মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও
রক্তাক্ত আফগান

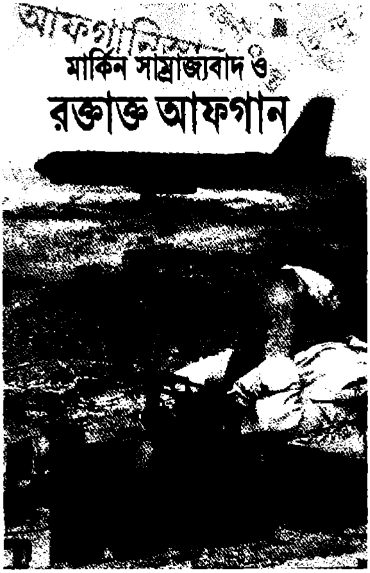

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও রক্তাক্ত আফগান

(১১ সেপ্টেম্বর '০১ থেকে তালেবান সরকার পতন পর্যন্ত
পূর্বাপর ঘটনার বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংকলন)

www.pathagar.com

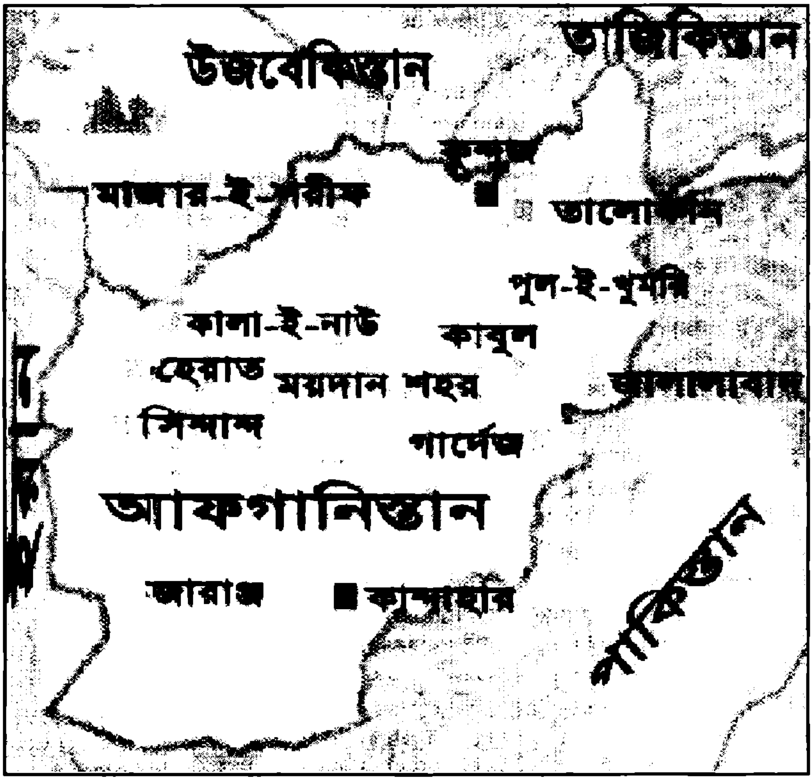

আফগানিস্তানের মানচিত্র।

www.pathagar.com

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও রক্তাক্ত আফগান

(১১ সেপ্টেম্বর '০১ থেকে তালেবান সরকার পতন পর্যন্ত
পূর্বাপর ঘটনার বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংকলন)

সম্পাদনায়
মাসুদ মজুমদার

www.pathagar.com

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও রক্তাক্ত আফগান
(১১ সেপ্টেম্বর '০১ থেকে তালেবান সরকার পতন পর্যন্ত
পূর্বাপর ঘটনার বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংকলন)

সম্পাদনায়
মাসুদ মজুমদার

প্রকাশক
মুহাম্মদ আমিনুর রহমান
১১৫, শহীদ তাজ উদ্দীন সরণী (নবম তলা)
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪২০৮৬

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০০২
প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

মুদ্রণ
রেডিয়্যান্ট
১৭৩/২, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৩৩৮৩৪২

স্বত্ব ঃ সম্পাদক-এর

মূল্য ঃ ৩৫০/- টাকা, ১৫/- ডলার

PAX-AMERICANA AND THE AFGHAN BLOOD BATH
(From 11th September 2001 Through the Fall of the Taleban Government: Explanatory Review of Articles and Papers Regarding Events Leading to- During and Aftermath)
Editor : **Masud Majumder.**
Published by : **Md. Aminur Rahman,** 115 Shahid Tajuddin Sarani (8th Floor)
Bara Maghbazar, Dhaka-1217, Phone : 9342086.
Date of Publications: November 2002. Cover Designed by: **Arifur Rahman.**
Price: Tk. 350.00. US $ 15.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

১৯৪৮ সালে ইসরাইল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বর্তমান ধারার শুরু। সেই থেকে আজ নাগাদ পৃথিবী জুড়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের শিকার মজলুম জনগণের আত্মত্যাগের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত

DEDICATION

State Terrorism that continues today stem from the superimposed Israel state in the land of Palestine in 1948. This compilation is dedicated to the memory of those who sacrificed their lives to State Terrorism and Imperialistic Barbarism since then.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১। অন্য ত্রিশদিনের মতই একটি দিন, কিন্তু আলাদা। নিউ ইয়র্ক শহরের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র-যা কিনা পুজিবাদী বিশ্বের অহংকার, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। পেন্টাগন-যাকে ভাবা হয় পরাশক্তির সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের প্রাতিষ্ঠানিক পিঠস্থান। চোখের পলকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে গেলো। কেউ ভাবেন-এটা ঘটনার শুরু, অনেকের ভাবনা এটা ঘটনার উপসংহার পর্ব। যুক্তরাষ্ট্র ভাবলো তারা আক্রান্ত। মার্কিন বিশ্লেষকেরা মন্তব্য করলো—এতদিন আঘাত হানতো অন্যের ভুঁইতে, রণাঙ্গন হতো মানচিত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থান, আজ খোদ মার্কিন মুল্লুকে আক্রান্তের আহাজারি, শোকের মাতম, ভীতির আতঙ্ক, ক্ষতির বেশুমার হিসাব।

তাৎক্ষণিক যুক্তরাষ্ট্র একজন ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষে দাঁড় করালো, তার নাম ওসামা বিন লাদেন। উচ্চশিক্ষিত ধনাঢ্য সৌদী নাগরিক। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইসলামী জাজিরাতুল আরবের স্বপ্ন দেখার অপরাধে নির্বাসিত রাষ্ট্রবিহীন একজন যাযাবর। লাদেনকে উপলক্ষ করে আক্রান্ত হলো আফগানিস্তান। আরোপিত যুদ্ধে তালেবান সরকার উচ্ছেদ হলো। নির্বাসিত হলো অজানা কোন স্থানে। আজ নাগাদ কেউ জানে না লাদেন কোথায় আছেন, কি ভাবে আছেন। তালেবান সরকার প্রধান মোল্লা ওমর কোথায় আছেন, কারা তাঁর আশ্রয় দাতা, কাদের প্রশ্রয়ে তাঁরা আত্মগোপন করে আছেন। অধিকন্তু, তারা জীবিত কি মৃত সেই তথ্যও কারো হাতে নেই। সম্প্রতি জাজিরা টেলিভিশনে ওসামার নতুন ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে। তার নামে ইন্টারনেটে সার্কুলার ইস্যু হয়েছে। মোল্লা ওমর অদৃশ্য কোন স্থান থেকে তার অনুসারীদের নির্দেশ দিচ্ছেন। মার্কিন স্থাপনা এবং 'পুতুল সরকারকে' টার্গেট করে আবার 'জিহাদ' শুরু করার আহ্বান জানাচ্ছেন।

এই হলো ঘটনা পরম্পরার একদিক। অন্যদিকে আছে সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস রূপ। মানুষ ও মানবতার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ কত নিষ্ঠুর, ভয়াবহ ও জঘন্য হতে পারে তার নমুনা। যুদ্ধ-ধ্বংস কাকে বলে তার উপমা। মানুষের মৃত্যু নিয়ে মানুষ কত হীন, ঘৃণ্য ও দুর্বিনীত আচরণ করতে পারে তার উদাহরণ।

এটা সবার জানা কথা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অস্ত্র বানায় নিজস্ব গরজে কিন্তু ব্রেকফার্স্ট কিংবা ডিনারের জন্য নয়, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য।

লক্ষ লক্ষ টন বোমা পড়েছে আফগানিস্তানের পাথুরে মাটি ও পাহাড়ের ওপর। দু'টো

www.pathagar.com

বিশ্বযুদ্ধে যে পরিমাণ অস্ত্র ও গোলা-বারুদ ব্যবহৃত হয়েছে সমপরিমাণ ব্যবহৃত হয়েছে আফগানিস্তানে অসম যুদ্ধে। অধিকন্তু অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র-ক্ষেপণাস্ত্র যা বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, কুয়েত আক্রমণ ও উদ্ধারে তা ব্যবহৃত হতে পারেনি, পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালানো সম্ভব হয়নি। আফগান শিশু-নারী-বৃদ্ধ অসহায় বেসামরিক মানুষের ওপর তাও পরীক্ষা করা হয়েছে।

যুদ্ধ শুরু করার আগে ডব্লিউ বুশ যুদ্ধের নৈতিক কারণ দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলো। তার শ্লোগান ছিলো 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। বিশ্ব বিবেক দর্শকের ভূমিকা পালন করলেও মার্কিনী কারণের সাথে একমত পোষণ করেনি। বরং এই যুদ্ধ মানবতার বিরুদ্ধে পরাশক্তির একতরফা নগ্ন হামলা হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। একজন ফরাসী সাংবাদিক জোর দিয়ে বলেছেন বুশের যুদ্ধের কোন নৈতিক কারণ নেই, মার্কিনীরা নিজস্ব প্রয়োজনে লাদেন নামে একজন প্রতিপক্ষ দাঁড় করাবার গরজবোধ করতো যদি বাস্তবে কোন লাদেন নাও থাকতো। এই একটি তথ্যই আরোপিত যুদ্ধের আসল মতলব চিহ্নিত করে দেয়।

আফগান যুদ্ধের ফলাফল মিলাবার সময় আসেনি। সবাই একমত যে পৃথিবী পাল্টে যাবে। ১১ সেপ্টেম্বর পাল্টাবার দামামা বাজিয়েছে। এই যুদ্ধের শেষ কোথায় কেউ জানে না। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক,ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অভিন্ন স্বার্থের মেল বন্ধনে যে যুদ্ধ শুরু হয়, তা শেষ হয় না।

একটি ঘটনার নানামুখি বিশ্লেষণ হতে পারে। একই ঘটনা দেখা ও পর্যবেক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করতে পারেন। এটি কখনো কখনো আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। কখনোবা মানবিক সীমাবদ্ধতা কিংবা মেধার বিষয়ও হতে পারে। চিন্তা করলেই মানুষ চিন্তাবিদ বা চিন্তানায়ক হয় না, বিশেষ দৃষ্টিতে অন্বেষা বা দর্শন করলেই সবাই দার্শনিক হন না। একজন মানুষ যতটুকু ভালোভাবে জানে তা শুধু নিজের ব্যাপারেই, অন্যসব ব্যাপারে ধারণা-অনুমান এবং বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। বিচার-বিশ্লেষণ বিশ্বাস ও মানসিকতা দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। মানুষ কখনো মন ও বিশ্বাসে নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাছাড়া মানবিক সীমাবদ্ধতা ডিঙ্গাবারতো প্রশ্নই ওঠে না। মানুষ সাধারণত বিশ্বাস প্রবণতার দিকে ঝুঁকে থাকে। তাই আফগান যুদ্ধ, তালেবান সরকার ও ওসামা বিন লাদেনকে সবাই একই সমান্তরাল ভাব ও ভাষায় বিশ্লেষণ করবেন এটা ভাবা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র ভাবনা, মানবাধিকার দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাধীনতার চিন্তা সম্পর্কে আজকের বিশ্বের প্রায় সকল মানুষ, মুক্ত বিবেক একমত যে মার্কিনীরা ডাবল চিন্তা এতটা আত্মস্থ করেছে যে, তাদের প্রশাসন কোন ভাবেই মানবিক হতে পারে না। অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েই তারা বিশ্বের ওপর একক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। যারা টুইন টাওয়ার এবং পেন্টাগনকে টার্গেট বানিয়েছে তারা মার্কিন জনগণ এবং মার্কিনীদের স্বাধীনতাকে, রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে উদারনৈতিক শাসনতান্ত্রিক চর্চা ও আইনের শাসনের প্রতি চ্যালেঞ্জ করতে চায়নি। পশ্চিমা নষ্ট ও বস্তুবাদী সভ্যতার নাভীমূলে কিংবা অপসংস্কৃতির বেদীতে, প্রযুক্তির স্নায়ুকেন্দ্রকে আঘাত করতে চায়নি। সরাসরি আঘাতটা করতে চেয়েছে অর্থনৈতিক অহম ও সামরিক দম্ভের ওপর। এটা যেন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, ক্ষীণকণ্ঠের প্রতিবাদ।

প্রতিবাদের ভাষায় সংযম থাকে না, ব্যাকরণ থাকে না। এটা কখনো কখনো হঠকারিতায়

www.pathagar.com

রূপান্তরিত হতে পারে। হতে পারে আত্মঘাতী। মজলুম যখন জালেমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আর কোন ভাষা খুঁজে পায়না তখন যে ভাবেই পারে তার প্রতিবাদকে ঘৃণায় রূপান্তর করতে বাধ্য হয়, ঘৃণার ভাষা সাধারণত বহুমাত্রিক, এর প্রকাশ সংযম নির্ভর নয়।

আফগান যুদ্ধ-আসলে এটা যুদ্ধ নয়, আফগান 'যুদ্ধ' ভাবলে বলতে হবে এটা আরোপিত যুদ্ধ। অসম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আমেরিকা একতরফা একটি ছায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কার্যকর প্রতিপক্ষ ছিলো না। একদল মজলুম আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে মাত্র। সংখ্যায় এরা ছিলো এতই কম যে, আত্মরক্ষাকারী একজন তালেবান কিংবা একজন কায়দা সদস্যের তুলনায় অসহায়-নিরস্ত্র শিশু-বৃদ্ধ-নারীর সংখ্যা ছিলো হাজারগুণ। ফলে প্রতিটি গোলা-বোমা প্রতিবারই কেড়ে নিয়েছে নিরস্ত্র এমন কোন বনি আদমকে, তার পরিচয় হয়তো অসহায় নারী-শিশু কিংবা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। এই কারণেই বলা যাবে এটা যুদ্ধ নয়, একতরফা গণহত্যা। মানুষ ও মানবতার বিরুদ্ধে অস্ত্রবাজদের অস্ত্র পরীক্ষার মহড়া।

ইউরোপ যুদ্ধের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করেছে। ঠাণ্ডা মাথায় আমেরিকা যখন গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছিল ইউরোপ তখন যুদ্ধাতংক নিয়েও মার্কিনীদের মদদ যুগিয়েছে, ফলে এটা রূপ পেয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা হিসেবে। তারা চেয়েছে যুদ্ধটা যেনো এশিয়ার মাটিতেই শেষ হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ দাঁড়াবার আগে হত্যার বিনিময়ে যুদ্ধ থেকে বাঁচা যায়। আসলে আরোপিত যুদ্ধ তাৎক্ষণিক ফলাফল নির্ণয় করে দেয় না। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে একটি প্রলম্বিত প্রতিক্রিয়াজাত ফলাফলের জন্ম দেয়। আফগান আক্রমণ মার্কিনী অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছে। এক সময়ের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ এখন আদর্শিক লড়াইকে স্পর্শ করে বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিত রচনা করেছে।

আমরা একটি নির্মোহ পক্ষপাতমুক্ত ইতিহাস চাই। এই সময়ের ইতিহাস। সেটা রাজা-বাদশা-কিংবা রাজ-রাজড়াদের নয় মানুষের ইতিহাস চাই। সময়ের ইতিহাস চাই। মহাকাল থেকে আমরা ১১ সেপ্টেম্বর' ০১ সাল থেকে ২৫ নভেম্বর' ০১ তালেবান ঘাঁটি কুন্দুজের পতন পর্যন্ত মাত্র ৭৫ দিন অর্থাৎ পৌনে একশ' বা দু'মাস পনের দিনের ইতিহাসটা ধরে রাখতে চাই। আমরা আমাদের মত করে ইতিহাস তুলে ধরলে ঝোঁক-প্রবণতা কাজ করতে পারে। পক্ষপাতদুষ্ট হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই আমরা চেয়েছি এই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ দেশী-বিদেশী বিশ্লেষকরা যেভাবে উপস্থাপন করেছেন আমরা সেটুকু তুলে ধরতে। এই ক্ষেত্রে কোন মতকে খণ্ডন করা কিংবা দ্বিমত পোষণ করার দায়িত্ব আমরা নিতে চাইনি। পাঠক-ইতিহাসবেত্তা এর মাধ্যমে একটা নিরপেক্ষ উপসংহার টানতে পারবেন।

মহাকাল থেকে সময়কে বিভাজন করা দুঃসাধ্য। তারপরও কোন কোন সময় সন্ধিক্ষণ অধিকতর গুরুত্ববহ। আমরা যারা বিংশ শতকের শেষটা প্রত্যক্ষ করেছি, একবিংশ শতকের সূচনা পর্ব অতিক্রম করছি তারা অনেক উত্থান-বিকাশ ও পতনের নীরব সাক্ষী। সভ্যতার সংঘাত, সত্য-মিথ্যার লড়াই, সমাজবাদের পতন, ধনতন্ত্রের আধিপত্য, জাতি রাষ্ট্রের উত্থান, স্নায়ুযুদ্ধ, একক পরাশক্তির পদচারণা, বিজ্ঞানের উৎকর্ষ, মানবিক বিপর্যয়ের হলাহল প্রভৃতির সাক্ষ্য দিতে আমাদের উপস্থিতি অবশ্যই ইতিহাসকে বেশি প্রভাবিত করবে। তাই আগামী প্রজন্মের জন্য কিছু টাটকা ভাবনা রেখে যাবার দায়টা

www.pathagar.com

কম নয়। আফগান ইস্যুর মূল্যায়ন-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পূর্বাপর অনেক ঘটনাকে টেনে তুলেছে, সেটাই আমাদের উদ্যোগের মূল প্রেরণা।

লেখকের মত একান্তভাবেই নিজস্ব। ডান বাম মধ্যপন্থী নানামুখি লেখক নানা ভাবে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করবেন-এটাই স্বাভাবিক। আমরা এই স্বাভাবিকতা রক্ষার স্বার্থে লেখকের নিজস্ব ভাষা-বানান এবং দৃষ্টি ভঙ্গি হুবহু তুলে ধরেছি। এমন কি অতীত, বর্তমানকাল বিষয়ক সংশোধনীও আমরা পরিহার করেছি, এই কারণে পাঠকের মনে সন্দেহ বা খটকা লাগার দায়টাও আমাদের। কারণ দু'হাজার এক সালের ঘটনার বিশ্লেষণ, দু'হাজার দুই সালের উপস্থাপন একটু সময়গত ফারাক সৃষ্টি করতেই পারে।

দুনিয়াজুড়ে শত শত লেখক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীসহ আন্তর্জাতিক ঘটনা বিষয়ক বিশ্লেষক আছেন। আমরা লেখক-লেখা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে শুধু এতটুকু পক্ষপাত করেছি যে—বাংলাদেশের লেখকদের তিনি যে মতেরই হন প্রাধান্য দিয়েছি। অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে প্রতিনিধিত্বশীলদের টেনেছি। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রাপ্ত তথ্যগুলো আমরা খতিয়ে গ্রহণ করেছি। ইন্টারনেটে পেয়েছি বলেই লুফে নেইনি। ইত্তেফাক, ইনকিলাব, যুগান্তর, প্রথম আলো এই ক'টি দৈনিককে বেশি প্রাধান্য দিয়েছি। পাক্ষিক চিন্তা, সাপ্তাহিক বিক্রম থেকেও আমরা তথ্য নিয়েছি। ইংরেজি দৈনিক, আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা, গবেষণা পুস্তকও আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে। সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এখানে আমরা কোন পক্ষ বিবেচনা করিনি। তাই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বুশ, লাদেন, মোল্লা ওমর কারো মত টেনে আনার গরজবোধ করিনি। লেখকদের মন্তব্যকেই আমরা ধরে রাখতে চাই। অধিকন্তু আমরা 'আদালতের' দায়িত্ব পালন করার কোন চেষ্টাই করিনি, বরং বিশ্ব বিবেক ও জনতার আদালত যাতে উপকৃত হয়, আগামী প্রজন্ম এবং যে কোন ইতিহাসবেত্তাই নির্মোহ তথ্য খুঁজে পান সেই চেষ্টাই করেছি। এধরনের উদ্যোগ প্রথম নয়, তেমনি শেষও নয়, আবার একমাত্রও নয়। তাই কৃতজ্ঞচিত্তে বলবো আমরা যাদের কাছ থেকে উপকৃত হয়েছি সকলেই ইতিহাস সৃষ্টিতে অবদান রেখেছেন।

আগেই উল্লেখ করেছি মানবিক সীমাবদ্ধতার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষ একসাথে সামগ্রিক চিন্তা করতে পারে না। যা ভালো জানে তা শুধু নিজের সম্পর্কে। বাকীটা নির্ভর করে ধারণা-অনুমান তথ্য-উপাত্ত ও নির্ভরশীলতার ওপর। মানুষ নিজের পেছনটা দেখতে পায় না কিন্তু তার পেছনকে অস্বীকার করতে পারে না। তেমনি আমরা বিষয় বিশ্লেষকদের ওপর আস্থার সাথে নির্ভর করি। এই প্রকাশনার কাজে হাত দিয়ে আমরা প্রতিটি মুহূর্তে নিজেদের এই সীমাবদ্ধতা মগজে রেখেছি।

অল্প ক'টি ছবি যেগুলো স্বব্যাখ্যাত আমরা অঙ্গসজ্জায় সংযোজন করেছি। এতে প্রয়োজন মত এর ব্যবহার সহজ হবে। ছবিগুলোর অধিকাংশই ইন্টারনেট সূত্রে প্রাপ্ত। আমরা সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সৌজন্য স্বীকার করছি।

মাসুদ মজুমদার
ঢাকা।
নভেম্বর '০২ ❑

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও রক্তাক্ত আফগানিস্তান

প্রথম মহাযুদ্ধের বেশ আগে থেকেই ধনবাদের কুৎসিত রূপ পাল্টে ক্রমে জনগণ মনমোহিনী রূপে তার আবির্ভাব। কিংবদন্তীর চিত্রাঙ্গদার মত। তার গানের ধুয়া গণতন্ত্র, মানবাধিকার, ঔপনিবেশিকতার অবসান ও মুক্ত বিশ্ববাজার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাত্র আড়াইশো বছর আগেও ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-নিপীড়িত উপনিবেশ। ঔপনিবেশিক দশামুক্ত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ যে নয়া-ঔপনিবেশিক মহাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে এখন সে একক পরাশক্তি। ওদিকে পুঁজিবাদের ঘনীভূত সংকট জনহিতৈষী মলম দিয়ে শেষরক্ষা করতে পারছে না। ধনী দরিদ্রের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য আর ধনবাদী ভোগলালসার লাগামহীন পরিতোষণ পৃথিবীর স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে। মানবজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন। তাই প্রতিবাদের ভাষা ক্রমশঃই বজ্রকঠিন হচ্ছে। শ্রেণী সংগ্রাম বিবেকের সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। মার্কিন পরাশক্তিও জনগণ মনমোহিনী রূপচর্চা ভুলতে বসেছে। এখন বিশ্ব সন্ত্রাসী কুৎসিত দানব হিসেবে তার রূপান্তর ঘটছে। মুখে যুদ্ধ নয় বলে কাজে যুদ্ধবাজ হিসেবে এখন তার আত্মপ্রকাশ। অতীতে পুঁজিবাদী বিবর্তনের ধারায় একচেটিয়া ঔপনিবেশিক বাজার দখল ও রাজ্যজয়ের ইউরোপীয় নৌশক্তি-তৎপরতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোটামুটি নির্লিপ্ত ছিল বলা চলে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও পরবর্তী গৃহযুদ্ধের টানাপড়েন ও উচ্চাদর্শের জের তাকে একরকম অন্তর্বৃত করে রেখেছিল। নবাবিষ্কৃত মহাদেশ তথা উত্তর ও দক্ষিন আমেরিকার কর্মকান্ডের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনৈতিক উৎসুক্য বহুদিন একরকম কেতাবী পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল বলা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ব এশিয়ায় ইউরোপীয় শক্তিদ্বন্দ্বের নাম ডাক জারীর মহড়ায় তাল মিলিয়ে মহাচীনে অনুপ্রবেশের একটা সীমিত প্রয়াস তার ছিল বটে। কিন্তু তার বাড় বাড়েনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত আদপে মনরো ডকট্রিনের আওতায় আশেপাশের মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি আর কাছাকাছি কারিবিয়ান সমুদ্রের বানানা রিপাবলিক আর প্রশান্ত মহাসাগরীয় কিছু দ্বীপরাষ্ট্র পর্যন্ত ছিল তার দাপটের বিস্তার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ, উৎপাদন ও কারিগরি উদ্ভাবনের আভ্যন্তরীণ বাজার ছিল প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইউরোপ বা রাশিয়া ছিল তার সৌখিন বাজার। পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের বিভক্তির দ্বন্দ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগে পর্যন্ত খুব একটা মাথা গলায় নি। বিগত শতাব্দীর তিরিশ শতকের মহামন্দার ধ্বস ছিল মার্কিন

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বাজারের আত্মসন্তুষ্টিতে প্রথম বজ্রাঘাত। তার জের চলেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত। প্রাক্তন প্রভু বৃটিশ শক্তির উপরোধে আটলান্টিক চার্টারে স্বাক্ষরদান করে অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমে যখন বিশ্বরণাঙ্গনে পাশ্চাত্য মিত্রশক্তির সামরিক প্রধানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল (পূর্ব ইউরোপীয় মিত্র শক্তিকেও প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই রসদ জুগিয়েছে), তখনও তার আপ্তবাক্য ছিল, যুদ্ধ নয়, মুক্তবাণিজ্য আর ঔপনিবেশিকতার অবসান। যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত ইউরোপকে চাঙ্গা করে তুলতে মার্শাল প্ল্যান নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হ'ল, কারণ তার নিজভূমিতে (হাওয়াই দ্বীপ ছাড়া) মহাযুদ্ধের কোন আঘাত লাগে নি। তার সম্পদ ও উৎপাদন ক্ষমতা ছিল অটুট, সুরক্ষিত।

ইউরোপীয় মেধাক্রয় করে এবং নিজস্ব উদ্ভাবন শক্তির বদৌলতে ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আনবিক বিধংসী শক্তি অর্জন করেছে। তার যুদ্ধাবতরণের প্রাক্কালে জাপানী বোমারু বিমানের হাওয়াই দ্বীপের মার্কিন নৌঘাঁটি পার্ল হারবারে অতর্কিত আক্রমণের বদলা সে নিয়েছে সহস্রগুন। আনবিক বোমা ফেলে বিকীরণ দগ্ধ করেছে জাপানের পুরো দুটো শহরকে। মার্কিন নয়া ঔপনিবেশিকবাদের হৃদয়হীন নিষ্ঠূরতা ও নির্বিকার জিঘাংসার হাতেখড়ি সম্ভবতঃ তখনই ঘটেছে। মহাযুদ্ধের অবসানে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে প্রভাব বলয় বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় পশ্চিম ইউরোপের পক্ষ নিয়ে মার্কিন মহাশক্তি স্নায়ুযুদ্ধে রত হয়েছে বিশ্বব্যাপী। মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতা, নাশকতা-গুপ্তহত্যা, যুদ্ধজোট গঠন, গৃহবিবাদে ইন্ধন বা সীমিত যুদ্ধ ইত্যাদি অনেক মতলববাজ খেলাতেই গোপনে বা প্রকাশ্যে লিপ্ত হয়েছে মার্কিন বিশ্বশক্তি ও তার সাগরেদ পর্যায়ে পরিণত প্রাক্তন প্রভু বৃটিশরাজ।

এদিকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, মহাকাশ জয় যান্ত্রিক বুদ্ধি তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি আরও নানা ধরণের ব্যবহারিক উদ্ভাবনে অসামান্য অগ্রসর প্রযুক্তির বাণিজ্যিক অশ্বমেধযজ্ঞে। পশ্চিম ইউরোপও তার রথযাত্রার সারথি হয়েছে। সেই ঘোড়দৌড়ে রাশিয়া হেরে গেছে। ভেঙে কয়েক টুকরো হয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। ফলে অপ্রতিরোধ্য মার্কিন পরাশক্তি এখন বেসামাল। আর তার অগ্রসর প্রযুক্তির দক্ষতা-মূল্য বা উৎপাদনের বাজার এখন বিশ্বব্যাপী। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার অধিনায়ক হিসাবে বিশ্ববাজারকে কুক্ষিগত রাখার তাগিদ তার অপরিসীম। তার অগ্রসর প্রযুক্তির অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের সুবাদে মার্কিন নীতিনির্ধারক সমাজে এমন ধারণাও জন্মেছে যে আগামী হাজার বছর মার্কিন আধিপত্যের যুগ। তার হুংকারে যারা মাথানত করবে না তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেও কেউ কিছু বলার থাক্‌বে না। মার্কিন শক্তিমত্তার এই পরাকাষ্ঠার সর্বস্বীকৃতির জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান বুশ প্রশাসন। পূর্ববর্তী ক্লিন্টন প্রশাসন আফগানিস্তান অতর্কিত ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে দূরপাল্লায় তার ধবংস ক্ষমতার একটা নমুনা দেখিয়েছিলমাত্র। বুশ প্রশাসন আফগানিস্তানে বোমা হামলার কার্পেট বিছিয়ে রক্তবন্যা প্রবহমান করেছে। সমগ্র আফগানিস্তানে স্থিতিশীল তালেবান প্রশাসনকে উচ্ছেদ করে সে দেশের পরাজিত পলায়নপর একটা দস্যুসর্দার চক্রকে কিছু প্রবাসী পলাতক জড়ো করে কাবুলে ক্ষমতায় বসিয়েছে। সেই পুতুল সরকারের সুরক্ষার নামে আফগানিস্তানে পাকাপোক্তভাবে মার্কিন সমরযন্ত্র ও তার দোসরদের উপস্থিতি। কেন ? সেটা কি নিছক ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ নিউ ইয়র্ক আর ওয়াশিংটনে আত্মঘাতী সাধারণ প্রযুক্তির ধ্বংস ক্ষমতার প্রদর্শনীর ধৃষ্টতার বদলা নেবার জন্য ? সে প্রদর্শনী যেন মার্কিন পরাশক্তির

www.pathagar.com

অগ্রসর প্রযুক্তির দম্ভকে তামাশা করে গেল। তার ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধের অচ্ছেদ্য ব্যূহরচনার উচ্চভিলাষী ব্যয়বহুল পরিকল্পনাকে উপহাস করে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ পরিবহনের চারটা উড়োজাহাজ কব্জা করে নাম-না-জানা ছিনতাইকারীরা তার জ্বালানি তেলের পূর্ণ ভান্ডকেই ক্ষেপণাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে যুগপৎ আঘাতে পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিল নিউ ইয়র্কের আকাশচুম্বি টুইন টাওয়ার আর ওয়াশিংটনে পেন্টাগনের একটা বহুতল ভবন। সেটাও ছিল একটা হিংসাত্মক বিধ্বংসী আক্রমণ। আফগানিস্তানে সন্দেহভাজন প্রশিক্ষণ শিবিরে ক্লিন্টনের ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণের মত বিনামেঘে বজ্রপাত। তুলনা অসম হলেও বলতে হয়, দুই ক্ষেত্রেই প্রাণ দিয়েছে নিরীহ মানুষ। স্পষ্টতঃ ১১ই সেপ্টেম্বরের আত্মঘাতী যুগপৎ হামলায় জীবনহানি আর সম্পদহানির ব্যাপকতা ছিল ভয়াবহ। তার চাইতেও বড় কথা, মার্কিন আকাশ নিরাপত্তা আর অর্থনৈতিক স্থিতিমূলে শক্ত নাড়া দিতে পেরেছিল ঐ হামলা। তার মাধ্যমে নাম-না-জানা কোন ভুঁ-ইফোড় গোপন চক্র রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও দমনশক্তিনির্ভর বিশ্বব্যবস্থাকে যেভাবে দুঃসহ অবজ্ঞা প্রদর্শন করল, সেটা অন্যান্য জাতিরাষ্ট্রগুলিও কেউই দুর্বলের আত্মবলির প্রতিশোধ বলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখলো না। তার সমূহ নিন্দা প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হল জাতিসংঘে। মার্কিন নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের ছায়ার বিরুদ্ধে রণসজ্জার ডাকে সাড়া দিল দক্ষিণ এশিয়াভুক্ত জাতিরাষ্ট্রগুলিসহ নানা দেশ ও শক্তিধর রাষ্ট্র।

বুশ প্রশাসন বললো, ঘটনার জন্য দায়ী ওসামা বিন লাদেন ও তার ছায়াসংগঠন আল কায়েদা। ছিনতাইকারীরা প্রায় সকলেই আরব গুপ্তঘাতক। ওসামা বিন লাদেন আরবদের মধ্যে মার্কিন বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে বলে বহুদিন থেকেই মার্কিন প্রশাসন তাকে তাড়া করে ফিরছে। সৌদি আরব থেকে বিতাড়িত হয়ে সে সুদানে আশ্রয় নিয়েছিল। মার্কিন চাপে সুদান থেকেও বহিষ্কৃত হয়ে সে আফগানিস্তানে আশ্রয় পায়। অতীতে মার্কিন সহায়তা ও অস্ত্রশিক্ষা নিয়েই আফগানিস্তানে সে রুশ সামরিক দখলের বিরুদ্ধে লড়েছিল।

বুশ প্রশাসন আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের কাছে দাবী করল, লাদেনকে আমেরিকায় বিচারের জন্য হস্তান্তর করতে হবে, কারণ সে টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে ধ্বংসাত্মক আত্মঘাতী আক্রমণের মূল হোতা, যুদ্ধাপরাধী। তালেবান সরকার বললো, উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া রাষ্ট্রীয় অতিথিকে কোনক্রমেই অন্যের হাতে তুলে দেবে না আফগানিস্তান। তার পাল্টা যে মহাধ্বংসাত্মক আক্রমণের ছক কাটলো, মার্কিন সৈন্যেরও জীবন হানির ঝুঁকি নিল যুক্তরাষ্ট্র, সেটা কি নিতান্তই পরাশক্তির প্রতিশোধের রুদ্ররোষ? এতদিন তো আফগান তালেবানদের উপেক্ষা করেই আসছিল মার্কিন পরাশক্তি। জাতিসংঘ বহির্ভূত তালেবান প্রভাব না ওসামা বিন লাদেনের আল কায়েদা চক্র বিশ্বশক্তির দরবারে পতঙ্গতুল্য, সভ্যজগতের এক পাশে ক্ষুদ্র নগণ্য তাদের অবস্থান। তবু মশা মারতে কামান দাগা কেন?

১১ই সেপ্টেম্বরের এক বছর পরে এমন অনেক অব্যক্ত প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হচ্ছে বুশ প্রশাসনকে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে মার্কিন বৈদেশিক নীতি নিয়ে। তাই তথাকথিত সন্ত্রাসের ছায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে আরও বিস্তৃত করে একতরফা ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণের নগ্ন প্রস্তুতি ও প্রচারে লিপ্ত হয়েছে বুশ ব্লেয়ার আঁতাত। বিশদ সে আলোচনায় না গিয়ে আমি এখানে শুধু আনবো, আফগানিস্তানে তালেবানকে হটিয়ে মার্কিন পুতুল

www.pathagar.com

সরকার প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে মার্কিন তেলরাজনীতির একটা প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পর্বে আরও দুটো ঘটনা ঘটেছে। প্রথমতঃ মার্কিন শক্তিবিস্তার ও ভোগপ্রবৃত্তির শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি তার জন্য আভ্যন্তরীণ জ্বালানী তেলের বিপুল চাহিদা সৃষ্টি করেছে। অপেক্ষাকৃত সস্তা অপরিশোধিত তেল সরবরাহের জন্য সে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়তঃ মহাযুদ্ধের ব্যয়বহনে ইহুদী ধনকুবের ও প্রযুক্তিবিদদের অর্থ ও মেধার যোগান পুরস্কৃত করতে জংগী ইহুদিবাদ বা যায়েনিজমের প্রতি মার্কিন প্রশাসনের একটা সহমর্মিতা গড়ে উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্যে আরব বিশ্বের স্কন্ধলগ্ন, কোন নির্দিষ্ট সীমারহিত ইসরাইলী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের চাপ বজায় রেখে আরব শক্তিগুলোকে ব্যতিব্যস্ত রাখার কৌশলও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আরব বিশ্বকে বিভক্ত রাখতে মার্কিন নীতি নির্ধারকেরা সৌদি আরব রাজবংশের রক্ষণশীলতাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, তার নানা ফিকির তৈরী করেছে। ক্রমে মিশরকে করায়ত্ব করেছে। ওদিকে ইসরাইলের সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পন্ন করে কার্যতঃ মধ্যপ্রাচ্যে যে কোন জরুরী অবস্থায় মার্কিন সামরিক প্রবেশ পথ উন্মুক্ত রেখেছে। ইসরাইলের প্রতিরক্ষা ও সম্প্রসারণের বিপুল ব্যয়ভার যুক্তরাষ্ট্র অনুদানের মাধ্যমে নিজের ঘাড়ে নিয়েছে। ওদিকে সৌদি আরবে কমান্ড কন্ট্রোলের একটা উচ্চ প্রযুক্তির স্থাপনা ও সামরিক উপস্থিতিও বজায় রেখে চলেছে। মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় মার্কিন প্রশাসন নামমাত্র লোকদেখানো ব্যস্ততা চালু রেখেছে, আসলে চলছে ঢিমাতালে। ইসরাইলকে সুযোগ ও মৌন সমর্থন দিচ্ছে দেদার পিটিয়ে ফিলিস্তিনবাসীদের গণহত্যা ধরপাকড়ের মাধ্যমে মনোবল ভেঙে দেওয়ার অপচেষ্টায়। সৌদি আরবকেও ভয় দেখাচ্ছে। সন্ত্রাসী আরব তৎপরতার সঙ্গে সেদেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির পরোক্ষ সম্পৃক্ততার কারণে সেদেশে সরাসরি মার্কিন হস্তক্ষেপ যুক্তিযুক্ত এমন মতবাদ উচ্চপর্যায়ে উত্থাপিত করছে। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র বা নিমরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটা মনগড়া ছক বেঁধে দিয়েছে বুশ প্রশাসন। তিন বছরের সময়সীমা স্থির করে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রকে ও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে বুঝ্ দেওয়ার চাল চেলেছে। এককভাবে হলেও ইরাক আক্রমণের এবং সেই সময়সীমা পেরুবার আগেই সেখানে সরকার পরিবর্তনের মার্কিন কর্মসূচী সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়েছে বুশ প্রশামন।

ইরাক আক্রমণের জন্য এই নিশপিস্, এই ত্বরা, এই অধীরতা কেন? কারণ আরব তেলের সরবরাহের মাত্রায় কোন কারণে ভাঁটা পড়ুক, এটা যুক্তরাষ্ট্র কোনক্রমেই হতে দেবে না। সউদি তেলের বিপুল খনিজ আগামী দশ বছরে মজুদ ক্রমেই ফুরিয়ে আসবে। মধ্যপ্রাচ্যে তখন সবচাইতে বেশী উত্তোলনযোগ্য তেলের মজুদ থাকবে ইরাকে। সাদ্দামকে না সরালে ইরাকের তেলের নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যাবে না তাছাড়া সাধারণভাবে আরব জনমনে মার্কিন পরাশক্তির প্রতি ভক্তি ও আনুগত্যের ভাব সৃষ্টি করা যাবে না। তাই সাদ্দামকে ঝুঁকিপূর্ণ রক্তাক্ত যুদ্ধ করে হলেও হঠাতে হবে, পরাজয়ের গ্লানি তার মাথায় চাপাতে হবে, এটাই বুশ প্রশাসনের মরণ-পণ। একই সাথে সউদি আরবেও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের হুমকি দিয়ে রাজপরিবারকে হাতের মুঠোয় রাখতে হবে, স্পষ্টতঃই এই কৌশল অবলম্বন করেছে বুশ প্রশাসন। সেই কৌশলের পিছনে যেমন রয়েছে ইহুদিবাদের প্ররোচনা (ইরাকের রণশক্তি বা সৌদি আরবের ধনবল বর্ধিষ্ণু হলে ইসরাইল কখনোই নিজেকে সর্বেসর্বা বা সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করতে পারবে না), তেমনি রয়েছে

www.pathagar.com

বিশ্বের সীমিত জ্বালানী তেল সম্পদের উপর একচেটিয়া মার্কিন নিয়ন্ত্রন আরোপ করার তাগিদ।

তাহলে আফগানিস্তানকে এত রক্তের মূল্য দিতে হল কেন ? সেও কি সউদি আরবকে বাগে রাখতে আফগানিস্তানের সৌদি শরণার্থী ওসামাকে যমদূত তাড়িত-লাঞ্ছিত-ক্ষতবিক্ষত করে পরাশক্তির ক্রোধানলের দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য ? মোটেও নয়। আফগানিস্তানে মার্কিন বিধ্বংসী আক্রমণের মুখ্য কারণও তেল রাজনীতি। তবে সেটা মধ্যপ্রাচ্যের তেল নয়, মধ্য এশিয়ার তেল।

কাস্পিয়ান সাগর আর তার পার্শ্ববর্তী প্রাক্তন সোভিয়েট বর্তমানে স্বাধীন কমনওয়েলথের তিনটি দেশে বিপুল পরিমাণ তেল এবং গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে। এই দশকের মাঝামাঝি সময়ে কাজাকিস্তানের সমুদ্র সৈকতে ও কাস্পিয়ান সাগরে ভূ-গর্ভে তেল সম্পদের পরিমাণ কমপক্ষে ২০ বিলিয়ন ব্যারেল (কোন কোন হিসেবত মতে ৫০ বিলিয়ন ব্যালে।)। যদি সবচেয়ে কম অনুমানকেও গ্রহণ করা হয় তবে সেটা দাঁড়ায় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে তেলের যে রিজার্ভ আছে তার প্রায় কাছাকাছি। মধ্য এশিয়ার মাটির নিচে এই অভাবনীয় পরিমাণ তেল সম্পদের আবিস্কার মার্কিন পরাশক্তি ও তার বিশ্বস্ত মিত্রদের ওই অঞ্চল নিয়ে নতুন চক্রান্তে উৎসাহিত করে তোলে। অত্যুৎসাহী তেল বিশেষজ্ঞরা সে সময় এসব মন্তব্য ও করেন য়ে, যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও উত্তোলন করা সম্ভব হলে কাজাকিস্তানের তেল সম্পদ সৌদি আরবের চেয়েও বেশী হবে আর তুর্কমেনিস্তানে যে পরিমাণ তেল রয়েছে তা পরিমাণের দিক থেকে গোটা বিশ্বের তালিকায় পঞ্চম।

সমস্যা দেখা দেয় প্রাপ্ত তেল ও গ্যাস সম্পদ বাজারজাত করার রাস্তা নিয়ে। মধ্য এশিয়ার এই তেল অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার উপায় কি? আশপাশে কোন সমুদ্র বন্দর নেই। চারদিকেই পাহাড়-পর্বত, বা উপত্যকা। পাইপলাইন বসিয়ে এই সম্পদকে পণ্যের আকারে বিশ্ব বাজারে আনার জন্য ৫টি বিকল্প উপায় পাওয়া যায়। প্রথমটি চীনের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয়টি প্রতিবেশী জর্জিয়ার বাকু হয়ে কৃষ্ণসাগরে। অথবা বাকু হয়ে তুরুস্কে। চতুর্থটি আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তানে। পঞ্চমটি চেচনিয়া হয়ে রাশিয়ায়। যুক্তরাষ্টের জন্য সম্ভাব্য বিকল্পগুলোর কোনটিই খুব আকর্ষণীয় ছিলনা । যুক্তরাষ্ট ও পশ্চিমা দেশগুলো চায়নি যে তেলের প্রবাহ রাশিয়া বা আজারবাইজান হয়ে বিশ্ব বাজারে আসুক । তাতে গোটা মধ্য এশিয়ার রাজনীতি রুশনির্ভর হয়ে পড়ার ভয়। ইরানের ভেতর দিয়ে পাইপলাইন বসানো হোক এটা যুক্তরাষ্ট গ্রহণ করতে পারছিলনা। কেননা, তার অর্থ হবে যুক্তরাষ্টের কোন কোম্পানী তাতে অংশ নিতে পারবেনা এবং ইরানের ক্ষমতাসীন মার্কিন বিদ্বেষী সরকারের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। চীনের মধ্য দিয়ে এই তেলের পাইপলাইন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কোন বিবেচনায়ই যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গ্রহণযোগ্য সমাধান ছিলনা। ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায় পশ্চিমা বিশ্বের জন্য একটিমাত্র বিকল্প বাকি থাকে-আফগানিস্তান হয়ে পাইপলাইন বসানো। আর সেজন্যই তালেবান সরকারকে হারানো হঠানো মার্কিন প্রশাসনের জন্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। এগারোই সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে বুশ প্রশাসন বুঝে শুনেই ব্যবহার করেছে তালেবান হঠিয়ে আফগানিস্তানে তার অনুগত একটা পুতুল সরকার বসানোর উপলক্ষ্য হিসাবে। ওসামা বিন লাদেনকে মার্কিন

www.pathagar.com

গোয়েন্দা বা সামরিক বাহিনী খুঁজে পায় নি। তা নিয়ে খুব মাথাও ঘামাচ্ছে না বুশ প্রশাসন। কাবুল কান্দাহারের পথ ধরে আরব সাগর থেকে মধ্য এশিয়ার জ্বালানী তেলের ভান্ডার পর্যন্ত পৌঁছাবার নিরাপদ রাস্তার পাহারার পাকা বন্দোবস্ত তার হয়ে গেছে। আর সেটাই ছিল তার নয়া-ঔপনিবেশিক স্বার্থের লক্ষ্যবস্তু।

তালেবানদের আরোপিত শৃংখলার অবর্তমানে দূর্ভাগা আফগানিস্তানে কি তাহলে কাবুল কান্দাহার বা আরও কিছু দূর্গ শহরের বাইরে রক্তপাত অশান্তি আর অরাজকতারই স্থায়ী বন্দোবস্ত হল ? স্বাধীনচেতা আফগান সংকল্প, আত্মমর্যাদাবোধ ও নির্ভীক প্রতিরোধ কি বিধ্বংসী প্রযুক্তিসিদ্ধ দূরপাল্লার আক্রমণে ও নির্মম দুঃশাসনে নিঃশেষ হয়ে গেল ? আফগান ইতিহাস তা বলে না। এই সংকলনে আফগানিস্তানের অদৃশ্য প্রতিরোধের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের স্বচ্ছ মূল্যায়ন লিপিবদ্ধ হয়েছে প্রাক্তন তালেবান রাষ্ট্রদূত সাইয়ীদ রাহমাতুল্লা হাশেমীর দুটো নিবন্ধে। তার মর্মবাণী রক্তাপ্লুত আহত আফগানিস্তানের পুনরুজ্জীবনের দিশারী হবে, তার লক্ষণ ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এছাড়াও ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে রচিত এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত দেশ-বিদেশের বিভিন্ন লেখকের অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ এই প্রকাশনায় সংকলিত হয়েছে। বিশ্বের রাজনীতি কিভাবে একটা স্বল্পস্থায়ী ধ্বংসাত্মক ঘটনায় বাহ্যতঃ আমূল পাল্টে গেল, কিভাবে উচ্চাদর্শের বুলি হারিয়ে রিয়াল-পলিটিক বা রাজনৈতিক দরকষাকষির নগ্ন স্বার্থপরায়ণতার প্রতিধ্বনি বিশ্বসভার রাষ্ট্রনায়কদের মুখে মুখে ফিরছে, তার ছাপচিত্র পাঠক পাবেন এই সংকলনের মধ্যে।

সাদেক খান

প্রবীণ সাংবাদিক, শিল্প সমালোচক ও গবেষক।

www.pathagar.com

PREFACE

11th September 2001. Like the rest of the thirty days, but different. In a moment New York city's World Trade Center, the pride of the capitalist world, the icon of wealth and supremacy, was reduced to rubble. Within a blink of an eye, the Pentagon, an institute which is recognized as the supreme institute signifying the Western military might, became the object of attack. Some think this is where the story begins, whilst many others think this is the conclusion. The US thought they were under attack. US analysts remarked: Until now attacks were carried out in others' territories, battlefields were spread far and wide across the world map, today America itself is under attack and feeling the terror, the mourning, the loss, the burden of financial leakage.

Instantly the US targeted one person as its enemy, his name is Osama-bin-Laden. A well educated, rich Saudi citizen convicted of going against imperialism and dreaming of an Islamic Jajiratul Arabia. Banished and without a country, a nomad. Targeting bin-Laden, Afghanistan was attacked. The Taleban Government fell in an imposed war and has since been exiled to an unknown location. Today, nobody knows where bin-Laden is or how he is. Nor is much known about where or under whose protection Mollah Omar is, the leader of the Taleban. In actuality, nobody knows whether they are dead or alive. Recently, Jajira Television has published Osama's lat-

www.pathagar.com

est video. Circulars have been issued on the Internet under his name. Mollah Omar is giving instructions to his followers from an unknown location. He is calling for a new 'Jihad' on US establishments and the new 'Puppet Government' in Afghanistan.

This is one side of the story. On the other side is the gruesome nature of imperialism. An example of how cruel it can be towards people and humanity, how grisly, how disgusting. A show of what war devastation really is. An example of how wicked, despicable, and degrading one's attitude can be towards another's death.

Its a well-known fact that imperialistic powers make weapons to serve their own needs; not to serve breakfast or dinner with but to kill their enemies.

Hundreds of thousands of tons of bombs have landed on the mountains and rocky terrain of Afghanistan. Artillery and munitions in the range of that used in two world wars combined was used in the lopsided war in Afghanistan. The latest and most deadliest of weapons invented after the World Wars, which could not be used or tested in the Iran-Iraq war, the attack on Kuwait or its recovery, were tested on the innocent children, women, and aged civilians of Afghanistan.

Before starting the war, G. W. Bush tried to establish ethical grounds for it. His slogan for it was 'War against Terrorism.' Even though world conscience played the role of an audience, it did not concur with American reasons for the war. Instead, this war was noted as being against humanity, and as the naked one-sided aggression by the Western powers. A French journalist has stressed that there are no ethical grounds for Bush's war; Americans, out of their own necessity, would have felt the need to create a foe named bin-Laden even if he did not exist. This fact alone signifies the real reason behind this imposed war.

The time has not come to evaluate the results of the Afghan war. Everybody is of the same opinion that the world will change. The events of 11th September have sounded the bugle of change. Nobody knows where this war will end. A war that is bound by financial, political, religious and philosophical grounds has no end to it.

An event may have many different interpretations. The same event

www.pathagar.com

may be seen and observed by different people in different lights. Sometimes this is a matter of idealistic points of view, sometimes a matter of human incapability or a matter of varying intelligence. Just because a person is able to think, it doesn't make him a sage; and just because a person is able to see, it doesn't make him a philosopher. What a person knows well is what he knows about himself. In other aspects he has to depend on assumption, comprehension and his abilities of judgment. His beliefs and nature tremendously affect a person's judgment. People can never be impartial when it comes to one's thoughts and beliefs. Overcoming human incapacity is completely out of the question. People are prone to be inclined towards their beliefs. So it cannot be thought that everybody will evaluate the Afghan war, the Taleban government and Osama-bin-Laden in the same light. Of the US's democratic point of view, their stand on human rights issues and their opinions on freedom, almost the entire world is of the same opinion that Americans have mastered duality to such and extent that their administration can in no way be considered humane.

Through financial and military superiority, the US wants to singularly spread their own dominion over the world. Those who targeted the Twin Towers and the Pentagon did not intend the attack to be on the US citizens or on their freedom nor was it intended against the sound law and order system that exists within the US. They did not want to attack the Western filth or the center of the capitalistic society, nor did they want to attack the disease of an adverse culture or the nerve center of technology. The attack was intended to strike straight at their symbol of financial arrogance and at the structure signifying their supreme military prowess. Its as if the weak are expressing their grief through the softest of protests against the mightiest of mighty.

The language of protest has no restraint, no grammar, and no rationale. It can sometimes be converted into rashness. It may become self-destructive. When the oppressed have no way of protesting against the oppressor, the protest turns to hatred. Hate can be expressed in many ways and its expression is not governed by restraint.

The Afghan war-actually its not a war. If it is considered to be a 'war' then it must be known as an imposed war, a lopsided war. In this con-

www.pathagar.com

flict, the US is waging a one-sided war against a shadow. There was no capable opposition to prevent this attack. A group of oppressed people were simply trying to defend themselves. They were so small in number that to every Taleban or a member of the Al-Quaida faction there were thousands of times many more innocent, weaponless women, children and aged civilians. Based on this, it can be said that this is not a war but one-sided genocide. A demonstration of military prowess upon innocent people and humanity.

Europe has seen the horror of war. Europe came to US aid when the US was calmly carrying out cold-blooded mass murder. This has thus been termed as an Anglo-American attack. They desired the war to be concluded on Asian soil alone. If the opponent is murdered before he can stand, a war can be evaded. Actually, the results of an imposed war cannot be known instantly. Through action and reaction a long drawn out reactionary result takes form. The Afghan attack has challenged US existence. Once a war of mental anguish this is now touching the realms of an idealistic war and laying the foundations of a world war.

We want an honest unbiased history. A history of this time. Not a history of kings and kingdoms but a history of the people. A history of time. From the greater time continuum, we want to capture the time from 11th September 2001 to 25th November 2001 when the Taleban stronghold in Kunduz fell, a matter of 75 days, in other words, ¾ of a hundred days or two months and fifteen days. We want to preserve the history of this time. If we try to interpret history in our own way, we leave ourselves open to favoritism. There is the possibility of becoming biased. That's why we wanted to highlight the presentations of analysts from home and abroad regarding the events that transpired. In this respect, we did not want to break down any opinion nor try to show resentment towards any. The reader can extrapolate for himself an unbiased conclusion from this historical compilation.

Partitioning a section of time out from the greater time continuum is truly a daunting task. Even then some moments are too important to let slip by. Those of us who have witnessed the end of the 20th century and have observed the beginning of the 21st are silent witnesses to many rises, proliferations, and falls. Having observed the conflict of civilization, the war between truth and lies, the fall of socialism,

www.pathagar.com

the rise of capitalism, the war of nerves, the dominance of a single superpower, the superiority of science, and continued human suffering, this will obviously influence our historical representation of this age. So leaving behind some accurate information for our next generation is a responsibility we cannot shrug. Analyzing and breaking down the Afghan issue, it is evident that it involves many past and present episodes in history, bringing that to the fore is our chief inspiration.

A writers view is completely his own. It is normal to expect

leftist, neutral rightist and writers of other various orientations to observe an event from varying angles. In order to maintain this normalcy we have left intact the writers' language and point of view. We haven't even made adjustments in tense, and are thus responsible for the reader finding certain passages suspicious or strange. For events that took place in 2001 and the analysis taking place in 2002 some allowances are obviously expected to accommodate the time difference.

Worldwide, there are hundreds of writers, journalists, intellectuals, political scientists, and analysts of international events. In selecting writers and writings, our only bias was that we favored Bangladeshi writers no matter which point of view they happened to express. From the rest of the world, we selected those with the most influence and best representations. We carefully chose facts and writings we received from the electronic media. We didn't accept them just based on the fact that they were posted on the Internet. The newspapers we gave more importance to were the Ittefaq, Inquilab, Jugantar and Prothom Alo. We also collected information from Pakkhik Chinta and the Weekly Bikram. English dailies, International newspapers and magazines, investigatory analyses, were also taken into account. We are grateful to all concerned.

We did not take a side here. Thus we didn't feel the need to support a side by including the views of G. W. Bush, Mollah Omar, or Osama-bin-Laden. We simply want to capture the views of the writers. We have in no way tried to play the role of a 'court of justice.' In fact, we have tried to help the people's court and the world conscience, and have tried to ensure that the next generation and any avid historian

www.pathagar.com

have a handy source of facts and information from which to find whatever they might seek. This initiative is not the first of its kind, or the last, nor is it the only one. Thus with gratitude, we would like to say that those who have helped us have helped create and preserve a bit of history.

As mentioned before, the first and foremost drawback to mankind is that people do not think collectively. He knows best only that which he knows of himself. The rest depends on assumption, facts and reliability. A person cannot see his backside but he cannot deny its existence. We rely on analysts with similar confidence. We kept reminding ourselves of this fact after taking up work on this publication.

A few pictures that are self-explanatory have been added to the introduction. This will help their use as required. The picturs have mostly been collected from the Internet. Some of them heve been collected from international news media. We thank all for their kindness and consideration.

Masud Majumder

Dhaka, Bangladesh
Tel : 8315223 (Res.)
November 2002

www.pathagar.com

CONTENTS

1.	Preface	**Editor**
2.	Foreword	**Sadeq Khan** Eminent Journalist and Researcher
3.	A peep into the worldwide US barbarism	**Collected**
4.	Terrorism in the United States	**Robert Fisk** The Independent, USA
5.	Face to face with Bin Laden	" "
6.	Al-Jazeera Television under US attack	**Nurul Islam** Media Person
7.	Unprecedented secrecy surrounding US adventurism	" "
8.	Afghan War: Yet to begin	**Obaid Jaigirdar** Writer, Columnist and Industrialist
9.	Reprisal can't be the solution	**Vincent Canistraro** Former Chief of antiterrorism sqnad of CIA
10.	Afghans had always defeated the invaders	**Collected**
11.	US attacked : International terrorism must be stopped	**Emazuddin Ahmed** Former VC. DU Political Scientist
12.	Afghanistan: On which direction ?	" "
13.	Injustice: The reason behind terrorism	**Edward Said** Palestinian Professor Columbia University Writer. USA
14.	War in Afghanistan : Some predictions	**Salimullah Khan** Writer and Intellectual

www.pathagar.com

15.	This is inhuman blood-bath	**Mahbub Hasan** Journalist
16.	Why Bush left Washington unprotected ?	**Zaglul Ahmed Chowdhury** Journalist and Analyst of International Affairs
17.	Afghan War: How long will it last ?	" " "
18.	Afghan situation & its geo-political impact in the region.	" " "
19.	Afghanistan's new journey: Will it bring stability?	**Zaglul Ahmed Chowdhury** Journalist and Analyst of International Affairs
20.	What's the price of security ?	**Kuldip Nayar** Eminent Indian Writer & Columnist
21.	Afghans never defeated	**Internet** From CNN. A.P
22.	Laden's next target is India !	**Shumon Islam** Media Person
23.	The algebra of 'Infinite Justice'	**Arundhati Ray** Booker Prize Winning Author, India
24.	What does Bangladesh get by supporting USA?	**Mijanur Rahman Khan** Journalist and Columnist
25.	Bush's surprise: Laden's network in 60 countries	**Monowarul Islam** Writer. New York
26.	Evidence of Laden's involvement	**Collin Powel** US Secretary of State
27.	Interview with Osama bin Laden: 'If Jihad is a crime I am a criminal.'	**Salma Rahman** Translated from Time Magazine
28.	US aggression and the Third World	**Aurangazeb Gauhar** Journalist & Writer. Pakistan
29.	Strategic Alliance : Undergoing Change	**Brig. (Ret) Abdul Hafiz** Columnist
30.	Power struggle to control Hindukush	" " " "
31.	Fall of Taleban : What will happen to the mission of Osama ?	" " " "
32.	Let us find out the reasons behind international terrorism	**Abu Ahmed** Professor of Economics DU & Columnist

www.pathagar.com

33.	Attack on US is attack against terrorists	**Mohammad Habibur Rahman** Writer & Researcher
34.	War against civilization and humanity: The blood flows	**Abul Kashem Chowdhury** Professor of Bangla JU & Columnist
35.	We understand US woes : Does US realize ours?	**Ramzi Barud** Managing Editor, Web Portal Middle East News Online, USA
36.	Who is to rule Afghanistan?	**Rabeya Shahnaz Parveen** Writer & Media Person
37.	It's not easy to subjugate Afghanistan	" " "
38.	Treacherous terrain: Rugged mountains and blistering deserts	**Manjarul Islam Shaheen** Media Person
39.	Terrorism in US: The evidence against Osama isn't irrefutable.	**Taslima Lipi** Media Person
40.	Nobel Prize recipient Rigobarta Menchu's letter to the US President George W. Bush	
41.	Aggression in Afghanistan: A US attempt to dominate world	**Nirmal Shen** Journalist & Columnist
42.	The real truth behind the Afghan invasion by US led international forces in the name of uprooting international terrorism.	**Badruddin Umar** Eminent Politician & Columnist
43.	US attack on Afghanistan must be resisted	" "
44.	Terrorism: Internal & external	" "
45.	The world war against terrorism by the US led imperialistic international coalition & Salman Rushdie	" "
46.	Stop this war : Save humanity	**Abul Kashem Fazlul Haque** Writer & Professor of DU
47.	US policy on Afghanistan will lead the world nowhere?	**Abed Khan** Journalist & Columnist

www.pathagar.com

48.	What's the US true objective ?	" "
49.	Al-Jazeera: The television channel broadcasting the deadly Afghan war scenes	**Enamul Haque** Translated from the Guardian
50.	Losing the initial war, Bush now involves the rest of the world in Afghanistan	**Foez Ahmed** Writer & Intellectual
51.	US commandos, Taleban guerillas and the Northern Alliance: Comparison of their relative strength	**Shah Mohammad Mutasim Billah** Translated from Time Magazine
52.	Personal statement of Omar and Laden	**Faruque Chowdhury** Former Foreign Secretary & Columnist
53.	The future of Afghanistan	**Abul Kalam Manjur Morshed** Professor of DU & Writer
54.	What is the future of Pakistan ?	" " " "
55.	What is the objective of Bush and his partners: An end to terrorism or an end to Islam ?	**A. K. M. Abdus Sattar** Columnist
56.	Afghanistan : My witness	**Syed Ali Ahsan** National Professor & Eminent Educationist. Former VC
57.	The US government and its people are responsible for the WTC incident not bin Laden	**Dr. S. M. Lutfor Rahman** Writer. & Professor of DU
58.	Bush's declaration of crusade and what follows	**Miskin Shah** Researcher & Writer
59.	An account of the chronology of events of the present Afghan crisis	**Tanveer Hussain Khan** Media Person
60.	US terrorist attack on Afghanistan: The role of Pakistan	**Dr. Abdur Rahman Siddiqui** Writer & University Professor
61.	Secret killings in US	**Michael Parenti** US Writer & Political Scientist

www.pathagar.com

62.	The price of freedom of speech from Micheal Parenti's 'Ugly Truth'	" "
63.	US media manipulation	" "
64.	I have witnessed Allah in Afghanistan	**Naheed** A martyred teenage Afghan girl
65.	What happened after the Taleban Mujahideen took over Kabul	**Ruhul Amin Khan** Journalist & Columnist
66.	An exclusive interview with the Afghan Ambassador	**Abdul Salam Jaef** Ambassador of Taleban Govt.
67.	If Laden is killed he will be immortalized as a Shaheed	**Noam Chomsky** US Jewish Writer. Political Analyst
68.	Self defence is a birth right : There is no scope of killing innocent people by bombing	**Barrister Rafiqul Islam Miah** Former Minister & Politician
69.	Mal propaganda against Islam	**Shahdat Hussain Khan** Journalist & Columnist
70.	State terrorism against Afghanistan: The responsibilities of the Muslim world	**Abdullah Bin Sayeed Jalalabadi** Writer
71.	World terrorism and the Muslim world	**Nurul Islam** Writer.
72.	The mystery behind repeated attacks on Afghanistan	**Syeed Rahmatullah Hashemi** 24-year-old Roving Ambassador of the Taleban Govt.
73.	Afghan war fall outs	**K. G. Mustafa** Journalist & Columnist
74.	A few examples of the hypocrisy and ignorance of the US ruling class !	**M. M. Akash** University Teacher
75.	Not the end to history : Is it a clash of civilization ?	**Amanullah Kabir** Journalist & Columnist
76.	Will the Afghan war disrupt the balance of South Asia?	" "
77.	Terrorism and the honorable terrorists (!)	**Syeed Abul Maksud** Writer & Columnist

www.pathagar.com

78.	Muslim misfortune : Bush's delight	**Bashir Al Helal** Author, Writer & Columnist
79.	The Muslim world from a Western perspective	**Shah Abdul Halim** Chairman Islamic Information Bureau Bangladesh
80.	US agenda : Peace without justice	" " "
81.	Terrorism in US : An attempt to block the forward march of the Muslim world	**Mohammad Shamim Akhter** Journalist
82.	'My four wives, 16 children and myself are ready to sacrifice our lives to save Mollah Omar and bin Laden'	**Mobaidur Rahman** Journalist & Columnist
83.	Osama bin Laden: A symbol – of humility and charity. A character of unflinching determination, selflessness who left a pompous life	**Hafez Fazlul Haque Shah** Writer
84.	Afghanistan: A land of heroes and warriors that has never accepted defeat in thousand years	**Mohammad Nur** Journalist
85.	The fall of Kabul and the Political future of Afghanistan	**Dr. Tarek Shamsur Rahman** Columnist & Professor of Govt. & Politics, JU
86.	Which direction is Afghanistan heading?	" " " "
87.	The Muslim mind in the current crisis and the role of Bangladesh	**Kazi Anis Ahmed** Writer
88.	Afghan crisis: The aim is to install a gas pipeline	**Ali Riaz** Teacher, Recloni University, South Carolina, USA
89.	Afghanistan: Bloody past and uncertain future	" "
90.	The US atrocity in Afghanistan: The Western media intentionally are keeping people in the dark	**Ahmed Jamil** Columnist & Analyst of International Affairs

www.pathagar.com

91.	The fall of the Taleban and the crisis of the Muslim Ummah	' '
92.	The Western might and the Islamic movement	**Abu Hasan** Columnist & Writer
93.	A quest for peace or a trade in arms?	**Abdul Gaffar Chowdhury** Eminent Journalist & Columnist resident in UK
94.	Afghanistan: Bush's Crusade. War to the collaborators; Jihad to the Mujahideen	**Masud Majumder** Journalist & Columnist
95.	The decline and fall of US is only a matter of time	" "
96.	The worst terrorist in 100 years: British & US imperialism	**Collected from various sources**
97.	British & US terrorism: Using Afghans to kill Afghans	**Abdul Matin Khan** Politician & Columnist
98.	These countries usually have this kind of fate	" "
99.	Bush and the invisible power	**Benjin Khan** Reporter: Fortnightly Chinta
100.	Osama bin Laden has shaken the whole world	**Toufiq Aziz** Journalist
101.	Afghanistan: Hope for peace from the battlefield	**Dr. Abdul Latif Masum** Professor of JU & Columnist
102.	British & US aggression in Afghanistan	**Professor Ibn Golam Samad** Professor of RU & Columnist
103.	Murder of imprisoned Talebans : An unprecedented crime	**Munshi Abdul Mannan** Journalist & Columnist
104.	The interim government in Afghanistan and the oil giants	**Haidar Akbar Khan Rono** Politician & Columnist
105.	The Western media is misguiding the Muslim world.	**Abu Tamima** Media Person. Afghanistan
106.	How stable is peace in Afghanistan?	**Rahman Mukhles** Writer

www.pathagar.com

107.	US supremacy over the decades	**Wahidul Islam Mamun** Writer
108.	What is the United Nation's contribution towards world peace ?	**Mohammad Tazibur Rahman** Journalist
109.	A new crusade, a new Jihad	**Ahmed Abdul Kader** Journalist & Researcher
110.	A new crusade in a new era	**Shahadat Hussain Khan** Journalist & Columnist
111.	Extracts from the press on the US debacle in Afghanistan	**Collected from various sources**
112.	Unseen Afghanistan: Its misery	**Mohsen Makhmalbaf** Eminent Iranian Film Maker
113.	Crusade and Jihad	**Farhad Mazhar** Eminent Researcher & Columnist
114.	US has taken bloody revenge for attack on Twin Towers	**Parvez Hoodbhoy** Educator. Pakistan
115.	In a long drawn strategic war, the Afghans will be victorious	**Professor Syeeda Zakia Khatun** Writer
116.	US is the catalyst of worldwide terrorism	**Commodore (Retd.) M. Ataur Rahman** Writer
117.	Afghanistan: A land locked country	**Times of India**
118.	What happened in Afghanistan	**Professor Ghulam Azam** Eminent Political Leader Journalist & Columnist
119.	Unknown story of US defeat in the Afghan battlefield	**Internet**
120.	Unknown story of US debacle in Afghan battefield vis a vis US and Western perception of right and wrong	**Internet**
121.	Respect and sympathy for the defeated in Afghanistan and a few words on US and Israel's right of 'self-defense'	**Professor Abdul Gafur** Eminent Writer, Journalist & Columnist

www.pathagar.com

122.	The UN Security Council has put an angel's garb on Satan	" " "
123.	Kala-E-Jongi prison: A testament to cold blooded murder	**Mohammad Momin Uddin** Journalist
124.	The Twin Towers tragedy from a US Muslim perspective	**Michael Wolf** A reverted, Muslim from California US
125.	The British government's collected testimonies and unknown facts about bin Laden and Al-Quaeda	**Nabab Uddin** Journalist
126.	Terrorism: Opposed to democracy and human rights	**Professor Dr. M. Abdul Rob** Professor of DU & Columnist
127.	Afghanistan versus the British-US coalition and Bangladesh	**Sheikh Rokonuzzaman Rokon** Media Person & Journalist
128.	Come - lets create a resistance to this war	**Nazib Tarek** Journalist
129.	Prophet's indication towards Afghanistan	**Syeed Mobnu** Writer from UK
130.	Who controls Kabul today after ousting the Taleban ?	**Mausumi Saha** Translated from 'Human Rights Watch'
131.	Reconstraction of Afghanistan: Dollars & Bombs.	**William Bloom** Author of 'Killing Hope': US Military & CIA interventions since WW II ; and 'Rogue State': A Guide to the world's only superpower
132.	Afghan women and US crocodile's tears	**Mini Bruce Pratt** US Women's Rights and Antiterrorism Activist
133.	Historical letter sent to Molla Omar by three prominent 'Arab leaders: You are the' glory of the Muslim nation, one of the greatest heroes of present history. The Muslim world is with you	**Ubaidur Rahman Khan Nadvi** Translated from 'Joboré Mumin Karachi'

www.pathagar.com

134.	100 days of Afghan war: Little gain at a greater price Former	**Sirajur Rahman** BBC Newsman. Eminent Journalist & Columnist
135.	Bush's war cry: Gore Vidal's explanation on the real cause behind it.	" "
136.	Afghanistan: Related thoughts	**Mohammad Siddiqui** Columnist
137.	Afghanistan: Liberated or occupied?	**Abu Ahmed** Professor of Economics DU & Columnist
138.	The murder of imprisoned Talebans in Afghanistan: A scandalous incident of history	**Internet**
139.	Roots of the Laden family	**Gautom Mandal** Translator
140.	A thrilling story of a US Taleban	**Newsweek**
141.	Europe and US relationship with Muslims in the current context	**Zahid Jamir** MS Computer Informations Systems Brooklyn College, City University., New York
142.	What US achieved in Afghanistan ?	**Eric Margolish** Journalist from Europe
143.	American Aggression in Afghanistan	**A. Z. M Shamsul Alam** Writer, Researcher & Ex-Secretary
144.	Afghanistan	**Sarker Shahabuddin Ahmed** Writer
144.	"Operation Infinite Justice" & American People	**Dr. Maimul Ahsan Khan** Visiting Prof. of Law, University of California. Afghanistan Specialist, South ASIA Coordination group Amnesty International. USA

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

নিকট অতীত এবং চলমান বিশ্বের সবচাইতে আলোচিত বিষয় 'সন্ত্রাস'। নিঃসন্দেহে ১১ সেপ্টেম্বর এর ঘটনা একটি অনভিপ্রেত, বেদনাদায়ক বিষয় যা প্রতিটি মানব হৃদয়ে যন্ত্রণার রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে। কিন্তু এই জাতীয় ঘটনার মধ্যে এটাই কি সর্বপ্রথম (?) এবং সর্ববৃহৎ ? এক শ্রেণীর প্রচার যন্ত্র ১১ সেপ্টেম্বর এর ঘটনাকে এমনভাবে উপস্থাপন করছে মনে হয় যেন ১১ সেপ্টেম্বরই সন্ত্রাসের 'জন্মতারিখ'। ১১ সেপ্টেম্বর পরবর্তী ঘটনা বিশ্লেষণে জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান সভ্যতার মুখপাত্র পশ্চিমা বিশ্ব, তাদের দুনিয়া জোড়া নেটওয়ার্ক-এর প্রবল প্রচারযন্ত্র সন্ত্রাস নামক বিষয়টিকে বিশ্ববাসীর সামনে অপর একটি সভ্যতার ধারক বাহকদের দিকে আঙ্গুল তুলে ধরছে। এতে মনে হচ্ছে সন্ত্রাসের জন্ম, সমর্থন, লালন ও প্রয়োগ কেবল ঐ বিশেষ সভ্যতার ধারক-বাহক অর্থাৎ মুসলমানরাই করে চলছে। জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান সভ্যতা কেবল নিরীহ ভুক্তভূগী। বিশাল ক্ষমতাধর, অস্ত্রবল ও অর্থবলের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও এহেন অবস্থায় তারা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। বিষয়টিকে ইনিয়ে বিনিয়ে দুনিয়াজোড়া সর্বাধিক উন্নতমানের ব্যাপক উপস্থিতি সম্পন্ন তাদেরই প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে নির্দোষ (?) চেহারা তুলে ধরছে। এই প্রচারণা কতখানি অন্ধ বিদ্বেষ দোষে দুষ্ট কিংবা নিরেট সত্যের উপস্থাপনা তার বস্তুনিষ্ট আলোচনা রয়েছে দেশী বিদেশী লেখকের এই সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলোতে।

সন্ত্রাস, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, তথ্য সন্ত্রাস- এগুলো কি ? এগুলোর পার্থক্য কারী বিষয়গুলো কি কি? এদের উৎপত্তি কোথায় ? কোন বিশেষ বঞ্চনা-হতাশা-নির্যাতন-এর অন্তর্নিহিত কারণ রূপে চিহ্নিত ? কারা ঐ কারণগুলো ঘটিয়ে চলছে। বিশ্ব বিবেকের বিরুদ্ধে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নানারূপ সাহায্য সহযোগিতা করে কারা ঐ সব মূল কারণকে শুধু বাঁচিয়েই রাখছেনা বরং সময় সময় বিশেষ অযুহাত দেখিয়ে সন্ত্রাস নির্মূলের নামে নিজেরাই বৃহত্তর সন্ত্রাসের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। ১১ সেপ্টেম্বর কি শুধু ৫ হাজার নিরীহ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুর ভয়াবহ স্মৃতি বহন করে এনেছিল ? না এর সাথে জড়িয়ে অজস্র প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিলো। লাদেন প্রসঙ্গ এনে হত দরিদ্র দেশ আফগানিস্তান অক্রান্ত হলো। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নৃশংসতার অগুনে পুড়ে আফগানিস্তান খাক হয়ে গেলো। এর কারণ কি শুধু তেল, অস্ত্র ব্যবসা আর বাণিজ্য!

মার্কিন শাসকদের আচরণে নতুন নতুন প্রশ্ন বিশ্ব জন সমক্ষে উঠে আসলো। ২৭টি

www.pathagar.com

সংগঠনকে চিহ্নিত করে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করা হলো। সবগুলো মুসলিম সংগঠন। পৃথিবীতে আর কি কেউ সন্ত্রাসী নয় ,আর কোন সন্ত্রাসবাদী নেই!

তাহলে সন্ত্রাসবাদ মানে কি? সন্ত্রাস দমনের একক দায় ও অধিকার কি শুধু মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের! এটা কি শুধু মার্কিনী সমস্যা? 'মোষ্ট ওয়ান্টেড অপরাধী' খোজার নামে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রকে ধবংস করে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি আত্নত্যাগ করলো! কি স্বার্থ ত্যাগ করলো! কি পেলো। কি হারালো। মানবতার মৌলিক এইসব প্রশ্নগুলো ঘুরে ফিরে আসছেই।

মার্কিন হুংকার কিসের বিরুদ্ধে। কার বিরুদ্ধে।একদিকে মার্কিনীরা বলছে তারা সন্ত্রাসের নাড়ি নক্ষত্র সবই জানে, অপরদিকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে সব কিছু. তাহলে সবই কি লোক দেখানো! এই সন্দেহ আরো ঘনীভুত হয়ে মার্কিনী ষড়যন্ত্রের ধোয়াটে পরিকল্পনাকেই বড় জিজ্ঞাসার মুখোমুখি করছে। বিভিন্ন মতের লেখক, বিভিন্ন দেশের লেখক এইসব প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। কোন্‌টি অভিযোগ কোন্‌টি প্রতিশোধ সেটিও মূল্যায়িত হয়েছে বিভিন্ন প্রবন্ধে। প্রকাশক হিসাবে আমরা চিন্তা ও প্রশ্নের দুয়ার খুলে ধরার তাগিদ বোধ করেছি। বক্ষমান প্রবন্ধগুলো তারও একটা জওয়াব তুলে ধরেছে।

স্নায়ু-যুদ্ধোত্তর এক মেরু বিশ্বের স্বঘোষিত মোড়ল এবং তাদের পা-চাটা সেবাদাসগণ এই এক মেরু বিশ্বব্যাবস্থাকে চিরস্থায়ী করার ক্ষেত্রের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য হুমকি চিহ্নিত করণ এবং নির্মূল করণের জন্যই কি মরিয়া হয়ে উঠেছে ? তার জন্যই কি HUNTINGTONG'S CLASHES OF CIVILISATION -এর উদ্ভাবন ? পরবর্তীতে তারই বাস্তবতা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার মানসেই কি বিন-লাদেনদের সৃষ্টি ? এই অত্যন্ত জরুরী প্রশ্নের যথাযথ বিশ্লেষণ রয়েছে বক্ষমান প্রবন্ধগুলোতে।

NOVUS ORDO SECLORUM বা NEW WORLD ORDER এর চটকদার শ্লোগান যেমন DEMOCRECY, HUMANRIGHTS এবং FREE MARKET ECONOMY কি সত্যিই মানবতার কল্যাণে উচ্চারিত হচ্ছে। না এগুলোর আড়ালে বিশ্ব-বিবেককে বোকা বানিয়ে নিজদের হীন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অপচেষ্টা চলছে?

"সভ্যতার দ্বন্দ্ব" শব্দে স্বার্থের গন্ধ আছে কি ? "শ্রেণী-স্বার্থের দ্বন্দ্বের" শ্লোগানের ন্যায় এটাও কি নেহায়তই হীন স্বার্থ সিদ্ধির অপচেষ্টা ? এই দ্বন্দ্বের ডামাডোলের আড়ালেই কি ঘৃণ্য মারণাস্ত্র ব্যাবসা চাঙ্গা করা হচ্ছে না ? এর ভেতর দিয়েই কি ঘৃণা-বিদ্বেষ-জিঘাংসার শয়তানি বিষ ছড়ানো হচ্ছে না ? পর সম্পদ লুন্ঠন করার জন্য, অগনিত দুর্বল জাতিগোষ্ঠির রক্তের হোলিখেলার জন্য, কিংবা তাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে পায়ে দলে স্বীয় দম্ভ-অহংকার প্রকাশ করার জন্যই কি উক্ত 'সভ্যতার দ্বন্দ্ব' তত্ত্বের আবিষ্কার ? এ বিষয়টিও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে বক্ষমান আলোচনা গুলোতে।

যে কোন প্রকাশনার সাথে পূজির সম্পর্ক থাকে। অন্তত, প্রকাশক আশা করেন ব্যবসা সফল প্রকাশনাটি সামনে রাখতে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, একজন প্রকাশক যে ঝুকী বহন করেন সেটা শতভাগই পূঁজি নির্ভর। পূঁজি ভাবনার বাইরে প্রকাশনা হয় না এটাও ঠিক নয়, মহৎ উদ্দেশ্যের সাথে পূঁজিও সংশ্লিষ্ট থাকে, কোথাও ব্যবসাটা প্রাধান্য পায়, আবার কারো ভাবনায় মহৎ লক্ষ্যটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়।

www.pathagar.com

এই প্রকাশনার ব্যপারে আমরা মহৎ লক্ষ্যটাই প্রাধান্য দিয়েছি, এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এটি একটি সময়কে তুলে ধরতে তথ্যের সমাহার ঘটিয়েছ। মুলতঃ এর মাধ্যমে উপকৃত হবেন যে কোন গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট লোকজন, ইতিহাস পড়ুয়া, সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছাত্র-শিক্ষক পেশাজীবীরা।

আন্তর্জাতিক বিষয়ের ওপর ভাবেন, চটজলদি তথ্য-উপাত্ত চান, রাজনীতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার স্বরূপ জানতে রেফারেন্স চান-তারা বইটির মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন। রাজনীতি একটি বিজ্ঞান, এর সাথে সময় জড়িয়ে ইতিহাস নির্ভরতা প্রাধান্য পায়। যে কোন রাজনীতি-বিশ্লেষক যিনি বিশ্বরাজনীতির নাড়ীর স্পন্দন বুঝতে চাইবেন বইটি তাদেরকে শুধু উপকৃতই করবে না, সমৃদ্ধও করবে।

মুসলিম উম্মাহ্ এই বইয়ের মূল চরিত্র নয়। মূখ্য বিষয় পরাশক্তির আর্থ-সামরিক রাজনৈতিক চরিত্রের বিশ্লেষণ। এই ক্ষেত্রে আফগানিস্তান 'কেইস ষ্টাডী' হিসেবে সামনে এসেছে। আফগানিস্তান একটি মুসলিম জনপদ, ইসলামী ঐতিহ্য সমৃদ্ধ দেশ, ও আই সি'র সদস্য রাষ্ট্র, জাতিসংঘের সদস্য। ঘুরেফিরে মুসলিম উম্মাহ্ কখনো পক্ষ, কখনো প্রতিপক্ষ হিসেবে আলোচনায় ওঠে এসেছে, এর ভেতর দিয়ে মুসলিম উম্মাহ্ নিয়ে যারা ভাবেন, অনুসন্ধিৎসু, শত্রু-বন্ধু চিনতে আগ্রহী, নিজেদের যোগ্যতা-দুর্বলতা মাপতে চান, নিজেদেরকে আত্মপর্যালোচনার মুখোমুখি দাড়া করাতে সাহসী হন তারাও উপকৃত হবেন।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সত্যানুসন্ধিৎসু মনের জিজ্ঞাসায় নির্জলা-সত্য উপস্থাপনার তাগিদে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কতখানি স্বার্থক ও সুন্দর হয়েছে তার বিচারের ভার বিজ্ঞপাঠকের উপর রইল। এই প্রচেষ্টায় যারা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তাদের নামোল্লেখ করে খাটো করতে চাইনা। তাদের প্রতি আমরা শুধু আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও বইটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর এবং ত্রুটিমুক্ত হয়নি। এক্ষেত্রে আপনাদের সকলের দেয়া যথাযথ সংশোধনী এবং পরামর্শ ভবিষ্যৎ সংস্করণে আমাদের পাথেয় হবে আশা করি।

মুহাম্মদ আমিনুর রহমান
১১৫ শহীদ তাজ উদ্দীন সরণী (নবম তলা)
বড় মগবাজার, ঢাকা -১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪২০৮৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

মাসুদ মজুমদার
প্রসঙ্গ কথা / ৭
সাদেক খান
মুখবন্ধ / ১১
সংকলিত
বিশ্বব্যাপী মার্কিন সম্রাজ্যবাদের দস্যুবৃত্তি ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের খতিয়ান / ৪৫
রবার্ট ফিস্ক
আমেরিকায় সন্ত্রাস / ৬১
লাদেনের মুখোমুখি / ৬৪
নুরুল ইসলাম
মার্কিন তোপের মুখে আল জাজিরা টিভি স্টেশন / ৬৮
আমেরিকার অভিযানে নজিরবিহীন গোপনীয়ত / ৭১
ওবেইদ জাগীরদার
আফগান যুদ্ধ ঃ শেষ নয় শুরু মাত্র / ৭৩
ভিনসেন্ট ক্যানিস্ট্রারো
প্রতিশোধ সমাধান হতে পারে না / ৭৯
ইন্টারনেট থেকে
আফগানিস্তান সব সময় আক্রমণকারীদের পরাস্ত করেছে / ৮২
এমাজউদ্দীন আহমদ
আমেরিকা আক্রান্ত ঃ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমন করতে হবে / ৮৬
কোন পথে আফগানিস্তান ? / ৯০
এডওয়ার্ড সাঈদ
অবিচারই সন্ত্রাসের মূল কারণ / ৮৫
সলিমুল্লাহ খান
আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধের আগাম ফলাফল / ৯৯
মাহবুব হাসান
মানবতাবিরোধী এ হত্যাযজ্ঞ! / ১০৪
জগলুল আহমেদ চৌধুরী
ওয়াশিংটন স্বীয় গৃহ অরক্ষিত রাখল কেন ? / ১০৭

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে যুদ্ধ আর কত দিন চলতে পারে ? / ১১০
আফগান পরিস্থিতি এই অঞ্চলের রাজনীতি কতটা বদলে দেবে ? / ১১৪
আফগানিস্তানের নবযাত্রা-দেশটি স্থিতিশীল হবে কি ? / ১১৭
কুলদীপ নায়ার
নিরাপত্তার মূল্য কত ? / ১২০
ইন্টারনেট থেকে
আফগানরা কখনও হারেনি / ১২৩
সুমন ইসলাম
লাদেনের পরবর্তী টার্গেট ভারত! / ১২৫
অরুন্ধতী রায়
ইনফিনিট জাস্টিস'-এর বীজগণিত / ১২৬
মিজানুর রহমান খান
যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন দিয়ে কি পাচ্ছে বাংলাদেশ ? / ১৩৪
মনোয়ারুল ইসলাম
বুশের বিস্ময়, ৬০ দেশে লাদেনের নেটওয়ার্ক / ১৩৯
কলিন পাওয়েল
লাদেন জড়িত থাকার অনেক প্রমাণ আছে / ১৪১
সালমা রহমান
সাক্ষাৎকারে ওসামা বিন লাদেন 'জেহাদ অপরাধ হলে আমি অপরাধী' / ১৪৩
আওরঙ্গযেব গওহর
আমেরিকান আগ্রাসন ও তৃতীয় বিশ্ব / ১৪৮
ব্রিগেডিয়ার (অব.) আবদুল হাফিজ
বদলে যাচ্ছে কৌশলগত মৈত্রী / ১৫৫
হিন্দুকুশে অব্যাহত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব / ১৫৬
তালেবানের পতন ঃ অতঃপর ওসামা মিশনের কি হবে ? / ১৬৪
আবু আহমদ
আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের পেছনের কারণ দেখা উচিত / ১৬৯
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
আমেরিকায় হামলা সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতায় / ১৭৪
আবুল কাশেম চৌধুরী
সভ্যতা ও মানবতাবিরোধী যুদ্ধ : রক্তের রঙ লাল / ১৮০
রামজি বারুদ
আমেরিকা, তোমার দুঃখ আমরা বুঝি আমাদের দুঃখ তুমি বোঝ ? / ১৮৬
রাবেয়া শাহনাজ পারভীন
সীমানা পেরিয়ে আফগানিস্তান কে শাসন করবে / ১৯০
আফগানিস্তান জয় সহজ নয় / ১৯৩
মানজারুল ইসলাম শাহিন
দুর্গম গিরি কান্তার মরু... / ১৯৬

www.pathagar.com

তাসলিমা লিপি
যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাস ঃ ওসামার বিরুদ্ধে প্রমাণ অকাট্য নয় / ১৯৮
মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের কাছে গুয়েতেমালার নভেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রিগোব্যার্তা মেনচুর চিঠি / ২০১
নির্মল সেন
আফগানিস্তান ঃ এ হামলা বিশ্বজয়ের যুদ্ধ / ২০৩
বদরুদ্দীন উমর
মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের সামরিক হামলার স্বরূপ / ২০৯
সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন হিসাবেই প্রতিরোধ করতে হবে / ২১৪
সন্ত্রাসবাদ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী / ২২০
গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদ বিরোধী 'বিশ্বযুদ্ধ' এবং সালমান রুশদি / ২২৫
আবুল কাসেম ফজলুল হক
এই যুদ্ধ বন্ধ হোক : রক্ষা পাক মানবজাতি / ২২৯
আবেদ খান
মার্কিনীদের আফগান নীতি পৃথিবীকে কোথায় নেবে ? / ২৩৪
আমেরিকার আসল লক্ষ্যটা কী ? / ২৩৭
এনামুল হক
আল-জাজিরা আফগান যুদ্ধের দৃশ্য প্রচার করছে যে টিভি চ্যানেলটি/ ২৪১
ফয়েজ আহ্‌মদ
আফগানিস্তানে প্রাথমিক যুদ্ধে পরাজিত বুশ বিশ্বকে জড়াচ্ছেন / ২৪৫
শাহ্ মুহাম্মদ মুতাসিম বিল্লাহ
মার্কিন কমান্ডো, তালেবান গেরিলা ও নর্দার্ন অ্যালায়েন্স ঃ কার কত শক্তি / ২৫০
ফারুক চৌধুরী
ওমর ও লাদেনের একান্ত কথা / ২৫৩
আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
আফগানিস্তানের ভবিষ্যত / ২৫৮
পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কী ? / ২৬২
এ কে এম আব্দুস সাত্তার
বুশ গং কর্তৃক সন্ত্রাস দমন, না ইসলাম খতম / ২৬৬
সৈয়দ আলী আহসান
আফগানিস্তান আমার সাক্ষ্য অপরাধ প্রবণ মার্কিন সরকার এবং মার্কিন / ২৭১
ড. এস. এম লুৎফর রহমান
নাগরিকরাই দায়ী ওসামা বিন লাদেন নন / ২৭৬
মিসকীন শাহ্
বুশের ক্রুসেড ঘোষণা এবং তারপর / ২৮০
তানভীর হোসেন খান
আফগানিস্তানে বর্তমান সংকটের ধারাবাহিক ঘটনাপঞ্জি / ২৮৪
ডক্টর আবদুর রহমান সিদ্দিকী
আফগানিস্তানে মার্কিনীদের সন্ত্রাসী হামলা : পাকিস্তানের ভূমিকা / ২৯০

www.pathagar.com

মাইকেল প্যারেন্টি
যুক্তরাষ্ট্রে গোপন নিধনযজ্ঞ / ৩০১
আমেরিকায় বাকস্বাধীনতার মূল্য মাইকেল প্যারেন্টি আগলি ট্রুথ থেকে / ৩১২
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া কারসাজি / ৩১৮
নাহিদ
'আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি' গ্রন্থ থেকে / ৩২৩
রূহুল আমিন খান
তালিবান মুজাহিদদের কাবুল বিজয়ের পরে / ৩২৯
অনুদিত
একান্ত সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রদূত আবদুল সালাম জায়েফ / ৩৩৭
নোয়াম চমস্কি
মেরে ফেলা হলে লাদেন পাবে শহীদের মর্যাদা / ৩৪১
ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া
জন্মগত অধিকারে নিরীহ মানুষকে বোমা মেরে হত্যার স্থান নেই / ৩৪৬
শাহাদত হোসেন খান
ইসলামের বিরুদ্ধে মতলবী প্রপাগান্ডা / ৩৫১
আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
আফগানিস্তানে শ্বেতহস্তীদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস / ৩৫৫
নূরুল ইসলাম
ওয়ার্ল্ড টেরোরিজম ও আমরা / ৩৬০
সাইয়্যেদ রাহমাতুল্লাহ হাশেমী
আফগানিস্তানে উপর্যুপরি বৈদেশিক আগ্রাসনের রহস্য / ৩৭১
কে. জি. মুস্তাফা
আফগান যুদ্ধের 'ফল-আউট' / ৩৭৯
এম এম আকাশ
মার্কিন শাসকশ্রেণীর ভণ্ডামি ও মূর্খতার অনন্য দৃষ্টান্ত! / ৩৮৩
আমানুল্লাহ কবীর
ইতিহাসের ইতি নয় তবে কি সভ্যতার সংঘাত / ৩৮৮
আফগানিস্তান যুদ্ধ কি দক্ষিণ এশিয়ার ভারসাম্য নষ্ট করবে / ৩৯২
সৈয়দ আবুল মকসুদ
সন্ত্রাসবাদ ও সেই সকল সম্মানিত সন্ত্রাসবাদীগণ (!) / ৩৯৬
বশীর আল্‌হেলাল
মুসলমানের আমামা কেড়ে নিয়ে বুশ দামামা বাজাচ্ছেন / ৪০১
শাহ্‌ আবদুল হালিম
পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে মুসলিম বিশ্ব / ৪০৫
আফগানিস্তানে মার্কিনী এজেণ্ডা / ৪১৫
মুহাম্মদ শামীম আখতার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সন্ত্রাস / ৪২৭

www.pathagar.com

মোবায়েদুর রহমান
'বিন লাদেন ও মোল্লা ওমরকে রক্ষার জন্য আমি,
আমার চার বিবি এবং ১৬ সন্তান জীবন দিতে প্রস্তুত' / ৪৩০
হাফেজ ফজলুল হক শাহ্
অবিস্মরণীয় ত্যাগের, সুস্থ জীবনবোধের, মানবিকতার
এবং মহত্ত্বের প্রতিকৃতি, কে এই ওসামা বিন লাদেন ? / ৪৩৬
মোহাম্মদ নুর
হাজার বছরের বীরের জাতি আফগান পরাজয় যাদের কখনো স্পর্শ করেনি / ৪৪৩
ড. তারেক শামসুর রেহমান
কাবুলের পতন ও আফগানিস্তানের ভবিষ্যত রাজনীতি / ৪৪৬
আফগানিস্তান কোন পথে ? / ৪৫১
কাজী আনিস আহমেদ
বর্তমান সঙ্কটে মুসলিম মানস ও বাংলাদেশের অবস্থান / ৪৫৫
আলী রীয়াজ
আফগানিস্তান ঃ গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনই আসল লক্ষ্য / ৪৬১
আফগানিস্তান ঃ রক্তাক্ত অতীত, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ / ৪৬৭
আহমদ জামিল
আফগানিস্তানে মার্কিন বর্বরতা পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলো আড়াল করে যাচ্ছে / ৪৭২
আফগানিস্তান তালিবান নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়ার পর মহাসংকটের মুখে মুসলিম উম্মাহ / ৪৭৯
আবু হাসান
পাশ্চাত্য শক্তি ও ইসলামী আন্দোলন / ৪৮৭
আবদুল গাফফার চৌধুরী
শান্তির অন্বেষা, না মারণাস্ত্র ব্যবসা ? / ৪৯৪
মাসুদ মজুমদার
আফগানিস্তান ঃ বুশের ক্রুসেড ঃ তাঁবেদারদের যুদ্ধ এবং মুজাহিদদের জিহাদ / ৫০০
আমেরিকা ঃ পঁচন ও পতন অবশ্যম্ভাবী লাদেন উপসর্গ, ফেরাউনী উক্তি তার প্রমাণ / ৫০৫
আবদুল মতিন খান
ইঙ্গ-মার্কিন সন্ত্রাস ঃ আফগানকে দিয়ে আফগান হত্যা / ৫১৬
এসব দেশের কপালে এই-ই থাকে / ৫২০
বেনজীন খান
অদৃশ্য শক্তি বনাম বুশ অতঃপর 'আমেরিকার' তোপের মুখে 'মার্কিন' / ৫২৫
তৌফিক আজিজ
সারাবিশ্ব কাঁপিয়েছেন ওসামা বিন লাদেন / ৫৪৩
ডঃ আবদুল লতিফ মাসুম
আফগানিস্তান ঃ রক্তাক্ত প্রান্তরে শান্তির মায়া মরীচিকা / ৫৪৫
এবনে গোলাম সামাদ
আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসন / ৫৪৮
মুন্শী আবদুল মাননান
বন্দী তালিবান হত্যা ঃ এক নজিরবিহীন বর্বরতা / ৫৫২
হায়দার আকবর খান রনো
আফগানিস্তানে অন্তর্বর্তী সরকার এবং তেল সাম্রাজ্য / ৫৫৬

www.pathagar.com

আবু তামিমা মোঃ দেলাওয়ার হোসাইন
পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম মুসলিম বিশ্বকে বিভ্রান্ত করছে / ৫৬০
রহমান মুখলেস
আফগানিস্তানে স্থায়ী শান্তি কতদূর ? / ৫৬২
ওয়াহিদুল ইসলাম মামুন
যুগে যুগে আমেরিকার আধিপত্যবাদ / ৫৬৬
মোহাম্মদ তজিবর রহমান
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের অবদান কি ? / ৫৭০
আহমদ আবদুল কাদের
নয়া ক্রুসেড, নয়া জিহাদ / ৫৭৩
সাহাদত হোসেন খান
নয়া জামানায় নয়া ক্রুসেড / ৫৭৯
সংকলিত
আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার ঘটনাক্রম / ৫৮৬
মোহসেন মাখমালবাফ
না-শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ / ৫৯৭
ফরহাদ মজহার
ক্রুসেড ও জেহাদ / ৬০৮
পারভেজ হুদবি
আমেরিকা টুইন টাওয়ারে হামলার রক্তাক্ত বদলা নিয়েছে / ৬২৩
অধ্যাপিকা সৈয়দা জাকিয়া খাতুন
দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ কৌশলে আফগানরা বিজয়ী হবে / ৬২৫
কমোডোর এম আতাউর রহমান
বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের হোতা আমেরিকা / ৬৩০
টাইমস অব ইন্ডিয়া
বধ্যভূমি আফগানিস্তান / ৬৩৬
অধ্যাপক গোলাম আযম
আফগানিস্তানে যা ঘটল / ৬৪০
ইন্টারনেট থেকে
আফগান রণাঙ্গনে মার্কিনীদের বিপর্যয়ের অজানা কাহিনী / ৬৪৮
ইন্টারনেট থেকে
যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের নীতিবোধ / ৬৫৫
আবদুল গফুর
আফগানিস্তানে পরাজিতদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা / ৬৫৮
নিরাপত্তা পরিষদ ইবলিসের গায়ে ফেরেশতার আলখেল্লা চড়িয়েছে / ৬৬৫
মোঃ মমিন উদ্দিন
কালা-ই-জঙ্গি বন্দীশিবির ঃ নৃশংস গণহত্যার কলংক চিহ্ন / ৬৭১
মাইকেল উলফ

www.pathagar.com

একজন আমেরিকান মুসলমানের দৃষ্টিতে টুইন টাওয়ার দুর্ঘটনা / ৬৭৬
নবাব উদ্দিন
ব্রিটিশ সরকারের সংগৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণ / ৬৮০
প্রফেসর (ডঃ) মোহাম্মদ আব্দুর রব
সন্ত্রাস ঃ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরিপন্থী / ৬৯১
শেখ রোকনুজ্জামান রোকন
আফগানিস্তান বনাম ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাজ জোট এবং বাংলাদেশ / ৬৯৭
নাজিব তারেক
আসুন, আমরা একটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ি / ৭১৮
সৈয়দ মবনু
আফগানের প্রতি রাসূলের ইঙ্গিত ? / ৭২৩
হিউম্যান রাইট ওয়াচ
তালিবানদের সরিয়ে কাবুলের গদিতে আজ কারা ? / ৭২৯
উইলিয়াম ব্লুম
আফগান পুনর্গঠন ঃ বোমা এবং ডলার / ৭৩৩
মিনি ক্রুস প্রাট
আফগান নারী ও মার্কিন কুম্ভীরাশ্রু / ৭৩৬
উবায়দুর রহমান খান নাদভী
মোল্লা উমরের প্রতি প্রখ্যাত তিন আরব মাশায়েখের ঐতিহাসিক পত্র / ৭৪০
সিরাজুর রহমান
আফগান যুদ্ধের একশ' দিন নাকের বদলে নরুন লাভ / ৭৪৯
বুশের রণ-হুঙ্কার ঃ আসল কারণ সম্বন্ধে গোর ভিডালের ব্যাখ্যা / ৭৫৪
মুহাম্মদ সিদ্দিক
আফগানিস্তান ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা / ৭৫৯
আবু আহমেদ
আফগানিস্তান মুক্ত হয়েছে না দখল হয়েছে ?/ ৭৬২
আফগানিস্তানে কারাবন্দী তালিবান হত্যা ঃ ইতিহাসের এক কলঙ্কিত ঘটনা / ৭৬৬
গৌতম মণ্ডল
লাদেন পরিবারের গোড়ার কথা / ৭৬৮
একজন আমেরিকান তালেবানের রোমাঞ্চকর কাহিনী / ৭৭১
জাহিদ জমির
ইউরোপ আমেরিকার বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমান / ৭৭৫
এরিক মারগোলিস
আফগানিস্তানে আমেরিকা কি পেল ? / ৭৮১
আ. জ. ম. শামসুল আলম
আফগানিস্তানে মার্কিন সন্ত্রাস / ৭৮৪
সরকার শাহবুদ্দীন আহমদ
প্রসঙ্গ ঃ আফগানিস্তান / ৭৯৯
ড. মাইমুল আহসান খান
মার্কিন জনতার চোখে "অপারেশন ইনফিনিট জাস্টিস" / ৮০২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দস্যুবৃত্তি ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের খতিয়ান

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ পৃথিবীকে পাল্টে দিয়েছে। এখন নিজ ভূখণ্ডে আমেরিকা আক্রান্ত। যুগপৎ বেপরোয়াও। সাধারণ ভাবে আমেরিকাবাসী নির্লিপ্ত-দেশ-দুনিয়া নিয়ে বেশী ভাবে না। যখন ভাবে গভীরে যেতে চায়। আমেরিকার গোয়েন্দা নেটওয়ার্কও জানেনা তাদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার মানুষ এতটা ফুঁসে ওঠেছে কেন ?

আজ যখনই আমেরিকার সাথে কোন দেশের বা ব্যক্তির বিরোধ ঘটে তখন দুনিয়া ব্যাপী মানুষ কেন তাৎক্ষনিক মার্কিন বিরোধী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। হোক সে ইরাক অথবা সাদ্দাম-এর সাথে আমেরিকার কিংবা আফগানিস্তান তথা বিন লাদেনের সাথে বিরোধ। মানুষ কেন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অথবা শহীদ হতে সোচ্চার হচ্ছে? কেন আমেরিকার বিরুদ্ধে মানুষের এত ঘৃণা ? এ প্রশ্ন আজ খোদ আমেরিকানদেরও। তারা প্রশ্ন করছে, ওরা কেন আমাদের এত ঘৃণা করে ? মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ তাঁর জবাবে বলেন, ওরা আমাদের স্বাধীনতাকে ঘৃণা করে। আমাদের ধর্মের স্বাধীনতা, কথা বলার স্বাধীনতা, ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা, ভিন্নমত পোষণের স্বাধীনতাকে ঘৃণা করে। 'ওরা আমেরিকান ওয়ে অফ লাইফকে ঘৃণা করে' কিন্তু বুশের এ ভাষণ কি সত্য ? না, অরুন্ধতী'র ঠিক জায়গাতেই খটকা লেগেছে-তাহলে তো আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হওয়ার কথা ছিল 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি', কারণ 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি'ই তাদের ওয়ে অফ লাইফ-এর প্রতীক। কিন্তু আক্রমণ হয়েছে আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভুত্বের প্রতীক ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আর পেন্টাগনের ওপর। কেন ? এই কেন'র উত্তর রয়েছে আমেরিকার ধারাবাহিক সন্ত্রাসী ইতিহাসের মধ্যে। এখানে তার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত নিদর্শণ, আরো কয়েকটির একটু ব্যাখ্যাসমেত এবং সাথে কিছু গোপন তথ্যের ফাঁস হওয়া অজানা কাহিনী তুলে ধরা হলো।

এই সব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আমরা সাপ্তাহিক বিক্রম, পাক্ষিক চিন্তা, ঢাকা। গৌতম মন্ডল, মৌসুমী সাহা, কলিকাতা। লারুছ-হাউ টু ডিফিট গ্লোবাল স্ট্র্যাটাজিক ইরিগুলার ওয়ার ফেয়ার, কিলিং হোপ, হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ, আগ্লী ট্রুথ, উইলিয়াম ব্লুম, মিনি ক্রুজ প্রাট, ইরিক মার্গুলিস, এ্যাডওয়ার্ড সাঈদ, অরুন্ধতী রায়, মাইকেল প্যারেন্টি, নোয়াম চমস্কি, বিবিসি খ্যাত সিরাজুর রহমান, মাইকেল উলফ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব ও জাতীয়-আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্র-পত্রিকার সহায়তা নিয়েছি। সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

১. ১৯৪৫ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে ৬ ও ৯ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে দুটো পারমাণবিক বোমা ফেলে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হত্যা করে।

২. ১৯৪৯ ঃ সি আই এ'র মদদে সামরিক অভ্যুত্থানে সিরিয়ার নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করা হয়।

৩. ১৯৫০-৫২ ঃ কোরিয়া যুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়াকে অস্ত্রসহ সমর্থন জোগায় আমেরিকা এবং সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

৪. ১৯৫৩ ঃ ব্রিটিশ তেল কোম্পানি জাতীয়করণকারী ইরানের মোসাদ্দেক সরকার উৎখাত করে আমেরিকার অনুগত রেজা শাহ্ পাহ্লভি সরকারকে ক্ষমতায় বসায়।

৫. ১৯৫৮ ঃ স্থিতিশীলতা আনার অজুহাতে লেবাননে মার্কিন সৈন্য অবতরণ করে।

৬. ১৯৬০ ঃ কথিত বিপজ্জনক ব্যক্তি লুকিয়ে আছে, তাকে ধরার অজুহাতে ডোমেনিক রিপাবলিকে মার্কিন সৈন্য সরাসরি হানা দেয়।

৭. ১৯৬০ ঃ এই দশকের গোড়ার দিকে ইরাকী নেতা আবদুল কাশিমকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

৮. ১৯৬২ ঃ কিউবায় রাশিয়া মিসাইল বেস স্থাপনের উদ্যোগ নিলে যুদ্ধসাজে আটলান্টিক মহাসাগরে নেমে যায় আমেরিকা। এবং হত্যার চেষ্টা করে ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে।

৯. ১৯৬৩ ঃ কমিউনিস্টদের হত্যার জন্য ইরাকের বাথ পার্টিকে তালিকা প্রদান এবং নিমর্মভাবে তা বাস্তবায়ন করে।

১০. ১৯৬৩ ঃ কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

১১. ১৯৬৪ ঃ ভিয়েতনাম যুদ্ধে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে আমেরিকা। এই যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যরা লক্ষ লক্ষ টন নাপাম বোমা নিক্ষেপ করে লাখ লাখ ভিয়েতনামীকে হত্যা করে।

১২. ১৯৬৩ ঃ ডোমিনিকান রিপাবলিকে জুয়ান বস্‌ক্ সরকার হটানোর জন্য মিলিটারি ক্যু করে সফল হয়।

১৩. ১৯৬৩ ঃ দক্ষিণ ভিয়েতনামে নগো দিন দিয়েমকে হত্যার সহায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে সফল হয়।

১৪. ১৯৬৩ ঃ ইকুয়েডর-এ কার্লোস জুলিও এরোসেমেনা সরকারকে উচ্ছেদ করে।

১৫. ১৯৬৪ ঃ চিলিতে সালভাদের আইয়েনদেকে নির্বাচনে পরাজিত করার জন্য যুদ্ধুফার্দো ফ্রেইফে ২ কোটি ডলার সাহায্য দান করে সফল হয়।

১৬. ১৯৬৪ ঃ উরুগুয়ে, পেরু, ব্রাজিল-এ বিরোধীদের দমন করার জন্য পুলিশ এবং ইনটেলিজেন্স কর্মীদের হত্যা করে।

১৭. ১৯৬৪ ঃ কঙ্গোতে প্যাট্রিস লুমুম্বার অনুগত বিদ্রোহীদের পরাজিত করার জন্য সামরিক এবং আর্থিক সাহায্য দান করে সফল হয়।

১৮. ১৯৬৪-৬৭ ঃ দক্ষিণ ভিয়েতনাম-এ ভিয়েতকংদের রাজনৈতিক ভিত্তিভূমি নির্মূল করার জন্য ২০,০০০ এর বেশি হত্যা (ফিনিক্স প্রোগ্রাম)-আংশিক সফল হয়।

১৯. ১৯৬৪-৭০ ঃ উত্তর ভিয়েতনাম-এ নুং উপজাতি এবং আমেরিকান বিশেষ বাহিনীর অন্তর্ঘাত এবং অ্যামবুশের প্রচেষ্টা চালায়।

২০. ১৯৬৫ ঃ কম্বোডিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বোমা হামলা চালায়।

www.pathagar.com

২১. ১৯৬৫-৭১ ঃ লাওসে অন্তর্ঘাত ও অ্যামবুশ (অপারেশন শাইনিল ব্রাস ও প্রেয়েরি কায়ার)-অমীমাংসিত রেখে দেয়।

২২. ১৯৬৫ ঃ ইন্দোনেশিয়াতে সুকর্নো সরকার উচ্ছেদের জন্য প্রচার অভিযান সংগঠিত করে। ৫,০০,০০০ লাখ এর বেশি কমিউনিস্ট হত্যার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে সফল হয়।

২৩. ১৯৬৫ ঃ থাইল্যান্ডে-পাথেট লাওণ্ডে এর বিরুদ্ধে লাওয়েসিয়াম সরকারের পক্ষে ১৭০০০ ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগ করে সফল হয়।

২৪. ১৯৬৭ ঃ বলিভিয়াতে চে-গুয়েভারাকে গ্রেফতারের ব্যাপারে সাহায্য করে সফল হয়।

২৫. ১৯৬৭ ঃ গ্রিস-এ রাজা কন্‌স্টানটিনের সিংহাসন ত্যাগের পর জর্জ পাপানড্রি সরকারকে উচ্ছেদ এবং কর্নেল জর্জ পাপাডোপুলোস-এর সামরিক সরকার স্থাপনে অর্থ সাহায্য করে সফল হয়।

২৬. ১৯৬৭ ঃ নিরাপত্তা পরিষদে ইসরাইলের প্রতি ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে দখলিকৃত ভূখণ্ড ফিরিয়ে দেয়ার প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের উপর্যুপরি ভেটো দান।

২৭. ১৯৬৯-৭০ ঃ কম্বোডিয়ায় ভিয়েতকংদের আশ্রয়স্থল ধ্বংসের জন্য বোমা বর্ষণ করে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে পশ্চাদপসারণ করে।

২৮. ১৯৭৩ ঃ মিসর ও সিরিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকা ইসরাইলকে সামরিক সাহায্য দেয়।

২৯. ১৯৭৩-৭৮ ঃ আফগানিস্তানে নূর মোহাম্মদ তারিককে প্রতিহত করার জন্য মোহাম্মদ দাউদ সরকারকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য প্রদান করে ব্যর্থ হয়।

৩০. ১৯৭৫ ঃ পর্তুগাল-এ ভাস্কো ডোস সান্টোস গন্ডলভেস সরকারকে উচ্ছেদ করে।

৩১. ১৯৭৫ ঃ অ্যাঙ্গোলা-তে অ্যাঙ্গোলার গৃহযুদ্ধে পপুলার মুভমেন্টকে পরাস্ত করতে সামরিক সাহায্য দান করে ব্যর্থ হয়।

৩২. ১৯৭৬ অস্ট্রেলিয়াতে গঘ হুইলামের শ্রমিক সরকার উৎখাতের জন্য প্রচার এবং রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে সফল হয়।

৩৩. ১৯৭৬-৭৯ ঃ জ্যামাইকাতে মাইকেল ম্যানলি সরকারকে উচ্ছেদের জন্য মিলিটারি ক্যু সংগঠনের চেষ্টা এবং তিনবার হত্যা প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

৩৪. ১৯৭৬-৭৯ ঃ ইরানে শাহ বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হলে আমেরিকা সে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। এবং জনগণের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ভূমিকা রাখতে যেয়ে এক পর্যায়ে সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়।

৩৫. ১৯৭৯ ঃ আফগান-রাশিয়ার যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে আমেরিকা। ১৯৮৯ সালে রাশিয়া পরাজিত হলে আফগান থেকে সরে আসে আমেরিকা।

৩৬. ১৯৭৯ ঃ সিকেলেস-এ ফ্রান্স এনবার্ট রেনের সরকারকে উৎখাতের প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

www.pathagar.com

৩৭. ১৯৭৯-৮০ ঃ জ্যামাইকাতে মাইকেল ম্যানলির সরকারকে উচ্ছেদের জন্য অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি, নির্বাচনে হারাবার জন্য প্রচার অভিযান এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সফল হয়।

৩৮. ১৯৭৯ ঃ আফগানিস্তানে হাফিজুল্লা উচ্ছেদে বিদ্রোহীদের সাহায্য প্রদান।

৩৯. ১৯৮০ ঃ আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীতে উত্যক্ত করার জন্য বিদ্রোহীদের সামরিক সাহায্য প্রদান করে।

৪০. ১৯৮০ ঃ গ্রানাডাতে মরিস বিশপের সরকার উচ্ছেদের জন্য সামরিক ক্যুর চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়।

৪১. ১৯৮০ ঃ ডমিনিকাতে অলিভার সেরাফিনকে পরাস্ত করতে ইউজেনা চার্লসকে আর্থিক সাহায্য দান করে সফল হয়।

৪২. ১৯৮০ ঃ গায়ানাতে ফরবেস বার্নহ্যাম সরকারের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য বিরোধী নেতা ওয়াল্টার রডনির হত্যায় উৎসাহদান করে সফল হয়।

৪৩. ১৯৮০-৮৮ ঃ ইরান-ইরাক যুদ্ধে আমেরিকা প্রকাশ্যে ইরাকের পক্ষাবলম্বন করে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহ করে এবং পারস্য সাগরে অবস্থানকারী মার্কিন জাহাজ থেকে ইরানী যাত্রীবাহী বিমান লক্ষ্য করে গুলি করলে ২৯০ জন যাত্রী নিহত হয়।

৪৪. ১৯৮১-৮৮ ঃ লিবিয়ায় মুয়াম্মার গাদ্দাফি সরকারকে উচ্ছেদের জন্য লিবিয়ার উপকূলে সামরিক মহড়া চালিয়ে গাদ্দাফীকে উস্কানি প্রদান এবং দু'টি লিবীয় বিমান গুলি করে ভূপাতিত করে। ১৯৮৬ সালে লিবীয় টহল বোটে হামলা করে ৭২ জনকে হত্যা করে। বার্লিনে বোমা হামলার অভিযোগে ১৯৮৮ সালে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফির বাসভবনে হামলা চালিয়ে পালক কন্যাসহ অসংখ্য লোককে হত্যা করে।

৪৫. ১৯৮২ ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সবুজ সংকেতে লেবাননে ইসরাইলী অভিযানে ১০ হাজার বেসামরিক লোক নিহত হয়।

৪৬. ১৯৮২ ঃ গুয়েতেমালাতে অ্যাঞ্জেল অ্যানিবাল গুয়েভারার সরকারকে উচ্ছেদের জন্য মিলিটারি ক্যু সংগঠিত করে সফল হয়।

৪৭. ১৯৮২ ঃ বলিভিয়ায় সেলসো টোররেলিওর সরকারকে উচ্ছেদের জন্য মিলিটারি ক্যু সংগঠিত করে সফল হয়।

৪৮. ১৯৮২-৮৩ ঃ সুরিনামে কর্নেল ডেসি বুটের্স-এর সরকারকে উৎখাতের জন্য তিন বার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়।

৪৯. ১৯৮৯ ঃ পানামায় মার্কিন সেনাবাহিনী হানা দেয় এবং মাদক চোরাচালানে জড়িত অভিযোগে প্রেসিডেন্ট নরিয়েগাকে অপহরণ করে।

৫০. ১৯৯০-৯১ ঃ ইরাকের কুয়েত অভিযানের পর সংকটের কূটনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাখ্যান করে। কুয়েতকে দখলমুক্ত করে ইরাককে

www.pathagar.com

শায়েস্তা করার জন্য জাতিসংঘের তথাকথিত অনুমোদন নিয়ে উপসাগরীয় যুদ্ধে বহুজাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব দেয় আমেরিকা। যুদ্ধে পরাজিত হয় ইরাক। এই যুদ্ধে আত্মসমর্পণকারী অসংখ্য ইরাকি সৈন্যকে ট্যাংকের নীচে নির্মমভাবে পিষ্ট করা হয় আমেরিকার নির্দেশে।

৫১. ১৯৯৮ ঃ তাঞ্জানিয়া ও কোরিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলার পর কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই একতরফা দোষারোপ করে সুদানের ওষুধ কারখানা ধ্বংস করা হয়। দাবি করা হয়েছিল, ওই কারখানায় রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করা হয়। কিন্তু পরে যুক্তরাষ্ট্রই সেখানে রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির কোন প্রমাণ না পাওয়ার কথা স্বীকার করে।

বিশ্ব সভ্যতায় আমেরিকার দস্যুবৃত্তির খুব সামান্য খতিয়ান-ই এটি। সুতরাং দুনিয়ার মানুষ আজ তাকে কেন ঘৃণা করে নিশ্চয় বুঝতে কারো বাকি থাকার কথা নয়।

এবার আমরা আরো কয়েকটির একটু ব্যাখ্যাসমেত বর্ণনায় যেতে পারি।

৫২. শ্যামুয়েল হান্টিংটন একজন ইহুদী পণ্ডিত। 'সভ্যতার সংঘাত' নামে একটি বই লিখেছেন। পুস্তকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় পাশ্চাত্য সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য ইসলামকে হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করা। এটাও প্রমাণ করা যে, ইসলাম ও মুসলিমের সাথে বস্তুবাদী কথিত গণতান্ত্রিক পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত অনিবার্য। তার এই তত্ত্ব এখন আমেরিকা ও ইউরোপের বৈদেশিক নীতির মূল চালিকাশক্তি। বৈদেশিক নীতি ছাড়াও আন্তর্জাতিক যে কোন ইস্যু এবং আভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণে আমেরিকা ও ইউরোপ ইসলাম ও মুসলমানকে প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যদিও তত্ত্বটি নতুন নয়। বর্তমান ক্রুসেডও প্রথম নয়।

স্বদেশে নীতি ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও বিশ্বজুড়ে আমেরিকা আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে। তাছাড়া আমেরিকা-ইউরোপসহ তাদের অনুগত দেশগুলো পরিচালিত হয় খৃস্টান ও ইহুদী স্বার্থ সংরক্ষণ করার মন-মানসিকতা নিয়ে। বিশ্বের তাবৎ সম্পদের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে ইহুদী-খৃস্টান বলয়াধীন শক্তিগুলো। প্রায় সত্তর ভাগ মিডিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় ইহুদীদের দ্বারা। আমেরিকা ও ইউরোপের সরকারগুলো কার্যত ইহুদী-খৃস্টান স্বার্থ সংরক্ষণে শতভাগ নিষ্ঠাবান।

কথা, বক্তব্য ও বিবৃতিতে মানবতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বাণী প্রচার করলেও ক্ষেত্র বিশেষে তারা পরস্পরের সাথে বাহ্যত ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে কৌশলগত কারণে। বাস্তবে-আচরণে আমেরিকা-ইউরোপ, খৃস্টান-ইহুদী জগৎ এক ও অভিন্ন মতের অনুসারী। মোশরেকরাও তাদের সহযোগী। সাময়িক কোন রাষ্ট্রীয় মতদ্বৈততা থাকলেও ইহুদী ও খৃস্টান জগৎ মোনাফেক ও মোশরেকদের সাথে নিয়ে নীতিগত প্রশ্নে, আদর্শিক ব্যাপারে ইসলাম ও মুসলিমের প্রতিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে।

এই সত্য আমাদেরকে এই উপসংহারে পৌঁছায় যে, পৃথিবী এখন আদর্শিকভাবে দু'ভাগে বিভক্ত। এই বিভাজন কেউ মানুক আর না-ই মানুক, বাস্তবে বিশ্ব আদর্শিকভাবে বিভক্ত হয়ে আছে। সামনের দিনগুলোতে প্রতিটি ক্ষেত্রে এই আদর্শিক বিভাজন আরো সুস্পষ্ট এবং প্রখরতর হয়ে ওঠবে। এ নমুনা আমরা এখনো প্রত্যক্ষ করছি।

www.pathagar.com

এ কথা সত্য যে, পৃথিবীর বৃহত্তর অংশ মানুষ আহলে কিতাব। তারপরও বিকৃতি এবং বিভ্রান্তি তাদেরকে নৈতিকতা-বিবর্জিত এমন এক বস্তুবাদী স্তরে নামিয়ে নিয়ে গেছে, যাদের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য আয়াত নাযিল করা হয়েছে। তারা যে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হবে-এ বাণী পবিত্র কুরআনের। তাদের ব্যাপারে সতর্ক হবার তাগিদও কুরআনের আয়াত দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত।

তারা শুধু সাধারণ স্বার্থ বিবেচনা করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি অন্যায় ও জুলম করে না, তারা জুলুম করে আদর্শিক ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কারণে। এখনও জুলুম করছে আদর্শিক ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মাথায় নিয়ে। তারা বর্ণবাদী ধারণা নিয়ে তো বটেই, এমনকি মানবতার বিরুদ্ধেও বিদ্বেষ ছড়িয়েছে। সাদা চামড়ার দাবিদার সেজে কালো মানুষকে শুধু হেয়প্রতিপন্নই করেনি, হিন্দুদের বর্ণবাদে পিষ্ট নমশুদ্রদের মতই কালো মানুষদের দাস হিসেবে ব্যবহার করেছে। কালোদের পিঠে আরোহণ করে সাদা চামড়াধারীরা কৌলীন জাহির করেছে। সৃষ্টির সেরা মানুষের প্রতি এমন ঘৃণ্য অমানবিক আচরণ মানবিক হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে। ম্যালকম এক্স-এর অপরাধ তিনি কালো মানুষের নেতা। ওমর আবদুর রহমানের অপরাধ তিনি ইসলামী ব্যক্তিত্ব। ড. আবু মুসা মারজুকাফের অপরাধ তো ফিলিস্তিনীদের নেতা হওয়ার অপরাধ ছাড়া কিছুই ছিল না।

তারা যখন বিপর্যয় সৃষ্টি করার গরজ বোধ করে, তখনই মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়, দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করে। আর মানবতাকে পদদলিত করে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট পন্থায়। তারা তখনই হিংস্র জানোয়ার হয়ে আবির্ভূত হয়েছে, যখন তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে আঘাত এসেছে। মানবতা ও মানুষের সামগ্রিক মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। তাদের স্বার্থ নিয়ে তারা কতটা হীন, ঘৃণ্য, জঘন্য ও পাপিষ্ঠ হতে পারে শয়তানের প্রতিভূ হতে পারে, তার একটি খণ্ডচিত্র নিম্নে প্রদান করা হল।

৫৩. আফগানিস্তানে তালেবান নির্মূলের ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক অভিযান এখনো চলছে। কলম্বাসের আমেরিকা ও ভাস্কোদাগামার ভারতে আসার নৌপথ চিহ্নিত করার পর ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গরা বিশ্বব্যাপী খৃষ্টীয় প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে যে আগ্রাসন, হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল, আফগানিস্তানে বর্তমান হামলা তারই আধুনিক সংস্করণ।

৫৪. কলম্বাস আমেরিকা যাবার পথ চিহ্নিত করার পর ব্যবসা ও ধর্ম প্রচারের নামে দলে দলে ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গরা আমেরিকা যাতায়াত শুরু করে দেয়। তবে মূল কাজ ছিল দস্যুতা। আমেরিকার মূল বা আদিবাসী যারা রেড ইন্ডিয়ান বলে চিহ্নিত, তাদের সহায়-সম্পত্তি শক্তিবলে দখল করা। আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গদের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা ছিল দাস ও মাদক ব্যবসা। আর এ উভয় প্রকার ব্যবসাই ছিল রেড ইন্ডিয়ানদের স্বার্থবিরোধী। দাস ব্যবসার মাধ্যমে সেখানে তারা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করত এবং এই শক্তি দিয়ে রেড ইন্ডিয়ানদের ওপর হামলা চালাত। তাদের জমিজমা দখল করে নির্দোষ দাসদের মাধ্যমে চাষাবাদ করাত। আর মাদক ব্যবসার মাধ্যমে গোটা আদিবাসীদের মধ্যে মাদকাসক্তি ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য খৃস্টান ধর্মাবলম্বী শ্বেতাঙ্গরা রেড ইন্ডিয়ানদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করার জন্য সংক্রামক ও মরণব্যাধি ছড়ায়, ব্যাপক মাদকাসক্তির বিস্তার ঘটায়, নির্বিচারে গণহত্যা চালায় ও পালের পর পাল বুনো মোষ হত্যা করে পরিকল্পিত খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি

www.pathagar.com

করে। আজকের বুশের পূর্বপুরুষরা যারা ধর্মীয় উন্মাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ইউরোপ থেকে পালিয়ে আমেরিকা গিয়েছিল, তারা আনন্দ-উল্লাসের জন্য রেড ইন্ডিয়ান ও তাদের খাদ্যের প্রধান উৎস বুনো মোষ হত্যা করত। এর ফলে আদিবাসীরা এক পর্যায়ে রোগ-ব্যাধি, খাদ্যাভাব ও গণহত্যার শিকার হয়ে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং বহিরাগতদের নির্দেশে অনুর্বর ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে অমানবিক পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হয়। বর্তমান 'সভ্যতার' ছোঁয়া থেকে তারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। দিন দিন তাদের সংখ্যা কেবল হ্রাসই পাচ্ছে।

ইউরোপীয়রা যখন প্রথম আমেরিকায় পদার্পণ করে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় এক কোটি দশ লাখ আদিবাসী বাস করত। ইউরোপীয়দের গণহত্যার কারণে বর্তমানে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় এদের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে দশ লাখেরও নীচে। কানাডায় মাত্র পাঁচ লাখের মত রেড ইন্ডিয়ান বেঁচে আছে—যা সেখানকার মোট জনসংখ্যার এক শতাংশ মাত্র। তবে তারা যে পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে, তাতে এপিচি, মাইকান, সু, বিকোট, বিউথাক, নারাংগানসেট, ওয়াম, পানোগ প্রভৃতি উপজাতীয়দের মত নিশ্চিহ্ন হতে বেশি সময় লাগবে না। শ্বেতাঙ্গদের নির্মূল অভিযানের শিকার হয়ে এসব উপজাতিসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

৫৫. আমেরিকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর শ্বেতাঙ্গরা মার্কিন নাগরিক পরিচয়ে বাণিজ্যের নামে রণপ্রস্তুতি নিয়ে এশিয়ার উদ্দেশ্যে তরী ভাসায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক বছর পরই মার্কিন বাণিজ্য ও রণতরী মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় গিয়ে হাজির হয়। প্রথমে তারা শুরু করে আফিম ব্যবসা, যা প্রাচ্যের জাতিসমূহের কাছে গর্হিত অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত। প্রথমে এই ব্যবসায় বৃটিশরা মনোনিবেশ করে। পরে মার্কিনীরা এতে ভাগ বসায়। এই ব্যবসায় শতকরা ৫শ' ভাগেরও বেশি লাভ হত। এই লাভজনক ব্যবসাকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে মার্কিনীরা উঠেপড়ে লাগে।

মার্কিন বণিকরা ইজমির ও অটোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে আফিম ক্রয় করে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে আটলান্টিক সাগর হয়ে, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ চীন সাগর দিয়ে চীনের ক্যান্টনে নিয়ে যেত। এ জন্য তাদেরকে মরক্কো, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া ও আধুনিক লিবিয়ার জলসীমা ব্যবহার করতে হত। বাণিজ্য তরীগুলো এসব দেশের বন্দর থেকে খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করত। সেজন্য এসব দেশকে মার্কিন বণিকদের বড় অংকের কর দিতে হত, যা মার্কিনীদের মনঃপূত ছিল না। তাই বার্ষিক মাত্র ১০ হাজার ডলারের বিনিময়ে মার্কিন সরকার ১৭৮৭ সালে মার্কিন বণিকদের নিরাপত্তা বিধান ও আনুষঙ্গিক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে মরক্কোকে বাধ্য করে। একই ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর করতে ১৭৯৬ সালে লিবিয়াকে এবং ১৭৯৭ সালে তিউনিসিয়াকে বাধ্য করে।

৫৬. এতেও মার্কিনীরা সন্তুষ্ট হল না। তারা উল্লেখিত দেশগুলোর ওপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮০১-১৮০৫ সাল পর্যন্ত প্রথমে লিবিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মার্কিন রণতরীর বহর লিবিয়ার রাজধানীর ত্রিপলী অবরোধ করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেফারসনের অনুমোদনক্রমে এবং যুদ্ধমন্ত্রী টিমোথি পিকারিং-এর নির্দেশে তিউনিসিয়া ও লিবিয়ায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল যথাক্রমে উইলিয়াম এটন ও জমস এল ক্যাথকার্ট লিবিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর ষড়যন্ত্র শুরু করে। লক্ষ্যে পৌছার জন্য

www.pathagar.com

তারা লিবিয়ার শাসকের ভাই মিসরে নির্বাসিত হামেদ কারমানলির সাথে চুক্তি করে ক্ষমতা দখলের জন্য মার্কিনীরা তাকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য করবে এই শর্তে যে, তিনি মার্কিনীদের বাণিজ্য শুল্ক হ্রাস করবেন এবং ইউরোপীয়দের বাণিজ্যশুল্ক বৃদ্ধি করবেন। পাশাপাশি তিউনিসিয়ায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল উইলিয়াম এটনকে তার সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক করবে। অতপর এটন ও কারমানলির সমর্থকরা মার্কিন মেরিন সেনা ও নৌ-বাহিনীর গোলন্দাজ বাহিনীর সমর্থনে লিবিয়ার দেরনা শহর দখল করে নেয়। এ অবস্থায় ত্রিপলীয় শাসনকর্তা ইউসুফ কারমানলি মার্কিনীদের সাথে এক অসম চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হন। এটন লিবিয়ার সেনাবাহিনীর প্রধানের পদটি দখল করে। এই কৃতিত্বের জন্য ম্যাসাচুসেটস স্টেটস কর্তৃপক্ষ তাকে দশ হাজার একর ভূ-সম্পত্তিও উপহার দেয়। একই কায়দায় অনুরূপ একটি চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য করা হয় মরক্কোকেও।

৫৭ লিবিয়া ও মরক্কোতে মার্কিন পরিকল্পনা সফল হবার পর তারা নজর দেয় তিউনিসিয়ার প্রতি। তিউনিসিয়ায় হামলা চালানোর অজুহাত দাঁড় করানোর জন্য সেখানকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত শাসনকর্তার সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করতে থাকে। ফলে শাসনকর্তা তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হন। আর সেই অজুহাতে ১৮০৫ সালের ১ আগস্ট জন রজার্ট-এর নেতৃত্বাধীন মার্কিন নৌ-বহন কোন প্রকার সতর্কবাণী ছাড়াই তিউনিসিয়ায় প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। পাশাপাশি রজার্ট তিউনিসিয়ার শাসকের কাছে একটা চুক্তির খসড়া পাঠিয়ে বলেন, এতে স্বাক্ষর না করলে তার রাজধানীকে গোলার আঘাতে গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। বাধ্য হয়ে সরকার প্রধান সে অসম চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

৫৮. ১৮১৫ সালে কমোডোর স্টিফেন ডেকাটুর ও কমোডর উইলিয়াম বেইনস ব্রিজের নেতৃত্বে জলদস্যু দমনের নামে দু'স্কোয়াড্রন মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আলজেরিয়ার উপকূলে এসে হাজির হয়। আলজেরিয়ার জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য জাহাজে বৃটিশ পতাকা উড়িয়ে স্কোয়াড্রন দু'টি পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করে আলজিরীয় নৌ-বহরকে ধ্বংস করে দেয়। এরপর আলজিয়ার্স শহরের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। পাশাপাশি আলজিয়ার্সের গবর্নর ড. ওমরের কাছে বশ্যতামূলক এক চুক্তিনামা পাঠায়, যাতে মার্কিন বণিকদের বিশেষ সুযোগ ও ভূমিগত অধিকার প্রদানের কথা বলা হয়। চাপের মুখে মার্কিনীরা গবর্নরকে সে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে।

৫৯. একই সময় মার্কিনীরা আবারো নতুন করে তিউনিসিয়া ও ত্রিপোলি ও মৌরিতানিয়ায় আগ্রাসী হামলা চালিয়ে বাড়তি দাবী-দাওয়া আদায় করে নেয়।

৬০. ভারত মহাসাগরে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মার্কিনীরা বর্তমান ওমান ও থাইল্যান্ডকে এক অধীনতামূলক চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করে।

৬১. ১৮৮২ সালে আলেকজান্দ্রিয়ার ওপর ব্যাপক গোলাবর্ষণের পর মিসরকে দখল করে নিতে বৃটিশকে ব্যাপক সহযোগিতা করেছিল মার্কিন স্কোয়াড্রনের চারটি যুদ্ধজাহাজ। গোলার আঘাতে আলেকজান্দ্রিয়াকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার পর শত শত মিসরীয়দের লাশ মাড়িয়ে বৃটিশ বাহিনীর সাথে সেখানে অবতরণ করে মার্কিন মেরিন সেনা।

www.pathagar.com

৬২. ১৮২০ এর দশকে মার্কিনীরা সুমাত্রার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম উপকূলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মানসে নানা প্রকার রোগ ছড়িয়ে দেয়, যে কারণে সেখানে মৃত্যুহার বেড়ে যায়। এতে সুমাত্রাবাসীদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয়। মার্কিন নাবিকরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে নানা ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও গর্হিত আচরণের মাধ্যমে এই অসন্তোষকে আরো বাড়িয়ে দিলে স্থানীয় জনগণ ১৮৩১ সালে মার্কিন বণিক ও মৈত্রী নামক একটি জাহাজে হামলা চালায়। এর প্রতিশোধ গ্রহণার্থে ১৮৩২ সালে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ পোটোম্যাক কুয়ালাবাটুতে ভিড়ে এবং এর নাবিকরা বন্দরে অবতরণ করে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। এতে দেড়শ' মুসলিম নিহত এবং ২০০ জন আহত হয়। মার্কিনীদের উদ্দেশ্য যাতে কোন প্রকারে স্থানীয় বাসিন্দারা টের না পায়, সে জন্য পোটোম্যাকে ওলন্দাজ পতাকা উড়ান হয়েছিল।

৬৩. ১৮৪২ সালে ছয়টি যুদ্ধজাহাজবিশিষ্ট এক মার্কিন নৌ-বহরের কমান্ডার চার্লস উইলিকস সুলু দ্বীপপুঞ্জের শাসক সুলতান মুহাম্মদকে একটি অধীনতামূলক মার্কিন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে।

১৮৫০ সালের ২৩ জুন মার্কিন স্বার্থসংশ্লিষ্ট একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে ব্রুনাইর সুলতান ওমর আলীকে বাধ্য করে মার্কিনীরা। অতঃপর ১৮৬৫ সালে ব্রুনাইর উত্তরাংশের বিরাট এলাকা মার্কিনীদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিতেও সুলতানকে বাধ্য করা হয়। এপর সুলতান বাধ্য হন আমেরিকান ট্রেডিং কোম্পানী অব বোর্নিও'র প্রধান কর্মকর্তা টোরিকে এমবোয়ানা ও মারুদুর রাজা হিসেবে নিয়োগ করতে। সুলতান রাজাকে স্বাধীন সার্বভৌম শাসকদের মত আইন প্রণয়ন, মৃত্যুদণ্ডদান, মুদ্রা তৈরি ও প্রচলন, প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনসহ নানাবিধ ক্ষমতা প্রদানেও বাধ্য হন।

৬৪. ১৮৯৯ সালে আজকের ফিলিপাইনের তৎকালীন সুলতান জামাল উল কিরামের সাথে মার্কিনীরা এক সমঝোতা চুক্তিতে উপনীত হয়। কিন্তু স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার পর ১৯১৩ সালে মার্কিনীরা সকল মুসলিম এলাকা দখল করে নেয় এবং তাদেরকে সংখ্যালঘু জাতিতে পরিণত করা হয়। যে কারণে ফিলিপাইন এখন একটি খৃস্টান রাষ্ট্র।

৬৫. ১৮৭০ সালের মধ্যে কৌশলে ৫০ জনেরও বেশি মার্কিন সেনা অফিসার মিসরীয় সশস্ত্র বাহিনীতে চাকরি নেয়, যার মধ্যে জেনারেল স্টোন কায়রোতে মিসরীয় সশস্ত্র বাহিনীর চীফ অব স্টাফ এবং কর্নেল চেইলি লঙ সুদানে মোতায়েনকৃত মিসরীয় সশস্ত্র বাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফের পদ দখল করে। এরপর ইরিত্রিয়াকে কেন্দ্র করে মার্কিনীরা মিসর-ইথিওপিয়া যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয় এবং যুদ্ধে মিসরীয়দের পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধে মিসর আর্থিক এবং সামরিক দিক থেকে ব্যাপক দুর্বল হয়ে পড়ে। আর সেই সুযোগে ১৮৮২ সালে বৃটিশ মিসরকে দখল করে নেয়। এই ক্ষেত্রে মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলোও বৃটিশকে সহায়তা করে। কর্নের চেইলি লঙ এতে নেতৃত্ব দেন। পাশাপাশি তারা ইথিওপিয়া থেকে ইরিত্রিয়াকে আলাদা করে ফেলে এবং একটি খৃস্টান রাষ্ট্রের জন্ম দেয়।

৬৬. রুশ গবেষক গ্রিগোরী বনদারেভস্কি তার 'মুসলিম জনগণের শত্রুর স্বরূপ' বইতে লিখেছেন, এক হাতে বাইবেল আর অন্য হাতে ডলারের থলি নিয়ে মার্কিন উপনিবেশবাদীরা তাদের পশ্চিমা প্রতিযোগীদের মধ্যে এবং মুসলিম শাসকদের মধ্যে

www.pathagar.com

বিরোধ-বিবাদ জাগিয়ে তোলে, তারা অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করে এবং অস্ত্রের হুমকি প্রদর্শন করে। এভাবে তারা অটোমান সাম্রাজ্য, পারস্য উপসাগর, জাঞ্জিবার দ্বীপ ও সুলু দ্বীপমালায় ঘাঁটি গেড়ে বসার চেষ্টা করে, এটা ছিল মার্কিনীদের প্রথম পর্যায়ের আগ্রাসনমূলক তৎপরতা, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত চলে।

২.৭ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের মধ্যদিয়ে মার্কিন আগ্রাসনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রুশ, ফরাসী, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে একটি জোট গঠিত হয়, যা মিত্রশক্তি নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি সময় মিত্রশক্তি যখন ইউরোপের পরাজিত জাতিগুলোর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ নিয়ে ব্যস্ত, তখন মার্কিনীরা এদের অগোচরে জাপানে পারমাণবিক বোমা হামলা চালায়। এই হামলা করা হয় শরীকদের না জানিয়েই। ৬ ও ৯ আগস্টের এই বোমা হামলায় জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর দু'টি ধ্বংস হয়ে যায় এবং মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে লাখ লাখ লোক প্রাণ হারায় ও আহত হয়ে পঙ্গুত্ববরণ করে অগণিত মানুষ। বোমা হামলার ক'দিন পর ১৪ আগস্ট জাপান বিনা শর্তে সে অঞ্চলের মার্কিন সমর অধিনায়ক ডগলাস ম্যাক আর্থারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ফলে ম্যাক আর্থার জাপানের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে যান। অন্য মিত্রদের সেখানে নাক গলানোর কোন সুযোগ ছিল না। ফলে সেখানে মার্কিন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। একটানা প্রায় ৬ বছর জাপানকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে রেখে সকল প্রকার শোষণ শেষে ১৯৫১ সালে শান্তিচুক্তি নামে জাপানীদের মার্কিন অধীনতামূলক এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী জাপানের বোনিন ও রিউকু দ্বীপ দু'টিতে মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাপানে মার্কিন সেনা ঘাঁটি স্থাপিত হয়। চুক্তির শর্তানুসারে জাপান এখনো শক্তিশালী নিরাপত্তা বাহিনী গঠনের অধিকার থেকে বঞ্চিত।

৬৭. ইন্দোচীন ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান একে দখল করে নেয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর একদিকে ইন্দোচীন স্বাধীনতার দাবী তোলে, অন্যদিকে ফ্রান্স সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ অবস্থায় ইন্দোচীনকে উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও লাওস এই চারটি রাষ্ট্রে ভাগ করা হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামে ফ্রান্সের পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এমতাবস্থায় দক্ষিণ ভিয়েতনামবাসীরা স্বাধীনতার জন্য এবং উত্তর ভিয়েতনামবাসীরা উভয় ভিয়েতনামকে একত্র করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের পুতুল সরকার মার্কিন মদদে সে আন্দোলন দমনের প্রয়াস চালিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর্যায়ে মার্কিনীরা সেখানে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে। বিশ্বব্যাপী এর প্রতিবাদ জানান হয়। এমনকি খোদ মার্কিনীরা পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করে। কিন্তু মার্কিন প্রশাসন সকল প্রকার প্রতিবাদ উপেক্ষা করে সেখানে মার্কিন সৈন্য প্রেরণ করতে থাকে। সর্বমোট পাঁচ লাখ মার্কিন সৈন্য সেখানে জড়ো করা হয়। তারা ভিয়েতনামে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে এবং পাইকারীভাবে আবাল-বৃদ্ধা-বণিতাসহ এক কোটিরও বেশি মানুষ হত্যা করে। মার্কিনীরা নির্বিচারে বোমা মেরে বাঁধ, হাসপাতাল, শিশুদের স্কুল, ধর্মীয় উপাসনালয় ধ্বংস করে। বেসামরিক এলাকায় নাপাম বোমা ফেলে নিরপরাধ নারী-পুরুষকে হত্যা করে। ১৯৬৫ সাল থেকে মোট ৭০ লাখ টনেরও বেশি বোমা ভিয়েতনামে ফেলা হয়,

www.pathagar.com

যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বোমার তিনগুণেরও বেশি। মার্কিন হিসেব মতে, এক লাখ ভিয়েতনামী কেবল এই বোমার আগুনে পুড়েই মারা যায়। ধ্বংস হয় দু'শ' হাসপাতাল ও সাতশ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কথিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঠেকানোর সেই মার্কিনীদের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে মার্কিন হিসেব অনুযায়ী ২৩ লাখ লোক প্রাণ হারায়। অবশ্য আমেরিকাও কম মূল্য দেয়নি। তাদের পাঁচ হাজার বিমান ও প্রায় দু'হাজার হেলিকপ্টার এই যুদ্ধে ধ্বংস হয়। হাজার হাজার মার্কিন সৈন্য প্রাণ হারায়। এ অবস্থায় বিশ্বব্যাপী ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ তীব্র হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপের কারণে হাজার হাজার মার্কিন সৈন্যের লাশ ভিয়েতনামে রেখে আমেরিকা সে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

৬৮. কম্বোডিয়ার অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে মার্কিন সৈন্য সেখানে প্রবেশ করে এবং মার্কিন বিরোধীদের উপর পাইকারী হত্যাযজ্ঞ চালায়। তারা লাখ লাখ কম্বোডীয় জনগণকে হত্যা করে। শেষ পর্যন্ত তারা বিশ্বনিন্দা মাথায় নিয়ে পরাজয়ের গ্লানি মুখে মেখে কম্বোডিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

৬৯. কোরিয়াকে বিভক্ত করা এবং উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যে তিক্ততা, তারও নাটের গুরু এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাদেরই কলকাঠি নাড়ানোতে কোরিয়ার লাখ লাখ নিরপরাধ মানুষ অকাতরে প্রাণ হারায়। তাদের নিষেধাজ্ঞার কারণে উত্তর কোরিয়ার মানুষকে এখনো সীমাহীন কষ্টের জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

৭০. ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লব ঠেকানোর নামে মার্কিনীরা সেখানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সুহার্তোকে ক্ষমতায় বসায়। সুহার্তো নিষ্ঠুরতার সাথে মার্কিন বিরোধী হিসেবে পরিচিত লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করে। কিন্তু এই মার্কিন পদসেবককে একটি খৃস্টান রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ব তিমুরকে স্বাধীনতা না দেয়ার ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান নিলে তাকে দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত করে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে চলৎশক্তিহীন আবদুল ওয়াহিদকে ক্ষমতায় বসায়। মার্কিন পদলেহী আবদুল ওয়াহিদ বিনা বাক্যব্যয়ে পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা দিয়ে দেন। কিন্তু তারপরও তার শেষরক্ষা হয়নি। কলার খোসার মত তাকেও ছুঁড়ে ফেলা হয়।

৭১. শ্রীলংকায়ও কথিত কমিউনিস্ট বিপ্লব ঠেকাতে মার্কিনীরা সেখানে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়। এই সামরিক সরকার কমিউনিস্ট দমনের নামে মূলত নিরপরাধ মার্কিন বিরোধী জনগণকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে। এ সময় লাখ লাখ লোক প্রাণ হারায়। এখনও সেখানে তামিল বিদ্রোহ লাগিয়ে রাখা হয়েছে।

৭২. ১৯৫৮ সালে একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে আমেরিকা আইয়ুব খানকে পাকিস্তানের ক্ষমতায় বসায়। কিন্তু আইয়ুব খান স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করলে কৌশলে তাকে সরিয়ে দেয়ার জন্য পাক-ভারত যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া হয়। আবার পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর শোষণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে আমেরিকা পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করার নামে প্রতারকের ভূমিকা পালন করে এবং হানাদার বাহিনীর গণহত্যাকে সমর্থন জানায়।

৭৩. সুদান যাতে একটি মুসলিম দেশ হিসেবে টিকে থাকতে না পারে, সেজন্য স্বাধীনতার শুরুতেই সেখানকার খৃস্টানদের বিদ্রোহ করার জন্য উস্কিয়ে দেয়া হয়। নন্দিত

www.pathagar.com

সরকার সুদানে ইসলামী আইন চালু করলে মার্কিনীরা বিদ্রোহীদেরকে উস্কে দেয়। কিন্তু তারা মার্কিনীদের আশা পূরণ করতে না পারায় মিথ্যা অজুহাতে সুদানকে একঘরে করে রাখা হচ্ছে। সেখানে এখনো গৃহযুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধে প্রায় ১০ লাখ লোক প্রাণ হারায় এবং ৬০ লাখ উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে।

৭৪. ইরাক মুসলিম বিশ্বের একটি ক্ষমতাধর রাষ্ট্র। তার আর্থিক ও সামরিক শক্তি মার্কিন-ইসরাইলের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। মার্কিন মদদে ইসরাইল একদিন কোন প্রকার ঘোষণা ছাড়াই ইরাকের পারমাণবিক চুল্লির উপর হামলা চালায় এবং তা ধ্বংস করে দেয়। এরপরও ইরাকের সামরিক শক্তিতে শংকিত মার্কিনীরা ইরাককে ইরানের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে দেয়। দীর্ঘ আট বছর এই যুদ্ধ চলার পরও দু'টি মুসলিম শক্তি সম্পর্কে শংকামুক্ত হতে না পেরে ইরাককে কুয়েতের প্রতি লেলিয়ে দিয়ে তার সামরিক শক্তি ও স্থাপনা ধ্বংস করার অজুহাত দাঁড় করায়। কুয়েত মুক্ত করার নামে মার্কিনীরা ইরাকের সকল সামরিক শক্তি ও স্থাপনা ধ্বংস করে। দু'লাখ ইরাকী সৈন্যকে ট্যাংকের নিচে পিষে মারে। ইরাকের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরাকের কোটি কোটি শিশু খাদ্য ও ওষুধের অভাবে মারা যায়। তাছাড়া এ পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজারবার বিমান হামলা চালিয়ে ইরাকের হাজার হাজার বেসামরিক লোককে হত্যা করা হয়।

৭৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইঙ্গ-মার্কিন প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আরব বিশ্বের হৃদপিণ্ডের উপর বিষফোঁড়াসদৃশ ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অতপর এই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা, স্থিতি ও বিকাশের জন্য মার্কিনীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আরব নিধন ও আরব ভূখণ্ড দখল প্রক্রিয়া শুরু হয়। মার্কিন ভেটোর কারণে বিশ্ব সম্প্রদায়ও কিছু করতে পারছে না। প্রকৃত অর্থে প্রতিটি আরব শিশুর রক্তে মার্কিন প্রেসিডেন্টদের হাত রঞ্জিত, তাদের ইঙ্গিতে এখনো সেখানে রক্ত ঝরছে।

৭৬. ১৯৫৬ সালে মিসর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলে বৃটিশ ও ফরাসীরা ইসরাইলকে মিসরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। ইসরাইল মিসরের সিনাই এলাকা দখল করে নেয়। মার্কিন মদদে ইসরাইল ১৯৬৭ সালে জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর ও জেরুজালেম সিরিয়ার গোলান মালভূমি, মিসরের গাজা ও সিনাই এলাকা দখল করে নেয়। ১৯৭৩ সালে ইসরাইল আবারও মিসর ও সিরিয়ায় হামলা চালালে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কর্মীরা সর্বশক্তি দিয়ে মিসর-সিরিয়ার সৈন্যদের সাথে মিলে ইসরাইলী হামলা প্রতিহত করে। প্রতিরোধ বাহিনী ইসরাইলের প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করে তেলআবিবের দিকে অগ্রসর হলে মার্কিন চাপে মিসর যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কর্মীদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও সাহসে ভীত হয়ে মার্কিনীরা প্রমাদ গোনে। ভবিষ্যতে এরা মিসরের ক্ষমতা দখল করবে এই ভয় দেখিয়ে মিসরীয় শাসকদের দ্বারা তাদেরকে হত্যা ও দেশছাড়া করায়। এ অবস্থায় মিসরীয় শাসকরা মার্কিন সেবাদাসে পরিণত হয় এবং মুসলিম বিশ্বের স্বার্থবিরোধী কাজে মার্কিনীদের সাহায্য করে চলেছে।

৭৭. স্বাধীনতার শুরু থেকেই আলজেরিয়ার জনগণ সেখানে ইসলামী শাসনব্যবস্থা চালু করার দাবী জানিয়ে আসছে। কিন্তু পাশ্চাত্য তা হতে দেয়নি। গত নির্বাচনে জনগণের ভোটে ইসলামপন্থীদের ক্ষমতায় যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হলে মার্কিন ইন্ধনে সেখানে

www.pathagar.com

ইসলামবিরোধী সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সামরিক জান্তা ইসলামপন্থীদের ওপর বেধড়ক নির্যাতন, নিপীড়ন, জেল-জুলুম ও হত্যাযজ্ঞ চালায়, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রায় এক লাখ লোক নিহত হয়েছে।

৭৮. স্বাধীনভাবে চলার অপরাধে হত্যার উদ্দেশ্যে মার্কিনীরা লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্নেল গাদ্দাফীর তাঁবুতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। কিন্তু ভাগ্যগুণে গাদ্দাফী বেঁচে যান। অতপর প্রমাণহীন সন্ত্রাসের অভিযোগে লিবিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

৭৯. ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবার পর মার্কিন গুপ্তচররা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ইরানে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীসহ ৭০ জন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে হত্যা করে সেখানে প্রতিবিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা চালায়। তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। অতঃপর ইরানের একটি যাত্রীবাহী বিমানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে ২৯০ জন যাত্রীকে হত্যা করে, যার মধ্যে ৫০ জন ছিল শিশু। আন্তর্জাতিক আদালত এর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাত কোটি ডলার জরিমানাও করে।

৮০. কোন প্রকার তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই মার্কিন দূতাবাসে হামলার অভিযোগে আমেরিকা '৯৯ সালে সুদানের ওষুধ কারখানায় ও আফগানিস্তানের বেসামরিক এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়।

৮১. আফগানিস্তান থেকে রুশ সৈন্য চলে যাবার পর সেখানে যাতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বা কোন স্থিতিশীল সরকার কায়েম হতে না পারে, সে জন্য গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে রাখা হয়। তালেবানরা তা থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে এগিয়ে আসার কারণে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়। তারপর অনুগত রাখতে চেষ্টা করে। তালেবানরা আপোসহীন থাকতে চাইলে লাদেন অজুহাতে তাদের উপর নেমে আসে যুদ্ধের বিভীষিকা।

৮২. মার্কিন অস্ত্রবাজার চাঙ্গা রাখার জন্য আমেরিকা আরব, ইসাইল, চেচনিয়য়া, বলকান, কুর্দী, কাশ্মীর, আফগান, আরাকান, মিন্দানাও প্রভৃতি সংকটের স্থায়ী রূপ দিতে চায়। বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র এবং পেন্টাগনে বিমান হামলার পর আমেরিকার সকল কোম্পানীর শেয়ারের দাম পড়ে গেলেও অস্ত্র কোম্পানীর শেয়ারের দাম বেড়ে গেছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, আফগানিস্তানের পর ইরাকে একবার হামলা হলে অস্ত্র কোম্পানীগুলোর যে আয় হবে, তা দিয়ে কয়েকটি বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র গড়া যাবে।

৮৩. এ ছাড়াও ১৯৬৭ সালে আমেরিকা পেরুতে হামলা চালায়। গ্রানাডা, পানামা, হাইতিও একাধিকবার মার্কিন হামলার শিকার হয়।

এ সকল ঘটনাও সামগ্রিক চিত্র নয়। বিশ্ববিবেককে নাড়া দেয়া উল্লেখযোগ্য কিছু প্রামাণ্য তথ্যের উপস্থাপনা মাত্র। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র ঘৃণ্য তৎপরতার নমুনা আরো বেশি ব্যাপক, ভয়াবহ এবং লোমহর্ষক। বিশ্বের বিবেকবান গবেষকরা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রমাণ করছেন, বিশ্বের প্রায় সকল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, রাষ্ট্রনায়ক হত্যার নেপথ্যে রয়েছে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের মোসাদ এবং খৃষ্টান-ইহুদী চক্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রিত সংস্থা সিআইএ। তাদের কুকীর্তির হাজার হাজার তথ্য এখনো বিশ্ববাসীর অজানা।

আমরা কি জানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে দিয়ে এবং নিজেরা কিভাবে উম্মাহর হৃদপিণ্ড মক্কা-মদীনা-বায়তুল মোকাদ্দাসকে আজদাহার মত ছোবলের মধ্যে রেখেছে। সৌদি

www.pathagar.com

আরবকে অক্টোপাসের মত আমেরিকা গিলে ধরে আছে। সারা আরব জাহানের তেল সম্পদ, রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় মার্কিনীদের অঙ্গুলি হেলনে। শুধু আধিপত্য বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা আমেরিকা কত প্রকার গোপন ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করতে পারে, তার হিসাব করা সহজ নয়।

তাদের গোপন পরিকল্পনার দলিল-দস্তাবেজসহ প্রচুর বই-পুস্তক বাজারে আসতে শুরু করেছে। আত্মস্বীকৃত এসব খুনীরা মনের অজান্তেই মাঝে-মধ্যে গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়। ইন্টারনেটে পাওয়া এমন কিছু তথ্য আমরা তুলে ধরলাম। এখানে পঁচিশটি ঘটনার সংক্ষিপ্তরূপই শুধু তুলে ধরা হল।

এক. '৯১ সালে ডেজার্ট স্টোর্মের সময় মার্কিন সৈন্যদের হামলায় কতজন ইরাকী নিহত হয়েছিল- এ প্রশ্নের জবাবে জেনারেল কলিন পাওয়েল বলেন, সত্যিকার অর্থে আমি এ সংখ্যা সম্পর্কে কিছু জানি না। অনেকের মতে, এ সংখ্যা ছিল ২ লাখ।

দুই. সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশ '৮৮ সালে দেশপ্রেমের অজুহাত দেখিয়ে নৌবাহিনীর মাধ্যমে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যাকাণ্ড ঘটান। '৮৮ সালের ৩ জুলাই মার্কিন যুদ্ধজাহাজ একটি ইরানী যাত্রীবাহী বিমান গুলী করে ভূপাতিত করে। এতে ২৯০ জন যাত্রী প্রাণ হারান। মার্কিন নৌ-সেনারা বেআইনীভাবে যাত্রীবাহী বিমানকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। বুশ বলেছেন, আমি কখনই আমেরিকার তরফ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করব না, যা ঘটেছে তাতে আমি পরোয়া করি না।

তিন. '৪৮ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের নীতি-নির্ধারণী বিষয়ক পরিচালক জর্জ কেনান বলেন, বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য বজায় রেখেছে। তাদের মানবাধিকার, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও গণতন্ত্রায়ণের বুলি আওড়ান বন্ধ করা উচিত।

চার. মার্কিন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল উইলিয়াম লুনি '৯৯ সালের ৩০ আগস্ট ওয়াশিংটন পোস্টের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, '৯৯ সালের প্রথমে ৮ মাসে ইঙ্গ-মার্কিন বিমানগুলো ১০ হাজারবার হামলা চালিয়ে ইরাকের শত শত বেসামরিক লোককে হত্যা করে।

পাঁচ. প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনের আমলে সাবেক মার্কিন এটর্নী জেনারেল রামজে ক্লার্ক বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির কারণে বিশ্বে বৃহত্তম অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।

ছয়. '৯৬ সালে সাবেক মার্কিন মেরিন কমান্ড্যান্ট জেনারেল ডেভিড শার্প বলেন, আমার ধারণা, তৃতীয় বিশ্বের নিষ্পেষিত মানুষের ওপর নোংরা যুদ্ধ ও সমস্যা চাপিয়ে রাখলে, তারা তাদের সমাধান খুঁজে বের করবে। এক্ষেত্রে তাদের বিপ্লব অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। কেননা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সচ্ছলরা-অসচ্ছলদের হিস্যা দিতে রাজি নয়।

সাত. '৬৭ সালের ৪ এপ্রিল নিউইয়র্ক সিটির একটি গীর্জায় ভাষণ দিতে গিয়ে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বলেছিলেন, ভিয়েতনামে আমাদের থাকার অভিপ্রায় নেই। আমাদের ন্যূনতম প্রত্যাশা হচ্ছে, ওটাকে উপনিবেশ হিসেবে রাখা এবং বিনিয়োগের জন্য সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। তিনি বলেন, কেন মার্কিন জঙ্গী হেলিকপ্টারগুলো

www.pathagar.com

কলোম্বিয়া ও পেরুর গেরিলাদের ওপর হামলার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আট. সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা ও লেখক রালফ ম্যাকজি দি ক্রাইসিস অব ডেমোক্রেসি ডেউলি ডিজিটস, মাই টুয়েন্টি ইয়ার্স ইন দি সিআইএ গ্রন্থে লিখেছেন, ৪০-এর দশকের শেষদিক থেকে বিশ্বে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে সিআইএ ডেথ স্কোয়াড গঠন ও ব্যবহার করেছে।

নয়. '৯৮ সালের অক্টোবরে মার্কিন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানায়, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের দেশগুলোতে নির্যাতন, মানবাধিকার লংঘন ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করতে যেসব দেশের সরকারের কাছে অস্ত্র সরবরাহ এবং সশস্ত্র গ্রুপ গঠন করেছে ও প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

দশ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন বলেন, আমরা বিশ্বের অন্যতম শাসকে পরিণত হতে যাচ্ছি। আমরা বিশ্বের সরকারগুলোকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ ও পদানত করতে সক্ষম হব।

এগার. '১৩ সালে উইনস্টোন চার্চিলের ইরাক নীতির সাথে একমত প্রকাশ করে বৃটিশ রয়্যাল কমিশন জানায়, আমাদের অবশ্যই ইরাকী তেলের মালিক হতে হবে অথবা ইরাকী তেল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বার. '১৯ সালে বৃটিশ সরকারের ভারতীয় রাজনৈতিক দফতরের প্রধান স্যার আর্থার হার্টজেল বলেছিলেন, আমাদের টিকে থাকতে হলে আবার ইনস্টিটিউশনগুলোর সাথে কিছু প্রশাসন গড়ে তোলা উচিত, এতে আমাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ নিশ্চিত হবে।

তের. '৪১ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের বৈদেশিক সম্পর্ক পরিষদ সূত্রে বলা হয়, যুদ্ধের লক্ষ্য স্থির থাকলে সেটা এংলো আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই হতে হবে।

চৌদ্দ. '৪৭ সালে বৃটিশ বৈদেশিক অফিস সূত্রে বলা হয়, একটা বিশাল এলাকার মধ্যে জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করতে পুলিশী ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্থান গড়ে তুলে সারাবিশ্বে আমাদের কৌশলগত ও নিরাপত্তা স্বার্থগুলোর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধান করা হবে। কুয়েত হল এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যেখান থেকে ইরাক, দক্ষিণ পারস্য, সৌদি আরব ও পারস্য উপসাগর নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

পনের.'৪৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের পরিকল্পনা স্টাফের সাবেক প্রধান জর্জ কেনান বলেন, আমাদের রয়েছে বিশ্বের প্রায় ৬০ শতাংশ সম্পদ। কিন্তু জনসংখ্যা মাত্র ৬ দশমিক ৩ শতাংশ। এ পরিস্থিতি আমরা ঈর্ষা ও অসন্তোষের বস্তুতে পরিণত হতে পারি না। আগামী দিনে আমাদের সত্যিকার কাজ হচ্ছে সম্পর্কের ধরণ পাল্টানো, যা আমাদের বৈষম্যমূলক অবস্থান বজায় রাখতে সহায়তা করবে। আমাদের মানবাধিকার, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও গণতন্ত্রায়ণের মত বিষয় নিয়ে অহেতুক কথা বলা বন্ধ করা উচিত।

ষোল. '৪৭ সালে আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, আমেরিকায় মহান স্বাধীনতার কথা শুনে এদেশে এসেছি। আমি স্বাধীন ভূমি হিসেবে আমেরিকাকে নির্বাচিত করে ভুল

www.pathagar.com

করেছি। আমার জীবনে এর সংশোধন করতে পারব না।

সতের. '৬৩ সালে ইরাকের বাথ পার্টি ইরাকী প্রধানমন্ত্রী আবুল কাসেমকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার পর সিআইএ'র একজন অফিসার মার্কিন সিনেট শুনানিতে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

আঠার. '৭৩ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের ভিয়েতনাম বিষয়ক নীতি-নির্ধারক জন ম্যাকনটন এক নিবন্ধে বলেন, ভিয়েতনামের জনগণকে হামলার লক্ষ্যবস্তু করায় শুধু দেশে ও বিদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠেনি, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুদ্ধের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। রাস্তা-ঘাট ও বাঁধ ধ্বংস করে দিয়ে জনগণকে ডুবিয়ে মারা যায়নি। তবে ধানের মাঠ পানিতে প্লাবিত হয়ে যাওয়ায় দশ লক্ষাধিক লোক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে।

ঊনিশ. '৭৫ সালে ওয়াশিংটন পোস্ট হেনরি কিসিঞ্জারের বরাত দিয়ে জানায়, বিশ্বের কোন কোন স্থানে যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই কিছু কার্যক্রম চালাতে হবে। যাতে প্রমাণ হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে পরাশক্তি হতে সংকল্পবদ্ধ।

বিশ. '৮১ সালে বৃটিশ শ্রমিক দলীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন বলেন, ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি করার ব্যাপারে শ্রমিক দল ছাড়া অন্য কোন দলের পক্ষে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়।

একুশ. '৮৩ সালে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান গ্রানাডায় আগ্রাসন চালানোর পর বলেন, জাতিসংঘের একশ' দেশ আমাদের প্রতিটি বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে। আমরা যেখানেই জড়িত, সে ব্যাপারে তারা একমত হয় না। এতে আমার কোন ক্ষতি নেই।

বাইশ.'৮৩ সালে নিকারাগুয়ায় সরকারকে অস্থিতিশীল করার গোপন কার্যক্রম অনুমোদন করেছেন কিনা এ প্রশ্নের জবাবে রোনাল্ড রিগ্যান বলেন- না, আমরা তাদের সমর্থন করছি না। তবে আমি এলসালভেদর নিয়েই চিন্তিত।

তেইশ. '৮৫ সালের ২ জুলাই ডেইলি এক্সপ্রেসে প্রকাশিত খবরে রোনাল্ড রিগ্যান বলেন, মার্কিন সৈন্যদের বীরত্বগাঁথা র‍্যাম্বো ছবি দেখার পর আমি জানি পরবর্তীতে কি ঘটতে যাচ্ছে।

চব্বিশ. যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের এরোসল ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম ব্যবহার শত্রুপক্ষের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। এর তেজস্ক্রিয়তায় ক্যান্সার ও কিডনী রোগ দেখা দিতে পারে। এমনকি মৃত্যুও ঘটে। মার্কিন সৈন্যরা এটাই ব্যবহার করে থাকে।

পঁচিশ. কুয়েতে ইরাকী আগ্রাসনের ৯ দিন পর '৯০ সালের ২৪ জুলাই মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র মার্গারেট টুটুইলার বলেন, কুয়েতের সাথে আমাদের কোন প্রতিরক্ষা চুক্তি নেই। কুয়েতকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নেই।

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা

মাসুদ মজুমদার

সাংবাদিক, কলামিষ্ট

www.pathagar.com

আমেরিকায় সন্ত্রাস

রবার্ট ফিস্ক

১৯৯৮ সালে মার্কিন সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক আপগানিস্তানে ওসামা বিন লাদেনের সাথে এক কথপোকথনে মিলিত হন।
সে সাকক্ষাৎকারে আমেরিকা, সৌদি আরব, প্যালেস্টাইন, ইরাকে মার্কিন হামলা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি কথা বলেন।
২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ সালে মার্কিন পত্রিকা দি নেশন-এ প্রকাশিত সে সাকক্ষাৎকারটি বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাপারটা তাহলে এই। অটোমান সাম্রাজ্যের পতন, বেলফোর ঘোষণা, লরেন্স অব অ্যারাবিয়াকে ঘিরে মিথ্যা বেসাতি, আরব বিদ্রোহ, ইসরায়েল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন, চার চারটি আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ আর টানা চৌত্রিশ বছর ধরে আরব ভূমিতে ইসরায়েলের পাশবিক দখলদারিত্ব-মধ্যপ্রাচ্যের আধুনিক ইতিহাসের পুরোটাই মাত্র কয়েকটি ঘন্টার ব্যবধানে এক ফুৎকারে চোখের আড়াল হয়ে গেল একটি ধ্বস্ত, অপমানিত জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ বলে দাবিদার একদল লোকের হঠকারী আর ভয়াবহ পাল্টা আঘাতের বদৌলতে। কোনো প্রমাণ ছাড়াই এত তড়িঘড়ি করে শেষ কথাটা বলে ফেলাটা কতটা যথার্থ, কতটা ন্যায়সঙ্গত ? অথচ ওকলাহোমায় সর্বশেষ বর্বরোচিত অপকর্মের হোতাটির জন্ম তো খোদ আমেরিকার মাটিতেই ? আমি ভয়ে ভয়ে আছি। আমেরিকা এ মুহূর্তে যুদ্ধোন্মাদনায় মেতে উঠেছে। আমার ধারণা যদি ভুল না হয়, তাহলে বলতে পারি মধ্যপ্রাচ্যে মারা যাবে আরো হাজার হাজার আদম সন্তান, সম্ভবত আমেরিকাতেও অতীতে আমাদের কেউ কেউ 'অনাগত বিস্ফোরণের' ব্যাপারে সতর্কবাণী করেছিলাম। কিন্তু আমরা কস্মিনকালেও এমন দুঃস্বপ্নের কথা ভাবিনি।

আর হ্যাঁ, মনে উঁকি দিচ্ছে ওসামা বিন লাদেনের কথা-তার অর্থকড়ি, তার ধর্মবোধ, আমেরিকার ক্ষমতার দর্পচূর্ণ করে দিতে তার ভয়াবহ আত্মনিবেদনের কথা। বিন লাদেনের সামনে বসে আমি তার মুখে শুনে যাচ্ছিলাম কীভাবে তার লোকেরা আফগানিস্তানে রুশ বাহিনীকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, চূর্ণ করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের দর্প। সীমাহীন আত্মবিশ্বাসের কারণেই তারা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পেরেছে। তবে আগামী দিনগুলোতে বিশ্ববাসীকে যেমনটি বিশ্বাস করতে বলা হবে,

www.pathagar.com

সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে গণতন্ত্রের যুদ্ধ আদতে তা নয়। ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘরের ওপর মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ার ১৯৯৬ সালে লেবাননে একটি অ্যাম্বুলেন্সের ওপর মার্কিন হেলিকপ্টার থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার, কানা নামের একটি গ্রামের ওপর আমেরিকানদের নির্বিচার কামান দাগার ঘটনাও প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় আমেরিকা ও ইসরায়েলের অর্থপুষ্ট একটি লেবাননি জঙ্গিগোষ্ঠী কীভাবে শরণার্থী শিবিরগুলোতে মানুষকে কচুকাটা করেছে, রক্তগঙ্গা বইয়েছে, মেয়েদের সম্ভ্রম লুটেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় যে একটি অশুভ অবর্ণনীয় ঘটনা ঘটে গেছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। হাজার হাজার নিরীহ মানুষের হত্যাযজ্ঞের পর ফিলিস্তিনিদের আনন্দ-উল্লাস তাদের হতাশার বহিঃপ্রকাশই শুধু নয়, একই সঙ্গে এটা তাদের রাজনৈতিক অপরিপক্কতারও প্রমাণ। এতদিন ধরে তারা তাদের ইসরায়েলি দুশমনদের যে দোষে দোষী করে এসেছে, নিজেদের বেলায় তারা সেটা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের উল্লাসটা তাই কাণ্ডজ্ঞানহীনতারই পরিচয়। বছরের পর বছর ধরে লাগাতার হুমকি আমেরিকার বুকের মধ্যে গিয়ে আঘাত হানার, 'আমেরিকান কালসাপের' মুণ্ডু কেটে ফেলার যাবতীয় প্রতিশ্রুতিকে এতদিন আমরা অসাড়ের তর্জন-গর্জন বলেই ধরে নিয়েছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম একটি পশ্চাদপদ, গোঁড়া, অগণতান্ত্রিক দুরাচার চক্র এবং ক্ষুদে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর এতসব হঠকারী প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার মুরোদই বা কতটুকু? কিন্তু এবার আমরা ঠকে শিখলাম!

১১ সেপ্টেম্বরের বিপুল ধ্বংসযজ্ঞের ঘন্টাকয় পর আমার মনে পড়তে লাগল আমেরিকা ও তার মিত্রদের ওপর আরো কতো অভাবনীয় হামলার কথা। ১১ সেপ্টেম্বরের ধ্বংসযজ্ঞের তুলনায় সেগুলো ছিল নস্যি। ১৯৮৩ সালের ২৩ অক্টোবরে বৈরুতে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে যারা ২৩৯ জন আমেরিকান নৌসেনা ও ৫৮ জন ফরাসি ছত্রীসেনাকে হত্যা করেছিল, তারা যে সময়টা বেছে নিয়েছিল তা কি বিস্ময়করভাবে নিখুঁত ছিল না?

আমেরিকান নৌসেনাদের ওপর বোমা হামলা এবং তিন মাইল দূরে ফরাসি ছত্রীসেনাদের ওপর হামলা-এ দু'টি ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল মাত্র ৭ সেকেন্ড। তারপর সৌদি আরবে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা হলো। আর গত বছর এডেন বন্দরে মার্কিন রণতরী ইউএসএস কোলেকে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও প্রায় সফল হলো। আর মধ্যপ্রাচ্যের নতুন এই বিভীষিকাকে অনুধাবন করতেও আমরা বরাবরের মতোই ব্যর্থ হলাম। এই হতাশাতাড়িত জানবাজি-রাখা আত্মঘাতী হামলাকারীদের সামাল দেওয়ার মুরোদ আমেরিকা এবং তাদের পশ্চিমা মিত্রদের কারোরই নেই।

আর অনিবার্যভাবেই এই সর্বনাশা আগুনে-ঝড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে যে ঐতিহাসিক ভুলচুক ও অন্যায়-অবিচার সেগুলোকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য কতো মরিয়া চেষ্টাই না চালানো হবে। আমাদের বলা হবে 'বর্বর সন্ত্রাসবাদের' কথা। বলা হবে 'মোক্ষম' জবাব দেওয়াটা যে কত জরুরি সে কথা। অথচ আমেরিকার প্রতি প্রধান তিনটি ধর্মের উৎপত্তিস্থলে মানুষের মনের পুঞ্জীভূত ঘৃণার কথাটাও আমাদের বুঝতে হবে।

একজন আরবকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, হাজার হাজার নিরীহ মানুষের মৃত্যুর ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া কী। যে কোনো সজ্জন ব্যক্তির মতো তিনিও একে এক মারাত্মক অপরাধ

www.pathagar.com

বলেই আখ্যা দেবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এই প্রশ্নটাও ছুঁড়ে দেবেন যে অবরোধ আর নিষেধাজ্ঞা প্রায় পাঁচ লাখ ইরাকি শিশুর জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে সেটির বেলায় আমরা এরকম আপ্তবাক্য ব্যবহার করছি না কেন, ১৯৮২ সালের ইসরায়েলি দখলদারিত্বের সময় সাড়ে ১৭ হাজার বেসামরিক লোক যখন খুন হলো তখন আমরা কেন প্রতিবাদে ফুঁসে উঠিনি ? গত সেপ্টেম্বরে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে হিংসার আগুন জ্বললো। আমরা তার মৌলিক কারণগুলোকে সুকৌশলে ধামাচাপা দিতে চাইলাম। পাছে ১১ সেপ্টেম্বরের নৃশংস ঘটনার পক্ষে এগুলোর ফাঁকফোকর থেকে মোক্ষম কোনো যুক্তি বেরিয়ে পড়ে! আরব ভূমিতে ইসরায়েলি দখলদারিত্ব, ফিলিস্তিনিদের সহায়-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে পথে বসিয়ে দেওয়া, একের পর এক বোমাবর্ষণ আর রাষ্ট্রপরিচালিত নিধনযজ্ঞ-সবকিছুই আমরা ধামাচাপা দিতে চাইলাম।

আমাদের চোখে ইসরায়েল হচ্ছে ধোয়া তুলসি পাতা। সাদ্দাম হোসেনসহ অন্যসব দুরাচার স্বৈরশাসক যে ইসরায়েলের ঘাড়েই দোষ চাপাবে সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। তবু ইতিহাসের দুষ্ট প্রভাব এবং এতে আমাদের নিজেদের পাপের বোঝা ওই আত্মঘাতী হামলাকারীদের পাশেই তো অন্ধকারে এক কাতারে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের প্রতিশ্রুতির যাবতীয় ফাঁকা বুলি আর আমাদের হাতে অটোমান সাম্রাজ্যের বিনাশও সম্ভবত আজকের এই ভয়াবহ ট্র্যাজেডির অনিবার্য পথেই আমাদের ঠেলে দিয়েছে। বছরের পর বছর ধরে ইসরায়েলের অন্যায় লড়াইয়ের পক্ষে দাঁড়িয়ে কাড়ি কাড়ি অর্থের শ্রাদ্ধ করেও আমেরিকা ভেবেছিল তার গায়ে এতটুকু আঁচড়ও লাগবে না। সেটা আর হলো না। তবু আমেরিকা যে 'বিশ্ব সন্ত্রাসের' বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানবেই, সে তো জানা কথা। কিন্তু ঘৃণাব্যঞ্জক আর সময়বিশেষে 'সন্ত্রাসবাদ' নামের এই বর্ণবাদী শব্দটা ব্যবহারের অপরাধে খোদ আমেরিকার দিকেই আঙুল তোলে, কার তেমন বুকের পাটা ?

আট বছর আগে আমি একটা টিভি সিরিজ তৈরিতে সহায়তা করেছিলাম। পশ্চিমাদের প্রতি মুসলমানদের কেন এত বিদ্বেষ, ওই সিরিজটিতে তার কারণ ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। ওই ফিল্মে যেসব মুসলমানের সচিত্র আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছিল আজ তাদের কথাই আমার খুব মনে পড়ছে। আমেরিকায় তৈরি বোমা ও মারণাস্ত্র দিয়ে ওই লোকগুলোর বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা বলাবলি করছিল, আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোনো সহায় নেই। প্রযুক্তি বনাম ধর্মবোধ, পরমাণুশক্তির বিরুদ্ধে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী। এখন আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি এর মানে। ❑

আমেরিকান সাংবাদিক

দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট. ১২ সেপ্টেম্বর ২০০১

অনুবাদ ঃ জুয়েল মাজহার

www.pathagar.com

লাদেনের মুখোমুখি

(দুই)

১৯৯৮ সালে মার্কিন সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক আফগানিস্তানে ওসামা বিন লাদেনের সাথে এক কথোপকথনে মিলিত হন।

সে সাক্ষাৎকারে আমেরিকা, সৌদি আরব, প্যালেস্টাইন, ইরাকে মার্কিন হামলা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি কথা বলেন।

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ সালে মার্কিন পত্রিকা দি নেশন-এ প্রকাশিত সে সাক্ষাৎকারটি বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে শেষবার আমার দেখা হয় গত বছর। আফগানিস্তানের এক পাহাড়চূড়ায় স্থাপিত ক্যাম্পের তাঁবুতে। তাঁবুর একটু দূরেই পাহাড় কেটে বানানো ফুট পঁচিশেক উঁচু এয়ার রেইড শেলটার। সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে লাদেনের প্রতিরোধের সময়কার এক স্মৃতিচিহ্ন, যদিও এখনো ক্রুজ মিসাইলের ধাক্কা সামলানোর মতো যথেষ্ট শক্ত। সাদা সৌদি পোশাক পরা লাদেন তাঁবুতে ঢুকে করমর্দন করলেন আমার সঙ্গে। তারপর জোড়াসন হয়ে শতরঞ্চিতে বসলেন। আমার ব্যাগে বৈরুত থেকে বের হওয়া সেদিকের কয়েকটা পত্রিকা ছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই প্রায় ছোঁ মেরে কাগজগুলো নিলেন লাদেন। তার পরের প্রায় আধঘন্টা সব ভুলে ডুবে রইলেন তাতে। আফগান পোশাক পরা এক আরব মুজাহিদ পড়ার সুবিধার জন্য সামনে ধরে ছিল সশব্দ এক গ্যাসবাতি। লাদেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিলেন ইরান, তার নিজের দেশ আর ইসরায়েল-অধিকৃত পশ্চিম তীর এলাকার খবরগুলো। দু-একটি খবর সত্যি কি না তা আমার কাছে জানতেও চাইলেন তিনি ।

এক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা মানুষটিকে মাপতে মাপতে আমার মনে হলো, বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের এই কথিত হোতা দুনিয়ার খুব একটা খোঁজখবর রাখেন না। স্বদেশের নেতৃবৃন্দকে ঘৃণার চোখে দেখা এই সৌদি নাগরিক আগের এক সাক্ষাতে বলেছিলেন আমাকে, 'মাতৃভূমিকে মুক্ত করার লড়াই যদি হয় সন্ত্রাসবাদ তাতে তা করতে পেরে আমি বরং সম্মানিত। 'তবে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন সুদান ও আফগানিস্তানে গত মাসের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর যে শিরোপা দিয়েছেন লাদেনকে তা নিশ্চয়ই আরো

www.pathagar.com

বেশি সম্মানের। ক্লিনটনের বালকোচিত অভিধা, 'আমেরিকার এক নম্বর গণশত্রু- নিশ্চয়ই আলোড়িত করেছে লাদেনকে, দুনিয়া সম্পর্কে যার সহজ-সরল মনোভঙ্গি রাজনৈতিকভাবে যেমন অপরিণত তেমনি বিপজ্জনক। গত বছর তুষারাবৃত সেই পর্বতশীর্ষে (এত ঠাণ্ডা যে, ভোরে চুলের মধ্যে বরফ জমে আছে দেখেছিলাম) ওসামা বিন লাদেনকে দেখাচ্ছিল বিচ্ছিন্ন, প্রায় নিঃসঙ্গ একজন মানুষ। তখনো 'অশুভ' সাদ্দাম হোসেনকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র অনেকটা উপেক্ষাই করছিল তাকে।

ক্লিনটন পুরোপুরি বদলে দিয়েছেন সেই ছবিটা। নতুন শিরোপাটা দিয়ে তিনি এই সৌদি ভিন্ন মতাবলম্বীর মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ করলেন। পাশ্চাত্য 'অন্যায়ের' সবচেয়ে বড় শত্রু তথা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন ওসামা বিন লাদেন।

আমেরিকা আজকাল তার প্রতিপক্ষকে যেভাবে হলিউডি গুণ্ডাদের মতো বিবেচনা করে, ঘটনা এত করুণ না হলে তা নিয়ে মজাই করা যেত। অলিভার নর্থও ফিলিস্তিনি ঘাতক আবু নিদালকে আমেরিকার এক নম্বর গণশত্রু ঘোষণা করেছিলেন। সাদ্দামকে তুলনা করা হয়েছে হিটলারের সঙ্গে, যদিও সাদ্দামের জনপ্রিয়তা স্ট্যালিনের স্মৃতিই মনে করিয়ে দেয়। আবার এর আগে সাদ্দাম যখন আমাদের 'নিজের লোক' হিসেবে ইরানে অভিযান চালাচ্ছেন তখন আয়াতুল্লাহ খোমেনিকে ভিলেন বানিয়েছি। রোনাল্ড রিগ্যান লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার আল গাদ্দাফিকে বলেছিলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যের সেই খ্যাপা কুত্তা'। এমন কি শান্তির পথে পা বাড়াতে বাধ্য হওয়ার আগ পর্যন্ত যে ইয়াসির আরাফাত ছিলেন মহা সন্ত্রাসবাদী, ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তিচুক্তির পর তাকেই আমরা বলছি মহা রাষ্ট্রনায়ক।

ওসামা বিন লাদেন আমেরিকার এই 'হেট ফিগার'-এর পরম্পরার বিষয়টি বোঝেন, বা বুঝলেও গা করেন কি না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই।

সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম লাদেনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। নিজের ধর্ম ইসলামের অর্থও এখানেই শিখেছেন তিনি। আফগান সংগ্রাম তাকে প্রণোদিত করেছে ভাবতে। লাদেন বলেছিলেন আমাকে, 'ওখানে দু'বছরে যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, অন্য কোথাও তা একশ' বছরেও হতো না।'

সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আফগানদের সাহায্য করতে নয় হাজার আরব যোদ্ধা নিয়ে এসে হিরোতে পরিণত হন লাদেন। নিজের ভারি নির্মাণ উপকরণ (প্রসঙ্গত, নির্মাণকাজ লাদেনের এক পারিবারিক ব্যবসা ছিল) ব্যবহার করে দুর্গম পাহাড়ে রাস্তা বানিয়েছেন, তৈরি করেছেন অস্ত্রাগার ও হাসপাতাল। যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি যে ঘাঁটিগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ঠিক সেগুলোতেই সিআইএ ট্রেনিং দিয়েছিল লাদেনের এখনকার আফগান সহযোদ্ধাদের অনেককেই। কিন্তু আশির দশকের গোড়ার দিকে মার্কিন এজেন্টদের তৈরি করা ওই ঘাঁটিগুলোকে তখন 'মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি' বলা হলেও এখন তার নাম হয়েছে 'সন্ত্রাসবাদীর আখড়া'। লাদেন আমাকে বলেছেন, তিনি বা তার সহযোদ্ধাদের কেউ আফগানিস্তানে 'মার্কিনী সহযোগিতার কোনো নজির' দেখেননি। কিন্তু সিআইএ-র উপস্থিতি নিশ্চয়ই গোচরে ছিলো তার।

লাদেনের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৯৩ সালে সুদানের মরু এলাকায়। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের জন্য সড়ক তৈরি করছিলেন লাদেন। মিশরীয় কর্তৃপক্ষের ভাষ্যমতে,

www.pathagar.com

খার্তুমের উত্তরের সেই মরুভূমিতেই প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকবিরোধী কট্টরপন্থীদের প্রশিক্ষণ দিতেন লাদেন। তো, সেবার রুশবিরোধী যুদ্ধ সম্পর্কে মুখ খোলাতে পেরেছিলাম তাকে।

লাদেন বলছিলেন, 'একবার রুশ সৈন্যরা আমার মাত্র তিরিশ মিটার দূরে ছিল। আমাকে পাকড়াও করার চেষ্টা করছিল তারা। মাথার ওপর তুমুল বোমাবর্ষণ চললেও আমি কিন্তু ভেতরে খুব শান্ত বোধ করছিলাম। এতটাই যে, একসময় ঘুমিয়ে পর্যন্ত পড়ি ওই অবস্থার মধ্যেই। আমাদের প্রথম দিককার বইগুলোতে এ অভিজ্ঞতাটির কথা আছে। একসময় একটা ১২০ মিলিমিটার মর্টার শেল এসে পড়লো আমার সামনে। কিন্তু ফাটলো না। রুশ বিমান থেকে আরো চারটা বোমা ফেলা হয়েছিল আমাদের সদর দপ্তরের ওপর। সেগুলোও বিস্ফোরিত হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করেছিলাম আমরা। তারা শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তান ছেড়ে পালায়। না, মৃত্যুভয় কখনোই হয়নি আমার। মুসলিম হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি মৃত্যুর পর বেহেশতেই যাবো। যুদ্ধের আগে আল্লাহ অন্যরকম প্রশান্তি এনে দেন আমাদের মধ্যে।

১৯৮০ সালে লাদেন যখন প্রথম আসেন তখন আমি নিজেও আফগানিস্তানে ছিলাম। তখনকার রিপোর্টিং নোটগুলো এখনো যত্ন করে রেখে দিয়েছি। মুজাহিদরা কীভাবে সহশিক্ষার অপরাধে স্কুল জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিত, আর দলা কাটতো শিক্ষকদের সে কথা লেখা আছে নোটগুলোতে। ওই সময় লন্ডন টাইমস পত্রিকা আফগান মুজাহিদদের বলত 'মুক্তিযোদ্ধা'। পরে মুজাহিদরা ৪৯ জন যাত্রীসহ একটি বেসামরিক আফগান বিমান ভূপাতিত (ব্রিটিশ নির্মিত ব্লোপাইপ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে) করলে একই পত্রিকা তাদের বলল 'বিদ্রোহী'। মজার ব্যাপার, রুশরা ছাড়া আর কেউই তাদের তখন একবারও 'সন্ত্রাসবাদী' বলেনি।

১৯৯৬ সালে সুদান পাসপোর্ট বাতিল করে লাদেনকে বহিষ্কার করলে (যার পুরস্কার হিসেবে আমেরিকা এখন তার ওপর ক্ষেপণাস্ত্র মেরেছে!) তিনি আফগানিস্তানে ফিরে যান। ততোদিনে আফগান পোশাকধারী আরব যোদ্ধারা আলজেরিয়ার ক্ষমতাবঞ্চিত ইসলামপন্থীদের সঙ্গেও কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে।

ওসামা বিন লাদেন সৌদি শাসকদের বিবেচনা করেন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে। তার মতে আবদুল আজিজ আল সউদ দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আইন চালু না করায় তারা জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। লাদেন বলেন, 'দেশটা যেন সউদ পরিবারের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তারপর খনিজ তেল আবিষ্কৃত হওয়ার পর রাজপরিবার পেল আরেকটা বড় সমর্থন - পেট্রোডলার। অঢেল টাকা হাতে আসায় জনগণ যা চায় তাই দিয়ে তাদের খুশি করা হলো।' তবে ১৯৯০ সালে যা ঘটল সে তুলনায় এগুলো নিশ্চয়ই তুচ্ছ। '৯৬ সালে আফগানিস্তানে লাদেন বলেছিলেন আমাকে, 'ইরাক প্রতিবেশী কুয়েত দখল করে নেওয়ার পর দুই পবিত্র স্থানের দেশ সৌদি আরবে মার্কিন সৈন্য প্রবেশ করলে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও শরীয়া আইনের ছাত্ররা জোর প্রতিবাদ জানান। সৌদি শাসকরা এত বড় ভুল করায় তাদের ভাঁওতাবাজি ধরা পড়ল। তারা কিনা সমর্থন জানাল মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশকে। দক্ষিণ ইয়েমেনের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়েমেনী কমিউনিস্টদের সাহায্য করেছে সৌদি শাসকরা। আরাফাতকে তারা সহায়তা করেছে

www.pathagar.com

হামাসকে দমন করতে। আলেমদের অপমান ও কারাবন্দি করার পর সৌদি শাসকরা বৈধতা হারিয়ে ফেলেছিল।'

সৌদি আরব নাগরিকত্ব কেড়ে নিলেও এখনো যোগাযোগ রাখে ওসামার সঙ্গে। কারণ দেশের অনেক প্রভাবশালী লোক তার সমর্থক। ইসলামাবাদের সৌদি দূতাবাসের মাধ্যমে লাদেনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে রিয়াদ। লাদেন আমাকে বলেছেন, সৌদি রাজপরিবারের এক দূত 'জেহাদ' ত্যাগ করার বিনিময়ে তার পরিবারকে ২০০ কোটি রিয়াল দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল। তিনি ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

সুদানের মরুপ্রান্তরে বসে কোনো একদিন লাদেনের মনে স্থির বিশ্বাস হয়, আফগানিস্তানকে রুশমুক্ত করতে পারলে মার্কিনীদেরও মধ্যপ্রাচ্য ছাড়া করা সম্ভব তার পক্ষে। লাদেন আমাকে বলেছেন, সৌদি আরবের খোবারে মার্কিন সেনাঘাঁটিতে '৯৬ সালের বোমা হামলায় তিনি জড়িত নন। তবে ওই ঘটনার জন্য সৌদি সরকার যে তিন তরুণের শিরচ্ছেদ করেছে তাদের দুজনকে তিনি চিনতেন।

লাদেন বলেন, 'ফিলিস্তিনে ৬০ জন ইহুদী মারা গেলে গোটা দুনিয়া এক হয়ে নিন্দার ঝড় তোলে, কিন্তু ৬ লাখ ইরাকি শিশুর মৃত্যুতে (মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে) সেরকম প্রতিক্রিয়া হয় না। ইরাকের শিশুদের এভাবে হত্যা করা ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের সামিল। অনেক মুসলিম দেশেই ক্রমশ আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের বিশ্বাসভাজন আলেমগণ আমেরিকাকে আরব থেকে উচ্ছেদ করা অবশ্য কর্তব্য বলে ফতোয়া দিয়েছেন।'

যুক্তরাষ্ট্র কেনিয়া ও তানজানিয়ায় তার দূতাবাস ভবনে বোমা হামলার কোনো কারণ স্বীকার করতে চায় না বলেই এ বিষয়টি খুব কম লোকের নজরে এসেছে যে, ১৯৯০ সালে সৌদি আরবে প্রথম মার্কিন সৈন্য প্রবেশের ঠিক অষ্টম বর্ষপূর্তির দিন ঘটে ওই হামলা।

লাদেনকে যখন আমি শেষবার দেখি তখনও জাতিসংঘ ক্যাম্পে ইসরায়েলী সৈন্যদের লেবাননী উদ্বাস্তুর গণহত্যার বিষয়টি তার মন থেকে মোছেনি। ইসরায়েল দাবি করেছে ব্যাপারটি 'ভুলক্রমে' ঘটে গেছে। জাতিসংঘ তা একরকম মেনেই নিয়েছে। আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট একে বর্ণনা করেছেন শুধু একটি দুর্ঘটনা হিসেবে, যেন তা ছিল কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। লাদেনের ভাষায় এটা 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদেরই' এক নমুনা। তিনি বলেন, এ ঘটনার জন্য দায়ী ইসরায়েলীদের অবশ্যই বিচার হওয়া উচিত।

গত আগস্টে ওসামা বিন লাদেন ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন প্রায় একই কথা বলেছেন। কিন্তু এক বধিরের কথা কি আরেক বধিরের কানে ঢোকে? ❑

১১ সেপ্টেম্বর' ৯৮

www.pathagar.com

মার্কিন তোপের মুখে আল জাজিরা টিভি স্টেশন

নূরুল ইসলাম

আল জাজিরা। কাতারভিত্তিক আরবিভাষী স্যাটেলাইট টেলিভিশন স্টেশন। হঠাৎ করেই যেমন পাদপ্রদীপে চলে এসেছে। আবার হঠাৎ করেই তেমনি বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তোপের মুখে পড়েছে। কারণ, স্টেশনটি বর্তমানে বিশ্বের রোষানলে পতিত ওসামা বিন লাদেন ও তার আশ্রয়দাতা তালেবান সরকারের বক্তব্য শোনাচ্ছে, বিভিন্ন সংবাদচিত্র দেখাচ্ছে। আসলেই আল জাজিরা বর্তমানে ওসামা, তার গোষ্ঠী ও আশ্রয়দাতা তালেবান কর্তৃপক্ষের একমাত্র মুখপাত্র হয়ে উঠেছে। আর এ কারণেই বিরাগভাজন হয়েছে মার্কিনীদের।

সম্প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল বলেছেন, আল জাজিরার ভারসাম্যপূর্ণ সংবাদ সম্প্রচার করা উচিত। ওই টিভি ওসামা, আল কায়দা ও তালেবান কর্তৃপক্ষকে বেশি সময় দিচ্ছে বলেও তিনি পরোক্ষভাবে অভিযোগ করেন। কলিন পাওয়েল তার অসন্তুষ্টির কথা সরাসরি কাতারের আমীর ও ওই স্টেশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শেখ হামাদ বিন খলিফা আল হাদির কাছে তুলে ধরেন। এতে ওই স্টেশনের কর্মকর্তারা এমন কি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা আন্দোলন কর্মীরা প্রতিবাদ জানান। তারা বলেন, এই মন্তব্য গণমাধ্যমের ওপর আঘাত হানার সামিল। অবশ্য পরে পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র রিচার্ড বুচার বলেছেন, আল জাজিরার নিজেদের মতো অনুষ্ঠান সম্প্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে।

আল জাজিরা কারও প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছে, গত সেপ্টেম্বরে কলিন পাওয়েলের সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করা হয়েছে। এমন কি এই সোমবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের সাক্ষাৎকারও প্রচার করা হয়। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট জে ডব্লিউ বুশের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য হোয়াইট হাউসে আবেদন করা আছে।

আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় গড়ে তোলা এই স্টেশনের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী মার্কিন বিমান হামলার অধীন আফগানিস্তানের কিছু কিছু ফুটেজ দেখাতে পারছে। এই কেন্দ্র থেকে বিশ্বের অন্য টিভি স্টেশন ফুটেজ করে ধার নিচ্ছে, কখনও বা চড়া মূল্যে কিনে নিচ্ছে। কাতারের আমীর ১৯৯৬ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রথম এই বেসরকারি

www.pathagar.com

সম্প্রচার কেন্দ্র আল জাজিরা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর থেকে স্টেশনটি সরকারি খরচেই চলত। তবে আসছে নভেম্বরে সরকারি সহায়তা বন্ধ করে দেয়া হবে। এই সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে নিজ পায়ে দাঁড়াতে হবে। এজন্য প্রতিষ্ঠানটি উঠেপড়ে লেগেছে। স্টেশনে বিবিসি ও ভোয়ার মতো সংবাদ মাধ্যমের প্রশিক্ষিত কর্মীরা কাজ করছেন। অভিজ্ঞ ও দক্ষ সাংবাদিকরা প্রতিটি অনুষ্ঠান কভার করেন, তুলে ধরেন। তবে সংস্থাটিকে এর আগেও নানা পক্ষের তোপের মুখে পড়তে হয়েছে। কারণ এই স্টেশন প্রায়ই বিভিন্ন দেশের নিষিদ্ধ , গোপন সংস্থা ও ব্যক্তির সংবাদ এবং সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করে। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, ওই সাক্ষাৎকারগুলোই যখন বিবিসি, ভোয়া বা সিএনএন ইংরেজিতে সম্প্রচার করে তখন কোন পক্ষই সামান্য আপত্তিও তোলে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর যখন আফগানিস্তানে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন ওসামা ও তার গোষ্ঠী আল কায়দা এই চ্যানেলে ভিডিও টেপ পাঠিয়ে জেহাদের প্ররোচনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। তালেবান শাসনাধীন আফগানিস্তানের সংবাদ সংগ্রহ ও সম্প্রচারে একমাত্র অনুমোদনপ্রাপ্ত এই টিভি চ্যানেল। তালেবান গোষ্ঠী অন্য কোন প্রচার মাধ্যমকে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সরাসরি ঢুকতে দেয় না। আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন বিমান হামলা শুরু হওয়ার পর এ পর্যন্ত লাদেন ও আলকায়দার দু'টি ভিডিও বিবৃতি সম্প্রচার করেছে আল জাজিরা। দু'টি ভিডিও টেপই ছিল আগে ধারণকৃত।

৭ অক্টোবর রাতে হামলা শুরু হওয়ার পর ৮ অক্টোবর সকালে আল জাজিরায় সম্প্রচারিত হয় ওসামার একটি বিবৃতি। এতে দেখা যায়, সামরিক পোশাক ও আফগান টুপি পরা ওসামার দু'পাশে বসা আছেন তার মিসরীয় সহযোগী আইমান আল জাওহারি ও আল কায়দার মুখপাত্র কুয়েতি নাগরিক সুলায়মান আবু গেইস। ওসামার পক্ষে আবু গেইস বিবৃতিটি পড়ে শোনান। এক পর্যায়ে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে লাদেনও কিছু বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'আজ থেকে আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু হল। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সবদিক থেকে আমেরিকা আজ ভয়ে আতঙ্কিত। আমরা দীর্ঘ বছর ধরে যে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছিলাম, আজ থেকে আমেরিকার সে দুর্ভোগ শুরু হল। তাদের এই পরিণতি ছিল প্রত্যাশিত। আমরা যতদিন নিজ দেশ ও ফিলিস্তিনে নিরাপদ হব না, আমেরিকা ততদিন নিজেদের নিরাপদ ভাবার সুযোগ পাবে না। তিনি বলেন, 'আফগানিস্তান ও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সামিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে জঘন্য অপরাধ আমেরিকা করেছে ইসলামের কিছু অগ্রসৈনিকদল আমেরিকার বিশাল ক্ষতিসাধন করে তার বদলা নিয়েছে। আমরা মহান আল্লাহর কাছে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।'

ওসামা আরও বলেন, 'আফগানিস্তানে হামলার ঘটনা বিশ্বকে আস্তিক-নাস্তিক এই দুই শিবিরে বিভক্ত করেছে। এ মুহূর্তে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে তাদের ধর্মকে রক্ষা করা।' তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশকে নাস্তিকদের নেতা অভিহিত করে বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের অজুহাতে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে নেমেছে। তারা ১৯৪৫ সালে জাপানে কয়েক হাজার মানুষ হত্যা করেছে। অবরোধের মাধ্যমে ইরাকের ১০ লাখ শিশুকে খুন করেছে। আজ আরব উপদ্বীপে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে।' যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী

www.pathagar.com

হামলায় নিজেদের জড়িত থাকার কথা সরাসরি স্বীকার না করে বলা হয়, 'এই হামলা ছিল আমেরিকার বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির পরিণতি। এই পররাষ্ট্রনীতি অব্যাহত থাকলে ইসলামের শার্দুলরা জেহাদ থামাবে না। আল্লাহ আমেরিকার একটি নরম জায়গায় আঘাত হেনেছেন। এজন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া।' আল জাজিরা টেলিভিশন ১০ সেপ্টেম্বর লাদেনের আল কায়দা গ্রুপের আরেকটি ভিডিও টেপ সম্প্রচার করে।

গোটা বিশ্বের সরকারগুলোর সামরিক ও রাজনৈতিক সমর্থন নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন বিমান হামলার মুখে কোণঠাসা ওসামা, আল কায়দা ও তালেবান গোষ্ঠী এখন বিশ্ববাসীর কাছে তাদের বক্তব্য পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে আরব বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় আল জাজিরা টিভি চ্যানেলকে। আর যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসবাদী লাদেনকে সংবাদের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে আল জাজিরাও গুণছে ব্যবসায়িক সাফল্য। কারণ আরব বিশ্বের সাধারণ জনগণের মধ্যে ওসামা এখনও বেশ জনপ্রিয়। ❑

১২ অক্টোবর '০১

জর্জ ডব্লিউ বুশ।

www.pathagar.com

আমেরিকার অভিযানে নজিরবিহীন গোপনীয়তা

(দুই)

যুক্তরাষ্ট্রে নারকীয় সন্ত্রাসী হামলার প্রধান সন্দেহভাজন ওসামা বিন লাদেন ও তার আশ্রয়দাতা দেশ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের সামরিক অভিযান এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ওয়াশিংটন এই অভিযানকে অভিহিত করেছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'নতুন যুদ্ধ' হিসাবে। কিন্তু মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন জানিয়েছে সন্ত্রাসবাদবিরোধী এই নয়া যুদ্ধ পরিকল্পনায় নেয়া হবে নজিরবিহীন গোপনীয়তা। এই লড়াইয়ের খবরাখবর সংগ্রহে গণমাধ্যমের ওপরও থাকবে কঠোর বিধিনিষেধ। অতীতে কোন যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র এ ধরনের গোপনীয়তা এবং গণমাধ্যমের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করেনি। লাদেনবিরোধী লড়াইয়ের এই পরিকল্পনা যাতে খুব বেশি সামরিক কর্মকর্তা জানতে না পারেন সেজন্য সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করা হচ্ছে। এই সামরিক অভিযান পরিকল্পনায় জড়িত পেন্টাগন কর্মকর্তারা জানান, বুশ প্রশাসন এমন কি এই প্রক্রিয়ায় নিয়মিত তথ্য (রুটিন ইনফরমেশন) সরবরাহেও কড়াকড়ি আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ এসব তথ্য সন্ত্রাসবাদীদের কাজে লেগে যেতে পারে।

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ সোমবার বলেন, 'আমেরিকার জনগণের কাছে আমি এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই যে, আমরা কি পরিকল্পনা নিচ্ছি বা নিচ্ছি না সে ব্যাপারে প্রশাসন মোটেই মুখ খুলবে না। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর ইন্টারনেটে মার্কিন যুদ্ধ জাহাজগুলোর অবস্থান স্থাপন করা বন্ধ করে দিয়েছে। প্রতিরক্ষা দফতরের ওয়েবপেজে দেখা যায়, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে হামলার একদিন আগে অর্থাৎ ১০ সেপ্টেম্বর থেকেই যুদ্ধ জাহাগুলোর অবস্থান হালনাগাদ করা হয়নি। এছাড়া আফগানিস্তানে হামলার উদ্দেশ্যে যাওয়া সৈন্যদের সঙ্গে সাংবাদিক পাঠানোর কোন পরিকল্পনাও পেন্টাগনের নেই। যুদ্ধজাহাজগুলোতে সাংবাদিক মোতায়েনের চিন্তাও তাদের মাথায় নেই। অথচ ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে সৈন্যদের সঙ্গেও সাংবাদিক পাঠানো হয়েছিল। যুদ্ধজাহাজেও সাংবাদিক মোতায়েন করা হয়েছিল। জানা গেছে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযানের জন্য পেন্টাগন 'হাই এন্ড' ও 'লো এন্ড' পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। হাই এন্ড পরিকল্পনায় থাকবে সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থনকারী দেশটির বিরুদ্ধে বিমান হামলা। আর লো এন্ডে

www.pathagar.com

থাকবে লাদেনের মতো সন্ত্রাসীকে ধরা কিংবা হত্যা করার জন্য স্পেশাল ফোর্স ব্যবহার। পেন্টাগন কর্মকর্তারা জানান, বাস্তব পরিকল্পনায় নিবিড় গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে। সংবাদ সংস্থাগুলোকেও কোন তথ্য দেয়া হচ্ছে না। কারণ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর গোয়েন্দা সংস্থা নেই। যা রয়েছে যে কোন রাষ্ট্রের। তারা শত্রুপক্ষের কর্মকাণ্ডের খবরাখবরের জন্য সংবাদ সংস্থাগুলোর ওপরই নির্ভর করে। ❑

মিডিয়া কর্মী।

২১ সেপ্টেম্বর' ০১

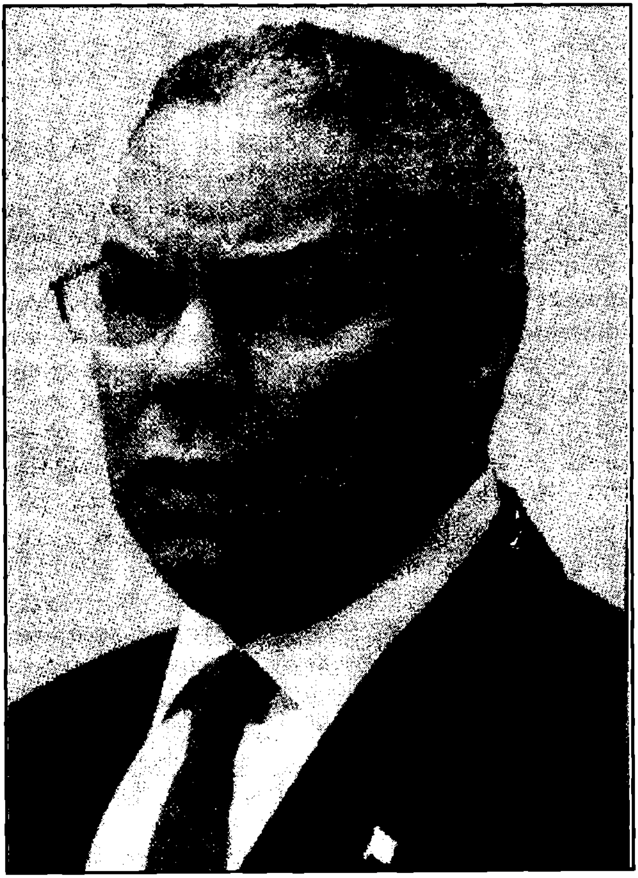

কলিন পাওয়েল।

www.pathagar.com

আফগান যুদ্ধ ঃ শেষ নয় শুরু মাত্র

ওবেইদ জাগীরদার

মানবাধিকারকে কতটা মূল্য দেয় আমেরিকা ?

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার ধরন ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ড আরেকবার আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আমেরিকা ও তার দোসর রাষ্ট্রগুলো পৃথিবীর বাকী দেশগুলোকে কোন চোখে দেখে,....কি তাদের লক্ষ্য অর্জনে নৈতিকতা, বিশ্বশান্তি, মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ইত্যাদি ধারণাকে তারা কতটা মূল্য দেয়। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলায় ওসামা বিন লাদেন জড়িত থাকার কোন প্রমাণ তারা এখনও দেখাতে পারেনি। প্রমাণ ছাড়াই তারা আরেকটি রাষ্ট্রে হামলা করেছে, সে দেশের সরকারকে উৎখাত করেছে, অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় দিনের পর দিন হাজার হাজার নিরীহ আফগানকে খুন করেছে, শত শত টন বোমা ফেলে আফগানিস্তানের বিরান ভূমিকেও ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। তারা আফগান জনগণের নাগরিক অধিকারের কথা ভাবেনি, মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার স্বীকার করেনি-গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা ভাবা তো দূরের কথা।

শুধু অপরাধের প্রমাণ নিয়েই নয়, আফগানিস্তান সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়েও আমেরিকা পরিষ্কারভাবে স্বেচ্ছাচারীরূপে আবির্ভূত হয়েছে। প্রথমত, হামলার আগে তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে হুমকি দিয়ে বলেছে—হয় আমাদের সহযোগিতা করুন না হলে সন্ত্রাসীদের তালিকাভুক্ত হোন। অর্থাৎ কেউ যদি আফগানিস্তানে হামলা চালাতে আমেরিকাকে সহযোগিতা বা সমর্থন না করত তাহলে আমেরিকা তাকেও সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করত এবং তার উপরও হামলা করত। আমেরিকার এ বক্তব্যের মধ্যে আমরা পাই শক্তির প্রকাশ, ত্রাস, হুমকি। কিন্তু গণতন্ত্র বা বিশ্ব শান্তির প্রতি বিন্দুমাত্র অঙ্গীকার বা দায়ভার এর মধ্যে নেই। তার বক্তব্যে যে অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে তা হল—গণতন্ত্র ধ্বংস হলে হোক, বিশ্ব শান্তি প্রয়োজনে নিপাত যাক, আমেরিকার যা প্রয়োজন তা করা হবে।

দ্বিতীয়ত, আফগানিস্তানে তারা বেপরোয়া বোমা চালিয়েছে। ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার করেছে, ডেইজী কার্টার নামের বিরাট সাইজের বোমা ফেলেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, বোমায় কারা মৃত্যুবরণ করছে তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ছিল না। তাই প্রতিদিনই নারী

www.pathagar.com

ও শিশুসহ নিরীহ আফগানরা মারা গেছে মার্কিন বোমার আঘাতে। ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রবার জুমার নামাজের সময় মসজিদে বোমা ফেলে নামাজরত মুসল্লিদের ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। হাসপাতাল, এতিমখানা, টিভি সেন্টারে, নিরীহ গ্রামবাসীদের আস্তানায়-সর্বত্র বোমা ফেলে শিশু-নারী-বৃদ্ধদের হত্যা করা হয়েছে। এ রকম নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড কি গণহত্যা নয় ? যে কারণে মেলোসোভিচ এবং কারাদজিসকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে, আমেরিকা কি আফগানিস্তানে তা করেনি ? পৃথিবীর একটি দেশও এখনো আমেরিকাকে যুদ্ধাপরাধী বলে অভিযুক্ত করেনি। আন্দাজ করা যায়, কেউ হয়ত তা করবেও না।

তৃতীয়ত, যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে জেনেভা কনভেনশনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে আমেরিকা। আত্মসমর্পণকারী তালিবান সৈন্যদের পশুর মত নির্যাতন করা হচ্ছে। অনাহারে-অর্ধাহারে, বিনা চিকিৎসায় রেখে তাদের তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের চুল, দাড়ি কেটে হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে রাখা হয়েছে; জেলে না পুরে বন্দী করে রাখা হয়েছে লোহার খাঁচায়-যেন এরা হিংস্র বন্যপ্রাণী। আমেরিকার অভ্যন্তরে যুদ্ধবন্দীদের মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে আইনগত জটিলতা থাকায় তালিবানদের কিউবার হোয়ানতানামো ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিচারের জন্য (যুক্তরাষ্ট্র কিউবার ভূতপূর্ব ডিক্টেটর হোয়ান বাতিস্তার নিকট থেকে এ জায়গাটি নিয়ে ঘাঁটি বানিয়েছিল। এখনও আমেরিকা জোর করে তা দখলে রেখেছে)। তার আগে আফগানিস্তানেও বহু বন্দী তালিবানকে নির্দয়ভাবে খুন করা হয়েছে। তাহলে জেনেভা কনভেনশনের অর্থ কি ? এরপরও আমেরিকার সন্তুষ্টি আসেনি। এখনও আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণ চলছে। অবশ্য এরও উদ্দেশ্য আছে। এ অঞ্চলে আমেরিকার দু'দশকের তৎপরতাও একই উদ্দেশে পরিচালিত হয়েছে, যার মূলে আছে আমেরিকার দীর্ঘ এক পরিকল্পনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী দৃশ্যত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কোথাও সমাজতান্ত্রিক জোটের প্রভাব যে কোন মূল্যে প্রতিহত করাই ছিল আমেরিকান জোটের মূল লক্ষ্য। আমি এখানে সচেতনভাবেই সমাজতান্ত্রিক জোট এবং আমেরিকান জোট কথাটি ব্যবহার করছি। কারণ, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর জোটের পেছনে ঐক্যবোধ হিসেবে কাজ করেছে খ্রীস্টীয় জাতীয়তাবাদ এবং এর পরই সাদা চামড়ার জাতীয়তাবোধ। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক জোটের শক্তি হিসেবে মানবিক ও সমাজতান্ত্রিক বোধই একমাত্র শক্তি। '৫০-এর দশক থেকে আমেরিকান জোট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রতিটি পদক্ষেপে কাঁটা পুঁততে থাকে এবং অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে, দূরদর্শিতাহীন নেতৃত্বের কারণে অধিকাংশ মুসলিম দেশ আমেরিকার লেজুড়বৃত্তির ভূমিকা নেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করার পর আমেরিকা তার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। পাকিস্তানের মাধ্যমে আফগান মুজাহিদদের হাতে তুলে দেয় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও আসতো আমেরিকা থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পিছু হটার পর দেশটির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করার জন্য আমেরিকা নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কারণ, তখন সমাজতান্ত্রিক শক্তি ধ্বংস হয়ে গেলেও আমেরিকার সামনে অন্য প্রলোভন দেখা দেয়। তা হল, মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর তেল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ। এ তেল সন্তোষজনক খরচে আমেরিকায়

www.pathagar.com

পার করতে হলে আফগানিস্তানের উপর দিয়ে পাইপ লাইন টানার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু আফগানিস্তানের কোয়ালিশন সরকার আমেরিকার স্বার্থ পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই বিকল্প শক্তি হিসেবে তালিবানদের দাঁড় করান হয়, আবারও পাকিস্তানের মাধ্যমে এবং আমেরিকার খরচে। এই হল আজকের বিশ্বে খ্রীস্টীয় প্রচার মাধ্যমগুলোর অপপ্রচারে সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত তালিবানদের উত্থানের ইতিহাস। তালিবান আমেরিকার সৃষ্টি মোল্লা ওমরের সরকার আমেরিকার অর্থ ও অস্ত্রের উপর পা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এর পরপর পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকে। মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে গড়ে ওঠা তালিবান সরকার প্রকৃত স্বাধীন একটি আফগান সরকার হিসেবে আবির্ভূত হয়। তারা কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করতে থাকে, ফলে স্বভাবতই ইয়াংকি কালচারের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাবও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী ও পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী শক্তি আমেরিকা তালিবানদের ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়। এখন থেকে বেশ কয়েক বছর পূর্বেই আমেরিকা এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। প্রয়োজন ছিল উপলক্ষ। ১১ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা তাদের উপলক্ষে পরিণত হল।

আফগানিস্তান নিয়ে আমেরিকার কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের হামলার মত ঘটনা আমেরিকার খুব দরকার ছিল-তালিবানদের ধ্বংসের জন্য, আফগানিস্তানে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জন্য। আমেরিকা তার উদ্দেশ্য সফল করেছে। এমন কি এ উপলক্ষে ইরাক ও ইরানকেও শেষ করে দিতে চাচ্ছে। এই দু'টি দেশ এককালে আমেরিকার বন্ধু ছিল বটে, কিন্তু এখন এরাই ইসরাইলের বড় শত্রু।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা সম্পর্কে আরব পত্রিকাগুলোর ভিন্ন তথ্য

১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের হামলার ঘটনা নিয়ে আমেরিকা যে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায়নি তার রহস্যও ধীরে ধীরে উদঘাটিত হচ্ছে। কয়েকটি আরবী পত্রিকায় তথ্য প্রকাশিত হয়েছে যে, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে কর্মরত ইসরাইলীরা হামলার দিন অফিসে যায়নি বলে বেঁচে গেছে। কিন্তু ভারতীয়রাও ঐদিন কাজে যায়নি। এর অর্থ দাঁড়ায় ইসরাইলীরা জানত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা হচ্ছে এবং তাতে হাজার হাজার লোক মরবে, এমন কি ভবন দু'টির সমস্ত মানুষ মৃত্যুবরণ করতে পারে। এ তথ্য সত্যি হলে একটা প্রশ্ন সামনে চলে আসে যে, ইসরাইলীরা ওই হামলা সম্পর্কে জানত; হয়ত তারা জড়িত ছিল। পুরো বিষয়টিই হয়ত তাদের দ্বারা সাজানো।

আরব অঞ্চলে মার্কিনবিরোধী ক্ষোভ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, কমবয়সী আরব-তরুণদের কেউ উস্কানি দিলে এবং সহযোগিতা করলে তাদের পক্ষে এমন একটি হঠকারী ঘটনা ঘটিয়ে ফেলা অস্বাভাবিক নয়। ইসরাইলীরা আমেরিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে বসে আছে। তাদের পক্ষেই সম্ভব এমন একটি ঝুঁকিপূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। কড়া সিকিউরিটি এড়িয়ে বিস্ফোরক জোগাড় করা এবং বিমানে নিয়ে তোলার কাজটি ভেতরের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। আমেরিকা সে সম্পর্কে মুখ খুলছে না। এ বিষয়ে তাদের নীরবতা রহস্যজনক। যদি আরব পত্রিকাগুলোর তথ্য সঠিক হয়ে থাকে অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বর কোন ইহুদী ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে কাজে না গিয়ে থাকে, তাহলে আন্দাজ

www.pathagar.com

করা যায় ইহুদীরা এর সাথে জড়িত ছিল। পরে আমেরিকা তা জানতে পেরেই মুখ বন্ধ করেছে। ইহুদীরা এর আগেও এ ধরনের ষড়যন্ত্র করেছে। এখানে এরকম একটি ঘটনা অন্তত উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক পূর্বের ঘটনা। ইসরাইলী এজেন্টরা জর্ডান, মিসর আর সিরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের গলা নকল করে ফোনে পরস্পরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছিল। ঠিক সে সময় মেডেটারেনিয়ান কোস্ট থেকে ইসরাইলের এসব ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতার খবর সংগ্রহ করছিল মার্কিন স্পাই শিপ ইউএসএস লিবার্টি। যুদ্ধের পরিকল্পনা চূড়ান্ত। আমেরিকার দেয়া কয়েকটি ফ্যান্টম বিমান নিয়ে আকাশে ওড়ে ইসরাইলের ঠাণ্ডা মাথার খুনী পাইলটরা এবং ইউএসএস লিবার্টির উপর বোম্বিং শুরু করে। লিবার্টি থেকে ইসরাইলী পাইলটদের বারবার বোঝানোর চেষ্টা চলছিল যে, এটি ইসরাইলের মিত্র আমেরিকার স্পাই শিপ। তাছাড়া বিশাল আমেরিকান ফ্ল্যাগ অনেক দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল। ইসরাইলী পাইলটরা কান দেয়নি। তারা তো সব জেনে-শুনেই আক্রমণ করেছিল। অতর্কিত আক্রমণে ৩৯ জন মার্কিন নাবিক ও অফিসার নিহত হলেও জাহাজটি অলৌকিকভাবে টিকে থাকে। সাহায্যের ডাক পেয়ে নিকটস্থ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার গুয়াডেলক্যানের থেকে এক ঝাঁক ফ্যান্টম উড়ে এলে ছুটে পালায় ইসরাইলী বৈমানিকরা।

পেন্টাগনে প্রথমে তুলকালাম শুরু হলেও উপরের নির্দেশে আবার দ্রুতই সব চাপা পড়ে যায়। পেন্টাগনের যেসব অফিসার ইসরাইলীদের এই বর্বরোচিত আক্রমণের নিন্দা করেন তারা অচিরেই চাকরিচ্যুত হন। সহজেই আন্দাজ করা যায় আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি যুক্ত করার জন্য ইসরাইল বলির পাঁঠা হিসেবে বেছে নিয়েছিল ইউএসএস লিবার্টিকে। আমেরিকা সরাসরি অভিযুক্ত করত আরব দেশগুলোকে। কিন্তু গুয়াডেলক্যানের কাছাকাছি থাকায় এবং সময়মত সাড়া দেয়ায় তাদের ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল হয়ে যায়। অবশ্য এই ঘটনার জন্য ইসরাইলকে এমন কি ক্ষমাও চাইতে হয়নি। মার্কিন সরকারের ভেতরে ইহুদীদের উপস্থিতি এতটাই প্রবল যে, যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন সৈন্যদের এমন নির্মম মৃত্যুও মেনে নিতে বাধ্য হয়। গত ১১ সেপ্টেম্বরে ১৯৬৭ সালের ঘটনারই যে পুনরাবৃত্তি হয়নি সে সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। কারণ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের হামলায় কারও জড়িত থাকার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ দিতে পারেনি।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা ঃ ফায়দা হল কার ?

১১ সেপ্টেম্বরের হামলা উপলক্ষে দ্বিতীয় যে দেশটি ফায়দা লুটছে, তা হল ইসরাইল। আরব রাষ্ট্রগুলোর দীর্ঘকালীন চাপ এবং ফিলিস্তিনীদের সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক রক্তক্ষয়ের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরাইল-ফিলিস্তিন আলোচনা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, ফিলিস্তিনীদের উপর ইসরাইলের কর্তৃত্ব দিন দিন হ্রাস পেয়ে ধীর কিন্তু একমুখী গতিতে স্বাধীন ফিলিস্তিনের উদ্ভবের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর সাতলা ও শাতিলার গণহত্যার নায়ক ইসরাইলী প্রধান এরিয়েল শ্যারন পুরো পরিস্থিতি পাল্টে দিয়েছে। ফিলিস্তিনীদের সন্ত্রাসী অভিহিত করে ইসরাইলী সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে নেমেছে। ইয়াসির আরাফাতকে

www.pathagar.com

গৃহবন্দী করা হয়েছে। ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে ফিলিস্তিন পুলিশের হেডকোয়ার্টারসহ সকল আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ক্ষেপণাস্ত্রসহ অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত ইসরাইলী বাহিনী ফিলিস্তিনে শহরের পর শহর দখল করে নিচ্ছে। ঘরবাড়ী ধ্বংস করা হচ্ছে। এক কথায় ফিলিস্তিনে চলছে ইসরাইলের পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ। যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলী আক্রমণের জবাবে ইয়াসির আরাফাতকে সন্ত্রাস দমনের জন্য চাপ দিচ্ছে। কিন্তু ইসরাইলের বর্বরোচিত ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে দেশটি সম্পূর্ণ নীরব। ফিলিস্তিনে ইসরাইলী দখলদারিত্বের অবসানের আলোচনা আবার গোড়ার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে ইসরাইল। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী বলছেন, আরাফাতকে আর ফিলিস্তিনীদের নেতা হিসেবে মানতে রাজি নয় ইসরাইল। ইসরাইলের এই নতুন অবস্থান স্পষ্টত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার ফল। আমেরিকার সন্ত্রাসবাদবিরোধী প্রচারণা এবং আফগান যুদ্ধের ফায়দা লুটছে ইসরাইল।

একইভাবে ভারতও আফগান যুদ্ধকে উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করছে। পার্লামেন্টে তথাকথিত পাকিস্তানী সন্ত্রাসীদের হামলার অজুহাত তুলে ভারত সীমান্তে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে পাকিস্তান আক্রমণের হুমকি দিচ্ছে। ভারত পরাশক্তি না হয়েও আচরণ করছে পরাশক্তির মত। ভারতের পার্লামেন্টে যে পাকিস্তানী সন্ত্রাসীরাই হামলা করেছে এমন কোন প্রমাণ না দিয়েই সে পাকিস্তানের কাছে কিছুসংখ্যক নেতার তালিকা দিয়ে বলেছে, এদেরকে ভারতের হাতে তুলে দিতে হবে এবং এখন পর্যন্ত এই উদ্ভট দাবীতেই ভারত অনড়। পাকিস্তান প্রমাণ ছাড়াই ভারতের নির্দেশিত সংগঠন দুটো নিষিদ্ধ করেছে, বেশ কিছু নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু ভারত এতে সন্তুষ্ট নয়। যেন সে পাকিস্তানে হামলা করতেই বদ্ধপরিকর। অথচ প্রমাণ নেই ভারতের পার্লামেন্টের হামলা-ভারতেরই সাজানো ব্যাপার কি না। বিস্ময়কর যে, যুক্তরাষ্ট্র ভারতকেই ক্রমাগত সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। ভারতের মূল উদ্দেশ্য কাশ্মীরের স্বাধীনতার ইস্যুটি চিরতরে থামিয়ে দেয়া।

সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধে এ তিনটি দেশই প্রধানত সোচ্চার। এছাড়া বৃটেনও তাদের সারিতে। তবে বৃটেন নিজের স্বার্থ ছাড়াই আমেরিকার লেজুড়বৃত্তিতে অভ্যস্ত। এটি অতীতে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধে জড়িত তিনটি দেশ নিজ নিজ স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করছে এবং এ থেকে নিজ নিজ লক্ষ্য অনুযায়ী ফায়দা লুটছে। এখানে আমেরিকার ক্ষোভের একটি প্রত্যক্ষ উপলক্ষ আছে-ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের হামলা। যদিও হামলায় লাদেনের জড়িত থাকার প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে ভারত ও ইসরাইল কোন ইস্যু ছাড়াই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টরে হামলার ঘটনার সুযোগ নিচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে দেশ দু'টি যে সুযোগ চেয়েছিল এখন যেন হঠাৎ করেই তা তাদের হাতের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। সবকিছুই যেন কাকতালীয়ভাবে ঘটে চলেছে। শোনা যায়, মার্কিন ও ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই ও মোসাদ সম্প্রতি কোলকাতায় অফিস খুলেছে। দূতাবাসে বোমা ফাটানো, গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্রমূলক গেরিলা ও কমান্ডো হামলায় মোসাদ যে শয়তানের চেয়েও দক্ষ তা কে না জানে! কাকতালীয়ভাবে ভারতীয় পার্লামেন্টেই বা হামলা হল কেন ? কাজেই অসম্ভব নয় যে,

www.pathagar.com

ইসরাইলসহ যেসব দেশ ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার ফায়দা লুটছে তারাই পরিকল্পিতভাবে চরমপন্থী আরব-তরুণদের বিভ্রান্ত করে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা করিয়েছে।

আফগান যুদ্ধের পরবর্তী গতিধারা

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল আফগানিস্তান ধ্বংস হওয়ার পরও যুক্তরাষ্ট্র থেমে থাকেনি। সে চেষ্টা করছে এই যুদ্ধ ইরাক, ইরান ও উত্তর কোরিয়ায় টেনে নিতে। প্রেসিডেন্ট বুশ কোন উস্কানি ছাড়াই তিনটি দেশকে অশুভ অক্ষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তিনি হুমকি দিয়ে বলেছেন, এরা সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিচ্ছে। তাই এদেরকে তার মূল্য দিতে হবে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র এসব দেশেও হামলা চালাবে এবং নিরীহ মানুষকে গণহারে খুন করবে। এখানেও লক্ষণীয় যে, বুশ এবারও তার হুমকি ঘোষণা করেছেন এককভাবে। তিনি লক্ষ্য অর্জনে আকাশযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নির্মাণ ও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই নয় শুধু, তার বক্তব্যকে কাজে পরিণত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বাজেটে যুদ্ধ খাতে ব্যয়ও বাড়িয়েছেন।

আফগান যুদ্ধ শেষ। যুদ্ধ খাতে আরও অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন হল কেন ? আমেরিকা তার বহুদিনের মিত্র পাকিস্তানকে বেকায়দায় ফেলে ভারতকেই বা কেন মদদ জোগাবে এবং ক্লিনটন প্রশাসনের প্রচেষ্টায় মধ্যপ্রাচ্য সংকট যেখানে নিয়ন্ত্রণযোগ্য পরিস্থিতিতে উন্নীত হচ্ছিল, সেখানে ইসরাইল হঠাৎ করেই তা জটিল করবে কেন, আর আমেরিকাই বা তাতে সায় দেবে কেন ?

মুসলিম দেশগুলোকে আমেরিকার এই নতুন মনোভাব সতর্কতার সাথে যাচাই করে দেখতে হবে। তাদের বুঝতে হবে আফগান যুদ্ধ আফগানিস্তানেই শেষ হচ্ছে না, এ যুদ্ধ আমেরিকাকে যে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে তা তার আধিপত্যবাদী আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত হবে। পরিণামে তা ডেকে আনবে আরও যুদ্ধ, আরও আগ্রাসন। প্রেসিডেন্ট বুশের বক্তব্য থেকেও সে ধরনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ❑

লেখক ঃ কলামিস্ট, গ্রন্থকার ও শিল্পপতি

ঢাকা।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০১

www.pathagar.com

প্রতিশোধ সমাধান হতে পারে না

ভিনসেন্ট ক্যানিস্ট্রারো

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমের সাবেক প্রধান।

পেন্টাগন ভবন ও বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার ভয়াবহ পরিণতি দেখে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন কট্টরপন্থী মৌলবাদী গোষ্ঠীর হুমকির পরিণাম কী হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র তা উপলব্ধি করতে পারেনি এবং এসব হুমকি মোকাবিলায় ওয়াশিংটনের প্রস্তুতিও ছিল কম। আফগানিস্তানের ধর্মীয় জঙ্গি সংগঠন আল কায়েদা ও যুক্তরাষ্ট্রে শ্রেষ্ঠত্ববাদী ক্রিশ্চিয়ান আইডেনটিটির মতো চরমপন্থী সংগঠনগুলো এখন গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের সময় যে ধরনের হুমকি ছিল তা আগে-ভাগেই কিছুটা বোঝার উপায় ছিল। এখন তা নেই। কারণ এখনকার সন্ত্রাসবাদীরা ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশ বা বয়ানে উদ্বুদ্ধ হয়ে মার্কিন প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের চরম ক্ষতি সাধনের জন্য আত্মহত্যা করতেও প্রস্তুত। এভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে সহিংস হামলার জন্য তারা কিছু প্রচলিত বা জ্ঞাত কৌশল অবলম্বন করছে। সন্ত্রাসবাদীরা আজও এসব কৌশল প্রয়োগ করতে পারে এটা কেন যেন মার্কিন সরকারের মাথায় এতদিন ঢোকেনি। সরকার কেবল জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ এবং পরমাণু অস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঝুঁকি নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর সন্ত্রাসবাদবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচিতে কয়েকশ' কোটি ডলার খরচ করা হয়। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর হাতে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে সেরা ও সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি। সংস্থাগুলোর জনশক্তিও খুবই দক্ষ। কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাটি সম্পর্কে কোনো আগাম তথ্য তারা জানতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে যে ব্যাপক ব্যর্থতার পরিচয় তারা দিয়েছে তাও এককথায় আশঙ্কাজনক।

যুক্তরাষ্ট্রে এফবিআই ও সিআইএ যথাক্রমে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার কাজগুলো করে থাকে। এমন একটি আত্মঘাতী বোমা হামলার সম্ভাবনা সম্পর্কে সংস্থা দুটো কিছুই জানত না। আর এরকম হামলা ঘটলে কী করতে হবে তার কোনো প্রস্তুতিও তাদের ছিল না। গত দুই মাস বিশ্বজুড়ে মার্কিন নাগরিক ও স্থাপনা সম্পর্কে নানা হুমকি সম্পর্কিত কিছু পরামর্শনামা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বেশ কয়েক দফা ইস্যু করা হয়। গোয়েন্দা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত এসব পরামর্শনামায়

www.pathagar.com

বলা হয়েছিল, ওসামা বিন লাদেনের গ্রুপটি মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের মার্কিন স্থাপনা ও অবস্থানগুলোতে বেশ কিছু হামলা চালানোর পরিকল্পনা করে চলেছে। ছয় সপ্তাহ আগে বিন লাদেনের সঙ্গে জড়িত একটি বিশ্বস্ত সূত্র বলেছিল, আল কায়েদা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নারকীয় হামলা চালাতে যাচ্ছে। কিন্তু বিন লাদেন সম্পর্কে গোয়েন্দা বিভাগগুলোতে যে ধারণাটি গড়ে উঠেছে তার ভিত্তিতে মনে করা হলো, এটা একটি সাধারণ হুমকি মাত্র। শিগগির কোন হামলা হলেও তা বিদেশে মার্কিন স্থাপনাগুলোয় চালানো হতে পারে বলে ধারণা করে হয়েছিল। কারণ এ ধারণার পক্ষে ইলেকট্রনিক গোয়েন্দা যন্ত্রের সমর্থন মিলেছিল। মার্কিন গোয়েন্দা ব্যবস্থার সকল আয়োজনে কিংবা এফবিআইয়ের তথ্য সংগ্রহ কর্মসূচির কোথাও খোদ যুক্তরাষ্ট্রের ওপর এ রকম একটি হামলা চালানোর কিঞ্চিত মাত্র তথ্যও সংগৃহীত হয়নি। সবগুলো সংস্থার দৃষ্টি ছিল দেশের বাইরে। আর এ ফাঁকেই ইতিহাসের সবচেয়ে নারকীয় ও দুঃসাহসিক সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রস্তুতি চলছিল, উত্তর আমেরিকায় আল কায়েদার নেটওয়ার্কটিই সম্ভবত এ কাজটি করেছে।

ঘটনার পর তাই প্রশ্ন, সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোয় নিজেদের লোক ঢুকিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হবে, নাকি এ কাজে দামী অত্যাধুনিক গোয়েন্দা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হবে। বিন লাদেনের ক্যাডাররা যুক্তরাষ্ট্রকে বেশ ভালোভাবেই বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে। নিজেদের অনেক ক্ষতি হবে জেনেও এ ব্যাপারে তারা গোয়েন্দাবৃত্তির পুরনো রীতি প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। নিঃসন্দেহে এ কাজে তারা সফল হয়েছে। বিন লাদেন এখন টাকাকড়ি লেনদেনের ব্যাপারে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন না এবং অধীনস্থদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন না। টাকাকড়ি দেওয়া-নেওয়া ও নির্দেশ প্রদানের মতো কাজগুলো তিনি বাহকের মাধ্যমেই সারেন। সাম্প্রতিক সময়ে বিন লাদেন সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তা তিনি যোগাযোগের চ্যানেলগুলোয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ছেড়েছিলেন। এর সবগুলোই ছিল ভুল তথ্য। লাদেন চেয়েছিলেন প্রতিপক্ষরা তার সম্পর্কে ভুল তথ্যই জানুক।

যুক্তরাষ্ট্রে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে দক্ষ জনশক্তির খুবই অভাব। আবার বাজেটে অগ্রাধিকার পেয়েছে অন্য কিছু খাত। সন্ত্রাসবাদবিরোধী কার্যক্রমগুলোকে এখনো সমন্বিত করা হয়নি। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামিসৃষ্ট সন্ত্রাসবাদকে এখনো আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে একটি সমস্যা বলে মনে করা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রে এখনো আল কায়েদার মতো সংগঠনগুলোকে কেবল অপরাধী সংগঠন মনে করা হয়। আরো মনে করা হয়, বিচার ব্যবস্থার আওতায় এনে এগুলোকে পুরোপুরি দমন করা যাবে। পূর্ব আফ্রিকার মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলায় অভিযুক্তদের শাস্তি দিয়ে বিচার বিভাগ বেশ শ্লাঘা অনুভব করেছিল। তখন এ কথাটি কেন কারো মনে জাগেনি যে, ওই বোমা হামলার সমূল পরিকল্পকদের তো চিহ্নিত করা হলো না। যারা এ হামলায় তথ্য যুগিয়েছে তারা তো আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ধরাছোঁয়ার বাইরে আফগানিস্তানেই থেকে গেল। সেখানে বসে তারা যুক্তরাষ্ট্রে আরেকটি নতুন হামলার পরিকল্পনাও সম্পাদনের সুযোগ পাচ্ছে। নিজের ঘর পোড়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের সামনে এখন অবধারিত প্রশ্ন হলো, ইসরাইলের মতো তারাও সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার জন্য সন্দেহভাজন ও সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদীদের বেছে বেছে হত্যার পদ্ধতিটি গ্রহণ করবে কিনা। ইসরাইলিরা প্রায় প্রতিদিনই আত্মঘাতী বোমা হামলার মুখোমুখি হয়। সন্ত্রাসবাদী ঘটনার অভিজ্ঞতাও তাদের বেশি।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে যারা এ নারকীয় হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করেছে এবং যারা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানা হবে। সন্দেহভাজনদের বেছে বেছে হত্যা করলে ভবিষ্যতে সন্ত্রাসী হামলার সম্ভাবনা কমে। কিন্তু তা মার্কিন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুরোপুরি বিরোধী। আবার এর ফলে নতুন করে পাল্টা সন্ত্রাসী হামলাও শুরু হতে পারে। প্রতিশোধ নিলে সমস্যার সমাধান হবে কিংবা এর মাধ্যমে নতুন সহিংস হামলার আশঙ্কাও দূর করা যাবে না। পূর্ব আফ্রিকার মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলার পর লাদেনের শিবির ও সুদানে ওষুধ কারখানায় ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই প্রতিরক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে সুশৃঙ্খল ও দক্ষ গোয়েন্দা ব্যবস্থা তৈরীকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এরপরও যদি গোয়েন্দা ব্যবস্থা ব্যর্থ হয় (যেমন ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কের সাম্প্রতিক ঘটনায় হয়েছে) তাহলে সব ধরনের সমরোপকরণ ব্যবহার করে সামরিকভাবে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার কথা ভাবা যেতে পারে। আল কায়েদাই সাম্প্রতিক জঘন্য ঘটনার জন্য দায়ী বলে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেলে যুক্তরাষ্ট্রও বিন লাদেনকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আফগানিস্তানের তালেবান কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাতে পারে। তালেবানরা তা না করলে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত সেনাবাহিনী ব্যবহারসহ একটি সামরিক অভিযান চালানো। তখন সামরিক অভিযান চালিয়ে জঘন্য হামলার পৃষ্ঠপোষক এবং তাদের সমর্থনকারী সরকার উভয়কে ধ্বংস করা উচিত কাজ হবে। ❑

১৩ সেপ্টেম্বর '০১

www.pathagar.com

আফগানিস্তান সব সময় আক্রমণকারীদের পরাস্ত করেছে

কাবুলে গিরিসংকট ও অন্য পার্বত্য এলাকায় খোঁজাখুঁজি করলে বেল্টের পুরানো বাকল কিংবা তলোয়ারের ক্ষয়ে যাওয়া হাতলের কিছু অংশ হয়তো আজও পাওয়া যেতে পারে। এতে পুরনো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্রিটিশ রেজিমেন্টের সদস্যদের কোনো পরিচয় জানা সম্ভব নয়। কারণ তকমায় খোদাই করা অক্ষরগুলো এতোদিনে আর বোঝার কোনো উপায় নেই। তবে আরো খুঁজলে ওই রেজিমেন্টের ১৬ হাজার সৈন্যের হাড়গুলোও পাওয়া যেতে পারে। আফগানিস্তানের দুর্গম সংকটসঙ্কুল পর্বতের ঢাল কিংবা কালো পাথুরে মাটির কোনো না কোনো জায়গায় সেগুলো আজও আছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পর জেনারল উইলিয়াম এলফিনস্টোনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীও আফগানিস্তানে অভিযান চালিয়েছে। এর ১০০-রও বেশী বছর পর সোভিয়েত রাশিয়ার সেনাবাহিনীও অভিযানে গিয়েছিল। সেই জেনারেল এলফিনস্টোনের সময়ই বলুন আর সাম্প্রতিককালে সোভিয়েত বাহিনীর কথা বলুন, অভিযান শুরুর আগে নীতি ও আদর্শের বহু বুলি কপচানো হয়েছিল, অনেক বাগাডম্বরও হয়েছিল। কিন্তু দুটো অভিযানই কেবল ভেস্তে যায়নি, পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়েছিল। জর্জ জুনিয়র এবং ন্যাটো, আপনারা অনুগ্রহ করে এ ব্যাপারটা একটু লক্ষ্য করুন।

আফগানিস্তানের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো পশ্চিমা সামগ্রিক অভিযানের সবচেয়ে অনুপযোগী এলাকা। আর এ ধরনের কোনো একটি অঞ্চলে ওসামা বিন লাদেন ঘাঁটি গেড়ে লুকিয়ে রয়েছেন। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা আফগানিস্তানের মালভূমিতে কোনো বিদেশী সামরিক অভিযানের কী পরিণতি ঘটে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল দুই যুগ আগে। সালাং টানেলের কাছে রাশিয়ার একটি প্যারাস্যুট রেজিমেন্ট আমাকে গ্রেপ্তারের পর একটি সোভিয়েত কনভয়ের সঙ্গে আমাকে কাবুল পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হলো, কিন্তু কাবুল আসার পথে আমাদের কনভয়টির ওপর হলো হামলা, তুষারঢাকা পর্বতের ঢাল বেয়ে নেমে এল আফগানরা। তাদের হাতে ছুরি, তবে আফগানদের ওপর বিমান হামলা এবং সোভিয়েত তাজিক বাহিনীর সৈন্যরা এসে পড়ায় আমরা সে যাত্রায় বেঁচে গেলাম। তখন রাজনীতিতে ক-অক্ষর গোমাংস জ্ঞানের অধিকারী কিছু নিরক্ষর লোকের সামনে শক্তিধর রেড আর্মির বিপর্যয়টাও নিজ চোখে দেখেছি। এর মধ্যে

www.pathagar.com

একদিন এক মুজাহিদ সৈন্য লন্ডন ও রাশিয়ার দখলের বলে আমার সঙ্গে জোর তর্ক করেছিল।

১৮৩৯ সালে ব্রিটিশ সরকারও রাশিয়ার ব্যাপারে বেশ দুশ্চিন্তায় ছিল। কারণ রাশিয়ার জারের সঙ্গে আফগানিস্তানের শাসক দোস্ত মোহাম্মদের বেশ দহরম-মহরম চলছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাড়ে ১৬ হাজার সৈন্য নিয়ে জেনারেল এলফিনস্টোন আফগানিস্তানে অভিযান চালালেন। উদ্দেশ্য, জারের সঙ্গে দোস্ত মোহাম্মদের সম্পর্কের অবসান ঘটানো। সৈন্য ছাড়াও এলফিনস্টোনের সঙ্গে ছিল ৩৮ হাজার অনুসারীর আর একটি দল। এলফিনস্টোন কান্দাহার দখল করে ৩০শে জুন কাবুলে প্রবেশ করলেন। আধুনিক যুগে সেবারই কোনো বিদেশী বাহিনী প্রথমবারের মতো কাবুলে প্রবেশ করেছিল, সেকালের পরাশক্তি ব্রিটেন অবাধ্য ও পরাজিত এশীয় নেতাদের নির্বাসনে পাঠিয়ে দিতেন। তাই দোস্ত মোহাম্মদকেও ভারতে নির্বাসন দেওয়া হয়। কিন্তু আফগানরা ব্রিটিশ শাসনের জোয়াল কাঁধে নেয়নি, কাবুলে গ্যারিসন স্থাপন করে এলফিনস্টোন মূর্খতার পরিচয়ই দিয়েছিলেন।

১৮৪০ সালের ১ নভেম্বর উত্তেজিত জনতা এক বাজারে আলেকজান্ডার বার্নস নামে এক ব্রিটিশ কর্মকর্তাকে কুপিয়ে হত্যা করল। মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করার পর মাথাটা একটি লাঠির আগায় গেঁথে রাখা হলো। এ সময় ৩০০ সদস্যের একটি সেনা ইউনিট আশপাশেই ছিল। তারা কোনো রকম প্রাণ হাতে নিয়ে কাবুল পৌঁছে। কয়েকদিনের মধ্যেই দোস্ত মোহাম্মদের ছেলের নেতৃত্বে ৩০ হাজার আফগান সৈন্যের একটি বাহিনী মাঠে নামলে এলফিনস্টোনের নাভিশ্বাস উঠতে থাকে। তিনি জালালাবাদে ব্রিটিশ দুর্গে নিরাপদে ফিরে যাওয়ার সুযোগের বিনিময়ে দোস্ত মোহাম্মদের মুক্তির প্রস্তাব দিলেন। আফগানরা এতে রাজি হলো। তখন চলছিল স্মরণকালের অন্যতম তীব্র শৈত্যপ্রবাহ। ওদিকে রসদপত্রও ছিল কম। এলফিনস্টোনের সৈন্য ও অনুসারীদের ১০ মাইল লম্বা কনভয় কাবুল গিরিসংকট ধরে যাত্রা শুরু করে। বস্তুত এলফিনস্টোনের কাছে খাবারদাবারের কোনো মজুদ ছিল না। আর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিটিও ছিল মিথ্যা। তুষারঢাকা নির্জন কাবুল গিরিসংকট অতিক্রম করার সময় তিনি সৈন্যদের অনুসারীদের পরিত্যাগ করলেন। ইদানীং আবিষ্কৃত বিভিন্ন রেকর্ডে দেখা যায়, তখনকার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সেনাবাহিনীর সঙ্গে অনুসারী হিসেবে যে সকল ভারতীয় মহিলা অংশ নিয়েছিল উপজাতীয় আফগানরা তাদের উপর নারকীয় হামলা চালায়। তাদের নগ্নদেহে অভুক্ত অবস্থায় রাখা হতো এবং পরে ধর্ষণের পর ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হতো। এরপর মৃতদেহগুলো খোলা আকাশের নিচে তুষারের ওপর ফেলে রাখা হতো। এলফিনস্টোন এদের রক্ষা করার কোনো চেষ্টাই তখন করেননি। সে উপায় বা শক্তিও তার ছিল না। কাবুল গিরিসংকট ধরে পরে যতবার অভিযান চালানো হয়েছে ততবারই নতুন নতুন হামলা ও গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে। আমি নিজেও একটি রাশিয়ান কনভয়ের ধ্বংসবিশেষের প্রত্যক্ষদর্শী।

এলফিনস্টোন কয়েকজন ব্রিটিশ অফিসার ও মহিলাকে নিয়ে কোনো রকমে নিরাপদে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। হাজার হাজার আফগান যোদ্ধা পুরো বাহিনীটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। শেষ ব্রিটিশ সৈন্যটিকে পর্বতের উপর নিয়ে কেটে হত্যা করা হয়। কোমরে

www.pathagar.com

ইউনিয়ন জ্যাক বেঁধে লড়তে লড়তে এক কোম্পানী কমান্ডার প্রাণ বিসর্জন দেন। কয়েকদিন পর ওই গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া একমাত্র সৈন্যটি কোনোরকমে একটি ঘোড়ায় চড়ে জালালাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথে ২ অশ্বারোহী আফগান তাকে আক্রমণ করল। আক্রমণকারীদের একজনকে আঘাত করতে গিয়ে হলিউডি ছবির কাহিনীর মতো তার তলোয়ার ভেঙে গেল। মুমূর্ষু ঘোড়াটিতে চড়ে কোনোরকমে ব্রিটিশ দুর্গে এসে পৌছেছিল। ইতিহাসে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী আর কোথাও এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়নি।

এরপরও ব্রিটিশরা আফগানিস্তানের জন্য চিনে জোঁকের মতো লেগেছিল। গ্যান্ডাম্যাক চুক্তির আওতায় আমীর ইয়াকুব খানকে কাবুল শাসন করতে দেওয়া হলো। ১৮৭৯ সালে কাবুল নগরীতে একটি ব্রিটিশ দূতাবাসও খোলা হয়। খোলার কয়েক মাসের মধ্যেই দূতাবাস অবরোধ করা হলো। দূতাবাসের লোকজন শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যান। পুরো ভবনে যখন আগুন লাগিয়ে দেয়া হলো তখন কয়েকজন ব্রিটিশ নাগরিক আফগানিস্তানের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। জ্বলন্ত দূতাবাসের ছাদের ওপর যুদ্ধরত সব ব্রিটিশকে কচুকাটা করে আগুনে পোড়ানো হয়। কাবুলে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত মেজর পিয়ের লুইস নেপোলিয়নেরও একই পরিণতি ঘটেছিল।

১৮৮০ সালে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময় সেখানে নিয়োজিত তৎকালীন ব্রিটিশ জেনারেল এলফিনস্টোনের বাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়ার স্থানটি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। এ সময় তিনি খবর পেলেন মাইওয়ান্দ নামে মরুভূমিপ্রায় এক প্রত্যন্ত এলাকায় তার ৩০ বোম্বে ইনফ্যান্ট্রিকে লড়তে হচ্ছে। সেখানে হাজার হাজার 'গাজি' আফগান যোদ্ধা ব্রিটিশ কামান ও মিশরীয় সৈন্যদের ওপর আত্মঘাতী হামলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভারতীয় ব্রিটিশ সেনাবাহিনী গোয়েন্দা রিপোর্টে এই অকুতোভয় যোদ্ধাদের আত্মাহুতি ও আক্রমণের রক্তহিম করা বর্ণনা রয়েছে। মালালেহ্ নামের এক আফগান যুবতীও ওই আক্রমণে যোগ দিয়েছিল। পুরুষরা রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে যেতে পারে মনে করে ওই যুবতী তার বোরকা ছিঁড়ে পতাকা তৈরী করে এবং পদাতিক বাহিনীর সামনের সারির সৈন্যদের ওপর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে রাইফেলের গুলিতে তাকে প্রাণ দিতে হয়। পরে ব্রিটিশরাও এ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। সেখানে ১ হাজার রাইফেল ও কমপক্ষে ৬০০ তলোয়ার খোয়া যায়।

ভারতের বিশাল সাম্রাজ্য এবং রাশিয়ার সীমান্তের মাঝখানে একটি নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এরকম অনেক খেলাই খেলেছিল। তবে এ খেলার ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতায় ভরা। যাদের সপক্ষের লোক ভাবা হয়েছে তারা কিছুদিন পরই বিরুদ্ধে চলে গেছে। আশির দশকে ওসামা বিন লাদেন যেমন পশ্চিমা মিত্র ছিলেন। ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত কাবুলের আমীর শের আলী খান ব্রিটেনের মিত্র ছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যর পক্ষে লড়াই করার জন্যও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কাবুলের এই আমীর কিন্তু পরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার অনুমতি দেননি এবং ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের লুটপাট করার জন্য ডাকাতদের উৎসাহ দিয়েছেন। ১৮৭৮ সালের ২১শে নভেম্বর এ আমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সময় বলা হয়েছিল, তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় ঘৃণা সৃষ্টির জন্য প্রকাশ্যে উসকানি দিয়েছেন।

www.pathagar.com

ব্রিটিশ দূতাবাসে হত্যাকাণ্ড চালানোর সহায়তা করে নির্মম ও কাপুরুষোচিত অপরাধ করেছেন যার ফলে আফগান জনগণের ওপর অনপনেয় কলঙ্কের বোঝা নেমে এসেছে।

গত ৪৮ ঘন্টায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এমনকি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনী ব্লেয়ারের পক্ষ থেকে যে সব বক্তব্য এসেছে তার কথা ও সুর ঠিক এরকম নয় কি ? দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের ১০০ বছর পর আফগানিস্তানে অভিযানে নেমেছিল সোভিয়েত রাশিয়ার সেনাবাহিনী। পুরো একটি দশক তারা রক্ত ঝরিয়েছে এবং এটাও সত্য যে, সোভিয়েত বাহিনীর দখলদারিত্বের সময়ই আফগানিস্তানের জনগণ গণহত্যার শিকার হয়েছে। ওসামা বিন লাদেন নিজে বেশ কয়েকবার রুশ ঘাতকদের হত্যার চেষ্টা থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছেন। আজ যখন কালো শক্তির হাত থেকে 'গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা'কে রক্ষার নতুন যুদ্ধে পশ্চিম মহলের পক্ষ থেকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সমর্থন চাওয়া হচ্ছে তখন পুতিনের উচিত, আফগানিস্তানে রুশ সামরিক অভিযান কী ধরনের বেদনাদায়ক ছিল তা বুশকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এ ধরনের কোনো প্রস্তাব দেওয়ার আগে ইতিহাসটা একটু পড়লে ভালো হয়।

সংকলিত ।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১

www.pathagar.com

আমেরিকা আক্রান্ত ঃ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমন করতে হবে

প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ

সেদিন নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনের জনগণ জেগে উঠেছে এক মনোরম প্রভাতে। শরৎকালীন আকাশ ছিল নির্মল। অন্যদিনের চেয়ে বুঝি একটু বেশি নীল। প্রাত্যহিক দৌড়ঝাঁপের মধ্য দিয়ে সবাই ছুটেছে যে যার কর্মস্থলে। কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদয় হয়নি যে, সেই নির্মল নীল আকাশ থেকে বিনা মেঘে বজ্রপাত হতে পারে। সিএনএন-এর মতো তথ্য মাধ্যমকে অবিশ্বাস্যরূপে 'America Under Attack' শিরোনামে তথ্য সরবরাহ করতে হতে পারে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক রাজধানীতুল্য নিউইয়র্কে যে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে, তা ছিল সবার কল্পনাতীত। নিউইয়র্কের বিশ্বখ্যাত বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ভবনের দু'টি টাওয়ারই ধসে পড়ে। ওয়াশিংটনের দুর্ভেদ্য মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন ভবনের একাংশও বিধ্বস্ত হয়। পররাষ্ট্র দফতরের বাইরেও একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। অনেকের ধারণা, পেনসিলভেনিয়ার জেলার্স শহরের ১২ কিলোমিটার পূর্বে যে ৭৬৭ জাম্বো জেটটি বিধ্বস্ত হয় তার গতিপথ ছিল হোয়াইট হাউস। যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। হোয়াইট হাউসে বোমা হামলার আশঙ্কায় সেখানকার অধিবাসীদের সরিয়ে নেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ নিরাপদ স্থানে সরে যান। এসব সন্ত্রাসী ঘটনায় কতজন নিহত হয়েছেন এবং কতজন আহত হয়েছেন, তার সঠিক হিসাব এখনও মেলেনি। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তা দশ হাজার ছাড়িয়ে যাবে।

বিশ্বের নেতৃবৃন্দ নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনের এই মর্মান্তিক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। নিন্দা জানিয়েছেন বাংলাদেশের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং সাবেক প্রাধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা। মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলোর নেতৃবৃন্দ সরকারিভাবে যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত এই লোমহর্ষক দুর্ঘটনায় ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেছেন। তবে এই দেশগুলোর জনগণের মধ্যে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত ঘটনাকে 'বর্বরোচিত' বলে নিন্দা

www.pathagar.com

জানালেও ফিলিস্তিনিরা রাস্তায় রাস্তায় উল্লাস প্রকাশ করেছে। সাদ্দাম হোসেনের ইরাকে জনগণ আনন্দ প্রকাশ করেছে। ইরাকের মুখপাত্র বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সারাবিশ্বে যে মানবতাবিরোধী উদ্যোগের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং নির্বিচারে অসহায় ও নিরীহ মানুষদের খুন করেছে, এটা তারই প্রতিফল। আফগানিস্তানের তালেবান কর্তৃপক্ষ এই সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন, ওসামা বিন লাদেন এই হামলার সঙ্গে জড়িত নন বলে জানিয়েছেন। তবে হামলাকারীদের এই নিখুঁত পরিকল্পনার প্রশংসা করেছেন।

প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এই হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার শপথ নিয়েছেন। তার কথায়, এই হামলা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শামিল। যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া হবে। ন্যাটোর (NATO) মহাসচিব জর্জ রবার্টসন এই হামলাকে 'অবর্ণনীয়'রূপে আখ্যায়িত করে বলেছেন, ন্যাটোর কোন সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সামগ্রিকভাবে ন্যাটোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামান্তর। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম নিকট-প্রতিবেশী কিউবার কম্যুনিস্ট নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রো এই হামলার নিন্দা করেন এবং তারপরে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন প্রতিবাদী দেশের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘকাল ধরে যে পরিকল্পিত সন্ত্রাস চালিয়েছে, এই ট্র্যাজেডি তারই পরিণাম। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ভবনে এই দুঃসাহসিক আক্রমণের পরে সারাবিশ্বে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও দূতাবাসসমূহে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সকল উল্লেখযোগ্য সরকারি ভবন থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। সকল বাণিজ্যিক ফ্লাইট বন্ধ করা হয়েছে। বিমানবাহিনীর বিমানগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে উড্ডীয়মান সন্দেহজনক বিমানকে মাটিতে নামিয়ে আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উত্তরে কানাডা ও দক্ষিণে মেক্সিকো সীমানা বন্ধ করা হয়েছে। ৭টি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ নিউইয়র্কের দিকে যাত্রা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে সকল আমোদ-প্রমোদ, বিনোদন পার্ক, হলিউড স্টুডিও, সিনেমা হলগুলো বন্ধ করা হয়। স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষিত হয়েছে। এক কথায় যুক্তরাষ্ট্রে এক ধরনের যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বুশের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'কোন কাপুরুষ যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ হানলেও আমেরিকার স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যুক্তরাষ্ট্র এখন এক পরীক্ষার মুখোমুখি এবং আমরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবই।'

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি ও শক্তিমত্তার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত করেছে। এক, বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি বটে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এখন আর দুর্ভেদ্য কোন দুর্গ নয়। একদিকে প্রশান্ত মহাসাগর এবং অন্যদিকে আটলান্টিক মহাসাগর পরিবেষ্টিত যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর ও দক্ষিণে দুর্বল ও নির্ভরশীল রাষ্ট্র কর্তৃক বেষ্টিত যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে যেভাবে বিশ্বময় চিত্রিত করে এসেছে, যেভাবে নিজেকে দুর্ভেদ্য, অজেয় এবং চিরঞ্জীব বলে চিহ্নিত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে, এই হামলা তার বেশ খানিকটা দমিয়ে দিয়েছে। দুই. ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রান্তসীমায় পার্ল হারবারে আক্রমণের পরে যুক্তরাষ্ট্রের হার্টল্যান্ডে সেদিনের হামলা, বিশেষ করে পেন্টাগনে সরাসরি আক্রমণে, যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকদের অক্ষমতা ও ব্যর্থতা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

এই মুহূর্তে অনেকের প্রশ্ন কিভাবে এটা হতে পারল ? যে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো

www.pathagar.com

বিশ্বময় মোড়লি করে ফিরেছে এতদিন, বিশ্বের ছোট-বড় অসংখ্য জনপদের তথ্যসম্ভারে সুসজ্জিত হয়ে অনেক জনপদের নেতানেত্রীর ত্রাস হিসাবে মাঝে মাঝেই আবির্ভূত হয়েছে, নিজের ঘর সামলাতেই যারা ব্যর্থ কিসের দক্ষতা তাদের ? সমগ্র ঘটনাটি যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের ভাবমূর্তি ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে। হামলাকারীরা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেই যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ছিনতাই করে নিখুঁতভাবে সুনির্দিষ্ট টার্গেটে আঘাত করল। আঘাত করল বিশ্বের সবচেয়ে সুরক্ষিত কার্যালয় পেন্টাগনে এবং তাও বেশ কিছু সময় ধরে-এসব কিসের লক্ষণ ? এ তো পরাশক্তিসুলভ দক্ষতার পরিচায়ক নয়। তিন. ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলবে বলে মনে হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের থাকে কিছু বন্ধু, কিছু থাকে শত্রু। যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত সন্ত্রাসী কার্যকলাপে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত যারা করেছেন, তাদের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় সবাই এই হামলার নিন্দা করেছেন বটে, কিন্তু ইরাক, ফিলিস্তিন, কিউবা বা তালেবান আফগানিস্তানের নেতৃবৃন্দ একদিকে যুক্তরাষ্ট্রে হামলাকে যেমন নিন্দা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সংঘটিত হামলারও নিন্দা করেছেন। এই গ্রুপে রয়েছে কম্যুনিস্ট ফিডেল ক্যাস্ট্রো এবং মুসলিম বিশ্বের বেশ কয়েকজন নেতা। কোন কোন মহল বৃহৎ যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইসরাইলকে ব্র্যাকেট করে কথা বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্ষদে এসব বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ হতে থাকবে বেশ খানিক দিন। চার. আজকের প্রযুক্তি যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং তা যতটুকু বিশ্বজনীন হয়ে পড়েছে, সে পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব জনমতের প্রত্যাশার সঙ্গে সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হলে আজকের বিশ্বে একক পরাশক্তি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের যে ভূমিকা তা ম্লান হতে বাধ্য। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরে আসারও সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে অদূর ভবিষ্যতে। পাচ. যুক্তরাষ্ট্রে এই হামলার জন্য কারা দায়ী, এ নিয়ে চলছে তুলকালাম অনুসন্ধান।

গোয়েন্দাদের দৃষ্টি এখন ওসামা বিন লাদেনের দিকে। যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি জনসমষ্টির দৃষ্টি ফিলিস্তিনিদের ওপর। প্রশাসনের একাংশ ইরাকের সাদ্দাম হোসেনকে দায়ী করতে ব্যস্ত। কেউ কেউ বলেন, এমন নিখুঁত দুষ্কর্মটি আমেরিকার দক্ষিণপন্থীদের পক্ষেই শুধু সম্ভব। দক্ষিণ আমেরিকার ড্রাগ-ডনদের কাজ বলেও কেউ কেউ মনে করেন। তা যাই হোক, সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের পূর্বে, সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সব দিক দীর্ঘদিন ধরে ভেবে-চিন্তে না দেখে, কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী উপস্থিতির পরিপন্থী হয়ে উঠতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র মুসলিম বিশ্বের সমর্থন হারাতেও পারে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের এবং মধ্য এশিয়ার জ্বালানি শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণও হারাতে পারে। তখন যুক্তরাষ্ট্র অতীতের মতো ঘরমুখো বিচ্ছিন্নতাবাদী (Isolationist) সমৃদ্ধ এক জনপদের অবস্থানেও ফিরে যেতে পারে। পরাশক্তি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ম্লান হয়ে উঠতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের জীবনে এই দুর্ঘটনা এক ধরনের ওয়াটারশেডের (Watershed) মতোই। যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের জন্য এটি এক চ্যালেঞ্জস্বরূপ। অত্যন্ত সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় তাদের এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। চুপচাপ থাকলেও তা মর্যাদাহানিকর হয়ে উঠবে। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অবিবেচনাপ্রসূত কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দৃঢ়সংকল্প হলেও তা কাউন্টার প্রোডাক্টিভ হয়ে উঠতে পারে। বিশ্বের অন্যান্য উঠতি শক্তিকেন্দ্র অত্যন্ত

www.pathagar.com

আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যুক্তরাষ্ট্র কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই মুহূর্তে কিন্তু আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বিজয়ী হয়েছে। এর মাথা নত করাতেই হবে। সন্ত্রাসের জবাব কি সন্ত্রাস দিয়ে হবে, না অন্য কোন প্রক্রিয়ায়। এটি এই মুহূর্তের মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন। যুক্তরাষ্ট্র এর সঠিক জবাব খুঁজে পেলে বুঝতে হবে এখনও তা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, বৈভব-প্রাচুর্যে, শক্তিমত্তা-প্রভাবে এবং দূরদর্শিতায় পরাশক্তি বটে। ভুল করলে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তির পর্যায়ে অবনমিত হওয়ার সম্ভানা রয়েছে। চীন, জাপান, রাশিয়া, ইউরোপ তাই গভীর মনোযোগের সঙ্গে জর্জ বুশের পরবর্তী পদক্ষেপের প্রতি নজর রেখেছে। ❑

লেখক ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

১৯ সেপ্টেম্বর '০১

বিশেষ মুহূর্তে মোল্লা ওমর।

www.pathagar.com

কোন পথে আফগানিস্তান ?

(দুই)

আফগানিস্তানে তালেবানদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটলো। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক কোয়ালিশনের প্রত্যক্ষ মদদে উত্তরাঞ্চলীয় জোট (Northern Alliance) আফগানিস্তানের ৩১টি প্রদেশের ২৭টিতে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। ৭ অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করে, 'আধামৃত' আফগানিস্তানে ১১ সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার এবং ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিশোধের নিমিত্তে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তিসুলভ 'হাইটের মারণাস্ত্র' প্রয়োগ শুরু করেছিলো। সে মিশনও এখন সমাপ্ত প্রায়। বাকি শুধু দক্ষিণ আফগানিস্তানের কোনো অজ্ঞাত স্থানে আত্মগোপনকারী তালেবান নেতা মোল্লা ওমর এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের কথায় 'প্রাইম সাসপেক্ট' ওসামা বিন লাদেনকে জীবন্ত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রমে বিচার করা। এ জন্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের কিছু দক্ষ সৈনিকও আফগানিস্তানের মাটিতে নেমে পড়েছে। তাছাড়া, তালেবানি স্টাইলের 'ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি'র পরিবর্তে আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে 'আধুনিকতার আলোয়' চারদিক উদ্ভাসিত করার ব্যবস্থা গৃহীত হতে যাচ্ছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে গত ২৭ নভেম্বর জার্মানির বনে আফগানিস্তানের বিভিন্ন জাতি ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনও হয়েছে। পাশ্চাত্যের ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আন্তর্জাতিক কোয়ালিশনের বিজয় তাই ঘোষিত হচ্ছে তারস্বরে।

অন্যদিকে জোরেশোরে প্রচার করা হচ্ছে যে, পাঁচ বছরের জমাট বাঁধা অন্ধকার ভেদ করে আফগানিস্তানে নতুন আলোর সূর্যোদয় সর্বস্তরে দৃশ্যমান। কাবুলের যে সকল মাঠে প্রকাশ্যে তালেবানরা মানুষ হত্যা করতো সেই সকল মাঠে এখন ফুটবল খেলার আয়োজন হয়েছে। রাস্তাঘাটে শোনা যাচ্ছে সঙ্গীতের সুর মূর্ছনা। রেডিও-টেলিভিশনের কার্যক্রম আবারো শুরু হয়েছে। সবাই ময়লা মুছে ফেলে টেলিভিশনের সামনে বসে গোটা বিশ্বকে নতুন আলোকে অবলোকন করছে।

পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে, বোরখা খুলে ফেলে মহিলারাও রাস্তায় নেমে এসেছে। অন্যকথায়, সেই সনাতন, সঙ্কীর্ণচিত্ত, মৌলবাদী তালেবানি আফগানিস্তানের ভস্মস্তূপ থেকে বেরিয়ে আসা শুরু হয়েছে আধুনিক, অগ্রগামী, আলোকোজ্জ্বল নতুন

www.pathagar.com

আফগানিস্তান। পাশ্চাত্যের তথ্য মাধ্যমগুলোর এসব নতুন নতুন তথ্যের ছিটেফোঁটা এদেশেও আসছে। ভাবখানা এই যে, তালেবানদের পরিবর্তে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কর্তৃত্বে আফগানিস্তানে সুদিন ফিরছে। দিনে দিনে আধুনিক আফগানিস্তানের মতে বাতায়ন উন্মুক্ত হচ্ছে। আর দুঃখ কিসের ? দুর্দিন শেষ হয়ে এলো। সন্ত্রাসের পরিবর্তে আফগানিস্তানে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। শান্তির দূত হিসেবে আন্তর্জাতিক কোয়ালিশন আফগানিস্তানে আবির্ভূত হয়েছে।

মানুষের স্মৃতি ক্ষণস্থায়ী বটে, কিন্তু কতোটকু ক্ষণস্থায়ী ? মাত্র পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনাবলী পর্যন্ত কি স্মৃতি ধারণ করে না ? হয়তো করে। সম্ভবত এ কারণেই কাবুলের জনসাধারণ উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কর্মকর্তা ও সদস্যদের আধিপত্যে এরই মধ্যে এতো ভীত হয়েছে, এতো সন্ত্রস্ত হয়েছে। এই ব্যক্তিরাই ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত কাবুলের হর্তাকর্তা-বিধাতা ছিলেন। ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এবং তারাই লুটপাট, ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ডের মতো নৃশংস অপরাধে ছিলো অপরাধী। গণধর্ষণ ও গণহত্যার মতো অপরাধের মাত্রা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, আফগানিস্তানের জাতীয় বিবেক স্তম্ভিত হয়।

১৯৯৬ সালে একমাত্র কাবুলেই এই জোটের সদস্যদের দ্বারা অন্যূন পঞ্চাশ হাজার আদম সন্তানের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং প্রায় পনেরো হাজার শিশু ও নারীর সম্ভ্রমহানিতে আতঙ্কিত হয়েই কাবুলের অধিবাসীরা তালেবানদের স্বাগত জানায়। তালেবানদের শাসনামলে অন্তত পক্ষে ধর্ষণের পাপ আফগানিস্তানের সমাজ জীবনকে আর স্পর্শ করে নি, যদিও নৃশংসতায় তারা উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সদস্যদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলো না। তবে উত্তরাঞ্চলীয় জোট নেতা জেনারেল রশীদ দোস্তামের সঙ্গে কারো তুলনা চলে না। ১৯৯৭ সালে তারই নির্দেশে হাজার হাজার যুদ্ধবন্দিকে মধ্যযুগীয় বর্বর পন্থায় হত্যা করা হয়েছিলো। সন্দেহভাজনদের দ্রুতগামী ট্যাঙ্কের সঙ্গে বেঁধে মাইলের পর মাইল এমনভাবে নির্যাতন করা হতো যার ফলে তাদের দেহ টুকরো টুকরো হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেতো। এসব তিনি প্রকাশ্যেই করতেন যেনো অন্যদের সামনে তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। তালেবানদের হটিয়ে আফগানিস্তানে এখন রশীদ দোস্তামের মতো ব্যক্তিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ অবস্থা কতোদিন চলবে কে জানে!

এ পর্যন্ত আফগানিস্তানে যা ঘটেছে তা যদি আফগান জনগণের দ্বারা ঘটতো, তাহলে কারোর কিছু বলার ছিলো না। জনগণের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান যে পর্যায়ের সেই ধরনের সরকারই তারা লাভ করে। আফগানিস্তানে বিরাজমান অবস্থার সৃষ্টিকর্তা নর্দার্ন এলায়েন্স বা উত্তরাঞ্চলীয় জোট নয়, নয় তালেবান গোষ্ঠীও। আফগানিস্তানের সাধারণ জনগণ তো নয়ই। এ জন্যে মোল্লা ওমর অথবা ওসামা বিন লাদেন কতোটুকু দায়ী তা সময়ই নির্ধারণ করবে, কিন্তু জর্জ বুশের যুক্তরাষ্ট্র যে এর প্রধান নায়ক তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এও বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের মূল টার্গেট বিন লাদেন নয়, মূল টার্গেট হলো আফগানিস্তান তথা মধ্য এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের একটা ছোট্ট অথচ নিরাপদ ঘাঁটি। ১১ সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে যা ঘটেছে তা যে ওসামা বিন লাদেনের মতো ব্যক্তির নেতৃত্বে সম্ভব নয় তা যুক্তরাষ্ট্র জানে।

তাই বিন লাদেনকে 'প্রাইম সাসপেক্ট' হিসেবে চিহ্নিত করলেও কোনো প্রমাণ উপস্থাপনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো সময়ে আগ্রহী হয় নি। তাকে ধরার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র বহুসংখ্যক মিত্র

www.pathagar.com

সহযোগে একটা ফুলস্কেল যুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছে-তাও অত্যন্ত অস্বাভাবিক, বিশেষ করে যখন দেখি, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রটি যুদ্ধ করছে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্বল, অসহায় ও দুস্থ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। যুক্তরাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবীরাও এই অজুহাতকে ধর্তব্যের মধ্যে নেয় না। নোয়াম চমস্কি তো জোরেশোরে উচ্চারণ করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ওসামা বিন লাদেনকে কখনো জীবন্ত ধরবে না, কেননা তখন বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে অকাট্য কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই।

তালেবানদের হটিয়ে এবং এখন পর্যন্ত অনুগত উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন করে, আফগানিস্তানে একটি ব্যাপকভিত্তিক সরকার গঠন প্রক্রিয়ার আড়ালে যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থানকে স্থায়ী করার সংকল্পই এই যুদ্ধের মূল লক্ষ্য। বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে এবং ভূমণ্ডলীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র মধ্য এশিয়া (Central Asia) সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। মধ্য এশিয়ার বিপুল পরিমাণ তেল ও গ্যাস সম্পদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

মধ্য এশিয়ার ৬টি মুসলিম রাষ্ট্রে রুশ নিয়ন্ত্রণ এতোই ব্যাপক যে, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে নিরাপদে পা ফেলা সম্ভব নয়। যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে, একুশ শতকের বৃহত্তর অংশ জুড়ে জ্বালানি ক্ষেত্রে তেল ও গ্যাসই থাকবে মুখ্য ভূমিকায় এবং যে ক্ষেত্রে তেল ও গ্যাসের মজুদ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে ওসব ক্ষেত্রে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বুশের পিতা সিনিয়র বুশ মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে স্থিতিশীল করেছিলেন কুয়েত দখল মুক্ত করার অজুহাতে ইরাকের বিরুদ্ধে উপসাগরীয় যুদ্ধে। ওই যুদ্ধের ফলে উঠতি ইরাকের সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত হয়। মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে। সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত ও ওমানে স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি স্থাপিত হয়। পারস্য উপসাগর, আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরে রণতরীসহ যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক উপস্থিতি স্থায়ী হয়ে ওঠে। তখন অজুহাত ছিলো ইরাকের কুয়েত দখলের মতো নির্বুদ্ধিতা।

এখনকার অজুহাত কিন্তু সন্ত্রাস নিরোধ। যারা সন্ত্রাসে লিপ্ত অথবা যারা সন্ত্রাসীকে সহায়তা দান করে, আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে থাকে তারাও সন্ত্রাসী। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের মতে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হবে। তাদের বিচার করতে হবে। সন্ত্রাস নির্মূল করতে হবে। সন্ত্রাসীকে শায়েস্তা করতে হবে এবং এ জন্যে সকল পন্থা গ্রহণযোগ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নৈতিকতা একটু ভিন্ন। জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখতে গিয়ে একটানা দশ বছর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ করে দেশটাকে ছারখার করলেও তা সন্ত্রাস নয়। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে এবং যুদ্ধের পরবর্তী নিষেধাজ্ঞা পর্বে লাখ লাখ ইরাকী শিশু, নারী-পুরুষ ও বৃদ্ধ নিহত হলেও তা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্বে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরেও অনুশোচনায় পীড়িত হয় নি যুক্তরাষ্ট্রের বিবেক। আর ধরে নেয়া যদি যায় যে, ওসামা বিন লাদেনই দায়ী ১১ সেপ্টেম্বরের দুর্ঘটনার জন্যে। তার পরেও কি সেই একটি 'সন্ত্রাসীকে ধরার জন্যে আফগানিস্তানে হাজার হাজার নর-নারীকে হত্যা করে।

এই ধ্বংসযজ্ঞ কি সমর্থনযোগ্য? এ প্রশ্নের উত্তর কারো জানা নেই। তারাও জানে না।

www.pathagar.com

তবে এটুকু তাদের জানা হয়ে গেছে যে, মধ্য এশিয়ার তেল ও গ্যাস সম্পদে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা চাই। মধ্য এশিয়ার ৬টি মুসলিম রাষ্ট্রেই-আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাখস্তান ও কিরঘিজিস্তানে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ তেল ও গ্যাস। এক আজারবাইজান থেকেই সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নের তেলের চাহিদা মিটতো। মধ্য এশিয়ার তেল ও গ্যাসের ওপর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ত্রিবিধ। এক. বিশ্বব্যাপী আধিপত্য সংরক্ষণের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিজের প্রয়োজন। দুই. প্রয়োজনবোধে মিত্র রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থে এর ব্যবহার। তিন. প্রতিযোগী অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যেও তেল ও গ্যাসকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার।

তাছাড়াও মধ্য এশিয়ার কৌশলগত অবস্থানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে রাশিয়া, অন্যদিকে চীন এবং অপরদিকে ভারত-অবস্থানগত গুরুত্বের জন্যে ভূ-মন্ডলীয় রাজনীতিতে তারা এই শতকে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী হতে পারে। এই মধ্য এশিয়ার প্রবেশদ্বার যেহেতু আফগানিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকেই একদিকে চীন ও অন্যদিকে রাশিয়ার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, তাই আফগানিস্তান যে যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারকারী ব্রিটেন আফগানিস্তানকে প্রায় আড়াইশ' বছর চেষ্টা করেও কব্জা করতে ব্যর্থ হয়েছে। রাশিয়া মধ্য এশিয়া দখলে আনলেও আফগানিস্তানকে গ্রাস করতে ব্যর্থ হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের অন্যতম কারণ হচ্ছে আফগানিস্তানে দশ বছরব্যাপী যুদ্ধ। ব্রিটেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন যা পারে নি যুক্তরাষ্ট্র তাই সম্ভব করতে কৃতসংকল্প। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশ করে আফগানিস্তানে ঠিক সে প্রক্রিয়া কার্যকর হয় নি। সৌদি আরব ও কুয়েতের মতো আফগানিস্তানের নিকটতম প্রতিবেশী ইরান ও পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ জানায় নি। আমন্ত্রণ জানায় নি আফগানিস্তানের আরো তিনটি নিকটতম প্রতিবেশী-উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান। তারপরেও যুক্তরাষ্ট্র ঢুকেছে আফগানিস্তানে, মধ্য এশিয়ার গন্তব্যে।

আফগানিস্তানে প্রবেশ পথে প্রথমে পাকিস্তানকে ঘুষ দিতে হয়েছিলো বটে, পরবর্তীকালে তারও প্রয়োজন হবে না, কেননা পরিস্থিতি এমনভাবে সাজানো হচ্ছে যেনো পাকিস্তান বিশ্বস্ত মিত্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে স্থায়ীভাবে থাকতে দিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্রেও হয়তো যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এরই মধ্যে উজবেকিস্তানে মার্কিন সৈন্যের সমাবেশ ঘটেছে। তাজিকিস্তানেও মার্কিন সৈন্য রয়েছে। প্রথমে ভারতও আগ বাড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে তার ভূমি ও আকাশ ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। তোষামোদিতে পাকিস্তানের কাছে যেনো হেরে না যায় তা স্মরণে রেখে কে কতোটুকু সহায়তা দেবে সে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার এই অঞ্চলে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেবে তা নির্ভর করছে আফগানিস্তানের ভবিষ্যতের ওপর।

আফগানিস্তান কি অখণ্ড থাকবে ? খণ্ডিত হলে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেমন হবে ? এসব প্রশ্ন এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। জাতিসংঘের উদ্যোগে আজ থেকে জার্মানিতে যে সম্মেলন বসছে তাতে কোন্ কোন্ নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকছে তা জানা না গেলেও এটি সুস্পষ্ট হয়েছে, উত্তরাঞ্চলীয় জোটের প্রতিনিধিত্ব থাকছে সবচেয়ে বেশি-

www.pathagar.com

এমন বেশি যে তারাই যেনো সম্মেলনে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। যুক্তরাষ্ট্র চাইবে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থায় আফগানিস্তানের বিতাড়িত রাজা জহির শাহকে প্রধান করতে। পাকিস্তান খুব খুশি না হয়েও সম্ভবত জহির শাহকে সমর্থন করবে শুধুমাত্র এই কারণে যে, রাজা জহির শাহ্ পশতু ভাষীদের প্রতিনিধি এবং এই গ্রুপের ব্যক্তিরাই আফগানিস্তনে সর্বাধিক। রাশিয়া, ইরান ও ভারতের অংশগ্রহণও ব্যাপক, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সমর্থনভিত্ হিসেবে।

ভারত এরই মধ্যে তার প্রতিনিধিদলকে কাবুল পাঠিয়েছে। কিন্তু আফগানিস্তানকে ঘিরে দীর্ঘ ২০ বছরে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি এতোই ভিন্ন যে, কোনো পর্যায়ে ঐকমত্যের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। রাজা জহির শাহ্ এবং রাব্বানীর পারস্পরিক সম্পর্ক দা-কুমড়ার। আফগানিস্তান প্রশ্নে দিল্লি ও ইসলামাবাদের দূরত্ব হাজার যোজন। তেহরান ও তাসখন্দের ভাবনা-চিন্তায় দেখা যায় আকাশ-পাতাল ফারাক।

সব মিলিয়ে মনে হয়, আফগানিস্তান বিভক্ত হতে যাচ্ছে। হিন্দুকুশ পর্বত বরাবর উত্তর আফগানিস্তান ও দক্ষিণ আফগানিস্তান-এ দু'ভাগে বিভক্ত হতে চলেছে বলে মনে হয়। উত্তরাঞ্চলে তাজিক-উজবেক-হাজারা গ্রুপ এবং দক্ষিণে পশতুন অধ্যুষিত আফগানিস্তান। আজকের সমস্যাসঙ্কুল আফগানিস্তানে সমাধান যদি এমনি হয় তা হলে তার প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যতে আরো মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সমগ্র অঞ্চল হয়ে উঠতে পারে অস্থিতিশীল।

১১ সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসের যে বীভৎস রূপ সবাই দেখেছে, সমগ্র মধ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াব্যাপী তেমনি সন্ত্রাসের ভয়াবহতা বিস্তৃত হতে পারে। আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্ক আরো হিংসাত্মক হতে পারে। আমার মনে হয়, একুশ শতকের প্রথম যুদ্ধের চেয়ে আরো ভয়াবহ যুদ্ধের উর্বর ক্ষেত্র তৈরি হতে চলেছে জার্মানিতে। কে জানে ভবিষ্যতের আফগানিস্তানে আজকের তালেবানদের চেয়ে অধিক প্রভাবশালী তালেবান গ্রুপের জন্যে ভূমি কর্ষিত হচ্ছে! ❑

২ ডিসেম্বর '০১

www.pathagar.com

অবিচারই সন্ত্রাসের মূল কারণ

এডওয়ার্ড সাঈদ

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী ফিলিস্তিনী লেখক, মনীষা। বর্তমানে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। খ্যাতনামা আখ্যান-গ্রন্থ 'ওরিয়েন্টালিজম'এর লেখক হিসেবে ইনি বিশেষভাবে পরিচিতি। পশ্চিমের প্রাচ্যবীক্ষার অন্তর্নিহিত কূটকৌশল 'ওরিয়েন্টালিজম'এর মূল প্রতিপাদ্য।

নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে (আংশিকভাবে) ভয়াবহ আতঙ্কের ঘটনাটি সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায় একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। এমন ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। কোন রকম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া সন্ত্রাসীরা এ ধরনের যুক্তিহীন ধ্বংসলীলা আগে চালায় নি। কারা এ কাজ করল, তাদের মিশনই বা কী তাও জানা যায়নি।

ব্যাপক আতঙ্ক, ভয়, ক্ষোভ ও শোকের এ দিনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত নিউইয়র্ক নগরের বাসিন্দারা বহুদিন মনে রাখবেন। ধ্বংস ও মৃত্যু অনেকের জন্য যে দুঃখ ও শোক বয়ে এসেছে, তাও চিরস্থায়ী হবে। নিউইয়র্কবাসীর সৌভাগ্য, রুডি জিউলিয়ানির মতো একজন লোক বর্তমানে এ নগরীর মেয়র। অনেকের কাছে জিউলিয়ানিকে বিরক্তিকর, পশ্চাদগামী ও ঝগড়াটে স্বভাবের মনে হতে পারে, কিন্তু এ দুর্যোগের সময় তিনি দ্রুত যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন তার সঙ্গে কেবল চার্চিলের ভূমিকার তুলনা চলে। ভাবাবেগ বর্জন করে, ঠাণ্ডা মাথায় অসাধারণ সহানুভূতির সঙ্গে নগরীর পুলিশ, দমকল ও জরুরি সেবাপ্রদানকারীদের পরিচালনা করেছেন। এতে তার সম্মান আরো বেড়েছে।

কিন্তু হায়, ব্যাপক প্রাণহানি ঠেকানো যায়নি। নগরীর বিপুল সংখ্যক আরব ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আতঙ্ক সৃষ্টি ও মারমুখী হামলার ব্যাপারে জিউলিয়ানের কণ্ঠ থেকেই সর্বপ্রথম সাবধান বাণী শোনা গেছে। স্বাভাবিক জীবন যাত্রা আবার শুরুর প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান এবং দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয়টাও তিনি দিয়েছেন সবার আগে। টেলিভিশনের সংবাদচিত্র ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রাণহানির ঘটনার আতঙ্ককে যুক্তরাষ্ট্রের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। সংবাদ বিশ্লেষক ও মন্তব্যকারীরা যুক্তরাষ্ট্রের সামনে আগামীতে কী ধরনের সম্ভাব্য বিপর্যয় আছে কিংবা আরো কী ঘটতে পারে তা তুলে ধরেছেন। অনেকে বেশ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বর্ণনা দিয়েছেন। এর গভীর প্রভাবও

www.pathagar.com

পড়েছে মার্কিন নাগরিকদের মনে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে ক্রোধ, ক্ষোভ ও অসহায়ত্ববোধের পাশাপাশি আবার প্রতিশোধ গ্রহণ এবং বেপরোয়াভাবে সমুচিত জবাবদানের একটি স্পৃহাও জেগেছে।

শোক প্রকাশ এবং দেশপ্রেমের স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতা, স্বীকৃত পণ্ডিত ব্যক্তি এবং বিশেষজ্ঞরা বারবার সন্ত্রাসবাদ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ বন্ধ না করা, আক্রমণে নিবৃত্ত না হওয়া কিংবা হার না মানার কথা বলেছেন। সবাই বলেছেন, এটা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু কোথায় কোন ফ্রন্টে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এ যুদ্ধ চালাতে হবে সেটাই প্রশ্ন। মধ্যপ্রাচ্য এবং ইসলামের দিকে অস্পষ্ট ইঙ্গিত ছাড়া প্রশ্নের কোনো সঠিক জবাব পাওয়া যায় না। কেবল বলা হয়েছে, আমরা এদের বিরুদ্ধে এবং সন্ত্রাসবাদকে অবশ্যই ধ্বংস করে দিতে হবে।

কিন্তু সবচেয়ে হতাশার ব্যাপার হলো, সারা বিশ্বে এবং আটলান্টিকের দুই তীর বাদে বাকি বিশ্বের জটিল পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা উপলব্ধিতে খুবই কম সময় ব্যয় করা হয়েছে। গড়পড়তা মার্কিন নাগরিকরা দূর দেশের লোকজন ও সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। তাদের এক রকম বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই রাখা হয়। আমেরিকাকে পরাশক্তি না বলে ঘুমন্ত দানব বলা যায়। ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র তারা সবসময় নিরন্তর যুদ্ধ কিংবা কোনো না কোনো রকমের সংঘাতে জড়িত ছিল। ওসামা বিন লাদেনের নাম ও চেহারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের কাছে পরিচিত। বিন লাদেন ও তার অজ্ঞাত পরিচয় যোদ্ধারা আজ নিন্দা ও ঘৃণার প্রতীক। কিন্তু তাদের যে একটা অতীত পরিচয় ছিল তা বেমালুম ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। রণোন্মাদনা সৃষ্টির জন্য অবধারিতভাবে যৌথ কল্পনাকে কাজে লাগানো হয়েছে। এর সঙ্গে মবি ডিক নামে তিমিটির খোঁজে ক্যাপ্টেন আহাবের গৃহীত কৌশলেরই তুলনা চলে।

এই প্রথমবারের মতো কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজ দেশে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। আর এর জন্য হঠাৎ করে সংঘাতের ভূগোলও পাল্টে গেল। এখন প্রতিপক্ষের যেমন দৃশ্যত কোনো পরিচয় নেই, তেমনি তার কোনো ভৌগোলিক সীমানাও দেখা যাচ্ছে না। এমন একটি প্রতিপক্ষ ভবিষ্যতে আর কী প্রলয় ডেকে আনতে পারে তা সংযমহীন ভাষায় বর্ণনা করা হচ্ছে। অথচ যুদ্ধের দামামা পেটানোর বদলে পরিস্থিতিকে যুক্তিপূর্ণ উপায়ে বোঝার চেষ্টা করাটাই বেশি দরকার। কিন্তু জর্জ ডব্লিউ বুশ ও তার দলবল পরিষ্কারভাবে যুদ্ধই চাচ্ছেন। ওদিকে ইসলামী ও আরব বিশ্বের অধিকাংশ লোকের কাছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার আর উদ্ধত শক্তি সমান অর্থ বহন করে। তারা আরো জানে যে, এই দেশটি কেবল ইসরাইল নয়, আরব বিশ্বের নিপীড়নমূলক সরকারগুলোকে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে এবং ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন ও প্রকৃত ভুক্তভোগীদের সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনা থাকলেও তাতে কর্ণপাত করে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার বিরোধিতা করাকে আধুনিকতার প্রতি ঘৃণা কিংবা প্রযুক্তির প্রতি ঈর্ষা বলা যায় না। যুক্তরাষ্ট্র আরোপিত নিষেধাজ্ঞায় ইরাকি জনগণের দুর্ভোগ এবং মার্কিন মদদে গত ৩৪ বছর যাবৎ ফিলিস্তিনি এলাকার ওপর ইসরাইলের দখলদারিত্বসহ আরো অনেক হস্তক্ষেপ ও লুণ্ঠনের ঘটনাই এ মার্কিন বিরোধিতার মূল কারণ।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষয়ক্ষতির ঘটনার সুযোগে ইসরাইল এখন ফিলিস্তিনিদের ওপর সামরিক

www.pathagar.com

অভিযান ও নিপীড়ন আরো জোরদার করেছে। সন্ত্রাসবাদের ওপর জোর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক আলোচনায় এই বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তেমনিভাবে অনুচ্চারিত থেকেছে অনেক মহলের নোংরা বৈষয়িক স্বার্থ। তেল ও প্রতিরক্ষা শিল্প এবং ইহুদিবাদী লবিগুলো পুরো মধ্যপ্রাচ্যের ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে কেউ কোনো কথা বলছেন না।

আধুনিক যুগের ইতিহাসে দেখা যায়, সংগ্রামের কোনো না কোনো পর্যায়ে সন্ত্রাসের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এএনসি একসময় সন্ত্রাসের পথ ধরেছিল। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরুতে ইহুদিবাদীরা সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়েছিল। একইভাবে নিরীহ বেসামরিক লোকের ওপর এফ-১৬ বিমান থেকে বোমাবর্ষণ এবং হেলিকপ্টার গানশিপ নিয়ে হামলা চালানোও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড।

ইতিহাস ও যুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে সন্ত্রাসকে কেবল ধর্ম ও অজ্ঞাত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে লঘুভাবে একটি মিথ সৃষ্টি করা খুবই মন্দ কাজ। যুক্তরাষ্ট্রেই হোক আর মধ্যপ্রাচ্যেই হোক, ইহজাগতিকভাবে সচেতন মহলকে এ বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কোন ধর্ম, কোন রাজনীতি, কোন আদর্শই নিরীহ লোককে পাইকারি হারে হত্যার কাজকে অনুমোদন দেয়নি। কেবল কিছু লোকের ছোটো খাটো কোনো গ্রুপ কারো কাছ থেকে কোন রকম ম্যান্ডেট না নিয়েই এ ধরনের কাজ করতে পারে। এর দায়-দায়িত্বও কেবল তাদের।

পথের ভিন্নতা মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে। তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরাও নানা মত ও পথের অনুসারী। মত ও পথের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতিগত গোষ্ঠীগুলো নিষ্ফলভাবে হলেও তাদের নিজ নিজ পরিমণ্ডল গড়ার চেষ্টা চালায়। আর ইতিহাসও কেবল কোনো জনপ্রিয় নেতা ও তার অনুসারী কিংবা বিরোধীদের নিয়েই রচিত হয় না। এ ক্ষেত্রে ইতিহাস আরো জটিল এবং পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মীয় কিংবা আদর্শবাদী মৌলবাদীদের নিয়ে মুশকিল হলো যে, তারা হত্যা করা ও নিহত হওয়ার অঙ্গীকারপূর্ণ বিপ্লব ও প্রতিরোধের যে পুরনো ধারণাকে লালন করছে তা আজকের উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে অনায়াসে কার্যকর করা যায়। অনায়াসে প্রতিশোধও নেয়া যায়। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে দরকার একটি বিচক্ষণ নেতৃত্ব যা শিক্ষা, ব্যাপক জনমত গঠন ও ধৈর্যশীল সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব দেয়। আর সাধারণত মোহময় চিন্তাভাবনা ও দ্রুত রক্তাক্ত সমাধানের বাহুবাপূর্ণ কাজে দরিদ্র ও বেপরোয়া স্বভাবের লোকেরাই আকৃষ্ট হয়। এই ক্ষেত্রে কিন্তু উল্টোটাই ঘটল।

অন্যদিকে ব্যাপক সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বিচক্ষণতা ও নৈতিক আদর্শের গ্যারান্টি দিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র যখন কোমর বেঁধে লড়াইয়ে নামার তোড়জোড় করছে, তখন এ নিয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারীদের বক্তব্যগুলোকে কেউ আমল দিচ্ছে না। মার্কিন মিত্র দেশগুলোরও একই অবস্থা। এক অজ্ঞাত স্থানে একটি অনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য সবাই লড়তে প্রস্তুত। অথচ সব ধরনের উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও মত ও পথের উর্ধ্বে উঠে বিদ্যমান সীমিত সম্পদের ভিত্তিতেই ভাগ্যকে ভাগাভাগি করে গড়ে

www.pathagar.com

তোলার দরকারটাই এখন বেশি।

ইসলাম অন্ধভাবে অনুসরণ করা যায় না। কেউ কেউ হয়তো তা করবে। যারা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং অবিচার ও নিপীড়নের ওপর নির্ভরশীল, ইতিহাসের দিকে তাকাবে না ভবিষ্যৎ প্রজন্মই তাদের সমালোচনা করবে। প্রতিপক্ষকে দানবে পরিণত করে তোলা কোনো সুস্থ রাজনীতির ভিত্তি হতে পারে না। অবিচারই সন্ত্রাসের মূল কারণ। সেই কারণগুলো দূর করে সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত ও নিষ্ক্রিয় করে সমস্যার সমাধান করা যায়।

১৯ সেপ্টেম্বর '০১

বিধ্বস্ত জনপদের মানুষ।

www.pathagar.com

শুভ ও অশুভ নয়, প্রভু ও ভৃত্য, অথবা আফগানিস্তানে মার্কিন যুদ্ধের আগাম ফলাফল

সলিমুল্লাহ খান

জনসাধারণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত না হলেও বাংলাদেশের বর্তমান সরকার আইনের বিধান অনুসারে গঠিত। তাই জাতির নিয়তি কাঁপানো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে এই সরকারেরও উচিত ছিল জনসাধারণের মত কী যাচাই করে দেখার একটা সুযোগ সৃষ্টি করা। আফগানিস্তান বা অনির্দিষ্ট অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এ দেশের জল, স্থল ও নভোমণ্ডল ব্যবহারে অনুমতি দান এমনই এক নিয়তি কাঁপানো সিদ্ধান্ত। আমাদের সরকার নজিরবিহীন দ্রুততার সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যুদ্ধজোটে যোগদানের এই সিদ্ধান্ত সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আমাদের আশঙ্কা, সরকারের এই সিদ্ধান্ত দেশের প্রকৃত জনমতের প্রতিফলন ঘটায় নি। এই জাতীয় সিদ্ধান্ত থেকেই-ইতিহাসে দেখা যায়-অনেক দেশের সরকার জনসাধারণের সমর্থন বা বৈধতা হারাতে বাধ্য হন। তো কেন এই ঝুঁকি ? সরকার নৈতিক অবস্থানের দোহাই দিয়েছেন। আমাদের বক্তব্য, এই দোহাই সৎ নয়।

সারা দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষও ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় ব্যথিত। কিন্তু এই ঘটনার একমাত্র পরিণতি যুদ্ধ-এই সিদ্ধান্ত পৃথিবীরও নয়, বাংলাদেশের জনগণেরও নয়। যত ন্যূনতম পন্থায়ই হোক, আমাদের দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজোট জড়িত করার আগে দেশের মানুষের সেন্টিমেন্ট কী ভেবে দেখা উচিত ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সরকার ও সরকারের অনুমোদক রাজনৈতিক (প্রধান) দলগুলো তা করেন নি। এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে। কারণ আমরা মনে করি-এ বিষয়ে জনমত সরকারি মতের অনুসারী নয়। শঙ্কার অন্য কারণও আছে। যুদ্ধ 'দীর্ঘস্থায়ী' হলে সাধারণের মধ্যে বিরাজমান ভিন্নমতই প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ নেবে। দেশের দায়িত্বশীল বুদ্ধিমানদের উচিত, এ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনায় অংশগ্রহণ করা। অন্ধ হলেই কিন্তু প্রলয় বন্ধ হবে না। জাতীয় স্বার্থ ও স্বাধীনতা বিপন্ন করার অধিকার শুধু তত্ত্বাবধায়ক কেন, কোনো সরকারেরই নাই।

১. সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স্‌ যুদ্ধের সঙ্গে খারাপ আবহাওয়ার একটা তুলনা

www.pathagar.com

করেছিলেন। হব্‌স্‌ বলেছিলেন, যুদ্ধ মানে মাত্র ঘটনা নয়, আবহাওয়া। 'সময়' যুদ্ধে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। হব্‌সের উপমা অনুসারে, এক পশলা বৃষ্টি হলেই আবহাওয়া খারাপ হয় না। যেদিন থেকে আকাশে মেঘ জমতে থাকে, হাওয়া দম মেরে যায় সেদিন থেকেই আবহাওয়া খারাপ হলো বলা যায়। যুদ্ধও তেমনই। যখন দুই বিবদমান পক্ষের উভয়কে ঠাণ্ডা করার মতো কোনো মধ্যস্থ শক্তির অস্তিত্ব থাকে না তখনই বলা যায় যুদ্ধ শুরু হলো। দার্শনিকের ভাষায় ঃ 'শুধু খণ্ড খণ্ড লড়াই বা সংঘাতকেই যুদ্ধ গণ্য করা হয় না। যুদ্ধের মাধ্যমে মীমাংসার ইচ্ছাটা যখন থেকে পরিষ্কার ব্যক্ত হয়- সময়ের সে পরিসরের সবটুকুকেই যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত ধরে নেওয়া যায়। যুদ্ধের সংজ্ঞার মধ্যেই এই 'সময়' বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত।' (হব্‌স্‌ ১৬৫১ ঃ ৮৮) এই সংজ্ঞা অনুসারে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শুরু করেই দিয়েছে। এখন আমরা শুধু অধীর হতে পারি-এর শেষ কোথায়? ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার মতো ঘটনায় 'মানুষ আদিম অনুভূতি ও আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়। এটাই 'স্বাভাবিক'। কিন্তু অনুভূতির আগুনে যুদ্ধের আহুতি না দিয়ে শুভবুদ্ধির পতাকা ওড়াতে থাকাই তো সত্যের পরীক্ষা।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যুদ্ধমুখী নীতি শুভবুদ্ধির পতাকা মাটিতে নামানোর তেমন আর বাকি রাখে নি। অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড সাঈদ মার্কিন সরকারের বর্তমান নীতিকে মার্কিন মহাকবি হেরমান মেলভিলের 'মবি ডিক' গদ্যকাব্যের নায়ক তিমি মাছের বিরুদ্ধে প্রতিনায়ক ক্যাপ্টেন আহাবের প্রতিশোধপরায়ণতার তুলনা বলে উল্লেখ করেছেন (সাঈদ ২০০১)। আমরাও এ তুলনা যথার্থ মনে করি। সেই সঙ্গে আমরা এটুকু যোগ করতেও ভুলি না, মবি ডিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্যাপ্টেন আহাব জয়ী হন নি। শুধু তাঁর নিজেরই নয়, তিমি শিকারী দলসুদ্ধ 'রেপকুড' জাহাজেরও সাগর সমাধি হয়েছিল।

সারা পৃথিবীতে তিমি এখন একটি বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী। এই ফলাফল নিশ্চয় অকারণ নয়। বিশেষত, উনিশ শতকে তিমি শিকারের ব্যবসা ছিল খুবই বাড়ন্ত। মার্কিন দেশের উত্তর-পূর্ব উপকূলের বিভিন্ন শিকার কেন্দ্রের একটি-নান্টাকেট-থেকে ক্যাপ্টেন আহাবের জাহাজও তিমি শিকারে বেরুত। তিমির তেল দিয়ে সভ্যতার প্রদীপ জ্বলত। এই ছিল প্রধান আকর্ষণ। এরকম এক অভিযানে 'মবি ডিক' নামে পরিচিত এক সাদা স্পার্ম তিমির কামড় খেয়ে একটি পা হারান ক্যাপ্টেন আহাব। তারপর থেকে প্রতিশোধের নেশায় তিনি 'পাগল' হয়ে যান। আহাবেরই আপন জবানিতে শুনি ঃ 'আই অ্যাম ডেমোনিয়াক, আই অ্যাম ম্যাডনেস ম্যাডেন্‌ড' অথবা 'আমি শুধু পাগল নই, আমি দানব, আমি উন্মত্ত প্রমত্ততা।' (মেলভিল ১৮৫০ ঃ ১৭১)

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই অশুভ শক্তি তিমি মাছের পেছনে তিনি দুনিয়ার তাবৎ জলসীমার মধ্যে ঘুরতে থাকেন। প্রতিশোধের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে তার বুকে। শেষ পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের এক দূর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে মবি ডিকের সঙ্গে মোলাকাত হয় ক্যাপ্টেন আহাবের। পর পর তিনদিন আক্রমণ করেও তিনি বধ করতে ব্যর্থ হন মবি ডিককে। আক্রমণের তৃতীয় ও শেষ দিনে পলায়নরত তিমির গায়ে হার্পুন গেঁথে দিতে সক্ষম হন আহাব। সে আক্রমণ ছিল আহাবের জন্যেও বিপদসঙ্কুল, কিন্তু আহাব কোনো যুক্তি মানবেন না। তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান তিমি বধ, প্রতিশোধ। শেষ মুহূর্তের একটু আগে, আহাবের দলসঙ্গী অফিসার স্টারবাক তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা

www.pathagar.com

করেন-'ফিরে আসেন'। স্টারবাকের যুক্তি 'মবি ডিক নিজের প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে, সে তো আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে না, পাগলপারা আপনিই তাকে অতিষ্ঠ করছেন।' (মেলভিল ১৮৭১ ঃ ৫৭৭) কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতোই বলা চলে- যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে।

মবি ডিক শেষ পর্যন্ত রুখে দাঁড়ায়। আক্রমণ করে জাহাজ। এই দৈত্যাকার শাদা তিমির মাথার আঘাতে 'পেকুড' জাহাজ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয় ধীরে ধীরে। 'পাঁচ হাজার বছর আগে যেরকম সমুদ্রের বিশাল ফেনা গড়িয়ে গড়িয়ে যেত তেমনি গড়িয়ে যেতে শুরু করে।' (মেলভিল ১৮৫১ ঃ ৫৮২)

ঊনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে পরিচিত হারমান মেলভিল এ কাহিনী প্রকাশ করেন ১৮৫১ ইংরেজি সালে। তখন তখনই বুদ্ধিমান সমালোচকরা ধরতে পেরেছিলেন মবি ডিকের গল্প যেমন তিমি শিকারের একটা বাস্তব আখ্যান তেমনি পৃথিবীর ইতিহাসে বর্ধিষ্ণু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতীকী কাহিনীও। যুক্তরাষ্ট্র তখন স্পেনের কলোনি ফ্লোরিডা আর মেক্সিকোর খণ্ড টেক্সাস অঞ্চল কেড়ে নিয়েছে। ক্যাপ্টেন আহাবের প্রতিশোধপরায়ণতা শেষ পর্যন্ত নিজের এবং নিজের জাহাজেরই ধ্বংস ডেকে আনে। মেলভিল এই সাবধানবাণী নিজের দেশবাসীর গোচরে আনার জন্যই এ কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন।

২. ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি ক্যাপ্টেন আহাব পৃথিবীকে যে চোখে দেখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃশ্রেণী পৃথিবীকে সেই চোখেই দেখছেন। আহাব দুনিয়ার সব বস্তুকে দুইভাগে ভাগ করেছিলেন। একভাগে কালো, অন্ধকার, মন্দ- এক কথায় 'অশুভ'। অন্যভাগে শাদা, আলো, ভালো- এক কথায় শুভ। আহাবের বিচারে সমুদ্রের তিমি সেই অশুভের আর তিনি নিজে শুভের মূর্তি। অন্তর্দ্রষ্টা মেলভিল তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন নি। মেলভিল দেখিয়েছেন, বেচারা তিমির নামে-হিংস্রতা ও মৃত্যুপরায়ণতার-যে বদনাম আহাব সাহেব করেছেন আসলে তার বেশিরভাগ আহাবের নিজেরই গুণ। জীবন-মেলভিলের চোখে-অতখানি বিশুদ্ধ শাদা-কালোয় বা শুভ-অশুভে বিভাজনযোগ্য নয়। হিংসা ও প্রতিশোধ আহাবের -মানুষের -মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূষণ। আহাব সেই ভূষণ সমুদ্রের তিমির গায়ে চড়িয়ে প্রাসাদ লাভ করেছেন-এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু আহাবের পক্ষেও এই কথা ভাবা সম্ভব হয় নাই যে, এ পদ কর্তন ব্যাপারটি ঘটানোর জন্য মবি ডিক ডাঙায় উঠে আসেনি। আহাবই তার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করার জন্য মাঝ সমুদ্রে হার্পুন হাতে ছুটে গিয়েছিলেন।

আহাবের শিকারী জাহাজ ডোবার কথা আমরা জেনেছি মেলভিলের মুখপাত্র ইসমাইলের মুখে। ওই জাহাজ ডুবির একমাত্র সাক্ষী, একমাত্র জীবিত নাবিক, এই ইসমাইল। মবি ডিকের ভাগ্যে এর পর কী ঘটেছিল সে কাহিনীর আর আমাদের জানার সুযোগ হয় নাই। সামুদ্রিক তিমির কোনো কোনো প্রজাতি আজ যে বিলুপ্তপ্রায় সে ঘটনাই গল্পের অকথিত অংশ বলে দিচ্ছে। সব গল্পই কখনো না কখনো শেষ হয়।

আহাব তাঁর খালাসীদের বোঝানোর কোশেশ করেছিলেন-মবি ডিকের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই অশুভের বিরুদ্ধে শুভের লড়াই। মেলভিল দেখিয়েছেন খোদ আহাবই অশুভের প্রতিমূর্তি। আজ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও আর আর নেতা তাঁদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

এই ধর্মীয় পরিভাষা প্রয়োগ করেছেন। 'অশুভ' ও 'ক্রুসেড' শব্দদুটি খুব ঘন ঘন প্রচার করা হচ্ছে। মেলভিলের সন্দেহই কি তা হলে সঠিক ? এ অশুভ কি যুক্তরাষ্ট্রেরই অভ্যন্তরীণ অশান্তির অপর নাম ? হয়তো তাই।

যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে বলছে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ সেরকম 'অশুভের বিরুদ্ধে শুভের যুদ্ধ' যদি না হয় তো আমাদের সরকার কি তাঁর জাতীয় স্বাধীনতা সমর্পণের নীতি পরিবর্তন করবেন ? আমাদের সামনে এই প্রশ্নটা এখন উত্তরের দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে।

সন্ত্রাস ও যুদ্ধ দুটোই রাজনীতির বর্ধিত সংস্করণ। রাজনীতির প্রশ্নকে শেষ পর্যন্ত আমাদের রাজনীতির আলোকেই বিচার করতে হবে। আমরা সারা পৃথিবীজুড়ে আজ যে রাজনীতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি সে রাজনীতি শুভ ও অশুভের নয়। এ যুদ্ধ খ্রিস্টান পাশ্চাত্য আর ইসলামি প্রাচ্যের নয়। এ রাজনীতি শেষ বিচারে প্রভু ও ভৃত্যের। পৃথিবী যে এখন আরো বেশি করে প্রভু ও ভৃত্যে বিভক্ত সে সত্য চাপা দিয়ে আমরা সন্ত্রাসের ব্যাকরণ বা যুদ্ধের অভিধান কোনোটাই পড়তে পারব না। আরো যুদ্ধ, আরো মৃত্যু, আরো হত্যার পরও রাজনীতি থাকবে।

মনুষ্য সমাজে প্রভু ও ভৃত্যের, দাসমালিক ও দাসের উদ্ভব হলো কী করে ? মানুষ ঠিক যেভাবে তিমি শিকার করে ঠিক সেভাবে দাস শিকার করে না। বনের পশুকে গৃহস্থ মানুষ যেভাবে পোষ মানায়, মানুষ মানুষকে ঠিক সেভাবে পোষ মানায় নি। দু'মানুষের মধ্যে লড়াই বাঁধল। ধরা যাক, একজন আত্মসমর্পণ করল। দাস হলো। অন্যজন প্রভু হলো। কিন্তু এতে প্রভুর মনে শান্তি আসে না। যখন একজন মানুষ আত্মসমর্পণ করে, 'স্বাধীনতা' বিসর্জন দিয়ে শুধু 'প্রাণ' বাঁচায় তখন সে আর 'মানুষ' থাকে না। সেই অমানুষের স্বীকৃতি-দাসত্ব স্বীকার করা মানুষের-প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্যে যথেষ্ট নয়। কারণ সে প্রভুর সমান নয়। সমানের স্বীকৃতিই শুধু গণনার যোগ্য।

দাসের কাছে তাহলে কী চায় প্রভু ? চায় কাজ। কাজের মধ্য দিয়ে আবার দাসও আপনার হারানো মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ইতিহাস এই অর্থে দাসেরই সৃষ্টি। কিন্তু এই ইতিহাসের ওপর তার মালিকানা নাই। নিজেও সে মানুষ এই প্রমাণ দেওয়ার জন্য তাকে বিদ্রোহ করতে হয়। বিদ্রোহ মানে 'হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু'। কথিত আছে দার্শনিক মহাত্মা হেগেল বলেছিলেন, একমাত্র মানুষই আত্মহত্যার ঝুঁকি নিতে পারে এবং তখনই তার দাসত্বের অবসান ঘটে। তখনই সে 'মানুষ' হয়ে ওঠে। যুদ্ধ ও শান্তি সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনার পূর্বশর্তস্বরূপ এই সত্যটি হজম করা দরকার।

৩. মানুষ এক ধরনের পশু। তবে অন্য পশুর সঙ্গে মানুষের এক ভেদ নির্দেশ করেছিলেন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল। তার মতে, মানুষ 'রাষ্ট্রায়ত্ত পশু'। রাষ্ট্র গড়ে তোলা মানুষের স্বভাব। দার্শনিক হবস এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নন। তাঁর মতে, মানুষ রাষ্ট্র গড়ে স্বভাবের কারণে নয়, ঠেলায় পড়ে। কী সেই ঠেলা ? যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ স্বভাবের জগতে বাস করে, ততক্ষণ মানুষ যুদ্ধাবস্থায় থাকে। এ যুদ্ধ সবার বিরুদ্ধে সবার। স্বভাবের জগৎ নয়, শান্তির অভাবই মানুষের 'রাষ্ট্র সমাজ' গড়ার আসল কারণ। যুদ্ধ মানেই তাই সভ্যতার পরাজয়, স্বভাবের জয়। মানুষ স্বভাবে প্রভুও নয়, দাসও নয়-

www.pathagar.com

নিতান্ত পশু। যুদ্ধে মানুষ পশু পরিচয়েই ফিরে যায়। চিরকাল পশু থাকা তার পক্ষে অসম্ভবও। তাই সে সমাজ গড়ে। শান্তির কথা বলে।

হাতের পাঁচ আঙুল যেমন সমান নয় তেমনি সমাজের সব মানুষও সমান নয়। পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘোরে এ কথা যেমন সত্য, উপরের কথাটিও তেমনই সত্য মাত্র। এর বেশি নয়। হব্‌স্‌ বলেছিলেন অন্য কথা। তাঁর মতে, মানুষ মাত্রেই সমান। কারণ পৃথিবীর দুর্বলতম মানুষটিও হয় কৌশলে বা সমানমনা অন্যদের সহায়তায় সফলতম মানুষটিকে হত্যা করতে পারে। (হব্‌স্‌ ১৬৫১ ঃ ৮৭)

হব্‌স্‌ের মতে, মানুষে মানুষ সমতার দ্বিতীয় একটি কারণও আছে। প্রত্যেক মানুষই মনে করে সে আর সকলের চেয়ে বেশি বিজ্ঞ। আমার চেয়ে বেশি বিদ্বান, বেশি বুদ্ধিমান, বেশি বাকপটু লোক আছে, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু আমার যে ন্যায়-অন্যায় বোধ, শুভ-অশুভ বিচার তা অন্যের চেয়ে উত্তম-এই ধারণা প্রায় সব মানুষেরই। নিজেকে বড় করে দেখার এই প্রবণতা- এই নৈতিক অহঙ্কার-যখন সবারই সমান তখন, হব্‌স্‌ সিদ্ধান্ত করেন, মানুষ মাত্রেই সমান। (হব্‌স্‌ ১৬৫১ ঃ ৮৭)

মানুষ তিমি নয়। কিন্তু কোনো কোনো তিমি মানুষের মতো রুখে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা এই পড়না পড়বেন কিনা জানি না। কিন্তু বাংলাদেশের পড়না হওয়া উচিত এই বাক্য ঃ আসন্ন আমেরিকার যুদ্ধে আফগানিস্তানের অবস্থান অশুভের দলে নয়, ভৃত্যের কাতারে।

উল্লেখ ঃ

Thomas Hobbes, Leviathan, Richard Tucked.. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. (First Published 1651)

Herman Melville, Moby Dick, Tony Tannered.. Oxford I Soford University Press, 1988. (First Published 1851)

এডওয়ার্ড সাঈদ. *'অবিচারই সন্ত্রাসের মূল কারণ', প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১।*

১৯ সেপ্টেম্বর' ০১/ লেখক ঃ বামপন্থী বুদ্ধিজীবী।

www.pathagar.com

মানবতাবিরোধী এ হত্যাযজ্ঞ!

মাহবুব হাসান

মানুষের মন পাঠ করা খুবই কঠিন। মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য কাজটা বেশ পারেন। তারা মনের ভেতরের ভাল-মন্দ জানতে পারেন, বুঝতে পারেন। কিন্তু সাধারণজনেরা তা পারেন না। অথচ বিশ্বে তাদের সংখ্যাই বেশি। অসাধারণ যারা তারা হরহামেশাই মিডিয়ায় আসেন। নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে গত ১১ সেপ্টেম্বর বিমানকে ক্রুজ মিসাইল হিসাবে ব্যবহারের পর যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞের দৃশ্য বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করল, ইতিহাসে তাকে এক 'নতুন যুদ্ধ' হিসাবে বর্ণনা করা যায়। এই হামলা চরম মানবতা বিরোধিতার সর্বশেষ নিদর্শন। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বাণিজ্য কেন্দ্রে ও পেন্টাগনে হামলাকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হিসাবে ঘোষণাই দিয়েছেন। টিভি পর্দায় 'টেরর ইন আমেরিকা' শিরোনামের মধ্যে মার্কিনি জনগণ ও প্রশাসকদের ভীতসন্ত্রস্ত মুখ দেখে মনে এই প্রশ্নই জাগে–বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তির একি দশা! মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভয়ে চল্লিশ হাজার ফুট উপরে দুই ঘন্টা কাটিয়ে যখন নিশ্চিত হলেন যে, কোন দেশ আমেরিকা আক্রমণ করেনি বরং কোন সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ এই ধ্বংসযজ্ঞের হোতা, তখন তিনি ধরণীতে নেমে আসেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের মনে কেন এত ভয়, সে খবর বলতে পারবেন মনোবিশারদরা। যারা আত্মঘাতী হল ছিনতাইকৃত বোয়িংসহ, তাদের মনেই বা এই মানবতাবিরোধী মানসিকতার সৃষ্টি হল কেন, তাও আমাদের জিজ্ঞাস্য। কেন মানুষ মারতে চাইল তারা ? কেন তারা স্টিলের কাঠামোর সুউচ্চ ভবনের সাধারণ চাকরিজীবীদের বিরুদ্ধে এমন নৃশংস আত্মঘাতমূলক হামলা চালাল? এ সবকিছুই জানতে-বুঝতে পারবেন মনোবিজ্ঞানীরা। বিমান ছিনতাইকারী লোকগুলোর মন বিশ্লেষণের কোন সুযোগ নেই । কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট থেকে সাধারণ নাগরিকদের মনোজরিপ করলে তাদের মনোময় কথা জানা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ওপর এই হামলার জন্য ধিক্কার উঠেছে সচেতন মানুষের শুভবুদ্ধিতে। তারা ন্যক্কারজনক হামলার নিন্দা জানিয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে চলেছে বিশ্লেষণ, কেন হামলা হল পেন্টাগনের মতো সুরক্ষিত সামরিক অফিসে এবং লোকারণ্যের জায়গা টুইন টাওয়ার বাণিজ্য কেন্দ্রে। যুক্তরাষ্ট্র প্রথমেই আঙুল তুলেছে, এ কাজ মুসলমানদের। সেই

www.pathagar.com

মুসলমান ফিলিস্তিনি হতে পারে, সৌদি হতে পারে, ইরাক-ইরান-আফগান হতে পারে। এশিয়ার পূর্বদিকে আর যায়নি তারা।

তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু হচ্ছে মুসলমান। আর সেই মুসলমানদের মধ্যে কয়েকজনের নাম মোল্লা ওমর, লাদেন, সাদ্দাম যেমন হতে পারে তেমনি হতে পারে ফিলিস্তিনি উগ্রপন্থী দলগুলো। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন লাদেনই দায়ী। এই নরক গুলজারের পেছনে রয়েছে তারই হাত। লাদেন এ কথা অস্বীকার করলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট আফগানিস্তান নেতা মোল্লা ওমরকে বলেছেন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করতে। অস্বীকৃতি জানিয়েছেন মোল্লা ওমর। বলেছেন, মার্কিন হামলা হলে জেহাদ।

'জেহাদ' করা যাবে তবে কতক্ষণ টিকতে পারবে মোল্লা ওমর, সেটাই হচ্ছে কথা। আর যুদ্ধ শুরু হলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একাট্টা হলেই বা কী ? জেতা সম্ভব নয়; বরং যুদ্ধ শুরুর আগেই মুসলিম বিশ্ব একাট্টা হলে মার্কিনি যুদ্ধংদেহী মনোভাব প্রশমন করা যেতে পারে। কেননা, কাবুলে হামলা হলে পাবলিক মারা পড়বে এবং সেটাও হবে মানবতাবিরোধী ধ্বংসযজ্ঞ। মার্কিন মানবতাবোধে যাতে এই সত্য উদ্ভাসিত হয় যে, লাদেনকে আটক করতে গিয়ে তারাও নৃশংসতারই পথ নিয়েছে। কথায় আছে, 'যত গর্জে তত বর্ষে না'। মার্কিনি গর্জনটি রণহুংকার-বিশ্ব কাঁপানো। বিশ্বব্যাপী তার সহমর্মী ও সহযোগী পেতে কষ্ট করতে হয়নি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তো বসেই ছিলেন বিবৃতি দেয়ার জন্য। তবে, পাকিস্তানি জেনারেল কাম প্রেসিডেন্ট বড় গ্যাঁড়াকলে পড়েছেন। যাদের নিয়ে তার সামরিক শাসনের শক্তিশালী ভিত, তারা কেউই সায় দেয়নি মার্কিনিদের সাহায্য-সহযোগিতা দানে। তারপরও পারভেজ মোশাররফ নজিরবিহীন সহযোগিতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। পাক-আফগান নারী-পুরুষ পাক সীমান্তে জড়ো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মাত্র তিন দিনের আলটিমেটামের পর আসলেই আফগান আকাশে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানতে শুরু করবে কিনা, সেই অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি। এ দেশের মানুষ কিছুটা ভাবপ্রবণ, তাই হয়তো কল্পনাবিলাসীও। টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে হামলা কারা করেছে সেই ব্যাপারটি নিয়ে বেশ চটকদার বিশ্লেষণ করছে। আমি পর্যায়ক্রমে সেগুলো বলছি। প্রথমত, লাদেন এ হামলার সঙ্গে জড়িত নয়। এটা বিশ্বাস করে অধিকাংশ সচেতন মানুষ। যারা বিশ্বাস করে তারা বলেছে, কাজটা মানবতাবিরোধী, তবে উচিত কাজটি করেছে। আমেরিকা যে কাগুজে বাঘ সেটা প্রমাণ হল। ইসরাইলকে মদদ দেয়া, ইরাকে অবরোধ করে মানবতাবিরোধী কাজ করা। হিরোশিমা- নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলা-সব অপরাধের যেন এটা একটি ক্ষুদ্র প্রতিবাদ। কেউ কেউ বলছেন টুইন টাওয়ারে হামলা চালিয়েছে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোশাদ। কেন করেছে ? তার ব্যাখ্যা হিসাবে বলেছে, আমেরিকানদের চোখে মুসলমানদের আরও ঘৃণ্য করে তোলা। তাতে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই মুসলমানদের 'শিক্ষা' দিতে তৎপর হবে। কারণ ইসলামই এখন ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা বিশ্বের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। কেউ কেউ বলছেন, এই সন্ত্রাসী কাজ ফিলিস্তিনি উগ্রবাদীদের। একজন বললেন, জাপানিদের প্রতিশোধ স্পৃহার বহিঃপ্রকাশ এটি। কেন জাপানিরা এটা করতে যাবে ? উত্তর-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা-নাকাসাকিতে মানবতাবিরোধী কাজটি যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধ ছিল। তার কোন বিচার হয়নি। সেই পাপের শাস্তির সূচনা করেছে

www.pathagar.com

তারা। যাত্রীবাহী বিমানকে ক্রুজ মিসাইল হিসাবে ব্যবহার করে প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে যে নয়া দিগন্ত উন্মুক্ত করেছে সন্ত্রাসী আত্মঘাতীরা, সেটাও প্রমাণ হল। আলফ্রেড নোবেল মৃত্যুর আগে তার আবিষ্কারের যে নারকীয় পরিণতি দেখেছেন, আজ বোয়িং কোম্পানির বিমানগুলো যে মিসাইলে পরিণত হতে পারে, তাই যেন প্রমাণিত হল। এই ডাইমেনশন সন্দেহ নেই, অবনত, দমনবিধ্বস্ত তৃতীয় দুনিয়ায় মানুষকে নতুনভাবে উৎসাহ দিতে পারে। এটা থামাতে হলে বিপুল শক্তিধর যুক্তরাষ্ট্রকে সংযম-সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে, যা তারা ১৯৪৫ সালে দিতে পারেনি, তা আজকে ২০০১ সালে দিতে হবে। না হলে প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্রের এই সর্বশেষ সম্ভাব্য বিশ্ব যুদ্ধ সত্য সত্যই রূপান্তরিত হতে পারে পারমাণবিক মহাসমরে। হতে পারে না কী? ❑

লেখক ঃ সাংবাদিক।

১৯ সেপ্টেম্বর' ০১

একদিকে রুটি অপরদিকে বোমা।

www.pathagar.com

ওয়াশিংটন স্বীয় গৃহ অরক্ষিত রাখল কেন ?

জগ্‌লুল আহ্‌মেদ চৌধূরী

বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সন্ত্রাস ঘটে গেল তাতে সারাবিশ্ব হতভম্ব হয়ে পড়েছে। যেভাবে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ও বিখ্যাত শহর নিউইয়র্কে যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক বিমান ব্যবহার করে ভয়াবহ সন্ত্রাস চালানো হয়-এতে একদিকে পৃথিবী যেমন শোকাভিভূত হয়েছে অসংখ্য মৃত্যুর কারণে, অন্যদিকে স্তম্ভিত হয়ে গেছে এই ভেবে যে, কি করে সম্ভব হল এই ধরনের সন্ত্রাস খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে। যে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবী থেকে সন্ত্রাস দূর করতে বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে সহায়তা করে আসছে এবং প্রকাশ্যে এ বিষয়ে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে-সেই শক্তিশালী দেশে এটা কি করে সম্ভব হল। তাছাড়া যেসব স্থানে আঘাত আনা হয়েছে-তার মাঝে রয়েছে আমেরিকার সবচেয়ে গোপনীয় ও স্পর্শকাতর সামরিক দফতর 'পেন্টাগন'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের অভাব নেই। গত বছরগুলোতে এর যথেষ্ট প্রমাণাদি পাওয়া গেছে। তাই বিশ্বে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের বিভিন্নভাবে হামলা অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কারণে মার্কিন দূতাবাস, অন্যান্য স্বার্থ ও এমন কি নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারটি তাই একটি সর্বদা আলোচিত বিষয়। তাই বলে 'পেন্টাগনে' হামলা এবং কয়েকশ' ব্যক্তি নিহত হওয়ার আশংকার সংবাদ এবং একই সঙ্গে নিউইয়র্কের সবচেয়ে উঁচু ও আমেরিকা তথা পৃথিবীর অন্যতম সুরম্য ভবন ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে' বিমান নিয়ে আঘাত করে সেটাকে ধ্বংস করা! কারা এত শক্তিশালী সন্ত্রাসীচক্র যে অবলীলাক্রমে এই কঠিন কাজ সমাধা করতে পারে? এই সন্ত্রাসে হতাহত মানুষের সংখ্যা অসংখ্য এবং এই জঘন্য ঘটনা সারাবিশ্বে নিন্দা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে সীমাহীনভাবে। কিন্তু একই সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যু প্রচণ্ডভাবে আলোচিত হচ্ছে সর্বত্র। কি করে এটা সম্ভব-কারা ঘটাতে পারে এমনি ধরনের অবিশ্বাস্য ঘটনা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ কি করে এক অর্থে অরক্ষিত থাকল এতদিন। যদি রক্ষিত থেকেই থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, সেই নিরাপত্তা কতটুকু পর্যাপ্ত ছিল ? অন্তত 'পেন্টাগনের' মতো একটি দফতরে কি করে আঘাত হানা সম্ভব হল? বলা হয়ে থাকে, আমেরিকা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও অন্যান্য কৌশলগত স্থানগুলো

www.pathagar.com

সম্পর্কে এতই ওয়াকিবহাল যে, নীতিনির্ধারকরা ওয়াশিংটনে বসেই স্বল্প সময়ের মাঝে বিভিন্ন ধরনের সামরিক পরিকল্পনা নিতে পারেন এবং সেটা বাস্তবায়িতও করতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, লিবীয় নেতা গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক ব্যবস্থা এতই নিখুঁত ছিল লিবীয় নেতার গোপন বাসভবনে মার্কিন বিমানগুলো আঘাত করতে সক্ষম হয়েছিল। ভাগ্যগুণেই বেঁচে গিয়েছিলেন গাদ্দাফী-যিনি তার মার্কিনবিরোধী মনোভাব কখনও নিবৃত্ত করেননি এবং সেটাই বজায় রেখে চলেছেন। ধারণা করা হয়, আফগানিস্তানে বসবাসরত সৌদি ভিন্ন মতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেন-যাকে সাম্প্রতিক বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য আমেরিকা দায়ী করে এসেছে- তার গতিবিধি এবং আস্তানা-সবকিছুই আমেরিকানদের জানা এবং তার বিরুদ্ধে যে কোন পদক্ষেপ তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে বিমান নিয়ে হামলার জন্য লাদেনকেই আমেরিকা সন্দেহের তালিকায় শীর্ষে রেখেছে। যদিও লাদেন এই সন্ত্রাসের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা অস্বীকার করেছেন-তিনি যারা এটা ঘটিয়েছে তাদের অভিনন্দিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী লাদেন আমেরিকা ও ইসরাইলকে বড় শত্রু মনে করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়ে যাবেন বলে প্রকাশ্যই বলেছেন।

উল্লেখ্য, আমেরিকার এই ধ্বংসে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই সমবেদনা ও ব্যথিত হয়েছে। ইসরাইলের সমবেদনার বহিঃপ্রকাশ সবার চেয়ে বেশি। সেখানে জাতীয়ভাবে একদিন শোক ঘোষণা করা হয়। তেলআবিবের সবেচেয়ে বড় মিত্র ওয়াশিংটন। আরব ও প্যালেস্টাইনিদের সঙ্গে ইসরাইলের বিরোধে এই আমেরিকাকেই মনে করা হয়ে থাকে ইসরাইলের পক্ষ অবলম্বনকারী। তাই আমেরিকায় এই সন্ত্রাসের সময় কিছু কিছু স্থানে- যেমন চরম আমেরিকাবিরোধী ইরাক কিংবা প্যালেস্টাইনি শরণার্থী শিবিরে উল্লাস লক্ষ্য করা গেছে। এতে ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র মনোভাবই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। অবশ্য প্যালেস্টাইনি নেতা ইয়াসির আরাফাত এই সন্ত্রাসকে নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন, এর সঙ্গে তার সমর্থকদের কোন সংস্রব নেই। তাহলে কি লাদেনই এই ভয়াবহ সন্ত্রাস- যা কিনা আমেরিকায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পার্ল হারবারে জাপানি হামলার পর সবচেয়ে বড় হামলা হিসাবে বলা হচ্ছে-এর নায়ক ? নাকি অন্য কোন জঙ্গি সংগঠন যার শক্ত ভিত্তি রয়েছে খোদ আমেরিকার মাটিতে ? এটা সত্য যে, লাদেনের বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী একটা নেটওয়ার্ক আছে–কিন্তু সেটা কি এতই উন্নত ও শক্তিধর যে 'পেন্টাগন' ও নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস করে দিতে পারে ?

ওসামা বিন লাদেন পূর্বে অনেকবার মার্কিন স্বার্থের ওপর আঘাত হানার হুমকি দিয়েছেন। ১৯৯২ সালে ইয়েমেনে ১০০ মার্কিন মেরিন সেনার ওপর বোমা হামলায় কৃতিত্ব তিনি দাবি করেছেন। ১৯৯৩ সালে সোমালিয়া ও ১৯৯৬ সালে রিয়াদে বোমা হামলার জন্যও তাকে দায়ী করা হয়ে থাকে। রিয়াদে ১৯ জন আমেরিকান সৈন্য নিহত হয়। ১৯৯৩ সালে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা হামলায় তার আর্থিক সহযোগিতা ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। ১৯৯৮ সালে তাঞ্জানিয়া ও কেনিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে হামলায় ৮ জন নিহত হয় এবং এর জন্যও অনেকে লাদেনকেই সন্দেহ করেছেন। এর পাশাপাশি আরও কিছু উগ্রপন্থী ইসলামিক সংস্থাকে সন্দেহ করা হয়। এই সংস্থাগুলোর সঙ্গে লাদেনের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। নিজস্ব কারণেই তারা মার্কিনবিরোধী সন্ত্রাসী কর্মপন্থা গ্রহণ করে থাকে। এদের মাঝে একটি হল এমন এক

www.pathagar.com

সংগঠন-যারা মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করেছিল।

আমেরিকায় যে সন্ত্রাস ঘটে গেল তার প্রভাব পড়বে বিভিন্ন পর্যায়ে। আমেরিকাকে এই দুর্দিনের মাঝেও এই অপবাদ ঘুচাতে হবে যে, পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি হয়েও স্বীয় গৃহ রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র সমর্থ নয়। যে ধরনের সন্ত্রাসের শিকার হল আমেরিকা-তাতে এই ধারণাই বৃদ্ধি পাবে যে, বিশ্বের 'পুলিশের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও এবং খোদ মার্কিনিরা যোজন দূরে থাকলেও তারা যে ভয়ংকর হামলার শিকার হবে না এতদিন এটা ভেবে তারা 'বোকার স্বর্গে' বসবাস করে এসেছে। এই সন্ত্রাসের যতই নির্মমতা ও ভয়াবহতা থাকুক না কেন- এটা অনস্বীকার্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী ও বিস্তৃত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এর বিন্দুমাত্র পূর্বাভাস জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। যারাই এই ঘটনার পেছনে থাক না কেন – তাদের গোপনীয়তা, আধুনিকতা ও কর্মপন্থা বাস্তবায়নে দৃঢ়তা ও সফলতার মাত্রা ওয়াশিংটনকে বিস্মিত করেছে। আমেরিকার স্বীয় স্পর্শকাতর স্থানগুলোর নিরাপত্তার দুর্বলতা এবার দারুণভাবে উন্মোচিত হয়েছে এবং ভাষ্যকাররা বলছেন, কোন সরকারই পূর্বে ভাবেননি যে আমেরিকার স্বীয় ভূখণ্ডে আমেরিকা অসহায় হয়ে যেতে পারে। এটা যে কোন প্রশাসনের জন্য অক্ষমতা ও লজ্জার কারণ। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর 'Act of War' কিংবা প্রতিশোধ নেয়ার চরম বাসনা থাকবে স্বাভাবিক। কিন্তু সেটা হবে কার বিরুদ্ধে ? যদি শত্রু চিহ্নিতকরণ সুষ্ঠু না হয়ে থাকে ?

প্রেসিডেন্ট বুশের প্রশাসন এখন দুটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ধ্বংসলীলা কম নয়। শুধু 'পেন্টাগনেই' বিলিয়ন ডলারের যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষজ্ঞগণ নিহত হয়েছেন। বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস মার্কিন অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে। এমনিতেই অর্থনীতি ভাল যাচ্ছিল না। প্রেসিডেন্টকে হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে সক্রিয় হতেই হবে। আমেরিকার গর্ব অনেকখানি ধুলায় মিশে গেছে। কেননা যে আমেরিকা অসাধ্য সাধন করতে পারে বালে জনশ্রুতি রয়েছে-সেই পরাশক্তির এই অবস্থা কেন! এই ঘটনা পৃথিবীর কিছু অঞ্চলে আমেরিকার চাপ বৃদ্ধি করবে। পাকিস্তান ও পার্শ্ববর্তী আফগানিস্তানে 'তালেবান' সরকার যারা ওসামা বিন লাদেনকে স্বীয় দেশে বাস করার অনুমতি দিয়েছে- প্রবল চাপের সম্মুখীন হবে। অন্যান্য মার্কিনবিরোধী দেশ- ইরাক, ইরান, লিবিয়া ও অন্যান্যের মাঝে মার্কিন প্রতিশোধের ভয় সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য লিবীয় নেতা গাদ্দাফী বলেছেন, এই ধ্বংসে তিনি ব্যথিত। এই সন্ত্রাসের পর আমেরিকায় আরব ও মুসলিমরা আতংকে থাকতে শুরু করেছেন। যদি প্রমাণাদি ছাড়াই তাদের ওপর বুশ প্রশাসন নির্যাতন চালায়- সেটা বিভিন্ন শুভ হবে না। এই সহিংস ঘটনায় অন্য কোন অত্যন্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংগঠন বা গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা উড়িয়ে দেয়া কারণে যায় না। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলম, অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু। কি দোষ ছিল এদের! সন্ত্রাস দমনে বিশ্ববাসী কি কার্যকর পন্থা গ্রহণ করবে ? সন্ত্রাসের কারণ ও উৎস কি খুঁজে দেখা হবে ? ❑

সেপ্টেম্বর '০১

লেখক ঃ সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের বিশ্লেষক।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে যুদ্ধ আর কত দিন চলতে পারে ?

(দুই)

আফগানিস্তানে যুদ্ধ কত দিন চলতে পারে ? পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সামরিক শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রায় চার সপ্তাহ যাবত যে সর্বাত্মক বিমান হামলা চলছে, তা আফগানিস্তানকে প্রায় লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। রাজধানী কাবুল ও অন্যান্য শহর কান্দাহার, হেরাত ও জালালাবাদে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে যাচ্ছে মার্কিন অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমানগুলো। সহায়তা করছে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ মিত্র ব্রিটেন। কিন্তু এত দীর্ঘ দিন যাবত দিবারাত্র বিমান আক্রমণ করেও যতটুকু ফলাফল পাওয়ার কথা ছিল, তা পায়নি মার্কিন সামরিক কমান্ডাররা। ওয়াশিংটনে 'হোয়াইট হাউসে' নীতি-নির্ধারকরা কিছুটা বিস্মিত ও এক অর্থে হতাশও বটে। তারা ভাবেননি সর্বাত্মক বোমা হামলা ও আকাশ থেকে অন্যান্য ধরনের আক্রমণ সত্ত্বেও আফগানিস্তানের মতো একটি দরিদ্র দেশের তালেবান সরকার ও এর যোদ্ধারা যারা কিনা এমনিতেই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত-এই ধকল সহ্য করে এখনও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

তালেবানদের কোন বিমানবাহিনী সত্যিকার অর্থে নেই। মাত্র কয়েকটি পুরনো জঙ্গি বিমান আছে, যা বিরোধী Northern Allience-এর বিরুদ্ধে আগে ব্যবহার করা হয়েছে। আমেরিকার সামরিক বিমানগুলো প্রায় কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সারা আফগানিস্তানে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। কাবুল সরকার মাঝে মাঝে বিমান বিধ্বংসী কামান থেকে সেই হামলা প্রতিহত করার ক্ষীণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা নিতান্তই অপ্রতুল এবং আমেরিকা ও ব্রিটিশ অত্যাধুনিক বিমানগুলোর কাছে কোন চ্যালেঞ্জই নয়। এই বিমানগুলো বিভিন্ন সামরিক অবস্থান, গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ছাড়াও তালেবান সৈন্যদের যেসব স্থানে অবস্থান রয়েছে সেগুলোকে 'টার্গেট' করছে। আফগানিস্তান কোন শক্তিশালী দেশ নয়। জনসংখ্যা বর্তমানে দু'কোটির কিছু বেশি। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিনের যুদ্ধে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন দলের মাঝে ক্ষমতার লড়াইয়ে গৃহযুদ্ধে তাদের সৈন্য সংখ্যা কমেছে, যেভাবে কমেছে জনসংখ্যা। বহুলোক নিহত হয়েছে গত ২২ বছরে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭৯ সালে কাবুলে বামপন্থী বারবাক কারমালের সরকারকে

www.pathagar.com

ক্ষমতায় রাখার জন্য সৈন্য পাঠায়। সেই সময় সোভিয়েত বিরোধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশের সাহায্য নিয়ে বাম বিরোধীরা আফগানিস্তানে যুদ্ধ শুরু করে এবং সেই যুদ্ধ দশ বছর স্থায়ী হয়। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত সৈন্যরা এই দেশটি ছেড়ে চলে গেলেও সেখানে স্থিতিশীলতা ও শান্তি আসেনি। বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীরা সরকার গঠন এবং দেশ শাসন করতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ সালে পাকিস্তানের সহায়তা নিয়ে উগ্র ধর্মীয় 'তালেবান' গোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করে এবং এখনও ক্ষমতায় আছে। দেশটির প্রায় ৯০ ভাগ তারা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে বর্তমান সঙ্কট সৃষ্টি হবার আগে। বাকি দশ ভাগ তালেবানবিরোধী গোষ্ঠীরা নিয়ন্ত্রণ করছে। এদের অনেক নেতা রয়েছে। যেমন সাবেক প্রেসিডেন্ট বোরহান উদ্দীন রব্বানী, সাবেক গেরিলা কমান্ডার আহমেদ শাহ মাসুদ, যিনি বর্তমান সঙ্কট উদ্ভব হওয়ার ঠিক আগে নিহত হন। তার জায়গায় এসেছেন জেনারেল ফাহিম। এছাড়া আছেন যুদ্ধবাজ আবদুর রশীদ দোস্তান। এরা এতদিন ইরান ও উজবেকিস্তানের সাহায্য পেয়ে এসেছে। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে তেমন কোন সাফল্য দেখাতে পারেনি। বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এরা সাহায্য পাচ্ছে মার্কিনিদের এবং রাশিয়ার। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন সম্প্রতি সাবেক প্রেসিডেন্ট বোরহান উদ্দীনকে সব রকম সাহায্য, সামরিক অস্ত্রাদি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বলীয়ান হয়ে Northern Allience আক্রমণ চালাচ্ছে। তবে কত দূর সফল হচ্ছে, এ নিয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু সাহায্যকারীরা চায়, তারা এগিয়ে যাক-সফল হোক।

বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আসছে 'তালেবানরা' ক্ষমতা নেয়ার পর থেকেই। তবু তারা অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে এ পর্যন্ত। ধারণা করা হয় যে, তাদের সৈন্য সংখ্যা ৪০ থেকে বড় জোর ৫০ হাজার। অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কারণে সামরিকভাবে তারা খুব উন্নতভাবে সজ্জিত নয়। তবে Northern Allience বা অন্যান্য বিরোধীদের মোকাবেলা করতে তাদের সমস্যা হয়নি। কিন্তু এখন শক্তিধর আমেরিকা ও মিত্রদের! তাছাড়া যে পাকিস্তানের তারা সাহায্য পেয়ে এসেছে, সেই দেশ এখন আমেরিকার পক্ষে। যদিও পাকিস্তানে বিক্ষোভ হচ্ছে তালেবান ও ওসামা বিন লাদেনেরই পক্ষে। সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ আমেরিকায় যে মর্মান্তিক সন্ত্রাস ঘটে গেল, এর জন্য ওয়াশিংটন সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেছে আফগানিস্তানে আশ্রয় নেয়া লাদেনকে। কাবুলের তালেবান সরকার লাদেনের কড়া সমর্থক। যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল লাদেনকে হস্তান্তর করা হোক। তালেবানরা সেটা মানেনি। বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসে তার সম্পৃক্ততা থাকার সত্যিকারের প্রমাণ নেই। তাই লাদেনকে ধরা জীবিত কিংবা মৃত ও তালেবানদের শায়েস্তা করার জন্য এই আক্রমণ। কিন্তু কত দিন চলবে এই আক্রমণ! লাদেনকে পাকড়াও করাও সম্ভব হচ্ছে না। আফগানিস্তানের নাজুক সরকার কত দিন পারবে এই আক্রমণ সামাল দিতে ? কি হতে পারে দেশটির সম্ভাব্য চিত্র ? এই নিয়ে ভাবনা ও বিশ্লেষণের শেষ নেই। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ মনে করেন, এই অভিযান বেশি দিন চলবে না। শিগগির তিনি এটা শেষ করতে চান। প্রতিরক্ষা

মন্ত্রী বলেছেন, বোমাবর্ষণ করে তালেবানদের অত্যন্ত দুর্বল করে দেয়া হয়েছে। তারা এখন থেকে আমেরিকার সামরিক শক্তির অর্থ বুঝতে পারবে। কিন্তু সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন রোমে বলেছেন, এই অভিযান সময় সাপেক্ষ। আক্রমণে

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ চান পবিত্র রমজান মাসের আগেই অভিযান শেষ হোক। বেশ কিছু মুসলিম দেশ, যারা এই 'Anti-Terrorism' কোয়ালিশনে যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করছে। বলছে, রমজান মাসে এই আক্রমণ চালানো ঠিক হবে না। স্পষ্টত, আরব ও মুসলিম দেশে মার্কিনিদের পক্ষে যে সমর্থন আগে ছিল, সেটা কমছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। সাংহাইয়ে সাম্প্রতিক APEC শীর্ষ সম্মেলনে ইন্দোনেশীয় ও মালয়েশিয়ার সরকার প্রধানরা বলেছেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ প্রয়োজন, কিন্তু মার্কিন আক্রমণে বেসামরিক নাগরিকসহ অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতিতে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পাকিস্তান ও ভারতে আমেরিকাকে দু'দেশের সরকার কর্তৃক সমর্থন ও বিভিন্ন সামরিক সহায়তা দেয়ার সিদ্ধান্ত সমালোচিত হচ্ছে।

বাম বিরোধীরা সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে দশ বছর যুদ্ধ করতে পেরেছিল এই কারণে যে, তারা আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশের আর্থিক ও সামরিক সাহায্য পেয়েছিল। তাছাড়া সেই সময় পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানের সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু তালেবানরা বস্তুত একঘরে এবং তাদের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা সবার জানা। তাই তারা কতদিন অবস্থান ধরে রাখতে পারবে, এ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে এবং সেটাই থাকার কথা।

তবে, তাদের পক্ষে রয়েছে আফগানিস্তানের বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য যা বহিরাগতদের জন্য অনুকূল নয়। মার্কিন স্থলবাহিনীর কমান্ডোরা প্রথমে সুবিধা করতে পারেনি। তবে বড় ধরনের মার্কিন স্থল আক্রমণ অনিবার্য। এছাড়া তালেবানদের পর্যুদস্ত করা বেশ কঠিন। তারা চাইছে Northern Allience-এর মাধ্যমে তালেবানদের পরাজিত করতে। কিন্তু এদের এক শীর্ষনেতা আবদুল হককে ধরার পর হত্যার মাধ্যমে তালেবানরা এই ম্যাসেজই দিতে চেয়েছে যে, বিরোধীদের উৎখাতে তারা বদ্ধপরিকর। এছাড়া কেউ পছন্দ করুক আর নাই করুক এটা সত্য যে, তালেবানরা একটা বিশেষ আদর্শে উদ্বুদ্ধ। তাই তাদের নীতির জন্য তারা হয়তো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেতে পিছপা হবে না। এদের নেতা মোল্লা ওমর বিভিন্নভাবে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। অবশ্য সেটা কত দিন পারবেন, এ নিয়ে সন্দেহ আছে।

বিন লাদেনকে ধরা সম্ভব হবে কিনা, এ নিয়ে খোদ আমেরিকায় প্রশ্ন রয়েছে। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, আমেরিকার জন্য সেটা এখন আর অগ্রাধিকার নয়। কিন্তু প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড মনে করেন, লাদেনকে জীবিত কিংবা মৃত পাকড়াও করার সিদ্ধান্ত অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট বুশ CIA-কে এ বিষয়ে অভূতপূর্ব ক্ষমতা দিয়েছেন। একই সঙ্গে সংবাদে প্রকাশ যে লাদেন কোন অবস্থায়ই ধরা পড়বেন না। তার কাছে নাকি আণবিক শক্তিসম্পন্ন অস্ত্রাদি আছে। প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করবেন। লাদেন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের হোতা। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তার সম্পৃক্ততা ছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসে তার ভূমিকা অস্বীকার করছেন। আর সেটা সমর্থন করছে তালেবানরা।

আফগানিস্তানে যুদ্ধ কত দিন চলবে, সেটা নির্ভর করছে স্থল আক্রমণের ধারা ও সাফল্যের ওপর। তালেবানদের বদলে বিকল্প আফগান সরকার নিয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা ও এর সফলতার বিষয়টিও এখানে জড়িত। বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং গোষ্ঠী পাকিস্তান

www.pathagar.com

ও ভারত এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। সব কিছু মিলিয়ে আফগান সঙ্কট শিগগির সমাধান হবে, এটা মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাও থাকতে পারে দীর্ঘ দিনের ইতিহাসের রক্তক্ষয়ী আফগানিস্তানে আর প্রচুর রক্ত ঝরবে। এই ক্ষত শুকোবার নয়। সাবেক সোভিয়েত আর বর্তমান মার্কিন আক্রমণের মাঝে গুণগত ব্যবধান আছে সত্য, কিন্তু এই সমস্যার দীর্ঘস্থায়িত্ব সম্পর্কে একটা সাদৃশ্য থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য অসাধ্য না হলেও কষ্টসাধ্য। আফগান ইতিহাসও অনেকটা তাই বলে। ❑

১৩ নভেম্বর ২০০১

এই শিশুটি কি জানে আলকায়দা কি ?

www.pathagar.com

আফগান পরিস্থিতি এই অঞ্চলের রাজনীতি কতটা বদলে দেবে ?

(তিন)

সংঘাতমুখর ও দীর্ঘদিনের ক্ষতবিধ্বস্ত দেশ আফগানিস্তানে আবার ক্ষমতার পালাবদল ঘটছে বা ঘটেছে। একটি ছোট দেশ হলেও আফগানিস্তানের ঘটনাবলী সব সময়ই শুধু এই অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিবেশকেই প্রভাবিত করেনি, সারাবিশ্বের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে বিভিন্ন মাত্রায় পরিবর্তন করেছে। এর একটু মুখ্য কারণ হল আফগান ঘটনাপঞ্জিতে বৃহৎ শক্তির সম্পৃক্ততা। পূর্বে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন যা ছিল সেই সময়ের দুটি পরাশক্তির অন্যতম দেশটির অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিল আর সেই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরোক্ষভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালিয়েছে আফগানিস্তানে। সে সময় দুটি পরাশক্তি দীর্ঘ দশ বছর আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে তাদের সামরিক শক্তির ব্যাপকতা প্রদর্শন করেছে। ১৯৭৯ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন কাবুলে বামপন্থী সরকারের সমর্থনে সৈন্য প্রেরণের মধ্য দিয়ে মস্কো-ওয়াশিংটনের ঠাণ্ডা লড়াই আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে সরব যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আফগানিস্তান থেকে বহুদূরে অবস্থিত আমেরিকা সেদিন কাবুলের বামপন্থীবিরোধী 'মুজাহেদিন' শক্তিকে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা ও সাহায্য করে। পাকিস্তান আফগানিস্তানের একটি 'ফ্রন্টলাইন' দেশ হওয়ায় সেই সংকটে মার্কিন সাহায্যের একটি বড় অংশ যায় ইসলামাবাদের অনুকূলে। পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল পারভেজ মোশাররফ বর্তমান আফগান সংকটের সময় যেভাবে ক্ষমতায় আছে, সেই সময় আরেক সামরিক প্রধান জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষততায় ছিলেন সেই দেশে। আফগান যুদ্ধের ফায়দা নিতে কুণ্ঠিত হননি তিনি। দীর্ঘ দশ বছর পর সোভিয়েত সৈন্যের আফগানিস্তান ত্যাগের মধ্য দিয়ে সেই সংকটের একটা সমাধান হলেও 'মুজাহেদিন'দের অভ্যন্তরীণ সমস্যাও শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের কারণে দেশটি আর অতি আকাঙ্খিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

www.pathagar.com

পায়নি। প্রেসিডেন্ট বুরহানউদ্দিন রব্বানির দুর্বল সরকারকে ১৯৯৬ সালে সরিয়ে ক্ষমতায় আসে 'তালেবান' শক্তি। পাঁচ বছর পর রাজনৈতিক চালচিত্রের কি এক অভিনব পরিবর্তন। কাবুলে 'তালেবানরা' ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে আর দেশের রাজধানীতে ফিরে নিজেকে বৈধ সরকারপ্রধান হিসেবে দাবি করেছেন বুরহানউদ্দিন রব্বানী।

আফগান পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং প্রায় প্রতিদিনই নতুন সংবাদ সৃষ্টি হচ্ছে দেশের ঘটনাবলী নিয়ে। তথাপি একটি চিত্র স্পষ্ট আর সেটা হচ্ছে এই যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে ক্ষমতায় যারা ছিল গত পাঁচ বছর তারা সেই অবস্থানে নেই। বিরোধীরা সেই অবস্থানে চলে এসেছে আন্তর্জাতিক সাহায্য নিয়ে 'তালেবান' বিরোধীরা সর্বাত্মক সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য পেয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও এর প্রধান মিত্র ব্রিটেন থেকে। দিনের পর দিন সীমাহীন বোমাবর্ষণের মধ্য দিয়ে 'তালেবান'দের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে আমেরিকা ও ব্রিটেনের অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমানগুলো। বিরোধী Northern Allianec যারা গত পাঁচ বছর যাবৎ আফগানিস্তানের মাত্র পাঁচ শতাংশ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করত তারা দখল করেছে কাবুলসহ বিভিন্ন অঞ্চল। আর বর্তমান সংকটের একটি আগ্রহের দিক হল এই যে, যে রাশিয়া পূর্বে আমেরিকাকে পরোক্ষভাবে প্রতিহত করেছে আফগানিস্তানে তারা এবার সমর্থন ও সাহায্য করেছে 'তালেবান' বিরোধীদের। অর্থাৎ আমেরিকা ও রাশিয়া সমর্থন এবং সামরিকভাবে সাহায্য করেছে একই পক্ষকে।

অবশ্য এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বর্তমান রাশিয়ান ফেডারেশন আদর্শগতভাবে ভিন্ন যদিও ভৌগোলিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকাংশ অংশ নিয়েই বর্তমান রাশিয়ান ফেডারেশন গঠিত। সাবেক সোভিয়েতরা ছিল কমিউনিস্ট। আর বর্তমান রাশিয়া গণতান্ত্রিক। তাই মস্কো ও ওয়াশিংটনের মাঝে একটি বড় নীতিগত ব্যাপারে আর সমস্যা নেই। বরং বর্তমান রাশিয়া পাশ্চাত্য দেশগুলোর মতই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মৌলিক নীতির ক্ষেত্রে। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর আমেরিকাই একমাত্র পরাশক্তি। পূর্বের আর বর্তমান আফগানিস্তান সংকটের মাঝে কত বৈপরিত্য। এবার আরও একটি বিষয় অত্যন্ত লক্ষণীয়। তাহল যে পাকিস্তান পূর্বে কাবুলের 'তালেবান' সরকারের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিল, তারাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে তালেবানবিরোধী কোয়ালিশনের অংশ। রাজনীতিতে যেমন শেষ কথা বলতে কিছু নেই, একইভাবে নেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। সেটাই প্রতিফলিত হয়েছে বর্তমান আফগান পরিস্থিতিতে।

আফগান সংকটের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে এবং পড়বে এই দেশের কাছাকাছি অঞ্চলসমূহে। দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব এশিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে এই সংকটের প্রভাব পড়বে সবচেয়ে বেশি। এরই মাঝে বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে সেই প্রতিক্রিয়ার সূচনা এবং এটাই প্রত্যাশিত যদিও মনে হচ্ছে যে, আফগান সংকট সত্যিকার অর্থে সহসা পুরোপুরি নিরসন হবে না।

যদিও আফগানিস্তান দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, তবু আফগান সংকট ও যুদ্ধের প্রভাব পড়ছে সবচেয়ে বেশি এই অঞ্চলে। পাকিস্তান ও ভারত এই দক্ষিণ এশিয়ার দু'টি প্রধান দেশ। তারা কম-বেশি জড়িয়ে পড়েছে এই সংকটে। বেশি জড়িয়েছে পাকিস্তান। অবশ্য এর কারণ রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এবং দীর্ঘদিনের কাবুল-ইসলামাবাদের

www.pathagar.com

মাঝে ধর্মীয় ও অন্যান্য নৈকট্যের জন্য পাকিস্তান সেই দেশটির ভাল-মন্দ থেকে দূরে থাকতে পারে না। যেমনি পারে না ইরান। অন্যদিকে সাবেক সোভিয়েত থেকে বর্তমান স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উজবেকিস্তানও বিভিন্নভাবে আফগান পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইরান 'তালেবান'দের বিরোধী শক্তির সমর্থক। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই দেশের সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ রয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তান পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়েই 'তালেবান' বিরোধী অবস্থান নিয়েছে। অবশ্য পাকিস্তানের সরকার ও অধিকাংশ জনগণের মাঝে এই বিষয়ে ভিন্নতা রয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। কেননা, পাকিস্তানে সরকারের বিরুদ্ধে আফগান নীতির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়েছে। উজবেকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমভাবে সাহায্য করেছে। তাই মনে করা যেতে পারে যে, আফগানিস্তানে 'তালেবান'বিরোধী জোটের যুদ্ধে সফলতা সেই দেশের প্রতিবেশীরা স্বাগত জানিয়েছে। পাকিস্তানও সরকারিভাবে 'তালেবান'দের পক্ষ আর অবলম্বন করতে পারছে না। বরং 'তালেবান'বিরোধী বক্তব্য দিচ্ছে।

স্পষ্টত, ভারত আফগানিস্তানে ক্ষমতার পটপরিবর্তনে খুশি হয়েছে। কেননা, 'তালেবানরা' ছিল নতুনদিল্লির চিরশত্রু ইসলামাবাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এমন কি অনেকেই মনে করেন 'তালেবানরা' পাকিস্তানেরই সৃষ্টি। তাই এই 'তালেবান'দের কাবুল থেকে বিদায় ভারতের কাছে সুসংবাদ। 'তালেবান'রিরোধী জোট স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের প্রতি নমনীয় নয়। বরং কঠোর মনোভাব পোষণ করে আসছে। তাই ভারত মনে করছে, পাকিস্তানের প্রভাব এই অঞ্চলে এখন কমতে বাধ্য এই কারণে যে, কাবুলে এখন আর ইসলামাবাদের অনুগত কোন সরকার নেই। এটা সত্য যে, আফগানিস্তানের পরিবর্তন পাকিস্তানের বিপক্ষে গিয়েছে। হয়তো এছাড়া কোন উপায় ছিল না।

আফগান সংকটকে কেন্দ্র করে এবং আমেরিকাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহায়তা করে ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা আদায় করে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশ থেকে। দু'টি দেশ রীতিমতো প্রতিযোগিতায় নেমেছে কে কার চেয়ে বেশি সুবিধা নিতে পারে। একই সঙ্গে কে কাকে কোণঠাসা করতে পারবে, সে লক্ষ্যে কারও কমতি নেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা সফর করেছেন এবং প্রেসিডেন্ট বুশের সঙ্গে কথা বলেছেন। বাজপেয়ি রাশিয়াও সফর করেছেন এবং নতুন আফগান সরকারে দু'টি দেশের প্রাধান্য রাখার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।

আফগান পরিস্থিতি প্রভাব ফেলছে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কি রূপ ধারণ করে, তার ওপর নির্ভর করবে প্রভাবের বিভিন্ন দিক। তবে এটা অনস্বীকার্য যে বৃহৎ শক্তিবর্গ এবং আঞ্চলিক দেশসমূহ এই পরিস্থিতি অবলোকন করছে একদিকে আগ্রহ ও অন্যদিকে উৎকণ্ঠা নিয়ে। যার যার স্বীয় স্বার্থই এখানে মুখ্য। ❑

২৯ নভেম্বর' ০১

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের নবযাত্রা-দেশটি স্থিতিশীল হবে কি ?

(চার)

যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে এক নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হল ২২ ডিসেম্বর একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ গ্রহণের মাঝ দিয়ে। একটি বিতর্কিত ও অত্যন্ত ঘটনাবহুল পর্যায়ের পর শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেছে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার-যার প্রধান হয়েছেন হামিদ কারজাই। সেটা সম্ভব হয়েছে বেশ কিছুদিনের প্রাণান্ত চেষ্টার পর। জার্মানীর বন-এ বিভিন্ন আফগান উপদলের মাঝে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় অনুষ্ঠিত প্রায় সপ্তাহব্যাপী জটিল আলাপ-আলোচনার পরই বিভিন্ন তালেবান বিরোধী উপদল আফগানিস্তানে একটি সাময়িক সরকারের রূপরেখার বিষয়ে সম্মত হয় এবং সেই আলোকেই অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হামিদ কারজাই-এর নেতৃত্বে ৩০ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রীসভা দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

আফগানিস্তানের রাজনৈতিক চিত্রের 'তালেবান-বিরোধী বিভিন্ন পক্ষ রয়েছে, এই সরকারে-যার মেয়াদ হবে ছয় মাস। এর পর দেশের ঐতিহ্য অনুযায়ী একটি উপজাতি ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক সভা নির্বাচিত হবে এবং সেই 'সভাটি' একটি বিশেষ সময়সীমার মাঝে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবে। নিঃসন্দেহে আফগানিস্তানের মত একটি দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা আনয়নে এবং একটি কার্যকরী সরকার ও শাসন ব্যবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ প্রশংসার দাবি রাখে। কেননা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত তালেবান বিরোধী শক্তিরা তাদের অভিন্ন শত্রু তালেবানদের পতনে উৎফুল্ল হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে তাদের পুরনো বিরোধ এবং জাতিগত ও অঞ্চলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবার ধীরে ধীরে প্রকট হবার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে।

গত পাঁচ বছরের তালেবান শাসনের সময় তাদের ব্যবধান একতায় রূপান্তরিত হয়েছিল এই কারণে যে, তখন অভিন্ন প্রতিপক্ষকে সরানোই ছিল তাদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন। কিন্তু যখনই অবিরাম মার্কিন বোমা-বর্ষণে এবং উত্তরাঞ্চলীয় যোদ্ধাদের আক্রমণে তালেবানদের অবস্থান দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে, তখনই এসব উপদলের মাঝে

www.pathagar.com

বিভিন্ন প্রশ্নে মতবিরোধের সূত্রপাত হতে থাকে। এমনি পটভূমিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎসাহে এবং জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে জার্মানীতে আলোচনাটি ছিল অত্যন্ত জরুরী এবং জটিল। তালেবান বিরোধী চারটি উপদলীয় নেতারা দীর্ঘ ও কঠিন আলোচনার পরই মতপার্থক্য যতদূর সম্ভব নিরসন করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও কাদের সমন্বয়ে এই সরকার গঠিত হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সমর্থ হয়ে। এই প্রেক্ষাপটেই ২২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আফগানিস্তানে ক্ষমতা গ্রহণ করে।

মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠক দেশ পুনঃগঠনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সবারই এখন থেকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে আফগানিস্তানের দিকে। মূলত, কয়েকটি বিয়য়ের প্রতি আগ্রহ ও কৌতূহল থাকার কথা। যেমন বিভিন্ন উপদল নিয়ে গঠিত এই সরকার কতদূর সক্ষম হচ্ছে দেশ পরিচালনায়? দেশটি তালেবানমুক্ত হলেও তালেবানদের প্রভাব বিভিন্নভাবে এখনও রয়ে গেছে এবং কিভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই সমস্যা এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক উপজাতীয় নেতাদের নিয়ন্ত্রণ করবে? দেশটির পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সাহায্যের অভাব হবে না কিন্তু সেই সুযোগ সার্থকভাবে গ্রহণ করার মত বিচক্ষণতা কি দেখাতে পারবে হামিদ কারজাই-এর সরকার? আফগান সংকটকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে অনেক দেশই স্বীয় স্বার্থকে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। এ বিষয়ে কতটুকু সজাগ রয়েছে এ সরকার এবং একটি স্বাধীন নীতি যা দেশের এবং মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণ নিশ্চিত করে কি অনুসৃত করতে পারবে এই সরকার? সর্বোপরি আফগান জনগণের সামাজিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য মূল্যবোধকে সম্মান দেখিয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে হতাশাগ্রস্ত এই দেশটিকে কি আলোর সূচনা দেখাতে পারবেন হামিদ কারজাই ও তার মন্ত্রীরা? এই বিষয়গুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কেননা ঐতিহাসিক দায়িত্ব আজ পড়েছে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ওপর এবং এই কাজের সার্থক বাস্তবায়নের ওপরই নির্ভর করছে হতভাগ্য দেশটির ভবিষ্যত।

আমরা অনেকেই আফগানিস্তানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলীওয়ালা', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে', 'শবনম'সহ ইত্যাদি রচনাসম্ভারের কারণে। যদিও দেশটি আমাদের চেয়ে বেশি দূরে নয়, তথাপি এটা অনস্বীকার্য যে, আফগানিস্তান সম্পর্কে আমরা এতটা পরিচিত নই যতটা কাছাকাছি অন্যান্য দেশ সম্পর্কে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে বিগত দুই দশকের বেশী সময় ধরে বিভিন্ন ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে এই দেশটি আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্ববাহী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৯ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানে বামপন্থী সরকারের সমর্থনে সৈন্য প্রেরণের পর থেকে দেশটি পৃথিবীর শিরোনামে চলে আসে। এর পূর্বে ১৯৭৩ সালে চাচাত ভাই ও ভগ্নিপতি মোহাম্মদ দাউদের হাতে রাজা জহীর শাহর ক্ষমতা থেকে উৎখাতের পর থেকে দেশটির ইতিহাস চলেছে একটি রক্তাক্ত পথে। হাফিজুল্লাহ আমিন, নূর মোহাম্মদ তারাকী-বামপন্থী দলের বাবরাক কারমাল কিংবা নজীবল্লাহ সবাই এই অধ্যায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

দশ বছরের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর সোভিয়েত সৈন্যরা আফগানিস্তান ছেড়ে যায় কিন্তু বিজয়ী 'মুজাহেদীন'রা তাদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। প্রেসিডেন্ট

www.pathagar.com

বুরহানউদ্দীন রাব্বানীর সরকার অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জর্জরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ সালে 'তালেবান' নামে তুলনামূলকভাবে গভীর ধর্মীয় অনুশাসনে বিশ্বাসী নতুন গোষ্ঠীর কাছে ক্ষমতা দিতে বাধ্য হয়। এটা হয়েছে রক্তাক্ত পথে এবং কাবুল থেকে বিতাড়িত রাব্বানী ও তার সমর্থকরা নিজেদেরই আইনগতভাবে দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বলে দাবি করে এসেছে।

উগ্রপন্থী 'তালেবানদের' শক্ত অবস্থান নড়বড়ে হতে শুরু করে ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে। আমেরিকা মনে করে আফগানিস্তানে বাসকারী এবং তালেবানদের কাছে অত্যন্ত প্রভাবশালী ধনকুবের সৌদি ভিন্ন মতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেনই 'তালেবানদের' সমর্থন নিয়ে এই সন্ত্রাসী কাণ্ড ঘটিয়েছেন। এর পরের ইতিহাস সবার জানা।

একটা বিরাট প্রত্যাশার মাঝ দিয়ে একটি নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে দেশটিতে। বলাবাহুল্য, দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধ এবং সাম্প্রতিককালের মার্কিন বোমাবর্ষণ বড় বড় শহরসহ বিভিন্ন অঞ্চলকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে। এই ধ্বংসের মাঝ দিয়ে দেশটিকে একদিকে গড়ে তোলা এবং সম্ভাব্য সবার সঙ্গে সম্মতি রেখে একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে নতুন দিক সূচনা করার দায়িত্ব বর্তেছে কারজাই সরকারের ওপর। এটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই সরকারের প্রধান পদটির প্রতি তালেবান-বিরোধী বিভিন্ন শক্তির অনেকেরই আকর্ষণ থাকায় হামিদ কারজাই ঈর্ষা ও অসহযোগিতার শিকার হবেন বিভিন্ন মাত্রায় যদিও তিনি প্রকাশ্যে সমর্থনের অঙ্গীকার পেয়েছেন।

যেমন 'মাজার-ই-শরীফ' অঞ্চলের শক্তিধর ব্যক্তি আবদুর রশীদ দোস্তাম বলেছেন যে, তিনি এবং তার সমর্থকরা সরকারে মর্যাদা পাননি এবং সেই কারণে তার প্রীত হওয়ার কোন কারণ নেই। মূলত চারটি উপদলের মাঝে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের মাঝে দফতর নিয়ে মন কষাকষি রয়েছে। এর মাঝে একটি নারী সংগঠন পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুল্লা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইউনুসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কারণে বিষোদগার করেছে। তাই একতা বজায় রেখে কাজ করা হামিদ কারজাই-এর জন্যে দুষ্কর। তাছাড়া এখন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও অন্যান্য বড় দেশ যারা 'তালেবান' উৎখাতে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সাহায্য করেছে, স্বীয় স্বার্থ চিন্তা করে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

রাশিয়া মনে করে, হামিদ কারজাই অতি মাত্রায় মার্কিন মনোভাবসম্পন্ন। প্রতিবেশী পকিস্তান ও ইরানের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রাখাও এই সরকারের একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। উপজাতীয় নেতারা অত্যন্ত ক্ষমতাশীল কিছু এলাকায় তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা একটি কঠিন কাজ। দেশে 'তালেবানদের' সমর্থকও আছে। সবকিছু মিলে বিভিন্নমুখী বাস্তবতার সম্মুখীন হবে এই সরকার। তথাপি আফগানিস্তানে একটি নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা রচিত হয়েছে। এর সদ্ব্যবহার করতে হবে এটাই প্রত্যাশা। দেখার বিষয়, হতভাগ্য আফগানিস্তানে এই আশা পূরণে নতুন প্রশাসন কতটুকু সমর্থ হয়। ❑

ডিসেম্বর '০১

www.pathagar.com

নিরাপত্তার মূল্য কত ?

কুলদীপ নায়ার

*১১ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার-এর টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনের ওপর ভয়াবহ হামলা সারা পৃথিবীকে সচকিত করেছে। পাকিস্তান ইতিমধ্যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকাকে সহায়তার জন্য তৈরি। বাংলাদেশ কিন্তু ভারতের ভূমিকা কী হবে-এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন সে দেশের প্রবীণ ও বিখ্যাত কলামিস্ট **কুলদীপ নায়ার**। পাঠকদের জন্য তৈরী করেছেন **আহমদ জামান চৌধুরী***

হঠাৎ করে কারও জীবনে অবর্ণনীয় হাহাকার ও কল্পনাতীত ট্র্যাজেডির জন্ম হল এবং নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের পুরো ভিতই ধ্বংস হয়ে গেল-তখন কারও কারও কাছে কেমন মনে হবে ? এই জ্বলন্ত প্রশ্নেরই মুখোমুখি আজকে আমেরিকা এবং বাকি দুনিয়া। এটা ঠিক, বেঁচে থাকা মানুষ ধসে যাওয়া ইমারতের আবর্জনা আবার একদিন না একদিন সরিয়ে সাফ করতে পারে, যা আমেরিকানরা এখন সর্বোচ্চ কর্মতৎপরতার সঙ্গে পালন করছে, আমেরিকান প্রশাসনের মতোই অন্যরাও বিমানবন্দর, সরকারি দফতর বা অন্যত্র নিরাপত্তারক্ষী বসাতে পারেন। কিন্তু সাধারণ নাগরিকের মনে সেই নিরাপত্তার বোধটি আমরা কি করে ফিরিয়ে আনব যারা একদিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাকে আবার সন্ত্রাসী হামলা কিংবা যে কোন বিপর্যয় থেকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য ?

আমেরিকায় যে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল তাতে এটাই পরিষ্কার হল যে, সবচেয়ে শক্তিমান জাতিও এখন অসহায় যখন প্রত্যক্ষ আক্রমণের বদলে হাইজ্যাক বিমান ও আত্মঘাতী স্কোয়াডের আক্রমণে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। ওয়াশিংটনের মার্কিন প্রশাসন হয়তোবা সঠিক যখন তারা বলছে, অপরাধীকে খুঁজে বের করা হবে ও উচিত শাস্তি পাবে। কিন্তু তাদেরকে শাস্তি প্রদান করে রোগের লক্ষণকেই দমানো যাবে-রোগকে নয়। এই রোগ হচ্ছে উগ্রবাদ, যা মানুষের মনমানসিকতায় এমনভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হয় যাতে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তাদের ধর্ম এবং বিশ্বাসই হচ্ছে সঠিক, অন্য কারোটা নয়, লাখ লাখ মানুষ যারা গণতন্ত্র ও উদার ভাবধারায় বিশ্বাস করেন তাদের তুলনায় উগ্রবাদীদের সংখ্যা পৃথিবীর দেশগুলোতে অনেক কম। কিন্তু যেহেতু তারা সংখ্যায় কম, সে জন্য উগ্রবাদী পথেই আশ্রয় নিয়ে এমন ঘটনা ঘটায় যেমনটা ঘটিয়েছে আমেরিকায়। সহিংসতা সর্ব অর্থেই শান্তির বিকল্পে দণ্ডায়মান।

www.pathagar.com

উগ্রবাদের কাঁটাতারের ওপর ভারতের বসবাস দীর্ঘদিনের। এই উগ্রবাদে হাজার হাজার প্রাণহানি ঘটেছে এবং কবে যে এর শেষ তাও অজানা। অপরাধীরা পাতাল অপরাধ জগত বা অন্য সম্প্রদায়ের হতে পারে, কিন্তু চরম পন্থাই পরিষ্কার- অর্থাৎ অন্য সম্প্রদায়ের যারা ভিন্নমত পোষণ করে তাদের বিনাশ করে। বস্তুত যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যসহ অনেক দেশই রক্তাক্ত ভারত দেখেছে। কিন্তু এসব দেশ এমন ধারণা কখনও দেয়নি যে উগ্রবাদের শিকার ভারতের পাশে তারা দাঁড়াবে। আমেরিকা নিজে যখন উগ্রবাদের সর্বাত্মক শিকার হয়েছে তখনই তারা এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলছে।

আমেরিকা ধ্বংসযজ্ঞের পরিকল্পনা নিশ্চয়ই অনেক দিনের। অনেক লোক, যারা এই পরিকল্পনাকে পুঙ্খানুপঙ্খানুভাবে বাস্তবায়িত করেছে, তারাও নিশ্চয়ই ছড়ানো ছিটানো ছিল। কোন সূত্র তাদের এভাবে একত্রিত করেছে ? এটা কী নতুন কোন মতবাদ যা রূপ নিতে যাচ্ছে। অপরাধীরা কারা ? উগ্রবাদের হাতে যারা পুতুল এজন্য কী তাদেরই অভিযুক্ত করতে হবে ? নাকি এদের মদদদাতাদেরও যারা এর অর্থায়ন করেছে এবং তাদের শনাক্ত করতে হবে ? সেই দেশগুলো কারা ? তাদের শাসকরা কারা ? ভারতের মতো বহু মতের সমাজ উগ্রবাদের শিকার হয়েছে। উগ্রবাদ বহু মানুষকে বিভ্রান্তও করেছে। (কাশ্মীরের) হুরিয়াত এই উগ্রবাদকে খুবই নরম ভাষায়, পাকিস্তানের মতো, নিন্দা করেছে। এদের কারণেই ইসলামের মতো শান্তিবাদও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ সাম্প্রতিককালে উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে, বিলম্বে হলেও কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন। পাকিস্তানিরা এখন দেখছে, তাদের সমাজ কীভাবে তালেবানি হতে শুরু করেছে। মোশাররফ নিশ্চয়ই স্বাধীনতাকে উগ্রবাদ বলে চাপিয়ে দিতে পারেন না। দেখা যাচ্ছে, তিনিও দুই ঘোড়ার পিঠে একই সঙ্গে সওয়ারি হয়েছেন। ওয়াশিংটন তখন দিল্লিকে আমলে আনেনি যখন সে বলেছিল, ভারতের মতো উগ্রবাদী ঘটনা যে কোন দেশে ঘটতে পারে। আমেরিকা তখন বিষয়টিকে ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসাবে একপাশে সরিয়ে রেখেছে। তবে এখন দেশগুলোর সময় নেই, কার কী ক্ষতি সাধিত হয়েছে সেটা বিচার করার। এখন সময় এসেছে উগ্রবাদের কারণ দূর করার। সময় এসেছে, যারা বা যেসব দেশ এসব অপরাধের পৃষ্ঠপোষকতা করছে তাদের সনাক্ত ও শাস্তি প্রদান করা।

তবে কাউকে হঠাৎই দোষী করা যাবে না। তাহলে সমবেদনা আদায় করার মতো ভিত তারা খুঁজে পেতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এটা দেখা উচিত যে, শুধু রাজনৈতিক কারণে ওয়াশিংটন যেন কাউকে পাকড়াও করে শাস্তি প্রদান করতে না পারে। যে পৃথিবীতে বহু স্বার্থের এক সঙ্গে বসবাস, সেখানে একক স্বার্থ বা অগ্রাধিকারের প্রাধান্য পাওয়া উচিত নয়।

ভারত যদি মনে করে এই চ্যালেঞ্জ নিরাপত্তাকে বিপন্ন করছে না তাহলে জনগণের সমর্থন নিয়ে চ্যালেঞ্জে সামনা-সামনি হওয়া উচিত। নিরাপত্তায় জনগণকে সংশ্লিষ্ট করা বাস্তবতারই স্বীকৃতি বলে বিবেচিত হবে।

কিছু সমাজ নিরাপত্তা যে তাদের অসার ও অবাস্তব ধারণা গড়ে নেয় যা শেষ পর্যন্ত আমেরিকার মতো বিপর্যয় ও ট্র্যাজেডির জন্ম দিয়ে থাকে। কিন্তু আমেরিকাই হচ্ছে তার বড় দৃষ্টান্ত যা দেয়ালের ওপারের মতো শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা কম্যুনিস্ট পৃথিবীর সুরক্ষার দুর্গে প্রবেশ করতে পেরেছিল এবং সেটা ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এবারকার ঘটনা

www.pathagar.com

গোয়েন্দা তৎপরতার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা ও কলঙ্ক। এজন্য কিছু গোয়েন্দাবিশারদকে শনাক্ত হতে হবে। কিছু রাঘববোয়ালকে পদত্যাগে বাধ্য করতে হবে। (১১ সেপ্টেম্বরের) ধ্বংসযজ্ঞ ওয়াশিংটনকে, হঠকারিতার বদলে, নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে নিরহঙ্কার ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। সে কী সময়ের শিক্ষা গ্রহণ করবে ? ❑

২১ সেপ্টেম্বর' ০১

লেখক ঃ ভারতীয় কূটনৈতিক, সাংবাদিক।

কে বলে দেবে এদের ভবিষ্যৎ।

www.pathagar.com

আফগানরা কখনও হারেনি

গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনের সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ঘোষণাকে ইতিহাস সায় দিচ্ছে না। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অতীতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যেসব দেশ আঘাত হেনেছে তারা সবাই নাকানি-চুবানি খেয়েছে। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, চেঙ্গিস খান, ব্রিটিশ থেকে শুরু করে সর্বশেষ সোভিয়েত ইউনিয়নও তাদের সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিল আফগানিস্তানে। এতে তাদেরকে চরম শিক্ষা পেতে হয়েছিল। সোভিয়েত নেতা গর্বাচেভ আফগানিস্তানকে 'রক্তাক্ত ক্ষত' আখ্যা দিয়েছিলেন। ১০০ বছরেরও বেশি আগে একজন ব্রিটিশ ভাইসরয়ও বলেছিলেন আফগানিস্তান হচ্ছে 'বিষাক্ত পানপাত্র'। ১৮৩০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার এবং আফগানিস্তানের মধ্যে তিনটি বড় ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ব্রিটিশরা চেয়েছিল আফগানিস্তানে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছিল বেশি। চরম মূল্য দিতে হয়েছিল ব্রিটিশকে। সিএনএন/এপি।

১৮৪২ সালে কয়েক হাজার ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সৈন্য আফগানিস্তানের গহীন পাহাড়ি এলাকা দিয়ে আফগানিস্তান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় আফগান যোদ্ধারা তাদের নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ ঘোষণা করে। দীর্ঘ ১০ বছর ব্যাপী এই যুদ্ধে কমপক্ষে ১৫ হাজার সোভিয়েত সৈন্য নিহত হয়। রাশিয়ার প্রখ্যাত যুদ্ধবিদ লিও করলভ 'সোভিয়েত স্পেশাল অপারেশন ইউনিট'কে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। এই বাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের ডেলটা ফোর্স এবং ব্রিটিশ এসএএস-এর সমপর্যায়ে ছিল কিন্তু অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট, লেসার গাইডেড মিসাইল প্রভৃতি এসব পাহাড়ি লোকদের ঘায়েল করতে পারেনি।

সিএনএন'র জিল ডয়ার্থি বলেন, আফগানিস্তানে হামলার জন্য কোন মানচিত্র, কোন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কাজে লাগবে না। এটা এমন একটি দেশ যেখানকার প্রতিটি টিলা, প্রতিটি গুহা শত্রুদের অতি পরিচিত। তিনি বলেন, 'আমি সেসব লোকের জন্য দুঃখ অনুভব করছি যাদেরকে গহিন পাহাড়ি অঞ্চলে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। করলকভ বলেন, আফগানিস্তানে গিয়ে লাদেনকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ সেখানে বহু জায়গা রয়েছে যেখানে লাদেন লুকিয়ে থাকতে পারে। তিনি বলেন, সোভিয়েত

www.pathagar.com

ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময় সোভিয়েত বাহিনীকে আফগানদের গেরিলা এবং আত্মঘাতী হামলার শিকার হতে হয়েছে। করলকভ বলেন, তিনি দেখেছেন মারাত্মকভাবে আহত আফগান যোদ্ধাও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি ছুড়তে থাকে। তাদের বেশিরভাগই অপারেশনে যাওয়ার আগে নেশা গ্রহণ করে।

লন্ডনের কিংস কলেজের সেন্টার অব ডিফেন্স স্টাডিজের চেয়ারম্যান জন গারনেট বলেছেন, আফগানিস্তানে ভূমিভিত্তিক কোন হামলায় যাওয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বিরত থাকতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বের এ অংশটির ব্যাপারে ১৯ শতকে ব্রিটিশদের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং বেশি দিন আগে নয়, রাশিয়ারও সে অভিজ্ঞতা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি চিন্তাই করতে পারি না যে, এখনই আফগান জনসাধারণের ওপর যুক্তরাষ্ট্র বোমা নিক্ষেপ করবে। করলে তা হবে ভয়ঙ্কর ভুল এবং এতে যুক্তরাষ্ট্রকে বিপুল সমর্থন এবং সহমর্মিতা থেকে বঞ্চিত হতে হবে, যা বর্তমানে কিছুই করে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়েই করতে হবে। অন্যথায় সব সমর্থন হারিয়ে যাবে।

ধারণা করা হচ্ছে, আফগানিস্তানে বর্তমানে বিন লাদেনের আল কাইদা গ্রুপ এবং সহযোগী গ্রুপসমূহের অন্তত ১০ হাজার সদস্য রয়েছে।

সি, এন, এন, এপি,

২১ সেপ্টেম্বর '০১

আত্মরক্ষার এ দৃশ্য.................

www.pathagar.com

লাদেনের পরবর্তী টার্গেট ভারত!

সুমন ইসলাম

সারাবিশ্বে এখন চলছে লাদেন উন্মাদনা। সংবাদপত্রগুলোর প্রথম পাতায় বড় বড় করে ছাপা হচ্ছে তার ছবি। একই সঙ্গে তাকে নিয়ে রচিত হচ্ছে নানা কাহিনী। এসব কাহিনীর বেশিরভাগেরই সত্যতা খুঁজে পাওয়া কঠিন। তারপরও ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের যেন শেষ নেই। যুক্তরাষ্ট্রে হামলা হওয়ার পরই এটা ধরে নেয়া হয় যে লাদেনই হামলার জন্য দায়ী। এ কারণে তাকে পাকড়াও করার চেষ্টা চলছে। প্রশ্ন উঠেছে, লাদেনের পরবর্তী টার্গেট কি ? হিন্দুস্তান টাইমসের এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, লাদেন নিজেই নাকি বলেছেন, তার পরবর্তী টার্গেট হচ্ছে ভারত। তিনি ইতোমধ্যে মুজাহেদীনদের একত্রিত হয়ে ভারতকে টার্গেট করতে আহ্বান জানিয়েছেন। আর গোয়েন্দাদের বিশ্বাস ভারতে অবস্থানরত মার্কিন ভবনগুলো হামলার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে।

গত ১৪ জুন দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল আব্দেল রউফ হাওয়াশ নামের একজন সুদানি এবং অপর চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। এরা মার্কিন দূতাবাসের ভিসা শাখার কাছে একটি গাড়ি বোমা রাখার চেষ্টা করেছিল। পুলিশ বলছে, হাওয়াশের সঙ্গে লাদেনের যোগাযোগ রয়েছে। তবে এটি প্রমাণ করা যায়নি। সূত্র বলছে, এখন শুধু মার্কিন দূতাবাসই নয়, মার্কিন মালিকানাধীন করপোরেশনসমূহও টার্গেটে পরিণত হবে। অভিযোগ রয়েছে, বিন লাদেনের সঙ্গে কাশ্মীরে সক্রিয় জঙ্গি দল হরকাত-উল মুজাহেদিন এবং লস্কর-ই তৈয়েবার যোগাযোগ রয়েছে। লাদেন শেষ পর্যন্ত কি করবেন তাই এখন দেখার বিষয়।

২১ সেপ্টেম্বর' ০১

মিডিয়া কর্মী।

www.pathagar.com

‘ইনফিনিট জাস্টিস’-এর বীজগণিত

অরুন্ধতী রায়

‘প্রতিটি নিহত মার্কিন নাগরিকের জন্য কতোটি আফগানের লাশ চাই ?
আমরা যখন ইনসাফের এই বীজগণিতের ধাঁধা মেলাতে ব্যস্ত, ততোক্ষণে
বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর জোট আফগানিস্তানকে ঘিরে ফেলছে।’
বুকার পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতীয় লেখিকা অরুন্ধতী রায়ের বিশ্লেষণ

পেন্টাগন ও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ১১ সেপ্টেম্বরের অবিবেকী আত্মঘাতী হামলার পর এক আমেরিকান সংবাদগ্রাহক বলেছিলেন, ‘গত মঙ্গলবারের মতো এত পরিষ্কারভাবে শুভ এবং অশুভ নিজেদেরকে এর আগে আর কখনই প্রকাশিত করেনি। যেসব মানুষদের আমরা চিনি না তারা আমাদের চেনাজানা মানুষগুলোকে হত্যা করেছে। আর এ কাজ তারা করেছে ঘৃণার উল্লাসে।’ এ কথা বলেই ওই সংবাদগ্রাহক কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এবার তার সান্ত্বনা ঃ অচেনা লোকগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আমেরিকা। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে লোকগুলো অচেনা, কারণ তাদেরকে টিভিতে দেখা যায় না ঘন ঘন। শত্রুকে ঠিকমতো শনাক্ত করা বা তাদের প্রকৃতি ঠিকমতো অনুধাবন করার আগেই প্রচার আর বাগাড়ম্বরতার আতিশয্যে যুক্তরাষ্ট্র তার সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী এবং মিডিয়াকে যুদ্ধের জন্য সচল করেছে।

সমস্যা হলো, আমেরিকা একবার যুদ্ধে যাওয়া মানেই সেই যুদ্ধ শেষ না করে ফিরে আসার তার আর সুযোগ নেই। আর যুদ্ধে গিয়ে যদি সে শত্রু খুঁজে না পায় সেক্ষেত্রে দেশের বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করার খাতিরে তাকে একটা শত্রু বানিয়ে নিতে হবে। যুদ্ধ একবার শুরু হয়ে গেলে এটি বেগ পাবে। তৈরি হবে এর নিজস্ব যৌক্তিকতা। আর একসময় আমরা ভুলেও যাব যুদ্ধটা ঠিক কী কারণে শুরু হয়েছিল। আমরা এবার চোখের সামনে যা দেখছি, তা হলো বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী একটি দেশ প্রতিক্রিয়াবশত, ক্রোধোন্মত্ত হয়ে এক নতুন ধরনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পুরনো সহজাত প্রবণতার আশ্রয় নিচ্ছে আর এবারই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে সারিবদ্ধ যুদ্ধজাহাজ, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র আর এফ-১৬ বোমারু বিমানগুলোও তার আত্মরক্ষার জন্য অপর্যাপ্ত, সেকেলে অকেজো মনে হচ্ছে।

www.pathagar.com

এই মহাশক্তির পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডারও যেন এক অর্থহীন ভার মনে হচ্ছে। নতুন শতাব্দীর যুদ্ধ শুরু হবে বক্সকাটার, ছোট্ট ছুরি আর শীতল ক্রোধের মতো অস্ত্র দিয়ে। ক্রোধ এক লুকানো অস্ত্র। বিমানবন্দরের শুল্ক কর্মকর্তার চোখকে তা ফাঁকি দিয়ে অনায়াসে দেশের ভেতর চালান হয়ে যায়। বাক্সপেটরা ঘেঁটেও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না এ অমোঘ অস্ত্রকে।

কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে আমেরিকা ? ২০ সেপ্টেম্বর এফবিআই জানায়, বিমান ছিনতাইকারীদের কয়েকজনের পরিচয়ের ব্যাপারে তাদের মনে দ্বিধা আছে। আর ওই একই দিনে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বলেন, আমরা নিশ্চিতভাবে জানি কারা এরা এবং কোন কোন রাষ্ট্র এদের মদদ দিচ্ছে। এ কথা শুনে মনে হয়েছে, প্রেসিডেন্ট সাহেব এমন অনেক কিছু জানেন, যা এফবিআই এবং আমেরিকার জনগণ জানে না।

মার্কিন কংগ্রেসে তার ২০ সেপ্টেম্বরের বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট বুশ আমেরিকার শত্রুকে 'মুক্তির শত্রু' বলে অভিহিত করেন। আমেরিকাবাসী এখন জিজ্ঞেস করছে 'ওরা কেন আমাদের ঘৃণা করে?' বুশ বলেন, 'ওরা আমাদের ধর্মের স্বাধীনতা, কথা বলার স্বাধীনতা, ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা, ভিন্নমত পোষণের স্বাধীনতাকে ঘৃণা করে।' বুশ জনগণকে দুটো কথা বিশ্বাস করতে বলেছেন। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্র সরকার যাদেরকে শত্রু বলে চিহ্নিত করছে, তারাই প্রকৃত শত্রু, যদিও এর পেছনে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। দ্বিতীয়ত, এই শত্রুর প্রকৃত মোটিভ যুক্তরাষ্ট্র সরকার যা শনাক্ত করেছে-তাই। এই দাবির পক্ষেও খুব একটা প্রমাণ নেই।

কৌশলগত, সামরিক এবং অর্থনৈতিক কারণে যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের এ কথা বোঝানো মার্কিন সরকারের জন্য খুব জরুরি যে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি দেশবাসীর অঙ্গীকার এবং 'আমেরিকান ওয়ে অফ লাইফ' আজ হুমকিগ্রস্ত। শোক, সংক্ষোভ আর ক্রোধের এই বাতাবরণে এই তত্ত্ব খাওয়ানো খুব সহজ। কিন্তু তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে খটকা লাগে হামলার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে কেন আমেরিকা অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভুত্বের প্রতীক ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আর পেন্টাগন বেছে নেওয়া হলো? কেন বেছে নেওয়া হলো না 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি'? হতে কি পারে, হামলার পেছনে এই নারকীয় ক্ষোভের শেকড় আমেরিকার মুক্তি আর গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘৃণায় প্রোথিত নয়, বরং প্রোথিত এ দুটোর ঠিক বিপরীত জিনিসে অর্থাৎ সামরিক ও অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ, অভ্যুত্থান, সামরিক একনায়কতন্ত্র, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অকল্পনীয় গণহত্যা ইত্যাদির প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে ?

যুক্তরাষ্ট্রের শোকার্ত জনসাধারণের পক্ষে অশ্রুসজল চোখ তুলে একবার পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে এ কথা অনুধাবন করা কঠিন হবে যে, তাদেরকে যা ঘিরে রেখেছে তার নাম অমনোযোগ। হ্যাঁ, এটা অমনোযোগই বটে। এটা বিস্ময়ের অনুপস্থিতি। সেই পুরনো প্রবাদ নতুন করে শেখায় যে, নিজের খোঁড়া গর্তে একদিন নিজেকেই পড়তে হবে। আমেরিকাবাসীর এ কথা জানা উচিত। তাদেরকে নয়, তাদের সরকারের নীতিকে এত তীব্রভাবে ঘৃণা করা হচ্ছে।

মার্কিনিরা হয়তো বিশ্বাসই করতে পারবে না যে, তারা নিজেরা, তাদের অসাধারণ সুরকার, তাদের লেখক,তাদের অভিনেতা, খেলোয়াড় আর তাদের সিনেমাকে সর্বত্র

www.pathagar.com

স্বাগতম জানানো হয়। তাদের দমকলকর্মী, উদ্ধারকর্মী আর চাকুরেরা ওই হামলার দিন থেকে যে সাহসিকতা আর মহানুভবতা দেখিয়েছেন তাতে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছি।

যা ঘটেছে তা নিয়ে আমেরিকার সন্তাপ ছিল অঢেল। অঢেলভাবেই তা রাষ্ট্র করা হয়েছে। এই যন্ত্রণার গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর। কিন্তু এই শোককে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে ব্যবহার না করে যুক্তরাষ্ট্র যদি গোটা বিশ্বের শোককে লুণ্ঠন করে শুধু নিজের প্রতিশোধ চরিতার্থ করার কাজে এটিকে ব্যবহার করে, তাহলে এর চেয়ে আফসোসের আর কিছুই থাকবে না। কেননা, তখন আর আমেরিকাবাসীদের নয়, আমাদের কাঁধে চাপবে এসব অপ্রিয় প্রশ্ন উত্থাপন করা এবং সেগুলোর ততোধিক অপ্রিয় উত্তর খুঁজে বের করা। আর এ অসময়ে এসব কথা বলে আমরা হয়ে যাবো অপ্রিয় পাত্র। আমাদের কথা উপেক্ষা করা হবে কিংবা করে দেওয়া হবে স্তব্ধ।

বিশ্ববাসী হয়তো কখনোই জানতে পারবে না, কী ছিল ওই সুনির্দিষ্ট ছিনতাইকারীদের অভিপ্রায়, যারা আমেরিকার সুর্নিদিষ্ট ভবনগুলোয় বিমান চালিয়ে আঘাত হেনেছে। ওরা নিজেদের নাম অমর করে রাখার জন্য কাজটা করেনি। আত্মহননের আগে ওরা কোনো বিদায় সম্ভাষণমূলক চিরকুট রেখে যায়নি। রেখে যায়নি কোনো রাজনৈতিক বার্তা। কোনো সংগঠনও এ হামলার কৃতিত্ব দাবি করেনি। আমরা শুধু এটুকুই জানতে পেরেছি যে, নিজেদের কর্মের যথার্থতা সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস বেঁচে থাকার প্রতি মানুষের সহজাত আকুতি আর নিজেকে স্মরণীয় করে রাখার প্রবণতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছে, তাদের ক্রোধের বিশালত্বের কাছে ওই আত্মঘাতী কাজটি ছাড়া আর সবকিছুই যেন ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। আর ওই বিমানের ধাক্কা আমাদের এতদিনকার চেনাজানা পৃথিবীটায় একটা চিরস্থায়ী ফুটো সৃষ্টি করে দিয়ে গেছে। এই ছিনতাইকারী আর তাদের মোটিভ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য যেহেতু আর কখনই জানা যাবে না, তাই রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক ভাষ্যকার আর লেখকরা (আমার মতো) এটিকে সবসময় তাদের নিজস্ব রাজনীতি, নিজস্ব বিশ্লেষণের পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করবে। সে কারণে যে রাজনৈতিক পরিবেশে এই হামলা সংঘটিত হয়েছে তার বিশ্লেষণে যাওয়াই সবচেয়ে শ্রেয়।

কিন্তু যুদ্ধ একেবারে দোরগোড়ায়। যা বলা বাকি রয়ে গেছে, তা এখনই বলে ফেলতে হবে। আমেরিকা নিজেকে সন্ত্রাসবাদবিরোধী এক আন্তর্জাতিক কোয়ালিশনের নেতা বানিয়ে ফেলার আগেই এবং 'অপারেশন ইনফিনিট জাস্টিস' নামক প্রায় দেবতুল্য এক মিশনে আমেরিকা সব দেশকে আমন্ত্রণ (কিংবা জবরদস্তি করে অন্তর্ভুক্ত) করার আগেই তাদেরকে এ বিষয়টি বোঝাতে হবে যে, এ মিশন মুসলমানদের কাছে এক অবমাননা হিসেবে প্রতিভাত হবে। কেননা মুসলমানরা বিশ্বাস করে একমাত্র আল্লাহই 'ইনফিনিট জাস্টিস' বা 'চূড়ান্ত ইনসাফ' দিতে পারেন। তাই এ মিশনের নাম পাল্টে 'অপারেশন এনডিওরিং ফ্রিডম' অর্থাৎ 'অটল মুক্তির অভিযান' নাম রাখা উচিত। এ অভিযান চালানোর আগেই কিছু বিষয় খোলাসা করে নিলে সবার মঙ্গল হবে। যেমন ধরা যাক নাম 'ইনফিনিট জাস্টিস'ই হোক আর 'এনডিওরিং ফ্রিডম'ই হোক-এটা কি আমেরিকার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের জন্য যুদ্ধ, নাকি সামান্য অর্থে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ? এখানে কীসের প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে ? এটা কি সাত হাজার মানুষের মৃত্যুর, ম্যানহাটনে ৫০ লাখ বর্গফুট আয়তনের একটি ভবন ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার, পেন্টাগনের একটি অংশ

www.pathagar.com

ধ্বংস করে ফেলার, লাখ লাখ চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের, কয়েকটি বিমান পরিবহন কোম্পানির দেউলিয়াত্বের, নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারের মূল্যপতনের প্রতিশোধ ? নাকি এ প্রতিশোধের চেয়েও বড় কিছুর ? ১৯৯৬ সালে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডেলিন অলব্রাইটকে জাতীয় টেলিভিশনে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এই যে মার্কিন অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে ৫ লাখ ইরাকি শিশু মারা গেছে, এতে তার প্রতিক্রিয়া কী ? অলব্রাইট জবাব দিয়েছিলেন, এটি খুবই কঠিন একটি সিদ্ধান্ত, তবে যে লক্ষ্য পূরণে এ কাজ করা হচ্ছে, তার দাম হিসেবে এটি ঠিকই আছে। এ কথা বলার জন্য অলব্রাইটের চাকরি যায়নি। তিনি মার্কিন সরকারের মনোভাব প্রচার করতে একের পর এক দেশভ্রমণ অব্যাহত রেখেছেন। ইরাকের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরো পাকাপোক্তভাবে বলবৎ আছে। শিশুরা এখনো সেভাবেই মারা যাচ্ছে।

কাজেই এবার আমরা জবাব পেয়েছি। সভ্যতা আর বর্বরতার মধ্যে নিরীহ মানুষজনের ওপর গণহত্যার মধ্যে অথবা 'সভ্যতাসমূহের সংঘাত' এবং সামরিক পরিভাষায় 'প্রয়োজনীয় ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে' তফাৎ আমাদের চোখের সামনে উপস্থাপিত। এই হলো চূড়ান্ত ইনসাফের কুতার্কিক, অতি সূক্ষ্ম বীজগণিত। বিশ্বটাকে শয়তানমুক্ত করতে আর কতো ইরাকি মানুষ মেরে ফেলতে হবে ? প্রতিটি নিহত মার্কিন নাগরিকের জন্য কতোটি আফগানের লাশ চাই ? প্রতিটি নিহত পুরুষের বিপরীতে কতোটি নারী ও শিশুর মরদেহ ? প্রতিটি নিহত ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কারের লাশের বিপরীতে শুইয়ে দিতে হবে কতোটি মুজাহিদিনের লাশ ? আমরা যখন ইনসাফের এই বীজগণিতের ধাঁধা মেলাতে ব্যস্ত, ততোক্ষণে সারা বিশ্বের টেলিভিশনের পর্দায় উন্মোচিত হচ্ছে অপারেশন এনডিওরিং ফ্রিডম। বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর জোট আফগানিস্তানকে ঘিরে ফেলছে। ঘিরে ফেলছে বিশ্বের সবচেয়ে গরিব, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে, যার ক্ষমতাসীন তালেবান সরকার ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার জন্য দায়ী বলে শনাক্ত ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দিচ্ছে।

আফগানিস্তানে হামলা হলে সামরিক ক্ষয়ক্ষতির তালিকায় মানুষ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না (এদের মধ্যে ৫ লাখই এতিম হয়ে গেছে। প্রত্যন্ত, দুর্গম গ্রামগুলোয় বিমান থেকে কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ফেলা হলে রীতিমতো হুড়োহুড়ি শুরু হয় বলে রিপোর্ট বেরিয়েছে)। আফগানিস্তানে অর্থনীতি শ্মশান হয়ে গেছে। আগ্রাসী কোনো লক্ষ্যবস্তু কিংবা নিজেদের কৌশল নির্ধারণের জন্য কোনো উপকরণই খুঁজে পাবে না। এখানে কোনো বড় শহর নেই, নেই মহাসড়ক, শিল্প-কারখানা , উঁচু ভবন কিংবা পানি শোধনাগার। খামারগুলো এতোদিনে সেখানে কবরখানা হয়ে গেছে। পল্লী এলাকার খেতখামার থিকথিক করছে স্থলমাইনে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ১ কোটি স্থলমাইন পোঁতা আছে। নিজেদের সৈন্যবহরকে ভেতরে ঢোকাতে আমেরিকান সেনাবাহিনীকে প্রথমে এসব মাইন সাফ করতে হবে, তারপর রাস্তাঘাট তৈরি করতে হবে।

আমেরিকার হামলার আশঙ্কায় ১০ লাখ মানুষ তাদের বাড়িঘর ফেলে পাকিস্তান সীমান্তে ভিড় করেছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী ৮০ লাখ আফগান নাগরিকের এই মুহূর্তে জরুরি ত্রাণ প্রয়োজন। অথচ রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই খাদ্য ও ত্রাণ সংস্থাগুলোকে দেশত্যাগ করতে বলা হয়েছে। বিবিসির রিপোর্টে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয় শুরু হয়ে গেছে আফগানিস্তানে। চোখের সামনে নতুন শতাব্দীর এই চূড়ান্ত ইনসাফ প্রত্যক্ষ করুন। না খেয়ে মরোমরো হয়ে যাওয়া

www.pathagar.com

লোকগুলোকে সামরিক হামলার হুমকির সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আফগানিস্তানে বোমা ফেলে সেটিকে প্রস্তর যুগে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা আমেরিকায় বলাবলি হচ্ছে। কেউ একজন দয়া করে ওদের জানিয়ে দিন যে, তার আর দরকার হবে না। আফগানরা ইতিমধ্যেই ওই যুগে চলে গেছে। আর যদি তাতেও মন না ভরে, তাহলে জানিয়ে দিন, এ দুরবস্থা তৈরির পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কম কিছু নয়। মার্কিন জনগণ হয়তো ঠিকমতো জানেই না আফগানিস্তান নামক দেশটি পৃথিবীর মানচিত্রের কোন জায়গায় আঁকা আছে, তবে মার্কিন সরকার আর আফগানিস্তান অনেক পুরনো মিত্র।

১৯৭৯ সালে সোভিয়েতরা আফগানিস্তান দখলের পর সিআইএ এবং পাকিস্তানের আইএসআই সিআইএ'র ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গোপন তৎপরতা চালিয়েছেন। তাদের কাজ ছিল সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে আফগান প্রতিরোধকে মদদ যুগিয়ে যাওয়া আর এই প্রতিরোধ সংগ্রামকে জেহাদে রূপান্তরিত করা। এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত মুসলমান দেশগুলো কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে চলে যাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে শুরু হবে অস্থিতিশীলতা। যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছে ছিল এটিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য একটি 'ভিয়েতনামে' পরিণত করা। কিন্তু শেষ নাগাদ এটি হয়ে উঠলো তার চেয়েও অনেক বড় ব্যাপার। ১০ বছরে আমেরিকার এই ছদ্মবেশী যুদ্ধে ৪০টি মুসলমান দেশ থেকে ১ লাখ চরমপন্থী মুজাহিদিনকে অর্থ আর প্রশিক্ষণ দিয়েছে সিআইএ। আর এ কাজটি তারা করেছে আইএসআইএর মাধ্যমে। মুজাহিদিন নেতা আর সৈন্যরা জানত না যে, তাদের এই জেহাদ তারা আসলে লড়ছে আঙ্কেল স্যামের পক্ষে। (ভাগ্যের পরিহাস এটাই যে, আমেরিকাও একইভাবে টের পায়নি, তারা তাদেরই বিরুদ্ধে এক ভবিষ্যতের যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে পরিপুষ্ট করে তুলছে।)

১০ বছরের টানা লড়াই শেষে ১৯৮৯ সালে রুশরা তল্পি গুটিয়ে চলে যায়। পিছনে রেখে যায় ধুলোয় মিশে যাওয়া এক সভ্যতা।

এরপর আফগানিস্তানে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। জেহাদের আগুন এখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে চেচনিয়া, কসোভো এবং কাশ্মীরে। সিআইএ অর্থ আর সামরিক সরঞ্জাম ঢেলে যেতে থাকে। কিন্তু জেহাদিদের সংখ্যা বেড়ে গেছে বহুগুণ। আগের অর্থে কুলোচ্ছে না। আরো অর্থ দরকার। মুজাহিদিনরা কৃষকদের নির্দেশ দিলো , জেহাদের কর হিসেবে আফিম চাষ করো। আফগানিস্তান জুড়ে হাজার হাজার হেরোইনের ল্যাবরেটরি বানিয়ে দিলো আইএসআই। দু'বছরের মধ্যে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত হয়ে দাঁড়ালো বিশ্বের সবচেয়ে বড় হেরোইন উৎপাদনকারী এলাকা এবং আমেরিকার পথে পথে হেরোইনের ছড়াছড়ির প্রধান উৎস হয়ে উঠলো তা। এই মাদক ব্যবসার বার্ষিক আয় ছিল ১০ হাজার কোটি থেকে ২০ হাজার কোটি ডলার। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের একটি অংশ জঙ্গিদের প্রশিক্ষণে ব্যবহার হতে লাগলো।

১৯৯৫ সালে কট্টর মৌলবাদীদের একটি বিপজ্জনক অংশ তালেবানরা গৃহযুদ্ধের ভেতর লড়াই করতে করতে আফগানিস্তানের বড় একটি অংশের নিয়ন্ত্রণ দখল করে। এদের পেছনে মূল মদদ ছিল আইএসআইএ'র। পাকিস্তানের অনেক রাজনৈতিক দলেরও সতর্থন ছিল এতে। তালেবানরা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলো। তাদের প্রথম শিকার হলো দেশেরই জনগণ - বিশেষত মেয়েরা। তালেবানরা মেয়েদের স্কুল বন্ধ করে দিল।

www.pathagar.com

সরকারি চাকরি থেকে মেয়েদের ছাঁটাই করা হলো। চালু হলো শরিয়া আইন। নীতিবিরুদ্ধ কাজ করলে মেয়েদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার বিধান রয়েছে এ আইনে, বিধবার পরকীয়া প্রেমের শাস্তি জীবন্ত কবর। তালেবান সরকারের মানবাধিকারের যে রেকর্ড, তাতে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে কিংবা বেসামরিক লোকজন হতাহত হওয়ার আশঙ্কার কথা শুনিয়ে তাদেরকে হতোদ্যম করা যাবে না।

এতো কিছুর পরও আফগানিস্তানকে আবার ধ্বংস করতে রাশিয়া আর আমেরিকা এবার পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে - এর চেয়ে বড় পরিহাস আর কীই বা হতে পারে? প্রশ্ন হলো ধ্বংসস্তূপকে আপনি কি ধ্বংস করতে পারবেন? আফগানিস্তানে বোমা ফেললে কেবল ধ্বংসস্তূপের জিনিসগুলো ওলটপালট হবে, কবরখানা প্রকম্পিত হয়ে কেবল মৃতদের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটবে।

আফগানিস্তানের শূন্য প্রান্তর সোভিয়েত কমিউনিজমের গোরস্তান হয়েছে। এখান থেকেই তৈরি হয়েছে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন একমেরুর বিশ্ব। এই এক মেরুর বিশ্বে নব্যপুঁজিবাদ আর করপোরেটের বিশ্বায়নের জয়জয়কার। এরও প্রভু আমেরিকা। আর এবার এই আফগানিস্তান সেই সব সৈন্যদের কবরস্থানে পরিণত হতে যাচ্ছে, যারা আমেরিকার হয়ে এ যুদ্ধে লড়াই করেছে এবং আমেরিকাকে জিতিয়েছে।

আর আমেরিকার সবচেয়ে আস্থাভাজন মিত্রের অবস্থা? পাকিস্তানকেও ভীষণ পস্তাতে হয়েছে। পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বিকাশকে কণ্ঠরোধ করেছে যেসব সামরিক একনায়ক, তাদেরকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিতে এতটুকুও লজ্জিত হয়নি মার্কিন সরকার। সিআইএ'র আগমনের আগে পাকিস্তানে আফিমের একটি ছোট্ট গ্রাম্যবাজার ছিল। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে পাকিস্তানে হেরোইনসেবীর সংখ্যা শূন্য থেকে বেড়ে ১৫ লাখে দাঁড়ায়। ১১ সেপ্টেম্বরের আগে পাকিস্তান সীমান্তে ৩০ লাখ আফগান শরণার্থী বসবাস করছিল। পাকিস্তানের অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে। গোষ্ঠীগত সংঘাত, বিশ্বায়নের স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট কর্মসূচি এবং মাদক ব্যবসায়ীরা দেশটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে।

সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বানানো সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ শিবির আর মাদ্রাসাগুলো এখন ড্রাগনের দাঁতের মতো মুখব্যাদান করে আছে। এখান থেকে যেসব মৌলবাদী বেরুচ্ছে, তারা এখন পাকিস্তানেই তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। যে তালেবানদের অর্থ আর সমর্থন দিয়ে গড়ে তুলেছে পাকিস্তান সরকার, সেই তালেবানদের সঙ্গে এখন পাকিস্তানের নিজেদের রাজনৈতিক দলগুলোর কৌশলগত সখ্য তৈরি হয়েছে।

এখন মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে বলছে এতোদিন ধরে বাড়ির উঠানে লালন-পালন করা পোষা শ্বাপদটাকে আবার খাঁচায় ভরতে। যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেসিডেন্ট মোশাররফ এখন দেখছেন তার নিজ দেশে গৃহযুদ্ধ লেগে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

কিছুটা এর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য আর কিছুটা এর সাবেক নেতাদের দূরদৃষ্টির কারণে ভারত সৌভাগ্যবশত এই পাশার দান থেকে দূরে ছিল। ভারতও যদি এই খেলায় সামিল হতো আমাদের গণতন্ত্র এতোদিন টিকতো না। আজ আমরা মহা আতঙ্কে প্রত্যক্ষ করছি, ভারতের সরকার ক্রমাগত হাত কচলাচ্ছে। পাকিস্তানে ঘাঁটি না গেড়ে ভারতে ঘাঁটি গাড়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অনুনয় করছে। পাকিস্তানের বীভৎস পরিণতি দেখার পরও

www.pathagar.com

ভারত এ কাজ করতে আগ্রহী হবে - এটা শুধু অবাক করা ঘটনাই নয়, এটা রীতিমতো অচিন্ত্যনীয়। ভঙ্গুর অর্থনীতি আর জটিল সামাজিক ভিত্তির যে কোনো তৃতীয় বিশ্বের দেশমাত্রই এতোদিনে স্পষ্ট জেনে গেছে আমেরিকার মতো এক পরাশক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো (তা আমেরিকা স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে বলুক, আর যাত্রাবিরতিই করবে বলুক) হবে আপনার জানালার কাচের মধ্যে একটা ইট ছুড়ে মারতে অনুরোধ করা।

বাইরে থেকে বলা হচ্ছে অপারেশন এনডিওরিং ফ্রিডম আমেরিকান জীবনযাত্রাকে রক্ষার জন্য এক লড়াই। কিন্তু শেষ নাগাদ এটি আমেরিকান জীবনযাত্রাকে পর্যুদস্ত করে ছাড়বে। এই যুদ্ধের পরিণামে বিশ্বময় ক্রোধ আর সন্ত্রাসবাদের দাবানল আরো ছড়িয়ে যাবে। আমেরিকার আম জনতার ক্ষেত্রে এটা হবে অনিশ্চয়তার এক অসুস্থ পরিবেশে বসবাস ঃ আমার শিশু কি স্কুলে নিরাপদ থাকবে.? পাতাল রেলে কি কেউ বিষাক্ত নার্ভ গ্যাস ছড়িয়ে দেবে ? সিনেমা হলে কেউ বোমা পেতে রাখেনি তো ? এবারের হামলার সময় জীবাণু অস্ত্র ব্যবহারের চেষ্টাও হয়েছিল বলে জানা গেছে।

প্রেসিডেন্ট বুশ সারা বিশ্ব সাধুসন্তদের দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু তার পক্ষে বিশ্ব থেকে মন্দ লোক দূর করতে পারা সম্ভব নয়। সহিংসতা আর নিষ্পেষণের মাধ্যমে বিশ্ব থেকে সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন করার স্বপ্ন যদি মার্কিন সরকার দেখে থাকে, তবে এর চেয়ে বাস্তবতাবর্জিত আর কিছু হতে পারে না। সন্ত্রাসবাদ নিজে কোনো রোগ নয়, এটি রোগের লক্ষণ। সন্ত্রাসবাদের কোনো দেশ নেই। এটি কোক, পেপসি বা নাইকির মতোই এক বহুজাতিক এন্টারপ্রাইজ। সংকটের প্রথম লক্ষণেই সন্ত্রাসবাদীরা তাদের কারখানা এক দেশ থেকে সরিয়ে অন্য দেশে নিয়ে যেতে পারে ঠিক বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মতোই।

সন্ত্রাসবাদ পৃথিবীর বুক থেকে হয়তো কখনোই বিদায় নেবেনা। তবে এটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথমেই যা করতে হবে তা হলো মেনে নিতে হবে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোর মতোই তারাও একটি দেশ। তাদের মতোই বাকি সবাই এ পৃথিবীরই মানুষ, এমনকি যদি তাদেরকে টিভিতে দেখানো নাও হয়। তাদের মতো অন্য মানুষদেরও প্রেম আছে, দুঃখ , কাহিনী, গান এবং অধিকার আছে। কিন্তু এ কাজ না করে যুক্তরাষ্ট্র কী করেছে - প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ডকে জিজ্ঞেস করা হলো কখন আমেরিকার বিজয় হয়েছে বলে তিনি মনে করবেন ? জবাবে রামসফেল্ড বললেন, যখন সারা বিশ্বকে তিনি বোঝাতে সক্ষম হবেন যে, আমেরিকানদের তাদের নিজস্ব জীবনধারা চালিয়ে যেতে দেওয়া উচিত- তখনই তার বিজয় হয়েছে বলে তিনি মনে করবেন।

১১ সেপ্টেম্বরের হামলা ভীষণরকম উচ্ছন্নে যাওয়া এক বিশ্বের কাছ থেকে আসা এক সাবধানবাণী। বার্তাটা হয়তো লিখেছে বিন লাদেন এবং পৌঁছে দিয়েছে তার বার্তাবাহকরা। কিন্তু আমেরিকার পুরনো যুদ্ধের লাশগুলোর প্রেতাত্মারাও এ বার্তা লিখে থাকতে পারতো। কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার লাখ লাখ লোককে মারা হয়েছে, ১৯৮২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মদদে লেবাননে আগ্রাসন চালিয়ে ইসরায়েল সাড়ে ১৭ হাজার মানুষ মেরেছে, অপারেশন ডেজার্ট স্টর্মে হত্যা করা হয়েছে ২ লাখ ইরাকিকে, হাজার হাজার ফিলিস্তিনী মারা গেছে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে। আমেরিকার সরকারের মদদে প্রশিক্ষণে, অর্থে লালিত সন্ত্রাসবাদী, স্বৈরাচারী শাসক ও গণহত্যাকারীদের হাতে যুগোস্লাভিয়া, সোমালিয়া, হাইতি, চিলি, নিকারাগুয়া,

www.pathagar.com

এল সালভেদর, ডোমিনিকান রিপাবলিক আর পানামায় লাখ লাখ লোক মারা গেছে। এ তালিকা আরো বহুগুণে দীর্ঘ করা যায়।

এতো বিপুল যুদ্ধবিগ্রহে যে দেশের হাত রঞ্জিত, তার মানুষগুলো কতো না সৌভাগ্যবান। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে মাত্র দ্বিতীয় আক্রমণ। প্রথম হামলাটি হয় পার্ল হারবারে। এর প্রতিশোধ গ্রহণে অনেক বিলম্ব করা হলেও হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলার মাধ্যমে এই শোধ তোলা হয়েছে। এবার কোন রোমহর্ষক ঘটনা তাদের সামনে ঘটতে যাচ্ছে তা দেখার জন্য অপেক্ষায় আছে বিশ্ব।

সম্প্রতি কেউ একজন বলেছে, ওসামা বিন লাদেনের অস্তিত্ব না থাকলে যুক্তরাষ্ট্র একটা ওসামা বানিয়ে নিতো। কিন্তু এক হিসেবে দেখলে যুক্তরাষ্ট্রই কিন্তু তাকে বানিয়েছে। ১৯৭৯ সালে সিআইএ যখন আফগানিস্তানে মুজাহিদিনদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলো তখন সেখানকার জেহাদিদের একজন ছিলেন লাদেন। সিআইএ তাকে তৈরি করেছে, আর এফবিআই তাকে দাগী আসামি হিসেবে খুঁজছে। মাত্র এক পক্ষকালের মধ্যে লাদেন যুক্তরাষ্ট্রের সন্দেহভাজন তালিকা থেকে শীর্ষ সন্দেহভাজন এবং কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই সেখান থেকে সরাসরি জীবিত অথবা মৃত ধরে আসার তালিকায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু কে এই ওসামা বিন লাদেন ? প্রশ্নটা আসলে এভাবে করা উচিৎ-কী এই ওসামা বিন লাদেন, তিনি আমেরিকার ফ্যামিলি সিক্রেট। তিনি আমেরিকার সকল প্রেসিডেন্টের যমজ ভাই। একটা ভাই সভ্যতার পোশাক পরে সুশ্রী চেহারা নিয়ে থাকে, অন্য ভাইটা বর্বর। লাদেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কারণে পচে যাওয়া বিশ্বের একটা বাড়তি বুকের হাড় থেকে তৈরি মূর্তি। সেই পররাষ্ট্র নীতিতে রয়েছে বন্দুকের নলের কূটনীতি, পরমাণু অস্ত্র, করায়ত্তবাদ, অ-আমেরিকান জীবনযাত্রার প্রতি অশ্রদ্ধা, বর্বর সামরিক হস্তক্ষেপ- এইসব। এখন যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের এই গোপন ফ্যামিলি সিক্রেট প্রকাশ হয়ে পড়েছে, দুই যমজ ভাই একে অপরের প্রতি রাগে গড়গড় করছে আর পরস্পর পোশাক পাল্টে এসে অন্যের চেহারা নিয়ে নিচ্ছে-তাদের দুজনার বন্দুক, বোমা, অর্থ আর মাদকদ্রব্য সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। (আফগানিস্তানে মার্কিন হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে তালেবানরা যে স্ট্রিংগার মিসাইল ছুঁড়বে, সেগুলো এককালের সিআইএ-র দেওয়া)।

এখন বুশ আর লাদেন এমন কি একে অন্যের ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছেন। একে অন্যকে সর্পকুলের রাজা বলে অভিহিত করছেন। দুজনেই ঈশ্বরের দোহাই দিচ্ছেন এবং দুজনেই শুভ আর অশুভের লড়াই হিসেবে এটিকে শনাক্ত করছেন। দুজনেই একই রকম রাজনৈতিক অপরাধ করে চলেছেন। একজনের হাতে পরমাণু অস্ত্র, অন্যজনের হাতে ধ্বংসকামী হতাশার অস্ত্র। একজনের হাতে আগুনের গোলা, অন্যজনের হাতে সূচালো বরফখন্ড।

সারা বিশ্বের মানুষের প্রতি বুশের আল্টিমেটাম, 'আপনারা আমাদের সঙ্গে না থাকার অর্থ আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে আছেন।' এ এক চরম ঔদ্ধত্য। ❑

বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় লেখিকা

দি গার্ডিয়ান, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০১

অনুবাদ ঃ জিকরুল ইসলাম

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন দিয়ে কি পাচ্ছে বাংলাদেশ ?

মিজানুর রহমান খান

অভ্যন্তরীণ রাজনীতির গোলযোগের আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে আমরা অনেক সময় ভুলে থাকি বিশ্ব রাজনীতিতে আমাদের আদৌ কোন গুরুত্ব আছে কিনা। ৩০ বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশ কেবলই একটি ব্যর্থ জাতি রাষ্ট্র হিসাবে পৃথিবীর কাছে পরিচিতি পাচ্ছে কিনা। এই সেদিনও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে বাংলাদেশ ১৫০টি দেশের মধ্যে দুর্নীতিতে নাম্বার ওয়ান হয়ে জাতীয় রাজনীতিতে আলোড়ন তুলেছে। অনেক সময় আবার বাংলাদেশ ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার শিরোনাম হয়। কিন্তু এর মধ্যেও মাঝে মাঝে এমন দু'একটি উপলক্ষ আসে যখন বাংলাদেশ যে বিশ্বের একটি অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম মডারেট গণতান্ত্রিক দেশ, তা নতুন করে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কাবুলের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাংলাদেশের সমর্থন চাওয়া তেমনই একটি ঘটনা বলা চলে। হয়তো বাস্তবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে বাংলাদেশের আকাশসীমা, বিমানবন্দর ও ঘাঁটি এবং সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের আদৌ প্রয়োজন হবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহারের কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেয়নি।

সন্ত্রাস দমনে আমেরিকার প্রস্তাবের প্ররিপ্রেক্ষিতে গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০১ যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাকে সরকারিভাবে 'নীতিগত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের কাছে যে সুবিধা চেয়েছে তা একান্তভাবেই প্রতীকী। কিন্তু এই 'প্রতীকী সমর্থন সুপার পাওয়ার আমেরিকার কেন প্রয়োজন পড়ল? সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে হাইতিতে সৈন্য প্রেরণের সময় বাংলাদেশের সমর্থন আদায়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করেছিলেন। এমন কি এ বিষয়টি ক্লিনটন জাতির উদ্দেশে দেয়া তার ভাষণেও গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেন। হাইতিতে সৈন্য প্রেরণে বাংলাদেশের সমর্থন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে তুলনায় এবারের প্রয়োজন অনেক বেশি। বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বের বলা চলে আমেরিকার একমাত্র মডারেট মুসলমান বন্ধু রাষ্ট্র, যে দেশটিতে গণতন্ত্রও বিদ্যমান। মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশেই মোটামুটি রাজতন্ত্র কায়েম রয়েছে। অনেকে আবার

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে মৌলবাদী বা সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র। ইরান ও মালয়েশিয়ার সঙ্গে ওয়াশিংটনের টানাপোড়েন থেমে থেমে অব্যাহত। ইরান তার সীমান্ত সিল করে দিয়ে বলেছে যুক্তরাষ্ট্রকে সে তার আকাশসীমাও ব্যবহার করতে দেবে না। আর যুক্তরাষ্ট্রের নীতির একজন সমালোচক হিসাবে পরিচিত মাহাথির মোহাম্মদের মালয়েশিয়া বলেছে, সে কেবল নিউইয়র্কে বিমান-নাশকতার তদন্তে সহায়তা দেবে। আফগানিস্তান দেশটি মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের দক্ষিণ এশিয়া ডেস্কই দেখভাল করে থাকে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান ও ভারতের প্রতিযোগিতামূলক ও কৌশলগত সমর্থন ওয়াশিংটনের জন্য জরুরি হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের সমর্থন আদায় বড়ই উপরিহার্য ছিল। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ও বাংলাদেশই ছিল বিশ্বের সর্বপ্রথম মুসলিম রাষ্ট্র যে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনীতে নিজের নামটি লিখিয়েছিল।

কিন্তু বাংলাদেশ এবার বিনিময়ে কি পাবে সে বিষয়টি এখনও জানা যায়নি। ভারত ও পাকিস্তানের ওপর থেকে যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ১৯৯৮ সালে পোখরান ও চাগাইয়ের পাল্টাপাল্টি পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর বাহ্যত শান্তির সপক্ষে ধ্বনি তুলে দেশ দুটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। আর আজ কিনা কাবুলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহার পটভূমিতে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে যৌক্তিকতা দিতে ওয়াশিংটনের উপলব্ধি হচ্ছে, 'এই অবরোধ ও বিধি-নিষেধ বহাল রাখা এখন আর জাতীয় স্বার্থের পক্ষে যাবে না।' এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে আর একবার প্রমাণিত হল - যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির মূলনীতি সবার উপরে জাতীয় স্বার্থ তার উপরে নেই।

বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বহু বছর ধরে পিএল ৪৮০-এর আওতায় প্রায় ৭০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ মওকুফ, গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে কোটা ও ফ্রি সুবিধা লাভ এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অবৈধ বাংলাদেশী অধিবাসীদের বৈধতা দানের ইস্যুতে আলোচনা করে আসছে। পিএল ৪৮০-এর আওতায় বকেয়া ঋণ নবায়ন ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মওকুফের যে প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে তা যে কবে শেষ হবে কারও জানা নেই। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কূটনীতিকদের সঙ্গে আলোচনা করে মনে হয়েছে আইনি ও পদ্ধতিগত মারপ্যাঁচে খাবি খেতে থাকা এ এক অনন্তের জটিল প্রক্রিয়া। শুনেছি উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় মিসরের সমর্থন আদায়ের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র কায়রোকে কয়েক বিলিয়ন ডলারের ঋণ মওকুফ করে দিয়েছিল। এবারেও যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক প্যাকেজ উপহার দিচ্ছে। যদিও এবারের দাবা খেলায় দিল্লির চেয়ে ইসলামাবাদের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব কূটনীতির সঙ্গে বিশ্ব অর্থনীতির সম্পর্ক যে অবিচ্ছেদ্য তা অনেক সময় খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দিল্লি ও ইসলামাবাদের সম্পর্কের ওঠানামায় অর্থনীতির একটা ছন্দ যেন থাকেই। ভারতকে অর্থনৈতিক সুবিধা দেয়ার প্রক্রিয়া অবশ্য মি. ক্লিনটনই অনেক দূর এগিয়ে রেখে গেছেন। রোববার নয়াদিল্লি টিভি জানায়, বিশ্বব্যাংক থেকে ভারত গত দু'বছরে চার বিলিয়ন ডলারের ঋণ পেয়েছে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর গ্লেন অ্যামেন্ডমেন্টের আওতায় ভারতকে এই ঋণদান বিশ্বব্যাংক স্থগিত

www.pathagar.com

করে। ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সাধারণ সম্পাদক অমিত মিত্র বলেছেন, এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ফলে বিএইচইএল এবং লার্সেন অ্যান্ড টাব্রোসহ ৩৯টি বড় কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্র থেকে দ্বৈত প্রযুক্তি আমদানি করতে পারবে। শুধু তাই নয় এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারত তার মিসাইল কর্মসূচিকেও অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রকে তার চরম ঝুঁকিপূর্ণ সমর্থন দানের বিনিময়ে ৬০ মিলিয়ন ডলারের খেলাপি ঋণ পুনঃ তফসিলিকরণের সুযোগ দিচ্ছে। এছাড়াও সে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এখন প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলারের ঋণ মওকুফের জন্য লবিং করছে। ৫২ বিলিয়ন ডলার জিডিপির দেশ পাকিস্তানের মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৪০ বিলিয়ন ডলার। পাকিস্তান এছাড়াও কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসায় যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতিশীল মধ্যস্থতা আশা করছে বলেও খবর বেরিয়েছে।

বিজিএমইএ দীর্ঘদিন ধরে ডিউটি ও কোটা ফ্রি গার্মেন্টস রফতানির যে তদবির করে আসছে তাতে সুফল মেলেনি। লাভ হয়েছে সোলার্জ সাহেবদের। ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্স গত ১৫ মে ঢাকায় আমেরিকান চেম্বার আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজসভায় বলেন, ২০০5 সালের জানুয়ারিতে সারাবিশ্বে বস্ত্র বাণিজ্য কোটামুক্ত হয়ে যাবে। বাংলাদেশও তার তৈরি পোশাকের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আর কোটা পাবে না। তার ভাষায়, এ সমস্যার অন্যতম পরিত্রাণ হল একটি দক্ষ বন্দর গড়ে তোলা। বাংলাদেশকে এই দৃষ্টিভঙ্গি মনে রেখেও কোটা সুবিধা নিয়ে দেনদরবার করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবিয়ান ও আফ্রিকান অঞ্চলের দেশগুলোকে ডিউটি ও কোটা ফ্রি সুবিধা দিয়েছে। অবশ্য এই সুবিধা প্রাপ্তি এক দীর্ঘ ও দুরূহ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে। প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল প্রায় এক দশক আগে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে এই অঞ্চলটির তৈরি পোশাক রফতানির পরিমাণ অবশ্য মাত্র সাড়ে চারশ মিলিয়ন ডলার। সেই তুলনায় বাংলাদেশের একক রফতানির পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ১৮০০ মিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশের মাত্র এক বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা হামলার মুহূর্তে মারাত্মক কম্পন অনুভব করেছে। ভারত এতটাই উদ্বিগ্ন যে, ১১ সেপ্টেম্বরের পরপরই সে চলতি অর্থবছরের প্রাক্কলিত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এক শতাংশ হ্রাস করেছে। বাংলাদেশের রফতানির দুই প্রধান খাত গার্মেন্টস ও রেমিটেন্সের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এককভাবেই এক অপ্রতিরোধ্য ফ্যাক্টর। দু'দেশের ব্যালেন্স অফ পেমেন্টসও বাংলাদেশের অনুকূলে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৮ সালে দু'দেশের মোট বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণ ছিল দুই বিলিয়ন ডলার। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের অনুকূলে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১.৬ বিলিয়ন ডলার। এই ঘাটতি কমাতে তারা অবশ্য চাপ দেয় না। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে একক মার্কিন বৈদেশিক বিনিয়োগও সর্বোচ্চ। ৫ বছর আগের ২৫ মিলিয়ন ডলারের মার্কিন বিনিয়োগ সাড়ে ৭শ' মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। তবে একই সঙ্গে এটাও বলতে হবে যে, বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া গ্রান্টসের পরিমাণ ক্রমেই নিম্নমুখী। দু'তিন বছর আগেও বার্ষিক ১০০ মিলিয়ন ডলারের মঞ্জুরি পেত বাংলাদেশ। গত বছর এই প্রাপ্তির পরিমাণ ৫৮ মিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনের বিমান নাশকতার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে যে

www.pathagar.com

ঘোরতর মন্দার আশঙ্কা করা হচ্ছে তা যেন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ব্যাপক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে সে লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কালক্ষেপণের সুযোগ নেই। আশা করব মার্কিন সরকার বাংলাদেশের সর্বসম্মত সামরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতাকে অর্থনৈতিকভাবে 'ট্রান্সেলেটেড' করতে অচিরেই সক্ষম হবেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্স বলেছেনও, বাংলাদেশের জনগণের সহমর্মিতা আমাকে স্পর্শ করেছে। বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত দু'দেশের ভবিষ্যৎ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত কয়েক হাজার বাংলাদেশীর বৈধতা নিয়ে বাংলাদেশ দীর্ঘ দিন ধরে তৎপর। রিপাবলিকান সিনেটর বেনজামিন গিলম্যান বাংলাদেশী অভিবাসীদের জন্য কংগ্রেসে একটি বিলও এনেছিলেন। তিনি এখন আর অবশ্য ফরেন রিলেসন্স কমিটির চেয়ারম্যান নন। তার পরিবর্তে এসেছেন আরেক রিপাবলিকান সিনেটর হেনরি হাইড। কিন্তু একককভাবে বাংলাদেশীদের আইনগতভাবে অ্যামনেস্টি দেয়ার এই প্রক্রিয়ার কোন ভবিষ্যৎ আছে বলে মনে হয় না। অন্য দেশের এমন সুবিধা লাভের দৃষ্টান্ত কিন্তু আছে। লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশের নাগরিকরা এমন সুবিধা পেয়েছেন। কিছুদিন আগে এই সুবিধা পেল হন্ডুরাস। সে দেশে ভয়াবহ এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর যুক্তরাষ্ট্র এই সিদ্ধান্ত নেয়। সুতরাং বাংলাদেশকে কোন বিশেষ সুবিধাদান প্রশ্নে বুশ প্রশাসনের রাজনৈতিক সদিচ্ছাই যে কোন প্রক্রিয়াগত জটিলতাকে সহজেই অতিক্রম করতে পারে। বাংলাদেশের নিঃশর্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আসল বাস্তবতা ও বাধ্যবাধকতা যুক্তরাষ্ট্র সরকার নিশ্চয় অনুধাবন করতে পারেন।

মুসলিম দেশগুলোর সমর্থনদানের চিত্র কিন্তু তেমন জোরালো নয়। ইউএসএ টুডের রিপোর্ট (১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০১) অনুযায়ী, মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক মার্কিন নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশনের পরিবর্তে সন্ত্রাসবিরোধী একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তাব দেন। ইরাকের সাদ্দাম হোসেন ও লিবিয়ার গাদ্দাফি যথারীতি কঠোর বিরোধিতা করছেন। লিবিয়া অবশ্য মুখে 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার রয়েছে' বলে উল্লেখ করেছে। মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বুশ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য হামলা সম্পর্কে 'ক্রুসেড' শব্দটি ব্যবহার করায় তা আরব বিশ্বকে অধিকতর বিরক্ত করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র আরব বিশ্বের ক্ষোভ প্রশমনে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়েল শ্যারনকে লেবাননে হামলা বন্ধ ও ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে বৈঠকের জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে। ইসরাইলিরা হত্যা লীলার ব্যাপকতা কমিয়ে এনেছে। আফগান উদ্বাস্তু রোধের সম্ভাব্য স্রোত রোধে ইরান তার ৫৬২ মাইল সীমান্ত সিল করে দিয়েছে। সৌদি আরব কেবল হামলার তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। নতুন ঘাঁটি স্থাপনের প্রস্তাব বরং রিয়াদ নাকচ করে দিয়েছে।

পাকিস্তান ছাড়া তালেবান সরকারকে স্বীকৃতিদানকারী অন্য দু'টি দেশের একটি সৌদি আরব। অন্যটি সংযুক্ত আরব আমিরাত। বিমান ছিনতাইকারীদের একজন আমিরাতের পাসপোর্ট বহন করায় বিব্রত আমিরাত কাবুলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে বলে মনে করা হয়। আফগানিস্তানের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে উজবেকিস্তান (৮০ মাইল সীমান্ত রয়েছে) তার ভূমি ব্যবহার করতে দিচ্ছে। সেখানে মার্কিন যুদ্ধ বিমান অবস্থানও নিয়েছে। তাজিকিস্তান দিতে চেয়েছে শুধু আকাশ সুবিধা। তুর্কমেনিস্তান সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঘোষণা দিলেও যুদ্ধে অংশ নিতে প্রতিশ্রুতি দেয়নি। তুরস্ক তার বিমান ঘাঁটি

www.pathagar.com

ব্যবহার করতে দেবে। কুয়েত, কাতার ও ওমান যুদ্ধে অংশ নেয়ার কথা না বলে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পাশে থাকার কথা বলেছে। লেবানন কুচক্রীদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযান সমর্থন করবে বলে জানিয়েছে। আজারবাইজান হামলার নেপথ্যের সহযোগীদের পর্যুদস্ত করতে সহায়তার কথা বলেছে। এটা অনস্বীকার্য যে, উপসাগরীয় যুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ যেভাবে 'সমমনা দেশগুলোকে' আগ্রাসন নস্যাতে যেভাবে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল তা এবারে অনুপস্থিত। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এ পর্যন্ত কেবল 'হামলা'র নিন্দা জানিয়ে সাধারণভাবে সদস্য রাষ্ট্রকে সন্ত্রাসবিরোধী তৎপরতায় সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র এখনও এ ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদে তেমন কোন রেজুলেশন পাসে উদ্যোগী হয়নি। কলিন পাওয়েল নিরাপত্তা পরিষদের স্বতঃস্ফূর্ত বিবৃতিকে স্বাগত জানিয়ে একে 'হেলপফুল' বলে বর্ণনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০১ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সর্বদলীয় বিশেষজ্ঞদের বৈঠকে আন্তর্জাতিক আইনে অভিজ্ঞ একজন কূটনীতিক বলেন, 'উপসাগরীয় যুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে যেকারণে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাস করতে পেরেছিল তা বর্তমানে অনুপস্থিত। জাতিসংঘসমূহ কোন সার্বভৌম দেশের বিরুদ্ধে শান্তির প্রতি হুমকি, শান্তিভঙ্গ এবং আক্রমণাত্মক কার্যাদি' সম্পর্কে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এই তিন কারণে নিরাপত্তা পরিষদে কোন দেশের বিরুদ্ধে অনেকগুলো বিকল্প ব্যবস্থা নিতে পারে। কসোভোতে হামলার পর জাতিসংঘ তা 'পোস্ট ফ্যাক্টোর‍্যাটিফিকেশন' করেছে। পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোট অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ সেখানে শক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু এবারের অবস্থা ভিন্নতর। বাংলাদেশের নিঃশর্ত অবস্থান বেশ লক্ষণীয় বৈকি। ❑

লেখক ঃ সাংবাদিক।

২৫ সেপ্টেম্বর' ০১

www.pathagar.com

বুশের বিস্ময়, ৬০ দেশে লাদেনের নেটওয়ার্ক

মনোয়ারুল ইসলাম

গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট দেখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বিস্ময় প্রকাশ করলেন। এটা কি করে সম্ভব? পশ্চাৎপদ একটি দরিদ্র দেশে অবস্থান করে ওসামা বিন লাদেন কিভাবে এতা বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুললেন। তার হাতে ৬০টি দেশের তালিকা। যেখানে লাদেনের অনুসারীরা তৎপর। এর মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত একটি প্রভাবশালী দেশও রয়েছে। অবশ্য জর্জ ডব্লিউ বুশ এই দেশটির নাম প্রকাশ করেননি। তিনি বলেছেন, গোয়েন্দা সংস্থা আমেরিকার নিরাপত্তার প্রশ্নে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি গোয়েন্দা সংস্থাকে ঢেলে সাজানোর নির্দেশও দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও পাকিস্তান ওসামা বিন লাদেনের সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের কিছু নতুন উপাদান চিহ্নিত হয়েছে। নতুন আবিষ্কৃত দু'টি স্থান হচ্ছে ইউরোপের একটি দেশ ও গাজা উপত্যকা। আর লাদেন ও আফগানিস্তানস্থ তার ক্যাম্পই একমাত্র সমস্যার অংশ বিশেষ। তবে লাদেনের নেটওয়ার্কগুলো তেমন সুসংগঠিত নয়। তবে তা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ক্যাম্পগুলো এমন কি লাদেনকেও ধ্বংস করলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধের একটি অংশের সমাপ্তি ঘটবে।

গত ৫ বছর ন্যূনতম ১১ হাজার সন্ত্রাসী লাদেনের পরিচালনায় আফগান সীমান্তে প্রশিক্ষণ নিয়েছে যার অধিকাংশই অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বহির্বিশ্বে রওনা দিয়েছে। পশ্চিমা সরকারগুলো একমত হয়েছে যে, অসংখ্য সন্ত্রাসীর কার্যক্রম ওসামা বিন লাদেনের সাথে সম্পর্কিত। আর এর সাথে ইউরোপের একটি প্রভাবশালী দেশও জড়িত। এই সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তারা ইউরোপকেই উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছে। কারণ সেখান থেকে সারা দুনিয়ায় যাতায়াত, টেলিফোন যোগাযোগ ও ব্যাংকিং খুবই সহজ। ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকা আক্রমণের আগে ইউরোপের নিরাপত্তা রক্ষীরা বেশ কিছুসংখ্যক লাদেনের অনুসারীকে গ্রেফতারও করে। তারা স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি ও ব্রিটেনে অবস্থান করছিলো। এ গ্রেফতার শুরু হয়েছিলো গত ডিসেম্বর থেকে। গত ২৬ ডিসেম্বর ফ্রাঙ্কফুর্টে ৪ জন জঙ্গী মৌলবাদীকে প্রথম গ্রেফতার করা হয়। এদের ২ জন ইরাকি, ১ জন ফ্রান্স মুসলিম ও ১ জন ছিলেন আলজেরিয়ান। গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য অনুসারে এই ৪ জন জঙ্গী মৌলবাদী ফ্রান্সের স্টার্সবুর্গে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে বোমা

www.pathagar.com

হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। ইউরোপে সন্ত্রাসী সেলের প্রধান আলজেরিয়ান মুহাম্মদ বেনসাখিরিয়া ঐ সময় রেহাই পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি স্পেনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে গ্রেফতার হন। পুলিশের কাছে দেয়া স্বীকারোক্তিতে তিনি বলেন, আমি ও আমার সহকর্মীরা লাদেনের আল কায়েদা সংগঠন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। আমার অন্য সহকর্মীরা গত সামারে ইতালি ও জার্মানিতে গ্রেফতার হয়েছে। পুলিশ তার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বলেছে, এই দলটি ব্রিটেন, জার্মানি এবং বেলজিয়ামে অস্ত্র সরবরাহের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো।

প্রেসিডেন্ট বুশ গেলো সপ্তাহে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার ওপর আমি আস্থা হারিয়ে ফেলেছি। বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়, লাদেন ও তার অনুসারী সন্ত্রাসীদের এতো বিস্তৃতি ঘটেছে। যাদের অবস্থান আমাদের গোয়েন্দারা এতোদিন জানতেন না। ওসামা বিন লাদেনের বাহিনী সারা বিশ্বব্যাপী অর্থ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামভিত্তিক বিদ্রোহে ইন্ধন যোগায়। যারা কিনা ফিলিপাইনস, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া ও চেচনিয়ায় তৎপর রয়েছে। উজবেকিস্তানে ইসলামিক আন্দোলনে লাদেন বাহিনীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। যার মাধ্যমে ফারাগানা ভ্যালিতে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলছে। সেন্ট্রাল এশিয়ার উজবেকিস্তান, কিরিগিজিস্তান ও তাজিকিস্তান হবে এই নতুন ইসলামিক রাষ্ট্রের অংশ। আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা বলেছেন, লাদেনের প্রশিক্ষণ শিবির চলছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মিলিটারি বেজে। এ বেজটি নর্দার্ন আফগানিস্তানের মাজার-ই-শরীফ শহরের সন্নিকটে। ৩০০০ কট্টর সন্ত্রাসী রিক্রুট করা হয়েছে আরব দেশ, পাকিস্তান, ওয়েস্টার্ন চীন, চেচনিয়া ও সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে। আল কায়েদা থেকে প্রশিক্ষণ নেয়া ৮০০০ সন্ত্রাসী পশ্চিমা দেশগুলোতে অবস্থান করছে বলে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা খবর দিয়েছে। এসব সন্ত্রাসী এগ্রিকালচার কোম্পানি, ব্যাংকিং ও আমদানি-রফতানি ব্যবসার সাথে জড়িত থেকে সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ব্রাসেলস্থ একজন ন্যাটো এম্বাসেডরের মতে, সন্ত্রাসীদের অর্থের প্রধানতম যোগানদাতা হচ্ছে তেল। তেলের অর্থই তাদের অন্যতম আর্থিক শক্তি। ❑

২৫ সেপ্টেম্বর '০১
নিউইয়র্ক থেকে প্রবাসী বাংলাদেশী লেখক।

www.pathagar.com

লাদেন জড়িত থাকার অনেক প্রমাণ আছে

কলিন পাওয়েল

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর পূর্বে মুসলিম বিশ্ব গত ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে সন্ত্রাসী হামলার সংগে ওসামা বিন লাদেনের জড়িত থাকার ব্যাপারে উপযুক্ত প্রমাণ দেখানোর দাবী জানিয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল গত রোববার বলেছেন, সন্ত্রাসী হামলায় ওসামা বিন লাদেনের প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার বিষয়টি শিগগির জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে। মার্কিন বাহিনী ইতোমধ্যে আফগানিস্তানে আঘাত হানার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ করেছে।

পাওয়েল এবিসি নেটওয়ার্কের সংগে এক সাক্ষাৎকারে বলেন হামলার সংগে ওসামা এবং তার আল-কায়েদা সংগঠন জড়িত-এতে কোনো সন্দেহ নেই। যুক্তরাষ্ট্র শিগগিরই বিশ্বের কাছে এর প্রমাণ তুলে ধরবে।

কিন্তু পাকিস্তানের কর্মকর্তারা বলেছেন, ওসামা বিন লাদেনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার ব্যাপারে পাকিস্তানের কাছে শুধুমাত্র ১৯৯৮ সালে কেনিয়া এবং তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে হামলা চালানোর তথ্যপ্রমাণাদি রয়েছে।

তবে গত ১১ সেপ্টেম্বর বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র এবং পেন্টাগনে হামলা চালানোর কোনো উপযুক্ত প্রমাণ তারা সংগ্রহ করতে পারেনি।

ওসামা বিন লাদেন ১৯৯৬ সাল থেকে আফগানিস্তানে তালেবানদের আশ্রয়ে রয়েছে। তালেবানরা বলছে, যুক্তরাষ্ট্র যদি ওসামার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারে তবে তারা তাকে বিচারের জন্য হস্তান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করবে।

ওয়াশিংটন তালেবানদের এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছে।

পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সারতাজ আজিজ বলেছেন, আফগানিস্তানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য হামলার পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত উপযুক্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন করা।

www.pathagar.com

বর্তমান সমস্যার সংগে ধর্মীয় অনুভূতি জড়িত থাকার বিষয় উল্লেখ করে আজিজ বলেন, সামরিক অভিযান শুরু করার পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার কাছে উপযুক্ত প্রমাণাদি তুলে ধরা।

আরব লীগের প্রধান আমর মূসা গতকাল জর্ডানে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, কোনো আরব দেশের ওপর মার্কিন হামলা বরদাশত করা হবে না।

মূসা সাংবাদিকদের জানান, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনেক উপায় আছে এবং এ ব্যাপারে আরব দেশগুলোর সংগে অবশ্যই পরামর্শ করা উচিত। ❑

এএফপি

২৫ সেপ্টেম্বর '০১

আমাকে কেন হত্যা করতে চাও।

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকারে ওসামা বিন লাদেন 'জেহাদ অপরাধ হলে আমি অপরাধী'

কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র তখন ওসামা বিন লাদেনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। কিন্তু আফগানিস্তানের কোথায়, কোন গুহার মধ্যে, পাথরের আড়ালে তিনি লুকিয়ে আছেন সিআইএ-এর দুর্দান্ত গুপ্তচরদের পক্ষেও তা ঠাহর করা সম্ভব হচ্ছে না। এরকম এক টানটান অবস্থায় ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে টাইম ম্যাগাজিন লাদেনের এক সাক্ষাৎকার নেয়। ভোরের কাগজের পাঠকদের জন্য সেটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষান্তর করেছেন সালমা রহমান।

৭ আগস্ট ১৯৯৮ কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলায় ২২৪ জনের প্রাণহানির পর এই হামলা পরিকল্পনাকারী হিসেবে সৌদি ভিন্ন মতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেনের নাম নতুন করে উচ্চারিত হতে শুরু করে। দু'বছর আগে থেকে আফগানিস্তানে অতিথি হিসেবে আশ্রয় নেওয়া ওসামা বিন লাদেন তালেবানদের ছত্রছায়ায় নিভৃতে জীবন যাপন করছিলেন। আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে আফগানিস্তানে ওসামার সদর দপ্তরে যুক্তরাষ্ট্র ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালে তিনি বেঁচে যান। তালেবান শাসকগোষ্ঠী সেপ্টেম্বর থেকে ওসামাকে জনসম্মুখে বিবৃতি দান থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। ওসামা এবং তালেবান সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে বহির্বিশ্বে যেন জটিলতা তৈরি না হয় সে জন্য তার ওপর এই নির্দেশ জারি করা হয়। কিন্তু ১৯৮৯-এর ডিসেম্বরে ইরাকের ওপর অপারেশন ডেজার্ট ফক্স নামক অভিযানের পর যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করা থেকে ওসামাকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে কাজেই ডাক পড়ে সাংবাদিক রহিমুল্লাহ্ ইউসুফজাইয়ের। ইউসুফজাই পাকিস্তানের ইংরেজি দৈনিক দ্য নিউজ, হংকংভিত্তিক সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন টাইম এবং টেলিভিশন চ্যানেল এবিসি নিউজের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

নিজের সদর দপ্তরে মার্কিন হামলার পর থেকেই ওসামা বারবার অবস্থান পরিবর্তন করছিলেন। নিজের অবস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ার আশঙ্কায় স্যাটেলাইট ফোন থাকা সত্ত্বেও ওসামা তা ব্যবহার করতেন না। যুক্তরাষ্ট্র তাকে জনগণের এক নম্বর শত্রু হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

ওসামা ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে আফগানিস্তানে হেলমান্দ প্রদেশে এক তাঁবুতে বসে ইউসুফজাইকে সাক্ষাৎকার দেন। লম্বা, রোগাটে শরীরের ওসামার পরনে ছিল চিরাচরিত আরবি পোশাক। পাশে একটা একে-৪৭ রাইফেল নিয়ে ওসামা গভীর রাত পর্যন্ত প্রায় চার ঘন্টা ধরে সাক্ষাৎকার দেন। ওসামা খেলতে আর ঘোড়ায় চড়তে পছন্দ করেন। কিন্তু পিঠে সমস্যা থাকার কারণে হাঁটার সময় তাকে ছড়ি ব্যবহার করতে হয়। সহকর্মীদের ভাষায় বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার যোগাযোগ খবরের কাগজ আর বেতারের খবরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাক্ষাৎকারটি টাইম ম্যাগাজিনের ১১ জানুয়ারি ১৯৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

টাইম ঃ আফ্রিকায় যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি দূতাবাসে বোমা হামলার জন্য কি আপনি দায়ী ?

ওসামা বিন লাদেন ঃ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইন্টারন্যাশনাল ফ্রন্ট ফর জেহাদ সুস্পষ্ট একটি ফতোয়া জারি করেছে। এই ফতোয়ায় পবিত্র স্থানগুলোকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মুসলিম দেশগুলোকে জেহাদ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতরা এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। আল-আকসা মসজিদ এবং পবিত্র কাবা শরীফকে মুক্ত করার জন্য ইহুদি ও মার্কিনীদের বিরুদ্ধে জেহাদে উদ্বুদ্ধ হওয়া যদি অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়, তাহলে আমি যে অপরাধী তা ইতিহাস সাক্ষী দেবে। আমাদের কাজ হলো মুসলমানদের জেহাদে উদ্বুদ্ধ করা, সৃষ্টিকর্তার অশেষ দয়ায় আমরা তা করতে পেরেছি। কিছু মানুষ এতে যোগ দিয়েছে।

টাইম ঃ এই হামলার জন্য যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে আপনি কি তাদের চেনেন ?

ওসামা ঃ আমি যা জানি তা হলো সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির জন্য যারা নিজেদের জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে তারা প্রকৃত মানুষ। মুসলমান জাতিকে তারা অসম্মানের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আমরা তাদের সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে বসিয়েছি।

টাইম ঃ কিন্তু আপনার সঙ্গে তো গ্রেফতারকৃতদের সংশ্লিষ্টতার কথা বলা হচ্ছে ?

ওসামা ঃ ওয়াহিদ এল হেজ নামে যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তিনি আমাদের এক ভাই। সৃষ্টিকর্তার অশেষ দয়ায় ওয়াহিদ আফগান উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অনেক বছর হলো তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কিংবা যোগাযোগ নেই। তারপরও আমি এখনো তাকে স্মরণ করি। যুক্তরাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছে, তার সঙ্গে ওয়াহিদের কোন সম্পর্ক নেই। মোহাম্মদ রাশেদ আল-ওহালি সৌদি আরবের নাজদ প্রদেশের অধিবাসী বলে শুনেছি। মামদোহ্ সেলিম একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং হাফেজ। তিনি কখনই কোনো জেহাদী গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন না। আসল ঘটনা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ করে সিআইএ রিয়াদ, নাইরোবি, দার-এস সালাম, কেপটাউন, কাম্পালা এবং অন্যান্য স্থানে নিজেদের কৃতকর্মের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এই তিন জনকে গ্রেফতার করেছে। ভবিষ্যতেও তারা আফগানিস্তানে ইসলামিক জেহাদে অংশ নিয়েছে এমন যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করবে। সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন গ্রেফতারকৃতদের দুর্ভোগের অবসান ঘটান। আমরা নিশ্চিত যে, তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

টাইম ঃ জেহাদের লক্ষ্য যদি মার্কিনীরা হয় তবে আফ্রিকার অধিবাসীদের মৃত্যুকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন ?

www.pathagar.com

ওসামা : এখানে ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে, ঐ বিস্ফোরণের জন্য আমিই দায়ী। আমার উত্তর হলো, জাতির শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের যেসব ভাইয়েরা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন আমি জানি তাদের উদ্দেশ্য কি ? যখন পরিষ্কার বোঝা গেলো আফ্রিকার অধিবাসীদের আঘাত না করে মার্কিনীদের হটানো যাচ্ছে না, এতে যদি কোনো মুসলমান নিহত হয়, তাহলেও ইসলাম এই পদক্ষেপকে অনুমোদন দেয়।

টাইম : ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন ইরাকের ওপর যে যৌথ হামলা চালালো তাতে আপনার প্রতিক্রিয়া কী ?

লাদেন : ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র যে ইসরায়েল ও ইহুদিদের পক্ষে কাজ করছে এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণ পরিচালনার মাধ্যমে সে কথা তারা আবারো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে। ইহুদিরা যাতে আবারো মুসলিম বিশ্বকে বিভক্ত করতে পারে, মুসলমানদের ক্রীতদাস বানাতে পারে এবং এর অবশিষ্ট সম্পদ লুটে নিতে পারে সে পথ তৈরি করে দিতেই ইরাকের ওপর এই হামলা চালানো হয়েছে। এই আক্রমণে অংশ নেওয়া সৈন্যদের বিশাল একটি অংশ এমন কয়েকটি উপসাগরীয় দেশ থেকে এসেছে যে দেশগুলো নিজেদের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়েছে। যে ভূমিতে মোহাম্মদ (সাঃ) জন্ম নিয়েছেন এবং যেখানে তাঁর ওপর পবিত্র কুরআন শরিফ নাজিল হয়েছে, সেই ভূমিতে এখন ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতি রীতিমতো ভয়াবহ। ঐ দেশগুলোর শাসকরা দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তারা যেহেতু নিজেদের দেশে অবিশ্বাসীদের অনুপ্রবেশ মেনে নিয়েছেন, সেজন্য এই দেশগুলোকে মুক্ত করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। এই দেশগুলো মুসলমানদের, শাসকদের নয়।

টাইম : আপনার কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্র এখন কী আশা করতে পারে ?

লাদেন : কোনো চোর, অপরাধী কিংবা দস্যু চুরির উদ্দেশ্যে যদি অন্য কোনো দেশে প্রবেশ করে তবে সে যে কোনো মুহূর্তে প্রকাশ্যে নিহত হওয়ার আশা করতে পারে। মার্কিন বাহিনী আমার কাছ থেকে যে কোনো কিছু আশা করতে পারে। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত এবং খুব অল্প পরিসরে তা কার্যকরী। মুসলমানরা উত্তেজিত হয়ে আছে। আরব বিশ্বের ওপর যুক্তরাষ্ট্র যে হারে অন্যায়-অবিচার করেছে, ঠিক সে হারে মার্কিনিরা তাদের ওপর পাল্টা আঘাত আশা করতে পারে।

টাইম : যুক্তরাষ্ট্র বলছে যে, আপনি রাসায়নিক ও পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। কিভাবে আপনি এগুলো ব্যবহার করবেন ?

লাদেন : মুসলমানদের প্রতিরক্ষায় অস্ত্র সংগ্রহ করা ধর্মীয় দায়িত্ব। আমি যদি সত্যিই এ ধরনের অস্ত্র সংগ্রহ করে থাকি তবে আমি সেজন্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি যদি এই অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করতে চাই, তবে আমি দায়িত্ব পালন করছি মাত্র। বিপদের আশঙ্কা রয়েছে এমন অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য মুসলমানরা যদি এ ধরনের অস্ত্রের মজুদ গড়ে তোলা থেকে বিরত থাকে তবে সেটা হবে তাদের জন্য একটি পাপ।

টাইম : আপনার ঘাঁটিতে মার্কিন বিমান হামলাকে আপনি কিভাবে দেখছেন ?

লাদেন : মার্কিন হামলা এটাই প্রমাণ করেছে যে, এই পৃথিবী জংলি নিয়মে চলে। ঐ

www.pathagar.com

নিষ্ঠুর, বিশ্বাসঘাতকতামূলক হামলায় অসংখ্য বেসামরিক মুসলমান নিহত হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপা, ক্ষেপণাস্ত্রগুলো অকেজো হয়ে গিয়েছিলো। মার্কিন সামরিক বাহিনী যে তাদের নৈতিকতার মান হারাচ্ছে এই আক্রমণ তারই প্রমাণ। এরা এতটাই ভীরু যে তরুণ মুসলমানদের সামনা সামনি মোকাবিলা করার নৈতিক সাহস তাদের নেই।

টাইম ঃ যুক্তরাষ্ট্র আপনার সংগঠনের পেছনে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এক্ষেত্রে তারা কতোটা সফল হয়েছে ?

লাদেন ঃ যুক্তরাষ্ট্র জানে আজ থেকে ১০ বছর আগে সৃষ্টিকর্তার দয়ায় আমি তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিলাম। যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করেছে যে, সোমালিয়ায় মার্কিন সৈন্যদের নিহত হওয়ার দায়ভার পুরোপুরি আমার। সৃষ্টিকর্তা জানেন, এ ঘটনায় আমরা খুশি হয়েছি। তার দয়ায় এই সাফল্য এসেছে। আফগানিস্তানে এর আগে কাজ করেছেন এমন আরব মুজাহেদিন এবং সোমালীয় ভাইদের যৌথ উদ্যোগে এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এই ঘটনার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র আমাদের ওপর আর্থিক অবরোধ জোরদার করেছে এবং আমাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করছে। তারা ব্যর্থ হয়েছে। এই অবরোধে আমরা খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইনি। আশা করি সৃষ্টিকর্তা আমাদের পুরস্কৃত করবেন।

টাইম ঃ তালেবান সরকার যদি আপনাকে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে বলে তবে আপনি কি করবেন ?

লাদেন ঃ সেটা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। আমরা আশা করি না যে, এই ভূমি থেকে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে। সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি যদি আমাদের চলে যেতে হয় তবে তা যেন তার উদ্দেশ্যেই হয়।

টাইম ঃ আফগানিস্তানে থাকাকালীন আপনি কি আর কোনো হামলার আশঙ্কা করছেন ?

লাদেন ঃ আফগানিস্তানে কোনো বৈদেশিক আক্রমণ হলে তা কোনো একক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে হবে না। ওসামা বিন লাদেনকে একা আক্রমণ করা হবে না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, ইসলামের পতাকা তুলে ধরে আফগানিস্তান ইতোমধ্যে খ্রিস্টান-ইহুদি জোটের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। আমরা আশঙ্কা করছি কেবল ওসামার উপস্থিতিকে কারণ দেখিয়ে অবিশ্বাসীরা আফগানিস্তানের ওপর আক্রমণ চালাবে। সেই কারণে আমরা আমাদের ভাইদের সঙ্গে নিয়ে শহর ও গ্রামে বসবাসরত মুসলমানদের কাছ থেকে অনেক দূরে পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করি, যেন নিরীহ মুসলমানরা কোনো ক্ষতির সম্মুখীন না হন।

টাইম ঃ আপনার প্রচারিত ইসলামি বাণীর কি কোনো প্রভাব দেখতে পাচ্ছেন ?

লাদেন ঃ যুক্তরাষ্ট্র ও এর সমর্থক ইহুদিদের কারণে পৃথিবী জুড়ে যে অত্যাচার-অবিচার চলছে তাতে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। ইন্দোনেশিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন। সে' দেশে ৩০ বছর ধরে যে লোকটি স্বেচ্ছাচারী শাসন চালিয়েছে, সেই সুহার্তোকে ক্ষমতায় থাকাকালীন প্রচারমাধ্যমগুলো তাকে মহিমান্বিত করেছে, তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হিসেবে উপস্থাপিত করেছে। দুঃখজনক ব্যাপার হলো বর্তমানে আরব দেশগুলোর প্রচার মাধ্যমগুলোও ঠিক একই কাজ করছে। তবে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। আজ হোক,

www.pathagar.com

কাল হোক যেসব স্বৈরশাসক সৃষ্টিকর্তা এবং তার রসূলের (সাঃ) প্রতি নিজেদের বিশ্বাস এবং জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদেরও ঠিক একই পরিণতি হবে।

টাইম ঃ কিন্তু অনেক মুসলমানই আপনার হিংসার পথের সঙ্গে একমত নয় !

লাদেন ঃ নিজেদের ধর্মকে আমাদের পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। লড়াই করা হলে. আমাদের ধর্ম এবং শরিয়ার (ধর্মীয় আইন) একটি অংশ। সৃষ্টিকর্তা, তাঁর রসূল (সাঃ) এবং ধর্মকে যে ভালোবাসে, লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা সে অস্বীকার করতে পারে না। হাতে গোনা কেউ যদি এই মতবাদে বিশ্বাস করে যে, লড়াই করা ঠিক নয় তবে ইসলামের দৃষ্টিতে তারা সবচেয়ে বড়ো পাপী। অবিশ্বাসীদের প্রতি যাদের সহানুভূতি রয়েছে, যেমন প্যালেস্টাইনে পিএলও অথবা তথাকথিত ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ, দশকের পর দশক ধরে নিজেদের অধিকারের জন্য তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। অস্ত্র সমর্পণ করে, 'সহিংসতা' বন্ধ করে তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করছে। ইহুদিরা তাদের কী দিয়েছে ? ফিলিস্তিনিরা ইহুদিদের কাছ থকে ১ শতাংশ অধিকারও অর্জন করতে পারেনি।

টাইম ঃ বিশ্বের একমাত্র সুপার পাওয়ার যুক্তরাষ্ট্র আপনাকে জনগণের এক নম্বর শত্রু হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। এতে কি আপনি চিন্তিত ?

লাদেন ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবে পোষণ করা ধর্মীয় দায়িত্ব। সৃষ্টিকর্তা এ জন্য আমাদের পুরস্কৃত করবেন আশা করি। এক কিংবা দুই নম্বর শত্রু যাই বলা হোক না কেন, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। ওসামা বিন লাদেন নিঃসন্দেহ যে, মুসলমান জাতি তাদের দায়িত্ব পালন করবে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে তথাকথিত সুপার পাওয়ার যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে প্রচলিত লোককথার অবসান ঘটাতে পারবে মুসলমানরা।

২৪ সেপ্টেম্বর '০১

www.pathagar.com

আমেরিকান আগ্রাসন ও তৃতীয় বিশ্ব

আওরঙ্গযেব গওহর

ইসলাম অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় এবং সহাবস্থানের ধর্ম। কিন্তু বিকৃত খৃস্ট ধর্ম পশুসুলভ ও মানুষের হাতে চেঙ্গিসের রীতিতে রূপ নিয়েছে। আমেরিকা বাহাদুরের তৃতীয় বিশ্বের সাথে আচরণ মূলত ইসলামের সাথে শত্রুতা এবং বিকৃত খৃস্ট ধর্মের দর্পণ বৈ কি। বিশ্বে আগ্রাসনের ইতিহাস অতি পুরনো। কিন্তু যেভাবে আমেরিকা আগ্রাসনকে নিজের করে নিয়েছে, সম্ভবত তার পূর্ববর্তীয় যুগের আগ্রাসন পছন্দকারী দেশ এবং মানুষ এর মোকাবেলায় একেবারেই নগণ্য। আমেরিকার পূর্বে বৃটেন ছিলো এর কৃতিত্বের দাবীদার। আধিপত্যবাদী বৃটেন বিশ্বে ভৌগোলিক সীমা বৃদ্ধিকে অপছন্দনীয় সীমা পর্যন্ত পরিধি বিস্তার করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র করায়ত্ত করেছে, রাজা-বাদশাহদের হত্যা করেছে, অবলা নারীকুল এবং সবুজ-অবুঝ নিষ্পাপ শিশুদের জীবনকে স্বীয় খায়েশ চরিতার্থ করার বস্তুতে পরিণত করেছে। এমনও সময় আসে, বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে আন্দোলন আরম্ভ হয়। মানুষ চাইতে থাকে স্বাধীনতা ও স্বাধিকার। বৃটেন এ আন্দোলনকে অংকুরে বিনষ্ট করার জন্য যে জুলুম-নির্যাতন চালায়, ইতিহাসের পাতায় তা সংরক্ষিত রয়েছে। এসব ইতিহাস পড়ে মানবতা আঙ্গুল না কামড়িয়ে থাকতে পারে না। মানবতা কেঁপে উঠে এ জন্য, বিশ্বে স্বঘোষিত কালচার্ড জাতি মানবতাবিরোধী এ আচরণই বা শেষ পর্যন্ত করছে কেন, শুধুমাত্র স্বীয় শাসন রক্ষার্থে, স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য।

যা হোক, বৃটিশ শাসনের ভীতিপ্রদ কাহিনী শেষ হতে না হতেই বিশ্বে নব্য মোড়ল এবং নব্য আধিপত্যবাদী আমেরিকা পুনরায় একই কাহিনী আরম্ভ করেছে। এমনো হতে পারে, শেষ পর্যন্ত সে বৃটেনের জন্য বংশগত উত্তরাধিকার বনে যায়। আমেরিকা এবং বৃটেনের অধিবাসী ও শাসকদের মানসিকতা হচ্ছে এমন, বিশ্বে বৃটেনের সন্ত্রাস এবং একাধিপত্যের সহায়তা করেই যাচ্ছে আমেরিকা। আজ আমেরিকা যেখানেই কোনো ঘোল খাওয়ায়, সেখানেই বৃটিশ তার সহায়তা করে অতীতের নুন খাওয়াকে হালাল করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ আধিপত্যবাদ নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে। অবশ্য, স্বীয় বংশের উত্তরাধিকার আমেরিকাকে তার ডিউটি সোপর্দ করে গেছে। এখন

www.pathagar.com

আমেরিকা পৃথিবীতে সন্ত্রাস, আগ্রাসন এবং মোড়লিপনার শীর্ষে অবস্থান করছে। সে বিশ্বের অসংখ্য অঞ্চলে স্বীয় এ অপকর্মকে পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে। ইদানীং আফগান, সুদানের আক্রমণগুলোতে সে তার স্বরূপ উন্মোচিত করেছে। আমেরিকা এ দাবীও করে, এ বোমা হামলার হক অবশ্যই রাখে। আর সে তার বিরুদ্ধবাদীদের সমগ্র বিশ্বেই আক্রমণের ভিন্নতর কিছু নয়। সে ভিয়েতনামে নিরস্ত্র আপামর জনতাকে ক'বছর যাবত স্বীয় রক্তরঞ্জিত আধুনিক অস্ত্র দ্বারা করেছে রক্তাক্ত। ঝরিয়েছে বুকের তাজা লাল টুকটুকে রক্ত। পানামায় স্বীয় মর্জিমাফিক সরকার গঠন করার নিমিত্তে সেখানকার সরকারকে তাদের মন মতো শিকারে পরিণত করেছে। ইরাকের নিষ্পাপ শিশু স্বীয় জীবন উৎসর্গ করে প্রায়শ্চিত্ত করছে। কুয়েত তার তেলের কূপগুলো আমেরিকার চরণে রেখে স্বাধীন নেই। সৌদি আরবের সোনার খনিগুলো ওদের হাতেই। ইরানী বিপ্লবের পর ইরান আমেরিকান আগ্রাসনের লক্ষ্য বনেছে। এখানকার বিপ্লবের নেতৃত্বের টাইম বোমা থেকে সে হাত গুটাতে বাধ্য হয়েছে। ইরানী নেতৃত্বের বুকের পাটার জোরে তারা তাদের বিপ্লবকে নিষ্প্রাণ হওয়া থেকে রক্ষা করেছে।

লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং সাধারণ মানুষ আমেরিকার বোমা হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। আমেরিকা গাদ্দাফীর কাছে তার দু'জন আত্মস্বীকৃত অপরাধীকে ফেরত চেয়েছে। কিন্তু গাদ্দাফীর সাহসকে সালাম জানাতে হয়। তিনি বলেছেন, তোমরা আমার দু'জন লোক চাচ্ছো। আমি আমার দেশের দুটো কুকুরকেও তোমাদের হস্তগত করা আমার দেশের জন্য অপমান বলেই মনে করি। এবার আমেরিকা অভ্যাসগতভাবে সুদান এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানকে তার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। আমেরিকা আফগান এবং সুদানের বিরুদ্ধে আগ্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে দুটো স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, আঞ্চলিক নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক আইন এবং মূলনীতিগুলোকে পদদলিত করে আবারও একক সন্ত্রাসী দেশ হবার কার্যত সাক্ষ্য রেখেছে। সন্ত্রাস ব্যক্তিগত উদ্যোগে হোক বা সমষ্টিগত উদ্যোগে, তা কেবলমাত্র ঘৃণাই কুড়িয়ে থাকে। কারণ, এতে নিষ্পাপ জীবনগুলো অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এভাবে কোনো সন্ত্রাসকেই সঠিক পদক্ষেপ বলে মোটেই সার্টিফিকেট দেয়া যায় না। যে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের ওপর সন্ত্রাসের বিরোধিতার নামে আক্রমণ করা, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বরং অঘোষিতভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করারই নামান্তর। আর এটা হচ্ছে নিতান্ত কাপুরুষোচিত কর্মমাত্র।

কেনিয়া এবং তানজানিয়ায় আমেরিকান দূতাবাসে আক্রমণের সঠিক সাক্ষ্য-প্রমাণ যদি থেকেও থাকে, তবুও আমেরিকার এ বিষয়টি জাতিসংঘের ফোরামে ওঠানো উচিত ছিলো। যেখানে বোমা হামলাকারীদের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে তবেই বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকে। এমন কি, সেসব বিষয়ও আলোচনায় আসে, যে কারণে সন্ত্রাসের ন্যায় কর্ম করার জন্য সন্ত্রাসীরা বাধ্য হয়ে থাকে।

পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত সন্তর্পণে আমেরিকার গৃহীত কার্যাবলীর নিন্দাবাদ করেছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোর ভাষ্যানুযায়ী সরকার আপামর জনতাকে বিরোধিতা এবং আন্দোলনের সময় ধৈর্যধারণের জন্য সবকও দিয়েছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, বিগত অর্ধশত বছর যাবত পাকিস্তানের প্রতিটি সরকার আমেরিকাকে তোষামোদ করে আসছে। আযাদীর কিছুদিন পর পাকিস্তান পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং আমেরিকার সাথে সেনা-

www.pathagar.com

সন্ধিতে জড়িয়ে পড়ে। সেসব চুক্তির সাথে এখন কোনোভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত রাশিয়াকে বিতাড়িত করার জন্য ফ্রন্ট লাইন স্টেট বনে স্বীয় নিরাপত্তা পর্যন্ত বিঘ্নিত করেছে। এরপর মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধেরও পরাশক্তিগুলোর সার্বিক সহযোগিতা কোনো লুকোচুরির কথা নয়। আর আমরা তো পূর্বের ন্যায় আমাদের প্রভুদের নির্দেশ অত্যন্ত আনুগত্যের সাথে মানা শুরু করেছি। আফগানীরা তাদের জীবনকে উৎসর্গ করে সোভিয়েত রুশ থেকে যে শুধু স্বাধীন করেছে তা-ই নয়; তাকে নির্মমভাবে পরিণামের গ্লানি উপহার দিয়েছে আর আমেরিকাকে একমাত্র সুপার পাওয়ার হবার সম্মানে ভূষিত করেছে।

পাকিস্তানও সাধ্যের বাইরে গিয়ে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতা করেছে অকৃত্রিমভাবে। আজ আফগান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এও বলা হয়ে থাকে, তালিবানদের ওপর আমেরিকার আশীর্বাদ রয়েছে। কারণ, আমেরিকার আকাঙ্ক্ষা সেখানে ইরানের প্রভাব-প্রতিপত্তি একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাক। আফগানিস্তান এককভাবে থাকুক, যাতে করে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সংযোগ নিষ্কন্টক এবং সম্ভব হয়। এ হিসেবে আফগানিস্তানও আমেরিকার বন্ধু রাষ্ট্র বলে ধারণা করা যেতে পারে। আর আমেরিকা তার বন্ধুদের সাথে কিরূপ সদাচরণ করছে। এ প্রেক্ষিতে আমেরিকার সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রীর একটি বিবৃতি রেকর্ডভুক্ত রয়েছে।

"আমেরিকা তার শত্রুদের জন্য তো ভয়ংকর আছেই, সে তার বন্ধুদের জন্য তার চেয়েও বেশি ভয়ংকর।"

একটি শব্দ আমেরিকান চরিত্রের সঠিক চিত্র অংকন করে। কারণ, অতীতে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের সময়কালে পাকিস্তানের 'বন্ধু' আমেরিকা নিউট্রাল ভূমিকা পালন করেছিল। পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং আর্থিক সহযোগিতার গায়েও শক্ত করে পেরেক ঠুঁকে তবেই ক্ষান্ত হয়েছে। পরবর্তীতে বিধি-নিষেধ আরোপ করে পাকিস্তানকে শাস্তি দিতেও এতোটুকু কার্পণ্য করেনি পাকিস্তানের বন্ধু আমেরিকা।

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো বলেছেন, "আমেরিকা আফগানিস্তানে সন্ত্রাসীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে স্বীয় হকই ব্যবহার করেছে, আর এসব আক্রমণ দ্বারা পাকিস্তানের সরাসরি কোনো অসুবিধা নেই, আর সবার আমেরিকার এ ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করা উচিত।" এমন মনে হয়, বেনজীরের বিশ্বের যে কোনো দেশের স্বাধীনতা, স্বাধিকার, শীর্ষ নেতৃত্ব এর আন্তর্জাতিক রীতি-নীতিকে পদদলিত করায় কোনো বক্তব্য নেই, আর তিনি এক সুপার পাওয়ারের আশীর্বাদ গ্রহণ করে জনাব আসিফ যারদারী এবং নিজেকে আইনের বন্দিত্ব থেকে রক্ষা করতে চান। আরেকবার তিনি মসনদে বসার স্বপ্নে বিভোর। মুহতারামার পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষের আবেগের প্রতিও এতোটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। সমগ্র জাতি প্রতিবাদের আগুনে জ্বলছে। আর তিনি একমাত্র লিডার যে না-কি সাধারণ মানুষের আকুতি এবং তাদের আবেগ-অনুভূতির একেবারেই উল্টো বিবৃতি ফেঁদে বসেছেন। ভারতের আণবিক বোমা বিস্ফোরণের জবাবে পাকিস্তান সরকারকে প্রত্যুত্তরে আণবিক বোমা ফোটানোর ক্ষেত্রে চটজলদি না করার বিবৃতি দিতে যাবেন, আবার ফোটানোর পর নিন্দাবাদ করে তিনি মুনাফিকীর পরাকাষ্ঠাই

www.pathagar.com

প্রদর্শন করেছেন। এ বিবৃতিতে তার বাকী ইমেজও নিঃশেষ হয়ে যাবে। মুহতারামার সাথে ঐকমত্য পোষণকারী তাদের আল কাদের এবং নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানের অবস্থা-অবস্থানও তার থেকে ভিন্ন।

সম্প্রতি মিল্লাত পার্টির প্রধান এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমদ লেঘারি বলেছেন, নওয়াজ শরীফকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ফেলা হলে পাকিস্তান আট বিলিয়ন ডলার ঋণ পেতে পারে। এ বিবৃতিতে প্রতীয়মান হয়, জনাব লেঘারি আমেরিকা এবং আইএমএফ এবং বিবিধ সংস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কিন্তু তিনি এ সত্যকে দেখেও না দেখার ভান করেছেন। তিনি ছাড়াও কোনো কোনো নেতৃবৃন্দ তাদের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত। আর জনাব নওয়াজ শরীফ প্রধানমন্ত্রী হবার সুবাদে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের কাছে প্রাধান্য পাবেন নিঃসন্দেহে। আমেরিকা এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলো শাসকদের ওপর প্রেসার ক্রিয়েট করে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করে থাকে। কিন্তু আমাদের নেতা-নেত্রীরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে বারবার হোঁচট খেয়েই চলেছেন। যে পর্যন্ত কাপুরুষ এবং নাদানরা আমাদের রাজনৈতিক মঞ্চে আসীন থাকবে, সে পর্যন্ত পাকিস্তান হবে আধিপত্যবাদের বলির পাঠা।

সাবেক চীফ অফ দি আর্মি স্টাফ জনাব আসলাম বেগ বলেছেন, ক্রুজ মিসাইল এবং আমেরিকান গোয়েন্দা বিমান পাকিস্তানের আকাশসীমা অতিক্রম করে এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব নওয়াজ শরীফের সম্মতিতেই। অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর স্বীকারোক্তি লিখিত ছিলো না। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই মিসাইল পাকিস্তানের আকাশসীমা দিয়ে চলে গেছে। আর সম্ভবত এ কর্ম ওমান সালতানাত অথবা আমেরিকার সমুদ্র জাহাজ থেকেই করা হয়েছে। যা-ই হোক, তদানীন্তন সরকার আকাশসীমা লংঘনের দায়ে যথাযথভাবে প্রতিবাদ রেকর্ডভুক্ত করেনি। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আমেরিকাকে কঠোরভাবে ওয়ার্নিং দেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু ওই সময়ের সরকার নামে প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত থেকেছে।

আফগানিস্তানে আফগান গ্রুপগুলোকে আমেরিকা তার স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যও ব্যবহার করে। সর্বাগ্রে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার, বোরহানউদ্দিন রব্বানী প্রমুখ পাকিস্তান এবং আমেরিকার পূর্ণ সহযোগিতা পেতো। পরবর্তীতে তালিবানরা একটি শক্তি হিসেবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে তাদের মাধ্যমে অন্যান্য শক্তিকে দৃশ্যপট থেকে হটিয়ে দেয়া হয়। কারণ, তারা বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করতে ব্যর্থ ছিলো। তালিবানরা আফগানের বৃহত্তর এলাকা কন্ট্রোল করলে এবং ইসলামী আইন প্রবর্তনের ঘোষণা দিলে আমেরিকা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। আমেরিকা সন্ত্রাসের আচরণের আফগানিস্তানের আঞ্চলিক নিরাপত্তা, সিকিউরিটি কাউন্সিল এবং আন্তর্জাতিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মিসাইল আক্রমণ করে বসে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় সংগঠন সংস্থার জন্য চিন্তার বিষয় হচ্ছে, অন্য কোনো দেশ বা সাম্রাজ্যবাদ শক্তির সাহায্য-সহযোগিতা দ্বারা জিহাদ করার পরিণতি ফল কিরূপ হয়। কেউ কেউ এই ভেবে ডুগডুগি বাজিয়েছিলেন, তারা একটি সুপার পাওয়ারকে আরেকটি সুপার পাওয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, তারা পাকিস্তানের পবিত্র ভূমি ব্যবহার করে রাশিয়ার সাথে শত্রুতার বীজ বপণ করে রেখেছেন।

আজ পাকিস্তান যেসব অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ইস্যুতে উজ্জীবিত, এগুলো সৃষ্টির

www.pathagar.com

পেছনে অতীতের সরকারগুলোর নীতিভ্রষ্টতা এবং অপরিপক্ক উদ্যোগ ছাড়াও রয়েছে ভ্রান্ত পররাষ্ট্র নীতিও একটা বড় কারণ। পৃথিবীতে আজ এমন কোনো রাষ্ট্র তেমন একটা নেই, যার ওপর কিছুটা ভরসা করা যেতে পারে। কেউই পরিপূর্ণভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে। যেমন, আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর দেখা গেছে, আমাদেরও অন্য দেশের কার্যক্রমে অনুপ্রবেশ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, ইরানে কিভাবে বিপ্লব সাধিত হয়েছে, এটা সঠিক না ভ্রান্ত। আমাদের তালিবানদের ব্যাপারে নাক গলানো ঠিক না। তারা যেরূপ আইন প্রয়োগ করতে চায় করুক। আমাদের ধর্মীয় দলগুলোর এ বিষয়টিও সামনে রাখতে হবে, বিপ্লব আসা-যাওয়ার কোনো বস্তু নয়, আর যে কোনো বিপ্লবের বীজ তার পবিত্র ভূমি থেকেই অংকুরিত হয়। সেখানকার তাহজীব-কালচার এবং যমীনের বাস্তবতাই তার নিরিখি নির্ধারিণ করে। এসব দলের নিজের সমাজের চারিত্রিক বিষয়কে সর্বাধিক এবং সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেয়া উচিত। কারণ, চারিত্রিক স্খলন জাতিগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে। আর জাতিগুলো হয়ে যায় মৃত। এ বিষয়টিকে অস্বীকার করতে পারবে, বিপ্লব, মৃত জাতির মধ্যে আদৌ রক্ত সঞ্চালন করতে পারে না।

আমেরিকান সরকারের বক্তব্য হচ্ছে, তারা এ পদক্ষেপ সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন, আমেরিকান নাগরিকদের নিরাপত্তার খাতিরেই নিয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাহলে কি স্রেফ আমেরিকান নাগরিকই মানুষ! ফিলিস্তিনে ইসরাইলের সন্ত্রাস এবং কাশ্মীরে ভারতের সন্ত্রাসের দ্বারা সেসব মানুষের জীবন বিপন্ন হতে চলেছে, তারাই বা তাহলে কোন্ দলভুক্ত ? ইরাক কুয়েতে আক্রমণ চালালে জাতিসংঘের সাথে কৃত ওয়াদাগুলো পালন করার ব্যাপারে কোনো ধরনের উদ্যোগ-আয়োজন প্রতীয়মান হয় না। পাশ্চাত্য বিশ্ব এবং আমেরিকাকে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের পতাকাবাহী বলা হয়ে থাকে, মুসলমানদের অধিকার বিনষ্টকারীদের ব্যাপারে কেউ নীরব থাকলে তা কি গাদ্দারী নয় ?

আমেরিকা যে কাপুরুষ, তার অনুমানই ছিলো না নিজের। খারতুম এবং খোস্তে আধুনিক মিসাইল এবং উড়োজাহাজের বোমাবর্ষণের পর সুদান এবং আফগানিস্তানে জীবনযাত্রায় কোনোরূপ ইরফ পরিলক্ষিত হয়নি। ঈমানদীপ্ত মুসলমানের রাস্তায় রাস্তায় আমেরিকা নিপাত যাকসহ একাধিক শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ওয়াশিংটন এবং অন্যান্য আমেরিকান শহরে নিরাপত্তা জোরদারের অবস্থা দেখে মনে হয় যেন কোনো বৃহৎ শত্রু আক্রমণ চালিয়েছে। হোয়াইট হাউস ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিরাপত্তা কঠোর করা হয়েছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ মুখোশ পরে নিয়েছে। তারা প্রতিটি যাত্রীকে সন্দেহের চোখে দেখছে। এখন স্রেফ পরিখা খননের বিষয়টি বাকী আছে। অথবা ব্ল্যাক আউটে আসেনি। ওসামা বিন লাদেন এ ধমক দিয়ে দিলে, তিনি রাতে কোনো ঝটিকা আক্রমণ চালাবেন, তাহলে সম্ভবত বিশ্ব নিরাপত্তার দাবীদার তার জনগণকে রাতের বেলা আলো নিভিয়ে গুটিসুটি দিয়ে ঘরে বসে থাকার নির্দেশ দেবে।

আমেরিকার অর্থনৈতিক, কৃষি, সাইন্স এন্ড টেকনোলজির উৎকর্ষতায় পুরো বিশ্বের চোখ বিস্ফারিত করে রেখেছে। আর তার সেনাবাহিনীর আধিক্যকে রাশিয়াও মেনে নিয়েছে। যে স্বয়ং একটি আণবিক শক্তি। বিগত ক'টি দলকে সেও আমেরিকার করে যাচ্ছে। কিন্তু

www.pathagar.com

এতদসত্ত্বেও একজন সাধারণ মানুষ ওসামা বিন লাদেনকে যেভাবে ভয় করছে এরূপ কিউবা এবং পানামা আমেরিকাকেও কখনো ভয় করবে না।

এটা কিরূপ নিয়তির পরিহাস, বিশ্ব নেতৃত্ব দেবার ন্যায় গুরুদায়িত্ব এমন একটি দেশ গ্রহণ করেছে, যার সাবেক প্রেসিডেন্ট এক তরুণী মনিকা লিউনস্কি, যে তার থেকে আমেরিকান রেওয়াজ অনুযায়ী স্বীয় সতীত্ব রক্ষা করতে পারেনি, আবার এখন বাঁচার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই আমেরিকার সাধারণ মানুষের ওসামা বিন লাদেন ভয় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। কোনো কোনো লোকের বক্তব্য হচ্ছে, ক্লিনটন মনিকা লিউনস্কির ওপরের রাগ সুদান, আফগানিস্তান এবং ওসামা বিন লাদেনের ওপর ঝেড়েছেন।

আমেরিকায় ওই সময় একটি ছবি প্রদর্শিত হতো হলগুলোতে। নাম হচ্ছে The Dog Vag. ছবির কেন্দ্রীয় ধারণা হচ্ছে, এক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট সেক্স স্ক্যান্ডেলে ফেঁসে যাবার পর তার পরামর্শদাতাদের বলছেন, কোনো যুদ্ধের ফন্দি আঁটো। তবেই সেক্স স্ক্যান্ডেল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। ক্লিনটন এ ছবি দেখার পর সুদান এবং আফগানিস্তানে আক্রমণের ষড়যন্ত্র করে। অথবা ফিল্ম লেখক আমেরিকান রাজনীতিকদের স্মরণ করে দিয়েছেন। দুই অবস্থায়ই বিশ্ব শান্তির সবচেয়ে বড় আশংকা রয়েছে খোদ আমেরিকা থেকেই। এমন একটি দায়িত্বহীন রাষ্ট্র, যার প্রধান স্বীয় চরিত্রহীনতাকে ঢাকার জন্য নিষ্পাপ সাধারণ মানুষের ওপর ক্লাস্টার বোমাবর্ষণের নির্দেশ দিতে পারে। আমেরিকার তখনকার প্রধান তো এমনিতেই পুরুষ বিড়ালের খ্যাতি অর্জন করেছেন। এ যাবত অর্ধ ডজন নারী তার লালসার শিকার হয়েছে।

বিশ্ব নেতৃত্বের দাবীদার এদেশের সাধারণ মানুষ তাদের সাবেক প্রেসিডেন্টকে জাতির বউ-বেটির ওপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তারা তাদের উন্মাদ নেতাদের নিষ্পাপ মানুষের ওপর বোমা ফাটানো থেকে কিভাবে বিরত রাখবে! এটা সুস্পষ্ট কথা, কিন্তু বিশ্ব বিশেষত মুসলিম বিশ্বের হয়েছেটা কি ? তারা এক কাপুরুষ, ভীতু এবং চরিত্রগতভাবে বিধ্বস্ত রাষ্ট্রের থাবায় এসে তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। পাকিস্তান অনেক দিন যাবত মোশাদ এবং কেজিবি'র সন্ত্রাস এবং গোয়েন্দাবৃত্তির শিকার হয়েছে। আমওর ও মোশাদের সন্ত্রাসীরা সাধারণ মানুষের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোকে হারাম করে রেখেছে। কত পাকিস্তানী এদিক-সেদিক পালিয়েছে। ওসামা বিন লাদেন তার অসংখ্য সাথীকে আমেরিকা ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে যাতে তারা এফবিআই এবং সিআইএ'র অত্যাচারের শিকারে পরিণত না হয়। এদিকে আমেরিকা উন্মাদ হয়ে গেছে। সিআইএ'র প্রতিশোধের কাহিনী দুনিয়াভর প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

পূর্বেও আমেরিকা ইরান, লিবিয়া, ইরাক এবং সুদানকে ভয় করতো। এটা নয় রাষ্ট্র হিসেবে আমেরিকা এবং তার জনগণের জন্য আশংকার বিষয় হতে পারে। কিন্তু একজন মাত্র সাদাসিধে মানুষ স্বীয় কয়েকশ' মুসাফির নিঃসন্দেহে মুজাহিদ সঙ্গী-সাথীসহ বিশ্বে সবচেয়ে বৃহৎ সামরিক মিশনারী এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সজ্জিত, যার ভীতি বিশ্বকে প্রকম্পিত করে; তার প্রথমবার অনুমিত হলো, অস্ত্রশস্ত্র নয়, তাদের পরিচালনাকারীর দৃঢ়তাই অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারে। ক্লাসিংকপ কোনো হিজড়ার হাতে পুরে দেয়া হলে সে তার হাতের এবং হাঁটুর কাঁপুনিকে সামাল দিতে পারবে না। অবশ্য, প্রত্যয়দীপ্ত

www.pathagar.com

কোনো লোক ও অস্ত্রশস্ত্র গোলা-বারুদসম্পন্নও কিন্তু দুর্বল ইচ্ছার মালিক সৈনিকের ওপর ভারি হয়ে থাকে। ওসামা বিন লাদেনের আর কোনো অবদান থাকুক বা না থাকুক কিন্তু তার এ অবদান ইতিহাসের সোনালী পাতায় সর্বকালে জীবিত থাকবে, তিনি আমেরিকার কাপুরুষতা এবং প্রত্যয় শক্তিহীনতাকে নির্ণীত করেছেন, চিহ্নিত করেছেন, নির্ভীক আর অকুতোভয়ে।

পাকিস্তানী সাংবাদিক।

সেপ্টেম্বর '০১

নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে....................

www.pathagar.com

বদলে যাচ্ছে কৌশলগত মৈত্রী

ব্রিগেডিয়ার (অব.) আবদুল হাফিজ

গত ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে এক দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী হামলায় বিধ্বস্ত হয়েছে মার্কিন বিত্তবৈভবের প্রতীক 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' এবং সামরিক শক্তির প্রাণকেন্দ্র পেন্টাগনের একাংশ। ১৯৪১ সালে পার্ল হারবারে জাপানিরা এক 'কামিকাজে' অভিযানে তছনছ করে দিয়েছিল মার্কিন নৌ-বহর। প্রায় দুই যুগব্যাপী যুদ্ধাবসানে ৫৮ হাজার সৈনিককে হারিয়েও ভিয়েতনামের কাছে পরাজয় বরণ করেছিল মার্কিনিরা। কিন্তু দু'টি বিশাল মহাসমুদ্র পরিবেষ্টিত দুর্ভেদ্য দুর্গসদৃশ 'কন্টিনেন্টাল আমেরিকা'য় এমন অভূতপূর্ব বিপর্যয় এই-ই প্রথম। বলা বাহুল্য, এর সঙ্গে চুরমার হল যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে একক ও অজেয় পরাশক্তির 'মিথ'। প্রমাণিত হল যে, অপরিমিত শক্তির অধিকারী যুক্তরাষ্ট্রেরও রয়েছে সীমাবদ্ধতা। উন্মোচিত হল তার নিরাপত্তহীনতার একাধিক শূন্যগর্ভ অন্ধকার। এই হামলার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার সামর্থ্য অবশ্য আছে যুক্তরাষ্ট্রের, কিন্তু এর মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত নিঃসন্দেহে প্রচণ্ড, যা কাটিয়ে উঠতে মার্কিনিদের দীর্ঘ সময় লাগবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির বিজয়ের স্থপতি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের মতো বিশ্ব রাজনীতিতে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্নায়ুযুদ্ধে তার নিরঙ্কুশ বিজয় আরও সুসংহত করে যুক্তরাষ্ট্রের এই শীর্ষ অবস্থান। নিজেদের এই ঈর্ষণীয় অবস্থান স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে অধুনা মরিয়া হয়ে ওঠে বিশ্বের এই একক পরাশক্তি। তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি যে কোন চ্যালেঞ্জকে স্তব্ধ করার জন্য সম্প্রতি তারকা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে এই শক্তিধর দেশটি। সেই যুক্তরাষ্ট্র আজ দৃশ্যত এক করুণ অসহায়ত্বের শিকার। ব্যর্থতা শুধু শত্রুকে প্রতিরোধ না করতে পারার মধ্যেই নয়, শত্রুকে সুস্পষ্ট শনাক্ত করার অক্ষমতার মধ্যেও।

স্বভাবতই এই আকস্মিক সন্ত্রাসী হামলায় মার্কিনিরা যুগপৎ হতভম্ব, বিক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ। এই ক্রোধ ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মার্কিনিদের তিক্ত প্রতিক্রিয়ায়। মার্কিন প্রশাসন এই হামলাকে বলেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। বলেছে, এই হামলা গণতন্ত্র ও সভ্যতার প্রতি হুমকি। সঙ্গে সঙ্গে বুশ প্রশাসন এই হামলার হোতাদের খুঁজে বের করার সংকল্প ব্যক্ত করেছে। ব্যক্ত করেছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘস্থায়ী ও সুপরিকল্পিত অভিযানে পরিপূর্ণ জয়ের প্রত্যয়। যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররা বিশেষ

www.pathagar.com

করে ব্রিটেন সন্ত্রাস দমনে যে কোন মার্কিন প্রচেষ্টাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেয়ার কথা বলেছে। বস্তুত সমগ্র বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র তথা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এই প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত। নজিরবিহীন এই সন্ত্রাস, যাতে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানির আশংকা—তা যতই মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হোক না কেন তা কখনও কারও কাছে অভিপ্রেত হতে পারে না। এছাড়া সন্ত্রাস কখনও কোন সমাধানের সহায়ক নয়। কারও বিরুদ্ধে সন্ত্রাস প্রয়োগ শুধু সহিংসতাকেই ঘনীভূত করে এবং সংঘর্ষকে করে দীর্ঘায়িত। সুতরাং যে কোন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন সন্ত্রাসকে ঘৃণাই করবে। নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে সন্ত্রাসী হামলার আকস্মিকতা প্রাথমিকভাবে মার্কিনিদের বিমূঢ় করলেও এরা এখন সঙ্গত কারণেই হামলাকারী, তাদের সহযোগী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে আক্রোশে ফুঁসে উঠেছে। নাম-পরিচয়হীন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আক্রোশের ভয়াবহ রূপ হচ্ছে অনিশ্চিত লক্ষ্যবস্তুকে প্রত্যাঘাত। অনুমাননির্ভর এই প্রত্যাঘাতের কিছু কিছু উপসর্গ ইতোমধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়েছে খোদ যুক্তরাষ্ট্রে যখন সম্প্রদায় বিশেষকে প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে।

গত কয়েক দিনের অনুমাননির্ভর ও স্বেচ্ছাকল্পিত লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী ইসলামী জঙ্গিবাদ। তবু এককভাবে এই সন্দেহ, অনুমান ও প্রতিকূল ধারণার অঙ্গুলি উত্তোলিত হয়েছে সৌদি বংশোদ্ভূত এক পলাতক জঙ্গিবাদী ওসামা বিন লাদেনের দিকে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ প্রায় নিশ্চিত যে, এই লাদেনই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসের মূল হোতা। অবশ্য বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার জন্য মার্কিনিদের লাদেনকে সন্দেহ এই প্রথম নয়। ১৯৯৮ সালে পূর্ব আফ্রিকার দু'টি মার্কিন দূতাবাসে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ২৪৭ জন মার্কিন নাগরিককে হত্যা এবং এ বছরের শুরুতে এডেনে মার্কিন ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস কোলে একই রূপ হামলায় ১৯ জন মার্কিন নাবিককে হত্যার জন্যও সন্দেহের সূঁচ লাদেনকেই নির্দেশ করেছিল। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ইতিপূর্বেকার নাশকতামূলক হামলার অভিযুক্তদের মধ্যেও লাদেনকে শামিল করা হয়েছিল। তবে ১৯৯৬ সালে দাহরানের মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে হামলাই হচ্ছে একমাত্র সন্ত্রাসী তৎপরতা যার দায়িত্ব লাদেন স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

তবু যুক্তরাষ্ট্র ও সমগ্র পশ্চিমা মহলের কাছে লাদেনই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের প্রধান নায়ক এবং সন্ত্রাস নির্মূল করার লক্ষ্যে লাদেনই এখন তাদের লক্ষ্যবস্তু। এই লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রে এখন সামরিক প্রস্তুতি তুঙ্গে। মার্কিন সামরিক বাহিনীর ৫০ হাজার রিজার্ভ সৈনিককে ইতোমধ্যে কর্মস্থলে তলব করা হয়েছে। 'যুক্তরাষ্ট্র এখন সন্ত্রাসের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত' এই মর্মে দেশে রণোন্মাদনা সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত। এই যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ হিসাবে একটি বহুজাতিক জোটও প্রস্তুত করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলো ছাড়াও উল্লেখযোগ্য সব দেশই যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। এমন কি আরব-ইসলামী বিশ্ব এতে অংশগ্রহণে প্রস্তুত। সন্ত্রাস দমনের এমন স্বতঃস্ফূর্ত ও অনুকূল পরিবেশ অতীতে কদাচিৎ দেখা গেছে। এমন কি এক যুদ্ধ পূর্বে স্নায়ুযুদ্ধের অব্যবহিত পর উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রাক্কালেও আরব বিশ্বে কিছু কিছু ভিন্নমতের অস্তিত্ব ছিল। এখন তাও নেই। এই সুযোগকে বুশ প্রশাসন পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করবে এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এই যুদ্ধাভিযানের স্বরূপ নিয়ে। কেননা কায়াহীন সন্ত্রাস নামক এক ছায়া শত্রুর

www.pathagar.com

সঙ্গে সংঘর্ষ ইতিহাসে এই প্রথম।

লাদেন বনাম সন্ত্রাসবিরোধী বহুজাতিক জোট এই অভিনব সংঘর্ষটি সংঘটিত হতে যাচ্ছে পৃথিবীর একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে যা অতীতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে কিন্তু যার চমকপ্রদ নিজস্ব কোন ইতিহাসই নেই। আফগানিস্তান অসংখ্য উপজাতি অধ্যুষিত ঐতিহ্যপ্রিয়, প্রচণ্ডভাবে স্বাধীনতা লিপ্সু অথচ পশ্চাৎপদ, হতদরিদ্র তমসাচ্ছন্ন একটি দেশ। এমনি একটি দেশের বিরুদ্ধে জোট পাকাচ্ছে বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রপুঞ্জ। কেননা এই দেশেই স্বদেশ থেকে বিতাড়িত লাদেন আশ্রয় নিয়েছে ১৯৯৬ সাল থেকে। এখানেই একজন ধনকুবের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যার একদা সৌদি রাজপরিবারের সঙ্গে ছিল গভীর সৌহার্দ্য, সেই শীর্ণকায় রুগ্ন চেহারার ওসামা বিন লাদেন ভিন্নমত পোষণ করে একটি অসাধ্য সাধনের তপস্যায় রত। বাল্যাবধি সে তার স্বজাতিকে একটি গভীর প্রবঞ্চনার শিকার হতে দেখেছে। মরক্কো থেকে ফিজি, বলকান থেকে সিনজিয়াং সর্বত্র বিস্তৃত এই প্রবঞ্চনার জাল। এই জালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে তাদের বিপুল সম্পদ যা বৃহৎ শক্তিরা স্থানীয় শাসকদের সহযোগিতায় লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে।

লাদেন এই অবস্থাকে পাল্টাতে চায়। বিত্তবানদের ঐতিহ্যে সে সহজেই বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারত। তা না করে সে সৌদি রাজপ্রাসাদে তার ঠিকাদারি ব্যবসাকে পরিহার করে একটি দুর্গম পথে এগিয়েছে। হাতিয়ার তুলে নিয়েছে আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। রুশবিরোধী আফগান প্রতিরোধ যুদ্ধের সেই বীরযোদ্ধাকে আশ্রয় দিয়েছে আফগানিস্তানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী। আফগান ঐতিহ্যের ধারক তালিবানরা শত চাপের মুখেও তাদের অতিথিকে বর্জন করেনি। দু-দু'টি সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপিত হওয়ার পরেও একটি দারিদ্র্য, খরা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত আফগানিস্তান কোন অপরাধে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে লাদেনকে তুলে দিতে চায়নি। এই হল আফগানিস্তানের অপরাধ। সেই অপরাধের শাস্তি দিতেই আজ যুক্তরাষ্ট্রের রণপ্রস্তুতি।

সমগ্র পৃথিবী অবাক হয়ে ভাবছে হিন্দুকুশের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ওসামাকে অন্বেষণ করে কি তার ফল দাঁড়াবে বা ওসামা এবং তার আশ্রয়দাতাদের শাস্তি দিতে কিভাবে সন্ত্রাসকে পরাজিত করা যাবে! সন্ত্রাস শুধুই মাত্র একটি কৌশল যা সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলদের একটি হাতিয়ার। দুঃখজনক হলেও এ কথা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, সন্ত্রাসের সাম্প্রতিক শিকার যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ বিষয়টির ওপর একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং একটি অন্তঃদর্শনে ও তার ক্ষমতার দর্প দ্বারাই প্রভাবান্বিত হচ্ছে। এই প্রশ্ন আজ এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায়ই নেই। আফটার অল, দুর্বলরা পরাজয় বা আত্মনিধন নিশ্চিত জেনেও কেন সবলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করে ?

যুক্তরাষ্ট্রে আজ সন্ত্রাসের ফলে উদ্ভূত ট্র্যাজেডির জন্য আমরা সবাই মর্মাহত। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্বব্যাপী জ্ঞাত-অজ্ঞাত অসংখ্য ট্র্যাজেডির জন্য কি আমরা একইভাবে মর্মাহত হব না ? ইসরাইলি নির্যাতনে বিক্ষত পশ্চিম তীরবাসীদের জন্য কি আমরা একইভাবে ব্যথিত হব না ? লাখ লাখ ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু যাদের জন্ম ও মৃত্যু উদ্বাস্তু শিবিরে তাদের জন্য আমরা বিচলিত নই কেন? শাবরা ও শাতিলার বিদেহী আত্মাদের আহাজারি আমাদের শোকাবহ করে না কেন ? ৫৬ বছর আগে নিজ বাসভূম থেকে বিতাড়িত ফিলিস্তিনিরা নিজগৃহে ফিরতে পারবে না কেন ? কেন এবং কোন অপরাধে

www.pathagar.com

জাতিসংঘ আরোপিত অবরোধের ফলে ইরাকের দশ লক্ষাধিক শিশু প্রাণ হারিয়েছে ? তাদের জন্য কি বিশ্ব বিবেকের কোন দায়-দায়িত্ব নেই ? কেননা তারা দুর্বল। ? বিশ্বজোড়া এই ব্যাপক অন্যায় আচরণে পশ্চিমা বিশ্বের ভূমিকা তারা নিজেরাও অনবহিত নয়। সন্ত্রাসের উৎসধারাকে রোধ না করে তাকে খরস্রোতে পরিণত হওয়ার সুযোগ কেনই দেই আমরা। সন্ত্রাসের কারণগুলোকে নির্মূল না করে সন্ত্রাস নামক একটি অশরীরী শত্রুকে ধাওয়া করে সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্য অর্জিত হবে ? লাদেন বা তাদের সহযোগীদের নির্মূল করতে পারলেও অন্য লাদেন বা তৎপেক্ষা ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীর উদ্ভব হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়। নেহায়েত শক্তির জোরে লাদেন বা তার আশ্রয়দাতা আফগানিস্তানকে কুপোকাৎ করা গেলেও কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকেই তারা কি আন্তর্জাতিক আইনে দোষী সাব্যস্ত হবে। আন্তর্জাতিক বিবেক বা নৈতিকতা কি বলে ?

যুক্তরাষ্ট্রে এই সন্ত্রাসী হামলার ফলে শুধু যুক্তরাষ্ট্রে নয়, সমগ্র বিশ্বে একটি ভূ-রাজনৈতিক ভূকম্পন ঘটে গেছে। বদলে গেছে নিরাপত্তা কৌশলের প্রচলিত ধারণা। এরপর বিশ্ব রাজনীতিকে ঠিক সন্ত্রাস-পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে। একই অবস্থানে সম্ভবত থাকবে না যুক্তরাষ্ট্র স্বয়ং। তার রাজনীতি, বিশ্বাস ও জাতীয়তার ধারণায় আসবে একাধিক পরিবর্তন। ফলে বিকশিত হবে এক নতুন যুক্তরাষ্ট্র। তেমনিভাবে পাল্টে যাবে কৌশলগত মৈত্রীর কাঠামো। এই সন্ত্রাসের ফলে আঞ্চলিক কৌশলগত ভারসাম্য সবচেয়ে প্রভাবান্বিত হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ায়। এই অঞ্চলের পরস্পরের প্রতি বৈরী ভারত এবং পাকিস্তান উভয়ই এখন আসন্ন যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সহযোগিতার নামে পাল্লা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে তুষ্ট করার চেষ্টা করছে। যদি শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তানে একটি অনভিপ্রেত সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়, সমস্ত দক্ষিণ এশিয়াই তাতে অনিবার্যভাবে যুদ্ধ এলাকায় পরিণত হবে, বৃদ্ধি পাবে ধ্বংসাত্মক তৎপরতা। ফলে বিভিন্ন চেহারায় সম্প্রসারিত হবে সন্ত্রাসের ক্ষেত্র।

তবে এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার নয় যে, পশ্চিমের এই সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের কৌশল কি হবে ? কৌশল যা-ই হোক এবং এই যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক মানব সম্প্রদায়ের জন্য দুর্দশা বৃদ্ধি পাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। এই বিপজ্জনক সত্যি অবস্থায় বিশ্বকে নিপতিত করতে বুশ প্রশাসন কি সত্যি সত্যি একটি অনিশ্চিত সংঘর্ষের পথে অগ্রসর হবে, গভীর উদ্বেগের সঙ্গে বিশ্ব সম্প্রদায় তা দেখার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

২ অক্টোবর '০১

লেখক ঃ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, কলামিষ্ট।

www.pathagar.com

হিন্দুকুশে অব্যাহত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

(দুই)

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে মাসাধিককালের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের পর অবশেষে কাবুলের পতন হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরের লৌহশাসনের পর কাবুলসহ দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রধান ঘাঁটিগুলো থেকে পশ্চাদপসরণ করেছে দুর্ধর্ষ তালেবান যোদ্ধারা। এখনও স্পষ্ট নয় এটা কি তাদের চূড়ান্ত পরাজয় না যুদ্ধের কৌশল। যেসব আফগান এলাকা এখনও তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সেখানেও চলছে ঘোরতর যুদ্ধ এবং ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর নির্বিচার বোমাবর্ষণ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আপাতত তালেবান শাসনের এখানেই পরিসমাপ্তি। সেই সঙ্গে পরিসমাপ্তি তালেবান সমর্থনপুষ্ট ওসামা বিন লাদেন নেতৃত্বাধীন আল কায়দা জিহাদী গোষ্ঠীর আফগানিস্তানভিত্তিক মিশনের। এরই ফলশ্রুতিতে বিপন্ন ওসামার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। শেষ পর্যন্ত আল কায়দাসহ তাঁর পরিণতি যাই ঘটুক না কেন এই প্রবাদ পুরুষকে ঘিরে ইতোমধ্যেই যে কিংবদন্তির জন্ম হয়েছে তা কিন্তু বেঁচে থাকবে। সোচ্চার থাকবে তার প্রতিবাদের সুতীক্ষ্ণ ভাষা। অব্যাহত থাকবে অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে তার উদ্ভাবিত কৌশলের ধারা। ওসামার দর্শন ও পদ্ধতির যৌক্তিকতা নিয়ে পৃথক বিতর্ক হতে পারে কিন্তু বাস্তবতা এটা যে, প্রতিনিয়ত অপমানিত অবহেলিত ও প্রবঞ্চিত মানুষের কাছে তার আবেদন আগামী দিনগুলোত লাখ লাখ হৃদয়কে আন্দোলিত করতে থাকবে। তবে ওসামা-বিস্ময় আজকের আলোচনার বিষয় নয়। স্থানান্তরে তা নিয়ে লিখার আশা পোষণ করে মূল প্রসঙ্গ আফগানিস্তানে ফিরে আসি।

অসংখ্য উপজাতি অধ্যুষিত হিন্দুকুশের দুর্গম গিরিসংকুল এই দেশটিতে যুগ যুগ ধরে যে সংকট বিরাজ করছিল তালেবান শাসনের অবসান সেই সংকটেরই পুনরাবির্ভাব ঘটাল। তালেবানদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তানে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যে চিহ্নটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও অন্তর্হিত হল। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিক্ষত এই দেশটি আবারও নিক্ষিপ্ত হল একটি ভয়াবহ অনিশ্চয়তার গহ্বরে। আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের পূর্বশর্ত হিসেবে একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব আফগানিস্তানে কখনও বিদ্যমান ছিল না। দেশের সব উপজাতি, গোষ্ঠী ও পরিবারকে একই পরিচয়ের সূত্রে আবদ্ধ করে একটি জাতিরূপে আফগানদের দাঁড় করানোর অসামান্য কাজটি করেছিলেন একজন দুরানি পশতুন নেতা আহমদ শাহ

www.pathagar.com

আবদালী সেই ১৭৪২ সালে। তিনি দেশের পরস্পর বিবদমান উপজাতিদের নিয়ে একটি কনফেডারেশন গড়ে তুলেছিলেন এবং এর ওপর কর্তৃত্ব করার জন্য দুরানি রাজবংশের গোড়াপত্তন করেছিলেন। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ পশতুন (৪৫%) বংশজাত এই রাজবংশই দুশ' বছরের উপর আফগানিস্তানকে জাতিরাষ্ট্ররূপে টিকিয়ে রেখেছিল। অবশ্য দুরানি আমীরদের জন্য এই কাজটি কখনোই সহজ ছিল না এবং তারা আফগান ঐক্যের লক্ষ্যে ন্যায়-অন্যায় একাধিক কৌশল অবলম্বন করেছিল।

১৯৭৮ সালে রুশপন্থী 'সাউর বিপ্লব' এবং পরবর্তী বছরে সোভিয়েট আগ্রাসনের পর আফগানিস্তানে এই একক কর্তৃত্বের (Central authority) কাঠামো ভেঙে পড়ে যা আর কখনও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েট দখলদাররা আফগানিস্তান ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত এক দশককাল সোভিয়েটবিরোধী আফগানি মুজাহিদদের প্রতিরোধ যুদ্ধ চলতে থাকে। এই সময়ে বস্তুত কোন কার্যকরী সরকার প্রথাগত পদ্ধতিতে দেশটিকে শাসন করতে না পারায় নৈরাজ্য এবং অরাজকতা বিরাজ করে সমগ্র আফগানিস্তানে। এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র সিআইএ এবং আইএসআই-এর মাধ্যমে সোভিয়েট বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত আফগান মুজাহিদদের বিপুলভাবে অস্ত্রসজ্জিত করে। অস্ত্রসজ্জিত এই মুজাহিদরা দেশের বিভিন্ন এলাকায় জাতি ও গোত্রগতভাবে তাদের প্রভাব বলয় গড়ে তোলে। রুশ সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর এই মুজাহিদরা তাদের আঞ্চলিক বা উপজাতীয় নেতৃত্বের অধীনে সোভিয়েত পরবর্তী ডা. নজিবুল্লাহর পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই বহাল রাখে। ফলে আফগানিস্তানে সরকারি কর্তৃত্ব আরও খণ্ড-বিখণ্ড হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ পশতুনদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবে ১৯৯২ সালে সংখ্যালঘু তাজিকদের নেতৃত্বে প্রথম মুজাহিদ সরকার গঠন হলে আফগানিস্তানে শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। এর ফলে কাবুলে নামমাত্র সরকার বহাল থাকলেও সমগ্র দেশ চলে যায় অসংখ্য আঞ্চলিক এবং উপজাতীয় যুদ্ধবাজদের কবলে। গৃহযুদ্ধে প্রায় পঞ্চাশ হাজার আফগান নাগরিকের প্রাণহানি ঘটে।

এমনই একটি পটভূমিকায় আবির্ভাব ঘটেছিল তালেবান মিলিশিয়া নামে একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর। পাকিস্তানের আফগান উদ্বাস্তু শিবিরে প্রতিষ্ঠিত হাজার হাজার মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত আফগান তরুণদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয় সিআইএ'র পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা। সৌদি আরব থেকে আসে অর্থের জোগান। পাকিস্তানের আইএসআই-এর তদারকিতে প্রায় ৫০ হাজার তালেবানকে অস্ত্রসজ্জিত করা হয়। শোনা যায় কট্টর ইসলামপন্থী তালেবানদের রুশ-প্রভাবান্বিত রব্বানী সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানোর পেছনে ওয়াশিংটনের সবুজ সংকেত ছিল। তিক্ত অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত রব্বানী সরকারসহ বিভিন্ন মুজাহিদ গ্রুপকে যুদ্ধে হারিয়ে তালেবানরা ১৯৯৬ সালে যখন কাবুলে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, বহুদিন পর আফগানিস্তানে আবার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ফিরে আসে। তালেবানরা যে দেশে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনেছিল তা বাইরের পর্যবেক্ষকরা, যাদের কাছে এদের কট্টর শরিয়া আইন অপছন্দ তারাও অকপটে স্বীকার করে দেশে অপরাধ হ্রাস, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। ব্যবসা-বাণিজ্যে আগ্রহী প্রতিবেশী দেশগুলোও আফগানিস্তানের অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্ব নিরসনে স্বস্তিবোধ করেছিল। কাবুলের পতনের ভেতর দিয়ে একটি নির্ভরযোগ্য সরকারি নেতৃত্বের অবসান হল, যদিও বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তালেবানদের কোনদিনই বৈধ

www.pathagar.com

সরকার বলে স্বীকৃতি দেয়নি। দেশের ৯০ ভাগ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিধানে অক্ষম রব্বানী সরকারকেই জাতিসংঘ এযাবৎকাল বৈধ সরকার হিসেবে স্বীকার করে আসছিল। তবু তালেবানদের পতনে ক্ষমতার যে শূন্যতা সৃষ্টি হল অন্য কোন জোট বা গোষ্ঠীকে দিয়ে তা পূর্ণ করা অত্যন্ত কঠিন হবে।

রব্বানী সরকারকে ফিরিয়ে আনতে তালেবানবিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় যে জোট আহমদ শাহ মাসুদের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছিল, তা শুধু বিবদমান সংখ্যালঘু উপজাতিগুলোর সমন্বয়েই গঠিত হয়নি, এই জোটকে গত পাঁচ বছর ধরে টিকিয়ে রেখেছিল রাশিয়া, ভারত ও ইরান প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশ। এই দেশগুলোর হিন্দুকুশ অঞ্চলে নিজ নিজ স্বার্থ জোটকে সমর্থন দেয়ার পেছনে চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। আফগানিস্তান বহিঃস্বার্থের প্রভাবকে বুঝতে হলে কিছুটা পেছনে দৃষ্টিপাত করা দরকার। উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তখনকার দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি (Great Game)-এর মহড়া চলেছিল। জারের রাশিয়া ভগ্নপ্রায় অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ মধ্য এশিয়ার ব্যাপক এলাকা জুড়ে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে মরিয়া হয়ে অগ্রসর হয়েছিল আরও দক্ষিণে-ভারত মহাসাগরের নাব্য জলরাশির অভিমুখে। ভারতের ব্রিটিশ রাজশক্তি কিন্তু এই রুশ তৎপরতাকে দেখল ভারতে তাদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশের জন্য দুর্যোগের পূর্বাভাস হিসাবে। বলা বাহুল্য ব্রিটিশ ভারত তাদের নিরাপত্তার জন্য আফগানিস্তানকে একটি বাফার (Buffer) রাজ্যরূপে টিকিয়ে রাখতে এবং রুশরা চেয়েছিল এর দুর্ভেদ্যতাকে অতিক্রম করে ভারত সীমান্তে পৌঁছতে। রুশ-ব্রিটিশ এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বিগত শতাব্দীতে কিছুটা অমীমাংসিতভাবেই সমাপ্ত হয় বৃটিশদের এই অঞ্চল থেকে পশ্চাদপসরণের পর। কিন্তু এই অঞ্চলের ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব কখনও হ্রাস পায়নি। কথিত আছে যে, ভূমণ্ডলের হার্টল্যান্ড ইউরেশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে মধ্য এশিয়ার নিয়ন্ত্রণ সব সময়ই বৃহৎ শক্তিবর্গের বিবেচনার শীর্ষে অবস্থিত।

স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে মধ্য এশিয়ায় বহিঃশক্তির নতুন সমীকরণ ঘটেছে। সোভিয়েট সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পর সদ্য স্বাধীন মধ্য এশীয় রাষ্ট্রগুলো তাদের বিপুল সম্পদ সম্ভার নিয়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এখানকার অবিশ্বাস্য তেল ও গ্যাস সম্পদকে লুটেপুটে খেতে যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু দেশের দৃষ্টি এখন পৃথিবীর এই প্রত্যন্ত অঞ্চলটিতে নিবদ্ধ। ব্যবসার নামে পশ্চিমা বিশ্বের বহুজাতিক বৃহৎ কোম্পানিগুলো পাইপলাইনের রাজনীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। পাইপলাইন ব্যবসায় প্রতিবেশী দেশগুলোও অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী। মধ্য এশীয় সম্পদ নিয়ে ব্যবসা প্রতিযোগিতায় আফগানিস্তান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মার্কিন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ইউনোকল নামে একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে তুর্কমেনিস্তান থেকে আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তানের করাচি সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত পাইপলাইন স্থাপন করতে আগ্রহী। শোনা যায়, ১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি মার্কিন সরকার আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে পাইপ স্থাপনের অনুমতির বিনিময়ে তালেবানদের প্রায় স্বীকৃতি দিতে বসেছিল। পূর্ব আফ্রিকায় মার্কিন দূতাবাসে সন্ত্রাসী হামলার পর আফগানিস্তানে আশ্রিত ওসামা বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রে হস্তান্তর প্রশ্নে বিরোধ ঘটায় তা ভেস্তে যায়। এর পর থেকে তালেবানদের মার্কিনবিরোধী মনোভাব প্রকট হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রও তালেবানদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসায় মেতে ওঠে। কিন্তু মধ্য এশিয়া তথা আফগানিস্তানে তার স্বার্থ অপরিবর্তিতই থেকে যায়।

www.pathagar.com

'গ্রেট গেম'-এর পুরনো খেলোয়াড় রাশিয়ার স্বার্থও উষ্ণ সমুদ্রের জন্য না হোক তার সীমান্ত সংলগ্ন সাবেক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রগুলোতে নগণ্য হতে পারে না। মধ্য এশীয় দেশগুলো নানাভাবে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল এবং রাশিয়া তার নিজ স্বার্থে এই নির্ভরশীলতাকে জিইয়ে রাখতে চায়। রাশিয়ার অনুগত তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানের সরকারগুলো মুসলিম জঙ্গিবাদীদের দ্বারা উত্যক্ত হলে রাশিয়া উগ্রবাদী ইসলামকে দমন করতে এগিয়ে আসে। চেচেনসহ রাশিয়ার অভ্যন্তরেও রয়েছে অনেক মুসলিমপ্রধান এলাকা। এদের উগ্রবাদী ইসলামের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে রাশিয়া এই অঞ্চলে তালেবানদের প্রভাবের বিরুদ্ধে। রাশিয়া কখনোই চায়নি যে উগ্রপন্থী তালেবানরা সরাসরি রাশিয়ার সীমান্ত সংলগ্ন মধ্য এশীয় রাষ্ট্রগুলোতে তাদের প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হোক। তাই কিছুটা রুশ প্রচেষ্টাতেই গঠিত হয়েছিল উত্তরাঞ্চলীয় জোট, যাদের মাধ্যমে আফগানিস্তানের উত্তর সীমান্ত ঘেঁষে একটি 'বাফার জোন' (Buffer Zone) সৃষ্টি করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য। যুক্তরাষ্ট্রও এক সময়ে এই অঞ্চলে ইসলামী উগ্রবাদকে সূক্ষ্মভাবে সমর্থন জুগিয়েছে এখানকার সম্পদ আহরণের প্রতিযোগিতায় রাশিয়াকে কোণঠাসা করে রাখতে। বর্তমান আফগান যুদ্ধে মস্কো-ওয়াশিংটনের ঘনিষ্ঠতা আসলে একটি আবরণ মাত্র। তাদের স্থায়ী স্বার্থ কখনও অভিন্ন হতে পারে না। কাবুল দখলের ব্যাপারে মার্কিনিরা যদিও উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে সংযত করতে চেষ্টা করেছে : রাশিয়া এবং তার মধ্য এশীয় সহযোগীরা জোটকে উস্কে দিয়েছে কাবুল দখল ত্বরান্বিত করতে, যাতে তালেবান-পরবর্তী সরকারের ওপর রুশ প্রভাব বহাল থাকে।

তালেবান-পরবর্তী সরকারে ভারতও কম প্রভাব বিস্তার করবে না। রাশিয়ার মিত্র এবং পাকিস্তানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তালেবানবিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে ভারত সব সময় সমর্থন করে এসেছে। আফগানিস্তানে ভারত নীতির মূল লক্ষ্য যেভাবেই হোক ওই দেশটিতে পাকিস্তানি প্রভাব ব্যাহত করা এবং যে কোন ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বে আফগানিস্তানে পাকিস্তানকে 'স্ট্র্যাটেজিক ডেপ্থ' (Strategic depth) সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা। আফগানিস্তানে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ৯৯ ভাগ। তবু সেক্যুলার ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্ক শুরু থেকেই হৃদ্যতাপূর্ণ। শুধু সোভিয়েটবিরোধী মুজাহিদ প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় এবং তালেবান শাসনামলে এই ভারতীয় প্রভাব হ্রাস পায়। বর্তমান সংকটে ভারতের উদ্দেশ্য তার পুরনো প্রভাবকে পুনরুদ্ধার করা। এই লক্ষ্যে বরাবরই ভারত উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে সমর্থন দিয়ে এসেছে। ১৯৯৬ সালে তালেবানরা ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা তার রুশ সহযোগীদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সামরিক তৎপরতায় সাহায্য প্রদান করতে থাকে। ভারত হেলিকপ্টার টেকনিশিয়ানসহ বহুসংখ্যক সামরিক উপদেষ্টা এদের সাহায্যার্থে পাঠায়। রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের 'র' গোয়েন্দা সংস্থা দশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সামরিক যন্ত্রাংশ এবং পার্বত্য এলাকায় যুদ্ধের উপযোগী বিভিন্ন সরঞ্জাম উত্তরাঞ্চলীয় জোটের জন্য প্রেরণ করে। ভারতীয়রা তাজিকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে জোটের জন্য হাসপাতালও স্থাপন করে। কূটনৈতিক ফ্রন্টে ভারত ব্যাপকভিত্তিক সরকারের নামে আফগানিস্তানে জোট প্রভাবান্বিত সরকারকেই সমর্থন করে। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের সুযোগে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সুযোগ সন্ধান করেছিল। তা হাতছাড়া হওয়ায় এবং মার্কিনিদের পাকিস্তানকেই ফ্রন্টলাইন দেশ হিসেবে

www.pathagar.com

বেছে নেয়ার পর ভারত তার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তালেবান-পরবর্তী সরকারেই অধিক রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিনিয়োগের পক্ষপাতী।

ইরান আফগানিস্তানে তার শিয়া সম্প্রদায় হাজারা উপজাতিকে সংরক্ষণ এবং তাদের জন্য ব্যাপকভিত্তিক সরকারের একটি সম্মানজনক স্থান নিশ্চিত করতে তৎপর। তালেবানদের শিয়া-নিপীড়ন এবং মাজার-ই-শরিফে ইরানি কূটনীতিক হত্যা এবং আটক করার পর থেকে ইরান সব সময়ই তালেবানবিরোধী ভূমিকা পালন করেছে। এ নিয়ে পাকিস্তান-ইরানের ঐতিহ্যগত মৈত্রীতেও ফাটল ধরেছে। সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবিরোধী সংকট ও যুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পাকিস্তান। যদিও সাময়িক ভিত্তিতে ফ্রন্টলাইন দেশ হিসেবে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের মৈত্রী অর্জনে সক্ষম হয়েছে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর্থিক সুযোগ-সুবিধাদি লাভ করেছে, তবু সামগ্রিক বিচারে পাকিস্তানের ক্ষতির পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। পাকিস্তান একাধিক কারণে কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী মিত্র হওয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করবে না। সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তানের নতুন 'ব্যাপকভিত্তিক' সরকারেও তার কোন সমর্থক থাকবে না।

বিভিন্ন শক্তি ও প্রতিবেশী দেশগুলোর এমনই সব পরস্পরবিরোধী স্বার্থের প্রতিফলন ঘটবে তালেবান-পরবর্তী সরকারে। আফগানিস্তানে এখন সর্বজনগ্রাহ্য নেতৃত্বের উপযোগী কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নেই, যা দিয়ে ক্ষমতার বর্তমান শূন্যতাকে পূর্ণ করা যেতে পারে। ফলে অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা এবং হানাহানি অনিবার্যভাবে আগের মতো অব্যাহত থাকবে। এরই ফাঁকে দেশী-বিদেশী কায়েমি স্বার্থবাদীরা ফায়দা ওঠাবে এই নৈরাজ্যের। এই মুহূর্তে এটাই হল আফগানিস্তানের জন্য সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। ❑

৩০ নভেম্বর' ২০০১

www.pathagar.com

তালেবানের পতন ঃ অতঃপর ওসামা মিশনের কি হবে ?

(তিন)

মাত্র পাঁচ বছর পূর্বে আবির্ভূত তালেবান বিস্ময়কে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার পূর্বেই তা আফগানিস্তানের দৃশ্যপট থেকে অন্তর্হিত হল। ১৯৯৬ সালে যে প্রক্রিয়ায়ই তালেবান কাবুলে ক্ষমতার মঞ্চে আরোহণ করে থাকুক না কেন ওই একই সময় ওসামা বিন লাদেনের মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকে এরা কিন্তু প্রথাগতভাবে আর রাষ্ট্রীয় সরকার থাকেনি। লাদেন সফলভাবেই এদেরকে একটি আন্তর্জাতিক মিশনের বাহক হিসাবে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই অভিনব ভূমিকায় তারা কতটা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন অথবা তাদের রূপান্তরের পেছনে কোন চালিকাশক্তি কাজ করেছিল তা ধারণায় আমাদের কাছে অপ্রতুল। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম যখন যেটুকু আমাদের জানতে দিয়েছে তার অতিরিক্ত সামান্যই আমরা জেনেছি। ১৯৯৪ সালে কান্দাহারসহ আফগানিস্তানের অংশবিশেষে কর্তৃত্ব বিস্তারের সময় থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত যখন তালেবান প্রথমবারের মতো মার্কিনিদের কাছে ওসামা বিন লাদেনকে সমর্পণের দাবিকে অগ্রাহ্য করে- এই দীর্ঘ চার বছর কিন্তু পশ্চিমা মহল এই নতুন শক্তির উত্থানে বড় একটা উচ্চবাচ্য করেনি। বরং তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে তালেবানের সঙ্গে দেন-দরবার বহাল রেখেছে। ১৯৯৮ সালে লাদেনকে ঘিরে মার্কিনিদের তালেবান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতদ্বৈধতা ঘটার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ইউনোকলকে আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে পাইপলাইনের সম্মতির বিনিময়ে মার্কিন স্বীকৃতির প্রস্তাব উন্মুক্ত ছিল। রুশঘেঁষা তাজিক উপজাতি নিয়ন্ত্রিত রব্বানি সরকারের বিপরীতে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির আত্মপ্রকাশে তারা উৎফুল্লই হয়েছিল।

তালেবানের সঙ্গে মার্কিনিদের প্রথম সুস্পষ্ট শো-ডাউন ঘটে ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে যখন পূর্ব আফ্রিকায় একাধিক মার্কিন দূতাবাসে হামলায় সন্দেহভাজন লাদেনকে তারা তাদের কাছে হস্তান্তর করার দাবি জানায় এবং তালেবান কর্তৃপক্ষ তা অগ্রাহ্য করে। এরপর থেকেই ক্রুদ্ধ পশ্চিমা মহল তাদের শক্তিশালী মিডিয়ার মাধ্যমে তালেবানের ওপর কলঙ্ক লেপনে ব্রতী হয়। তালেবান হয়তো তাদের শরিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নিরীক্ষায়

www.pathagar.com

অমিতাচারের জন্য কমবেশি দায়ী হয়ে থাকবে। কিন্তু পশ্চিমা মহলের এই নির্মম কলঙ্ক আরোপের প্রক্রিয়ায় তালেবানের ভাল কাজগুলোও বহির্বিশ্বের কাছে অনবহিত থেকে যায়। ১৯৯২ সালে রুশপন্থী নজিবুল্লাহ সরকারের পতনের পর ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তাজিক নেতৃত্বাধীন প্রথম মুজাহিদ সরকারের শাসনামলে আফগানিস্তানে যে নৈরাজ্য বিরাজ করেছিল-যার ফলে ওই দেশে প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধে ৫০ হাজার আফগানের প্রাণহানি হয়-তার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে দেশে একটি স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা ছিল তালেবানেরই একক কৃতিত্ব। এরা লৌহহস্তে অপরাধ দমন করে অনেকের কাছে অপ্রিয়ভাজন হয়েছিল। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দরিদ্র দেশের জন্য বিপুল আয়ের উৎস হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও বন্ধ করে দিয়েছিল কুখ্যাত মাদক চাষ। এতদসত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের কোপানলে পড়ার কারণে পরবর্তী বছরগুলোতে তালেবান কর্তৃত্ব ক্রমশই বিতর্কিত হতে থাকে। এই বিতর্কে ঘৃতাহুতি দেয়ার জন্য অবশ্য তালেবান কর্তৃপক্ষও কম দায়ী ছিল না। তাদের একাধিক উগ্রপন্থী পদক্ষেপ এবং একগুঁয়েমি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এদের প্রতি তিক্ত করে তোলে।

তবু যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তালেবান শাসিত আফগানিস্তানকে বছরের পর বছর অর্থনৈতিক অবরোধের শিকার এবং পরবর্তীতে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা কতটা যুক্তিগ্রাহ্য তা এই মুহূর্তে নির্ণয় করা কঠিন। তবে ইতোমধ্যেই হাজার হাজার নিরস্ত্র তালেবানকে নির্বিচারে হত্যা, অসংখ্য বেসামরিক আফগান, বিশেষ করে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও রুগ্নদেরকে ক্রূরতম মারণাস্ত্রের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা এবং সমগ্র দেশটিকে একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার ভেতর দিয়ে তালেবান এবং তাদের আশ্রিত লাদেন নেতৃত্বাধীন আল কায়দা গোষ্ঠীর জন্য বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির যে আবহ সৃষ্টি হয়েছে তা 'সভ্য' জগৎ ও তৃতীয় বিশ্বের তিক্ত সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করবে। দৃশ্যত যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ আরব-মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও এই যুদ্ধের সমালোচনায় সোচ্চার হয়েছে সমগ্র পৃথিবী। যদিও ১১ সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত সন্ত্রাসের পেছনে বিন লাদেন বা তার আল কায়দা নেটওয়ার্কের সম্পৃক্ততার কোন নিরঙ্কুশ প্রমাণ নেই তবু শুধু তাদের অভিযুক্ত করার মধ্য দিয়েই তারা বিশ্বময় সাধারণ মানুষের বিপুল সহানুভূতি লাভে সক্ষম হয়েছে। মুসলিম দেশ এবং তৃতীয় বিশ্ব তো বটেই, লাদেনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং আফগানিস্তানে যুদ্ধের বিরোধিতা করে সমাবেশ, মিছিল এবং র‍্যালি হয়েছে খোদ ইউরোপে এবং উত্তর আমেরিকায়।

কেননা পৃথিবীতে এখনও প্রচুর প্রবঞ্চিত এবং বিবেকবান মানুষ আছে যারা মনে করে যে, ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাস যতই অনভিপ্রেত হোক না কেন তা ছিল তাদের একচেটিয়া আধিপত্যকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে বিশ্বময় মার্কিনিদের অসংখ্য রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সুতীব্র প্রতিবাদ।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বা পেন্টাগন ধ্বংসযজ্ঞের প্রকৃত অপরাধীদের জানার এবং লাদেনের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের সত্যাসত্য যাচাইয়ের সুযোগ তাদের নেই। কিন্তু যে বা যারাই তা করে থাকুক তাদের জন্য একটি প্রচ্ছন্ন অথচ অপ্রতিরোধ্য সহানুভূতি একেবারেই অকারণে নয়। একটি স্থিতিশীল বিশ্ব ব্যবস্থা ও শান্তির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীহীন একটি পরাশক্তির অস্তিত্ব হয়তো একেবারেই অপ্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু যখন এই

www.pathagar.com

পরাশক্তিটি উদ্ধত, অহংকারী এবং পক্ষপাতদুষ্ট হয় তখন এর কারণে সৃষ্ট দুর্ভোগের মাত্রাও কম হয় না। শক্তিমদমত্ত পশ্চিমা বিশ্বে যেখানে পৃথিবীর মাত্র ২০% বসবাস করে, কিন্তু যারা পৃথিবীর ৮০% সম্পদ ভোগ করে এবং বাকি ২০% কুক্ষিগত করতে চায় সেই বিশ্বকে এই দুর্ভোগ স্পর্শ করে না। নিদারুণ বৈষম্যের এই পৃথিবীতে 'আইভরি টাওয়ারে' বসবাসরত ভাগ্যবানদের দৃষ্টিগোচর হতে কখনও কখনও প্রয়োজন হয় প্রচণ্ড অভিঘাতের। ১১ সেপ্টেম্বরের প্রলয়ঙ্করী সন্ত্রাসী আক্রমণ এমনই একটি অভিঘাত ছিল কিনা ইতিহাস তার বিচার করবে।

এই অভিঘাতের ভাষা ও পদ্ধতি যতই ক্রুর, সুতীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী হোক না কেন গত অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরে যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতার কাছে তা নেহায়েতই নগণ্য। শুধু হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে সংঘটিত পারমাণবিক সন্ত্রাসই টুইনটাওয়ার ও পেন্টাগনের ট্র্যাজেডিকে ম্লান করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসে সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী চার হাজার মার্কিন নাগরিক নিহত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের' যারা শিকার তারাসহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশ এই বিয়োগান্তক ঘটনার জন্য শুধু সহানুভূতি প্রকাশই নয়, অপরাধীদের খুঁজে বের করার মার্কিনি প্রচেষ্টায় একাত্মতা ঘোষণা করেছে। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের দোসর ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সবচেয়ে বড় শিকার ফিলিস্তিনিদের নেতা ইয়াসির আরাফাত ব্লাক সেপ্টেম্বরের শুধু নিন্দাই করেননি, এই ট্র্যাজেডির জন্য শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এর বিপরীতে, ইরাকে যুক্তরাষ্ট্র আরোপিত দীর্ঘ এক যুগের অর্থনৈতিক অবরোধে যখন সে দেশের লাখ লাখ শিশু অকালে মৃত্যুবরণ করে- তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করা তো দূরের কথা, একজন মার্কিন বিদেশ মন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইট ব্যঙ্গ করেন, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গত অর্ধশতাব্দীর ইসরায়েলি ত্রাস, নির্যাতন ও অপমানে বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠিত হয় না যুক্তরাষ্ট্র। বরং মার্কিনিদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে পৃথিবীর বিস্তৃত অঞ্চল ও জনপদ। সিআইএ'র কালোথাবা প্রসারিত হয়েছে ইরানে, চিলিতে, পানামায়, নিকারাগুয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায়, গ্রানাডায়। মার্কিনিরা যুদ্ধ চাপিয়েছে ভিয়েতনামে, কোরিয়ায় ও ইরাকে। নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে নির্বিচারে হত্যা করেছে লাখ লাখ মানুষ, স্তব্ধ করেছে ভিন্ন মতাবলম্বী কণ্ঠ। নিজেদের সৈন্য পাঠিয়ে ভিনদেশে খবরদারি করেছে কৌশলগত সম্পদের এর ওপর। সৌদি আরবে এখনও পাঁচ হাজারের বেশি মার্কিন সৈন্য মোতায়েন আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ঔদ্ধত্য ও দর্পকে ধূলিসাৎ করে লাদেন ও তার আল কায়দা যদি টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে হামলা চালিয়ে থাকে- যে ধারণা পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম বিশ্ববাসীকে দিয়েছে। এই একই কারণে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ এদেরকে বীরের মুকুট পরিয়েছে এবং তাদের হৃদয়ের সিংহাসনে বরণ করে নিয়েছে। ওই একই কারণে পরাজিত বিপর্যস্ত তালেবানের জন্যও তাদের হৃদয়ে এক ধরনের অহংকার। অন্তত তারা বিশ্বের প্রবল পরাক্রমশালী শক্তির সামনে উন্নত শিরে দাঁড়িয়েছিল- যখন একই সময়ে আরব-মুসলিম বিশ্ব তথা তৃতীয় বিশ্বের সুবিধাবাদী শাসকগোষ্ঠী নিজেদের দুর্বিনীত প্রতিবাদী জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিল এবং তথাকথিত 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে' মার্কিন নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন বাহিনীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল। পশ্চিমা শক্তি সফলভাবেই ৫৬টি দেশের মুসলিম জনগণকে বিভক্ত করে রাখতে পেরেছিল। এই

www.pathagar.com

বিভক্তি শাসক ও জনগণের মধ্যে। উগ্রপন্থী ও নরমপন্থী মুসলমানের মধ্যে। শিয়া ও সুন্নির মধ্যে। আধুনিক ও রক্ষণশীল মুসলমানের মধ্যে। জিহাদি ও জিহাদবিরোধীদের মধ্যে। আরব ও অনারবের মধ্যে। মুসলমানদের ভিন্ন দল ও মতের মধ্যে বিরোধের সুযোগ নিয়ে আফগানিস্তানে তথাকথিত 'সন্ত্রাসবিরোধী' যুদ্ধ যখন সমাপ্ত, তখনও বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে ঃ লাদেনের জিহাদ কতটা সঠিক বা সঠিক নয়।

ইত্যবসরে আমাদের উপলব্ধিই নেই যে, এটা না লাদেনের জিহাদ অথবা 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ'। এটি আমাদের অস্তিত্বের লড়াই। ক্ষমতাধরকে তার আধিপত্যের অভিযানে ঠেকাতে না পারলে তা এক সময় আমাদের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেবে। তারা চায় আমাদেরকে অনুগত, অনুগ্রহভাজন রূপে দেখতে। আমরা চাই আমাদের সসম্মান অবস্থানকে টিকিয়ে রাখতে। পশ্চিমের বিত্তবৈভব নিয়ে আমাদের কোন পরশ্রীকাতরতা নেই। আমরা আমাদের মতো করে আমাদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং জীবনবোধ নিয়ে বাঁচতে চাই। পরধনে আমাদের আকর্ষণ নেই, কিন্তু আমাদের সম্পদকে আমরা সংরক্ষণ করতে চাই।

তা যখন সম্ভব হয় না তখনই হয় সভ্যতার সংঘাত। এই সংঘাতে নিষ্ক্রিয় থাকলে বিপন্ন হয় অস্তিত্ব। তবু মুসলিম বিশ্ব তথা তৃতীয় বিশ্বের নেতৃত্ব আজ সেই নিষ্ক্রিয়তার পথকে বেছে নিয়েছে নিজেদের নিরাপদ অবস্থানকে সংরক্ষণ করতে। তারা তাদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থকে বহাল রাখতে চায়। তাই পশ্চিমা শক্তির আজ্ঞাবহ হয়ে থাকার মধ্যেই তাদের লাভ। তাই তারা মুসলিম বিশ্বের প্রতি এত প্রচণ্ড আঘাত সত্ত্বেও নির্লিপ্ত, নির্জীব। অধুনা বিশ্বের সবচেয়ে অন্যায়, অসাধুতা এবং পক্ষপাতিত্বের মূর্তপ্রতীক ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনি আরবরা তার অসহায় শিকার। অথচ বিশাল আরব বিশ্ব তাদের বিপুল সম্পদ ও জনবল নিয়ে বিস্ময়করভাবে নির্বিকার।

আরব বিশ্বের এই নির্বিকারত্ব ভেঙে ওসামা বিন লাদেনই প্রথম বিশ্বব্যাপী বৈষম্যের হোতা যুক্তরাষ্ট্রে এবং আরব ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে মার্কিন সমর্থিত ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তার প্রতিবাদের ভাষা সুতীক্ষ্ণ, যা স্বভাবতই প্রতিপক্ষকে স্তম্ভিত করেছে। তারা এই কণ্ঠকে রোধ করতেই তার আশ্রয়দাতা তালেবানকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। কিন্তু ইতোমধ্যে লাদেন ও তার আল কায়দার সহযোগীরা একটি রক্তবীজের জন্ম দিয়েছে যা বিশ্বব্যাপী দুর্বলকে দিয়েছে একটি নতুন প্রত্যয়, একটি বোধোদয়। ব্যক্তি লাদেনকে পরাস্ত করা হয়তো হিসাবের ব্যাপার। কিছু শক্তি, কিছু শঠতা, কিছুটা কূটচাল দিয়ে হয়তো তা করা যায়। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে প্রতিবাদের যে দাবানল প্রজ্বলিত হয় তাকে নেভাবে কোন মারণাস্ত্র ?

লাদেন শিখিয়েছেন অস্তিত্বের লড়াইয়ে কেউ কারও চাইতে অধিক শক্তিশালী নয়। আমেরিকা তো নয়ই। পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তিমূল উদারনৈতিকতা, আত্মসমালোচনা ও অন্তর্দর্শন থেকে কবেই স্খলিত হয়েছে এই ঐশ্বর্যময় দেশটি। যে দেশের উদার মূল্যবোধ একদা মানুষের মনের কন্দরে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারত ও জয় করতে পারত দূরের মানুষকে, তার সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে এখন। ফলে এক অহেতুক দর্প ও ঔদ্ধত্য দুর্বল করে ফেলেছে এই পরাশক্তিকে। তাই প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণহীন আমেরিকা এখন অবলীলায় পশুত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষের সঙ্গে তাদের নিষ্ঠুরতার ভিতর দিয়ে। আফগানিস্তানকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে এখন এই দেশটি তার পশ্চিম এশীয় দোসর ইসরায়েলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে একই ভূমিকায়।

পক্ষান্তরে নিজেদের বিলীন করে দিয়েও তালেবান এবং তাদের আশ্রিত লাদেন ও তার সহযোগীরা একটি পরাশক্তির পশুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ রেখে গেলেন তার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি বহুদিন পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে অনুরণিত হতে থাকবে। তার থেকেই হয়তো জন্ম নেবে তীব্রতর প্রতিবাদের ভাষা। ❑

১২ ডিসেম্বর '০১

ধ্বংস আর ধ্বংস।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের পেছনের কারণ দেখা উচিত

আবু আহমদ

দুনিয়াতে এখন একটিই সুপার পাওয়ার রয়েছে, তাহল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্য যে সুপার পাওয়ার এখন থেকে একযুগ আগে ছিল সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন আর ইউনিয়ন নিয়ে নেই, এখন অনেক টুকরার বড় টুকরা রাশিয়ান ফেডারেশন, যার রাজধানী এখনও মস্কো। কোন যুদ্ধ ছাড়াই দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে এক ডজনেরও বেশি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। রাশিয়ান ফেডারেশন আজও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা পশ্চিমাদের কাছে সোভিয়েত সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এ রাষ্ট্র জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদটি ধরে রেখেছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পারমাণবিক অস্ত্রসহ অন্যান্য ভারি এবং ব্যয়বহুল সামরিক অস্ত্র এই রাশিয়ান ফেডারেশনের অধিকারে নিয়ে নেয়া হয়েছে। তবে এই রাশিয়ান ফেডারেশন শক্তিতে-সামর্থ্যে এখন অনেক নিচে নেমে গেছে। শক্তির দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনাই হয় না, বড়জোর তুলনা হতে পারে ন্যাটোর অন্যতম বৃহৎ শক্তিধর সদস্য জার্মানি-ইংল্যান্ডের সঙ্গে। এখন উত্তর আটলান্টিক সামরিক জোট ন্যাটোর সরব সদস্য না হলেও রাশিয়ান ফেডারেশন আর এ জোটের বৈরী নয় এবং ন্যাটোর সদস্যরা রাশিয়ান ফেডারেশনকে অন্য অনেক দিক দিয়ে একটা মিত্র রাষ্ট্র মনে করে। ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্য বৃহৎ সামরিক জোট ওয়ারশ প্যাক্টের নেতা ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের অবসানের পর ওয়ারশ জোটও ভেঙে যায় এবং এ জোটের প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কোন কোনটি ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়েছে এবং ন্যাটোর সদস্যপদও চাইছে। ন্যাটো সামরিক জোটে সর্ববৃহৎ সদস্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময় ন্যাটোকে বলা হতো এই জোট গণতন্ত্র ও ফ্রিডমকে রক্ষার জোট, মূল বিশ্বকে রক্ষা ও সমর্থন দেয়া এ জোটের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়ারশ জোট যদিও অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে অনেক আগেই, কিন্তু ন্যাটো সামরিক জোট বহাল তবিয়তে আছে এবং দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করছে। ন্যাটোর কর্মকর্তাদের মতে, এ জোটের বর্তমান কাজ হল সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলাসহ নতুন বিশ্ব

www.pathagar.com

ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। ন্যাটোর এখন কোন বড় প্রতিপক্ষ নেই, তবে এ জোটের যুদ্ধ ও প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করার প্রস্তুতির কোন ঘাটতি কখনও দেখা যায়নি। তবে এটা লক্ষণীয় যে ন্যাটো বারবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির পক্ষে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি এই জোট যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সংজ্ঞায়িত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধেও ব্যবহৃত হয়েছে। সারা ইসলামী দুনিয়া কোল্ডওয়ার তথা ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রসহ ন্যাটোর জোটের সমর্থনে কাজ করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র কোন কোন মুসলিম দেশকে দ্বিপক্ষীয় সামরিক চুক্তিতেও আবদ্ধ করেছিল। ওই রকম একটা উদাহরণ হল পাকিস্তান। এই দেশ পঞ্চাশ দশকের প্রথমদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কমিউনিস্টবিরোধী সেন্টো-সিয়াটো জোটের সদস্য ছিল। অন্যদিকে মুসলিম দেশ তুরস্ক প্রথম থেকেই ন্যাটোর সদস্য ছিল এবং এখনও আছে। আফ্রিকার কতিপয় মুসলিম দেশ নন-অ্যালায়েন্স বা গোষ্ঠীনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য হয়ে কোল্ডওয়ার বা ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে। কোল্ডওয়ার বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিশ্বকে নিজ নিজ বলয়ে ভাগ করার ওই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রতিযোগিতা অর্থনীতি ও সমাজ বিনির্মাণের স্বরূপ ও কৌশলের আদর্শগত ভিন্নতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব একদিকে ছিল, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কথিত মুক্ত বিশ্ব ছিল। ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যগত কারণে অধিকাংশ মুসলিম দেশই সেদিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র হয়ে পড়ল। কোল্ডওয়ারের শুরুতেই আরব-ইসরাইলি সমস্যা তথা ইসরাইলি কর্তৃক প্যালেস্টাইন দখলজনিত সমস্যা এবং পরবর্তী সময়ে যুদ্ধের শুরু হয়। ওই সমস্যা আজও সমাধান হয়নি।

বলা চলে ওই সমস্যাই মুসলমান তথা ইসলামী দেশগুলোকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যতটুকু দূরে রেখেছে এখন তারা আছে ততটুকু দূরে। ইসরাইল প্যালেস্টাইন দখল করে নেয় ১৯৪৮ সালে। ১৯৬৭ সালে জেরুজালেমও দখল করে নেয়। ১৯৪৮ থেকে আজতক মধ্যপ্রাচ্যে বড়-ছোট অনেক যুদ্ধ হয়েছে। একদিকে ছিল ইসরাইল এবং ওই কথিত রাষ্ট্রের বড় সমর্থনদাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে ছিল আরব তথা মুসলিম বিশ্ব। প্যালেস্টাইনে আজও যুদ্ধ চলছে, তবে যুদ্ধের ধরন বদল হয়েছে। এখন যুদ্ধ চলছে অনবরত, কখনও ইট পাথর নিয়ে, কখনও গ্রেনেড নিক্ষেপণের মাধ্যমে, কখনও ট্রাকভর্তি এক্সপ্লুসিভের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। বিগত একযুগ ধরে প্যালেস্টাইনিরা তাদের মাতৃভূমি ফেরত পাওয়ার জন্য যে যুদ্ধ করছে তা ইতিহাসে ইনতিফাদাহ বা গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিতি লাভ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইল যুদ্ধরত প্যালেস্টাইনিদের কখনও বলছে সন্ত্রাসী, কখনও বলছে ক্রিমিনাল। ইসরাইল প্যালেস্টাইনিদের মাতৃভূমি উদ্ধারের ওই যুদ্ধকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য কামান-বন্দুক-মিসাইল-ট্যাংক নিত্য ব্যবহার করে চলেছে। কিন্তু সময় এবং যুদ্ধ প্যালেস্টাইনিদের পক্ষে যাচ্ছে বলেই সবাই বলছে। মিসাইল-ট্যাংক এবং যুদ্ধবিমান যে ইসরাইলকে কোন নিরাপত্তা দিতে পারছে না সেটা ইসরাইলি জনগণ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেশি থেকে বেশি করে বুঝছে। আর সেই বোধ থেকেই তারা ইয়াসির আরাফাতকে আলোচনায় বসাতে চায়। আলোচনার সঙ্গী এই ইয়াসির আরাফাতও একদিন আমেরিকার এবং ইসরাইলের পলিসিমেকারদের চোখে সন্ত্রাসী ছিল। আজকে বড় এবং অগণিত সন্ত্রাসীর ভয়ে ইসরাইল কথিত সন্ত্রাসীদের নেতা আরাফাতের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজি হচ্ছে। পশ্চিম তীর ও গাজায় ইনতিফাদাহ

www.pathagar.com

সংঘটিত না হলে কোনদিনই ইসরাইল প্যালেস্টাইনিদের সঙ্গে আলোচনায় বসত না। আর যারা ইনতিফাদার সদস্য তারাই হল যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের চোখে বড় সন্ত্রাসী।

মুসলিম বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যত ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে তার অর্ধেক হয়েছে ইসরাইলের প্রতি মার্কিন সম্পর্কের কারণে। বিল ক্লিনটন যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন একটা আশার আলো দেখা দিয়েছিল, আলোচনার মাধ্যমে প্যালেস্টাইনিরা তাদের কিছু অধিকার হলেও উদ্ধার করতে পারবে- এমন একটা বোধ অনেক প্যালেস্টাইনির মনেও উদয় হয়েছিল। কিন্তু জর্জ বুশ হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট হিসাবে বসার পর সে আশার আলো যেন নিভে যেতে আরম্ভ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র এটা বুঝতে ভুল করছে যে, কি কারণে সন্ত্রাসের আন্তর্জাতিকীকরণ হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের শুধু প্যালেস্টাইনিদের একদিন সন্ত্রাসী বলা হতো, আজ এ বিশ্বে অনেক অনেক দল আছে যেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞায় কথিত সন্ত্রাসীদের দলের মধ্যে পড়ে। এসব কথিত সন্ত্রাসী দল কি শুধু তাদের ধর্ম ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য সন্ত্রাসী কাজ করছে? না। এদের সদস্যদের এখন ধারণা, যুদ্ধ ও জেহাদ ছাড়া তারা তাদের অধিকারকে ফেরত পাবে না। যে সমস্যার সমাধান আলোচনার টেবিলে হওয়া উচিত সে সমস্যাকে যুদ্ধের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টার পরিণাম হল দেশে দেশে এত সন্ত্রাসের উত্থান। মুসলিম বিশ্ব এবং ইসলাম এখন দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক, মডারেট বা নরম ইসলাম। দুই, গরম বা মিলিট্যান্ট ইসলাম। এ দুটো নামও যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছে। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র মুসলমানদের বিভিন্ন মানদণ্ডে বিচার করতে চেয়েছে। এই যে আজকে ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এত চিন্তিত, এই লাদেন তো যুক্তরাষ্ট্রেরই সৃষ্টি। এটা ঠিক, একদিন যুক্তরাষ্ট্র মুসলমানদের পক্ষ হয়ে সোভিয়েত আগ্রাসন থেকে আফগানিস্তানকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া সে যুদ্ধে ইতি অত সহজে ঘটত না। তবে যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য না করলে মুসলমানদের একটা অংশ লাল সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং সে যুদ্ধ হয়তোবা এখনও চলত। তবে কোন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে সে যুদ্ধ থামবে না যদি না সে যুদ্ধ পূর্বে শুধু কনভেনশনাল একটা আর্মি ফাইট না করে।

আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে পুরো জাতি যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়েছিল। কভেনশনাল আর্মি যা ছিল তার বেশির ভাগ লালফৌজদের পক্ষে চলে যায়। দলছুট কিছু আফগান সৈনিক এবং ওই দেশের জনগণ কমিউনিজম তথা সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শিক মতবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আফগানদের অবস্থান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান মিশে যায়। পাকিস্তানকে ব্যবহার করা হয় পশ্চাৎঘাঁটি হিসাবে। বিলিয়নস অব ডলারের অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য আসে। অবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাজিত হয়ে আফগানিস্তান ত্যাগ করে। যুক্তরাষ্ট্রও আফগানিস্তানের বিষয় থেকে দূরে চলে যায়। কিন্তু আফগানিস্তানের মুজাহিদরা ঘরে ফিরে যায়নি। তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হল, কেউ গেল রাশিয়া ও চেচনিয়াসহ অন্যত্র মুজাহিদ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে। তাদের মধ্যে এ ধারণা কাজ করল যে, যুদ্ধ করে বিজিত শক্তিকে পরাজিত করাই তাদের অন্যতম ধর্মীয় কর্তব্য। একটা পর্যায়ে আফগান মুজাহিদদের কোন কোন উপদল যুক্তরাষ্ট্রকেও তাদের ধর্ম ও স্বার্থের পক্ষে বাধা মনে করল। তারা এটা ভাবতে শুরু করল অন্যত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যত অন্যায় হচ্ছে তার দায়ভার যুক্তরাষ্ট্রকেও নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র আরব বিশ্বকে ভাগ করে ইরাকের ওপর দিনের পর দিন বোমা মারবে, ওই কৌশলকেও

www.pathagar.com

ওইসব মুজাহেদিন ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের একটা অবস্থান বলে মনে করে। ওসামা বিন লাদেনও ওই রকম একটা উপদলের নেতা হবে। এ লাদেন যখন সোভিয়েত লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তখন তিনি বীর ছিলেন, আর তার দেশ সৌদি আরবে মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতির প্রতিবাদ করার ফলে হুলিয়া জারিকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেন। এর মধ্যে আফগানিস্তানে কয়েকবার ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে, কখনও আঞ্চলিক কোয়ালিশনগুলো ক্ষমতায় এসেছে। সবশেষে এসেছে মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে তালেবানরা। এই তালেবানরা আফগানিস্তানের ৯৫ ভাগ এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে, যা আগের কোন সরকার করতে পারেনি। কিন্তু এ সরকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আজও মেলেনি। স্বীকৃতি না মেলার অন্যতম কারণ হল ওসামা বিন লাদেন। আফ্রিকার দুটো ইউএস অ্যাম্বেসিতে লাদেনের লোকরা হামলা করেছে বলে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ান্টেড লিস্টে লাদেন এখন এক নম্বরের ব্যক্তি। নিউইয়র্ক এবং পেন্টাগনে ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র এখন শুধু লাদেনকেই চায় না, তারা চায় যারা লাদেনকে আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে তাদেরকে অর্থাৎ সেই তালেবানি নেতৃত্বকেও। কিন্তু দুনিয়ার অনেক লোক বলছে, যার মধ্যে পশ্চিমের অনেক রাজনীতিবিদও আছেন, লাদেন যে ওই আক্রমণ চালিয়েছে তার প্রমাণ কি। যুক্তরাষ্ট্র অকাট্য প্রমাণের জন্য বসে থাকতে প্রস্তুত নয়। তারা লাদেনকে জীবিত বা মৃত চায়। ভাল কথা। কিন্তু কয়েক বছর আগে ওকলাহোমাতে যে সন্ত্রাসী আক্রমণ ঘটেছিল সেটাও কি লাদেন বা তার মতো অন্য কোন মুসলিম সন্ত্রাসী ঘটিয়েছিল ?

যুক্তরাষ্ট্রের উচিত কারা এ সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়েছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। প্রত্যেক কাজের পেছনেই একটা নৈতিক শক্তি চাই। লাদেন ও তার বাহিনী ওই কাজ করলে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার আছে তার ও তার সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে যা মনে হচ্ছে, বিশ্বের একমাত্র সুপার পাওয়ার যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে লাদেন ও তার নেটওয়ার্কের কতটুকু ধ্বংস করা যাবে তা জানি না, তবে এটা নিশ্চিত লাদেন ও তালেবানদের উৎখাত করার কাজে কামান-মিসাইল-ট্যাঙ্ক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে আফগানিস্তানের অনেক নিরীহ লোক মারা যাবে। গরিব আফগানরা এমনিতেই না খেয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের হামলা তাদের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে আরো বাড়িয়ে দেবে। পরিকল্পিত হামলা যদি পাকিস্তান থেকে শুরু হয় তাহলে পাকিস্তানের লোকজন ওই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত এমন হতে পারে এক লাদেনকে মারার জন্য যে যুদ্ধ শুরু হবে সে যুদ্ধ লাখো লাদেনকে জন্ম দেবে। বোমা-মিসাইল দিয়ে কথিত সন্ত্রাসীদের উৎখাত করতে পারলে প্যালেস্টাইনে এখন আর কোন সন্ত্রাসী থাকত না। সত্য হল, লাদেন ও তার লোকেরাও বোধহয় চায় যুক্তরাষ্ট্র আঘাত হানুক। আঘাতের পরিণাম কি হতে পারে। এক. যুক্তরাষ্ট্র স্থল সৈন্য নামালে সমরে তাদের ক্ষয়ক্ষতি বাড়বে, দুই. মিসাইল-বিমান দিয়ে যুদ্ধ কার্যকর হচ্ছে। তিন. পাকিস্তানকে জড়ালে সে যুদ্ধ বিশাল আকার ধারণ করবে এবং সে যুদ্ধের আগুন এই অঞ্চলের সবাইকে পোড়াবে। চার. যুক্তরাষ্ট্রের কল্পিত যুদ্ধে জয়-পরাজয় বলে কিছু থাকবে না। লাদেন ও তার লোকদের হারানোর কিছু নেই। কিন্তু অনেক হারাবার আছে পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের। ভারত যদি লাদেন-ট্র্যাক থেকে দূরে থাকতে পারে সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তবে সন্ত্রাসের আন্তর্জাতিকীকরণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার

www.pathagar.com

জন্য সর্বাগ্রে যা করণীয় তাহ্ল সন্ত্রাসের কারণগুলোকে দূর করা। সন্ত্রাসের সংস্কৃতি একবার বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লে সেটা সবার জন্য বিপদ ডেকে আনবে। আমরা অতি স্পষ্ট ভাষায় নিউইয়র্ক ও পেন্টাগনে ধ্বংসযজ্ঞের নিন্দা করি এবং এও মনে করি যুক্তরাষ্ট্রের ওই হামলার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ারও অধিকার আছে। তবুও বলব সবকিছু পুনঃ ভাবা দরকার। ❑

২ অক্টোবর '০১

লেখক ঃ অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বোমায় বিধস্ত জনপদ।

www.pathagar.com

আমেরিকায় হামলা সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতায়

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

মনে হয়, কাবিলের অভিশাপ মানব সমাজের ওপর এখনও চেপে বসে আছে। কোরান শরিফের বর্ণনামতে হজরত আদমের দুই পুত্র যখন কোরবানি করেছিল তখন একজনের কোরবানি কবুল হয় এবং অন্যজনের কোরবানি কবুল হয়নি। দুজনের মধ্যে একজন (কাবিল) অন্যজনকে (হাবিলকে) বলল, 'আমি তোমাকে খুন করবই।' অন্যজন বলল,'আল্লাহ্ সংযমীদের কোরবানি কবুল করেন, তুমি আমাকে খুন করার জন্য হাত তুললেও তোমাকে খুন করার জন্য আমি হাত তুলব না।' কাবিল তার ভাই হাবিলকে খুন করল। সে তার ভাইয়ের লাশ কীভাবে গোপন করবে তা তাকে দেখানোর জন্য একটি কাক আর একটি কাককে হত্যা করে মাটি খুঁড়ে কবর দিলে কাবিল বড় অনুতপ্ত হয়।

কোরান শরিফে বলা হয়েছে, 'এ কারণেই বনি-ইসরাইলের ওপর আমি এ বিধান দিলাম যে, নরহত্যা বা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার জন্য কাউকে হত্যা করলে সে যেন তাতে পৃথিবীর সকল মানুষকে হত্যা করল, আর কেউ কারও প্রাণরক্ষা করলে সে যেন তাতে পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণরক্ষা করল।' এই বিধান যে কেবল বনি-ইসরাইলের জন্য বিধেয় ছিল তা নয়। বেশিরভাগ ব্যাখ্যাকারীদের মতে, এই বিধান প্রযোজ্য ছিল সমুদয় মানব সম্প্রদায়ের জন্য। নূহের মহাপ্লাবনের সময় কাবিলের বংশধরগণ সব ধ্বংস হয়ে যায় বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু কাবিলের অপকর্মের অভিশাপ মনুষ্য সমাজে যে এখনো বিরাজ করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা জনসাধারণকে ভীতশঙ্কিত করার জন্য ত্রাসের ব্যবহারকে সাধারণত সন্ত্রাস বলা হয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আইনে সন্ত্রাসবাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হলেও আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞাটি এখনও আমাদের মধ্যে স্বীকৃতি পায়নি।

বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ডান, বাম, জাতীয়তাবাদী, জনজাতিগত, নৈরাজ্যবাদী, বিপ্লবী, সেনাবাহিনী, সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী বিভিন্ন ধরনের দল-

www.pathagar.com

উপদল কুচক্রী বা ষড়যন্ত্রকারীরা সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছে।

ক্ষেত্রবিশেষে রীতিমতো সন্ত্রাস বা অভাবিত জবরদস্তির শিকার হয়েছে সরকার, সাধারণ জনগণ বা বিশেষ ব্যক্তিবর্গ।

গ্রিক ঐতিহাসিক জেনোফোন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিকভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রবলতর শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন সন্ত্রাসকর্মের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। রোমান সম্রাট টাইবেরিয়াস-ক্যালিগুলারা নৃশংস সন্ত্রাস অবলম্বন করে রাজত্ব করেছে। স্প্যানিশ ইনকুইজি শাসন নানা ধরনের ধর্মীয় সন্ত্রাস রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে চালু করে।

আনুমানিক ৪০৫ খ্রিস্টপূর্বে ইউরিপিডিস বলেছিলেন, মল্লযুদ্ধে যুক্তি সন্ত্রাসকে পরাজিত করে। কিন্তু প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে ১৯২৪ সালে হিটলার তাঁর মাইন ক্যাম্ফ-এ বলেন, যুক্তির বিরুদ্ধে সহজতম জয়লাভের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সন্ত্রাস ও শক্তি। হিটলারের পরাজয় ঘটেছিল। কিন্তু ১৯৯৯ সালে তাঁর মাইন ক্যাম্ফ-এর ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থটি জার্মানির প্রথম দশটি বহুল বিক্রীত বই হিসেবে আমাজন কম-এ প্রচারিত হয়।

অতীতে ইহুদিদের মধ্যে হিব্রু শিকারিআই, মুসলমানদের মধ্যে সিরীয় অ্যাসাসিন এবং খ্রিস্টিয়ানদের মধ্যে নাইটস টেম্পলাররা সন্ত্রাসবাদে বড়ই পারদর্শী ছিল। ফরাসী বিপ্লবের নেতা রোবস্পিয়র সন্ত্রাসবাদের পক্ষে এইভাবে বলতেন, 'তারা বলে সন্ত্রাসবাদ নাকি স্বৈরাচারী সরকারের আশ্রয় অবলম্বন। আমাদের সরকার তা হলে কি স্বৈরাচারীর মতো? হ্যাঁ। উৎপীড়নের উপগ্রহ যেভাবে অস্ত্রসজ্জিত তেমনি স্বাধীনতার মহানায়কের হাতে তরবারি ঝকমক করে বিপ্লবের সরকার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার স্বৈরাচার।'

রোবস্পিয়রের এই যুক্তি এখনও গ্রহণ করা হয়, বিশেষ করে সেইসব কর্মকাণ্ডের পক্ষে যাকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বলা যেতে পারে। একাধিক গণতান্ত্রিক দেশে জবরদস্তিকে অপছন্দ করা হলেও, সাধারণভাবে চণ্ডীনীতির বিরোধিতা করা হলেও রাষ্ট্রে যখন চণ্ডকর্মে লিপ্ত থাকে তখন মুষ্টিমেয় ছাড়া অনেকেই তেমন প্রতিবাদ করে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের পর পরাজিত দক্ষিণীদের কু ক্লাক্স ক্ল্যান প্রকাশ্যে সন্ত্রাসের রাজত্বের সৃষ্টি করে। ইউরোপ, রাশিয়া ও আমেরিকায় বহু লোক সন্ত্রাসের বলি হয়েছে। ১৮৬৫ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত আব্রাহাম লিংকন প্রমুখ বহু রাষ্ট্রপতি, রাজা, সম্রাট রাজনীতিবিদ সন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। বাংলাদেশে দুজন রাষ্ট্রপতি এবং চারজন মন্ত্রী সন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য সেনাবাহিনীর বহুজনের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া সম্পর্কে নানা প্রশ্ন আজও বিতর্কিত হয়ে রয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী প্রমুখ রাজনীতিবিদসহ বহু নিরীহ ব্যক্তি সন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। সন্ত্রাসীরা প্রতিপক্ষের মৃত্যুর চেয়ে তাদের মতাদর্শের জন্য অন্যদের যে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় তা আজ টেলিভিশন ও তথ্য বিপ্লবের ফলে অনেক কার্যকর হয়েছে। মুখ ও মুকুরের মধ্যে যে সম্পর্ক অনুরূপ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আজ সন্ত্রাসবাদ ও টেলিভিশনের মধ্যে। তথ্যপ্রযুক্তির বদৌলতে সন্ত্রাসবাদ শুধু আন্তর্জাতিক নয়, তা আজ যেমন পরম শক্তিধর, তেমনি ব্যাপক হিংসাত্মক। তবে সন্ত্রাসের সহায়তায় সাফল্যজনক পরিণতি তেমন পরিলক্ষিত হয় না।

www.pathagar.com

বর্তমান যুগে ইউরোপের স্পেনের বাস্ক অঞ্চলে বাস্ক ফাদারল্যান্ড এণ্ড লিবার্টি (এটা) আয়ারল্যান্ডে আইরিশ রিপাবলিক্যান আর্মি, পশ্চিম জার্মানির বাডের-মাইনহফ, ইতালির রেড ব্রিগেড, ফ্রান্সের ডিরেক্ট অ্যাকশন, মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে আবু নিদাল অর্গানিজেশন, হামাস, হিজবুল্লাহ, প্যালেস্টাইন লিবারেশন ফ্রন্ট, পপুলার ফ্রন্ট অব দ্য লিবারেশন ফ্রন্ট, কুর্দিস্তানে কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (পিকেকে), শ্রীলঙ্কায় লিবারেশন টাইগার অব তামিল ইলাম (এলটিটিই), কাশ্মীরে হরকাতুল আনসার, হরকাতুল মোজাহেদিন, জইশে মুহাম্মদ ইত্যাদি একাধিক দল-উপদল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন উপজাতি ও আদিবাসীদের মত দল-উপদল জাপানের রেড আর্মি ও আউম শিনরিকিও, কলাম্বিয়ার এফএআরসি, পোর্টোরিকোর এফএলএন, দক্ষিণ আমেরিকার সেনডেরো লুমিনিজো (শাইনিংপাথ. এসএল) এবং তুপাক আমারু রেভলিউশনারি মুভমেন্ট (এমআরটিএ) আজ বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে পশ্চিমী দুনিয়ায় সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের অস্ত্রশস্ত্র ও তহবিলের তদারকি করে কিন্তু পশ্চিমা অস্ত্র ব্যবসায়ীরা। তাদের মুদ্রা ধোলাই করার জন্য সদাপ্রস্তুত দেখা যায় কেম্যান আইল্যান্ড, লিখ্‌টেনস্টাইন ও সুইজারল্যান্ডসহ পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও লগ্নি প্রতিষ্ঠান।

ভিয়েতনামে বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নেতা তাদের ধর্মের ঐতিহ্য অনুযায়ী আত্মাহুতি দিয়েছিল। ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা মহাপাপ। যে আত্মঘাতী ধর্মযোদ্ধা শত্রুকে নিধন করতে গিয়ে প্রাণ দেয় সেই প্রাণাহুতিকে আত্মহত্যা বলতে তফসিরকারকরা নারাজ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে জিহাদ তা কোনো বর্ণ, জাতি বা ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। জিহাদ বলতে যে সংগ্রাম বোঝায় তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক নিরন্তর প্রয়াস হিসেবে ব্যাখ্যাত হয়। মানুষবোমা, গাড়িবোমা, ডিঙিবোমা থেকে আজ আত্মঘাতী বিস্ফোরক দ্রব্যের মধ্যে বিমানবোমা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর শেষ কোথায় ? রুশ বিপ্লবী ক্রপটকিন বলতেন, 'শতাব্দীর ইতিহাসের ভিত্তিমূলের ওপরে যে ইমারত খাড়া হয়ে আছে তা কি কয়েক কিলো বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে ধ্বংস করা যাবে ?' কিন্তু আজ এক সুটকেসের মধ্যে নাকি বহু টিএনটি ধ্বংসাত্মক বস্তু ধারণ করা সম্ভব! বর্তমান অচলায়তনকে উচ্ছেদ করার যেন দায়িত্ব নিয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা।

আজ কোনো দেশই সন্ত্রাসমুক্ত নয়। জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের সরকার যে দেশের আদর্শ সেখানে স্কুলের ছেলেমেয়ে যেভাবে সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে তার এক নিরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন।

রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই, কথাটা আমাদের দেশে দলবদল, দলভাঙানো, জোটগঠন ও জোটভাঙার ক্ষেত্রে বেশ চালু হয়েছে। রাজনীতি বহুমুখী, কোনো কোনো সময় হরবোলা। কোনো কোনো সময় কোনো কোনো রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডে মোনাফেকি বিদঘুটেভাবে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে এমন সব বখাটে কথাবার্তা বলা হয়, যা অপরাধ দমনে মোটেই সহায়ক হতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাধিক রাষ্ট্রকে বদমাশ রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নাকি সন্ত্রাসবাদকে সাহায্য করে। ইরানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেশটি তুরস্ক, সুদান,

www.pathagar.com

বাহরাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, আলজেরিয়া, বসনিয়া হার্জেগোবিনা এবং ক্রোয়েশিয়ার সন্ত্রাসীদের মদদ যোগায়। ইরান অবশ্য তা অস্বীকার করে। ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ দাবি করে কাশ্মীরে ষোলোটি দেশের নাগরিক বিভিন্ন সন্ত্রাস কর্মে নিয়োজিত। অপরদিকে বিশ্বশান্তির জন্য যাঁরা চিন্তা-ভাবনা করেছেন সেই পশ্চিমা চিন্তানায়করাই যুক্তরাষ্ট্রকে 'সমস্যা-রাষ্ট্র' হিসেবে অভিহিত করছেন। কারণ, বিশ্বশান্তির জন্য একাধিক ক্ষেত্রে যেখানে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিবাচক ভূমিকার প্রত্যাশা করেছিলেন, সেখানে বড় হতাশ হয়েছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র সম্মতি দেয়নি এবং ভবিষ্যতেও দেবে বলে মনে হয় না।

পারমাণবিক অস্ত্র, মহাকাশ-ক্ষেপণাস্ত্র, জীবাণু অস্ত্র ইত্যাদি ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে অস্বাভাবিক তৎপরতা, স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণে, পরিবেশ দূষণ বিরোধিতায় গড়িমসি, জাতিসংঘে প্রদেয় চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে খেলাপি নীতি ইত্যাদি নানা কারণে সারা বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রকে এক মেরু বিশ্বের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে মেনে নিতে যথেষ্ট অনীহা রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গে জাতিসংঘের প্রায় সমস্ত শান্তিকামী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইসরাইলি বিরোধিতায় যুক্তরাষ্ট্রের দৃশ্যত নিষ্ক্রিয়তার জন্য মুসলিম বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয়তা নেই।

গ্রানাডা, নিকারাগুয়া, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকায় যুক্তরাষ্ট্র শীতল যুদ্ধের সময় যে বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেছিল তার মধ্যে কমিউনিস্টবিরোধিতায় যত যাথার্থ্যই থাক না কেন তা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে নিশ্চিহ্ন করতে কোনো সাফল্য লাভ করেনি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি ও সম্পদের হিংসায় নয় বরং তার আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আত্মম্ভরিতা ও বখাটে আচরণের জন্য দেশটি আজ সন্ত্রাসবাদের চাঁদমারি। আবার অন্যদিকে সেই রাষ্ট্রের অধিকাংশ শান্তিপ্রিয় জনগণের মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা লক্ষ্য করা যায় (তার সমর্থনে তাদের সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত করতে হবে)। এবং সেই দেশে ব্যক্তিগত ভাগ্যোন্নয়নের যে সুযোগের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয় তার জন্য দুনিয়ার দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কাছে যুক্তরাষ্ট্র একটি সব পেয়েছির দেশ। অভিবাসীদের জন্য এক স্বর্গভূমি।

ঘটনাচক্রের পরিবর্তনে আজকের যিনি সন্ত্রাসী আগামীকালে তিনি ত্রাতা ও মহানায়ক হিসেবে সমাদৃত হন এমন ইতিহাস আমাদের জীবনেই একাধিকবার ঘটেছে। এই তো সেদিন পর্যন্ত ম্যান্ডেলা সন্ত্রাসী ছিলেন। তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য লন্ডনে তাঁর কাছে গিয়ে ব্রিটেনের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করলেন।

যখন আফগানিস্তানে তালেবান বা মুজাহেদিনরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তখন তারা ছিল মুক্তিযোদ্ধা, কিন্তু তারা যখন নিজের দেশকে স্বনিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করল তখন তারা হল সন্ত্রাসী। মিত্র হিসাবে যখন তালেবানরা নারীবিরোধী পদক্ষেপ নেয় তখন পশ্চিমা বহু দেশ তেমন কোনো আপত্তি তোলেনি। আমার শত্রুর শত্রু, আমার মিত্র- এই নীতি সন্ত্রাসবাদকে নিরুৎসাহ তো করে না, বরং আরো উসকে দেয়।

প্রতিটি রাষ্ট্রকাঠামোর মঙ্গল সাধন ও অমঙ্গলবিধানের একটা নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে। সেই ক্ষমতার অপব্যবহার নিদারুণ পরিস্থিতির জন্ম দেয় ও সন্ত্রাসের বীজতলা হিসাবে কাজ করে। রাষ্ট্রের কাঠামো কীভাবে যে সন্ত্রাসী কাঠামো হয়ে দাঁড়ায়, গত তিন

www.pathagar.com

দশকে আমরা তার একাধিকবার পরিচয় পেয়েছি। যেখানে অস্ত্র ও অর্থের প্রভাবে প্রশাসনের চাকা শ্লথ হয়ে পড়ে, বিচারালয়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ভরসা পায় না, সেখানে তো সন্ত্রাসেরই জয়জয়কার। প্রবলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস তো দুর্বলের একমাত্র শক্তি।

সংক্ষুব্ধ বিচারপ্রার্থী যখন প্রতিষ্ঠিত আদালতে বা নাগরিক সমাজের কাছে বিচার ও সমবেদনা পায় না তখনই সে হন্তারক ভাড়া করতে এগিয়ে যায়।

যারা সমাজের আমূল পরিবর্তন দাবি করছে তাদের কাছে সন্ত্রাস আজ যুদ্ধের বিকল্প হিসাবে, অতীব উগ্র পন্থা হিসাবে সমাদৃত হচ্ছে।

জাতিসংঘে এ সম্পর্কে প্রাণবন্ত আলোচনা হলেও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট দিশা পাওয়া যাচ্ছে না। গত ১ অক্টোবর জাতিসংঘের এক বিশেষ অধিবেশনে সকল দেশের সরকারকে একক ও সমবেতভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার আহ্বান জানানো হয়। আজও বহু দেশ জাতিসংঘ প্রস্তাবিত বারোটি সন্ত্রাসবিরোধী চুক্তি ও প্রটোকল অনুসমর্থন করেনি এবং একটি সমন্বিত সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমের কনভেনশন প্রণীত হয়নি।

সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন করতে হলে তার মূল কারণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত কী রূপ নেবে তা এখনো পরিষ্কার নয়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্ব নিন্দা করলেও তার বিরুদ্ধে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সে সম্পর্কে কোনো ঐকমত্য নেই।

ইউ কে প্রিভেনশন অফ টেরোরিজম অ্যাক্ট ১৯৭৬-এর ১৪ (১) ধারায় সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ঃ 'দি ইউজ অফ ভায়োলেন্স ফর পলিটিক্যাল, এন্ডস (ইনক্লুডিং) এনি ইউজ অফ ভায়োলেন্স ফর দি পারপাজ অফ পুটিং দি পাবলিক অর এনি সেকশন অফ দি পাবলিক ইন ফিয়ার।'

আমাদের দেশে ১৯৯২ সালে যে সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন আইন পাশ করা হয় সেখানে সন্ত্রাসের একটা পেল্লায় সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল;

'সন্ত্রাসমূলক অপরাধ' অর্থ-

(ক) কোন প্রকার ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া বা বেআইনী বল প্রয়োগ করিয়া-

(অ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে চাঁদা, সাহায্য বা কোন নামে অর্থ বা মালামাল আদায় বা অর্জন করা;

(আ) স্থলপথ, রেলপথ, জলপথ বা আকাশপথে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করা বা কোন যান চালকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যানের গতি ভিন্ন পথে পরিবর্তন করা;

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে কোন যানবাহনের ক্ষতিসাধন করা;

(গ) ইচ্ছাকৃতভাবে সরকার বা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন প্রতিষ্ঠান, আইনের অধীন গঠিত, স্থাপিত বা সৃষ্ট কোন সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান বা কোন কোম্পানী, ফার্ম বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কোন দূতাবাস বা বিদেশী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর যে কোন সম্পত্তি বিনষ্ট বা ভাংচুর করা;

www.pathagar.com

(ঘ) কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন অর্থ, অলংকার, মূল্যবান জিনিসপত্র বা অন্য কোন বস্তু বা যানবাহন ছিনতাই করা বা জোরপূর্বক কাড়িয়া লওয়া;

(ঙ) রাস্তাঘাট, যানবাহনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা উহার আশপাশে বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানে কোন বালিকা, কিশোরী ও তরুণীসহ যে কোন অপ্রাপ্ত বয়স্কা বা প্রাপ্ত বয়স্কা নারীকে অশ্লীলভাবে উত্যক্ত বা হয়রানি করা;

(চ) কোন স্থানে, বাড়ীতে, দোকানে, হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, যানবাহনে বা প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পিত বা আকস্মিকভাবে একক বা দলবদ্ধভাবে শক্তির মহড়া বা দাপট প্রদর্শন করিয়া ভয়ভীতি বা ত্রাস সৃষ্টি করা বা বিশৃঙ্খলা বা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা;

(ছ) কোন প্রতিষ্ঠানের দরপত্র ক্রয়ে, গ্রহণে বা দাখিলে জোরপূর্বক বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা কাহারও দরপত্র গ্রহণে বিধি-বহির্ভূতভাবে বাধ্য করা;

উপরোক্ত আইন অবশ্য পরে বাতিল হয়ে যায়। সন্ত্রাসবাদের বিভিন্ন অবগুন অপরাধ আইনের বিভিন্ন ধারায় যেভাবে সম্বলিত রয়েছে তা তৎপর তদন্ত ও দক্ষতার সঙ্গে মামলা পরিচালনার সাহয্যে দমন করা সম্ভব। বিশেষ আইন, দুর্বল ও হতোদ্যম প্রশাসনের পরিচায়ক।

মানুষের প্রাণরক্ষার জন্য বর্ণ, ধর্ম, জাতি সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিপন্ন মানুষের পক্ষে সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতায় বাংলাদেশ তার সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করবে। কিন্তু তার সাথে সাথে আমাদের সজাগ থাকতে হবে একটি মাত্র ঘটনার ভয়াবহতায় দিগভ্রান্ত হয়ে যেন আমার দেশের কোনো ভয়ানক ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

অতি দ্রুততার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সবসময় বিচক্ষণতার পরিচায়ক নয়, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক কূটনীতির জগতে তো নয়ই। আমরা যদি আমাদের দরিদ্র দেশকে অপ্রয়োজনে বিব্রতকর কোনো আন্তর্জাতিক বিড়ম্বনায় জড়িয়ে ফেলি তাহলে তা আমাদের জন্য শুভ বয়ে নিয়ে আসবে না। চোখ কান খুলে চারধারে তাকিয়ে-আপাত জেনে বুদ্ধির তাগিদে নয়-দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সার্বিক মঙ্গলকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের কর্মপন্থা আমাদেরকেই নির্বাচন করতে হবে।

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র মূল্যহীন হয়ে যাবে, যদি সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কোনো হঠকারী তৎপরতায় অসহায় নিরুপায় ও নিরস্ত্র মানুষের রক্তে সেই অপপ্রয়াস রঞ্জিত হয়ে ওঠে। প্রতিহিংসায় মানুষ অন্ধ হলে অন্ধকার যুগের আবার সূত্রপাত ঘটবে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে এবং মানবপ্রকৃতির বিরুদ্ধে যে মহান বিজয় আমরা অর্জন করেছি তা সত্ত্বেও। ❑

৩ অক্টোবর ২০০১

লেখক ঃ গবেষক।

www.pathagar.com

সভ্যতা ও মানবতাবিরোধী যুদ্ধ : রক্তের রঙ লাল

আবুল কাশেম চৌধুরী

শল্য চিকিৎসকরা জানেন এবং ভালো করেই জানেন গুরুতর ও বিশেষ কতিপয় কারণে রক্ত বিষাক্ত না হলে সর্বদা এবং সর্ব অবস্থায় রক্তের বর্ণ লাল। লাল বর্ণের কণিকা সমন্বয়ে রক্তের বিকাশ এবং প্রকাশ ঘটে বলেই তো এমন একটা সত্যকে আমাদের নিরীক্ষণ করতে হয়। এই রক্ত মানব জাতির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মানুষ তাই পারস্পরিক সম্বন্ধকে রক্তের বন্ধনেই আবিষ্কার করতে চায়। তাই বলা যায়, রক্তের সম্বন্ধেই গড়ে উঠেছে এই পৃথিবী। বৈচিত্র্যমণ্ডিত এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ তাই রক্তের বন্ধনেই নিজেদের আবিষ্কার করতে উদ্যোগী। সেই রক্তের বর্ণ লাল- বিশ্বস্ত ভাষায় বলা যায় লোহিত বর্ণ।

দুঃখের বিষয় এই সাধারণ সত্যকে আমরা প্রায়শই সংকীর্ণ অর্থে ভাবতে অভ্যস্ত। রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ বলতে আমরা সচরাচর বুঝে থাকি একই বংশের লোক। সেই বংশ যে সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ নয় তা আমরা সহজে মেনে নেই না। হয়তো সেক্ষেত্রে পরিবার বা বংশ অতিক্রম করে আমরা একটা দেশ বা জাতি পর্যন্ত উপনীত হই। তারপর এক অনির্দেশ্য অনিশ্চয়তা। অবশ্য আমরা জানি, বুঝি এবং স্বীকার করি রক্তের রঙ লাল এবং রক্তের এই বৈশিষ্ট্য বিশ্বজনীন। মানব জাতির এক সাধারণ পরিচয় রক্তের এই বৈশিষ্ট্য বিশ্বজনীন। মানব জাতির এক সাধারণ পরিচয় রক্তের এই নিবিড় সম্বন্ধে নিবন্ধিত।

মানুষ মানুষকে ভালোবাসে, সমাদর করে-তা এই রক্তের প্রতি অসাধারণ সমীহার কারণেই। পিতা-মাতা সন্তানকে ভালোবাসে, কারণ তারা রক্তের সম্বন্ধে সম্পর্কিত। এমনি করে এই ভালোবাসা সম্প্রসারিত হয়, চারদিকে- তাও এই রক্তেরই গুণে। এই রক্তের বন্ধনেই গড়ে ওঠে গোত্র, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতি এবং তারও ওপরে দেশ। আমরা আমাদের স্বদেশকে স্বজাতিকে ভালোবাসি এই রক্তেরই কারণে। এমনি করে রক্তের এই সম্বন্ধ সম্প্রসারিত হয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে। এই বিশ্বজনীন মানবপ্রেম রক্ত সম্পর্কেরই এক আদর্শ রূপ। সুতরাং, মানব প্রেম বা বিশ্ব শান্তির অপার বিস্ময় দাঁড়িয়ে আছে এই রক্ত সম্পর্কেরই কোনো না কোনো কারণে। এই রক্ত-সম্পর্ক দাঁড়িয়ে আছে এক মহৎ

www.pathagar.com

পরিকল্পনার ওপর এবং অনাদি অনন্ত কাল ধরে। এর পাশাপাশিই বিদ্যমান হিংসা, প্রতিশোধপরায়ণতা এবং সংকীর্ণ স্বার্থপরতার এক বিস্তীর্ণ জটিল এবং বিস্তৃত জগত। ব্যক্তিস্বার্থের সংঘাত, পরিবার পরিবারে বিরোধ, জাতি বৈরিতার হিংস্র অভিব্যক্তি ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ এই রক্ত সম্পর্ককে বিপর্যস্ত করে প্রায়ই এবং এমনটা ঘটে থাকে যুগে যুগে। এই সংঘাত-সংঘর্ষের কারণে যে রক্তপাত ঘটে তা যে পক্ষেরই হোক তার রঙ লাল। বিগত শতাব্দিতে বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে এই দু'টি মহাযুদ্ধ এবং তাতে যে রক্ত নিঃসরণ ঘটেছে তার পরিমাণ কেউ পরিমাপ করতে পারবে না। রক্তের বন্ধনে মানব জাতি সভ্যতার যে মজবুত ভিত্ গঠন করেছিলো সাম্রাজ্যলিপ্সুদের আগ্রাসী প্রচেষ্টায় তা অনেকটাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। তার কারণ রক্তের যে বন্ধনকে স্বীকার করে সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো তা সাম্রাজ্যিক লোভে এবং সংকীর্ণ স্বার্থপরতায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

মহাকালের বুকে এই সর্বাত্মক হিংসা এবং ধ্বংসযজ্ঞের অভিলাষ চরিতার্থ করতে গিয়ে পরস্পর শত্রুতার বশবর্তী হয়ে মানুষ পরাক্রমের যে অপব্যয় করে তা আসলে বিশ্বজনীন গড়ে ওঠা রক্ত সম্পর্কের ওপরই নিষ্ঠুর আঘাত এবং প্রত্যাখ্যাত। বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক সভ্যতার এটি একটি মস্ত বড়ো গ্লানি। জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেক-বিবেচনার এমন বিস্ময়কর ও সর্বব্যাপক বিস্তার আসলে সভ্যতারই গ্লানি। সর্বশেষে তা বিশ্বজনীন গড়ে ওঠা আধুনিক সভ্যতা এবং তার প্রজ্ঞা প্রবুদ্ধ সামাজিক সর্বব্যাপী অর্জনের সম্মুখে, মনুষ্যত্বেরই বিপর্যয়।

রক্ত সম্পর্কে বিপর্যয় ঘটেছে যুগে যুগে; যার সর্বব্যাপক পরিণতি বিশ্বযুদ্ধ। দুই দু'টি বিশ্বযুদ্ধ। কেউ কি জানে, কতো রক্তপাত ঘটে সেই দুই বিশ্বযুদ্ধে ? বাজার দখল এবং পুনর্দখলের হিংস্র মনোমালিন্যে ? কেউ জানে না, জানা সম্ভব নয়। তবে সর্বজন স্বীকৃত সত্য হচ্ছে সেই দু'টি বিশ্বজনীন মহাবিপর্যয়। ব্যক্তিস্বার্থ নয়, গোষ্ঠীস্বার্থ নয়, সাম্রাজ্যিক স্বার্থে উদ্বেলিত হয়েই কতিপয় মানুষ বিশ্বজনীন দেখিয়েছিলো এই রক্তপাতের পরাকাষ্ঠা। মহাবিপর্যয়ের পর স্বভাবতই এই বিশ্বে মানুষ বড়ো কাতর হয়েছিলো শান্তির জন্যে। বিশ্বনন্দিত শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, বৈজ্ঞানিক সকলেই শান্তিযজ্ঞে আত্মনিবেদন করেছিলেন। দু'দিকে দুই পরাশক্তি বিশ্বকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে শান্তি রক্ষায় সম্মতি জানিয়ে শুধু স্নায়ুযুদ্ধে নিয়োজিত ছিলো অনেক দিন। পরাক্রমী আণবিক শক্তির বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে এক ধরনের বোঝাপড়াও গড়ে উঠেছিলো এই ধরাধামে। সেই বিশ্ব আর নেই। আজ এককেন্দ্রিক বিশ্বে একক পরাশক্তির দায়িত্ব পালন করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু তাতেও রক্তপাত বন্ধ হয় নি। বিশ্ব শক্তির ভারসাম্যে নতুন নতুন টানাপোড়েন এবং সেই সূত্রে পরাশক্তির পিষ্টনে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ময়দানে রক্তপাত বন্ধ হয় নি। চীন, ভিয়েতনাম, কোরিয়া প্রভৃতি জাতির মুক্তিযুদ্ধে যে রক্তপাত ঘটেছে এবং বুকের রক্ত ঢেলে মানুষ যে বিজয়ী হয়েছে তার মাহাত্ম্য কিন্তু কম নয়। এগুলোও অনেকদিন আগের কথা। ততদিনে সম্ভবত চিড় ধরেছে আমাদের বিশ্বাসে। বিশ্ব চেতনা হয়তোবা বিস্মৃত সেই সত্য যে 'রক্তের রঙ লাল'!

তাই তো দেখি পরাক্রমী পরাশক্তির মুখ চেয়ে অথবা স্পর্ধিত আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সারাবিশ্ব থেকেই রক্তের নেশায় মেতে ওঠে মানুষ, মুখে বলে 'ওম্ শান্তি'। কিন্তু গোপনে প্রকাশ্যে অভিনব অস্ত্র নির্মাণ, তার কার্যক্ষমতা নিরীক্ষণ এবং তা নিয়ে টক-ঝাল-মিষ্টি জাতীয় বাদানুবাদ চলতেই আছে। কখনো কখনো প্রকাশ্যে, কখনো বা সংগোপনে এবং

www.pathagar.com

এসব চলছে শান্তির সুধাবর্ষী বাণীরই আড়ালে। তাই শেষ পর্যন্ত নয়, গোপনে-প্রকাশ্যে নানা দেশে বিরোধ বিসংবাদ চলছেই, কখনো সম্মুখ সমরে, কখনো আত্মগোপন মহড়ার মাধ্যমে-শান্তি নয়, চলছে যুদ্ধই। আমরা দেখছি রক্তপাতের নানা নিদর্শন। ফলে আমাদের বিশ্বাস প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে যে, রক্তের রঙ লাল।

এই তো কয়েক দিন পূর্বে, বিগত এগারই সেপ্টেম্বর দু'হাজার এক সালে প্রবল পরাক্রান্ত মার্কিন সাম্রাজ্যের বা পৃথিবীর অদ্বিতীয় পরাশক্তির হৃৎপিণ্ডে রক্ত ঝরেছে। কে বা কারা এই সর্বনাশ করেছে আমরা জানি না, তবে বিশ্ব মনুষ্যত্বের অমর রক্ত সেখানে নিঃসৃত হয়েছে অবিশ্বাস্য এক প্রক্রিয়ায়। মার্কিন শক্তির হৃৎপিণ্ড এবং বিশ্ব প্রতিরক্ষার দুর্ভেদ্য দুর্গ ওয়াশিংটনের পেন্টাগন বিধ্বস্ত। সম্ভবত এটা এখন আর মার্কিন প্রতিরক্ষারই দুর্গ নয়, বিশ্বশক্তির অপার মহিমা। তার কয়েক মিনিট পূর্বে নিউইয়র্কের সন্নিকটে অবস্থিত আমেরিকা তথা বিশ্ববাণিজ্য তথা বিশ্ব অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র উদ্ধত যুগল শীর্ষ অর্থাৎ twin tower-ও ধূলিসাৎ হয়। একই সঙ্গে চারটি সুবৃহৎ বিমান ছিনতাই করে সেই সব বিমানের পেট্রোলকেই আত্মঘাতী ছিনতাইকারী পেট্রোল বোমা আকারে ব্যবহার করেছে। শত্রুপক্ষের আত্মত্যাগই না এই বিধ্বংসী প্রক্রিয়ায় একদল সুশিক্ষিত যুবক শুধুমাত্র আত্মত্যাগই প্রদর্শন করে না, প্রদর্শন করেছে তাদের সমন্বিত মেধার বিস্ময়কর অভিব্যক্তি, আমেরিকানদের ভাষায়-Evil genious. মেধা, সংঘশক্তি, নিষ্ঠা এবং দুঃসাহসের এই সমন্বয়কে হয়তো Evil genious-ই বলতে হবে। কারণ, কোন মহৎ আদর্শ এর দ্বারা প্রতিষ্ঠা পেলো আমরা জানি না, তবে অগণিত মানুষ প্রাণ হারালো। যুগল শীর্ষ শুধুমাত্র ঐশ্বর্যের অহংকারই ছিলো না, ছিলো বিশ্ব বাণিজ্যের রাজধানী অর্থাৎ কেন্দ্রভূমি। সেখানে তখন পূর্ণ উদ্যমে প্রাত্যহিক কর্তব্য-কর্ম উপলক্ষে নানা জাতির অসংখ্য নর-নারী ছিলো উপস্থিত এবং তাদের রক্তপাত এক নতুন বিস্ময়কর ইতিহাসের সূচনা করে খণ্ড ক্ষুদ্র আঞ্চলিক যুদ্ধে, এমন কি বিশ্বযুদ্ধেও সাধারণত একই ঝটকায় একটি জাতির জনগোষ্ঠীই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। এবার শুধু মার্কিনিদের নয় একযোগে সকল মহাদেশের সকল জাতির মানুষকে রক্ত ঢেলে দিতে হয়েছে একই সময়ে। মার্কিনীদের কাছে এর তাৎপর্য কী রকম জানি না, তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেলো-রক্তের রঙ লাল এবং সকল দেশের সকল জাতির মানুষের রক্তই লাল। নানা দেশ, নানা জাতির আনীত মানুষের একযোগে এই রক্তের যে মিলন ঘটলো, বিশ্ব ব্যবস্থায় কি তার কোনো প্রতিফলন পাওয়া যাবে ?

এককেন্দ্রিক বিশ্বে প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, অর্থাৎ আমেরিকা এই ক্ষয়ক্ষতি এবং অবমাননা সহ্য করতে রাজি নয়। তারা সেই সন্ত্রাসী শক্তিকে, তাদের পৃষ্ঠপোষক দেশসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এগিয়ে যাচ্ছে। যে কোনো কারণেই হোক মুসলিম বিশ্বের কতিপয় রাষ্ট্রকে এই সন্ত্রাসী কর্মে জড়িত বলে অনুমান করা হচ্ছে। সুতরাং যে যুদ্ধের দামামা বাজছে তা সেই মুসলিম রাষ্ট্র সমুদয়ের দিকে এবং বিশেষ করে আফগানিস্তানের মতো একটি ক্ষুদ্র এবং নানাদিক থেকে অসহায় একটি রাষ্ট্রকে লক্ষ্য করেই চলছে এক সর্ববিধ্বংসী মহাসমরের প্রস্তুতি। ইতোমধ্যেই মারাত্মক অন্তর্বিদ্রোহে নিঃস্ব একটি জাতি আফগানিস্তান আজ এক অতি পশ্চাৎপদ প্রতিক্রিয়াশীল দেশে অর্থনৈতিকভাবে খাবি খাচ্ছে, রাজনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদতার আবর্তে নিবদ্ধ। বিগত দুই দশক ধরে সেখানে অন্তর্বিরোধে শুধু রক্তই

www.pathagar.com

ঝরে নি, অর্থনৈতিক উৎপাদন ভীষণভাবে বিপন্ন।

সাম্প্রতিককালে গৃহযুদ্ধের ভেতর দিয়ে আফগানিস্তান শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবেই বিধ্বস্ত হয় নি, চলছে একটানা গৃহযুদ্ধ এবং আধ্যাত্মিকতার নামে সামাজিক ব্যবস্থার অর্জিত সমস্ত অগ্রগতি আজ সেখানে শুধু বিপন্নই নয়, দারুণ প্রতিক্রিয়াশীল আক্রোশে বিপর্যস্ত। ধর্মের নামে রাজনীতিক অধিকার সেখানে বিপন্ন এবং নারী নির্যাতনের একটি নিকৃষ্ট জগৎ এই আফগানিস্তান। দুই দশকে যুদ্ধবিগ্রহে অসংখ্য পুরুষ জীবন হারিয়েছে, স্বভাবতই তাদের সবারই না হোক, অনেকেরই ছোট ছোট পুত্র-কন্যা রয়েছে। এমন ক্ষেত্রে মায়েরা ঘর থেকে বের হয়ে যে কিছু রোজগার করবে তার ব্যবস্থা নেই। নারীদের জবরদস্তি করে পরিবারে আবদ্ধ করার নামে সামাজিক অন্ধকার আবর্তে তারা শুধু বিপন্ন নয়, একটি অমানবিক অবস্থায় রাখা হয়েছে। যারা বিবিসি বা সিএনএন জাতীয় টেলিভিশন কেন্দ্রের সংবাদ প্রচারের সঙ্গে পরিচিত, তারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন অসহায় বিধবা মাতারা রাস্তায় কাজের খোঁজে বের হলে বোরকার অন্তরোষের হাত থেকে রেহাই পায় নি। প্রকাশ্যে তাদের বেত্রাঘাত করে সংসার নামক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পুত্র-কন্যা-পরিবার নিয়ে অভুক্ত থাকার জন্যে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। বাস্তব প্রয়োজনেই ক্রমান্বয়ে হয়তো এই নিষ্ঠুরতা প্রশমিত হয়েছে, কিন্তু নারী নির্যাতনের সমাপ্তি ঘটে নি। আফগানিস্তানের মেয়েরা এখন শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত। এই জাতীয় পশ্চাৎপদতার সঙ্গে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কতো রকম শান্তি আছে আমরা হয়তো জানি না। কিন্তু ধর্ম, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মকে অগ্রসর বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করার কি কোনো অর্থ আছে?

অর্থনৈতিকভাবেও গৃহযুদ্ধে অবসিত আফগান জাতি আজ বিপন্ন এবং বৈদেশিক সাহায্য সেখানে অপরিহার্য। কিন্তু ধর্মান্ধ সংকীর্ণমনা তালেবান সম্প্রদায় বাইরের সাহায্য গ্রহণে বিশেষভাবে সংকীর্ণমনা। তাই ধর্মের জিগির তুলে বৈদেশিক সাহায্য সংস্থার প্রতি এমন সব আচরণ প্রদর্শন করছে যে, সেই প্রক্রিয়া প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। এখনো যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানবাসীদের অনেকেই পার্শ্ববর্তী ইরান বা পাকিস্তানে বাস্তুত্যাগী হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

বলা হচ্ছে, এই আফগানিস্তানের তালেবানী রাজনীতির প্রবক্তা হচ্ছে সৌদি আরবের একজন ভিন্ন মতাবলম্বী উচ্চশিক্ষিত প্রকৌশলবিদ এবং ধর্মান্ধ ব্যক্তি ওসামা বিন লাদেন এই নব্য পশ্চাৎমুখী গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধর্মগুরু। ইসলাম ধর্মাবলম্বী গোঁড়া এই ব্যক্তিটির অঙ্গুলি হেলনেই আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্রীয় বিরাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে বলে জানা যায়। প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কোন অবস্থান না নিয়েও তিনি আজ যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের নিয়ন্তা বলে ধরে নেয়া হয়। সন্ত্রাসী হামলায় উদ্ধত আমেরিকার অহংকার যে আজ অকস্মাৎ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তারও মূল প্রবক্তা হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এই রক্ষণশীল সন্ত্রাসী নেতা ওসামা বিন লাদেনকে।

বিক্ষুব্ধ আমেরিকা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি আমেরিকার আত্মরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে এই সন্ত্রাসী হামলার মূল উদ্যোগী পুরুষ হিসেবে আমেরিকা চিহ্নিত করেছে এই মৌলবাদী ব্যক্তিকে যিনি প্রায় সকল অবস্থাতেই তালেবানী শাসন ব্যবস্থার আড়ালে আত্মগোপন

www.pathagar.com

করে থাকেন। পর্বতসংকুল আফগান রাষ্ট্রের নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করে আত্মগোপন অবস্থায় এই ধরনের একটি আত্মশ্লাঘামূলক বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে সাফল্য লাভ করায় স্বভাবতই আক্রান্ত পরাশক্তির অহংকারে চোট লেগেছে এবং তা লাগবারই কথা। তাছাড়া বৃহত্তর আমেরিকান জনগোষ্ঠীও একই কারণে আহত এবং বিক্ষুব্ধ। এ সব বিবেচনা করে আমেরিকান সাম্রাজ্য তালেবানদের বিরুদ্ধে এবং একই সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের কতিপয় রাষ্ট্রকে সন্ত্রাসী নামে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে।

শুধু হুমকি নয় সারাবিশ্বে সাজ সাজ রব। পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, সৌদি আরব, তুর্কিসহ বিশ্বের পরাশক্তি সমুদয় আমেরিকার সামরিক অহঙ্কারের ছত্রছায়ায় এই যুদ্ধে নানাভাবে সহযোগী ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে এসেছে। তবে কি ক্ষুদ্র এবং অতিশয় কৃশ আস্ফালন সর্বস্ব তালেবানী আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করা হবে ? আবার কি সাধারণ মানুষের রক্তপাত ঘটবে সারা বিশ্ব জুড়ে যে রক্তের রঙ আগের মতোই এবং চিরকালীন লাল বর্ণের ? যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে এখনো বেঁচে রয়েছেন তাদের কাছে তো বটেই, শান্তিকামী বিশ্বের কাছেও এমন আশঙ্কা কোন আনন্দের সংবাদ বহন করে আনে না, তারা শুধুই শিহরিত হয় মাত্র।

মানব জাতির আতঙ্ক ও আশঙ্কা যতো প্রবলই হোক না কেনো, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সেই উৎকণ্ঠা আমাদের সমকালীন বিশ্বকে শিহরিত না করে পারে না। কারণ আমাদের অনুমান ও আশঙ্কা কোনোটিই অবমূল্যায়িত হওয়ার মতো নয়।

স্মৃতি হয়তো অনেকটা প্রতারক হতে পারে। সময় হয়তো অসময়ের অনেক স্মৃতি বিস্মৃতির অন্ধকারে ঢেকে দিতে পারে। তথাপি সত্য ইতিহাসের ধূসর পাতায় জ্বলজ্বল করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আণবিক বোমা বর্ষণের হৃদয়বিদারক ঘটনার জন্যে দায়ী কে মানুষ তা জানে। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ নাপাম বোমার ঘৃণ্য আস্ফালনে কলঙ্কিত করেছে কে-সে কথা ইতিহাসের ছাত্ররা কোনোদিন বিস্মৃত হবে না। কোরিয়াতেও তাদের যুদ্ধংদেহী ভূমিকা হিংসারই জন্ম দেয়। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে—মানুষ ভয়ে-ভীতিতে স্বার্থপরতার এসব স্মৃতি অবজ্ঞা করলেও একথা তো ভুলতে পারে না সে সব ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমেরিকা নামক পরাশক্তির ভূমিকা কী ছিলো ? আজকের ঘৃণ্য সন্ত্রাসীরা অনুদার দৃষ্টির স্মৃতিপটে যে সেই সব ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিকে অসৎ উদ্দীপনা হিসেবে দেখে নি সে কথা কে বলতে পারে ?

তালেবানদের কথাই বলি, আর ওসামা বিন লাদেন নামক দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী নায়কের কথাই ধরি এই ধরাধামে তাদের আবির্ভাবের মূল উৎস ছিলো মার্কিন পরাশক্তি এবং তাদের পরম সহায়ক ছিলো পাকিস্তান ও সৌদি আরব। তালেবানদের অমানবিক রাজ্যব্যবস্থা এবং লাদেনের মানব বিধ্বংসীর গোড়াপত্তনী তো তাদেরই হাতে। তাই আজ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য অবতারণার পূর্বাহ্নে আমেরিকাকেও ভেবে দেখতে হবে রক্তের প্রতিশোধ রক্ত দিয়ে হয় না। বহু গোত্রে বিভক্ত আরব জাতির মানুষ প্রতিশোধপরায়ণতায় বংশপরম্পরায় মানুষের রক্ত নিয়ে খেলা করেছে। কিন্তু সেটা আইয়ামে জাহেলিয়াত বা মধ্যযুগীয় অন্ধকার যুগের কথা। আধুনিক সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যে পরাশক্তি বিশ্বে আপন মহিমা প্রকাশ করে চলেছে তাদের কি নিরীহ মানুষের

www.pathagar.com

রক্তপাতে উদ্যত হওয়া উচিত?

খণ্ড ক্ষুদ্র কৃষকায় অনুন্নত সর্বোপরি গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত একটি জাতি কতিপয় ব্যক্তির দুষ্কৃতির জন্যে কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? আমেরিকার যুগল অট্টালিকায় কর্মরত ছিলো পৃথিবীর সব দেশের মানুষ। নানা জাতির রক্তের সংমিশ্রণে বিশ্ব আজ ভালো করেই জানে রক্তের রঙও লাল। তাই বিশ্ব মানবতার নামে আমরা কি এই আবেদন করতে পারি না, দুষ্কর্মের শাস্তি দুষ্কৃতকারীকেই দেয়া হোক, নিরীহ-নিরপরাধ মানুষ যেনো আবার নতুন করে কোনো অপঘাতের শিকার না হয়।

এ যাবত যত যুদ্ধ ইতিহাসে ঘটেছে কোনটিই শান্তি এবং মানবতার স্বার্থে ঘটে নি। ঘটেছে সংকীর্ণ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থে সর্বোপরি যে যুদ্ধ সভ্যতার উদ্দীপনা শক্তি বিজ্ঞানের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়-সেই যুদ্ধকে পরিহার করা মানব জাতির একটি পবিত্র কর্তব্য। রক্তের রঙ লাল-এটি কোনো প্রবাদ বাক্য নয়, সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্তর্বাণী। ❑

প্রাবন্ধিক, গবেষক, কলাম লেখক, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

৪ অক্টোবর ২০০১

এটা যেন মৃত্যু উপত্যকা।

www.pathagar.com

আমেরিকা, তোমার দুঃখ আমরা বুঝি আমাদের দুঃখ তুমি বোঝ ?

রামজি বারুদ

ফিলিস্তিনি লেখক রামজি বারুদ যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলভিত্তিক ওয়েব পোর্টাল মিডল ইস্ট নিউজ অনলাইনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক। তাঁর এ লেখায় উঠে এসেছে আমেরিকায় হামলা সম্পর্কে মধ্যপ্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গি

ছয় বছর বয়সী মেয়েটি খানিকটা নুয়ে, আলতো করে ফুলটি রাখল। ইতোমধ্যেই কয়েকশ' ফুল পড়েছে। পোড়ানো হচ্ছে মোমবাতি। ব্যানার উড়ছে হাওয়ায়। ফিলিস্তিনি শিশুটি এবার দৌড়ে ছুটে এসে মায়ের হাত ছোঁয়। তার চোখে-মুখে ভয়। মুখ শিশুতোষ লজ্জায় রাঙা। তারপর মা-মেয়ে দুজনেই হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থেকে চুপচাপ- মোমবাতির পুড়ে যাওয়া দ্যাখে।

ছোট্ট এই শোক অনুষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, পেনসিলভানিয়া ও ওয়াশিংটনে নিহত কয়েক হাজার মানুষের স্মরণে। তবে এই সংবাদ যোগাড়ের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন গুটিকয়েক সাংবাদিক। তাও বিদেশী কোনো সংবাদ মাধ্যমের নয়, তারা সবাই স্থানীয় আরব ও ফিলিস্তিনি।

মার্কিন জাতি তাদের হতাহতদের স্মরণে বিশ্বকে কাঁদতে দেখেছে। তবে তারা ভুলেও অনুভব করেনি ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে অনেক ফিলিস্তিনির মনেও ওই সময় কী তীব্র সমবেদনা অনুভূত হচ্ছে। তবে মার্কিনিরা আতঙ্ক আর হতাশা নিয়ে ঠিকই দেখেছে হামলার ঘটনায় উৎফুল্ল কটি ফিলিস্তিনি শিশু জীর্ণ গাড়ির ছাদে চড়ে গান গাইছে। শূন্যে গুলি ছুঁড়ে উল্লাস করছে দুজন লোক। পুরো চশমা নাড়িয়ে স্বস্তি ব্যক্ত করছেন এক বৃদ্ধা।

প্রতিটি বৃহৎ মার্কিন সংবাদ নেটওয়ার্কই এক্সক্লুসিভ ভিডিও চিত্র ও সংবাদ প্রতিবেদন প্রচারে পরস্পর পাল্লা দিয়ে থাকে। কিন্তু এই ডজনখানেক ফিলিস্তিনির উল্লাসের সংবাদটির ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। মার্কিন গণমাধ্যমগুলো সোৎসাহে খবরটি নিজেদের মধ্যে, সেই সঙ্গে সারা বিশ্বে সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। এভাবে মুহূর্তের মধ্যে বিশ্ববাসীকে জানানো হয়ে যায় ঃ মার্কিন জাতির দুঃখে ফিলিস্তিনিরা উল্লাস করে।

www.pathagar.com

কিন্তু ছোট্ট এই খবরটি বস্তুনিষ্ঠও যদি হয়, গুটিকয়েক শিশু ও একজন বৃদ্ধা মহিলা কয়েক লাখ ফিলিস্তিনির, যাদের মধ্যে হাজার হাজার মার্কিন নাগরিকত্বধারীও আছেন, প্রতিনিধিত্ব করে না।

আমেরিকা! এই দুঃখ, এই যন্ত্রণার মধ্যেও যদি সম্ভব হয় স্মৃতির ক্যাসেটটা একটু পেছনে ঘোরাও। ১৯৯১ সালে উপসাগর যুদ্ধোত্তর নিউইয়র্ক সিটির কিছু টুকরো দৃশ্য মনে আনার চেষ্টা করো। মার্কিন সেনাদল মধ্যপ্রাচ্য মিশন শেষে সবে দেশের মাটিতে পা রেখেছে। টেলিভিশনে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ টানটান ভঙ্গিতে, সরল বাক্যে বললেন, 'বোমা মেরে ইরাককে পাথর যুগে ফেরত পাঠানোর মিশন আমাদের শেষ হলো।'

এই মার্কিন বাহিনীই উপসাগর যুদ্ধে মিত্রশক্তির নেতৃত্ব দেয়, দিনের পর দিন ইরাকে অবিরাম বোমা ফ্যালে, নির্লিপ্তভাবে হত্যা করে। মার্কিনিরা, সেই সঙ্গে বিশ্ববাসীও এসব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে, যেমন সেদিন তারা দেখল বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের মাটিতে আছড়ে পড়ার দৃশ্যটি।

ইরাকে যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের সিংহভাগই ছিল অসামরিক, নির্দোষ নারী-পুরুষ। কদিন আগে দৃশ্যত দারুণ সুন্দর এক সকালে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে যেসব নিউইয়র্কবাসী মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তুলনায় ওই ইরাকিরা কম বা বেশি নির্দোষ ছিল না।

ইরাকের দক্ষিণ থেকে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি নগর শহর গ্রামে টনকে টন বোমা ফেলে, অসামরিক নাগরিকদের রক্তে হাত ধুয়ে ঘরে ফিরেছিল মার্কিন সেনারা। তারা ইরাকে সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করেছে। একটি অরক্ষিত জাতির বিরুদ্ধে সর্বাধিক মারণপ্রযুক্তির গবেষণা চালিয়েছে। তারা বোমা মেরেছে। হত্যা করেছে। কখনো কখনো ইরাকিদের অসহায়ত্বকে উপহাস করেছে।

টিভিতে দেখা গেছে, মার্কিন সৈন্যরা যুদ্ধবিমানে ক্ষেপণাস্ত্র বোঝাই করছে। সেগুলোতে লেখা 'আহমেদ, বিদায় জানাও', 'শুভ রমজান', 'আল্লাহকে হাই বলো'। এরপরও দেশে ফেরার পর তাদের কেউ ভৎর্সনা করেনি। গায়ে পচা ডিম ছুঁড়ে মারেনি। উল্টো উষ্ণ সংবর্ধনা জুটেছে। কারণ মার্কিন স্বার্থ উদ্ধার হলেই 'আমাদের ছেলেমেয়েরা' একেকটি বীর সৈনিক।

এবং এই এখনো নিউইয়র্কে, যে নগরীর অর্ধেকই এখন তলিয়ে আছে ধুলো আর ধ্বংসস্তূপে হাজার হাজার লোক রাজপথে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। উদ্ধারকাজ সেরে ফেরত আসা সৈন্যদের উদ্দেশে গাইছে, 'স্পারকলড স্টারস'। উল্লাসে হর্ষধ্বনি করছে 'ইউএসএ, ইউএসএ'।

একদিন এই যুক্তরাষ্ট্রের বিজয়ের মৌতাত জমে উঠেছিল। প্রায় প্রতিটি মার্কিন সংবাদপত্র, টিভি স্টেশন, ছেলে থেকে বুড়ো লাখ লাখ মার্কিন ও তাদের প্রতিনিধিরা ইরাকিদের মৃত্যুতে মৌজ-ফুর্তিতে মজেছিল। আজকের লড়াই ছিল শুভর সঙ্গে অশুভের। আর এতে শুভরই জয় হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ওই আনন্দ-উৎসব দেখার সুযোগ সেদিন ইরাকিদের হয়নি। তাদের ঘরদোর

www.pathagar.com

তখন ধ্বংসস্তূপ। সামান্য রুটি ও দুধ কেনার জন্য জলের দরে বেচতে হয়েছে প্রিয় সব সংগ্রহ। নেই বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ। হাসপাতালগুলো নিশ্চিহ্ন।

যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ওই হামলা অবশ্যই নিন্দনীয়। যখন কয়েকটি ব্যক্তি মনে করে রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার জন্য অন্যের প্রাণ হরণ করার অধিকার তারা রাখে, তখন আদতে মানবতাকেই পদদলিত করা হয়।

তবে এ হামলার স্থায়িত্ব ছিল ঘণ্টাকয়েক। আর এর তিন দিন পরই কংগ্রেস দেশ পুনর্গঠনের জন্য তহবিল সংগ্রহ, হামলায় বিপন্নদের সহায়তা এবং ভবিষ্যৎ হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ৪০০ কোটি ডলার অনুমোদন করে।

ফিলিস্তিনের ট্র্যাজেডি কিন্তু এরকম এক-দুই ঘন্টার নয়। এটি চলছে কয়েক প্রজন্ম ধরে। ৫৩ বছর ধরে ফিলিস্তিনিরা বিশ্বের কুখ্যাততম একটি সেনাবাহিনীর নির্যাতন সহ্য করছে। ৫৩ বছর ধরে তাদের বন্দিশিবিরে বাস করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাদের খাওয়ানো হচ্ছে দূষিত পানি। তাদের প্রিয়জনদের খুন করা হচ্ছে। ঘরদোর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করা হয়েছে। কেড়ে নেওয়া হয়েছে ঈশ্বরপ্রদত্ত সব সুবিধা। জাতিসংঘ ঘোষিত সব অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। জেলে পোরা হচ্ছে। নির্মমভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। খুন করা হচ্ছে। তাদের প্রাণ নিয়ে পালাতে বাধ্য করা হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়।

ফিলিস্তিনিদের দিনপঞ্জীতে এমন একটি দিনও আসে না যেদিন একটি বা দুটি হত্যাকাণ্ড তারা দেখে না।একটি শিশুর খুনের প্রতিবাদ জানাতে তারা রাজপথে নামে। বিক্ষোভ করার সময় গুলিতে মারা যাওয়া আর একজনের লাশ কাঁধে করে ঘরে ফিরে।

তুমি যুক্তি দেখাতে পারো, আমেরিকা, আজ আপন বেদনায় আমি আর্ত, খামাখা তোমাদের কষ্ট নিয়ে কেন ভাবতে যাব ? উত্তরটা সোজা। ফিলিস্তিনিদের হত্যা করেছে যেসব বুলেট, সেগুলো 'মেড ইন ইউএসএ'। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডেরও খরচ যুগিয়েছে এই আমেরিকাই।

১৯৮২ সালে বৈরুতের একটি শরণার্থী শিবিরে হামলা চালিয়ে তিন হাজার ফিলিস্তিনিকে খুন করা হলো। খুনিরা শিবির ছেড়ে চলে যাওয়ার পর দেখা গেল বিকৃত মৃতদেহের স্তূপ জমেছে। লাশের চামড়া খুবলে নেওয়া হয়েছে, সম্ভ্রম হারিয়েছে নারীরা। অসংখ্য লাশের পাশে পড়ে আছে হাজার হাজার গুলির খোসা। আমেরিকায় তৈরি গুলির খোসা। লাশ গণকবর দেওয়ার পর অপরাধের চিহ্ন মুছে দিতে যে বুলডোজারটি গোরস্থানে ঢুকে তারও সরবরাহকারী ছিল আমেরিকা।

১৯৪৮ সালে দখলিকৃত আরব ভূখণ্ডে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হলো। সেই থেকে আজ অবধি ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গঠন ও অবৈধ বসতি নির্মাণ কাজে যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করেছে সাড়ে বার হাজার কোটিরও বেশি ডলার। সেই থেকে যুক্তরাষ্ট্র নিপীড়িত একটি জনগোষ্ঠীর দামে টিকে থাকা বর্ণবাদী একটি দেশকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে।

এই সেদিন নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন ডিসিতে হামলার ৪৮ ঘন্টা আগে একটি ডিক্রি জারি করেন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। বলেন, ফিলিস্তিনিদের খুন করতে ইসরায়েল যে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া অস্ত্র ব্যবহার করে এটি মার্কিন অস্ত্র রপ্তানি নীতিকে লঙ্ঘন করে না।

www.pathagar.com

এত কিছুর পরও মাত্র ডজনখানেক শিশু মার্কিনিদের মৃত্যুতে উৎসব করতে রাজপথে ছুটেছে। এত কিছুর পরও সিংহভাগ ফিলিস্তিনি আমেরিকানদের মৃত্যুতে শোকার্ত হয়েছে। কারণ একটাই। কয়েক দশক ধরে নিজেদের ট্র্যাজিক অভিজ্ঞতা থেকে তারা বুঝেছে, মৃত্যু কত মর্মান্তিক।

১৯৯১ সালে লাখ লাখ মার্কিনি ইরাকের বিরুদ্ধে 'বিজয়' উৎসবে মেতেছিল। সেদিন কিন্তু ফিলিস্তিনিরা 'ফিলিস্তিন, ফিলিস্তিন' বলে গান ধরেনি। রঙিন বেলুনও ওড়ায়নি। শ্যাম্পেনের বোতল খুলে গলা ভেজায়নি। বরং তারা লাইন বেঁধে দাঁড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অস্ত্রেশস্ত্রে বিধ্বস্ত শহর রামাল্লায়, গাজায়। স্বেচ্ছায় রক্ত দিয়েছে।

ছয় বছর বয়সের ফিলিস্তিনি বালিকাটি শোক অনুষ্ঠান শেষে মায়ের হাত ধরে বাড়ির পথ ধরছে। রামাল্লা থেকে জেরুজালেম আধঘন্টার পথ। তবে এই মা ও শিশুর কয়েক ঘন্টাও লাগতে পারে। কারণ অসংখ্য ইসরায়েলি সেনা চৌকিপথে। একের পর এক। এসব ডিঙিয়েই তারা এসেছিল যুক্তরাষ্ট্রের হতাহতদের স্বজনদের সঙ্গে সংহতি জানাতে।

মায়ের সঙ্গে ঘরে ফিরছে মেয়েটি। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ইসরায়েলি সৈন্য। তাদের চোখে সন্দেহ, অবিশ্বাস। আর দশজনের মতো এই মেয়েটিকেও ফিলিস্তিনি পতাকা রাখতে দেওয়া হয়নি। তার হাতে এখন দুলছে ছোট্ট একটি মার্কিন পতাকা। মেয়েটির চোখে-মুখে স্বস্তির অভিব্যক্তি, সৈন্যরা অন্তত এই পতাকাটি কেড়ে নেবে না।

ওদিকে ঠিক এময় পশ্চিম তীরের শহর জেনিনে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি মরিয়া হয়ে নিজেদের ঘরদোর, স্বজন-পরিজনকে সরিয়ে তোলার চেষ্টা করছিল। ইসরায়েলি সেনাদের কয়েক দিনের বোমা হামলায় ভিটেমাটি ধসে গেছে, মারা পড়েছে ১১ জন।

আচমকা একজন ফিলিস্তিনি তরুণের চিৎকার শোনা যায় ঃ পালাও সবাই, হেলিকপ্টারগুলো আবার আসছে। তরুণটির অস্ত্র বলতে বুকপকেট ভর্তি পাথর, হাতে গুলতি। আতঙ্কিত লোকজন ততক্ষণে সংকীর্ণ গলি ধরে ছুটছে। এরই মধ্যে পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে দু'টি আমেরিকা-মেইড হেলিকপ্টার। পলায়নপর মানুষগুলোর ওপর বৃষ্টির মতো গুলি চালায়। স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলি। আমেরিকায় তৈরি গুলি। ❑

লেখক ঃ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী ফিলিস্তিনী সাংবাদিক।

অনুবাদ ঃ গাইস রহমান পিয়াস

৫ অক্টোবর ২০০১

www.pathagar.com

সীমানা পেরিয়ে আফগানিস্তান কে শাসন করবেন

রাবেয়া শাহ্নাজ পারভীন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে বিমান হামলার পাশাপাশি কাবুলে তালেবান সরকারকে সরিয়ে নতুন সরকার বসানোর তোড়জোড় চালিয়ে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসাবে মার্কিন নেতৃবৃন্দ রোমে নির্বাসিত সাবেক আফগান রাজা জহির শাহ, উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নেতৃবৃন্দ ও অন্য আফগান গোষ্ঠীর সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছেন। মার্কিনিরা তালেবানমুক্ত আফগানিস্তানে জহির শাহর নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার দেখতে চায়। আরও চায়, ওই সরকারের অধীনেই সাধারণ নির্বাচন এবং নতুন গণতান্ত্রিক সরকার।

তবে তালেবান কর্তৃপক্ষ আগেভাগেই আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রশ্নে বিদেশীদের সঙ্গে যোগসাজশ করার ব্যাপারে দেশীদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। তালেবান প্রধান মোল্লা মোহাম্মদ ওমর বলেছেন, এ ধরনের ষড়যন্ত্রকারীকে কমিউনিস্ট সরকারের মতোই পরিণতি ভোগ করতে হবে। এর মাধ্যমে মোল্লা ওমর কমিউনিস্ট সরকার প্রধান নজিবুল্লাহকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানোর প্রতিই ইঙ্গিত করেন। কিন্তু এই হুঁশিয়ারির মুখে তালেবানবিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নেতৃবৃন্দ হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। তারা জানেন, আন্তর্জার্তিক চাপ ও মার্কিন হামলার মুখে তালেবান সরকার কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তারা এই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাচ্ছেন। গত পাঁচ বছর ধরে তালেবানবিরোধী অভিযান চালিয়ে গেলেও ওই গোষ্ঠী এতটুকু সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এবার তারা মার্কিন সমর্থনে সাফল্যের চূড়ায় উঠতে চান। এরই মধ্যে তারা নতুন ভূখণ্ড দখলে নেয়ারও দাবি করেছেন।

১৯৯৬ সালে তালেবান গোষ্ঠী যখন কাবুল দখল করে, তখন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বুরহানুদ্দীন রাব্বানী তার রাজনৈতিক ও সামরিক সঙ্গী-সাথী নিয়ে উত্তরাঞ্চলে পালিয়ে যান। কিন্তু সাবেক কমিউনিস্ট প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহ ধরা পড়েন এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগসাজশ করার অপরাধে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। এরপর বিরোধী অন্যান্য গোষ্ঠী উত্তরের জোটের সঙ্গে যোগ দেয়। এরাই বর্তমানে উত্তরাঞ্চলীয় বিরোধী জোট নামে পরিচিত।

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওসামাকে পাকড়াও করা, তালেবান সরকারকে উৎখাত করা এবং কাবুলে নতুন ও অনুগত একটি সরকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। এ

www.pathagar.com

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ডান-বাম, সামনে-পিছনের সব দেশকে সঙ্গে নিচ্ছে। ব্রিটেন এ ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। এমন কি পাকিস্তানও বলেছে, তালেবানের দিন ফুরিয়ে এসেছে।

মার্কিন কর্মকর্তারা তাদের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এমন একজন ব্যক্তিত্ব খুঁজছিলেন, যিনি হবেন বহুজাতিভিত্তিক সব আফগানের কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত। এক্ষেত্রে তারা সাবেক প্রেসিডেন্ট বুরহানুদ্দীন রাব্বানী কিংবা সাবেক প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারকে নয়, বেছে নিয়েছেন নির্বাসিত সাবেক রাজা জহির শাহকে। জহির শাহ'র বয়স বর্তমানে ৮৭ বছর। ১৯৭৩ সালে এক অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ইতালিতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। সেই থেকে তিনি রোমে বসবাস করছেন। তবে মার্কিনিরা রাব্বানী বা হেকমতিয়ারকেও হাতছাড়া করছেন না। তালেবানবিরোধী মহাজোট করার জন্য তারা সবাইকে সংগঠিত করছেন।

মার্কিন কর্মকর্তারা উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নেতৃবৃন্দকে জহির শাহর সঙ্গে আলোচনার জন্য রোমে আনা-নেয়া, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার সব খরচ বহন করছেন। গত মাসের শেষের দিকে জহির শাহ ও উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটা সমঝোতাও হয়ে গেছে। সমঝোতা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ সরকারের রূপরেখা হয়েছে। এরই অংশ হিসাবে একটি রাজনৈতিক ও অপর একটি সামরিক পরিষদ হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী তালেবান সরকারের পতনের পর জহির শাহর নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার হবে। ওই সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচন হবে। নির্বাচনের পর হবে নতুন সরকার। সবকিছু তদারকি করবে জাতিসংঘ। কারণ, অনেকেই বলেছেন, বাইরের লোকেরা আফগানদের ওপর তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারে না। আফগান জনগণই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

মার্কিন পরিকল্পনাধীন জহিরশাহর নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি অনেকেই সায় দিয়েছে। বিবদমান গোষ্ঠীগুলোর অধিনায়ক নির্বাসিত উপজাতীয় প্রধান ও তালেবানবিরোধী জোটের নেতৃবৃন্দ সম্ভাব্য সরকারে স্থান পেতে এখন রোম, ওয়াশিংটন আর লন্ডনে ছোটাছুটি করছেন। এই প্রক্রিয়া তদারককারী এক পশ্চিমা কর্মকর্তা বলেন, তালেবানবিরোধী জোট কিংবা বর্তমানে নির্বাসিত অনেক গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দই সাবেক রাজার রোমের বাসভবনে যাতায়াত করছেন এবং ভবিষ্যতে সরকারে স্থান পাওয়ার জন্য তদবির করছেন।

তবে ধারণা করা হচ্ছে, সাবেক রাজা জহির শাহ লোয়া জিরগা (মহাসম্মেলন) আহ্বান করবেন। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী সম্মেলন। এতে রাজনৈতিক-সামরিক নেতৃবৃন্দসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা শেষে এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সম্ভাব্য লোয়া জিরগায় তালেবানমুক্ত আফগানিস্তানে নির্বাচন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তালেবানবিরোধী জোট নর্দার্ন এলায়েন্সসহ সব গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দই লোয়া জিরগায় স্থান পাওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। তবে এগিয়ে রয়েছে নর্দার্ন এলায়েন্সের নেতারাই।

এই জোটের বর্তমান কমান্ডার ইসমাইল খান জিরগায় স্থান পাওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন। জোটের আরেকজন কমান্ডার জেনারেল দোস্তামও জিরগায় স্থান পেতে

www.pathagar.com

যাচ্ছেন। তবে সবচেয়ে দাবি বেশি উত্তরাঞ্চলীয় জোটের রাজনৈতিক নেতা বুরহানুদ্দীন রব্বানীর। ১৯৯৬ সালে কাবুল থেকে বিতাড়িত হওয়া সত্ত্বেও তিনি এখনও নিজেকে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট মনে করেন। এমন কি জাতিসংঘও এখনও তাকে ওই দেশটির প্রকৃত প্রতিনিধি মনে করে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার তালেবানমুক্ত কাবুল সরকার গঠন পরিকল্পনায় জহির শাহর পরই তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

উপজাতীয় রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি নির্বাসিত আফগান পণ্ডিতসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও জহির শাহর সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। তারাও সম্ভাব্য জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্ব চাইছেন। কারণ তারা জানেন, জহির শাহ পণ্ডিতদের মূল্য বোঝেন। রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম মন্ত্রিসভা থেকে রাজ পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে দিয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিদের বিভিন্ন পদে বসিয়ে দেন। বিদেশে অবস্থানরত আফগান পণ্ডিতদের অনেকে আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী দেশগুলোতে ছুটে এসেছেন এবং তালেবানের বিরুদ্ধে আফগানদের সংগঠিত করছেন।

সোভিয়েত বাহিনী-বিরোধী লড়াইয়ের অন্যতম অধিনায়ক ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি বলেছেন, এখনই নতুন কাবুল সরকার গঠনের তোড়জোড়ের কোন অর্থ হয় না। তালেবানের হাতে বিতাড়িত ও তেহরানে বসবাসরত ৫৩ বছর বয়স্ক হেকমতিয়ার আরও বলেন, যতক্ষণ না মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তান দখলে নিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কারও পক্ষে এদেশে যাওয়া সম্ভব নয়।

কমিউনিস্ট-উত্তর প্রথম কাবুল সরকারের প্রধানমন্ত্রী হেকমতিয়ার আফগানিস্তানের ব্যাপারে বিদেশী হস্তক্ষেপে নাখোশ। তিনি চান, আফগানরাই তাদের সমস্যা সমাধান করুন। তিনি দেশটিতে মার্কিন হামলারও বিরোধিতা করেন। তবে ভবিষ্যৎ সরকার গঠনে তিনি নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব দেন।

সবকিছুর পরও একটি প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসছে। তা হলো, সম্ভাব্য লোয়া জিরগা কিংবা ভবিষ্যত কাবুল সরকারের তালেবান প্রতিনিধিত্ব থাকবে কি থাকবে না। এ ব্যাপারে তালেবান বিরোধী নেতৃবৃন্দ বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এক পক্ষ বলছে, থাকা উচিত। অন্য পক্ষ বলছে, অবশ্যই না। ❑

লেখক ঃ প্রাবন্ধিক।

১২ অক্টোবর '০১

www.pathagar.com

আফগানিস্তান জয় সহজ নয়

(দুই)

গভীর রাত। আফগানিস্তানের পাহাড়িয়া এলাকা। হঠাৎই আলো ও শব্দহীন একটি ছোট্ট বিমান আকাশে উদয় হল। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ওই এলাকার একটি পাহাড়ের উপর। থামল। সঙ্গে সঙ্গে দড়ি বেয়ে নেমে গেল বিশেষ পোশাক আর অস্ত্রশস্ত্রে সাজানো একটি দল। বিমানটির আগেই দলটি উধাও হয়ে গেল পাহাড়ের বুকে। এরপর কয়েকটি দৃশ্য। কখনও বিনা বাধায় কখনও বা বাধা মোকাবেলা করে লক্ষ্যস্থলে এগুলো আর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সহযোদ্ধা ও কন্ট্রোল রুমে তাদের অবস্থানের বর্ণনা। এরপর আরও কয়েকটি দৃশ্য—কখনও অস্ত্রে, কখনও বা হাতেই শত্রু ঘায়েল। তারপর কাঙ্খিত গুহার সন্ধান লাভ এবং গুহাবাসী শত্রু ও তার জানবাজ দেহরক্ষীদের সঙ্গে লড়াই। অকল্পনীয়, অবর্ণনীয় লড়াই। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কাজ করতে সক্ষম বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা শেষমেশ শত্রুকেও ঘায়েল করল। তারপর বিমানে তুলে ফিরে চলল গন্তব্যে---পেছনে উড়ছে পঞ্চাশ তারকা বিশিষ্ট লাল-নীল পতাকা। সম্ভবত এভাবেই সাজানো হয়েছে ওসামা বিন লাদেন পাকড়াও অভিযান। অনেকটা ফিল্মি স্টাইলে। কারণ, মার্কিন নেতৃবৃন্দ বারবারই বলেছেন, ওসামা কোথায় লুকাবে ? গুহায় ? গুহা থেকেই তাকে বের করে আনা হবে।

কিন্তু আফগানিস্তানের মাটিতে লড়াইয়ে অভিজ্ঞ সমরবিদ ও সমরনেতারা বলেছেন, আফগানিস্তান বড়ই দুর্ভেদ্য। আফগানরা এতই দুর্দমনীয়, তাদের পদানত করা দুঃসাধ্য। আর গুহা ? সে তো এক রহস্যপুরী। একথা মার্কিন সরকারও জানে। তারপরও তারা অভিযান চালাবেই এবং লক্ষ্যে পৌঁছবেই। এজন্য বছর গুণতেও প্রস্তুত, প্রস্তুত নিজস্ব বাহিনীর সদস্যদের প্রাণহানি করতে। আর অঙ্কের বোঝা তো আছেই। মার্কিন বাহিনী একমাত্র ব্যক্তি ওসামা বিন লাদেনের জন্য আফগানিস্তানে বিমান হামলা চালাচ্ছে একটানা ১৮ দিন ধরে। এ সময় ওয়াশিংটন তার লক্ষ্যের কতটুকু পেয়েছে ? মার্কিনিরা বলেছে, তারা পরিকল্পনা অনুযায়ী এগুচ্ছে এবং প্রাথমিক সাফল্যও পেয়েছে। সাফল্যের বিবরণ তারা দেয়নি। তাবে সামরিক বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, মার্কিন বাহিনী প্রথমে বিমান হামলায় দেশটির যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করতে চেয়েছে এবং তা করেছে। এরপর

www.pathagar.com

ওসামার গোষ্ঠীর সামরিক স্থাপনা ধ্বংস করতে চেয়েছে এবং তাও করেছে। তারা দাবি করেছে, এ পর্যন্ত আল কায়দার নয়টি ঘাঁটি তালেবানের নয়টি বিমানবন্দর ও ২৪টি অস্ত্রাগার ধ্বংস হয়েছে। এরপরই তারা আফগানিস্তানের আকাশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে এবং তা করেছে। মার্কিন সমরবিদরা সাফল্য দাবি করলেও দেখা যাচ্ছে, এই দিনগুলোতে একটানা বোমা ফেলা হলেও মূল শত্রু ওসামা, তার সাঙ্গপাঙ্গ কিংবা তার আশ্রয়দাতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর বা তার সহযোগীদের টিকিটিও পায়নি। হতাহত বা বাস্তুচ্যুত হয়েছে হাজার হাজার নিরীহ আফগান। অন্য দেশের মাটিতে আশ্রয় পাওয়ার জন্য ছোটাছুটি করছে, ত্রাণের আশায় তীর্থের কাকের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। এছাড়া ওসামার ঘাঁটি বা তালেবান সামরিক স্থাপনার চেয়ে বেসামরিক স্থাপনাই ধ্বংস হয়েছে বেশি। কাবুলের জাতিসংঘ, রেডক্রস দফতর, হেরাতের হাসপাতাল ও মসজিদ গুঁড়িয়ে দিয়েছে তারা। কিন্তু তালেবান নেতৃবৃন্দ বলেছেন, মার্কিনিরা কখনোই জিততে পারবে না।

মার্কিনি সমরবিদরা জানেন, আফগানিস্তান দখলে নিতে এবং আফগানদের দমন করা দুষ্কর। এক সময়ের পরাক্রমশালী ব্রিটিশরা পারেনি, পারেনি পরাশক্তি রাশিয়াও। এ কারণেই তারা দেশটির ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং দেশবাসীর প্রকৃতি মাথায় রেখে রণকৌশল নির্ধারণ করেছেন। তারা জানেন, শুধু বিমান হামলা চালিয়ে আফগানিস্তান জয় কিংবা আফগানদের পরাজিত করা যাবে না। তারা আরও জানেন, আকাশপথে হামলা ছাড়া অন্য সব হামলাই বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ। এ কারণেই তারা বিমান হামলার পাশাপাশি কয়েকটি বিকল্প পথের কথা ভাবছেন। এর মধ্যে রয়েছে স্পেশাল ফোর্স পাঠিয়ে ওসামাকে জীবিত বা মৃত তুলে আনা। কিন্তু এই অভিযানের সাফল্যের ব্যাপারে সন্দিহান তারা। আরেকটি বিকল্প হল, বিশাল স্থলবাহিনী পাঠানো। কিন্তু এতে খোদ মার্কিনি, বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং অন্যদের মধ্যেও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়তে পারে। কারণ স্থলযুদ্ধে অসংখ্য জীবনহানি অনিবার্য, তাছাড়া সময়সাপেক্ষ। তৃতীয় বিকল্প হচ্ছে, বিমান বাহিনীর সমর্থনে স্পেশাল ফোর্স এবং তার পাশাপাশি স্থলবাহিনী হিসাবে উত্তরাঞ্চলীয়, অন্য তালেবান বিরোধীদের সম্মুখ সমরে পাঠানো। পেছনে থাকবে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী। কিন্তু এতেও ঝুঁকি রয়েছে। তবে সম্ভবত এই কৌশলেই এগুচ্ছে তারা। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সামরিক স্থাপনা ধ্বংস করার পর আকাশ দখলে নিয়েছে। এরপর বিমান বাহিনীর সমর্থনে লক্ষ্যস্থলে ঝটিকা অভিযান চালানোর জন্য বিশেষ বাহিনী পাঠিয়েছে। এরই পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে রাজধানীসহ গুরুত্বপূর্ণ শহরের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। স্পেশাল ফোর্স ওসামাকে ধরবে আর অন্যেরা কাবুলসহ গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো দখলে নেবে। এরপর কাবুলে নতুন সরকার বসানো হবে। অবশ্য নতুন সরকার বসানোর ব্যাপারে এরই মধ্যে তোড়জোড় চালিয়ে যাচ্ছে তারা। আর স্পেশাল ফোর্স অচিরেই ওসামাকে ধরতে ব্যর্থ হলে, অনুগত সরকারের সহায়তায় ধরা হবে তাকে। কিন্তু আফগানিস্তানে যুদ্ধ করে অভিজ্ঞ সমরবিদরা হুশিয়ারি দিয়েছেন। আফগানিস্তানের মাটিতে পোড় খাওয়া সাবেক রুশ জেনারেলরা বলেছেন, সাধারণ কেন, বিশেষ বাহিনীর মাধ্যমে স্থলযুদ্ধ করেও আফগানিস্তান দখলে নেয়া যাবে না। আফগানদের দমন করা যাবে না। আফগানিস্তানের মাটিতে রক্তগঙ্গা বইবে, তবু ওই মাটি দখলে নেয়া যাবে না। আর ওসামা বিন লাদেনকে গুহা থেকে তুলে আনাকে তারা

www.pathagar.com

অলীক বলে বর্ণনা করেছেন। আফগানিস্তান যুদ্ধ থেকে পরাজিত হয়ে ফিরে যাওয়া জেনারেল ও বর্তমান পার্লামেন্ট সদস্য অ্যালেক্স জেলেনিয়ভ বলেন, স্থলযুদ্ধে নামলে মার্কিন বাহিনীকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। কারণ তারা এমন এক জাতির. বিরুদ্ধে মাঠে নামছে, যুদ্ধের মধ্যেই যাদের জন্ম এবং বেড়ে উঠা। কাজেই তাদের হারানো দুঃসাধ্য। ১৯৮৯ সালে আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়া শেষ রুশ বাহিনীর সদস্য জেলেনিয়ভ বলেন, আফগানিস্তানের মাটিতে মার্কিন বাহিনীকে চড়া মূল্য দিতে হবে। স্পেশাল ফোর্সটোর্স হলিউডের সিনেমায়ই মানায়। ওই দুর্গম গিরিতে নয়। আফগান যুদ্ধফেরত আরেক জেনারেল রুসলান আউশেভ বলেছেন, আফগানিস্তানের মাটিতে মার্কিন বাহিনীকে রীতিমতো নাকানিচুবানি খেতে হবে।

বর্তমানে ইঙ্গশটিয়ার প্রেসিডেন্ট জেলেনিয়ভের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেন, মার্কিন বাহিনীর হাতে বেশি সংখ্যক আফগান হতাহত হলে দৃশ্যটাই পাল্টে যাবে। মিত্র আফগান গোষ্ঠীগুলো তালেবানের সঙ্গে হাত মেলাবে। মার্কিন বাহিনী হয়ে পড়বে কোণঠাসা। আরেক রুশ জেনারেল ফ্রাঞ্চ ক্লিন্টশেভিচও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, স্থলযুদ্ধ যত দীর্ঘ হবে প্রতিপক্ষ তত জোটবদ্ধ ও শক্তিশালী হতে থাকবে। বর্তমানে সংসদ সদস্য ক্লিন্টশেভিচ আরও বলেন, আর এক সময় উত্তরাঞ্চলীয় জোট তালেবানের সঙ্গে মিলে ভিনদেশীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কারণ, এটা ওদের মজ্জাগত। সোভিয়েত বাহিনী ১৯৭৯ সালে কাবুলের কমিউনিস্ট সরকারের সমর্থনে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। এর এক দশক পর শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে ১৯৮৯ সালে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এ সময় ১৪ হাজার রুশ সৈন্য নিহত হয়েছে। পঙ্গু হয়েছে আরও বেশি। আর খরচের খাতা তো আছেই । ধরা যাক, মার্কিন অভিযান স্বল্প নয়, দীর্ঘমেয়াদি হবে। আরও ধরা যাক, তারা বিমানবাহিনীর সহায়তায় একদিকে বিশেষ বাহিনী এক এক স্থানে ঝটিকা অভিযান চালাবে। আর অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলীয় জোট ও মিত্র দেশের বাহিনীকে নামাবে স্থলযুদ্ধে, পাশাপাশি থাকবে মার্কিন ও অন্য দেশী বাহিনী। কিন্তু তারপরও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। এভাবেও কি সম্ভব হবে ওসামাকে তার গুহা থেকে বের করে আনা ?

এক সাবেক আফগান লড়াকু বলেছেন, সম্ভব হবে না। ভয়েচ অব আমেরিকার ফরাসি বিভাগের প্রধান সাবেক আফগান কর্নেল বলেন, আগ্রাসী বাহিনীর কবল থেকে বাঁচতে এবং ঝটিকা হামলা করতে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও সুনিপুণভাবে আফগানিস্তানে অসংখ্য গুহা তৈরি করা হয়েছে। সোভিয়েত বাহিনীর ফিরে যাওয়ার পর এসব সৌদি ধনকুবের ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়েদার দখলে চলে যায়। ওসামা গত কয়েক বছরে এসব গুহাকে আরও আধুনিক ও সুরক্ষিত করে গড়ে তুলেছেন। ব্যয় করেছেন অনেক টাকা। মধ্য এশীয় দেশগুলোর সামরিক ইতিহাসের ওপর তথ্যবহুল বইয়ের লেখক কর্নেল জালালি আরও বলেন, এসব গুহায় এমন অনেক গোপন সুরঙ্গ ও কুঠুরি রয়েছে, লাদেন ও তার সহযোগীরা যেখানে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারবেন বছরের পর বছর। নানামুখী সুড়ঙ্গ আর কুঠুরি শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য যথেষ্ট। রুশ বাহিনী যখন ওসব গুহায় ঢুকত তখন রীতিমতো ধাঁধায় পড়ে যেত। আর রহস্যময় ওসামা তো হাওয়ায়ই মিলিয়ে যাবেন। ❑

২৬ অক্টোবর' ০১

www.pathagar.com

দুর্গম গিরি কান্তার মরু...

মানজারুল ইসলাম শাহিন

আফগানিস্তানের ইতিহাস লড়াই আর সংঘাতের ইতিহাস। আফগান জাতি হাজার হাজার বছর তাদের সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। এসব লড়াই-সংগ্রাম ছিল বিদেশী দখলদার ও আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে। এখনও দেশটি গৃহযুদ্ধ, উপজাতীয় দ্বন্দ্ব-কোন্দলে ক্ষত-বিক্ষত। এর ওপর শুরু হয়েছে আরেক যুদ্ধ: সম্পূর্ণ নতুন ও অন্য এক যুদ্ধ। বর্তমান বিশ্বের একক পরাশক্তি আমেরিকা ও তার মিত্রবাহিনীর সঙ্গে লড়ছে আফগান তালেবান যোদ্ধারা। অতীতে ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো বৃহত পরাশক্তিদ্বয় সেখানে আগ্রাসন চালিয়ে সহী সালামতে ফিরে আসতে পারেনি। ব্রিটেন আফগানিস্তানের ওপর তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন আদর্শগতভাবে দেশটির ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করে গত দু'দশক। কিন্তু বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র অথবা আন্তর্জাতিক বিশ্ব আফগানিস্তানের ওপর যে অভিযান শুরু করেছে তা অতীতের যে কোন আগ্রাসী দেশগুলোর উদ্দেশ্য থেকে একটু ভিন্ন ধরনের। কিন্তু সেখানে মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী কতটুকু সুবিধা করতে পারবে তা নিয়ে খোদ সমরনায়করাই বিভিন্ন রকম মূল্যায়ন করছেন। টানা বিমান হামলার পর মার্কিন বাহিনী এবার ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা অথবা গ্রেফতার এবং তার সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আল কায়দার নেটওয়ার্ক ও প্রশিক্ষণ শিবির ধ্বংসের লক্ষ্যে সেখানে স্পেশাল ফোর্স নামাতে যাচ্ছে। কিন্তু দুর্গম আফগান ভূমিতে স্থলবাহিনী কতটুকু সফল হবে তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে অন্তত ইতিহাস তাই বলে।

আফগানিস্তানে রয়েছে পাহাড়, পর্বত ও গুহা। উঁচু উঁচু পাহাড়ের কারণে এখানে কেউ হঠাৎ কোন আক্রমণ করে কোনভাবেই লাভবান হতে পারেনি। বিশেষ করে স্থলযুদ্ধে আফগানদের কাবু করা খুব একটা সহজ নয়। ১২৭৯ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সাবেক সোভিয়েত সৈন্যদের হটাতে আফগান যোদ্ধারা যে অকুতোভয় সাহসের পরিচয় দেখিয়েছে তাতে গোটা বিশ্বই হতবাক। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো পরাশক্তির বাঘা বাঘা জোয়ানদের নেতৃত্বে স্থলযুদ্ধে আসা হাজার হাজার সৈন্য আফগানদের হাতে নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে সোভিয়েত সরকার বলা চলে শিয়ালের মতো লেজ গুটিয়ে চলে যায়। এটি ১৯৮৯ সালের ঘটনা। এবার দেশটিতে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা

www.pathagar.com

চলছে। পশ্চিমাদের ভাষায় বিশ্বে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের প্রধান মদদদাতা ওসামা বিল লাদেনকে হত্যা অথবা গ্রেফতার এবং তার সন্ত্রাসী চক্রকে ধ্বংস করা। তালেবান কর্তৃপক্ষ যাতে লাদেনকে আশ্রয়দান বন্ধ করে সে জন্য এ হামলা। কিন্তু এ উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভবত খুবই জটিল ব্যাপার। আফগানিস্তানে রয়েছে উঁচু উঁচু হাজার হাজার পাহাড়, স্থল যোগাযোগ এসব পাহাড়ের জন্য খুবই সমস্যাসঙ্কুল বিশেষ করে দেশটির মধ্যভাগ ও উত্তর-পূর্বে এ সমস্যা বেশি। উচ্চ পর্বতের কারণে দেশটি বহু উপত্যকায় বিভক্ত। এদের অধিকাংশই মধ্যাঞ্চলে। আর এসব পাহাড়ের গুহায় মানুষ লুকিয়ে থাকার কারণে গত রোববারের হামলায় তিন/চারদিনে মাত্র ৩৫ জন লোক নিহত হয়। এছাড়া দেশটিতে রয়েছে জাতিগত মতভেদ বা বিভেদ। দেশের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশই পশতুন জাতিগত সম্প্রদায়। এদের মধ্যে বর্তমান ক্ষমতাসীন তালেবানদের জোরালো সমর্থন রয়েছে। জনসংখ্যার ২০ শতাংশের মতো তাজিক, এদের একটি অংশ বর্তমান উত্তরাঞ্চলীয় জোট নর্দান এলায়েন্সের প্রতি অনুগত। এছাড়া ৫ শতাংশ উজবেকও রয়েছে এদের সঙ্গে। সুতরাং এদেশে যে কোন ধরনের স্থল আগ্রাসন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। আফগানিস্তান উচ্চ পর্বতের দ্বারা ঘেরা ও সুরক্ষিত। তবে উত্তরাঞ্চলের পিঞ্চ নদীর মধ্য থেকে এ দেশে আগ্রাসন চালানো একটু সহজসাধ্য হলেও তাজিকিস্তান ও রাশিয়া সেখান থেকে আন্তর্জাতিক এ অভিযানে কোন ধরনের সহায়তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আর এজন্য আমেরিকা ও তার মিত্ররা বিমান হামলা চালাচ্ছে। এতে বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

তালেবানদের রয়েছে বড় ধরনের গেরিলা বাহিনী, কয়েকটি ট্যাংক ও বিমান। বর্তমানে এ তালেবানদের রুখতে পারার মতো যে ব্যক্তিটি নর্দান এলায়েন্স ছিলেন তার নাম কমান্ডার আহমদ শাহ মাসুদ। তিনি গত মাসে তালেবান সমর্থকদের আত্মঘাতী বোমা হামলায় আহত ও পরে নিহত হন। তার এ মৃত্যুর ফলে তালেবানদের বিরুদ্ধে জোটের সামরিক অভিযান আরও জটিল করে তুলেছে। মাসুদ আন্তর্জাতিকভাবে বহু দেশেরই সমর্থন জোগাড় করতে সমর্থন হন এবং তালেবানদের আলোচনার টেবিলে নিতে চলেছিলেন। তার অনুপস্থিতিতে তারই উত্তরসূরি কি পারবেন নিঃসন্দেহভাবে মাসুদের কাজটি করতে ? ❑

লেখক ঃ মিডিয়া কর্মী।

১২ অক্টোবর '০১

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাস ঃ ওসামার বিরুদ্ধে প্রমাণ অকাট্য নয়

তাসলিমা লিপি

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে নিউইয়র্ক ও পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে ওসামা বিন লাদেন এবং তার আল-কায়েদা সংগঠনের সংশ্লিষ্টতা। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তাদের কাছে লাদেনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে। এই বলে তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে নিয়ে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের কোয়ালিশন গঠন করেছে। চেষ্টা করেছে জনমত সৃষ্টির। কিন্তু এসব সাক্ষ্যপ্রমাণের বেশিরভাগই প্রকাশ করা হয়নি। যা প্রকাশ করা হয়েছে তা মোটেও অকাট্য নয়।

সন্ত্রাসী হামলার তদন্তে চার হাজারেরও বেশি এফবিআই এজেন্ট, তিন হাজার সহযোগী এবং চারশ'রও বেশি গবেষণাগার কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এটাই যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সন্ত্রাসী আটকের লক্ষ্যে সবচেয়ে বড় অভিযান।

এফবিআই চারটি বিমান ছিনতাইয়ে জড়িত সন্দেহভাজন ১৯ ছিনতাইকারীর নাম প্রকাশ করেছে। সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত সন্দেহে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, বলা হয়েছে, তাদের ছিনতাইকারী অথবা ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এদের কেউ কেউ আরও বিমান ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা করছিল বলেও বলা হয়েছে। এফবিআই তদন্ত সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছে তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তদন্তে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনশ'রও বেশি লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের অনেকেই অবৈধ অভিবাসী। মার্কিন তদন্ত কর্মীরা বোস্টন বিমানবন্দরে একটি ভাড়া করা গাড়িতে একটি কোরআন শরিফ এবং কিভাবে বিমান চালাতে হয় তার কাগজপত্র পেয়েছেন।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একজন ছিনতাইকারীর পাসপোর্ট পাওয়া গেছে বলেও জানা গেছে। টেক্সাসে যে চারজনকে আটক করা হয় তাদের কাছে কয়েক হাজার মার্কিন ডলার এবং ছিনতাইকারীরা যে ধরনের ছুরি ব্যবহার করেছে সে ধরনের

www.pathagar.com

ছুরি পাওয়া গেছে বলেও জানানো হয়। ডেট্রয়েটে আটক তিনজনের কাছে বিমানবন্দরের নকশা পাওয়া গেছে। ছিনতাইকারীরা অবস্থান করেছে এমন ধরনের বাড়িঘর এবং হোটেলে অভিযান চালানো হয় এবং যেসব ফ্লাইং স্কুলে তারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে সেগুলোতে তল্লাশি চালানো হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ওসামা বিন লাদেন বা তার আল-কায়েদা সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন ধরনের সন্দেহভাজনদের আটক করা হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়।

তদন্তকারীরা জানান, সংযুক্ত আরব আমিরাতে একটি ব্যাংক একাউন্ট থেকে ফ্লোরিডায় আত্তার একাউন্টে অর্থ পাঠানো হয়েছে এবং সেটা পাঠিয়েছে বিন লাদেনের একজন সহযোগী মোস্তফা মোহাম্মদ আহমেদ।

সেপ্টেম্বর মাসের ৮ থেকে ৯ তারিখের মধ্যে এই টাকা পাঠানো হয়। আত্তা পরে আরব আমিরাতেই একই ব্যাংকে টাকাগুলো ফেরত পাঠায় বলে জানা গেছে। আত্তা মিসরীয় ইসলামী জিহাদের সদস্য বলেও বলা হয়। ইসলামী জিহাদ পরিচালনা করেন আয়ামান আল জাওহারি। তিনি ওসামা বিন লাদেনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং আল কায়েদার একটি শীর্ষপদে রয়েছেন। দুই বিমান ছিনতাইকারী খালেদ আল মিদহার এবং নওয়াক আল হামজি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে আল কায়েদার দুজন সদস্যের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলে জানা যায়। এগুলোর ভিডিও পাওয়া গেছে বলে বলা হয়েছে। লাদেনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারি নথিতে বলা হয়েছে, সৌদি বংশোদ্ভূত সন্ত্রাসীর ঘনিষ্ঠ এবং পদস্থ সহযোগীরা ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পরিকল্পনা করেছে। সহযোগী বলতে আল কায়েদার নেতাকে বোঝানো হয়েছে। তবে তার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

মার্কিন কর্মকর্তারা আরও বলেছেন, তারা ১১ সেপ্টেম্বরের আগে বিন লাদেনের একটি বার্তা শুনেছেন। তাতে বলা হয়েছে, অভিযান আসন্ন। স্যাটেলাইট ফোনে পাঠানো এই বার্তাটি ছিল বিভ্রান্তিকর। এতে মনে হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কোন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার কথা বলা হয়েছে।

প্রমাণগুলো কতটা জোরালো

১১ সেপ্টেম্বরের হামলায় বিন লাদেনের সরাসরি জড়িত থাকা সম্পর্কিত কোন প্রমাণ জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। যেগুলো করা হয়েছে তার সবই প্রসঙ্গক্রমে টানা।

এর মধ্যে সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ সম্ভবত আল কায়েদার একজন কর্মীর ফ্লোরিডায় অর্থ পাঠানো। অন্য প্রমাণ যেমন-লাদেনের বার্তা, মোহাম্মদ আত্তার মিসরের ইসলামী জিহাদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং আল কায়েদার সঙ্গে অন্য ছিনতাইকারীদের যোগাযোগ-সবটাই প্রমাণ সাপেক্ষে।

এসব প্রমাণের কোনটাই আদালতে বিচারের জন্য উত্থাপিত হয়নি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে একত্রিত করা এবং জনমত গড়ে তোলার জন্যই এসব প্রমাণের কথা বলা হয়েছে। মার্কিন এবং ব্রিটিশ কর্মকার্তারা বলেছেন নিরাপত্তার কারণে

www.pathagar.com

তারা সব প্রমাণ প্রকাশ করেননি। ইয়েমেনে ইউএসএস কোল এবং পশ্চিম আফ্রিকার দুটি মার্কিন দূতাবাসে হামলাসহ বিভিন্ন স্থানে হামলার সঙ্গে বিন লাদেনের সংশ্লিষ্টতাকেই যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন বর্তমান আক্রমণে তার জড়িত থাকার অজুহাত হিসাবে দাঁড় করাতে চাচ্ছে। ❑

লেখক ঃ মিডিয়া কর্মী।

১২ অক্টোবর '০১

শিশু সন্তানের লাশ সামনে ভাগ্যাহত পিতা।

www.pathagar.com

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের কাছে গুয়েতেমালার নবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রিগোব্যার্তা মেনচুর চিঠি

মাননীয় প্রেসিডেন্ট,

আমি প্রথমে মঙ্গলবার ১১ তারিখে আপনার দেশে সংঘটিত দুঃখজনক ঘটনার জন্যে আমার আন্তরিক দুঃখ ও শোক প্রকাশ করছি এবং একই সাথে বলতে চাই আমরা সন্ত্রাসকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করি।

গত কয়েকদিন ধরে আমি সকল ঘটনাকে মনোযোগ সহকারে বোঝার চেষ্টা করছি এবং আমি নিশ্চিত হয়েছি যে এ ধরনের ঘটনায় সবচেয়ে ভাল প্রতিক্রিয়া হতে পারে গভীর প্রতিফলন করা, কঠোরতা নয়; পরিমাপ করা জ্ঞান, ক্রোধ নয়; সুবিচারের পথ সন্ধান করা, প্রতিশোধ নেয়া নয়, আমি পৃথিবীর মানুষের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে দেখেছি, প্রচার মাধ্যমের সাথে কথা বলেছি, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সাথে কথা বলে বুঝেছি আমাদের কাজকে আলোকিত করার জন্যে নির্মল-শান্ত ভাবের দরকার।

তথাপি, জনাব প্রেসিডেন্ট, গত রাতে কংগ্রেসে দেয়া আপনার ভাষণে ব্যবহৃত কথাগুলো কী পরিণাম বয়ে আনতে পারে ভেবে আমি আমার মধ্যে সৃষ্ট ভীতি দমন করতে পারছি না। আপনি আপনার দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন এমন একটি 'বৃহৎ প্রচারের প্রস্তুতি নিতে যা এর আগে কেউ কোনদিন দেখেনি' এবং আপনার সেনাবাহিনীকে বলেছেন, এমন একটি যুদ্ধে যাবার কারণে গর্বিত হয়ে উঠতে যেখানে আপনি পৃথিবীর সকল মানুষকে একত্রিত করতে চাচ্ছেন। আমাদের মতো মানুষরা যারা কখনো মুক্তির স্বাদ পেতে পারি নি এবং যে সভ্যতা আপনার জনগণ ভোগ করে তা আমরা পাই ও আমরা কখনোই সন্ত্রাস সমর্থন করিনি। আমরা অন্য সংস্কৃতির গর্বিত জনগোষ্ঠী, যারা দিনের পর দিন বৈষম্যের শিকার হয়েছি এবং আমাদের আত্মমর্যাদা ও সম্মান ক্ষুন্ন করা হয়েছে, বিদেশী আগ্রাসনী যুদ্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, তারা কখনোই আপনার উদ্ধত আচরণের সাথে একাত্ম হতে পারি না।

প্রগতির নামে, প্লুরালিজমের নামে, সহনশীলতা ও মুক্তির নামে আপনি সেই আমাদের আপনি কোন সুযোগ দিচ্ছেন না বরং শুধুমাত্র একটি পথ আমাদের নিতে বলছেন। যখন আপনি বলেন যে "All nations in all regions of the world must now make a decision : or you are with us you are with the terrorists"

www.pathagar.com

অর্থাৎ পৃথিবীর সকল অঞ্চলে সকল জাতির অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ঃ হয় আপনারা আমাদের সাথে আছেন নয়তো আপনারা সন্ত্রাসীদের সাথে আছেন।

এই বছরের শুরুতে এই গ্রহের নারী ও পুরুষদের সহস্রাব্দীর শান্তির নৈতিক দিক সম্পর্কে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলাম যে ঃ

সুবিচার ছাড়া শান্তি আসতে পারে না

সম অধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া সুবিচার পাওয়া যায় না।

উন্নয়ন ছাড়া সমতা অর্জন করা যায় না

নিজ নিজ জাতিসত্তার পরিচয় এবং সংস্কৃতির প্রতি সম্মান ছাড়া গণতন্ত্র হয় না।।

বর্তমান বিশ্বে এই উপাদানগুলো দুর্লভ এবং এই উপাদানগুলোর অসম বন্টনের কারণে ঘৃণা ও নৈরাশ্যকর অবস্থার ওপর আরো বেশি আগুন জ্বলে উঠছে। এই বিশ্বের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার দেশ নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেনি। গতকাল রাতে আমরা আপনার কাছে আবেগপূর্ণ ভাষণ আশা করেছিলাম; কিন্তু যা আমরা শুনলাম তা হচ্ছে হুমকি, যা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

আমি আপনার সাথে একমত যে এই সংঘাতের দিক কোন দিকে তা জানা নেই, কিন্তু যখন আপনি বলেন যে এর ফলাফল আপনার জানা আছে, তখন আমার নিশ্চিতভাবে মনে হয় একটি বড় ধরণের মিথ্যার জন্যে ব্যাপকভাবে মানুষের বলিদান করা হবে।

আপনি যুদ্ধের ডাক দেয়ার আগে আমি আপনাকে একটি ভিন্ন ধরনের বিশ্ব নেতৃত্বের আহ্বান জানাবো, যেখানে মানুষকে বোঝানো হবে দখল করা হবে না, 'চোখের বদলে চোখ' নেয়ার মতো মধ্যযুগের বর্বরতার থেকে উত্তরণের জন্যে যে হাজার বছরের অভিজ্ঞতা আছে তা কাজে লাগানো হবে, আমাদের নতুন করে সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জানার জন্যে নতুন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে না, যেখানে আমরা প্রগতির সুফল ভোগ করতে পারবো এবং যেখানে একটি শিশুও রুটি ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না। একটি সুতার ওপর আশা করে,

শুভেচ্ছান্তে,
রিগোব্যার্তা মেনচু টুম (Rogoberta Mencho Tum)
নভেল পুরস্কারপ্রাপ্ত
গুডইল ও শান্তির সংস্কৃতি বিষয়ক এ্যামবাসাডর

রিগোবার্তা গুয়েতেমালার ইন্ডিয়ান কৃষক নারী। ল্যাটিন আমেরিকায় বহু নারীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তাঁর জীবনে প্রতিফলিতহয়েছে। ১৯৭৮ সালে গুয়েতেমালার দখলদার সৈন্যদের হাতে তার ভাই, বাবা ও মা মারা যায়। রিগোব্যার্তা মেনচু টুম বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

১২ অক্টোবর '০১

www.pathagar.com

আফগানিস্তান ঃ এ হামলা বিশ্বজয়ের যুদ্ধ

নির্মল সেন

এক দিন। এক মাস। এক বছর। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বলেছেন, আফগানিস্তানের যুদ্ধ কতদিন চলবে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদকে জানিয়েছে, এ যুদ্ধ আফগানিস্তানের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য শুনলে মনে হতে পারে তাহলে পৃথিবীটা কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কব্জায়? সব সিদ্ধান্তের মালিক কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র? ইচ্ছা হলেই কি কারও ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া যায়? এমন যদি হয়, যুক্তরাষ্ট্রে সন্দেহ হয়েছে ওসামা বিন লাদেন বাংলাদেশে আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে হুকুম দিল লাদেনকে ফেরত দাও নইলে হামলা। কিন্তু লাদেন তো বাংলাদেশে নেই। একথা বিশ্বাস হল না যুক্তরাষ্ট্রের। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হামলা শুরু করল বাংলাদেশে। জাতিসংঘের অনুমতি নিতে হল না। তাহলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে? আমরা বাংলাদেশের মানুষ তো ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াব। আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে ঘটনাটি হয়তো তেমন নয়। তালেবান সরকার বলছে লাদেন তাদের দেশেই আছে। কিন্তু কারও হুকুমে তারা লাদেনকে ফেরত দেবে না। লাদেনের অপরাধ জানানো হলে তারাই তার বিচার করবে।

একথা মানেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। লাদেনের জন্য তারা হামলা চালিয়েছে আফগানিস্তানে। কিন্তু এ হামলা কি বৈধ? ইচ্ছে হলেই কি কেউ কারও দেশে আক্রমণ চালাতে পারে? ইচ্ছে হলেই কি এক দেশের অপরাধীকে অন্য দেশ থেকে ধরে আনার জন্য হামলা চালানো যায়? এর জন্য তো আইন আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তি মানতে হলে নিশ্চয় বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের নিহত প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনিদের ফেরত দেয়ার দাবি করতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

তবে এ কথা সত্য যে, সাত সমুদ্দুর পার হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হামলা করার মত ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। কিন্তু কথার পিঠে কথা সাজালে বাংলাদেশ নিশ্চয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফগান হামলার মতো মার্কিন মুল্লুকে হামলা চালাতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে- এ ঘটনা ঘটছে কেন। ১১ সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ ঘটনার নিন্দা করার ভাষা নেই। এ সন্ত্রাস আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু এ সন্ত্রাস প্রতিরোধের পথ কি? এর একমাত্র

www.pathagar.com

পথ কি অন্য দেশে হামলা চালানো? হামলা মানে তো যুদ্ধ। সে যুদ্ধই শুরু হয়েছে। কিন্তু এ যুদ্ধের কি প্রয়োজন ছিল? এ যুদ্ধ করে কোথায় পৌঁছবে পৃথিবী।

এর একটি ব্যাখ্যা আছে ভিন্ন মহলে। ব্যাখ্যাটির কেন্দ্র হচ্ছে অস্ত্র ব্যবসা। এ প্রশ্নটি দেখা দিয়েছিল জর্জ বুশের নির্বাচনের সময়। সবারই জানা প্রকৃতপক্ষে জর্জ বুশ নির্বাচিত হননি। নির্বাচিত হয়েছিলেন ডেমোক্রেটিক প্রার্থী আল গোর। তাকে হারিয়ে দিয়ে নির্বাচিত করা হয়েছে জর্জ বুশকে। একটি মহলের ধারণা জর্জ বুশকে যারা জয়ী করেছে তারা সমরাস্ত্রের লবির লোক। ক্লিনটনের আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ব্যবসা হ্রাস পেতে থাকে। সীমিত ক্ষেত্রে হলেও ক্লিনটনের আমলে পৃথিবীতে উত্তেজনা কিছু হ্রাস পেয়েছিল। উত্তেজনা হ্রাস পাওয়ার ফলে অস্ত্র ব্যবসায় মন্দা দেখা যায়। এ পটভূমিতে জর্জ বুশ ক্ষমতায় আসে অস্ত্র ব্যবসায়ীদের মুখপাত্র হিসাবে। জর্জ বুশ ক্ষমতায় এসেই প্রেসিডেন্ট রিগানের আমলে ফিরে যেতে চেষ্টা করেন। তিনি ক্ষেপণাস্ত্র চুক্তি বাতিল করেন। পুরোপুরি যুদ্ধ ব্যবসা শুরু করেন। ফিরে যেতে চান রিগানের তারকাযুদ্ধ ব্যবসার আমলে। জর্জ বুশ ক্ষমতায় আসার পরে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘর্ষ তীব্র হয়েছে। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক কখনও কখনও যুদ্ধের কাছাকাছি এসেছে। যুদ্ধের পরিবেশ হচ্ছে অস্ত্র বিক্রির পরিবেশ এবং হিসাব করে দেখা গেছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার শতকরা ৬৮ ভাগ অস্ত্র বিক্রি করে থাকে। এই অস্ত্র বিক্রির পটভূমিতেই জর্জ বুশের ক্ষমতায় আসা। তারপর ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা। তারপর আফগানিস্তানের যুদ্ধ শুরু।

কিন্তু যুদ্ধ কখন হয়? যুদ্ধ হচ্ছে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে পৃথিবীতে। জাপানের তোশিবা ও হিটাচি মার খাচ্ছে। হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংক সুদের হার কমাচ্ছে প্রায় প্রতিমাসে। এ সংকট কাটানোর জন্য একটি যুদ্ধ প্রয়োজন। এ যুদ্ধে পণ্যমূল্য বাড়ে। সম্পদশালী দেশগুলোর রফতানি বাড়ে। একটি যুদ্ধ অর্থনীতিতে সঙ্কট সৃষ্টি করে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। লাদেনকে কেন্দ্র করে এমন একটি পরিস্থিতির জন্ম দেয়া হলে খুব একটা অবাক হওয়ার কিছু থাকবে কি।

বলা যেতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ চাইলেই অন্য দেশগুলো একমত হবে কেন। কেন ছোটাছুটি করছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। এ ব্যাপারে তিনি যেভাবে ছটফট করছেন তাতে মনে হচ্ছে লাদন বোধহয় প্রথমে তাদের দেশেই হামলা করেছে। ঘটনা কিন্তু তেমন নয়। লন্ডনের এক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটেন বিশ্বের নেতা ছিল। লন্ডন ছিল সবকিছুর কেন্দ্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হয়। মনে হচ্ছে ব্রিটেনকে সে অতীতের স্বপ্নে পেয়ে বসেছে। কিন্তু টনি ব্লেয়ার খেয়াল করেননি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তার ভারত বা পাকিস্তান সফর তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তার সফরের পরেও মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব কলিন পাওয়েল ভারত ও পাকিস্তান সফরে আসছেন।

তবে এক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকাও খুব উল্লেখযোগ্য। প্রশ্নটি সন্ত্রাসের। সন্ত্রাসী লাদেনকে ধরার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ। ভারত ভাবল এই সন্ত্রাসের সঙ্গে কাশ্মীরের সন্ত্রাসের প্রশ্নটি হয়তো যুক্ত করা যাবে। ফলে আগ বাড়িয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ি মার্কিন

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু কাজ হল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটেনের টনি ব্লেয়ার কাশ্মীরের সন্ত্রাসের সঙ্গে লাদেনের সন্ত্রাস যুক্ত করতে রাজি হলেন না। ভারত সরকারের লাফঝাঁপ মাঠে মারা গেল। তবে সর্বশেষ ভারত সরকারের একটি সান্ত্বনা পুরস্কার মিলেছে। এ সান্ত্বনা পুরস্কার কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি কাশ্মীরের বিধানসভায় সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল। ভারতের বিশ্বাস এ সন্ত্রাসের জন্য দায়ী পাকিস্তানের সন্ত্রাসীরা। এ সন্ত্রাসকেই ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযানে যুক্ত করতে চেয়েছিল। ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের পারভেজ মোশাররফ আশ্বাস দিয়েছেন- তিনি এ ব্যাপারে তদন্ত করে দেখবেন। পাকিস্তানের তদন্ত করে দেখার আশ্বাসই ভারতকে খানিকটা স্বস্তি দিয়েছে। ভারত ভাবতে পারছে বিলম্বে হলেও পাকিস্তান সন্ত্রাসের কথা স্বীকার করেছে এবং এ আলোচনাও হবে দ্বিপাক্ষিক। কাশ্মীর সম্পর্কে এটাই ভারতের নীতি। এ কথা ঠিক যে, আফগানিস্তানে হামলার সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যার কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে, পৃথিবীর সব রাষ্ট্র এ যুদ্ধকে নিজের সুবিধায় লাগানোর চেষ্টায় আছে। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া, ফ্রান্স এবং চীনও মার্কিন যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সমর্থন জানিয়েছে। বিশ্বের বাজারে এরাও এখন অস্ত্র বিক্রেতা। সেকালের রাশিয়া বা চীন নেই। এখন তারাও ব্যবসায়ী। অস্ত্র ব্যবসায়ে তাদের ভূমিকাও খুব কম নয়। সকলের কাছে এখন সকলেই অস্ত্র বিক্রি করে। যুদ্ধ তাদের কেনা-বেচার সুযোগ করে দেয়।

কিন্তু শুধু কি অস্ত্র ব্যবসার জন্যই এ যুদ্ধ? এ যুদ্ধ কি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে? নাকি এ যুদ্ধ বিশ্বজয়ের যুদ্ধ? এ যুদ্ধ কি পৃথিবীতে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যুদ্ধ? প্রাথমিক ঘটনায় মনে হয় এমন একটি প্রশ্ন কোথায় যেন আছে। এ ঘটনা শুরু হয়েছিল ক্লিনটনের আমলে। বলকান দেশসমূহে তিনি ন্যাটোর সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করেছিলেন। বিল ক্লিনটন জাতিসংঘকে পাত্তা দেননি। ভেঙে টুকরো টুকরো করেছেন যুগোস্লাভিয়াকে। পাশ্চাত্যের শক্তি তাকে অন্ধ সমর্থন করেছে। এবারও একই ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে। ন্যাটোর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, আফগান যুদ্ধ বিস্তৃত হলে ন্যাটো তার চুক্তির শর্ত প্রয়োগ করবে। ন্যাটোর সেই চুক্তিতে বলা আছে- ন্যাটো জোটের কোন একটি দেশ আক্রান্ত হলে জোটের সব সদস্যই মনে করবে তারা আক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ ন্যাটোভুক্ত সব রাষ্ট্রই তখন যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে। এর অর্থ হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কিন্তু সত্যি সত্যি কি পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগুচ্ছে ? সে যুদ্ধই কি শুরু হয়েছে আফগানিস্তানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে—এ যুদ্ধ আফগানিস্তানের সীমান্ত ছাড়িয়ে যেতে পারে। এ যুদ্ধ চলতে পারে এক দিন, এক মাস বা এক বছর। তাহলে এটা কি সারা বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ? নইলে এ যুদ্ধের ব্যাখ্যা।

এই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার যুদ্ধের পক্ষে একটি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছিল কিছুদিন আগে। মাসটি আগস্ট। নিউইয়র্কে হামলার এক মাস আগের খবর। একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল হেরাল্ড ট্রিবিউনে। পত্রিকায় প্রথম খবরের শিরোনাম হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান (U.S. urged to embrace an Imperalist role)। পত্রিকায় প্রথম খবরটিতে বলা হয়, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদী বলে অভিহিত করেন তারা এ শব্দটিকে অপমানজনক বলে মনে করেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছু কিছু রক্ষণশীল প্রতিরক্ষা বিষয়ক বুদ্ধিজীবী বলছেন, সত্যি সত্যি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এবং এটা ঘোষণা করা উচিত... তারা বলেন, এক দশক আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং উপসাগরীয় এলাকায় প্রায় স্থায়ীভাবে ২০ হাজার সেনা মোতায়েন প্রমাণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তি। মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিম গোলার্ধের সর্বত্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি। কসোভো, বসনিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক উপস্থিতি এবং ইরাকের আকাশ দখল—সব মিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন সর্বময় কর্তা।

আমেরিকান বিশ্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা প্রজেক্ট ফর নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরির [নতুন মার্কিন শতাব্দী] নির্বাহী পরিচালক টমাস ডোনেলি বলেছেন, ঠিক রোম বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতো নয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার একটি সাম্রাজ্য। এ দেশটি অন্য কোন দেশ দখল করছে না, উপনিবেশ সৃষ্টি করছে না। কিন্তু নিজের সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের মাধ্যমে পৃথিবী দখলে রেখেছে। বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন-তাহলে বিশ্বের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কি ? ক্লিনটনের আমলে হেইতি অভিযান, বসনিয়া সংকট, সুদান-আফগানিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, যুগোস্লাভিয়ায় বোমা হামলা কি তার কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা? না, এটাই ঠাণ্ডাযুদ্ধ-পরবর্তী চরিত্র। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি কি তাহলে ভবিষ্যতে এ রূপ নেবে?

এ নীতি-ব্যাখ্যা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল রামসফেল্ড এবং জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের মধ্যে বিতর্ক চলছে। প্রতিরক্ষা সচিব পুরান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বাদ দিয়ে ভাবছেন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষার কথা। একমত হচ্ছেন না জয়েন্ট চীফ অব স্টাফ। ডোনাল বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মেনে নিচ্ছে যে, তারা একটি নতুন সাম্রাজ্য দেখভাল করছেন-তাদের কাছে সমস্যা হচ্ছে এ ব্যাপারে নতুন পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন। লক্ষণীয় যে, প্রেসিডেন্ট হয়ে জর্জ বুশ বলকান এলাকা ত্যাগের নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি থেকে সরে গেছেন। অর্থাৎ তিনি সেখানে থাকবেন।

টমাস ডোনেলির আর এক সহপ্রবক্তা বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক এন্ড্রু বাসেভিকের মতে সারা পৃথিবীতে মার্কিন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে কিনা তা আজ আর কোন প্রশ্ন নয়। এ কর্তৃত্ব কেমন হবে তা-ই প্রশ্ন। তিনি বলেছেন, এটা যেন সেই রাজ [অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজ প্রতিষ্ঠার মতো] প্রতিষ্ঠার অভিযান। এটা অবশ্যম্ভাবী এবং এজন্য আমাদের নৈতিক এবং ধনেজনে চড়া মূল্য দিতে হবে। সে পরিস্থিতি আজ আমরা কল্পনাও করতে পারছি না। আর বাসেভিক বলেছেন, দেশের বাইরে সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকায় দেশের অভ্যন্তরেও তীব্র সংকটের সৃষ্টি হবে।

এই প্যাকস আমেরিকা বা বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পটভূমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে অনেক আগে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের নিয়ন্তা বানানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর। মার্শাল পরিকল্পনার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হয়েছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ। শেষ পর্যন্ত তারকাযুদ্ধের আমলে এসে বিপর্যস্ত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব দখলের পালা।

লক্ষণীয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের প্রথম পর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল একেবারে শান্তশিষ্ট। পৃথিবীকে বুঝানো হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো জঙ্গি নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের পর পৃথিবী একেবারে ঠাণ্ডা বরফ। এ

www.pathagar.com

পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ব্যক্তিগত জীবনে চরম কেলেংকারির মুখোমুখি হয়েও দাঁড়িয়ে থাকলেন বিল ক্লিনটন (যে সুযোগ রিচার্ড নিক্সনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেয়নি) তার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বজয়। ক্লিনটনদের প্রয়োজন ফুরাল। এবার নির্বাচনে কারচুপি করে ক্ষমতায় আনা হল জর্জ বুশকে। তিনি ক্ষমতায় এসে অস্ত্র সংক্রান্ত স্বাক্ষরিত সব চুক্তি বাতিল করলেন পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দিয়ে।

তারপর ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে শতাব্দীর জঘন্যতম সন্ত্রাসী হামলা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ হামলার জন্য চিহ্নিত করল ওসামা বিন লাদেনকে। লাদেন আফগানিস্তানে বাস করছেন। তাকে ফেরত দেয়ার দাবি জানায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিচারের জন্য। রাজি হল না আফগানিস্তানের তালেবান সরকার। সুতরাং আফগানিস্তানে হামলা। লক্ষ্য লাদেনকে উদ্ধার। সন্ত্রাস নিঃশেষ করা পৃথিবী থেকে।

আজকের যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বজয়ের পরিকল্পনার অঙ্গ-তা হলফ করে বলা যাবে না। এ সময় চিলি, ভিয়েতনাম, এঙ্গোলা, বসনিয়াসহ পৃথিবীর অসংখ্য দেশে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করে লাভ হবে না। বলে লাভ নেই আফগানিস্তানে পুরনো ঐতিহ্যের স্মারক বুদ্ধ মূর্তিগুলো আফগান সরকারের ধ্বংস করার সময় সভ্য (!) জগতের নীরবতার কথা। স্মরণে থাকবে না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই লাদেনের জন্মদাতা। এরপর বিশ্বাস করানো হচ্ছে সামরিক সন্ত্রাস করে ক্ষমতা জবরদখলকারী পাকিস্তানের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ নাকি বিশ্ব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রথম কাতারের সাহসী যোদ্ধা। তাহলে সন্ত্রাসের ব্যাখ্যা কি?

এ প্রশ্নের জবাব না খুঁজেই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেছনে লাইন দিয়েছে। তবে তারা দর কষাকষি করেছে। ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ভারত কোটি কোটি ডলার এবং রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের বিনিময়ে এই সন্ত্রাস (!) বিরোধী যুদ্ধে শরিক হয়েছে। ফাঁকে পড়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ তার পোশাক শিল্প সম্পর্কেও কোন কথা বলতে পারেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সঙ্গে একমত হয়েছেন দু'বড় দলের দু'নেত্রী এ যুদ্ধে সহযোগিতা করতে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পেছনের শক্তি ছিল দেশের দু'টি দলের অনির্বাচিত দু'নেত্রী। আর দু'নেত্রীর ছিল নির্বাচনে জেতার তাড়া। তারা বুঝতে চেষ্টা করেননি যে, এ ব্যাপারে মতামত দিতে তাদের কেউ এখতিয়ার দেয়নি। কিন্তু তাদের নির্বাচনে হার-জিতের এবং তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নতজানু হতে বাধ্য করছে। আমরা বাংলাদেশও এখন যুদ্ধে।

জর্জ বুশ বলেছেন, এ যুদ্ধ ক'দিন চলবে তিনি জানেন না। এ যুদ্ধ নাকি ছড়িয়ে পড়তে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন দেশ জড়িয়ে পড়তে পারে। অস্ত্র বিক্রি বাড়তে পারে। এ যুদ্ধে এশিয়া খণ্ডে অনাক্রান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা জমবে। এ যুদ্ধশেষে হয়তো নির্ধারণ হবে কে আরও পরাক্রমশালী হবে- হবে পৃথিবীর অঘোষিত নিয়ন্তা।

আমাদের দেশে পণ্যমূল্য বাড়বে। কলকারখানা আরও বন্ধ হবে। পোশাক শিল্প মার খাবে। লাখ লাখ মানুষ বেকার হবে। বিপর্যস্ত হবে সাধারণ মানুষ। কারণ? পৃথিবীর সব সন্ত্রাসীকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী লাদেনকে ধরার অভিযানে নেমেছে। এরা আফগানিস্তানে বিকল্প সরকার গঠনের পরিকল্পনা করছে। গরু মেরে জুতা দানের মতো যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের মানুষকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করছে। কেউ কি ভেবেছেন

www.pathagar.com

এমন দেশে দেশে সরকার পরিবর্তনের ভূমিকা আগেও পালন করেছে আমেরিকা তাদের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র মাধ্যমে। তবে সে অভিযান ছিল গোপনে আড়ালে। এবার কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে নেমেছে গণতান্ত্রিক বলে পরিচিত রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতায়। আর এ যুদ্ধ ইরান বা ইরাকের সীমানা লংঘন করবে না এ নিশ্চয়তা কোথায়? তাহলে বিশ্ববাসী কি লাদেনকে ধরার নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পৃথিবীর যে কোন দেশে হামলা চালানোর অধিকার দিয়েছে? তাহলে এ যুদ্ধ তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বজয়ের যুদ্ধ। ❑

১৩ অক্টোবর '০১

লেখক : সাংবাদিক, রাজনীতিক।

এই শিশু জানেনা তার কি অপরাধ, এরই নাম ইনফিনিট জাষ্টিস।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস মোকাবেলার অজুহাতে আফগানিস্তানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের সামরিক হামলার স্বরূপ

বদরুদ্দীন উমর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী জোট ওসামা বিন লাদেন নামে জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং তৃতীয় বিশ্বে তাদের ওপর নির্ভরশীল অনেক রাষ্ট্র এই যুদ্ধকে নানাভাবে সাহায্য-সমর্থন করছে। শুধু তাই নয়, এই যুদ্ধকে বলা হয়েছে 'নতুন ধরনের এক বিশ্বযুদ্ধ!'

এক ব্যক্তি সে যতই শক্তিশালী হোক, যতই বড় সন্ত্রাসী হোক, যতই থাকুক বিভিন্ন দেশে তার সন্ত্রাসের বিস্তৃত জাল, তার বিরুদ্ধে এভাবে সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের যুদ্ধ ঘোষণা এক হাস্যকর ও কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার। কিন্তু যতই হাস্যকর ও কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এভাবেই ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার অব্যবহিত পরই নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী জোটের পক্ষ থেকে ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

এই যুদ্ধের যৌক্তিকতা হিসেবে তিনি বলেছেন যে, বিন লাদেন হল বিশ্বের সব থেকে বিপজ্জনক সন্ত্রাসী এবং তাকে শাস্তি দেয়া ও নিষ্ক্রিয় করা বিশ্বে শান্তি স্থাপন এবং মার্কিন Way of life বা জীবনধারা অব্যাহত রাখার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে বিমান হামলার পর সঙ্গে সঙ্গেই জর্জ বুশ বিন লাদেনকে এ ঘটনার জন্য দায়ী করেন। তাদের গোয়েন্দা বিভাগ সিআইএ এবং এফবিআই-এর পক্ষ থেকে যখন বলা হচ্ছে যে, এ কাজ কারা করেছে সেটা তারা জানে না এবং এ ব্যাপারে কোন তথ্য তাদের নেই তখন তাদের প্রেসিডেন্ট অবলীলাক্রমে কোন তথ্য-প্রমাণের তোয়াক্কা না করে লাদেনকেই 'সন্দেহভাজন' ও পরে 'প্রধান সন্দেহভাজন' ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে তোলপাড় করা প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন! শুধু প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তাই নয়, লাদেনকে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন এবং সেখান থেকে তিনি তার তৎপরতা জারি রেখেছেন এই অজুহাতে আফগান

www.pathagar.com

সরকারকে তিনি 'হুকুম' করেছেন লাদেনকে তাদের হাতে তুলে দিতে। এক্ষেত্রে আফগান সরকারের ধর্মান্ধ ইসলামী মৌলবাদী নেতা মোল্লা ওমরের বক্তব্য, মার্কিন জীবনধারার রক্ষক 'সুসভ্য' জর্জ বুশের থেকে যে অনেক বেশি যৌক্তিক এবং সভ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই- লাদেন যে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে ১১ সেপ্টেম্বরের বিমান হামলার জন্য দায়ী তার প্রমাণ দাও, আমরা তাকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করব। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এর জবাবে বলেছেন, এ নিয়ে কোন তথ্য-প্রমাণ দাখিলের অথবা আলোচনার সুযোগ নেই। এসব ছাড়াই তার হুকুম অনুযায়ী একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের সরকারকে কাজ করতে হবে।

আফগান সরকার সেভাবে কাজ করতে সম্মত না হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে তার পরম অনুগত সহযোগী মিলিতভাবে আফগানিস্তানের ওপর এক নিষ্ঠুর যুদ্ধ চালিয়ে দিয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বোমারু বিমান প্রত্যেক দিন কাবুল, কান্দাহার, হেরাত ও জালালাবাদে বিস্তর বোমাবর্ষণ করছে। আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরে অবস্থিত তাদের যুদ্ধ জাহাজগুলো থেকে মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র নিয়মিতভাবে নিক্ষেপ করছে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রামসফিল্ড ঘোষণা করেছেন, তারা এভাবে আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণ ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে সে দেশকে 'প্রস্তর যুগে' পাঠিয়ে দেবেন।

মার্কিন জীবনধারা বা Way of Life-এর কি করুণ অবস্থা! বিশ্বের সব থেকে সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিশালী দেশ হওয়া সত্ত্বেও নৈতিকতার দিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ধর্মান্ধ তালেবানদের দিক থেকেও অনেক নিম্নস্তরে এর থেকে তার বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? রামসফিল্ড আফগানদেরকে 'প্রস্তর যুগে' ফেরত পাঠাতে চান কিন্তু তারা নিজেরাই নৈতিকতার দিক দিয়ে প্রস্তর যুগের নৈতিকতার থেকে কোন উচ্চ পর্যায়ে নেই।

কিন্তু বিন লাদেনকে আফগানিস্তান আক্রমণ করে এবং তাকে প্রস্তর যুগে ফেরত পাঠিয়েই যে তারা ক্ষান্ত হবে এমন নয়। প্রেসিডেন্ট বুশ এবং তার বিদেশমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ঘোষণা করেছেন, এই যুদ্ধ আফগানিস্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। অন্য যেসব দেশ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেও এই আক্রমণ সম্প্রসারিত হবে! বুশ সাহেবদের থলের বিড়াল এভাবেই বেরিয়ে পড়েছে!! আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনের উদ্দেশ্যে তারা অন্য আরও দেশের ওপর সামরিক আক্রমণের চক্রান্ত ও পরিকল্পনা করছেন।

এই সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রগুলো কারা ? জর্জ বুশ ও তার সাম্রাজ্যবাদী সাঙ্গ-পাঙ্গদের মতে, এরা হল ইরাক, সুদান, ইরান, সোমালিয়া, লিবিয়া, লেবানন, এমন কি প্যালেস্টাইন। বিল ক্লিনটন সুদানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে সামরিক হামলা করার পরবর্তী ঘটনাবলী সুবিদিত। বিন লাদেনের মালিকানার কথা বলে তারা খার্তুমের এক বিরাট ওষুধ কারখানা (আল-শেফা) ধ্বংস করার পর প্রমাণিত হয়েছে তার মালিক বিন লাদেন নয়, ইদ্রিস নামে অন্য এক ব্যক্তি। তাছাড়া সে কারখানায় কোন রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির চিহ্ন মার্কিন বিশেষজ্ঞরাও খুঁজে পাননি। সেটা ছিল শুধুই ওষুধ কারখানা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত সুদান বুশ সাহেবদের সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত। তাদের এই তালিকায় ইসরাইলের নাম নেই! কারণ ইসরাইল হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরই বিশ্বের দুই নম্বর শক্তিশালী ও মারাত্মক সন্ত্রাসী রাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের

www.pathagar.com

স্বার্থের দীর্ঘদিনের পাহারাদার। তারা নিয়মিতভাবে সমগ্র আরব জনগণের ওপর- লেবানন, সিরিয়া, প্যালেস্টাইনের ওপর সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়ে এসেছে এবং এখনও লেবানন ও প্যালেস্টাইনের জনগণের বিরুদ্ধে হামলা করছে, প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে তার জন্য সকল প্রকার সন্ত্রাসী তৎপরতার আশ্রয় নিচ্ছে।

আফগানিস্তান বিন লাদেনের মতো একজন সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দিয়েছে এবং তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করতে সম্মত হচ্ছে না, এই অজুহাতে তারা আফগানিস্তানের ওপর নিষ্ঠুর সামরিক হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজে তাদের ফ্লোরিডা এবং অন্যান্য অঞ্চলে কিউবার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতায় নিযুক্ত নিকৃষ্ট সন্ত্রাসবাদীদেরকে আশ্রয়-প্রশ্রয়, অর্থ ও সামরিক সাহায্য দিচ্ছে, তাদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। নিকারাগুয়াতেও তারা এ কাজ করে সেখানকার বিপ্লবী সরকার উৎখাত করেছিল। এসবের অর্থ একটাই, 'জোর যার মুল্লুক তার'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যা ভাল, সারা বিশ্বের জন্য সেটাই ভাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে যা করা দরকার সেটাই মানবিক, সেটাই পরম নৈতিক! বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, ক্লিনটনের বিদেশমন্ত্রী অলব্রাইটকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তাদের অবরোধ ও বোমাবর্ষণের ফলে ইরাকে যে পাঁচ লাখ শিশুর মৃত্যু হয়েছে সেটা তারা কিভাবে বিচার করবেন ? জবাবে অলব্রাইট বলেছিলেন, তারা সামগ্রিকভাবে যে নীতির জন্য লড়াই করছেন তাতে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে করার কিছু নেই। এটা হল এক অপরিহার্য আনুষঙ্গিক ক্ষতি! এই হল প্রেসিডেন্ট বুশের 'মার্কিন জীবনধারা' American way of life-এর এক 'মহান' নিদর্শন!!

এই জীবনধারা শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, তাদের সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী জোটের। এই জীবনধারা রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তারা সারা বিশ্বের জনগণকে জিম্মি করে রেখেছে, এখন বিন লাদেনকে ধরার অজুহাতে আফগানিস্তানের ওপর সামরিক হামলা করছে এবং অন্যান্য দেশের ওপর বৃহত্তর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং আগ্রাসনের আসল লক্ষ্য হল, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের তেলসম্পদ, তাদের অর্জিত অর্থসম্পদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন। শুধু মধ্যপ্রাচ্যের নয়, তুর্কমেনিস্তানের মজুদ তেল ইরানের পরিবর্তে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে যাতে নামিয়ে আনা যায় তারও এক চক্রান্ত। বিন লাদেনকে ধরার থেকে তেলের ওপর এই দখলকারী স্থাপনই আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক হামলার মূল কারণ। এ কারণেই তারা চায় আফগানিস্তানে তাদের এমন এক তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করতে যার মাধ্যমে তারা গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন ও নিজেদের তেলের স্বার্থ হাসিল করতে পারে। এ ব্যাপারেও তাদের বক্তব্য খুব নগ্ন। আফগানিস্তান বিন লাদেনকে তাদের হাতে তুলে দিলেও তারা সেখানে তাদের হামলা অব্যাহত রাখবে এবং বিদ্যমান সরকারকে উৎখাত করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীরা যতই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতার নামে তাদের নতুন ধরনের এই 'বিশ্বযুদ্ধের' পরিকল্পনা করুক এবং তাদের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন নিরাপত্তা পরিষদকে দিয়ে একের পর এক প্রস্তাব পাস করুক তাদের এই যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন বিরুদ্ধ। বাংলাদেশসহ নিরাপত্তা পরিষদের

www.pathagar.com

স্থায়ী এবং অস্থায়ী পনেরো সদস্য সর্বসম্মতিক্রমে এসব প্রস্তাব পাস করলেও এ মাসের (অক্টোবর ২০০১) প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেষণে তারা এই যুদ্ধের পক্ষে কোনো প্রস্তাব পাস করাতে পারেনি। ১৮৯ দেশের ১৫৬ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে বক্তব্য উপস্থিত করে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করলেও সেখানে নিরাপত্তা পরিষদের মতো আঞ্চলিক সন্ত্রাস এবং আফগানিস্তানের ওপর চলমান সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের পক্ষে কোন প্রস্তাব পাস করাতে সক্ষম হয়নি। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের কোন সংজ্ঞা নিরূপণ করাও সম্ভব হয়নি। কারণ মার্কিনসহ অন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো সন্ত্রাসবাদের যে সংজ্ঞা উপস্থিত করেছে তার অর্থ দাঁড়ায় তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেসব রাষ্ট্র দাঁড়ায় অথবা অল্পবিস্তর তাদের স্বার্থের বিরোধিতা করে তারাই সন্ত্রাসী রাষ্ট্র! এই 'সংজ্ঞা' অন্যদের কাছে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য হওয়ায় শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তানে হামলাসহ ভবিষ্যত অন্য দেশের ওপর তাদের হামলার পক্ষে কোন প্রস্তাব পাস জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সম্ভব হয়নি। সাধারণভাবে জাতিসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদানত হলেও এক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতা তাদের নৈতিক ও যৌক্তিক অবস্থানের চরম দুর্বলতাই নির্দেশ করে।

বিশ্বের দেশে দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উন্মোচন করে এবং আফগানিস্তানে তাদের সামরিক হামলার বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে এবং তা ক্রমশ সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী হচ্ছে ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ার অসংখ্য রাজধানী এবং অন্যান্য অঞ্চলে প্রতিদিনই এই বিক্ষোভ হচ্ছে। এই পর্যায়ে আফগানিস্তানের ওপর হামলার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ সংগঠিত হলেও এগুলো সাধারণভাবে বিশ্বের দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, জি-৮ ইত্যাদির বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বিভিন্ন শহরে যে লাখ লাখ মানুষ সমবেত হয়ে তাদের বৈঠকগুলো ঘেরাও করেছিলেন তার সঙ্গেও বর্তমানে আফগানিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণবিরোধী বিক্ষোভগুলো একই সূত্রে গ্রথিত।

বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই সংগ্রাম বিচ্ছিন্নভাবে হলেও কোন শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন এখানে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এর প্রথম কারণ রাজনৈতিক দলগুলো অর্থাৎ বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক ওই বিক্ষোভ সংগঠিত করার কোন দায়িত্ব না নিয়ে সে দায়িত্ব কয়েকজন অরাজনৈতিক নির্দলীয় ব্যক্তির ওপর ছেড়ে দেয়া। দ্বিতীয়ত, এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক আফগানিস্তানের ওপর সামরিক হামলা এবং আফগানিস্তানের ধর্মীয় মৌলবাদী তালেবানদের তৎপরতাকে এক করে, অর্থাৎ তুল্যমূল্য করে, তাদের উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলে, সমগ্র বিশ্বের আন্দোলনের ধার নষ্ট করে তাকে ভোঁতা করে দেয়া। এই প্রচেষ্টাকে নিরীহ মনে করার কারণ নেই। উপরন্তু এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমেরিকানরা বাংলাদেশে বসে বসে ঘাস খাচ্ছে না। আমরা বরাবরই ধর্মের রাজনৈতিক ব্যাপারে, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিরোধিতা করে এসেছি। আফগানিস্তানের তালেবানরা কি জিনিস সেটাও আমরা জানি। ওসামা বিন লাদেন যে একজন সন্ত্রাসী সেটাও আমাদের অজানা নেই। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার জোট কর্তৃক আফগানিস্তানের ওপর হামলা এবং তালেবানদের মৌলবাদী তৎপরতাকে

www.pathagar.com

এক করে দেখা এক চরম রাজনৈতিক মূর্খতা অথবা দুরভিসন্ধিমূলক ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছু নয়। বিশ্বে দেশে দেশে এমন কি পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা এবং অন্যান্য অঞ্চলে বিশাল আকারে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হচ্ছে। এই বিক্ষোভের সময় তারা এই দুইকে গুলিয়ে ফেলে কোন কর্মসূচি পালন করছে না। এ ধরনের উদ্ভট চিন্তা অন্য কোথাও নেই।

আমাদের এই বাংলাদেশেও আফগানিস্তানের ওপর সামরিক হামলা থেকে নিয়ে আরও ব্যাপকতর হামলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করার সময় সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলামী মৌলবাদকে একেবারে পৃথক করেই দেখতে হবে। অন্যথায় আমরা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারণার শিকার হয়ে এক উদ্ভট পরিস্থিতিই সৃষ্টি করব, কোন প্রকৃত আন্দোলন সংগঠিত করার ধারে-কাছেও যেতে পারব না। ❑

১৫ অক্টোবর '০১

লেখক ঃ বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, কলামিষ্ট।

লাশ কোলে হতভাগ্য অভিভাবক।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন হিসাবেই প্রতিরোধ করতে হবে

(দুই)

১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে বিমান হামলার পরবর্তী পর্যায়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ আফগানিস্তানে সামরিক হামলা শুরু করে তাকে আখ্যায়িত করেছিলেন 'অনন্ত ন্যায়বিচার' বা 'Infinite Justice'- এর জন্য যুদ্ধ হিসাবে! তার 'অনন্ত ন্যায়বিচারের' জন্য এই যুদ্ধ আবার ছিল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অপর নাম!! ইসলামী ধর্মমত অনুযায়ী 'অনন্ত ন্যায়বিচারের' মালিক একমাত্র আল্লাহ। কাজেই মুসলিম জনগণের মধ্যে এই নামকরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে তাড়াতাড়ি নাম পরিবর্তন করে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের' বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধকে বুশ সাহেব 'স্থায়ী স্বাধীনতা' বা 'Enduring Freedom' নামে নোতুন আখ্যায় ভূষিত করেন!

'অনন্ত ন্যায়বিচার' অথবা 'স্থায়ী স্বাধীনতা' যে নামেই জর্জ বুশদের কথিত 'বিশ্বযুদ্ধ'কে আখ্যায়িত করা হোক এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস নির্মূলকে এর লক্ষ্য হিসাবে নির্দেশ করা হোক এ যুদ্ধের সঙ্গে 'অনন্ত ন্যায়বিচার' 'স্থায়ী স্বাধীনতা' অথবা 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ' নির্মূলের কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে অন্য অঘোষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের। সে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ তেল ক্ষেত্রগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং সেখানকার তেলসম্পদ অবাধে লুণ্ঠনের জন্য অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি। সমগ্র বিশ্বের ওপর তাদের দখল ও হুকুমদারি অধিকতর শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই যুদ্ধকে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এক 'নোতুন বিশ্বযুদ্ধ' হিসাবেও আখ্যায়িত করেছেন। এই যুদ্ধকে তিনি প্রথমদিকে ইসলামী মৌলবাদের বিরুদ্ধে এক 'ক্রুসেড' বা খ্রিস্টান ধর্মযুদ্ধ আখ্যাতেও ভূষিত করেন। কিন্তু পোপ জন পলসহ অনেক খ্রিস্টান এই আখ্যার বিরোধিতা করায় পরবর্তী পর্যায়ে একে 'ক্রুসেড' নামে অভিহিত করা থেকে জর্জ বুশ বিরত থাকেন। এছাড়া এভাবে 'ক্রুসেড' ঘোষণার পর মুসলিম জনগণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে তারা ইসলামকে এক মহান ধর্ম হিসাবে বর্ণনা করে বলেন যে, তাদের যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে নয়! এ যুদ্ধ ইসলামী

www.pathagar.com

মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে!! ইসলামী মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ভাল কথা। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এর সঙ্গে ইসলামী মৌলবাদীদের কোন সম্পর্ক নেই। মধ্যপ্রাচ্য এবং পূর্ব, উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় অনেকগুলো ইসলামী মৌলবাদী দেশ আছে যার মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্ট হল সউদী আরব, কুয়েত ও আরব-আমিরাত। এই নিকৃষ্টতম ইসলামী দেশগুলোর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুধু যে শক্রতা নেই তা নয়, এগুলোই হল মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে তাদের সব থেকে বড় মিত্র ও নির্ভরযোগ্য দেশ। যে দেশগুলোর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক খুব খারাপ অথবা শক্রতামূলক সেগুলো হল ইরাক, ইরান, সুদান, সোমালিয়া, সিরিয়া ও লিবিয়া। এ দেশগুলোর প্রত্যেকটিই হল তেল-গ্যাস সমৃদ্ধ দেশ।

তেল-গ্যাস সমৃদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিজেদের তেল-গ্যাস সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে দিয়ে তাদের দ্বারা জনগণের সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করেছে তাদের সঙ্গে সামাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার নেতৃত্বাধীন জোটের কোন বিরোধ ও শক্রতা নেই। তারা হল সাম্রাজ্যবাদের পরম মিত্র। অন্যদিকে যেসব দেশ নিজেদের তেল ও গ্যাসসম্পদ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এবং রাখার পক্ষপাতী তাদের সঙ্গেই মার্কিনের দ্বন্দ্ব ও শক্রতার সম্পর্ক।

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদবিরোধী 'বিশ্বযুদ্ধের' নোতুন পরিস্থিতিতে এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন খুব বেশি। কারণ পরিস্থিতির এ দিকটি বিবেচনার মধ্যে রাখলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের স্বরূপ বোঝার কোন অসুবিধা হবে না। এবং সেই সঙ্গে প্রকৃত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী শক্তি কে ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল না অন্য কেউ সেটাও বোঝার সুবিধা হবে।

এক্ষেত্রে যে আফগানিস্তানের ওপর ইঙ্গ-মার্কিন জোট যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সে দেশটিতে মার্কিন নীতির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ও পর্যালোচনা পরিস্থিতির আসল চরিত্রের সঙ্গে পরিচিতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭৩ সালে দাউদ সরকার উৎখাত হয় এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় এক সোভিয়েতপন্থী সরকার যার নেতৃত্বে থাকেন তারাকী, হাফিজুল্লাহ আমীন, বাবরাক কারমাল প্রভৃতি। পরে অনেক অভ্যন্তরীণ দলাদলি ও চক্রান্তের মধ্য দিয়ে ১৯৭৯ সালে বাবরাক কারমাল সোভিয়েত ইউনিয়নের খাস লোক হিসাবে সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এর জন্য সোভিয়েত সামরিক বাহিনীকে সরাসরি আফগানিস্তান আক্রমণ করে সে দেশের ওপর নিজেদের সামরিক নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব স্থাপন করতে হয়।

আফগানিস্তানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই অবস্থান মার্কিন স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় তারা সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জাতিসংঘকে কাজে লাগায় এবং সব রকম সম্ভাব্য উপায়ে তাদের উৎখাতের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আফগান মোল্লাতন্ত্রকে ব্যবহার করে তাদের মাধ্যমে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে এক ব্যাপক সোভিয়েত-বিরোধী যুদ্ধ সংঘটিত করা। সেই যুদ্ধে মার্কিনের প্রধান সহযোগী ছিল পাকিস্তান এবং চীন।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই সেই সময় থেকে দ্রুত পরিণত হয় এক দৈত্য সংস্থায়। মূলত তাদের মাধ্যমেই সোভিয়েতবিরোধী আফগান যুদ্ধ সংঘটিত ও পরিচালনা করা হয়। বাবরাক কারমালের সোভিয়েতপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে পুশতুন, উজবেক, কাজিক ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর মোল্লাতান্ত্রিক উপাদানের নেতৃত্বে এক ধরনের ইসলামী মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ ১০ বছর চলার পর সোভিয়েত বাহিনী পরাজিত হয়ে আফগানিস্তান পরিত্যাগ করে এবং শীঘ্রই বোরহানউদ্দীন রাব্বানী ও গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন হয় এক ইসলামী মৌলবাদী সরকার। আফগানিস্তানের সেই ধর্মীয় মৌলবাদী সরকারের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন বিরোধ তো ছিলই না, উপরন্তু তারা ছিল সেই সরকারের খুব শক্তিশালী পরোক্ষ প্রতিষ্ঠাতা যারা বড় আকারে অর্থ অস্ত্র সরবরাহ করে ও সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সেই মোল্লাতান্ত্রিক শক্তির বিজয়ের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত সৃষ্টি করেছিল।

এইভাবে রাব্বানী সরকার প্রতিষ্ঠার পর আফগানিস্তানে পাকিস্তান সমর্থিত ওয়াহাবী পুশতুন এবং ইরান সমর্থিত শিয়া, হাযারী, উজবেক, তাজিক ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে নোতুনভাবে সংঘর্ষ শুরু হয়। আফগানিস্তানে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান প্রথমোক্তদের পক্ষ গ্রহণ করে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কারণ আফগানিস্তানে ইরানী প্রভাব ও আধিপত্য আমেরিকানদের জন্য খুব অসুবিধাজনক ছিল।

পাকিস্তানের পেশোয়ার ও কোয়েটা অঞ্চলে জামিয়াতে-উলামা-এ ইসলামের দ্বারা পরিচালিত মাদ্রাসাগুলোতে আফগান ছাত্রদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে সেই শিক্ষার্থী বা তালেবানদের দিয়ে পাকিস্তানের আইএসআই গঠন করে তালেবান বাহিনী। সে সময় ওসামা বিন লাদেন বেশ কিছুদিন পেশোয়ারে নিজের ঘাঁটি গেড়ে থেকে তালেবান এবং নিজের আল-কায়েদা গ্রুপের লোকদের প্রশিক্ষণ দেন। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের আইএসআই-এর ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। মোল্লা মুহম্মদ ওমর-এর নেতৃত্বে এই তালেবানরা বোরহানউদ্দীন ও গুলবুদ্দীনের সরকার উচ্ছেদ করে ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন হয়। তালেবানরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের মাধ্যমে পাকিস্তান আফগানিস্তানের ওপর এমন আধিপত্য বিস্তার করে রাখে যা ছিল এ দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রমী ব্যাপার।

এই আফগান যুদ্ধের সঙ্গে পাকিস্তানের আইএসআই সরাসরি যুক্ত থাকলেও তাদের পেছনে ছিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ। প্রকৃতপক্ষে সিআইএ ছিল আইএসআই-এর স্রষ্টা ও সংগঠক। সেই সঙ্গে তার অর্থ, অস্ত্র, সামরিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির যোগানদার। আফগানিস্তানে পূর্ববর্তী মোল্লাতান্ত্রিক শাসনে ইরানের যে প্রভাব ছিল সেটা তালেবান আমলে আর থাকেনি। এ কারণে তালেবান সরকার-এর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কও আগের যে কোন সরকারের থেকে ভাল ছিল। তালেবানরা আফগানিস্তানে নিম্নপর্যায়ের যে ফ্যাসিস্ট শাসন বলবৎ করে এবং নারীদের ওপর যে নির্যাতন চালায় সেটা নিয়ে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও তার প্রশাসনের কোন মাথাব্যথা ছিল না! উপরন্তু আফগানিস্তানে সে সব কিছুর সঙ্গেই ছিল আমেরিকানদের সহাবস্থান!! অবশ্য মার্কিন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অবস্থান এ রকম হলেও মার্কিন জনগণের

www.pathagar.com

একাংশের মধ্যে তালেবান বিরোধিতা ছিল। বিশেষ করে আমেরিকান নারীবাদী সংস্থাগুলো ছিল একেবারে তালেবানবিরোধী এবং তাদের বিরোধিতার কারণেই মার্কিন তেল কোম্পানি ইউনোকল আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে পাইপ লাইনে তুর্কমেনিস্তানের তেল পাকিস্তানের দিকে নামিয়ে নেয়ার যে চুক্তির ব্যবস্থা করছিল সেটা কার্যকর করা আর তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯৬ সালে ধর্মীয় ফ্যাসিস্ট ও চরম নিপীড়ক তালেবান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের কোন দ্বন্দ্ব ছিল না! ওসামা বিন লাদেন ১৯৯৬ সাল থেকে আফগানিস্তানে আশ্রয় নিয়ে থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে কোন প্রকার সন্ত্রাসী বলেও আমেরিকানদের মনে হয়নি!! কাজেই শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই নয়, আফগানিস্তানেও ইসলামী মৌলবাদীদের সঙ্গে সহাবস্থানে মার্কিন প্রশাসনের কোন অসুবিধা হয়নি!!!

এসব থেকে বোঝার অসুবিধা একবারেই নেই যে, বর্তমানে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আফগানিস্তানের ওপর যে সামরিক হামলা পরিচালনা করছে তার সঙ্গে ইসলামী মৌলবাদ বিরোধিতা এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নির্মূলীকরণের কোন সম্পর্ক নেই। ১১ সেপ্টেম্বরের পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে এমন এক তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধে নেমেছে যারা ক্ষমতায় থাকলে ওই অঞ্চলের ওপর তাদের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং ক্যাস্পিয়ান সাগর অঞ্চল, বিশেষত তুর্কমেনিস্তান থেকে তেলের পাইপ আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত নিয়ে আসার পক্ষে সকল বাধা দূরীভূত হয়।

মধ্যপ্রাচ্য এবং যেসব অঞ্চলের উল্লেখ উপরে করা হয়েছে সেখানে তেল স্বার্থকে বাদ দিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির চিন্তা করা সম্পূর্ণ এক অবাস্তব ব্যাপার। সেভাবে চিন্তা করলে কারও পক্ষে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির আসল চরিত্র বুঝে ওঠা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু সাধারণভাবে সেই ধরনের বিভ্রান্তির অবস্থা সৃষ্টির জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক, সোমালিয়া, সুদান ও আফগানিস্তান প্রত্যেকটি দেশে যে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে আসছে তাকে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিরোধী' 'ইসলামী মৌলবাদ বিরোধী' 'গণতন্ত্র রক্ষা'র যুদ্ধ ইত্যাদি নামে অভিহিত করে তাদের নিয়ন্ত্রিত বিশ্বজোড়া প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার সঙ্গে বিন লাদেনের সম্পর্ক বিষয়ে কোন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাই কোন প্রমাণ পায়নি। সে জন্য প্রমাণ উপস্থিত করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে জর্জ বুশ প্রথম দিন থেকেই লাদেনকে 'সন্দেহভাজন' 'প্রধান সন্দেহ ভাজন' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং তার আশ্রয়দাতা হিসাবে আফগানিস্তানের ওপর সামরিক হামলা করেছেন।

লাদেনের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারার বিষয়টি যেভাবে এই পরিস্থিতিতে গুরুত্ব পাওয়া দরকার ছিল সেভাবে তা কোন গুরুত্বই লাভ করেনি। সেটা হলে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা যে 'ইসলামী মৌলবাদী' অথবা 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের' বিরুদ্ধে নয়, এ সত্য খুব সহজেই ধরা পড়ত।

যথাযথভাবে পুরো পরিস্থিতিটি বিশ্লেষণ না করার কারণে আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক

www.pathagar.com

হামলার বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করছেন তাদের একটা বড় অংশের মধ্যে এ নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

এই বিভ্রান্তি এখন অন্য কারণে নতুন করে সৃষ্টির ব্যবস্থা স্বয়ং ওসামা বিন লাদেনই করেছেন। ১১ নভেম্বর ২০০১ তারিখে লন্ডনের 'সানডে টেলিগ্রাফ' পত্রিকাতে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বিন লাদেন এখন নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তার গ্রুপ আল-কায়েদাই নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনের ওপর ১১ সেপ্টেম্বর বিমান হামলা করেছে। চৌদ্দ দিন আগে ধারণকৃত এই ভিডিও সাক্ষাৎকার লাদেনের সমর্থকদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল যাতে লাদেন নাকি একথা নিজেই স্বীকার করেছেন বলে পত্রিকাটি উল্লেখ করেছে।

সেটা যদি হয় তাহলেও সে কাজের সঙ্গে ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়েদা গ্রুপের সরাসরি কোন সম্পর্ক ছিল এমন মনে করার কারণ নেই। মাত্র কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের এক সাংবাদিককে লাদেন যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এবং যার রিপোর্ট পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাতেও তিনি ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার সঙ্গে নিজের লিপ্ততার কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি চৌদ্দ দিন আগে উপরোক্ত ভিডিও সাক্ষাৎকারে যদি নিজের লিপ্ততার কথা বলেন, তাহলে একথা অবশ্যই একটি প্রমাণিত সত্য হিসাবে ধরে নিতে হবে যে, ওসামা বিন লাদেন এক কথায় মিথ্যাবাদী। কারণ ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার সঙ্গে তার লিপ্ততার ব্যাপারে সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী দুই বক্তব্য একসঙ্গে সত্য হতে পারে না। তার যে কোন একটি মিথ্যা।

প্রথমটির থেকে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ তাদের লিপ্ত থাকার কথাটি মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা ষোলআনা। ভিডিও সাক্ষাৎকারের নিজের লিপ্ততার কথা বলে থাকলে সেটা প্রকৃতপক্ষে কোন 'স্বীকৃতি' নয়। সেটা হল এক বড় মাপের হামবাগ কথাবার্তা যা তিনি বাহাদুরির জন্য বলেছেন। তিনি এটা বলে থাকতে পারেন এমন এক উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যেখানে তার এ কাজ করা না করার ওপর আফগানবিরোধী যুদ্ধ আর নির্ভরশীল নয়। কাজেই এ ধরনের দাবি হঠাৎ করে উপস্থিত করে তিনি ভক্তবৃন্দের কাছে নিজের বাহাদুরি জাহির করার চেষ্টাও করে থাকতে পারেন। তবে ইতিপূর্বে ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে লাদেন চারটি ভিডিও সাক্ষাৎকারের প্রত্যেকটিতেই ওই দিনের ঘটনার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক ও লিপ্ততার কথা জোরের সঙ্গেই অস্বীকার করে এসেছেন। তার এই অস্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে মোল্লা ওমরও আমেরিকায় বিমান হামলার সঙ্গে ওসামা বিন লাদেনের সম্পর্ক না থাকার কথা বলেছেন।

প্রথমে অস্বীকার করে পরে তার উল্টো কথা বলে ভক্তবৃন্দের মাঝে বাহাদুরি নেয়া যেতে পারলেও এর দ্বারা বিন লাদেন একজন বড় মাপের প্রমাণিত মিথ্যাবাদীরূপে পরিচিত হবেন। এর ফলে ভক্ত ও সমর্থকদের কাছে যে তার নৈতিক চরিত্রের মাপও অসম্ভব ছোট হয়ে দাঁড়াবে তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই এই পঞ্চম ভিডিও সাক্ষাৎকার কতখানি সত্য ব্যাপার সেই সাধারণভাবে টেলিভিশনে প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত বলা মুশকিল। বিশেষত এ কারণে যে, তার পূর্ববর্তী চারটি ভিডিও সাক্ষাৎকারেই কুয়েতের আল-জাজিরা টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হলেও এ সাক্ষাৎকারটি সেভাবে এ পর্যন্ত প্রচারিত হয়নি।

এ প্রসঙ্গে সব থেকে বড় বিবেচনার বিষয় এই যে, এখন বিন লাদেন ১১ সেপ্টেম্বরের

www.pathagar.com

ঘটনার সঙ্গে নিজের লিপ্ততার কথা বললেও এ পর্যন্ত মার্কিন প্রশাসনের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কোন প্রমাণ বের করা তাদের গোয়েন্দা বিভাগগুলোর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই বিন লাদেনকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং আফগানিস্তানকে তার আশ্রয়দাতা হিসাবে একই পদের শত্রু বিবেচনা করে আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে এবং সেখানে নিজেদের পরম অনুগত এক সরকার গঠন করতে নিযুক্ত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী জোট এবং পাকিস্তান, ভারত প্রভৃতির মতো তাদের মক্কেল রাষ্ট্রগুলো যে যুদ্ধ আফগানিস্তানে শুরু করেছে এবং যে যুদ্ধ আরও সম্প্রসারিত করার হুমকি দিচ্ছে তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ অথবা ইসলামী মৌলবাদ মোকাবেলার কোনই সম্পর্ক নেই, নিজেদের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আড়াল করার জন্যই তারা এ দুইয়ের হুজুগ তুলেছে।

এই হুজুগের সঙ্গে বাংলাদেশেও দুই ধরনের লোক সম্পর্কিত হয়েছে। প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ ও ইসলামী মৌলবাদকেই এর জন্য দায়ী করে আরও যা বলা হচ্ছে তার দ্বারা বিভ্রান্ত লোকজন। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নানা যোগসূত্রে সম্পর্কিত এবং তাদের দ্বারা রাজনৈতিকভাবে এবং অন্যভাবে প্রতিপালিত লোকজন। দ্বিতীয় ধরনের লোকজনের সঙ্গে এ নিয়ে কোন যুক্তিসঙ্গত আলোচনা অথবা কথাবার্তা অর্থহীন ও নিষ্ফল। কিন্তু প্রথমোক্ত লোকজন যারা সৎভাবেই বিভ্রান্ত তাদের এ বিষয়টি ভালভাবে বোঝানোর প্রয়োজন বর্তমান পরিস্থিতিতে খুব জরুরি। কারণ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন হিসাবেই প্রতিরোধ করতে হবে।

এই জরুরি কর্তব্য পালন সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির জন্য অপরিহার্য। ❑

১২-১১-২০০১

www.pathagar.com

সন্ত্রাসবাদ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ

(তিন)

১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে বিমান হামলার পর থেকে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে অনেক কথাবার্তা ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার জন্য অনেক পদক্ষেপ দুনিয়া জুড়ে শুরু হয়েছে। এসব কথাবার্তা ও পদক্ষেপের কেন্দ্রস্থলে রয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশ, তার প্রশাসন ও তাদের পশ্চিমা মিত্রশক্তিসমূহ।

প্রথম থেকেই কোন তথ্য-প্রমাণ ছাড়া ওসামা বিন লাদেনকে তারা ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার 'প্রধান সন্দেহভাজন' বলে ঘোষণা দিয়ে সন্ত্রাসবাদ দমনের এক মহাকর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। তাদের এই কর্মসূচির প্রধান দিক হল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা কারা করেছে এ ব্যাপারে কোন তথ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারলেও অথবা যারা এ কাজ করেছে তাদের চিহ্নিত করার পর সেটা প্রকাশ্যে উপস্থিত করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সম্ভব না হলেও, এই পরিস্থিতির সুযোগ তারা পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী বোমা হামলার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোটকে সঙ্গে নিয়ে আফগানিস্তানের ওপর শুরু করেছে রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় এক ব্যাপক বোমা হামলা।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজকের দুনিয়ায় সব থেকে বড় ও বিপজ্জনক সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় এবং তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বেপরোয়াভাবে তার সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে যাওয়ার কারণ শুধু একটি-দু'টি দেশের জনগণই নয়, অসংখ্য দেশের জনগণ তাদের বিরুদ্ধে। তাদের সকলেরই সব থেকে বড় আন্তর্জাতিক শত্রু হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কাজেই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ আছে এবং অনেক দেশেই তাদের দূতাবাসসহ বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর ওপর সশস্ত্র হামলা জারি আছে। এ সব হামলাই হল মার্কিন হামলার প্রতিক্রিয়া। এই হামলার শর্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে নিজেরাই সৃষ্টি করেছে।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনের অজুহাত দেখিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে সামরিক হামলা করলেও তাদের এ হামলা যে আফগানিস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না এটা

www.pathagar.com

তারা প্রথম থেকেই বারবার ঘোষণা করছে। কারণ ওসামা বিন লাদেনের আল কায়েদা গ্রুপ আফগানিস্তানের বাইরে অনেক দেশে ছড়িয়ে আছে, কাজেই তাদের শায়েস্তা করার জন্য অন্যান্য দেশের ওপরও হামলা করা প্রয়োজন। যে সব দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সামরিক হামলা এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক শাস্তির তালিকায় এ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে সেগুলো সবই হল তাদের অবাধ্য রাষ্ট্র-ইরাক, ইরান, সিরিয়া, সুদান, সোমালিয়া, লিবিয়া, উত্তর কোরিয়া, ইত্যাদি। কাজেই প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসবাদ দমনের সঙ্গে এই সম্ভাব্য মার্কিন সামরিক হামলার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে সেই সব দেশে তেল-গ্যাসসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রকম অর্থনৈতিক স্বার্থের, এক কথায় তাদের লুণ্ঠন স্বার্থের।

১১ সেপ্টেম্বরের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের যুদ্ধজোট যেভাবে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'বিশ্বযুদ্ধ' ঘোষণা করেছে তার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে অন্য অনেক দেশই নিজেরা অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে সন্ত্রাসবিরোধী আইন নতুনভাবে প্রণয়ন ও জারি করে নিজেদের দেশে তাদের প্রতিপক্ষকে সশস্ত্রভাবে আক্রমণ ও জব্দ করার প্রস্তুতি শুরু করেছে। এই সব দেশের মধ্যে আমাদের প্রতিবেশী ভারতের চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মীয় ফ্যাসিস্টদের বিজেপি সরকার একেবারে প্রথম সারিতে।

বিগত অক্টোবর মাসে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের মন্ত্রিসভা সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার জন্য একটি আইনের (Prevention of Terrorism Ordinance. POTO 2001) খসড়া অনুমোদন করেছ। ১৭ নভেম্বর ভারতের ২৮টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ি বলেন যে, ভারত সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে তালিকার শীর্ষে আছে কিন্তু সে আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই তার জন্য প্রয়োজন নতুন আইন। তিনি কাশ্মীর এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর উল্লেখ করে বলেন যে, ওই সব রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা করছে, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া দরকার। তিনি বলেন, ১১ সেপ্টেম্বরের পর অনেক দেশই সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ভারতের বামপন্থী দলসমূহ এবং কংগ্রেস বাজপেয়ি সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত সন্ত্রাসবাদবিরোধী এই আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করছে। তাদের বক্তব্য হল, বিশ্ব পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিজেপি সরকার কুখ্যাত Terrorist and Disruptive Activities (TADA) নোতুন নামে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে এবং POTO হল এরই নতুন সংস্করণ। ১৯৯৫ সালে টাডা-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন'-এর প্রবল বিরোধিতার মুখে সেই দানবীয় আইনটির নবায়ন আর সম্ভব হয়নি। এখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে এবং ভারত-মার্কিন সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হওয়ার কারণে বিজেপি TADA-এর অভাব POTO-এর দ্বারা পূরণ করার চেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছে।

এই প্রস্তাবিত আইনের আসল লক্ষ্য হল, কাশ্মীর এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণের ওপর আরও নিষ্ঠুর ও বড় আকারে সশস্ত্র হামলা পরিচালনা করা। এ ব্যাপারে সহায়তার জন্য হাত বাড়িয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তারা ভারতের এই অবস্থার সুযোগ

www.pathagar.com

নিয়ে এখন তাদের সঙ্গে এক দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কাশ্মীর এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যা ঘটছে তার জন্য জাতিগত নিপীড়নকারী কেন্দ্রীয় ভারত সরকারই দায়ী। তারা প্রথম থেকেই এ সব অঞ্চলের জনগণের ওপর যে বিরামহীন নিপীড়ন চালিয়ে আসছে তার প্রতিক্রিয়াতেই উত্তরের রাজ্যগুলোতে ব্যাপক আকারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হচ্ছে। এ সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের সশস্ত্র হামলা ও নির্যাতনের প্রতিক্রিয়াতেই সরকারের বিরুদ্ধেও সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। কাজেই এগুলোকে সন্ত্রাসবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করার কোন যৌক্তিকতা অথবা গ্রাহ্যতা নেই।

কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ভারত সরকার যা করছে তার থেকে বিশুদ্ধতম সন্ত্রাসবাদ আর কিছুই নেই। এ রাজ্যের জনগণ ১৯৪৭ সাল থেকেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং ভারত ও পাকিস্তান সরকারের বিবিধ রকম চক্রান্তের শিকার হয়ে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময়ব্যাপী চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছে। কাশ্মীরকে জবরদস্তিমূলকভাবে ভারত ও পাকিস্তান নিজেদের অধিকারভুক্ত দেশ হিসাবে দাবি করে প্রত্যেকেই তার অংশ বিশেষ দখল করে আছে। এরা উভয়ই হল কাশ্মীরে দখলদারী শক্তি। কাশ্মীরের জনগণ আসলে ভারত ও পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রেরই অঙ্গরাজ্য হিসাবে না থেকে কাশ্মীরকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই দাবি করে আসছেন। তার জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সেখানে গণভোটেরও প্রস্তাব জাতিসংঘে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু নেহেরুর কংগ্রেস সরকার তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও অল্পদিনের মধ্যেই সামরিক হামলা চালিয়ে কাশ্মীর দখল করার পর গণভোটের বিষয়টি শিকেয় তুলে সেখানে নিজেদের সম্পূর্ণ অবৈধ দখল কায়েম করেছে এবং সে দখলদারী তাদের এখনও আছে। কাজেই কাশ্মীরে ভারত সরকার জবরদস্তিমূলকভাবে নিজেদের দখল কায়েম রাখার জন্য সশস্ত্রভাবে জনগণের ওপর চেপে বসে আছে এবং তাদের ওপর নিয়মিত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারত সরকারই হল কাশ্মীরে সব থেকে বড় সন্ত্রাসবাদী শক্তি এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেই তারা এই সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাশ্মীরী জনগণ যে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম করছেন তার ওপর সশস্ত্র হামলার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই সেখানে দেখা দিয়েছে সশস্ত্র সংগ্রাম। কাজেই কাশ্মীরে যা হচ্ছে তাকে সন্ত্রাসবাদ হিসাবেই আখ্যায়িত করা পুঁজিবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শয়তানি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আসলে কাশ্মীরে স্বাধীনতার যে লড়াই হচ্ছে তার সঙ্গে মুসলমানিত্ব বা সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্ক নেই। এই সম্পর্ক ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই নিজেদের স্বার্থে কাশ্মীরী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার আন্দোলনের ওপর আরোপ করেছে। কাশ্মীর মুসলমান প্রধান অঞ্চল কাজেই সেটা পাকিস্তানের মধ্যে আনা দরকার, এই যুক্তি দেখিয়ে পাকিস্তান সেখানকার স্বাধীনতা আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করছে এবং সেখানকার কিছু ধর্মীয় সংগঠনকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করছে এবং নিজেদের সশস্ত্র বাহিনীর লোকদেরও সেখানে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভারত সরকারও কাশ্মীরী জনগণের স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনকে পাকিস্তানি এজেন্টদের কাজ এবং সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে সেখানে নির্বাচিত সরকারের আড়ালে এক সামরিক শাসন জারি রেখেছে এবং নিয়মিতভাবে সেখানে কাশ্মীরীদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিরাট সংখ্যায়

www.pathagar.com

হত্যা করছে এবং অন্য নানাভাবে তাদের ওপর নির্যাতন জারি রেখেছে। এখন POTO নামক এক নতুন 'সন্ত্রাসবিরোধী' আইন পাস করে তারা কাশ্মীরী জনগণের ওপর নতুন উদ্যমে আরও কঠিন হামলা পরিচালনার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সম্পর্কেও এই একই কথা। নাগা, মিজো ইত্যাদি জাতি বরাবরই ছিল অভারতীয় স্বাধীন জাতি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের ওপর সামরিক আক্রমণ চালিয়ে তাদের দেশকে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের অধীনস্থ করেছিল এবং ১৯৪৭ সালে ভারত ছাড়ার সময় তারা ওই অঞ্চলগুলোকে স্বাধীনতা না দিয়ে ভারত সরকারের অন্তর্ভুক্ত রেখেই বিদায় নিয়েছিল। সেই থেকেই ভারতের এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জাতি নিজেদের আবাসভূমিতে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে। কাজেই সে সংগ্রামের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদের কোন সম্পর্ক নেই। ভারতীয় দখলদারিত্বের বিরুদ্ধেই সে অঞ্চলে গড়ে উঠেছে সশস্ত্র সংগ্রাম। এ সংগ্রাম দখলদারী ও সেখানকার জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর সশস্ত্র আক্রমণেরই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া মাত্র। কিন্তু এসব সশস্ত্র তৎপরতাকে নিজেদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিক্রিয়া হিসাবে না রেখে ভারত সরকার তাদের সন্ত্রাসী হিসাবে আখ্যায়িত করে নিষ্ঠুরভাবে দমন করে আসছে।

সন্ত্রাস-বিরোধিতার অজুহাতে POTO নামে নিপীড়নমূলক আইনের প্রস্তাব তারা করেছে এবং যে আইন তারা শেষ পর্যন্ত তাদের পার্লামেন্টে পাস করিয়ে নেবে সেটা কাশ্মীরের মতোই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও তাদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আরও কঠোর ও নিষ্ঠুরভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের হাতকে আইনগতভাবে জোরদার করবে। তাই এই আইন হল, ভারত সরকার কর্তৃক সে দেশের জনগণের ওপর এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনতাকামী বিভিন্ন জাতির ওপর সন্ত্রাসী হামলাকে আইনসিদ্ধ করারই এক পৈশাচিক প্রচেষ্টা। সন্ত্রাসবাদের অনেক চেহারা। বাংলাদেশে যে সন্ত্রাসী তৎপরতা দেখা যায় সেটারও মূল ভিত্তি এ দেশের শাসক শ্রেণীর তৎপরতার সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৯৭২ সাল থেকে চুরি, দুর্নীতি ইত্যাদির মাধ্যমেই বাংলাদেশের নোতুন শাসক শ্রেণী গঠিত হয়েছে এবং এভাবে গঠিত হতে গিয়ে তাদেরকে ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতে হয়েছে। এই সন্ত্রাস যে শুধু রাষ্ট্রীয়ভাবেই করা হয়েছে তা নয়। শাসক শ্রেণীর লোকেরা নিজেরা বেসরকারিভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ের এই সন্ত্রাস করে আসছে এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হলেও, ব্যক্তিগত পর্যায়ের এই সন্ত্রাসী তৎপরতার ব্যাপকতা সরাসরি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী তৎপরতা থেকে অনেক বেশি।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাস ও যথেচ্ছ খুন-খারাবি প্রথম থেকেই চলে আসার ফলে এই ধরনের কার্যকলাপে সাধারণভাবে বিপুল এবং উত্তরোত্তর সংখ্যায় মানুষ অভ্যস্ত হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখানে লোকসংখ্যা বিশাল আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু অর্থনৈতিক বিকাশ সেই তুলনায় কিছুই হয়নি। বেকারত্ব এখানে এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যাতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোকদের কর্মসংস্থান বিপজ্জনকভাবে সীমিত। এই পরিস্থিতিতে প্রাথমিক পর্যায়ের চুরি, দুর্নীতি, লুণ্ঠন কমে না এসে সেটা আরও বড় আকারে হচ্ছে ক্রমবর্ধমানভাবে। বাংলাদেশে সাধারণভাবে যে সন্ত্রাসী তৎপরতা-ছিনতাই, লুণ্ঠন, হত্যা যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে এবং যত বর্ধিত আকারে ঘটছে তাতে

www.pathagar.com

একথা অনায়াসে বলা চলে যে, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী তৎপরতার দিক থেকে বাংলাদেশই হল বিশ্বের নিকৃষ্টতম দেশ। এখানে সন্ত্রাসবাদ শাসক শ্রেণীর ও তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত লোকদের এক বিরাট অংশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে।

১৮ নভেম্বর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরের সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে হিসাব দেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে,' গত ১ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর ২৫ দিনে দেশে ২৬৬ টি খুন ও ২৩৩টি ধর্ষণের মামলা হয়েছে।' ৯৬ থেকে ২০০১ সালের জুন পর্যন্ত হয়েছে ১৮ হাজার ৫৬৩টি খুন ও ২২ হাজার ৯২৫টি ধর্ষণের মামলা।' (দৈনিক যুগান্তর, ১৯.১১.২০০১) এ তো গেল মামলার হিসাব। কিন্তু মামলা হয়নি এরকম ঘটনা যে আরও কত তার কোন হিসাব নেই, হিসাব দেয়া সম্ভবও নয়। পরিস্থিতির এদিকে তাকিয়ে বলা চলে যে বাংলাদেশই হচ্ছে এখন সারা বিশ্বের মধ্যে চোর, পকেটমার, লুণ্ঠনকারী, ধর্ষণকারী ও খুনির মতো অপরাধীদের সব থেকে বড় এবং নিরাপদ অভয়ারণ্য। এই অভয়ারণ্য সৃষ্টির মূল কারণ দু'টি। প্রথমত এ দেশের শাসক শ্রেণী নিজের গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে প্রথম থেকেই বেপরোয়া হয়ে সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং তারই জের হিসাবে এখনও কার্যত সন্ত্রাসকে তারা আশ্রয় করে আছে। দ্বিতীয় বাংলাদেশে কোন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না এবং বেকারত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বেকাররা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

কাজেই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ থেকে নিয়ে একটি দেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তিপর্যায়ের সন্ত্রাসবাদ পর্যন্ত সব সন্ত্রাসবাদের মধ্যে একটি জায়গায় মস্ত সাদৃশ্য আছে। সেটা হল এই যে, সন্ত্রাসবাদের জন্ম ও বিকাশের মূল কারণ সন্ত্রাসী তৎপরতার মধ্যে পাওয়া যায় না। সে কারণ আন্তর্জাতিক বা দেশীয় ক্ষেত্রে মূলত লুণ্ঠন, নিপীড়ন ও জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সঙ্গেই সম্পর্কিত থাকে। কাজেই সে সমস্যাগুলোর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোন দেশ ও সমাজ থেকে ও সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের কোন সম্ভাবনা নেই। ❑

১৯ নভেম্বর '০১

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদ বিরোধী 'বিশ্বযুদ্ধ' এবং সালমান রুশদি

(চার)

বিগত ৯ নভেম্বর ২০০১ তারিখে লন্ডনের দৈনিক গার্ডিয়ান পত্রিকায় 'এ যুদ্ধ তাহলে ইসলামের বিরুদ্ধেই' শীর্ষক সালমান রুশদির একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

এই রচনাটি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও 'প্রতিবাদী' বুদ্ধিজীবী সালমান রুশদি কর্তৃক তার বিশ্লেষণ ক্ষমতা, মানবিক বোধ, পাণ্ডিত্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি সব কিছুকেই সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদতলে নিবেদন করারই এক করুণ দৃষ্টান্ত।

তিনি এই রচনাটি শুরু করেছেন এভাবে, 'এ যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে নয়'। বিশ্ব নেতারা এই মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন গত কয় সপ্তাহ ধরে বারবার। অংশত একথা তারা বলছেন, পশ্চিমা দুনিয়ায় বসবাসরত নিরপরাধ মুসলমানদের ওপর প্রতিহিংসামূলক হামলা প্রতিরোধের মহৎ আশায় এবং অংশত এ কারণে যে, যুক্তরাষ্ট্র যদি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোয়ালিশন অব্যাহত রাখে তাহলে সে আর এই ইঙ্গিত দিতে পারে না যে, ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই প্রয়োজনীয় অস্বীকৃতির সমস্যা হলো যে, এটা সত্যি নয়।'

এ পর্যন্ত পড়ার পর স্বাভাবিকভাবেই একজন পাঠকের মনে হওয়ার কথা যে, এরপর সালমান রুশদি মার্কিনসহ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর এই বড়ো মাপের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন এবং আসলে কি কারণে তারা নিজেদের ভণ্ডামির আড়ালে তাদের সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী বিশ্ব যুদ্ধ শুরু করছেন তার কিছু ব্যাখ্যা দেবেন। কিন্তু না, তিনি সে রকম কিছুই করেন নি।

উল্টো তিনি উপরোক্ত দেশগুলোর ভণ্ডামিকেই সমর্থন করে তাদের দস্যুসুলভ বিশ্বযুদ্ধকে যুক্তিযুক্ত করার চেষ্টাতেই নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি বলছেন, 'এ যুদ্ধ যদি ইসলামের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধেই না হবে কেনো তাহলে ওসামা বিন লাদেন ও আল কায়দা সমর্থনে বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে ? কেনো তাহলে কোনো এক মোল্লার জেহাদের ডাকে কুঠার ও তরবারি সজ্জিত হয়ে দশ হাজার লোক যুদ্ধের জন্যে জড়ো হবে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে ? কেনো তাহলে তালেবানদের পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে তিনজন ব্রিটিশ মুসলিম নিহত হবে ?

একথা ঠিক যে, সাম্রাজ্যবাদীদের 'বিশ্বযুদ্ধের' আসল কারণ যাই হোক, তারা ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদকে সম্পর্কিত করেই তাদের এই যুদ্ধ পরিচালনা করতে নিযুক্ত হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, ইসলামী সন্ত্রাসবাদী বলে যাদেরকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা আখ্যায়িত করছে তারা ইসলামী মৌলবাদী (সৌদি আরব, কুয়েত, ইরান, লিবিয়া, আফগানিস্তান ইত্যাদি) এবং অমৌলবাদী (ইরাক, সিরিয়া, সোমালিয়া, ইয়েমেন ইত্যাদি) দেশগুলোর একটা অংশ। সৌদি আরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত ইত্যাদির মতো ইসলামী মৌলবাদী দেশগুলোর সঙ্গে মার্কিনসহ অন্য পশ্চিমাদের কোনো বিরোধ নেই। তারা এই দেশগুলোতে সামরিক ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে এবং তেলসহ তাদের অন্যান্য সম্পদ অবাধে লুণ্ঠন করছে, তাদের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

মার্কিনীদের বিরোধ হচ্ছে সে সব মৌলবাদী এবং অমৌলবাদী মুসলমান প্রধান দেশগুলোর সঙ্গে যারা বিভিন্ন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকলেও এ পর্যায়ে নিজেদের দেশের সম্পদ, মূলত তেল সম্পদ, অন্যদের দ্বারা লুণ্ঠিত হতে দেয়ার বিরোধী। যারা নিজেদের দেশে নানাভাবে সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব স্থাপিত হতে দেয়ার বিরোধী। এসব তথ্য ও যুক্তি সালমান রুশদির বড়োই অপছন্দ। কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের যুদ্ধকে 'ইসলামের বিরুদ্ধে নয়' বলে আখ্যায়িত করা যে সত্যি নয় এটা বলা সত্ত্বেও তাদের ভণ্ড, ধাপ্পাবাজ ইত্যাদি না বলে রুশদি বলছেন যে, অস্বীকৃতি সত্ত্বেও এটাই হলো আসল কাজ। ইসলামী মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদীদেরকে দোষারোপ করতে গিয়ে তিনি বলছেন, 'বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র এবং পেন্টাগনে হামলার সঙ্গে ইহুদিরাই জড়িত বলে কেনো তাহলে মিথ্যা অপবাদ রটানো হবে সেমিটিজম বিরোধী ইসলামী শিবির থেকে এবং এর পক্ষে তালেবান নেতৃত্ব ও অন্যান্যরা যুক্তি দেখিয়ে বলবে যে, এ ধরনের হামলা চালানোর মতো আধুনিক প্রযুক্তি বা সাংগঠনিক সামর্থ্য মুসলমানদের নেই ?

প্রথমত, বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগনে হামলার জন্যে ইহুদিরা দায়ী একথা সেমিটিজম বিরোধী ইসলামী শিবির থেকে করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। কিন্তু এ অভিযোগ বা এক্ষেত্রে প্রবল সন্দেহ যে শুধু 'সেমিটিজম বিরোধী ইসলামী শিবির' থেকেই করা হচ্ছে তাই নয়, খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্র-পত্রিকাতেই সে কথা মার্কিনিরাও কেউ কেউ বলেছেন। এছাড়া অন্য অনেকেও বলেছেন একথা। এটা বলার জন্যে যে কোনো ব্যক্তি বা মহলকে ইসলামী মৌলবাদী হতে হবে এমন কথা নেই। ইসরাইল হলো যুক্তরাষ্ট্রের পরই বিশ্বের সব থেকে বিপজ্জনক সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। কাজেই নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে তারা হামলা করেছে অথবা করতে পারে একথা বললেই যে কেউ ইহুদী বিরোধী হিসেবে বলছে এটা মনে করার কারণ নেই। কিন্তু সেটা না থাকলেও ইসরাইলি সন্ত্রাসের সমর্থক সালমান রুশদির কাছে সেটা বলাই মনে হয়েছে যুক্তিসঙ্গত!

www.pathagar.com

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, তিনি 'ইসলামী শিবিরের' বিরুদ্ধে যেভাবে লেখাটিতে বিষোদগার করেছেন সেটা যে সাধারণভাবে মুসলমানবিরোধী অবস্থান এ নিয়ে তার কোনো অসুবিধা নেই। কারণ ইহুদী বিরোধী হওয়া খারাপ হলেও মুসলমানবিরোধী হওয়াটা ভালো! আসলে তার এই ইহুদী পক্ষপাতিত্ব ও মুসলমান বিরোধিতা যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ইসরাইলের সন্ত্রাসের প্রতি এক ফ্যাসিস্টসুলভ সমর্থন এটার সব থেকে বড়ো প্রমাণ ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর মার্কিন নেতৃত্বে 'বিশ্বযুদ্ধ' ঘোষণা, আফগানিস্তান আক্রমণ ইত্যাদির মধ্যে তিনি দোষের কিছুই দেখেন না! এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে তার সামান্য কোনো 'মানবিক' সমালোচনা পর্যন্ত নেই। না থাকারই কথা, কারণ তিনি মুসলমানদের ওপর এই হামলার পক্ষপাতি।

১১ সেপ্টেম্বরের হামলার জন্যে লাদেনকে দায়ী করার মতো কোনো প্রমাণই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে নেই এর সব থেকে বড়ো প্রমাণ হলো, সে রকম কোনো প্রমাণ উপস্থিত করার ক্ষেত্রে তাদের চরম অপারগতা। এই প্রমাণহীন অভিযোগ ও এর ভিত্তিতে আফগানিস্তান আক্রমণ এবং ইরাক ইত্যাদি অন্যান্য দেশের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি যে কতোখানি ফ্যাসিস্ট চরিত্রের পরিচায়ক এ বিষয়ে রুশদির কোনো বক্তব্যই নেই। কারণ তিনি এই মার্কিন অবস্থানেরই সমর্থক। কাজেই কেউ ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার ব্যাপারে প্রমাণ উপস্থিত না করেও ইচ্ছেমতো অন্যদের ওপর আক্রমণ করলেও তার মতো 'যুক্তিবাদীর' কোনো অসুবিধা নেই! অসুবিধা আছে কেউ এ ব্যাপারে প্রমাণ দাবি করলে!!

সালমান রুশদির বক্তব্য থেকে মনে হয় শুধু মুসলমানরাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার কোটি কোটি জনগণ, এমন কি ইউরোপ ও খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনগণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশও যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী এ সত্য বা তথ্যের কোনো খেয়াল করা রুশদির জন্যে অসুবিধাজনক।

ইসলামী মৌলবাদীদের পশ্চাৎপদতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা নিয়ে শুধু যে রুশদিই কথা বলেছেন এমন নয় এ নিয়ে দুনিয়ার অনেক প্রগতিশীল মহল থেকেও যথেষ্ট আলোচনা ও বিরোধিতা হয়েছে এবং এখনো অব্যাহত আছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ একেবারে সামনে নিয়ে এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার জন্যে লাদেনকে 'প্রধান সন্দেহভাজন' হিসেবে অভিযুক্ত করে তার এবং তার আশ্রয়দাতা আফগান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকে সমর্থন করার মধ্যে কোনো ধরনের মানবিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি যে নেই এটা এক্ষেত্রে তার বক্তব্য থেকেই যথেষ্ট স্পষ্ট। এটা যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতাকে আড়াল করা, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের সন্ত্রাস ও দস্যুতাকে আড়াল করা ও তাকে 'নিরীহ' প্রমাণ করার এক কুৎসিত চেষ্টা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মুসলমান প্রধান দেশগুলোতে ইসলামী মৌলবাদীরা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসেবে অনেক রকম সমস্যা সৃষ্টি করছে এবং এ সব দেশের জনগণ তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। এ সংগ্রাম আরও ব্যাপক ও শক্তিশালীভাবে সংগঠিত করা প্রয়োজন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এমন কোনো অবস্থান বা এমন ধরনের কোনো আলোচনা যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী

www.pathagar.com

হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দুর্বল করে সেটার মধ্যে কোনোভাবেই কোনো প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক উপাদান থাকতে পারে না।

এ ধরনের অবস্থান শুধু যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, নিপীড়ন ও হামলাকেই আড়াল করে, তাকে বিভিন্ন দেশের জনগণের ওপর বৃহত্তর হামলার প্রস্তুতিকে সাহায্য করে, তাই নয়- এটা প্রকৃতপক্ষে মৌলবাদ বিরোধিতাকেও দুর্বল করে। কারণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতার বিরুদ্ধে মৌলবাদকে স্থাপন করলে তার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই জনগণের একটা বড়ো অংশের সহানুভূতির উদ্রেক হয় এবং সেটা তাদের মৌলবাদী অবস্থানকেই শক্তিশালী করে।

লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত সালমান রুশদির রচনাটির মধ্যে মুসলমান বিদ্বেষ, ইসরাইল ও ইহুদীবাদ প্রেম ইত্যাদি থাকলেও এর সব থেকে লক্ষণীয় দিক হচ্ছে খুব চাতুর্যের সঙ্গে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী জোট-এর 'বিশ্বযুদ্ধের' দস্যু চরিত্র আড়াল করে তাকে সমর্থন করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাস দমনের নামে আফগানিস্তানে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে যেভাবে হাজারে হাজারে, নিরীহ শিশু, নারী, বৃদ্ধসহ অগণিত মানুষকে হত্যা করছে এবং একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর দস্যুসুলভ হামলা পরিচালনা করে দেশটিকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে তার কোনো উল্লেখ 'মহামতি' সালমান রুশদির রচনাটির মধ্যে কোথাও নেই। না থাকারই কথা। কারণ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুটে থেকেই তিনি তার মানবিকতা, ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীলতা প্রচার করেন। তিনি আর যাই হোন, নিমকহারাম নন! ❑

১২ ডিসেম্বর '০১

www.pathagar.com

এই যুদ্ধ বন্ধ হোক : রক্ষা পাক মানবজাতি

আবুল কাসেম ফজলুল হক

যুদ্ধবাজ বুশের নেতৃত্বে ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদীরা আফগানিস্তানে যে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে তা চলতে থাকলে একদিন গোটা মানবজাতিই ধ্বংস হয়ে যাবে। পিতা বুশ, ক্লিনটন, তার পর পুত্র বুশ এরা আলেকজান্ডার ও হিটলারের ঔদ্ধত্য নিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আসছে। আলেকজান্ডার চেয়েছিলো দিগ্বিজয়ী বীর হতে, আর হিটলার চেয়েছিলো গোটা পৃথিবীর শাসক হতে। তাদের আধিপত্য লিপ্সা, কর্তৃত্ব লিপ্সা, প্রভুত্ব লিপ্সা ও শোষণ লিপ্সা ছিলো অদম্য, অফুরন্ত, অন্তহীন। ক্ষমতা যতো পেয়েছে ততোই আরও ক্ষমতা চেয়েছে। বুশ তাদেরই উত্তরসূরি। 'আমেরিকাকে আঘাত করে কেউ টিকতে পারবে না।' 'লাদেনকে জীবিত অথবা মৃত যেভাবেই হোক চাই।' 'এই যুদ্ধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ।' 'দ্রুত নিষ্পত্তিতে আমরা যাব না, যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী।' 'কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই, কোনো আলোচনার সুযোগ নেই, আমরা জানি লাদেনই অপরাধী, তাকে আমাদের হাতে তুলে দিতেই হবে।' বুশের এই সব উক্তি তার আধিপত্য লিপ্সা, কর্তৃত্ব লিপ্সা, প্রভুত্ব লিপ্সা ও শোষণ লিপ্সারই নগ্ন প্রকাশ। আফগানিস্তান ধ্বংস করে সে সন্তুষ্ট থাকবে না, বিশ্বব্যাপী সে চাইবে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রসারিত করতে।

মার্কিন আধিপত্যবাদীরা গ্লোবালাইজেশন নামে যে বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, এই যুদ্ধ তারই অংশ। যুদ্ধ তারা চালিয়ে যাবে। যেখানেই তারা অবাধ্যতা দেখবে, সেখানেই যুদ্ধ চালাবে। ওসামা বিন লাদেন উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য তার গোটা পৃথিবী, গোটা মানবজাতি। তা না হলে লাদেনকে, আফগানিস্তানের মতো একটি পশ্চাৎপদ, ক্ষুদ্র, দুর্বল জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে সে উন্মাদ হয়ে উঠবে কেনো ? বুশ দেখছে, সকলেই আজ তাকে ভয় পায়; এতে সে একরকম আত্মবিশ্বাস নিয়েই যুদ্ধে নেমেছে। ব্রিটেনের টনি ব্লেয়ার যুদ্ধে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তার দোসর হয়েছে। তবে লাদেনকে ভয়ও পায় তারা। বিশ্ব-জনমত তাদের মনে দ্বিধা জাগায়। লাদেনের বিরুদ্ধে বুশ-ব্লেয়ারদের এতো অসহিষ্ণুতা কেনো ? লাদেনকে কি তারা ভয় পায় না ? আফগানদেরই বা এতো সাহসের উৎস কোথায় যে, তারা ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদীদের মোকাবেলায় এগিয়েছে ? কেনোই বা তাদের এই মোকাবেলা ?

www.pathagar.com

লাদেন ও আফগানদের সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদীদের ও তাদের সহযোগীদের প্রচার মাধ্যম ছাড়া অন্য সূত্র থেকে বিশ্ববাসীর কিছু জানার সুযোগ প্রায় নেই। তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট সুযোগের প্রায় সবটাই নিয়ন্ত্রণ করছে ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদীরা ও তাদের সহযোগীরা। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিপ্লবের সুযোগে 'গ্লোবালাইজেশন' নামে যে বিশ্বব্যবস্থা তারা প্রতিষ্ঠা করেছে, তাতে পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রের শাসকরা নিজেদের শাসন-শোষণের স্বার্থে আজ ঐক্যবদ্ধ। সন্ত্রাস দমনের ছুঁতায় আফগানিস্তানে যুদ্ধ চাপাবার কথা বলে বুশ যখন একটি একটি করে বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে তাদের সমুদ্র-বন্দর, বিমান-বন্দর, সমুদ্রসীমা, আকাশসীমা ইত্যাদি ব্যবহার করার প্রস্তাব দিয়েছে তখন নিঃশর্তে, কালক্ষেপ না করে প্রায় সকল সরকার সম্মতি দিয়েছে। বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারও অতি দ্রুত আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতাদের সম্মতি নিয়ে বুশের প্রস্তাবে রাজি হয়েছে। পাকিস্তান ও উজবেকিস্তানের স্থল, জল ও আকাশসীমা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করে চলছে। অস্ট্রেলিয়া মার্কিন কমান্ডে আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠাচ্ছে।

সরকার যে দিকেই যাক, পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রে শান্তিকামী মানুষরা বুশ-ব্লেয়ারের যুদ্ধের বিরোধিতা করছে। মিছিল-সমাবেশ, বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখার মাধ্যমে যুদ্ধাভিযানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করছে। ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদীদের প্রচার মাধ্যম থেকে প্রচার করা হচ্ছে যে, লাদেন ও তালেবান শাসকরা এই যুদ্ধকে 'ইসলামের ওপর ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদীদের আক্রমণ' বলে অভিহিত করছে। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র সক্রিয় মুসলিম শক্তিগুলো আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণে ফেটে পড়ছে, অনেকেই জীবন উৎসর্গ করছে। সাধারণ মুসলমানরাও বুশ-ব্লেয়ারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশেও, সরকারের অবস্থান যাই হোক, শান্তি কামীরা ও অন্যরা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে।

ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদীরা গত দুই সপ্তাহ ধরে লাদেনকে ধরার উদ্দেশ্যে এবং আফগানিস্তানে তালেবান সরকারকে উৎখাত করে তাদের পছন্দমতো একটি তাঁবেদার পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসানোর উদ্দেশ্যে রাত-দিন বিমান আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তাতে লাদেনের ও তালেবান সরকারের ধ্বংসের সম্ভাবনা কতোখানি তীব্র হচ্ছে বলা কঠিন; তবে প্রতিদিন শ' শ' সাধারণ নাগরিক-শিশু, নারী, যুবক, বৃদ্ধ করুণভাবে নিহত হচ্ছে। অনেক অসহায় আফগান নাগরিক শুধু প্রাণ ধারণের আশ্রয় স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে নিয়ে বাস্তুত্যাগী হয়ে ঘুরছে, আশ্রয় পাচ্ছে না। তারা দেশ ছেড়ে যাওয়ার উপায়ও পাচ্ছে না, ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদীরা কঠোর অবরোধের ব্যবস্থা করে রেখেছে। ইঙ্গ-মার্কিন বর্বররা একদিকে মানুষ মারছে, মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়া করছে; অপরদিকে আবার উদ্বাস্তুদের জন্যে বিমান থেকে রিলিফ ছড়াচ্ছে। এরই মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা দিয়েছে এনথ্রাক্স ব্যাধি। ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদীদের প্রচার-মাধ্যম থেকে প্রচার করা হচ্ছে যে, এটা লাদেন ও তালেবান শাসকদের দ্বারা পরিচালিত জীবাণু যুদ্ধের সূচনা বলে মনে হয়। খুব স্পষ্ট নয় তাদের বক্তব্য। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন ক্রমবর্ধমান হারে এনথ্রাক্স-রোগ বিস্তারের খবর তারা প্রচার করছে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও আরও কোনো কোনো দেশে এনথ্রাক্সের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে বলে খবর

www.pathagar.com

প্রচারিত হয়েছে। বুশ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের উদ্দেশে হুমকি দিচ্ছে, আজ হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ নিতে হবে, না হয় সন্ত্রাসীরূপে চিহ্নিত হতে হবে- কোনো মাঝামাঝি অবস্থানের সুযোগ নেই। বুশ বলছে, মার্কিন সরকার ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করছে আর লাদেন ও তালেবানরা অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করেছে। এ অবস্থায় গোটা মানবজাতি এক ধ্বংসলীলার মধ্যে পড়ে গেছে। মার্কিনীরা যুদ্ধ আরম্ভ করলো কেনো ? আফগান জনগণ কেমন করে এই বিপর্যয়ের মধ্যে পড়লো ?

বর্তমান যুদ্ধের ও আফগান-বিপর্যয়ের কতকগুলো প্রত্যক্ষ কারণ আছে, আবার কতকগুলো পরোক্ষ ও মৌলিক কারণ আছে সেগুলো অনুসন্ধান করে দেখা আজ সমগ্র পৃথিবীর সচেতন নাগরিকদের কর্তব্য।

প্রত্যক্ষ কারণগুলো সকলের মনে ভাসমান। গত ১১ সেপ্টেম্বর আকস্মিকাভাবে বিমান আক্রমণ চালিয়ে ওয়াশিংটনে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ১১০ তলা দু'টি বিশাল ভবন টুইন টাওয়ার ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়। একই সময়ে, ১৮ মিনিটের ব্যবধানে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হেডকোয়ার্টার্র পেন্টাগন ভবনে বিমান আক্রমণ চালিয়ে ভবনটির ওপরের দিকে কয়েকটি তলা ধ্বংস করে দেয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকার তথ্য দিয়েছে যে, এই ধ্বংসলীলায় পাঁচ হাজারের মতো সাধারণ নর-নারী নিহত হয়েছে। এই নিহতদের মধ্যে জনা ত্রিশেক প্রবাসী বাংলাদেশীও আছে। বেসরকারি হিসেবে বলা হচ্ছে, আরও বেশি লোক নিহত হয়েছে। এই ঘটনা কারা ঘটালো ? বুশ বলছে, এটা আফগানিস্তানে প্রবাসী সৌদি ধনকুবের ওসামা বিন লাদেন ঘটিয়েছে। মুসলিম উগ্রবাদীদের মহল থেকে বলা হচ্ছে, এটা ইহুদি মহল থেকে ঘটানো হয়েছে। পৃথিবীর সাধারণ মানুষ অবাক বিস্ময়ে শুনছে এসব কথা।

অনেকে ভাবছে ঘটনা যারাই ঘটিয়ে থাকুক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দর থেকে চারটি মার্কিন বিমান নিয়ে এই ঘটনা ঘটানোর পেছনে অবশ্যই মার্কিন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কোনো মহল এই ঘটনা ঘটিয়ে সাফল্যের কৃতিত্ব দাবি করছে না। এ অবস্থায় বুশ লাদেনকে অভিযুক্ত করে, আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে, আফগানিস্তানে লাদেন ও তালেবানদের বিরুদ্ধে স্থল, জল ও আকাশপথে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালাচ্ছে। বিমান আক্রমণও দুই সপ্তাহ অতিক্রম করেছে। জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গত এক দশক ধরে, প্রায় সম্পূর্ণরূপে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও তার লেজুড় রাষ্ট্রসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যায় কাজে বিরোধিতায় কোনো দেশের সরকারই সাহসী নয়। তা ছাড়া, তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের পরে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সরকার ও শাসক শ্রেণী একজোট হয়ে কাজ করছে। সকল দেশের সামনের সারির বুদ্ধিজীবীরাও একই ধারায় কর্মরত। এতে মার্কিন আধিপত্যবাদীদের ঔদ্ধত্য বহুগুণ বেড়ে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে পৃথিবী হয়ে গেছে এককেন্দ্রিক। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে-ওয়াশিংটনকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহ আবর্তিত হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃত্ব গ্রহণ করে যে এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে, তারই নাম তারা দিয়েছে গ্লোবালাইজেশন।

আফগান জনগণের দুর্দশার প্রকৃতি বুঝতে হলে আফগানিস্তানের অন্তত গত সিকি শতাব্দির রাজনৈতিক ঘটনাবলি অবলোকন করতে হবে।

www.pathagar.com

১৯৭০-এর দশকের অন্তিম পর্যায়ে আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কমরেড তারাকি এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। ওই অভ্যুত্থানে পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট দাউদ ও তার অনেক সহকর্মী নিহত হয়েছিলেন। তখনকার কোল্ড ওয়ারের মধ্যে প্রেসিডেন্ট দাউদ ছিলেন মস্কো অনুসারী, মার্কসবাদ অনুসারী না হলেও তার সরকার ছিলো মস্কো অনুসারী। তারাকিদের কমিউনিস্ট পার্টিও ছিলো মস্কোপন্থী। সোভিয়েত সহায়তায় তারাকির নেতৃত্বাধীন সামরিক কমিউনিস্ট সরকার আফগানিস্তানকে একটি আধুনিক কমিউনিস্ট রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। তারা ভূমি-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কার করেন, নারী-স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেন, এমন অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেন- যাতে পশ্চাৎবর্তী আফগান সমাজের ধর্মবোধে ও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে। সামরিক শক্তি ব্যবহার করে অসন্তোষ দমন করা হয়। এভাবে বছর যেতে না যেতেই তারাকির নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টির আর এক নেতা কমরেড হাফিজুল্লাহ আমিন গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারাকিকে হত্যা করে পার্টিপ্রধান ও রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন। ওই সময়ে আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অনেক সৈন্য আনয়ন করা হয়।

আফগানিস্তানের সোভিয়েত সমর্থিত কমিউনিস্ট পার্টিতে ও কমিউনিষ্ট সরকারে নানারকম অন্তর্বিরোধ চলতে থাকে, পশ্চাৎবর্তী সংস্কৃতির জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষও তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে এবং রক্তক্ষয়ী ঘটনাপ্রবাহ অব্যাহত থাকে। দুই বছরের মধ্যে হাফিজুল্লাহ আমিনও নিহত হন নিজের দলের লোকদের দ্বারাই। এভাবে আফগানিস্তানে মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠার যে আয়োজন চলে তাতে হাফিজুল্লাহর পরে বারবাক কামাল এবং তার পরে নজিবুল্লাহ আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে বারবাকের আমলে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে লক্ষাধিক সোভিয়েত সৈন্য আনা হয়েছিলো। আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতাসীন থাকাকালে বাংলাদেশের কোনো কোনো নেতা আফগানিস্তানে গিয়েছেন এবং ফিরে এসে ঘোষণা দিয়েছেন, বাংলাদেশেও তারা আফগান মডেলে বিপ্লব করবেন! গরবাচেভ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে ঘোষণা দেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগান নীতি ভুল। তিনি আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য ফিরিয়ে আনেন। তাতে আফগানিস্তানের সোভিয়েত সমর্থিত কমিউনিস্ট সরকার বিপর্যয়ে পড়ে, বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপ ক্ষমতার লড়াইয়ে মত্ত হয়।

তারাকির সোভিয়েত সমর্থিত কমিউনিস্ট সামরিক অভ্যুত্থানের সময় থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে ও গোপনে আফগানিস্তানে সর্বাত্মক সোভিয়েত বিরোধী কার্যক্রম চালাতে থাকে, কাজেই পাকিস্তান হয়ে পড়ে মার্কিন কর্মকাণ্ডের ঘাঁটি। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত দখল হটানোর কাজে মার্কিনীরা ধর্মীয় শক্তিকে জাগিয়ে তোলার ও ট্রেনিং দিয়ে শক্তিশালী করে তোলার নানারকম প্রকাশ্য ও গোপন তৎপরতা চালাতে থাকে। আফগানিস্তানে তালেবান দল গঠনের পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও পাকিস্তানের বিস্তর অবদান আছে। ওসামা বিন লাদেনকে তারাই তৈরি করেছে এবং সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাজে লাগাবার জন্যে আফগানিস্তানে এনেছে। লাদেন একজন প্রকৌশলী, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, কিন্তু বিশ্বাসের দিক দিয়ে ফেনাটিক-মুসলিম উগ্রবাদী। ১৯৯১ সালে তালেবান দল আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখল করে। সেদিন তারা প্রেসিডেন্ট

www.pathagar.com

নাজিবুল্লাহ ও তার সহকর্মীদের হত্যা করে, ক্রমে সোভিয়েত সহযোগী হাজার হাজার আফগান নিহত হয়। সোভিয়েত সমর্থক আফগান সরকারকে তালেবানরা আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ করে রাখে। সেই সরকারই এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা নর্দার্ন এলায়েন্স নামে অভিহিত হচ্ছে। এই আফগান সরকারই জাতিসংঘের সদস্য। যুদ্ধে তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-উভয় পক্ষেরই সমর্থন পাচ্ছে। বুশ-ব্লেয়াররা চাইছে এই নর্দার্ন এ্যালায়েন্সকে সমগ্র আফগানিস্তানের শাসক বানিয়ে তালেবানদের ধ্বংস করতে। বুশ ক্রুসেড ঘোষণা করেছে, লাদেন জেহাদ ঘোষণা করেছে। একটা ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টিতে উভয় পক্ষ তৎপর। তালেবানদের এবং লাদেনের বক্তব্য যেটুকু আমরা পাচ্ছি, তা ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদীদের প্রচারমাধ্যমে থেকে। এতে প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাচ্ছে না। ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদীরা তাদের প্রতিপক্ষকে সহজেই তাদের প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে নানাভাবে রঞ্জিত করে হেয় প্রতিপন্ন করে দেয়।

বিশ্ববাসীকে মার্কিনী প্রচারে হারিয়ে গেলে চলবে না। যে জিনিসটি তলিয়ে দেখতে হবে তা হলো, লাদেন ও তালেবানরা কেনো ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদীদের বিরুদ্ধে মরণপণ অবস্থান গ্রহণ করেছে। মার্কিন ও রুশ আধিপত্যবাদীরা আফগান জনগণকে বলির পাঁঠা বানিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নিতে চেয়েছে এবং চাইবে। এরই বিরুদ্ধে লাদেনের ও তালেবানদের অভ্যুদয়। মধ্যপ্রাচ্যের তেল-সম্পদ লুটে নেয়ার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র ও তালেবানদের অভ্যুদয়। মধ্যপ্রাচ্যের তেল-সম্পদ লুটে নেয়ার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য যে কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে, তারই বিরুদ্ধে লাদেন ও তালেবানদের অভ্যুদয়। মার্কিন ঐশ্বর্যের পেছনে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের ভূমিকা বিবেচনা করতে হবে। আফগান জনগণের বাঁচার অধিকারের পক্ষে পৃথিবীর জনগণ যদি আজ তৎপর না হয় তা হলে সভ্যতার সঙ্কটে গোটা মানবজাতি তলিয়ে যাবে।

আজ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সরকার ঐক্যবদ্ধ হয়ে আফগানিস্তানে মার্কিন আক্রমণের ও যুদ্ধ চালাবার কাজে মদদ যুগিয়ে চলছে; এ অবস্থায় শান্তির জন্যে, মানবজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্যে, সকল দেশের জনসাধারণকে শান্তির পক্ষে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সকল দেশের জনগণের কণ্ঠ থেকে যদি আওয়াজ ওঠে-এই যুদ্ধ করো: মানবজাতিকে ধ্বংসের গ্রাস থেকে রক্ষা করো-তাহলে পৃথিবীতে ন্যায়ের পক্ষে নতুন রাজনৈতিক শক্তি জন্ম নেবে। তাতে ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্যবাদীরা নিরস্ত্র হতে বাধ্য হবে। মানবজাতির জন্যে কল্যাণকর প্রগতিশীল নীতি অনুসরণ করা হলে লাদেন ও তালেবানদের পশ্চাৎবর্তিতার ও উগ্রতার ফলে সৃষ্ট সমস্যাও সমাধান করা যাবে। ❑

১৮ অক্টোবর '০১

লেখক : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক।

www.pathagar.com

মার্কিনীদের আফগান নীতি পৃথিবীকে কোথায় নেবে ?

আবেদ খান

১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছিলেন সাপ্তাহিক টাইম পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর জেমস কেলি সাপ্তাহিকীটির বিশেষ সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে। সম্বোধনটি ছিল পাঠকদের প্রতি। সূচনাটা এরকম-- 'গত মঙ্গলবার আমি অন্যান্য দিনের চাইতে একটু সকালেই উঠলাম। সম্ভবত আপনাদের সবার মত আমারও দিনটি বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কাটানোর কথা। কাজেই আমি তাড়াতাড়ি তৈরি হলাম। সকাল ৮টার পর একটু আগে স্ত্রী এবং পুত্রকে বিদায় চুম্বন দিয়ে ম্যানহাটনের মধ্যবর্তী টাইম অফিসের দিকে রওনা দিলাম। সাড়ে ৮টায় অফিসে গিয়ে ই মেইল-এর জবাব দিচ্ছিলাম। সকাল ৯টার সামান্য আগে ডেপুটি ম্যানেজিং এডিটর স্টিভ কোপ ডাউনটাউন থেকে সেলুলার ফোনে জানালেন, তিনি যখন ছেলেকে নিয়ে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছিলেন তখন তিনি একটা প্লেনকে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উত্তর টাওয়ারের গায়ে বিধ্বস্ত হতে দেখেন।'

এরপর তিনি জানিয়েছেন কীভাবে তাঁরা এই বিশেষ সংখ্যা বের করার পরিকল্পনা করলেন। ম্যানেজিং এডিটর জেমন কেলি তাঁর সম্পাদকীয়তে ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর যখন পার্ল হারবারে বোমা পড়ল তখন কীভাবে টাইম ম্যাগাজিনের বিশেষ সংখ্যা তৈরি হয়েছিল তার একটা চমৎকার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন।

এই বিশেষ সংখ্যাটিতে অনেক অসাধারণ আলোকচিত্র রয়েছে। এরকম একটি আলোকচিত্রই যে কোন আলোকচিত্র সাংবাদিকের জন্যে গৌরবময় সৃষ্টি। সেই হিসেবে টাইম ম্যাগাজিনের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে রাখা উচিত ইতিহাসের দুর্লভ সঞ্চয় হিসেবে। তবে আমি এটা রাখতে চাই সর্বোদ্ধত আমেরিকার দম্ভবিনাশে দলিল হিসেবে। ১৯৪১ সালে পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণের চাইতেও ভয়ঙ্কর এটা। তখন তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। বিশ্বযুদ্ধে এমনটি ঘটতেই পারে। যুদ্ধের সময় শত্রুর বোমারু বিমানের লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বন্দর। কিন্তু যখন যুদ্ধ চলছে না তখন তো এ ঘটনা অবিশ্বাস্য এবং অভাবনীয় মনে হবেই। তাছাড়া ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার তো ব্যবসাকেন্দ্র। গোটা পৃথিবীর অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র ম্যানহাটন এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারকে বুকে ধারণ

www.pathagar.com

করে গর্ববোধ করে। এই জায়গাটিতে আঘাত হানা, পেন্টাগনে হোয়াইট হাউসকে টার্গেট করে আক্রমণের চেষ্টা করা এবং সবগুলো কাজ করা। একই সঙ্গে একই কৌশলে-এ তো অবিশ্বাস্য পরিকল্পনা! আর সবচাইতে মর্মান্তিক ব্যাপারটি হচ্ছে এক্ষেত্রে বোমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যাত্রীবাহী বিমান। যে চারটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে সেগুলো প্রায় একই সময়ে ছিনতাই করা হয়েছে। এই ঘটনায় গোটা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়েছে, শোকে মুহ্যমান হয়েছে মার্কিন জনগণ, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে বুশ প্রশাসক। এই একটি ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অহঙ্কারের সৌধকে চুরমার করে দিয়েছে।

এই ঘটনার পরপরই মার্কিন প্রশাসন যে ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠবে তা সহজেই অনুমান করা গিয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যেই তাদের সন্দেহ তালিকার শীর্ষে ওঠে আফগানিস্তান। তালেবান এবং লাদেন হয়ে উঠল এক নম্বর প্রতিপক্ষ। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আর এক ঘটনা ঘটল যা বেশ বিপজ্জনক। সাদা চামড়ার লোকদের চোখে এশিয়ান চেহারার যে কোন মানুষ হয়ে পড়ল সন্দেহভাজন এবং সন্ত্রাসী মনোভাবাপন্ন। মুসলমান ধর্মাবলম্বী হলেই কিংবা মুসলমান নাম হলেই যে কোন স্থানে হয়রানির শিকার হতে হয়। ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে, নব্য সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পড়ল পাশ্চাত্যে। আর অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে আফগানিস্তানের তালেবান নেতৃবৃন্দ এর সুযোগ গ্রহণ করে বিশ্বের মুসলমানদের আহ্বান জানালো মার্কিনী হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। আসলে বুশ প্রশাসক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যে স্লোগান উঠিয়ে পাশ্চাত্যকে মোটামুটি নিজের পেছনে দাঁড় করিয়েছিল সেই স্লোগানটি ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে এবং মুসলিম-অমুসলিম সংঘাতটিই বেশি প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। এখন ক্রমশ টুইন টাওয়ার ধ্বংসলীলার স্মৃতি চাপা পড়ে প্রধান হয়ে উঠছে আফগানিস্তানে মার্কিন অভিযান এবং লাদেন। আমেরিকা সোভিয়েট ইউনিয়নের অভিযানের বিরুদ্ধে লাদেনকে তৈরি করেছিল, এবার টুইন টাওয়ারের ঘটনার ভেতর দিয়ে তাকে বিশ্বনেতায় পরিণত করল। আমেরিকা সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত করার স্লোগান দিয়ে সন্ত্রাসবাদকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করল।

আফগানিস্তানে মার্কিন অভিযান নিয়ে আমার নিজস্ব একটি ব্যাখ্যা আছে। অনেকের কাছে এ ব্যাখ্যা দুর্বল এবং অগ্রহণযোগ্য হতে পারে তবু বলছি, আমেরিকার লক্ষ্য কি কেবলমাত্র আফগানিস্তান, না আরও অনেক কিছু ? এশিয়ায় মার্কিন উপস্থিতি পাকাপোক্ত করার জন্যেই এই সুপরিকল্পিত আয়োজন কি না সেটাও ভাববার সময় এসেছে। আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলার পাল্টা অভিযানের পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওপর আধিপত্য পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যও এক্ষেত্রে কাজ করেছে বলে মনে হয়। বিষয়টাকে আমি এভাবে দেখতে চাই-এক. উপমহাদেশে ঘাঁটি গড়বার জন্যে আমেরিকার একটা দরজা দরকার ছিল। আফগানিস্তান হতে পারে সেই দরজা; দুই. চীনের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তানকে পরিপূর্ণভাবে কব্জা করা এবং সেখানে আনুষ্ঠানিক ও স্থায়ী অবস্থানের দরকার ছিল। সেটা যে করা হয়েছে তা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোশাররফের অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এখন পারভেজ মোশাররফ খাঁচায় বন্দী ময়না এবং খাঁচাটি ঝুলছে বুশের হাতে। পাকিস্তানকে আমেরিকার প্রয়োজন দু'টি কারণে। প্রথমত উপমহাদেশে ভারত ক্রমশ শক্তিধর হয়ে উঠছে, তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে তার বাজার।

www.pathagar.com

আমেরিকার দরকার এই বাজার। একই সঙ্গে দরকার এশিয়ায় আর একটি সুবিশাল শক্তি চীনকে ঠেকানোর জন্যে ভারতকে পুষ্ট এবং তুষ্ট করা। এজন্যেই পাকিস্তানকে ব্যবহার করা দরকার। আমি বিস্মিত হব না যদি মার্কিন ব্যবস্থাপনায় আগামী দুই দশকের মধ্যে পুরো উপমহাদেশকে সীমান্তবিহীন অভিন্নদেহী করার আয়োজন করা হয়।

উপমহাদেশে চীনের একটি শক্ত প্রতিপক্ষ দরকার হবে। এ জন্যে প্রয়োজনবোধে গোটা উপমহাদেশকে অভিন্নভাবে রাখতে হবে। এবং দ্বিতীয়ত আমেরিকা এটা বিশ্বাস করে যে, পাকিস্তান বিশ্ব সন্ত্রাসের সূতিকাগার, সেখান থেকে ইসলামী...জিঙ্গোইজম ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। আফগানিস্তানও আজকের অবস্থানে এসেছে তাদের মদদে। এটা যদি অতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তাহলে বিশ্বব্যাপী যে সংকট সৃষ্টি হবে সেটা আমেরিকার বাজার টিকিয়ে রাখার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে; তিন. আমেরিকার জন্যে এখন বড় মাপের যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীদের পরম নির্ভরযোগ্য পেন্টাগন বুশকে ক্ষমতায় এনেছে অস্ত্র ব্যবসায়ের বাজার বাড়ানোর জন্যে। যুদ্ধহীন বিশ্ব মার্কিন অর্থনীতির জন্যেও সংকট আজকে। অতএব, একটা বড় মাপের যুদ্ধ দরকার। মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধ বাঁধিয়ে আমেরিকা অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে দিতে পেরেছিল। এখন স্নায়ুযুদ্ধের অবসান মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীদের জন্যে একটা বড় রকমের ধাক্কা।

যুদ্ধবাদই হচ্ছে তাদের একমাত্র মতবাদ। এজন্যে আফগানিস্তান নয় উপমহাদেশই হচ্ছে তাদের প্রধান লক্ষ্য। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক আতঙ্কবাদীদের প্রতিহত করা ইত্যাদির আড়ালে যে পরিমাণ অস্ত্র অর্থনীতি উপকৃত হবে ভারত-পাকিস্তানের কাশ্মীর সংকট ঝুলিয়ে রেখে ততটুকু কিছুতেই হবে না। অতএব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্যে যুদ্ধ সব সময় প্রয়োজন ছিল, এখনও প্রয়োজন, ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হবে। মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শক্তির লড়াই এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লড়াই-এর চেহারা কখনও এক হতে পারে না এবং হয়ও না। সাম্রাজ্যবাদ যখন তাকে ব্যবহার করে তখন নিজের প্রয়োজনেই ব্যবহার করে আবার যখন বিরোধিতা করে তখন নিজের স্বার্থেই করে। কিন্তু প্রগতিশীল শক্তি মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদকে কখনও ব্যবহার করে না বরং তার ভেতরটাকে উন্মোচন করে সেখানে আলো ফেলার চেষ্টা করে। ইঙ্গ-মার্কিন অভিযানের প্রাবল্যে হয়ত আফগানিস্তান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, হয়ত লাদেন-ওমরকে ধরাও যাবে। কিন্তু তার ফলে কি সাম্প্রদায়িকতা কমবে ? পৃথিবীর মুসলমান জনগোষ্ঠী কি এর দ্বারা শান্ত হবে ? আমার ধারণা, সমগ্র ঘটনা পৃথিবীকে অনেক বেশি অনগ্রসর, অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলবে। অন্ততঃপক্ষে আগামী একটি দশক বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন চেহারার মৌলবাদ তা সে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান যেই হোক না কেন অনেক বেশি শক্তিমত্তা প্রদর্শন করবে। সেসব দূর হতে পৃথিবীকে অন্ততঃপক্ষে দুই দশক অপেক্ষা করতে হবে। অনেক রক্তপাতের মাধ্যমে পৃথিবীর অনেক ভৌগলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অবশেষে আসবে শান্তি। আমেরিকার আফগান নীতি এই দুর্দশারই সূচনা। ❑

২১.১০.২০০১

লেখক ঃ সাংবাদিক, কলামিষ্ট।

www.pathagar.com

আমেরিকার আসল লক্ষ্যটা কী ?

(দুই)

চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছে বহুল প্রচারিত সৌদি দৈনিক ওকাজ। পত্রিকার সম্পাদকীয়তে সরাসরি টুইন টাওয়ার বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করেছে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদকে। বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শক্তি বা ওয়াশিংটনের সঙ্গে সহযোগিতা ছাড়া এত নিখুঁত ও কার্যকর হামলা চালানো সম্ভব নয়। ওকাজের অভিযোগে নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে ১১ সেপ্টেম্বর হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ৬ জন ইসরাইলিকে আটক করা হয়েছিল, কিন্তু পরে তাদেরকে রহস্যজনকভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

অন্য একটি সূত্র আরও ভয়ঙ্কর তথ্য জানিয়েছে। টুইন টাওয়ারে নাকি হাজার তিনেক ইহুদি কাজ করত। কেউ চাকরি করত, কেউবা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। ওই দিন টুইন টাওয়ারে কোন ইহুদি ধর্মাবলম্বী যায়নি। এই সূত্রটি অবশ্য কতখানি নির্ভরযোগ্য কিংবা পুরো ঘটনা সম্পর্কে ভিন্ন চেহারা দিয়ে দেয়াটা এই সূত্রের প্রয়াস কিনা—বোঝা মুশকিল। তবে একটি বিষয় মোটামুটি স্পষ্ট যে, একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে বুশ প্রশাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জড়িয়ে ফেলল এবং কোরিয়ার যুদ্ধ বা ভিয়েতনামের যুদ্ধের দীর্ঘসূত্রিতা মার্কিন প্রশাসনকে মার্কিনিদের কাছে যতখানি খাটো করে ফেলেছিল ঠিক ততখানি খাটো আবার তাদেরকে সম্ভবত হতে হচ্ছে। সৌদি দৈনিক ওকাজ যে তথ্য প্রকাশ করেছে এর পক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছে সেটাকে যদি আমরা তর্কের খাতিরে বিবেচনার চেষ্টা করি, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, মোসাদ কেন এই কাজটি করবে ? এ ধরনের বিধ্বংসী কাজ করার পেছনে মোসাদের স্বার্থ কী ? ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অহঙ্কার এবং মার্কিন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম স্পন্দন। ইহুদিদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে এই টুইন টাওয়ারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবেই। মোসাদ কেন এর ওপর চড়াও হবে ? মোসাদ কেন পেন্টাগনের ওপরইবা হামলা চালাবে ? মোসাদের উদ্দেশ্য যদি হয় মার্কিনিদের ভেতরে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে আতঙ্ক সৃষ্টি করার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিনিদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের দিকে নজর ফেরানো তাহলে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার কিংবা পেন্টাগন সদর দফতর কেন এবং চারটি যাত্রীবাহী বিমান হাইজ্যাক করাই বা কেন ? অন্য কোন লক্ষ্যবস্তুও তো হতে পারত।

www.pathagar.com

অবশ্য যারা মোসাদ নামক ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থাকে এর সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন, তাদের যুক্তি হচ্ছে- প্রথমত, এই পরিকল্পনা করার এবং সেটা কার্যে পরিণত করার যোগ্যতা বর্তমান বিশ্বে সিআইএ এবং মোসাদ ছাড়া আর কারও নেই। কিন্তু মোসাদ এটা করতে পারে এবং সিআইএ'র ভেতরকার কোন গোপন অংশকে এ কাজে ব্যবহার করতে পারে; দ্বিতীয়ত, তারা এমনসব লক্ষ্যস্থল বেছে নেবে যেগুলো নাড়া দেবে মার্কিন প্রশাসন এবং মার্কিন জনগণকে। যা হবে স্পর্শকাতর এবং ক্রোধ উৎপাদনকারী; তৃতীয়ত, মোসাদ নামক সংস্থাটি অতিশয় নিষ্ঠুর এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে তারা কুণ্ঠিত হয় না; চতুর্থত, লাদেনের নেটওয়ার্ক কিংবা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের যোগ্যতা এত মানসম্পন্ন এবং নিখুঁত নয়। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে প্রশিক্ষণ দেয়া, একসঙ্গে এতগুলো বিমান একই সময়ে হাইজ্যাক করা এবং তা ব্যবহার করা-এ সবই লাদেন সুদূর আফগানিস্তানে বসে কন্ট্রোল করবেন এবং সেটা এত নিখুঁতভাবে প্রতিপালিত হবে তা মনে হয় না।

পক্ষান্তরে যারা এটা লাদেন এবং তালেবানি সরকারের কাজ বলে মনে করেন তাদের যুক্তি হচ্ছে; প্রথমত, মোসাদের পক্ষে এ কাজ করার কোন প্রয়োজনই নেই, কারণ এর দ্বারা ইসরাইল কোনভাবেই উপকৃত হচ্ছে না; দ্বিতীয়ত, তালেবান এবং লাদেন নিষ্ঠুরতায় কারও চাইতে কম নয়। পুরো আফগানিস্তানই তার সাক্ষী। প্রতিপক্ষকে কত নির্দয় এবং নৃশংসভাবে দমন করতে হয় সেটা লাদেন খুব ভালই জানেন এবং মোল্লা ওমরও জানেন; তৃতীয়ত, লাদেনের নেটওয়ার্ক বিশ্বব্যাপী। তার অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে তথাকথিত জেহাদের জন্য। তারই একটা অংশ হিসাবে যদি ১১ সেপ্টেম্বরকে বেছে নেয়া হয় তাহলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই; চতুর্থত, যে চারটি বিমানকে ব্যবহার করা হয়েছে সেই চারটিই যাত্রীবাহী। প্রতিটির মধ্যে যদি দু'জন করে থাকে তাহলে অন্তত আটজন ছিল সুইসাইডাল স্কোয়াডে! প্রয়োজনে প্রাণ দিতে পারার মতো ডেডিকেশন কখনও কোন গোয়েন্দা সংস্থার থাকবে না। এটা করতে পারে তারই যারা ঘোরের মধ্যে থাকে, যাদের কোন আদর্শগত শক্তি থাকে।

সৌদি পত্রিকার মন্তব্য কিংবা এর পাল্টা যুক্তি প্রদর্শন হচ্ছে একাডেমিক বিষয়। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিটি হল বুশ প্রশাসন ১১ সেপ্টেম্বরের সূত্র ধরে বিশ্বব্যাপী অস্থিরতার সৃষ্টি করল। আমেরিকাকে যুদ্ধে নামাল, মার্কিন জনগণকে যুদ্ধের ব্যাপারে প্রভাবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করল, সমস্ত পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত করল। এর ফলে সমস্ত পৃথিবী তৃতীয় মহাযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। বুশ প্রশাসন এর নাম দিয়েছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু এই যুদ্ধের নামে যে গোটা পৃথিবীতে সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটানো হল তার কী হবে ? প্রেসিডেন্ট বুশ মুখে যাই বলুন তার এই তড়িঘড়ি কাজকর্ম, অতি দ্রুত আসামি সনাক্তকরণ এবং হামলায় নেমে পড়াকে সন্দেহের চোখে দেখার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বুশ প্রশাসন বলেছে, ১১ সেপ্টেম্বর ঘটনার জন্য প্রধান দায়ী ব্যক্তি ওসামা বিন লাদেন। এ ব্যাপারে তাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু কী সব প্রমাণ তা তো বুশ প্রশাসন মার্কিনবাসীকেও জানায় নি-বিশ্ববাসী তো অনেক দূরের ব্যাপার। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে তারা ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী সমেত বিভিন্ন বৃহৎ শক্তিকে তাদের সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে, আফগানিস্তান থেকে তালেবানি শাসনের অবসান ঘটাতে পারলেই যেন তারা বিশ্বকে সন্ত্রাসমুক্ত করে ফেলল।

www.pathagar.com

কিন্তু আসলে অবস্থা দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ অন্যরকম। মার্কিনি অভিযান একজন ধর্মোন্মাদকে বানিয়েছে বিশ্বনেতা। আমেরিকা আফগানিস্তানে সোভিয়েট অভিযান প্রতিহত করার জন্য লাদেন এবং পাকিস্তানের মাধ্যমে তালেবান সৃষ্টি করেছিল। এখন সেই পাকিস্তানকেই তাদের ব্যবহার করতে হচ্ছে তালেবান এবং লাদেনের বিরুদ্ধে। প্রথিবীতে লাদেনকে ক'জন চিনত ? তালেবান নিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা কি মাথা ঘামিয়েছে কখনও ? অথচ আমেরিকা এই কাজটিই করে দিল। শুধু তাই নায়, যেসব দেশে কখনও ধর্মোন্মাদদের অবস্থান ছিল না, বুশ প্রশাসনের এই প্রতিহিংসামূলক হঠকারিতার ফলে সেইসব দেশে তাদের অবস্থান দৃঢ় হয়েছে। যে পাকিস্তানকে দিয়ে তারা আফগানিস্তানকে তালেবান শাসনমুক্ত করার কথা বলছে আদতে তাদের এই অভিযানের ফলে গোটা পাকিস্তানটাই এখন তালেবানি শাসনে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হঠকারি সিদ্ধান্ত এবং বিবেকবর্জিত বোমাবর্ষণ পৃথিবীকে মৌলবাদ বিস্তারের উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত করেছে।

আফগানিস্তান কিংবা উপমহাদেশ শুধু নয়, আজ ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানীর বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মনে হচ্ছে বুশ প্রশাসন এবং তার সহযোগীরা প্রকৃতপক্ষে তাদেরকেই টার্গেট করছে কিংবা করে চলেছে। এর ফলে তাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক এবং এটা প্রকারান্তরে আফগানিস্তানের মৌলবাদী শক্তিকে আরও সংহত ও সমর্থনপুষ্ট করছে। তালেবানি শাসনের বিরুদ্ধে, মৌলবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের মানুষকে যদি প্রস্তুত না করা যায় রাজনৈতিকভাবে, যদি সেখানে পৌঁছে না দেয়া যায় শিক্ষা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা তাহলে কি কোনভাবে সম্ভব তাদেরকে ফেরানো ? বুশ প্রশাসন ভাবছে তালেবান সরকারকে উৎখাত না করতে পারলে আফগানিস্তানে সভ্যতা পুনর্বাসিত হবে না। যে কোন আধুনিক মানুষ এটা মানতেন। কিন্তু তার উপায়টা কি নির্বিচারে বোমাবর্ষণ ? এর ফলে আফগানিস্তানের যে নিরীহ মানুষ তালেবান শাসনের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তারাই আবার জুটবে তাদের পাশে। কারণ তালেবান এবং লাদেন এটাকে ধর্মযুদ্ধ হিসাবে প্রচার করার সুযোগ পেয়ে গেছে। এর কারণেই আজ পাকিস্তান থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের মৌলবাদী শক্তি তৎপর হয়ে উঠছে—কেউ কেউ দল বেঁধে চলে যাচ্ছে আফগানিস্তানের ভেতরে তালেবানের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য। হয়তো এটা কার্যকর হবে না অতটা। কিন্তু দেশে দেশে তো তাদের ঘাঁটি তৈরি হয়ে গেল।

আফগানিস্তানে অভিযান চালিয়ে বুশ প্রশাসন নতুন করে ইসলামী মৌলবাদীদের উস্কে দিল। আমেরিকা এই কাজটি আগেও করেছে। ইরানের বেলায়, ইরাকের বেলায়, লিবিয়ার বেলায় তাদের নীতি বারংবার প্যান ইসলামিক মনোভাব এবং ধর্মীয় মৌলবাদকে জাগিয়ে দিয়েছে। যদি বাস্তবভাবে আমরা বিশ্লেণ করার চেষ্টা করি তাহলে দেখব মুসলিম মৌলবাদকে শক্ত মাটিতে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে আমেরিকা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছে। শুধু মুসলিম মৌলবাদী নয়, ইহুদিবাদ, চার্চবাদ,উগ্র হিন্দুত্ববাদ অর্থাৎ সব ধরনের মৌলবাদ বিস্তারেই ইন্ধন জুগিয়েছে আমেরিকা। এসব ক্ষেত্রে আমেরিকার একমাত্র স্বার্থ হচ্ছে তার বাজার সম্প্রসারণ এবং যুদ্ধনীতির বিস্তার।

আজ ক্রমশ এই মতের বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছে যে, প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা আফগানিস্তান ইস্যু সৃষ্টি করে অন্য কোন উদ্দেশ্য কি সাধন করতে চাইছে তার লক্ষ্য

www.pathagar.com

কি আফগানিস্তান অথবা লাদেন না বৃহত্তর কোন লক্ষ্য আছে ? এ নিয়ে অবশ্য পরবর্তী সময়ে কিছু আলোচনা করার চেষ্ট করা যাবে। তার আগে ভাবনা-চিন্তার খোরাক হিসাবে বলি-এক. আমেরিকা আফগানিস্তান অভিযান শুরু করার আগেই বলে রাখল এটা দীর্ঘস্থায়ী হবে; দুই. ১১ সেপ্টেম্বরের পর আত্মগোপন অবস্থা থেকে ফিরে এসে বুশ বললেন, এই ঘটনা বিশ্ব অর্থনীতির চিত্র বদলে দেবে; তিন. ১১ সেপ্টেম্বরের অনেক আগে থেকেই ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে আমেরিকার মনোযোগ এবং আগ্রহের আতিশয্য দেখা গিয়েছিল; চার. উপমহাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন আগ্রহ এবং তৎপরতা বেশ ভালভাবেই দেখা যাচ্ছিল; পাঁচ. বুশ প্রশাসন প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল এবং মার্কিনি জনসাধারণকে এভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল যে, যে কোন মূল্যেই হোক লাদেনকে ধরা হবে; ছয়. ধীরে ধীরে বুশ প্রশাসন তার অবস্থান পাল্টে ফেলল এবং বলল যে, লাদেনকে হয়তো ধরা যাবে না সহজে কিন্তু আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের অবসান ঘটানো হবে; সাত. তারা সবচাইতে আগে বেশ কিছু জায়গা চিহ্নিত করে রাখল যেগুলোকে তারা ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করবে—উজবেকিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ হচ্ছে সেইসব ঘাঁটি। এসব হচ্ছে ভাবনার খোরাক। ❑

৮ নভেম্বর '০১

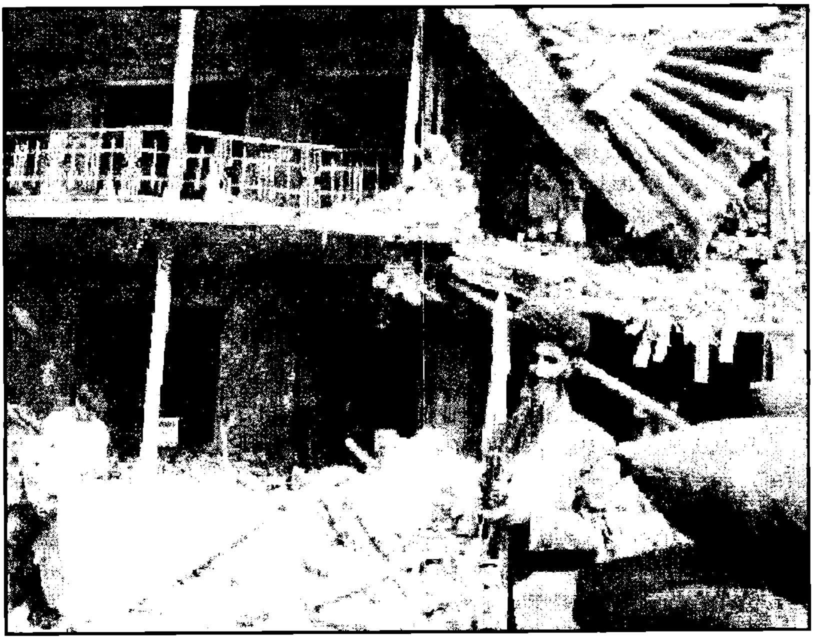

বিধ্বস্ত ঘরবাড়ী।

www.pathagar.com

আল-জাজিরা আফগান যুদ্ধের দৃশ্য প্রচার করছে যে টিভি চ্যানেলটি

এনামুল হক

দশ বছর আগে উপসাগর যুদ্ধ শুরু হলে সবার মুখে মুখে ফিরছিল সিএনএনের নাম। কোটি কোটি দর্শক তখন সিএনএন চ্যানেলে বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বাগদাদ নগরীর ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করছিল। এবারের আফগান যুদ্ধে সিএনএনের নাম আর শোনা যাচ্ছে না। সে স্থান দখল করে নিয়েছে আল-জাজিরা নামে একটি আরব স্যাটেলাই চ্যানেল। আফগানিস্তানের যুদ্ধ ও অন্যান্য ঘটনার দৃশ্যাবলীর জন্য বিশ্বের অধিকাংশ দর্শক আজ নির্ভর করছে আরবী ভাষায় প্রচারিত এই টিভি চ্যানেলটির ওপর। কারণ আল-জাজিরাই একমাত্র টিভি চ্যানেল যার কাবুলের সঙ্গে সবাসরি সংযোগ আছে। আল-জাজিরা পরিণত হয়েছে সেই খোলা জানালায়, যে জানালা দিয়ে লোকে আজকের আফগানিস্তানকে দেখছে। আল-জাজিরা ফুটেজ প্রদর্শিত হচ্ছে সিএনএন, বিবিসি, স্কাই নিউজে।

অথচ আফগানিস্তানের বর্তমান যুদ্ধের আগে মধ্যপ্রাচ্যের বাইরের অধিকাংশ মানুষ কখনও এই নামে কোন টিভি চ্যানেল আছে বলে শোনেনি। এর অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় আরব উপদ্বীপের কাতার নামক ক্ষুদ্র একটি দেশের রাজধানী দোহা থেকে, যে নামটিও হয়ত অনেকেরই অজানা। সেই অখ্যাত অপরিচিত স্যাটেলাইট চ্যানেলটি রাতারাতি চ্যানেল টিভির জগতে পাদপ্রদীপের আলোয় চলে এসেছে আফগানিস্তান যুদ্ধের কারণে। অবশ্য আল-জাজিরায় যুদ্ধের দৃশ্য প্রচারের শুরুটা মোটেও ভাল হয়নি। দশ বছর আগে বাগদাদে হামলার দৃশ্য সিএনএন যেভাবে দেখিয়েছিল কাবুলে বিমান হামলার দৃশ্যও সেভাবে দেখাতে পারবে বলে আশা করছিল আল-জাজিরা। কাবুলে রাত্রিকালীন দৃশ্য ধারণের উপযোগী ক্যামেরাও বসানো হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিন যুদ্ধ শুরু হলে সবুজ রঙের কাঁপা কাঁপা কিছু দৃশ্যই শুধু ভেসে উঠেছিল, যা থেকে কার্যত যুদ্ধের কিছুই বোঝা যায়নি। তা না হয় নাই বোঝা গিয়েছিল। তবে ঐ রাতে আল-জাজিরার দ্বিতীয় স্কুপটি দুনিয়া জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ওটা ছিল বিশ্ববাসীর উদ্দেশে ওসামা বিন লাদেনের

www.pathagar.com

ভিডিও বার্তা।

আল-জাজিরার শাখা অফিস আছে কাবুলে। সেখানে স্টুডিও আছে। শোনা গেছে, কোত্থেকে একটা গাড়ি দ্রুত ছুটে এসে আল-জাজিরা অফিসে ভিডিও ক্যাসেটটি পৌঁছে দিয়ে মুহূর্তে হাওয়া হয়ে যায়। যে লোকটা দিয়ে যায় তালেবানদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। আল জাজিরার কাবুল রিপোর্টার তাইকির আলুনি ভিডিওটা দেখেই এর গুরুত্ব বুঝে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দোহায় যোগাযোগ করে প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের জানালেন। কর্মকর্তারাও বুঝলেন কি অসাধারণ এক্সক্লুসিভ হাতে এসেছে তাদের। তাইকিকে তাঁরা এক্ষুণি ভিডিওটা সরাসরি এয়ারওয়েভে ছেড়ে দিতে বললেন। নিজেরা দেখতে চাইলেন না পর্যন্ত। নিজেদের রিপোর্টারদের ওপর এমনি পূর্ণ আস্থা আছে তাঁদের।

শুধু কাবুল নয়, বাগদাদে এবং আফ্রিকার অন্যান্য স্থানেও আল-জাজিরার সর্বক্ষণিক স্যাটেলাইট সংযোগ আছে। তবে বর্তমান অবস্থায় কাবুলের সংযোগটা তাদের কাছে সোনার খনির মতো। যেসব সচিত্র খবর তারা পরিবেশন করেছে অন্য আর কেউ পারছে না। কাবুলে বোমা-ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ও তৎপরবর্তী দৃশ্যাবলী, তার আগে বিন লাদেনের ছেলের বিয়ে, তালেবানদের বামিয়ানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস প্রভৃতি দৃশ্য পরিবেশন করেছে। দেখিয়েছে কিভাবে ছেলের বিয়েতে কার্পেটের ওপর সৌম্য মূর্তিতে বসে আছেন লাদেন। দেখিয়েছে কাবুলে মার্কিন দূতাবাসে বিক্ষোভকারীদের হামলার দৃশ্য। সবই তাদের একার কৃতিত্ব। তাদের এক্সক্লুসিভ। চ্যানেলের আফগান ব্যুরো অফিসটা অতি সাধারণ ছোটখাটো ভগ্নপ্রায় এক ভবন। সেখানে কারও ভিডিও সাক্ষাৎকার নিতে গেলে হয় ভবনের বাইরে এসে অথবা ছাদে গিয়ে নিতে হয়। এমনি জরাজীর্ণ পরিবেশের কারণে অনেক সময় হাস্যকর রকমের অঘটনও ঘটতে দেখা গেছে।

যেভাবে জন্ম হয়েছিল

আল-জাজিরার যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। জন্মের পাঁচ বছরের মধ্যে টিভি চ্যানেলটি আরব বিশ্বের সর্বাধিক দর্শিত চ্যানেলে পরিণত হয়েছে। কেউ কেউ এটাকে আরব-বিবিসি বলে আখ্যায়িত করে। অবশ্য উৎস খুঁজতে গেলে কথাটা অমূলক বলে উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি বিবিসি আরবী ভাষায় প্রচারিত একটি টিভি চ্যানেল খোলে এবং মধ্যপ্রাচ্যে এর অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে অনুষ্ঠান পরিবেশন বন্ধ করে দেয়।

আরবী টিভি চ্যানেলটি যখন নিশ্চিত অপমৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছিল তখন কাতারের আমিরের একটি পরিকল্পনায় এতে নতুন করে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। তিনি একটা স্বাধীন টিভি কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়ে এর জন্য ৫ বছরে ১০ কোটি ডলারের একটি তহবিলের ব্যবস্থা করেন। কেন্দ্রটির জন্য বিবিসির আরবী চ্যানেলের লোকদের একেবারে তৈরি স্টাফ হিসাবে পাওয়া গেল। তারাও সুযোগ পেয়ে এক সঙ্গে সবাই যোগ দিল এই কেন্দ্রে।

এবার কাতার দেশটি সম্পর্কে এখানে দুটো কথা বলে নেয়া ভাল। ৫ লাখ স্থানীয় লোক অধ্যুষিত কাতার প্রায় দেড়শ' বছর আল-থানী পরিবার কর্তৃক শাসিত হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

১৯৭১ সাল পর্যন্ত দেশটি ব্রিটেনের আশ্রিত রাজ্য ছিল। আগে দেশটির রফতানি আয় আসত মুক্তা থেকে। পরে তেল আবিষ্কৃত হবার পর দেশটি প্রাচুর্যের মুখ দেখে। কাতারের বর্তমান আমির ১৯৯৫ সালে তাঁর পিতাকে সরিয়ে শাসন ক্ষমতায় আসেন। তিনি দেশের বেশ কিছু উদারমুখী সংস্কার চালু করেছেন। দু' বছর আগে প্রথম কাউন্সিল নির্বাচনে মহিলাদের ভোট দেয়ার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার দেয়া হয়। আল-জাজিরা এসব উদারপন্থী ধ্যানধারণার বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এর পাশাপাশি বেশ কিছু প্রতিক্রিয়ারও জন্ম দিয়েছে। আরব সরকারগুলো সাধারণ আরব জনগোষ্ঠী আল-জাজিরার পরিবেশিত অনুষ্ঠানে বেশ আহত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল। টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান যে র‍্যাডিকেল চরিত্রের ছিল তা নয়, এর আলোচনা বা রাজনৈতিক বিতর্কে এমন সব বিষয় স্থান দেয়া হতো যেগুলো নিয়ে আরবরা পারিবারিক বা বন্ধুবান্ধব পর্যায়ে অহরহই ঘরোয়াভাবে আলোচনা করে থাকে। ইংরেজী ভাষায় হলে এ নিয়ে কোন সমস্যা হতো না। কিন্তু ইস্যুগুলোকে প্রকাশ্যে টেনে আনা হয়েছে এবং তাও আবার আরবীতে-এখানেই ছিল যত বিপত্তি। আরবদের এতদিনের সংস্কারের গায়ে এটা আঘাত হানে। প্রতিটি আরব সরকার আল-জাজিরার ওপর ক্ষেপে ওঠে। তারা তাদের মানসিক আঘাত সামলে নেয়ার পর আল-জাজিরার সমালোচনা শুরু করে। কাতারের ওপর কূটনৈতিক চাপ আসে। লিবিয়া ও কুয়েত তো এক সময় কাতার থেকে তাদের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করার হুমকি দিয়েছিল। সৌদি বিজ্ঞাপনদাতারা টিভি স্টেশনটি বয়কট করেছে। হালে অবশ্য এই চ্যানেলের সঙ্গে আরব নেতাদের প্রেম ও ঘৃণার সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগের চাপ খানিকটা কমেছে।

আরব অঞ্চলে আজও এক বিচিত্র ধরনের সেন্সরশীপ বিদ্যমান। সেখানকার রাষ্ট্রগুলো আজও তথ্যের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এসব দেশের সরকারী টিভি চ্যানেলগুলোয় সংবাদের শুরু হয় রাজা বা প্রেসিডেন্টের খবর পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। কোন কোন দেশে এমন ঘটনার কথাও শোনা গেছে যে, পত্রিকার প্রথম পাতার ওপরের দিকে সে দেশের রাষ্ট্রনায়কের ছবি না ছাপার জন্য কথিত স্বাধীন সংবাদপত্রের সম্পাদককে জবাবদিহির জন্য তলব করা হয়েছে। প্রচলিত এই যে ধারা এটাকে বদলে দিতে সাহায্য করছে আল-জাজিরা। ইতোমধ্যে এ অঞ্চলের গোটা মিডিয়ার ওপর প্রভাব রেখেছে এটা। অন্য চ্যানেলগুলোও এগিয়ে আসতে প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হচ্ছে। এমন কি প্রিন্ট মিডিয়া পর্যন্ত। মিডিয়ার পক্ষে এখন প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ খুলে গেছে। কারণ বাস্তবিকপক্ষে এখন তথ্যের প্রবাহ এমন হয়ে গেছে যে, সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার সত্যিই কোন উপায় নেই। কোন একটি চ্যানেল বা কোন একটি পত্রিকার মানুষের পছন্দ না হলে তারা অন্য চ্যানেল, অন্য পত্রিকার দিকে ঝুঁকবে।

কি নেই আল-জাজিরায়! সংবাদ আছে। পর্যালোচনা আছে। রাজনৈতিক বিতর্ক আছে। সোপ আছে। কুইজ আছে। এর অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে স্টুডিও বিতর্ক, যেখানে দর্শকরা ফোন করতে পারে। কখনও কখনও ঘন্টার পর ঘন্টা জুড়ে চলে বিতর্ক। এসব আলোচনা-বিতর্কের মধ্য দিয়ে আল-জাজিরা এ অঞ্চলের সমস্ত রকমের মতার্দশকে তুলে ধরছে। আল-জাজিরা নিজেকে হয়ত বিতর্কিত করছে। তবে এর বিশ্বাসযোগ্যতা ও পেশাদারী সততাও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। মিসরীয় ঔপন্যাসিক আহদাফ

www.pathagar.com

সুইফ আল-জাজিরার অনুষ্ঠান দেখে চমৎকৃত হয়েছেন।। এর বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই চ্যানেলের কারণে আরব বিশ্বে সংবাদ ও মতামত প্রকাশের ওপর সেন্সরশীপ অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, "এটা একটা জানালার মতো, যা দিয়ে আমরা মুক্ত বাতাস গ্রহণ করতে পারি।"

মিডিয়া কর্মী

সূত্র ঃ গার্ডিয়ান,

২২ অক্টোবর '০১।

শিশুটির কান্না কে থামাবে।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে প্রাথমিক যুদ্ধে পরাজিত বুশ বিশ্বকে জড়াচ্ছেন

ফয়েজ আহ্‌মদ

কয়েকদিন পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক প্রচেষ্টায় প্রেসিডেন্ট বুশ সর্ববিশ্বজনমত তার আফগানিস্তান নীতির পক্ষে আনয়নের জন্যে চীনের বৃহত্তম ও প্রাচীন শহর সাংহাইতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতাদের উপস্থিতিতে এপেক সম্মেলন করেছে। তার সাফল্য সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান। বিশ্বের বহু উল্লেখযোগ্য দেশ আফগানিস্তানে তালেবানদের উচ্ছেদ ও ওসামা বিন লাদেনকে ধরার জন্যে যে আক্রমণ চলছে তাতে নিরীহ ও স্থানীয় শাসনে নির্যাতিত নাগরিকদের যেনো যুদ্ধের শিকার হতে না হয় সে ব্যাপারে পূর্ব থেকেই বক্তব্য দিয়ে আসছিলো। সাংহাইতে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনে অনেক নেতার কণ্ঠে এ বক্তব্য অস্পষ্ট নয়। মালয়েশিয়ার প্রেসিডেন্ট মাহাথির ও চীনের প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিনকে আফগানিস্তানে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের পক্ষে সমর্থন দেবার জন্যে বুশকে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বুশ সাহেব প্রেসিডেন্ট পুতিনকে নিয়ে সম্মেলনে ভিন্নমত পোষণকারী নেতাদের আকৃষ্ট করার জন্যে ঐতিহ্যবাহী চীনা রঙিন ফুলতোলা 'টিউনিক' গায়ে দিয়ে উপস্থিত হন। একই পোশাকে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জিয়াং জেমিন হাসছিলেন-'ঠেকায় পড়লে বাবাজি কিনা করেন' এটিই বোধ হয় প্রেসিডেন্ট জেমিন দেখাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ আমেরিকা নিজেদের স্বার্থে গতকালের শত্রুর সঙ্গেও যে 'সোলম' বা 'খোলস' বদল করতে পারে সেটাই এ ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। প্রত্যেক নেতাই ওখানে জানেন যে, আফগানিস্তানের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী না করলে এবং বিশ্বের সমর্থন না পেলে আমেরিকা জয়ী হতে পারবে না।

যা আশঙ্কা করা দিয়েছিলো তা-ই বুশের নির্দেশে এখন আফগানিস্তানে ঘটছে-সাধারণ জনগণকে হত্যা। বুশ প্রশাসন শুধু নয়, আমেরিকা চরিত্রগত দিক থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এই নয়া সাম্রাজ্যবাদ গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক সাহায্য ও সিআইএ'কে দিয়ে নিজেদের হাতের পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করে আসছিলো। অর্ধশতাব্দিকাল থেকে তারা প্রচেষ্টা করে আসছিলো বিশ্ব বাণিজ্যকে এককভাবে গ্রাস করতে। তাদের সঙ্গী হচ্ছে ব্রিটেন। যে ব্রিটেন তথাকথিত লেবার পার্টির

www.pathagar.com

শাসনেও আমেরিকানদের লেজুড়বৃত্তি করেছে। আজকেও তারা একই কাজ শুরু করেছে।

সাংহাইতে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দেশ শেষ পর্যন্ত বুশকে সম্পূর্ণ খালি হাতে বিদায় না দিলেও সতর্কতা দিয়েছেন যে, আফগানিস্তানে সাধারণ মানুষের রক্ত যেনো না ঝরে। তিনি তার যুদ্ধের পক্ষে সম্পূর্ণ সমর্থন পেতে সক্ষম হন নি। টনি ব্লেয়ারই বুশের একমাত্র মুখ্য তল্পীবাহক। সন্ত্রাসের অর্থ ও ব্যাখ্যার প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্বের খ্যাতিমান অনেক বুদ্ধিজীবী ও রাষ্ট্রনায়করাও প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যান্য স্থানে দীর্ঘদিন যাবত যে কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে সে সমস্ত কার্যকলাপ কি সন্ত্রাসের মধ্যে পড়ে না ? প্রথম দিকে বুশের ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত বক্তব্য থেকে প্রকাশ পেয়েছিলো যে, তিনি বিশ্বের সর্বশক্তিমান তিন বাহিনীর সমন্বয়ে প্রধানমন্ত্রী ব্লেয়ারকে সঙ্গে নিয়ে আফগানিস্তানে কয়েকদিনের মধ্যে বিজয় পতাকা উড্ডীন করবেন। যাদের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান চালিয়ে আজ জয়লাভ করতে চান সেই শাসক গোষ্ঠীকে আমেরিকা ও তাদের সমর্থক পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলো। তাদেরই সৃষ্ট সেই রাষ্ট্র কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আজ বুশকে বিশ্বের সমর্থন নিয়ে অগ্রসর হতে হচ্ছে। বিন লাদেনকে তালেবানরাই আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়েছে। এতোদিন পর্যন্ত তালেবান শাসকদের নারকীয় শাসন ব্যবস্থা ও বিন লাদেনের বিরুদ্ধে আমেরিকা কোনো শব্দ উচ্চারণ করে নি। কারণ তারা তাদেরই শাসক দ্বারা দুঃশাসনে চরিত্রহীন হয়ে গেলেও তাদের কিছু আসে যায় না।

বেশ কিছুদিন পূর্বে আফ্রিকায় দু'টি আমেরিকান দূতাবাসে বোমাবর্ষণ এবং আমেরিকা বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র আক্রমণের পর আমরা লাদেনের কথা প্রধানত আমেরিকানদের মুখে শুনতে পাই। নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগনে অচিন্ত্যনীয় আক্রমণে সাধারন নাগরিকের মৃত্যুতে আমাদের স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রতি বেদনাবোধ রয়েছে। কিন্তু বুশের ব্যর্থ ও সতর্কতাশূন্য শাসনব্যবস্থা আমেরিকার এই জাতীয় বিপর্যয়ের জন্যে কতোটা দায়ী সেটা সহজেই অনুমেয়। এখন বুশ ও তার প্রশাসনের অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা ঢেকে রাখার জন্যে কল্পিত শত্রু ওসামার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে নিজেকে রক্ষার চেষ্টায় ব্যাপ্ত রয়েছেন। সে জন্যে তিনি প্রমাণিত কোনো শত্রু না পেয়েও আফগানিস্তানে আশ্রিত লাদেনকে আক্রমণের অছিলায় নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে লাদেনের সন্ধানে আফগানিস্তানের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এ কেবল আফগানিস্তান নয়। বিশ্বের আমেরিকার দুঃশাসন বিরোধী অন্যান্য দেশগুলোকেও তিনি রক্তচক্ষু দিয়ে শাসিয়ে দিতে চান।

তিন সপ্তাহ যাবত আরব সাগর থেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শত শত বোমারু বিমান পাঠিয়েও দেখা গেলো আফগানিস্তানের প্রধান শহরগুলো কাবুল, কান্দাহার, জালালাবাদ এবং এখন হেরাত ও মাজার-ই শরীফের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। একে বর্তমান যুদ্ধের ভাষায় বলা হয় কার্পেটিং বোম্বিং অর্থাৎ B1, B2, B56 ও অন্যান্য বোমারু এবং ফাইটার বিমান দিয়ে একাধারে বোম্বিং ও আক্রমণ করে। এই সমস্ত প্রধান শহরগুলোতে আমেরিকা কার্পেটিং বোম্বিং করে আফগানিস্তান জয় করে ফেলতে চেয়েছিলো। কার্পেটিং বোম্বিংয়ে তারা সমস্ত শহরগুলোকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করে। সে প্রচেষ্টা

বহুলাংশেই ব্যর্থ হয়েছে। এই জাতীয় দিবা ও রাত্রির বোম্বিং-এর ফলে আফগানিস্তানের মুখপত্রের দাবি অনুযায়ী ১ হাজারের ওপর দরিদ্র নাগরিককে প্রাণ দিতে হয়েছে। যারা অধিকাংশই তালেবান শাসনের সমর্থক নন। সর্বশেষ যে খবরটি এসেছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ। হেরাতে আমেরিকানরা একটি হাসপাতালে বোমাবর্ষণ করেছে যেখানে নিহত হয়েছে শতাধিক রোগী, ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য সাধারণ মানুষ। এই বীভৎস সাধারণ মানুষ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বুশ প্রশাসন সরাসরিভাবে জড়িত।

তারা বর্তমানে বাধ্য হয়ে সাময়িককালের জন্যে মিত্র হয়েছে এই সমস্ত দেশগুলোকে আশ্বাস দিয়েছিলো যে, কোনো সাধারণ নাগরিকের উপর আক্রমণ হবে না এবং তাদের আক্রমণ লাদেনের সঙ্গে সমর্থক প্রশাসনের ওপর হবে।

বাস্তবে যুদ্ধ অন্ধ। একথা আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ছিলো না যে, আফগানিস্তানে সাধারণ মানুষের এ যুদ্ধে মৃত্যু হবে না। তাছাড়া যুদ্ধে সর্বাগ্রে মৃত্যু হয় সত্যের। সেখানে দর্শন থাকে একটাই—ধ্বংস ও মৃত্যু। বিজয় হয় রক্ত প্রবাহের ওপরে। আমেরিকানরা তালেবানদের শায়েস্তা ও বিন লাদেনকে গ্রেফতারের জন্যে প্রায় ১৫ দিন দিবারাত্রি বোম্বিং করেও তাদেরই অতীতের সৃষ্ট মিত্র তালেবানদের ক্ষমতাচ্যুত ও শায়েস্তা করতে পারে নি। এখন তারা প্রকৃত যুদ্ধে নেমে গ্রাউন্ড স্পেশাল ফোর্স আফগানিস্তানের ভূমিতে নামিয়েছে। ইতোমধ্যে পেশোয়ারে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় তারা দু'জনকে হারিয়েছে।

বুশ টেলিভিশনে তাদের জন্যে কপট দুঃখ প্রকাশ করেছে। তালেবানরা ২ দিন পর্যন্ত দাবি করছে যে, গ্রাউন্ড ফোর্স নামাবার কালে তারা দু'টি আমেরিকান হেলিকপ্টারক ভূপাতিত করেছে। আল জাজিরা টেলিভিশনে তার ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশ প্রদর্শনও করেছে। বুশ প্রশাসন এ ঘটনা এখনো অস্বীকার করে যাচ্ছে। যেনো আমেরিকাকে কেউ আঘাত হানতেই পারে না!

এখন বিশ্ববাসীর কাছে প্রশ্ন হয়ে উঠেছে যে, আক্রমণকারী বুশ ও ব্লেয়ার বিশ্বব্যাপী নেতাদের মোটামুটি সমর্থন ব্যতীত আফগানিস্তানে শীত না আসা পর্যন্ত যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে কিনা। ধমক দিলে যে কোনো রাষ্ট্র তাদের সমর্থন দেবে এ জাতীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস অবিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে। শুধু আফগান শাসকরা নয় আরব বিশ্বে অনেক দেশ এ যুদ্ধকে ইসলামের ওপর আক্রমণ বলে আখ্যায়িত করছে। তাতে বুশ প্রশাসন উচ্চকিত হয়ে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে পৃথকীকরণের চেষ্টা করছে এবং বলছে, এ যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে। তখনই প্রশ্ন আসে প্রকৃত সন্ত্রাসী কে? তারা গোয়েন্দা বিমান দিয়ে চীনকে ঘিরে রেখেছে। তারা রাশিয়ার ওপরে এখনো B-২ জাতীয় চালকহীন বিমান প্রেরণ করে। তারা প্যালেস্টাইনে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করেছে ইসরাইলের সঙ্গে। তারা ১০ বছর পূর্ব থেকেই ইরানের উপর আক্রমণ করেছে, এখনো সে আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে।

কুয়েতের যুদ্ধে ইরাককে পরাজিত করেছে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী। তারও পূর্বে ইরানে তারা আক্রমণ চালিয়েছিলো। লিবিয়ার প্রেসিডেন্টকে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে আক্রমণের প্রস্তুতিতো তারা সর্বদাই রেখেছে। বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় আঞ্চলিক যুদ্ধ তারা লাগিয়ে রেখেছে। আলজেরিয়ায় যে কট্টর মুসলিমদের গোপন সহযোগিতা দান করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চলছে তার পেছনেও আমেরিকার প্রচেষ্টা রয়েছে। গত ৪০ বছর যাবত

www.pathagar.com

আমেরিকা থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরবর্তী ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র কিউবাতে তারা অবরোধ সৃষ্টি করে রেখেছে। এই কিউবা গোপনে আক্রমণ করতে গিয়ে 'বে অফ পিক'-এ আমেরিকা এক সময় পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছিলো। ক্যাস্ট্রো দিয়েছিলো জীবনপণ প্রতিরোধ।

ইরাকে এখনো আমেরিকান অবরোধের কারণে প্রতিদিন ওষুধ ও খাদ্যের অভাবে শিশু মৃত্যুর হার বেড়ে চলেছে। এ সমস্ত কি সন্ত্রাস ও আধিপত্যবাদের মধ্যে পড়ে না ? আমেরিকার মনোভাব এমন যে, সে আফগানিস্তানকে লক্ষ্য করে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতে প্রস্তুত।

আমেরিকার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তারা অপরাজেয়-তা ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এই অপরিমেয় শক্তির অধিকারী আমেরিকা আফগানিস্তানের মতো একটি ক্ষুদ্র জনশক্তি সম্পন্ন দেশে সর্ব মারণাস্ত্র প্রয়োগ করেও আঙুলের তুড়ি দিয়ে পরাজিত করতে পারে নি এবং একাজ সম্ভব নয় সেকথাও তারা প্রমাণ করলো। এখন তাদের বিশ্ব জনমত অন্তত বিশ্ব নেতাদের সহায়তার মুখোমুখি। অভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য ভৌগোলিক কারণে পাকিস্তান আমেরিকা যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। কিন্তু তাদের দেশে এজন্যে তাদের কৈফিয়ত দিতে হবে। যেমন- ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর আমেরিকার দিতে হয়েছিলো।

মোশাররফের দেয়া প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমেরিকার প্রচারযন্ত্র ও প্রশাসনে তোলপাড় শুরু হয়েছে। মধ্য এশিয়ার কোনো কোনো রাষ্ট্র যে সহযোগিতার মৌখিক আশ্বাস দিচ্ছে তা কেবল বৃহৎ রাজনীতির প্রেক্ষাপটে, বিশ্বযুদ্ধের জন্যে নয়। প্রকৃত ব্যাখ্যায় দেখা যাবে এখনো সাংহাই সম্মেলনের পর আমেরিকা-ব্রিটেন এককভাবে অপর দেশ দখলের প্রচেষ্টার জন্যে দায়ী হতে পারে। এখনো তারা আবিষ্কার করতে পারে নি অ্যানথ্রাক্স জীবাণু কারা কোথা থেকে প্রেরণ করছে। এই আতঙ্ক আমেরিকান মানুষকে আতঙ্কিত করেছে। এই জীবাণু যুদ্ধ শুধু নয়, আমেরিকার বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণ রাস্তায় নেমেছে সাধারণ মানুষ হত্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যে যুদ্ধের প্রথম দিক থেকেই।

আফগানিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তান সৈন্য ব্যবহারের ইঙ্গিত করেছে আমেরিকা। সে কারণে তারা পাকিস্তানের সুস্পষ্ট উত্তরের জন্যে সিএনএন-এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট মোশাররফের একটি বিশেষ সর্বশেষ সাক্ষাতকার নিয়েছে। তিনি বলেছেন, আমরা সহযোগিতা করতে রাজি এবং স্থল, আকাশপথ ও কৌশলগত সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। কিন্তু আমরা সৈন্য প্রেরণ করবো না। আমেরিকা-ব্রিটেন জানে যে, এই যুদ্ধে আফগানদের হারাতে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী রূপ দেয়া লাগতে পারে। এ কথা আমেরিকানরা আফগানিস্তান আক্রমণের এক সপ্তাহ পরেই বলেছে। এ যুদ্ধ বিশ্বের সমগ্র দেশকে অর্থনৈতিক সংকটে ফেলেছে। উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে অনেক দেশের। বাংলাদেশও তার বাইরে নয়।

আমরা আফগানিস্তানে তালেবানদের বর্বর শাসনের বিরুদ্ধে। আফগানিস্তানের তালেবানবিরোধী প্রতিবাদী নিরব ও আক্রান্ত জনগণের সঙ্গে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, শান্তিকামী প্রকৃত গণতন্ত্রমুখী আফগানদের ওপর তালেবানদের পরাজিত করার অজুহাতে যে দুর্যোগ নেমে এসেছে সেই সীমাহীন দুর্যোগের জন্যে বুশই দায়ী। এবারকার যুদ্ধ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার যে আশঙ্কা তার নেতৃত্ব বুশই দিচ্ছেন। এই যুদ্ধ

www.pathagar.com

যদি আরো ব্যাপকতা লাভ করে তবে তা হবে ব্যতিক্রমী। ১৯৪১ সালে পার্ল হারবারে জার্মানিদের বোমাবর্ষণের পর সাধারণ আমেরিকানরা শত্রুর হাতে নিজেদের রক্ত দেখে নি। কিন্তু এ যুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই ৬ হাজার সাধারণ আমেরিকানদের মৃত্যুর খবর বয়ে এনেছে।

আমরা তালেবানদের মধ্যযুগীয় বর্বর শাসন ব্যবস্থার বিরোধী হলেও তালেবান শাসনবিরোধী সাধারণ আফগানদের পক্ষে। একই কারণে আমরা বুশের যুদ্ধংদেহী মনোভাবকে প্রত্যাখ্যান করি, কিন্তু এ যুদ্ধে তালেবানদের বিজয় আমরা কামনা করি না। কিন্তু অপরের ভূমি বা দেশ দখলে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের আকাঙ্ক্ষাকে দানবীয় শক্তির প্রয়াস বলে মনে করি। কোনো যুদ্ধই কোনোদিন সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারে নি। তবুও বুশ সাহেব যে অসত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন সেক্ষেত্রে তিনি সত্যনিষ্ঠার মৃত্যুই ডেকে এনেছেন। তিনি যুদ্ধে নেমে যে জাল বিস্তার করেছেন তার পরিব্যাপ্তি থেকে নিজেকেও রক্ষা করতে পারবেন কিনা তা বলা কঠিন। ❑

২৩ অক্টোবর ২০০১

লেখক ঃ বুদ্ধিজীবী।

এই হত্যার জবাব কি?

মার্কিন কমান্ডো, তালেবান গেরিলা ও নর্দার্ন অ্যালায়েন্স ঃ কার কত শক্তি

শাহ মুহাম্মদ মুতাসিম বিল্লাহ

আফগানিস্তানে বোমা ফেলা হচ্ছে হরদম। রাতদিন সকাল-বিকাল কিংবা রোববার-শুক্রবারের কোন বাছবিচার নেই। এই দু'টি শক্তির লড়াই। একটি হলো যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক আন্তর্জাতিক শক্তি। অন্যটি ওসামা বিন লাদেনের সমর্থক তালেবান শক্তি। এই দুই শক্তির যাঁতাকলে বিশ্ব মানবতা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তা দেখার আগে বিবদমান পক্ষগুলো কে কার কত ক্ষতি করলো সেদিকেই কড়া নজর রাখছে। কিভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায়, পরাস্ত করা যায়, নিশ্চিহ্ন করা যায় তাই বিবেচ্য হয়ে উঠেছে। প্রচলিত ধারণায় এটিই হলো যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিশ্ব সন্ত্রাস ঠেকাতে যুদ্ধ ঘোষণা করে আফগানিস্তানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনীর হামলা কি আরেক সন্ত্রাসের জন্ম দিচ্ছে?

সন্ত্রাসের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা না থাকায় এ বিষয়ে বিতর্ক থেকেই যাবে। আর বলবানের অস্তিত্বই বিকশিত হবে। তাহলে বলবান কে ?

এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে আফগানিস্তানের তালেবান বাহিনীকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে এই যুক্তরাষ্ট্রকেই। এ যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র একা নয়–তাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করছে বিশ্বের ক্ষমতাধর সবকটি রাষ্ট্র। তালেবান বাহিনীকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনীর হামলা সহ্য করা ছাড়াও বিরোধী নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের আক্রমণও মোকাবিলা করতে হচ্ছে। দ্বিমুখী আক্রমণে তালেবান লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও গতকাল রোববার পর্যন্তও তা হয়নি। ক্ষয়িষ্ণু শক্তি নিয়ে তালেবান বাহিনী এখনো এর পূর্বেকার অবস্থানের ওপরই অটুট রয়েছে। তালেবানের সামরিক শক্তি একে একে ধ্বংস হতে থাকলেও তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতার কমতি নেই। এই ক্ষমতার বলেই তারা মান্ধাতার আমলের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উচ্চ প্রযুক্তির অধিকারী আধুনিক সামরিক শক্তিধর যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে। এদের সামরিক শক্তির তুলনামূলক চিত্র দেখলে এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়।

আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক অভিযান পরিচালনাকারী সেনারা বিশেষ অপারেশন

www.pathagar.com

কর্মকাণ্ডে উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪৪ হাজার মার্কিন সৈন্য ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা হিসেবে প্রস্তুত। এরা টার্গেট এলাকার বাইরে ও ভেতরে যে কোন সময় আক্রমণ চালাতে সক্ষম। এছাড়া আফগানিস্তানের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে ইউএসএসওকম-এর কয়েকটি ইউনিট কাজ করছে। মার্কিন ফ্রন্টলাইনের আওতাধীন বিশেষ অপারেশন কমান্ডের মধ্যে আছে আর্মি রেঞ্জার্স, গ্রিন বেরেটন, ডেলটা ফোর্স এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর অন্য কমান্ডোরা। তালেবানবিরোধী নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের প্রতিও মার্কিন বাহিনী সমর্থন প্রকাশ করেছে। নর্দার্ন অ্যালায়েন্সও তালেবান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। মার্কিন বাহিনী এদের অগ্রযাত্রায় সাহায্যও করছে। তালেবানবিরোধী বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠন করা হয় নর্দার্ন অ্যালায়েন্স। এই জোটে ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার সৈন্য আছে। নর্দার্ন অ্যালায়েন্সকে রাশিয়া ট্যাঙ্ক ও কামান দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

অন্যদিকে তালেবান বাহিনীতে আছে ৪৫ হাজার সৈন্য। এর অধিকাংশই অনিয়মিত। তালেবান বাহিনীতে গেরিলা যুদ্ধে অভিজ্ঞ অনেক কমান্ডার রয়েছেন। এই বাহিনীতে ৮ হাজার পাকিস্তানি ও আরব স্বেচ্ছাসেবক আছে। ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়দা সংগঠনের প্রতি অনুগত মিসর, সৌদি আরব, ইয়েমেন ও সুদানের লোকদের নিয়ে গঠিত ৫৫ তম ব্রিগেডও তালেবান বাহিনীতে রয়েছে। এদের প্রত্যেকেই ওসামা বিন লাদেনের কথিত সন্ত্রাসী শিবিরগুলোতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এরা সবাই শত আক্রমণের মুখেও পিছু হটতে রাজি নয়, অকাতরে জীবন দিতে প্রস্তুত। এদের একটা লক্ষ্য মার্কিনবিরোধী যুদ্ধে মরলে শহীদ আর বাঁচলে গাজি। তালেবান বাহিনীর আরব ইউনিটগুলো কান্দাহার ও হেরাত অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ করছে।

মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে লেসার নিয়ন্ত্রিত এজিএম ৬৫ ম্যানভেরিক বোমা, ক্লাস্টার বোমা, এমাইনম ১২০ ক্ষেপণাস্ত্র, এম ৪এ১ গ্রেনেড নিক্ষেপযোগ্য বন্দুক এবং এসি-১৩০ বোমারু বিমান ও নিঃশব্দে চলাচলকারী এমএইচ ৬জে লিটল বার্ড হেলিকপ্টারসহ বিভিন্ন অত্যাধুনিক জঙ্গি বিমান ও অস্ত্র ব্যবহার করছে। স্থল অভিযানে অংশ নেয়া মার্কিন কমান্ডোদের কাছে কেভলার দেহবর্ম স্যাটেলাইট ল্যাপটপ জিপিএস নেভিগেশন সুবিধা ও ছোট গ্রেনেড আছে। পক্ষান্তরে তালেবান বাহিনীর আছে একে ৪৭ রাইফেল, যুক্তরাষ্ট্র নির্মিত স্টিংগার বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র (২শ) ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান। তাদের কাছে রাসায়নিক অস্ত্র ফসজিন গ্যাসও থাকতে পারে।

তালেবান বাহিনীর কাছে রাসায়নিক বা জীবাণু অস্ত্র এমন কি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির উপাদান থাকলেও এটা সহজভাবেই বলা যায় সামরিক শক্তির দিক দিয়ে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনীর কাছে বিন লাদেন সমর্থক তালেবান বাহিনী বড় কোন ফ্যাক্টর নয়। যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে এদের পরাস্ত করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। তালেবান বাহিনীকে পরাস্ত করাই কি মার্কিন বাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য ? নাকি আরো কিছু আছে। যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার জন্য অভিযুক্ত ওসামা বিন লাদেন ও তার সমর্থক তালেবান বাহিনী প্রধান মোল্লা মোহাম্মদ ওমর যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তানে হামলাকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধ হিসেবে দেখতে চান না। তাদের কথা হলো যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। ইসলামের অগ্রযাত্রা, জয়যাত্রা ধ্বংস করে দেয়াই এর লক্ষ্য।

www.pathagar.com

বিশ্লেষকদের কেউ কেউ একে ইসলামি সভ্যতার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব বা লড়াই বলে আখ্যায়িত করতে চাইলেও ইসলামি বিশ্ব তাতে সাড়া দিচ্ছে না। তবে অধিকাংশ ইসলামি দেশই আফগানিস্তানে মার্কিন হামলাকে সতর্কতার সাথে দেখছে। ইসলামি দেশগুলোর সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করলেও সেসব দেশের অভ্যন্তরে এ নিয়ে বিরোধ দানা বাঁধছে। এক্ষেত্রে পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার কথা বলা যায়। শুধু ইসলামি দেশই নয়, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশেও মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ চলছে। বিক্ষোভে সহিংস ঘটনাও ঘটেছে। ভারতের মুম্বাইয়ে বিক্ষোভের ঘটনায় পুলিশের গুলিতে কমপক্ষে ৭ জন মারা যায়। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রায় ১০ হাজার জঙ্গি আফগানিস্তানে গিয়ে মার্কিনবিরোধী যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হয়েছে।

পাশাপাশি মার্কিন বাহিনীও আফগানিস্তানে সামরিক হামলা জোরদার করছে। তারা তালেবান অবস্থানের ওপর কাবুল বিমানবন্দর, হেরাত, কান্দাহার ও মাজার-ই-শরিফে বৃষ্টির মতো বোমা ফেলে চলেছে। উদ্দেশ্য তালেবানের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করা। এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আফগানিস্তানের পাহাড়ি ভূখণ্ড, কান্দাহার- কাবুল - হেরাত প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমি মাইন, লুকিয়ে থাকা শত্রুবাহিনী ও বুবি ট্র্যাপ। নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের আক্রমণের লক্ষ্যও হলো হেরাত ও বাগওয়ানের বিমানবন্দর, কাবুলের উত্তরে তালেবান প্রতিরক্ষা লাইন, আরব ৫৫তম ব্রিগেড ব্যারাক, মাজার-ই-শরিফে তালেবান ঘাঁটি। তারাও চাচ্ছে তালেবানকে ক্ষমতাচ্যুত করা। এ লক্ষ্য সাধনে তাদের জোটের অভ্যন্তরীণ বিরোধই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে তালেবান চাইছে কাবুল, কান্দাহার ও অন্যান্য এলাকায় তাদের প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে মার্কিন বাহিনীকে পরাস্ত করা কিন্তু মার্কিন সামরিক শক্তি ও সংবেদনশীল গোয়েন্দা প্রযুক্তি তালেবান সেনাদের পদে পদে পর্যুদস্ত করে দিচ্ছে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনীই তালেবানের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছে। তালেবানের ক্ষমতাচ্যুতির পর কোন ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে এ নিয়েও চলছে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা।

কিন্তু এতসবের পরও প্রশ্ন থেকে যায় আফগানিস্তানে মুহুর্মুহু বোমা ফেলে তালেবানকে ক্ষমতাচ্যুত করার মাধ্যমেই কি এই দুনিয়া থেকে সন্ত্রাস দূর করা যাবে ? সন্ত্রাসের পেছনে মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিকসহ অন্য যেসব কারণ কাজ করছে তা কি দূর করা হবে না ? নাকি নিতান্ত প্রতিশোধস্পৃহাবশত নিজের শ্রেষ্ঠত্ব টিকিয়ে রাখতে এমনি হামলা অন্যান্য এলাকায়ও চালানো হবে?

মিডিয়া কর্মী

তথ্য সূত্র ঃ টাইম।

২৩ অক্টোবর '০১

www.pathagar.com

ওমর ও লাদেনের একান্ত কথা

ফারুক চৌধুরী

গত ২০ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় আমার সাক্ষাৎকার ছিল উর্দু দৈনিক আওসাপের সম্পাদক হামিদ মিরের সঙ্গে। ৩৬ বছর বয়স্ক এই সাংবাদিক কিছুদিন আগেও সুপরিচিত ছিলেন না মোটেও। তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন নিউইয়র্ক আর ওয়াশিংটনে বোমা হামলার পরপরই। তার কাছেই ওসামা বিন লাদেন লোক মারফত জালালাবাদ থেকে বার্তা পাঠালেন, তিনি এই বোমা হামলার জন্য দায়ী নন, যদিও তিনি তা সমর্থন করেন। তার এক সাক্ষাৎকার আমি বিবিসি টেলিভিশনে দেখেছিলাম। প্রথম আলোর সম্পাদক, অনুজ প্রতিম মতিউর রহমান আমাকে পাকিস্তানে আসার অনুরোধ করলেন। তার অনুরোধে দাবির মাত্রাই বেশি ছিল। রাজি হলাম তাৎক্ষণিকভাবেই, আর সেদিনই সিদ্ধান্ত নিলাম, ইসলামাবাদে হামিদ মিরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করব।

হামিদ মিরের ব্যস্ততার আজকাল শেষ নেই। তিনি তার সম্পাদকীয় দায়িত্ব ছাড়াও ওসামা বিন লাদেনের জীবনী লেখার কাজ হাতে নিয়েছেন। তাছাড়া আফগানিস্তানের ভেতরে তার রয়েছে একাধিক রিপোর্টার। তাদের সঙ্গে মোবাইল টেলিফোনে যোগাযোগে তাকে ভয়ানক ব্যস্ত থাকতে হয়। তদুপরি উৎসুক দর্শনার্থীর ভিড় তো আছেই, যারা ওসামা বিন লাদেন আর মোল্লা ওমরের কাছের একজন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহী। হামিদ মিরের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের সময় পেতে আমাকে কাঠখড় পোড়াতে হলো না খুব একটা। কারণটা তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়েই বুঝতে পারলাম। ১৯৭১-এর আগস্ট মাসে তার অধ্যাপক পিতা প্রফেসর ওয়ারেস মির, যিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের হেড ছিলেন, তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের আমন্ত্রণে ঢাকা সফর করেন, সফর শেষে তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করেন লিখিতভাবে। বড় হয়ে হামিদ মির তার পিতার লেখাগুলো পড়েছেন। ১৯৭১ সালে বর্তমানে ৩৬ বছর বয়স্ক সুদর্শন এই সাংবাদিক তার পিতা ওয়ারেস মিরকে তিনি দখলকৃত বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ-কষ্ট বর্ণনা করে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখেছিলেন। বাংলাদেশের প্রতি তার রয়েছে একটি বিশেষ আকর্ষণ।

ইসলামাবাদের আবপাড়ায় অবস্থিত দৈনিক আওসাফ অফিসে ব্যস্ততার ছাপ।

www.pathagar.com

সম্পাদকের নাতিবৃহৎ কামরাটিতে কম্পিউটারে কর্মরত রয়েছেন হামিদ মিরের একজন সহকর্মী। টেবিলের টেলিফোনটি বেজেই চলেছে, যেন আমি নির্বিঘ্নে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করতে না পারি। আর হামিদ মিরের মোবাইলটিও টেবিল টেলিফোনের সুরে সুর মিলিয়ে বেজেই চলেছে। ৩ মিনিট পরপরই অফিসের ম্যানেজার হাজির হচ্ছে ফ্যাক্স বার্তা হাতে নিয়ে। দৈনিক আওসাফ এখন যুদ্ধক্ষেত্রের অতি কাছে। আমার বসা অবস্থায়ই জালালাবাদ থেকে টেলিফোন এল আফগানিস্তানে আওসাফ পত্রিকার রিপোর্টার মোহাদ্দেস ইকবালের। তিনি নাকি খবর পেয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের একটি জঙ্গিবিমান কিছু আগেই ভূপাতিত হয়েছে। 'মনে হচ্ছে এটি গুজব, এ ধরনের খবর নিয়ে টেলিফোন, নিশ্চিত না হয়ে করো না'- ভর্ৎসনার রেশ রয়েছে হামিদ মিরের কণ্ঠে (রিপোর্টটি সত্যি ছিল না)। মোহাদ্দেস ইকবাল আরো জানালেন, পাকিস্তান থেকে শত শত পাঠান 'জেহাদে' অংশ নিতে সীমান্তে পাড়ি জমাচ্ছেন। তারপর এল ব্যবসায়ী কথায়। অতিরিক্ত ৭ হাজার কপি আওসাফ প্রতিদিন জালালাবাদ পাঠানোর যেন ব্যবস্থা করা হয়। ওপরে পাকিস্তান থেকে জেহাদে অংশ নিতে হাজার হাজার পাঠান যাওয়ার ফলে পত্রিকাটির চাহিদা বাড়ছে তো বাড়ছেই। কথাটি আমাকে সম্পাদকীয় তৃপ্তিতেই বললেন হামিদ মির।

দৈনিক 'জঙ্গ' পত্রিকাতে হয়েছিল হামিদ মিরের সাংবাদিক জীবনের হাতে খড়ি। তারপর তিনি 'ডেইলি পাকিস্তান' বলে একটি দৈনিকের সম্পাদনা করেন। ১৯৯৬-এর নভেম্বর মাস। আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের সহকারী সেক্রেটারি অফ স্টেট রবিন রাফায়েল তালেবানদের সমর্থনে নিউইয়র্কে একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণের প্রতিবাদে হামিদ মির 'মাদার অফ তালেবান' শীর্ষক একটি কলাম লেখেন, যাতে তালেবানের কঠোর সমালোচনা ছিল। হামিদ মির আমাকে বললেন, সেই কলামে তিনি প্রশ্ন রেখেছিলেন, আমেরিকানরা কট্টরপন্থী তালেবানকে কেন সমর্থন করছে? এই কলামটি ছাপা হওয়ার পর পাকিস্তানে তালেবানদের কিছু সমর্থক কান্দাহারে মোল্লা ওমরের সঙ্গে হামিদ মিরের সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করলেন। রাশিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধে ডান চোখ হারানো, তালেবানদের বর্তমান নির্বাচিত 'আমিরুল মুমিনিনের' বয়েস এখন মাত্র ৪২ (আফগানিস্তানে গড়পড়তা মানুষের আয়ু এখনো ৪৭!) কান্দাহারে ১৯৯৬-এর সেই ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় মোল্লা ওমর সেজে বসেছিলেন। তিনি হামিদ মিরকে নৈশভোজের দাওয়াত জানালেন। মেনু-আলুর সোরবা (ঝোল), লম্বা শুকনো রুটি আর সবুজ চা।

মনে হলো, মোল্লা ওমর হামিদ মিরের অতীতে ছাত্র রাজনীতিতে অংশ নেওয়া সম্বন্ধে অবগত আছেন। তিনি বললেন, 'ছাত্র হিসেবে আপনিই তো আফগানিস্তানে রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মোজাহেদদের সমালোচনা করতেন। তাই বলে কি আপনি রাশিয়ার এজেন্ট? তালেবানকে আপনি কেন আপনার নিবন্ধে আমেরিকার এজেন্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন? আসলে আমেরিকানরা আমাদের সমর্থন করছে তাদের নিজের স্বার্থে। তুর্কমেনিস্তান থেকে আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তানে গ্যাসের পাইপ লাইন তৈরির একটি প্রস্তাব রয়েছে। প্রকল্পে ব্যয় হবে ৫ বিলিয়ন ডলার। আমেরিকানরা সেই কাজটি চাইছে বলেই তারা আমাদের সমর্থন জানাচ্ছে'- বললেন মোল্লা ওমর। হামিদ মিরও তখন জেনেছেন, অবসরপ্রাপ্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত রবার্ট ওকলিকে তাদের 'লবিস্ট' হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। আমেরিকান কোম্পানি ইউনকল আশা ব্যক্ত করেছে, তারা কাজটি

www.pathagar.com

পাবে। মোল্লা ওমর জানালেন, তালেবানরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কাজটি দেওয়া হবে আর্জেন্টিনার 'ব্রিদাস' কোম্পানিকে। তিনি বললেন, আমেরিকানরা ওসামা বিন লাদেনকে এই সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী করবে, আর তাকে 'সমুচিত শিক্ষা' দিতে চাইবে। আপনি তখন আর তালেবানকে আমেরিকান এজেন্ট বলে আখ্যায়িত করবেন না' - মোল্লা ওমর বললেন। মোল্লা ওমর বললেন, হামিদ মির যেন ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

মোল্লা ওমরের স্পষ্টবাদিতা খুব ভাল লাগল হামিদ মিরের। তিনি কান্দাহারের মানুষের কাছে প্রশ্ন রাখলেন, কেন তারা মোল্লা ওমরের প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল ? তাদের উত্তর, মোল্লা ওমর শান্তি আর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। সেই ন্যায়বিচারের একটি নিদর্শন হামিদ মির পরদিনই প্রত্যক্ষ করলেন কান্দাহারের একজন বিচারকের কক্ষে। একজন মা এসে অভিযোগ জানালেন, তার নিজের সন্তান, তার ছেলে নাকি তাকে মারধর করেছে। পাকড়াও করে আনা হলো ছেলেটিকে। তার শাস্তি ৫/৬ কিলো পানিভরা একটি পাত্র গলায় বেঁধে তাকে থাকতে হবে নয় মাস। ছেলেটি যাতে আদেশ পালন করে তার নিশ্চয়তা বিধান করবে সার্বক্ষণিক একজন সশস্ত্র তালেবান প্রহরী। বিচারকের কথায়, তখনই ছেলেটি বুঝবে যে তার ভার নয়টি মাস বয়ে নিয়ে বেড়াতে কী কষ্ট হয়েছিল মায়ের!

হামিদ মির আমাকে জানালেন, ছয় ফুট দীর্ঘকায় মোল্লা ওমর রক্ত গৌরবর্ণ। ইসলামিক বিষয়াদিতে তার জ্ঞান গভীর, যদিও তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা খুবই সীমিত। গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তি তিনি, অত্যন্ত রক্ষণশীল। তার ছবি ওঠানোতেও রয়েছে শক্ত আপত্তি।

মোল্লা ওমরের নির্দেশে হামিদ মিরের সাক্ষাৎ হলো ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে। প্রথমবারের মতো ১৯৯৭-এর মার্চ মাসে জালালাবাদের সন্নিকটে, যেখানে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হামিদ মিরকে। দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়েছে ১৯৯৮-এর মে মাসে কান্দাহারে। তারপর তিনি ওসামা বিন লাদেনের কাছে ফিরে গেছেন অনেকবারই। কিন্তু সেসব সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে তিনি নারাজ। মানবনির্মিত গুহাতেই ওসামা বিন লাদেনের বাস। ঋজু দীর্ঘকায় এই মানুষটির রঙ ফর্সা। হাস্যরস তার আছে, তবে ধর্মীয় বিষয়াদিতে মোল্লা ওমরের পাণ্ডিত্য তার নেই। তেজদৃপ্ত বক্তাও তিনি নন। বক্তৃতায় মানুষকে উদ্বেলিত করার ক্ষমতা তার তেমন নেই। মোল্লা ওমর ওসামার চেয়ে বেশি উগ্রবাদী।

হামিদ মির বললেন, ওসামার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়ে তাকে গুহাতে অবস্থান করতে হয়েছিল এক রাত। কারণ সান্ধ্য ভোজনের পর সাক্ষাৎকারে রাজি হননি ওসামা বিন লাদেন। নৈশভোজ ছিল মোল্লা ওমরের খাবারের মতো আলুর ঝোল নয়। ছিল পোলাও-এর ওপর বিছানো আস্ত একটি দুম্বার রোস্ট, পেস্তা, বাদাম, সালাদ আর টমেটো। রাতযাপনের পর ফজরের নামাজ, তারপর ভোর সাড়ে ৫টায় প্রাতঃরাশের পর তার সাক্ষাৎকারটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাতে গুহার ভেতর মশার উৎপাত ছিল যথেষ্ট- জানালেন হামিদ মির। ওসামা বিন লাদেনের সামনে যেতে দেহ তল্লাশির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। হামিদ মিরের বেলায় পকেটের কলমটিও নিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। পরিবর্তে তাকে দেওয়া হয়েছিল অন্য একটি অধিকতর মূল্যবান কলম। হামিদ মির

www.pathagar.com

জানালেন, ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে প্রথম আসেন ১৯৭৯ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে। অবস্থান করেন ১৯৯১ পর্যন্ত। তারপর স্বদেশ সৌদি আরবে ফিরে যান। সেখান থেকে ক'বছরের জন্য তিনি যান সুদানে। ১৯৯৬ সালের মে মাসে ওসামা বিন লাদেন ফিরে আসেন আফগানিস্তানে। ওসামার বিত্তশালী পিতা আল-আকসা ও মদিনার মসজিদের সংস্কারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

হামিদ মির আমাকে বললেন, ওসামার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো আরবভূমি থেকে ইহুদি এবং খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের বিতাড়িত করা। তার পিতার মৃত্যুকালে ওসামার বয়স ছিল মাত্র ১০। কিন্তু আরবভূমি থেকে ইহুদি আর খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের বিতাড়নের এই 'অনুপ্রেরণা' তিনি তার পিতার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। তার এই অভীষ্ট লক্ষ্যের পক্ষে ওসামা কোরআন শরিফের 'সূরায়ে বাকারার' উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। নব্বইয়ের দশকের প্রারম্ভে ওসামা যখন সৌদি আরবে, তখন সে দেশের সরকারও তার সাহায্য চেয়েছিলেন সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করতে। রাজি ছিলেন ওসামা। তবে এক শর্তে। সৌদি সরকার যেন সে দেশ থেকে আমেরিকানদের বিতাড়িত করেন। হামিদ মির বললেন, তিনি ওসামাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমেরিকানদের হত্যা করার যৌক্তিকতা কী ? কোনো তাৎক্ষণিক উত্তর ওসামার ছিল না। কিন্তু পাশে বসা ডা. জাওয়ারি (মিসরীয় নাগরিক) বললেন, আমেরিকানদের প্রদত্ত অর্থে ইসরায়েল সামরিক সাজসরঞ্জাম আর অস্ত্র ক্রয় করে থাকে আর সেই দেশ প্যালেস্টেনিয়ানদের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত। অতএব, আমেরিকানদের হত্যা করার যৌক্তিকতার রয়েছে বৈকি। হামিদ মির আমাকে জানালেন, সৌদি রাজপরিবারেরও ওসামার প্রভাবশালী সমর্থক রয়েছে। তিন বছর আগে মদিনার মসজিদের গ্র্যান্ড ইমাম আবদুর রহমান হুজায়েফি সৌদি আরবে আমেরিকার সামরিক উপস্থিতির তীব্র নিন্দা করেন। তিনি তাই বর্তমানে পদচ্যুত। কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করার সাহস কারো হয়নি, কারণ সৌদি যুবরাজ আবদুর রহমান হুজায়েফির সমর্থক।

হামিদ মিরের মতে, ওসামার বৈশিষ্ট্য পরিকল্পনার আর মোল্লা ওমরের নেতৃত্ব প্রদানে। ওসামার বিচরণ নিভৃতে কিন্তু নেপথ্যে থেকেও মোল্লা ওমরের সম্মোহনী শক্তি অসাধারণ। কোনো অবস্থাতেই মোল্লা ওমর ওসামাকে হস্তান্তর করবেন না, কারণ তাদের ট্রাডিশনে ওসামা মোল্লা ওমরের হাতে হাত রেখে তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। ওসামার জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্তের ভার মোল্লা ওমরের। তাদের জীবন মানে জেহাদ আর মৃত্যুতে রয়েছে শাহাদত। বিপদে বিচলিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না ওসামা, ওমর আর তাদের অনুচরদের-বললেন হামিদ মির।

মোল্লা ওমরের যোদ্ধাদের মাঝে বাংলাদেশীও কিছু রয়েছে। জনাতিনেকের সঙ্গে তো হয়েছে হামিদ মিরের ব্যক্তিগত পরিচয়। তারা আশির দশক থেকেই রয়েছেন আফগানিস্তানের যুদ্ধে। হামিদ মির যখন মোল্লা ওমরের সাক্ষাৎপ্রার্থী ছিলেন, তার গাইডদের একজন ছিলেন বাংলাদেশী। হামিদ মির বিশ্বাস করেন, ওমর আর ওসামাকে মেরে ফেললেও তালেবানদের শেষ করা যাবে না। আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণ শুরু হয়েছিল গত ৭ অক্টোবর থেকে। তার ফলে তালেবানরা হয়েছে আরো সুসংহত, আরো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আরো শক্তিশালী। সীমান্তের এপারের পাকিস্তান থেকে যোগ দিচ্ছে হাজার হাজার পাখতুন যোদ্ধা, যাদের 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন! পারভেজ

www.pathagar.com

মোশাররফ এদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না বলেই মনে করেন হামিদ মির। যাদের অভিধানে জেহাদে মৃত্যু নেই, রয়েছে শাহাদতের দরজায় প্রবেশের অপূর্ব সুযোগ, তাদের কি দমিয়ে রাখা যাবে- হামিদ মিরের প্রশ্ন।

হামিদ মিরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমাকে গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এলেন তিনি। ব্যস্ত পেশাদার সাংবাদিক হামিদ মির। আবার ফিরে যাবেন তার টেলিফোন মোবাইল আর ফ্যাক্সের ভুবনে। সুপরিকল্পিত ছিমছাম ইসলামাবাদে তখন রাত নেমেছে, জ্বলজ্বল করছে অসংখ্য বিজলি বাতি। এখানে এখন আলোর বন্যা। সীমান্তের ওপারের আফগানিস্তানে ঘুটঘুটে বিদ্যুৎহীন রাতের অন্ধকারকে হয়তো বা চমকানো বিদ্যুতের মতো এখন আলোকিত করছে নানা নামের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের অগ্নিচ্ছটা। আলেকজান্ডার, তৈমুর, বাবরের সৈন্যদের পদভারে একদা টলমল আফগানিস্তানে মধ্যযুগীয় বিজয়ীর বর্বরতাকেও কি ছাড়িয়ে যায়নি একবিংশ শতাব্দীর অত্যাধুনিক এই ধ্বংসযজ্ঞ ? কিন্তু তালেবানদের জন্য একি ধ্বংসযজ্ঞ না শাহাদতের পয়গাম ? এই উন্মত্ততার শেষ কোথায়? কবে ?

আগামীকাল আমার সাক্ষাৎকার পাকিস্তানে নিযুক্ত তালেবান রাষ্ট্রদূত মোল্লা আবদুস সালাম জায়েফের সঙ্গে, কী প্রশ্ন রাখি তার কাছে। ❑

সাবেক পররাষ্ট্র সচিব, কলাম লেখক, ২৩ অক্টোবর/ইসলামাবাদ থেকে

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের ভবিষ্যত

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ থেকে শুরু করে বাইরের আক্রমণের ফলে নানাভাবে সাধারণ নাগরিকের জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। তাদের অবস্থা অনেকাংশে প্রচলিত বাংলা প্রবাদের মতো: রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, নল খাগড়ায় প্রাণ হারায়। একটি দেশের ওপর গত দু'শ' বছর ধরে রাজনৈতিক পরিবর্তন, রাষ্ট্রীয় সংঘাত ও বহিরাগত আক্রমণের ফলে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ নিম্নমুখী হয়েছে। আফগানিস্তানের অধিবাসীদের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বিভিন্ন গোষ্ঠীগত বিভক্তি, ধর্মের প্রতি অনুরাগ, স্বাধীনচেতা ও সাধারণভাবে দরিদ্র। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে অপেক্ষাকৃত অসমতল ও পাহাড়ি অঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠেছে।

সমতলভূমিতে বসবাসরত মানুষের তুলনায় পাহাড়ি এলাকায় অবস্থানরত মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। এই শ্রেণীর মানুষের সীমিত জীবিকা, কঠোর মনোবৃত্তি ও নিজস্ব অঞ্চলের প্রতি গভীর অনুরক্তি লক্ষণীয়। আফগানিস্তানের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র হওয়ায় শাসকদের পক্ষে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়েছে। এই কারণে বিভিন্ন গোত্রের দলপতিদের প্রভাবও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আফগানিস্তানের অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের প্রধান প্রচেষ্টা জীবিকার মাধ্যমে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ ও বহির্জগৎ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা। ধর্মের প্রতি দুর্বলতা থাকায় ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়েছে বলেই মুজাহিদীন বা তালেবান নামে পরিচিত শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার কঠিন হয়ে দাঁড়ায় নি। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এখানে যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে এর কারণেই উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে বিভক্তিকরণ করা সম্ভব হয়েছে।

তালেবান শাসকরা উগ্রপন্থী হওয়ায় তারা ধর্মীয় আদর্শের মাধ্যমে আফগানিস্তানের জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনে। এই প্রভাব সর্বস্তরের মানুষ গ্রহণ করতে পারেন নি, বিশেষত আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল ও সামাজিক মর্যাদার অধিকারী এক শ্রেণীর মানুষ। তারা নিজেদের বাড়িতে গোপনে টেলিভিশন ও রেডিও রাখতে দ্বিধাবোধ করেন নি। জাতিগত বৈরিতা এখানে কতখানি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়

www.pathagar.com

কাবুল তালেবানমুক্ত হওয়ার পর রাস্তার ওপর তালেবান সমর্থককে ফেলে দিয়ে পদাঘাতের মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায়, কিংবা একজন বৃদ্ধের মুখ আঘাতের মাধ্যমে রক্তাক্ত করে দেওয়া। যুদ্ধোত্তরকালে সব দেশেই এই ঘটনা স্বাভাবিক হলেও আফগানিস্তানে নির্দয়তার এই চিত্র বেশি করে চোখে পড়েছে।

আমেরিকার নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর লাদেন প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার দিকটি উদঘাটিত না হলেও আমেরিকা ব্রিটিশদের সঙ্গে নিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করে বসে। আমেরিকার টিভি প্রতিদিন 'ওয়ার এগেনস্ট টেরর' এই শিরোনাম ব্যবহার করে লাদেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আফগানিস্তানের ওপর হামলার সচিত্র খবর প্রচার করতে থাকে এই আক্রমণের পেছনে আমেরিকার যৌক্তিক কোনো দিক নেই, আছে পৃথিবীর এক নম্বর শক্তিশালী জাতি হিসেবে নিজের ক্ষমতাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানটি যে অর্থহীন ও গলায় শোভমান মালা তা সচেতন মানবজাতির পক্ষে বুঝতে কষ্টকর হয় না। জাতিসংঘের মহাসচিবও আমেরিকার খেয়াল-খুশির কাছে ক্রীড়নক মাত্র। আমেরিকার নীতির বিরুদ্ধাচরণের অর্থ তার পদ হারানো। অথবা প্রাক্তন জাতিসংঘ মহাসচিব দ্যাগ হ্যামারশেল্ডের মতো পরিণতি লাভ।

জাতিসংঘের মহাসচিব ন্যায়নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে এতো লোভনীয় পদ ও সুযোগ-সুবিধা হারাতে নারাজ। 'স্ট্রাইক এগেনস্ট টেরর' যদি সন্ত্রাস-নির্মূলের বিরুদ্ধে আমেরিকার শ্লোগান হয়, তাহলে এই শ্লোগান তাদের বিরুদ্ধেই প্রথমে ব্যবহার করা উচিত। তারা এই সন্ত্রাসী নীতি অনুসরণ করে কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও ইরাকের হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে বোমা নিক্ষেপ করে ও জীবাণু বোমার সাহায্যে। এখন লাদেনকে ধরার নামে হত্যা করছে আফগানিস্তানের নিরন্ন, অসহায়, অতি-দরিদ্র, রাজনীতি অসচেতন মানুষকে। তারা ইরাকে শিশুখাদ্য ও ঔষুধ বন্ধ করে ইরাকি শিশুদের অপুষ্টি ও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলো। ভুক্তভোগী হয় শুধু এশিয়ার শান্তিকামী মানুষ।

ইসরাইলের সন্ত্রাসী কার্যকলাপে তারা হাত-পা গুটিয়ে থাকে, আর আনন্দ পায় গৃহ-বিতাড়িত, রাজ্য-বিতাড়িত ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলের হত্যাযজ্ঞ দেখে। আমেরিকার দৃষ্টিতে মানবতা জিনিসটি আসলে কী ?

আমেরিকার আফগানিস্তানে আক্রমণের পর একমাসের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। আমেরিকার প্লেন যেভাবে দিনে ও রাতে সেখানে অবিরাম বোমা বর্ষণ করেছে তার ক্ষয়ক্ষতি জানা প্রায় দুঃসাধ্য। কারণ এই যুদ্ধের সংবাদ পরিবেশনে সাংবাদিকদের আফগানিস্তানে প্রবেশাধিকার নেই। এক্ষেত্রে কতগুলো দিক অনুমানসাপেক্ষ। আমেরিকার অবিরাম আক্রমণে আফগানিস্তানের বহু ঘর-বাড়ি ধ্বংসের সঙ্গে অসংখ্য নাগরিকের মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক। এই আক্রমণে তালেবানদের পক্ষেও ক্ষয়ক্ষতি স্বাভাবিক হলেও তার পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তালেবান যোদ্ধাদের দু'টি কারণে অসম সমরে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত, আমেরিকার সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের যুক্ত হওয়া এবং পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশের সহযোগিতা। দ্বিতীয়ত, রামায়ণের ঘরের শত্রু বিভীষণের মতো নর্দার্ন এ্যালায়েন্স আমেরিকার সহায়তায় প্রকাশ্য যুদ্ধে অগ্রসর। এই পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে তালেবানদের পক্ষে বাইরে বেরিয়ে এসে আমেরিকার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ করা অনেকাংশে কঠিন হয়ে পড়েছে। এই প্রক্রিয়ায় তালেবানরা সরে গিয়ে, পশ্চাদপসরণ করে বা আত্মগোপন করে নিজেদের অধিকৃত শহর ও অঞ্চলগুলো ছেড়ে দিয়েছে। এখানে দু'টি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত কাবুল ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে পালিয়ে গিয়ে তালেবানরা কোথায় আত্মগোপন করেছে ? দ্বিতীয়ত এই শ্রেণীর পশ্চাদপসরণ তাদের কোনো যুদ্ধকৌশল কি না ?

নর্দার্ন এলায়েন্স, আমেরিকা ও ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে নিজেদের অঞ্চল ছেড়ে দেয়ার পর তালেবানরা যদি আত্মগোপন করে থাকে তাহলে নর্দার্ন এলায়েন্সের পক্ষে সেই স্থানগুলো আবিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে না কেনো ? তার অর্থ হলো যে, আফগানিস্তানে অসংখ্য দুর্ভেদ্য অঞ্চল আছে যেখানে অনায়াসে সৈন্য ও অস্ত্রসহ দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব।

অবশ্য, এখানে খাদ্য সামগ্রীর প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। গুহায় আত্মগোপনকারী তালেবান সৈন্যদের মধ্যে খাদ্যের অভাব দেখা দিলে তাদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহ করা ছাড়া বিকল্প পথ নেই। এখানেও তালেবান সৈন্যদের অসুবিধে আছে। তারা মোল্লা ওমরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গুহার বাইরে এলে তাদের নিশ্চিত মৃত্যু অথবা ধরা পড়ার পর বিচার ও প্রাণদণ্ড প্রদানের আশঙ্কা রয়েছে। দ্বিতীয় দিকটি হলো তালেবানদের এই আত্মগোপন যুদ্ধের কোনো কৌশল কি না ? এই প্রক্রিয়ায় তারা প্রথম ক্ষেত্রে নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাবে। বর্তমানে নর্দার্ন এলায়েন্সের সৈন্যরা উৎফুল্ল ও অনেকেই লুটপাটে ব্যস্ত। ব্রিটিশ স্থলবাহিনীর একটি অংশ আফগানিস্তানের সমতলভূমিতে পাহারারত। এক্ষেত্রে তালেবানদের পক্ষে অতর্কিতে শত্রুদের ওপর আক্রমণ করা কোনো ক্ষেত্রেই অস্বাভাবিক বলে মনে করার উপায় নেই।

তালেবানদের প্রধান মোল্লা ওমরের মতো লাদেনও বর্তমানে কোথায় সদলবলে অবস্থান করছেন সে তথ্যও উদঘাটিত না হওয়ায় যুদ্ধের সময় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কারণ আমেরিকার লক্ষ্য একটিই-মোল্লা ওমর ও লাদেনকে ধরা অথবা হত্যা করা। আমেরিকা বর্তমান কৌশল অবলম্বন করে লিবিয়ার গাদ্দাফি, ইরাকের সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা করতে সক্ষম হয় নি। কারণ গাদ্দাফি কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করতেন না এবং ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের অবস্থানও ছিলো প্রায় সমশ্রেণীর। এই দিকটি চিন্তা করলে মোল্লা ওমর বা লাদেনকে ধরা সহজ নাও হতে পারে। আফগানিস্তানের প্রায় পুরো ভাগ আমেরিকা ও ব্রিটেনের সহায়তায় নর্দার্ন এলায়েন্স দখল করার পর সম্মিলিত জাতিগত গোষ্ঠীকে নিয়ে একটি সরকার গঠনের পরিকল্পনা ক্রিয়াশীল। আফগানিস্তানের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একটি আদর্শ বা নীতিমালার মধ্যদিয়ে বর্তমানে আনা সম্ভব হলেও ভবিষ্যতে তা কতদিন ক্রিয়াশীল থাকবে তা এই মুহূর্তে বলা প্রায় অসম্ভব। কোনো কারণে এদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে জোট ভেঙে যাওয়া স্বাভাবিক। জোট ভাঙার পর আফগানিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা কী দাঁড়াবে ? তারা কি তখন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হবে ? এই সময় আমেরিকা কাদের পাশে এসে দাঁড়াবে ? তাদের অবস্থার দিকও চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

এর পাশাপাশি পাকিস্তানেদের দিক থেকেও একটি ভীতি বিদ্যমান। পাকিস্তান আমেরিকাকে সর্বাত্মক সহযোগিতার পর তারা চাইবে আফগানিস্তানে তাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন একটি সরকার গঠন করতে। এই প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের পাকিস্তানভীতি নিঃসংশয়ে অস্বীকার করা যায় না। মোল্লা ওমর ও লাদেনের পতন বা হত্যার পর আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা তা অনেকাংশে আমেরিকা, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের এলিটদের অনুসৃত নীতির ওপর নির্ভরশীল। ❑

২৫ অক্টোবর ২০০১

লেখক : অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কী ?

(দুই)

আফগানিস্তানে আমেরিকার আক্রমণের পর পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ না করলেও বর্তমানে যে সুখকর তা কোনভাবেই মন্তব্য করা চলে না এবং ভবিষ্যৎ আলোকে উদ্ভাসিত না অন্ধকারাচ্ছন্ন সেদিক সম্পর্কে চিন্তা করারও সময় এসেছে। আফগানিস্তান আক্রমণের প্রস্তুতিকালে পাকিস্তানের পক্ষে আমেরিকার শর্তের প্রতি সমর্থন ছাড়া কোন উপায় ছিল না। আমেরিকার প্রস্তাবে অসমর্থনের অর্থ ছিল ত্রিধারিক। প্রথমত. আর্মির পক্ষ থেকে শাসনক্ষমতা গ্রহণের বিপক্ষে পাকিস্তানি শাসককে নিন্দনীয় করে সমর্থন না করা ঃ দ্বিতীয়ত, ওয়ার্ল্ড মানিটারি ফান্ড, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সহায়তা অপ্রদান ও নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং তৃতীয়ত, ভারতীয় কাশ্মীরে পাকিস্তানের আক্রমণের ক্ষেত্রে তাকে সন্ত্রাসীরূপে চিহ্নিতকরণ। এই তৃতীয় দিকটি পাকিস্তানের পক্ষে ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াতে পারত। তার কারণ, আমেরিকা অনায়াসে ভারতের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে সমবেতভাবে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করতো। এক্ষেত্রে আমেরিকার লাভ হতো দ্বিপাক্ষিক, ভারতকে বন্ধুরাষ্ট্র হিসাবে মর্যাদা দিয়ে ভারতে নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণ (অন্যান্য আর্থিক ও মিলিটারি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে), পাকিস্তান আক্রমণ করে তার আণবিক বোমা ধ্বংস ও বর্তমানের মতো আফগানিস্তানে আক্রমণ পরিচালনা। অবশ্য এক্ষেত্রে আমেরিকার অবস্থা সর্বত্র যে অনুকূল হতো তা নয়। কারণ, পাকিস্তান আক্রমণের ক্ষেত্রে আবরবিশ্বে ও অন্যত্র ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা অযৌক্তিক বলেও গ্রহণ করা যায় না।

পাকিস্তান এসব দিক চিন্তা করেই বাধ্য হয়ে আফগানিস্তান আক্রমণে আমেরিকাকে নিজস্ব ভূখণ্ড ব্যবহার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। এই ইতিবাচক দিক থেকে পাকিস্তান আমেরিকাকে সহায়তা প্রদানের পর দেশের ভেতরে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এর ফলে মোশাররফের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। দেশবাসী স্পষ্টত তার আফগানিস্তান নীতির কারণে বিপক্ষে, পাকিস্তানে ব্যাপক আমেরিকাবিরোধী বিক্ষোভ তার প্রমাণ। এই বিক্ষোভ শুধু আমেরিকার বিরুদ্ধেই হয়নি, পরিচালিত হয়েছে মোশাররফের বিরুদ্ধেও। বিক্ষোভকারীরা নিজের দেশের প্রধান

www.pathagar.com

শাসকের কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে বুশের কুশপুত্তলিকার সঙ্গে। এখানে যে প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল, আফগানিস্তান যুদ্ধের পর মোশাররফের রাজনৈতিক অবস্থা কী হবে ? তার পক্ষে ক্ষুব্ধ দেশবাসীকে আয়ত্তে আনা কি সম্ভব হবে? এই দিকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কারণে। প্রথমত, আফগানিস্তানে আরেরিকার যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মোশাররফের কোন ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয়ত, আমেরিকানরা রমজান মাসেও যুদ্ধবিরতি না করলে পাকিস্তানে মোশাররফের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভের ফলে তার পদচ্যুতির সম্ভাবনা বেশি। এই ঘটনা ঘটলে তার ভবিষ্যৎ কী তা সহজেই অনুমেয়- বন্দি, বিচার ও হত্যা। তৃতীয়ত, মোশাররফের পতন ঘটলে আমেরিকার নিজের পছন্দ অনুযায়ী একটি শাসকগোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া সহজতর হবে। এর ফলে আমেরিকার পক্ষে নিজের ইচ্ছানুযায়ী পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এই অবস্থা যদি না ঘটে তাহলে পাকিস্তানে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলকে সমর্থন দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়ে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে। এই নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতিনির্ভরশীল পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাজনৈতিক দলের মনোভাবের ওপর।

আমেরিকায় ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের পর সেখানে দ্রুতগতিতে যেভাবে আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে, তা শুধু লাদেনকে ধরা বা হত্যা করা মনে করলে ভুল হবে। কারণ লাদেনের মূল্য কয়েক লক্ষ কোটি ডলার সম্ভবত নয়। দ্বিতীয়ত, লাদেনকে ধরার ক্ষেত্রে আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষকে হত্যা করা আমেরিকার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল না। লাদেনকে সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করলেও তালেবানদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কারণ, আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে মুজাহেদিন, তালেবান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সংঘাত তা কোনমতেই বৈদেশিক নয়। সম্পূর্ণই অভ্যন্তরীণ। আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণে শিশুসহ অসংখ্য নাগরিকের মৃত্যু হলেও আমেরিকার পক্ষে এই হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক রীতি। কোরিয়া, ভিয়েতনাম থেকে শুরু করে ইরাক আক্রমণ তার প্রমাণ। আমেরিকার মৌখিক মানবতাবাদের আদর্শ প্রকৃতপক্ষে স্বৈরাচারী মনোভাব। যে মনোভাব ইরাকে শিশুখাদ্য ও ওষুধ প্রবেশে পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে শিশু-মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। এই আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণ শুধু আফগানিস্তানের ওপর আঘাত কিনা তা স্পষ্ট হতে বেশি সময় লাগবে না।

বর্তমানে আমেরিকা পাকিস্তানের বন্ধুস্থানীয় হলেও এই বন্ধুর হাত তার ওপর প্রসারিত হতে পারে দু'ভাবে-আণবিক কেন্দ্র ধ্বংস ও কাশ্মীর সহিংসতার নামে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ। পাকিস্তান আণবিক বোমার অধিকারী হওয়ায় আমেরিকা ও ভারত ভীত নয়। ভীত ইসরাইল। ইসরাইলের ভীতির কারণ, এই আণবিক বোমা পাকিস্তানের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে তার শত্রুর হাতে আসা সম্ভব। একাধিক শত্রুদেশ আণবিক বোমার অধিকারী হলে তারা এই বোমা নিক্ষেপে ইসরাইল ধ্বংসে সক্ষম। সম্ভবত ইসরাইলের ধারণা, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো আর্থিক সহায়তা প্রদানে পাকিস্তানে আণবিক বোমা তৈরি করে নিজেদের দেশে নিয়ে আসবে। সাম্প্রতিককালে ইসরাইলের পক্ষ থেকে আমেরিকার পাকিস্তানের আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করা খানিকটা সহজসাধ্য হয়ে পড়েছে পাকিস্তানে আমেরিকার স্থলভাগ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহারের সুযোগের কারণে। সংবাদপত্রে এ সম্পর্কিত প্রকাশিত তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার শঙ্কা, কোন কারণে মোশাররফের পতন হলে আণবিক অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ তালেবানপন্থীদের হাতে গেলে

www.pathagar.com

তাদের নয়, স্পষ্টতই ইসরাইলের ভীত হওয়ার কারণ বিদ্যমান। সেজন্য আফগানিস্তানে যুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকা ইসরাইলি কমান্ডোদের সঙ্গে একটি মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের ইউনিটকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। মার্কিন গোয়েন্দাদের পক্ষে পাকিস্তানের আণবিক অস্ত্র সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হলেও তাদের ধারণা-এই অস্ত্রের সংখ্যা একেবারে কম নয় যাকে অবহেলা করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, আমেরিকা ও ইসরাইলের পক্ষে পাকিস্তানের আণবিক অস্ত্র কেন্দ্র দখল করতে সক্ষম হলে অস্ত্র নির্মাণের প্রকৃতি ও অন্যান্য গোপন তথ্য সংগ্রহ করা অনায়াসেই সম্ভব হবে। তবে, আমেরিকা বা ইসরাইলের পক্ষে এই গোপন কাজ করা সহজসাধ্য হবে না। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগ যে নীরবে বসে থাকবে এবং পাকিস্তানি সৈন্যরা হস্তক্ষেপ করবে না, তা চিন্তা করা কঠিন। ইসরাইলের পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের তুলনায় পাকিস্তান-ভীতির সম্ভাব্য কারণ হল, এক্ষেত্রে পাকিস্তান মধ্যপ্রাচ্যের দেশের তুলনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনেক অগ্রগামী।

আণবিক অস্ত্রকেন্দ্র দখলের প্রতি আমেরিকা ও ইসরাইল বা শুধু আমেরিকার দৃষ্টি ছাড়াও পাকিস্তানের অন্য একটি দুর্বল দিক বর্তমান কাশ্মীর সমস্যা। ইতিপূর্বে কাশ্মীরে সহিংস কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমেরিকা পাকিস্তানের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে উচ্চবাচ্য না করলেও বর্তমানে তারা জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে পাকিস্তানের যুক্ত থাকার ভারতীয় অভিযোগ সমর্থন করেছে। পাকিস্তান আফগানিস্তানের আল কায়দা দলকেও ভারতে সন্ত্রাসী কার্য পরিচালনার জন্য ব্যবাহার করেছে। আফগানিস্তান আক্রমণে পাকিস্তান সর্বতোভাবে আমেরিকাকে সহায়তা প্রদানের পরও বুশ প্রশাসনের এই মানোভাব পরবর্তীকালে সন্ত্রাস-প্রতিরোধে তাদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত যে হবে না, তা নয়। বিশেষত আফগানিস্তান আক্রমণে আমেরিকার নীতি প্রায়ই পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে বন্ধুরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে শুরু করেছে।

আফগানিস্তানে আমেরিকা যে আক্রমণ পরিচালনা করছে তা থেকে দু'টি দিক অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে প্রথমটি হল, যেভাবেই হোক তালেবানগোষ্ঠী ও লাদেনকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নামে মাত্র একটি দুর্বল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে তারা আণবিক বোমা ব্যবহারে দ্বিধাবোধ করবে না, এই ধরনের মানসিকতাও প্রকাশিত হয়েছে। আফগানিস্তানে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করলে তালেবানগোষ্ঠী ও লাদেন সমর্থকদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে, এ ব্যাপারে দ্বিমতের অবকাশ কম। সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব কী নিরীহ জনসাধারণের মৃত্যুতে প্রতিবাদে অগ্রসর হবে ? সম্ভবত বিচ্ছিন্ন দেশের সাধারণ মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও রাষ্ট্রীয় শাসকরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক হবেন বলে মৌনব্রত অবলম্বন করবেন। বর্তমানে আমেরিকা পাকিস্তানে যেভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে তাতে পাকিস্তানের আণবিক বোমা অধিকার করে আফগানিস্তানে নিক্ষেপ করাও বিচিত্র নয়।

সৌদি আরব আমেরিকার মিত্রস্থানীয় দেশ হলেও সাম্প্রতিককালে আমেরিকার ট্রেড সেন্টার বিধ্বস্ত হওয়ার পর সেখানে প্রবাসী আরবদের ওপর বিরুদ্ধ আচরণে সৌদি আরবেও সরকারি পর্যায়ে বিপ্রতীপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমেরিকা রমজানের সময়ও আফগানিস্তানে বোমা নিক্ষেপে বিরত থাকবে না-এই ঘোষণায় সৌদি

www.pathagar.com

আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বিপুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। পাকিস্তানও এর বাইরে অবস্থিত নয়। এই পরিস্থিতিতে মোশাররফের পতন হলে বর্তমান পরিবেশ আকস্মিকভাবে নতুন দিকে মোড় নিতে পারে। সম্ভবত এ কারণেই আমেরিকা আফগানিস্তানের ওপর মারাত্মক আক্রমণ হেনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চায়।

বর্তমান অসম সময়ে তালেবানরা দ্বিমুখী বিপদের সম্মুখীন হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত। তালেবানদের গৃহশত্রু উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা মার্কিন সহায়তায় তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসরমান। তালেবান এলাকার সঙ্গে তাদের গভীর পরিচয় বলে একবার তাদের এলাকায় প্রবেশে সক্ষম হলে আমেরিকার বিমান আক্রমণের সহায়তায় তারা তালেবানদের বিপক্ষে সফল প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে দেশীয় দুই প্রতিপক্ষের আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতি ছাড়া লাভ কম।

আফগানিস্তানে তালেবানরা নিশ্চিহ্ন বা জয়ী যে পর্যায়েই আসুক না কেন, এশিয়ায় আমেরিকার নীতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। আমেরিকার নীতি শুধু এশিয়াও মধ্যপ্রাচ্যের দেশকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। সেজন্য এশিয়ান ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং আত্মরক্ষার জন্য নতুন করে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন। আমেরিকার হাতে পুতুল হয়ে থাকলে তারা নিজেদের প্রয়োজনমতো সুতো ধরে নাচাবে। পুতুল নাচের সুতো থেকে এখন পুতুলদের মুক্তি প্রয়োজন। ❑

নভেম্বর' ০১

www.pathagar.com

বুশ গং কর্তৃক সন্ত্রাস দমন, না ইসলাম খতম

এ কে এম আব্দুস সাত্তার

১। আফগানিস্তানে উপর্যুপরি ইঙ্গ-মার্কিন হামলা চলছে। সন্ত্রাস নির্মূলের নামে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ তার মিত্রদের নিয়ে আফগানিস্তানের নিরীহ নিরপরাধ গরীব মানুষগুলোর বিরুদ্ধে এ সর্বাত্মক হামলা শুরু করেছেন। তাদের মতে জনাব ওসামা বিন লাদেন ও তার কিছু অনুসারী ১১ সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র এবং ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলায় সন্দেহভাজন। আফগানিস্তানের তালেবান সরকার তাদের আশ্রয়দাতা। তাই আফগানিস্তানে এ হামলা। বিশ্বের সর্বাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র, বোমারু বিমান এতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ হামলায় আফগান শহরগুলোর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। নিরপরাধ নারী-শিশুসহ বেসামরিক শত শত লোক নিহত ও আহত হচ্ছে। সামরিক লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে তা পরিষ্কার নয়।

২। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ এ বিশ্বের একমাত্র সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির সদর দপ্তর বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র এবং সামরিক সদর দপ্তর পেন্টাগন সে দেশীয় ৩টি হাইজ্যাক করা বিমান দিয়ে বিধ্বস্ত করা হয়। হাজার হাজার মানুষ নিহত এবং অগণিত সম্পদ এতে ধ্বংস হয়েছে। এ কাপুরুষোচিত হামলাকে বিশ্ব বিবেক নিন্দা জানিয়ে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ বিচার দাবী করেছে। এ অপকর্ম সম্পাদন করেছে একদল দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী যাদের পরিচয় ও যোগসূত্র আজ পর্যন্ত জানা যায়নি বা বলা হয়নি।

৩। কয়েক শ্রেণীর রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান যারা নিরপেক্ষ কথা বলার সাহস ও অধিকার রাখে না এবং স্বাভাবিকভাবে নিরপেক্ষ কথা বলে না শুধু তারাই অন্ধভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সব কথা ও কাজে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে (১) কেউ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতায় চলে এবং নিজের বলে চলার সামর্থ্য নেই, (২) কেউ অন্ধ ইসলাম বিদ্বেষী, (৩) কারো নিজের ঘরে মুসলমানদের সঙ্গে বিবাদ আছে এ সুযোগে সমস্যা সমাধান করে নিতে চায়, (৪) জনসমর্থনহীন গদি টলটলায়মান শাসক এ সুযোগে শত্রু নিধন করতে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে খুশী করতে চায় এবং (৫) কেউ আমেরিকার অথৈ হৈ চৈ করে একদিকে নাম কিনছে ও অন্যদিকে মার্কিনীদের যুদ্ধে জড়িয়ে দিয়ে দুর্বল করতে পারলে মন্দ কি ? এ রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন প্রচারণার কাছে লাগে। প্রকৃতপক্ষে, এরা সমর্থন দেয়ার কোনো সামর্থ্য রাখে না। কেননা এদের পিছনে

www.pathagar.com

ধন ও জনসমর্থন নেই। ইসরাইল ছাড়া অন্য দেশের বিবেকবান জনগণ আফগানিস্তানের নিরপরাধ জনগণের সাথে। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এর ব্যতিক্রম নয়। যুক্তরাষ্ট্র এ প্রক্রিয়ায় বিশ্বের সচেতন বিবেকবান জনগোষ্ঠী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। সমর্থক রাষ্ট্রগুলোকে আমেরিকা খুব উপকার করবে সে আশা করা যায় না। অতীতের এমন নজির নেই যে, কোনো পরাশক্তি তার দুর্বল মিত্রদের এগিয়ে দিয়েছে।

৪। বিশ্বের সব বিবেকবান ও নিরপেক্ষ লোকরা যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত ন্যক্কারজনক হামলার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনে বিচার দাবী করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র সে কথায় কান দেয়নি। সেটা পরাশক্তির ইজ্জতেরও বরখেলাফ। তাই তদন্ত, বিচার ও তার ভিত্তিতে শাস্তি দিতে সে রাজী হয়নি। সে একতরফাভাবে দোষী সাব্যস্ত এবং অ্যাকশন প্রোগ্রাম প্রণয়ন ও বাস্তাবায়ন শুরু করেছে। সে স্বেচ্ছাচারিতা এবং একগুঁয়েমির পরিচয় দিচ্ছে। সে জানে নিরপেক্ষ পরামর্শ শুনলে তার মতলব সিদ্ধ হবে না। অনেক ইহুদী, খৃস্টান ও অমুসলমান, এমন কি তার নিজস্ব প্রশাসন ও দেশের কিছু লোক জড়িয়ে পড়তে পারে। তাদের প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও গুপ্তচরবৃত্তির দুর্বলতা ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা বেরিয়ে আসবে। তখন তা সামাল দেয়া কঠিন হবে। যদিও আমেরিকা কর্তৃক প্রচলিত সন্ত্রাসী লিস্টে অমুসলমান কিছু দেশ, ব্যক্তি ও সংগঠনের নাম আছে, তবে তাদের লক্ষ্য মুসলমান। অতীতে আক্রমণ তাদের উপরই হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হয়। যুক্তরাষ্ট্র আসলে সন্ত্রাস দমন চায় না। সে চায় তার নিজের নিরাপত্তা, স্বার্থ ও প্রভুত্ব। এখন মুসলমানরা তাদের জন্য হুমকি। এ পর্যায়েই তাদের শায়েস্তা করা জরুরী। তাই গোপনে, একতরফাভাবে ও অন্ধভাবে কাজ করা যাচ্ছে।

৫। যুক্তরাষ্ট্রের এতো তাড়াহুড়ার কোনো কারণ দেখি না। অত্যাসন্ন কোনো পরবর্তী আক্রমণ সামনে ছিল না। তাই সুষ্ঠু তদন্তের সুযোগ ছিল। বিশ্বের, তালেবানদের এবং জনাব লাদেনের কাছে অভিযোগ পেশ করার এবং মতামত নেয়ার পর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিচার ফয়সালার সময় ছিল। কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির সুযোগ ছিল। এভাবে ধাপে ধাপে সমস্যাটির হয়তো শান্তিপূর্ণ সমাধান করা যেত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র আর মুসলমানদের সময় দিতে রাজী নয়। এতে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছে। মিত্রদের ক্ষমতা নড়বড়ে। ইসলামী আন্দোলন দিনদিন জোরদার হচ্ছে। তাই গরীব, দুর্ভিক্ষ পীড়িত উন্নত বিশ্বসৃষ্ট যুদ্ধ ও সমস্যাক্লিষ্ট একটি দেশের মুসলমানদের উপর তারা একতরফাভাবে একটি নগ্ন বিশ্ব যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। এর মোকাবিলায় আফগানদের এমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। যুদ্ধ হয় সমানে সমানে। এখানে যুদ্ধ হচ্ছে সশস্ত্রের সাথে নিরস্ত্র জনগণের। আঘাতের পর আঘাত আসছে। নির্বিকারে তারা ধ্বংস হচ্ছে অথচ সহ্য করছে। প্রতিরোধ করার কোনো সামর্থ্য নেই। মনে হয় বিশ্বের যুদ্ধবাজ কিছু সমরনায়ক ছায়ার সাথে যুদ্ধ হচ্ছে অথচ সহ্য করছে। প্রতিরোধ করার কোনো সামর্থ্য নেই। বিশ্বের যুদ্ধবাজ কিছু সমরনায়ক মিথ্যা দম্ভ ও আস্ফালন করছে। সর্বশেষ বিশ্ব সভ্যতা ও মানবতার এ কেমন রূপ? আফগানরা যুক্তরাষ্ট্রে কোনো স্বার্থহানি ঘটিয়েছে, সম্পদ লুণ্ঠন করেছে এবং কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে তাদের আর ক্ষমা করা যাবে না এমন জানা নেই। অর্থাৎ যুদ্ধ বাধানোর কোনো কারণ দেখি না। তারপরও তাদের উপর এ আক্রমণ কেন ? অবশ্য তাদের একটা অপরাধ আছে। তারা মুসলমান এবং ইসলামী আন্দোলন করছেন। প্রভুদের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি চায়। মর্যাদা ও

www.pathagar.com

অধিকার নিয়ে বাঁচতে চায়। এতে মুসলমান দেশগুলোর অযোগ্য ও স্বৈরশাসকদের পতন ঘটবে এবং আমেরিকাসহ অমুসলিম দেশগুলোতে ইসলামের সুবাতাস ঢুকবে। আমেরিকার নেতৃত্ব ও স্বার্থ হুমকির সম্মুখীন হবে। তাই তারা আফগানিস্তানে ছুটে এসেছে। প্রয়োজনে অন্য মুসলমান দেশেও আক্রমণ চলবে। ইতিমধ্যে কিছু দেশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেউ বিপদ দেখে চোখ বন্ধ করে রাখলে বিপদ পালিয়ে যাবে না। সংঘবদ্ধভাবে ও সক্রিয়ভাবে বিপদ তাড়াতে হবে। জ্ঞান, নৈতিকতা, যোগ্যতা ও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। স্বাবলম্বী হতে হবে। মুসলমান ও ছোট দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে শক্তি ও সম্পদ গড়তে হবে। সুপার পাওয়ার কাউকে কোনো দিন উন্নতি দেয়নি ও দিবে না।

৬। যুক্তরাষ্ট্র খুব বুদ্ধিমানের কাজ করছে বলা যায় না। দিন বদলাচ্ছে। কৌশল বদলাচ্ছে, মানুষের শিক্ষা ও সচেতনতা বাড়ছে। একতরফাভাবে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করলে কেউ মানে না। নতুন আঙ্গিকে সব বিবেচনার দাবী রাখে। মিথ্যা অপপ্রাচার এখন আর আগের মতো কার্যকরী নয়। আধুনিক তথ্য বিনিময়ের সুবাদে সত্য প্রকাশ পাচ্ছে। ফলে মানুষকে অন্ধকারে রেখে বোকা বানানো যাচ্ছে না। বড়দের অযৌক্তিক হুকুম ও ধমক এখন আগের মতো সব ঠাণ্ডা করে দেয় না। ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্ক আক্রমণে সে সত্য প্রমাণিত হলো। সুতরাং সময়ের দাবী আরো ধীরস্থির কুশলী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার প্রয়োগ। মুসলমানদের এক ফুঁৎকারে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়। গায়ের জোরে এদের নাস্তানাবুদ করা যাবে না। এদের উপর আঘাত হলে বিপরীত ফল পাওয়া যাবে। দ্বিগুণ বিপরীত ফল পাওয়া যাবে যদি ইসলামকে নিভিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। ইসলামের উপর আঘাত এরা সহ্য করতে রাজী নয়।

৭। যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা যতোই বলুক, এ আঘাত ইসলামের উপর নয়, সন্ত্রাসীদের উপর, বাস্তবে মুসলমানদেরই আক্রমণ করা হচ্ছে এবং তাদের থেকে জোর করে ও ভীতি প্রদর্শন করে সমর্থন আদায় করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বস্ততা নেই। যৌথ, নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য তৃতীয় পক্ষের ঘোষণা দরকার। ইসলাম, সন্ত্রাস, জিহাদ, ক্রুসেড, ইসলামের উপর আঘাত কি ইত্যাদি ব্যাপারে ব্লেয়ার ও বুশ ফতোয়া দিলে যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের মিত্ররা মানতে পারে এবং তাতে তাদের দেশে তাদের জনপ্রিয়তা বাড়তে পারে। কিন্তু মুসলমানরা তা মানবে না এবং মুসলমানদের মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তা বাড়বে না। মুসলমানদের কাছে অবিকৃত সত্যের কষ্টি পাথর আছে।

৮। বিশ্বব্যাপী এ হামলার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হচ্ছে। অনেক মুসলিম দেশে বিক্ষোভকারীরা পুলিশের গুলীতে নিহত হচ্ছে। আফগানিস্তানের পক্ষে দিন দিন সমর্থন বাড়ছে। নৈতিক সমর্থন ব্যাপক। বস্তুগত সমর্থন দিতে অনেকে প্রস্তুত। মুসলমানদের কাছে বিশ্বস্ত হতে হলে যুক্তরাষ্ট্রকে তার নীতির পরিবর্তন করতে হবে। সুবিধামত সন্ত্রাস করা এবং সমর্থন করা চলবে না। জনপ্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকারগুলোকে সমর্থন করতে হবে। মুসলমান বিশ্বে মার্কিনীরা সব সময় বিপরীত কাজটি করছে। তাদের বৈধ দেশ ও সরকারকে গায়ের জোরে পরিবর্তন করে ফেলছে। গণতন্ত্রের মুরুব্বীর দাবীদার হয়ে মুসলমানদের গণতান্ত্রিক বিজয়কে সমর্থন করেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন করেনি। আফগানিস্তানেও মার্কিনীদের উদ্দেশ্য একই। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

পুতুল সরকার বসানোর পাঁয়তারা চলছে। এতে সমস্যা জটিল ও দীর্ঘায়িত হবে। যুদ্ধ বন্ধ হবে না। আরও ব্যাপক যুদ্ধে অনেকে জড়িয়ে পড়তে পারে, যার দায়-দায়িত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বহন করতে হবে।

৯। যারা সমর্থক তারা মার্কিন হামলার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে চলছে। বিশ্ব সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে বলা হচ্ছে, লাদেন জড়িত থাকার প্রমাণ তাদের কাছে আছে। তবে এ রহস্যজনক গোপনীয়তা কেন ? মুসলমানদের আরও বলা হচ্ছে, এ হামলা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে। হামলা স্বল্প স্থায়ী হবে। টার্গেটেড আক্রমণ চালানো হবে, যদিও টার্গেট ঠিক করা হয়নি। বেসামরিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাকে লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করা হবে না। প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বেসামরিক মানুষ, বসতবাড়ী ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান কিছুই রেহাই পাচ্ছে না। মিত্রদের কথার কোন দাম নেই। যারা আমেরিকান চাপের মুখে অন্ধ সমর্থন দিয়ে তাদের দেশ ও সুযোগ-সুবিধা সব দিয়ে বসে আছেন তাদের কথায় মার্কিনীরা কর্ণপাত করবে না। যদি এসব প্রপাগান্ডায় বিশ্বাস করতে বলেন তবে প্রমাণস্বরূপ প্রথমেই আফগানিস্তান ও প্যালেস্টাইনে মুসলমান নিধন (খ্রিষ্টীয় ক্রুসেড) বন্ধ করুন। মুসলমানদের শান্তিতে থাকতে দিন। তাদের ধর্ম, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং বিপ্লবী ও নির্বাচিত সরকারগুলো মেনে নিন। মুসলমানরাও অন্যদের ন্যায় সংগত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা মেনে নিবে। জোর করে বন্ধ না করে পরস্পরের অধিকার মেনে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা বেশী ফলপ্রসূ হবে। সার্বভৌম সম অধিকার ভিত্তিক সহ-অবস্থানের কোন বিকল্প নেই।

১০। এ অসম, অনৈতিক ও অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে নৈতিক চাপ বাড়ছে। ভিতর ও বাহির থেকে। অর্থনৈতিক মন্দা, অস্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শেয়ার বাজার ও ডলারের মূল্য কমছে। তেলের চাহিদা ও মূল্য কমছে। স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। বিনিয়োগ, রফতানি ও রেমিটেন্স অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। ফলে বাড়ছে বেকারত্ব। যুদ্ধের খরচ ও ক্ষতি ব্যাপক। আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতির খরচও কম নয়। উন্নত বিশ্ব, বিশেষ করে পাশ্চাত্য বিশ্ব থেকে শান্তি ও স্বস্তি বিদায় নিচ্ছে। আফগানিস্তানের ব্যয় তুলনামূলভাবে কম। পাহাড়ে বোমা মারা হচ্ছে। প্রতি আক্রমণ প্রায় অনুপস্থিত। আনুপাতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এই যুদ্ধ লাভজনক হবে কি? আফগানিস্তানের আছে কি, ক্ষতি হবেই বা কি ? সর্বোপরি বিশ্ব একটি ঝুঁকিপূর্ণ অনিশ্চয়তার দিকে এগুচ্ছে। এটার শেষ কবে ও কোথায় কেউ বলতে পারে না। বড় পার্টনার হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাভে যেমন বড় ভাগ, ক্ষতিতেও বড় ভাগ নিতে হবে। গরীব ও উন্নয়নশীল মিত্রদের নাজুক অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি হবে। বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনার দাবী রাখে। মন্দাভাব কাটিয়ে ওঠা অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য হবে। এটা অবশ্য আমেরিকার জন্য ব্যবসা হতে পারে।

১১। বিশেষ ব্যক্তি, দেশ এবং অঞ্চলকে কিছুকালের জন্য দমিয়ে রাখা যায়। সব মুসলমানদের চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দেয়া যাবে না। মুসলমান এখন পৃথিবীর সব দেশে আছে। খোদ আমেরিকায়ও আছে। আঘাতে আঘাতে তারা উজ্জীবিত হয়। যুদ্ধ করে তাদের সবাইকে, দমানো বা মারা যাবে না। মুসলমানদের নষ্ট করতে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ভোগ বিলাস ও চরিত্রহীনতা বেশী কার্যকরী। পাশ্চাত্যদের এ প্রোগ্রামও এখন

www.pathagar.com

ধরা পড়ে গেছে। মুসলমানরা পাশ্চাত্যের এবং তাদের পদলেহীদের ইসলামী বুঝ প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা তাদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় কুরআনিক আলোর সন্ধান পেয়েছে। তাদের মধ্যে এখন কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের ব্যাপক চর্চা হচ্ছে। তারা ইসলামকে বুঝতে শিখছে। তাই তাদেরকে শক্তির বলে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। যত তাড়াতাড়ি তাদের অধিকার মেনে নেয়া হবে ততই সবার মঙ্গল হবে।

১২। এই অসম ও অন্যায় চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। অবিলম্বে এটা বন্ধের আহ্বান জানাচ্ছি। মুসলিম উম্মাহ ও শান্তিকামী বিশ্ববাসীকে এ হামলা প্রতিহত ও পরাস্ত করতে এগিয়ে আসতে হবে। ভ্রান্ত মুসলমান দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ তাদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করুন। মুসলমান জনগণ আপনাদের সঙ্গে নেই এবং থাকবে না।

১৩। শান্তির নিজস্ব পথ আছে। সন্ত্রাসের পথে শান্তি আসে না। তাতে প্রতিহিংসা ও প্রতিরোধ বাড়ে সন্ত্রাস আরও ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। কদর্য পথে মহৎকে অর্জন করা যায় না। অসত্য-অসুন্দরকে পরিহার করে সত্য ও সুন্দরকে বরণ করুন। পরস্পরের সমস্যা অনুধাবন করতে হবে। যৌক্তিক অবস্থানকে মেনে নিন। সম্মান, বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, সহানুভূতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করুন। শত্রুকেও মহত্ত্ব থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হোন। আলোচনার টেবিলে বসে সমস্যার সমাধান খুঁজুন। শান্তি সবার হাতে ধরা দিবে। ❑

২৫ অক্টোবর '০১

লেখক ঃ প্রাবন্ধিক।

www.pathagar.com

আফগানিস্তান আমার সাক্ষ্য

সৈয়দ আলী আহ্সান

ভূগোলে পড়েছিলাম আফগানিস্তান একটি পর্বতসঙ্কুল দেশ। বহু অঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম। মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে সে দেশে জীবন যাপন করে। কিন্তু এই কঠোর জীবন যাপনের ফলে সে দেশের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত দুর্ধর্ষ এবং স্বাধীনতাপ্রিয়। এখানে অতি সাধারণ মানুষও মিথ্যা কথা বলতে জানে না এবং স্পষ্টভাষী।

সেখানকার দরিদ্র মানুষ বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এসেছে ভাগ্যের অন্বেষণে। আমি আমার শৈশবে একজন কাবুলিওয়ালাকে দেখেছিলাম। সে কি করে যেন আমাদের গ্রামে উপস্থিত হয়েছিল। আমাদের বাড়ী গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত দৃষ্টিগোচর বাড়ী ছিল। বাড়ীতে একটি দোতলা দালান এবং একতলা দালান ছিল। এর চতুর্দিকে একটি উঁচু প্রাচীর ছিল। অবাক হয়ে দেখবার মতই বটে। বাড়ীর পিছনে বিরাট পুকুর ছিল। আমার নানাজান সূফীসাধক ছিলেন। কিন্তু আমার নানী জমিদার ছিলেন। আমার নানীর বাবার কোন পুত্রসন্তান ছিল না। শুধু তিন মেয়ে ছিল; এদের মধ্যে একজনের বিয়ে হয় বরিশালের জমিদার ইসমাইল চৌধুরীর সঙ্গে, আরেকজনের বিয়ে বামনার জমিদার সারওয়ারজান চৌধুরীর সঙ্গে। তৃতীয়জন হচ্ছেন আমার দাদার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে। তার নাম ছিল সৈয়দ মোকাররম আলী। তিনি আরবী এবং ফারসী ভাষায় অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন সূফীসাধক। তিনি প্রতিদিন মসজিদে বসে গ্রামের লোকদের অভিযোগ শুনতেন এবং সেই অভিযোগগুলোর সমাধান করতেন। এ রকমভাবে একদিন তিনি যখন মসজিদের বারান্দায় বসে রয়েছেন তখন এক দীর্ঘদেহী কাবুলি এসে উপস্থিত। সে সাড়ে ৬ ফুট লম্বা। মাথায় বিরাট পাগড়ি, লম্বা কুর্তা পরা এবং পরনে সালোয়ার। তার পায়ে একটি শক্ত নাগরাই জুতো। নানাজানের সঙ্গে কি কথা হলো জানি না, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে সে নানাজানের ভক্ত হয়ে গেল। তাকে আমরা কয়েক বছর পর্যন্ত দেখেছিলাম। সে মিথ্যা কথা বলতে জানত না এবং মানুষ অন্যায় করলে সে অন্যায়ের প্রচণ্ড প্রতিবাদ করত। আমার নানাজান তাকে আরবী অক্ষর শেখালেন এবং কোরআন শরীফের কয়েকটি সূরা তাকে মুখস্থ করালেন। এখানেই সে আমাদের বাড়ীর একজনে পরিণত হয়। এরপর সে যে কখন হারিয়ে গেল তা আর আমি জানি না। সে কথাবার্তা কলার মত বাংলা শিখেছিল। তার কাছেই জেনেছিলাম

www.pathagar.com

যে, তার বাড়ী জালালাবাদের দক্ষিণে।

বড় হয়ে যখন আরমানিটোলা সরকারী স্কুলে ভর্তি হলাম তখন ইতিহাস পাঠক্রমের মধ্যে আফগানিস্তানের পরিচয় পেলাম। জানলাম যে, সে দেশের লোকেরা কঠোর পরিশ্রমী এবং সাহসী। যখন লর্ড কার্জন ভারতের গভর্নর জেনারেল তখন রাশিয়ার জার আফগানিস্তান দখল করে ভারতের দিকে আসতে পারে এই ভয়ে ব্রিটিশ সরকার ভীত ছিল।

তারা লর্ড কার্জনকে নির্দেশ দিলেন আফগানিস্তান আক্রমণ করতে। ব্রিটিশ সৈন্যদল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখল করে এবং কামান স্থাপন করে কাবুলের বাজার উড়িয়ে দেয়। অনেক নিরীহ লোক তখন মারা যায়। এর ফলে সেখানকার মানুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়। শেষ পর্যন্ত খাইবারপাস দিয়ে ব্রিটিশ সৈন্য পলায়ন করবার চেষ্টা করে। খাইবারপাস ছিল সংকীর্ণ ও বন্ধুর। সেখান থেকে ব্রিটিশ বাহিনী যখন ভারতবর্ষে পলায়নের চেষ্টা করে তখন দুর্ধর্ষ আফগানরা পাহাড়ের উপর থেকে বিপুল প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করে তাদের হত্যা করে। একজন সৈনিক কোনরকমে প্রাণ নিয়ে ভারতবর্ষে আসতে পেরেছিল। এ ঘটনার ফলে ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তানের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন হয়। তখনই প্রমাণ হয়েছিল যে, আফগানিস্তানের লোকেরা নিরীহ এবং শান্ত। কিন্তু ক্ষুব্ধ হলে তাদের মত দুর্ধর্ষ আর কেউ হতে পারে না।

আফগানিস্তানের লোকেরা এমনিতেই খুব শান্ত বটে, কিন্তু তারা মিথ্যাবাদী নয়। আমি যে কাবুলির কথা পূর্বে বলেছি একটি লোক তার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে যখন এক বছর পর সে কথা অস্বীকার করে তখন সেই কাবুলি ঐ লোকটাকে কঠোর হাতে গলা ধরে আমার নানাজানের কাছে নিয়ে আসে। নানাজান যখন জিজ্ঞেস করেন, 'কি হয়েছে' ? তখন সে বলেছিল, 'এ লোকটি মিথ্যা কথা বলছে। আমার কাছ থেকে যে টাকা ধার নিয়েছিল সে কথা অস্বীকার করেছে।' একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি, উক্ত কাবুলির যা কিছুই ঘটুক না কেন, মিথ্যা সে কোনক্রমেই সহ্য করে না।

বড় হয়ে সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থটি পড়েছিলাম। মুজতবা আলী কাবুলে শিক্ষক হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানকার লোকদের আতিথেয়তা, মানুষকে সহায়তা করবার ইচ্ছা এবং আশ্চর্য বিনয়ী ভঙ্গি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সেখানকার সাধারণ হতদরিদ্র মানুষরা শুধুমাত্র রুটি-পেঁয়াজের সঙ্গে খেয়ে সময় কাটাচ্ছে। কেউ সামনে দিয়ে গেলে তাকে ঐ রুটির ভাগ নিতে বলছে। এভাবে তারা অতিথি সেবা করে। বড়লোকদের কথা আলাদা, কিন্তু সাধারণ লোকেরা যে অতিথিপরায়ণ তা সহজেই বোঝা যায়।

তারা মুসলমান, কিন্তু সাধারণ মানুষের ধর্ম সম্পর্কে কোন কৌতূহল নেই। ধর্ম আছে এবং মানুষের বিশ্বাসও ধর্মের প্রতি আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ সংকটাপন্ন জীবন যাপন করছে, সে সম্পর্কে অভিযোগ নেই। দেশের কোথায় কি হচ্ছে তা নিয়ে সাধারণ লোকের মাথাব্যথা নেই, কিন্তু দীপ্ত সাহসিকতার সঙ্গে তারা নিজের ভাগ্যের সম্মুখীন হয়। প্রফেসর শাহেদ সোহরাওয়ার্দী একজন আফগানের কথা আমাকে বলেছিলেন। সে কলিকাতার রাস্তায় চলতে গিয়ে একজন মরিচ বিক্রেতাকে দেখে। সে সুপক্ক লাল মরিচ

www.pathagar.com

বিক্রি করছিল। কাবুলিওয়ালা মরিচ দেখে একটু প্রলুব্ধ হয়। সে পথচারী একজনকে জিজ্ঞেস করে যে, ওগুলো কি। পথচারী একটু কৌতুক করে তাকে বলে, ওগুলো এক ধরনের মিষ্টি ফল, খেয়ে দেখতে পার। কাবুলি আট আনার মরিচ খরিদ করে খেতে থাকে। যে লোকটি তাকে বলেছিল যে, এগুলো সুস্বাদু ফল তখন দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে এবং তার মুখের মধ্যে দাঁতের উপর মরিচ ঘষে দেয় এবং হাসি মুখে বলে, 'তোমার আরাম হবে, মজাচে খাও।'

আফগানিস্তান ভূতত্ত্ববিদদের কাছে একটি মূল্যবান জনপদ। আফগানিস্তানের মৃত্তিকার এবং শিলান্তরগুলো অত্যন্ত প্রাচীর। হিন্দুকুশ পর্বতমালা আফগানিস্তানকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। এই পর্বতমালার উত্তরাঞ্চলে যারা থাকেন তারা জাতিগতভাবে উজবেক এবং কিরগিজ। উজবেকস্তান এবং কিরগিজিস্তানের মানুষের সাথে আফগানদের মিল আছে। হিন্দুকুশ পর্বতমালার দক্ষিণে যারা বাস করে তারা প্রধানত পশতুন এবং মৌলিক আফগান। আফগানিস্তানে দু'টি ভাষা প্রধানত পশতু এবং ফারসী। যখন রাজতন্ত্র ছিল তখন প্রাসাদের ভাষা ছিল ফরাসী। কিন্তু লোককাহিনী ও গীতি মূলত পশতু ভাষায় পাওয়া যায়। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পশতুভাষী লোকেরা বাস করে। সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফফার খানের আজীবন চেষ্টা ছিল পশতু ভাষাভাষী জাতিসত্তাকে একত্রিত করা। কিন্তু এটা কখনই প্রবল রাজনৈতিক রূপ লাভ করেনি। আফগানিস্তান ভূ-তত্ত্ববিদদের কাছে মূল্যবান হলেও এখানে ভূতত্ত্ব জরিপ তেমন হয়নি। ফলে এখনও এদেশের শিলান্তর ও মৃত্তিকার গঠন অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। উনবিংশ শতাব্দী থেকে এদেশে রাজনৈতিক উত্থান-পতন চলছে। ইংরেজরা এসেছে এবং চলে গেছে। সোভিয়েট শক্তিও এদেশকে গ্রাস করেছে এবং অনেকদিন পর্যন্ত তাদের অবস্থান এখানে ছিল। দুটো শক্তিই এদেশের সাধারণ নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার করেছে। এসব অত্যাচারের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে আফগানিস্তান যখন মাথা তুলবে মনে করছে তখন আফগানিস্তানের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাক-মার্কিন সহযোগিতায় তালেবানরা আফগানিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করলো।

তালেবানরা ইসলামী দল বলে সর্বত্র পরিচিত। আমরা বিদেশী মিডিয়ার মধ্যদিয়ে বিশেষ করে ইঙ্গ-মার্কিন মিডিয়ার মাধ্যমে তালেবানদেরকে একটি মৌলবাদী উগ্র শক্তি হিসেবে জানতে শিখেছি। যদিও পাকিস্তান তালেবান গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং নানারকম সাহায্য দিয়ে আফগানিস্তানে বসিয়েছে, কিন্তু তাদের প্রচার মাধ্যম, তাদের আধুনিক পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যথার্থ ধর্মীয় পরিচয় যথেষ্ট স্পষ্ট করেনি। অথচ ইহুদী প্রভাবিত পাশ্চাত্য মিডিয়া সর্বাংশে তালেবানকে নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ বলে প্রচার করছে। আমেরিকার বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল তালেবানদের একটি অপশক্তি এবং পশুশক্তি বলে পরিচয় করিয়েছে এবং এখনও করছে। একটি মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেলে আমি দেখলাম একটি বিকৃত মানুষের ছবি যার সম্পূর্ণ গায়ের চামড়া ছিলে নেয়া হয়েছে। এটা নাকি তালেবানদের কীর্তি। সেদিন একটি জার্মান টেলিভিশন চ্যানেলে একজন বৈজ্ঞানিকের সাক্ষাৎকার দেখলাম। তিনি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ব্যবহার সম্পর্কে মন্তব্য করলেন। তিনি বললেন, আজকের দিনে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে যে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই ব্যবহার করতে পারে, যা সত্য নয়, তাকে সত্য বলে প্রত্যয়িত করতে পারে, গভীর রাত্রিতে জনপদের উপর বোমা নিক্ষেপ

www.pathagar.com

করাকেও ক্যামেরার কৌশলে ক্ষুদ্র একটি বিস্ফোরণ বলে দেখানো যায়। বর্তমানে আমেরিকা আফগানিস্তানে তাই করছে। তালেবানরা যদিও বলছে আমেরিকার বোমা বিস্ফোরণে শত শত লোক মারা যাচ্ছে এবং এর প্রমাণ স্বরূপ তারা বিদেশী সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিদেরকে ধ্বংসস্তূপের কাছে নিয়ে গেছে চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বারা অবহিত করানোর জন্য। কিন্তু এর উত্তরে আমেরিকা বলছে যে, তালেবানরা মিথ্যাবাদী এবং সত্যকে বিকৃত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত পারঙ্গম।

আমরা বর্তমানে পশ্চিমা মিডিয়ার উপর খুব বেশী নির্ভরশীল। ইসলামিক মিডিয়া বলতে এখন পৃথিবীতে কিছুই নেই। যেমন আমেরিকান টিভি ও রেডিও, তেমনি বিবিসি এবং ফ্রেঞ্চ মিডিয়া। কিছুটা নিরপেক্ষতার আভাষ পাওয়া যায় শুধুমাত্র ডয়েচে টেলিভিশন এবং রেডিওতে। ইরানের একটি নেটওয়ার্ক আছে শাহের আমলে যাকে ইত্তেলাত বলা হত। এখন সেটা আছে কি না জানি না। থাকলেও তেমন ব্যাপকতা নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে, মুসলমান দেশের সংখ্যা যদিও অনেক, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন বিষয়ে ঐকমত্য নেই। আরব দেশেগুলো পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে স্থান নিতে দ্বিধা করে না।

আমেরিকা ভিয়েতনামে প্রায় দশ বছর যুদ্ধ করেছে। সে দেশটি একসময় ফ্রান্সের অধীনে ছিল। এবং এখনও সে দেশে ফরাসী সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। যখন স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হয় সে দেশের লোকেরা ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হয়। কিন্তু কিছুকাল যুদ্ধ করেই ফরাসীরা বুঝতে পারে যে, এই যুদ্ধে জয়লাভ করা একেবারেই অসম্ভব। তখন তারা ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে যায়, যেমন তারা আলজিরিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তখন ভিয়েতনামে আমেরিকা সৈন্য পাঠায় এবং ভিয়েতনামে নিজের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। কিন্তু দশ বছর যুদ্ধ করে ভিয়েতনাম যখন নিজের করায়ত্ত করতে পারলো না তখন বেত্রাহত শৃগালের মত পালিয়ে যায়। এখন আফগানিস্তানের দিকে তারা দৃষ্টি দিয়েছে। আফগানিস্তানে দরিদ্র ও নিরন্ন জনগোষ্ঠীর ওপর বোমা চালিয়ে তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করছে। আফগানিস্তানেও তারা টিকতে পারবে না। প্রেসিডেন্ট বুশ যদিও বলেছেন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। হতে পারে দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু একদিন আমেরিকাকে পলায়ন করতেই হবে। একদিকে আমেরিকা প্রচণ্ড বোমা হামলা চালাচ্ছে, আবার অন্যদিকে উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণসামগ্রী পাঠাচ্ছে। একেই বলেই 'গরু মেরে জুতা দান'।

আমার মনে হয় আফগানিস্তান আক্রমণের পিছনে একটি বিরাট পরিকল্পনা আছে। আমেরিকা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এবং সে যুদ্ধ হবে ইসলামের বিরুদ্ধে। যখন টুইন টাওয়ার ধ্বংস হল তখন প্রেসিডেন্ট বুশ তার প্রথম প্রতিক্রিয়ায় একটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, তাহলো ক্রুসেড। একমাত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধেই খ্রিস্টানরা ক্রুসেড শব্দটি ব্যবহার করে আসছে। ইসলামের জেহাদ শব্দটি এর সমার্থক নয়। জেহাদ হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ, মিথ্যার বিরুদ্ধে জেহাদ, অপলাপের বিরুদ্ধে জেহাদ, কামনার বিরুদ্ধে জেহাদ এবং বিকল সংকল্পের বিরুদ্ধে জেহাদ। জেহাদের প্রতিপক্ষ কোন সম্প্রদায় নয়, কিন্তু ক্রুসেডের একমাত্র প্রতিপক্ষ মুসলমান। ইউরোপীয় খ্রিস্টানগণ এক সময় জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে অবতীর্ণ হয়েছিল। আজ প্রেসিডেন্ট বুশ একটি বিশ্ব কোয়ালিশন গঠন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ডাক দিয়েছেন। পরীক্ষামূলকভাবে আফগানিস্তানের

www.pathagar.com

উপর নিপীড়ন হচ্ছে এর প্রথম ধাপ। চিরকাল নিরীহ আফগানরা প্রতারিত হয়ে আসছে। আজও তারা নির্যাতন, প্রতারণা ও বঞ্চনা সহ্য করছে।

আমেরিকা একটি পরাশক্তি। পরাশক্তির দায়িত্ব হচ্ছে ক্ষুদ্র শক্তির বিরুদ্ধে এবং অসহায়তার বিরুদ্ধে নির্যাতনের জন্য প্রতিজ্ঞা করা নয়। বরঞ্চ তার কর্তব্য হচ্ছে নিরুপায় মানুষগুলোকে সাহায্য করা। আফগানিস্তানের অসহায় মানুষগুলো হতদরিদ্র। তারা বাঁচতে চায় এবং বাঁচবার জন্য সাহায্য চায়। সে সাহায্যের হাত কে বাড়িয়ে দেবে? ❑

২৬ অক্টোবর '০১

লেখক : কবি, শিল্প-সাহিত্য সমালোচক, সাবেক মন্ত্রী, জাতীয় অধ্যাপক।

www.pathagar.com

অপরাধ প্রবণ মার্কিন সরকার এবং মার্কিন নাগরিকরাই দায়ী ওসামা বিন লাদেন নন

ড. এস. এম লুৎফর রহমান

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে এবং পেন্টাগনে যে নজিরবিহীন ধ্বংসকর্ম ঘটে তা এই শতকের এক অভাবনীয় ঘটনা। একে মার্কিনীরা সারা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদী ঘটনা বলে প্রচার করলেও আসলে এটি যে একটি স্যাবোটাজ বা ধ্বংসাত্মক ঘটনা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ ঘটনাস্থল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহর। আর ঐ কর্মে ব্যবহৃত বিমান চারটির প্রত্যেকটিই আমেরিকান বিমান। ওগুলোর প্রত্যেকটির পাইলটও আমেরিকান। এদের কেউই আরব-আমেরিকান, এমন কি মুসলমানও নয়। তাছাড়া যে দু'টি বিমান কোম্পানীর বিমান একাজে ব্যবহৃত হয় সে কোম্পানী দু'টিও আমেরিকান। এ দু'টি আমেরিকান বিমান কোম্পানীর চারটি বিমানের যে চারজন পাইলট ওই স্যাবোটাজ চালিয়েছেন, তাদের নামও প্রকাশ করা হয়েছে। এরা কেউই কোন বিমান হাইজ্যাক করেননি। বরং নিজ নিজ বিমান দিয়ে তারা আক্রোশের বশে ঐ চারজন পাইলট আপন দেশের সম্পদ ও শক্তির প্রতীক 'বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র' ও 'পেন্টাগনে' আঘাত হেনেছে তার খবরও আন্তর্জাতিক তথ্যসূত্রে জানা গেছে। এ বিষয়ে গত ২০-৯-২০০১ তারিখে ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিকে যে খবর প্রকাশিত হয় তা থেকেও স্পষ্ট জানা যায়-এগারোই সেপ্টেম্বরের দুঃখজনক ঘটনা ছিল মার্কিন সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক শক্তির দুই মিনারের ওপর ক্ষুব্ধ আমেরিকানদেরই হানা আঘাত। একে 'হাইজ্যাক' বলা যায় না। বড়জোর বলা যায় 'স্যাবোটাজ' তাও স্বদেশের স্বসমাজের মানুষের দ্বারা সংঘটিত।

কেন এই স্যাবোটাজ ?

উপরের কোটেশন থেকে উক্ত 'স্যাবোটাজ' বা আঘাতের যে সামান্য কারণ আন্দাজ করা সম্ভব তা হল ভিয়েতনামে পরিচালিত যুদ্ধ। আজ দু'হাজার এক সালে যাদের বয়স ত্রিশ-চল্লিশ বছর তাদের মধ্যে খুব কম যুবক-যুবতীই ঐ যুদ্ধের প্রকৃত খবর জানেন। এজন্য এখানে সে বিষয়ে মোখতাছার কিছু আলোচনা করে নেয়া দরকার। নইলে কেন ওই চার

www.pathagar.com

জন আমেরিকান নিজেদেরই দেশের 'শক্তি' ও 'সমৃদ্ধি'র ওপর আত্মহননকারী আঘাত হানেন তা বোঝা যাবে না।

পাঠকগণের একাংশ নিশ্চয়ই জানেন, মার্কিন সরকার ভিয়েৎনামে সমাজতন্ত্রের বিজয় নস্যাৎ করতে গত শতকের তিন দশকব্যাপী কী জঘন্য বর্বরতার পরিচয় দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্রীস্টান শক্তি সেদেশে প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্রের এমন একটির প্রয়োগও বাদ রাখেনি, যা পরবর্তী কোন যুদ্ধের জন্য রাখা যেত। তারা কেবল আণবিক বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহার করেনি। কারণ তাতে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারত। ভিয়েতনামের মাইলাই গ্রামে যে পাশবিক অত্যাচারের নজির সেদিন মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট রেখেছিল, সে রকম বর্বরতা তার আগে আর কখনও কোথাও দেখা যায়নি। ঐ যুদ্ধে নাপাম বোমাসহ যে হাজার হাজার টন বোমার আঘাত ভিয়েতনামের মাটিকে ধুলিতে পরিণত করেছিল, তার তুলনা দেওয়া চলে না। এতসব সত্ত্বেও ভিয়েতনাম যুদ্ধ পরিস্থিতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে নিজেদের অনুকূলে আনা সম্ভব হয়নি। এমনকি, ঐ যুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর অবস্থা এতই নাজুক হয়ে পড়ে যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করাই কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ ষাট-এর দশকে মার্কিন জনগণ এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। মার্কিন সৈনিকরা ভিয়েৎনামে যুদ্ধ করতে গিয়ে অযথা প্রাণ হারাতে আর রাজি ছিল না। সরকার পক্ষ থেকে তখন নতুন সৈন্য সংগ্রহের জন্য মার্কিন পত্র-পত্রিকায় লোভনীয় বিজ্ঞাপন দেয়া হতে থাকে। তাতে মার্কিনী যুবতীদের প্রায় নগ্ন ছবি ছেপে, মোটা অংকের বেতনের উল্লেখ করে বলা হত 'ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশ নিয়ে মাত্র দু'বছর যুদ্ধের পর চাকরি থেকে অবসরদানসহ ঐসব যুবতীকে লাভ করা যাবে।' কিন্তু উচ্চ বেতন, যুবতী নারীদেহ এবং স্বল্পতম সময়ে চাকরির প্রলোভনও ব্যর্থ হয়।

মার্কিন জনগণ তাদের যুবকদের আর মরতে দিতে চাচ্ছিল না। তারা ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবধারিত পরাজয় দেখতে পেয়ে মার্কিন সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করায়, অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। জয় হয় উত্তর ভিয়েতনামের। এ যুদ্ধে কি পরিমাণ মার্কিন সৈন্য নিহত হয়, তার প্রকৃত তথ্য কোনদিনই পাওয়া যাবে না। সেকথা কেবল মার্কিন সরকারই জানে। কিন্তু যারা বেঁচেছিলেন, আর যাদের আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধুরা বেঁচে ছিলেন এবং এখনও বেঁচে আছেন, তাদের অবস্থা কি, সেটাই এ প্রসঙ্গের মূলকথা। বর্তমান আলোচনায় সে কথাই বিশেষ জরুরী। এরকম পরিস্থিতিতে যারা মারা যায় বা মরতে বাধ্য হয় তারা তো মরেই বেঁচে যায়। আর যারা বেঁচে ফিরে আসে অথবা যাদের নিকট-জনেরা বেঁচে থাকে তাদের অবস্থাই হয় সব থেকে করুণ। এদের একদল হয়তো পাগল বা চিরবিমর্ষ হয়ে যায়। অন্যদল হয় ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও প্রতিকারবাদী। এই শ্রেণীর লোক যে জীবনে হতাশ হয়ে 'হয় মারব নয় মরব' নীতি নিয়ে, যে কোন অঘটন ঘটাতে পারে তা যে কোন মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসকই কবুল করবেন। তার প্রমাণ হিসেবে গত পনেরোই অক্টোবর, ২০০১ বিবিসির নৈশ অধিবেশনে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকার থেকেও পাওয়া যায়। ঐ সময় এগারোই সেপ্টেম্বরের দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের নিকট আত্মীয়-স্বজনদের ভবিষ্যৎ মানসিক সমস্যা কেমন হতে পারে-

www.pathagar.com

সে বিষয়ে বিবিসির এক প্রশ্নের জবাবে নিউইয়র্কের বেলেভিউ হাসপাতালের মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসক জনাব ডাক্তার আবদুল্লাহ হাসান বলেন, ও মারা গেছে, আমি আত্মহত্যা করতে চাই। এরকমও হতে পারে।

অতএব, ভিয়েতনামেই মরুক কিংবা নিউইয়র্কেই মরুক, মৃতের জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের শোকের প্রতিক্রিয়া হয় একই রকম। অন্যায় কেউ স্বেচ্ছায় না করে বাধ্য হয়ে করলে তার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হবেই। সে জন্য ভিয়েতনাম যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি তাড়িত পূর্বোক্ত চারজন মার্কিন পাইলটের আত্মহননকারী প্রতিশোধমূলক ভূমিকা যথেষ্ট বাস্তবসম্মত এবং যৌক্তিক। অতএব বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগনে যে তারাই আঘাত হেনেছে, অন্য কোন দেশের, অন্য কোন লোক নয়, তা সত্য।

বলা দরকার যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি ভয়ঙ্কর অপরাধপ্রবণ সন্ত্রাসী দেশ। বিবিসি সূত্রে (১৫ অক্টোবর) জানা যায়, এ দেশে বর্তমানে আটশ'টি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আছে। তাদের মধ্যে চারশ'টি গ্রুপই সশস্ত্র। ঐ চার ব্যক্তি এদের কোন দলের সদস্য ছিল কিনা, তা কেবল যুক্তরাষ্ট্র সরকারই বলতে পারে। কিন্তু তারা তা বলছে না। এ ঘটনার সঙ্গে যে ইহুদী এবং ভারতীয় হিন্দু গুপ্তচর সংস্থারও সম্পর্ক ছিল, ঘটনা ঘটার আগেই তারা তা জানত। সে তথ্যটিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচার করছে না। তারা এও প্রচার করছে না যে, পূর্বোক্ত চারটি বিমানের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা ব্লাক বক্স-এ কি তথ্য লুকিয়ে আছে। যদিও প্রথমে বলা হয়, ঐসব বিমানের ব্লাক বক্স পাওয়া গেলে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা যাবে, তথাপি মাসাধিককাল বলে যাবার পরও সে বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য নেই। এও যে মার্কিনীদের মিথ্যা, অপরাধ ও সন্ত্রাসপ্রবণ মনের পরিচয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

খ্রিস্টান মার্কিনীদের এই সাম্রাজ্যবাদী ও সন্ত্রাসবাদী অপরাধপ্রবণ মানসিকতার কারণেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ মূল ঘটনা আড়াল করে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 'ক্রুসেড' ঘোষণা করেছেন, ইসলাম ও মুসলমান-বিশ্বের বিরুদ্ধে। আর তার আশু টার্গেট করেছেন- সত্যিকার ইসলামপন্থী বিপ্লবী, মর্দে মুজাহিদ, হিম্মত ও হুরমতদার (সাহসী ও কর্মকুশলী) সর্বস্বত্যাগী, মুমিন ও পরহেজগার মুসলিম ওসামা বিন লাদেনকে। আর তার আশ্রয়দাতা একশ' পার্সেন্ট খাঁটি ইসলামী আদর্শে পরিচালিত শাণিত-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার দেশ (বিবিসির একটি বক্তব্যে উক্ত) আফগানিস্তানকে তথা তার তালেবান সরকারকে। অথচ তালেবান সরকার বা তার প্রধান মোল্লা মোহাম্মদ ওমর, লাদেন কিংবা তার সংগঠন আল কায়দার কারো বিরুদ্ধে এগারোই সেপ্টেম্বরের ঘটনার সথে জড়িত থাকার কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত বুশ সরকার দাখিল করতে পারেনি।

একইভাবে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে অন্যদের আঘাত হানার দায়-দায়িত্বও বারবার লাদেন ও মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে আসছে। কিন্তু কোথাও তাদের কারো বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। বরং ওকলাহোমা ঘটনার মত ঘটনাগুলোয় মার্কিন নাগরিকদের সংশ্লিষ্ট থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

তাই খ্রিস্টবাদী যিশুর এই শ্রেণীর মার্কিন চ্যালাদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় কোন লাদেন বা কোন মুসলমান প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট অব্রাহাম লিংকনকে হত্যা করেছিল ? কে হত্যা করেছিল প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডিকে ? কারা প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও

www.pathagar.com

আত্মসমর্পণে উদ্যোগী জাপানের জনবহুল দু'টো শহরের ওপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে ? স্রেফ নব-উদ্ভাবিত মারণাস্ত্রের কার্যকারিতা দেখার জন্য ? কারা ভিয়েতনাম, কোরিয়া, কম্বোডিয়ায় অসংখ্য নরহত্যা চালিয়েছে ? সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করে কারা শান্তি ও সমৃদ্ধির একটি বিশাল ভূখণ্ডকে টুকরো টুকরো করেছে এবং ঐ রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশে শান্তিতে বসবাসকারী মুসলমানদের ওপর গণহত্যা চাপিয়ে দিয়েছে ? তুর্কী ও আলজিরীয় জনগণের জাতীয় ঐক্য, শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আজ কাদের হাত সক্রিয় ? কাশ্মীর সমস্যা, প্যালেস্টাইন সমস্যা, পূর্ব তিমুর সমস্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার হোতা কারা ? সুসমৃদ্ধ ইরাককে আজ তেজস্ক্রিয় ধুলায় ধূসর করে দিয়েছে কারা ? ইরাক এবং আফগানিস্তানের লক্ষ লক্ষ বেসামরিক নারী, পুরুষ ও শিশুরা নিহত হয়েছে ও হচ্ছে কোন শক্তির সন্ত্রাসী হামলায় ? এরকম বহু প্রশ্নের একটিই জবাব- আর তা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্বর খ্রিস্টান শক্তিই এসব কিছুর নায়ক। এসব কিছুর জন্য দায়ী।

অতএব, এ কথা নিঃসংকোচে বলা য়ায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত এগারোই সেপ্টেম্বর যে দুর্ঘটনা ঘটে, তা আমেরিকান নাগরিকদের দ্বারাই সংঘটিত। ওসামা বিন লাদেনকে দিয়ে নয়। তিনি নিজেও সে কথা অস্বীকার করেছেন। আল কায়দা বা অপর কোন মুসলিম সংগঠনও ঐ ঘটনার সাথে জড়িত নয়। তালেবান সরকার নয়। আফগানিস্তান নয়। ইরাক নয়। ফিলিস্তিন নয়। আরব-আমেরিকানরাও নয়। তথাপি গোটা অপকর্মের দায়-দায়িত্ব ইসলাম ধর্ম, মুসলিম জাহান, আফগান জনগোষ্ঠী, আল-কায়দার সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক-এ সংগঠন উপসাগরীয় এলাকায় মার্কিন দখলদারিত্বের বিরোধী বলে এর ওপর চাপিয়ে দিয়ে সন্দেহ বাতিকে আক্রান্ত আমেরিকা 'ক্রুসেড' (মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত খ্রিস্টানদের ধর্মযুদ্ধ ইসলাম ধর্মের উচ্ছেদ করে খ্রিস্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠা যার লক্ষ্য) ঘোষণা করেছে। বুশ প্রশাসন আফগানিস্তানে আক্রমণ চালাচ্ছে দিনের পর দিন। আর ইতিহাসের এই ঘৃণ্যতম, জঘন্য, মানবতাবিরোধী ক্রুসেড চালাতে তারা জাতিসংঘসহ সারা পৃথিবীকে কাজে লাগাচ্ছে। চীনকেও বাদ রাখেনি। বাদ দেয়নি ইরান, পাকিস্তান, সৌদি আরব, বাংলাদেশে, ইন্দোনেশিয়ার মত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোও। এসব কিছুর ওপর আণবিক শক্তির দাঁতওয়ালা কাগুজে বাঘ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সারা দুনিয়ার প্রচার মাধ্যমগুলোয় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে তারস্বরে ওসামা বিন লাদেন, তালেবান সরকার ও আফগানবিরোধী মিথ্যা, একতরফা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রচার যতই তীব্র হোক, সমস্বরে হোক, বিশ্বব্যাপী হোক, এ কথা কখনই অস্বীকার করা যাবে না যে, অপরাধপ্রবণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্রিস্টান সরকারই বিশ্বসন্ত্রাসী এবং এগারোই সেপ্টেম্বর বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগনে ক্রুদ্ধ আঘাত সেই সরকারেরই বিশ্বব্যাসী সামরিক সন্ত্রাস ও অর্থনৈতিক সন্ত্রাস পরিচালনার ফল। ❑

২৬ অক্টোবর '০১
লেখক ঃ গবেষক, প্রাবন্ধিক, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক।

www.pathagar.com

বুশের ক্রুসেড ঘোষণা এবং তারপর

মিসকীন শাহ্

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ক্রুসেড ঘোষণা করেছেন। পোপ ২য় আরবানের মত ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে নয়। ক্রুসেড ঘোষণা করেছেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী (অবশ্য বুশের ভাষায়) ওসামা বিন লাদেনকে জীবিত অথবা মৃত ধরে আনার জন্য বিরাট অংকের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর অপরাধ ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে আমেরিকার চার চারটি বিমান হাইজ্যাক করে এর সাহায্যে টুইন টাওয়ার নামে ১১০ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক টাওয়ারে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে তিনি সেটাকে তাসের ঘরের মত মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। মার্কিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দফতর পেন্টাগনে হামলা চালিয়ে এর একটি বিরাট অংশ ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ছিল বৃহত্তম পরাশক্তি আমেরিকার গর্ব ও অহংকার। পেন্টাগন ছিল তাদের আরেকটি গর্বের ধন। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে ওসামা বিন লাদেন আমেরিকার গর্ব ও অহংকার গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের প্রচণ্ড জাত্যভিমানে আঘাত হেনেছেন। সেই সাথে এখানে কর্মরত কয়েক হাজার মানুষের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছেন। এ হামলা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে নয়, পেন্টাগনে নয়, স্বয়ং আমেরিকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপরই সরাসরি আঘাত। এটা আমেরিকার জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। অতএব এটাকে বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেয়া যায় না। এটাই বুশের বক্তব্য।

কিন্তু ওসামাই যে এ বিমান হামলা চালিয়েছেন তার প্রমাণ কি ? তিনিই যে বিমানগুলো হাইজ্যাক করেছেন তার প্রমাণ কৈ ? বিমানগুলো তা মার্কিনীরাই চালাচ্ছিল আর হাইজ্যাক কেউ করে থাকলে তাও তো মার্কিনীদেরই কেউ করেছিল। খোদ মার্কিন মুল্লুকেই সন্ত্রাসীদের সংখ্যাতো আর কম নয়। সন্ত্রাসী ঘটনা বরং বেশীই ঘটে। এইতো বেশি দিনের ঘটনা নয়। ট্রেড সেন্টারে একটা বিস্ফোরণ ঘটল। দোষ দেয়া হলো মুসলমানদের। অনেক পরে জানা গেল, আমেরিকার এক ছাঁটাইকৃত সৈনিকই সেটা ঘাটিয়েছিল। ধৃত হবার পর বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। তাহলে খবর নেবার আগেই সম্ভাব্য অপরাধী হিসেবে মুসলমানদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল কেন ? প্রশ্ন জাগে, জন এফ কেনেডি এবং তারও আগে আব্রাহাম লিংকনসহ চার চার জন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কারা হত্যা করেছিল ? কেনেডির ভাই রবার্ট কেনেডিকে কারা হত্যা

www.pathagar.com

করেছিল ? এই যে মাঝে মাঝে পত্রিকার পাতায় দেখা যায় অমুক স্কুলের এত সংখ্যক বালক-বালিকাকে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করা হয়েছে, এগুলো কারা করে ? তারা কোন দেশের ? বেশী দিনের কথা নয়, প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানকে যারা গুলী করেছিল তারাই বা কারা? আমেরিকায় এত সন্ত্রাস ও খুনাখুনি হয়েছে অথচ নিশ্চিত না হয়ে ওসামা বিন লাদেনই ঘটিয়েছে বলে প্রচার করা হচ্ছে। তিনি নাকি সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণ দেন। তিনি কেবল আশ্রয় ও প্রশ্রয়ই দেন না সন্ত্রাসীদের, তাঁর বিপুল বিত্ত সম্পদের একটা বিরাট অংশও সন্ত্রাসীদের পেছনে ব্যয় করেন। আল-কায়দা নামক একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ ও নেটওয়ার্কের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। পৃথিবীব্যাপী মার্কিনী স্বার্থ ও স্থাপনায় আঘাত হানার লক্ষ্যেই এর প্রতিষ্ঠা। কাজেই টুইন টাওয়ারে হামলা ওসামার সন্ত্রাসী বাহিনীর না হয়েই পারে না। অতএব ধর ওসামাকে, হোক সে জীবিত অথবা মৃত।

এরপর থেকেই সে তারস্বরে চিৎকার করে চলেছে সারাবিশ্ব জুড়ে। কেন না এতবড় বিরাট পরাশক্তি হবার পরও তার সাহস হচ্ছে না একাকী অগ্রসর হবার। এজন্য তার সঙ্গী দরকার, সহায়ক শক্তি দরকার। অতএব সেই সহায়ক শক্তি ও সঙ্গীর খোঁজে সে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত চষে ফিরছে। ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি মিত্র শক্তি হিসেবে আমেরিকাকে সাহায্য করতে চায় বটে, কিন্তু তাদের একটিই প্রশ্ন—প্রমাণ চাই। ওসামা বিন লাদেনই যে এ কাজ করেছে তার প্রমাণ কৈ ? এতবড় দুঃসাহসিক কাজ করার জন্য যেই নিখুঁত পরিকল্পনা ও উন্নত প্রযুক্তি দরকার তা ওসামার আছে কিনা সর্বাগ্রে তা দেখতে হবে। তদুপরি এতবড় ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সফল বাস্তবায়ন বহু লোকের ও বহুদিনের সম্মিলিত পরিকল্পনা ও প্রয়াস ছাড়া সম্ভব নয়। তদুপরি যেই লোকগুলো এতবড় দুঃসাহসিক ও আত্মঘাতী অভিযানে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিল তারাই বা কেন, কোন নেশায় ও কোন লক্ষ্যে এভাবে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিল ? কি চেয়েছিল তারা ? এগুলোও তো ভেবে দেখা দরকার। অতএব সবদিক ঠাণ্ডা মাথায় না ভেবে হঠাৎ করেই কিছু একটা করে বসা ঠিক হবে না। এর পেছনে কি ওসামাই আছেন নাকি অন্য কেউ বা অন্য শক্তি তাঁর নাম ভাঙিয়ে তাদের অন্যবিধ মতলব হাসিল করতে চাইছে ? কিন্তু না, আমেরিকা অতশত শুনতে রাজি নয়। ক্রোধে ও আক্রোশে সে অন্ধ।

একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি হবার দম্ভে অনেক আগ থেকেই সে ধরাকে সরা জ্ঞান করে আসছে। শক্তিমান থোড়াই যুক্তি-প্রমাণের ধার ধারে। অন্যতম পরাশক্তি হিসেবে রাশিয়া যতদিন আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ততদিন তাকে কিছুটা হলেও হিসাব-নিকাশ করে পা ফেলতে হয়েছে। রাশিয়ার পতনের পর সেই হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কিন্তু যোগ্য ও উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কাউকে না পেয়ে যখন সে অস্থির হয়ে উঠছিল তখন মিঃ হান্টিংটন 'সভ্যতার সংঘাত' নামক এক তত্ত্ব নিয়ে হাজির হলেন এবং এই তত্ত্বে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্ভাব্য একমাত্র যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসবে ইসলামকে সামনে টেনে আনলেন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামের মাঝে সংঘাত অনিবার্য বলে প্রমাণ করতে চাইলেন। পশ্চিমাদের কাছে এ তত্ত্বের মূল বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল। ইসলাম কেবল আধ্যাত্মিক বলেই বলীয়ান নয়, সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবেও যথেষ্ট গুরুত্বের দাবীদার। তদুপরি মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর ভৌগোলিক-রাজনৈতিক অবস্থান এমনিতেই তাদের

www.pathagar.com

শিরঃপীড়ার কারণ ছিল। অতঃপর কম্যুনিজমের পতনের পর মানুষ যেভাবে ইসলামের দিকে ঝুঁকছে তা তাদের ঘুমকে হারাম করে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। স্বয়ং আমেরিকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের হার অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। প্রতি বছর ২০ হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করে থাকে। এদের মধ্যে ১৫ হাজার কৃষ্ণাঙ্গ বাকী ৫ হাজার শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান এবং মুসলিম জনসংখ্যা ইতোমধ্যেই এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ফলে তা অনেক মার্কিনীর তো বটেই, বিশেষ করে আমেরিকার ইহুদীদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, এ জনসংখ্যা ইহুদীদের সংখ্যা অতিক্রম করে মুসলমানদেরকে আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যায় এনে দাঁড় করিয়েছে। তদুপরি ইতোমধ্যেই আমেরিকার রাজনীতি ও সমাজ জীবনে তারা তাদের প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানীসহ পশ্চিমা সকল দেশেই প্রায় মুসলমানদের সংখ্যা চোখে পড়ার মত। অধিকন্তু ইসলামী জীবন-চেতনা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের বাহ্যিক আচার-আচরণ ও বেশভূষায়ও এর ছাপ পড়ছে। ফলে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন শহরে দাড়ি-টুপি পরিহিত মুসলমানের সংখ্যাও ইদানীং বেশ চোখে পড়ে। যে স্পেন একদিন খ্রিস্টানদের নির্মূল অভিযানের প্রেক্ষিতে মুসলিম-শূন্য হয়ে গিয়েছিল সেখানেও বর্তমানে ইসলাম তার নিজস্ব পরিচয় প্রকাশ করতে শুরু করেছে। বর্তমানে সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী জীবনবোধের প্রতি যেই তাকিদ ও চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে করে এদের উত্থানকে এখনই স্তব্ধ করা না গেলে, তদুপরি তাদের সামরিক শক্তিকে অবিলম্বে নির্মূল করা না গেলে তা পাশ্চাত্যের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে বিধায় 'পয়লা রাতেই বিড়াল মারতে হয়'-এই চির পুরাতন মহাজন বাণীকে মনে রেখেই ইরাক-ইরান যুদ্ধ বাধিয়ে উভয় মুসলিম রাষ্ট্রের সামরিক শক্তিকে মিশিয়ে দেয়া হয়। এরপর ইরাককে দিয়ে কুয়েত দখল করিয়ে অতঃপর কথিত অপরাধে কুয়েত পুনরুদ্ধারের নামে ইরাকের ওপর ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সামরিক শক্তিকে গুঁড়িয়ে দেয়। অতঃপর কাবুল দখলের অভিযোগে চির প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়াকে টুকরো টুকরো করা হলে এর পেট চিরে ছয়টি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটলে এবং পাকিস্তানের নেতৃত্বে একটি উদীয়মান আঞ্চলিক মুসলিম কমনওয়েলথ-এর সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠায়, তদুপরি মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের নেতৃত্বে তালেবান পরিচালিত একটি ইসলামী (তাদের ভাষায় মৌলবাদী) সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, অধিকন্তু মুসলিম বিশ্বে আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু পাকিস্তান একমাত্র মুসলিম দেশে হিসেবে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হওয়ায় আমেরিকার জন্য এমন একটি অজুহাত মেলা দরকার ছিল যাতে করে একই ঢিলে সবগুলো পাখি মারা যায়। টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে বিমান হামলা পশ্চিমা বিশ্বের মোড়ল আমেরিকার জন্য সেই মোক্ষম সুযোগ এনে দেয়। কোন বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই আমেরিকা ওসামা বিন লাদেনকে এর জন্য দায়ী করে এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তার ঘাড়ে একতরফাভাবে চাপিয়ে ওসামার আশ্রয়দাতা মেজবান দেশ আফগানিস্তানের প্রতি ওসামাকে তাদের হাতে তুলে দেয়ার দাবি জানাতে থাকে। কিন্তু কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দেশ ও জাতিই এ ধরনের অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবি মেনে নিতে পারে না। দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্যর অধিকারী আফগানরা এ ধরনের দাবি মেনে নেবে-এটা তো আরও অসম্ভব। তারা আমেরিকার কাছে প্রমাণ চাইল, কিন্তু তারা তাদের দাবিতে অনড়। আফগান ইসলামী হুকুমতের মজলিসে শূরার সহস্রাধিক সদস্য

www.pathagar.com

তিনদিনব্যাপী বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যে সিদ্ধান্ত নিল, তা হল- কোনরূপ উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া ওসামা বিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়া হবে না। তবে হ্যাঁ, কৃত অপরাধের যথোপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ সাপেক্ষে আফগান ইসলামী আদালতে বিচার হতে পারে কিংবা কোন তৃতীয় মুসলিম দেশের কাছে বিচারের জন্য তাকে তুলে দেয়া যেতে পারে কিংবা তিনি স্বেচ্ছায় অন্য কোথাও যেতে চাইলে যেতে পারেন। কিন্তু তিনি থাকতে চাইলে মেহমান হিসেবে তাকে হেফাজত করা হবে।

অবশেষে আমেরিকা ৭ অক্টোবর থেকে ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় ও মদদ দানের অজুহাতে আফগানিস্তানের ওপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে আফগানিস্তানে কমান্ডো বাহিনীও পাঠানো হয়েছে। ঘোষিত সর্বাত্মক ক্রুসেড শুরু হয়ে গেছে। বীরের জাতি আফগান মুজাহিদরাও সর্বাত্মক জিহাদে লিপ্ত। আমেরিকা যখন হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা ফেলে লাখ লাখ নারী-পুরুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়, ভিয়েতনাম ও কোরিয়ায় ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠে, শাবরা সাতিলা ক্যাম্পের ২ হাজার নারী ও শিশুকে যখন তারই প্রশ্রয়ে ট্যাঙ্কের নিজে পিষে মারে ইসরাইল, খাদ্য ও ওষুধের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যখন পাঁচ লক্ষাধিক ইরাকী শিশুকে মৃত্যুর হিমশীতল কোলে ঠেলে দেয়া হয়, হাজার হাজার কাশ্মীরী নারী-পুরুষের আর্তচিৎকারে যখন আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে; তখন যাদের প্রাণে এতটুকু দাগ কাটে না-বিশ্ব সন্ত্রাসী সে আমেরিকা সন্ত্রাস দমনের নামে আজ আফগানিস্তানে এক অসম সমরে লিপ্ত। তারা আজ অন্যায়ভাবে বীরশ্রেষ্ঠ আফগানদের ইসলাম কায়েমের অপরাধে(?) কোরআন-সুন্নাহ মাফিক চলতে চাওয়ার দোষে (?) খেসারত আদায় করছে। তারা অহংবোধ অন্ধ। ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধশূন্য। তারা ইরাককে শেষ করেছে।

সউদী আরবে মুসলমানদের প্রিয় ভূমিতে স্থায়ী ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। চেতনাকে নিঃশেষ করতে চাইছে এবং পাকিস্তানের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমেরিকার মনে রাখা উচিত, যে সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না সেই বৃটিশ সাম্রাজ্য আফগানিস্তানের বুকে চরম মার খেয়েছে, যার ব্যথা আজকের টনি ব্লেয়ারও ভুলতে পারছে না। পরাশক্তি রাশিয়া আফগানিস্তানের মাটিতে পা রাখার অপরাধের মাশুল গুনছে। আমেরিকাকেও তার এত দিনের কৃত পাপের কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। এ মাটিতেই তার কবর রচিত হবে। জালিম ও মজলুমের লড়াইয়ে আল্লাহ সব সময় মজলুমের পক্ষে। আফগানিস্তান একমাত্র ঈমানী শক্তিকে সম্বল করে আল্লাহর ওপর ভরসা করে মোকাবিলা করে যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ জয় তাদের অবধারিত। নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব। ❑

২৬ অক্টোবর '০১

লেখক : গবেষক, প্রাবন্ধিক।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে বর্তমান সংকটের ধারাবাহিক ঘটনাপঞ্জি

তানভীর হোসেন খান

১১ সেপ্টেম্বর ঃ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক রাজধানী নিউইয়র্কের ১১০ তলাবিশিষ্ট টুইন টাওয়ার নামে খ্যাত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগনে আত্মঘাতী বিমান হামলা॥ পেনসিলভেনিয়ায় চতুর্থ বিমান বিধ্বস্ত॥ ৪টি বিমান এ আত্মঘাতী মিশনে অংশগ্রহণ করে॥ তিনটি বিমান নিউইয়র্ক বিমানবন্দর থেকে এবং আরেকটি বিমান বোস্টন বিমানবন্দর থেকে ছিনতাই করা হয়॥ বিমানে ২৬৬ জন যাত্রী এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে আরো প্রায় সাড়ে ৬ হাজার লোকের মৃত্যু॥ প্রাণনাশের আশংকায় প্রেসিডেন্ট বুশের ৬ ঘন্টা আকাশে অবস্থান এবং পরে নেভাদায় পারমাণবিক বাংকারে আশ্রয় গ্রহণ।

১২ সেপ্টেম্বর ঃ যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে মুসলমানদের ওপর হামলা॥ বর্ণবাদী হামলায় তিনজন মুসলমান নিহত॥ টেক্সাস, অটোয়া অস্ট্রেলিয়ায় মসজিদে অগ্নিসংযোগ॥ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে হামলার সন্দেহে মার্কিন ও প্রবাসী মুসলমানদের পাইকারি গ্রেফতার॥ যুক্তরাষ্ট্রে বিমান উড্ডয়ন বন্ধ॥

১৩ সেপ্টেম্বর ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী হামলার জন্য সৌদি ভিন্নমতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেনকে সন্দেহ। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কলিন পাওয়েল এক সাংবাদিক সম্মেলনে লাদেনকে দায়ী করে একটি বিবৃতি দেন॥

১৪ সেপ্টেম্বর ঃ প্রেসিডেন্ট বুশকে যে কোন দেশের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়ে মার্কিন সিনেটে একটি বিল পাস। ভূখণ্ড ও আকাশসীমা ব্যবহার পাকিস্তানের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের দাবি॥ রাওয়ালপিন্ডিতে সেনা সদরে কোর কমান্ডারদের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের ৭ ঘন্টা রুদ্ধদ্বার বৈঠক॥

www.pathagar.com

১৫ সেপ্টেম্বর ঃ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তাদানে পাকিস্তানের অঙ্গীকার॥ কোর কমান্ডার ও মন্ত্রিসভার যৌথ বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা দানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়॥

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ লাদেনকে হস্তান্তরে কাবুলকে পাকিস্তানের ৩ দিনের আল্টিমেটাম॥ মার্কিন চাপে পাকিস্তান মধ্যস্থতার উদ্যোগ নেয়। পাকিস্তান সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএস আই প্রধান লেঃ জেনারেল মেহমুদ আহমদের নেতৃত্বে একটি পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের কাবুল যাত্রা॥

১৭ সেপ্টেম্বর ঃ সৌদি ভিন্নমতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেনকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় হাজির করার জন্য মার্কিন বাহিনীকে প্রেসিডেন্ট বুশের নির্দেশ। প্রেসিডেন্ট বুশ ওয়াশিংটনে এক অনুষ্ঠানে কথিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে ক্রুসেড হিসেবে ঘোষণা করেন॥

১৮ সেপ্টেম্বর ঃ যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের আকাশসীমা, সমুদ্রবন্দর বিমানঘাঁটি ও বিমানবন্দর ব্যবহারের অনুমতি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়॥ লাদেনকে হস্তান্তরে তালেবানদের অস্বীকৃতি। তালেবান উপপ্রধানমন্ত্রী মোল্লা মোহাম্মদ হাসান বলেন, আফগানিস্তান ধ্বংস হয়ে গেলেও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে লাদেনকে হস্তান্তর করা হবে না।

১৯ সেপ্টেম্বর ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তালেবান শীর্ষ নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের আলোচনার প্রস্তাব॥ মজলিসে শূরার বৈঠক॥ ১ হাজার শীর্ষ আলেমের যোগদান॥ লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরের বিষয় নিয়ে আলোচনা॥ সামরিক অভিযানের প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট বুশের স্বাক্ষর॥

২০ সেপ্টেম্বর ঃ কাবুলে দ্বিতীয় দিনের মত মজলিসে শূরার বৈঠক॥ সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতানৈক্য॥ বৈঠক স্থগিত॥

২১ সেপ্টেম্বর ঃ তালেবান মজলিশে শূরার বৈঠকে ওসামা বিন লাদেনকে স্বেচ্ছায় আফগানিস্তান ত্যাগের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস। তালেবান সরকারের কাছে এ প্রস্তাব হস্তান্তর। লাদেনকে হস্তান্তরে বুশের আল্টিমেটাম। মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণে বুশ এ আল্টিমেটাম দেন।

২২ সেপ্টেম্বর ঃ তালেবানদের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সম্পর্ক ছিন্ন। আফগানিস্তানে মার্কিন গোয়েন্দা বিমান গুলীতে ভূপাতিত।

২৩ সেপ্টেম্বর ঃ পাকিস্তান ও ভারতের ওপর থেকে মার্কিন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এক বিবৃতিতে এ দু'টি দেশের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার কথা ব্যক্ত করেন। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে বৃটিশ কমান্ডোদের সঙ্গে তালেবানদের সংঘর্ষ।

২৫ সেপ্টেম্বর ঃ তালেবানদের সঙ্গে সউদী আরবের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন। ৪৮ ঘন্টার

www.pathagar.com

মধ্যে রিয়াদ থেকে তালেবান কূটনীতিকদের দেশে ফেরার নির্দেশ।

২৬ সেপ্টেম্বর ঃ কাবুলে পরিত্যক্ত মার্কিন দূতাবাসে অগ্নিসংযোগ। লাখো লাখো মানুষের বিক্ষোভ।

২৭ সেপ্টেম্বর ঃ মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ নেতা রেভারেন্ড জেসি জ্যাকসনকে মধ্যস্থতার জন্য পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ। তালেবান সরকার তাকে এ আমন্ত্রণ জানায়।

২৮ সেপ্টেম্বর ঃ ওসামা বিন লাদেনের কাছে স্বেচ্ছায় আফগানিস্তান ত্যাগের ফতোয়া হস্তান্তর। কান্দাহারে মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের সঙ্গে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ।

২৯ সেপ্টেম্বর ঃ নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে এক সুধী সমাবেশে কন্সাল জেনারেল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে নিহত ২ বাংলাদেশীর তালিকা প্রকাশ করেন। ক্যাম্প ডেভিডে নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠকে আফগানিস্তানে হামলার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট বুশের আভাস দান।

৩০ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরাঞ্চলীয় জোটের প্রতি তালেবান শীর্ষনেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের হুঁশিয়ারী। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর বলেন, উত্তরাঞ্চলীয় তালেবান শাসনের পতন ঘটালে যুদ্ধ বেধে যাবে।

০১ অক্টোবর ঃ পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ বলেন, তালেবানদের দিন শেষ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তালেবানদের সংঘাত অনিবার্য। তিনি বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে একথা বলেন।

০১ অক্টোবর ঃ তালেবানরা ঘোষণা করে যে, ওসামা বিন লাদেন তাদের হেফাজতে রয়েছে। তবে তাকে তারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করবে না। পাকিস্তানে নিযুক্ত তালেবান রাষ্ট্রদূত আবদুস সালাম জায়িফ ইসলামাবাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন।

০২ অক্টোবর ঃ বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তালেবান রাষ্ট্রদূত আবদুস সালাম জায়িফ বলেছেন, অকাট্য প্রমাণ ছাড়া তারা ওসামা বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করবেন না। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেন। তবে প্রেসিডেন্ট বুশ এ প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তিনি বলেন, তালেবানদের অবশ্যই আল কায়েদার সকল শিবির ধ্বংস করে দিতে হবে।

০২ অক্টোবর ঃ মার্কিন সিনেটে ৩৪ হাজার ২৫ কোটি ডলারের প্রতিরক্ষা বাজেট পাস। বাজেটের ১১ শতাংশ ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কথিত সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের জন্য প্রতিরক্ষা বাজেটে এ ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়।

০৩ অক্টোবর ঃ উজবেকিস্তানে ১ হাজার মার্কিন কমান্ডো মোতায়েন।

০৪ অক্টোবর ঃ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের পাকিস্তান সফর। রাশিয়া সফর শেষে

www.pathagar.com

তিনি পাকিস্তানে আসেন। সফরকালে তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন।

মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড র‍্যামসফেল্ডের উজবেকিস্তান সফর। তিনি মিসর থেকে উজবেক রাজধানী তাসখন্দে এসে পৌঁছেন। আফগানিস্তানে হামলার পরিকল্পনা নিয়ে তিনি উজবেক প্রেসিডেন্ট ইসলাম করিমভের সঙ্গে বৈঠক করেন।

লাদেনের বিচারে তালেবানদের প্রস্তাব। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল-খালিজ পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানে নিযুক্ত তালেবান রাষ্ট্রদূত আবদুস সালাম জায়িফ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র অকাট্য প্রমাণ দিলে আমরা লাদেনের বিচার করতে প্রস্তুত আছি।

০৫ অক্টোবর ঃ কাবুলের আকাশে মার্কিন গোয়েন্দা বিমানে তালেবানদের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ। ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মার্কিন প্রিডেটার গোয়েন্দা বিমানটি ধ্বংস হয়।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের ভারত সফর। সফরকালে ব্লেয়ার ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে দু'ঘন্টার এক বৈঠকে মিলিত হন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোশাররফের সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে অনির্দিষ্টকালের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলায় সমর্থন দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জেনারেল মোশাররফ বিপাকে পড়েন এবং সংকট উত্তরণে তিনি তার মেয়াদ বৃদ্ধি করেন।

০৭ অক্টোবর ঃ আফগানিস্তানে রাতের অন্ধকারে মার্কিন বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু।

কুয়েতভিত্তিক আল জাজিরা টেলিভিশনে প্রচারিত এক বিবৃতিতে ওসামা বিন লাদেন বলেন, আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা ইসলামের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ।

০৮ অক্টোবর ঃ আফগানিস্তানের ৩১টি লক্ষ্যবস্তুতে মার্কিন বোমাবর্ষণ। কাবুল, কান্দাহার ও জালালাবাদে তালেবান সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস। ৪টি মার্কিন বিমান ভূপাতিত।

০৯ অক্টোবর ঃ তালেবান শীর্ষনেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের বাসভবনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা। এতে তার বাসভবন আংশিক বিধ্বস্ত হয় এবং তার শিশু পুত্র নিহত হয়। পেন্টাগনের স্বীকারোক্তি ঃ বোমা মেরে লাদেনকে কাবু করা যাবে না। পেন্টাগনে এক প্রেস ব্রিফিং-এ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড র‍্যামসফেল্ড একথা বলেন।

নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান অনুমোদন।

১০ অক্টোবর ঃ কাতারের রাজধানী দোহায় ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের জরুরী বৈঠকে

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রকে আফগানিস্তানের বাইরে হামলা না করার জন্য হুঁশিয়ারি। কান্দাহারে বিরামহীন মার্কিন বোমাবর্ষণ।

১০ অক্টোবর ঃ মুসলমানদের প্রতি আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান। কাতারের আল-জাজিরা টেলিভিশনে প্রচারিত আল-কায়েদার মুখপাত্র সোলাইমান আল-গাইথ এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানান।

১১ অক্টোবর ঃ মুসলমানদের প্রতি মার্কিন হামলার প্রতিরোধে আফগানিস্তানকে সহায়তা করার আহ্বান। বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকায় রেকর্ডকৃত এক বিবৃতিতে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর এ আহ্বান জানান।

১১ অক্টোবর ঃ পাকিস্তানের জেকোবাবাদ ও পাসনি বিমান ঘাঁটিতে ১৫টি মার্কিন বিমান ও স্পেশাল ফোর্সের অবতরণ। তালেবান লক্ষ্যবস্তুতে বাংকার ব্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ।

১২ অক্টোবর ঃ ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তরে তালেবানদের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় দফা প্রস্তাব। জাতির উদ্দেশে এক সাপ্তাহিক ভাষণে প্রেসিডেন্ট বুশ এ প্রস্তাব দেন।

১৩ অক্টোবর ঃ যুক্তরাষ্ট্রে সন্দেহভাজন জীবাণু অস্ত্র। ফ্লোরিডার একজন ফটোগ্রাফার একটি চিঠি খুলতে গিয়ে অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হয় এবং পরে মারা যান। এরপর আরও দু'জন আক্রান্ত হয়।

১৪ অক্টোবর ঃ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে আল-কায়েদার প্রতিশোধমূলক হামলার হুমকি। কাতারভিত্তিক আল-জাজিরা টেলিভিশনে এক বিবৃতিতে আল-কায়েদার মুখপাত্র সোলাইমান আল-গাইথ এ হুমকি দেন। তিনি আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা বন্ধ করতে বলেন এবং হুমকি দেন যে, মার্কিন হামলা বন্ধ না হলে ওয়াশিংটন ও লন্ডনে আবারও আত্মঘাতী বিমান হামলা চালানো হবে। তিনি মুসলমানদের মার্কিন ও বৃটিশ বিমানে ভ্রমণ না করতে এবং সুউচ্চ ভবনে না যেতে অনুরোধ করেন।

১৫ অক্টোবর ঃ কাবুলে ৬০টি মার্কিন বিমানের ৩ ঘন্টা একটানা বোমাবর্ষণ। ৫০টি জঙ্গী বিমানের সঙ্গে ১০টি দূরপাল্লার বি-১ ও বি-২ বোমারু বিমানও বোমাবর্ষণে অংশগ্রহণ করে।

১৬ অক্টোবর ঃ অত্যাধুনিক বোমারু বিমান এসি-১৩০-এর নেতৃত্বে শতাধিক জঙ্গী বিমানের কাবুল ও কান্দাহারে মোট ১৩০ দফা হামলা। পাকিস্তান ও ভারত সফরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল কলিন পাওয়েল।

১৭ অক্টোবর ঃ মাজার-ই-শরীফের উপকণ্ঠে তালেবানদের সঙ্গে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের প্রচণ্ড সংঘর্ষ। কাবুল, কান্দাহার ও মাজার-ই-শরীফে মার্কিন বোমাবর্ষণ। আফগানদের প্রতি জেহাদ চালিয়ে যাওয়ার জন্য মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের আহ্বান।

www.pathagar.com

১৮ অক্টোবর ঃ কাবুলে মার্কিন হামলায় ৪০ জন বেসামরিক লোক নিহত। আফগানিস্তানে মার্কিন কমান্ডো হামলার ইঙ্গিত। প্রেসিডেন্ট বুশ এপেক সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন ত্যাগের প্রাক্কালে এ ইঙ্গিত দেন।

১৯ অক্টোবর ঃ আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে মার্কিন কমান্ডো অবতরণ। পেন্টাগনের এক বিবৃতিতে স্বীকার করা হয় যে, আফগানিস্তানে মার্কিন কমান্ডোরা অবস্থান করছে এবং তারা গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করছে।

২০ অক্টোবর ঃ আফগানিস্তানে প্রথম মার্কিন কমান্ডো হামলা। তালেবানদের গুলীতে মার্কিন ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার ভূপাতিত। কমপক্ষে ৩০ জন কমান্ডো নিহত।

২১ অক্টোবর ঃ কাবুল ও কান্দাহারে অবিরাম মার্কিন বোমাবর্ষণ। আফগানিস্তানে ফের কমান্ডো হামলার ঘোষণা। এপেক শীর্ষ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার। ওসামা বিন লাদেনকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে প্রেসিডেন্ট বুশের একটি দলিলে স্বাক্ষর। ওয়াশিংটন পোস্টে একথা প্রকাশিত হয়। আফগানিস্তানে প্রথম মার্কিন হেলিকপ্টার ব্যবহার।

২২ অক্টোবর ঃ আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার তৃতীয় সপ্তাহ শুরু। তালেবান অগ্রবর্তী অবস্থানে মার্কিন বোমাবর্ষণ। রোমে আফগানিস্তানে ক্ষমতাচ্যুত বাদশাহ জহির শাহ্'র সঙ্গে ইইউ প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ। তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবে'তে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বুরহানুদ্দিন রাব্বানীর সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠক। আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনীর জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ।

২৬ অক্টোবর '০১
মিডিয়া কর্মী

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে মার্কিনীদের সন্ত্রাসী হামলা পাকিস্তানের ভূমিকা

ডক্টর আবদুর রহমান সিদ্দিকী

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ওপর বিধ্বংসী হামলা চালানো হয়। এতে ধূলিসাৎ হয়ে যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র টুইন টাওয়ার। ধ্বংস হয়ে যায় দেশটির সামরিক হেডকোয়ার্টার পেন্টাগনের একাংশ। অল্পের জন্য নাকি রক্ষা পায় হোয়াইট হাউস। এসব হামলার ফলে প্রাণ হারিয়েছে হাজার হাজার মানুষ। পেন্টাগন হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের একমাত্র সুপার পাওয়ার যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র সামরিক আধিপত্যের উৎসস্থল। টুইন টাওয়ার মার্কিনীদের বিপুল বিত্ত-বৈভব, সম্পদ-সমৃদ্ধির উদ্ধত প্রতীক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী যে সামরিক ও অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল, এ হামলার মধ্য দিয়ে সে অহঙ্কার ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। প্রতিপন্ন হয়েছে, আটলান্টিকের ওপারে মহাশক্তিধর যুক্তরাষ্ট্রও প্রতিপক্ষের হামলার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে, তার নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অভেদ্য নয়। স্নায়ুযুদ্ধোত্তরকালে এক মেরুবিশিষ্ট বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে দৌরাত্ম্যে-দাপটে যুক্তরাষ্ট্র যে দানবীয় রূপ ধারণ করে, তাতে তারা নিজেদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বলে জ্ঞান করতে শুরু করেছিল। এই ভয়ঙ্কর হামলার মধ্য দিয়ে মার্কিনীদের সে অহঙ্কার শুধু ধূলিসাৎ হয়ে যায়নি, বহুল কথিত 'আমেরিকান ড্রিম'ও ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

এই ঘটনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও তার ঘনিষ্ঠ মিত্রবর্গ আরবীয় বংশোদ্ভূত ওসামা বিন লাদেনকে প্রধান সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আর তার আশ্রয়দাতা স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ আফগানিস্তানকে করেছে অভিযুক্ত। বিনা সাক্ষ্য-প্রমাণে, জবরদস্তিমূলক দায়ী করা হয়েছে ওসামা বিন লাদেনকে। অভিযোগের সপক্ষে তারা আজ পর্যন্ত কোন চূড়ান্ত ও বিশ্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ জনসমক্ষে হাজির করতে পারেনি। ওসামা বিন লাদেনকে গ্রেফতার করার অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্রবর্গ বিপুল যুদ্ধসরঞ্জাম ও সৈন্য দ্বারা কয়েক সপ্তাহ আগেই আফগানিস্তানকে কার্যত ঘিরে ফেলে। আফগানিস্তানে এখন চলছে ব্যাপক ইঙ্গ-মার্কিন হামলা। তাদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আয়োজন, হামলার ব্যাপকতা, কূটনৈতিক দৌড়ঝাঁপ ও নিরন্তর রটনা-প্রচারণা দেখে মনে হচ্ছে তারা একটা মহাযুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, এটা হচ্ছে

www.pathagar.com

একুশ শতকের প্রথম যুদ্ধ এবং এতে তারাই জয়ী হবে। পৃথিবীর দরিদ্রতম ও একটানা গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত একটি দেশকে স্রেফ অনুমিত কারণে ধ্বংস করার জন্য সুপার পাওয়ার যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসররা যে ন্যক্কারজনক হামলা শুরু করেছে, একদিকে তা যেমন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তেমনি অন্যদিকে মার্কিনীদের বীরত্ব নয় বরং কাপুরুষোচিত মননেরই প্রতিফলন ঘটিয়েছে। প্রেসিডেন্ট বুশ ঔদ্ধত্যের সাথে ঘোষণা করেছেন, যারা লাদেনকে আশ্রয় দেবে, সাহায্য করবে, যে কোন রূপ সুযোগ-সুবিধা (Comfort) প্রদান করবে কিংবা তার পক্ষ অবলম্বন করবে, তাকেই যুক্তরাষ্ট্র প্রতিপক্ষ হিসেবে সন্ত্রাসীদের সমতুল্য বিবেচনা করবে। শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। পাশ্চাত্য জানে না যে লাদেন একজন মামুলি মুসলমান নন। তিনি রাজা-বাদশাহদের মত জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তার সমস্ত ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধাকে উৎসর্গ করেছেন মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য। তার জান-মাল উৎসর্গ করেছেন আল্লাহর রাহে। স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন যাযাবর ফকিরী জীবন, মুজাহিদের জিন্দেগানি। নিজেকে উৎসর্গ করেছেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

ইতোমধ্যে তিনি হয়ে উঠেছেন মুসলিম বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্ব। দেশে দেশে স্বাধীনতাকামী মুজাহিদীনদের অনুকরণীয় আদর্শ, বিশ্বব্যাপী অত্যাচারিত মুসলিম প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণার নব উৎসস্থল। লাদেনকে দেখা হচ্ছে একুশ শতকের মুসলিম উম্মাহর মুক্তি/উত্থানের প্রতীক হিসেবে। তিনি সন্ত্রাসের সাথে জড়িত আছেন কি নেই সেসব প্রশ্নকে এড়িয়ে কোটি কোটি মুসলমান তাকে ভালবাসে, অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা করে, সমর্থন করে। তার অনুপ্রেরণায় বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহ সম্ভবত নতুন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাইছে। আর এজন্যই পাশ্চাত্যের যত ভয়, যত উৎকণ্ঠা। লাদেন যদি অব্যাহতভাবে কাজ করে যেতে পারেন, তবে অচিরেই ইসলামের উত্থান অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। পাপাচারে নিমজ্জিত পশ্চিমা সমাজ-সংস্কৃতি হবে হুমকির সম্মুখীন, সমাধি রচিত হবে পাশ্চাত্যের নষ্ট সভ্যতার। এজন্যই পশ্চিমের নেতারা মরিয়া হয়ে উঠেছে লাদেনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য। এ রকম একজন মহাপুরুষকে চিহ্নিত করা হয়েছে সন্ত্রাসী হিসেবে, তাকে জীবিত অথবা মৃত ধরার জন্য ঘোষণা করা হয়েছে মাথার দাম। তাকে ধরার জন্য আফগানিস্তানে সমাবেশ ঘটানো হয়েছে বিপুল সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্রের। ঐক্যবদ্ধ হয়েছে সমগ্র পাশ্চাত্য দুনিয়া।

এসব থেকে সহজেই বোঝা যায়, ব্যক্তি ওসামা বিন লাদেন কত বড় মাপের একজন মানুষ। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা লাদেনকে কব্জা করার জন্য আফগানিস্তানের ওপর প্রচণ্ড হামলা আরম্ভ করেছে। তারা অন্ধ প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে-কল্পিত শত্রু লাদেনকে তাদের চাই-ই। অথচ তাদের হাতে পর্যাপ্ত কোন তথ্য-প্রমাণ নেই, নেই কোন সমর্থনযোগ্য অকাট্য দলিলপত্র। তবু তারা লাদেনকে জীবিত বা মৃত পেতে চায়, আর তার আশ্রয়দাতা আফগান সরকারকেও তোপের মুখে উড়িয়ে দিতে চায়। সন্ত্রাসী কায়দায় গুঁড়িয়ে দিতে চায় এই ইসলামী ভূখণ্ডটিকে। এটা হচ্ছে বিবেকহীন অন্ধ দানবের মত আচরণ। অবশ্য বুশ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রকে আঘাত করে এক ঘুমন্ত দানবকে জাগিয়ে দেয়া হয়েছে। দানবই বৈকি! যার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, আছে শুধু আক্রোশ ও শক্তির বড়াই। প্রতীয়মান হচ্ছে, ইতোমধ্যে বুশ প্রশাসনকে প্রকাশ্য ইসলামবিদ্বেষ গ্রাস করে ফেলেছে। এখন্যই তার মুখে ক্রুসেডের কথা উচ্চারিত হয়েছে।

www.pathagar.com

তিনি এই যুদ্ধকে 'ক্রুসেড' হিশেবে আখ্যায়িত করেছেন। কি ভয়ঙ্কর মধ্যযুগীয় মানসিকতা তার! পশ্চিমের দেশগুলো বুশের আহ্বানে যেভাবে সাড়া দিয়েছে, তাতে তাদেরও সেই মধ্যযুগীয় ক্রুসেডারদের মন-মানসিকতাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হাজার বছর পরে তারা আরেকবার ইসলামকে ঘিরে ফেলতে চাইছে। তাই ব্যক্তি লাদেনকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার চেষ্টা একটা ছল মাত্র, তাদের আসল টার্গেট হচ্ছে ইসলাম। মুসলমানদের নিঃস্ব ও নির্বীর্য করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। তাই আফগান মুল্লুকের মাটিকে তামা করে দিতেও তাদের দ্বিধা-সঙ্কোচ নেই। এ আচরণ কোন সভ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে না। কাউকে জীবিত বা মৃত ধরার উদ্ধত ঘোষণা কোন রাষ্ট্রনায়কোচিত ব্যক্তির মুখে উচ্চারিত হতে পারে না। যে সরকার মাত্র একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আশ্রয়দানের অভিযোগে অপর একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর সামরিক হামলা চালানোর কদর্য নীতি গ্রহণ করতে পারে, যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, যারা একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকার বদলিয়ে নিজের পছন্দমত পুতুল সরকার বসাতে তৎপর, তাদের অভিধানে গণতন্ত্র শব্দটি আছে বলে মনে হয় না। আর যা-ই হোক, এদের সভ্যতার বড়াই করা সাজে না। এরা আদি যুদ্ধবাজদের আধুনিক সংস্করণ মাত্র। সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য কোন বাস্তব প্রমাণ ছাড়াই প্রতিশোধ নেয়া হচ্ছে তালেবানদের বিরুদ্ধে। এ রকম সামরিক অ্যাকশন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বৈ কিছু নয়। এই হামলা স্পষ্ট এক ধরনের বর্ণবাদী আচরণ তথা ঘোরতর ইসলামবিদ্বেষের অভিব্যক্তি। কোন সভ্য ন্যায়বোধসম্পন্ন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র এহেন অন্যায় আচরণ করতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে এই অন্যায় একতরফা যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ায় রাজনৈতিক-কূটনৈতিক সমর্থন পেতে চাইছে মুসলিম দুনিয়ার কাছে। প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায় প্রধানত কৌশলগত কারণে। বিশেষভাবে আফগানিস্তানের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী পাকিস্তানের সমর্থন তারা প্রথম থেকেই চেয়েছে, নানা প্রলোভন প্রদান করে ও দূতিয়ালীর মাধ্যমে, এমনকি হুমকি-ধমকিও দিতে তারা কসুর করেনি। পাকিস্তানের সাথে আফগানিস্তানের রয়েছে দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত। দুদেশের বিপুলসংখ্যক জনগণের মধ্যে রয়েছে জাতি-গোষ্ঠীগত (এথনিক) অভিন্নতা, রয়েছে গভীর ধর্মীয় সাংস্কৃতিক মিল। তদুপরি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে রয়েছে বহু শতাব্দীব্যাপী একই ধরনের ঐতিহাসিক ও রণনীতিগত অবস্থান ও অভিজ্ঞতা। সুতরাং পাকিস্তানের জনগণ ও আফগান জনগণের মধ্যে যত না পার্থক্য ও দূরত্ব রয়েছে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি রয়েছে মিল ও নৈকট্য। এ রকম প্রেক্ষাপটে আফগান জনগণ একটি বহিঃশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হলে পাকিস্তানের জনগণের ওপর তার অপরিমেয় মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব পড়তে পারে। কোন এক পক্ষ আক্রান্ত হলে আপনা থেকেই দু'দেশের জনগণের মধ্যে অধিকতর সহমর্মিতা ও ঐক্যের মনোভাব গড়ে ওঠারই কথা। আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক ইঙ্গ-মার্কিন নৃশংস হামলার স্বতঃস্ফূর্ত ও তীব্র প্রতিক্রিয়া পাকিস্তানী জনগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আফগানিস্তানের তালেবান সরকার এবং আল কায়েদা সংগঠনের ওপর যখন পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ইহুদী-খ্রিষ্টীয় শক্তি মরণ আঘাত হেনে বসেছে, তখন পাকিস্তানের সামরিক সরকার হঠাৎ করে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছে। সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে তালেবান সরকারের ওপর থেকে এবং প্রকাশ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের সামরিক হামলায় যাবতীয়

www.pathagar.com

সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করছে। ব্যবহার করতে দিয়েছে স্থলভাগ, আকাশসীমা ও দু'টি বিমান ঘাঁটি। পাকিস্তানের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ শুধু বস্তুগত সাহায্য-সহযোগিতাই করছেন তা-ই নয়, পশ্চিমের ইহুদী-খ্রিস্টান চক্রের সাথে সুর মিলিয়ে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার ও ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করতেও দ্বিধা করছেন না। অন্যদিকে তিনি নিজ দেশের জনগণকে আফগান ইস্যুতে বিভাজিত করার অশুভ পন্থাও অবলম্বন করছেন। যেসব নাগরিক মার্কিনী হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে লিপ্ত রয়েছে, জেনারেল মোশাররফ তাদের চরমপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। দেশের প্রতিবাদী মানুষদের তিনি প্রকাশ্য রাজপথে গণ্ডায় গণ্ডায় হত্যা করছেন। সামরিক বাহিনীকে নামিয়ে দিয়েছেন আফগানিস্তানের সাথে একাত্মতা প্রকাশকারী প্রতিবাদী মানুষকে দমন করার জন্য। মসজিদেও মোতায়েন করা হয়েছে মিলিটারী। দিকে দিকে নির্যাতন করা হচ্ছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে। গৃহবন্দী ও গ্রেফতার হয়েছেন অনেক বিশিষ্ট আলেম-ওলামা।

বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান বিদ্যমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ভূমিকায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত। কেননা আফগান পরিস্থিতির বহু কিছু নির্ভর করছে পাকিস্তানের সামরিক ও কূটনৈতিক অবস্থান গ্রহণের ওপর। এমন কি পাকিস্তানী জনগণের ভবিষ্যৎ আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সামরিক অবস্থান ও নিরাপত্তা, সর্বোপরি কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভাগ্য অনেকাংশে এই যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাত্মক সামরিক অভিযানের পরিণতি কি হতে পারে তারও অনেকখানিই নির্ধারিত হবে পাকিস্তানের ভূমিকা দ্বারা। যুক্তরাষ্ট্র এ কথা ভাল করে জানে বলেই পাকিস্তান সরকারকে নিজেদের বলয়ে ধরে রাখার সব রকম প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আর জেনারেল মোশাররফ পয়লা আহ্বানে আফগানিস্তানের দিক থেকে অ্যাবাউট টার্ন করেছেন এবং সাগ্রহে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। ইতোমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পাকিস্তানের জনসাধারণ ও সরকার পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। জনগণ আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার তীব্র বিরোধিতা করছে। জনগণ বুলেট, টিয়ারগ্যাস, গ্রেফতারকে উপেক্ষা করে নেমে এসেছে রাজপথে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা ফেটে পড়ছে প্রচণ্ড বিক্ষোভে। আর সেই সাথে ওসামা বিন লাদেনের প্রতি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের আস্থা ও সহানুভূতি; সহমর্মিতা ও সমর্থন দৃঢ়তর হচ্ছে তালেবান সরকারের প্রতি। অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে ওসামা বিন লাদেন এখন অধিক জনপ্রিয়। তিনি পরিণত হয়েছেন মুসলিম বিশ্বের এক মহান হিরোতে। যারা কোন দিন তার নামও শোনেনি, তারাও হয়ে উঠেছে তার ভক্ত, সমর্থক। পাকিস্তানের আম জনতা মোল্লা ওমর ও মুজাহিদ লাদেনের পক্ষাবলম্বন করেছেন। আর সামরিক শাসক জেনারেল মোশাররফ এত সব জেনেশুনেও ভিন্ন পথ অবলম্বন করছেন, নিজ দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এমন কি বিশ্বের অনেক অমুসলিম দেশও আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন অন্যায় হামলায় তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছে। আর প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান হামলাকারীদের পক্ষাবলম্বন করেছে। এ আচরণ অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ও নিন্দনীয়।

জেনারেল মোশাররফ এ ঘটনার প্রারম্ভেই খানিকটা উপযাচক হয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যাপক সমর্থন-সহায়তা দানের কথা ঘোষণা করেন। প্রথমেই পাকিস্তানের আকাশসীমা

www.pathagar.com

মার্কিনীদের সুবিধার্থে অবাধে ব্যবহার করতে দেয়ার অঙ্গীকার প্রদান করেন। ইতোমধ্যেই পাকিস্তানের ভূভাগ, আকাশসীমাকে ব্যবহার করে মার্কিন বোমারু বিমানগুলো আফগানিস্তানে দিবারাত্রি হামলা চালাচ্ছে। পাকিস্তান সরকার মার্কিনীদের গোয়েন্দা/তথ্যগত সহায়তা প্রদান করছে। ফলে শত্রুপক্ষ অতি সহজে আফগানিস্তানে তাদের নিশানা নির্ধারিণ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ রক্ষার জন্য এতকাল আফগানিস্তান সরকার পাকিস্তানের যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সুবিধাসমূহ ব্যবহার করতে পেরেছে। এই মুহূর্তে মোশাররফ সরকার সেই সুবিধাসমূহ প্রত্যাহার করে নেয়ায় মোল্লা ওমরের সরকার দারুণ যোগাযোগ বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। জেনারেল মোশাররফ ইতিপূর্বে লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়ার জন্য দেন-দরবার করতে কাবুলে উচ্চশক্তিসম্পন্ন প্রতিনিধিদলও প্রেরণ করেছিলেন। অন্যদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন না করলেও কাবুল থেকে তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন পাকিস্তানের কূটনৈতিক মিশনের লোকজনদের। এভাবে কূটনৈতিভাবে বেকায়দায় ফেলেছেন তালেবান সরকারকে। অর্থাৎ জেনারেল মোশাররফের সরকার আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পক্ষে অনুষ্ঠ ও সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করেছে। কিন্তু পাকিস্তানের ব্যাপক জনগণ তালেবান সরকার ও ওসামা বিন লাদেনের পক্ষাবলম্বন করে ইতোমধ্যে মার্কিনীদের বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা প্রদান করেছেন।

জেনারেল মোশাররফ তার দেশবাসীর নাড়ীর স্পন্দন যেমন বুঝতে ভুল করেছেন, তেমনি তিনি ভুলে গেছেন ইতিহাস। বিগত অর্ধশতাব্দীকালে পাকিস্তানের সকল সামরিক শাসকই বরাবর একই ধরনের ভুল করেছেন। তারা নিজেদের অবৈধ নড়বড়ে ক্ষমতার মসনদকে টিকিয়ে রাখার জন্য জনগণের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করেছেন, আর বারবারই তারা মারাত্মক বিপর্যয়ের আবর্তে জাতিকে ঠেলে দিয়েছেন। জনবিচ্ছিন্ন এসব ইচ্ছারাজা সামরিক শাসকদের কারণে জনগণকে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে। এসব কারণে ইতিপূর্বে পাকিস্তান একদফা ভেঙে গেছে। জেনারেল মোশাররফের ক্ষমতালিপ্সা ও অদূরদর্শিতার কারণে আরেকবার বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে দেশটি। দেশে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। পেশোয়ারের এক বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশে বিক্ষুব্ধ নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেছেন যে, তারা পাকিস্তানও ধ্বংস করবে, যুক্তরাষ্ট্রকেও ধ্বংস করবে। সম্ভবত নির্বাচিত একটি সরকার থাকলে এ অবস্থার উদ্ভব হতে পারত না। ভাল হোক বা মন্দ হোক, একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে জেনারেল মোশাররফ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছেন। সাংবিধানিকভাবে নিযুক্ত প্রেসিডেন্ট রফিক তারারকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বসেছেন প্রেসিডেন্টের আসনে। জেনারেল মোশাররফ বেশ ভালই বোঝেন, তার কোন জনভিত্তি নেই। দিকে দিকে মানুষ বলাবলি করছে যে, জেনারেল মোশাররফ নিজেই এক ধরনের সন্ত্রাসী। তিনি গণতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকে রাষ্ট্রক্ষতা হাইজ্যাক করে নিয়েছেন, আবার সন্ত্রাসী কায়দায় দখল করছেন প্রেসিডেন্টের আসনটি। কাজেই তিনি বিশ্ব সন্ত্রাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মুরব্বী হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং তাদের সমর্থন দেবেন, এতে বিস্ময়ের কি ? ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তার দরকার পশ্চিমা মুরব্বীদের আশীর্বাদ। আর সে আশীর্বাদকে সুনিশ্চিত করার জন্যই তিনি দেশের জনগণের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হননি। তিনি উদ্বাহু সমর্থন দিয়েছেন মতলববাজ মার্কিনীদের।

www.pathagar.com

যদি এ কথা বলা হয় যে, জেনারেল মোশাররফের মার্কিনীর প্রতি সমর্থনদান একটি সূক্ষ্ম কূটনৈতিক চাল মাত্র, তা বিশ্বাস করা সত্যি খুব কঠিন। দৃশ্যত ঐ রকম মনে হতে পারে যে, ইঙ্গ-মার্কিন এই যুদ্ধ পরিকল্পনায় সমর্থন দেয়া ছাড়া মোশাররফের আর কি পথই বা খোলা ছিল? যুক্তি দেয়া যেতে পারে যে মোশাররফ এই যুদ্ধে সমর্থন দিয়ে বহুবিধ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-কূটনৈতিক ফায়দা পাকিস্তানের জন্য হাসিল করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন পাকিস্তানকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার পুরনো ফন্দি-ফিকিরকে তড়িঘড়ি যুদ্ধের সমর্থনদানের মধ্য দিয়ে বানচাল করা সম্ভব হয়েছে। ভারত কূটনৈতিকভাবে এতে মার খেয়েছে। আর বেশী বিলম্ব হলে যুক্তরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়িয়ে ভারত পাকিস্তানকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে শনাক্ত করার কাজে উঠেপড়ে লাগত। আর এই মওকায় পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনার ওপর বিধ্বংসী হামলার আশঙ্কা আপাত এড়ানো গেছে। সর্বোপরি পাকিস্তানের এই চূড়ান্ত অর্থনৈতিক দুর্দশার দিনে যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ প্রত্যাহৃত হওয়ায় পাকিস্তানের অর্থনীতিতে একটি স্বস্তিকর অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে সবই হয়তো সত্য। পাকিস্তান একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। তার সরকার কি পলিসি গ্রহণ করবে কি করবে না, কি সিদ্ধান্ত নেবে তা তাদের একান্ত নিজস্ব এখতিয়ার। বাইরের কোন ব্যক্তি বা মহলের কিছু বলার অবকাশ নেই। তারপরও একটা কিন্তু থেকে যায়। এসব আপাতঃ অর্জন কোন চূড়ান্ত অর্জন নয়। দেশের আম জনতাকে বিগড়ে দিয়ে প্রতিবেশীর প্রতি বিশ্বসঘাতকতা করে কোন চূড়ান্ত অর্জন সম্ভব হবে না। ফলে তালেবানবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে পাকিস্তান মূলত কিছুই অর্জন করেনি, বরং নিজেদের সুদূরপ্রসারীভাবে বিপন্ন করে তুলেছে। ইতোমধ্যে মার্কিনীদের জন্য জেনারেল মোশাররফ যা কিছু করেছেন তাতে স্বতঃপ্রমাণিত হয় যে, এসবই তিনি করেছেন সচেতনভাবে, খোলামেলাভাবে নিজের আখের গোছানোর জন্যই। জেনারেল মোশাররফ বারবার জাতীয় স্বার্থের কথা বলে তার সিদ্ধান্তসমূহের বৈধতাদানের চেষ্টা করেছেন। বস্তুত তিনি ব্যক্তিস্বার্থের দ্বারা তাড়িত হয়েই পশ্চিমাদের সমর্থন করছেন, তা-ই ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জেনারেল মোশাররফ পাকিস্তানে একজন মোহাজির। আর পাঞ্জাবী প্রাধান্যযুক্ত পাক সেনাবাহিনীতে তার ভিত্ তেমন মজবুত না হওয়ারই কথা। সর্বোপরি তার কার্যকালের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। কাজেই ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জেনারেল মোশাররফ দেশের ভেতরে-বাইরে উচিত-অনুচিত যে কোন কাজ করবেন বা সুবিধাজনক মিত্র খুঁজবেন এটাই স্বাভাবিক।

জেনারেল মোশাররফ আফগানিস্তানে এই হামলায় মার্কিনীদে। পাকিস্তানের আসমান-জমিন ছেড়ে দিয়ে শিয়ালকে মুরগীর খোঁয়াড় দেখিয়েছেন। কিন্তু তিনি ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা নেননি যে, মার্কিনীরা আসলে পাকিস্তানের প্রকৃত বন্ধু নয়, বন্ধুবেশী শত্রু। ১৯৪৮ সালে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাক-ভারতের প্রথম যুদ্ধে নবীন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের পাশে মার্কিনীরা দাঁড়ায়নি। ফলে ৫৩ বছর পরও জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও কাশ্মীর ইস্যুর কোন শান্তিপূর্ণ সুরাহা হয়নি। ১৯৬৫-এর যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র তার সরবরাহকৃত অস্ত্রপাতি ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহারে বাধা প্রদান করেছিল। ফলে ১৭ দিনের যুদ্ধে পাকিস্তান যুদ্ধোপকরণগত ঘোরতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, এমনকি অর্থবহ কোন কূটনৈতিক সমর্থনও তখন প্রদান করেনি। স্নায়ুযুদ্ধকালীন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ষোলআনাই ব্যবহার করেছে। কিন্তু ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে বিশেষত পূর্ব পাকিস্তান ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র একরকম প্রতারণাপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে

www.pathagar.com

পাকিস্তান পরাভূত ও দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। নব্বইয়ের দশকের প্রারম্ভে চুক্তি মোতাবেক পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুত এফ-১৬ বোমারু বিমানবহর সরবরাহ করেনি। উপরন্তু নব্বইয়ের দশকে কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তৎপর হয়ে উঠলে ভারতের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসবে চিহ্নিত করার প্রয়াস চালিয়েছে। ১৯৯৮-এর পাকিস্তান পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির ওপর দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। ফলে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব বেহাল হয়ে পড়ে। সেই সাথে দেশটিকে আরেক দফা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্র। সর্বশেষ গত বছর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন দক্ষিণ এশিয়া সফরে এসেছিলেন। তিনি ৩-৪ দিনব্যাপী হাসিখুশি ডগমগ মুডে হিন্দু ভারত সফর করেন। আর যাবেন কি যাবেন না এমনতর সিদ্ধান্তহীনতার মধ্য দিয়ে অবশেষে মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য অত্যন্ত খটমটে মেজাজে মুসলিম পাকিস্তান সফর করেন। এই ঘটনা থেকেই জেনারেল মোশাররফের যথোচিত বোধোদয় হওয়া উচিত ছিল। এতকিছুর পরও সেই যুক্তরাষ্ট্রকেই জেনারেল মোশাররফ তার সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির বশে অকুণ্ঠ সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মার্কিনীদের মিথ্যা আশ্বাসের কুহকে পড়ে কিংবা কোন ক্ষণিক লাভের আশায় মুসলিম প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধে পাশ্চাত্যকে ঢালাও সমর্থন দান করা নেহায়েতই নাদানি। এর ফলে বিশ্বের মুসলমানরা যেমন হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছে, তেমনি পরীক্ষিত পুরনো বন্ধু চীনও হয়েছে নাখোশ।

পাকিস্তান বর্তমানে হয়ে পড়ছে বন্ধুহীন ও বিচ্ছিন্ন। সর্বোপরি, এহেন আচরণে বিপন্ন হয়ে পড়েছে বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ। মাত্র কদিন আগেও যে মার্কিনীরা পাকিস্তানের গলায় সন্ত্রাসীর তকমা এঁটে দিতে তৎপর ছিল, তারাই আবার তথাকথিত সন্ত্রাসী লাদেন ও তার আশ্রয়দাতা আফগানিস্তানকে শায়েস্তা করতে পাকিস্তানকে কাজে লাগাতে চায়। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার এই কৌশলের ফাঁদে পা দিয়েছেন জেনারেল মোশাররফ। বুশদের ক্রুসেড ঘোষণার প্রেক্ষিতে বিশ্ব রাজনীতিতে যে নতুন বিন্যাস ঘটেছে, তা উপলব্ধি করতে সম্ভবত জেনারেল মোশাররফ ব্যর্থ হয়েছেন। আজকে বিশ্ব সোজাসুজি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে ইসলাম, অন্যদিকে এন্টি ইসলাম। অন্যভাবে বলা যায়, একদিকে সেই চির পুরাতন ক্রুসেডাররা, অন্যদিকে আত্মরক্ষাকারী বীর মুজাহিদরা। আর জেনারেল মোশাররফ অবস্থান নিয়েছেন ইসলামের চিরকালীন শত্রু ক্রুসেডারদের শিবিরে। সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিম নিধনে যারা উন্মত্ত, তাদের দোসর সেজেছেন। জেনারেল মোশাররফের এই অবস্থানে পাকিস্তানের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত নানাভাবে ফায়দা ওঠানোর চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কাশ্মীর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি। আর যুক্তরাষ্ট্রও তাতে স্পষ্ট সমর্থন দিয়েছে। তারা শুধু আফগানিস্তান নয়, অন্যান্য দেশেও সন্ত্রাস দমনে হামলা চালাবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। আর পাকিস্তানকে ভারত বরাবরের মত চিহ্নিত করতে চায় সন্ত্রাসবাদের দোসর হিসেবে। ওদিকে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার কাশ্মীরের সন্ত্রাসীদের গুঁড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। অথচ জেনারেল মোশাররফ বলেছেন, কাশ্মীর ইস্যুকে সন্ত্রাস দমনের সাথে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। কাশ্মীরীরা স্বাধীনতা সংগ্রামী। বাজপেয়ী বলেছেন, সকল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে উভয় দেশকে একযোগে কাজ করতে হবে। সবকিছু মিলিয়ে এ এক জটিল পাকচক্র।

www.pathagar.com

বেকায়দায় ঠেকে পশ্চিমারা আপাত তার সাথে দহরম-মহরম করলেও পাকিস্তানকে একটি ইসলামী শক্তির আধার হিসেবে চিহ্নিত করতে তারা কখনও ভুল করবে না। শক্তির ভারসাম্যের প্রশ্নে তারা ভারতের দিকেই ঝুঁকে ছিল এবং ঝুঁকে থাকবেই। তাদের শ্যেনদৃষ্টি রয়েছে পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনার দিকে। পারমাণবিক শক্তিধর এ মুসলিম দেশটিকে তারা শেষ অবধি বিশ্বাস করতে চাইবে না। তাই পাকিস্তানকে সন্ত্রাসীদের সহগামী হিসেবে চিহ্নিত করেই রাখবে। তারা কাশ্মীর 'জঙ্গীবাদীদের' পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানকে একযোগে আজ না হয় কাল 'সাইজ' করতে চাইবে। সম্ভাব্য প্রথম সুযোগেই তারা পাকিস্তানের ওপর আঘাত হানতে কখনই ভুল করবে না। সম্প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেনারেল মোশাররফকে পাকিস্তানে পারমাণবিক স্থাপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন। সেটাই শেষ কথা নয়। জেনারেল মোশাররফের ভুলে গেলে চলবে না যে, এরাই পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর পর পাকিস্তানের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছিল। গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসন কায়েম করার অপরাধে কমনওয়েলথ থেকে পাকিস্তানের সদস্যপদ স্থগিত রাখা হয়েছিল। এসব জেনারেল মোশাররফ নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। অনেক আগেই সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, ইরান, লিবিয়ার সাথে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে একই ব্রাকেটবন্দী করে রাখা হয়েছে। পাশ্চাত্যকে এত সহযোগিতা করার পরও কি পাকিস্তান কখনও ব্রাকেট থেকে বের হয়ে আসতে পারবে ? তা কখনও সম্ভব বলে মনে হয় না। এসব মুসলিম দেশকে পশ্চিমারা তাদের সর্বাত্মক হামলার সিরিয়ালে রেখেছে। একে একে সবাইকে এরা ঘিরে ফেলবে। ওরা ফিলিস্তিনকে দখল করেছে, লেবাননকে তছনছ করেছে। ইরাককে করছে পর্যুদস্ত ও একঘরে ইরানকে করেছে ক্ষতিগ্রস্ত। আর আফগানিস্তানে চলছে নৃশংস হামলা। এর পরের পালা কার তা-ই শুধু দেখার বিষয়। তাই পাকিস্তান সরকার সন্ত্রাস দমনের নামে ওসামা বিন লাদেন অথবা আফগান মুসলমানদের ওপর আঘাত হানার সুযোগ করে দিয়ে খোদ পাকিস্তানকেই বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এর ফলে দেশটি টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। পাকিস্তানের সুপরিচিত সাবেক সেনাকর্তা জেনারেল গুলও সে রকম আশঙ্কাই ব্যক্ত করেছেন সম্প্রতি। সুতরাং জেনারেল মোশাররফ তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে ও মার্কিনীদের বিপক্ষে না গিয়ে যদি কুশলী অবস্থান গ্রহণ করত, তাহলে একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে, সৎ প্রতিবেশী হিসেবে মুখ রক্ষা করতে পারত। আফগানিস্তানের সাথে কূটনৈতিক ধারাবাহিকতাও রক্ষা করা সম্ভব হত। আর সে রকম পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে হামলা চালানের দুঃসাহস দেখাত কিনা সন্দেহ।

জেনারেল মোশাররফ বিগত কয়েকদিন 'পাকিস্তান হ্যায় মেরা জান, সব্‌সে পেহ্‌লে পাকিস্তান'-এই শ্লোগানের আড়ালে পাকিস্তানী জনগণকে আফগানিস্তানে পশ্চিমা হামলার পক্ষে সমবেত করার চেষ্টা করেছেন। অথবা এভাবে পাকিস্তানীদের নির্বিকার থাকার উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। আফগান জনগণের সাথে পাকিস্তানের জনগণের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্ককে পাশ কাটিয়ে এককভাবে পাকিস্তানকে দাঁড় করানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সীমান্তের ওপারে আফগানিস্তানের মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যাক, আমরা চোখ বুজে থাকব আর মার্কিনীদের কৃপায় নিজেদের সাময়িক আর্থিক ফায়দা হাসিল করে নেব-এ রকম একটি সংকীর্ণ জাতিগোষ্ঠীকেন্দ্রিক ধারণা সাধারণ্যে প্রচারের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু একটি আত্মকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন জাতিরাষ্ট্র হিসেবে একটি

www.pathagar.com

বৈরী প্রতিবেশীর পাশে পাকিস্তান টিকে থাকতে পারবে কিনা, আর থাকলেও কতটা মর্যাদার সাথে থাকবে তাও ভেবে দেখার মত বিষয়। বরং জেনারেল মোশাররফের শিক্ষা নেয়া উচিত ছিল মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের কর্মধারা থেকে। যেমন তালেবানদের সাথে ইরানের রয়েছে ভীষণ মনোমালিন্য। তা সত্ত্বেও ইরান চলমান মার্কিন হামলার প্রেক্ষিতে আফগানিস্তানের পক্ষে অত্যন্ত প্রশংসনীয় অবস্থান গ্রহণ করেছে। আফগানদের পুরনো বন্ধু পাকিস্তানেরও তদ্রূপ ভূমিকা গ্রহণ করাই ছিল যথার্থ। কিন্তু তা না করে জেনারেল মোশাররফ যে পথে অগ্রসর হয়েছেন তা শুধু পাকিস্তানের জনগণ নয়, মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সাধারণ মানুষরাও স্পষ্টত প্রত্যাখ্যান করেছে। পাকিস্তানের সাহসী জনগণ দাঁড়াতে চায়। কিন্তু জেনারেল মোশাররফ সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। দেশে সেনাবাহিনী নামিয়ে জনগণকে অবদমনের চেষ্টা করছেন। এভাবে আফগান মুসলমানদের ওপর অবাধ হত্যাযজ্ঞ চালানোর জন্য তিনি সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন মার্কিনীদের। উপমহাদেশের মুসলমানরা এই নৃশংস ও ঘৃণ্য রাজনীতির জন্য তাকে ধিক্কার জানাচ্ছেন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের যে অন্তর্নিহিত ইসলামী স্পিরিট, তা জেনারেল মোশাররফের আচরণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় না। তার পূর্বসূরি সামরিক শাসকদের যত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকুক না কেন, তারা ছিলেন মূলত ইসলামী চেতনার ধারক। ইসলামী স্পিরিটের সাথে আইয়ুব, ইয়াহিয়া, জিয়াউল হক কখনও কম্প্রোমাইজ করেননি। কিন্তু জেনারেল মোশাররফ পাকিস্তানের প্রাণশক্তিস্বরূপ ইসলামী ভাবাদর্শ থেকে বহু দূরে এবং প্রকৃত পাকিস্তানী লোক-মানসের প্রতিনিধিত্ব তিনি করেন বলে প্রতীয়মান হয় না। একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সরকার/রাষ্ট্রপ্রধানের আচরণে, কর্মকাণ্ডে ইসলামী চেতনার প্রতি আনুগত্যহীনতার তার নিজ দেশের এবং বহির্বিশ্বের মুসলমানদের যুগপৎ ব্যথিত ও বিস্মিত করেছে।

ঘটনার বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে জেনারেল মোশাররফ যে অবস্থান গ্রহণ করেছেন তা কোন আকস্মিক বা পরিস্থিতিভিত্তিক জরুরী সিদ্ধান্ত নয়। বরং এর মধ্য দিয়ে তার পরিকল্পিত রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। জেনারেল মোশাররফের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়েছে মাস দুয়েক আগে জারি করা এক বিশেষ ফরমানের মধ্য দিয়ে। এতে একাধারে তিনি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের নামে দেশব্যাপী এক অভিযান শুরু করেন। মুখে মুখে যা-ই বলুন, এর মধ্য দিয়ে বস্তুত তিনি কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বেকায়দায় ফেলতে চেয়েছেন। এর পাশাপাশি পাকিস্তানের হাজার হাজার সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, দোকানদার, কাশ্মীরী মুজাহেদীনদের যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছিল এ সহায়তাদানকেও তিনি বেআইনী ঘোষণা করেছেন। দেশব্যাপী দানবাক্স ও সাইনবোর্ডসমূহ সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়। এভাবে তিনি সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কৌশলে রুখতে চেয়েছেন। সম্প্রতি তিনি 'হিজবুল মুজাহিদীন' নামের একটি সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করেছেন। হয়তো 'জয়েস-এ মুহাম্মদ' ও অন্যান্য সংগঠনের ভাগ্যেরও একই পরিণতি অপেক্ষা করছে। এসব কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে জেনারেল মোশররফের রাজনৈতিক মানসলোকের একটা স্পষ্ট পরিচয় যাওয়া যায়। আর কাদের খুশি করার জন্য তিনি এসব করছেন, তার অনুমান করাও খুব একটা কঠিন নয়। তিনি যখন আগ

www.pathagar.com

বাড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে আফগানিস্তানে হামলার সমর্থন দান করেন, ওসামা বিন লাদেনকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য অতিশয় উৎসাহে দূতিয়ালী করেন, তখন তার আসল মতলব ও চরিত্র প্রকটিত হয়ে যায় বৈকি! সুতরাং এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জেনারেল মোশাররফ পাশ্চাত্যের কৃপা যাঞ্চা করে এবং কোন একটি বিশেষ প্রতিবেশীর মনোরঞ্জন করে ক্ষমতায় টিকে থাকার পলিসি গ্রহণ করেছেন। তার লাদেন-আফগান নীতির ক্ষেত্রেও সেই ধারণারই খোলামেলা প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তিনি সরাসরি এখন তালেবানদের সন্ত্রাসী হিসেবে অভিহিত করছেন। কিন্তু বিশ্বের সাধারণ মুসলমানরা জানে যে তালেবানরা শরিয়তের বিধানের একনিষ্ঠ অনুসারী এবং তারা একটি ইসলামী হুকুমত কায়েম করেছেন।

অবশ্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছে জেনারেল মোশাররফের আসল চেহারা অনেক আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে। ক্ষমতা দখলের প্রথম দিকেই তিনি মিডিয়ায় যেভাবে আবির্ভূত হন, তার মধ্য দিয়ে তিনি তার প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরার ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন। সে সময় প্রকাশিত একটি ছবিতে দেখা যায় জেনারেল মোশাররফ, তার হিজাববিহীন আধুনিকা স্ত্রী ও একটি কুকুরকে পাশে নিয়ে সাংবাদিকদের ক্যামেরায় পোজ দিয়েছেন। যতদূর মনে পড়ে তার মাথার উপরে শোভা পাচ্ছিল কামাল আতাতুর্কের একটি ছবি। একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাপ্রধান ও প্রধান নির্বাহীর এই হচ্ছে হাল হকিকত। যারা ইতিহাস সচেতন এবং সমকালীন বিশ্ব রাজনীতির ধারা-উপধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তারাই ছবিটির মূল মর্মবাণী ভালো করেই বোঝেন। এর মধ্যে দিয়ে জেনারেল মোশাররফ পাশ্চাত্যের প্রতি কি ম্যাসেজ দিতে চেয়েছেন তাও স্পষ্ট এবং পাশ্চাত্যও বোধকরি তা যথার্থই অনুধাবন করেছিল। আর সে কারণেই জেনারেল মোশাররফের বর্তমান আফগান নীতি প্রায় দ্ব্যর্থহীনভাবেই পাশ্চাত্যের অনুরূপ এবং বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের পরিপন্থী।

যদি তালেবান সরকার উৎখাত হয়ে যায় পশ্চিমের মদদপুষ্ট ধর্ম নিরপেক্ষ মার্কা তাঁবেদার একটা সরকার পাকিস্তান সীমান্তের ওপারে ক্ষমতাসীন করানো হয় তা কি ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের জন্যে খুবই সুখকর হবে ? কৌশলগত দিক থেকেও কি পাকিস্তান একটি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে? যদি মার্কিনীরা কাবুল, কান্দাহার, জালালাবাদ প্রভৃতি স্থানে সামরিক ঘাঁটি গেড়ে বসে, তা কী এই অঞ্চলের মুসলমানের জন্য শান্তি ও স্বস্তির কারণ হবে ? সেন্ট্রাল এশিয়ার তেল, গ্যাসসমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোতে যদি পশ্চিমী পুঁজিপতিরা ব্যবসা ফেঁদে বসে তা কী খুবই চমৎকার বিষয় হবে ? আরব সাগরে বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইতোমধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন বিশাল নৌবহর অবস্থান নিয়ে দিন-রাত হামলা চালাচ্ছে আফগানিস্তানে। কবে তারা এই স্থান ত্যাগ করবে তা কেউ জানে না। এ অবস্থা কী পাকিস্তানের নৌ-বহর ও সার্বিক জাতীয় নিরাপত্তার জন্য খুব অনুকূল হবে ?

প্রতিদিন ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান হেলিকপ্টার গানশিপ টন টন বোমা ফেলছে আফগানিস্তানে। দেশটির লোকালয়, মাঠ-ময়দান, শস্যক্ষেত্র, ফলের বাগান, বড় বড় স্থাপনা জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার পাউন্ডের বিধ্বংসী বোমার আঘাতে ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে পাহাড় পর্বত ও উপত্যকা ভূমি। গৃহহীন হচ্ছে লাখ লাখ মানুষ, প্রাণ হারাচ্ছে শত শত নিরীহ নারী, পুরুষ, শিশু। ধ্বংস হচ্ছে মক্তব মাদরাসা মসজিদ। ঝাঁঝরা হচ্ছে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বুক মার্কিনীদের ঝাঁক ঝাঁক বুলেটে। এহেন

www.pathagar.com

ধ্বংসযজ্ঞের অংশীদার হয়ে পড়েছে পাকিস্তান, তার ক্ষমতালোভী সামরিক শাসকচক্র। পরন্তু প্রায় নিরস্ত্র এই জনগোষ্ঠীর উপর যুক্তরাষ্ট্র পরখ করছেন তাদের নতুন নতুন অস্ত্রের রেঞ্জ/কার্যকারিতা। হয়ত ব্যবহার করা হচ্ছে ডিপ্লিটেড ইউরোনিয়াম অস্ত্র। হাজার বছরের জন্য ছারখার হয়ে গেল আফগানিস্তানের জমিজমা, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে পরিবেশ। এসবের প্রভাব কী সীমান্তের এপারে পাকিস্তানে পড়বে না ?

এর পরেও কী নিজ দেশের ও বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানদের সেন্টিমেন্টের বিপরীতে জেনারেল মোশাররফ তালেবানদের বিরুদ্ধেই থাকবেন ? যারা ক্রুসেডের নামে হামলা চালায় সেসব ইহুদী নাসারাদের আগ্রাসনে আঞ্জাম দিয়েই যাবেন তিনি ? দোসর হয়ে থাকবেন হাজারো নিরীহ মুসলমানদের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের ? একটা স্বাধীন দেশের সার্বভৌম সরকারকে সন্ত্রাসী কায়দায় টপকানোর জঘন্য কর্মসূচীতে সমর্থন প্রদান করবেন ? এর কোনটার পরিণাম কি তার ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রিক কল্যাণ বয়ে আনবে বলে মনে হয় ? আফগান জনগণ এই দুর্জন দুর্মর দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, তবু তারা ইতিহাসে পরিগণিত হবে বীর হিসেবে। আর জেনারেল মোশাররফ ইতিহাসে চিত্রিত হবেন একজন ভাঁড় হিসেবে।

জেনারেল মোশাররফ দাবী করে আসছিলেন যে, আফগানিস্তানে এই ইঙ্গ-মার্কিন অপারেশন হবে খুবই সীমিত ও সুনির্দিষ্ট ধরনের এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অপারেশন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র জেনারেল মোশাররফের এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে, এই হামলা অব্যাহত থাকবে এবং তা দীর্ঘ মেয়াদী হবে। তাহলে পাকিস্তানের মাটিতে মার্কিন সৈন্যদের উপস্থিতিও কি দীর্ঘমেয়াদী হবে ? ওদিকে আজাদ কাশ্মীর অঞ্চলেও ভারত সামরিক হামলা চালানোর কথা ভাবছে। জেনারেল মোশাররফ একই সঙ্গে কাশ্মীরের মুজাহিদীনদের পক্ষ অবলম্বন করে এবং তালেবাদের সন্ত্রাসী হিসেবে অভিহিত করে বস্তুত দো-ধারী তলোয়ারের সামনে দাঁড়িয়েছেন। এখন জেনারেল মোশাররফ কী করবেন ? প্রতিবেশীর ঘরে লাগানো আগুন যে তার নিজের ঘরেও ছড়িয়ে পড়বে না তার কি কোন গ্যারান্টি আছে ? কাজেই কাশ্মীর কিংবা আফগানিস্তানের তথাকথিক সন্ত্রাসবাদ দমনের এই পশ্চিমী চক্রান্ত তার নিজের ও দেশের জন্য হতে পারে মর্মন্তুদ। মুসলমানদের চিরশত্রু ইহুদীদের পৃষ্ঠপোষক ও ক্ষমতাদর্পী যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি জেনারেল মোশাররফের এই তোষণনীতি পাকিস্তানী আওয়ামের জন্যও বয়ে আনতে পারে অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশা। নিজের দেশের প্রতিবাদী জনগণকে 'চরমপন্থী' বলে আখ্যায়িত করে তিনি কি শেষ রক্ষা করতে পারবেন ? তাই জেনারেল মোশাররফকেও পাকিস্তানের জনগণ 'বিশ্বাসঘাতক' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। সেখানে জনগণের মধ্যে জিহাদী জোশ দিনকে-দিন প্রবলতর হয়ে উঠছে, আর জেনারেল মোশাররফ হয়ে পড়ছেন জনবিচ্ছিন্ন। তার এখন তেমন সময় ও সুযোগ আছে কী না কে জানে, তবে আফগান পলিসি পুনর্বিবেচনা করে জনগণের কাতারে এসে দাঁড়ানোই হবে জেনারেল মোশাররফের জন্য সমীচীন। ব্যক্তি শাসক ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করতে থাকলে জনগণই এক সময় সঠিক ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। ❑

অক্টোবর '০১
লেখক ঃ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রে গোপন নিধনযজ্ঞ

মাইকেল প্যারেন্টি

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আমেরিকান লেখক মাইকেল প্যারেন্টি ১৯৯২ সালে ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। আমেরিকা ও বিদেশে তিনি বহু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। মার্কিন শাসক শ্রেণীর কপট নীতির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশের অপরাধে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকারের স্বঘোষিত নিশানবর্দার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে শিক্ষকতার সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। এখানে মাইকেল প্যারেন্টির বিখ্যাত গ্রন্থ 'আগলি ট্রুথ্‌স'-এর অংশবিশেষের তরজমা প্রকাশ করা গেল। - বি.স

শক্তিশালী অর্থনীতি ও সামরিক শক্তির উৎকর্ষ সাম্প্রতিক বিশ্বে যে দেশটিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে সেটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। গৌরব ও গর্বের বাতাসে সদম্ভে পতপত করে উড়ছে বহু তারকাখচিত মার্কিন পতাকা। তার ধমক, ঠকম ও তামকে বিশ্বের ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশগুলো কম্পমান ও দিশেহারা। কোন অপরাধে, কখন, কার ঘাড়ে মার্কিন খাঁড়া নেমে আসে অমোঘ নিয়তির মত-এ ভয়ে তারা তটস্থ। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র মানেই সব পেয়েছি'র দেশ- এরকম একটি যাদুকরী আকর্ষণের দিকে ধাবিত গোটা বিশ্বের মানুষ। আপন গর্ব, মহিমা ও সমৃদ্ধির সম্মোহনী চক্রে মানুষকে প্রলুব্ধ করে তাদের মেধা ও শক্তিকে নিজের প্রবৃদ্ধির কাজে ব্যবহারে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ সুপরিকল্পিত ছক তৈরী করে রেখেছে। তাই বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র মানেই একটি স্বপ্নভূমি, একটি অদম্য স্রোতের টান। যুক্তরাষ্ট্র মানেই একটি 'মিথ'। কিন্তু অতি সম্প্রতি গত ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন ইতিহাসের ভয়াবহতম ধ্বংসযজ্ঞে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে বহুদিনের লালিত গৌরব ও দম্ভের সাজানো বাগান, বেরিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতম দিকটি। আহত দানব তাই গর্জে উঠেছে, ধসের টানে তলিয়ে যাওয়ার আগে সকল শক্তিতে সে উন্মাদের মত আঘাত হেনে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে তাকে, আঘাতকারী অদৃশ্য শক্তিকে। তারই বলি হয়েছে দুর্বল, দরিদ্র দেশ আফগানিস্তান ও তার দারিদ্র্যপীড়িত ও অসহায় জনগণ।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের এই যে জাঁকজমক, পালিশ করা চেহারা তার অন্তরালে আর কোন চিত্র

www.pathagar.com

কি আছে? আজ গোটা বিশ্ব যখন অমিত-বিক্রম মার্কিন শক্তির দাপটের সামনে হরহরি কম্পমান- তখন এই মহাশক্তির রূপচর্চিত ঝকমকে চেহারার আড়ালে যে দাগ ও ক্ষত রয়েছে তারই একটি অবিকৃত রূপ উপস্থাপন করেছেন মাইকেল প্যারেন্টি তার 'ডার্টি ট্রুথ' বা নোংরা সত্য গ্রন্থটিতে। 'ডার্টি ট্রুথ' গ্রন্থটি হচ্ছে মার্কিন মিডিয়া ও সংস্কৃতি, ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রক্ষমতা, আদর্শ ও রাজনৈতিক সচেতনতা বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে রচিত কতিপয় প্রবন্ধের দৃষ্টি উন্মোচক ও আকর্ষণীয় সংকলন। প্যারেন্টি তার গ্রন্থে এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ, বাক-স্বাধীনতা, নব্য নাৎসীবাদের উদ্ভব, আসন্ন প্রতিবেশগত বিপর্যয়, সম্পদ ও দারিদ্র্যের মধ্যে সম্পর্ক, সন্ত্রাসবাদ উন্মাদনা, কেনেডি হত্যা বিষয়ে অব্যাহত অসন্তোষ এবং মার্কিন কর্পোরেট বিশ্ব প্রাধান্যের পোস্টমর্টেম ও অবিচার নিয়ে কথা বলেছেন।

রাজনৈতিক থেকে ব্যক্তিপর্যায় পর্যন্ত বিচারকালে প্যারেন্টি সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সম্পর্কটি প্রদর্শন করেছেন। ইনকিলাবের সম্মানিত পাঠকদের জন্য মাইকেল প্যারেন্টির 'ডার্টি ট্রুথ' গ্রন্থের Hidden Holocaust, USA *শীর্ষ প্রবন্ধটির ভাষান্তর এখানে উপস্থাপন করা হলো।*

আমি সেসব লোকের কথা বলেছি, যাদের চোখ অশ্রু সজল, যারা খুঁজে ফিরছে একটি চাকরি। আমাদের প্রার্থনা করতে হবে তাদের জন্য, তাদের আত্মহনন থেকে বিরত রাখার জন্য। তাদের এমন বহু লোক আছে যাদের কাছে শুধু মৃত্যুই কাম্য। বর্ণনা চার্লি ট্যারান্স-এর যিনি একটি বেসরকারী সামাজিক সংস্থার পরিচালক। সে সব হতাশাগ্রস্ত লোক, যারা চাকরি, আশ্রয় ও খাবার খুঁজে ফিরছে-তাদের মাঝে তিনি কাজ করেন। তার এ বর্ণনা হচ্ছে আলবামার, গাডমডেন এলাকার। কিন্তু এ চিত্রটি হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন স্থানের।

এটা হতে পারে ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউস থেকে এক মাইল বা এরকম দূরত্বে অবস্থিত কোন সুপার মার্কেটে, যেখানে একজন লোককে দেখা যায় কুকুরের খাবারের একটি ক্যান হাতে নিয়ে কাঁদতে। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঘটনাটা কি? তখন তার জবাব- আমি ক্ষুধার্ত, আমি ক্ষুধার্ত। এটা হতে পারে নতুন নিউইয়র্কে যেখানে এক মহিলা ঝগড়া করছে তার বাড়িওয়ালার সাথে, যে তাকে ও তার কয়েকটি সন্তানকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করতে চায়। শিশু কল্যাণ ব্যুরো তার সন্তানদের নিয়ে যায়-যা তাকে আরো বিপর্যস্ত করে দেয়। আর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় নিইউয়র্কে একটি মানসিক হাসপাতালে। সেখানে তাকে আটকে রাখা হয় মানসিক রোগিনী হিসেবে।

এ দেশে আছে দুঃখ ও নির্মমতা। একদিকে মার্কিন নেতারা মুক্তবাজার চূড়ান্ত সমাধানের দিকে এগিয়ে চলেছেন, অন্যদিকে তৈরী হচ্ছে অসংখ্য ক্ষুধা, যন্ত্রণা ও বিচ্ছিন্নতার করুণগাথা। এ ধরনের বিষয়গুলো দীর্ঘদিন ধরেই আছে। এ সমাজের যেমন আছে সামাজিক বিকারগ্রস্ততা তেমনি আছে অপরাধ ও পুঁজিবাদ। আর এভাবেই অনেকের জন্যই জীবন ক্রমশই হয়ে উঠছে জটিল, ভয়াবহ রকমের কঠিন।

নিষিদ্ধ পরিসংখ্যান

যুক্তরাষ্ট্র যে একটি চমৎকার, সুখী, সমৃদ্ধিশালী দেশ-সে কথা রক্ষণশীলরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলতে ভালবাসে। দেশের প্রতি ভালবাসার এই ব্যাপারটি শুধু একটিমাত্র

www.pathagar.com

ক্ষেত্রেই সত্য আর তা হল দেশটিতে যারা বাস করে তাদের প্রতি তারা আসলেই কোন বৈষম্য করে না। অসহায় মানুষের কান্না তাদের কানে রাজনীতির বেসুরো আর্তনাদের মত বাজে। যারা বিদ্যমান পরিস্থিতির সমালোচনা করে দেশের নাগরিকদের যাদের কিছু উদ্বেগ রয়েছে, তাদের তারা 'রক্তাক্ত হৃদয়' বলে আখ্যায়িত করে থাকে। কিন্তু কদর্য সত্য হল, যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশেও বিস্ময়কর রকম কষ্টসাধ্য জীবন, অপব্যবহার, যন্ত্রণা, অসুস্থতা, সহিংসতা ও বিকার রয়েছে। মার্কিন সমাজে লাখ লাখ মানুষের যে কি অবস্থা এবং তারা কি পরিণতি বরণ করে, নিচের তথ্যগুলো থেকে তার একটি নগ্নচিত্র পাওয়া যেতে পারে। এতে দেখা যায় যে, প্রতি বছরে ঃ

ঃ ২৭ হাজার আমেরিকান আত্মহত্যা করে।

ঃ ৫ হাজার লোক আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। কোন কোন হিসাবে এ সংখ্যা আরো বেশী।

ঃ ২৬ হাজার লোক মারাত্মক দুর্ঘটনায় নিহত হয়।

ঃ ২৩ হাজার লোক খুন হয়।

ঃ ৮৫ হাজার লোক আহত হয় আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে।

ঃ গুলীতে আহতদের মধ্যে ৩৮ হাজার লোক মারা যায়। এর মধ্যে শিশুদের সংখ্যা ২৬০০।

ঃ হামলা, ধর্ষণ, সশস্ত্র দস্যুতা, চুরি, ডাকাতি ও অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন অপরাধের শিকার হয় ১ কোটি ৩০ লাখ লোক।

ঃ ১ লাখ ৩৫ হাজার শিশু স্কুলে অস্ত্র নিয়ে যায়।

ঃ বিভিন্ন ধরনের অপরাধে ৫৫ লাখ লোক গ্রেফতার হয় (ট্রাফিক আইন লংঘনকারীরা ছাড়া)।

ঃ অতিরিক্ত মদ্যপানে ১ লাখ ২৫ হাজার লোক অকালে মৃত্যুবরণ করে।

ঃ তামাক-সংশ্লিষ্ট অসুস্থতার কারণে ৪ লাখ ৩০ হাজার লোক অকালে মারা যায়। এর মধ্যে ৫৩ হাজার অধূমপায়ী।

ঃ ৬৫ লাখ লোক হেরোইন, উত্তেজক ও বিপজ্জনক নেশাদ্রব্য, পিসিপ, কোকেন অথবা অন্য কোন কড়া নেশা নিয়মিতভাবে ব্যবহার করে।

ঃ ৫ হাজারের বেশী লোক অবৈধ মাদক সেবনে মারা যায়। হাজার হাজার লোক মারাত্মক দৌর্বাল্যে ভোগে।

ঃ কিচেন সিংকের নিজে জমে থাকা বিভিন্ন খাবার সামগ্রীর পচা গন্ধ নিঃশ্বাসের সাথে মিশে এক হাজারেরও বেশী লোক মারা যায়। নিম্নশ্রেণীর লোকদের শতকরা ২০ ভাগ লোক বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে বাস করে অসুস্থতায় ভোগে। হাজার হাজার লোক স্থায়ী স্নায়ুবিক ক্ষতির শিকার হয়।

ঃ ৩ কোটি ১৪ লাখ ৫০ হাজার লোক মারিজুয়ানা সেবন করে। এর মধ্যে ৩০ লাখ চরম নেশাগ্রস্ত।

ঃ ৩ কোটি ৭০ লাখ, অর্থাৎ প্রতি ৬ জনের মধ্যে একজন আমেরিকান নিয়মিতভাবে

www.pathagar.com

আবেগ নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ ব্যবহার করে। ব্যবহারকারীদের অধিকাংশই নারী। চিকিৎসকরা এর ব্যবস্থাপত্র দেয়, আর ওষুধ কোম্পানীগুলো তা সরবরাহ্ করে, লাভের পরিমাণ বিস্ময়কর।

ঃ ২০ লাখ লোক হাসপাতালে চিকিৎসা না নিয়ে শক্তিশালী মন নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ ব্যবহার করে, কখনো কখনো এগুলোকে 'কেমিক্যাল স্ট্রেইটজ্যাকেটস' নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

ঃ সাইকো একটিভ ওষুধ ব্যবহারে ৫ হাজার লোক মারা যায়।

ঃ ২ লাখ রোগীকে ইলেকট্রিক শক চিকিৎসা দেয়া হয়, যা মস্তিষ্ক ও স্নায়ু ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর।

ঃ ২ কোটি ৫০ লাখ অর্থাৎ এক-দশমাংশ আমেরিকান মানসিক সমস্যার কারণে মনোরোগ চিকিৎসক ও মনোরোগ চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। এজন্য বছরে ব্যয় হয় ৪শ' কোটি ডলারেরও বেশী।

ঃ ৬৮ লাখ লোক মানসিক সমস্যার কারণে ননমেডিকেল সেবা ব্যবস্থা যেমন -মন্ত্রী, কল্যাণ সংস্থা ও সোসাল কাউন্সেলরদের সাহায্য গ্রহণ করে। মোটের ওপর আট কোটি লোক তাদের জীবনকালে কোন না কোন প্রকার মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা চেয়ে থাকে।

ঃ ১৩ লাখ লোক হাসপাতালগুলোতে আহত হওয়া সংক্রান্ত চিকিৎসা গ্রহণ করে।

ঃ ২০ লাখ লোক অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের শিকার হয়। যাদের মধ্যে দশ হাজার মারা যায়।

ঃ চিকিৎসার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় এক লাখ আশি হাজার লোক মারা যায়। প্রতিবছর বিমান দুর্ঘটনা ও সড়ক দুর্ঘটনায় মোট যত লোক মারা যায়, এ সংখ্যাও এ উভয়ের চাইতে বেশী।

ঃ চিকিৎসকের বৈধ ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করে ১৪ হাজারেরও বেশী লোক মারা যায়।

ঃ গাড়ী দুর্ঘটনা ৪৫ হাজার লোক নিহত হয়। তা সত্ত্বেও গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও অধিক মহাসড়ক নির্মিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে গণপরিবহনের নিরাপদ পন্থা হ্রাস পাচ্ছে।

ঃ গাড়ী দুর্ঘটনায় ১৮ লাখ কমগুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এদের মধ্যে দেড় লাখ স্থায়ী সমস্যায় ভোগে।

ঃ ১ লাখ ২৬ হাজার শিশু বড় ধরনের জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মলাভ করে। এর অধিকাংশই ঘটে অপর্যাপ্ত গর্ভকালীন পরিচর্যার অভাব, পুষ্টি ঘাটতি, পরিবেশগত দূষণ অথবা মায়ের মাদকাসক্তির কারণে।

ঃ ২৯ লাখ শিশু শারীরিক নির্যাতন ও অনাহারসহ মারাত্মক অবহেলা বা নির্যাতনের শিকার হয়।

ঃ পিতা-মাতা ও দাদা-দাদী বা নানা-নানীর হাতে ৫ হাজার শিশু নিহত হয়।

ঃ ৩০ হাজারেরও বেশী শিশু নির্যাতন ও অবহেলার কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক

www.pathagar.com

পঙ্গুত্ববরণ করে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর লিউকিমিয়া, গাড়ী দুর্ঘটনা ও সংক্রমণজনিত ব্যাধিতে যত শিশু মারা যায়, শুধু নির্যাতনেই তার চেয়ে বেশী শিশু মারা যায়। ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের কারণে বেকার পিতা-মাতার দ্বারা শিশু নির্যাতনের ঘটনা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যৌন নির্যাতনসহ নির্যাতনমূলক আচরণের কারণে পিতা-মাতার ও অন্য বয়স্কদের কাছ থেকে ১০ লাখ শিশু বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। যৌন নির্যাতনের কারণে ঘরপালানো শিশুদের মতে, শতকরা ৮৩ ভাগই শ্বেতাঙ্গ পরিবারে।

ঃ ১ লাখ ৫০ হাজার শিশু নিখোঁজ।

ঃ এদের মধ্যে ৫০ হাজার স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। এদের বয়স এক থেকে দশ বছরের মধ্যে। নিউইয়র্ক টাইমসের মতে এদের বেশ কিছুসংখ্যক সম্ভবত অর্ধেকই অজ্ঞাত পরিচয় শিশু হিসেবে কবরস্থ হয়।

ঃ ৯ লাখ শিশু যুক্তরাষ্ট্রে শিশু শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। এর মধ্যে ৭ বছরের শিশুও রয়েছে। তারা কমবেতনে দশ ঘন্টা ধরে কৃষি শ্রমিক, থালা-বাসন ধোয়ার কাজ, লন্ড্রি শ্রমিক কিংবা ঘরের কাজ করে, যা শিশুশ্রম আইনের লংঘন।

ঃ ২ থেকে ৪ লাখ মহিলা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ঘরোয়া সংহিসতা আঘাতপ্রাপ্তির একক বৃহত্তর কারণ এবং মার্কিন মহিলাদের মৃত্যুর দ্বিতীয় বৃহৎ কারণ।

ঃ ৭ লাখ মহিলা ধর্ষিত হয়, প্রতি ৪৫ সেকেন্ডে একজন ধর্ষিত হয়।

ঃ ৫০ লাখ শ্রমিক চাকরিরত অবস্থায় আহত হয়। এদের মধ্যে দেড় লাখ কর্ম-সংশ্লিষ্ট অক্ষমতার শিকার হয় যার মধ্যে রয়েছে নির্বাক হয়ে যাওয়া, পক্ষাঘাত, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, শ্রমশক্তি হারানো কিংবা চিন্তাশক্তি হারানো।

ঃ ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ ক্যান্সার ও যক্ষ্মাসহ কর্ম-সংশ্লিষ্ট রোগে ১ লাখ গুরুতর অসুস্থতার শিকার হয়।

ঃ চাকরি করতে গিয়ে ১৪ হাজার থেকে নিহত হয় যাদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই পুরুষ।

ঃ কর্ম-সংশ্লিষ্ট রোগে ১ লাখ লোক অকালে প্রাণ হারায়।

ঃ বিষাক্ত পরিবেশদূষণ অথবা খাদ্য, পানি ও বাতাসের বিষক্রিয়ায় ৬০ হাজার লোক নিহত হয়।

ঃ বিষাক্ত গোশ্‌ত খেয়ে ৪ হাজার লোক প্রাণ হারায়।

ঃ বিষাক্ত গোশতে থাকা ই, কোলি ০১৫৭-এইচ ৭ ব্যাকটেরিয়ার কারণে সৃষ্ট বিষক্রিয়ায় ২০ হাজার লোক অসুস্থতায় ভোগে, যার ফলে জীবনভর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়।

বর্তমানে ঃ

ঃ যুক্তরাষ্ট্রে ৫১ লাখ লোক কারাগারে বন্দী অথবা বিচারাধীন অথবা প্যারোলে রয়েছে। এদের মধ্যে ২৭ লাখ কাউন্টি, রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক অথবা আইজি তত্ত্বাবধানে রয়েছে। প্রতি সপ্তাহে যত লোক ছাড়া পায় তার চেয়ে ১৬০০ জন বেশি

www.pathagar.com

কারাগারে ঢোকে। ১৯৮০ সালে গড় কারাবন্দীর শতকরা ২০০ ভাগ বেড়েছে। বন্দীদের শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশী মাদক সংক্রান্ত অপরাধে দণ্ডিত। মাদকসেবীদের মধ্যে শতকরা ১৩ ভাগ আফ্রিকান- আমেরিকান, কিন্তু মাদক সংক্রান্ত গ্রেফতারের শতকরা ৩৫ ভাগ, মাদক অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্তদের শতকরা ৫৫ ভাগ এবং কারাদণ্ডপ্রাপ্তদের শতকরা ৭৪ ভাগই আমেরিকান।

ঃ যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা ১৫ হাজারেরও বেশী। এ সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১০ লাখেরও বেশী লোক যক্ষ্মার জীবাণু বহন করছে। এদের মাঝে বিরাট সংখ্যক লোক অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল অথবা মাদকাসক্ত।

ঃ ১০ কোটি লোক মদ্যপানজনিত সমস্যার শিকার। মদ্যপায়ীদের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়ছেই।

ঃ ১৬ লাখ লোক ডায়াবেটিসে ভুগছে। ১৯৯৮ সালে এ সংখ্যা ছিল ১১ লাখ। এর কারণ আমেরিকানরা অধিকতর বসে থাকার কাজ করছে এবং চিনিতে আসক্ত হয়ে পড়ছে।

ঃ এ বছর ডায়াবেটিসে ১ লাখ ৬০ হাজার লোক মারা যাবে।

ঃ সামাজিক অসুস্থতা বা মানসিক প্রতিবন্ধিত্বের কারণে ২ লাখ ৮০ হাজার লোক চিকিৎসা গ্রহণ করে। এদের মধ্যে অনেককেই মন নিয়ন্ত্রণ ওষুধ ব্যবহার করতে বাধ্য করা হয়।

ঃ ২ লাখ ৫৫ হাজার মানসিক রোগী বা মানসিক প্রতিবন্ধীকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এদের অনেকেই এখন ফ্লপ হাকসে থাকে কিংবা রাস্তায় ভবঘুরের মত দিন কাটায়।

ঃ পক্ষাঘাত, শ্রবণহীনতা, অন্ধত্ব ও কম পর্যায়ের শারীরিক অক্ষমতাসহ মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধিত্বের শিকার হয় ৩ লাখ লোক। এদের মধ্যে বেশীরভাগই দরিদ্র। সময়মত চিকিৎসা ও জীবনমানের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে অনেককেই নিরাময় করা সম্ভব।

ঃ ২৪ লাখ আমেরিকান ক্লান্তিজনিত বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়।

ঃ ১ কোটি লোক অ্যাজমা অথবা অ্যাজমার লক্ষণসম্বলিত রোগের শিকার। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে এ ধরনের রোগীর সংখ্যা শতকরা ১৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রধান কারণ বাতাসদূষণ।

ঃ ৪ কোটি লোকেরই বিপর্যয়কর রোগে জীবন বীমা বা সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই।

ঃ পরিবারের সাথে বসবাসরত ১৮ লাখ বয়স্ক লোক পরিবারের ব্যাপক দুর্ব্যবহার যেমন জোরপূর্বক আটকে রাখা, অনাহার ও প্রহারের শিকার। অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির সাথে সাথে সন্তান ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কর্তৃক বয়স্ক সদস্যদের সাথে দুর্ব্যবহারের মাত্রা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঃ ১১ লাখ ২৬ হাজার লোক নার্সিং হোমে বাস করে।

ঃ ১০ লাখ অথবা আরো বেশি সংখ্যক শিশুকে অনাথাশ্রম, সংশোধন কেন্দ্র ও প্রাপ্তবয়স্কদের কারাগারে রাখা হয়। এদের অধিকাংশেরই সামান্য অপরাধ কিংবা বিনা

www.pathagar.com

অপরাধে ও যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। অধিকাংশই দরিদ্র পরিবারের সন্তান।

ঃ প্রায় ১০ লাখ লোক এইডসের শিকার। এদের মধ্যে ২ লাখ ৫০ হাজার মারা গেছে।

ঃ ৯ লাখ ৫০ হাজার স্কুল শিশুকে প্রতিবছর হাইপার অ্যাকটিভিটির কারণে উচ্চমাত্রার কম নিয়ন্ত্রণ ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। যার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ওজন হ্রাস, বৃদ্ধি হ্রাস ও অন্যান্য রোগ দেখা দেয়।

ঃ ৪০ লাখ শিশু শ্রবণহীনতা সমস্যা নিয়ে বড় হচ্ছে। অথচ সেদিকে কেউ নজর দিচ্ছে না।

ঃ কল্যাণ কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল ৯০ লাখ শিশুর অর্ধেক অর্থাৎ ৪৫ লাখ শিশু অপুষ্টিতে ভোগে।

ঃ ৪ কোটি লোক অথবা প্রতি ৪ জনের মধ্যে একজন মহিলা এবং প্রতি ১০ জনের মধ্যে একজন পুরুষ তাদের শিশু বয়সে বিশেষ করে ৯ থেকে ১২ বছরের মধ্যে যৌন নিপীড়নের শিকার। নিকটাত্মীয় বা পরিবারের সাথে সম্পর্কিতদের দ্বারা এটাও ঘটতে থাকে। এ দুঃসহ স্মৃতি তারা কখনোই ভুলতে পারে না চিকিৎসায়ও নিরাময় হয় না।

ঃ ৭০ লাখ থেকে ১২ লাখ লোক চাকরিহীন বা বেকার। ব্যবসায় মন্দা বা উন্নতির সাথে এ সংখ্যা কমে-বাড়ে। মনের ওপর এর চাপ পড়ে। ফলে মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়।

ঃ ৬০ লাখ লোক সম্পূর্ণ অস্থায়ী চাকরি করে।

ঃ ১ কোটি ৫০ লাখ বা বেশি সংখ্যক লোক খণ্ডকালীন চাকরিতে নিয়োজিত যাদের পূর্ণকালীন চাকরি প্রয়োজন।

ঃ ৩০ লাখ অতিরিক্ত শ্রমিক বেকার কিন্তু তারা বেকার ভাতা পায় না। কেউ কেউ কাজ খুঁজে না পেয়ে সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দেয়।

ঃ ৮০ লাখ লোক মার্কিন শ্রম দফতরের হিসাব অনুযায়ী সুবিধাজনক অবস্থানের নিচে বাস করে। এর মধ্যে ৩৫ লাখ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে করে থাকে।

ঃ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী ১২ লাখ লোক অব্যাহত ক্ষুধা ও অপুষ্টির শিকার। দারিদ্র্যসীমায় বা তার নিচে বসবাসরতদের অধিকাংশই বছরের একটি অংশ অনাহারের মধ্যে থাকে।

ঃ ২ লাখ অথবা আরো বেশী লোক গৃহহীন। তারা রাস্তায় থাকে কিংবা অস্থায়ী আশ্রয়ে বাস করে।

ঃ ১৬ কোটিরও বেশী লোক গৃহসামগ্রীর ঋণগ্রস্ত। এক দশক আগেও এরকম লোকের সংখ্যা ছিল ১০ কোটি। অধিকাংশ লোকেই আভাস দিয়েছে যে, তারা ঋণ করেছে বিলাস-ব্যসনের জন্য নয়, প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনার জন্যই। ক্রমবর্ধমান ঋণ অধিক থেকে অধিক সংখ্যক পরিবারে আর্থিক ধসের সৃষ্টি করছে।

সুখী জাতি ?

যুক্তরাষ্ট্রে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। এদেশে

www.pathagar.com

বেকার প্রায় ২ কোটি লোকের অধিকাংশই এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেসব শিশু অপুষ্টির কারণে শ্রবণশক্তির সমস্যা নিয়ে বেড়ে উঠছে, তাদের প্রায় সকলেই এই সাড়ে তিনকোটির অন্তর্ভুক্ত। ৩ কোটি ৭০ লাখ লোক নিয়মিত মন নিয়ন্ত্রণ ওষুধ ব্যবহার করে। ২ কোটি ৫০ লাখ লোক মনোচিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে থাকে।

ঃ এই বঞ্চনার ও যন্ত্রণার কিছু কিছু অন্যগুলোর মত মারাত্মক নয়। যে ৮ কোটি লোক পর্যাপ্ত আরামদায়ক জীবন যাপন সীমার নীচে বাস করে তাদের বিষয়টি কিছু পর্যবেক্ষকের কাছে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও একটি শ্রেণীভুক্ত মনে হতে পারে। তারা নিজেরা দারিদ্র্যসীমা থেকে বিপুল দূরত্বে অবস্থানরত। স্বাস্থ্য-বীমাহীন ৪ কোটি লোক কোন প্রকৃত বিপর্যয়ের শিকার হয়নি ঠিকই কিন্তু তারা হুমকির সম্মুখীন যদিও স্বাস্থ্যকর্মীর অনুপস্থিতির কারণে তাদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়া হয় না যা কার্যত মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করে। আমরা হয়ত গ্রেফতারকৃত ৫৫ লাখ লোকের কথা বিবেচনা না করতে পারি। কিন্তু যে ১৫ লাখ লোক কারাদণ্ড ভোগ করছে, তাদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের কি হবে ? চাকরিসংশ্লিষ্ট পঙ্গুত্বের শিকার দেড় লাখ লোকের কথা হয়ত আমরা ভাবি, কিন্তু চাকরি সংশ্লিষ্টতার কারণে আহত ৫০ লাখ লোকের কথা ? আমাদের কর্তৃপক্ষ ২ কোটি বেকার লোকের প্রকৃত সংখ্যার অর্ধেকের কথা স্বীকার করে না। কারণ তা হলে দারিদ্র্যসীমার সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। এভাবে তারা ভুল চিকিৎসার শিকার ১১ লাখ লোকের মধ্যে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ মানসিক সমস্যার জন্য চিকিৎসা গ্রহণ করে। নিয়মিত মাদক সেবনকারী ৩ কোটি ৭০ লাখ লোকের মধ্যে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ, গৃহস্থালি সামগ্রীর জন্য ঋণে জড়িয়ে পড়া ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র শতকরা ৫ ভাগের ঋণ গ্রহণের কথা স্বীকার করে।

আমরা যদি শুধু তাদের কথা বিবেচনা করি, যারা শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে অথবা মারাত্মক পঙ্গুত্বের শিকার অথবা অপুষ্টির শিকার বা গৃহহীন-শুধু তারা যারা আত্মহত্যার, খুন, আঘাত, মাদক ব্যবহার ও অতিরিক্ত মদ্যপানে অকালে প্রাণ হারিয়েছে, কিংবা যারা শিল্প ও মোটরযান দুর্ঘটনায়, ভুল চিকিৎসায় পেশাগত অসুস্থতা ও যৌন সংক্রমিত রোগে মারা গেছে, তাহলে ১ কোটি ৯০ লাখ লোকের এক হতবুদ্ধিকর সংখ্যা দেখতে পাব। ভিয়েতনামে যুদ্ধ করতে গিয়ে ১২ বছরে ৫৮ হাজার মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছিল। আর খোদ মার্কিন মুল্লুকে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াই এবং সহিংস ঘটনায় কয়েক লাখ লোক অকালে মারা যায়।

সরকারী হিসাবে যাই বলা হোক, কোন সন্দেহ নেই যে আমরা এক গোপন নিধনযজ্ঞের সম্মুখীন। আরো কথা যে, উপরোক্ত পরিসংখ্যানে সম্পূর্ণ চিত্রটি প্রকাশিত হয়নি। প্রতিটি বিষয়েই একটি অজ্ঞাত সংখ্যক মানুষ হিসেবের বাইরে থেকে গেছে। যেমন সরকারী হিসেবে সাড়ে তিন কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। কিন্তু কিছু অর্থনীতিবিদের মতে এ সংখ্যা আসলে ৪ কোটি ৬০ লাখের মত।

নিহতদের সংখ্যার বিষয়ে উল্লেখ্য যে সামরিক বাহিনীতে প্রশিক্ষণ ও পরিবহন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রতিবছর দু'হাজারেরও বেশী মৃত্যুর ঘটনা হিসাবের বাইরে থেকে যায়। বহু হত্যা ও আত্মহত্যার ঘটনা সঠিক বিচার না হওয়ায় স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে গণ্য করা হয়। একইভাবে তেজস্ক্রিয়তা ও অন্যান্য কারণে সৃষ্ট ক্যান্সারের মৃত্যুর ঘটনাগুলোও স্বাভাবিক

www.pathagar.com

মৃত্যু হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়।

সরকারী নীতি, ব্যক্তিগত বেদনা

প্রশ্ন করতে পারে- পরিস্থিতি যদি একই খারাপ তাহলে মার্কিন মৃত্যুর হার হ্রাস পাচ্ছে কেন ? গত অর্ধশতক ধরে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। প্রধানত শিশু মৃত্যুহার নাটকীয়ভাবে কমে আসা এবং স্বাস্থ্য মানের উন্নতির কারণে বহু রোগে মৃত্যু না হওয়া। উপরন্তু বিগত কর্মজীবী লোকদের শিল্প ক্ষেত্রে সংগ্রামের কারণে কয়েকটি ক্ষেত্রে অবস্থার ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। অন্য কথায় এখন অবস্থা যতটা খারাপ, আগের দিনে কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থা আরো শোচনীয় ছিল। উদাহরণস্বরূপ, এখন প্রতিবছর কর্মক্ষেত্রে ১৪ হাজার লোক মারা যায়। কিন্তু ১৯১৬ সালে এক বছরে মারা যায় ৩৫ হাজার। যদিও আজকের দিনের তুলনায় তখন শ্রমশক্তি ছিল অর্ধেক।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সচেতনতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির ফলে লাখ লাখ লোক ধূমপান ত্যাগ করেছে, নিয়মিত ব্যায়াম করছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ করছে। বিশেষ করে যাদের বয়স ৪০-এর মধ্যে, তারাই বেশী স্বাস্থ্য সচেতন। ফলে মৃত্যু হার কমছে। ঘন্টায় ৫৫ মাইল গতিসীমা এবং মাতাল অবস্থায় গাড়ী না চালানোর কঠোর নিষেধাজ্ঞার কারণে সড়ক দুর্ঘটনা কমেছে। কিন্তু ক্যান্সার সংক্রান্ত মৃত্যু, অন্যান্য বিকারজনিত আত্মহত্যা ও মৃত্যুর ঘটনা দারিদ্র্যসীমা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আয়ু বৃদ্ধির বিষয়টি এখনো হামাগুড়ি দেয়ার পর্যায়েই রয়েছে।

অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, আমরা একনম্বরে রয়েছি বলে যেমনটি ভাবছি, আসলে তা নয়। অন্য ১৩টি দেশের চাইতে এখনো যুক্তরাষ্ট্রের শিশু মৃত্যুর হার বেশী। আয়ু বৃদ্ধির মাত্রাও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থার অনিবার্য ফসল নয়, বরং প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের প্রফিট-বিফোর-পিপল কর্পোরেট ব্যবস্থার সৃষ্টি সামাজিক ও বস্তুগত অবস্থান। এখানে কিন্তু উদাহরণ দেয়া দেতে পারে ঃ

প্রথমত শিল্প উৎপাদনে সর্বদাই কিছু ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যে সব প্রাণহানি ঘটেছে, তা মূলত অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা মান, কাজের গতি ও নিরাপত্তা বিধি বলবৎকরণের বিষয়টি উপেক্ষা করার ফলে। উন্নত ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারে। শুধু রসায়ন শিল্পেই অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ওএসএইচএ) কর্তৃক চালুকৃত নিয়ম-কানুন দুর্ঘটনা ও অসুস্থতা শতকরা ২৩ ভাগ হ্রাস করতে পারে। অথচ এ জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রমিক বিছু বার্ষিক ব্যয় মাত্র ১৪০ ডলার।

দ্বিতীয়ত যে কোন সমাজেই কিছু শিশু অসুস্থ হতে পারে ও মারা যেতে পারে। কিন্তু ভাল পুষ্টির ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা অবস্থা পালটে দিতে পারে। দি উইমেন, ইনফ্যান্ট এ্যান্ড চিলড্রেন নিউট্রিশন প্রোগ্রাম (ডব্লুআইসি) অনাহার ও ক্ষুধার ক্ষেত্রে কর্মসূচি হ্রাস করেছে। অন্যদিকে ১ কোটি ৩০ লাখ শিশুকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য একটি আইন প্রণীত হওয়ার কয়েক বছর পর কংগ্রেস দেখতে পায় যে প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ শিশু-কিশোরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়নি। এর ফলে হাউস সাব কমিটির বর্ণনানুযায়ী 'প্রয়োজনীয় পঙ্গুত্ব, প্রতিবন্ধিত্ব, এমন কি হাজার হাজার শিশুর মৃত্যু ঘটেছে।'

তৃতীয়ত ঃ চিকিৎসা ক্ষেত্রে সব সময়ই কিছু সমস্যা থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য

www.pathagar.com

পরিচর্যা যে পন্থায় সংগঠিত করা হয়েছে তা বিস্ময়কর। প্রায়শই অর্থের উপর জীবন ও মৃত্যু নির্ভর করে। বহু অসুস্থ লোকই উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবা না পেয়ে কিংবা বিলম্বে চিকিৎসা করার কারণে মারা যায়। স্বাস্থ্য বীমার প্রিমিয়াম বহুগুণে বেড়েছে। এবং হাসপাতালের বিলও বেড়েছে পাঁচগুণ। এখন এটা মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃত যে, জনসাধারণ এখন ভাল চিকিৎসা পাচ্ছে না। চিকিৎসা অধিকতর ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসার মানের অবনতি ঘটেছে।

কিছু চিকিৎসক চিকিৎসা সেবা ও টেস্টের জন্য অতিরিক্ত ফি গ্রহণ , রোগী না থাকা সত্ত্বেও কিংবা সেবা প্রদান না করেই প্রতারণামূলক বিল করে, অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা, টেস্ট ও হাসপাতালে ভর্তি করে লাখ লাখ ডলার কামিয়ে নিচ্ছেন এবং যা সবচেয়ে মর্মান্তিক তা হল তারা অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার করছেন। অন্যদিকে বেসরকারী স্বাস্থ্য বীমা কোম্পানিগুলো প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধি করে ও সেবা স্থগিত রেখে মুনাফা করে চলেছে। সে কারণে লোক স্বাস্থ্য বীমা বাবদ আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করছে অথচ আগের যে কোন সময়ের চেয়ে কম চিকিৎসা পাচ্ছে।

চতুর্থত যে কোন সমাজেই লাখ লাখ মোটর গাড়ি দুর্ঘটনা একটি অনিবার্য ব্যাপার। কিন্তু আমরা কেন এ ধরনের ব্যয়বহুল, বিপজ্জনক ও প্রতিবেশ বিপর্যয়কর পরিবহন পদ্ধতির উপর ক্রমাগত বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি ? লোক পরিবহনের ক্ষেত্রে একটি রেল সড়ক কিংবা সাবওয়ে কার ৫০টি মোটর গাড়ির কাজ করতে পারে। জাপানের মনোরেল অন্য সাধারণ ট্রেনের তুলনায় অনেক বেশি গতির যাত্রীবাহী ট্রেন এবং তা কোন প্রকার দুর্ঘটনা ছাড়াই ৩শ' কোটি যাত্রী বহন করেছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ তেল কোম্পানিগুলো ও গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের দেশে বহুগুণে নিরাপদ এই মনোরেল চালু করতে না দেয়ার ব্যাপারে সাফল্যের রেকর্ড স্থাপন করেছে।

১৯৯৫-৯৬ সালে রিগান প্রশাসন পরিবেশ, ভোক্তা নিরাপত্তা মান, বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচী, শিশু ও মহিলাদের জন্য পুষ্টি কর্মসূচীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয় ব্যাপক হ্রাস করে। রাজ্য ও স্থানীয় সরকারগুলো জন সুরক্ষা কর্মসূচী ও মানব সেবা খাতে ব্যয় হ্রাস করেছে। একইভাবে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ক্লিনিক, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দিয়ে অর্থনৈতিক মিতব্যয়িতার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আমাদের বলা হচ্ছে, বউ পেটানো, শিশু নির্যাতন, মদ্যপান, মাদক ব্যবহার, অন্যান্য অনাচার ও অপরাধ কর্ম কোন শ্রেণীসীমা মানে না এবং সকল উপার্জনকারী পর্যায়েই এগুলো পরিলক্ষিত হয়। এটা সত্য কিন্তু বিভ্রান্তিকর। তারা বলতে চায় যে সমাজের সর্বস্তরেই এটা নির্বিচারে ঘটে থাকে এবং এটাকে অন্য কোনভাবে দেখার অবকাশ নেই। কিন্তু এসব অপরাধ অনাচারের জন্য মূলত দায়ী হচ্ছে স্বল্প আয়, বেকারত্ব এবং আশ্রয়হীনতা। অর্থনৈতিক অবনতি যত বাড়ছে, এসব ঘটনাও ততই বাড়ছে। এই পরিসংখ্যানে যা দেখা গেছে তার পিছনে রয়েছে আমাদের শ্রেণী, বর্ণ, যৌন ও বয়সজনিত নিপীড়নের ঘটনা যা কিনা সামাজিক শৃঙ্খলা নিষ্ঠুরতার বহুকাল ধরে চলে আশা উত্তরাধিকার যা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সংবাদ মিডিয়া অথবা শিক্ষাবিদদের গভীর ও বিশদ আলোচনার বিষয় হতে পারে।

www.pathagar.com

আমেরিকার তৃতীয় বৈশ্বিকীকরণের ফলে ক্রমেই অধিকতর সংখ্যক মাঝারি আয় পর্যায়ের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা মারাত্মক চাপ, মদ্যপান, চাকরির অনিশ্চয়তা, অপর্যাপ্ত আয়, উচ্চ বাড়ি ভাড়া, বিপুল বন্ধকী দায়, অধিক করের শিকার হচ্ছে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে। আমরা প্রায় সবাই কীটনাশক সম্বলিত খাদ্য খাচ্ছি, রাসায়নিক পূর্ণ বাতাস ফুসফুসে টানছি, বিষাক্ত পানি পান করার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছি এবং ক্রমশই ক্রমবর্ধমান রাসায়নিক বিক্রিয়া আক্রান্ত পরিবেশের মধ্যে নিজেদের উন্মুক্ত করছি। আমি 'আমাদের প্রায় সবাই' কথাটি বলছি একারণে যে, শুধু ভাগ্যবান কিছু ব্যক্তিই পল্লী এলাকায় জমিদারিতে, র‍্যাঙ্কে, সমুদ্রতীরবর্তী প্রাসাদে এবং গ্রীষ্মকালীন আবাসে বাস করেন সেখানে বাতাস তুলনামূলকভাবে বিশুদ্ধ। আর প্রেসিডেন্ট রিগানের মত তারা শুধু উত্তম তাজা খাদ্য ও গোশত খান যা কিনা রাসায়নিক দূষণমুক্ত, পক্ষান্তরে আমাদের কীটনাশক, পতঙ্গ দমনকারক ও রাসায়নিক সার সম্পর্কে বিকারগ্রস্ত না হওয়ার পরামর্শ খয়রাত করেন।

এ বিষয়গুলোর কারণে আমাদের অনেকেই 'আমেরিকা দি বিউটিফুল' সম্পর্কে উল্লসিত হওয়ার সামান্যই উৎসাহবোধ করেন। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা আমাদের দেশকে ভালবাসি না-বরং ভালবাসি। আমরা ইউএসএ নামটিকেই শুধু নয়, এর জনগণকে ভালবাসি। আমরা বিশ্বাস করি একটি জাতির গৌরবকে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা গোপন করার কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়-যা তার জন্য লজ্জাকর। দি আমেরিকান ড্রিম অনেকের জন্যই দুঃস্বপ্নে পরিণত হচ্ছে। মুক্তবাজার লুটপাটের অবসান ঘটানো, সমন্বিত কল্যাণের জন্য উদ্বেগ এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 'জনগণের বিনিময়ে মুনাফা নয়'- শুধু একটি শ্লোগান নয়-এটি আমাদের একমাত্র আশা। ❑

২৬ অক্টোবর '০১
লেখক ঃ গবেষক।
ভাষান্তর ঃ হোসেন মাহমুদ

www.pathagar.com

আমেরিকায় বাকস্বাধীনতার মূল্য
মাইকেল প্যারেন্টি আগলি ট্রুথ থেকে

(দুই)

'আমাদের বাক স্বাধীনতা আছে'-এটা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি ? আমরা অনেকেই ভাবি বাক স্বাধীনতা বা স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার সমাজের প্রত্যেকে ভোগ করি। আসলে এটা কোন বিমূর্ত অধিকার নয়। আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার মধ্যেই এ অধিকার-এর প্রকাশ, আর এ বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন কিছুই নেই।

ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির আচরণেরই একটা ধরণ হল কথা বলা বা বক্তব্য প্রদান করা। অর্থাৎ কোন একটা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যেমন- ঘরে, কর্মস্থলে, শিক্ষাঙ্গনে, সরাসরি শ্রোতাদের সামনে কিংবা সংবাদপত্র কি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক জনগণের কাছে বক্তব্য তুলে ধরা যায়। যে কোন বক্তব্যের লক্ষ্যই হল অন্যদের মনে পৌঁছে যাওয়া। এটা রাজনৈতিক বক্তব্যের ক্ষেত্রেও একেবারে তাই। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক বক্তব্যকে খুব জোর প্রচার দেয়া হয় আর অন্য কিছু বক্তব্যকে সুকৌশলে জনগণের চোখের আড়ালে সরিয়ে রাখা হয়।

আদর্শগতভাবে ভাগ করে দেয়া স্বাধীনতা

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একজনের মতামত যতটা বামমুখী তার প্রচার পাওয়া, জনগণের দরবারে প্রবেশ করাটা ততটাই কঠিন। বামদের কর্পোরেট মালিকানায় ক্রমবর্ধমানভাবে একীভূত মিডিয়া থেকে *ঠেলেঠুলে* সরিয়ে রাখা হয়, বিশেষত যারা গোঁড়ামির উর্ধ্বে এবং যারা দেশে-বিদেশে বড় পুঁজির নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে সরাসরি বলেন তাদের এই দশা হয়। যারা বিশ্বাস করেন যে, দরিদ্ররা সম্পদে বিশেষ অধিকার প্রাপ্তদের ধনীদের শিকার এবং এদের ক্ষমতার স্বার্থ নিশ্চিহ্ন হওয়া দরকার-তাদের মত প্রগতিশীলদের 'বাম' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এরা বিশ্বাস করেন শ্রমিক সংঘগুলো আরও জোরাদার হওয়া দরকার এবং শ্রমজীবী জনগণের অধিকার বিস্তৃত হওয়া দরকার, পরিবেশ কঠোরভাবে সংরক্ষণ করা, বর্ণবাদ, যৌনবাদ, সমকামী আক্রমণের ভয়কে জোরদারভাবে রুখে দেয়া জরুরী। এরা আরও মনে করেন, মানবসেবা খাতে যথাযথ অর্থায়ন হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

প্রগতিশীলরা আরও যুক্তি দেখান ভিয়েতনাম, নিকারাগুয়া, এঙ্গোলা এবং প্রায় এ কডজন রাষ্ট্রের ঐ সব বিপ্লবী সরকারকে সমর্থন দেয়ার সপক্ষে যারা জনগণের জন্য সমাজ-সংস্কারের হাত দিয়েছিল, ঐ সব সরকারকে জাতীয় নিরাপত্তার নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষতিকর যুদ্ধের মাধ্যমে জোর করে ক্ষমতা থেকে নামিয়েছিল। প্রগতিশীলরা ঐসব কাজকে শুধু 'ভুল' বলেনি বরং একে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য সুপরিকল্পিত ভয়াবহ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বলে মত প্রকাশ করেছে।

এ ধরনের মতামত যারা পোষণ করেন দেশের প্রধান প্রচার মাধ্যমে প্রবেশাধিকার থেকে তারা বঞ্চিত থেকে যান। এক কথায়, কিছু মানুষের অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি মত প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যারা উল্লিখিতদের উদ্যোগে অবস্থান নেন তারা রক্ষণশীল বা ডানপন্থী নামে পরিচিত। রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা বেশ বিরাট পরিমাণে বাক স্বাধীনতা ভোগ করে। তারা মানবিক ও পরিবেশগত্ প্রয়োজনের চাইতে কর্পোরেশন আর বৃহৎ মুনাফাকেই বেশি পছন্দ করে। যখন বহু লোক চরম দরিদ্র জীবন-যাপন করে আর কিছু লোক প্রাচুর্যের পাহাড় গড়ে, এর মধ্যে তারা কোন সমস্যাই দেখতে পান না। এরা মুক্ত বাজারকে কার্যত পূজা করেন, আর ব্যবসার ক্ষেত্রে কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ হলে তাকে 'প্রশাসনিক পাপ' মনে করে, অন্যদিকে যারা আরও দরিদ্র হতে বাধ্য হচ্ছে তাদেরকেই দারিদ্র্যের জন্য দোষারোপ করা হয়। তারা যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাচার ও দেশে দেশে যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাচার ও দেশে দেশে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে এবং শ্রেণী, লিঙ্গ ও বর্ণগত সমতার বিরুদ্ধ নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এ ধরনের ডানপন্থী যেমন- রুশ লিম্বফ, উইলিয়াম, এফ, বাকলে জুনিয়র, জন ম্যাকললিন, জর্জ উইল এবং রবার্ট নোভাক জনগণ ও শ্রোতামণ্ডলীর কাছে বাম উদারপন্থী ও গণমুখী জিম হাইটাওয়ার, জেরি ব্রাউন কিংবা রালফ নাদেরের চাইতে বেশি প্রচার পান। মোটের ওপর, রক্ষণশীল ও উদারপন্থী যে কেউই কোন একজন 'চরমপন্থী' বা বাম মার্কসবাদীর চাইতে বেশি প্রচার পেয়ে থাকেন।

ধনী কর্পোরেট মিডিয়া মালিকদের অর্থনৈতিক শক্তির কারণেই ডানপন্থীরা গণপ্রচারের এতসব পথ খুঁজে পান, ওদের (ডানপন্থীদের) মেধা আর প্রজ্ঞার কারণে এসব সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে-এটি মনে করবার কোন কারণ নেই। জনগণের দাবী নয় বরং প্রাইভেট কর্পোরেট মালিক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের কল্যাণেই ওদের প্রচার মাধ্যমে এত বেশি দেখা যায়। বহু লোক তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। এটা তাদের বক্তব্যের আবেদনের জন্য নয় বরং ঐ বক্তব্য এত প্রচুর যে শুনতে মানুষ বাধ্য। সহজলভ্যতা ভোগের একটা গুরুতর পয়লা শর্ত। এক্ষেত্রে যোগান শুধু চাহিদা মেটায়ই না যোগান চাহিদা সৃষ্টিও করে। এখানে কর্পোরেট আমেরিকার সাথে নিজেদের স্বার্থকে একাত্তা করে রেখেছে। তাদের বাক স্বাধীনতা যারা দৃঢ়ভাবে ভাল-মন্দ যাচাই করে দেখে তাদের চেয়ে অনেক বেশি। বিরুদ্ধভাবাপন্ন জনগণের কেবল নিজেদের পরস্পরের সাথে কথা বলার স্বাধীনতা আছে। যদিও এদের বছরের পর বছর ধরে উদ্বেগে থাকতে হয় কখন টেলিফোনে তাদের কথা টেপ হয়ে যায় আর কখন তাদের সভায় কখন সরকারের এজেন্ট কি দালাল এসে হানা দেয়। বামপন্থীদের কখনও কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে দেয়া হয় কিন্তু সারাক্ষণই তাদের রচনা ও বক্তব্য নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় আর অনুষদের পদ থেকে অপসারণের ঝুঁকি তো লেগেই আছে। যেমন তারা শ্রমিক ইউনিয়নে কাজ করার স্বাধীনতা রাখে, কিন্তু তাদের বিশেষজ্ঞ সাম্যবাদীদেরকে তাদের রাজনীতিকে খুবই

www.pathagar.com

সাবধানে গোপন রাখতে হয়।

বাম ধারার জনগণ জনসম্মুখে কথা বলতে পারেন তবে সেখানে সাধারণত অল্প কয়েকজন লোককেই একসাথে পাওয়া যায়। তাছাড়া এটা প্রগতিশীল কিছু প্রকাশনায় লিখবার স্বাধীনতা রাখেন কিন্তু সেসব প্রকাশনা সংস্থার না আছে কোন ধনী পৃষ্ঠপোষকতা, না আছে ব্যাপক পাঠকের দ্বারে পৌছবার মত টাকা বিনিয়োগ-মোটকথা ঐ সংস্থাগুলোর কর্পোরেট বিজ্ঞাপনদাতাও নেই, তাই বাতি জ্বলে যাবার দশা চলছে।

দেখা যাচ্ছে, যাদের খুব সামর্থ্য আছে তারাই কেবল বাকস্বাধীনতা ভোগ করে। এ পণ্যটিও অন্য আর সব পণ্যের মত বাজারজাত করতে হয়। অনেক টাকা-পয়সা খরচ করতে হয় জনগণের দ্বারে পৌছতে। কাজেই বাক স্বাধীনতার প্রসঙ্গ যখন ওঠে তখন দেখা যায় কারো কারো বক্তব্য কোটি কোটি গুণ জোরে শোনা যায় তেমন যন্ত্রে- মাইকে শোনানো হয়, অন্যদিকে অন্যদের হাত-পা বাঁধা জনগণের সামনে খালি গলায়ই চিৎকার করতে হয়।

ক্ষমতাশালীর স্বাধীনতা

আমরা স্বাধীনতাকে 'শক্তি' বা ক্ষমতার বিপরীত কিছু একটা বলে ভাবতে অভ্যস্ত। আসলে ব্যাপারটা এমনই। জনগণের অতিকষ্টে অর্জিত যেসব 'গণতান্ত্রিক অধিকার' রয়েছে সেগুলোই শাসকের স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে রুখতে শক্তি যোগায়। কিন্তু রাষ্ট্রের ঐ স্বৈরক্ষমতাকে ঠেকিয়ে আমাদের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে হলে জনগণের শক্তিকে/ক্ষমতাকে আমাদের জড় করতে হয়। আরেক দিকে তাই বলতে হচ্ছে, ক্ষমতা আর স্বাধীনতা সবসময় বিপরীত নয়, বরং প্রায়ই গভীরভাবে সম্পর্কিত। যদি কোন একজনের কোন ক্ষমতাই না থাকে।

তবে ক্ষমতাশালীদের স্বার্থের হাত থেকে তার নিজের সামান্য স্বাধীনতাটুকু রক্ষা মুশকিল হয়ে যায়। আমাদের স্বাধীনতার ততটুকুই 'বাস্তব' হয়ে ওঠে, যতটা আমাদের গণতান্ত্রিক ক্ষমতা দিয়ে 'বাস্তব' করে তুলতে পারি।

বিরুদ্ধভাবাপন্ন কিংবা বাম জনগণের ততদূর পর্যন্ত স্বাধীনতা আছে যতখানি তারা নিজেদের শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে, উদ্বুদ্ধ করে, শিক্ষিত করে তোলে। কর্তাদের চক্রকে জনগণ নিজেদের সংগঠিত ধর্মঘট, বয়কট-অবরোধ, সমাবেশ করে যতটুকু প্রতিরোধ করতে পারে ততটুকুই তাদের স্বাধীনতার বহর। তাদের বিক্ষুব্ধ বক্তব্য জনগণের দ্বারে পৌছনোর আগেই গণযোগাযোগের দুনিয়া নিয়ন্ত্রণকারী দুর্গ (এটি যে কোন পত্রিকা বা টিভি চ্যানেলের কান ধরে উঠবস করাতে অভ্যস্ত)-এর টক্কর খেয়ে ফিরে যায়।

আমাদের যতটুকু স্বাধীনতা আছে তা ওই সংবিধান প্রণেতা বিংবা কোন কর্তৃপক্ষের 'দান' নয়। একবার মনে করে দেখুন যে 'অধিকার-এর সনদ' (যা বিল অব রাইটস নামে সুপরিচিত) টি আদি সংবিধানে ছিল না। দশটা সংশোধনের অনুমোদনের পর এটি যুক্ত হয়েছিল সংবিধানের সাথে। ফিলাডেলফিয়ায় ১৭৮৭ সালের সাংবিধানিক সম্মেলনে যখন ভার্জিনিয়ার কর্নেল ম্যানস ওই 'অধিকার-এর সনদ' পেশ করেছিল, এখন তা সবাই ভোট দিয়ে নাকচ করেছিল- হ্যাঁ, কেবল ম্যাসাচুসেটস ভোটদানে বিরত ছিল। জনবিক্ষোভ, গরিবদের জমি বাজেয়াপ্ত-দখল, খাদ্য-দাঙ্গা এবং অন্যসব হাঙ্গামা দেখে ফিলাডেলফিয়া আগত 'গণ্যমান্য' ধনীরা নড়েচড়ে বসেছিল-তারা আরও নিজেদের

www.pathagar.com

ঠেকাতে আরও মজবুত 'কেন্দ্রীয় শাসন' চালু রাখার তাগিদ অনুভব করেছিল। কিন্তু জনগণের ক্ষোভ-বিদ্রোহ বড় কৃষকদের দৌরাত্ম্যকে কিছুটা দমায়। গণবিক্ষোভের হুমকিতে অবশেষে বহু দেরি করিয়ে শাসক শ্রেণীর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওই 'অধিকার-এর সনদ' নতুন সংবিধানে যুক্ত হবার অনুমোদন পায়।

দেখাই যাচ্ছে, 'অধিকার-এর সনদ'টি কোন বণিক, জমি-অর্থ ব্যবসাদার এবং দাস মালিক- যারা কিনা আমাদের 'প্রতিষ্ঠাতা পিতা' হিসেবে পরিচিত, তারা কেউ আনন্দে গদগদ হয়ে উপহার দেননি। এ সনদ নির্যাতিত শ্রেণীর সংগ্রামেরই ফসল। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের ভোটাধিকার অনুমোদনের জন্য যে সম্পদের যোগ্যতা দরকার হত, তার বিরুদ্ধে ১৮২০ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষকরা ব্যাপক গণবিক্ষোভ গড়ে তুলেছিল নারীর ভোটাধিকার পাবার জন্য প্রায় শতবর্ষ ধরে বিক্ষোভ সংগ্রাম করতে হয়েছে। আফ্রো-আমেরিকানদের মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ এবং তারপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যে সংগ্রাম চলছে তা আজও সাফল্যের পুরো আলো দেখেনি।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে দুনিয়ার শিল্প শ্রমিক

Industrial workers of the World- সংক্ষেপে Wobblies ('ওবলিজ') নামে এ দেশজুড়ে যে ইউনিয়ন আন্দোলন চলে, তার লক্ষ্য ছিল সকল পেশার শ্রমিক জনগণের অবস্থার উন্নতি লাভ। বিজয় অর্জনের জন্য 'ওবলিজ'দের সংগঠিত হতে হয়েছিল, জনগণের কাছে তারা তাদের বলিষ্ঠ বক্তৃতা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। তখন বক্তৃতাকালে বারবারই স্থানীয় পুলিশের মার, গ্রেফতার আর জেল-জুলুমকে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল। 'ওবলিজ'রা উপলব্ধি করলেন, কোনো একটা শহরে তারা যদি ৫ জনের বদলে ৫০০ জন যেতে পারেন, সেখানে নগর কর্মকর্তা কিংবা তাদের সহচররা একটু কমই অত্যাচার করেন।

শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমেই বাক স্বাধীনতার গোড়াপত্তন হল। ওবলিজদের মৌলিক অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য যে সংগ্রাম, তা-ই বাক-স্বাধীনতার নাগরিক অধিকারের লড়াইয়ের দিকে যুগপৎ তাড়িত করেছিল। যেখানে আগে পুলিশদের কাজই ছিল কেবল শ্রমিক ইউনিয়নের সংগঠকদের, শিল্পে শ্রমিক মালিকানা দাবিকারীদের, বিদ্রোহীদের সমাজতন্ত্রীদের এবং সাম্যবাদীদের পিটিয়ে জেলে পোরা, সেখানে ঐ লড়াই 'মহানন্দা' পর্যন্ত চলল। গণসংগঠনের ব্যাপক বিক্ষোভ শত শত অঞ্চলে বাক-স্বাধীনতা এনে দিল। এর সাথে তাল মিলিয়ে চলল দিনে ৮ ঘন্টা কাজের, সামাজিক নিরাপত্তা, বেকারত্ব ও অক্ষমদের বীমা এবং কারখানায় যৌথ দরকষাকষি (সিবিএ) করার অধিকারের লড়াই। প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অধিকার তার যত ভয়াবহ সীমাবদ্ধ কিংবা অপ্রতুল হোক না কেন, একটি শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা ও ক্ষমতার বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের কারণেই অন্তত অস্তিত্বটুকু রাখতে পারছে।

'অপরাধী চক্র' সিআইএ-র স্বাধীনতা ?

(সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি কার্যত ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি, সংক্ষেপে-সিআইএ)। অন্যান্য স্বাধীনতার মত বাক- স্বাধীনতাও নির্ভরশীল পরিস্থিতির ওপর।

www.pathagar.com

সামাজিক ও শ্রেণীগত পরিপ্রেক্ষিত বিচারেই এর অস্তিত্ব দেখা দেয়- এটা 'গণতন্ত্রের' পক্ষেও সত্য। এটা যখন আমরা বুঝি তখন 'ন্যাট হ্যানটফের মত কলাম লেখনের ভুল যুক্তিগুলোকে এড়াতে পারি। সিআইএ-র ক্যাম্পাসে এবং মিলিটারী রিক্রুটারদের বিরুদ্ধে যখন বাম কর্মীরা নাগরিক প্রতিবাদ জানায়, তখন এই লোক তার বিরুদ্ধে অবিরাম কলম চালান। হ্যানটফ বলেন, প্রতিবাদকারীরা নাকি সেসব ছাত্রদের অধিকারে আঘাত করছে যারা ঐ রিক্রুটার বা নিয়োগদানকারীদের সাথে কথা বলতে চায় (যেন বা ছাত্রদের প্রতিবাদ চলার সময় ছাড়া আর কখনও কথা বলার সুযোগ নেই!)। হ্যানটফ খুবই উদ্বিগ্ন হন যে, এতে সিআইএ-র অধিকার খর্ব হচ্ছে।

বাক-স্বাধীনতার প্রতি অমন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মানুষের ভোগান্তি আর সামাজিক ন্যায়বিচারের কোন সম্পর্কই নেই। এর সম্পর্ক না আছে শ্রেণী-ক্ষমতা ও রাষ্ট্র-ক্ষমতার বাস্তবতার সাথে, না আছে সিআইএ-র খুনী চরিত্রের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের সাথে। ওই বাক-স্বাধীনতার ভড়ংয়ের সাথে সিআইএ-র দুনিয়া জোড়া জনবিরোধী ক্রমাগত ভয়াবহ অত্যাচার- নিষ্পেষণের স্বীকৃতির কোন লক্ষণ নেই। কি নেই সিআইএ-র ? ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ২৫,০০০ কোটি টাকা) বার্ষিক বাজেট, সাথে আছে হাজারে হাজারে ডেথ স্কোয়াড, দুনিয়াজুড়ে গণতান্ত্রিক শক্তি ও দরিদ্র জনগণের বিরুদ্ধে জীবননাশী যুদ্ধের বন্দোবস্ত, শত শত প্রকাশনা সংস্থা, সংবাদ সংস্থা, ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ আর নিজেদের হাজারো দালালকে দিয়ে মিথ্যা খবর পরিবেশন-সবই অবলীলায় চলে। সিআইএ-র 'বাক-স্বাধীনতা' টাকা আর ক্ষমতার জোর খুব ভালভাবেই আছে। অন্তত যারা সিআইএ-র কর্মকাণ্ডকে প্রতিরোধ করে তাদের থেকে বহুগুণ বেশী। হ্যানটফ অধিকারকে তার আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা থেকে আলাদা করে দেখেন। তাই তার কথা অনুযায়ী 'সিআইএ'কে ক্যাম্পাসের কোন একটা গণতান্ত্রিক সংলাপে অংশ নেয়া আর দশজনের মত এক নজরে দেখতে হবে। বস্তুত, দেশে-বিদেশে বাক-স্বাধীনতা লংঘনকারীদের এক পাণ্ডা হল 'সিআইএ'। যারা হ্যানটফের একচোখা নীতিকে মেনে নেবেন তারা 'সিআইএ' বন্ধ হলে যে লাখো মানুষের বাক-স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া যাবে, আর এর সমস্ত এজেন্টদের অত্যাচার-নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে এ ব্যাপারে কিছু বলবার মুখ থাকবে না। তারা নীরব থাকবেন-তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে 'সিআইএ'-র আক্রমণ আর হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে গিয়ে মুক্ত স্বাধীন হবার ব্যাপারে।

ক্যাম্পাসে সিআইএ রিক্রুটমেন্ট জোর বিক্ষোভ করে সীমিত করা হয়েছে। এতে আন্দোলনকারীরা উল্টো স্রোতে গেছে কিন্তু তারা গণতান্ত্রিক সংগ্রামের এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। বিক্ষোভকারীরা কলেজ ক্যাম্পাসে 'সিআইএ'-র বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখোমুখি হয়েছেন-ঝড় তুলেছেন, সারা দুনিয়ার স্বৈরশক্তিকে মদদ দানকারীর দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে স্বাধীনতাকে বরং বিস্তৃতি দিয়েছেন-একে খর্ব করার প্রশ্নই ওঠে না। হ্যাঁ, এখানে প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে কিছু আক্রমণের অভিযোগও আছে। কিছু উচ্চবিত্ত ছাত্র আছেন যারা সিআইএ'র সাথে নিযুক্ত হয়ে রাজনৈতিক অপরাধীর পেশায় যেতে আগ্রহী-তাদের সাথে কিছু বিরোধ লেগেই যায় ঐটুকু আক্রমণ বা সন্ত্রাসই হেনটফের কাছে 'সিআইএ'-সমস্ত সন্ত্রাসী কার্যকলাপের চাইতেও বেশী বলে মনে হয়। আমরা যদি হেনটফের পক্ষ নেই তাহলে আমাদের কোন ডাইরেক্ট একশনে যাওয়া চলবে না, প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার বিরুদ্ধে ক্ষমতাহীনদের কোন নাগরিক বিক্ষোভও চলবে না। কারণ তাতে 'সিআইএ'র রিক্রুট করার অধিকার লংঘিত হবে। ক্ষমতা আর সম্পর্কের

www.pathagar.com

পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখতে ব্যর্থ হবার কারণেই হেনটফ সিআইএ-র 'বাক-স্বাধীনতা' নিয়ে এক কিম্ভূতকিমাকার অবস্থান নিয়েছেন- আরও নোংরাভাবে বলছেন- এর কাজের স্বাধীনতার কথা। এটা ঐ 'নিরপেক্ষতার তত্ত্বকে' ছুঁড়ে ফেলার মতই শোনায় যাতে বলা হয়- বেচারা কর্পোরেট মিডিয়া বসদের বাক-স্বাধীনতা সীমিত-কারণ এটা তাদের অন্যদের মঞ্জুর করতে হয়।

অধিকতর গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম

রিগ্যান-বুশ-ক্লিনটনের যুগ আমাদের একটা জিনিসই শিখিয়েছে, আমাদের স্বাধীনতার ততক্ষণ কোন গ্যারান্টিও নেই, নিরাপত্তাও নেই, যতক্ষণ আমরা আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ হয়ে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন না করি। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এ শিক্ষাই দেয় যে আমাদের অধিকার হল সেই বস্তু যা কখনই 'সংরক্ষিত' নয়। বরঞ্চ তার জোরদার ব্যবহার করে একে বিস্তৃত করতে হবে। শারীরিক শক্তি যেমন চর্চায় বাড়ে তেমনি আমাদের রাজনৈতিক শক্তি যোগ্যতাও ক্রমাগত চর্চা ও তীর্থ করার মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পাবে। বাকস্বাধীনতার প্রতি আমাদের যে সম্মান তা আরও স্পষ্ট চেহারা এবং সুদৃঢ় চর্চা আর প্রয়োগ দাবী করে। হয় এর ব্যবহার করতে হবে, নয়ত একে আমরা হারাব। গণতন্ত্র ফুলদানিতে করে দেয়া কোন 'ঠুন্‌কো উপহার' নয়। বরঞ্চ এ হলো বহুযুগের সম্পদশালীদের স্বার্থে অগণতান্ত্রিক চেহারার সাথে জনগণের স্বার্থের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বহুমাত্রিকভাবে বিচিত্র গড়ে ওঠা এক ক্রমাগ্রসরমান প্রক্রিয়া। মিডিয়ার পণ্ডিতদের কথা অনুযায়ী 'গণতন্ত্রে প্রবেশাধিকার' আছে কিনা এই ভয়ে না থেকে আমরা বরং সংগ্রাম করে যাব জনগণের আরও ক্ষমতার জন্য শ্রমিক ও মানবসেবার জন্য আরও মুক্তি, বর্ণবাদ, যৌন ব্যবসা, সমরবাদ, পরিবেশকে ধ্বংস করে দেয়ার পুঁজিবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে এ সংগ্রাম চলবে।

এ জন্য আমাদের দুনিয়া জুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের বিরোধিতাকে আরও জোরদার করতে হবে। আমাদের জোর দাবী হতেই হবে শুধু মুনাফার জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, উৎপাদনশীল সেবা ও খাতে গণতান্ত্রিক মালিকানা, নানা আদর্শের বৈচিত্র্য সহ সরকার বিরোধীদের মূল ধারার প্রচার মাধ্যমে ঠাঁই দিতে হবে, টেলিভিশন-রেডিওতে দর্শক-শ্রোতার রুচির নিয়ন্ত্রণ চাই। আমাদের প্রতিটা আন্তরিক চেষ্টায় আমরা দেখতে শিখব কেমন করে বহু লোকের স্বার্থের বিরোধিতা করতে ভয়ংকরভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত গুটিকয়েক লোক নিযুক্ত, এক কথায় আরও গণতন্ত্রের জন্য এক সংগ্রাম, এমন এক সংগ্রাম যা প্রত্যেকের সামাজিক অবস্থার অগ্রগতি আনবে, সমাজের জন্য সমাজের স্বার্থে সামাজিকভাবে সচেতন মানুষের সমাজের সম্পদরূপে নিয়োজিত হওয়ার সংগ্রাম এটা ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীর লোভ থেকে শ্রেয়। সমানাধিকারের দিকে, উন্নয়নের দিকে এ লড়াইকে যেতে হলে-'সিআইএ'র স্বাধীনতা একটু কমতি হবে-কিন্তু তাতে আমাদের আর সকলের স্বাধীনতা বাড়বে বৈ কমবে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাক-স্বাধীনতা কোন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তির জন্য বা তাদের অনুচরদের জন্য সীমিত নয় বরং সব মতের মানুষের জন্যই এটি সহজলভ্য। ❑

২৬ অক্টোবর '০১

ভাষান্তর ঃ বিনতে রাবেয়া

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া কারসাজি

(তিন)

আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংবাদে পক্ষপাতদুষ্টতা এড়ানো যায় না। এছাড়া ডেটলাইন প্রেসার, বিচার-বিশ্লেণে মানবিক ভুলভ্রান্তি, আয়-ব্যয়ের সীমাবদ্ধতা এবং জটিল সংবাদ বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রেও সংবাদ বিকৃতি ঘটতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায়, কোন যোগাযোগ ব্যবস্থাই সকল বিষয়ের সকল সংবাদ উপস্থাপন করতে সক্ষম নয়। সুতরাং বাছ-বিচার অবশ্যই প্রয়োজন। আমার বক্তব্য হচ্ছে, মিডিয়ার ভুল ব্যাখ্যা নিছক নির্দোষ ভুলভ্রান্তি (innocent error) নয়, যা প্রতিদিনের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে, এসব ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা তো আছেই। এ কথা সত্য যে, সংবাদপত্রকে সিলেক্টিভ হতে হয়, কিন্তু এই বাছাই প্রক্রিয়ায় কোন নীতির প্রশ্ন রয়েছে কিনা তা-ই বিচার্য। সংবাদ মাধ্যমের পক্ষপাতদুষ্টতা গতানুগতিক বা এলোমেলো প্রক্রিয়ায় ঘটে না, এর মধ্যে একটি সমান্তরাল পৌনঃপুনিক নির্দেশনা কাজ করে। এখানে শ্রমিকের ওপর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষপাত, কর্পোরেট সমালোচকদের ওপর কর্পোরেশনে, নিম্ন আয়ের মাইনরিটিদের ওপর সচ্ছল শ্বেতাঙ্গদের, আন্দোলনকারীদের ওপর আমলাদের, বাম তৃতীয় দলের ওপর দুই দলের একচেটিয়া কর্তৃত্ব, পাবলিক সেক্টরের উন্নয়নের চাইতে প্রাইভেটাইজেশন এবং মুক্তবাজারের নামে 'সংস্কার-এর ওপর জোর দেয়া, তৃতীয় বিশ্বের বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রসমূহে মার্কিন কর্পোরেট আধিপত্য বজায় রাখার পক্ষাবলম্বন এবং জিম হাইটাওয়ার এবং রালফনাদের-এর মত প্রগ্রেসিভ ও জনপ্রিয় বিশ্লেষক কলামিস্টদের ওপর অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল লিমবাও এবং জর্জ উইলদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন ইত্যাদি। প্রধান ধারার সংবাদ মাধ্যমগুলো (The corporate mainstream media) এমন বিষয়গুলোতে খুব একটা হস্তক্ষেপ করে না যাতে করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন শক্তিগুলো বিপাকে পড়ে, তাহলে এসব মিডিয়ার মালিক এবং বিজ্ঞাপনদাতারাও সমস্যায় পড়তে পারেন। এসব কারণে সংবাদ মাধ্যমগুলো কয়েকটি মিডিয়া কারসাজির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

এগুলো হচ্ছেঃ

www.pathagar.com

ক. সংবাদ গায়েব করা (Suppression by Omission)- এটি সংবাদ কারসাজির সবচেয়ে প্রচলিত ধারা। সংবাদ বিষয়টিকে একেবারেই অন্তরালে রাখা, যাতে কখনও কখনও সংবাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যাকে পাশ কাটানো নয়, পুরো বিষয়টিকে গায়েব করে দেয়া হয়। যে রিপোর্টটি প্রকাশিত হলে ক্ষমতাসীনদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় তাদের প্রকৃত চেহারা দিনের আলোয় স্পষ্ট হয়ে পড়ে , তার জন্যই এই প্রক্রিয়া। এ কারণেই কোন উন্মাদের দ্বারা টাইলেনল বিষক্রিয়ায় কয়েকজনের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা হয়ে ওঠে বড় সংবাদ। অন্যদিকে কারখানার যান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে ফুসফুসে বিষক্রিয়ায় হাজার হাজার শ্রমিকের আক্রান্ত হওয়ার মত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দশকের পর দশক ধরে অনুদঘাটিত ও অনালোচিত থেকে যায়। কারণ এসব কারখানার মালিকরাই বড় বড় মিডিয়ার মালিক। এসব মিডিয়া প্রায়শই প্রকৃত সংবেদনশীল সংবাদ সম্পর্কে একেবারেই চুপ থাকে অথবা কালক্ষেপণ করে থাকে। এ কারণেই ১৯৬৫ সালে সিআইএ এবং মার্কিন সামরিক সাহায্যে ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইন্দোনেশীয় সামরিক বাহিনী যখন প্রেসিডেন্ট সুকর্নোকে ক্ষমতাচ্যুত করে ইন্দোনেশীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং সহযোগী দলগুলোকে নির্মূল করে, পাঁচ লক্ষাধিক লোক হত্যা করে (কারও কারও মতে দশ লাখ), এবং নাৎসীদের হত্যাযজ্ঞের পর এসেই সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক গণহত্যা বলে ধরে নেয়া যায়। এ সময় জেনারেলরা কমিউনিস্টদের হাতে গড়ে ওঠা শত শত লাইব্রেরী, হাসপাতাল, বিদ্যালয় ও কমিউনিটি সেন্টার ধ্বংস করে দেয়। এখানকার ইতিহাসের সবচেয়ে রোমহর্ষক ঘটনা ছিল এটি, কিন্তু এই ঘটনাটি সংবাদ হিসেবে উঠে আসতে টাইম ম্যাগাজিনের তিন মাস সময় লেগে যায় এবং নিউইয়র্ক টাইমসে এ সংবাদ প্রকাশিত হয় আরও এক মাস পরে তাও ইন্দোনেশিয়া সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রচারিত তাদের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন সম্বলিত সম্পাদকীয়র সাথে (৪ এপ্রিল ১৯৬৬) যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থিত দক্ষিণপন্থী দেশসমূহের প্রধান সংবাদ মাধ্যমেও এ ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়া হয় জনগণের আগ্রহ ও সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে।

খ. লক্ষবস্তুকে আক্রমণ করে নষ্ট করে দেয়া- কখনও হয়তো কোন ঘটনা সংবাদে উঠে আসে না। যদি মনে হয় যে এতেই যথেষ্ট নয়, তখন মিডিয়া একে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে সচেষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিগত ৪০ বছর ধরে সিআইএ সরাসরি ফ্রান্স, ইন্দোচায়না, আফগানিস্তান এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় মাদক চোরাচালানের সাথে জড়িত থাকে। এই কর্মকাণ্ড মাঝে-মধ্যেই কংগ্রেসী তদন্তের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়-সত্তরের দশকে কংগ্রেস সদস্য পাইকস-এর কমিটি এবং আশির দশকে সিনেটর কেরীর তদন্ত রিপোর্টগুলো অবশ্যই একেকটি পাবলিক রেকর্ড, কিন্তু মিডিয়া এসব রেকর্ড সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ তো করেইনি, উপরন্তু তারা বিরামহীনভাবে এবং ন্যক্কারজনক কায়দায় এসব তদন্তের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে। ১৯৯৬ সালের আগস্টে 'সান জোস মার্কারী নিউজ' নামক একটি পত্রিকা সিআইএ-কন্ট্রা কেলেঙ্কারির ওপর ইন ডেপ্‌থ সিরিজ প্রকাশ করলেও প্রধান মিডিয়াগুলো এ সম্পর্কে একেবারেই বিরত থাকে। কিন্তু এই সিরিজগুলো যখন ওয়েব পেজের মাধ্যম সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, তখন বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ায় বড় মিডিয়াগুলো তখন আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়। ওয়াশিংটন পোস্ট এবং নিউইয়র্ক টাইমস-এ আর্টিকেল প্রকাশিত হতে পারে তা নেটওয়ার্ক টেলিভিশসহ অন্যান্য

www.pathagar.com

মাধ্যমে বলা হয় এই চক্রান্তের সাথে সিআইএ-র সংশ্লিষ্টতার কোন কারণ নেই, এবং মার্কারী নিউজ সিরিজসমূহকে তারা অপসাংবাদিকতা (bad journalism) বলে ঘোষণা করতে থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে জনগণের আগ্রহ তাদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এবং জনগণকে ধোঁকা দেয়ার হীন প্রচেষ্টা ধরা পড়ে যায়। কারণ, মার্কারী নিউজ সিরিজ তাদের বছরব্যাপী তদন্ত রিপোর্টে নির্দিষ্ট এজেন্ট এবং ডিলারদের সুস্পষ্ট তথ্যসহ ওয়েবে ছেড়ে দেয়ার পর আনুমানিক প্রমাণাদি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে মেইনস্ট্রিম মিডিয়াগুলো তাদের মিথ্যাচার চালিয়েই যেতে থাকে এবং বলতে থাকে, এসব প্রমাণের কোন অস্তিত্ব নেই। তাদের বিরামহীন প্রচারণার বিষয় ছিল একটিই-মাদক চোরাচালানের সাথে সিআইএ-র কোন সংশ্রব নেই।

গ. লেবেলিং-কোন বিষয়ের ওপর লেবেল এঁটে দেয়ার মাধ্যমে উক্ত বিষয় সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই ভাল অথবা মন্দ ধারণার সৃষ্টি করা হয়। কয়েকটি পজিটিভ লেবেলের উদাহরণ হচ্ছে 'স্থিতিশীলতা' প্রেসিডেন্টের যোগ্য নেতৃত্ব' এবং 'শক্ত প্রতিরক্ষা'। কয়েকটি নেতিবাচক লেবেল হচ্ছে 'বামপন্থী গেরিলা' 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী' ইত্যাদি। নেতিবাচক লেবেলিংয়ের আরও উদাহরণ দেয়া যায়, ১৯৯৮ সালের জুনে 'প্রোপজিশন ২২৬' নামক একটি সংগঠন শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে, ওরা ইউনিয়ন লিডারদের ইউনিয়ন বস" বলে লেবেল এঁটে দিলেও কখনো কর্পোরেট লিডারকে 'কর্পোরেট বস' বলেনি। মিডিয়াগুলোও নিজেদের সম্পর্কে 'লিবারেল মিডিয়া লেবেল দিয়ে থাকে। সামাজিক অগ্রগতিকে নস্যাৎ করার জন্য চাতুর্যপূর্ণভাবে 'রিফর্ম' লেবেলটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গত ৩০ বছর যাবৎ 'ট্যাক্স রিফর্ম' শব্দটি উচ্চবিত্তের ওপর কর কমানো এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর বাড়তি করের বোঝা চাপানোর তকমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ঘ. অগ্রে দায়িত্ব গ্রহণ-ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দাবী রাখে এমন পলিসি সম্পর্কে মিডিয়া প্রথমেই গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা আরোপ করে। ১৯৮০'র দশকে যখন হোয়াইট হাউজ একটি বিশাল আকারের বর্ধিত সামরিক বাজেটের প্রস্তাব করে বসে, তার পূর্বেই অনেকে বিশাল সামরিক বাজেট কমানোর পক্ষে মত দিয়েছিল, কিন্তু মিডিয়াগুলো তাদেরকে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না দিয়েই বর্ধিত বাজেটের পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করে। অনুরূপভাবে মিডিয়া সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলতে গিয়ে চটকদার 'রিফর্ম' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে যা ভালভাবে চলছে এমন প্রকল্পকে নস্যাৎ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সোশ্যাল সিকিউরিটি বলতে ত্রিমুখী মানব কল্যাণমূলক কাজকে বোঝায়-প্রথমত অবসরে পেনশন, দ্বিতীয়ত রুটিরোজগার যোগানো ব্যক্তির মৃত্যুতে পরিবারের অন্য শিশুদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধান এবং তৃতীয়ত পেনশনের আগেই যারা অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রতিবন্ধীত্ব বরণ করে তাদের জীবনযাপনে সহায়তা করা। কিন্তু বর্তমানে সংবাদ মাধ্যমে সোস্রাল সিকিউরিটি সম্পর্কে যেসব কভারেজ দেয়া হয় তাতে সামাজিক কল্যাণমূলক উক্ত বিষয়গুলোর উপস্থাপন দেখা যায় না। তদস্থলে মিডিয়ার অবস্থান থাকে বিতর্কিত ও সন্দেহজনক।

ঙ. বিষয়বস্তু সীমিতকরণ - বক্তব্য উপস্থাপনে মিডিয়ার পদ্ধতি ও স্টাইল দেখে অনেকে

www.pathagar.com

চমৎকৃত হয় তবে এতে সারবস্তু থাকে অতি সামান্য, নির্বাচনের রিপোর্টিং হচ্ছে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যখন রাজনৈতিক প্রচারণা ঘোড়দৌড়ের পর্যায়ে নেমে আসে প্রচারণা ঃ কারা নামছে ? কে পাবে মনোনয়ন ? কে জিতবে নির্বাচনে ?

নিউজ কমেনটেটররা নাট্য সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা নির্দিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে অতুলনীয় ইমেজ গড়ে তুলতে অতিশয় পারঙ্গম। কিন্তু প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে উপস্থাপনা থাকে খুবই অপর্যাপ্ত। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমন্বিত করতে প্রার্থীকে রাষ্ট্রীয় বিষয়ের ওপর যুক্তিতর্কে অবতীর্ণ করার প্রক্রিয়া কদাচিত দেখা যায়। শ্রমিকদের বড় বড় ধর্মঘটগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যায় বিষয়ের সীমিতকরণ প্রচেষ্টা। সেক্ষেত্রে কতদিন ধর্মঘট হল কোম্পানী ও জনগণের কত ক্ষয়ক্ষতি হল এবং ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রকারান্তরে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু সমস্যার প্রকৃত সমাধানের দিকে দৃকপাত করা হয় না। বেতন-ভাতা কর্তন, চাকরির পদমর্যাদা হ্রাস করা, অথবা নতুন কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনীহা ইত্যাদি বিষয়ে কোন জোরালো ভূমিকা দেখা যায় না।

চ. মিথ্যা ভারসাম্য আরোপ-মিথ্যা ভারসাম্য আরোপের একটি উদাহরণ হচ্ছে-১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর বিবিসি ওয়ার্ল্ড রিপোর্টে প্রচারিত প্রতিবেদন "a history of violence between Indonesian forces and Timorese guerrilla শিরোনামের প্রতিবেদনে একটি অসম যুদ্ধকে সমান্তরালভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে বলা হয় "Killing on both sides" এবং এর মাধ্যমে একটি মিথ্যা ভারসাম্য আরোপ করে বিবিসি'র উপস্থাপক সংবাদকে ডিসটর্ট করেছেন।

ছ. ফ্রেমিং-সবচেয়ে কার্যকর অপপ্রচারণাগুলো (Propaganda) মিথ্যা তথ্যের চাইতে ফ্রেমিং এর ওপরই বেশী নির্ভর করে। সত্যকে উপেক্ষা না করে একে আবদ্ধ করে ফেলা। অতিরঞ্জন ও অলঙ্করণের মাধ্যমে উপস্থাপক মূল বিষয়ের বাইরে না গিয়েও একটি অভীষ্ট চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়। সংবাদকে প্যাকেজ করণের মাধমে এক্সপোজার সংখ্যা, সংবাদের স্থান (প্রথম পৃষ্ঠা, শেষ পৃষ্ঠা ইঃ) উপস্থাপনার স্বরভঙ্গি, হেডলাইন এবং ছবি, ব্রডকাস্ট মিডিয়ার ক্ষেত্রে শব্দ ও দৃশ্যের সু-সমন্বয়-এর ওপর ফ্রেমিং নির্ভরশীল। সংবাদ পাঠক নিজেকেই প্রাথমিক অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। নানারকম অঙ্গভঙ্গি ও স্বর পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশিত তথ্যকে অধিক কার্যকর ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়।

কেন, এ প্রশ্ন করতে নেই-সংবাদ হিসেবে অনেক রিপোর্টই উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু খুব কমসংখ্যক বিষয়েরই ব্যাখ্যা করা হয়। আমরা শুধু মেইন স্ট্রিম পণ্ডিতদের নির্মিত বিশ্বকে দেখার জন্যই এখানে আমন্ত্রিত। ঘটনার মুহূর্তটিকে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিত্বের মন্ত্রে, পারিপার্শ্বিকতায়, দ্বিধাময়তায় এবং ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা কখনো শক্তিশালী শ্রেণীস্বার্থের অনুকূলে নয়, তথাপি আমাদের মধ্যে তা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিষয়বস্তু এবং স্বরের নৈর্ব্যক্তিকতার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বাগ্মিতার মুখোশ ধারণ করে প্রকৃত বিষয়কে কৌশলে পরিহার করার মোক্ষম পদ্ধতি। মোটকথা, সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা ব্যর্থতার নয়, বরং দক্ষতার এড়িয়ে যাওয়ার সাফল্য। তাদের কাজ তথ্য পরিবেশন নয় তথ্য গোপন করা। গণতান্ত্রিক ডিসকোর্সগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার

www.pathagar.com

বদলে এগুলো উহ্য রাখা। এর কাজ হচ্ছে আমাদেরকে নিজেদের মত করে বিশ্বকে ভাবার সুযোগ দানের বদলে সে নিজেই তার মতামত আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। আমরা যখন বুঝি সংবাদ বাছাই প্রক্রিয়াটি তাঁদের স্বার্থেই বিবেচনা করা হয় যাদের ক্ষমতা, অবস্থান ও শক্তি রয়েছে। মিডিয়া এ কাজটি শাসক শ্রেণীর পক্ষে অতি দক্ষতা ও সৌকর্যের সাথেই সম্পাদন করছে। ❑

২৬ অক্টোবর '০১
ভাষান্তর ঃ জামাল উদ্দিন বারী

এই পিতার জন্য সান্ত্বনার বানীটি কি হতে পারে।

www.pathagar.com

‘আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি’ গ্রন্থ থেকে

নাহিদ

শহীদ এক আফগান কিশোরী

আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট শাসকরা ক্ষমতা দখলের আগেই সর্দার দাউদ নারীমুক্তির নামে আফগান ধর্মপ্রাণ নারীদের মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে লাম্পট্যের লেলিহান শিখার মধ্যে টেনে আনার পরিকল্পনা সমাপ্ত করেছিলেন। সর্দার দাউদের পূর্বসূরি আমানুল্লাহর আমলেও নারী স্বাধীনতার সস্তা শ্লোগান তুলে ইসলামী পর্দার বিধানকে অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করার হীন প্রয়াস চালানো হয়েছিল। কিন্তু প্রতিটি ঘৃণ্য অপচেষ্টাই আফগান জনসাধারণের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দুর্জয় ইসলামী চেতনার সামনে টিকতে পারেনি। সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হয়ে গেছে শক্তিশালী ধর্মীয় প্রতিরক্ষা ব্যুহের সামনে এসে। এরপর যখন কমিউনিস্টরা আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখল করে বসল, তখন ফ্রি-সেক্স এর নামে সেদেশের যুবা-তরুণদের বিপথগামী করার উদ্যোগ নেয়া হয়। কমিউনিস্ট পার্টির লোকজন তাদের মহিলা আত্মীয়দের নিয়ে ক্লাবগুলোতে আসতে শুরু করলেন। রাস্তাঘাটে, শপিং সেন্টারে নারীদের অবাধ ও অসংযত চলাফেরা বৃদ্ধি পেল। দেশীয় কমিউনিস্টরা নিজেদের আত্মীয় মহিলাদের ঘরের বাইরে বের করে এ কথাই বুঝাতে চাইতেন যে, আফগানিস্তানে এখন অবগুণ্ঠনবতী মহিলাদের দিন ফুরিয়ে গেছে। অবরোধবাসিনী নারীসমাজ এবার মুক্ত বিহঙ্গের মত ডানা মেলে উড়তে শুরু করেছে কমিউনিজমের ভুবনে।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নারী স্বাধীনতার চরম রূপ আফগানিস্তানের প্রগতিবাদী নাস্তিকরা দেখতে পেল। তাদের মা, বোন, কুলবধূ ও কন্যারত্নরা কেবল রুশ দখলদার বাহিনী ও অধিকৃত আফগানিস্তানে সমাগত সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের হাতে হাত রেখে ড্যান্সই করছে না, বরং রুশীয় মুরুব্বীদের বিছানায়ও তাদের যেতে হচ্ছে নিয়মিত। যখন তখন কেনা বাঁদীর মত ব্যবহার করছে ওরা মুক্তমনা আফগান রমণীদের। আফগান কমিউনিস্টরা যেহেতু রুশীয় অতিথিদের সব ধরনের চাহিদাই পূরণ করাকে নিজেদের পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করে, অতএব, সোভিয়েত অতিথিরাও খোলাখুলিভাবেই মদ ও

www.pathagar.com

নারীর প্রয়োজন তাদের অজ্ঞাবহ দালালদের কাছে তুলে ধরতে লাগল। সোভিয়েত বাহিনী ও দেশীয় কমিউনিস্ট বরকন্দাজরা কেবল আফগানিস্তানের স্বাধীনতা বিক্রি করেই তৃপ্ত হয়নি বরং আফগান রমণীদের ইজ্জত সম্ভ্রমও তারা বিকিয়েছে নির্দ্বিধায়। আফগান কমিউনিস্ট পরিবারেও এমন কিছু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সচেতন মহিলা ছিলেন, যারা অন্যায় ও পাপাচারের এ উত্তাল সমুদ্রেও নিজেদের ঈমান ও মর্যাদা নিয়ে কঠিন পর্বতের ন্যায় দৃঢ় হয়ে টিকে থেকেছেন। এমনি এক বোনের নাম নাহিদ। তাঁর পাষণ্ড কমিউনিস্ট পিতা সোভিয়েত প্রভুদের হৃদয়-মন জয় করার উদ্দেশ্যে তাঁকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু নাহিদ ওদের লাম্পট্যের আসরে আত্মাহুতি না দিয়ে পরিণত হয়েছে মুসলিম নারী জাতির জন্য পথপ্রদর্শক সুউচ্চ আলোর মিনারে। কিশোরী নাহিদের এ ঈমানদীপ্ত ঘটনা বিগত ৮৮-এর ২ সেপ্টেম্বর ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত এক সভায় ইসলামাবাদের ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক জনাব আসলাম সিরানী বর্ণনা করেছিলেন। এ ঘটনা সম্পর্কে আরও কিছু অজানা তথ্য উদঘাটনের চেষ্টা করেও সফল হতে পারিনি, তবে আফগান সাংবাদিক গুলেসপন খান পারভীন নামক আরেক তরুণীর কাহিনী শুনিয়েছেন, যা অনেকটা নাহিদেরই ঘটনার মত।

ঈমান যার হিমালয়কেও হার মানায়

'নাহিদ' রাজধানী কাবুলের ঐতিহ্যবাহী রাবেয়া বলখী বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। তার বাবা ফরিদ খান ছিলেন কাবুলের কমিউনিস্ট পার্টির একজন উঁচুদরের পাণ্ডা। ছোটবেলায় মা মারা যাওয়ার নাহিদ হয়ে উঠেছিল স্বভাবতই একটু ধর্মভীরু ও নম্র প্রকৃতির মেয়ে। তাছাড়া মেধাবী ছাত্রী হিসেবে তাঁর সুনাম সারা শহরময় ছড়িয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে রূপ-সৌন্দর্যও দান করেছিলেন অন্য দশ জনের চেয়ে বেশী। পরিবেশ ও শিক্ষা-দীক্ষার গুণে নাহিদের মনে দেশপ্রেম ও ধর্ম সচেতনতা ছোটবেলা থেকেই শিকড় গেড়ে বসে। মুক্ত স্বাধীন মুসলিম আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর আগ্রাসন ও খোদাদ্রোহী কমিউনিস্টদের শাসন ক্ষমতা দখলে নাহিদের কোমল হৃদয় আহত হয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে তাঁর মনোভাব চেপে যেতে থাকেন। একজন কমিউনিস্ট নেতার কন্যা হওয়ার সুবাদে বাড়ীতে বসেই তিনি অনেক আগাম সংবাদ ও গোপন পরিকল্পনা জানার সুযোগ পেতেন। অতএব, আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও ইজ্জতের লড়াইয়ের নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের সাথে নাহিদ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং অনেক গোপন তথ্য মুজাহিদদের আগাম জানিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আযাদীর লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি তাঁর স্কুলে সহপাঠিনীদের মাঝেও জিহাদের উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হন। নাহিদের মত সচেতন ছাত্রীদের অব্যাহত প্রচেষ্টারই সুফল হিসেবে গোটা আফগান জিহাদে মুসলিম নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। কাবুলের রাবেয়া বলখী ও সুরিয়া গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা যেদিন আফগান মুজাহিদদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গগনবিদারী শ্লোগান তুলে কাবুলের রাজপথে নেমেছিল, সেদিনই দুশমনরা বুঝে গিয়েছিল যে, গোটা আফগানিস্তান এবার রাজপথে নামবে।

এ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাই একদা রুশ দখলদার বাহিনী ও কারমাল সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের লক্ষ্যে নিজেদের কালো ওড়না উড়িয়ে রাজপথে বের হয়ে

www.pathagar.com

এসেছিল। রুশ বাহিনী এদের বিক্ষোভ মিছিলে গুলী চালিয়েছিল নির্বিচারে। গুলীতে বেশকিছু ছাত্রী হতাহত হয়। সে মিছিলের পুরোভাগে একটি আফগান কিশোরী পতাকা বহন করছিল। সেনাবাহিনীর গুলীতে তার দুটো হাতই অচল হয়ে যাওয়ায় সে তার সহপাঠিনীর হাতে পতাকাটি তুলে দিয়ে বলেছিল ঃ "এটা শক্ত করে ধর বোন। এ তো ইসলামের পতাকা, স্বদেশের আযাদীর পবিত্র ঝাণ্ডা এটা। একে কিছুতেই নিচে নামানো যায় না।" আযাদী ও সম্মানের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত এসব ছাত্রীরা ছিল নাহিদের স্কুলেরই বান্ধবী।

নাহিদদের বাড়ীতে প্রায়ই বেড়াতে আসতো সোভিয়েত সেনা অফিসাররা। তাঁর বাবার সাথে উঁচু পর্যায়ের লোকদের ওঠাবসা, সখ্য। একদিন জনৈক রুশ কর্মকর্তা নাহিদদের বাড়ী এসে নাহিদকে এক নজর দেখে ফেলে। সাথে সাথে সোভিয়েত সেনা কর্মকর্তার মনে একটা কুমতলবের উদয় হয়। নাহিদের বাবা ফরিদ খানকে সে লোকটি বলে ঃ তোমার মেয়ের নাচ দেখতে হবে ফরিদ খান। সেনা অফিসারটি মনে মনে ভাবতে থাকে, এতো খুবসুরত কন্যা ধরে রেখে ফরিদ খান আমাদের সাথে বেঈমানী করছে। তার তো আরও আগেই এ মেয়েটিকে ক্লাবে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। মুক্তচিন্তা ও উদার মনের অধিকারী, প্রগতিশীল কমিউনিস্ট নেতা ফরিদ খানের পক্ষে এ প্রস্তাব গ্রহণ করা ছিল নিতান্ত সহজ। এছাড়া রুশ বাহিনীর সামনে 'না' শব্দটি উচ্চারণ করার মত দুঃসাহস তো কাবুলের সরকার প্রধানেরও নেই। কিন্তু ফরিদ খান খুব ভাল করেই জানেন যে, তাঁর মেয়ে নাহিদকে কোনক্রমেই ক্লাবে নিয়ে নাচানো যাবে না অতএব, খুবই নরম স্বরে ফরিদ খান বলে চললেন ঃ নাহিদ খুব লাজুক মেয়ে। ক্লাবে গিয়ে সে নাচতে রাজি হবে না। রুশ কর্মকর্তা ধমকের সুরে বললেন ঃ তুমি না কমিউনিস্ট। ফরিদ খান দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন ঃ জি, অবশ্যই আমি কমিউনিস্ট। রুশ কর্মকর্তা অত্যন্ত রাগতস্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন ঃ না, তুমি কমিউনিস্ট হতে পারনি। কোন কমিউনিস্টই এমন সেকেলে হতে পারে না। কোন কমিউনিস্টের স্ত্রী-কন্যাই বিদ্রোহী মৌলবাদীদের মত প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে না। আমাদের মেয়েরা তো স্বাচ্ছন্দ্যে নেচে-গেয়ে ক্লাবগুলোকে মাতিয়ে রাখে। যদি আসলেই তোমরা দেশের সত্যিকার উন্নতি আর সমৃদ্ধি চাও, তবে পাক্কা কমিউনিস্ট হয়ে যাও। নিজেদের স্ত্রী, কন্যাদের তথাকথিত লজ্জা-শরমের শিকল মুক্ত করে স্বাধীনতার স্বাদ নিতে দাও। এ ব্যাপারেই তো আমরা এতদূর থেকে তোমাদের সহায়তায় ছুটে এসেছি।

রুশ কর্মকর্তার এসব কথা শুনে ফরিদ খান খুবই লজ্জিত হলেন। রুশ সেনা অফিসারটি ফরিদ খানকে প্রগতিশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে নাহিদকে ক্লাবে নিয়ে যাওয়ার কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। নিজেকে পাকা কমিউনিস্ট প্রমাণিত করার আকাংক্ষার পাশাপাশি রুশ প্রভুদের অসন্তুষ্টির ভয়ও ফরিদ খানের মনে। মেয়েকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন তিনি। নাহিদ যদি ক্লাবে গিয়ে রুশ সৈন্যদের সাথে একটু নাচতে সম্মত হয়, তাহলে তার বাবার পদমর্যাদা বাড়বে। বৃদ্ধি পাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তার সম্পর্কের সকল সুফল। এসব শুনে নাহিদ ভেতরে ভেতরে অগ্নিদগ্ধ হতে থাকে। সে অত্যন্ত শান্ত অথচ কঠোর উচ্চারণে বাবাকে বলে, আপনাকে আমি খুব ভালোবাসি আর শ্রদ্ধা করি বলেই একজন খোদাদ্রোহী নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও আপনার সাথেই আমি এখনও বসবাস করছি। আমি ভাবতেও পারি না যে, কোন জন্মদাতা পিতা

www.pathagar.com

এত আত্মমর্যাদাহীন হতে পারে। আপনি তো শুধু ইসলামই ত্যাগ করেননি, বরং আমাদের দেশীয় এবং সামাজিক নিয়ম-নীতিগুলো পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছেন।

ফরিদ খান তার কিশোরী কন্যাকে স্নেহমাখা গলায় বুঝাতে শুরু করেন ঃ "শোন্ মা নাহিদ, তুমি বেশী সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ। ইসলাম একটা মধ্যযুগীয় আদর্শ। অনেক পুরানো কিছু নীতিকথা। এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ী সরলমনা জনসাধারণকে শোষণ করার উদ্দেশ্যে এসব বিধিনিষেধের জাল পেতেছে। দেড় হাজার বছর আগে একসময় ইসলাম হয়ত আধুনিক একটা জীবনাদর্শ হিসেবে সফল হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে বর্তমান উন্নতি ও প্রগতির যুগে সেটিই আঁকড়ে রাখতে হবে কেন ? কী করে সম্ভব হাজার বছর আগের একটা আদর্শ এ সময়েও অনুসরণ করে চলা! নাহিদ, তুমি কি কোনদিন চিন্তা করে দেখেছ। লজ্জা-শরম ও শালীনতার দোহাই দিয়ে আফগান নারী সমাজের ওপর কী পরিমাণ নির্যাতন চলছে। এখন তো নারীর স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। কল-কারখানায় পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। সভা-সমিতিতে মহিলারা অবাধে যাতায়াত করছে। কিন্তু এসব মৌলভীরাই আবার ইসলামের নামে স্বদেশী নারীসমাজকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। যদি তুমি নিজকে সময়ের সাথে পরিচালিত না কর তাহলে অনেক পেছনে পড়ে যাবে। আমি চাই তুমি সামাজিক হও। তুমি যতটুকু সুন্দরী সে পরিমাণ সামাজিকতা যদি তোমার মাঝে সৃষ্টি হয়, তাহলে শুধু তোমার বাবার মর্যাদাই বাড়বে না, মনের মত সঙ্গী পাবে তুমি। বড় বড় সোভিয়েত কর্মকর্তারাও তোমাকে বিয়ে করার জন্যে ঘুর ঘুর করবে।

তার বাবা যে এত বেশী প্রগতিশীল হয়ে গেছে, আত্মমর্যাদাবোধ বা সামাজিক মূল্যবোধ বলতে আর কিছুই যে তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই, এ বিষয়টি এত স্পষ্টভাবে আর কখনও ধরা পড়েনি নাহিদের কাছে। নিজের কোমল হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পেয়েও নাহিদ খুবই স্বাভাবিক হয়ে বলল ঃ "আপনি যে জীবনাদর্শকে মধ্যযুগীয় ও প্রাচীন বলছেন, সে জীবনাদর্শই নারী জাতিকে ঐ মর্যাদা দিয়েছে, যা আমেরিকা আর রাশিয়াও দিতে পারেনি । ইসলামে মা, বোন ও কন্যার যে সম্মান রয়েছে, দুনিয়ার অন্য কোন আদর্শে, ধর্মে বা মতবাদে কি সে মর্যাদা দেয়া হয়েছে তাদের ? স্ত্রীকে যে অধিকার ইসলাম দিয়েছে তার কি কোন তুলনা হয়? আপনার বক্তব্য শুনে তো আপনাকে বাবা বলে ডাকতেও আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। আপনি নিজের দ্বীন ও ঈমান বিক্রি করেছেন। নিজের মাতৃভূমির স্বাধীনতা বেচে দিয়েছেন। এখন কন্যার মান-ইজ্জতও বিকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন। আপনি কি চান যে, আপনার কন্যা নাস্তিক কাফেরদের সামনে নৃত্য করুক। তাদের হাতে হাত রেখে মাখামাখি করুক। এসব তো আমি কোন মুসলমানের সামনেও করতে রাজি নই। আপনি এখন আর আমার পিতা হওয়ার যোগ্য নন। আপনি এখন একজন ঈমান বিক্রেতা দেশের স্বাধীনতা ও আপন কন্যার সন্তানের সম্ভ্রমের সওদাগর।"

জবাব শুনে ফরিদ খান খুবই চিন্তিত হল। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল ঃ তোমার ধর্ম তোমাকে কি এ শিক্ষা দিয়েছে যে, নিজের পিতার সাথে এমন বেআদবীসূচক কথাবার্তা বলবে যে পিতা শুধু তোমার উন্নতি ও সুখের কথাই ভেবে থাকে।

ঃ হ্যাঁ, আমার ধর্ম আমাকে এ শিক্ষাই দেয় যে, নিজের জন্মদাতা পিতাও যদি ইসলামবিদ্বেষী ও খোদাবিমুখ মুরতাদ হয়ে যায়, তবে তার পিতৃত্বের বন্ধনও ছিন্ন হয়ে

www.pathagar.com

পড়ে। নাচতে যাওয়ার জন্যে ফরিদ খান নাহিদকে অনেকভাবেই রাজি করাতে চেষ্টা করল। প্রথমে আদর করে, বুঝিয়ে, অবশেষে ধমকের স্বরেও তাকে রাজি করতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত একমতো জোর করেই একদিন ফরিদ খান নাহিদকে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে রুশ সেনা অফিসারদের সাথে রেখে বাইরে চলে যায়।

রুশরা নাহিদকে নাচতে অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়। নাহিদ কিছুতেই নাচবে না। সে সামরিক ব্যক্তিদের সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, আমি মুসলমান। আল্লাহর রাস্তায় আমার এ নগণ্য প্রাণটা দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তোমাদের সাথে আমি নাচে শরিক হব না।

জনৈক রুশ সেনা অফিসার বলল ঃ ইসলাম তো আফগানিস্তান থেকে অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। আর এ ক্লাবের জলসা ঘরে তোমার আল্লাহও আসবেন না। নরম কথায় যদি তুমি রাজি না হও, তবে অন্য রাস্তাও আমাদের জানা আছে।

নাহিদ ঃ তুমিও হয়ত ভুলে যাচ্ছ যে, আমি এক পাহাড়ী মেয়ে। সব ধরনের নিপীড়ন সওয়ার মত মনোবল ও ধৈর্য আমার রয়েছে।

অফিসার ঃ তোমারও মনে হয় জানা নেই যে, রুশীয়দের হাতে এমন শক্তিশালী অস্ত্র রয়েছ, যা বিশালকায় পর্বতকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম।

নাহিদ ঃ আমার আল্লাহ তোমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশী শক্তিশালী। তাঁর এক দুর্বল বাঁদীকে কষ্ট দিতে যদি তোমাদের এতই ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে ইনশাআল্লাহ, আমাকে একটা মজবুত পাহাড়ের চেয়েও শক্ত ও কঠোর দেখতে পাবে।

রুশ সেনা অফিসার নিরাশ হয়ে নির্যাতনের পথই বেছে নিল। নাহিদের গায়ের কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে তার শরীরে জ্বলন্ত সিগারেটের স্যাঁকা দিতে লাগল সৈন্যরা। ছুরির খোঁচায় তাঁর শরীরে নিজের অপবিত্র নাম লিখতে লাগলো সে পাষণ্ড অফিসার। সবকিছু চরম ধৈর্যের সাথে মুখ বুঁজে সয়ে গেল নাহিদ। সে এমন এক পর্বত বনে গেল, যার সাথে টক্কর দিলে যে কেউ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। সারা রাতভর পাশবিক নির্যাতনে শেষরাতের দিকে নাহিদ শহীদ হয়ে গেল। কিন্তু রুশ সৈন্যরা তাকে নাচাতে পারেনি। মৃত্যুর সময় নাহিদ শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দুটো শ্লোগান তুলেছিল। 'আল্লাহু আকবর' ও 'আফগানিস্তান জিন্দাবাদ।' এই ছিল নাহিদের শেষ কথা।

শহীদ হওয়ার পর রুশীয়রা নাহিদের অনাবৃত দেহ একটি মসজিদের চত্বরে ফেলে রাখে। ফজরের সময় আগত মুসল্লিরা লাশটি দেখতে পেলে গোটা এলাকা জুড়ে শোক ও দুঃখের ছায়া নেমে আসে। পরদিন স্কুলের ছাত্রীরা যখন নাহিদের শাহাদাতের সংবাদ পেল, তখন সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের নেত্রী, তাদের বান্ধবীর লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই মসজিদের চত্বরে সমবেত হয়। নাহিদের লাশ ছুঁয়ে তারা জিহাদের শপথ নেয় এবং তার রক্ত দিয়ে মসজিদের প্রাচীরে একজন ছাত্রী লিখে দেয় 'আযাদী'।

এরপর যখন রাবেয়া বলখী স্কুলের ছাত্রীরা নাহিদের লাশ নিয়ে মিছিল করতে থাকে, শুরু হয় গোলাবর্ষণ। একে একে ২৩ জন মুসলিম ছাত্রী শাহাদাতবরণ করে। আহত হয় অনেকে। এ ঘটনার পর অনেক দিন পার হয়ে গেছে। কিন্তু আফগান মুসলিম জনসাধারণ তথা আযাদীর সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের স্মৃতি আজও অম্লান হয়ে

www.pathagar.com

আছে। মসজিদের প্রাচীরে এখনও রয়ে গেছে নাহিদের রক্তে লেখা আযাদীর পয়গাম।

যতদিন পর্যন্ত আফগান মাটি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন না হয়েছে, নিশ্চিহ্ন না হয়েছে সর্বশেষ গাদ্দার কমিউনিস্ট-ততদিন পর্যন্তই নাহিদ ও তার বান্ধবীরা অনুপ্রেরণা হয়ে আছে স্বাধীনতার সৈনিকদের। বিশ্বজুড়ে ইসলামের কন্যাদের জীবনে নাহিদ একটি চিরভাস্বর, মহিমাময় আদর্শ হয়ে অনন্তকালব্যাপী পথের দিশা দেবে। স্মৃতিতে জাগরূক হয়ে থাকবে আলোর মশাল হয়ে। ❑

২৬ অক্টোবর '০১

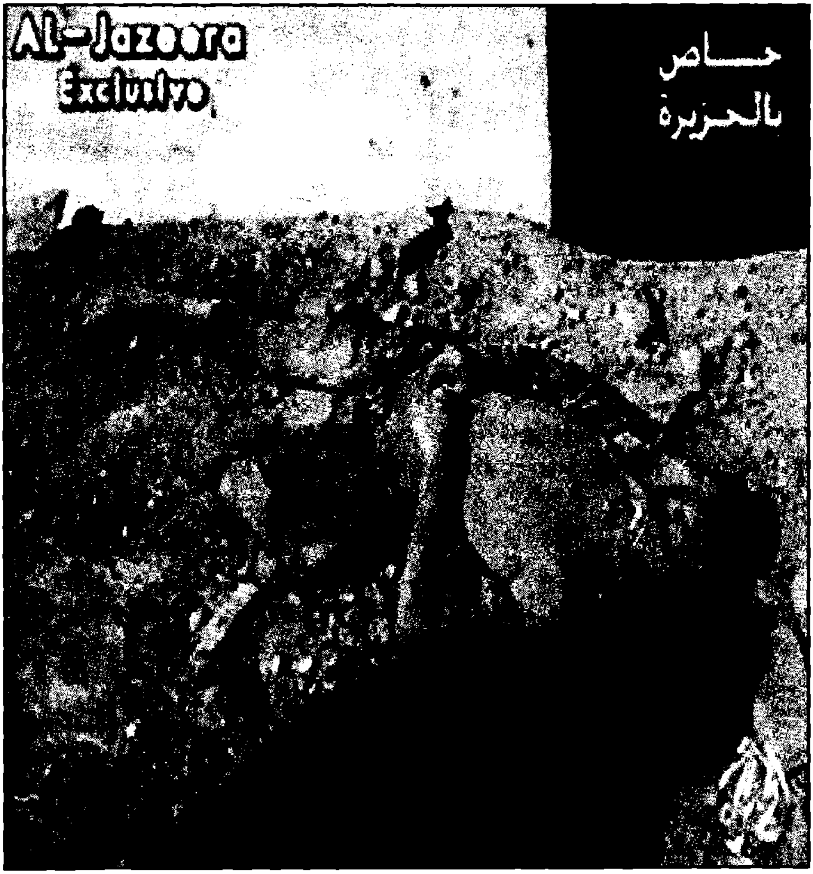

হায় মানবতা!

তালিবান মুজাহিদদের কাবুল বিজয়ের পরে

রূহুল আমিন খান

আফগানিস্তান এখন এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। গত ৭ অক্টোবর ক্ষুধিত শকুনের মত দেশটির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেই থেকে অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছে হামলার পর হামলা। সর্বাধুনিক মারণাস্ত্রের আঘাত হেনে চলেছে একতরফাভাবে নির্বিচারে। নির্মমভাবে হত্যা করে যাচ্ছে বেসামরিক নাগরিকদের। অসহায় নারী, মাসুম শিশু কেউই রেহাই পাচ্ছে না তাদের হিংস্র ছোবল থেকে। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত হেনে, গুচ্ছ বোমা ফেলে ধুলায় মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে জনবসতি, ধ্বংস করা হচ্ছে স্থাপনা, গুঁড়িয়ে দেয়া হচ্ছে পবিত্র মসজিদ পর্যন্ত। জ্বলছে আফগানিস্তান। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা গত ১১ সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে বিমান হামলার প্রতিশোধ হলেও আসল কারণ আরো গভীরে। এ পরিকল্পনা অনেক আগের। যে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে একুশ শতকে ইসলামের নবযাত্রা শুরু, ওদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তা নস্যাত করে দেয়া। বিশ্বব্যাপী ইসলামের নবউত্থানকে প্রতিহত করা। ইসলামী বিশ্ববিপ্লবকে ঠেকানো। পুঁজিবাদের মরণ সময় ঘনিয়ে এসেছে। সমাজবাদের কবর হয়ে গেছে। বস্তুবাদের নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে।

বর্ণবাদের অভিশাপ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করছে নিপীড়িত মানবতা। এই তৃষিত মরু সাহারায় আবেহায়াতরূপে প্রতিভাত হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম আজ আমেরিকাকে করছে আলোড়িত, পাশ্চাত্য জগতকে করছে আকৃষ্ট। প্রাচ্যের দেশসমূহে জাগিয়েছে নতুন সাড়া। তাই ভীত শঙ্কিত কেবল আমেরিকা, বৃটেন, জার্মানি, জাপান, চীন, রাশিয়া, ভারতই নয়, আতঙ্কিত ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুসলিম দেশসমূহের শাসকরাও। সম্পদ আর শাহানশাহী হারানোর ভয়ে কম্পমান মুসলিম রাজাবাদশা, সুলতানরাও। আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল ইসলামী সাম্য-ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়, ইনসাফ ও সুষম বন্টনের নমুনা, কায়েম হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শের। তৈরি হতে শুরু হয়েছিল সেখানে বিশ্ব ইসলামী বিপ্লবের সৈনিক। তাই দুনিয়ার ইহুদী, নাসারা, ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির, তাবত কাফের মুশরিক, বেদ্বীন শক্তির মাথা ব্যথার কারণ হয়ে পড়েছে আফগানিস্তান। চক্ষুশূল হয়েছে তালেবান মুজাহিদিন, তালেবান সরকার, আমীরে শরীয়ত মোল্লা ওমর আর বিশ্ব ইসলামী বিপ্লবের

www.pathagar.com

মহানায়ক ওসামা বিন লাদেন। তাই নীল-নকশা তৈরি করে, ছক সাজিয়ে, ব্যাকগ্রাউন্ড সৃষ্টি করে, সুপরিকল্পিত অজুহাত বানিয়ে নিয়ে সর্বপ্রকার সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে আফগানিস্তানের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হিরোসিমা, নাগাসাকি ধ্বংসের নায়ক, ভিয়েতনাম গণহত্যার হোতা, হত্যা, ক্যু, যুদ্ধ ও অশান্তির প্রধান মোড়ল খ্রীস্ট সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেন্ট ওয়াকার বুশ ঘোষণা করেছেন নয়া ক্রুসেড। আর আপন আপন মতলবে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সকল অমুসলিম শক্তি। এমন কি নামকাওয়াস্তে মুসলিম শক্তিও। লক্ষ্য-আফগানিস্তানের বিপ্লবী ইসলামী শক্তিকে নির্মূল নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। ঐ দানবীয় শক্তির তুলনায় বলতে গেলে কিছুই নেই আফগান মুজাহিদদের, তালেবান সরকারের। চারদিকে ঘিরে আছে তাদের প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু। আধুনিক অস্ত্র নির্মাণের শক্তি তাদের নেই। বাইরে থেকে একটি অস্ত্র কিংবা একটি বুলেট সংগ্রহ করার উপায়ও তাদের নেই। সরবরাহের সকল পথ বন্ধ। দুশমনের নিশ্ছিদ্র বেষ্টনী গোটা সীমান্তব্যাপী, তাই বাহ্যিক দৃষ্টিতে পতন তাদের অনিবার্য। কিন্তু সবই কি অঙ্কের হিসাবে হয় ? হয় না। তালেবানদের কাবুল দখলও মিলানো যায় না অংকের হিসাব দিয়ে। আর এই সর্বাত্মক হামলার মুখে অর্ধমাস টিকে থাকাটাও মিলছে না কোনো হিসাবেই। আফগানিস্তানের ওপর হামলা চালিয়ে বিজয়ের গৌরব নিতে পারেনি কোন বহিঃশক্তি। নিকট অতীতেও আমরা দেখেছি, পারেনি বৃটিশরা, পারেনি সোভিয়েতরা। পরাজয়ের গ্লানি নিয়েই তাদের ফিরতে হয়েছে। এবার যুক্তরাষ্ট্রের পালা। আল্লাহই ভাল জানেন এই যুদ্ধের পরিণতি। একমাত্র তিনিই জানেন ভবিষ্যৎ। তবে ইসলামের মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের অনেক সময় জানিয়ে দেন ভবিষ্যতের কিছু কথা। এমন কিছু কথা প্রকাশ করে গেছেন শাহ নিয়ামত উল্লাহ আমেরিকা ও ইংল্যান্ড সম্পর্কেও। তিনি তার কাসীদায় অবশ্য স্পষ্ট ভাষায় ইংল্যান্ড ও আমেরিকা শব্দ বলেননি। বলেছেন আলিফ। ইন্টারপ্রেটাররা এই আলিফের অর্থ করেছেন ইংল্যান্ড ও আমেরিকা। যেহেতু আরবী ফার্সি বর্ণমালার লিখনীতে এ দুটি দেশের নামের প্রথম অক্ষর হচ্ছে আলিফ। শাহ নিয়ামত উল্লাহ বলছেন ঃ

“ভারতের মত পশ্চিমাদেরো ঘটিবে বিপর্যয়

তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে ঘটাইবে মহালয়।

এই রণে হবে 'আলিফ' এমন পয়মাল মিসমার,

মুছে যাবে দেশ, ইতিহাসে শুধু নামটি থাকিবে তার।

কুদরতী হাতে কঠিন দণ্ড দেয়া হবে তাহাদের

ধরা বুকে শির তুলিয়া নাসারা দাঁড়াবে না কভু ফের।”

(কাসীদায়ে শাহ নিয়ামত উল্লাহ ঃ কাব্যানুবাদ ঃ রূহুল আমীন খান)

এই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকেই দুনিয়াকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা।

আফগানিস্তান ও তালেবানদের ওপর যে এমন হামলা আসবে সে আশঙ্কা আমরা করে আসছিলাম তাদের উত্থানকাল থেকেই। তাই আমরা ১৯৯৬ সালে বিজয়ী বেশে তাদের রাজধানী কাবুলে উপস্থিতিকে স্বাগত জানানোর সাথে সাথে এই আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছিলাম একটি নিবন্ধে। দৈনিক ইনকিলাবে ১১-১০-১৯৯৬ সালে প্রকাশিত সেই

www.pathagar.com

উপসম্পাদকীয় নিবন্ধটি আমরা হুবহু নিম্নে তুলে ধরছি ঃ

"তালেবান মুজাহিদীন! অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তোমাদেরকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন। সবুজ, কাঁচা, নবীন, কিশোর, তরুণ হে ইসলামের বীর সৈনিকগণ! তোমাদের কৃতিত্বে, তোমাদের সাফল্যে. তোমাদের আদর্শ-নিষ্ঠা, সততা, ন্যায়পরায়ণতায় আমরা বিস্মিত, বিমুগ্ধ। তোমাদের ত্যাগে, বীরত্বে, সাহসিকতায় শৌর্যে-বীর্যে আমরা উদ্দীপিত, গর্বিত। তোমাদের দিকে আশাভরা দৃষ্টিতে যেমন তাকিয়ে আছে কমিউনিস্ট অত্যাচারে জর্জরিত সেই লাখো-কোটি মজলুম মুসতাদআফীন মানুষ, অগণিত লাঞ্ছিতা মা, ধর্ষিতা বোন, অসহায় শিশু, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা—তেমনি তাকিয়ে আছে অগণিত শহীদান যারা নাস্তিক খোদাদ্রোহী বর্বর শাসকদের বিরুদ্ধে, বেঈমান মোনাফিক স্বদেশী গাদ্দারদের বিরুদ্ধে, সীমান্তের ওপার থেকে আসা নাস্তিক শ্বেতভল্লুক-রুশ লাল ফৌজের বিরুদ্ধে তুলে নিয়েছিলেন হাতিয়ার। যারা নিজ ধর্ম নিয়ে বাঁচার জন্য, নিজ ঐতিহ্য নিয়ে টিকে থাকার জন্য, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য, জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, দুশমনের গোলার সম্মুখে বুক পেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুলতান মাহমুদ, মুহম্মদ ঘোরী, ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী, আহমদ শাহ আবদালীর শৌর্য নিয়ে লড়েছিলেন, অকাতরে নিজ কলিজার খুন ঢেলেছিলেন। হাসিমুখে জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সেই অমর শহীদানের শুভেচ্ছা রয়েছে তোমাদের পথে। তাঁরা তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন তাদের স্বপ্ন তোমাদের মধ্য দিয়ে পূরণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

ঐ চেয়ে দেখ, জান্নাতুল ফিরদাউস থেকে তোমাদের শিরে ঝরে পড়ছে তাঁদের আশীষ ধারা। হে তালেবান বীর সিপাহীগণ! শুভেচ্ছার ডালি সাজিয়ে আছি আমরা বাংলাদেশীরাও। তোমাদের ঐ লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের দেশী টগবগে তরুণরাও ছুটে গিয়েছিল আফগানিস্তানের পাথুরে জমিনে, লড়েছিল বীর বাহাদুরের মত তোমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। তাদের অনেকে পান করেছে শাহাদাতের আবেহায়াত। চিরনিদ্রায় শায়িত আছে কাবুল, কান্দাহার, মাজার-ই শরীফ, পানশিরের খুন রাঙ্গা জমিনে। হে তালেবান তরুণবৃন্দ! শুধু তাই নয়, তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে এই উম্মা'র শত কোটি মর্দে মুমিন, ইসলাম জাহানের সব দেশের ইসলামের সৈনিকরা। তোমরা তো জানো, প্রায় সব ক'টি মুসলিম দেশের তরুণ মুজাহিদের শহীদী খুন মিশে আছে আফগান শহীদানের খুনের সাথে। সেই খুনের দরিয়া সাঁতরে তোমরা আবার যুদ্ধবিধ্বস্ত, উপদলীয় কোন্দলে ক্ষতবিক্ষত, আত্মঘাতী লড়াইয়ে পর্যুদস্ত আফগানিস্তানে সোনালি স্বপ্নের পুষ্পঝরা দিন ফিরিয়ে আনবে, আবার সেখানে শংকাহীন লক্ষ সূর্য হাসবে, আল্লাহর দ্বীন তার পুরোটা কল্যাণময় রূপ নিয়ে ভাস্বর হয়ে উঠবে, সাম্য-মৈত্রী ন্যায়-ইনসাফ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে, আফগানিস্তান পরিণত হবে শান্তির আগারে-এই তো সবার প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা নিয়েই একদিন মুসলিম জাহান তাকিয়ে ছিল জমিয়তে ইসলামীর নেতা বুরহানুদ্দীন রাব্বানী, হিজবে ইসলামী নেতা গুলবুদ্দিন হিকমতিয়ার, সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী, শেরে পানশির আহমদ শাহ মাসুদ প্রমুখ মুজাহিদীন নেতৃবৃন্দের দিকে। তারা রুশ কামানের গোলা স্তব্ধ করে দিতে পেরেছিলেন, ট্যাংকের স্টিল বড়ি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, রুশ শ্বেতভল্লুকদের নাস্তানাবুদ করতে পেরেছিলেন, লাল ফৌজকে পরাজিত, পর্যুদস্ত করে সীমান্তের ওপারে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তারা সক্ষম হয়েছিলেন জেনারেল দাউদ খান, নূর মোহাম্মদ তারাকী,

www.pathagar.com

বারবাক কারমাল, জেনারেল নাজিবুল্লাহকে পরাস্ত করতে, আফগানিস্তানের পবিত্র মাটি থেকে নাপাক কমিউনিস্ট শাসন উৎখাত করতে। তারা সক্ষম হয়েছিলেন বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিতে। কিন্তু হায়! তারা ব্যর্থ হলেন সমঝোতা স্থাপনে, ঐক্য প্রতিষ্ঠায়, সম্মিলিতভাবে দেশ শাসনে। তাই যে কামান একদিন লাল ফৌজের বক্ষ বিদীর্ণ করেছিল সেই কামানের গোলা ছিন্নভিন্ন করতে লাগল মুমিন মুসলিমের পবিত্র দেহ। যে মেশিনগানের গুলী একদিন নাস্তিকদের বুক ঝাঁঝরা করেছিল, তাই ঝাঁঝরা করতে লাগল ঈমানদার ভাইয়ের অস্থিপিঞ্জর। ভাইয়ের হাতে ঝরতে লাগল ভাইয়ের খুন। নিজেদের হাতে ধ্বংস হতে থাকল স্বদেশের দালানকোঠা, সহায়সম্পদ। এই আত্মঘাতী ভ্রাতৃঘাতী লড়াই থামাতে মুসলিম জাহান ব্যাকুল হয়ে উঠল। ওআইসি সক্রিয় হল, জোরদারভাবে কূটনৈতিক তৎপরতা চলল। এমনকি মুজাহিদ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে পবিত্র হারামে, আল্লাহর পবিত্র ঘর খানায়ে কাবার সামনে হাজির করা হলো। তারা কাবার গেলাফ ছুঁয়ে অঙ্গীকার করলেন। খোদার ঘরকে সামনে রেখে শপথ নিলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় প্রিয় নবী (সঃ)-এর রওজা মুবারক জিয়ারত করে সেই অঙ্গীকারকে সত্যায়িত করলেন কিন্তু তারপরও থামল না সেই আত্মঘাতী লড়াই, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, উপদলীয় কোন্দল ভাষা আর জাতিগত সংঘাত। বাড়ল জনগণের দুর্দশা, ভাগারে পরিণত হলো যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ।

> "চুঁ কুফর আজ কাবা বরখিজাদ কুজা মানাদ মুসলমানী
> কাবাতেই যদি কুফরী হইবে কোথায় থাকিবে মুসলমানী ?
> ওঝাকেই যদি ভূতে ধরে তবে ভূত ছাড়াবে কে ?"

ইসলামী জেহাদের বীর সিপাহসালাররাই যদি এতকিছুর পরও চালিয়ে যেতে থাকেন আত্মঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী লড়াই তবে তা বন্ধ করবে আর কোন শক্তি ? কিন্তু না, তারপরও কথা আছে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তবে মশা দিয়েও নমরুদ বাহিনী ধ্বংস করতে পারেন। যদি তিনি চান তবে ক্ষুদ্র আবাবিল দিয়েও আবরাহার বিশাল হস্তিবাহিনী গো-চর্বিত তৃণের ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারেন। অতিক্ষুদ্র দিয়েও নিতে পারেন অতি বৃহৎ কাজ। আফগানিস্তানের বেলায়ও হল তাই। এক আফগান কবিই বলেছেন-এই সেই আফগান জাতি/যদি ঈমান পলায়ন করে গিয়ে সুরাইয়া সিতারাতেও/তবে সেখান থেকে তা নামিয়ে আনেন যারা জমীনে। হ্যাঁ, আফগান কবির সেই কথাই আবার সত্যে পরিণত হল। ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কাবুলে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ইসলাম আর কমিউনিজমে যে লড়াই শুরু হয়েছিল, ১৭ বছর আগে সোভিয়েত ছত্রী বাহিনীর কাবুল বিমান বন্দরে অবতরণের মধ্যদিয়ে যে কমিউনিস্ট আগ্রাসন ও সোভিয়েত দখলদারী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ১৯৯২ সালে মুজাহিদীন কর্তৃক সেই দখলদারিত্বের অবসান ঘটলেও এবং কমিউনিস্ট শাসনের পতন হলেও যে যুদ্ধ রূপ নিয়েছিল আত্মঘাতী লড়াইয়ে, তারই অবসানকল্পে মাত্র ২২ মাস আগে মাদ্রাসার কচি, সবুজ, তরুণ-কিশোর ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হলো তালেবান বাহিনী। তারা আত্মপ্রচারণা চায় না, ভাষা বৈষম্যের কোন্দল চায় না, গোত্র পার্থক্যের দ্বন্দ্ব চায় না, উপদলীয় সংঘাত চায় না, তারা চায় যে লক্ষ্যে একদিন মুজাহিদীন দরিয়াকে দরিয়ায় বুকে তাজা খুন ঢেলেছিল সেই লক্ষ্যের বাস্তবায়ন। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিরংকুশকরণ,

www.pathagar.com

জনগণের নিরাপত্তা বিধান, শান্তি প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম। এটা যাতে না হতে পারে, সেটাই ছিল ইহুদী-খৃষ্ট-নাস্তিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের মূল লক্ষ্য। এই আন্তর্জাতিক চক্রের শিকার হয়েছিলেন সাবেক মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ।

এটা বুঝতে হলে আর একটু পেছনে যেতে হবে, জানতে হবে এর ব্যাকগ্রাউন্ড পশ্চাৎভূমি ও প্রেক্ষাপট। আফগানিস্তান হয়ে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করেই ভারতে এসেছিলেন সুলতান মাহমুদ। ১৭ বার সফল আক্রমণ চালিয়ে দুর্বল করে দিয়েছিলেন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি। এই আফগানিস্তান থেকেই ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে এসেছিলেন শেহাব উদ্দীন মুহম্মদ ঘোরী এবং চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে দখল করেছিলেন দিল্লীর সিংহাসন। ভারতের বুকে কায়েম করেছিলেন মুসলিম শাসন। সেই মুসলিম শাসন যখন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হল তখন এই আফগানিস্তান থেকেই এসেছিলেন সম্রাট বাবুর। শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুঘল সাম্রাজ্য। আবর মুঘল শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে, মুসলমানদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি, মারাঠা দুস্যুরা যখন ভারতের বুক থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে দিতে বদ্ধপরিকর হল তখন এই আফগানিস্তান থেকেই তাকে রক্ষা করার জন্য ছুটে এসেছিলেন বীর মুজাহিদ আহমদ শাহ আবদালী। তিনি মারাঠা শক্তিকে পরাস্ত, পর্যুদস্ত ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের স্বপ্ন-সাধ ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে ভারতে ইসলামী শাসন আরো কিছুদিন টিকে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। পানিপথের সেই তৃতীয় যুদ্ধের ক্ষত, দগদগে ঘা হয়ে এখনও জ্বলছে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয়দের কলিজায়। এই আফগানিস্তান হয়েই এসেছিলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী এবং লক্ষণ সেন প্রমুখ ব্রাহ্মণ্য রাজাদের পরাজিত করে এই বাংলায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন। তাই আফগান তালেবানের ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এবং তাদের ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বুকের জ্বালাটা অবোধগম্য নয়।

থাকগে সে কথা। হযরত শাহ নেয়ামত উল্লাহ বোখারী (রঃ) আজ থেকে ৮৪৪ বছর আগে ১১৫২ খৃষ্টাব্দে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, ভারত বিভক্ত হয়ে একাধিক রাষ্ট্র (বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন পর ব্যাপক রক্তপাত ঘটবে। হবে প্রচণ্ড লড়াই। তারপর এক পর্যায়ে এসে এই আফগানিস্তান থেকে ইসলামী ফৌজ বীর বিক্রমে অগ্রসর হবে ভারতের দিকে। তারা পুরো হিন্দুস্থান দখল করে আবার কায়েম করতে ইসলামী হুকুমত।

"সৃষ্টি হইবে ভারত ব্যাপিয়া প্রচণ্ড আলোড়ন

'উসমান এসে নিবে জিহাদের বজ্রকঠিন পণ।

'সাহেব কিরান' হাবীবুল্লাহ হাতে নিবে শমশের।

খোদায়ী মদদে ঝাঁপিয়ে পড়িবে ময়দানে যুদ্ধের।

কাঁপিবে মেদিনী সীমান্ত বীর গাজীদের পদভারে

ভারতের পানে আগাইবে তারা মহা রণহুংকারে।

পঙ্গপালের মত ধেয়ে এসে এসব 'গাজীয়ে দ্বীন'

www.pathagar.com

ভারত জিনিয়া বিজয় ঝাণ্ডা করিবেন উড্ডীন।

মিলে এক সাথে দক্ষিণী ফৌজ ইরানী ও 'আফগান'

বিজয় করিয়া কবজায় পুরা আনিবে হিন্দুস্থান"। (কাসিদায়ে শাহ নেয়ামতুল্লাহ ঃ অনুবাদ রূহুল আমীন খান)

সুতরাং ভারত চাইতে পারেনা আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা। এজন্যই তারা ইন্ধন যুগিয়ে গেছে সেই আত্মঘাতী যুদ্ধে। অনুরূপ চাইতে পারে না রাশিয়াও। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন কালের পাতা থেকে মুছে গেছে আফগানিস্তানে তাদের আগ্রাসী লড়াইয়ের কারণেই। বিপদের শেষ এখানেই নয়। আফগানিস্তান জামালুদ্দীন আফগানীর দেশ। যে জামালুদ্দীন আফগানী ছিলেন প্যান ইসলামিজম-এর মুখপাত্র। যিনি চেয়েছিলেন সমগ্র মুসলিম জাহানকে এক করতে। ইসলামী উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করে এক অজেয় বিশ্ব শক্তিতে রূপান্তরিত করতে। সেই জামালুদ্দীন আফগানীর উত্তরসুরিরা, বিভিন্ন মুসলিম দেশের তরুণদের নিয়ে গঠন করেছিল যেই জিহাদী ফৌজ, তাদের নেতারা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকেন তবে প্যান ইসলামিজমের চেতনা তাদের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। আবার এ সময়ের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কবর রচিত হয়েছে। জন্ম হয়েছে উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান, তাজিকিস্তান, কিরঘিজিস্তান, আজারবাইজান নামের ছয়-ছয়টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের যদিও তারা ইসলামের বদৌলতে স্বাধীন হয়েছে তবুও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে অধিকাংশ স্থানে রয়েছেন পতিত সমাজতন্ত্রেরই নেতারা। অপরদিকে প্রতিটি দেশেই দানা বেঁধে উঠছে ইসলামী আন্দোলন। কোথাও কোথাও সেই ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদদের সাথে লড়াই হচ্ছে সমাজতন্ত্রের প্রেতাত্মাদের। আফগানিস্তানের সীমান্ত লাগোয়া সেসব দেশের মুজাহিদদের সংযোগ ঘটলে আফগানিস্তানেরই মত ইসলামী বিপ্লব শুরু হবে সেসব দেশেরও। তাই কায়েমী স্বার্থবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরসুরিদের সাথে মিলে আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধের ইন্ধন যুগিয়েছে। ইসলামপন্থীরা যেন সুসংহত না হতে পারে সেজন্য চালিয়েছে অশুভ তৎপরতা। ওদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের দোসররাও ইসলামী পুনর্জাগরণে ভীত-সন্ত্রস্ত। তাই মৌলবাদের ধুয়া তুলে, আতঙ্ক ঝড়িয়ে, অপপ্রচারের অস্ত্র প্রয়োগ করে সেই পুনর্জাগরণ ঠেকানোর চেষ্টায় হয়েছে মশগুল। চীনেরও মাথা ব্যথা কম নয়। সিংকিয়ান অঞ্চলে, উইঘুর এলাকায় ঐতিহ্যবাহী মুসলিম জাতিগোষ্ঠী বাঁচতে চাইছে নিজেদের ধর্মীয় স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে। আফগান মুসলমানদের সাথে রয়েছে তাদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও সযোগ। তালেবানরা সফল হলে না জানি পরিস্থিতি কিরূপ ধারণ করে। এদিকে ইরান, সুন্নী আফগানের প্রাধান্যের ভয়ে, আর বাণিজ্যিক স্বার্থে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছে না আফগানিস্তানের শক্তিমান হয়ে ওঠাকে। সব হীনস্বার্থের নদী মিলিত হয়েছে এসে এক মোহনায়। তাই এতদিন পর্যন্ত জারি ছিল আফগানিস্তানের ভ্রাতৃঘাতী, আত্মঘাতী লড়াই।

কিন্তু আফগানিস্তানের ইসলামী জনতা কেন দিতে থাকবে এর খেসারত? তারা ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছে- যেখানে বর্ণ-গোত্র ভাষার বৈষম্য নেই। সবাই এক আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, কাবা, কলেমায় বিশ্বাসী। ইসলামের রজ্জুতে শক্তভাবে গ্রথিত, ঐক্যবদ্ধ। তাই তারা এসে দাঁড়িয়েছে সেই আদর্শের পতাকাবাহী, সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার

www.pathagar.com

অঙ্গীকারে ওয়াদাবদ্ধ তালেবানদের পাশে। আল্লাহর মদদ আর জনতার সমর্থনই হলো তালেবানের শক্তির উৎস। জনতা দেখেছে যে এলাকাই তালেবানের কব্জায় এসেছে সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শান্তি, বিদূরিত হয়েছে ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি। কায়েম হয়েছে ন্যায় ইনসাফ। তাই তালেবান এলাকার পর এলাকা জয় করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এসে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে রাজধানী কাবুলের দ্বারপ্রান্তে এবং অবশেষে দোস্তাম, রব্বানী, হিকমতিয়ার, মাসুদের মত বীর বাহাদুরদের পরাভূত করে জয় করে নিয়েছে রাজধানী কাবুল। যা ভাবা যায় না, চিন্তা করা যায় না, কল্পনায় আসে না এমন অত্যাশ্চর্য ঘটনা বাস্তবে সংগঠিত হতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক ইসলামের দুশমনরা। তাই তালেবানদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে অপপ্রচার। সউদী আরবে হাতকাটা আইন আছে, জিনার শাস্তি সঙ্গেসার আছে, নামাজ না পড়ার জন্যও কড়াকড়ি বিধান আছে-সেসব আমেরিকা বা তার ইয়ারদের জন্য মৌলবাদিতা নয়, দোষের বলেও তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার নেই। অথচ নামাজ কায়েম, হিজাব কায়েম, শরীয়া শাসন কায়েমের সেই একই কাজ করে তালেবানরা আজ বনে গেছে বর্বর, অসভ্য, মধ্যযুগীয়। হেবরনের মুসলিম হত্যা, কাশ্মীরে গণহত্যা, বসনিয়ায় নরমেধযজ্ঞ, চেচনিয়ায় পৈশাচিক বর্বরতা বছরের পর বছর চলতে দেখেও মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বলে যাদের বিবেক দংশিত হয় না, প্রতিবাদের বাক্য কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয় না-সেই 'মানবতাবাদীরা' 'মানবাধিকারবাদীরা', 'আঁতেলরা', 'বুদ্ধিজীবী নামধারী প্রাণীরা, একটা যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় মহিলাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করতে থাকার নির্দেশের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে মধ্যযুগীয় বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা। যে রাশিয়ায় সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে দুর্নীতি ভরা, আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো সাম্প্রতিক সময়ও যে রুশ সেনাবাহিনীকে আখ্যায়িত করছে একটি বিরাট লুটেরা নিকৃষ্ট ও দুষ্কৃতকারী বাহিনী বলে, যে আমেরিকায় রাতের বেলায় কিছুক্ষণ বিদ্যুৎ না থাকলে ছিনতাই, ডাকাতি, রাজহানি, লুট, ধর্ষণের হিড়িক পড়ে যায়, যে ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীরের জনপদে প্রবেশ করে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণের সৃষ্টি করে, যে বাংলাদেশী আঁতেলরা পার্বত্য চট্টগ্রামে শত শত অ-উপজাতিদেরকে নৃশংসভাবে নিহত হতে দেখে মুখে কুলুপ এঁটে থাকে, তারা নামাজের মধ্যে বিবাহের মধ্যে, শরীয়াহ আইন চালুর মধ্যে বর্বরতা-নিষ্ঠুরতা দেখতে পেলে তাতে বোধহয় মুমিন বান্দাদের আশ্চর্য হওয়াটার কিছু নেই। ওদের অন্ধ চোখ অবশ্যই দেখবে না যাতে বড় একটা যুদ্ধের পরে বিজয়ী তালেবান বাহিনী রাজধানী কাবুলে প্রবেশের পর দোকানও লুট হয়নি, একটি মানুষও গুপ্তহত্যার শিকার হয়নি, একটি নারীও ধর্ষিতা হননি, কোথাও কোন আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়নি, প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ হয়নি। না, ওরা চোখ থাকতেও অন্ধ। কারণ ওরা বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণে ভীত। আমরা দাহির, পৃথ্বীরাজ, লক্ষণ সেন, বল্লাল সেনদের উত্তরসূরিদের কণ্ঠে, কিংবা জার, লেনিন, স্ট্যালিনদের প্রেতাত্মাদের কণ্ঠে অথবা বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তিনীদের হত্যার নেপথ্য নায়কদের কণ্ঠে, হিরোশিমা, নাগাসাকিতে এটমবোমা নিক্ষেপ করে লাখ লাখ নিরপরাধ মানুষের ঘাতকদের কণ্ঠে তালেবানদের সমালোচনা আর গালিগালাজ শুনে তাই বিস্ময় বোধ করি না। শরীয়া শাসন দেখে ওদের যদি নস্টার ডোমাস, জিনডিকশন, শাহ নেয়ামতুল্লাহ বোখারীর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণে উদিত হতে থাকে আর তারই প্রতিক্রিয়ায় ওদের কণ্ঠ দিয়ে যদি তালেবানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা উদগীরিত হতে থাকে তবে তাতে

www.pathagar.com

বিস্মিত হবার কি আছে? বিস্মিত হব না ওরা তাদের ওপর আক্রমণ চালালেও।

তবে তোমাদের প্রতি আমাদের আবেদন আছে, হে তালেবান বন্ধুরা! তোমরা নাজিবুল্লাহর সৈন্য নও, তোমরা গরবাচেভের বাহিনী নও, তোমরা নেতানিয়াহুর সেনা নও, তোমরা বুশের বাহিনীও নও, তোমরা রহমাতুল্লীল আলামীন দয়াল নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর অনুসারী, তোমাদের সামনে থাকবে ফতেহ্ মক্কার নজির। তোমাদের সামনে থাকবে জামালুদ্দিন আফগানীর স্বপ্ন। তোমাদের সাধনা হবে মহাবিজ্ঞানী আলবিরুনীর সাধনা। তোমরা সুলতান মাহমুদ, মুহম্মদ ঘোরী, আহমদ শাহ আবদালীর উত্তরসূরি। তোমরা প্যান ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী জামালউদ্দীন আফগানীর উত্তরাধিকারী। তোমরা ইসলামের পতাকাবাহী। তোমাদের প্রদর্শন করতে হবে ইসলামের কল্যাণময় রূপ। রাজ্য শাসনে দেখাতে হবে ওমর ফারুক আর ওমর ইবনে আবদুল আজীজের দৃষ্টান্ত। কুকুরগুলো চিল্লাতে থাকুক, আদর্শে অবিচল থেকে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করে গেলে একদিন সারা দুনিয়াই তোমাদের প্রতি জানাবে শ্রদ্ধা-অভিনন্দন। এই অন্ধকার অমানিশা বিদূরিত হয়ে উদিত হবেই দীপ্ত আল হেলাল,,,,,,❑

২৬ অক্টোবর '০১

লেখক ঃ কবি, সাংবাদিক।

www.pathagar.com

একান্ত সাক্ষাৎকারে আফগান রাষ্ট্রদূত আবদুল সালাম জায়েফ

সুদীর্ঘ সাড়ে চার দশকের কর্মজীবনে বিচিত্র এবং স্মরণীয় যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তার সঙ্গে সোমবার, ২২ অক্টোবর যেন যোগ হলো আরো একটি স্মরণীয় ঘটনা। তা হচ্ছে পাকিস্তানে তালেবান সরকারের দূতাবাসে আমার সাক্ষাৎকার রাষ্ট্রদূত আবদুল সালাম জায়েফের সঙ্গে। এটাই এখন সারা বিশ্বে আফগানিস্তানের একমাত্র দূতাবাস। আমার সাক্ষাৎকার রাষ্ট্রদূতের বাসস্থানে, এই কারণে যে রোববারের পাকিস্তানে সরকারী অফিস বন্ধ। (যেতে যেতে মনে হলো আমাদের দেশে অফিস রোববারে বন্ধ রাখার সুবুদ্ধি কবে হবে ? পাকিস্তান, আর পাকিস্তানে তালেবানদের দপ্তর যদি তা করে, আমরা কেন হব তার ব্যতিক্রম ? নতুন সরকার ভেবে দেখবেন কি ?)

ইসলামাবাদের জনবিরল এফ ১০/৩ এর ছয় নম্বর রাস্তায় রাষ্ট্রদূত নিবাস। গেটের বাইরে সালোয়ার কোর্তা পরিহিত পাকিস্তানী মিলিশিয়ার কড়া পাহারা। বিনয়ী-ভদ্র সব সৈন্য (৭১ এ বাংলাদেশে এদের কী হয়েছিল ? পানিতে নিজের প্রতিবিম্বের ওপর মিলিশিয়া সৈন্যের গুলি চালনার হাসির গল্পটি কেন জানি হঠাৎ মনে পড়ল।) আমাকে দুই মিনিট অপেক্ষা করতে বলে তাদের নিজের চেয়ার টেনে দিয়ে বসতে বলল। বুঝলাম অতি উৎসাহে সময়ের কিছু আগেই পৌঁছে গেছি। নির্ধারিত সময় ঠিক ১১টায় বাসভবন থেকে বেরিয়ে এলেন সাদা পাগড়ি, সালোয়ার আর লম্বা সাদা কোর্তা আর পেশোয়ারি চপ্পল পরিহিত একজন তালেবান কর্মকর্তা। তালেবানের সঙ্গে আমার এই প্রথম সংস্পর্শে উষ্ণ অভ্যর্থনা তিনি আমাকে জানালেন। নিয়ে গেলেন ঘরের ভেতর।

মাঝারি আকারের বসার ঘর তালেবান রাষ্ট্রদূতের। বসার ঘরেও সোফা সেটের পাশে দু'টি বিছানা। অনেক মানুষেরই স্থান সঙ্কুলান করতে হয় তালেবান রাষ্ট্রদূতের। কিছু পরই ঘরে এলেন রাষ্ট্রদূত মোল্লা আবদুল সালাম জায়েফ। তার পাগড়িটি কালো। শান্ত, গম্ভীর তার অবয়ব, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা অথবা ব্যস্ততার লেশমাত্র নেই তাতে। তার চশমাটা একটু বেমানানই লাগল। মধ্যযুগীয় বেশভূষা আর পরিবেশে ঘরের সোফা সেটটির মতো তার চশমাটাও তাদের আধুনিকতায় বেমানান। মনে হলো মেঝেতে বসার ব্যবস্থাই যেন যথার্থ হতো।

কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। আমাকে যে ভদ্রলোক স্বাগত জানিয়েছিলেন তিনিও বসলেন

www.pathagar.com

পাশের সোফাটিতে। পরিচয় দিলেন। তিনি করাচিতে তালেবান কনসালে জেনারেল মোল্লা রহমত উল্লা কাহকাজাদে। বললেন, তিনি রাষ্ট্রদূতের ফারসি আমার জন্য উর্দুতে তরজমা করবেন। আমার সাক্ষাৎকার উর্দুতেই হবে। উর্দু ঢাকায় বলা হয়ে ওঠে না, তবুও খুব বেগ পেতে হলো না। যথাসময় যথাশব্দ বেরিয়েই এল স্মৃতির মণিকোঠা থেকে। সবুজ চা এল, সঙ্গে কিছু চকোলেট। চারদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ছাপ।

তালেবান রাষ্ট্রদূতকে আফগানিস্তানে যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। ফারসিতে উত্তর দিলেন তিনি। স্পষ্ট ধীরে ধীরে উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য। বললেন, আফগানিস্তানে এখন আমেরিকানরা 'কার্পেট বম্বিং' চালাচ্ছে। কোনোরকম বাছবিচারহীন তাদের হানা। তবে আফগানরা বছর বছর ধরেই তো বোমা খেয়ে আসছে। খুব বেশি যায় আসে না তাতে। তালেবানদের মনোবল এখন অনেক উচুঁতে।

তিনি বললেন, তবে অর্থনৈতিক অবস্থা সন্তোষজনক না মোটেও। গত তিনটি বছরই তার দেশে খরা গেছে। তার ওপর রয়েছে বোমা হামলা। এদিকে তালেবান সরকারের মানা রয়েছে 'পপি' ফুলের চাষ করায়। তাই চাষীরা তাও করছে না। তবে চিন্তার কারণ নেই, কারণ সবই তো আল্লার ইচ্ছা।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তালেবানদের একতায় কি কোনো ভাঙ্গন ধরেছে? গুজব উঠেছিল যে, তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোল্লা মোতাওয়াক্কিল নাকি দেশ ছেড়েছিলেন। তারপর আরো একটি গুজব শুনেছিলাম এখানে এসে যে, তিনি পাকিস্তানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য ইসলামাবাদ এসেছিলেন।

তিনি বললেন, এসব গুজব উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং তাতে কোনো সত্যতা নেই। তিনি জানালেন, তালেবান পররাষ্ট্র মন্ত্রী এখানে আসেননি মোটেও। তালেবানদের মাঝে কোনো মতভেদই নেই। তারা এখন আগেকার চেয়ে অনেক সুসংহত এবং শক্তিশালী- বললেন তিনি। তিনি সবেমাত্র আফগানিস্তানে মোল্লা ওমরের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। প্রশ্ন রাখলাম যে, উত্তরের মৈত্রীজোট (নর্দার্ন অ্যালায়েন্স) আর দক্ষিণের পাখতুন অধ্যুষিত এলাকায় ভূতপূর্ব বাদশাকে নিয়ে জনমত গড়ে তোলা আর এই দুই গ্রুপের সহযোগিতা সম্বন্ধে যে কথাটি উঠেছে তা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা কতটুকু? তালেবান রাষ্ট্রদূত বললেন, প্রথমোক্ত জোটটি রাশিয়ার সাহায্যপুষ্ট আর দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি আমেরিকানদের। এই দুই গ্রুপের কেউই আফগানিস্তানে নিরীহ মানুষের ওপর বোমা হামলার প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি- তিনি বললেন। তারপর আমাকে তার জিজ্ঞাসা, আপনিই বলুন আপনি কি মনে করেন যে, আফগানি জনসাধারণ এদের গ্রহণ করবে? আর জহির শাহ। তিনি তো কলেমাই জানেন না। নামাজ পড়েন না। হজ করেননি। তাকে আফগানিস্তানে ডেকে আনা হবে কাবা শরীফে মূর্তি স্থাপন করার শামিল। শক্ত এই কথাগুলো শান্তভাবে নিচুস্বরেই উচ্চারণ করলেন তালেবান রাষ্ট্রদূত। তাকে এবার আমার প্রশ্ন, পাকিস্তানিরা বলছেন, ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর করা নিয়েই আপনাদের মাঝে একটি 'মৌলিক' ব্যবধান গড়ে উঠেছে। তারা বলছেন, নিরাপত্তা পরিষদে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর করা হোক। পাকিস্তান মনে করে, জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে তা মেনে নিতে পাকিস্তানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই সিদ্ধান্তের বরখেলাফ করলে পাকিস্তানের সঙ্গে আপনাদের সরকারের

www.pathagar.com

বিরূপ সম্পর্ক হবে।

আবার তার উত্তর, কোনো উত্তেজনা নেই তাতে। বললেন, পাকিস্তান সম্বন্ধে তার কিছু বলার নেই, তবে যে আমেরিকানরা তালেবানদের ইসলামিক আদালতের ওপর শ্রদ্ধাশীল নন, তাদের কোনো কথাই তালেবানরা শুনতে রাজি নন। তালেবানরা তো প্রস্তাব করেছিল যে, ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তারা তিন জন বিচারক (উলেমা) নিয়ে গঠিত বিচারালয়ে তার শুনানি করবে। সেই তিন বিচারকের একজন থাকবেন আফগান, একজন সৌদি এবং তৃতীয় উলেমা অন্য যে কোন দেশের। এই কথাটি বলেই পেছনের দিকে হাত দেখিয়ে তিনি বললেন, যাক এসব অতীতের কথা। এখন তো জেহাদ শুরু হয়েছে। আমরা এখন যুদ্ধে নেমেছি। বাক্যালাপের আর নেই কোনো অবকাশ। আমারা এখন একমাত্র আল্লাহর সহায়তায় বিশ্বাসী। দৃঢ় সংকল্পে আর চরম আত্মবিশ্বাসেই কথাগুলো উচ্চারণ করলেন তালেবান রাষ্ট্রদূত।

তাকে বললাম, আপনি তো সারা বিশ্বে তালেবানদের রাষ্ট্রদূত। বিশ্ববাসীকে কি আপনার কিছু বলার আছে ? কোনো বিরতি না দিয়েই তার উত্তর। তিনি বললেন, আজ আফগানিস্তান পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব নিরুপায় একটি দেশ। যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তি। তারা আফগানিস্তানের মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। এটা বন্ধ করতে সাহায্য করুন। বিশ্ববাসীর কাছে আমার এই আবেদন।

শেষ প্রশ্নটি আর না করেই পারলাম না। তাকে বললাম, আপনিই তো কিছু আগে বললেন, আপনাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। না খেয়ে তো মারা যাবে আপনার দেশের মানুষ। অকপট স্বীকার করলেন যে, তাকাতে পারি না নিষ্পাপ ফুলের মতো সুন্দর আফগান শিশুগুলোর অবাক বিস্ময়ে টেলিভিশন ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকা। ওসামাকে হস্তান্তর করে অন্তত এদের বাঁচানো কি সমীচীন হবে না, তার কাছে আমার প্রশ্ন।

মনে হলো এই প্রথমবারের মতো মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল তার অবয়বে। সেই হাসিটি যেন একটি পরম আত্মবিশ্বাসের, তৃপ্তির। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহর (সঃ) একটি হাদিসে আছে যে, জন্মের ১২০ দিন পর আল্লাহ্ নবজাতকের সম্বন্ধে চারটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তা হলো - (১) রেজেক, (২) নবজাতকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, (৩) মৃত্যুর দিনক্ষণ আর (৪) নবজাতকের চূড়ান্ত গন্তব্য-স্বর্গ না নরক।

অতএব, মানুষের মৃত্যুচিন্তার কোনো কারণই তো থাকতে পারে না- বললেন তিনি।

স্বীকার করব, বিস্ময়েই তার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন, আচ্ছা আপনি কি, আপনারা কি সত্যিই এই বিশ্বাস ধারণ করেন ?

রাষ্ট্রদূতের মৃদু হাস্যে উত্তর, 'নইলে আমেরিকার মতো একটি পরাশক্তির বিরুদ্ধে আমরা কীভাবে লড়ছি আর ভবিষ্যতে কীভাবে লড়ব ?'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দুই হাত বাড়িয়ে হাত মেলালেন। খোদা হাফেজ। ফি আমানিল্লাহ।

গাড়িতে বসে একটি কথা মনে পড়ল। ৪১ বছর আগে ১৯৬০ সালের নভেম্বরে আমি কার্যরত অবস্থায় চীনে ছিলাম। প্রেসিডেন্ট কেনেডির হত্যার খবর পেয়ে সর্বশেষ সংবাদ

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করলাম একজন চীনা দোভাষীকে। তিনি বললেন, আমেরিকান কোনো প্রেসিডেন্টের খবরাখবরে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। অতএব আমার প্রশ্নটির উত্তর তার জানা নেই। ৪১ বছর পর, দুদিন আগেই তো আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বুশকে সাংহাইতে দেখলাম চীনের প্রেসিডেন্ট জিয়াংজেমিন সমভিব্যাহারে। চার দশকে বিশ্ব রাজনীতির নাটকীয় সব পরিবর্তন। মনে দুঃখ রইবে, আত্মকেন্দ্রিক সে দুঃখ যে, আজ থেকে ৪০ বছর পর, আফগানিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের বিবর্তন দেখে যাওয়ার সুযোগ আমার হবে না। স্বর্গ অথবা নরক যেখানেই হোক আমার নির্ধারিত অবস্থান, এ ধরার পানে ফিরে কি তাকানো যাবে? ❑

২৬ অক্টোবর ২০০১

এম. রহমান/সাংবাদিক, কলামিষ্ট।

এর নাম মানবতা!

www.pathagar.com

মেরে ফেলা হলে লাদেন পাবে শহীদের মর্যাদা

নোয়াম চমস্কি

বিশ্বখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার। এখন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজীর অধ্যাপক। জাতিতে ইহুদী এ লেখক যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতির কঠোর সমালোচক। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার গোপন নথিপত্রে সন্ত্রাসী তালিকায় তাঁর নাম ছিল।

বিশ্বখ্যাত মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও কর্মী নোয়াম চমস্কি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের চেহারাটাই আদ্যন্ত বদলে দিয়েছেন। ভাষাবিজ্ঞানের বাইরেও সমাজ, রাজনীতি, পুঁজিবাদ, বিশ্বায়নসহ নানাবিধ বিষয়ে তার অভিনিবেশ ও পর্যবেক্ষণ রীতিমতো ঈর্ষণীয়। ধনবাদী পশ্চিমা বিশ্বের যাবতীয় দাদাগিরির কট্টর সমালোচক অ্যাব্রাম নোয়াম চমস্কির জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যের ফিলাডেলফিয়াতে। ভাষাবিজ্ঞানের নতুন এক ক্ষেত্র তৈরী করে তাকে প্রতিষ্ঠিত ছাঁচ দিয়েছেন চমস্কি। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত সিনট্যাকটিক্যাল স্ট্রাকচারস গ্রন্থে তিনি যে ভাষাদর্শন তুলে ধরেন সেটির পোশাকী নাম ট্রান্সফরমেশনাল জেনারেটিভ গ্রামার। জাতিতে ইহুদি এই ভাষাবিজ্ঞানী বরাবরই যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার। তিনি মনে করেন, এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর, সমালোচনা করার দায়িত্ব বুদ্ধিজীবীরা কোনো ভাবেই এড়াতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রে গত ১১ সেপ্টেম্বরের অভাবনীয় সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা বিশ্বের বর্তমান ও অতীত ভূমিকা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন রেডিও বি-৯২, বেলগ্রেডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে।

কী কারণে এসব হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করেন ?

প্রশ্নটার জবাব দেওয়ার আগে প্রথমেই অপরাধের হোতাদের শনাক্ত করতে হবে। আপ্ত ধারণাটি হচ্ছে, এসব হামলার শেকড়টা রয়ে গেছে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে। আর সম্ভবত এ হচ্ছে ওসামা বিন লাদেনের সংস্থারই কাজ। সন্দেহ নেই বিন লাদেনই হচ্ছেন এ ব্যাপক বিস্তৃত আর জটিল এই সংস্থাটির মূল প্রেরণা। তবে ব্যাপারটা এমন নয় যে, বিন লাদেনের সরাসরি নিয়ন্ত্রণই এ কাজ করেছে। ধরা যাক ব্যাপারটা সত্য। তারপর আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে যে কোনো বিবেকবান মানুষই বিন লাদেনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পুরো এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা তার বিশাল সমর্থকগোষ্ঠীর ভাবাবেগের

www.pathagar.com

ব্যাপারটিকেও খতিয়ে দেখতে চাইবেন। এসব ব্যাপারে আমাদের হাতে ভূরি ভূরি তথ্য আছে । মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে খুবই নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞরা বছরের পর বছর বিন লাদেনের একের পর এক সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এদের মধ্যে রবার্ট ফিস্ক এ অঞ্চলে সবচেয়ে খ্যাতিমান প্রতিনিধি (দ্য ইন্ডিপেডেন্ট, লন্ডন)। পুরো এলাকাটির গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য, জ্ঞান তার নখদর্পণে। পাশাপাশি অঞ্চলটি নিয়ে তার বাস্তব অভিজ্ঞতাও কয়েক দশকের। সৌদি কোটিপতি বিন লাদেন রুশদের আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত করার যুদ্ধে অংশ নিয়ে এক জঙ্গীবাদী নেতা বনে গেলেন। রাশিয়ার উপর মোক্ষম আঘাত হানার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সিআইএ এবং পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থায় তাদের মিত্ররা অনেক ধর্মীয় চরমপন্থীকে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থকড়ি দিয়ে মাঠে নামিয়ে দিল। সৌদি কোটিপতি বিন লাদেন ছিলেন এদেরই একজন। এতে করে শুধু রুশ বাহিনীর প্রত্যাহারটাই বিলম্বিত হয়েছিল। অনেক বিশ্লেষক এমনটাই মনে করেন। তবে সিআইএ'র সঙ্গে লাদেনের সরাসরি যোগাযোগ ছিল কিনা সেটা পরিষ্কার নয়। আর সেটা গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপারও নয়। সিআইএ যে নিজেদের পক্ষে সংগঠিত করার জন্য সবচেয়ে ধর্মোন্মাদ, সবচেয়ে নিষ্ঠুর যোদ্ধাদেরই বেছে নিয়েছিল তাতে আর আশ্চর্য কি! শেষমেষ উদ্দেশ্যটা ছিল 'একটি মধ্যপন্থী সরকারকে গুঁড়িয়ে দিয়ে মার্কিনিদের ঢালাও অর্থায়নপুষ্ট গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে থেকে ধর্মোন্মাদ একটি গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসানো' (লন্ডন টাইমস এর প্রতিবেদক সাইমন জনকিন্স, যিনি ওই এলাকা সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ) ওই সময়টায় আফগানিরা (লাদেনসহ অনেকেই যা নন) রুশ সীমান্ত জুড়ে সন্ত্রাসের তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু রাশিয়া যখন নিজেদের বাহিনী প্রত্যাহার করে নিলো তখন এরাও এসব কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিলো। মানে যুদ্ধটা এদের রাশিয়ার বিরুদ্ধে ছিল না ; ছিল বরং রুশদের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের ওপর রুশদের অপরাধের বিরুদ্ধে।

'আফগানি'রা অবশ্য তাদের লড়াকু কর্মকাণ্ডে পুরোপুরি ইতি টানেনি। বলকান যুদ্ধে এরা বসনিয়ার মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। যুক্তরাষ্ট্রও তখন তাতে বাদ সাধেনি। বসনিয়ার পক্ষে ইরানের সমর্থন-সহযোগিতা যেমনটি সহ্য করেছিল তারা। জটিল সব কারণ ছিল এর পেছনে। এখানে সেগুলো তুলে ধরার দরকার নেই। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, বসনীয়দের শোচনীয় অবস্থা নিয়ে তাদের (যুক্তরাষ্ট্র) তেমন কোনো মাথাব্যথা আদতেই ছিল না। 'আফগানি'রা চেচনিয়াতেও রুশদের বিরুদ্ধে লড়েছে। খুব সম্ভবত মস্কোসহ রুশ ভূখণ্ডের অন্যান্য স্থানে সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে এরা জড়িত। বিন লাদেন এবং তার আফগানি বন্ধুরা তখনই কেবল যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল যখন তারা দেখল মার্কিনিরা সৌদি আরবে স্থায়ী ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। লাদেনের দৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্র ছিল রুশদের আফগানিস্তান দখলের বিরোধী পক্ষ। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটার গুরুত্ব অনেক বেশী। কেননা ইসলামের পবিত্র স্থানগুলোর হেফাজতকারী হিসেবে সৌদি আরবের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

বিন লাদেন সেখানকার নিপীড়ক আর দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদের ঘোর বিরোধী। এসব শাসককে তিনি 'ইসলাম পরিপন্থী' বলে মনে করেন। সৌদি আরবের শাসকগোষ্ঠী এদেরই দলে, যেটি কিনা তালেবানের পর দুনিয়ার সবচেয়ে কট্টর মৌলবাদী শাসকগোষ্ঠী। আর গোড়া থেকেই এরা যুক্তরাষ্ট্রের খুব কাছের মিত্র। ওই শাসকগোষ্ঠীকে বিন লাদেন ঘৃণা করেন। আর যুক্তরাষ্ট্রকে ঘৃণা করেন সে ওসব শাসকগোষ্ঠীকে অকাতরে

www.pathagar.com

সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে বলে। ইসরাইলের বর্বর দখলদারিত্বের পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে চলা মার্কিন সমর্থন ও ওই অঞ্চলের অন্য অনেকের মতো তাকেও যারপরনাই ক্ষেপিয়ে তুলল। ৩৫ বছর ধরে এটা চলছে। গণহত্যা, বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকা নির্মম আর সর্বনাশা দখলদারিত্ব, নিত্যদিন ফিলিস্তিনিদের লাঞ্ছনার শিকার হওয়া, অধিকৃত অঞ্চলকে ভাগ ভাগ করে পুরো সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য ইহুদি বসতির বহর ক্রমশ বাড়িয়ে চলা, জেনেভা সনদকে বুড়ো আঙুল দেখানো, সেই সঙ্গে আরো যে সব কর্মকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া বিশ্বের সর্বত্রই অপরাধ বলে স্বীকৃত-সবই সমানে চালিয়ে যাওয়া। ওয়াশিংটন এ জাতীয় সকল কুকর্মের পক্ষে ঠাণ্ডা মাথায় কূটনৈতিক, সামরিক আর অর্থনৈতকি মদদ যুগিয়ে গেছে। এসব কিছুর জন্য যুক্তরাষ্ট্রই মূলত দায়ী। ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মনে কষ্টের অনুভূতিটা অভিন্ন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল (১৪ সেপ্টেম্বর) উপসাগর এলাকার ধনাঢ্য আর হোমরা-চোমরা লোকদের মধ্যে চালানো এক জনমত জরিপের ফল প্রকাশ করে। এদের মধ্যে ছিলেন ব্যাংকার, পেশাজীবী এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এমন সব ব্যবসায়ী। সবার প্রায় একই মত: ইসরাইলের অপরাধ আর যাবতীয় কুকর্মের পক্ষে জানবাজি মার্কিন সমর্থন অন্যদের মতো লাদেনও মেনে নিতে পারেননি।

পুরো একটা দশক ধরে ইরাকের বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা চলছে লাগাতার। এসব হামলায় পুরোটা দেশ হয়ে উঠেছে ধ্বংসস্তূপ। খুন হয়েছে লাখো লাখো মানুষ। অন্যদিকে সাদ্দামের শক্তি ভিত্ হয়েছে আরো মজবুত। বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের পুরোটা সময়জুড়ে সে তো ছিল যুক্তরাষ্ট্রে আর ব্রিটেনের আশকারা পাওয়া মিত্র। সাদ্দাম কী না করেছে, বিষাক্ত গ্যাস হামলা চালিয়েছে কুর্দিদের ওপর। এসব বাস্তবতাকে পশ্চিমারা যতই ভুলে থাকার ভান করুক, ওই অঞ্চলের মানুষের তা বিলকুল মনে আছে। এই মার্কিনি নীতির প্রতি ধিক্কার। যে যুক্তরাষ্ট্র কিনা বছরের পর বছর ধরে সমস্যা কূটনৈতিক সমাধানের অনুকূলে আন্তর্জাতিক সমাজের ঐকমত্যের সকল রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। অন্যদিকে ইরাকের বেসামরিক সমাজটাকে ছারখার করে দিয়েছে, পুরো এলাকাটায় নির্মম আর উৎপীড়ক অগণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে ঢালাও মদদ যুগিয়ে এসেছে, উৎপীড়ক শাসকদের 'নির্লজ্জ আশকারা দিয়ে' অর্থনৈতিক উন্নয়নের সব রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। জনগণের বড় অংশটা দারিদ্র্য আর অত্যাচারে জর্জরিত। এদের মনে ক্ষোভের আগুনটা আরো গনগনে। এসব অন্যায়-অবিচারের কারণে জন্ম নেওয়া হতাশা আর ক্রোধের বশবর্তী হয়েই এরা আত্মঘাতী বোমা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসব ব্যাপার নিয়ে যারা মাথা ঘামান তারা সবাই ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারবেন।

যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দুনিয়ার বেশিরভাগ দেশই স্বস্তিদায়ক একটা গল্প দাঁড় করাতে চায়। নিউইয়র্ক টাইমসের (১৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যা) থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সেখানে লেখা হয়েছে, 'স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা, সমৃদ্ধি, ধর্মীয় বহুত্ববাদ এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের মতো যেসব মূল্যবোধকে পশ্চিমা দুনিয়া লালন করে এসেছে সেসবের প্রতি' প্রচণ্ড ঘৃণাবোধে তাড়িত হয়েই দুর্বৃত্তরা এই ভয়াবহ অপকর্ম করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অতীত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এর কোনো যোগসূত্র আদতেই নেই। অতএব এসব ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। (সার্জ শমোমান)

এটা হচ্ছে স্বস্তিদায়ক চিত্র। আর এ ব্যাপারে এদের গড়পড়তা অবস্থানটা কী, ইতিহাস

www.pathagar.com

ঘাঁটলে তা আলবৎ আঁচ করা যাবে। বলতে কি, এটা হচ্ছে মূল্যবোধের ব্যাপার। আমরা সবাই যা জানি, এরা ঠিক তার উল্টো ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির। তার ওপর নিজের পক্ষে সাফাই গাওয়া আর ক্ষমতার পক্ষে গদগদ সমর্থনের বেলায় তো এদের জুড়ি মেলাই ভার।

'এই ধারণাটা ব্যাপকভাবে চালু যে, বিন লাদেন এবং তার মতো অন্যরা মুসলিম দেশগুলোর ওপর বড় ধরনের হামলা চালানোর জন্য মুখিয়ে আছে। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকল ধর্মান্ধ এক জোট হতে চলেছে। (জেনকিন্সসহ অন্য অনেকেই এমন ধারণা পোষণ করেন।) এ ধারণাটাও কম-বেশি চালু হয়েছে বাজারে। উভয় পক্ষেই সবচেয়ে কঠোর আর সবচেয়ে অশুভ নির্মম যে অংশটি আছে সন্ত্রাস-সহিংসতার ক্রমবিস্তারে এরাই সবসময় বগল বাজায়। ভূরি ভূরি নজিরের মধ্যে একটা বাস্তব নজির বলকান অঞ্চলের সাম্প্রতিক ইতিহাসের দিকে নজর দিলেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

অভ্যন্তরীণ মার্কিন নীতি এবং নিজেদের ব্যাপারে মার্কিনিদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর এসবের প্রভাবটা কেমন হবে ?

এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে তার পলিসি ঘোষণা করেছে। দুনিয়ার সামনে এখন দুটো মাত্র পথ খোলা : 'হয় আমাদের দলে নাম লেখাও, না হয় অনিবার্য মৃত্যু আর তাণ্ডবের মোকাবিলা করো।' যে কোন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের ওপর ইচ্ছেমতো হামলার সার্বিক ক্ষমতাও প্রেসিডেন্টকে দিয়েছে কংগ্রেস। অর্থাৎ মার্কিন নীতিটাও হলো এই যে, যারা এদের সমর্থন করবে তারা সবাই বদমায়েশের হাড্ডি। ওদেরকে জিজ্ঞেস করুন, নিকারাগুয়ায় অবৈধ শক্তি প্রয়োগ বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের নির্দেশ যুক্তরাষ্ট্র অমান্য করার পর নিকারাগুয়াও যদি একই পদক্ষেপ নিত সেক্ষেত্রে ওরা কী করত ? মনে রাখতে হবে প্রচার মাধ্যম আর অভিজাত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিশেষ ধরনের এজেন্ডা থাকে। আর সেটা আমরা ভালো করেই জানি।

হামলার প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নেওয়ার পর সবার মনে আশঙ্কা দেখা দিলো: এর জবাবে যুক্তরাষ্ট্র কী করবে? আপনিও কি ভয় পেয়েছিলেন?

যে কোনো সুস্থ মানুষের মনেই এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে আতঙ্ক জাগাই স্বাভাবিক। আর সে প্রতিক্রিয়া তো জানাই গেছে। সন্ত্রাস আর সহিংসতার ব্যাপক বিস্তার ঘটার সম্ভাবনা খুবই বেশি। কিন্তু এক্ষেত্রে সংঘাত-সহিংসতা ছড়াবে আরো ব্যাপক, সর্বব্যাপী আকারে।

যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে পাকিস্তানকে বলে দিয়েছে, সব খাদ্য ও অন্যান্য সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে। অথচ এই সরবরাহই তো আফগানিস্তানের অন্তত কিছু মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। দাবিটা যদি মানা হয় তাহলে সন্ত্রাসের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই-এমন নিরীহ লাখো লাখো মানুষকে নির্ঘাত মারা পড়তে হবে। আমি আবারও বলব ঃ যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে বলেছে লাখো লাখো মানুষ মেরে ফেলতে। অথচ এই মানুষগুলোই তালেবানি নির্মমতার সবচেয়ে বড় শিকার। প্রতিশোধ নাও ভালো কথা, কিন্তু সেটা ওই মানুষগুলোর ওপর কেন ? মার্কিন জনগণের যদি সামান্যতম ধারণা থাকত যে, তাদের নাম নিয়ে কী কাণ্ডটাই না করা হচ্ছে, তাহলে তারা আতঙ্কে শিউরে উঠত। এই যখন অবস্থা তখন এমন এক বিনাশী যুদ্ধের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে পারি না। এটা মানব

www.pathagar.com

সমাজের একটা বড় অংশের জন্য ভয়াবহ পরিণাম বয়ে আনবে।

যুক্তরাষ্ট্র যদি আফগানদের ওপর হামলা চালায় তাহলে বিরূপ ফলই ফলবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা। এতে করে আরো বেশি বেশি মানুষ লাদেনের সমর্থনে নাম লেখাবে। আর যদি তাকে মেরে ফেলা সম্ভব হয়, তাতেও কোনো ইতরবিশেষ হবে না। পুরো মুসলিম বিশ্বে ক্যাসেটে তার কণ্ঠ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে আর লোকে তাকে দেবে শহীদের মর্যাদা। স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ২০ বছর আগে লেবাননে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে একটা ট্রাক নিয়ে ঢুকে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানো হয়েছিল। আর তাতেই দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিধর মার্কিন বাহিনীকে লেজ গুঁটিয়ে পালাতে হয়েছিল। এ ধরনের হামলা চালানোর সুযোগের কি আর শেষ আছে! আত্মঘাতী হামলা মোকাবিলা করা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়!

১১ সেপ্টেম্বরের পর এই পৃথিবী কখনোই আর সেই পৃথিবী থাকবে না। আপনি কি তেমনটাই মনে করেন ?

মঙ্গলবার যে ভয়াবহ হামলাটা হলো সেটা একদমই নতুন। মাত্রা ও ধরনের দিক থেকেই শুধু নয়, বরং লক্ষ্যের দিক থেকেও অভিনব। আর যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় ১৮১২ সালের যুদ্ধের পর তার মূল ভূখণ্ডে হামলার ঘটনা এটাই প্রথম। এর আগে এর উপনিবেশগুলোর ওপর হামলা হলেও মূল ভূখণ্ডের ওপর হামলা আর কখনোই হয়নি। উপনিবেশের পুরো সময়টায় যুক্তরাষ্ট্র আদিবাসীদের মেরে সাবাড় করেছে, মেক্সিকোর অর্ধেকটা দখল করে নিয়েছে, আশপাশের অঞ্চলজুড়ে ভয়াবহ সহিংস হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটিয়েছে, হাওয়াই এবং ফিলিপাইন দখল করেছে (লাখ লাখ ফিলিপিনোকে হত্যার মধ্যদিয়ে)।

আর বিশেষ করে গত আধা শতাব্দীজুড়ে বাকি দুনিয়ায় শক্তি প্রয়োগের ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে। কত মানুষ যে এর অসহায় শিকার হয়েছে তার লেখাজোখা নেই। এবারই প্রথম বন্দুকের নলের মুখ ঘুরে গেছে অন্যদিকে। আর ইউরোপের ব্যাপারটা আরো নাটকীয়। ইউরোপও ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছে। তবে সেগুলো ছিল অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ। অন্যদিকে ইউরোপীয়রা বিশ্বের বেশিরভাগ অংশ দখল করেছে চরম নৃশংসতা আর পাশবিকতার জোরে। যাদের ওপর সে এত অবিচার-নির্যাতন চালিয়েছে তাদের তরফ থেকে সে আক্রান্ত হয়নি। বিরল ব্যতিক্রম অবশ্য আছে (যেমন ইংল্যান্ডে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি)। তাই মার্কিনিদের সাহায্যে ন্যাটোর একাট্টা হওয়ার ব্যাপারটা তো খুবই স্বাভাবিক। শত শত বছরের ঔপনিবেশিক সহিংসতা বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক সংস্কৃতির ওপর রেখে গেছে ব্যাপক প্রভাব।

এটা বলাই যথার্থ যে, বিশ্ব ইতিহাসে এ এক অভিনব ঘটনা। নৃশংসতার ব্যাপকতার জন্যই নয়, বরং লক্ষ্যের দিক থেকেও। এখন পশ্চিমা দুনিয়া কী করে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিত্তশালী আর ক্ষমতাগর্বী দেশগুলো যদি শত শত বছরের চিরাচরিত পথে চরম সহিংস পথে এগোয়, তাহলে সহিংসতার ব্যাপক বিস্তার ঘটবে। এর দীর্ঘমেয়াদী ফলও হবে বিভীষিকাময়। তবে তা এমন নয় যে সেটা ঘটবেই ঘটবে। অনেক বেশি মুক্ত আর গণতান্ত্রিক সমাজের সচেতন মানুষেরা চাইলে রাজনৈতিক গতিমুখকে আরো মানবিক ও সম্মানজনক পথে ঘুরিয়ে দিতে পারেন। ❑

অক্টোবর '০১

www.pathagar.com

আত্মরক্ষার জন্মগত অধিকারে নিরীহ মানুষকে বোমা মেরে হত্যার স্থান নেই

ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া

যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগন বিল্ডিং সন্ত্রাসীদের আত্মঘাতী বোমা হামলার ধ্বংসের বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্ব বিবেক ক্ষোভ, ঘৃণা ও প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে। বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগন বিল্ডিং ধ্বংস করে নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করার কথা এ ঘটনা ঘটার পূর্বে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ঘটনার ভয়াবহতা দেখে সবাই হতবাক, বিস্মিত। সারা বিশ্বকে শত শতবার ধ্বংস করার আগ্নেয়াস্ত্রের মালিক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে কি ক্ষমতাবলে এ আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে এ প্রশ্ন সকলের।

যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্র এ হামলার মূল হোতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে আলোচিত ব্যক্তিত্ব ওসামা বিন লাদেনকে। প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশ ওয়াশিংটন ডিসিতে পেন্টাগন সদর দপ্তর পরিদর্শন করে বলেন, "জীবিত অথবা মৃত যাই হোক ওসামা বিন লাদেনকে আমেরিকা চায়।" যুক্তরাষ্ট্র ১১ সেপ্টেম্বর বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগন বিল্ডিং ধ্বংসের জন্য ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের নিকট লাদেনকে আমেরিকার নিকট হস্তান্তরের দাবী জানায়। আফগানিস্তানের তালেবান সরকার প্রধান মোল্লা ওমর যুক্তরাষ্ট্রের হামলার জন্য ওসামা বিন লাদেন দায়ী এ প্রমাণ ব্যতীত লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানান। ১১ সেপ্টেম্বর-এর সন্ত্রাসী হামলার জন্য লাদেনই দায়ী এর প্রমাণ চাওয়া কি আন্তর্জাতিক আইন বহির্ভূত ? এখানে উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের কোন প্রস্তাব অনুসারে ওসামা বিন লাদেনকে তাদের নিকট হস্তান্তরের দাবী উত্থাপন করেনি যুক্তরাষ্ট্র। এমন কি জাতিসংঘের কোন অঙ্গ-সংগঠনও ওসামা বিন লাদেনকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের বিচারের জন্য তাদের নিকট হস্তান্তরের দাবী করেনি। যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের তালেবান শাসকদের নিকট ওসামা বিন লাদেন যে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার জন্য দায়ী তার প্রমাণ না দিয়েই ওসামা বিন লাদেনকে তাদের নিকট হস্তান্তরের দাবী করে।

International Convenient on civil and political rights যা

www.pathagar.com

জাতিসংঘের ১৯৬৬ সালে ২২০০ প্রস্তাবে গৃহীত হয়েছে তার ১৪(২) ধারায় বলা হয়েছে "Everyone charge with criminal offence shall have right to be presumed innocent proved guilty according to law."

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ সকল সভ্য দেশই কোন অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করার ব্যাপারে উপরে উল্লেখিত আইন, নিয়ম ও রীতিনীতি অনুসরণ করে। ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বিশেষ করে ১১ সেপ্টেম্বরের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগন বিল্ডিং ধ্বংসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে অভিযোগ উত্থাপন করেছে তার নিজস্ব গতিতে প্রবাহিত হতে দেওয়াই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। অভিযোগকারী অভিযোগের যথার্থ প্রমাণাদি উপযুক্ত আদালতে প্রদান করার পর আদালতই নির্ধারণ করবে অভিযুক্ত ব্যক্তি আইন মোতাবেক দোষী কিনা। অভিযোগ যতই ভয়ংকর, ভয়াবহ ও অমানবিক হোক না কেন যথোপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত অভিযুক্তকে সাজা দেবার কোন বিধান সভ্যতায়, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন পরিপন্থী। জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার সাধারণত আন্তর্জাতিক আদালতে অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধাপরাধ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসসহ সকল অপরাধই এ যাবতকাল আন্তর্জাতিক আদালতেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক আদালতেই এসব অপরাধের বিচারের বিধান রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে সোফা চুক্তির আওতায় যেসব দেশে তাদের সেনা মোতয়েন করেছে সেসব দেশে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী কোন অপরাধ করলে তার বিচার যুক্তরাষ্ট্রের আইন মোতাবেক যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে। যে দেশের বিরুদ্ধে বা যে দেশের নাগরিক-এর বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হল সে দেশের আইন মোতাবেক বিচার করার অধিকার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নেই। যুক্তরাষ্ট্রের এ জাতীয় ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক আইনে বৈধ কিনা তা বিচার করার ক্ষমতা বা অধিকার কারো নেই। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে যুক্তরাষ্ট্র অপরাধীকে পাকড়াও করে নিজেদের আইনের আওতায় বিচার করেন। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সে ক্ষমতা রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগন বিল্ডিং ধ্বংসকারী আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ওসামা বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর না করার জন্যই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র দিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে। প্রথমে প্রেসিডেন্ট বুশ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করলেও ক্রুসেডের মর্মার্থ উপলব্ধি করে এখন ক্রুসেড শব্দ ব্যবহার না করেও আফগানিস্তানে নিরপরাধ নিরীহ মুসলিম নর-নারী ও শিশু হত্যা করছে নির্বিবাদে। তাদের হামলার হাত থেকে আন্তর্জাতিক রেডক্রসও রেহাই পাচ্ছে না।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আলোচনায় সন্ত্রাস, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছে বিশ্ব সংস্থা 'জাতিসংঘ'। কিন্তু জাতিসংঘ সন্ত্রাস বা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কোন সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা বের করতে পারেনি।

স্বাধীনতা যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ বা গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামকে কেউ কেউ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে চিহ্নিত করলেও এ জাতীয় সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে জড়িতরা তাকে স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেই অভিহিত করেছে। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে

www.pathagar.com

জাতিসংঘের বহু নবাগত সদস্য তাদের পবিত্র স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং পরবর্তীতে বিশ্ব সংস্থার সদস্য পদও লাভ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে জাতিসংঘ সনদের ৫১ ধারায় স্বীকৃত আত্মরক্ষার অধিকার বলে আমেরিকায় ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আফগানিস্তানে সামরিক হামলা শুরু করেছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত তার ভাষায় অপরাধী সন্ত্রাসী ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেয়ার জন্য আফগানিস্তানকে Abettor অভিহিত করে আফগানিস্তান আক্রমণের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। অপরাধীর দোষ-প্রমাণের পূর্বে Abettor বিচার কিভাবে করছেন তা বোধগম্য নয়। এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘ-এর সনদের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। জাতিসংঘ সনদের ৫১ ধারায় বলা হয়েছে- "Nothing in the present charter shall impair the present right to individual or collective self-defence of an armed attack occurs against a member of United Nations until security council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members is the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the security council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the security council under the present charter to take at any time such action as it deem necessary in order to maintain or restore international peace and security."

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সশস্ত্র আক্রান্ত রাষ্ট্র ৫১ ধারায় জন্মগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং চীন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন আফগানিস্তান আক্রমণের পূর্বে কেন নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি উত্থাপন করেননি তা বোধগম্য নয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ না করে একটি দরিদ্র, দুর্বল, যুদ্ধ ও অন্তর্কলহে ক্ষত-বিক্ষত একটি দেশকে আক্রমণ করে সে দেশের নিরপরাধ, দরিদ্র শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ অসহায় মানুষকে হত্যা করছে তা কি নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনারও কোন সুযোগ নেই। নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা ব্যতিরেকে এবং নিরাপত্তা পরিষদকে সংযুক্ত না করে আফগানিস্তান আক্রমণ করে নিরাপত্তা পরিষদের বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে অনাস্থা ও অবিশ্বাসের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ। নিরাপত্তা পরিষদকে এভাবে অকার্যকর করে বিশ্বশান্তি রক্ষায় নিরাপত্তা পরিষদ বা জাতিসংঘের ক্ষমতাকেই সরাসরি চ্যালেঞ্জ করলেন যুক্তরাষ্ট্র। এমনকি সম্প্রতি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান নিজে কেন এ ব্যাপারে কোন অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন তা বোধগম্য নয়। বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি নিরাপত্তা পরিষদের ধার না ধারলে বাস্তবে কিছুই আসে যায় না।

www.pathagar.com

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রই সবচেয়ে বেশী অর্থ প্রাদান করে থাকেন জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে এবং মুক্ত বিশ্বের নেতা হিসেবে জাতিংসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা বিশ্ববাসী অবগত। আফগানিস্তান আক্রমণের পর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আক্রমণকে বৈধ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করে নিরাপত্তা পরিষদের শক্তিশালী সদস্য যুক্তরাষ্ট্র এটাই প্রমাণ করল নিরাপত্তা পরিষদ স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী নয়।

যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান আক্রমণের পূর্বে সমগ্র ব্যাপারটি নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের নিকট বিষয়টি উত্থাপন না করে নিরাপত্তা পরিষদকেই উপেক্ষা করলেন। নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্যসহ সমগ্র বিশ্ব ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম সদস্য চীন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম সদস্য চীন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অধিকতর শ্রেয় হতো বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য পৃথিবীর হতদরিদ্র, অনগ্রসর বহিঃশত্রু ও আত্মঘাতী সংঘর্ষে ক্ষত-বিক্ষত আফগানের বিরুদ্ধে বিমান হামলা চালিয়ে শত শত নিরপরাধ শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ ও অসহায় নাগরিকদের হতাহত করছে। এসব নিরাপরাধ শিশু-মহিলা কোন অবস্থাতেই সন্ত্রাসে বা তালেবান বা ওসামা বিন লাদেনের কোন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নয়। অথচ তাদের জীবনই কেড়ে নিয়েছে আমেরিকার নির্দয় বোমা হামলা। আত্মরক্ষার জন্মগত অধিকার কি যুক্তরাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ/নিরপরাধ অসহায় দুর্বল মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়ার অধিকার দিয়েছে? নিরপরাধ মানুষের হত্যার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, "এটা একটা যুদ্ধ।" যুদ্ধে লক্ষভ্রষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই নিরপরাধ শিশু ও মহিলা হত্যাকে তারা অপরাধ মনে করছে না। কিন্তু এসব অসহায় শিশু ও মহিলাদের কি জাতিসংঘের সনদের ৫১ ধারায় স্বীকৃত আত্মরক্ষার অধিকারের কথা কি জাতিসংঘ ভেবেছে? প্যালেস্টাইনের জনগণের কি আত্মরক্ষাসহ অন্য কোন অধিকার প্রয়োগের সুযোগ আছে? তাই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র যুক্তরাজ্য ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার প্রতিশোধ নেবার জন্য পৃথিবীর সবচাইতে দরিদ্র, দুর্বল, অনগ্রসর এবং দুই যুগেরও বেশী সময় ধরে যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত আফগানিস্তানে আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে আক্রমণের পর ওসামা বিন লাদেন বা তালেবান সরকার খোদ আমেরিকারই সৃষ্টি এ কথা অবান্তর বলে বিবেচিত হলেও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি স্বাধীনতার ও মুক্তচিন্তার ধারক ও বাহকের দাবীদার আমেরিকার কর্মকাণ্ড বিচার-বিশ্লেষণের জন্য আফগানিস্তানের বর্তমান ট্র্যাজেডির জন্য কে বা কারা দায়ী তা বিবেচনায় আনতে হবে। খ্যাতনামা লেখক অরুন্ধতী রায় লন্ডনের লিবারেল পত্রিকা 'দৈনিক দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখেছেন - "Some one recently said that if Osama Bin Laden didn't exist America would have had & invent him."

বর্তমান বিশ্বের জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থায় নিজেদের প্রভাব বলয় অক্ষত রাখবার জন্য কারো কারো ওসামা বিন লাদেন আবিষ্কার করার প্রয়োজন যে

www.pathagar.com

অস্বাভাবিক নয় তার প্রমাণ মিলছে বর্তমান সংকটে। একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বলেছেন, "Taliban's were conceived and engineered by the CIA Financed by the sandis and brilliantly executed by Pakistan's is"

সৌদি যুবরাজ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের আফগান আক্রমণের যথার্থতা বর্ণনা করে ১০ মিলিয়ন ডলারের একটা চেক দিয়েছিলেন নিউইয়র্কের মেয়রের নিকট। কিন্তু যুবরাজ আমেরিকার একচোখা ইসরাইলী নীতির যুক্তিকর্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলায় মেয়র তার চেক ফেরত দিয়েছেন। বিশ্ব মুসলিমদের এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ইসরাইলী নীতি সম্পর্কে কথা বলার অধিকার কারো নেই।

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের আফগান হামলার বিরুদ্ধে খোদ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার লোকের শান্তি মিছিল হয়েছে। নিরপরাধ, দরিদ্র, অসহায়, শিশুঘাতী, নরঘাতী বোমা হামলার বিরুদ্ধে এ শান্তি মিছিল ষাটের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত শান্তি মিছিলের কথাই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মানবতাবাদী মনীষী বার্ট্রার্ন্ড রাসেলের গণআদালতে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন ও তার সহযোগীদের প্রতীকী বিচারের কথা মানবতাবাদী সভ্য দুনিয়ার মানুষ এখনও ভোলেনি। আত্মরক্ষার নামে আফগানিস্তানের নিরপরাধ শিশু, মহিলা ও দুর্বল, বৃদ্ধ ও অসহায় মানুষের আধুনিক সমরাস্ত্রের নিষ্ঠুর আঘাতে হত্যার বিচারের জন্য কি কোন গণআদালত প্রতিষ্ঠিত হবে ? কোন মানবতাবাদী বিশ্ববরেণ্য নেতার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হবে ?

ইসলামে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, 'একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা সমগ্র মানব সমাজকে হত্যা করার সমান।' সত্যিকারের মুসলমান নিরপরাধ হত্যা করে না। ❑

অক্টোবর '০১

লেখক ঃ আইনজীবী, সাবেক মন্ত্রী।

www.pathagar.com

ইসলামের বিরুদ্ধে মতলবী প্রপাগান্ডা

শাহ্দাত হোসেন খান

আমাদের দেশে তালেবান শব্দটির সঙ্গে প্রত্যেকেই কম-বেশী পরিচিত। এক্ষেত্রে সংবাদপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে সব সংবাদপত্রের ভূমিকা যে এক তা নয়। কয়েকটি সংবাদপত্রের ভূমিকা হচ্ছে ইতিবাচক এবং বাদবাকীদের ভূমিকা নেতিবাচক। পত্র-পত্রিকার পাতা উল্টালে আমরা তালেবানদের সম্পর্কে কিছু না কিছু লেখা খুঁজে পাবই। এসব লেখালেখির মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ লেখা যত এর চেয়ে ঢের বেশী হচ্ছে বিকৃত। বামপন্থী ও ভারতঘেঁষা পত্রিকাগুলোর লেখা পড়লে পাঠকদের মনে তালেবানদের সম্পর্কে একটি কুৎসিত ধারণা জন্ম নেয়। এরকম ধারণা সৃষ্টি করার জন্যই এসব পত্র-পত্রিকা তালেবান ও ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা চালাচ্ছে।

ভারতের রিলায়েন্স গ্রুপের মালিকানাধীন ইস্কাটন রোড থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার বাড়াবাড়ি সকল সীমা-পরিসীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ পত্রিকায় জনৈক কলামিস্ট দীর্ঘদিন ধরে তালেবানদের বিরুদ্ধে কলম চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্ভবত তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন নতুবা তার ভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেছে। তবে তিনি হাল ছেড়ে দিলেও অন্যরা হাল ছেড়ে দেননি। ওই পত্রিকার প্রথম পাতায় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বড় বড় হেডলাইনে প্রায়ই তালেবানদের বিরুদ্ধে জনমতকে উস্কে দেয়ার লক্ষ্যে গাঁজাখোরি রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে। এমন রিপোর্টও ছাপা হয়েছে যে, বাংলাদেশে তালেবানদের ঘাঁটি আছে এবং এসব ঘাঁটিতে অস্ত্রশস্ত্রের মজুদ গড়ে তোলা হচ্ছে। সামরিক প্রশিক্ষণও দেয়া হচ্ছে। আওয়ামী লীগের বিগত শাসনামলে এ ধরনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তদানীন্তন সরকার এসব রিপোর্টকে বাইবেল জ্ঞান করেছে এবং সেভাবে অগ্রসর হয়েছে। বিগত ৫টি বছর এদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। দেশের বরেণ্য আলেমদেরকে রাজপথে লাঠিপেটা করা হয়েছে। টুপি-দাঁড়ি নিয়ে বিদ্রুপ করা হয়েছে। একটির পর একটি মিথ্যা মামলা দিয়ে আলেম-ওলামা ও মাদ্রাসা ছাত্রদের হয়রানি করা হয়েছে। কবি শামসুর রাহমানের ওপর কথিত হামলার ঘটনায় দেশ জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। দোষ চাপানো হয় আলেম-ওলামাদের ওপর। আবিষ্কার করা হয় তালেবান কানেকশন। এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে, বাংলাদেশে তালেবান

www.pathagar.com

স্টাইলে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পক্ষে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করার নীল নকশা প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং এ নীল নকশা বাস্তবায়নে কবি শামসুর রাহমানকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। আরো বলা হয় যে, আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হরকাতুল জিহাদ নামে একটি গুপ্ত সংগঠন নাশকতা চালাচ্ছে। আঙ্গুল তোলা হয় মাদ্রাসার প্রতি। হরকাতুল জিহাদের সঙ্গে কাল্পনিক সম্পর্কের অভিযোগে মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের পাইকারী গ্রেফতার করা শুরু হয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ১ বৈশাখের অনুষ্ঠানেও কথিত বোমা হামলার জন্য ইসলামী-শক্তিকে দায়ী করা হয়। এমন অপপ্রচার চলতে থাকে যে, মাদ্রাসার ছাত্র ও টুপি-দাঁড়িওয়ালা লোকমাত্রই মৌলবাদী তালেবান এবং তালেবান মানেই সন্ত্রাসী। ইসলামপ্রিয় লোকজনকে তালেবানী বলে বিদ্রুপ করা হতে থাকে। অপপ্রচারে অপপ্রচারে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা হয় যে, তালেবান শব্দটি একটি গালির মত শোনাতে থাকে। এ অবস্থার জের এখনো কাটেনি।

উপমহাদেশের অপর দু'টি দেশ পাকিস্তান ও ভারতের মুসলমানরা যেভাবে আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিদিনই উত্তাল তরঙ্গের মত ক্ষোভে ফেটে পড়ছে সেখানে বাংলাদেশে প্রতিবাদের মাত্রা খানিকটা ক্ষীণ। এ পার্থক্যের কারণ হচ্ছে, পাকিস্তান ও ভারতে ইসলাম অথবা তালেবানদের সমর্থনে রাস্তায় বের হলে যে যাই বলুক অন্তত বিক্ষোভকারীদের কেউ স্বাধীনতা বিরোধী, রাজাকার কিংবা নরঘাতক বলে গালি দেয় না। নিষ্ঠুর হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে ভারতীয় আধিপত্যবাদের তাঁবেদার গুটিকয়েক রাজনৈতিক দল এবং তাদের অনুসারী কয়েকটি পত্রিকা ইসলামের সপক্ষ শক্তি ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ঢালাওভাবে স্বাধীনতা বিরোধী ও রাজাকার বলে গালি দিচ্ছে। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। সাবেক সোভিয়েতপন্থী বাম দল এবং ভারতপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো তালেবানদের নামই শুনতে পারে না। আফগান মুজাহিদদের সম্পর্কেও তাদের একই মনোভাব ছিল। এরা বাংলাদেশে বসে আফগান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে গদা ঘুরিয়েছে এবং এদেশে আফগান স্টাইলে কমিউনিস্ট বিপ্লব ঘটাবার স্বপ্ন দেখেছে। তারা দেখতে পাচ্ছে যে, বাংলাদেশসহ কোথাও এদের পায়ের তলায় মাটি নেই। অন্যদিকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে লড়াইয়ে মুজাহিদরা বিজয়ী হয়েছে এবং মুজাহিদদের উত্তরসূরি তালেবানদের উত্থান ঘটেছে।

তালেবানদের উত্থানে ভারত হিমশিম খাচ্ছে। বাংলাদেশেও ভারতপন্থীদের ভিত কেঁপে উঠেছে। নাস্তিক্যবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষতারাদীরা বুঝতে পেরেছে যে, ইরান ও আফগানিস্তানের মত দেশগুলোতে ইসলামের বিজয়ের ঢেউ বাংলাদেশের ওপর দিয়েও একদিন গড়িয়ে যাবে। এ দুশ্চিন্তা এদেরকে গ্রাস করছে। তাই তারা টিকে থাকার জন্য ইসলামের ভাবমূর্তি বিনষ্টে অপপ্রচারে নেমেছে। ইসলামের দুশমনরা জানে যে, তালেবানরা শুধু আফগানিস্তানের একটি ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নাম নয়, এটি হচ্ছে ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী আন্দোলনের একটি উদাহরণ। তালেবানরা যদি টিকে থাকে তাহলে অন্যান্য মুসলিম দেশেও ইসলামী আন্দোলন বেগবান হবে এবং পর্যায়ক্রমে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হবে। প্রতিটি মুসলিম দেশ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হলে সেখানে পাশ্চাত্যের ভাবধারার পরিবর্তে ইসলামী ভাবধারা ও ইসলামী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হবে। পাশ্চাত্যের অনুকরণে 'খাও, দাও, ফুর্তি কর' স্টাইলের জীবনাদর্শের স্থলে সংযমপূর্ণ ও

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রিত জীবন ব্যবস্থা কায়েম হবে। সিনেমা, মদ ও জুয়া নিষিদ্ধ হবে। ব্যভিচার বন্ধ হবে। ঘুষ ও চুরির জন্য শাস্তি পেতে হবে। এজন্য বস্তুবাদী ও ভোগবাদীরা ইসলামের বিরোধিতা করছে। তালেবানরা তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় শরিয়া আইন চালু করেছে। সেখানে খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। ঘুষ, দুর্নীতি ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে কঠোর আইন হয়েছে। মদ ও অশ্লীলতা বন্ধ হয়েছে।

ভোগবাদীর আইনের পরিবর্তে আল কোরআনের আইনকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটাই তালেবানদের অপরাধ। এজন্য দুনিয়ার সকল কুফরী শক্তি তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কেউ তাদের বলছে মৌলবাদী, কেউ বলছে সন্ত্রাসী, আর কেউবা বলছে মধ্যযুগীয় কিন্তু কেউ তালেবানদের সমালোচনা করার আগে নিজেদের আত্মসমালোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছে না। তথাকথিত প্রগতিশীলরা একবারও চিন্তা করে না যে, আদর্শের দিক থেকে তারা মৃত। তাদের কাছে পারলৌকিক জীবনের কোন মূল্য নেই। পরকালে তারা বিশ্বাসও করে না। তারা বলে যে, জীবন একটাই। তাই তারা ভোগ-বিলাসকে জীবনের পরমার্থ বলে মনে করে। কিন্তু মুসলমান এধরনের জীবনে বিশ্বাস করে না। ইসলামে এধরনের জীবনের কোন ঠাঁই নেই। ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়। এটি হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। একজন মুসলমানের জীবনের আদর্শ হচ্ছে হুজুরে পাক (সঃ)। যখন কোন মুসলমান ইসলামী আদর্শ পরিত্যাগ করে অন্য কারো আদর্শ নিয়ে বাঁচতে চাইবে এবং সেই আদর্শকে উত্তম বলে বিবেচনা করবে তখন তার ঈমানের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে। আমাদের মধ্যে যারা ইসলামকে সহ্য করতে পারেন না এবং নিজের জন্য যতটুকু সুবিধা ততটুকু পর্যন্ত ইসলামের গণ্ডি বলে মনে করেন তারা কোথায় চলছেন এবং তারা কাকে অনুসরণ করছেন তা বোধহয় তারা নিজেরাই জানেন না।

তালেবানরা প্রায় সবাই মাদ্রাসার ছাত্র। তালেব শব্দের অর্থ হচ্ছে ছাত্র। তালেবান হচ্ছে বহুবচন। পাকিস্তানে আফগান শরণার্থী শিবিরের ছাত্ররা তালেবান আন্দোলনের সূচনা করেছে। ১৯৯৪ সালে প্রথম তাদের কথা মানুষ জানতে পারে। ১৯৯৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তারা আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখল করে নেয়। বর্তমানে তারা দেশের ৯০ শতাংশ ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করছে। এতটুকু সাফল্যের পরেও তারা বিশ্বের কাছে বার বার মার খাচ্ছে। দু'বার তাদের ওপর জাতিসংঘ অবরোধ আরোপ করেছে। জাতিসংঘে তারা তাদের প্রাপ্য আসন পায়নি। তাতেও তারা হাল ছেড়ে দেয়নি। কিন্তু এবার বিপদ একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে উঠেছে। ৭ অক্টোবর থেকে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণ করছে। এ অভিযান কবে শেষ হয় কেউ বলতে পারছে না। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বলেছেন যে, এ লড়াই হবে দীর্ঘস্থায়ী। সৌদি ভিন্নমতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেনকে হত্যার জন্য যুক্তরাষ্ট্র অপারেশন এনডিউরিং ফ্রীডম অভিযান চালাচ্ছে। এ যুদ্ধ দ্বিতীয় সপ্তাহ অতিক্রম করছে। এতে খোরাম নামে একটি গ্রামেই নিহত হয়েছে ২শ' লোক। যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে হামলাকে বলছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। গত ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও ওয়াশিংটনে পেন্টাগন ভবনে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিশোধ গ্রহণে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে এ হামলা চালাচ্ছে। আফগানিস্তানে মার্কিন অভিযানে বিশ্ব বিবেক স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। মার্কিন অভিযানের বৈধতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দেশে দেশে প্রতিবাদ চলছে। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমগুলো মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভকে খুবই খাটো করে দেখছে। বলছে যে, বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নাকি মার্কিন অভিযানের পক্ষে। কিন্তু কোথায় ? আজ পর্যন্ত ১০ জন লোকও পৃথিবীর কোনো দেশে মার্কিন একশনের পক্ষে রাস্তায় নামেনি। বিশ্ব আদালতে আমেরিকার জন্য এর চেয়ে বড় পরাজয় আর কি হতে পারে ? আমেরিকার গায়ে শক্তি আছে বলে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। কিন্তু সে জানে না যে, সকল ক্ষমতার উৎস হচ্ছেন আল্লাহ। যুগে যুগে আল্লাহ বহু জাতিকে ধন-দৌলত দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু কেউ আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা পায়নি। আমাদের চোখের সামনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেল। আফগানিস্তানে হামলার জন্যই সমাজতান্ত্রিক পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

আফগানিস্তানে মার্কিন বোমা পড়ছে। কিন্তু কই ? কেউ তো মার্কিনীদের মত আতংকিত নয় ? তালেবান যোদ্ধারা রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে। মার্কিন বিমানের বোমাবর্ষণ দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। এটাই তো তাদের জয়। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা কেউ মেনে নিচ্ছে না। আমেরিকা নিজেই সন্ত্রাসী। যে যেমন অন্যকে সে তাই ভাবে। আমেরিকা সন্ত্রাসী বলেই শান্তির সপক্ষ শক্তি তালেবান ও ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করছে। আমাদের দেশেও যারা আমেরিকার দোসর এবং পতিত পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের তাঁবেদার তারও ইসলামের পক্ষের শক্তিকে একই দৃষ্টিতে দেখছে। ❑

২৬ অক্টোবর '০১

লেখক : সাংবাদিক।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে শ্বেতহস্তীদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও বিশ্ব মুসলিমের কর্তব্য

আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

শির দেগা নেহি দেগা আমামা—নীতিতে বিশ্বাসী চিরস্বাধীন আফগান মুসলমানরা আশির দশকে অপরিমিত সাহস ও ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে লড়েছে উত্তরের শ্বেত-ভল্লুকদের সাথে। আল্লাহ্ তাআলার অফুরন্ত রহমত ও মদদে পুষ্ট হয়ে সে জিহাদে তারা অবিশ্বাস্যভাবে কেবল জয়ীই হননি, বিশাল সোভিয়েত সাম্রাজ্যকে তাসের ঘরের মত খান খান করে ভেঙ্গে দিয়েছেন। রাজনৈতিক স্বার্থে সেদিন মার্কিনীরা আফগান মুজাহিদদের মদদ জুগিয়ে উৎসাহিত করেছিল। ঐ সময়টাতেই সউদী ভিন্নমতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেন নিজেকে এক কুশলী সমরবিদ এবং মুসলিম বিশ্বের স্বার্থে আত্ম নিবেদিত পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল নাসের একদা বলেছিলেন, গভীর সমুদ্রের অতল তলে বিচরণশীল দু'টি মাছের মধ্যেও যদি কোন সংঘাত দেখা দেয় তাহলে বুঝতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কুচক্রী হাত তার পেছনে সক্রিয় রয়েছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় পরাশক্তিরূপে পরিকীর্তিত সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর মুসলিম বিশ্ব ও তার নেতারাই মার্কিনীদের চক্ষুশূল হয়ে উঠলেন। তারা সম্যক বুঝতে পারছিল এরপর আর সোভিয়েত রাশিয়া ফ্যাক্টর নয়, ফ্যাক্টর এখন মুসলিম বিশ্ব। এদের মধ্যে যে সচেতনতা, আত্মোপলব্ধি, সমঝোতা গড়ে উঠেছে তা আর অগ্রসর হতে দিলে আরব বিশ্বের তৈল সম্পদের অন্যায্য ভোগস্বত্বসহ অনেক কিছুই হারাতে হবে, তাই রেজা শাহ'র আমলে গড়ে ওঠা ইরানের অস্ত্রভাণ্ডার ও ঐশ্বর্যভাণ্ডার বিনষ্টের জন্য দুই মুসলিম ভ্রাতৃসম ও ঘনিষ্ঠতম রাষ্ট্র ইরাক-ইরানের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়া হলো। প্রায় এক দশক স্থায়ী এ লড়াই যাতে উভয় রাষ্ট্রের অস্ত্র ও সম্পদ ভাণ্ডার পুরোপুরি খতম না হওয়া পর্যন্ত চালু থাকে তার জন্য সর্বপ্রকার কলকাঠি নাড়া হলো এবং এতে তারা শতকরা আশিভাগ সাফল্যও লাভ করলো।

ভারতের পাশাপাশি পাকিস্তানও যখন আণবিক বোমার অধিকারী হচ্ছিলো তখন গোটা পাশ্চাত্য জগতে ইসলামী বোমার আতঙ্ক ও প্রচারণা জোরাদার হয়ে উঠলো। কিন্তু

www.pathagar.com

ভারতের আণবিক বোমা বা অন্যান্য মারণাস্ত্রগুলো কিন্তু হিন্দুবোমা বা রাম বোমা নামে কোথাও সমালোচিত হয়নি বা তাতে কারো মধ্যে কোন আতঙ্ক বা ত্রাসও দেখা দিল না। নানা ছলছুতায় ইরাক, লিবিয়া, পাকিস্তান, সুদান প্রভৃতি প্রতিশ্রুতিশীল মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে অবরুদ্ধ করার পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র জোরদার হয়ে উঠলো। ইরাক ও লিবিয়ায় এ অবরোধের যে অমানবিক ফল ফললো তাতে সমৃদ্ধিশালী বাগদাদ নগরীর অপূরণীয় ক্ষতি হলো। ইরাকের কুয়েত দখলের অজুহাত সৃষ্টি করে কুয়েত ও সউদী আরবে মার্কিন সেনারা রীতিমতো দীর্ঘস্থায়ী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে বসলো। জেনারেল সাদ্দাম হোসেনের যোগ্য নেতৃত্বে ইরাকের তা অনেকটা গা সওয়া হয়ে গেলেও সউদী আরব ও কুয়েতের অর্থনীতি আজো তার ধকল সামলিয়ে উঠতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তাই যে সউদী আরবে একদা হাজার রিয়ালের নিচে মজুরি ছিল না, সেখানে আজ আড়াইশ' তিনশ' রিয়ালের বেশী মজুরি প্রায় অনুপস্থিত।

বাগদাদ ও সাদ্দাম হোসেনকে দমনের অজুহাতে পবিত্র ভূমিতে নাপাক-নাসারা মার্কিন বাহিনীর পদচারণাকে মুসলিম বিশ্বের ধর্মপ্রাণ জনতা কোনমতেই মেনে নিতে পারেনি। বিশেষত সউদী ভিন্ন মতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেন এটাকে অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই একটা ইস্যুরূপে গ্রহণ করেন এবং গোটা বিশ্বব্যাপী উলামায়ে কেরাম ও মুসলিম জনতাকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার বলিষ্ঠ আহ্বান জানান।

উত্তরের শ্বেত-ভল্লুকদের সার্থক মোকাবিলার পরও আফগান নেতৃত্বে যে অন্তহীন বিরোধ ও আত্মকলহ দেখা দিল তাতেও যে মার্কিনীদের এবং তাদের এজেন্টদের কারসাজি সক্রিয় রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। অগত্যা ঐ দেশের তালিবান তথা ছাত্রশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং নেতৃত্বলোভী ও ষড়যন্ত্রের শিকার আফগান সমরনেতাদের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে এ তরুণরাই নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার, আব্দুর রশীদ দোস্তাম ও মাসুদ-এর মতো দক্ষ সমরবিদরাও আর এ তরুণশক্তির সম্মুখে তিষ্টাতে পারলেন না। মোল্লা ওমরের মতো যুবকরা তাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞাতার অভাবে কূটকৌশলের মাধ্যমে সকল সমস্যার শতকরা ১০০ ভাগ সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও উত্তরের মাত্র পাঁচ শতাংশ এলাকা ছাড়া গোটা আফগানিস্তানই যে তাদের দখলে রয়েছে — তা তো শত্রু-মিত্র সকলেরই জানা। আমাদের দেশের একটি মহল নিজেদের দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও আফগান মুক্তিযোদ্ধা তালিবানকে বড্ড ভয়ের চোখে ও আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। এটা অনেকটা বৃটিশদের নিজেদের দেশের বীরদের শ্রদ্ধার চোখে দেখা এবং আমাদের ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামী সাইয়েদ আহমদ বেরলভী প্রমুখকে তাদের অমিত বিক্রম ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য প্রশংসা করা সত্ত্বেও দস্যুরাহাজক বলে প্রচারে মত্ত। বৃটিশ-মার্কিন পরাশক্তিসমূহের স্বীকৃতির তোয়াক্কা মাত্র না করে তরুণ যুবক তালিবানরা যেভাবে এই একবিংশ শতাব্দীর প্রগতির চরম উৎকর্ষের যুগেও বিগত কয়েক বছর ধরে সাফল্যের সাথে দেশটি পরিচালিত করে গেছে তা' এক বিরাট বিস্ময়ের ব্যাপার।

আশি সালের দিকে ইরানের ইসলামী বিপ্লব ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ঘোষণা করে নানা প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে আজ পর্যন্ত শুধু টিকেই থাকেনি, মার্কিনী ও রুশরা পর্যন্ত এমন একটি প্রগতিশীল ও উন্নত রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব

www.pathagar.com

কামনা করছে। ইরানী বিপ্লব পাশ্চাত্যের সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা সাফল্যের সাথে করেছে এবং আজো করে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে আফগানিস্তানেও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের অন্তর্দাহ শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিপূর্বে নাইজিরিয়ার আবু বকর তাকাওয়া বালাওয়াকে গুপ্তঘাতকের মাধ্যমে হত্যা করিয়ে তারও পূর্বে বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমীন নেতা হাসানুল বান্নাকে শহীদ করিয়ে দিয়ে যেভাবে সে দেশগুলোতে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে অঙ্কুরেই গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, ইরান ও আফগানিস্তানে তা করা সম্ভবপর হয়নি। ইরানের ইসলামী বিপ্লব ছিল শিয়া মতবাদের ভিত্তিতে, যা গোটা মুসলিম বিশ্বের ৫ শতাংশের মাত্র প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। আফগানিস্তানের শতকরা ৯৯ জন অধিবাসী যেহেতু সুন্নী মুসলমান তাই এরা গোটা বিশ্বের ৯০/৯৫ শতাংশ মুসলমানের চোখে এক আদর্শ মুসলিম রাষ্ট্ররূপে প্রতিভাত হোক এটা ইঙ্গ-মার্কিন, রুশ সাম্রাজ্যবাদীরা কোন দিনই মেনে নিতে পারে না। বিগত ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য টাওয়ারে হামলার কল্পিত নায়ক ওসামা বিন লাদেনকে ধরার নামে আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বে ৪০টি রাষ্ট্রের যৌথ শক্তির নগ্ন হামলার কারণ এখানেই নিহিত।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ প্রথম ঘোষণায়ই মনের অজান্তে তাকে ক্রুসেড তথা খৃস্টীয় ধর্মযুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। আসলে তার মনের কথাটি এভাবে অজান্তে মুখ ফসকে বের হয়ে যায়। আর অন্তরে যা আছে তা তো মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়বেই। কেননা, আরবীতে প্রবাদ আছে প্রতিটি পাত্র থেকে তাই বেরোয় যা তার মধ্যে রয়েছে আর আল কুরআনে আছে- ওমা ফী সুদুরিল আকবর- আর যা তাদের অন্তরে রয়েছে তা আরো জঘন্য। পরবর্তীতে নিজের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়লো ভেবে বুশ তার সে কথা থেকে দূরে সরে আসেন। কিন্তু বলতে শুরু করেছেন তাদের এ ক্রুসেড ইসলামের বিরুদ্ধে নয়- কেবল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। সন্ত্রাসের সংজ্ঞা তাহলে কি ? এই যে সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র দিয়ে আঘাত হেনে আফগানিস্তানের নিরপরাধ, নিরীহ মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে, তাদের বাড়ী-ঘর মায় স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল পর্যন্ত ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে এটা কি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নয় ? পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ সন্ত্রাসের আর কোন নজির আছে কি ?

নির্বোধ মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের প্রবোধ দিয়ে প্রথমে বলা হয়েছিল, তাদের আক্রমণ কেবল সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর হবে, নিরীহ জনগণের উপর হবে না। কিন্তু ২০০০ পাউন্ডের প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা জনপদে ফেলে যখন তিন শতাধিক নিরীহ নাগরিককে মুহূর্তের মধ্যে হত্যা করা হলো, তখন কি এরূপ হামলার জন্য লজ্জিত হয়ে আক্রমণ বন্ধ করা হয়েছে ? এখনো কি হত্যাযজ্ঞের সে তাণ্ডব চলছে না ? মুসলিম নামধারী মুনাফিক সাংঘাতদের কি তাতে চৈতন্যোদয় হচ্ছে ? ওআইসি নামক মুসলিম রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে বিবৃতি এসেছে এরূপ নিরীহ নাগরিক হত্যার হামলা মেনে নেয়া হবে না ? না মেনে করেছেনটা কী ? বিশ্বের প্রায় ষাটটি মুসলিম রাষ্ট্র কি ঐ তথাকথিত জাতিসংঘ থেকে বেরিয়ে আসার হুমকি দিতে পেরেছেন - যা তার পূর্ববর্তী লীগ অব নেশন্সের মতো আল্লামা ইকবালের ভাষায় কাফন চোরদের সঙ্গে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র আজ বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ

www.pathagar.com

মিছিলে তথাকথিত ইঙ্গ-মার্কিন পাশ্চাত্য সভ্যতার ধজাধারীদের বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনি দেয়া হচ্ছে। সর্বত্র বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হচ্ছে। মসজিদে মসজিদে আল্লাহর আরশ কাঁপা দোয়া ও মাতম করা হচ্ছে। কিন্তু তাতেই কি আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় ?

জিহাদ- কালেমার বিপ্লবী বাণী উচ্চারণের পরপরই একজন মুসলমানকে প্রস্তুত থাকতে হবে যে, গায়রুল্লাহ্ তাগুতী শক্তিরা আর তাদেরকে শান্তিতে জীবন যাপন করতে দেবে না। কুরআনুল কারীমের অজস্র স্থানে এ বক্তব্যটি নানাভাবে রয়েছে। সূরায়ে বুরুজে আছে ঃ

ওমা নাকামূহুম ইল্লা আইইউমিনু বিল্লাহিল আযীযিল হাকীম -

-'একমাত্র সর্বশক্তিমান কুশলী আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অপরাধেই কাফেররা তাদেরকে অগ্নিগহ্বরে নিক্ষেপ করছিল।'

সুতরাং প্রত্যেকটি মুমিনকে সর্বদা জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহ্ তাআলার সুস্পষ্ট নির্দেশ ঃ

ও আইদ্দু লাইম মাসতাতা তুমমিনার রিবাতে ওয়াল খায়ল মা তুরহিবুনা বিহী আদুওয়াকুম

-তোমরা তোমাদের সাধ্যমত তাদের (কাফেরদের) মোকাবিলার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে-যদ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে এতদ্ব্যতীত যাদেরকে তোমরা জান না সেই অজ্ঞাত শত্রুদেরকে ভীতিগ্রস্ত করে তুলবে।' (৮ আনফাল-৬০)

আল্লাহ্ তাআলার সে স্পষ্ট নির্দেশকে মুসলিম জাতি ব্যাপকভাবে অমান্য করেছে তাই তারা বিশ্বের অনেক নামী-দামী স্থাপত্য কীর্তি স্থাপন করলেও তোমাদের ভীতিপ্রদ অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে ততটুকু মনোযোগী হয়নি। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর তাবৎ কাফের শক্তি আণবিক বোমাসহ তাবৎ ভীতিপ্রদ অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করেছে। পাকিস্তানের মতো বিশ্বের একটি প্রধান মুসলিম রাষ্ট্র কাফেরদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে যা-ও আণবিক বোমা নির্মাণ করলো সাথে সাথে বিশ্বের কাফের পরাশক্তিসমূহের চক্ষুশূলে পরিণত হয়ে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়ে গেল আর সে আণবিক বোমার নিয়ন্ত্রকও হয়ে গেল পারভেজ মোশাররফের মতো মার্কিনীদের এক ক্রীড়নক। সুতরাং আফগানিস্তানের দুই কোটি মুসলমানকে রক্ষার প্রয়োজনে তাতে তো ব্যবহৃত হওয়ার কোন দূরতম সম্ভাবনাও নেই, উপরন্তু ঐ জাতীয় ফাসিক মুসলমান রাষ্ট্র প্রধানরাই মার্কিনীদের সহায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আফগান মুসলমানদের দুর্গতি বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে !

ইঙ্গ-মার্কিনীদের প্রতিশোধ জ্বালা

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তিন তিনবার আফগানিস্তানে হামলা করে পর্যুদস্ত ও হেনস্তা হয়েছে। মার্কিনীরাও কোরিয়া ও ভিয়েতনামসহ বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ করে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে দেশে ফিরেছে। সাম্প্রতিক পেন্টাগনে ও বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে হামলার দ্বারা মার্কিনীদের বাগাড়ম্বর অত্যন্ত নগ্নভাবে অসার প্রতিপন্ন হয়েছে। তারা যে আসলে কাগুজে বাঘ এ কথাটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাদের আত্মমর্যাদায় নিদারুণ আঘাত

www.pathagar.com

লেগেছে। তাই মরিয়া হয়ে দরিদ্র আফগানিস্তানের মুসলমানদের জীবন ও তাদের জাতিসত্তা নিয়ে এক পাশবিক খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে। বিশ্বের তাবৎ মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধভাবে এ তাগুতী শক্তির মোকাবিলা করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা যেখানে ভীতিপ্রদ অস্ত্রশস্ত্রের মজুত গড়ে তুলে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের জোর তাগিদ দিয়েছেন, সেখানে আমরা কেবল দু'আ ও মোনাজাতের ক্রন্দনের মাধ্যমেই কর্তব্য সম্পাদন করতে তৎপর রয়েছি। এটাই আমাদের বর্তমান নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির অন্যতম কারণ। ইতিপূর্বে কাফের শক্তি সম্মিলিতভাবে মিসর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও ইরাকের উপর হামলা চালিয়েছে। গোটা মুসলিম বিশ্ব কেবল নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। লিবিয়া ও ইরাক আজো অবরোধের শিকার কিন্তু মুসলিম বিশ্ব দীর্ঘকাল ধরে নির্বিকার। এখন আফগানিস্তানের উপর তারা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। আগামীকাল কার পালা কে বলবে ? আল্লাহ্ আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে এসব তাগুতী শক্তির মোকাবিলা করার তৌফিক দিন! আমীন!!

কুনূতে নাযেলা

রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমান জাতির এরূপ জাতীয় দুর্দিনে কুনূতে নাযেলা নামক বিশেষ বদদু'আর বিধান দিয়েছেন। ফজরের নামাজের জামাতের শেষ রাকাতে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সশব্দে ইমাম দু'আর বাক্যগুলো উচ্চারণ করবেন আর মুসল্লীগণ আমীন, আমীন বলবেন। ফেকাহর কিতাবগুলোতে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। মুসলমানদের ঐক্য এবং কাফেরদের বিনাশ কামনায় এ দু'আ এ মুহূর্তেই প্রতিটি মসজিদে চালু করা দরকার। যে দু'আ শরীয়তে যেভাবে করার বিধান সেভাবেই তা বেশী কবুল হওয়ার আশা করা যায়। ❑

অক্টোবর '০১
লেখক ঃ প্রাবন্ধিক।

www.pathagar.com

ওয়ার্ল্ড টেরোরিজম ও আমরা

নূরুল ইসলাম

টেরোরিস্ট শব্দের বাংলা সন্ত্রাসী, যারা সন্ত্রাস তৈরী করে তাদেরকে টেরোরিস্ট বলা হয়। শব্দটি ইংরেজী হলেও এর সাথে পরিচিত পৃথিবীর সকল ভাষাভাষীর মানুষ। যারা লেখাপড়া জানেনা তারাও টেরোরিস্ট বলতে কি বোঝায় তা জানে, কারণ পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যে দেশে টেরোরিস্ট নেই। এমন কোন জাতি নেই যে জাতির কেউ না কেউ টেরোরিস্ট বা টেরোরের শিকার হয়নি। এইতো বিগত ৫ বছরে বাংলাদেশের সর্বত্র টেরোরিস্ট তৎপরতা প্রবল ছিল, বোমা ফোটানো থেকে শুরু করে এমন কোন অপরাধ নেই যা ঐ টেরোরিস্টদের শক্তির বাইরে ছিল। এদের হাতে কত মানুষ অকালে প্রাণ দিয়েছে, কত নারী ধর্ষিতা হয়েছে তার হিসেব একমাত্র দেশবাসীই ভালো জানেন। ঠিক তদ্রূপ পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই এই অপরাধ সংগঠিত হয়ে থাকে। আমেরিকার মত দেশেও টেরোরিস্ট ছিল এবং এখনো আছে। গর্ভপাত বিরোধী খৃস্টান গ্রুপটি, KKK -এর মত বর্ণবাদীরা কি টেরোরিস্ট নয়? জাপানের রেড আর্মীরা একদিন টেরোরিস্ট ছিল, আজ-কাল এদের কোন নাম শোনা যায় না। ইংল্যান্ডের বর্ণবাদীরা সময় সময় যা করে তাও টেরোর। আয়ারল্যান্ডের রিপাবলিকান আর্মীদেরতো কেউ টেরোরিস্ট বলে না, এরা কি বৃটিশের বিরুদ্ধে পুষ্প বর্ষণ করেছিল?

টোরোরিস্ট যে কোন ধর্মেরই হোক সে টেরোরিস্ট। কিন্তু যখন দেখি মুসলিম টেরোরিস্ট বলে অপবাদ তখনই দুঃখ হয় এবং আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করে মুসলমানরা টেরোরিস্ট নয়, তোমরাই টেরোরিস্টের জনক, তোমরাই কিছুসংখ্যক মুসলমানকে বাধ্য কর টেরোরিস্ট হতে। কেউ যদি কারো কাছে শক্তিতে পরাজিত হয় তখন অবশ্যই এমন পন্থা অবলম্বন করবে যাতে সে লোক ঐ শক্তিশালীকে সহজেই কাবু করতে পারে। এই তো কিছু দিন হল, মাইক টাইসন তার প্রতিদ্বন্দ্বী মুষ্টিযোদ্ধার গালে কামড় দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। নিয়ম-নীতিবিরুদ্ধ সকল কর্মকাণ্ডই সন্ত্রাসের অংশ। নিজ স্বার্থ রক্ষায় যে কোন পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার প্রতিটি মানুষের আছে কিন্তু ঐ পদক্ষেপটি যদি আরেকজন মানুষের ক্ষতির কারণ হয়, তাহলে এটা অন্যায় বলে প্রতিটি জাতি প্রতিটি ধর্ম প্রত্যেক দেশের আইনে স্বীকৃত। এই দূষণীয় কাজের জন্য শাস্তি প্রদানের বিধানও সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে। টেরোরিস্টরা নিঃসন্দেহে মারাত্মক অপরাধী।

www.pathagar.com

আমি পূর্বেই বলছি টেরোর কর্মকাণ্ড বিভিন্ন উদ্দেশ্যে টেরোরিস্টরা করে থাকে। কেউ মুক্তিপণ, কেউ কোন সরকার হতে কোন দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে, কেউ বা সবল শক্তিকে ঘায়েলের উদ্দেশ্যে করে থাকে। বিগত চার দশক ধরে বিশ্বে যতগুলো টেরোর সংগঠিত হয়েছে এর বর্ণনা দেয়ার অবকাশ এই লেখাতে নেই, তবে প্রসঙ্গক্রমে সময় সময় আলোচনা করা যাবে। ইতিহাসের জঘন্যতম টেরোরিস্ট এটাক্ট হলো ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে, ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে এবং ফিলেডেলফিয়ার নির্জন স্থানে। ১৯ জন মুসলমান নাকি এই সন্ত্রাসের জন্য দায়ী। তাদের প্রধান নাকি সৌদীর একজন ধনীর ছেলে। আমেরিকা কর্তৃক যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে ১৯ জন হাইজ্যাকারের বেলায় ৯৫ ভাগ সঠিক অভিযোগ বলে মনে হয়। তবে বিন লাদেন এই কাজের জন্য দায়ী বলে আমেরিকার অভিযোগটির সন্দেহ আছে।

ঘটনার পর একদিন বিন লাদেনের বক্তব্য একটি আরবী টিভিতে প্রকাশ হয়, তা সিএনএন অনুবাদসহ প্রকাশ করে। সেই বক্তব্যে বিন লাদেন বলেছিলেন, আমি তা করিনি বা করাইনি, তবে আমি খুবই খুশী এই কাজটির জন্য। যারা করেছে তাদেরকে আমি শ্রদ্ধাসহকারে সালাম জানাই। বলেই তিনি বললেন, আমাদের হুজুরের জন্মভূমি হতে তোমাদের সৈন্য নিয়ে গেলে এবং প্যালেস্টাইনীদের প্রতি ন্যায় বিচার করার জন্য প্রস্তুতি নিলে এসব হীনকর্মকাণ্ড ঘটবে না বলে আমি বিশ্বাস করি। বিন লাদেনের আরবী বক্তব্য যখন ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয় তখন সৈন্য প্রত্যাহার এবং প্যালেস্টাইন সংশ্লিষ্ট বাক্যগুলো বাদ পড়ে যায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের সাংবাদিকদের মুখ হতে। এখানেই শেষ নয়, গত ১১ অক্টোবর লেরী কিং লাইভে যখন পকিস্তানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং রাজনৈতিক নেতা ইমরান খানকে প্রশ্ন করা হল, তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে কি মনে করেন, তিনি এক সময়ে বলেছিলেন বিশ্ব মুসলিম আমেরিকার জনগণ বিরোধী নয়, তারা বিরোধিতা করে আমেরিকার ফরেন পলিসির; ইমরান খানের কথাটি শেষ হতে না হতেই স্যাটেলাইটে সমস্যা দেখা দিল, সাধারণ মানুষ এই স্যাটেলাইটে সমস্যার কারণ বুঝতে না পারলেও আমি বুঝেছি, আমেরিকান ফরেন পলিসির বর্ণনা জনাব ইমরান খানের মুখে তারা শুনতে চান না তাই সেটেলাইটে সমস্যা দেখা দেয়।

সেদিন একজন সৌদী প্রিন্স ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ধ্বংসস্তূপ দেখতে গিয়ে দশ মিলিয়ন ডলারের একটি চেক নিউইয়র্কের ইহুদী মেয়রের হাতে দেয়ার পর বক্তব্যে বলেছিলেন প্যালেস্টাইন প্রশ্নে আমেরিকার পলিসি পরিবর্তন করা উচিৎ। কয়েক ঘন্টা পর তার দেয়া চেকটি ইহুদী মেয়র ফেরত দিলেন। এই ঘটনা হতেই সহজে বোঝা যায় ইহুদীরাই আমেরিকার একমাত্র বন্ধু, অপরদিকে সৌদী প্রিন্স যার টাকায় নিউইয়র্ক স্টক মার্কেট চলছে সেই প্রিন্সের দেয়া ১০ মিলিয়ন ডলারের চেকটি ফেরত দেয়ায় কি ঐ প্রিন্স বুঝতে সক্ষম হয়েছেন এই আমেরিকার প্রশাসন যন্ত্রের পরিচালক কারা ? যত বিলিয়ন ডলারই আমেরিকায় আরবের প্রশাসক রাখুক না কেন, যত হাজার সৈন্যই হুজুর (দঃ)-এর জন্মভূমিতে রাখুক না কেন, ইহুদীর সাথে সম্পর্কচ্যুত তারা হবে না, খুব সম্ভব এই জন্য পবিত্র কোরআনে রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়েছেন-"ইহুদী খৃস্টানদের বন্ধু মনে কর না, তারা একে অন্যের বন্ধু হতে পারে, তোমাদের নয়"।

www.pathagar.com

আমেরিকার সাধারণ মানুষ আমাদের বন্ধু আমাদের ভাই। তারা যদি সঠিকভাবে জানতে পারতেন বিশ্বে আমেরিকার সাহায্যে কি ঘটছে তাহলে অবশ্য প্রতিবাদ করতেন। কিন্তু প্রশাসনের ইঙ্গিতে মিডিয়া গ্রুপ জনগণকে তা জানতে দেয় না যার কিছুটা আমি শুরুতে উল্লেখ করেছি। ১১ সেপ্টেম্বরের ৩/৪ হাজার মানব সন্তানের অকাল মৃত্যু যে এই সরকারের আমন্ত্রণ তা এদেশের ৮০ ভাগ মানুষ বুঝে না, যদিও তারা ১০০ ভাগ শিক্ষিত বলে দাবীদার।

ডাক্তার যখন কোন রোগী পরীক্ষা করেন, তার প্রথম কাজ হল রোগের উৎস কোথায় তা নির্ণয় করা, তার পর সেই উৎস বা উৎপত্তিস্থানে ওষুধ প্রয়োগ করে তা বিস্তারে আঘাত হানা। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্য দেশগুলোর রাজনীতিক কাণ্ডারীরা সব কিছুতে বিজ্ঞ হলেও টেরোরিস্ট ব্যাধিটির উৎপত্তি কোথায় তা জানতে চান না। তারা সবই বুঝেন কিন্তু তা এড়িয়ে চলেন। তা যে বুঝেন তার ছোট একটি প্রমাণ এখানে তুলে ধরছি। ১৯৭৭ সালে নিউইয়র্ক শহর ও তার আশেপাশে ইলেকট্রিসিটি ফেল করে পুরো এলাকাটা অন্ধকারে ভূতুড়ে হয়ে গেল, সেই সুযোগে শুরু হল দোকানপাট লুট, শত শত দোকানের কোটি কোটি ডলারের মালামাল উধাও হয়ে গেল। দু'হাজারের মত লুণ্ঠনকারীকে গ্রেফতার করা হলো। পরবর্তীতে নেতারা বললেন দেশে বেকারের সংখ্যা বেশী হওয়ায় এমনটি হয়েছে। উক্তিটি অপ্রিয় হলেও যে তা আংশিক সত্য তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হয়েছিল। লুটপাটের উৎপত্তি বেকারত্ব হলেও টেরোরিজমের উৎপত্তি কোথায় তা নির্ণয়ে পাশ্চাত্য নেতৃবর্গ একশ' ভাগ ব্যর্থ হন।

১১ সেপ্টেম্বর টেরোরিস্ট এটাক্টে ৩/৪ হাজার মানুষের প্রাণ গেলো, এরা সবাই বেকসুর তাতে সন্দেহ নেই, এদের জীবন দিয়ে কার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলো তা মূল্যায়ন করার সময় এসেছে। সে মূল্যায়ন সুসভ্য জাতির নেতৃস্থানীয়রা কখনো করবে না, করতে হবে ঐ দেশের জনগণ, সাধারণ মানুষকেই। বিশ্বের প্রতিটি দেশের অধিকাংশ মানুষই শান্তিপ্রিয়, তারা শান্তিতে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু তারা যাদের প্রশাসনে নিয়োগ দেন তারা রাজনীতির খেলা খেলতে সময় সময় জাতিকে এমন নাজুক পরিস্থিতিতে নিক্ষেপ করেন, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাটি এমনি একটি ঘটনা, কিন্তু দুর্ঘটনা নয়; যার শিকার হল কয়েক হাজার খেটে খাওয়া মানুষের প্রাণ, নিশ্চিহ্ন হল বিশ্বের উচ্চমত দু'টি ইমারত, যা নির্মাণে লেগেছিল শত শত মাস কিন্তু ধ্বংসে লাগলো না কয়েকটি মূহুর্ত। এক হতে দু'ঘন্টায় তা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। কিন্তু সেই ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করতে কত দিন লাগবে তা এখন দেখার বিষয়। কেউ বলেন বছর লাগবে, কেউ বলেন ৬ মাস লাগবে, এক মাসতো অতিক্রম করে ফেললো এখানো সে ধ্বংসস্তূপে আগুনের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, এখনও সহস্রাধিক মৃত দেহের কোন সন্ধান মেলেনি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের শক্তিশালী দেশ, সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর এই যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র সিংহ যার সাথে কারো তুলনা হয়না, সেই সিংহ যদি গায়ের জোরে হারামকে হালাল করে, অন্যায়কে ন্যায় করে, তাহলে জঙ্গলের শিয়াল-কুকুর কেমন করে রক্ষা পাবে! ঐ শিয়াল-কুকুরকেও তো তাদের মত বেঁচে থাকতে হবে। যখনই তাদের মত বেঁচে থাকার অধিকারটি হুমকির সম্মুখীন হয় তখন তারা অন্য পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। আমেরিকার মত সিংহের সাথে কেউ যুদ্ধ করে জয়ী হবে না কিন্তু আমেরিকাকে

www.pathagar.com

জব্দ করতে হবে যখন কোন ছোট জাতি এমনটি ভাবে তখন তাদের কাছে একটি পথই খোলা থাকে যা হলো অতর্কিত আক্রমণ। এই অতর্কিত আক্রমণের ফসল হল ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা, একে আমরা টেরোরিজম বলি। যখনই টেরোরিজম নেটওয়ার্কে পরিণত হয় তখনই আমরা ওয়ার্ল্ড টেরোরিজম বলে থাকি, আজ সারা বিশ্ব সেই ওয়ার্ল্ড টেরোরিজমের শিকার হয়েছে। আমেরিকা টেরোরিজম বন্ধ করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। অপরদিকে টেরোরিস্ট আরো টেরোরিজম চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। একটি মুসলিম দেশে আমেরিকার বোমা আক্রমণে বিশ্ব মুসলিম যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেছে। মুসলিম বিশ্ব হতে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় যে সহানুভূতি এদেশটি অর্জন করেছিল তা প্রায় বিলীন হতে চলেছে। বিশ্ব মুসলিম দিন দিন আমেরিকা বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। টেরোরিজম বন্ধ হওয়ার পরিবর্তে তা প্রবল আকারে ছড়িয়ে পড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

১১ সেপ্টেম্বরের পর আমেরিকানদের ধারণা ছিল মুসলিম মাত্রই টেরোরিস্ট তাই বেশ কিছু ঘটনা ঘটে যায়। একজন শিখকে মুসলমান মনে করে গুলি করে হত্যা করা হয়, কোন কোন মসজিদে আক্রমণসহ মহিলাদের মাথায় রুমাল দেখলে বিদ্রূপ করা, দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালাকে বিন লাদেন বলে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়া যখন তোড়জোড়ে শুরু হল তখন নেতাদের হুঁশ ফিরে এলো, ঘোষণা দিলেন, আমাদের যুদ্ধ টেরোরিস্টদের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। প্রেসিডেন্ট বুশ ওয়াশিংটনের একটি মসজিদে গিয়ে বোঝাতে চাইলেন এদেশে বসবাসকারী মুসলমানও আমাদের মত মানুষ, মুসলমান বলতে টেরোরিস্ট বোঝায় না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওকলাহামা ফেডারেল বিল্ডিং-এ বোমা ফাটানোর কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি সংবাদ রেডিও-টিভিতে প্রচার করা হল বোমা ফাটার কয়েক মিনিট পূর্বে নাকি ফেডারেল বিল্ডিং-এর আশপাশে দুজন আরবকে ঘোরা-ফেরা করতে দেখা গেছে, আরব বলতেই যে মুসলমান তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুরু হল বিভিন্ন মসজিদে হুমকি, ভাগ্যিস যদি আসল বোমা ফাটানোর নায়ক মেকভে ধরা না পড়তো তা হলে সেই বোমা ফোটার দায়টাও মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া হতো এবং আমরা আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলমানরা কোণঠাসা হয়ে পড়তাম, যেভাবে ১১ সেপ্টেম্বর ঘটনায় হয়েছি।

কে না জানে যুক্তরাষ্ট্র বহিরাগতের দেশ, বিশ্বের সকল জাতির সুযোগ-সন্ধানী এসেছেন এই দেশে, কেউ এসেছেন ৫শত বছর পূর্বে আর কেউ এসেছেন আজ, অদূরেও আসবেন বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার মোহে পড়ে। একদিন এই দেশ ও মাটিকে ভালবেসে ফেলেন আগন্তুক। আমরা মুসলমানরা এর ব্যতিক্রম নই, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মুসলমানরা ভাল বেসেছেন এই দেশ এই মাটি এবং এই মাটির মানুষকে। তাদের কাছে ভালবাসা ছাড়া দ্বিতীয় পথ খোলা নেই, কারণ তাদের সন্তানরা এ মাটিতে জন্ম গ্রহণ করেছে, পাঁচশ' বছর পূর্বে আগতদের সন্তান-সন্ততির যে অধিকার এই মাটিতে, আজকের জন্ম নেয়া মুসলমানদেরও সেই অধিকার। এই পৃথিবীর কোন দেশের আইনই তাদের অধিকার হতে বঞ্চিত করতে পারবে না। কিন্তু এই দেশের কিছুসংখ্যক মানুষ মনে করেন মুসলমানরাই তাদের শত্রু, কারণ তারা টেরোরিস্ট, এ রকম মনে করার পেছনেও কারণ আছে, যারা তা মনে করেন তারা এই দেশের প্রাচুর্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন। দুঃখ-কষ্ট কি তা

www.pathagar.com

তাদের জীবনে স্পর্শ করেনি। যখন কাজ করার করেন। তারা কাজ ছাড়া বাকী সময়টুকুতে ব্যস্ত থাকেন মদ এবং নারী নিয়ে, কাজ যারা করেন না তারা নেন ওয়েলফেয়ার সরকার হতে, তারাও সব সময় ব্যস্ত থাকেন আনন্দ-ফূর্তিতে। সুতরাং পৃথিবীতে কি ঘটছে তা জানার সময়টুকু তাদের নেই, এই মানুষগুলো জানবে এই কাজ মুসলিম টেরোরিস্টরা করেছে, ঐ কাজ মুসলিম টেরোরিস্টের কাজ, তাহলে তারাও মুসলমানদের উপর ক্ষেপে উঠবেই। এই ক্ষেপার জন্য নৈতিকতার দিক দিয়ে আমি তাদের দায়ী করবো কি ?

রোগের উৎপত্তি নির্ণয় করা যদি ডাক্তারের প্রাথমিক কাজ হয়, লুটপাট যদি বেকারত্বের কারণে করে থাকে তাহলে টেরোরিস্টের মত ঘৃণ্যতম কাজ কি কারণে সংগঠিত হয় তা কেন বিশ্ব নেতারা আবিষ্কার করতে পারেন না। আসলেতো এই নেতারা ভাল করেই জানেন টেরোরিস্টের জনক যে তারা, তাদের পলিসির ফসল হলো টেরোরিজম। তারা যদি বিশ্বে সকল মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার করতেন তাহলে টেরোরিস্টের জন্ম হতো না। আয়ারল্যান্ডের মানুষ কি বৃটিশ সরকার হতে ন্যায়বিচার পেয়েছিল, যদি পেতো তাহলে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির জন্ম হতো না, কাশ্মীরবাসীর নিয়ন্ত্রণাধিকার কি জাতিসংঘ দিতে পেরেছিল ? যদি দিতো তাহলে বিগত ৫০ বছরে লাখ লাখ মানুষের অকাল মৃত্যু হতো না। প্যালেস্টাইনীরাও ৫০ বছর ধরে গৃহহারা তাদের জামিতে ইহুদীরা উড়ে এসে জুড়ে বসলো। তাদের প্রতি ন্যায়বিচার না করে প্রত্যক্ষ সমর্থন দিলো বিশ্ব নেতারা ইসরাইলকে। দুর্বল প্যালেস্টাইনীর কাছে কি ছিলো ঐ শক্তির মোকাবেলা করার ? তাই মিউনিক অলিম্পিক ট্র্যাজেডির সূত্রপাত।

রাশিয়াকে বিতাড়িত করতে আফগানীদের সাহায্য করেছিল যারা আজ সেই আফগানী তাদের শত্রু। এমনটি কেন হল ? বিন লাদেন যখন আফগানে যুদ্ধ করেন তখন আমেরিকানরা কেন বলে নি এই টেরোরিস্ট তোমরা বাদ দাও, অন্যথায় আমার সাহায্য পাবে না। রাশিয়া বিদায় নিতে না নিতেই শুরু হল ইরাক-কুয়েত সমস্যা। ঐ সময়ের পূর্ব পর্যন্ত ইরাকের সাদ্দাম হোসেন ছিলেন আমেরিকার হাতিয়ার। তাকে দিয়ে ইরানের সাথে' যুদ্ধ লাগানোর মুরুব্বী ছিলো আমেরিকা। যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন প্রতি বছরে আর্থিক সাহায্য যোগাবে সকল তেলসমৃদ্ধ আরব দেশ. আট বছর পর যুদ্ধশেষে কুয়েতের কাছে ইরাকের ঐ যুদ্ধের খরচ বাবদ পাওনা হয় ৭ বিলিয়ন ডলার। সাদ্দাম হোসেন জর্জ বুশের কাছে (বর্তমান প্রেসিডেন্টের পিতা) বিচার দেন। বুশ জানিয়ে দেন আরবদের মধ্যে সমস্যা, তাতে আমার হস্তক্ষেপ উচিৎ হবে না। তার পরই কুয়েত দখলের নাটক শুরু হয়। যখনই কুয়েত ইরাক কর্তৃক দখল হল আমেরিকার আর্মি পৌঁছে গেল সৌদী আরবের মরুভূমিতে। ইরাকের আমেরিকান প্রীতিতে যবনিকা নামলো।

তারপর যুদ্ধ হল ইরাকের শোচনীয় পরাজয়ই শুধু হল না, জাতিসংঘ নামক একটি পুতুল সংঘের মাধ্যমে আমেরিকার সকল শর্ত ইরাক মেনে নিল। সে আজ হতে দশ এগারো বছর পূর্বের কথা, ১৯৯০ সাল হতে আজ পর্যন্ত যতো শিশু-নারী-বৃদ্ধ ইরাকের অর্থনৈতিক বয়কটের কারণে প্রাণ হারালো ঐ সকল মানব সন্তান কি Innocent ছিল না ? যার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ছিল তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বুশের সরকার এবং জাতিসংঘ নামের পুতুল সংঘটি।

www.pathagar.com

১১ বছর অতিক্রম হলো আমেরিকান আর্মি এখনো সৌদীর মাটিতে অবস্থান করছে কার ভয়ে ? ইরাক কোন দিন সৌদী মাটিতে রক্তপাত করবে না কারণ, তা হুজুর (দঃ)-এর জন্মভূমি ছাড়াও মক্কা মদীনা ঐ ভূমিতে। সুতরাং মুসলমানদের বুঝতে বাকী নেই সৌদী মোনাফেক সরকারকে রক্ষায় আমেরিকানদের সেথায় অবস্থান। বিশ্ব মুসলিম অবগত আছেন ইসলামের কোথাও লেখা নেই একটি মুসলিম দেশ শাসিত হবে রাজা এবং পরিবার কর্তৃক। যেখানে মানুষের মতামতের শ্রদ্ধা নেই সেখানে ইসলাম অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে তোমাদের নেতৃত্বে মনোনীত কর।"

আমেরিকার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যদিও দেশটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ বলে পরিচিত এবং গণতন্ত্র পদ্ধতিতে সরকার নির্বাচিত হয়, সেই সরকারই অন্য দেশের স্বৈরাচারের ত্রাতা হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এটা কি আমেরিকা সরকারের দ্বিমুখী নীতি নয় ? আড়াই শত মিলিয়ন আমেরিকানদের সাথে প্রতারণা নয় ? মিশরের স্বৈরাচার হোসনি মোবারকের সরকারকে প্রতি বছর কয়েক বিলিয়ন ডলার দান করা হয় শুধুমাত্র তার একদলীয় শাসনকে টিকিয়ে রাখার জন্য, ইরানের শাহ্-এর পতন কি আমেরিকানদের কিছু শিক্ষা দেয়নি ? কোথায় আজ চাংকাইশেখ, কোথায় পাকরি বাতিস্তারা ? আমেরিকা কি পেল ভিয়েতনাম, কোরিয়া, চীনাদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে। না, কিছুই পায়নি বরং দিয়েছে হাজার হাজার আমেরিকান তাদের জীবন।

ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের পর যখন আমেরিকান সৈন্য সৌদীর মাটিতে অবতরণ করলো তখন মুসলিম বিশ্ব হতে প্রতিবাদ উঠলো, ঐ সময় মক্কার গ্র্যান্ড মুফতি কোরআনের একটি আয়াতের অপব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, যা নিউইয়র্ক টাইমস প্রকাশ করেছিল, তাতে তিনি বলেছিলেন, ইহুদী খৃষ্টানরা যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং ইসলামের হেফাজত করে তাহলে তারা পুরস্কৃত হবে। তার ব্যাখ্যা দেয় এই মুফতি যে সৌদী রাজ পরিবারের তল্পীবাহক আর এক মোনাফেক তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। বিশ্ব মুসলিমের প্রতিবাদকে রুখতে গিয়ে কোরআনের অপব্যাখ্যা করে কখনো ঈমানদার হতে পারে না। কথা ছিল কুয়েত লিবারেশনের পর তারা চলে যাবে। কিন্তু আজ ১০ বছর পরও তারা আমাদের হুজুর (দঃ)-এর জন্মভূমিতে অবস্থান করছে।

সৌদী আরবের মক্কাতে হুজুরের (দঃ)-এর জন্মস্থান। এছাড়া মুসলমানদের ২টি পবিত্র স্থান এই দেশটির ভেতরে। বিশ্ব মুসলিম ইসলামের সূতিকাগার এবং হুজুরের জন্মস্থানে কোন অমুসলিম দেখতে চান না। একান্ত প্রয়োজনে যারা থাকবেন তাদেরকে অনেক ইসলামী বিধান মেনে চলতে হবে। যেমন ব্যভিচারী মদ্যপায়ী কোন অবস্থাতেই এই ভূমিতে গ্রহণযোগ্য নয়। আমেরিকার সৈন্য যারা সেখানে অবস্থান করছে এরা যে এই দুটি জিনিস করছে না তার নিশ্চয়তা কি কেউ দিতে পারবে ? ভিয়েতনামের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট (৭৩-৭৪) বলেছিলেন আমেরিকার সৈন্যরা আমাদের দেশে যেসব জারজ সন্তানের জন্ম দিয়েছে তাও নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং আমেরিকানরা যৌন তৃপ্তি ছাড়া যে সৌদীর মাটিতে দিন কাটাচ্ছে তার নিশ্চয়তা কি কেউ দিতে পারবে ?

www.pathagar.com

পূর্বেই উল্লেখ করেছি সৌদী সরকার ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ সরকার। যতই ধর্মীয় বিধান দেশে চালু করুক না কেন, তাদের রাজতন্ত্রকে হালাল করার সুযোগ ইসলামে নেই। যে মুসলিম দেশে জবাবদিহিতা নেই সেইদেশে ইসলামী বিধান চালু প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। আমেরিকান সৈন্য এদেরই পাহারা দিয়ে মুসলিম বিশ্বের ঈর্ষার পাত্র হয়েছে। তাকি আমেরিকার মানুষ বুঝতে চান না ?

মিশরের একদলীয় শাসন শুরু হয় জামাল আব্দুন নাসেরের সময় থেকে মুসলিম ভ্রাতৃ সংঘ নামক রাজনৈতিক দলটিসহ সকল দল বাতিল করে যে শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়, তা যে স্বৈরতন্ত্র তা আমেরিকার গণতন্ত্রী জনগণ এবং তাদের সরকার না বুঝলেও বিশ্ববাসী ভালই বুঝেন। জামাল নাসের, আনোয়ার সাদাত চলে গেলেন, তারা পৃথিবী হতে বিদায় নিতে না চাইলেও রাব্বুল আলামীন তাদের থাকতে দেননি, কিন্তু এরা মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের অনেক নেতাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলেন চিরদিন মিশরের গদিতে বসে থাকতে। হোসনি মোবারকও তাদের অনুসরণ করছেন। রাজনীতিতে একাই সবকিছু। ক্ষমতায় চিরদিন টিকে থাকতে প্রয়োজন হয় ভিন্নমতের মানুষকে দমন। হোসনি মোবারকের দমন নীতিতে প্রয়োজন আর্থিক সাহায্যের, অসুবিধা নেই, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রের দেশ বিশাল শক্তিশালী দেশের নজর নিশ্চয় আছে, তাইত আমেরিকার জনগণের ট্যাক্সের কয়েক বিলিয়ন ডলার প্রতি বছরে দিতে হয় হোসনি মোবারকের চরণে।

১১ বছর পূর্বে আলজেরিয়ার মানুষ একটি ইসলামী দলকে ভোট দিয়ে পরবর্তী সরকার গঠনের দায়িত্ব দিল। পরাশক্তির পদলেহনকারী কিছু লোক দিয়ে সেই ভোট পদ্ধতি বানচাল করে চালালো স্বৈরশাসন। আর আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স তাকে হালাল করে নিল। ইসলামী স্যালভেশন ফ্রন্ট তার প্রতিবাদে হয়ে গেল সন্ত্রাসী বা টেরোরিস্ট। সেথায় প্রাণ হারালো হাজার হাজার মানুষ, কেউ হল সন্ত্রাসীদের শিকার আর কেউ হলো ঐ স্বৈরশাসকের শিকার। আলজেরিয়ার মানুষকে সন্ত্রাসী হতে কারা বাধ্য করেছিলো ? আর কারা ঐ স্বৈরশাসকদের সমর্থন দিয়েছিলো। সুতরাং টেরোরিস্টের জনক কারা তা কি বুঝতে কষ্ট হবে ? সুদানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সাথে সাথে উস্কিয়ে দেয়া হলো সে দেশের সংখ্যালঘু খৃস্টানদের। প্রচার করা হলো সুদানে মানবাধিকার লজ্মন হচ্ছে। কি ধরনের মানবাধিকার পাশ্চাত্য শাসক গোষ্ঠী দেখতে চান তা প্রকাশ করেন নি। আর কি ধরনের প্রজাতন্ত্র সুদান তাদের জাতিকে দিতে যাচ্ছে তা দেখার সুযোগও তারা সে দেশটিকে দেননি। বর্তমানে সুদানে যা ঘটছে তার জন্য কি পাশ্চাত্য শক্তি এবং তার পুতুল সংঘটি দায়ী নয় ?

যে কুয়েতের জন্য সারা বিশ্ব সাদ্দামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল সেই কুয়েত কি গণতন্ত্রী দেশ ? ইরাক, সিরিয়াতে একদলীয় শাসন যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমনি কুয়েত, আরব আমিরাতের জনগণ কর্তৃক কি সরকার গঠন হয় ? লিবিয়াতে যেমন গাদ্দাফী ৩০ বছর ধরে ক্ষমতায় তেমনি জর্দান এবং মরক্কোও বাদশা কর্তৃক শাসিত হচ্ছে। এদের কেউ পাশ্চাত্যের বন্ধু। তাদের কাছে মডারেট মুসলিম কান্ট্রি আর কেউ টেরোরিস্ট লালনকারী দেশ। আজ পাকিস্তান যদি ১১ সেপ্টেম্বরের পর আমেরিকাকে সমর্থন না করতো তাহলে পাকিস্তানও হতো বিন লাদেন এবং তালেবানদের সেইফ হেভেন, আর ভারত হতো

www.pathagar.com

তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। যে ভারতে কিছুদিন পূর্বেও খৃস্টান সম্প্রদায়কে নির্মমভাবে হত্যা করে সে দেশের শিব সেনারা, যারা বর্তমান শাসকদল বিজেপির অঙ্গ সংগঠন। আজও কোন সভ্য দেশের নেতাদের মুখে এই খৃস্টান হত্যার জন্য কোন মন্তব্য শুনিনি। কিন্তু বাংলাদেশের উপজাতি যারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তাদের দমনে ৯৩ সালে একশনে যাওয়ায় ১৭ জন কংগ্রেসম্যান তৎকালীন খালেদা জিয়া সরকারকে প্রতিবাদ পত্র লিখেছিলেন।

এখানেই শেষ নয়, বিগত ৫০ বছরে ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘুদের কমপক্ষে আট হাজার বার নির্যাতন হয়। কোন সভ্য দেশ হতে এই বর্বর কাজের জন্য মুখ খুলতে শুনিনি। বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর যখন বোম্বেতে পুলিশের সহায়তায় শতশত মুসলিমকে হত্যা করা হয় তখন তা নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশ হলেও বিশ্ব শান্তির ফেরেশতারা মুখ খুলেননি। ঐ সময়ে আমরা কয়জন আমেরিকান মুসলিম তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে লিখলেও মিঃ প্রেসিডেন্টের অফিস হতে কোন জবাব মিলেনি, মিলেনি ১৭ জন কংগ্রেসম্যান হতে যারা বাংলাদেশের সরকারের প্রতি রক্তচক্ষু দেখিয়েছিলেন। কুয়েত প্রশ্নে ইরাককে একঘরে করলেও কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতকে মুচকী হাসিপূর্ণ উপদেশটুকু দান করেননি। কথিত জাতিসংঘ এর মাধ্যমেও সামান্যতম উপদেশ খয়রাত করেন নি। যে জাতিসংঘ একদা কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পক্ষে অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ঘোষণা দিয়েছিল, সেই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বিলটিকে ভারত পদদলিত করলেও জাতিসংঘটির মানহানি ঘটেনি। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে প্যালেস্টানীদের নিয়ে শত শত বিল উত্থাপন হলে সে বিলগুলো অমান্য ইহুদী দেশ করলেও ঐ জাতিসংঘটির মান-মর্যাদার ক্ষতি হয়নি। দুর্বল ও নিরীহ মানুষের পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত নিলে ভোটো প্রয়োগকারী কারা তা বিশ্ববাসী ভালই জানেন।

ইম্পেরিয়েলিস্ট বলে এক সময় পরাশক্তিকে গালি দিত যারা, তাদের সাপ-বেজি সম্পর্কটি আজ হয়েছে ভাই-বন্ধু সম্পর্ক। ঐ সকল কথিত সমাজতন্ত্রীরা একদা বিশ্বে নির্যাতিত মানুষের দোহাই দিত। বিগত '৯০ সালের পর সে নির্যাতিত মানুষের কথা বেমালুম ভুলে গেল। জাতিসংঘের পাঁচজন পীর এক হয়ে একজনকে মহাপীর মেনে নিল, বিরাট ক্ষমতাধর হলে যেমন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না এই মহা পীর সাহেবের এমনটি হলো। ইচ্ছে মত ইরাককে শাস্তি দিতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ শিশু সন্তানের মৃত্যুর কারণ হলেও তারা অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে এদের মৃত্যু হলেও কর্ণপাত করেনি ঐ পীর সাহেবেরা, করেনি তাদের সংঘটি, কেন করবে। ঐ ইরাকী শিশু সন্তানরাতো ইনোসেন্ট ছিলো না। জন্মটাই তাদের অপরাধ। লকারবীতে পানামের বিমান ধ্বংসের অপরাধে লিবিয়াকে ফুল দিয়ে ভূষিত করেনি, করেছিল বোমা দিয়ে। পানামার নরিয়েগাকে যারা একদিন ড্রাগ ট্রাফিকার বানিয়ে ছিল সেই নরিয়েগার সাথে মতপার্থক্য দেখা দিলে বোমা বর্ষণ করে তাকে ধরে আনতে সক্ষম হলেও গাদ্দাফীকে আনা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত গাদ্দাফী দু'জন অভিযুক্তকে আন্তর্জাতিক আদালতে পাঠিয়ে দিয়ে রেহাই পান। অন্যথায় হয়ত তারও হতভাগা নরিয়েগার অবস্থা হত।

বসনিয়ায় যখন সার্বিয়ান কর্তৃক মুসলিম নিধন শুরু হলো তখন কেউ কোন কথা বলেনি। ইংল্যান্ডের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রীর মন্তব্যগুলো ছিল মিক্স শেষ পর্যন্ত ইউরোপের মান-

www.pathagar.com

সম্মান রক্ষার্থে ন্যাটো সেখানে গেল। কিছুটা পক্ষপাতিত্ব করলেও বিশ্বে মুখ রক্ষার জন্য সার্বিয়ানদের প্রতি কঠোর হলো। কসভোতে একই অবস্থা। সেখানেত পানামার মত হামলা চালিয়ে মিলোসোভিচকে ধরে আনার চেষ্টা করেন নি। কারণ ঐ মিলোসেভিচ তাদের জাতি ভাই। তাই লক্ষ লক্ষ মানব সন্তানকে হত্যাকারী মিলোসেভিচের কিছুই হয়নি। পরবর্তীতে লোকলজ্জার ভয়ে তাকে আদালতে পাঠালেও সঠিক বিচার হবে কিনা সন্দেহ। সেখানে মিশরী একজন মিলিটারী অফিসারের মত এক জনকে পেয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি।

মিশরের ঐ মিলিটারীর নাম ছিল সালেহ '৯৩ সালের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমাসহ পরবর্তীতে এই শহরে আরো ৭/৮ টি স্থানে বোমা হামলার ষড়যন্ত্রটা এফবিআইকে সে জানিয়েছিল। এই কথিত মুসলমানটি শুধু জানিয়েই দেয়নি, কার ঘরে বোমা তৈরীর মাল পত্র আছে তাও বলে দিয়েছিল। সে হয়েছিল এই মামলার রাজসাক্ষী। জানা যায়, সে নাকি সিআইএ হতে কয়েক মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল এই কাজটির জন্য, কাজেই তা সহজে বোধগম্য ঐ মিলিয়ন ডলারের একটি অংশ দিয়ে বোমা তৈরীর মালমসলা খরিদ করে ঐ সালেহই তার মুসলিম ভাইদের ফাঁসিয়েছিল। সে আমেরিকা আসার পরই অন্ধ মুফতি ওমর আব্দুর রহমানের ভক্ত হয়েছিল। সুতরাং এই লোক ভক্ত হয়ে ভক্ষক হয়েছিল তা এখনকার আরব মুসলিম কমিউনিটি মনে করেন। যখন আদালতে বিচার শুরু হয় তখন এই রাজসাক্ষী নিরাপত্তার অজুহাতে অনুপস্থিত ছিল। ওমর আব্দুল রহমানকে এই মামলার জড়িত করার উদ্দেশ্য বিবেকবান মানুষের কাছে আয়নার মত পরিষ্কার। মিশরের এই ইসলামী চিন্তাবিদ সাদাত হত্যায়ও অভিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু সাক্ষী প্রমাণ পর্যাপ্ত না হওয়ায় অব্যাহতি লাভ করেন। তাকে এই দেশে আনার পর হোসনি মোবারক নিশ্চিন্ত হলেও তাকে কোন না কোনভাবে জব্দ করা হয়তো প্রয়োজন ছিল। তাই এই নাটকের শুরু হয়েছিল, '৯৩ সালের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা এবং পরবর্তীতে কয়েকজন আরবের এপার্টমেন্টে বোমা তৈরীর মাল-মসলা আবিষ্কারের পর। অভিযুক্তদের প্রতি যে শাস্তি প্রদান করেছেন মাননীয় জজ তা ষড়যন্ত্রমূলক বলে সকল আমেরিকান আরবের বিশ্বাস। আমি একজনকে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনারা কেন উক্ত রায়কে মেনে নিচ্ছেন না? উত্তরে ভদ্রলোক বলেছিলেন, যে রাজসাক্ষী সালেহকে ডিফেন্স এটর্নীরা জেরা করার সুযোগ পেলো না সেই বিচারের রায় প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। ঐ মামলায় যারা অভিযুক্ত হয়ে শত বছর, দুইশত বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন এরা সকলেই এই দেশে রুটি-রুজির সূত্র ধরে এসেছিল। কেউ বিন লাদেনের মত ধনীর ছেলে নয়। এদের কাছে বোমা তৈরীর মাল-মশলার মত ব্যয়বহুল অর্থ ছিল না। নিশ্চয়ই সালেহকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আসল যোগানদাতার সন্ধান পাওয়া যেতো, তাদের ধারণা সিআইএ হতে নেয়া মিলিয়ন ডলার হতেই এর যোগান সালেহ দিয়েছিল। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধূলিস্যাত যে ঐ বিচারের রিএকশন নয় তা কি অস্বীকার কার করা যাবে?

বিশ্বে যতগুলো মুসলমান দেশ আছে এদের একটিও সত্যিকার ইসলামী দেশ নয়। কোরআনের ভাষায় ঐ সকল দেশের মুসলমান প্রশাসকদের কম করে হলেও মোনাফেক আর বেশী করে হলে কাফের বলা হয়। সূরা মায়েদা ৪৪ ঃ ৪৫ এবং ৪৭ আয়াত দ্রষ্টব্য। দেখুন তুরস্কের যে দেশে আল্লাহর প্রদত্ত বিধান মানুষের তৈরী বিধানের কাছে বেআইনী

www.pathagar.com

হয় সে দেশের শাসকমণ্ডলীকে কি মুসলিম বলা যায় ? যে মুসলিমের বাংলা অর্থ হলো আত্মসমর্পণ। যিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নিজেকে সমর্পণ করেন তাকে বলা হয় মুসলমান। দু'টি দেশ ছাড়া কোন দেশইত ইসলামী রিপাবলিক বলে ঘোষণা দেয়নি। তাই বিশ্বের মুসলিম দেশগুলো আমেরিকা-ইউরোপের চোখে মডারেট। ২/৩টি দেশ হল এক্সট্রিমিস্ট। একজন মুসলমান সঠিকভাবে তার ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করলে সে হবে ফান্ডামেন্টালিস্ট। এ সকল মডারেট দেশের নেতাদের ঘাড়ে আমেরিকা বসেছে বলেই ইহুদীর হাতে শত সহস্র প্যালেস্টাইনী হত্যা হচ্ছে, তবুও ইহুদীরা টেরোরিস্ট নয়। ইহুদীদের আমেরিকা বৃটেন লালন করলেও তারা টেরোরিস্টের সাহায্যকারী বলা হয় না। প্রকাশ্যে আমেরিকার এই সব তৎপরতা দেখে আসছি বছরের পর বছর হতে। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের নেতাদের তা দেখিয়ে দেয়ার সাহসটুকু নেই। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া কিংবা আরবের পুতুলদের শক্তি নেই আঙ্গুল তুলে পরাশক্তিকে বলবে, তোমরা যা করছো তা আমরা বুঝি। সুতরাং তোমাদের ঐ জাতিসংঘ তোমাদের দিয়ে আমরা বেরিয়ে গেলাম, তোমরা সুখে থাকো।

বিশ্বের ৫৫-৬০টি মুসলিম দেশের সাহস নেই একটি 'বিশ্ব মুসলিম সংঘ' নামক একটি সংঘ গঠন করে প্রমাণ করতে দ্বিমুখী নীতি হতে মুসলিম জাতিগুলো নিষ্কৃতি চায়। কেন সাহস নেই ? কারণ বিশ্বের সুবিধাবাদী মুসলিম শাসকগণের ২/৩ জন ছাড়া বাকী সবই নামে মাত্র মুসলিম তারা দুর্নীতির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে পরাশক্তির মদদ ছাড়া টিকে থাকতে পারবে বলে মনে করে না। তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামত, তেলের টাকা চলে যায় আমেরিকা বৃটেনের ব্যাংকগুলোতে। তাদের স্টক মার্কেট চলে আরবদের টাকায়। সেদিন যে সৌদী প্রিন্স নিউইয়র্কের মেয়রের হাতে দশ মিলিয়ন ডলারের চেক দিয়ে ইহুদীদের স্বার্থের ব্যতিক্রম একটি মন্তব্য করায় চেকটি ফেরৎ পেয়ে অপদস্ত হলেন তার জবাবে কি ঐ প্রিন্স বলতে পেরেছিলেন, তোমরা আমাকে যে অপমান করলে তার উত্তরে আমি আমার নিউইয়র্ক স্টক মার্কেটের সকল টাকা তুলে নেবো। তোমরা ভালই জানো নিউইয়র্ক স্টক মার্কেট আমাদের টাকায় চলছে। কিন্তু বাদশা প্রিন্স স্বৈরাচারদের সেই সৎ সাহস নেই, কোন দিন হবেও না। কারণ তারা পদদলিত করেছে বিদায় হজে হুজুর (দঃ)-এর অমর বাণীটি-"কুল্লু মুসলিমান আল ইখওয়াতুন"। অর্থাৎ বিশ্ব মুসলিম একে অন্যের ভাই মনে করে অদূরে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

বিশ্ব মুসলিম ঐক্য হলে বিশ্বের সকল শক্তিই তাদের পদতলে আসবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ ৬০টি দেশ যদি একে অন্যের সহযোগী হয় তাহলে মুসলমানদের কোন অভাব থাকার কথা নয়। তবে এটা ঠিক তাদের সব কয়টি দেশকে এবং নেতাকে ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ না করলে জাতি স্বার্থ রক্ষা করা মুশকিল। তাইতো বিশ্বের রাজতন্ত্রী শেখতন্ত্রী এবং স্বৈরতন্ত্রীরা পরাশক্তির পা চেটে চলেছে। এদের কোরআনের ভাষায় কি বলা হয় বিশ্ব মুসলিম পবিত্র কোরআন হতে তা জেনে নিলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

এই তিন তন্ত্রী পরাশক্তির কৃপায় ক্ষমতায় টিকে আছে তা কি কেউ অস্বীকার করবে ? এদের বিতাড়িত করতে হযরত ওমরের (রাঃ)-এর মত মানুষ কি প্রতিটি মুসলিম দেশে আর জন্মাবে না। আমাদের প্রভূ রাব্বুল আলামীন আমাদের গোনাহের শাস্তিস্বরূপ কাফের, জালিম এবং ফাসিকদের বিশ্ব মুসলিমকে শাসন-শোষণে বসিয়ে দিয়েছেন —

www.pathagar.com

এই প্রশ্নটি কাকে করবো ? আল্লামা ইকবাল ঠিকই তার কবিতায় আফসোস্ করে লিখেছিলেন- "যে জাতি সারা বিশ্বকে শাসন করার ক্ষমতা রাখে, সেই মুসলিম জাতি আজ শোষিত অসহায়, ঈমানী শক্তি আজ ধূলায় লুটোপুটি খায়।"

নিউজার্সি।

লেখক ঃ আমেরিকান প্রবাসী মুসলমান

অক্টোবর '০১

থেতলানো লাশ।

আফগানিস্তানে উপর্যুপরি বৈদেশিক আগ্রাসনের রহস্য

সাইয়্যেদ রাহমাতুল্লাহ্ হাশেমী

আফগানিস্তানের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত সাইয়্যেদ রাহমাতুল্লাহ্ হাশেমী (২৪) ১০ মার্চ, ২০০১ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাউদান ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মূল্যবান ভাষণ দেন আমরা সেটির হুবহু অনুবাদ পেশ করছি।

হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের কাছে কোন বার্তা নিয়ে আসে তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কারো ক্ষতি করে বস এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হতে হয়।

-সূরা হুজুরাত ৪৯ ঃ ৬, আল-কোরআন।

আমি এইমাত্র পণ্ডিতদের একটি বৈঠক থেকে এখানে এসেছি এবং ওই বৈঠকে আমরা যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছি তা হচ্ছে মূর্তি। আমি এখানে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, আমরা খুব কমই জানি এবং কম দেখতে পাই। লোকজন আফগানিস্তানের ঘটনাবলী খুব কমই জানে। এজন্য আমি অত্যন্ত ব্যথিত। কেউ আফগানিস্তানের সমস্যাগুলো বুঝতে চায়নি এবং বোঝার চেষ্টাও করেনি। আর এখন আফগানিস্তানকে একমাত্র যে বিষয়টি বিতর্কের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তা হচ্ছে মূর্তি।

আফগানিস্তানের সমস্যাগুলো নতুন নয়। আপনারা জানেন যে, আফগানিস্তানকে এশিয়ার সন্ধিস্থল বলা হয়। তাই আমরা ভূ-কৌশলগত অবস্থানের কারণে দুর্ভোগ পোহাচ্ছি। আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুর্ভোগ ভোগ করেছি। উনবিংশ এবং এখন এই শতাব্দীতেও আমরা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছি। আমরা বৃটিশদের আক্রমণ করিনি। রুশদের ওপরও আমরা আক্রমণ চালাইনি। তারাই আমাদের আক্রমণ করেছে। তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, আফগানিস্তানের সমস্যাগুলো আমাদের তৈরী নয়, আমাদের সমস্যাগুলো বিশ্বের কদর্য চেহারাই তুলে ধরছে।

www.pathagar.com

সোভিয়েত আগ্রাসন

১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন থেকে বর্তমান সমস্যার সূত্রপাত ঘটেছে। আফগানিস্তান একটি শান্তি প্রিয় দেশ এবং সে নিজের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বিনা উস্কানিতে রাশিয়া ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে ১ লাখ ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণ করে। তারা এক দশক আফগানিস্তান দখল করে রাখে। এ সময় তারা ১৫ লাখ লোককে হত্যা করে। তাদের হাতে আরও ১০ লাখ লোক পঙ্গু হয়ে যায়। রাশিয়ার নৃশংসতায় পৌঁছে ২ কোটি লোকের মধ্যে ৬০ লাখ দেশ ছাড়া হয়। রাশিয়া আফগানিস্তান ত্যাগ করার আগে ১ কোটি মাইন পুঁতে রেখে যায়। এসব মাইন বিস্ফোরণে আজও আমাদের শিশুরা নিহত হচ্ছে। কিন্তু কেউ এগুলো জানে না। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনকালে মার্কিন, বৃটিশ, ফরাসী, চীনা এবং অন্যরা আফগান মুজাহিদদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। পাকিস্তানে ৭টি এবং ইরানে অবস্থানরত ৮টি মুজাহিদ গ্রুপ রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই করেছে। রুশরা বিদায় নেয়ার পর এসব মুজাহিদ গ্রুপ আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। তাদের প্রতিটি গ্রুপের ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ ছিল এবং তাদের কাছে ছিল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। আফগানিস্তানে একটি একক সরকার না থাকায় তারা পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। মুজাহিদদের পারস্পরিক লড়াইয়ে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা রুশ আগ্রাসনকালে ক্ষয়ক্ষতির চেয়েও বেশী। রাজধানী কাবুলেই নিহত হয়েছে ৬৩ হাজার মানুষ। নৈরাজ্যের কারণে আরও ১০ লাখ লোক আফগানিস্তান ত্যাগে বাধ্য হয়।

তালিবানদের আবির্ভাব

এই নৈরাজ্য আর ধ্বংস দেখে দেশকে বাঁচানোর জন্য একদল ছাত্র এগিয়ে আসে। এরাই তালিবান নামে পরিচিত। তালিবান শব্দের অর্থ ছাত্রদল। আমাদের ভাষায় ছাত্রের বহুবচন হচ্ছে তালিবান। আরবী ভাষায় দু'জন ছাত্রকেও বোঝাতে পারে; কিন্তু আমাদের ভাষায় বুঝায় ছাত্ররা। এ ছাত্ররা একটি আন্দোলন গড়ে তুলল যার নাম ছাত্রদের আন্দোলন। এ আন্দোলন আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ কান্দাহারের একটি গ্রাম থেকে প্রথম শুরু হয়। একজন মুজাহিদ কমান্ডার দু'জন কিশোরী মেয়েকে অপহরণ করে শ্লীলতাহানি ঘটালে তালিবান আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। নির্যাতিত দুই কিশোরীর পিতা-মাতা একটি স্কুলে গিয়ে একজন শিক্ষকের কাছে সাহায্য চাইলেন। সেই স্কুলের শিক্ষক তখন ৫৩ জন ছাত্র ও ১৬টি বন্দুক যোগাড় করে ওই কমান্ডারের ঘাঁটি আক্রমণ করেন। কিশোরী দু'টিকে উদ্ধার করে তারা সেই কমান্ডারকে ফাঁসিতে ঝুলায়। কমান্ডারের কয়েকজন সঙ্গী-সাথীকেও ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। এ ঘটনার কথা সর্বত্র প্রচারিত হয়। বিবিসিতেও তা প্রচার করা হয়। এ কাহিনী শুনে আরও বহু ছাত্র এই আন্দোলনে শামিল হন এবং তারা বাদবাকি যুদ্ধবাজ কমান্ডারদের নিরস্ত্র করতে থাকেন। আমি এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য বাড়াতে চাই না। কান্দাহারে সেদিন যে ছাত্র আন্দোলন বা তালিবান মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল আজকের তালিবান হচ্ছে তারাই। তালিবানরা দেশের ৯৫ শতাংশ ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং চারটি বড় শহরসহ রাজধানী কাবুল দখল করেছেন। সেই যুদ্ধবাজদের একাংশ এখানো আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে রয়ে গেছে।

www.pathagar.com

তালিবান সরকারের সাফল্য

আমরা মাত্র ৫ বছর সরকারে আছি। আমাদের সাফল্যগুলো আপনারা জানেন না। তাই এগুলো তুলে ধরছি।

১। প্রথম আমরা যা করেছি তা হচ্ছে এই খণ্ড-বিখণ্ড দেশটাকে একত্রিত করার কাজ। আফগানিস্তান আগে ৫টি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। আমরা এসব খণ্ড জোড়া লাগিয়েছি। আমাদের আগে কেউ আফগানিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি।

২। দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমরা করেছি, যাতে সবাই বিফল হয়েছে, তা হল মানুষজনকে নিরস্ত্র করা। যুদ্ধের পর প্রতিটি আফগানের কাছে একটা করে কালাশনিকভ রাইফেল ছিল। কারও কারও কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যেমন-স্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্র এবং ফাইটার প্লেন ও হেলিকপ্টার পর্যন্ত ছিল। এসব লোককে নিরস্ত্র করা প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছিল। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ এসব অস্ত্র ক্রয়ে ৩শ' কোটি ডলারের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। এই পরিকল্পনার গোড়াতেই ত্রুটি ছিল বলে তা বাস্তবায়িত হয়নি। সবাই আফগানিস্তানের কথা ভুলে গেল। কিন্তু আমরা ৯৫ শতাংশ অস্ত্র উদ্ধার করেছি।

৩। তৃতীয় যে কাজটি আমরা করেছি তা হচ্ছে আফগানিস্তানে একটি একক প্রশাসন কায়েম যা বিগত ১০ বছর ধরে এখানে ছিল না।

৪। আমাদের চতুর্থ সফলতা সকলের কাছেই বিস্ময়কর যে, আমরা বিশ্বের আফিম চাষের ৭৫ শতাংশ কমিয়ে এনেছি। আফগানিস্তানে বিশ্বের ৭৫ শতাংশ আফিম উৎপাদিত হত। আমরা গত বছর আফিম চাষ বন্ধে একটি ডিক্রি জারি করি। এ বছর জাতিসংঘ মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী ইউএনডিসিপি এবং এ সংস্থার মিস্টার রানার্ড এফ গর্বভরে ঘোষণা করলেন যে আফগানিস্তানে আফিম চাষ শূন্য শতাংশ। আফগানিস্তানে আফিম চাষ বন্ধের ঘটনা জাতিসংঘের জন্য মোটেও সুখকর নয়। কারণ এতে তাদের অনেকেরই চাকরি খোয়া গেছে। ইউএনডিসিপিতে ৭শ' বিশেষজ্ঞ কাজ করতেন এবং বেতন পেতেন। এরা আফগানিস্তানে কোন কাজকর্ম না করেই সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। তাই আমরা যখন এই ডিক্রি জারি করি তাতে তারা খুশী হতে পারেন নি। এ বছর তারা সবাই তাদের চাকরি হারিয়েছেন।

৫। আমাদের পঞ্চম সাফল্য হচ্ছে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা। আমাদের কোন কোন বন্ধু আমাদের এ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা জানেন না এবং কোথাও কোথাও এনিয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে। কেউ কেউ অভিযোগ করছেন যে, আমরা নাকি মানবাধিকার লংঘন করেছি। এখানে দৃষ্টিভঙ্গী এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানের একটি প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। আমাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী আমরা মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি। একজন মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে তার বেঁচে থাকার অধিকার হচ্ছে প্রথম। আমাদের আগে আফগানিস্তানে কেউ শান্তিতে বসবাস করতে পারেনি। আমরা প্রথম যে কাজটা করেছি তা হল মানুষজনকে একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবন দান করা। দ্বিতীয় বড় যে কাজটা আমরা করেছি তা হচ্ছে মানুষজনের জন্য অবাধ ও নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার। আফগানিস্তানে ন্যায়বিচারের ধরণ আপনাদের মত নয়। ওখানে ন্যায়বিচার কিনতে হয়

www.pathagar.com

না। আফগানিস্তানে ন্যায়বিচার হচ্ছে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং অনায়াসলব্ধ।

নারী অধিকার

নারী অধিকার লংঘনের জন্য আমাদের সমালোচনা হচ্ছে। আপনারা কি জানেন আমাদের আগে কী ঘটত ? এখানে কিছু আফগানকে দেখতে পাচ্ছি, তারা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে একমত হবেন যে, আফগানিস্তানের গ্রামাঞ্চলে নারীদের সঙ্গে জীবজন্তুর মত ব্যবহার করা হত। আক্ষরিক অর্থেই তাদের বিক্রি করা হত। এই ঘৃণ্য রেওয়াজ আমরা বন্ধ করি। স্বামী বাছাই করার ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামতের কোন মূল্য ছিল না। প্রথম আমরা যেটা করলাম তা হচ্ছে তাদেরকে তাদের ভবিষ্যৎ বেছে নেয়ার অধিকার প্রদান করলাম। আফগানিস্তানে এক সময় উপঢৌকন হিসেবে নারীদের বিনিময় করা হত। আমাদের ধর্মে এ ধরনের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কিন্তু তাও চলত। এটা ছিল একটি সামাজিক রীতি-নীতি। দু'টি বিবদমান গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে রফা করতে চাইলে তারা নারী বিনিময় করত। এটা এখন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আফগানিস্তানে নারীদের অধিকার সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা পুরোপুরি অসত্য। সেখানে নারীরা কাজ করে। তবে এটা সত্য যে, ১৯৯৬ সালে রাজধানী কাবুল দখল করার আগে পর্যন্ত আমরা নারীদের ঘরের ভেতরে থাকতে বলতাম। তার মানে এই নয় যে, আমরা চিরদিন তাদের চার দেয়ালের ভেতর আটকে রাখতে চাই। কাবুল দখলের আগে আমরা নারীদের বলেছি যে, কাথাও আইন-শৃংখলা নেই। তাই আপনারা নিরাপত্তার জন্য ঘরে থাকুন।

আমরা মানুষজনকে নিরস্ত্র করেছি এবং আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করছি। এখন নারীরা কাজ করছেন। তবে পাশ্চাত্যের মত আমাদের নারীরা প্রতিরক্ষা বাহিনীতে চাকরি করে না। আমরা চাই না যে, আমাদের নারীরা পাইলট হোক কিংবা তারা বিজ্ঞাপনে দর্শনীয় বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হন। তারা কাজ করেন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে এবং এ ধরনের অন্যান্য ক্ষেত্রে একইভাবে নারী শিক্ষা নিয়ে আমাদের কোন সমস্যা নেই। আমরা বলেছি যে, আমরা শিক্ষা চাই এবং আমরা শিক্ষিত হবই। শিক্ষা লাভ করা হচ্ছে আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের অংশ। ধর্মীয় নির্দেশেই আমরা শিক্ষা লাভ করতে চাই আমরা নারীদের জন্য পৃথক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা বলছি। তার মানে এই নয় যে, আমরা নারী শিক্ষার বিরোধিতা করছি। আমরা চাই, আমাদের নারীরা শিক্ষিত হোক। তবে তাদেরকে শালীনতা বজায় রেখে পর্দার ভেতরে শিক্ষা লাভ করতে হবে। আমরা নারী শিক্ষার নয়, ছেলেমেয়ের একসঙ্গে পড়াশুনা করার বিরোধিতা করছি। আমাদের এখানে মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল-কলেজ রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাবে আমরা মহিলা স্কুল-কলেজের সংখ্যা বাড়াতে পারছি না।

আমাদের সরকারের আগে নানা ধরনের পাঠ্যসূচী চালু ছিল। কখনও ছিল রাজাদের বন্দনামূলক পাঠ্যসূচী। আর কখনও বা পাঠ্যসূচীতে থাকত কমিউনিস্টদের বন্দনা। এছাড়া ৭টি মুজাহিদ গ্রুপের পক্ষ থেকে ৭ ধরনের পাঠ্যসূচী দেয়া হত। এতে ছাত্রছাত্রীরা বিগড়ে যেত। তারা বুঝতে পারত না তারা কোন পাঠ্যসূচী অনুসরণ করবে। আমরা পাঠ্যসূচী একত্রীকরণে হাত দিয়েছি এবং সেটা চলছে। সম্প্রতি আমরা আফগানিস্তানের বড় বড় শহর ও কান্দাহারে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষদ পুনরায় চালু

www.pathagar.com

করেছি। চিকিৎসা অনুষদে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা বেশী। তবে তারা পৃথক পৃথকভাবে পড়াশুনা করছে। সুইডিশ কমিটিগুলোও মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। আমি জানি যে, তা মোটেও যথেষ্ট নয়। তবে আপাতত আমরা এতটুকুই করতে পেরেছি, আমরা রাতারাতি সবকিছু করে ফেলতে পারি না।

ওসামা বিন লাদেন

আমাদেরকে সন্ত্রাসবাদে মদদদানের জন্য অভিযুক্ত করা হচ্ছে। মার্কিনীদের কাছে সন্ত্রাসবাদ কিংবা সন্ত্রাসী বলতে বোঝায় কেবল বিন লাদেন। আপনারা হয়ত জানেন না যে, তালিবান আন্দোলনের জন্মের ১৭ বছর আগে থেকেই বিন লাদেন আফগানিস্তানে রয়েছেন। তিনি আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। স্নায়ুযুদ্ধকালে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান ও বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট ও তদানীন্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডিক চেনীর দৃষ্টিতে বিন লাদেনের মত মুজাহিদরা মুক্তিযোদ্ধা ও বীর হিসেবে বিবেচিত হতেন। তারা তাদেরকে হোয়াইট হাউসে পর্যন্ত আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কারণ এরা তখন তাদের স্বার্থে লড়াই করছিলেন। আর এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তাই এসব লোকের আর দরকার নেই। তারা এখন সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা থেকে সন্ত্রাসী। একেবারেই ইয়াসির আরাফাতের মত। মার্কিন মিত্রে পরিণত হওয়ায় আরাফাত সন্ত্রাসী থেকে হয়েছেন বীর। আর মার্কিন বিরাগভাজন হয়ে লাদেনের মত মুজাহিদরা হয়েছেন সন্ত্রাসী। বিন লাদেনকে যে সকল কর্মকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত করা হয় সে ধরনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ১৯৯৮ সালে আফগানিস্তানে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পার্থক্য কি ? উত্তর আফ্রিকায় দু'টি মার্কিন দূতাবাসে হামলা এবং আফগানিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ কোনটাই ঘোষণা দিয়ে করা হয়নি এবং এ দু'টি হামলাতেই সাধারণ মানুষ নিহত হিয়েছে।

সুতরাং আমরা সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভ্রান্ত। নির্বিচারে লোকজন হত্যার নাম যদি সন্ত্রাসবাদ হয়, তাহলে উত্তর আফ্রিকার দু'টি দেশে মার্কিন দূতাবাসে বোমা বিস্ফোরণ এবং আফগানিস্তানে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা নিঃসন্দেহে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। যুক্তরাষ্ট্র একজন লোককে ন্যায়বিচারের সুযোগ না দিয়ে তাকে হত্যার চেষ্টা করছে। ১৯৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ঘোষণা করে যে, তারা ওসামা বিন লাদেনকে হত্যার জন্য এ হামলা চালিয়েছে। আমরা তখন ওসামা বিন লাদেনকে চিনতাম না। আমি ইতঃপূর্বে কখনও তার নাম শুনিনি। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। সুতরাং আমরা বিস্মিত হই। আমি সে রাতে বাসায় ছিলাম আমাকে জরুরী একটি বৈঠকে তলব করা হয়। বৈঠকে আমাদের জানানো হয় যে, আমেরিকা আফগানিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। লাদেনকে হত্যার জন্য ৭৫টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তিনি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে রক্ষা পান। এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ১৯ জন ছাত্র নিহত হন। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের জন্য যুক্তরাষ্ট্র আজও ক্ষমা চায়নি। আপনারা আমাদের জায়গায় থাকলে কি করতেন ? আমরা যদি আমেরিকায় গিয়ে ৭৫টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে বলতাম যে, আমরা একটা লোককে হত্যা করতে এসব ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছি, যে লোকটিকে আমরা আমাদের দূতাবাসে হামলার জন্য দায়ী মনে করছি এবং

www.pathagar.com

সেই লোকটিকে আমরা পাইনি। তবে আমরা অপর ১৯ জন মার্কিনীকে হত্যা করে ফেলেছি। কী করত তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ? তাৎক্ষণিকভাবই যুদ্ধ ঘোষণা করতেন আপনারা। কিন্তু আমরা নম্র। আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করিনি। এমনিতেই আমরা সমস্যায় জর্জরিত। তাই আমরা আমাদের সমস্যা বাড়াতে চাই না।

সংকট নিরসনে আমাদের প্রস্তাব

আমরা বরাবরই বলে আসছি যে, ওসামা বিন লাদেন যদি সত্যি সত্যিই কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলায় জড়িত হয়ে থাকে এবং তার জড়িত থাকার পক্ষে কেউ আমাদের প্রমাণ দিতে পারে তাহলে আমরা তাকে শাস্তি দেব। কিন্তু কেউ আমাদের কাছে কোন প্রমাণ দেয়নি। আমরা তাকে ৪৫ দিনের ট্রায়ালে রাখলাম এবং এ সময় কেউ তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হাজির করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বলল, আমাদের বিচার ব্যবস্থায় তাদের আস্থা নেই। আমরা হতবাক হয়েছি যে, তাহলে তাদের বিচর ব্যবস্থাটা কোন ধরনের ? তারা একটা লোককে মারার চেষ্টা করছে তাকে কোন রকমের বিচারের সুযোগ না দিয়েই। এখানে আমাদের মধ্যে কেউ যদি অপরাধ করে, তাহলে পুলিশ গিয়ে তার বাড়ীঘর ভাঙতে শুরু করবে না। তাকে নিশ্চয়ই প্রথমে আদালতে নেয়া হবে। আমাদের কথা তারা শুনল না। বলল, আমাদের বিচার ব্যবস্থায় তাদের বিশ্বাস নেই এবং তাকে তাদের হাতে হস্তান্তর করতে হবে। আমাদের প্রথম প্রস্তাব নাকচ হয়ে যাওয়ার পর আমরা বললাম, ঠিক আছে আমরা রাজি। আপনারা চাইলে একটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল আফগানিস্তানে এসে এই লোকটির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করুক, যাতে তিনি কিছু করতে না পারেন। আমাদের সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়া হল। তৃতীয় প্রস্তাব আমরা দিয়েছি ৬ মাস আগে। এ প্রস্তাবে আমরা বললাম, তৃতীয় একটি ইসলামী দেশে আমরা ওসামা বিন লাদেনের বিচার মেনে নিতে রাজি আছি। যেখানে সউদী আরব ও আফগানিস্তানের সম্মতি থাকবে। কিন্তু আমাদের এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করা হল।

এখনও যথাসম্ভব খোলা মন এবং চতুর্থবারের মত আমি এখানে আমার নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে একটি পত্র নিয়ে এসেছি যেটা আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে চাই এই আশায় যে, তারা সমস্যাটির সমাধান করবেন। কিন্তু আমি মনে করি না যে, তারা তা করবেন। কারণ আমরা মনে করি এবং আমি ব্যক্তিতগতভাবে মনে করি যে, সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদাই একজন জুজু বুড়ি খুঁজে বেড়ায়। আপনাদের কি মনে আছে সাবেক সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ কি বলেছিলেন ? তিনি বলেছিলেন যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি করতে যাচ্ছেন। সবাই মনে করল, তিনি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে দিতে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি বললেন, আমি ওদের শত্রুকে সরিয়ে দিতে যাচ্ছি। এরপর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে খণ্ড খণ্ড করলেন। তিনি সত্যি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে বহু লোক চাকরি হারায়। পেন্টাগন, সিআইএ, এফবিআই থেকে বহু লোক ছাঁটাই করা হয়। কারণ তখন তাদের প্রয়োজন ছিল না। তাই আমাদের মনে হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র এখন একজন জুজু বুড়ি খুঁজছে। হতে পারে তারা তাদের বার্ষিক বাজেটের যৌক্তিকতা দেখাতে অথবা নিজেদের নাগরিকদের কাছে তাদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ

www.pathagar.com

করার জন্য এমন করছে।

আফগানিস্তান কোন সন্ত্রাসী রাষ্ট্র নয়। আমরা একটি সূচও বানাতে পারি না। তাহলে আমরা কিভাবে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হব ? কিভাবে আমরা বিশ্বের প্রতি একটি হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারি ? সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ঐসব দেশই হতে পারে যারা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের জন্য পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র তৈরী করে- আমরা নই।

অবরোধ

এখন আমাদের উপর অবরোধ রয়েছে। আর এই অবরোধে অসংখ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদিও আমরা ইতোমধ্যে বহু সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ চলছি। ২৩ বছরের অব্যাহত লড়াই, অবকাঠামোর পরিপূর্ণ ধ্বংস, শরণার্থী সমস্যা এবং কৃষি জমিতে পুঁতে রাখা স্থলমাইনের মত সংকটে আমরা জর্জরিত। এসব সমস্যার সঙ্গে এবার যোগ হল জাতিসংঘ অবরোধ। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও রাশিয়ার প্ররোচনায় জাতিসংঘ আমাদের উপর অবরোধ আরোপ করেছে। আমরা অবরোধের শিকার। এক মাস আগে কয়েকশ' শিশু মারা গেছে। ৭শ' শিশু মারা গেছে অপুষ্টিতে এবং ৪শ' শৈত্যপ্রবাহে। কেউ এ নিয়ে কথা পর্যন্ত বলল না। অথচ মূর্তির সুখ-দুঃখের খবর তারা ঠিকই রাখে।

মানুষের চিন্তা বাদ দিয়ে মূর্তির জন্য দরদ

সারা দুনিয়া যখন অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে আমাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিচ্ছে, তখন আমাদের অতীত নিয়ে দুর্ভাবনা করার কোন অধিকার নেই। আমি কান্দাহারে তালেবান সদর দফতরে যোগাযোগ করেছি। আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছি, কেন তারা মূর্তি ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। উলেমা পরিষদের প্রধান আমাকে জানান যে, ইউনেস্কো ও সুইডেনের একটি এনজিও বামিয়ানে রোদ-বৃষ্টিতে ক্ষয়ে যাওয়া বুদ্ধমূর্তি সংস্কারের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে তারা আফগানিস্তানে আসেন। নেতৃবৃন্দ তাদেরকে অনুরোধ করলেন তারা যাতে টাকাগুলো মূর্তি মেরামতের পরিবর্তে আমাদের শিশুদের জীবন রক্ষার্থে ব্যয় করেন। বিদেশী প্রতিনিধি দল তখন জানালো যে, মূর্তি ছাড়া অন্য কারও জন্য তারা তাদের অর্থ ব্যয় করবে না। এদের এই জবাবে আমাদের লোকজন ক্ষেপে গিয়েছিল। লোকজন বলল, যদি আমাদের শিশুদের কথা তোমরা না ভাব, তাহলে এই মূর্তিগুলো আমরা ভেঙ্গে ফেলব। আপনারা এই অবস্থায় পড়লে কী করতেন ? আপনাদের চোখের সামনে আপনাদের সন্তান অনাহারে মারা গেলে এবং আপনাদের উপর অবরোধ আরোপিত থাকলে কী করতেন আপনারা ? সে ধরনের অবস্থায় যারা অবরোধ আরোপ করেছে তারাই যদি মূর্তি সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে আসে তবে আপনারা কী করতেন ?

কফি আনান ও মূর্তি

আর আছেন কফি আনান। কফি আনানকে তো আপনারা চেনেন। তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব। তিনি পাকিস্তানে গেলেন এবং বললেন, সেখানে আমাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। কিন্তু এই লোকটি আমাদের শিশুদের নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজনবোধ করেননি। তিনি আফগানিস্তানের ৬০ লাখ শরণার্থী এবং দারিদ্র্য নিয়ে মাথা ঘামাননি। তিনি কেবল ওইসব মূর্তির জন্য পাকিস্তান সফরে গিয়েছেন।

www.pathagar.com

ওআইসির ভূমিকাও তথৈবচ। ওআইসি মূর্তির ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য কাবুলে একটি মিশন পাঠায়। আমরা সত্যি বিস্মিত। এই পৃথিবী শুধু মূর্তি নিয়ে ভাবল! কিন্তু তারা আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ নিয়ে ভাবল না! বামিয়ানে বুদ্ধমূর্তি ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত আমাদের নয়, এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন জনগণ ও ইসলামী পণ্ডিতগণ। এ সিদ্ধান্ত সুপ্রীম কোর্টে অনুমোদিত হয়েছে। আমরা এই সিদ্ধান্ত নাকচ করে দিতে পারি না। বিদেশীরা আমাদের ঐতিহ্যের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। তারা যদি আমাদের অতীত নিয়ে ভাবত তাহলে তারা আমাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিতে পারত না। আমাদের উপর দু'দুবার অবরোধ আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু যত অবরোধই আরোপ করা হোক তাতে আমাদের আদর্শের কোন হেরফের হবে না। আমাদের কাছে আদর্শটাই সব। তাই জাতিসংঘ অবরোধে আমাদের কিছুই যায় আসে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, নিষ্ফল বাঁচার চেয়ে আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। আমরা আলোচনার জন্য আমাদের দ্বার উন্মুক্ত রেখেছি। কিন্তু সর্বত্র আমাদের অফিস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। গত সপ্তাহে নিউইয়র্কেও আমাদের অফিস বন্ধ করে দেয়া হয়। তারা অন্যান্য দেশেও আমাদের অফিস বন্ধ এবং আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার চেষ্টা করছে। তবে তারা এটা জানে না যে, আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রচেষ্টা হবে ব্যর্থ। কারণ তাদের কোন বিশেষজ্ঞ নেই। তাদের কাছে ইংরেজী-ভাষী ছাড়া আর কোন বিশেষজ্ঞ নেই। তারা আমাদের ভাষায় কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। ঐসব বিশেষজ্ঞ অথবা জাতিসংঘ অবরোধ কমিটি কখনও আফগানিস্তানে যাননি। ❑

০১ নভেম্বর '০১

অনুবাদ ঃ সাহাদত হোসেন খান

www.pathagar.com

আফগান যুদ্ধের 'ফল-আউট'

কে. জি. মুস্তাফা

আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক হামলা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি যুক্তরাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত করেছে। কাবুল, কান্দাহার, হেরাত, মাজার-ই-শরিফ প্রভৃতি অঞ্চলে অবিশ্রান্তভাবে বিমান হামলা চালানোর ফলে আফগানিস্তানের অসামরিক এলাকা বিধ্বস্ত হয় এবং বহু বেসামরিক ব্যক্তি হতাহত হয়। এদের মধ্যে মহিলাও শিশুর সংখ্যাই বেশি। ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ, কার্পেট বম্বিং, মিসাইল হামলা ইত্যাদি তো আছেই, তার ওপর গত ২ ও ৩ নভেম্বর শুক্র ও শনিবার একটানা ১১ ঘন্টা বিমান আক্রমণ চালানো হয়েছে। ওসামা বিন লাদেনকে 'জীবিত অথবা মৃত' না পাওয়া গেলে এরূপ আক্রমণ চলতেই থাকবে বলে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে।

ওসামা বিন লাদেনকে ধরে আনার আদেশ জারি করা হয়েছিল বিমান আক্রমণ শুরু করার আগেই। আমেরিকা তখন মনে করেছিল হুকুম করলেই তালেবান কর্তৃপক্ষ তা পালন করবে। তারা তা তো করেইনি, উপরন্তু ঘোষণা করেছে, লাদেন তাঁদের সম্মানিত মেহমান, তাঁকে কারও কাছে সোপর্দ করার প্রশ্নই ওঠে না। কমান্ডো অভিযান চালিয়েও ইঙ্গ-মার্কিন কোয়ালিশন বাহিনী লাদেনের সন্ধান পায়নি। এই ব্যর্থতার দরুন যুক্তরাষ্ট্র আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। বর্তমানে তারা বেপরোয়া বিমান হামলা চালিয়ে শুধু তালেবান ঘাঁটি বা লাদেনের আল কায়দা শিবির নয়, সমগ্র আফগানিস্তানকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। জাতিসংঘ ও রেডক্রসের রিলিফ সামগ্রীর গোডাউনগুলো পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা থেকে লাখ লাখ শরণার্থী পাকিস্তান ও ইরানের সীমান্ত এলাকায় ভিড় জমিয়েছে। খাদ্য, বাসস্থান, শীতবস্ত্র কিছুই তাদের নেই। সুস্থ মানুষ ওই পরিস্থিতিতে কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারলেও নারী, শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তিরা হাজারে হাজারে মৃত্যুবরণ করবে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। জাতিসংঘ পাকিস্তান ও ইরানের কাছে এই মর্মে অনুরোধ জানিয়েছে, তারা যেন তাদের সীমান্ত উন্মুক্ত রাখে শরণার্থী স্রোতের মুখে, মানবতার নামে, মৃত্যু পথযাত্রী আফগানদের জীবন রক্ষার শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে। সন্ত্রাস দমনের নামে আফগানিস্তানে যে ভয়াবহ সমস্যা সৃষ্টি করা হয়েছে, তার সমাধান করতে আরও কত প্রাণ ধ্বংস হবে তার ইয়ত্তা নেই।

www.pathagar.com

নতুন উদ্বেগের খবর আসছে পাকিস্তান সীমান্ত থেকে। হাজার হাজার পাকিস্তানী পাখতুন আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছে তালেবান শক্তিকে মদদ দিতে। মার্কিন বিমানের বোমায় অথবা ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে পাকিস্তানী পাখতুনদের গণমৃত্যুর আশংকা অমূলক নয়। পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ রোজার আগেই যুদ্ধ শেষ করার যে আবেদন জানিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্র সে আবেদনে কর্ণপাত করেছে বলে মনে হয় না। পুরো ২৫ দিনের জল-স্থল-অন্তরীক্ষের অভিযানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র এখনও তালেবান প্রতিপক্ষকে খুব একটা দুর্বল করতে পারেনি। নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের সৈন্যরা এখনও পর্যন্ত তালেবান বাহিনীকে উত্তরাঞ্চলের ঘাঁটি থেকে উৎখাত করতে পারেনি। অ্যালায়েন্সের প্রভাবশালী কমান্ডার আবদুল হক এবং তাঁর কতিপয় সহযোদ্ধাকে বাগে পেয়ে ফাঁসি দিয়েছে তালেবান বাহিনী। অবশ্য এদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার ঘটনা থেকে তালেবান শক্তির পরিমাপ করা না গেলেও একথা অবশ্যই বলা যায় যে, তালেবান বাহিনী নতিস্বীকারে বাধ্য হবে এমন অবস্থা এখনও দূরঅস্ত।

মার্কিন আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সাহায্য সংস্থার কর্মতৎপরতা বন্ধ হওয়ার পথে। দেশের সীমান্ত এলাকার শরণার্থীরা যেসব সাহায্য পেত, তার একটি বড় অংশ বন্ধ হয়ে গেছে বোমার আঘাতে অথবা আতংকে। ওষুধপত্রের সরবরাহ নেই বললেই চলে। আহত শিশুদের যে করুণ চিত্র টেলিভিশনে দেখা যায় তা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এসব আহত অথবা রোগাক্রান্ত শিশুর জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হওয়ার পথে।

আফগানিস্তানে ক্ষমতার হাত বদলের অনুকূল পরিস্থিতি এখনও সৃষ্টি হয়নি। সাবেক শাসনকর্তা জহির শাহকে নিয়ে যে নাটক শুরু হয়েছে সে নাটকের সফল পরিণতির সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তাঁর বয়সই তাঁর বিরুদ্ধে। আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, শাহকে অবশ্যই শাসন করার ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে। জহির শাহর সেই ক্ষমতা আজ নেই। তাঁকে শিখণ্ডী হিসেবে রেখে অন্য কেউ শাসন করতে গেলেই তিনি প্রাসাদ চক্রান্তের শিকার হবেন অনতিবিলম্বে। তালেবান বাহিনী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পেরেছে পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। সেই সহযোগিতার হাত যুক্তরাষ্ট্র আপাতত সরিয়ে নিলেও সময় বুঝে ফিরে আসার জন্য নরমপন্থী বা মডারেট তালেবানের খোঁজে হয়রান হচ্ছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। সে অবস্থায় কাবুল বা কান্দাহার থেকে মোল্লা ওমর ও তাঁর কট্টরপন্থী তালেবান বাহিনী সরে গেলেও তা হবে নিতান্ত সাময়িক পিছু হটা বা ট্যাকটিক্যাল রিট্রিট। নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের ওপর আমেরিকা বা পাকিস্তান কারোরই পূর্ণ আস্থা নেই। কারণ তাদের অস্ত্রবল অত্যন্ত সীমিত, জনবল তথৈবচ। তেল বা গ্যাসের পাইপ লাইনের হেফাজত করতে উত্তরের গোষ্ঠীগুলোর ওপর নির্ভর করা যায় না। তারা এই যুদ্ধের মধ্যে আমেরিকার বাহ্‌বা যত পেয়েছে সে অনুপাতে অস্ত্র সাহায্য পায়নি। এ অভিযোগ নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের সব শরিকের।

এদিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। জেনারেল মোশাররফ আফগানিস্তানের ওপর মার্কিন হামলা মসৃণ করার জন্য যতটা সহযোগিতা করেছেন সেই অনুপাতে রাজনৈতিক সাফল্য লাভ করেননি। অবশ্য দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য যথেষ্ট পেয়েছেন সন্দেহ নেই। যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান অর্থনৈতিক ও সামরিক

www.pathagar.com

নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে। কিন্তু রাজপথে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে আফগাস্তিানের পক্ষে, তার তীব্রতায় জেনারেল মোশাররফের চেয়ার উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে কোয়েটায় জামায়াতে ইসলামীর বেলুচিস্তানের এক আমীর জেনারেল মোশাররফকে পদচ্যুত করার জন্য পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এই দাবি একবার উঠলে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, এটা পাকিস্তানের ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষকরা মনে করেন। বাওয়ালপুরে এক গির্জায় বন্দুকধারীদের হত্যাকাণ্ড জেনারেল মোশাররফের অবস্থাকে আরও দুর্বল করে ফেলবে। পাকিস্তানে আমেরিকার আফগানিস্তান নীতির বিরুদ্ধে যে ব্যাপক জনরোষের সৃষ্টি হয়েছে তার চরিত্র যে কোন সরকারের পক্ষে হুমকিস্বরূপ। পাকিস্তানে বড় আকারের গণআন্দোলন না হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল প্রাদেশিক বিভেদ। যেমন, পাঞ্জাবের আন্দোলন সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান ও সিন্ধুতে খুব বেশি আলোড়ন তুলতো না। কিন্তু এবারকার আন্দোলনকালে দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানের সবক'টি প্রদেশেই মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এর ফলে পাকিস্তানে যে সরকারই ক্ষমতাসীন থাকুক না কেন, সে সরকারকে অবশ্যই আফগানিস্তানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অংশ পাখতুনদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

আফগানিস্তানে নতুন সরকার কায়েমের যে প্রচেষ্টা চলছে তার পাশাপাশি পাকিস্তানেও একটি নতুন সরকার ক্ষমতায় আসীন হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুবিধা অনুযায়ী যে কোন বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানকে বিনা আড়ম্বরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। যেমন অতীতে ল্যাটিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য বা দূরপ্রাচ্যে করা হয়েছে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের ঘটনাবলী অনিবার্যভাবে বাংলাদেশে শুধু নয়, সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করেছে। আফগান যুদ্ধের কারণে মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের আকাশ, নৌ-বন্দর ও বিমানবন্দর ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় থাকতেই। বিএনপির নেতৃত্বে গঠিত চার দলীয় জোট সরকার সেসব সুবিধা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক হামলার প্রতিবাদে প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশের কোন বা কোন শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হচ্ছে। যেসব দল বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে তাদের মধ্যে দু'টি বর্তমান জোট সরকারের শরিক-জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটও রয়েছে। অসাম্প্রদায়িক ১১ দলীয় জোটও বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি ও ওয়ার্কার্স পার্টি আলাদা আলাদাভাবে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে রাজপথ প্রদক্ষিণ করছে।

বাংলাদেশ সরকার আফগানিস্তানে মানবিক সাহায্য দেয়ার জন্য ওআইসিকে অনুরোধ করেছে, কিন্তু যুদ্ধের বিপক্ষে একটি কথাও এ পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি। বরং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সহযোগিতার সিদ্ধান্তই তারা মেনে চলছে। যুদ্ধের আঁচ একটু তীব্রভাবে অনুভূত হলে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। ইতোমধ্যে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ আফগানিস্তানে মার্কিন বোমাবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ করেছে। বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ রাজপথ উত্তপ্ত রাখার ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেলে পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশেও প্রচণ্ড বিক্ষোভ দানা বাঁধতে পারে। সে পরিস্থিতিতে বিএনপির নেতৃত্বে গঠিত জোট সরকার রাজপথ সামাল দিতে হিমশিম খাবে সন্দেহ নেই। ভারতের অবস্থাও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে । সে দেশের

www.pathagar.com

দক্ষিণাঞ্চলের শহর হায়দারাবাদে বিক্ষোভকারীরা প্রাণ দিয়েছে। সে দেশের বামপন্থী দলগুলো সন্ত্রাসের বিরোধিতা করলেও আফগানিস্তানে মার্কিন বোমাবর্ষণ মেনে নিতে পারেনি। ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। সে দেশের বিক্ষোভকারীরা সহিংস পথ বেছে নেয়ার চেষ্টা করছে। মালয়েশিয়ার অবস্থাও টলমলে। এক কথায়, সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনমত আফগানিস্তানে মার্কিন আক্রমণের ঘোরতর বিরোধী হয়ে উঠেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের কথা বলা শুরু করেছে। তার মানে রণক্ষেত্রের এলাকাও বিস্তৃত হবে। সে অবস্থা মার্কিন কোয়ালিশনের সব দেশ মেনে নেবে কিনা সন্দেহ। ইরাককে রণক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমেরিকার অভিপ্রায় অস্পষ্ট নয়। কিন্তু বাগদাদকে আবার ব্যাপক যুদ্ধে জড়িত করলে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি, অর্থাৎ ফিলিস্তিন-ইসরাইল শান্তি প্রচেষ্টা মারাত্মকভাবে বাধা প্রাপ্ত হবে। ১৯৯০-৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় যেসব আরব দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থ দিয়েছিল তারা এবার আরব রাষ্ট্রবিরোধী কোন যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমর্থন দেবে না বলে ঘোষণা করেছে। সে কারণে এক দশক আগের চিন্তা-ভাবনা মাথায় রেখে আফগানিস্তানে যুদ্ধ সম্প্রসারিত করতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তা হবে চোরাবালিতে পা রাখার শামিল। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট গভীর। তারা হঠকারী কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে আটকে থাকবে না। কোন না কোন 'অপশন' তারা খোলা রাখবে, এটাই আশা করা যায়। সেদিক থেকে মনে হয় শুধু জেদের বশে কিংবা লোক দেখানো বাহাদুরি লাভের আশায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত সম্প্রসারিত যুদ্ধের বেড়াজালে আবদ্ধ হতে চাইবে না। পরিস্থিতি তাদের আয়ত্তে থাকতেই তারা আফগান যুদ্ধের সমাপ্তি টানবে বলে বিশ্বাস করার কারণ আছে। ❑

৪ নভেম্বর '০১

লেখক : সাংবাদিক।

www.pathagar.com

মার্কিন শাসকশ্রেণীর ভণ্ডামি ও মূর্খতার অনন্য দৃষ্টান্ত!

এম এম আকাশ

আমেরিকা ভূত দেখেছে!

ওসামা বিন লাদেনের ভূত! অবশ্য আমার এক প্রবাসী বন্ধুর মত কিছুটা ভিন্ন। তার মতে আমেরিকার শাসক শ্রেণী সচেতনভাবে ভূত দেখার ভান করছে যাতে পরবর্তী 'ভূতুড়ে' কাজগুলোকে সে জাস্টিফাই করতে পারে! যাই হোক এই ভূতের বিরুদ্ধে আজ সমগ্র 'মুক্ত বিশ্ব' ঐক্যবদ্ধ। জর্জ বুশের সঙ্গে টনিব্লেয়ার। টনি ব্লেয়ারের সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট পুটিন। রুশ-পুটিনের সঙ্গে ভারতীয় বাজপেয়ি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ির সঙ্গে পাকিস্তানের পারভেজ মোশাররফ। সবাই আজ ঐক্যবদ্ধ। দরিদ্র আফগানিস্তানের হতদরিদ্র গুহায় লুকিয়ে আছে যে, 'লাদেন' তাকে জীবিত অথবা মৃত ধরার জন্য সারা 'মুক্ত বিশ্বে' আজ শুরু হয়েছে এক বিশাল আয়োজন। রণতরী, ক্রুজ মিসাইল ও কমান্ডো বাহিনীর এক সম্মিলিত অভিযান। এক আমেরিকায় কুলোচ্ছে না, তার সঙ্গে একে একে যোগ দিয়েছে ব্রিটেন, রাশিয়া, জার্মানি, জাপান, ভারত এবং পাকিস্তান! কিন্তু কেন?

মার্কিন শাসকশ্রেণীর বক্তব্য

এই প্রথমবারের মতো মার্কিন মুলুকে ১১ সেপ্টেম্বরে আত্মঘাতী বিমান হামলা সংঘটিত হয়েছে। একটি সন্ত্রাসী চক্রের আত্মঘাতী ১৮ জন সন্ত্রাসী আমেরিকার গর্ব 'টুইন টাওয়ারে' এই হামলা সংঘটিত করেছে। একই সঙ্গে তারা 'পেন্টাগন' ও ওয়াশিংটনেও হামলা চালিয়েছিল। তবে পেন্টাগনে তারা আংশিক সাফল্য অর্জন করলেও ওয়াশিংটনে তারা সফল হয়নি। এই হামলা আমেরিকান শাসকশ্রেণীর নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন একাধিপত্যের ওপর হামলা। এই হামলা গুঁড়িয়ে দিয়েছে 'মুক্ত বিশ্বের' অহঙ্কারকে। এক কথায় বলা যায় মার্কিনি শাসকশ্রেণীর আঁতে ঘা লেগেছে এই হামলার ফলে।

এই হামলায় শুধু মার্কিন নাগরিক নয় হাজার কয়েক (সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে ছয় হাজার) নানা দেশের লোক যারা হামলার সময় টুইন টাওয়ারে বা পেন্টাগনে অবস্থান করছিলেন তারা কোনো অপরাধ না করা সত্ত্বেও মৃত্যুবরণ করেছেন। মার্কিন শাসকশ্রেণীর অহংকার

www.pathagar.com

গুঁড়িয়ে দেওয়াটা মূল লক্ষ্য হলেও এই সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত হয়েছেন অনেক নির্দোষ মানুষ। প্রতিশোধের আগুনে শুধু টুইন টাওয়ার পুড়ে যায়নি, পুড়ে দিয়েছে আশপাশের জনপদ।

পরবর্তী সময়ে শুরু হয়েছে আরো ভয়ানক জীবাণু যুদ্ধ অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর আক্রমণেও কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছেন। সারা আমেরিকা জুড়ে আতঙ্কের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে।

ইতোমধ্যেই আমেরিকার অর্থনীতির গতি শ্লথ থেকে শ্লথতর হয়ে গেছে। বিমান শিল্প ও পর্যটন শিল্পের বাতি নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থায় ধস নেমেছে। মার্কিন সরকার কর কমিয়ে, ব্যয় বাড়িয়ে ও সুদের হার কয়েক দফা কমিয়েও ভয়াবহ বেকারত্ব কমাতে পারছেন না। জাতিসংঘের একটি দপ্তরের হিসাবমতো ১১ সেপ্টেম্বরের হামলায় মার্কিন ক্ষতির পরিমাণই হবে ৩৫ হাজার কোটি ডলার। মার্কিন অর্থনীতিতে ছাঁটাই আগে থেকে চলছিল। ১৯৮৯ সালে বছর জুড়ে ছাঁটাইয়ের মাত্রা ছিল ১ লাখ ১০ হাজার কর্মজীবী। আর ২০০১ সালের শুধু আগস্ট মাসেই ছাঁটাই হয়েছিল ১ লাখ ৩০ হাজার। তাই সেপ্টেম্বরের হামলা ছিল আমেরিকান অর্থনীতির জন্য গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো। কিন্তু তা কি সকলের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য?

মার্কিন শাসকশ্রেণী যতই এখন চিৎকার করুক না কেন যে নিরীহ-নির্দোষ লোক মারা হয়েছে, আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, জীবাণু অস্ত্রের মতো মানবতাবিরোধী অস্ত্র প্রয়োগ হয়েছে, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও আক্রমণ পরিচালনা করা হয়েছে, কিন্তু পাশাপাশি তাদের একটি অংশ কি এসবের পরেও খুশি হয়নি? অস্ত্র বিক্রয় কি বৃদ্ধি পায়নি? অস্ত্রের ব্যবহার কি নতুন করে প্রসারিত হয়নি? মরচে ধরা বা আধা ঘুমন্ত মার্কিনি মিলিটারি যন্ত্র বা পেশিশক্তি কি আবার তাজা হওয়ার সুযোগ পায়নি?

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার আগে থেকেই এসব আলামত পাওয়া যাচ্ছিল। আল গোরের প্রতারণাপূর্ণ পরাজয়ের পর টেক্সাসের তেলসমৃদ্ধ অঞ্চলের মানসপুত্র জর্জ বুশ ক্ষমতায় এসে একতরফাভাবে তারকা যুদ্ধ ও জাতীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন। রাশিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করে শুরু হয়েছিল কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে ক্ষেপণাস্ত্র, আত্মরক্ষা ব্যূহ তৈরির কর্মসূচি। কিন্তু হায়! মিসাইল থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ হলেও আত্মঘাতী মানুষের বিমান হামলার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ নয়। ১৯৭৩ সালে ১৪০টি জাতি মিলে জীবাণু যুদ্ধের গবেষণা নিষিদ্ধ করার যে চুক্তি করেছিল জর্জ বুশ তা একতরফাভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন- কিন্তু হায়! আজ 'অ্যানথ্রাক্স' তার নিজের উঠোনেই হামলা করেছে। বহু দেশে গোপনে এবং প্রকাশ্যে গুপ্তহত্যা, দাঙ্গা, মিলিটারি শাসন চালু করা ও চালু রাখার জন্য এবং বিশেষত প্যালেস্টাইন সমস্যাকে মানব ট্র্যাজেডি হিসেবে জিইয়ে রাখার জন্য মার্কিন শাসকশ্রেণীও তার অন্যতম রাষ্ট্রযন্ত্র সিআইএ বছরের পর বছর যে শ্রম, মেধা ও কষ্ট করেছে আজ কি তারই ষোল আনা সু(কু)ফল মার্কিনিরা ভোগ করছে? ধীরে ধীরে এভাবে পৃথিবীতে তৈরি হবে যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য নাকি ব্যাপারটা অন্যরকম হবে এবং এখানেই থামবে না? এটাই আজ মূল প্রশ্ন। আমেরিকার প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু ভণ্ড ও মূর্খরা প্রতিশোধ নেন একভাবে আর বীর ও জ্ঞানীরা প্রতিশোধ নেন আরেকভাবে।

www.pathagar.com

ভণ্ডামি ও মূর্খতা কার ?

নিঃসন্দেহে বলা যায়, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পার্টি হচ্ছে আমেরিকা। আকস্মিক হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত আমেরিকান শাসকশ্রেণী কি মাথা ঠাণ্ডা করে পরবর্তী প্রতিশোধের কথা ভাবছেন ? নাকি উত্তেজিত বলদর্পী ঘোষণা দিচ্ছেন যার অনেকটুকুই ভণ্ডামি এবং মূর্খতার শামিল ?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন যে, কিছু তথ্যের ভিত্তিতে তারা মনে করেন যে, ওসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী চক্র 'আল-কায়েদার গ্রুপই এই ঘটনার হোতা। যদিও এই তথ্য-প্রমাণ জগদ্বাসীর সামনে তুলে না ধরেই মার্কিন বাদীপক্ষ বিবাদীর বিচার করে নিজেই তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে এবং তার ও তার সহযোগীদের শাস্তির ভার নিজেই নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যে বা যারা হামলা করেছে যারা ওই হামলার পেছনে কোনো না কোনো ধরনের সাহায্য করেছে, এবং সাহায্যকারীকে যে সাহায্য করেছে তাদের কাউকেই ছাড়া হবে না বলে একটি সভ্য দেশের সভ্য প্রেসিডেন্ট সদম্ভ ঘোষণা দিয়েছেন। এক চোখের বদলে দুই চোখ, এক প্রাণের বিনিময়ে একশটি প্রাণ এবং একটি হামলার বদলে এক হাজার হামলার এই 'অসভ্য' ঘোষণাকে অভিহিত করা হয়েছে 'operation for Infinite Justice (অসীম ন্যায় বিচারের অভিযান!) নামে। কিন্তু ব্যাপারটি এরকম না হয়ে যদি আমেরিকা আন্তর্জাতিক আদালতে একটি মামলা দায়ের করত এবং অপরাধীরা যদি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেতেন তাহলে ব্যাপারটা কেমন হতো ?'

হামলাকারীদের আত্মপক্ষ সমর্থন

হামলাকারীরা আজ আর কেউ বেঁচে নেই। তারা স্বেচ্ছায় জেনে-শুনে আত্মহত্যা করেছেন। সম্ভবত স্বর্গে বা নরকে ঈশ্বরের দরবারে তাদের আত্মা এতদিনে পৌঁছে গেছে। শেষ বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কী বলছেন এই 'আত্মহত্যাকারীর' দল ? আসুন, কল্পনা করি।

প্রথম বক্তা ঃ এটা ব্যক্তিগত কোনো সংকীর্ণ লুটপাটের হামলা ছিল না। এ থেকে আমরা নিজেরা কোনো ব্যক্তিগত লাভের আশা করিনি। বরং আমরা আত্মত্যাগ করেছি। ত্যাগ করেছি আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জীবন। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ভ্রাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা ও সন্ত্রাস হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ।

দ্বিতীয় বক্তা ঃ একবারও কি ভেবে দেখেছেন, কখন একজন মানুষ নিজের প্রাণের বিনিময়ে স্বেচ্ছায় অন্য একজন শত্রুর বিরুদ্ধে বিনা উসকানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ? প্রাণের বিনিময়ে প্রতিশোধের জন্য এগিয়ে যায় ! অতীতে শত্রুর পক্ষ থেকে কী এমন করা হয়েছিল আমাদেরকে যে জন্য এরকম জঘন্য প্রতিহিংসার আগুন জ্বলেছিল আমাদের প্রাণে-মনে ? তা কি হে মহান ঈশ্বর আপনি জানেন না ?

তৃতীয় বক্তা ঃ আমরা তো মরেই গিয়েছি। আমরা নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে পাপ করেছি তার শাস্তি তো ঈশ্বর আপনি আমাদের দিয়েছেনই। অবশ্য এটা ঠিক যে, এত নির্দোষ লোক যে মারা যাবে তা আমরা ভাবিনি। কিন্তু সেই অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি কি আমরা অপরাধ সংগঠনের পরমুহূর্তেই লাভ করিনি ?

www.pathagar.com

চতুর্থ বক্তাঃ হে ঈশ্বর, আপনি ন্যায় বিচারক, আপনার বিচারে সব সময় তুল্যমূল্য থাকে। ইরাকে মার্কিন হামলার সময় ৫ লাখ নির্দোষ শিশু মৃত্যুবরণ করেছিল। তখন আমেরিকার রাষ্ট্রদূত অলব্রাইট বলেছিলেন, 'ন্যায়যুদ্ধের' জন্য এটুকু দাম 'Worth paying'! আমরা কি সেই একই কথা আমেরিকাকে এখন ফিরিয়ে দিতে পারি না। আমেরিকার দৃষ্টিতে তখন যে যুদ্ধ ছিল ন্যায় যুদ্ধ, আমাদের দৃষ্টিতে তখন তা ছিল অন্যায় যুদ্ধ। আজ আমেরিকার দৃষ্টিতে যা অন্যায় আক্রমণ, আমাদের দৃষ্টিতে আজ তা হচ্ছে ন্যায়ের যুদ্ধ। আমরা মনে করি এই যুদ্ধে মাত্র পাঁচ হাজার নির্দোষ মৃত্যু 'Worth paying'।

পঞ্চম বক্তা ঃ হে ঈশ্বর, আমাদের এই আক্রমণ কোনো সাধারণ প্রস্তুতিহীন আক্রমণ ছিল না। দীর্ঘদিন আমরা এ জন্য প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ নিয়েছি। এই প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণে আমেরিকার সিআইএ-ই আমাদের টাকা-পয়সা ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল। শত্রুর শত্রুকে যেমন চালাক লোকেরা সাহায্য করে। আজ সেসব চালাক লোকেরা বলছেন, 'সন্ত্রাস আমার শত্রুর বিরুদ্ধে চালালে সেটা অন্যায় নয় কিন্তু আমার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলার দুঃসাহস দেখানো অন্যায়।' এটা কি দ্বিচারিতা নয়?

ষষ্ঠ বক্তা ঃ হে ঈশ্বর আমরা সন্ত্রাসবাদী, আমরা পাপী। কিন্তু যারা এক সময় আমাদের সন্ত্রাসবাদী বানিয়েছেন, সন্ত্রাসের বীজ যারা বপন করে সযত্নে লালন করেছেন, পানি দিয়ে পুষ্ট করেছেন সন্ত্রাসের বৃক্ষ তাদেরও তো শাস্তি হওয়া উচিত এবং তাদের শাস্তি হওয়া উচিত আমাদের আগে। কারণ আদি পাপ তো তারাই শুরু করেছিলেন। আমরা শুধু তাদের পরিণতি মাত্র। তাদের শাস্তি বকেয়া রেখে আমাদের শাস্তি প্রাদান সঙ্গত হবে কি?

সপ্তম বক্তা ঃ ঈশ্বর, আপনার বিচার হওয়া উচিত ভারসাম্যপূর্ণ। লঘু পাপে গুরুদণ্ড হওয়া উচিত নয়। পাপের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি হওয়া উচিত। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মুখপাত্র হামলার পর প্রথম দিনের প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, 'শাস্তির মাত্রা' 'proportionate' (আনুপাতিক) 'Specific' (সুনির্দিষ্ট) এবং 'Targetted' (লক্ষ্যাভিমুখী) হওয়া উচিত। কিন্তু এখন নির্বিচার মিসাইল মারা হচ্ছে আফগানিস্তানের অসংখ্য জনপদে। এমন কি জাতিসংঘের রেডক্রসের খাদ্য গুদামও আক্রান্ত হচ্ছে। প্রতি একজন মার্কিন নাগরিকের মৃত্যুর জন্য সহস্রাধিক আফগান নারী, শিশু ও বৃদ্ধের মৃত্যু ঘটানো কি 'ভারসাম্যপূর্ণ' হচ্ছে?

অষ্টম বক্তা ঃ আমরা না হয় প্রত্যক্ষভাবে সন্ত্রাস করেছি। কিন্তু পৃথিবীর অনেক অত্যাচারিত প্রতিশোধপরায়ণ ব্যক্তি আছে যারা আমাদের সমর্থন করেছেন। কেউ কেউ সাহস করে বাহ্‌বা না দিলেও মনে মনে হয়তো কিছুটা হলেও আনন্দিত হয়েছেন। তাদের স্বজন হারানো দীর্ঘশ্বাস কিছুটা তৃপ্তি লাভ করেছে। তবু এখন আমাদের জন্য মৃত্যুদণ্ড হলে হয়তোবা অন্যায় হবে না। হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড যে হয় তা মেনে নিয়েই তো আমরা এই হামলা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের এই অসংখ্য বিশ্বব্যাপী নীরব ও সরব সমর্থক ও সাহায্যকারীরও শাস্তি কি এক সমান হবে? যে প্রত্যক্ষ অপরাধ করল আর যে পরোক্ষভাবে নৈতিক সমর্থন দান করল উভয়ের অপরাধ কি সমান? উভয়ের

www.pathagar.com

জন্য সমান শাস্তি বিধান করে পৃথিবীব্যাপী তা কার্যকরী করার চেষ্টা করলে পৃথিবীর শান্তি লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। সেটাই কি আমেরিকার আসল লক্ষ্য ?

নবম ব্যক্তি ঃ মার্কিন সরকার বলছেন, পৃথিবী দু'ভাগে বিভক্ত। হয় সন্ত্রাসীদের পক্ষে, না হয় সন্ত্রাসীদের বিপক্ষে। হায় ঈশ্বর, তোমার পৃথিবী কি এতই সরল ও বৈচিত্র্যহীন। এখানে কি সকাল এবং রাতের মাঝখানে ভোর নেই। দিন ও রাতের মধ্যে গোধূলি নেই ? যদি তাই থাকে তাহলে এই নির্বোধ উক্তি কি আমেরিকান রাষ্ট্রপতি ও তার পরামর্শদাতাদের চূড়ান্ত বোকামির সাক্ষ্য দিচ্ছে না ?

দশম ব্যক্তি ঃ অপরাধ করলে শাস্তি হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শাস্তির মূল উদ্দেশ্য কী ? মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, অপরাধের শেকড় উৎপাটন। মার্কিনিদের বন্ধু (অবশ্য মার্কিনিরা যার বন্ধু হয় তার দ্বিতীয় শত্রুর প্রয়োজন নেই, এরকম একটা কথা বাজারে চালু আছে!) পাকিস্তানের জেনারেল পারভেজ মোশাররফই বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে একটা বিরাট বৃক্ষের মতো বিষয়। লাদেনকে মারলে সেই বৃক্ষের একটি পাতার মৃত্যু হবে মাত্র। 'আল-কায়েদাকে' ধ্বংস করলে ধ্বংস হবে সন্ত্রাসী বৃক্ষের একটি ডাল। কিন্তু সন্ত্রাসরূপী বৃক্ষের শেকড় উন্মুলিত করতে হলে সবার আগে প্রয়োজন প্যালেস্টাইন, কাশ্মীরসহ সকল আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ ও বিবাদগুলোর ন্যায়সঙ্গত নিষ্পত্তি। কিন্তু মার্কিন সরকার সে পথে না এগিয়ে, এগিয়ে গেছেন পৃথিবীতে আরেকটি অমীমাংসিত বিবাদকেন্দ্র সৃষ্টির দিকে। তৈরি করেছেন আরো লাদেন, আরো সন্ত্রাসী। অতঃপর আরো সাতজন নিহত 'সন্ত্রাসী' পরপর নানা আহাজারি করে বক্তব্য দেওয়ার পর সর্বশেষ অষ্টাদশ সন্ত্রাসী নেতা উঠে বললেন--

'হে ঈশ্বর, আমেরিকার নির্বোধ শাসকরা জানেন না যে, আমাদের সঙ্গে ওসামা বিন লাদেন বা তার আল-কায়েদা গ্রুপের সংশ্রব খুব সামান্যই। তারা আমাদের নৈতিক সমর্থন দিয়েছেন। তাও সেটা ঘটনা ঘটার পরে। কিন্তু এটুকুর জন্য আমেরিকা আজ সারা পৃথিবীতে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছে তার পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর। ধর্মান্ধতা ও প্যান-ইসলামকে বোমা মেরে, বিমান হামলা করে ধ্বংস করা যাবে না। যেমন যায়নি সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনামকেও! আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি, আফগানিস্তান হবে আমেরিকার দ্বিতীয় ভিয়েতনাম। আর যুদ্ধটা বিস্তৃত হতে হতে শেষ যুদ্ধটা হয়তো হবে আমেরিকার মাটিতেই। আমেরিকার শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের সঙ্গে আমেরিকার মুনাফালোভী অস্ত্রবাজ শাসকশ্রেণীর যুদ্ধ। যেমনটি হয়েছিল ভিয়েতনামের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের শেষ পর্বে। আমেরিকান বিবেক আজ জাগতে শুরু করেছে। ❑

৪ নভেম্বর ২০০১

লেখক ঃ গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক।

www.pathagar.com

ইতিহাসের ইতি নয় তবে কি সভ্যতার সংঘাত

আমানুল্লাহ্ কবীর

বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম আফগানিস্তানের জনগণ আক্রমণের শিকার হয়েছে বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। অত্যাধুনিক মার্কিন ও ব্রিটিশ বোমারু বিমানগুলো দিনে-রাতে আফগানিস্তানের শহর ও গ্রামগুলোতে হামলা করছে। বোমা বর্ষণে কেবল সামরিক-বেসামরিক স্থাপনাগুলোই ধ্বংস হচ্ছে না, নারী-শিশুসহ শত শত নিরীহ মানুষও নিহত হচ্ছে। পৈতৃক প্রাণটা রক্ষার জন্য আবার অনেকেই দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে প্রতিবেশী দেশগুলোতে, বিশেষত পাকিস্তানে। কেবল পাকিস্তানের সীমান্ত ছাড়া হতভাগ্য মানুষগুলোর জন্য অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সীমান্তও বন্ধ। মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে মিহি প্রতিবাদ হলেও দারিদ্র্য ও খরাপীড়িত অসহায় আফগান জনগণের পক্ষে সোচ্চার তেমন কোন শক্তিই নেই। যখন পাশ্চাত্য সমাজ নিজেদের সভ্যতার শিরোমণি বলে দাবি করছে, তখন তারাই আবার আরেকটা সভ্যতার অংশ আফগান জাতিকে ঢাকঢোল পিটিয়ে ধ্বংস করছে-'সভ্যতার শত্রু' বলে আখ্যায়িত ওসামা বিন লাদেনের সন্ধানে। এটা কি 'সভ্যতার সংঘাত' না চূড়ান্ত বিশ্লেষণে একে বলব 'সভ্যতার বিপর্যয়'?

গত ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক ও পেন্টাগনে যে ভয়াবহ বিমান হামলা হয়েছে, তা যেমন অভাবনীয় তেমনি বিস্ময়কর নানা কারণেই। বিশ্বের একমাত্র 'সুপার পাওয়ার' হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির অহমিকার প্রতীক যথাক্রমে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনের ওপর বিধ্বংসী হামলা যারাই করুক, তা পাশ্চাত্য সভ্যতার অহংবোধকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছে। ওই মুহূর্তে হামলাকারীদের পরিচয়ের উপযুক্ত প্রমাণাদি হাতে না থাকলেও প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ নিরাপত্তার জন্য আকাশ-পাতাল করে যখন আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন তার প্রথম বক্তব্যই ছিল, 'এটা সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। এবং এর পরই হামলার জন্য প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসাবে দায়ী করা হল ওসামা বিন লাদেনকে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় মার্কিন প্রশাসনের কাছে হামলা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত হলেও হামলাকারী কারা হতে পারে, তা পূর্ব নির্ধারিতই ছিল। যে কারণে হামলার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য টার্গেট চিহ্নিত করতে তাদের সামান্যতম বিলম্বও হয়নি। হামলার দায়-দায়িত্ব বিন লাদেন অস্বীকার করেন, তবে হামলাকে সঠিক বলে অভিনন্দিত করেন। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার ব্যাপারে ব্যাপক আলোচিত পাল্টা তত্ত্ব হচ্ছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সংগঠিত করার জন্য ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল অত্যন্ত

www.pathagar.com

পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। পরবর্তীকালে বিন লাদেন ও তার সংগঠন আল-কায়েদা হামলার জন্য ভারত, রাশিয়া ও ইসরাইলিকে দায়ী করেন। এ অভিযোগ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ভারত কাশ্মীরে, রাশিয়া চেচনিয়ায় এবং ইসরাইল প্যালেস্টাইনে সামরিক সমাধানের পরিকল্পনা এঁটেছে। এর পক্ষে জোরালো প্রমাণও মিলছে-টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনের হামলার ঘটনার পর ভারত কাশ্মীরে এবং ইসরাইল প্যালেস্টাইনে তাদের সামরিক অভিযান জোরদার করেছে। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আহ্বান জানালে ভারত সর্বপ্রথম তার প্রতি ইতিবাচক সাড়া প্রদান করে। বুশের আহ্বানের প্রতি শেষ পর্যন্ত ইতিবাচক সাড়া দেয়া ছাড়া পাকিস্তানের হয়তো অন্য কোন উপায় ছিল না, কিন্তু ভারতের ত্বরিৎ সমর্থন কৌশলগতভাবে পাকিস্তানকে বেকায়দায় ফেলে এবং দ্বিতীয় চিন্তার কোন সুযোগ দেয়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার অন্ধ সমর্থক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলছেন, তাদের যুদ্ধ ইসলাম বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়, তাদের যুদ্ধ নেহায়েতই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, ভারতের টার্গেট কাশ্মীর, ইসরাইলের টার্গেট প্যালেস্টাইন, রাশিয়ার টার্গেট চেচনিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান টার্গেট আফগানিস্তানসহ সম্ভাব্য টার্গেট সুদান ও সোমালিয়া মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা যা মুসলিম সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। যদি সন্ত্রাসীদের নেটওয়ার্ক ধ্বংস করার নামে এসব এলাকায় আফগানিস্তানের মতো সামরিক অভিযান চালানো হয়, তাহলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে মুসলিম জনপদগুলোই। বুশ বা ব্লেয়ার যাই বলুন, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী বলে পশ্চিমা পত্র-পত্রিকাগুলোতে এতদিন যাদের ওপর বিশাল বিশাল রিপোর্ট ছাপা হয়েছে, ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর দৃশ্যে যাদের আনা হল তারা সবাই ভিন্ন ব্যক্তি এবং মুসলমান। মার্কিন প্রশাসনের প্রকাশিত সন্দেহভাজন হামলাকারীদের তালিকা যে ঠিক নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় অব্যবহিত পরই যখন দেখা যায় নিহত হামলাকারী বলে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে তিনি জীবিত ও তার সঙ্গে ওই ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই, কিংবা তালিকাভুক্ত কেউ কেউ প্রবল প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তার পরও মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলোকে সন্ত্রাসের উৎস ও সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে হামলার পর পশ্চিমা সংবাদপত্রগুলোও দেখা যায় ইসলাম, মুসলিম সভ্যতা ও মুসলমানদের পুনর্জাগরণের ওপর নানা গবেষণামূলক মতামত, ব্যাখ্যা ও প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। যে বিষয়ে তাদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই, তা হল-ইসলাম হচ্ছে 'জঙ্গি ধর্ম', সুতরাং মুসলিম সভ্যতা হচ্ছে 'জঙ্গি সভ্যতা' আর মুসলমানরা হচ্ছে 'জঙ্গি' সম্প্রদায় বা জাতি'। পশ্চিমা বিশ্লেষকরা ধর্মীয় মেজাজ ও মনোভাবের ভিত্তিতে মুসলমানদের দু'টি অংশে নরমপন্থী দু'অংশের ভৌগোলিক অবস্থানের সীমারেখা টেনে বলা হয়েছে, সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানরা হচ্ছে উগ্রপন্থী, আর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মুসলমানরা তুলনামূলকভাবে নরমপন্থী। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানরা কেন উগ্রপন্থী, তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, মনস্তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণসহ হাজারো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করলেও ইসরাইলই যে এর মূল কারণ, তারা তা মানতে রাজি নন। উপরন্তু তারা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, তারা বুঝতে পারেন না মুসলমানরা কেন এতা মার্কিনবিরোধী! অথচ ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাই মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিকে উত্তপ্ত করে তুলেছে, যা মরুবাসী

www.pathagar.com

মুসলমানদের ভেতর সঞ্চারিত হয়ে তাদের উগ্রমূর্তি দান করেছে। ইসরাইল যেমন মুসলিম বিশ্বের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, পাশ্চাত্য শক্তিও তেমনি তাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে তাদের স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করছে। বস্তুতপক্ষে সভ্যতার সংঘাত বহু আগ থেকে চলে আসলেও ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা তাতে নতুন করে ইন্ধন জোগায়। প্রেসিডেন্ট বুশ সেপ্টেম্বরের হামলাকে (পাশ্চাত্য) 'সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ' 'শিষ্টের বিরুদ্ধে দুষ্টের লড়াই'- এসব বক্তব্য দিয়ে খ্রিস্টান ধর্ম আশ্রিত পাশ্চাত্য 'ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতা' ও 'ইসলামী সভ্যতার' মধ্যে যে সম্ভাব্য সংঘাতের কথা সামুয়েল হান্টিংটন বলেছেন, তারই প্রতিধ্বনি করে আফগানিস্তানে সম্ভবত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া শুরু করলেন। এ কথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়, আফগান যুদ্ধে তালেবান সরকার হয়তো পরাজিত হবেএবং তার পরিবর্তে মার্কিনিদের পছন্দসই ব্যক্তিরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে। কিন্তু যুদ্ধের অবসান না হয়ে তা বরং মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে পারে।

অনেকেই মনে করেন এবং মনে করাই যুক্তিসঙ্গত যে, আফগানিস্তানে ভয়াবহ একতরফা হামলাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা বিন লাদেনকে সিংহায়ন (Lionise) করেছে এবং তার সংগঠন আল-কায়দার কাছে পারমাণবিক বোমা রয়েছে বলেও সর্বশেষ প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা বলছেন, বিন লাদেন পাকিস্তান থেকেই পারমাণবিক বোমার প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, পাকিস্তানকেও বিন লাদেনের সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা। আর, যে কোনভাবেই তা যদি প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে পাকিস্তানও যে কোয়ালিশন ফোর্সের টার্গেট হতে পারে, সে আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

আজ অনেক মহলেরই প্রশ্ন, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা না ঘটলে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা হতো কিনা। প্রাপ্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতেই তাদের প্রশ্নের জবাবে বলা যায়- 'হ্যাঁ, হতো' সময়ের হেরফের যাই হোক। টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনের ঘটনা আফগানিস্তানের ওপর হামলাকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র, আকস্মিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন প্রশাসন হামলার আকস্মিক পরিকল্পনা করেছে, এ কথা ঠিক নয়। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মধ্যএশিয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ইউরোপীয় ও এশীয় মিত্ররা যে 'অর্থনৈতিক স্বার্থ' আবিষ্কার করে, তা উদ্ধারের জন্য অনেক আগ থেকেই মার্কিন স্ট্র্যাটেজিস্টরা সামরিক পরিকল্পনা তৈরি করছিলেন। তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তানসহ মধ্যএশিয়ার মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলোতে তেল ও গ্যাসের যে বিরাট মজুদ রয়েছে, তার প্রতি ক্ষুধার্ত দৃষ্টি পড়ে প্রধানত এশিয়া মহাদেশের জাপান ও ভারতের এবং পাশ্চাত্য বিশ্বের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোর। অবশ্য তাদের সঙ্গে পাকিস্তান ও চীনের অর্থনৈতিক স্বার্থও জড়িত। জাপান পাইপলাইনের মাধ্যমে সরাসরি গ্যাস আমদানি করবে তুর্কমেনিস্তান ও তার প্রতিবেশি দেশগুলো থেকে। এ গ্যাস পাইপলাইন চীন হয়ে যাবে জাপানে। আরেকটি গ্যাস পাইপলাইনের পরিকল্পনা করা হয়েছে তুর্কমেনিস্তান থেকে আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তানের করাচি এবং পাকিস্তান হয়ে ভারতের সম্ভাব্য স্থান নয়াদিল্লি। গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের পরিকল্পনা সফল হলে পরবর্তীকালে তেলের জন্যও পাইপলাইন স্থাপন করা হবে। করাচি হয়ে মধ্যএশিয়ার তেলসম্পদ চলে যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে। মার্কিন প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বর্তমানে তুর্কমেনিস্তানে গ্যাস-তেল উত্তোলন করছে এবং পাইপলাইন স্থাপন করে রফতানির পরিকল্পনা করছে এককভাবে মার্কিন তেল

www.pathagar.com

কোম্পানি ইউনোকল, যে ইউনোকল বাংলাদেশ থেকেও পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারতে গ্যাস রফতানির জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। কিন্তু মধ্যএশিয়া থেকে করাচি ও নয়াদিল্লিতে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল-গ্যান নেয়ার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বিশেষত বিন লাদেনের অনুসারী তালেবান সরকার। সুতরাং তালেবান সরকারকে উৎখাত করে আফগানিস্তানে স্বার্থসংশ্লিষ্ট দেশগুলো তাদের পছন্দসই একটা সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। বিন লাদেনের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ হচ্ছে, তিনি সারাবিশ্বে মুসলমানদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এবং 'সন্ত্রাসী তৎপরতায়' তাদের সাহায্য-সহযোগিতা দিচ্ছেন। এই অজুহাতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন ফোর্স বিন লাদেনের অনুসারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যএশিয়াতেও সামরিক অভিযান পরিচালনা করবে। প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, সন্ত্রাসবিরোধী এ সামরিক অভিযান সুদীর্ঘ দু'বছর ধরে চলতে পারে। ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট-আফগানিস্তানে মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর সামরিক অভিযান পরিচালিত হবে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান, কাশ্মীর বিরোধ মীমাংসা ও মধ্যএশিয়ার 'জঙ্গি' মুসলমানদের অভ্যুত্থানকে দমনের জন্য। আরও ভয়াবহ খবর হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছে। তাদের ভয়, প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ ক্ষমতাচ্যুত হতে পারেন এবং তাহলে পারমাণবিক বোমার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবে তালেবানপন্থী জেনারেলরা। এ কাজের জন্য পেন্টাগন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে একটা বিশেষ বাহিনীও গড়ে তুলছে, যারা প্রয়োজনে পারমাণবিক স্থাপনাগুলো ধ্বংসও করে দিতে পারে। কারণ, মার্কিন ও ব্রিটিশ প্রশাসনের সন্দেহ, পারমাণবিক শক্তির অধিকারী একমাত্র মুসলিম দেশ পাকিস্তান থেকে পারমাণবিক বোমা তৈরির রসদ ও কৌশল অন্যান্য মুসলিম দেশ ও গ্রুপগুলোর কাছে পাচার হচ্ছে অথবা হতে পারে। আর পারমাণবিক শক্তিরূপে পাকিস্তানের অবস্থানের কারণে বিস্ফোরণোন্মুখ কাশ্মীর বিরোধের সমাধানও সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণ এশিয়ায় কোয়ালিশন ফোর্সের এ ধরনের সন্ত্রাসবিরোধী সামরিক অভিযানের ব্যাপারে ভারতের আগ্রহই সবচেয়ে বেশি।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের (cold war) অবসানের প্রেক্ষাপটে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা তার আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই 'The end of History' (বা 'ইতিহাসের ইতি') লিখেছিলেন। সম্ভবত তার পাল্টা তত্ত্ব হিসাবেই হান্টিংটন পরবর্তীতে'The clash of civilisations and the Remaking of World Order' বইটি লিখেন, যার মূল প্রতিপাদ্যই হচ্ছে 'ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা'। অর্থাৎ ইতিহাসের ইতি নয়, ইতিহাস সৃষ্টির নতুন প্রেক্ষাপট তিনি তুলে এনেছেন বিশ্ব সম্প্রদায়ের সামনে। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা 'Remaking of world Order'-এরই সূচনা করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় বিশ্বযুদ্ধ বলতে আমরা যা বুঝি, সম্ভবত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধরণ তা নাও হতে পারে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন ফোর্স দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ভিত্তিতে সন্ত্রাসবিরোধী সামরিক অভিযানের নামে যে যুদ্ধ শুরু করেছে তাই কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু বলে আমরা ধরে নেব? ❑

১১ নভেম্বর' ০১

লেখক ঃ সাংবাদিক, কলামিষ্ট।

www.pathagar.com

আফগানিস্তান যুদ্ধ কি দক্ষিণ এশিয়ার ভারসাম্য নষ্ট করবে

(দুই)

খবরটা প্রথমে আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। পরে একজন সচেতন পাঠক বলার পর মনোযোগ দিয়ে তা পড়লাম। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে বলে খবরে বলা হয়েছে। যখন খবরটি প্রকাশিত হয় তখন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সেনাপ্রধান দুজনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন। খবরে বলা হয়েছে, মার্কিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় আফগানিস্তান যুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণের প্রস্তাবটিও উত্থাপিত হতে পারে। যে কোন সচেতন নাগরিকই খবরটা অত্যন্ত গুরুত্ব ও উদ্বেগের সঙ্গে পাঠ করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা শুরু হয় অক্টোবরের গোড়ার দিকে। তখন বাংলাদেশে ক্ষমতায় কেয়ারটেকার সরকার। তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী সামরিক অভিযান শুরুর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে যে সহযোগিতার আহ্বান জানান, তার প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিয়ে কেয়ারটেকার সরকার যুদ্ধে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ও আকাশসীমা ব্যবহারের সম্মতি প্রদান করে। উত্তরাধিকারসূত্রে নবনির্বাচিত বিএনপি সরকার সে বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করলেও এ ধরনের বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী সামরিক অভিযান জাতিসংঘের অধীনে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মতপ্রকাশ করে।

মার্কিন প্রশাসন থেকে বাংলাদেশের কাছে এ ধরনের প্রস্তাব আসাটা অস্বাভাবিক নয়। আফগানিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের ভূ-কৌশলগত অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার যে আভাস ইতোমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে, তাতে পাকিস্তানের মতো ভারত ও বাংলাদেশের ভূখণ্ড ও আকাশসীমা ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। আফগানিস্তানে মাসাধিককালের সামরিক অভিযানে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কেবল হাওয়াই হামলায় ওসামা বিন লাদেন ও তার অনুসারী তালেবান বাহিনীকে নির্মূল করা যাবে না, একই সঙ্গে স্থলবাহিনীকেও অংশ নিতে হবে। কিন্তু আফগানিস্তানের ভূ-প্রকৃতি, জঙ্গি জাতি হিসেবে

www.pathagar.com

তাদের রণকৌশল ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি সামরিক স্থলাভিযানের ক্ষেত্রে যে মারাত্মকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, তার স্বাক্ষর সাম্প্রতিক ইতিহাসেও একাধিকবার রয়েছে।

আফগানিস্তান যুদ্ধের অবসান কিভাবে ও কতদিনে হবে, তার ওপর বহুলাংশে নির্ভর করছে বর্তমান আঞ্চলিক ভারসাম্য থাকবে, কি থাকবে না। ভারত এ অঞ্চলে তার একক আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার প্রভাববলয় সম্প্রসারিত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পরপরই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি ইতোমধ্যে রাশিয়া, আমেরিকা ও ব্রিটেন সফর করে আফগানিস্তানের পরিবর্তনে তার দেশে কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতি আদায়ের চেষ্টা করেন। অর্থাৎ তালেবান সরকারের পতনের পর কাবুলে যাদের ক্ষমতায় বসানো হবে, তাদের ওপর ভারতের প্রভাব নিশ্চিত করাই মূল উদ্দেশ্য। কারণ এ ব্যাপারে ভারত ও পশ্চিমা শক্তির স্বার্থ অভিন্ন। প্রথমত 'সন্ত্রাসী মুসলমানদের' স্বর্গরাজ্য বলে চিহ্নিত আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ কোয়ালিশান ফোর্সের করায়ত্ত হলে কাশ্মীরে পাকিস্তানের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়বে বলে ভারত মনে করে। দ্বিতীয়ত মধ্য এশিয়া (তুর্কমেনিস্তান ও অন্যান্য দেশ) থেকে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান হয়ে দিল্লিতে পরিকল্পিত গ্যাস পাইপলাইনের নিরাপত্তার জন্য বিশেষত আফগানিস্তানের ওপর ভারতের প্রভাব অপরিহার্য। বুশ প্রশাসন এশিয়ায় তার 'প্রধান সামরিক মিত্র' এবং চীন ও মুসলিম দেশগুলোর 'প্রতিপক্ষ শক্তি' হিসাবে দাঁড়ানোর জন্য সম্প্রতি দিল্লিকে যে প্রস্তাব দিয়েছে তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, চীনের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে 'স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার'রূপে পেতে আগ্রহী। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ির ওয়াশিংটন সফরের আগ মুহূর্তে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়া টুডে'র প্রতিবেদনে বলা হয়, দিল্লি মার্কিন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও প্রেসিডেন্ট বুশের সঙ্গে আলোচনায় তা স্থান পাবে। কিন্তু কোন পক্ষই এ ব্যাপারে মুখ খুলছে না। সুতরাং একথা বলা যায়, এ বিষয়ে বুশ-বাজপেয়ি আলোচনার ফলাফল যা-ই হোক, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এটা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত যে, এশিয়ায় ভারতই হতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মিত্র। 'সভ্যতার সংঘাতের' কথা বিচার করলেও দেখা যায়, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে হিন্দুধর্ম আশ্রিত ভারতীয় সভ্যতার মনস্তাত্ত্বিক মিল রয়েছে। কাজেই, পাশ্চাত্য শক্তি যাকে 'সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 'বলে অভিহিত করছে, সে যুদ্ধে ভারত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে যদি দক্ষিণ এশিয়ায় 'সভ্যতার শত্রু' মুসলমান দেশ বা এলাকাগুলোতে 'সন্ত্রাস' দমনে উৎসাহী হয়ে ওঠে, তাহলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

পাশ্চাত্য মহল বাংলাদেশকে যতই 'মডারেট' মুসলিম দেশ হিসাবে আখ্যায়িত করুক না কেন, 'সভ্যতার সংঘাত' মাথায় রেখেই আমাদের প্রতিরক্ষা নীতি, পররাষ্ট্র নীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি নির্ধারণ করতে হবে। কারণ, বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ও মুসলমানপ্রধান দেশ হওয়ার কারণে একই সঙ্গে পাশ্চাত্য (খ্রিস্টান) সভ্যতা ও ভারতীয় (হিন্দু) সভ্যতার টার্গেট। এশিয়ায় ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য 'স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার' বলে স্বাভাবিকভাবেই তাকে চীন ও মুসলিম দেশগুলোর 'প্রতিপক্ষ শক্তি'রূপে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করবে। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র ও অপারমাণবিক দেশগুলোর অর্থনীতিকে বিশ্বায়ন নীতির নামে ভারতের অর্থনীতির পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা হবে। ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান ও ভারতে গ্যাস রফতানির ব্যাপারে বাংলাদেশের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের অব্যাহত

www.pathagar.com

চাপ এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনারই অংশ বলে মনে হয়। ভারত ইতোমধ্যেই প্রতিবেশী নেপাল-ভুটানের পানিসম্পদের ওপর খবরদারি প্রতিষ্ঠিত করে সেখান থেকে সস্তায় পানি-বিদ্যুৎ আমদানি করে শিল্পায়ন তথা উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করছে, যার কোন সুফল ওই দু'দেশের জনগণ পাচ্ছে না। ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান ও ভারতে গ্যাস রফতানির সঙ্গে বাংলাদেশের নিরাপত্তা জড়িত বলে এ দুটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের চরম সতর্কতার পরিচয় দিতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন নীতি ও ভারতীয় সভ্যতার প্রবক্তাদের সুর ও বক্তব্য একই ধরনের হওয়ার ফলে তা বাস্তবে রূপলাভ করলে পরিণতিও একই হবে, অর্থাৎ তার সুফল পাবে ভারত, যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে। বাংলাদেশ থেকে গ্যাস রফতানির কথা উঠলেই উদাহরণ হিসাবে আমরা নাইজেরিয়ার পরিণতির কথা বলি। দেশী-বিদেশী লুটেরার লুটতরাজের ফলে তেল-গ্যাস সমৃদ্ধ নাইজেরিয়া নিঃস্ব হয়ে গেছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো তেল-গ্যাস রফতানির আর্থিক সুফল পেলেও তাদের নিরাপত্তার জন্য নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে পাশ্চাত্য শক্তি, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওপর। তাদের এই নির্ভরতার কারণে তারা মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও প্যালেস্টাইনিদের অধিকার রক্ষার জন্য সন্ত্রাসী ইসরাইল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেকোন প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারছে না, উপরন্তু প্রতিদিনই সেখানে নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে। ইসরাইলের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যে পাশ্চাত্য শক্তি মদদ দিচ্ছে, সেই একই শক্তি তাদের স্বার্থের জন্য তেলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলোতে গণতন্ত্রের বিকাশ হতে দিচ্ছে না। যে কারণে অধিকার সচেতন আরব মুসলমানরা ক্রমেই ভায়োলেন্ট হয়ে উঠছে। আর পাশ্চাত্য দেশগুলো তখন তাদের আখ্যায়িত করছে 'মৌলবাদী' 'জঙ্গি' বা 'সন্ত্রাসী' বলে। যেমন কাশ্মীরে স্বাধীনতার জন্য লড়াইরত মুসলমানদের ভারত 'সন্ত্রাসী' হিসাবে চিহ্নিত করে আফগানিস্তানের মতো সেখানেও সন্ত্রাসবিরোধী সামরিক অভিযানের উস্কানি দিচ্ছে।

এটা আজ সুস্পষ্ট যে, তালেবান সরকারের পতন হলেও আফগানিস্তানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসার কোন সম্ভাবনা নেই। বরং এই অস্থিতিশীল অবস্থা আফগানিস্তানের আশপাশের দেশগুলো, এমন কি সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর এর ফলে তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী সামরিক অভিযানও আফগানিস্তানের বাইরে মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ায় সম্প্রসারিত ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। আফগান জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশ হচ্ছে পশতুন, যাদের প্রতিনিধিত্ব করে তালেবান। তাদের বাদ দিয়ে অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে নিয়ে সরকার গঠন করলে তাতে অতীত ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। কারণ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নও অবশেষে আফগানিস্তান থেকে দলবল নিয়ে সরে পড়তে বাধ্য হয়। তবে এবার ইঙ্গ-মার্কিন স্ট্র্যাটেজিস্টরা ভিন্ন পরিকল্পনা করেছে বলে মনে হয়- আফগানিস্তানকে উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত করে সেখানে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েনের মাধ্যমে বিশেষত উত্তরাঞ্চলে তাদের নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করতে চায়।

উল্লেখ্য, ইউনকল প্রস্তাবিত গ্যাস পাইপলাইন তুর্কমেনিস্তান থেকে ওই এলাকা হয়েই ভারতের দিল্লিতে যাওয়ার কথা। জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েন করলেই আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটবে, এমন কল্পনা করা যায় না, বরং তার ফলে গৃহযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী

www.pathagar.com

হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ, আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানত পশতুন। সাম্প্রতিক বিশ্ব মানচিত্রে অনেক পরিবর্তন হয়েছে- এশিয়ায় ও ইউরোপে। আফগানিস্তানও উত্তর ও দক্ষিণ এ দু'ভাগে বিভক্ত হলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা তাহলেই কেবল জঙ্গি আফগানদের শক্তিকে খর্ব করা সম্ভব হবে।

আফগানিস্তান যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে সবচেয়ে লাভবান হবে ভারত। পাইপলাইনের মাধ্যমে মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে গ্যাস পাওয়ার বিষয়টি যেমন নিশ্চিত হবে, তেমনি জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি এ ভূখণ্ডে স্ট্র্যাটেজিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ আফগানিস্তানে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনাসহ এ অঞ্চলের সকল মুসলিম দেশ রাশিয়া ও চীনের ওপর নজরদারি করবে, আর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা অনুসারে চীন ও মুসলিম দেশগুলোকে মোকাবেলার জন্য তাদের সম্ভাব্য 'প্রধান সামরিক মিত্র' ভারতকে উপযোগী 'প্রতিপক্ষ' হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালাবে। ফলে, দক্ষিণ এশিয়ায় এখন যে ভারসাম্য বিরাজ করছে, তা বিনষ্ট হতে বাধ্য। ❑

২৫ নভেম্বর' ০১

শিশুটি জানতোনা তার ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

সন্ত্রাসবাদ ও সেই সকল সম্মানিত সন্ত্রাসবাদীগণ (!)

সৈয়দ আবুল মকসুদ

১৯৭৭-এর ২৭ মার্চ ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় র‍্যান্ড করপোরেশনের পরিচালক ব্রিয়ান জেনকিনসের 'হাই টেকনোলোজি টেরোরিজম ঃ সারোগেট ওয়ার ফেয়ার' শীর্ষক পৃষ্ঠাব্যাপী লেখাটি পাঠ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। জেনকিনস ছিলেন ওয়ারশ জোট এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সরকারের বিরুদ্ধে আমেরিকা কর্তৃক 'প্রক্সি ওয়ার' চালিয়ে যাওয়ার একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা। এবং তিনি ছিলেন কার্টার প্রশাসনের একজন অতিপ্রিয় ব্যক্তি।

মার্কিন সরকারের নির্দেশে প্রস্তুত সেই নিবন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ক্রমবর্ধমান.... এই পরিস্থিতিতে আমাদের মৌলিক জাতীয় নিরাপত্তার কিছু কিছু ধারণাকে বদলাতে হতে পারে। বর্তমানে (সন্ত্রাস প্রতিরোধে) আমরা পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত নই।' সন্ত্রাসবাদীরা তাদের নতুন নতুন কৌশলে এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে এই বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে জেনকিনস আরো লিখেছিলেন, ধারণা হচ্ছে সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ জোরদার করছে। যার ফলে হচ্ছে বহুজাতিক ফ্রিল্যান্স সন্ত্রাসী দলগুলোর উত্থান। তারা সেই কারণগুলোর পক্ষে আক্রমণ পরিচালনা করতে ইচ্ছুক যেগুলোর প্রতি তারা সহানুভূতিশীল, অথবা মক্কেলের সন্ত্রাসী গ্রুপ কিংবা সরকারের ভাড়াটে হিসেবে বিশেষ সন্ত্রাসী অভিযান অথবা প্রচারণা চালানো।

দু' যুগ আগে প্রকাশিত সে লেখায় সন্ত্রাসবিশেষজ্ঞ জেনকিনস মন্তব্য করেছিলেন, 'সন্ত্রাসবাদ দমনে আমরা সামরিক শক্তি প্রয়োগের বিষয়টিও শেষ পর্যন্ত বাতিল করছি না।' বাতিল করা তো দূরের কথা অব্যাহতভাবে একমাত্র বল প্রয়োগ ও ষড়যন্ত্রের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে, শান্তিপূর্ণ পথ তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য। মার্কিন কাউন্টার টেরোরিস্ট ফোর্সের মধ্যে ছিল সেনাবাহিনীর বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিটসমূহ, রেঞ্জার ব্যাটেলিয়ান ও বিমানবাহিনীর ইউনিটসমূহ, নৌবাহিনীর সিলস (the Naval Seals), ফ্লিট মেরিন ফোর্সেস এবং বিমানবাহিনীর স্পেশাল অপারেশনস স্কোয়ার্ডনসমূহ। সত্তর

www.pathagar.com

দশকের এ বিশেষজ্ঞ দলগুলোর সঙ্গে পরবর্তী সময়ে যোগ হয়েছে আরো দক্ষ বাহিনী যে সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণাই নেই।

সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা সর্বত্র একরকম নয়। আমেরিকার সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা হলো ঃ যারাই উগ্রভাবে মার্কিন সরকারের নীতির অথবা বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরোধিতা করবেন তারাই সন্ত্রাসী। এটা কোনো কথার কথা নয়। মার্কিন সরকারের গোপন দলিলপত্র, যা বহুদিন পরপর প্রকাশ করা হয়, সেটাই সাক্ষ্য দেয়। অভিযোগ বা অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে শেখ ওসামা বিন লাদেনকে ঘোষণা করা হয়েছে বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসী এবং যুক্তরাষ্ট্রের এক নম্বর শত্রু। তাছাড়া ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরপরই ২৭টি সংগঠন ও ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট বুশ সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের সম্পদের ওপর আরোপ করেছেন নিষেধাজ্ঞা। নিউইয়র্ক, পেন্টাগন ও পেনসিলভেনিয়ায় যে ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক এবং যারাই তা ঘটিয়েছে তারা চরম নিষ্ঠুর মানুষ তাতে যেমন সন্দেহ নেই, তেমনি তাদের এক ধরনের উন্মাদও বলা যায়। কিন্তু প্রত্যেক কাজের পেছনে থাকে কারণ। প্রশ্ন হলো, কেন তারা এই নৃশংস আত্মঘাতী কাজটি করল। এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছে আমেরিকান একদল শিশু। এবিসি টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে জনা পঞ্চাশেক শিশু মন্তব্য করেছে : আমরা (আমেরিকানরা) নিশ্চয়ই এমন কিছু করেছি, যা ওদের (মুসলমান চরমপন্থীদের) উন্মাদ করে দিয়েছে। অথবা তারা আমাদের ওপর এতই বিরক্ত হয়েছে যে, আত্মহত্যা করতে পর্যন্ত ভয় পায়নি।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর একটি দিনও বিলম্ব না করে বুশ ও তার সরকার গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা দিলেন যে, লাদেনই এই ধ্বংসযজ্ঞের জন্য দায়ী এবং তাকে হত্যা করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নীতির বা স্বার্থে বিরোধী যে কাউকে হত্যা করতে মার্কিন সরকারের একেবারেই অরুচি নেই। এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি রুশ বিপ্লবী নেতা ট্রটস্কিকে। স্ট্যালিনের সঙ্গে তার তত্ত্বগত বিরোধ দেখা দিলে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে তাকে বহিষ্কার করে নির্বাসনে পাঠানো হয়। মেক্সিকোতে অবস্থানরত অবস্থায় আততায়ীর হাতে ১৯৪০ সালে তিনি নিহত হলে দুনিয়ার মানুষ সন্দেহ করে যে, এটি স্ট্যালিনেরই ষড়যন্ত্র। কিন্তু বহু পরে জানা যায় যে, ওই হত্যার পেছনে হাত ছিল আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা।

অনেক বছর আগে ১৯৭০-এর শেষের দিকে বার্লিনের ফ্রি ইউনিভার্সিটির এক পাঠাগারে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ থেকে প্রকাশিত কিছু ব্যতিক্রমধর্মী সাময়িকীর পাতা ওল্টানোর সুযোগ আমার হয়েছিল। কোনো কোনো নিবন্ধ পড়ে চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার উপক্রম হতো। অভ্যাসবশত অনেক কথা নোট বইতে টুকে রাখতাম। বিশেষ করে কয়েক বছর আগেই আমাদের দেশে ১৯৭৫-এ ১৫ আগস্ট ঘটে গেছে বলে কোনো তথ্য অবিশ্বাস্য বলে মনে হতো না। কেনেডির আমলের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে এক নিবন্ধে অবগত হলাম যে, কীভাবে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ দেশে দেশে এমন কি ইউরোপে পর্যন্ত মার্কিন নীতিবিরোধী শাসকদের ভাড়াটে ঘাতকদের মাধ্যমে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। তখনকার সেই বর্বর কর্মকাণ্ডের নাটের গুরু ছিলেন প্রেসিডেন্ট কেনেডির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ম্যাক জর্জ বান্ডি।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ তো অতি দুর্বল, দরিদ্র ও দুর্ভাগা এক দেশ। এখানকার প্রতিষ্ঠাতা-রাষ্ট্রপতিকে সপরিবারে হত্যা করতে ওদের করুণার উদ্রেক হওয়ার কথা নয়। মার্কিন সরকার ইউরোপের কোন কোন দেশে তাদের অপছন্দের শাসকদের ওপর থাবা বিস্তার করেছিল তার একটি ক্ষুদ্র তালিকা আমাদের পাঠকদের সামনে পেশ করতে চাই।

এফবিআই, সিআইএ প্রভৃতির শিকারের তালিকায় ছিলেন ফরাসি রাষ্ট্রপতি শার্ল দ্য গল, কিউবার প্রধানমন্ত্রী ফিডেল ক্যাস্ট্রো, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ। তাদেরই শিকার প্যাট্রিশ লুমুম্বা, গ্রিসের ল্যামব্রাকিস, ইতালির মাত্তেই ও অন্যান্য নেতা। লন্ডনে উত্তর ইয়েমেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা, পশ্চিম জার্মানির এটর্নি জেনারেল সিগফ্রিড বুবাক প্রাণ হারান এফবিআই-এর ষড়যন্ত্রে। শুধু শারীরিক হত্যা নয় চরিত্র হননের মাধ্যমে অনেক দেশের মার্কিনবিরোধী সরকারের পতন ঘটানো হয়, যেমন প্রফুমো কেলেঙ্কারির নাটক সাজিয়ে ব্রিটেনের ম্যাকমিলান সরকারের এবং অন্য উপায়ে জার্মানির চ্যান্সেলর আদেনয়ারের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

মানবজাতির ইতিহাসে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ পরিচালনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আর কোন দেশ অতিক্রম করতে পেরেছে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত কত দেশের লাখ লাখ মানুষকে যে আমেরিকা হত্যা করেছে তার সংখ্যা পৃথিবী কোনোদিনই নির্ণয় করতে পারবে না। কোথায় সে হানা দেয়নি? আরব বিশ্ব ছাড়াও চীন, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, লাওস, ইরান, ইরাক, বসনিয়া, যুগোস্লাভিয়া, লিবিয়া, গুয়েতেমালা, এল সালভাদোর, নিকারাগুয়া, পানামা, পেরুসহ কত নাম। কত জাতি ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সর্বনাশ ঘটিয়েছে একেবারে ঠাণ্ডা মাথায়, যেমনটি করছে এখন আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে।

যে দেশ দুর্বল রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের ওপর অকল্পনীয় বর্বরতা চালায় সে গোপন সন্ত্রাসবাদের শিকার আদৌ হবে না তা কি করে সম্ভব? প্রত্যেক মানুষ তা সে যত দুর্বলই হোক প্রতিরোধী চেতনার অধিকারী ও প্রতিহিংসাপরায়ণও বটে। গত ৫০ বছরে আমেরিকার মধ্যে নানা রকম ছোট ও বড় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে। সে জন্য যেসব দেশের নাম করলাম সেগুলোর কোনো না কোনো সন্ত্রাসী গ্রুপ দায়ী থাকতে পারে। প্রধানত আমেরিকার বিক্ষুব্ধ কোনো গোষ্ঠীই এ কাজ করে থাকে। কিন্তু বড় স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা নিজেরাই নিজের দেশে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে তার দায় শত্রুর ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করেছে-- এমন দৃষ্টান্তও অজস্র। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার ব্যাপারে মার্কিন সাময়িকী 'দ্য বাল্টিমোর সান' মন্তব্য করেছে, 'যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীই এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে।' অতীতেও তাদের এ ধরনের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে। যেমন ফিদেল ক্যাস্ট্রোর ওপর দোষ চাপিয়ে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে ১৯৬২-তে আমেরিকার মাটিতে একটি বড় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটাতে গিয়ে ব্যর্থ হয় যুক্তরাষ্ট্র সরকার।

১১ সেপ্টেম্বর ঘটনা ঘটার পর কালবিলম্ব না করে প্রেসিডেন্ট বুশ এবং তার পারিষদরা যখন ঘোষণা দিলেন যে-এ কাজ লাদেন করেছেন, তখনই নানা দেশের গোয়েন্দা ও প্রতিগোয়েন্দাগণ এবং সন্ত্রাস বিশেষজ্ঞরা বললেন, আরেক মুল্লুকে বলে এই বিশাল

www.pathagar.com

আয়োজনে শরিক হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের অভিমত, কোনো সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হাসিলের জন্য আমেরিকার প্রশাসন নিজেই ইসরায়েল, ব্রিটেন প্রভৃতির সহযোগিতায় এই কাণ্ড করেছে। ৩ নভেম্বর ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ইসরাইলি গোয়েন্দা 'মোসাদ' এই ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়ে থাকতে পারে। বিশ্বের বড় বড় প্রচার মাধ্যমের মালিক ও মার্কিন প্রশাসনের স্বার্থ অভিন্ন, তাই মার্কিনবিরোধী কোনো সংবাদ অথবা সংবাদভাষ্য বিশ্ব গণমাধ্যমে গুরুত্ব পায় না বললেই চলে। যুক্তরাষ্ট্র তার প্রিয় দেশ ইসরাইলের কোনো দোষই স্বীকার করতে নারাজ।

যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ব্রিটেন প্রভৃতি নাকি সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড করছে। সন্ত্রাসী বলতে আমেরিকা বা ব্রিটেন যা বোঝে পৃথিবীর মানুষের ধারণা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্রিটিশ সরকারের নথিপত্রে সন্ত্রাসীদের তালিকার একেবারে শীর্ষে ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তার আগে ছিলেন তিতুমীর, শরিয়ত উল্লাহ, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম, উল্লাসকর দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ এমন কি একেবারে আত্মভোলা কবি কাজী নজরুল ইসলাম। একই ব্যক্তি এক পক্ষের কাছে সন্ত্রাসী অপর পক্ষের কাছে মুক্তিসংগ্রামী।

গত ৫০ বছরে যুক্তরাষ্ট্র যাদের 'সন্ত্রাসী' বলে চিহ্নিত করে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করেছে তাদের সকলেই আক্ষরিক ও প্রচলিত অর্থে সন্ত্রাসী ছিলেন না, ছিলেন অন্যায়ের প্রতিবাদকারী ও মানবপ্রেমী। ইতিহাসে তারা পেয়েছেন অতি শ্রদ্ধার আসন। আমেরিকার শাসকদের কাছে সন্ত্রাসী ছিলেন এর্নেস্তো চে গুয়েভারা, বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের মহানায়ক মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, প্রগতিশীল রাজনীতির প্রবক্তা, মানবাধিকার ও নারীমুক্তি আন্দোলনের নেত্রী এনজেলা ডেভিস এবং আরো কত খ্যাত-অখ্যাত নেতা ও নেত্রী। সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে তারা হত্যা করেছেন ভিয়েতনামের সংগ্রামী নেতা ও কর্মীদের এবং নিকারাগুয়ার সান্দিনিস্তা জাতীয় যুক্তফ্রন্টের সমর্থক ও নেতাদের। গণতন্ত্র হত্যাকারী সামরিক শাসকদের তারা সহযোগিতা দেন, পক্ষান্তরে ক্ষমতা এবং দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেন বামপন্থী ও গণতন্ত্রীদের।

সম্প্রতি অনেকগুলো ইসলামী প্রতিষ্ঠানকে বুশ প্রশাসন সন্ত্রাসী ঘোষণা করে ওগুলোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তাদের হিসেবে সন্ত্রাসীদের তালিকা খুবই দীর্ঘ এবং সেখানে ইসলাম, খ্রীস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ বলে কিছু নেই, মার্কিনবিরোধী হলেই হলো। সত্তরের দশকে আমেরিকার প্রণীত সন্ত্রাসীদের দু'টি তালিকা থেকে কয়েকজন ব্যক্তি ও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেই এই লেখা শেষ করব। প্রথম তালিকার ২৮ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাঁ পল সার্ত্রে ও তার সাময়িকী লা টেম্পল মডার্নস, ক্লাউস ক্লইসা, আর্নেস্ট ত্যানডেল, হারবার্ট মার্ক্যুজ, অঁদ্রে গোর্জ, হ্যানোভার বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক ড. যর্গেন সেইফার্ট ও পিটার ব্রুকনার, সিগমুন্ড ফ্রয়েড ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. আলেকজান্ডার মিটসারলিচ প্রমুখ বামপন্থী দার্শনিক ও চিন্তাবিদ।

দ্বিতীয় তালিকার ৫৮টি নামের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠানই বেশি। তার মধ্যে ছিলেন নোয়াম চমস্কি, রিচার্ড বার্নেট, হিউম্যানিস্ট সাময়িকীর পল কুটিজ, সিয়াটলের

www.pathagar.com

সোসালিস্ট রেভ্যুলুশনারি পার্টির নেতা ডেরাল মোরিস, প্যারিসের 'লিবারেশন', শিকাগোর 'ইন দিজ টাইমস', লন্ডনের 'টাইম আউট', ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক স্টিফেন রোজেনফেল্ড, নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক পল মন্টগোমারি, রকফেলার ফাউন্ডেশনের এইচ ব্রুস ফ্রাঙ্কলিন প্রমুখ। এই 'সন্ত্রাসীদের' একমাত্র অপরাধ, তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করছিলেন। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গও লাদেনের মতোই মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা নিয়েই ঈশ্বরের কৃপায় বেঁচে ছিলেন, তবে তাদের সেই মৃত্যুদণ্ড প্রকাশ্য ছিল না, ছিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার খাতায়। ❑

১৪ নভেম্বর '০১

লেখক ঃ সাহিত্যিক, সাংবাদিক।

এই হত্যার জবাব কি?

www.pathagar.com

মুসলমানের আমামা কেড়ে নিয়ে বুশ দামামা বাজাচ্ছেন

বশীর আল্‌হেলাল

আমাদের ছেলেমেয়েরা বইয়ে পড়ে মানব সভ্যতার ইতিহাস। আসলে বলা উচিত ছিল মানবের অসভ্যতার ইতিহাস। এ অসভ্যতার বাইরের চেহারাটা হচ্ছে যুদ্ধ। ভেতরের চেহারাটা বাইরের চেহারার মতো চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু তা আরো ভয়াবহ। যুদ্ধে যত মানুষ মরে, যুদ্ধের পরে মরে আরো বেশি। আফগানিস্তানে ঠিক এই জিনিস এখন চলছে। আফগানিস্তানে যে যুদ্ধটা চলছে ইতিহাসের বইয়ে এরও একটা নাম দাঁড়িয়ে যাবে। হয়তো বুশ-লাদেনের যুদ্ধ, যদিও বুশ-লাদেনের যুদ্ধ এ নয়। শেষ তথ্যে জানা গেল, মাত্র এই কিছুদিন আগেও আমেরিকার বুশ পরিবার আর আরবের লাদেন-পরিবারের মধ্যে ব্যবসাদারির আত্মীয়তা ছিল। ছোট হোক, বড় হোক, যুদ্ধগুলোই এক-একটা ব্যবসাদারি। এর অর্থনৈতিক লাভ-লোকসানটাই আসল জিনিস। এমন কি বলা হচ্ছে, পেন্টাগন আফগানিস্তানে যে ধ্বংস চালাচ্ছে, কাবুল রাজধানীকে ভেঙেচুরে মিসমার করে দিল, এর একটা উদ্দেশ্য তাদের উদ্ভাবিত অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করা। মানবের এ সভ্যতায় সবকিছুই পণ্য, ভালোবাসা তেকে ঘৃণা, খাদ্য থেকে মারণাস্ত্র। বিন লাদেন কদিন আগে পাহাড়ে তার গোপন জটিল গুহাবাস থেকে বলে পাঠিয়েছেন তার কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে। তার প্রয়োগের ভয়ও তিনি দেখিয়েছেন। এ সত্য হোক বা না হোক, প্রয়োগ হোক বা না হোক, পারমাণবিক অস্ত্রও বেচাকেনা হতে পারে শিগগির।

এসব ঘোর ভয়ঙ্কর কাণ্ডকারখানাগুলোকে নিয়ে এত লেখালেখি, পর্যলোচনা, অনুমান, অনুসন্ধান, আবিষ্কার বের হচ্ছে পত্র-প্রত্রিকায়, ওসব পড়তেই দিন কেটে যায়। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞার্থ চূড়ান্ত হলো বলে কই দেখলাম না তো। সন্ত্রাসবাদ কী, আমাদের এ ক্ষুদ্র দেশ বাংলাদেশের যে কেউ বলে দেবে তা। একেবারে আজকের পরিসংখ্যান আমার জানা নেই। এই তো কিছু আগে সন্ত্রাসীদের হাতে গড়ে দৈনিক নয়জন করে মারা গেছে এ দেশে। সন্ত্রাসীকে ঘৃণা করে না কে? মধ্যযুগেও দেশ জয় করতে বেরিয়ে রাজা-বাদশা কিং-মনার্করা স্রেফ আতঙ্ক জাগাতে যুদ্ধবহির্ভূত গণহত্যা করতেন। ওগুলোকে আলাদা করে সন্ত্রাসবাদ বলা হতো না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ইতিহাসের অবিশ্বাস্য সন্ত্রাসটা ঘটল আমাদেরই এই সময়ে ১১ সেপ্টেম্বর (২০০১) যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে আর ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে। এর যে অসম্ভব বৈশিষ্ট্যটা ছিল : ৬

www.pathagar.com

হাজারের মতো নিরপরাধ মানুষের অসহায় মৃত্যু, তার সঙ্গে 'উনিশজন' সেই সন্ত্রাসীর স্বেচ্ছামৃত্যু। আমি অনেককে দেখেছি এ বুক কাঁপানো ট্র্যাজেডির ভালো-মন্দের কোনো বিবেচনাই তারা করতে চান না, যেন এর যে ছিল সেই অদৃশ্য চরিত্র নিয়তি, ক্ল্যাসিকাল কাব্যতত্ত্বে বা পোয়েটিকসে তার বারণ আছে। কিন্তু কই, বিশ্ব পলিটিকসের অত বড় নায়ক যে প্রেসিডেন্ট ডব্লিউ বুশ, তিনি সে বারণ মানলেন না। তিনি প্রতিশোধ নিতে ছুটলেন। ও গড! হা ঈশ্বর! তুমি কি পবিত্র গ্রন্থে এই রকমের প্রতিশোধ নিতে বলেছিলে? প্রেসিডেন্ট বুশ অবশ্য মুখে বললেন, চললাম গ্লোবাল টেররিজম নির্মূল করতে। চীন, রাশিয়াসহ যত দেশ নিয়ে তার ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টিটেররিজম কোয়ালিশন নাকি খাড়া হয়ে গেল। আমি একটা আলোচনায় বলেছিলাম, ওই রকমের কোয়ালিশন নয়, সমস্তটার বিবেচনার জন্য সমস্ত বিশ্ব নেতাদের নিয়ে বসুন, অবশ্য জাতিসংঘে নয়। পরে দেখি, সেই তার বিন লাদেনেরও জাতিসংঘের ওপর খুব রাগ। ওই ভবন এখন কড়া পাহারায়ও আছে। হায় জাতিসংঘ! কিন্তু কই, সে প্রতিশোধের আকার-প্রকারও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক কার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ? আফগানিস্তান জায়গাটাই বা কার যাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া এখনো শেষ হয় নি? সে কি মোল্লা ওমরের? তার কাছে কি বিন লাদেন কিনে নিয়েছেন? সেই নাটের গুরু বিশ্বের নাকি সন্ত্রাসী শ্রেষ্ঠ স্বল্পভাষী বিন লাদেনকে এখন দেখি কাতারের আল-জাজিরা স্যাটেলাইট টিভিতে বেশ কথা কইছেন, চেহারাও দেখাচ্ছেন তিনি।

দেশে দেশে, বাংলাদেশে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার তো চলছে প্রচুর প্রতিবাদ। স্থূলভাবে এদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। বাম আন্দোলনকারীরা একেবারে প্রথমেই পথে নেমে আসল কথাটা বলেছিলেন। বলেছিলেন, ওসব কিছু নয়। যুক্তরাষ্ট্র জায়গা খুঁজছিল, নতুন আমেরিকান আফগানিস্তান।

কোথায় সন্ত্রাস দমন? কোয়ালিশনের মিত্ররাও সব গাঁইগুঁই শুরু করেছেন। তাঁরা কান চুলকাতে চুলকাতে বলেছিলেন, বোমা মেরে মেরে সন্ত্রাসীদের খুঁজতে, কিন্তু আফগানিস্তানের নিরপরাধ মানুষ হত্যা না করতে। বুলেট, ক্ষুধায়, শীতে তারা অনেক মরেছে। আর কত? কিন্তু মার্কিনীরা সেটাই, হত্যা শুধু করতে পেরেছেন। আমার মনে হয়, এ যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আপাতত জরুরি মিত্র পাকিস্তান সবচেয়ে বেশি ঠকবে। তাই সবচেয়ে খুশি বিশাল ভারত। জেনারেল মোশাররফের পাকিস্তানের মতো উঞ্ছবৃত্তি কেন করবেন তারা? আমাদের দেশে স্ল্যাংটাই যদি ব্যবহার করতে অনুমোদন করেন, যে দৃশ্যপটটা রচিত হয়েছে, হতে যাচ্ছে, তা সমরতান্ত্রিক ছ্যারাব্যারা। তার সঙ্গে আমাদের অনেক দুঃখের, কষ্টের এ ক্ষুদ্র বাংলাদেশ কোন ফ্যাকড়ায় না জড়িয়ে যায়, এই ভাবনায় মরি।

আগের সূত্র একটু ধরি। বলতে পারেন মুসলমানদের হাতের ফসকে-যাওয়া সুতো। বলকানের বিচ্ছিন্ন দুর্বল মুসলমানগুলোর মুসলমানরূপেই একতরফা নির্যাতন, গণহত্যা হলে বিশ্বের সম্ভবত ১২০ কোটি মুসলমান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল, কিছু করতে পারেনি, করেনি। আমেরিকা অবশ্য ইউরোপের তুলনায় এ আহত মুসলমানদের তখন সত্য-মিথ্যা কিছু সান্ত্বনা দিয়েছিল।

কুয়েতের সঙ্গে ইরাকের যুদ্ধে সেই আমেরিকার ফোপরাদালালি করতে আসা, আরবের

www.pathagar.com

বুকে বসে ইরাককে পর্যুদস্ত করা এ যেন ছিল মুসলমানদের মাথা থেকে কাজী নজরুলের একটা গানের সেই আমামা কেড়ে নেওয়া। মুসলমানরা বলল, ওরা আমাদের 'শির' উঁচু করে চলতে দেবে না। ইরাকে সে মার্কিন প্ররোচনা শোনা যায়, এখন নতুন করে বাড়বে। আর ফিলিস্তিন-ইসরায়েল-জেরুজালেমের প্রশ্ন তো ছিলই। এখানে আমেরিকার অচল জড় মাথাব্যথাটা হচ্ছে আপন হাতের সৃষ্টি এ দাম্ভিকতাকে টিকিয়ে রাখা। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় ছাড়া তার উপায় তো নেই।

যে কথা বলতে চেয়েছি। এ প্রধানত মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা বা ইসলামী মৌলবাদের সমস্যা ছিল না, এখনো তা নেই। একালে ইসলামী (বা অন্য কোনো ধর্মীয়) রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো নিরীক্ষা সফল হবে না। এখানে বুশ আরেকটা ভুল বা ফন্দি করছেন। তিনি বারবার বলছেন, 'ইসলামের' বিরুদ্ধে তাদের এ 'জেহাদ' নয়, বরং তা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। অন্তত আমি দেখিনি তিনি বলেছেন, এ জেহাদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়। ইসলাম আর মুসলমানের মধ্যে অনেক পার্থক্য, যেমন খ্রিস্টান আর খ্রিস্টান ধর্ম, ইহুদি আর ইহুদি ধর্মের মধ্যে অনেক পার্থক্য। আমামা পড়ে যায়নি ইসলামের মাথা থেকে, পড়েছে মুসলমানদের মাথা থেকে। চোখের সামনে যা দেখলাম ঃ বাংলাদেশের, পাকিস্তানের, বিশ্বের বেশিরভাগ মুসলমানের চোখে বিন লাদেন তো নয়ই, আফগানিস্তানের তালেবান কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে ঘৃণা ছিল না। ভালোবাসাও ছিল না, দেখলাম, আফগানিস্তান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিন লাদেনের ছবি উঠে গেল মুসলমানের হাতে আর প্রেসিডেন্ট বুশের কুশপুত্তলি পোড়ানো হতে থাকল, যদিও এর কোনোটাই ইসলামসম্মত প্রতিক্রিয়া নয়।

কেন এসব ? কেন এ বিশ্বজোড়া আলোড়ন ? কে দায়ী ? বলুন, কে দায়ী ? কাবুল তো গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো। গ্লোবাল সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হবে ? সন্ত্রাসবাদ তো আর কিছু নয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়, যার আগে থাকে পুঞ্জীভূত অবিচার। সে অবক্ষয় তো সবচেয়ে বেশি ঘটালেন যাকে বলা হয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। এ কি কম আশ্চর্য নয় যে, ওই সাম্রাজ্যবাদ সংকটে পড়ে বিশ্ব-সন্ত্রাসবাদের মস্তিষ্ক আর দেহ ঠাওরালেন আর কাউকে নয়, আর কিছুকে নয়, আফগানিস্তানকে ?

বলছিলাম, কে দায়ী ? দায়ী ওনাদের বাহাদুরি। গত শতাব্দীর শেষের বছরগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের যখন বিপর্যয় হচ্ছিল, তার আগে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন মোটামুটি দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যারা ভালো করে জানেন, তারাও বিপর্যয়ে বিস্মিত হননি। কিন্তু আমি বিস্মিত হয়েছিলাম এই দেখে, সমাজতন্ত্রের তথাকথিত বাম-ডান নির্বিশেষে সকল কর্মীর বুকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওই বিপর্যয় কী রকম দুঃখটা দিয়েছিল। কেবল সমাজতন্ত্রের কর্মীরা নন, অন্যতর বহু ভালো মানুষ দুশ্চিন্তাবোধ করেছিলেন। স্বভাবতই আনন্দে নেচেছিলেন বুশগণ। বস্তুত সবাই জানেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ে সোভিয়েতেরা দায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন তথা পেন্টাগনের কলকাঠি সামান্য ছিল না। তাদের কাজ তারা করেছেন, আমি তাদের দোষ দেই না। কিন্তু তাই নিয়ে এত বাহাদুরি কেন ? ইতিহাস কখনো থমকে থেমে যায়, তাতে বড় ঝাঁকুনি লাগতে পারে। কিন্তু ইতিহাস ভূতের মতো পেছনে হাঁটে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের ওই বিপর্যয়ের ঝাঁকুনি এখন চলছে।

www.pathagar.com

পুঁজিবাদের বুদ্ধিজীবীদের খুব আত্মতুষ্ট দেখি। দেখি কথায় কথায় বলেন, এখন তো ঠাণ্ডা না স্নায়ুযুদ্ধ যদিও নেই, প্রশ্ন হলো, আফগানিস্তানে এ ভয়ানক গরম যুদ্ধ কেন ? গরিব নিরীহ আফগানিদের মাটির ঘরগুলো তাদের রুজি-রোজগার, সংসার-পরিবার তাদের আল্লার আসমান থেকে অগ্নিবৃষ্টি করে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন ? খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয় এর জন্য দায়ী। ১০ বছর আফগানিস্তানের ওপর তথাকথিত সমাজতন্ত্রের খবরদারি করে সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন ঠিক করেনি। কিন্তু রাশিয়ায় আজ যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকত আফগানিস্তানে বুশ সাহেবরা এ বিভীষিকা চালাতে পারত না, যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে ও পেন্টাগনে ১১ সেপ্টেম্বরের সে ভয়াবহ হামলাও হতো না। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ে বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কগুলোর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। এখন জাতিসংঘের তথাকথিত নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্র যা খুশি তাই পাস করিয়ে নেয়। জাতিসংঘের ক্ষমতা আর ইচ্ছাও নেই এ গণ্ডগোল মেটানোর। আমাদের সহজ বুদ্ধি তাই বলে।

শেষ করার আগে, আজ রাতের শেষ টিভি বুলেটিনে (১১.১১.০১) এইমাত্র যে খবর পাওয়া গেলে, প্রেসিডেন্ট ডব্লিউ বুশ, স্টেটস সেক্রেটারি কলিন পাওয়েল দুজনেই জানিয়েছেন, নর্দার্ন এলায়েন্সের বাহিনী কাবুল দখল করতে ছুটে আসছে বলে, কিন্তু তাদের এখনই কাবুলে প্রবেশ করার দরকার নেই। 'নর্দার্ন এলায়েন্সকে আমাদের দরকার হবে।' কিন্তু বিশ্বব্যাপী তাবৎ সন্ত্রাস দমনের স্বার্থে কাবুলকে এখন একটা আলাদা স্টেটাস দিয়ে আলাদা রাখা হবে।

পুনশ্চ ঃ বেশি রাতে (১৩.১১.০১) আবার জানা গেল, কাবুলের পতন হয়েছে। তালেবান বাহিনী সরে গেছে। কাবুলে লুটপাট চলছে। বিন লাদেন, মোল্লা ওমর নিরাপদে আছেন। পাকিস্তান দাবি করেছে, কাবুলে চাই জাতিসংঘ-সমর্থিত বাহিনী। পাকিস্তানের সাংবাদিক হামিদ মির বলেছেন, 'বিরোধীদের ফাঁদে ফেলতে কাবুল ছেড়েছে তালেবান।'

শেষে বলব, অনেক কিছু হলো। হায়, ১১ সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ারের বিপুল পবিত্র বেদনার সদগতি হলো না। ❑

১৫ নভেম্বর '০১

লেখক ঃ কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে মুসলিম বিশ্ব

শাহ্ আবদুল হালিম

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের একটি বিখ্যাত উক্তি হলো, অবিচার যেখানেই হোক তা সর্বত্র সুবিচারের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই বিশ্ব সমাজ থেকে অবিচার নির্মূলে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। অথচ দুর্বলের ওপর সবল বা গরীবের ওপর সম্পদশালীরা যখন অবিচার করে তখন আমরা সেটাকে বিভিন্ন অজুহাতে যুক্তিযুক্ত অনৈতিকভাবে বলে প্রমাণের চেষ্টা করি। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে জাতিতে-জাতিতে এবং রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা সত্য। যতই অনাকাঙ্ক্ষিত হোক না কেন, নিঃসন্দেহে এটাই হচ্ছে আধুনিক জীবন ও সমাজের প্রকৃত চিত্র। এ জন্য আমরা দেখি, নিছক জাতীয় স্বার্থ বা সামগ্রিকভাবে পশ্চিমা স্বার্থ রক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ লংঘন করছে। অনেক সময় মিত্রদের সহযোগিতায় এবং জাতিসংঘ পতাকার ছত্রছায়ায় তথাকথিত আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার নামে তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোর সংগ্রামকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে এবং অনৈতিক পন্থায় 'রক্তপিপাসু সন্ত্রাসী এবং মৌলবাদী' তৎপরতা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর ওপর তাদের শোষণ, অবদমন ও নিয়ন্ত্রণকে চিরস্থায়ী করতে চায়। অন্যদিকে বিশ্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে এসব মুসলিম দেশের স্বকীয় দৃষ্টভঙ্গি ও মূল্যবোধকে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা এবং স্বার্থের জন্য হুমকি বলে বিবেচনা করে। অধ্যাপক স্যামুয়েল হানটিংটন মনে করেন, ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে এ ধরনের আত্মপ্রত্যয়নের ফলে 'সভ্যতার সংঘাত' অনিবার্য।

উদ্দেশ্যমূলক ও কষ্টকল্পিত পূর্ব ধারণার বশবর্তী হয়ে ও পক্ষপাতদুষ্ট মন নিয়ে কে আগ্রাসী আর কে তার শিকার তা সঠিকভাবে যাচাই করা যায় না। কসোভো, বসনিয়া, চেচনিয়া, কাশ্মীর এবং ফিলিস্তিন ও মরোর জনগণ যখন শুধুমাত্র জাতিসত্তা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছে তখন তাদেরকে কিভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি ও সন্ত্রাসের জন্য দায়ী করা যায় ? সন্ত্রাসের শিকার হয়ে কেউ পাল্টা সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়ার প্রধান কারণ হল অন্য কোন পন্থায় সুবিচার না পাওয়া। অথবা নির্যাতিতরা তাদের দুর্দশার কথা কোন রাজনৈতিক

www.pathagar.com

ফোরামে উত্থাপন করতে না পারা অথবা তাদের দুর্দশার কথা প্রকাশের সকল রাজনৈতিক পথ বন্ধ হওয়া। পশ্চিমা সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্ব বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর সংগ্রামের যথাযথ মূল্যায়ন ও উপলব্ধির ব্যাপারে কোন কোন পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, ভূরাজনৈতিক কৌশলবিদ, পত্রিকার কলাম লেখক এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভাষ্যকারদের অনীহার মনোভাব বর্তমান পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার একটি অবিচারমূলক নেতিবাচক প্রবণতা।

নবপ্রজন্মের মুসলিম নেতৃত্ব মনে করেন, পশ্চিমা আধিপত্যের মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম দেশগুলোকে ক্ষমতাহীন, দুর্বল এবং কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে অনুপযুক্ত করে দিয়ে পশ্চিমাদের শর্ত ও হুমকির কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য করানো। স্নায়ুযুদ্ধের অবসান এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর মুসলমানদের কাছে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের একমাত্র পুলিশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। অন্যদিকে পশ্চিমা গণমাধ্যমে ইসলামকে পাশ্চিমা সভ্যতার কল্পিত শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে গোয়েবলসীয় কায়দায় লাগাতার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলাম সম্পর্কে অন্ধ, নেতিবাচক ও গতানুগতিক মনোভাবের কারণে পশ্চিমা জগতে ভূ-অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক ক্ষেত্রে নির্বিশেষে ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে ভুল ধারণা ও বিরোধ জন্ম নিয়েছে। পশ্চিমারা হিজাবের মত মুসলিম জীবন যাত্রার কোন কোন বিষয়ের সাথে সহাবস্থানে আর রাজি নয়। অথচ হিজাব মুসলিম মহিলার পরিচয় বহন করে। পশ্চিমারা হিজাবকে প্রগতি ও আধুনিকতা বিরোধী এবং পশ্চিমা সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার ঐক্য ও সংগতির জন্য হুমকি বলে মনে করে। অথচ খ্রীস্টান নারী ধর্মপ্রচারকদের মস্তকাবরণ বা ক্রস পরা এবং ইহুদীদের ইয়ারমূলক টুপি পরাতে তাদের কোন আপত্তি নেই।

এ প্রসঙ্গে কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করা হল যা পশ্চিমাদের দ্বিমুখী নীতি, অন্যায় আচরণ এবং ম্যাকিয়াভেলী চরিত্র সুস্পষ্ট করে তুলবে। ১৯৮৬ সালে প্রেসিডেন্ট রিগ্যান 'দুষ্ট' গাদ্দাফীকে শায়েস্তা করার জন্য বৃটেনের ঘাঁটি থেকে লিবিয়ায় বোমা বর্ষণের নির্দেশ দেন। এই বোমা হামলায় নিহতদের অধিকাংশই মহিলা ও শিশু। গাদ্দাফীর ১৬ মাসের শিশু কন্যা এ সময় নিহত হয়। অথচ যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা উঁচু কণ্ঠে বলে বেড়ায় রাজনৈতিক কারণে নিরীহ বেসামরিক লোক হত্যা অন্যায় এবং শিষ্টাচার ও সভ্য আচরণের পরিপন্থী। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে শিষ্টাচার ও সভ্য আচরণের পতাকাবাহী বলেও দাবী করে থাকে। ১৯৮৬ সালের ৪ এপ্রিল বার্লিনের একটি নৈশক্লাবে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় লিবীয় নাগরিক জড়িত থাকার কথিত অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র এফ-১১১ বোমারু বিমান থেকে ২০০০ পাউন্ড ওজনের লেসার নিয়ন্ত্রিত ৩২টি বোমা লিবিয়ায় নিক্ষেপ করে। বার্লিনের ওই নৈশক্লাবে মার্কিন সৈন্যদের হরহামেশা আসা-যাওয়া ছিল। নৈশক্লাবে ওই বোমা বিস্ফোরণে ৩ জন নিহত এবং ২৩০ জন আহত হয়। এর প্রতিশোধে যুক্তরাষ্ট্র হত্যা করে অন্তত ৭০ জন লিবীয় নাগরিককে এবং আহত হয় বিপুলসংখ্যক বেসামরিক লোক। অথচ নৈশক্লাবের বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায় লিবীয় নাগরিক জড়িত থাকার সপক্ষে কোন প্রমাণ বা যুক্তিগ্রাহ্য আলামত পাওয়া যায়নি। লিবিয়ার জনগণ এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি নির্দোষ এ কথা জেনেও নিছক রাজনৈতিক

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যেই প্রেসিডেন্ট রিগ্যান লিবিয়ায় বোমাবর্ষণের নির্দেশ দেন। এ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও নিরীহ্ নির্দোষ লোকদের হত্যার জন্য তিনিই দায়ী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিমান ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দেয়ায় বৃটেনও এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের দোসর হিসেবে কাজ করার দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারে না।

কুয়েতকে দখলমুক্ত করতে প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার মিত্ররা রাসায়নিক অস্ত্র, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে বহুসংখ্যক নিরীহ লোককে হত্যা করতে দ্বিধা করেনি। মেডিকেল এডুকেশন ট্রাস্ট্রের দেয়া তথ্যমতে, যুদ্ধ এবং যুদ্ধপরবর্তী সামরিক ও অর্থনৈতিক হত্যাকাণ্ডে প্রায় ২ লাখ সাধারণ ইরাকী নাগরিক নিহত হন। এটা ছিল গণহত্যার এক অসম যুদ্ধ। কেননা, সৈন্যবল ও অস্ত্রে পশ্চিমা বিশ্ব ছিল ইরাকের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। এ যুদ্ধে মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যরা ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ইউরেনিয়াম শেল নিক্ষেপ করে। অথচ জাতিসংঘের ৩২/৮৪ প্রস্তাব অনুসারে ইউরেনিয়াম শেলের ব্যবহার নিষিদ্ধ। এ প্রস্তাবে তেজস্ক্রিয় উপাদানসমৃদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। জেনেভা চুক্তির ১নং বিধির ৫৪ ধারায় বলা হয় 'যুদ্ধের কৌশল হিসেবে সাধারণ মানুষকে অভুক্ত রাখা নিষিদ্ধ।' তা সত্ত্বেও ইরাকী ছেলে-মেয়েরা এখনও শিশু খাদ্য এবং পুষ্টিকর গুড়ো দুধ থেকে বঞ্চিত। ইরাকে এনেসথেসিয়া ছাড়া রোগীকে অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে। চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম যেমন ব্যান্ডেজ, ক্ষতস্থান সেলাইয়ের সুতা, চিকিৎসার কাজে ব্যবহার্য শোষণী, স্টেথিসকোপ, এক্সরে যন্ত্রপাতি, স্ক্যানার এবং পানি পরিশোধনের মত জরুরী চিকিৎসা সামগ্রীর সরবরাহ সেখানে বন্ধ। এমনকি, সেখানে এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শিশুদের কাপড়-চোপড়, স্যানিটারী টাওয়েল, বৈদ্যুতিক বাল্ব, পাঠ্যবই, কাগজ, পেন্সিল ইত্যাদি সবকিছুই ইরাকে সরবরাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইরাকে এই নীরব ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেন, আর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের সমর্থন নিয়ে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন নিজেও সেই ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালিয়ে যান।

ইরাকের বিরুদ্ধে নয় বছরের নিষেধাজ্ঞার ফলে ১০ লাখ শিশুসহ ২০ লাখ ইরাকী নাগরিক নিহত হয়। বিল ক্লিনটন ১৯৯২ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর কুয়েত সফরকালে সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে হত্যার কথিত ষড়যন্ত্রের দায়ে বাগদাদের আবাসিক এলাকায় হামলা চালায়। এ হামলায় ২৩টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। হামলায় নিহতদের অধিকাংশই মহিলা ও শিশু। প্রখ্যাত ইরাকি শিল্পী লায়লা আল আত্তার এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত হন। অথচ কথিত এই ষড়যন্ত্রের বাস্তব কোন প্রমাণ ছিল না। বরং এখন অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভূয়া ও মিথ্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে ক্লিনটন হোয়াইট হাউসের শিক্ষানবিশ মনিকা লিউনস্কির সাথে যৌন কেলেঙ্কারীর কারণে মার্কিন কংগ্রেস ও সিনেটে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। এ অবস্থায় জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যই তিনি বাগদাদে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার নির্দেশ দেন। বস্তুত কংগ্রেসে ইমপিচমেন্ট ভোট অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে ইরাকের মাটিতে প্রথম মার্কিন অস্ত্রটি বিস্ফোরিত হয়। মনিকা লিউনস্কির সঙ্গে যৌন কলঙ্কের চিহ্ন কাপড় হতে মুছে ফেলতে এবং ক্ষমতায় টিকে থাকতে এক অপদস্থ মার্কিন নেতার বেপরোয়া চেষ্টার মাসুল হিসেবে বহু ইরাকীকে জীবন দিতে হয়। এই আকস্মিক হামলায় ৭৯টি মারাত্মক টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ

www.pathagar.com

করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সন্ত্রাসী তৎপরতা সম্পর্কে জানার জন্য 'জিওফ সাইমন্স'-এর দি স্ক্যারজিং অফ ইরাক ঃ স্যাংশন্স ল এন্ড ন্যাচারাল জাস্টিস' নামক তথ্যবহুল, গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী বইটি (প্রকাশক ম্যাকমিলান ঃ মূল্য ৯৯ পাউন্ড) আগ্রহী পাঠকের জন্য খুবই সহায়ক হবে।

১৯৯৮ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন নিরপেক্ষ কৌসুলির তদন্তের মুখে জাতীয় টেলিভিশনে দর্শকদের সামনে স্বীকার করতে বাধ্য হন, মনিকা লিউনস্কির সাথে তার অসঙ্গত সম্পর্ক ছিল। নিরপেক্ষ কৌসুলির কাছে দেয়া প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের জবানবন্দীর সত্যতা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়ায় এ সময় যখন মনিকাকে দ্বিতীয় দফা গ্রান্ড জুরির সামনে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য তলব করা হয় ঠিক তখনি প্রেসিডেন্ট হঠাৎ করে বিশ্ববাসীর কাছে ঘোষণা করেন যে, পূর্ব আফ্রিকার তানজানিয়া ও কেনিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে হামলার প্রতিশোধ নিতে তিনি সুদান ও আফগানিস্তানে আঘাত হানবেন। এটা ছিল জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিজের অপরাধ এবং ব্যর্থতা ঢাকা দেযার জন্য প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের এক প্রতারণাপূর্ণ কৌশল। এ সামরিক পদক্ষেপটি ছিল একান্তভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বিব্রতকর অবস্থা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস। আসন্ন ইমপিচমেন্ট থেকে বাঁচার জন্য প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন খার্তুমের আল শিফা ফার্মাসিউটিক্যাস প্রকল্পে হামলা চালান। সুদানের সর্ববৃহৎ এই ওষুধ প্রস্তুতকারক কারখানায় প্রধানত এনটিবায়োটিক ও ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ওষুধ তৈরী হত। যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ ওঠায় যে, প্রকল্পটির মালিক হচ্ছেন সউদী ধনকুবের ওসামা বিন লাদেন এবং সেখানে রাসায়নিক অস্ত্রের উপাদান (ভিএক্স স্নায়ুগ্যাস তৈরীর অন্যতম উপাদান) তৈরী হয়। পরবতর্তীকালে তদন্ত করে এই প্রকল্পে বিন লাদেনের বিনিয়োগের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে আল শিফা ফার্মাসিউটিক্যাল প্রকল্পটি পরিদর্শন এবং যেখানে রাসায়সিনক অস্ত্রের কোন উপাদান তৈরী হত কিনা তা দেখতে প্রকল্পের ধ্বংসের নমুনা পরীক্ষার জন্য সুদান আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা, ওআইসি, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এবং আরব লীগের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ তদন্তের অনুরোধ জানানো হলে যুক্তরাষ্ট্র তাতে ভেটো দেয়। খার্তুমে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত প্রকাশ্যে জানিয়ে দেন, আল শিফা প্রকল্প কোনাভাবেই কোন প্রকার রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। ইরাককে গণবিধ্বংসী অস্ত্র থেকে নিরস্ত্রীকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত জাতিসংঘ কমিশন খার্তুমে হামলার আগে ও পরে জানিয়েছে, ইরাকের স্নায়ুগ্যাস উৎপাদনের সাথে সুদানের সম্পর্কের কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। নিউইয়র্ক টাইমস-এ দাবী করা হয় আল শিফা বিপর্যয়ের পর আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সাথে সুদানের জড়িত থাকার অভিযোগ প্রত্যাহার করা উচিত। কেননা অভিযোগ সম্পূর্ণ বানোয়াট। এটা গোয়েন্দাদের চরম ব্যর্থতা এবং অন্ধ শত্রুতার নামান্তর (ইমপ্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউ.কে বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৮, আগস্ট ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১০) টাইম সাময়িকীর ১৯৯৯ সালের ৮ আগস্ট সংখ্যায় ওয়াশিংটন থেকে বার্তা সংস্থা এএফপির বরাত দিয়ে বলা হয়, আল-শিফা ফার্মাসিউটিক্যাল-এর মালিক সউদী ধনকুবের সালাহ্ ইদরিস তার প্রতিষ্ঠানের সুনাম পুনরুদ্ধারের এবং প্রতিষ্ঠানে মার্কিন বোমা হামলার ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে ৩ কোটি ডলারের একটি মামলা করার ব্যাপারে ওয়াশিংটনের একটি আইনী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা পেয়েছেন। অন্যদিকে একই সময় ক্লিনটন ওসামা বিন লাদেনের সন্ত্রাসী শিবির

www.pathagar.com

ও গোপন ঘাঁটি বলে অভিযোগ এনে আফগানিস্তানের পল্লী এলাকার একটি বসতিতে হামলা চালায়। ফিলিস্তিনীদের সাথে পশ্চিমাদের আচরণের ইতিহাসও কলঙ্কজনক সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে ১৯৪৮ সালে স্থানীয় ফিলিস্তিনীদের উৎখাত করে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাও ছিল আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ ও অমানবিক। কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক অন্যের মাতৃভূমিতে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করতে পারে না। অথচ নাৎসী জার্মানীর হাতে ইহুদীবাদের লাঞ্ছনার অজুহাতে পশ্চিমারা আরব ভূখণ্ডে এই নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করেছে এবং তা সঠিক বলে দাবী করেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যে জার্মানী এই জুলুম, নির্যাতন ও হত্যার জন্য দায়ী পশ্চিমারা সেই জার্মানীর ভূখণ্ডে ইহুদীদের জন্য কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেনি বরং তা করেছে আরব ভূখণ্ডে। যদিও আরবরা এই নির্যাতনের জন্য মোটেই দায়ী ছিল না। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিমারা অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে ইসরাইলী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণকে সমর্থন দিয়ে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'মায়ের আদরে' ইসরাইলকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে এবং সেই সঙ্গে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। ১৯৬৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৮.৪৯০ ডলার। এছাড়াও রয়েছে পেন্টাগনের বাজেটে গোপন বরাদ্দ অর্থাৎ প্রতিদিন দেড়কোটি ডলার এবং প্রতি ঘন্টায় ৬ লক্ষ ২৮ হাজার ডলার। এই বিপুল অর্থ ইসরাইলের আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা তৈরীতে সহায়ক হয়েছে। ১৯৯৫ সালের মাঝামাঝিতে ওয়াশিংটন ডিসি'র পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৫৬ কোটি ৮০ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত সাব সাহারার দেশগুলো বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছে প্রায় ২ হাজার ৪ শ' কোটি ডলার। অর্থাৎ সাব সাহারার প্রত্যেক আফ্রিকানের জন্য মাথাপিছু সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩ ডলার। অন্যদিকে ৪৮ কোটি ৬০ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৮২৫ কোটি ৪৪ লাখ ডলার । এর অর্থ হচ্ছে এই অঞ্চলে মাথাপিছু সাহায্যের পরিমাণ ৭৯ ডলার। তুলনা করলে দেখা যায়, একই সময়ে ইসরাইলের ৫৮ লাখ লোকের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্য যে পরিমাণ খরচ হয়েছে তার আনুপাতিক হার হচ্ছে যেখানে একজন আফ্রিকানের জন্য ১ ডলার ব্যয় হয়েছে সেখানে একজন ইসরাইলীর জন্য মাথাপিছু ব্যয় হয়েছে ২৫০.৬৫ ডলার। পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে পশ্চিম গোলার্ধে যদি কারো জন্য ১ মার্কিন ডলার ব্যয় করে তাহলে ইসরাইলীদের জন্য মাথাপিছু সেই ব্যয়ের অনুপাত দাঁড়ায় ২১৪ ডলার। এভাবেই যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ-ব্যাধি ও সন্ত্রাস নির্মূল করতে চায়।

যুক্তরাষ্ট্রের এই সাহায্যের অর্থ ইসরাইলকে কখনই পরিশোধ করতে হয়নি। ইসরাইল এ অর্থ দিয়ে ফিলিস্তিনের নিরীহ নারী-পুরুষ ও ১৮ বছর কম বয়সের শিশুদের ওপর নির্বিশেষে নির্যাতন ও হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। তথাপি বিগত ৫০ বছরে মার্কিন বিবেক এ ব্যাপারে কখনই জাগেনি। এমন বহু দেশের উদাহরণ রয়েছে, যারা জাতিসংঘ প্রস্তাব অমান্য করেছে, যুক্তরাষ্ট্র সেখানে সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে। যেমন ইরানের বিরুদ্ধে যখন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছিল তখন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছিল। ইরাকের বিরুদ্ধে যখন গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরির অভিযোগ ওঠে তখন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে শুধু সাহায্যই বন্ধ করেনি উপরন্তু ইরাকী জনগণের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তাই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, ইসরাইলের নৃশংস কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র

www.pathagar.com

কোন ব্যবস্থা নেয় না কেন ? এটা কি যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিমুখী নীতি তথা কপটতা নয় ? এটা কি বিশ্ব শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবধিকার রক্ষা, দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি ও সন্ত্রাস মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের বিঘোষিত নীতির সাথে চাতুরি ও বিশ্বাসঘাতকতা নয় ? বস্তুত ঘাতক ব্যাধি এইডস নিরাময় গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্র যে অর্থ ব্যয় করে সে তুলনায় ইসরাইলে জন্য ব্যয় করেছে তার ৮ গুণ অর্থ।

বসনিয়া-হারজেগোভিনা, কসোভা, চেচনিয়া এবং কাশ্মীর ক্ষেত্রেও পশ্চিমাদের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা সুস্পষ্ট। ১৯৯২-১৯৯৫ সালে সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচের আরোপিত যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নাম করে বসনিয়া-হারজেগোভিনায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে অহেতুক কালক্ষেপণ করায় ২ লাখ মুসলমানকে সার্বদের হাতে প্রাণ দিতে হয় এবং ১০ লক্ষাধিক লোক গৃহহারা হয়ে দেশের ভিতরে ও বাইরে থাকতে বাধ্য হয়। জার্মানী একাই বসনিয়া-হারজেগোভিনার ৩ লাখ ২০ হাজার উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দেয়। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর এ প্রসঙ্গে বলেছেন, বৃটেন ইউরোপের মাটিতে কোন মুসলিম দেশের অস্তিত্ব দেখতে রাজি নয়। অথচ এটা বলা কি ভুল হবে যে, দক্ষিণ এশিয়ার ভূখণ্ডে একটি খ্রীস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমারা তাৎক্ষণিভাবে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পূর্ব তিমুরকে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের গোপন এজেন্ডা হচ্ছে বৃহত্তম মৃসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার পাশে পশ্চিমা স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা। বিগত ৫০ বছর যাবৎ কাশ্মীরে রক্তপাত হচ্ছে। অথচ মুসলিম কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে জাতিসংঘের গণভোট অনুষ্ঠানের গৃহীত প্রস্তাবটি পশ্চিমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর সমস্যা পশ্চিমা বিশ্বের সম্মানিত (!) সদস্য দেশ বৃটেনেরই সৃষ্টি। কাশ্মীর প্রশ্নে বৃটিশ ও মার্কিন কৌশলগত নীতি শান্তি ও বৈধতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ফিলিপাইনের সবচেয়ে বড় মিত্র পশ্চিমারা এ পর্যন্ত মরো জনগণের আশা-আকাংক্ষার সাথে সংগতি রেখে মিন্দানাও সমস্যা সমাধানে কোন আগ্রহ দেখায়নি। কসোভোয় যখন যুদ্ধের নামে সার্বীয় কর্তৃপক্ষ গণহত্যায় জাতিগত নির্মূল অভিযান চালাচ্ছিল তখন জাতিসংঘের উর্দিপরা ন্যাটো বাহিনী সেখানে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে সেখানে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় উদ্বাস্তুর ঢল নামে, কসোভোর ৯০ শতাংশ মানুষ 'বর্ণবাদী খাঁচের' দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। একে তো মুসলমানরা ছিল নিরস্ত্র, অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার ফলে তাদের কাছে নতুন করে অস্ত্র সরবরাহের কোন উপায় ছিল না। ফলে মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত সার্বরা গণহত্যার অবাধ সুযোগ পেয়ে যায়। সার্বীয় কর্তৃপক্ষের হুমকির মুখে ৮ লাখ ৫০ হাজারের অধিক মুসলমান ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রতিবেশী দেশসমূহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। শুধুমাত্র জার্মানীতেই ১ লাখ ২০ হাজার কসোভান আশ্রয় গ্রহণ করে।

সার্ব সৈন্য ও পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য আরো ৫ লাখ ৮০ হাজার লোক পাহাড়-পর্বতে আশ্রয়গ্রহণ করে। সার্ব সৈন্য ও পুলিশ তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। হাজার হাজার মুসলিম পুরুষকে মৃত্যুদণ্ড দেয় এবং বসনিয়া-হারজেগোভিনার মতো এখানেও হিংস্র সার্বরা হাজার হাজার মুসলিম মহিলার শ্লীলতাহানি করে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় এবং সহায়-সম্পদ লুট করে। কসোভো পরিস্থিতি প্রমাণ করে জরুরী পরিস্থিতিতে কূটনৈতিক কৌশল তখনই কেবল কার্যকরী হয়, যদি তার পিছনে বিশ্বাসযোগ্য শক্তি

www.pathagar.com

প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে। হেগে অবস্থিত জাতিসংঘ যুদ্ধপরাধ ট্রাইবুনাল প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিককে অভিযুক্ত করলেও দীর্ঘদিন যাবৎ সে ট্রাইবুনালের সামনে হাজির হয়নি এবং পশ্চিমারা এ ব্যাপারে নির্বিকার থেকেছে এবং তাকে ট্রাইবুনালের সামনে হাজির করার জন্য কোন রকম কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকে। অবশ্য দীর্ঘদিন বিরতির পর অতি সম্প্রতি মিলোসেভিচকে গ্রেফতার এবং ট্রাইবুনালের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। অথচ কথিত মাদক পাচারের অভিযোগে ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্র জেনারেল নরিয়েগাকে অপহরণ করার পদক্ষেপ নিতে এক মুহূর্তের জন্য দেরি করেনি। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্র পানামায় রীতিমত আগ্রাসন চালাতেও পিছপা হয়নি। এ সময় মার্কিন বোমার আঘাতে কমপক্ষে পানামার ২ হাজার নাগরিককে প্রাণ দিতে হয়। পানামায় এই আগ্রাসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পানামা, পানামা খাল এবং পানামায় অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলোকে সরাসরি মার্কিন সার্বভৌমত্বে নিয়ে আসা। বর্তমানে কথিত সন্ত্রাসী সউদী ধনকুবের ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেয়ার অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বস্তুত স্নায়ুযুদ্ধের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া এক ব্যতিক্রমী ঐকমত্যের মাধ্যমে যৌথভাবে ২০০০ সালের ডিসেম্বরে নিরাপত্তা পরিষদে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তাব উত্থাপন করে। নিষেধাজ্ঞার আওতায় আফগানিস্তানে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয় এবং বিদেশী আফগান বিমান সংস্থার অফিস বন্ধ করে দেয়া হয়। এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যে দেশটি ২৩ বছরের যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত এবং খরার কারণে সেখানকার ১০ লাখ অভুক্ত লোক আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। ইতঃপূর্বে বিন লাদেনকে আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তানের আকাশ-সীমা লংঘন এবং আন্তর্জাতিক আইনের কোনই তোয়াক্কা না করে আফগানিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। ভিন্ন মতাবলম্বীদের রাজনৈতিক আশ্রয়দাতা হিসেবে পশ্চিমারা বহুল পরিচিত। কিন্তু কোন মুসলিম দেশকে এ সুযোগ দিতে তারা প্রস্তুত নয়। আমেরিকা মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত হলেও প্রকৃত পক্ষে এই দেশটি হচ্ছে নিরপরাধ মানুষ ও গণতন্ত্রের হত্যাকারী।

রুশ হানাদার বাহিনী চেচনিয়ায় গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। চেচনিয়ার নিরস্ত্র মুসলিম, বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশুদের ওপর চলছে অমানুষিক নিপীড়ন ও নির্যাতন, কিন্তু পশ্চিমাদের বিবেক তাতেও জাগ্রত হয়নি। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্য এশিয়া ও কাকেশাস অঞ্চলের খ্রীস্টান দেশগুলোকে নির্দ্বিধায় স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু রাশিয়া এখনো ৮টি মুসলিম প্রজাতন্ত্র জবর দখল করে রেখেছে। (দাগেস্তান, তাতারিস্তান, বাশকারিস্তান, কারবারদিন-বালকার, করাচেই-চারকেস, এদেজি ও চেচনিয়া)। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত যুদ্ধে রাশিয়া ১ লাখ চেচেনকে হত্যা করে এবং এ ক্ষুদ্র দেশটির অধিকাংশ সম্পদ ধ্বংস করে। সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অংশ হিসেবে রাশিয়া চেচনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ১ কোটি ৭০ লাখ ঘাতক স্থল মাইন স্থাপন করে। ১৯৯৬ সালের যুদ্ধ এবং আফগান মুজাহিদদের হাতে শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ক্ষমতায় এসে চেচনিয়ার মুসলমানদের ধ্বংস এবং নির্মূল করা জন্য নতুন করে যুদ্ধ শুরু করেন। চেচনিয়ার গণহত্যায় যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপকভাবে রাশিয়াকে আর্থিক সহায়তা

www.pathagar.com

দেয়। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তথাকথিত সন্ত্রাস মোকাবিলার নামে রাশিয়াকে অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত হেলিকপ্টার (Night Vision) সরবরাহ করে। চেচনিয়ায় রাশিয়ার মঙ্গোলীয় ধরনের কার্যকলাপে পশ্চিমাদের ভূমিকা লজ্জাজনক ও প্রতারণাপূর্ণ।

আলজেরিয়ায় পশ্চেমাদের কার্যকলাপও এর চেয়ে উন্নততর কিছু নয়। ইসলামের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অহেতুক আতঙ্কের কারণে আলজিরিয়ায় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট যাতে সরকার গঠন করতে না পারে সেজন্য ফ্রান্স তাদের বিরুদ্ধে সামরিক জান্তাকে সমর্থন ও মদদ জোগায়। ফলে এতদঞ্চলে সৃষ্টি হয় অস্থিরতা। ১৯৯২ সালে আলজেরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে ফরাসী প্রেসিডেন্ট মিতেরাঁ টেলিফোনে আলজেরিয়ার সামরিক জান্তা জেনারেল খালেদ নেজ্জারকে বলেন, 'আমরা আপনাকে সাহায্য করবো, আপনি এগিয়ে যেতে পারেন...।' তখন থেকে আলজেরিয়ার সামরিক সরকারকে ফ্রান্স রাজনৈতিক, সামরিক, কূটনৈতিক ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ফরাসী গণমাধ্যমও আলজেরিয়ার স্বৈরশাসককে সমর্থন দিচ্ছে। সামরিক জান্তাকে সমর্থন করে ফ্রান্স আলজেরিয়ায় তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে চিরস্থায়ী করতে চায় এবং তার অনুপস্থিতির কালে তলপিবাহক দালালের সহযোগিতায় সেখানে ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখতে চায়। এককালের ঔপনিবেশিক শক্তি ফ্রান্স কার্যত এখনো এ তত্ত্বে বিশ্বাস করে নিজ দেশে গণতন্ত্র এবং অন্যত্র সাম্রাজ্যবাদ' বস্তুত ফ্রান্স আলজেরিয়ার জনগণের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষার সরাসরি বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ায় সেখানে জনগণের মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে যা রক্তাক্ত সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে। সুতরাং আলজিরিয়ায় নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরার জন্য ফ্রান্সই দায়ী। স্বাধীনতার প্রতি ফ্রান্সের প্রতিশ্রুতির এটাই প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যে জন্য ফ্রান্সের অহংকারের শেষ নেই। কপটতা, শঠতা, মোনাফেকি ও চাতুরীর জাজ্বল্য উদাহরণ বটে! স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সত্যের প্রতি ফ্রান্সের আচরণ অনেকাংশেই অ-ফরাসীসুলভ।

প্রেসিডেন্ট বুশ তার দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচনী প্রচারণার মাঝামাঝিতে সোমালিয়ায় 'মানবিক হস্তক্ষেপ' চালান। মার্কিন নৌজাহাজ এতদাঞ্চল ত্যাগ করার পর দেখা যায়, সিআই-এর হিসাব অনুযায়ী, ৭ হাজার থেকে ১০ হাজার সোমালী নাগরিক প্রাণ হারিয়েছে। পশ্চিমাদের প্রতারণার ও দ্বিমুখী নীতির প্রমাণ হিসেবে এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়। মুসলমানদের সহিংস কার্যকলাপেও ক্ষেত্র বিশেষে কিছু প্রাণহানি ঘটেছে এটা সত্য। তবে তার সংখ্যা খুবই কম। যা ভৌগোলিক বা অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পশ্চিমা সংবাদপত্র মুসলমানদের কুখ্যাত সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করে। যদিও ফিলিস্তিন, ইরাক, বসনিয়া, কসোভো, চেচনিয়া, সোমালিয়া, কাশ্মীর, মিন্দানাওসহ বিভিন্ন স্থানে মুসলমানরাই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সবচেয়ে নির্মম শিকার। খার্তুম ও আফগানিস্তানের ধ্বংসাবশেষে পড়ে থাকা শরীরের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ মুসলমানদের, ফিলিস্তিনের গুলিবিদ্ধ নিহত যুবক মুসলমান, টেলিভিশনে ক্ষণিকের জন্য যে ভয়াবহ অগ্নিদাহের দৃশ্য দেখানো হয় সেটাও তাদেরই। জেমস জগবি'র মতে (আরব-আমেরিকান নিউজ, ২৬ জানুয়ারী ১৯৯৬) ১৯৮২ সাল থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৫টি সন্ত্রাসী ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে ৭৭টি ঘটনার সাথে পুর্টোরিকান জাতীয়তাবাদীরা জড়িত, ৩১টি ঘটনার সাথে প্রাণীর অধিকার ও

www.pathagar.com

পরিবেশবাদী গ্রুপ জড়িত, ২৩টি ঘটনার জন্য বামপন্থী সংগঠনগুলোকে দায়ী করা হয়, ১টি ঘটনায় এফবিআইর ভাষায় ইহুদী চরমপন্থীরা জড়িত এবং ১২টি ঘটনার সাথে ক্যাস্ট্রো বিরোধী কিউবানরা জড়িত। পক্ষান্তরে এই ১৪ বছরে আরব বা মুসলমানদের দ্বারা সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে মাত্র ৩টি (দ্রষ্টব্য ঃ ইমপ্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউকে, বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৪ঠা এপ্রিল ১৯৯৮) পরমাণু নীতির ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের দ্বিমুখী আচরণ সুস্পষ্ট। ১৯৯৮ সালের মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান পারমাণবিক পরীক্ষা চালায়। আণবিক পরীক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ক্ষেত্রে 'দুঃখ' প্রকাশ করে কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে 'নিন্দা' জানায়। এ ব্যাপারে মার্কিন নীতি ন্যায়সংগত ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রে এই বৈষম্যমূলক নীতি ছিল ভারতের অনুকূলে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এবং এটা ছিল মার্কিন নীতি-নির্ধারকদের মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাবের ফল। এক্ষেত্রে মার্কিন নীতি হচ্ছে মুসলিম অধ্যুষিত পাকিস্তানকে চিরস্থায়ীভাবে প্রধানত আমেরিকা এবং সাধারণত ইউরোপীয় শক্তির ওপর নির্ভরশীল করে রাখা। উপরন্তু নিজের স্বাধীনতার ব্যাপারে পাকিস্তান যেন কখনই আত্ম-প্রত্যয়ীভাব পোষণ না করে বরং আমেরিকার অনুগত দাসে পরিণত হয়। ৮ হাজার পারমাণবিক অস্ত্র ও সে পরিমাণ বোমা মজুত হ্রাস করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসম্মতি জ্ঞাপন এবং অন্যান্য দেশকে সিটিবিটি এবং এনপিটি স্বাক্ষর করার জন্য পীড়াপীড়ি করার মধ্যে তাদের দ্বিমুখী নীতি প্রতিফলিত হয়। পাকিস্তান যখন পারমাণবিক পরীক্ষা চালায় তখন পশ্চিমারা হৈ চৈ বাধিয়ে দেয় এবং পাকিস্তানকে 'ইসলামী বোমা' বানানোর দায়ে অভিযুক্ত করে। অথচ ভারতের বোমাকে তারা 'হিন্দু বোমা' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা বৃটেনের বোমাকে তারা 'খ্রীস্টান বোমা' নামে নামকরণ করেনি। ইসরাইলের বোমাকেও করেনি।

ওসামা বিন লাদেন মুসলমান হওয়ায় পশ্চিমা সরকার ও গণমাধ্যমগুলো তাকে ইসলামী মৌলবাদী এবং ইসলামী সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করে। কিন্তু তারা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম চরমপন্থী খ্রীস্টান সন্ত্রাসী জর্জ হাবাসকে 'খ্রীস্টান মৌলবাদী' বা 'খ্রীস্টান সন্ত্রাসী' বলে না অথবা আইআরএ'র সক্রিয় কর্মীদেরকে তারা 'ক্যাথলিক সন্ত্রাসী' বা 'খ্রীস্টান সন্ত্রাসী' বলে শনাক্ত করে না। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের শেষ মুহূর্তের কর্মকাণ্ডে মার্কিন শঠতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিদায়কালে ক্লিনটন যুগোশ্লাভিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেও ইরাকের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার বিষয়টি বেমালুম ভুলে যান। প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে তার প্রথম কাজ ছিল সহযোগী বৃটিশ প্রধামন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে সঙ্গে নিয়ে ইরাকে হামলা চালান। মনে হয় নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার পিতা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ইরাকের প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার মনোভাব লাভ করেছেন। এই বোমা বর্ষণের মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেয়া হল যে, যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের ওপর তার ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ন রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং কোন আরব মুসলিম নেতা মার্কিন শক্তিকে মানতে সম্মত না হলে তাকে মাঝে-মধ্যে এধরনের হামলার মুখোমুখি হতে হবে। একটি সার্বভৌম দেশে এ ধরনের হামলা এবং সেখানকার নিরীহ বেসামরিক নাগরিক বৃদ্ধ, মহিলা, ও শিশুদের হত্যার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিন্দাই যথেষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে বিশ্ব সম্প্রদায়কে সোচ্চার হয়ে দাবী জানাতে হবে ঃ

১. আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী অবৈধ বিমান উড্ডয়ন এলাকায় যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনকে

www.pathagar.com

বিমান চলাচল বন্ধ করতে হবে। এটা হচ্ছে সেই বিমানে উড্ডয়ন এলাকা যেখান থেকে দুই পশ্চিমা শক্তি নিয়মিত তাৎপরতার নামে বিনা উস্কানিতে ইরাকে হামলা চালানোর সুযোগ পায়।

২. অবিলম্বে ইরাকের ওপর থেকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পূর্ণাঙ্গভাবে অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে।

বিশ্বের সর্বত্র শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্যই পশ্চিমা জগৎ বিশেষ করে বর্তমান বিশ্ব সমাজের একক রক্ষক ও হেফাজতকারী বলে দাবিদার যুক্তরাষ্ট্রকে তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং দ্বিমুখী চরিত্র ও মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই বুঝতে হবে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য বিস্তারের দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন কোন দেশ প্রকাশ্যে বা গোপন কোন আধিপত্য সহ্য করতে রাজি নয়, সেটা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক যে ধরনের আধিপত্যই হোক না কেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের অগ্রগতিতে বাধা দেয়ার জন্য পশ্চিমাদের চেষ্টা নিরর্থক এবং নিস্ফল হতে বাধ্য। ইসলামী পুনর্জাগরণের দাবিই হচ্ছে পশ্চিমাদের অবশ্যই উৎকট স্বদেশিকতা পরিহার করে নিজেদের মনোভাব দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে এবং প্রগতি ও উন্নয়ন প্রয়াসের সহযোগী হিসেবে উদার মন নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোকে গ্রহণ করতে হবে। পাশ্চাত্যকে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে মানবিক সাম্য ও মর্যাদাকে মেনে নিতে হবে যাতে নতুন সহস্রাব্দে বিশ্ব সভ্যতার বিকাশ নিশ্চিত হয়। ❑

১৫ নভেম্বর '০১

লেখক ঃ ইসলামিক ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে মার্কিন এজেণ্ডা

(দুই)

ভারতের অবিসংবাদিত নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একবার মন্তব্য করেন ঃ "মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে অঢেল সম্পদ। লোভ-লালসা মেটানোর জন্য নয়।"

বেন ফ্রাঙ্কলিন বলেছেন ঃ "নিরাপত্তার জন্য যারা স্বাধীনতা পরিত্যাগ করে তারা নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা কোনটাই অর্জন করতে সক্ষম হয় না।"

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বক্তৃতাকালে ইরানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামী একুশ শতকে সম্পদের নির্মম অসম বন্টনের জন্য বিশ্ব পুঁজিবাদকে দায়ী করেন। তিনি বলেন ঃ "বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ যখন ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, নিরক্ষরতা, রোগ-ব্যাধি ও নিরাপত্তাহীনতায় জর্জরিত তখন আমরা সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির দ্বীপে বাস করতে পারি না"।

ইউরি এভনারি বলেন "বিশ্বে শ্যালম মুভমেন্টের শান্তি কর্মী পশ্চিমা বিশ্বের ঘোষিত শান্তির বাণীতে ন্যায়বিচার উপেক্ষিক। তাদের ন্যায়বিচারের ধারণা একপেশে। পশ্চিমারা শুধু তখনি ন্যায়বিচারের কথা বলে যখন তাদের স্বার্থে আঘাত লাগে। আমাদের প্রয়োজন সংঘাত নিরসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার এমন এক আন্তর্জাতিক উদ্যোগ যাতে বিশ্বের বড়-ছোট, ধনী-গরিব, উন্নত-অনুন্নত, ইহুদী-অ-ইহুদী নির্বিশেষে সব দেশের অংশগ্রহণ থাকবে। একইভাবে সংঘাতের সমাধানও হতে হবে অবশ্যই আন্তর্জাতিক। নিরীহ লোকদের হত্যা করে কোন কিছুকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করা যাবে না, সেটা আমেরিকায় হোক বা আফগানিস্তানে। পশ্চিমা বিশ্বকে অবশ্যই অপরাধমূলক সন্ত্রাস এবং হত্যার জন্য হত্যা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই তৃতীয় বিশ্বের আরব ও মুসলিম দেশসমূহের ব্যাপারে তাদের নীতি পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে এবং শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব পরিহার করে প্রকৃত শান্তি বিশেষ করে বিশ্বের যে সব অঞ্চলে সন্ত্রাস প্রধানত নব্য বা পুরানো উপনিবেশবাদের ফলশ্রুতি সে সব অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে হবে। পশ্চিমাদের এটা ভাবা উচিত হবেনা যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো নির্বোধ এবং ১৮৪২ সালে আফগানিস্তানে বৃটিশ আগ্রাসনের কথা তারা ভুলে গেছে, যখন

www.pathagar.com

বৃটিশ ভূখন্ডে ওসামা বিন লাদেন, মোল্লা ওমর, তালিবান, আল-কায়েদা বা অন্য কোন সন্ত্রাসী হামলা হয়নি। বিশ্ব শান্তি আজ যুগসন্ধিক্ষণ। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এখন আর 'জোর যার মুল্লুক তার' ধারণার ভিত্তিতে চলতে পারেনা। শুধুমাত্র সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করে বিশ্ব শান্তি অর্জিত হতে পারে না। সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে বিশ্বে স্বাধীনতা ও সাম্যের মূল্যবোধ এবং মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্তরিক ও নির্ভেজাল প্রয়াস। পশ্চিমা বিশ্বকে অবশ্যই স্থুল নৈতিক কপটতা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে স্পষ্ট কল্পিত ভুল ধারণা থেকে ফিরে আসতে হবে। এই কপটতা ও ইসলাম বিরোধী ধারণার প্রতিফলন ঘটে ফিলিস্তিনের অনাহারী শিশুদের মুখে খাদ্য জোগানোর কাজে নিয়োজিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করার মার্কিন নীতিতে। একদিকে তারা এসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে বন্ধ করে দেয় অন্যদিকে ইসরাইলী বসতি স্থাপনকারী এবং 'কাচ' এর মত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী তৎপরতা খুনখারাবি এবং ফিলিস্তিনী ভূখন্ড জবর-দখলে সহায়তা করার জন্য ১শ কোটি ডলারেরও বেশী অর্থসহ্ মার্কিন ইহুদীদেরকে সেখানে পাঠায়। আমেরিকার নীতি নৈতিকতার প্রতি বিশ্ববাসীর আস্থা ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং বিশ্বাসযোগ্যতা আর নেই। যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে তাদের পররাষ্ট্রনীতি পক্ষপাতদুষ্ট এবং নৈতিকতার বিচারে ভুল। শক্তি হচ্ছে একটি দুধারী তলোয়ারের মত। ন্যায়পথে ব্যবহৃত হলে এটি টিকে থাকে আর অপব্যবহার হলে ধ্বংস হয়ে যায়। প্রাচীন গ্রীক, রোম, পারস্য এবং মিসরীয় সভ্যতা একথারই সাক্ষ্য দেয়। এজন্য আমাদের সময়ের তথাকথিত আধুনিক সভ্যতাকেও এ থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। ঘটনাক্রমে ১১ই সেপ্টেম্বর ফিলিস্তিনকে উপনিবেশিক শাসনমুক্ত ঘোষণার দিন। ১৯২২ সালে বৃটিশদের রায় অনুসারে তৎকালীন জাতিপুঞ্জ এ ঘোষণা দেয়। অন্যদিকে ২০০১ সাল হচ্ছে বর্তমান জাতিসংঘের সভ্যতার মধ্যে সংলাপের বছর। তাহলে কি সভ্যতার সংঘাত তথা ইসলাম ও পশ্চিমা জগতের দ্বন্দ্বের মধ্যে বছরটি শেষ হলো?

অতীতে পশ্চিমারা সর্বাদা প্রচারণা চালাতো যে আরব ও মুসলিম দেশগুলো প্রযুক্তিতে পিছিয়ে রয়েছে। তারা সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ আল-কোরআনকে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ বলেও প্রচার করতো। এখন একটি বড় প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে মুসলিম জাহান সামগ্রিকভাবে পশ্চাৎপদ সেখানে ওসামা বিন লাদেন নামে এক ব্যক্তি বা আল-কায়েদা নামে একটি সংগঠন কী ভাবে এত নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে অচিন্তনীয় সাফল্যের সাথে পশ্চিমাদের গর্বের সৌধ বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র (WTC) তথা টুইন টাওয়ার এবং পেন্টাগনে হামলা চালাতে পারে! যে কেউ এটা ভেবে আশ্চর্য হওয়ার কথা যে তাহলে কি আরব ও মুসলিম দেশগুলো অত্যন্ত উন্নত ও স্পর্শকারত প্রযুক্তিতে সুরক্ষিত পেন্টাগনে হামলা চালানোর জন্যই বৈজ্ঞানিকভাবে যথেষ্ট এগিয়ে গেছে! এ প্রশ্নের জবাব যদি 'না' হয় তাহলে ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেয়ার অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানকে হামলার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করলো। তা হলে কেনই বা এ যুদ্ধ ? আফগাস্তিানে মার্কিন হামলার পেছনে লুকানো কর্মসূচীটা তাহলে কী ? বিশ্লেষকদের মতে যুক্তরাষ্ট্র কৌশলগত, সামরিক এবং অর্থনৈতিক কারণে আফগানিস্তানে হামলা চালিয়েছে। আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া এবং ককেশাস ও কাস্পিয়ান অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ এত গুরুত্বপূর্ণ যে এই স্বার্থ অর্জনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার মার্কিন জনগণকে সম্মত ও প্রভাবিত করার জন্য তাদের তথাকথিত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অঙ্গীকার এবং মার্কিন জীবনাচার আক্রান্ত

www.pathagar.com

হয়েছে বলে প্রচারণা যুদ্ধ শুরু করেছে।

মিথ্যে যাই বলা হোক না কেন তার গভীরে লুকিয়ে আছে আসল উদ্দেশ্য। কি সেটা ?

জন স্টেইনবেক রচিত উপন্যাসের শিরোনাম অনুসরণ করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকা (১০ই ডিসেম্বর ২০০১)'র প্রখ্যাত সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক প্রশ্ন করেছেন 'দুষ্টের বিরুদ্ধে শিষ্টের জয় অনিবার্য' নামে কেন এই সভ্যতার যুদ্ধ ? কেন এই 'সন্দেহজনক যুদ্ধ', কেন প্রেসিডেন্ট বুশ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এত তড়িঘড়ি করে 'ক্রুসেড' ঘোষণা করলেন ? অসম যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমা গণমাধ্যম এবং যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের যুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোন সময়ই নিল না। মার্কিন জীবনাচার কি ? এটা কি নিজের ঘরে মুক্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র আর বাইরে নয়া বিশ্বব্যবস্থা, মানবাধিকার, মুক্ত বাজার ও বিশ্বায়নের নামে নব্য উপনিবেশবাদ ? এজন্যই যুক্তরাষ্ট্র শুধু নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে স্বৈরাচারী একনায়কের শাসনকে সমর্থন করে এবং নিজের স্বার্থে সামরিক শক্তি ব্যবহার ও সামরিক হস্তক্ষেপে দ্বিধা করে না? যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের জনগণের বৈধ আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী এক নায়কদের সমর্থন করার পররাষ্ট্র নীতি ত্যাগ করতে হবে যাতে এসব দেশের জনগণ নিজেদের জীবন, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী গড়ে তুলতে পারে। তাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার বিষয়টি মেনে নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ পূরণ এবং এই স্বার্থকে এগিয়ে নিলে স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিবাজ সরকারকে সমর্থন করার পুরানো অভ্যাস ও ইচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। টুইন টাওয়ারের মত পৃথিবীর সুরম্য ভবন এবং পেন্টাগনে হামলায় ওসামা বিন লাদেন জড়িত থাকার অভিযোগের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও প্রেসিডেন্ট বুশ পক্ষপাতদুষ্ট ঠুনকো প্রমাণ ছাড়া কোন নির্ভরযোগ্য ও বাস্তব প্রমাণ আরব ও মুসলিম দেশ বিশেষ করে ওআইসির সামনে উপস্থাপন করতে অস্বীকার করলেন ? এর কারণ কি এই যে তাদের কাছে যে প্রমাণ আছে তা কোন আদালতে টিকবেনা। আমরা সব ধরনের খুনী ও সন্ত্রাসীর বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত চাই। অথচ দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) প্রতিষ্ঠা চুক্তি অনুমোদন করেনি। প্রেসিডেন্ট বুশ বিশ্ববাসীকে এমর্মে চরমপত্র দিয়েছেন যে "তোমরা আমাদের পক্ষে না থাকলে ধরে নেবো তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে"। বিশ্বে এই কি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও মুক্তির আঙ্গীকার? প্রেসিডেন্টকে পশ্চিমের (যুক্তরাষ্ট্র) পক্ষে থাকতে হবে অথবা সন্ত্রাসীদের (মুসলিম) পক্ষে। কোন যুক্তবাদী ও বিবেচনাসম্পন্ন লোক কিভাবে বলতে পারে যে স্বজাতির মুসলমানের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের সহযোগিতা করতে অসম্মত হলে মুসলমানরা এমনিতেই সন্ত্রাসীদের সমর্থকে পরিণত হবেন! এই পরিস্থিতিতে সুইডেনের মত নিরপেক্ষ দেশের অবস্থা কি দাঁড়াবে! তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশসমূহের সামনে মুক্তি, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, প্রগতি, সম্পদ, মুক্তি এবং যুদ্ধ ইত্যাদি শব্দ নতুন অর্থ ও মাত্রা বহন করে। আফগানিস্তানে হামলা কোন যুদ্ধ ছিলনা। এটা ছিল শান্তির নামে পশ্চিমাদের উগ্র স্বদেশবাদী অভিযান। আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের 'ইনফিনিট জাস্টিস' নামক অভিযান ছিল আফগানিস্তানকে হেয় করা এবং তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াস। অন্যদিকে 'স্থায়ী স্বাধীনতা' (Enduring freedom) ছিল আসলে 'স্থায়ীভাবে অধীনতা' অর্থাৎ আফগানিস্তানকে অর্থনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে অধীন করার চেষ্টা। হামলায় ওসামা বিন লাদেন জড়িত

www.pathagar.com

থাকার প্রমাণ দেখানোর জন্য সব মহল থেকে অনুরোধ জ্ঞাপন সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের অস্বীকৃতি হচ্ছে আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনের পুরোপুরি লংঘন এবং মানবাধিকার ও আইনের শসনের পরিপন্থী। এতে যুক্তরাষ্ট্রের পরাশক্তিসুলভ একগুঁয়েমি প্রকাশ পেয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে বিশ্বাসী। বিশ্ব জনমতের প্রতি তারা থোড়াই পরোয়া করে। নিজের দেশে স্বাধীনতার মার্কিন নীতির অর্থ হচ্ছে অন্য দেশের ওপর অধিপত্য। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যখন বলা হয় তারা পশ্চিমের বাইরের লোকদের ভালবাসে তখন প্রকৃত অর্থ ধরে নিতে হবে তারা পাশ্চাত্যের বাইরের যে সব এলাকার লোক তাদের অভিমত, সংস্কৃতি ও জীবনাচারের সাথে একমত নয়, তাদের ঘৃণা করে। দু'টি বিশ্বযুদ্ধ থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকান্ডে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে যখন তারা অ-পাশ্চাত্য দেশে শান্তি ও স্থিতির কথা বলে তখন বুঝতে হবে তাদের আসল মতলব হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের কোন আরব ও মুসলিম দেশের অগ্রযাত্রাকে বাধা দেয়ার জন্য শান্তির নামে সেখানে যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে চায়। এমনকি বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগনে হামলার দু'দিন আগেও দক্ষিণ ইরাকের বেসামরিক এলাকায় মার্কিন ও বৃটিশ জঙ্গী বিমানের বোমা বর্ষণে ৮জন লোক নিহত হয়। পশ্চিমের প্রধান গণমাধ্যমগুলো এই খবর প্রকাশ করেনি যাতে লোকজন জানতে না পারে। এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘের মিডিয়া পুরস্কার বিজীয় প্রখ্যাত সংবাদিক জন পিলজার-এর মন্তব্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, পশ্চিমা গণমাধ্যম মার্কিন আধিপত্য ও প্রাধান্যকে তুলে ধরে জনমত গঠনের জন্য প্রায়শঃ 'যুদ্ধ প্রচারণা' মাধ্যমের মত আচরণ করে। জন পিলজার বলেন পশ্চিমা গণমাধ্যমের অজ্ঞতা ও পক্ষপাতদুষ্টতা পৃথিবীকে 'সভ্যতার মধ্যে সংঘাতের' দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা সন্ত্রাস হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অংশ অথচ সাংবাদিকরা এ সম্পর্কে টু শব্দ বলা বা লেখার সৎসাহস দেখান না।

আফগান বিরোধী আন্তর্জাতিক জোটের শরীক দলগুলো গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র উৎপাদন করে। এসব দেশ তাই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে যাতে তাদের অস্ত্র বিক্রির সুযোগ হয় এবং এই ফাঁকে তাদের তৈরি অস্ত্রের কার্যকারিতাও পরীক্ষা হয়ে যায়। তৃতীয় বিশ্বের এবং বলকান অঞ্চলের মুসলিম দেশগুলো এভাবে পশ্চিমা অস্ত্র উৎপাদনকারী দেশসমূহের বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। কার্লাইল গ্রুপ সবচে বড় অস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বলে জানা যায়। এই প্রতিষ্ঠান প্রতিরক্ষা খাতে যে বিনিয়োগ (১৩শ কোটি ডলার) করে তা সামরিক সংঘাতে অস্ত্র বিক্রি করে সুদে-আসলে তুলে নেয়। সাবেক মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফ্যাঙ্ক কার্লুসি (তিনি চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ডোনাল্ড রামসফিল্ডের কলেজ জীবনের বন্ধু) সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস বেকার, জর্জ সোরস (দূর প্রাচ্যের উদীয়মান অর্থনীতির পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করার জন্য তিনি কুখ্যাত) এবং ফ্রেড মালিক (জর্জ বুশ সিনিয়রের প্রচারণা ম্যানেজার) প্রমুখের মত লোকেরা কার্লাইল গ্রুপ পরিচালনা করেন। বাল্টিমোর ক্রনিক্যাল পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে যে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সিনিয়র কার্লাইল গ্রুপ এশীয় বাজার থেকে বিনিয়োগ আহ্বান করেছেন।

এই গ্রুপের তেলের ব্যবসাও রয়েছে। সুতরাং এটা এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট যে প্রেসিডেন্ট বুশ জুনিয়র ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি মার্কিন তেল শিল্পের মাধ্যমে

www.pathagar.com

নিজেদের ভাগ্য গড়ার জন্য কাজ করছেন এবং তেল কোম্পানির সাথে তাদের উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ন রয়েছে। এখন পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে কেন প্রেসিডেন্ট বুশ আফগানিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপে এত উৎসাহী। যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা তেলকে নিরাপত্তা ও কৌশলগত বিবেচনার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এজন্য পশ্চিম এশিয়া ও উপসাগরীয় অঞ্চলে নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে। আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সংলগ্ন তুর্কমেনিস্তানে রয়েছে আনুমানিক ৬শ কোটি ব্যারেল তেলের মজুত এবং বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গ্যাসের মজুত। যুক্তরাষ্ট্রের আগামী ৩০ বছরের চাহিদা পূরণের জন্য এই মজুত যথেষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ তেল কোম্পানি ইউনোকল আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান হয়ে আরব সাগর অভিমুখী একটি তেল পাইপলাইন নির্মাণের অনুমতির ব্যাপারে রাজি করানোর জন্য গত কয়েক বছর যাবৎ তালেবানদের সাথে আলোচনা চালিয়ে আসছিলো। এই পাইপ লাইন নির্মাণ করতে পারলে এ অঞ্চলে আমেরিকার তেলের স্বার্থ ইরান ও রাশিয়ার বাধা মুক্ত হবে। ইউনোকল এই পাইপ লাইনের মাধ্যমে দক্ষিণ ও দক্ষিণ এশিয়ার উদীয়মান লোভনীয় বাজারে প্রবেশ করতে চায়। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে তালেবান প্রতিনিধি যুক্তরাষ্ট্রও সফর করেন এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। কিন্তু 'তালেবান সরকারের অনমনীয়তার কারণে' আলোচনা যখন ব্যর্থ হয় এবং মোল্লা ওমর যুক্তরাষ্ট্রকে পাইপলাইন নির্মাণের সুবিধা দিতে অস্বীকৃতি জানায় তখনি প্রকৃত সমস্যা দেখা দেয়। অত্যাধুনিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ওসামা বিন লাদেনকে (যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগনে হামলার মূল অপরাধী) না অপহরণের কোন চেষ্টা করেছে যেমনটি তারা নরিয়েগাকে করেছিলো, না তাকে ধরার চেষ্টা করেছে- যেমনটি ইরানে শাহের পতনের পর সেখানে আটক মার্কিন কূটনীতিকদের উদ্ধারের জন্য তারা করেছিলো। যুক্তরাষ্ট্র রবং সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তালেবান সরকারের পতন ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলো। কেন? এটা নারীদের তথাকথিত মৌলিক অধিকার অস্বীকার করার কারণে নয়; আসলে আফগান নারীদের বোরখা পরা না পরা এনিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোন মাথাব্যথা নেই, কেননা সৌদী মহিলারাও বোরখা পরেন। (আফগান মহিলারা একটি সুনির্দিষ্ট পর্দা প্রথা অনুসরণ করেন। বোরখা আসলে তাদের উপজাতীয় ঐতিহ্য। কেননা পাকিস্তানে যে মহিলা উদ্বাস্তু হিসেবে আশ্রয় নেন তারাও বোরখা পরতেন। অথচ তারা তো মোল্লা ওমরের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আফগান মহিলারা এখনো একই পর্দা প্রথা অনুসরণ করেন। এমনকি উত্তরাঞ্চলীয় জোট যখন আফগানিস্তানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয় তখনো তারা সেই বোরখা পরেছেন।) যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত মধ্য আফগানিস্তানের বামিয়ায় পাথরের তৈরি বুদ্ধের দুটি দীর্ঘ মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার কারণেও নয়, কেননা উগ্র হিন্দুরা যখন ভারতের প্রাচীন বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে তখন যুক্তরাষ্ট্র কোন উচ্চবাচ্য করেনি। তবে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে নিজের গোপন কর্মসূচী 'পেট্রোলের রাজনীতি' এগিয়ে নেয়ার জন্য এসব ইস্যুকে ব্যবহার করেছে। যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থকে সবকিছুর উর্ধে স্থান দিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে অন্যসব বিবেচনা গৌন এবং কোন কোন সময় গুরুত্বহীন। সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য থেকেও এটা স্পষ্ট। ১৯৯৬ সালে লেসলি স্টাইলের নেয়া সিবিএস টেলিভিশনের এক সাক্ষাৎকারে তাকে জিজ্ঞেস করা হয় মার্কিন

www.pathagar.com

নিষেধাজ্ঞার ফলে ৫ লাখ ইরাকী শিশু মারা যাওয়ার ব্যাপারটাকে তিনি কিভাবে দেখেন- জবাবে অলব্রাইট বলেন, 'এটা ছিল এক কঠিন সিদ্ধান্ত"। তবে এসব কিছু বিবেচনায় ছিল, "আমরা মনে করি ইরাককে এই মূল্য দেয়া দরকার ছিল"। বুকার পুরষ্কার লেখক ও সাংবাদিক অরুন্ধতী রায় বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র শিল্প, তেল শিল্প, প্রধান মিডিয়া নেটওয়ার্ক এবং পররাষ্ট্র নীতি মোটের ওপর সবকিছু ব্যবসায়িক স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হয়।

কাস্পিয়ান সাগর এলাকা পৃথিবীর সম্ভাব্য বৃহত্তম তেল মজুত এলাকা। ফলে মধ্য এশিয়া দ্বিতীয় মধ্যপ্রাচ্য হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে সমস্যা একটাই- পাইপলাইন দিয়ে তেল বাইরে নিয়ে যাওয়া। কাস্পিয়ান অঞ্চল এবং দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার বাজারের মধ্যে আফগানিস্তানের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউনোকলের প্রধান দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে পাইপলাইন নির্মাণ। এজন্য 'স্থিতিশীলতার' সম্ভাব্য উৎস হিসেবে ইউনোকল এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় তালেবানদের উত্থানকে স্বাগত জানায়। পরে অবশ্য তাদের এই আশা 'স্বপ্নে' পরিণত হয়। মার্কিন সর্বাধিনায়ক প্রেসিডেন্ট বুশ এবং তার চারপাশের স্তাবকরা মধ্য এশিয়ায় ব্যবসায়িক মুনাফার এই চমৎকার সম্ভাবনার কথা কখনো ভুলতে পারেনি। দুর্ভাগ্যক্রমে বিরোধের মূল বিষয় হচ্ছে এটা। বিষয়টি থেকে পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষকদের মনোযোগ এড়ানো কোনভাবেই সমীচীন নয়।

সাংবাদিক জন পিলজার লন্ডনের মিরর পত্রিকায় (২৯শে অক্টোবর ২০০১ সংখ্যা) এক নিবন্ধে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এই যুদ্ধকে "একটি গোপন অভিসন্ধির যুদ্ধ" এবং "পরাশক্তির পতাকা দোলানো ইমারতের পেছনে লুকানো মার্কিনীদের কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের উপায়" "নতুন অজুহাত, নতুন লুকানো কর্মসূচী, নতুন মিথ্যার আবরণে শক্তিহীনের বিরুদ্ধে শক্তিশালীর" শক্তিক্ষয়ের যুদ্ধ। পিলজার তার নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, টুইন টাওয়ারে হামলার দিন ব্লেয়ার সরকারের পূর্ণ 'সহযোগিতায় লন্ডনে একটি অস্ত্র মেলা' শুরু হয়। এই মেলায় বিভিন্ন স্বৈরাচারী ও মানবাধিকার লংঘনকারীদের কাছে গুচ্ছ বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রের মত ভয়ানক অস্ত্র বিক্রি করা হয়। পিলিজার উল্লেখ করেন- মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ অনেক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের শোষণের শিকার। পশ্চিমারা তাদের বা তাদের কাছাকাছি দেশসমূহের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করে। এটাই হচ্ছে পাশ্চাত্যের গোপন কর্মসূচী। ইরাকের বিরুদ্ধে আরোপিত গণঘাতক নিষেধাজ্ঞার ফলে প্রতিমাসে যে সংখ্যক শিশু মারা যায় তার সংখ্যা বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে নিহতের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। অথচ এজন্য মার্কিনীদের বিবেক কখনো জাগ্রত হয়নি, কারণ এই ঘটনা তো তাদের মূল ভূখন্ডে নয় বরং বহু দূরে সমুদ্রের তেপান্তরে। ইরাকের এসব নিরপরাধ শিশুর জন্য না কোন প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে না পল ম্যাকার্নির কোন কনসার্ট, তাদের মৃত্যুতে শোকও প্রকাশ করা হয়নি। মালয়েশিয়ার শিক্ষাবিদ ও মানবাধিকার কর্মী ডঃ চন্দ্র মোজাফফর তাই প্রশ্ন তুলেছেন ঃ "১৯৯৫ সালে ওকলাহোমা ফেডারেল ভবনে বোমা হামলায় শতাধিক লোক মারা যায়, এটাকে গণহত্যা বলা যায় না, হলেও সংখ্যায় সীমিত এক ক্রুকাট ডানপন্থী শ্বেতাঙ্গ মিলিশিয়া সদস্য এই হামলা চালায়, এটা জানার পরও কেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় এজন্য এত ব্যাপক ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করা হয়? মধ্য এশিয়ার গ্যাসের মজুদ রাশিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বুশের সরকার এটা পরিবর্তন করতে চায়, কিন্তু তালেবানরা মার্কিন শর্ত মানতে অস্বীকৃতি জানায়। এতেই যুক্তরাষ্ট্রের

www.pathagar.com

জ্বালানী নিরাপত্তার যুক্তি পরিবর্তিত হয়ে "সামরিক রূপ নেয়"। "বিন লাদিন ঃ লা ভেরিত ইন্টারডাইট" (বিন লাদিন ঃ ভয়ঙ্কর সত্য) নামক গ্রন্থে একথাই দাবী করা হয়েছে। প্যারিস থেকে আই পি এস জানায় জিন চার্লস ব্রিসার্ড এবং গুইলাম দাসকুই যৌথভাবে বইটি লেখেন। ব্রিসার্ড এবং দাসকুই'র রয়েছে তথ্য বিশ্লেষণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। ব্রিসার্ড ১৯৯০ সালের শেষপর্যন্ত ফরাসী কোম্পানী ভিভেন্ডির অর্থনীতি বিশ্লেষণ ও কৌশল বিভাগের পরিচালক ছিলেন। তিনি ফরাসী গোয়েন্দা বিভাগেও কাজ করেছেন। ১৯৯৭ সালে তিনি ফরাসী গোয়েন্দা বিভাগের জন্য বর্তমানে বিখ্যাত আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের ওপর একটি রিপোর্ট লেখেন। অন্যদিকে দাসকুই হচ্ছেন একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক এবং ইনটেলিজেন্স অনলাইন নামে একটি পত্রিকার প্রকাশক। তার পত্রিকাটি কূটনীতি, অর্থনীতি বিশ্লেষণ ও কৌশল বিষয়ক একটি সমাদৃত পত্রিকা। ইন্টারনেটে পত্রিকাটি পাওয়া যায়। এই দুই লেখক দাবী করেন, ২০০১ সালের আগষ্ট পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সরকার তালেবান সরকারকে মধ্য এশিয়ায় স্থিতিশীলতার উৎস হিসেবে দেখেছে। তাদের ধারণা ছিল তালেবানদের মাধ্যমে পুরো মধ্য এশিয়ায় অর্থাৎ তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান এবং কাজাকিস্তানের সমৃদ্ধ তেলক্ষেত্রের সাথে পাইপলাইন নির্মাণ করে তা আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারত মহাসাগরের দিকে নিয়ে যাবে। আলোচনার এক পর্যায়ে মার্কিন প্রতিনিধি তালেবানদের বলেন, "হয় আমাদের সোনার গালিচার প্রস্তাব মেনে নেবেন না হলে আমরা বোমার গালিচার নিচে আপনাদের পুঁতে ফেলবো", প্যারিসে এক সাক্ষাৎকারে লেখকদ্বয় এই তথ্য প্রকাশ করেন। আগস্টে মার্কিন ও তালেবান প্রতিনিধির মধ্যে সর্বশেষ বৈঠক হয়। এটা ছিল নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের ঘটনার ৫ সপ্তাহ আগে। ঐ বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্য এশিয়া বিষয়ক দায়িত্বশীল ক্রিস্টেন রোকাও উপস্থিত ছিলেন। বুশ পরিবারের রয়েছে তেল ব্যবসার দীর্ঘ পটভূমি। একইভাবে তার শীর্ষ সহযোগীদেরও। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি থেকে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের পরিচালক কনডোলেজা রিক, অন্যদিকে বাণিজ্য মন্ত্রী ডোনাল্ড ইভানস থেকে জ্বালানী মন্ত্রী স্টেনলি আব্রাহাম পর্যন্ত সবাই মার্কিন তেল কোম্পানিতে কাজ করেছেন। চেনি ২০০০ সালের শেষ পর্যন্ত হলিবার্টনের সভাপতি ছিলেন। এই কোম্পানি তেল শিল্পের উন্নয়নে নিয়োজিত। রিক ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে শেভরনের ম্যানেজার ছিলেন। অন্যদিকে ইভানস ও আব্রাহাম অপর নামকরা মার্কিন তেল কোম্পানি টমব্রাউনে কাজ করেছেন।

এই বই পূর্ববর্তী রিপোর্টের সত্যতা নিশ্চিত করেছে যে তালেবানদের সাথে আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার জাতিসংঘের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য গত ২০০১ সালে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ফ্রান্সিস ভেন্দ্রেলের মধ্যস্থতায় বেশ কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও রাশিয়ার প্রতিনিধি ছাড়াও আফগানিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন ৬টি দেশের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। কোন কোন সময় তালেবান প্রতিনিধিরাও আলোচনায় ছিলেন। এসব বৈঠকে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের সংখ্যার নাম অনুসারে এসব বৈঠককে "৬+২" বলা হত। (ছয়টি প্রতিবেশী এবং যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া) পাকিস্তান সরকারের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী নায়েফ নায়েকও এসব বৈঠকের সত্যতার কথা নিশ্চিত করেছেন। সম্প্রতি ফরাসী টেলিভিশনের এক নিউজ প্রোগ্রামে নায়েফ নায়েক বলেন,

www.pathagar.com

বার্লিনে জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত "৬+২" এর বৈঠকে আফগানিস্তানে একটি জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা হয়। এতে বলা হয় তালেবান যদি এই কোয়ালিশনকে মেনে নেয় তাহলে তারা অবিলম্বে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সাহায্য পাবে এবং কাজাখিস্তান ও উজবেকিস্তান থেকে পন্য সামগ্রী আসবে। নায়েফ নায়েক আরো দাবি করেন যে, এসব বৈঠকে মার্কিন প্রতিনিধি টম সাইমনস তালেবান ও পাকিস্তানকে সরাসরি হুমকি দিয়ে বসেন। সাইমনস বলেন ঃ "হয় তালেবান কাঙ্খিত আচরণ করবে বা পাকিস্তান তাদেরকে সে আচরণ করতে রাজি করাবে নয় তো আমরা বিকল্প পথ ধরবো"। নায়েফ নায়েকের মতে সাইমস-এর ব্যবহৃত শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে "একটি সামরিক অভিযান"।

সুতরাং স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে আফগান যুদ্ধ থেকে কে লাভবান হবে ? উত্তর স্পষ্ট। তেল শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই লাভবান হবে- বিশেষ করে বুশ পরিবার এবং তাদের ব্যবসায়িক সহযোগীরা। উইলিয়াম কুপারের মতে প্রতিরক্ষা শিল্পে জড়িত প্রত্যেকে লাভবান হবে।

জার্মানী ভিত্তিক পরিবেশ আন্দোলন গ্রীন পীস দাবী করেছে এটা এখন স্পষ্ট যে এন্টিবায়োটিক ওষুধের নতুন বাজার খোলা এবং আরব ও মুসলিম দেশগুলোর দুর্নাম ছড়ানোর উদ্দেশ্যে মার্কিন ওষুধ প্রস্তুত শিল্পগুলোর গবেষণাগারেই এনথ্রাক্স উৎপাদন করা হয়েছে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ যুক্তরাষ্ট্রে এনথ্রাক্স সন্ত্রাস চালানোর জন্য "উগ্র ডানপন্থী খৃষ্টানদের" সন্দেহ করেছেন। তিনি পশ্চিমাদের নৈতিক মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কুয়ালালামপুর থেকে এএফপির খবরে বলা হয় মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যখন ইরাকে হামলা চালানোর কথা বলা হয় তখন এনথ্রাক্স বিস্তারের বিরুদ্ধে কোন সহিংস ক্ষোভ দেখানো হয় না। ওয়ার্ল্ড নিউজপেপারের পক্ষে আই সি এম এক জরিপে পশ্চিমাদের নৈতিকতার স্বরূপ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জরিপে দেখা যায় আফগানিস্তানে বুশের সামরিক হামলার প্রতি স্বার্থহীন সমর্থন দেয়ায় 'যুদ্ধবাজ নেতা' হিসেবে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের জনপ্রিয়তা চমৎকারভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। লন্ডন থেকে রয়টার পরিবেশিত খবর অনুযায়ী জরিপে ৬৭ শতাংশ ব্রিটেনবাসী ব্লেয়ারের সেই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে যে পদক্ষেপের ফলে আফগানিস্তানে অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধ, নারী ও শিশুসহ নিরীহ লোক মারা গিয়ে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রমাণ পেশ না করার ব্যাপারে এত জিদ ধরলো কেন ? এর কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ব্যবহার করা এবং সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে আফগানিস্তানকে স্প্রিংবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করা। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার আফগান জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঃ "এবার আমরা আপনাদের ছেড়ে যাবো না", ওয়াশিংটন ডিসির ন্যাশনাল ক্যাথেড্রেলে জাতীয় প্রার্থনা ও স্মরণ দিবসের সমাবেশে বক্তৃতাকালে প্রেসিডেন্ট বুশ আফগানিস্তানে অব্যাহত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "যুদ্ধ শুরু হয়েছে অন্যের নির্ধারিত সময় ও কার্যকালে। এই যুদ্ধ শেষ হবে আমাদের পছন্দমত উপায় ও সময়ে।" পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান জেনারেল মির্জা আসলাম বেগ দাবী করেছেন যে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগনে হামলায় ওসামা বিন লাদেন বা আফগানিস্তান জড়িত থাকার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কোন প্রমাণ নেই, কিন্তু মার্কিন গণমাধ্যম তাদের বিরুদ্ধে একটা আবহ তৈরি করেছে। জেনারেল বেগ সতর্কবাণী

www.pathagar.com

উচ্চারণ করেন যে "এটা হচ্ছে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির পাঁয়তারা"। তিনি পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনা মারাত্মক হুমকির মুখে বলেও সতর্ক করে (ডন, লাহোর ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০০১) দিয়ে বঙ্গোপসাগরে চীন ও রাশিয়ার উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। (২০০১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর মস্কো থেকে সিনহুয়ার খবরে বলা হয় আফগানিস্তানে সামরিক পদক্ষেপ শেষ হয়ে যাওয়ায় রাশিয়া ইতিমধ্যে মধ্য এশীয় দেশসমূহ থেকে ঘাঁটি সরিয়ে নেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে)। পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক হামিদ মীরের মতে প্রেসিডেন্ট বুশ তালেবান বিরোধী, কারণ তালেবান যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেছে। ফ্রাইডে টাইমস পত্রিকায় (১৪ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সংখ্যা, লেখা এক নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে তালেবানদের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ৩ দফা কর্মসূচী ছিল। এক. তারা তালেবানকে ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। দুই. তারা আফগানিস্তানে শিন কিয়াং-এর বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেয়া ও প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপনের জন্য তালেবানদের চাপ দেবে এবং তিন. মার্কিনীরা আফগানিস্তানের মধ্যদিয়ে তুর্কমেনিস্তান থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ করবে। আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় জোট প্রকৃতপক্ষে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে অনুপ্রবেশ এবং নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালানোর জন্য বেশ কিছু তরুণকে প্রশিক্ষণ দেয়, যাতে তালেবান ও পাকিস্তানী মুজাহিদদের ওপর দোষ চাপানো যায়। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার এবং তাদের ইসরাইলী সহযোগী মাসাদ এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। বিদেশী সাংবাদিকদের বেশ ধরে বেশ কিছু মার্কিনী আফগানিস্তানের আকুরা খাটকের দারুল উলুম হাক্কানিয়া পরিদর্শন করে তার প্রধান মাওলানা সামিউল হককে জিনজিয়াং প্রদেশে চীনা নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে রাজি করানোর চেষ্টা চালায়। পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউলিয়াম বি. মাইলামও একই উদ্দেশ্যে ঘন ঘন সীমান্ত প্রদেশ সফর করেন। প্রটোকল অনুযায়ী এসব সফরের কথা পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানানো বিধেয় হলেও তিনি না জানিয়ে সফর করেন। (দ্রষ্টব্য ঃ প্লাটিং 'জিহাদ' এগেইনস্ট চায়না, ইমপেক্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউ কে বর্ষ ৩১. সংখ্যা ৬, জুন ২০০১ পৃষ্ঠা ২৭) ইমপেক্ট এর একই সংখ্যায় আরো বলা হয় গোয়াদেরে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণে পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ায় মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর ব্যথিত। এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ মেকরান উপকূলে চীন কৌশলগত ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ পায় (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫-১৬)। অবশ্য পাকিস্তানের কোন গ্রুপকে চীনের বিরুদ্ধে ব্যবহারের মার্কিন, ইসরাইলী ও ভারতীয় চেষ্টা এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৯৫ সালের অক্টোবরে ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক ইউনোকল তেল কোম্পানী আফগান ভূখন্ডের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে একটি তেল পাইপলাইন নির্মাণের সম্ভাবনা অনুসন্ধানের জন্য তুর্কমেনিস্তান সরকারের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। তালেবানরা কাবুল দখল করলে ইউনোকলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টোফার ট্যাগার্ট দৃঢ়তার সাথে বলেন ঃ "এটাকে আমরা খুবই ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করি।" পাকিস্তানের সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট ওকলেকে ইউনোকল তার পক্ষে লবি করার জন্য সময়মত নিয়োগ করে। তিনি ওয়াশিংটন ও পাকিস্তানের মধ্যে ঝটিকা সফরে ব্যস্ত সময় কাটান কিন্তু তালেবান ইউনোকলের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী রবিন রাফেল কান্দাহার গিয়ে উচ্চপদস্থ তালেবান কর্মকর্তাদের

www.pathagar.com

সাথে বৈঠক করেন কিন্তু তালেবানকে বশে আনার নীতি ব্যর্থ হয়, কারণ তালেবান সরকার প্রস্তাবিত গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের ব্যাপারে আর্জেন্টিনার ব্রিদাস কোম্পানীর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। শেষ পর্যন্ত যখন ৮শ কোটি ডলারের পাইপলাইন নির্মাণের কাজ শুরুই করা যাচ্ছে না তখন যুক্তরাষ্ট্র ক্রুদ্ধ হয়ে ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তরের দাবী তোলে। তালেবান সে দাবী মানতে অসম্মতি জানায়। স্বাধীনতার ওপর তালেবান সরকারের অটল থাকার এই নীতিতে যুক্তরাষ্ট্র ক্ষুব্ধ হয় এবং কাবুলে নিজেদের পছন্দসই সরকার বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তালেবান সরকার যখন মধ্য এশিয়ার সাথে সকল সড়ক যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আফগানিস্তানের ৫৫ শতাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতো তখনো যুক্তরাষ্ট্র সমস্যা সৃষ্টির প্রকাশ্য চেষ্টা চালায়। এ সমস্যা শুধু পাকিস্তান বা চীনের বিরুদ্ধে নয় ববং ইরানের বিরুদ্ধেও। তালেবান সরকারের আসল দোষ (?) হচ্ছে তারা যুক্তরাষ্ট্রের পুতুল হতে রাজি হয়নি। তারা কি যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যের কাছে নত হয়েছিল বা এ অঞ্চলে মার্কিন অর্থনৈতিক স্বার্থের পক্ষে কাজ করেছে? তালেবান ছিল স্থানীয় আন্দোলন, তারা না "মৌলবাদী না সন্ত্রাসী"। তারা যদি চীনের মুসলিম প্রদেশে অস্থিরতা সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হতে রাজি হতে তা হলে পরবর্তীতে তাদের আর কোন সমস্যা থাকতো না। বর্তমানে আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের পতন হওয়ার পর তথাকথিত যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার অজুহাতে জাতিসংঘ সনদের ৭শ অনুচ্ছেদের আওতায় নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব বলে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সহায়তা বাহিনীর প্রধান হিসেবে কাবুলে বৃটিশ সৈন্য অবস্থান করছে। এটা গভীরভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে যে কোন সময় যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল ও ভারতীয় গোয়েন্দারা পাকিস্তানের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্তবর্তী সব ঘাঁটি দখল করে নিতে পারে। ধারণা করা হয় এসব দেশ শুধুমাত্র পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনার বিরুদ্ধেই তাদের গোপন অভিযান শুরু করবে না বরং ইরান ও চীনের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে। দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার ২৫শে ডিসেম্বর ২০০১ সংখ্যায় বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র ভারতের কাছে ফেলকন বিমানবাহী রাডার ব্যবস্থা বিক্রির জন্য ইসরাইলকে সবুজ সংকেত দিয়ে দিয়েছে। সে অনুযায়ী ভারতের কাছে ১শ ডলার মূল্যের ৩টি ফেলকন এয়ারবর্ন ওয়ারনিং এন্ড কন্ট্রোল সিস্টেম (আওয়াকস) বিক্রি করা হবে।

সন্দেহ নেই যুক্তরাষ্ট্র একটি বড় সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের হাত অনেক দূর প্রসারিত। 'ক্ষুদ্র' আফগানিস্তানের পতনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক জোট গঠনের প্রয়োজন নেই। তবে "রাজনৈতিক কারণে" এর প্রয়োজন আছে বৈকি। ইতিহাস সাক্ষী দেয় আফগানরা অদম্য - তাদেরকে পরাভূত করা যায় না। আফগানিস্তানের মাটিতে বিদেশী সৈন্য অবস্থান করলে এমনকি সেটা যদি জাতিসংঘের পতাকাতলেও হয় তথাপি সেখানে গেরিলা যুদ্ধ চলতে পারে। এটা কাঁচের ঘরে ঢিল ছোঁড়ার আমন্ত্রণ জানানোর মত ব্যাপার। ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটির মধ্যপ্রাচ্য গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক আলম পায়বন্দ মন্তব্য করেন প্রত্যেক দেশ ভীতির মধ্যে থাকে যদি তারা আফগানিস্তানের এক ইঞ্চি জায়গাও দখল করে; (নিউইয়র্ক টাইমস, ১ লা ডিসেম্বর ২০০১)

যদিও বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগনে হামলায় ওসামা বিন লাদেন জড়িত থাকার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি তথাপি বৃটেনের দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় (১২ই

www.pathagar.com

সেপ্টেম্বর ২০০১) রবার্ট ফিস্ক প্রশ্ন তুলেছেন তা হলে কেন বহু মুসলমান পাশ্চাত্যকে ঘৃণা করে। ইসরাইলের যুদ্ধ নিয়ে মার্কিনীরা বছরের পর বছর জুয়া খেলে তাদের ধারণা জন্মেছে এতে কোন ক্ষতি নেই। না এটা আর হবে না। পশ্চিমা জগতকে এখন গান তথা আত্মঘাতী বোমারু বিমানের শব্দ শুনতে হবে। এখন যুদ্ধ হবে ধর্ম ও প্রযুক্তির মধ্যে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মার্কিনীদের অযৌক্তিক আচরণের প্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্ব বিশেষ করে আরব ও মুসলিম দেশগুলোর করণীয় কি। অত্যাবশ্যক নয় এমন মার্কিন পণ্য বর্জনের এখনি সময়। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলাম প্রচারক (দা'য়ী) ডঃ ইউসুফ আল-কারজাভী সারা বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি এই আহ্বান জানিয়ে বলেন, মুসলিম উম্মাহর জন্য সময় এসেছে আমেরিকা, তার কোম্পানী ও পণ্য বর্জন করার। কারণ যে সব মার্কিন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করছি, পোশাক পরছি এবং গাড়িতে চড়ছি তা বিশ্বে তাদের প্রাধান্য বিস্তারে সহায়তা করছে। পণ্য বর্জন অতীতে বিশেষ করে দুর্বল দেশের জন্য বেশ কার্যকরী অস্ত্র প্রমাণিত হয়েছে। কেউ তার পণ্য কিনছেনা বলে অন্যের ওপর বোমা ফেলতে পারবে না। ভারতের জনগণ তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বৃটিশ পণ্য বর্জন করেছিল। এটা এমন এক পদক্ষেপ যা সাধারণ পুরুষ, মহিলা এবং রাস্তার টোকাইকেও শক্তি জোগায়। আন্তর্জাতিক স্বৈরাচারিতা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য আমরা কমপক্ষে এটুকু করতে পারি।

পাশ্চাত্য ও তাদের প্রসারিত শাখা-প্রশাখা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে ভীতি প্রদর্শনকারী বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) ওপর আরব ও মুসলিম দেশগুলোর নির্ভরতা কমানোর আন্তরিক ও সযত্ন প্রচেষ্টা চালানো উচিত। বিদেশী সাহায্য ও মঞ্জুরীর ওপর নির্ভর না করে তাদেরকে নিজস্ব সম্পদের ওপর নির্ভর করতে হবে। এতে তারা পাশ্চাত্যের চাপিয়ে দেয়া, অযৌক্তিক ও অনৈতিক খবরদারি থেকে প্রকৃত অর্থে মুক্ত হতে পারবে। একটি ইসলামী সাধারণ বাজার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মুসলিম দেশগুলোর জনগণের স্বপ্ন এ পর্যন্ত মুসলিম নেতৃত্ব বাস্তবে রূপায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ ধরনের বাজার সত্যিকার অর্থে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের আর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। এজন্য কার্যকর ও বাস্তব পদক্ষেপ নেয়ার এখনি উপযুক্ত সময়। আরব ও মুসলিম দেশগুলোর উচিত তাদের নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা। এটি হচ্ছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেখানে তারা পিছিয়ে আছে। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমা গণমাধ্যমের পক্ষপাতদুষ্ট, বৈরী ও অনৈতিক প্রচারণার মুখে কাতারের আলজাজিরা টেলিভিশন মুসলিম জনমত তুলে ধরার ব্যাপারে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অর্থবহ ভূমিকা পালন করেছে। ধনী আরব ও মুসলিম দেশগুলোকে তাদের নিজস্ব টেলিভিশন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার এটাই যথার্থ সময়। এই নেটওয়ার্ক হতে হবে বিবিসি, সিএনএন ইত্যাদি টেলিভিশন চ্যানেলের সমকক্ষ।

সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দুটি কথা না বললে এই প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সন্ত্রাস কোন অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংগঠনের মদদে পরিচালিত হোক বা রাষ্ট্রীয় মদদে সেটা সন্ত্রাসই। সন্ত্রাসে শক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হল না দারিদ্র্য পীড়িত আফগানিস্তান সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ এক নির্যাতিত মানুষের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধীকার রক্ষার সংগ্রামের মধ্যে অবশ্যই তফাৎ থাকা.

www.pathagar.com

দরকার। বিশেষ করে যখন সেসব মানুষ তাদের ন্যায়সঙ্গত দুঃখ-দুর্দশা জানানোর কোন উপায় না দেখে জাতীয় মুক্তির জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। ইসলাম সর্বদা নিরীহ লোক, নিরস্ত্র বেসামরিক লোক, বৃদ্ধ, মহিলা, শিশু এবং অস্ত্র সমর্পণকারী যোদ্ধাদের হত্যার বিরোধী। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে মুসলমান অন্যের দুঃখ ও বেদনায় সুখী হতে পারে না- তারা মুসলমান হোক বা অমুসলমান। কোরআন মজীদে ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, "অন্যের শত্রুতা ও ঘৃণা তোমাদের যেন ন্যায় থেকে বিচ্যুত না করে"। [আল কোরআন-৫ (সূরা আল মায়েদা) ঃ ৮] কোরআনের প্রখ্যাত তফসীরকার মুহাম্মদ আসাদ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতে বলা হয়েছে "অপরের ঘৃণা যেন তোমাদের কখনো ন্যায় থেকে বিচ্যুত হওয়ায় পাপে লিপ্ত না করে"।

লেখক ঃ ইসলামিক ইনফরমেশন ব্যুরো বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান।

১লা জানুয়ারী ২০০২।

E-mail : khaled csdu@yahoo.com

ভাষান্তর ঃ মুহাম্মদ বাকের হোসাইন

বিধ্বস্ত জনপদ।

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সন্ত্রাস এবং মুসলিম বিশ্বের উত্থান শক্তিটুকুও রহিত করে দেয়ার প্রয়াস

মুহাম্মদ শামীম আখতার

তবে তিনি যে কে তার কোন প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত, ছিনতাইকারী যে সকলেই মুসলমান এটা প্রমাণ করাটা দুঃসাধ্য। কারণ, সারাবিশ্বে ডজন দুই বড় বড় সন্ত্রাসী সংগঠন রয়েছে যাদের জড়িত থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ওকলাহোমা সিটিতে বোমা হামলার খ্রিস্টীয় হোতা টিম মেকভিই মৃত্যুর আগে এই বোমা হামলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে এ কাজ করে বলে জানায়। তাছাড়া খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্রবাজির সাথে জড়িত সন্ত্রাসীর সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে খোদ ঘরের ইঁদুর নিয়ে শঙ্কিত হবারও যথেষ্ট কারণ আছে। বিশ্বখ্যাত আন্তর্জাতিক Time-এর ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ও ২৩ আগস্ট ১৯৯৩-এর সংখ্যায় যে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করে তাতে তাদের অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসের অনেক গোপন খবর থলে ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ে। সংখ্যা দু'টি সন্ত্রাসের যে পরিসংখ্যান দেয়-তাতে নিউইয়র্কের হামলাকে ভিন্ন আঙ্গিকে দেখার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। Time-এর ২৩ আগস্ট ১৯৯৩ সংখ্যায় বিল ক্লিনটনের শিহরণ জাগানো মন্তব্য রয়েছে। তিনি সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক অস্থিরতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, The first duty of any Government is to try to keep its citizens safe, but clearly too many Americans are not safe today যে কোন সরকারের প্রথম দায়িত্ব হল তার জনগণকে নিরাপত্তা দেওয়া; বর্তমানে মার্কিনীদের অনেকেই আজ আর নিরাপদ নয়। Time-এর ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৩-এর সংখ্যায় সে পরিসংখ্যান দেয়া হয় তাতে দেখা যায়, '৮২ সালে হ্যান্ডগানে যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যা ৯ হাজার', '৮৪ সালে প্রায় ৭ হাজার', '৮৬ সালে প্রায় হাজার', '৮৮ সালে প্রায় ৮ হাজার', ৯০ সালে ১১ হাজার', '৯২-তে ১৩ হাজার' প্রায়। একই সংখ্যায় জানানো হয়, সাধারণ জনগণের হাতে প্রায় ৬৭ লাখ হ্যান্ডগান রয়েছে। হ্যান্ডগান ব্যবহার করে ১৯৭৯-৮৭ সালের ঘটনা ঘটে। এ ধরনের হতাহত রোগীদের চিকিৎসার জন্য মার্কিনীদের বার্ষিক গড় ব্যয় হল ১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত বছর ওয়াশিংটনে 'শত মায়ের সমাবেশে' মার্কিনী মায়েরা সমাবেশ করে জানান, বিগত চার বছরে ক্রশফায়ারে ও গুলীবিদ্ধ হয়ে ৫ হাজার শিশু মারা গেছে। এই যেখানে অবস্থা,

www.pathagar.com

সেখানে মার্কিনী কোন ঘটনার জেরও তো হতে পারে। কিছুদিন ধরে মার্কিনীদের অর্থনীতিতে মন্দাভাব বিরাজ করছিল। এর প্রতিবাদে অথবা ইহুদী ব্যবসায়ীরা অস্ত্র বিক্রির নতুন মওকাতেও তো এ ঘটনা ঘটাতে পারে। কেননা, বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, আক্রমণে কোন ইহুদী মারা যায়নি এবং সেদিন কাজে কোন ইহুদীও যায়নি। এমনকি ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনকেও সেখানে যেতে বারণ করা হয়। কেননা, সেদিন ওখানে ইহুদীদের একটা অনুষ্ঠান ছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে Posrom বলে একটা কথা আছে। যখন রাষ্ট্র তার নিজ দেশে কৃত্রিম হানাহানির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ইন্ধন দিয়ে নাশকতা চালায় তখন তাকে Posrom বলে। মার্কিন প্রশাসনে ইহুদী লবির চাপে এ ধরনের ঘটনা ঘটলো কিনা অথবা যে রাডার নিয়ন্ত্রনের দায়িত্বে ছিল তার কোন গাফিলতি আছে কিনা এবং সেও চক্রের সাথে জড়িত কিনা এসব ভালোভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। ফ্লাইট রেকর্ডার পুঙ্খানুপুঙ্খ না বিশ্লেষণ করে কারও ওপর দোষ চাপানো হল সন্ত্রাসবাদের নামান্তর। ওসামা বিন লাদেনকে মার্কিনীরা যেভাবে দোষী সাব্যস্ত করছে এবং হামলার হুমকি দিচ্ছে তা জাতিসংঘের প্রকাশিত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি পুস্তিকায় বলা হচ্ছে ঃ " ১৪:১ আইন অনুসারে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত ফৌজদারী অপরাধের দায়ে প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার থাকবে। ১৪:৩ ঃ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী অপরাধের অভিযোগ মীমাংসার ব্যাপারে পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে তার নিম্নলিখিত ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভের অধিকার থাকবে।

ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি আনীত অভিযোগের কারণ ও ধরণ সম্পর্কে যে ভাষা বোঝেন সেই ভাষায় অবিলম্বে এবং বিস্তারিতভাবে তাকে অবগত করা।

খ) আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতি এবং নিজের পছন্দমত কৌঁসুলির সাথে যোগাযোগ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় ও সুবিধা লাভ;

গ) অযথা বিলম্ব না করে বিচারলাভ।

ঘ) নিজের উপস্থিতিতে বিচার লাভ করা এবং নিজে অথবা নিজের পছন্দমত আইন সংক্রান্ত সাহায্যের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন করা; আইন সংক্রান্ত সাহায্য না থাকলে তার এই অধিকার সম্পর্কে অবগত হওয়া; ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন হলে আইন সংক্রান্ত সাহায্য লাভ করা এবং অনুরূপ সাহায্য লাভের জন্য অর্থ প্রদানের যথেষ্ট সংস্থান না থাকলে বিনামূল্যে তা লাভ করা;

ঙ) তার বিপক্ষীয় সাক্ষীদের পরীক্ষা করা অথবা করানো এবং একই রূপ অবস্থা বা শর্তের অধীনে তার সপক্ষীয় সাক্ষীদের হাজিরা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

চ) আদালতে ব্যবহৃত ভাষা বুঝতে অথবা বলতে অসমর্থ হলে বিনামূল্যে দোভাষীর সাহায্য লাভ করা।

ছ) ব্যক্তিগত নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করতে অথবা নিজের দোষ স্বীকার করতে তাকে বাধ্য না করা"। (উৎস ঃ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-১১)

জাতিসংঘের এই নীতিমালার আলোকে ওসামা বিন লাদেনের পক্ষে বিপক্ষীয় সাক্ষীদের

www.pathagar.com

বক্তব্য পরীক্ষা করার অবকাশ রয়েছে [১৪:৩ (ঙ)]। এতগুলো পর্ব শেষ করেই তবে মার্কিনীরা কোন প্রকার অ্যাকশনে যেতে পারে। তবে খোদ মার্কিনীরাই যে সন্ত্রাসীর দৃষ্টান্ত রেখে গেছে তার বিচারও তো আগে হতে হবে। ১৯৪৮ সালে জোর করে দখলকরা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলের সে বড় সমর্থক। সুদান ও আফগানিস্তানে যে ক্রুইজ হামলা চালায় পরবর্তী কোর্টে তা নির্দোষ প্রমাণিত হয়। সোমালিয়া, পানামাতে হামলা চালিয়ে মার্কিনীরা যে রেকর্ড গড়েছে- আন্তর্জাতিক মহলকে আগে তার বিচার করতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্য হল, পাক রাষ্ট্রনায়ক পারভেজ মোশাররফের আচরণ। ❑

১৫ নভেম্বর '০১

লেখক ঃ সাংবাদিক।

এই চাহনীর জবাব কী ?

www.pathagar.com

'বিন লাদেন ও মোল্লা ওমরকে রক্ষার জন্য আমি, আমার চার বিবি এবং ১৬ সন্তান জীবন দিতে প্রস্তুত'

মোবায়েদুর রহমান

আফগানিস্তানে ৫ বছর মেয়াদী তালিবান শাসনের বাহ্যিক অবসান ঘটেছে। শুরু হচ্ছে আরেকটি অধ্যায়। সেই অধ্যায়টি কেমন হবে সেটা নিয়ে আগাম মন্তব্য করতে চাই না। কারণ ২২ ডিসেম্বর ৬ মাসের জন্য একটি সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবে। সে জন্য পরিস্থিতির ওপর নজর রাখাটাই সমীচীন। তবে একটি কথা শুরুতেই স্পষ্ট বলে রাখতে চাই। কথাটি হলো- হায়াত, মউত, রেজেক এবং দৌলতের মালিক হলেন আল্লাহ্। সেটা স্মরণ রেখেই বলছি, যদি ওসামা বিন লাদেন এবং মোল্লা ওমর বেঁচে থাকেন তাহলে সেদিন সুদূর নয়, যেদিন দক্ষিণ এশিয়া এবং মধ্য এশিয়ায় এমন সব ঘটনা ঘটবে যা কল্পনারও অতীত। পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের অভ্যন্তরভাগে ব্যাপক সফরের পর এই ধারণাই আমার মনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছে। আজকের এই কলামে সেই ধারণার পক্ষে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করবো। সেসব ঘটনা বর্ণনা করার আগে আফগানিস্তানে অতিসাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(১) জার্মানীর শৈলশিখরে অবস্থিত পিটার্সবার্গের মনোরম অট্টালিকায় আমেরিকার নেপথ্য ডিক্টেশনে জাতিসংঘের উদ্যোগে আফগানিস্তানের চারটি গ্রুপের ৭ দিনব্যাপী বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। ঐ বৈঠক যখন চলছিল তখন নর্দার্ন অ্যালায়েন্স এবং বোরহানউদ্দীন রব্বানী কাবুলে একটি নতুন কথা বললেন। তিনি বললেন যে, আফগানিস্তানে কি ধরনের সরকার গঠিত হবে, কাদের নিয়ে সেই সরকার গঠিত হবে সেটা নির্ধারিত হবে কাবুলে, বনে নয়। কিন্তু নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং জাতিসংঘের চাপিয়ে দেয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুল্লাহ্ বললেন যে, আফগানরা যখন পিটার্সবার্গে বসেছে তখন সব কিছু সেখানেই চূড়ান্ত হবে এবং অবশেষে তার কথাই খাটল।

(২) এরপর আবার কাবুল থেকে নর্দার্নের প্রধান আলোচক ইউনুস কানুনীকে বলা হল যে, আফগানিস্তানে শান্তিরক্ষার নামে কোন বিদেশী সৈন্য মোতায়েনের প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

আফগান সৈন্যরাই সে প্রয়োজন মেটাবে। ডঃ আবদুল্লাহও তখন কাবুলেই অবস্থান করছিলেন। তিনি বললেন যে, বিদেশী শান্তিরক্ষী মিশন আফগানিস্তানে মোতায়েন হবে এবং সে মোতাবেকেই সিদ্ধান্ত হল। এই দু'টি ঘটনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের মধ্যে প্রবীণ এবং নবীনদের বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করেছে। এই বিরোধে প্রথম রাউন্ডে নবীনরা প্রবীণদের কুপোকাত করেছে।

(৩) রোম গ্রুপ বলে পরিচিত পশতুনরা চেয়েছিলেন, নির্বাসিত বাদশা জহির শাহকে ৬ মাসের জন্য অস্থায়ী সরকারের প্রধান করা হোক। নর্দার্নিরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। এ অবস্থায় হামিদ কারজাই নামক এক উপজাতীয় কমান্ডারকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে প্রধান করতে হয়।

(৪) নতুন সরকারে নর্দার্ন অ্যালায়েন্সকে ১৬টি মন্ত্রণালয় দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- (ক) পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ, (খ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে জেনারেল ফাহিম, (গ) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ইউনুস কানুনী। বন সম্মেলনে যোগদানকারী ৪টি দলের মধ্যে অপর ৩টি দল হল- (ক) পেশাওয়ার গ্রুপ, (খ) সাইপ্রাস গ্রুপ, (গ) রোম গ্রুপ। প্রথমটি পাকিস্তানপন্থী, দ্বিতীয়টি ইরানপন্থী এবং তৃতীয়টি মার্কিনপন্থী। নর্দার্ন অ্যালায়েন্স রুশ-ভারতপন্থী। তালিবানদের ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন বিমান হামলা একচেটিয়া কৃতিত্বের দাবীদার। তৎসত্ত্বেও উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের সাথে ভৌগোলিক সংলগ্নতার কারণে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সহ তাজিক ও উজবেক প্রভাবিত উত্তরের জোটকে বন সম্মেলন ১৬টি মন্ত্রণালয় দিতে বাধ্য হয়েছে।

(৫) কিন্তু তারপরও উত্তরের জোটে ভাঙনের সানাই বেজে উঠেছে। এই জোটের অন্যতম শীর্ষ কমান্ডার জেনারেল আবদুর রশিদ দোস্তাম হুমকি দিয়েছেন যে, তিনি নতুন সরকারকে বয়কট করবেন। তিনি বলেছেন যে, মাজার-ই-শরীফ এবং কুন্দুজ দখলে তার বাহিনীর অবদান সবচেয়ে বেশী। তার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করার কথা ছিল। কিন্তু বন সম্মেলন শেষে এই উজবেক কমান্ডারকে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ দেয়া হয়নি। তাই তিনি নতুন সরকারকে বয়কট করবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরের জোটে আবদুল্লাহ, দোস্তাম ও রব্বানীর নেতৃত্বে ৩টি উপদল ইতোমধ্যেই খাড়া হয়ে গেছে।

(৬) হাতে গোনা যে ক'জন পশতুন নেতা তালিবানদের বিরোধিতা করছেন, তারা কোন উন্নততর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেটা করছেন না। মার্কিনী অনুকম্পা লাভ করে ক্ষমতা এবং হালুয়া-রুটি ভাগাভাগির জন্যই এটা করছে। স্বার্থ যেখানে ঐক্যের বন্ধন সংঘাত সেখানে অনিবার্য। তাই কান্দাহারের পতনের পর ২৪ ঘন্টাও অতিক্রান্ত হয়নি, দুই উপজাতীয় কমান্ডার কান্দাহারের নেতৃত্ব নিয়ে রাজপথে প্রকাশ্য একজন হলেন মোল্লা নাকিবুল্লাহ, আরেকজন হলেন গুল আগা। তারা অস্থায়ী সরকার প্রধান হামিদ কারজাইকেও কান্দাহার আসতে বারণ করছেন। বলছেন যে, তালিবানরা তাদের সাথেই আলোচনা করে ক্ষমতা থেকে সরে গেছেন, হামিদ কারজাইর সাথে নয়।

(৭) সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে, আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছোট্ট সীমান্ত শহর স্পীন বোলডাক নিয়েও কামড়াকামড়ি শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, সীমান্তের পাকিস্তান অংশের

www.pathagar.com

চমন এবং আফগান অংশে স্পীন বোলডাক অবস্থিত। এই ছোট্ট সীমান্ত শহরটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে তিনটি গোত্র। এদের মধ্যে প্রধান হল হাজী করিম খানের নেতৃত্বাধীন আচকজাই উপজাতি। মোঘল আমলে এক সময় দিল্লীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অস্বীকার করে ১২টি ভূঁইয়া অর্থাৎ ১২ জন নৃপতি স্বাধীন ভূখণ্ড ঘোষণা করেছিলেন। তালিবানরা সরে যাওয়ার পর মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, আফগানিস্তানে ৩৩ ভূঁইয়ার রাজত্ব কায়েম হবে।

(৮) তবে চূড়ান্ত পরিণামে দেখা যাবে কর্তৃত্বের সুতা কারও হাতেই নেই। এই সুতা নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে। রাশিয়ার বড় শক্তি নেই। তাই তারা নিজেরাই সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিমান শক্তি নিয়ে আফগানিস্তান দখল করেছে। তাদের আরেকটি শক্তি হল অফুরন্ত অর্থ। শত শত কোটি ডলারের বস্তাকে মুলা হিসেবে ওরা ঝুলিয়ে রেখেছে আফগানিস্তানের নতুন নেতাদের সামনে। মুলার ঐ টোপ দিয়েই তারা পশতুন নেতাদের বশে রেখেছে। তাই দেখা যায়, হামিদ কারজাইয়ের উলঙ্গ ডিগবাজি। ১২ ঘন্টা আগে তিনি সিএনএন-এর সাংবাদিককে স্যাটেলাইট ফোনে বললেন যে, কান্দাহার থেকে তালিবানদের আত্মসমর্পণের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঐ চুক্তি মোতাবেক আত্মসমর্পণ করলে মোল্লা ওমরসহ সমস্ত আফগান তালিবানকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। এই কলামিস্টসহ বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ সিএনএন এবং হামিদ কারজাইয়ের এই ভিডিও সংলাপ দেখেছেন এবং শুনেছেন। সিএনএন-এর এই সম্প্রচারের পর ৩ ঘন্টার মধ্যে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মিঃ ডোনাল্ড রামসফেল্ড সংবাদ ব্রিফিংয়ে আসেন এবং মোল্লা ওমরের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করেন। মিঃ রামসফেল্ডের এই বিরোধিতার ৫ ঘন্টা পর জনাব হামিদ কারজাই এক বিরাট ডিগবাজি মারেন। মাত্র ৮ ঘন্টা আগে প্রদত্ত বক্তব্য থেকে সরে এসে তিনি বিবিসিকে বলেন যে, মোল্লা ওমরকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়নি। তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। সুতরাং হামিদ কারজাইয়ের এই ডিগবাজি থেকে আরেকটি সত্য বেরিয়ে আসে যে, অনন্তকাল ধরে না হোক, আগামী আড়াই বছর যে সরকার ক্ষমতায় থাকবে সেটা কোন স্বাধীন-সার্বভৌম সরকার হবে না। সেটা হবে আমেরিকার পুতুল সরকার। আগামী আড়াই বছরের জন্য আফগানিস্তান হবে একটি আশ্রিত রাষ্ট্র এবং কাবুলের সরকার হবে একটি তাঁবেদার সরকার।

(৯) আফগানিস্তানে সরকারের মধ্যে থাকবে সরকার। সেই আলামত দেখা গেছে গত শনিবার। তালিবানবিরোধী সরকার তখন তোরাবোরা নামক পর্বত গুহা কমপ্লেক্সটি দখল করেছে। সিএনএন টেলিভিশনে দেখলাম, এই পর্বতরাজির কোন কোনটির শীর্ষে বাদশাহ জহির শাহ্‌র পতাকা উড্ডীন করা হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আফগানিস্তানে কোথাও উড়ছে নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের পতাকা, কোথাও উড়ছে জহির শাহ্‌র পতাকা, কোথাও হাজারা গোষ্ঠীর পতাকা, আবার অনেক স্থানে বিভিন্ন গোত্রপতির নিজস্ব পতাকা। মোট কথা, এ ক'দিনেই আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে এক ছ্যারাব্যারা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

- দুই -

পাকিস্তান সম্ভবত প্রথম মুসলিম রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রটি শুরুতেই আফগানিস্তানে মার্কিন

www.pathagar.com

হামলাকে প্রকাশ্য সমর্থন দেয়। এই সমর্থনের এনাম হিসেবে আমেরিকা জেনারেল মোশাররফের পিঠ চাপড়ে দেয়। তারা পাকিস্তানকে খুশি করার জন্য আরও বলে যে, আমেরিকার বিদেশনীতিতে পাকিস্তান এখন ফ্রন্টলাইন স্টেট বা সামনের কাতারের রাষ্ট্র। এই ধরনের কথাবার্তা শুনে জেনারেল মোশাররফের সরকারও আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওঠে। আমেরিকা আফগানিস্তানে হামলার শুরুতে পাকিস্তানের পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল কেন? কারণটি অতি পরিষ্কার। আফগানিস্তান একটি অদ্ভুত দেশ। যার চারদিকে রয়েছে ৬টি দেশ। অভিন্ন সীমান্তের এই ৬টি দেশ হল - (ক) পাকিস্তান (খ) তুর্কমেনিস্তান, (গ) তাজিকিস্তান, (ঘ) ইরান, (ঙ) উজবেকিস্তান, (চ) গণচীন। আফগানিস্তানের মোট প্রদেশের সংখ্যা ৩০টি। এর মধ্যে ৬টি দেশের সাথে সন্নিহিত প্রদেশের সংখ্যা ২০টি। সবচেয়ে বেশীসংখ্যক সীমান্ত সংলগ্ন প্রদেশ হল পাকিস্তানের সাথে। সংখ্যা ১০টি। এই ১০টির মধ্যে আবার ২টি প্রদেশ ইরান এবং তাজিকিস্তানের সীমান্তজুড়ে। প্রদেশ দু'টি হল নীমরুজ (পাকিস্তান+ইরান) এবং বাদাখশান (পাকিস্তান+তাজিকিস্তান)। ইরান সীমান্তে রয়েছে ৩টি প্রদেশ। এর মধ্যে হিরাত প্রদেশটি ইরান ও তুর্কমেনিস্তান উভয় দেশের সীমান্ত জুড়ে অবস্থিত। তুর্কমেনিস্তান সীমান্তে অবস্থিত ৫টি প্রদেশ। এখানে বালাখ প্রদেশটি উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান সীমান্তে অবস্থিত। উজবেকিস্তান সীমান্তে রয়েছে ২টি প্রদেশ। এর মধ্যে সামানগান প্রদেশটি উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান উভয় দেশের সীমান্তজুড়ে অবস্থিত। তাজিকিস্তান সীমান্তজুড়ে রয়েছে ৪টি প্রদেশ। এর মধ্যে বাদাখশান প্রদেশটি তাজিকিস্তান ও পাকিস্তান উভয় দেশের সীমান্তজুড়ে অবস্থিত। গণচীনের সীমান্তে রয়েছে মাত্র একটি প্রদেশ। নাম বাদাখশান। কিন্তু এই বাদাখশান প্রদেশের ৩ দিকে রয়েছে ৩টি দেশ। এগুলো হল—গণচীন, পাকিস্তান ও তাজিকিস্তান।

আফগান সীমান্তজুড়ে বিদেশী রাষ্ট্রের অবস্থানের এই বিস্তারিত বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, শুধু পাকিস্তান সীমান্তজুড়েই আফগানিস্তানের ১০টি প্রদেশ অবস্থিত। ইরান আমেরিকার বৈরী রাষ্ট্র। সুতরাং আফগানিস্তানের ব্যাপারে বিদেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান। অর্থনৈতিক কারণে আমেরিকাকে পাকিস্তানের যেমন প্রয়োজন তেমনি কৌশলগত কারণেও পাকিস্তানকে আমেরিকার তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন। ৩ লাখ ১৩ হাজার বর্গমাইল আয়তন, ১৪ কোটি অধিবাসী, ৬ লাখ ৮৭ হাজার সৈন্যের বিশাল সামরিক শক্তি এবং আণবিক বোমা ও নিজস্ব ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকারী সেই পাকিস্তান এবারের যুদ্ধে মাত্র ১৩০ কোটি ডলারের বিনিময়ে আমেরিকার কাছে বিক্রি হয়ে গেল? অথচ '৯০-এর উপসাগরীয় যুদ্ধে মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক বিক্রি হয়েছিলেন ৯০০ কোটি মার্কিন ডলারে। জেনারেল মোশাররফ তার বিনিময় মূল্য এত কমিয়ে দিলেন? এত সস্তায় তিনি বিক্রি হলেন? যারা নিজেদের এত হালকা করে, অন্যেরা তাদের মূল্য দেবে কেন? তাই তো দেখছি, আফগানিস্তানের অস্থায়ী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইউনুস কানুনী বন সম্মেলন থেকে সরাসরি দিল্লী গেছেন এবং সেখানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করেছেন। ওদিকে তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী (ডেজিগনেট) জনাব আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ তাজিকিস্তানে গেছেন এবং নতুন করে বুদ্ধি-পরামর্শ করেছেন। আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ'র পাকিস্তানবিদ্বেষ নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং ১৩০ কোটি ডলারের বিনিময়ে অস্তিত্বের সংকট ক্রয় করেছে পাকিস্তান সরকার। একদিকে বৈরী ভারত, আরেকদিকে বৈরী আফগানিস্তান।

www.pathagar.com

আমেরিকার সাথেও হাসিমুখ শেষ। আমেরিকা এখন উৎকটভাবে পাকিস্তানের প্রতি শীতল। সময়ের পরীক্ষিত বন্ধু তালিবানকে পাকিস্তান গলা টিপে হত্যা করেছে। সেই অপরাধের কাফ্‌ফারা দেয়ার সময় আসছে।

- তিন -

শুরুতে বলেছিলাম যে, ওসামা বিন লাদেন ও মোল্লা ওমর যদি বেঁচে থাকেন তাহলে আফগানিস্তানসহ মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির গতিধারা পাল্টে যেতে পারে। আমি ওপরের আলোচনায় দেখিয়েছি যে, মার্কিনীরা আফগানিস্তানে যেসব এলিমেন্টকে জুটিয়েছে এবং তালিবানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে ওরা সব বসন্তের কোকিল। ঈমান ও আদর্শের কোন বালাই ওদের নেই। কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে তালিবানরা ঈমান ও আদর্শের পরীক্ষা দিয়েছে এবং সেই পরীক্ষায় খাঁটি সোনা হয়ে বেরিয়ে এসেছে। শুধু আফগানিস্তান নয়, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান এবং করাচীর জনগণও তালিবানদের আদর্শনিষ্ঠতার জন্য তাদের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। বিন লাদেন এবং মোল্লা ওমরকে রক্ষার জন্য আজ তাদের জান হাজির। এখানে একটি ঘটনা বর্ণনা করছি ঃ

সীমান্ত প্রদেশের নওশেরায় একটি বাড়ীতে আমি এক রাতের মেহমান। গৃহস্বামী মধ্যবিত্ত সচ্ছল। তার রয়েছে ৪ স্ত্রী ও ১৬ জন সন্তান। শুনলাম এক সময় বিন লাদেনের সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল। ঘটনাটি বলার আগে পাঠকদের জানাতে চাই যে, পাঠান এবং বেলুচরা অসম্ভব পর্দানশীন। মহিলারা পরপুরুষের সামনে আসেন না। আর এলেও মাথা ও মুখমণ্ডল থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত বোরখায় আবৃত হয়ে আসেন। ঐদিকে আমেরিকা বিন লাদেনকে ধরার জন্য ২৫ কোটি ডলার ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানী মুদ্রায় এটি ১৫শ' কোটি রুপিয়া। আমি গৃহস্বামীকে ঠাট্টা করে বললাম, 'আপনি এই সুযোগে ১৫শ' কোটি রুপিয়া কামাই করতে পারেন, যদি ওসামা ও মোল্লা ওমরকে ধরিয়ে দেন।' শুনে ক্রোধে তাঁর চোখ জ্বলে উঠল। উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'ওসামা ও মোল্লা ওমরকে রক্ষার জন্য আমি জীবন দেব। তাতেও যদি শেষ রক্ষা না হয় তাহলে আমার চার বিবি জীবন দেবে।' এ কথা বলে তিনি তাঁর স্ত্রীদের ডাকলেন। পর্দার আড়াল থেকে চার বিবি বললেন, 'আমাদের সকলের কাছে একটি করে একে-৪৭ কালাশনিকভ রাইফেল আছে।' এই বলে একজন পর্দার আড়াল থেকে একটি কালাশনিকভ রাইফেল দিলেন। রাইফেলটি আমি নেড়েচেড়ে দেখলাম। এরপর ওরা বললেন, 'ওসামা বিন লাদেনকে রক্ষার জন্য আমরা চার বিবি শহীদ হতে প্রস্তুত। তাতেও যদি শেষ রক্ষা না হয় তাহলে আমাদের ১৬ জন সন্তান তাকে রক্ষার জন্য শহীদ হতে প্রস্তুত।'

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ রিসালপুরের একটি অস্ত্রের দোকান। এখানে পিস্তল-রাইফেলসহ বিভিন্ন হালকা ও স্মল আর্মস বিক্রি হয়। আমার পরিচয় জানতে পেরে দোকানদার বললেন, 'আমি ব্যবসায়ী। কিন্তু ওসামা এবং মোল্লা ওমরের জেহাদে শামিল হওয়ার জন্য আমি বিনা পয়সায় অস্ত্র বিলাতে রাজি আছি।' খোঁজ নিয়ে জানলাম, রিসালপুরের ঘরে ঘরে এসব অস্ত্র ছড়িয়ে রয়েছে। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ওরা প্রস্তুত।

তৃতীয় ঘটনা ঃ মালাকান্দের অন্যতম উপজাতি সরদার নূর মোহাম্মদ তার ১২শ' সশস্ত্র অনুসারী নিয়ে আফগান জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। তার অনেক অনুসারী শহীদ

www.pathagar.com

হয়েছেন। আমি মালাকান্দ যাই। তার জীবিত অনুসারীরা বললেন, 'এবার শত শত নয়, হাজার হাজার যোদ্ধা নিয়ে তারা আফগানিস্তান যাবেন। তারা আমেরিকাকে ধ্বংস করবেন।' 'তাহলে যাচ্ছেন না কেন?' উত্তর, 'আমিরুল মোমেনীনের বারণ রয়েছে।' আমিরুল মোমেনীন কে?' উত্তর, 'মোল্লা ওমর।' 'তিনি তো আফগানদের আমিরুল মোমেনীন।' 'হ্যাঁ, তবে এখন আমাদেরও।'

এই ঈমানী শক্তির সাথে ভাড়াটিয়া শক্তি কতদিন যুদ্ধ করবে? ❑

নভেম্বর '০১

লেখক ঃ কলামিষ্ট, সাংবাদিক।

টুইন টাওয়ার।

www.pathagar.com

অবিস্মরণীয় ত্যাগের, সুস্থ জীবনবোধের, মানবিকতার এবং মহত্ত্বের প্রতিকৃতি, কে এই ওসামা বিন লাদেন ?

হাফেজ ফজলুল হক শাহ্

ওসামা বিন লাদেন নিছক একটি নাম নয়, নয় কোন একক মনুষ্য শক্তি। ওসামা বিন লাদেন কোন অশান্তির তাণ্ডব নয়, নয় কোন ভয়ংকর ধ্বংসের জনক। ওসামা বিন লাদেন প্রাক্তন শতাব্দীর রক্তমাখা ইতিহাসের একটি দীর্ঘ অধ্যায়, চলমান দশকের সবচাইতে আলোচিত ব্যক্তিত্ব। ওসামা বিন লাদেন অশান্ত পৃথিবীর অস্থির পক্ষে বয়ে চলা প্রশান্তির সাইমুম, শোহাদায়ে কেরামের আদর্শস্নাত তারুণ্যদীপ্ত মনের এক মর্দে মুজাহিদ। ওসামা বিন লাদেন সম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া এক দূরন্ত কফেলার নাম, দুনিয়া কাঁপানো সিংহ হৃদয়, বীরশ্রেষ্ঠ শার্দুলের নাম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি গোয়েন্দা সংস্থার নাম (সংক্ষেপে) এফবিআই।। এই সংস্থাটি ১৯৯৮ সালে বিশ্বের দশ জন ব্যক্তিকে ফেরারী আসামী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। তন্মধ্যে ওসামা বিন লাদেন একজন। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক এ তথ্যটি বিশ্বময় প্রচার করা হচ্ছে। উক্ত সংস্থার ধারণা তিনি আফগানিস্তানের নিরাপদ পর্বতারণ্যে আশ্রিত। তাই বিশ্বের স্বঘোষিত মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র দাবী করেছে ওসামা বিন লাদেনকে অচিরেই তাদের হস্তে অর্পণ করতে হবে। আফগানিস্তানের বর্তমান তালেবান সরকার তাদের এহেন গর্হিত ও অযৌকিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার শ্বেত ভল্লুকদের ক্রুসেড আগ্রাসনে বিধ্বস্ত আফগান জাতির ওপর অবরোধ আরোপ করেছে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা। একই কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ঐকান্তিক ইচ্ছায় কথিত মানবাধিকার সংরক্ষণ সংস্থা জাতিসংঘ ১৯৯৯ সালে আফগানিস্তানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই প্রেক্ষিতে ইতিহাসে খ্যাত তৃতীয় উমর, এমরাতুল ইসলামীয়া আফগানিস্তানের মহামান্য আমিরুল মোমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, "অন্নদাতা আল্লাহ। তিনি ওপর থেকে বর্ষণ দেবেন আমরা নিচে ফসল ফলিয়ে তা ভক্ষণ

www.pathagar.com

করব এবং আল্লাহর ইবাদত করব। এতে কেউ প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর নির্মাণের বাসনা করলে আমরা কাউকে ছেড়ে কথা বলব না ইনশাআল্লাহ।"

কিন্তু কে এই ওসামা বিন লাদেন ? কি তার পরিচয় ?

কি করেন তিনি ? যার জন্যে গোটা তাগুৎ জগৎ আজ থর থর করে কাঁপছে। কেন ফেরারী আসামীর খাতায় তালিকাভুক্ত হতে হল তাকে ?

আসলে কেমন মানুষ তিনি যাকে গ্রেফতার করার জন্য আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, ব্যগ্র হয়ে উঠেছে তারা ওকে হত্যা করার লক্ষ্যে। তাই বিশ্ববাসীকে জানতে হবে কেন পৃথিবীর অপশক্তিগুলো বৈরী ভাবছে ওসামা বিন লাদেনকে। বিশ্ববাসীর জানা উচিৎ কে এই ওসামা বিন লাদেন।

দুই. পবিত্রতম শহরের দেশ সউদী আরবের বন্দর নগরী জেদ্দায় ১৩৭৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৭ সালে এক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার জন্ম। পিতার ষষ্ঠবিংশ সন্তানের মধ্যে তিনি দ্বাদশতম। পূর্ণ নাম শায়েখ ওসামা বিন মুহাম্মদ বিন আউস বিন লাদেন (হাফিযাহুল্লাহ)। তার শ্রদ্ধেয় পিতা ছিলেন সউদী আরবের প্রভাবশালী মন্ত্রী এবং বিরাট কনস্ট্রাকশন ফার্ম লাদেন গ্রুপের মালিক, যার মৃত্যুতে বাদশা ফয়সাল বিন আব্দুল আজীজ শোকাভিভূত হয়ে বলেছিলেন, আজ আমার দক্ষিণ হস্ত কর্তিত হল'।

আরবের পুরাতন ঐতিহ্য অনুযায়ী ওসামার শিক্ষা জীবন শুরু হয় কোরআন পাঠের মধ্য দিয়ে। সত্তরের দশকে ওসামা ছিলেন কিং আব্দুল আজীজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র। তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে পড়তেন। সেই সূত্রে তিনি একজন দক্ষ প্রকৌশলী। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অর্থনীতির উপরও উচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন। পিতার ইন্তেকালের পর কনস্ট্রাকশন ফার্ম লাদেন গ্রুপের দায়িত্ব হাতে নেন তিনি। অনেকে বলেন, পিতামহের কাছ থেকে তিনি এক হাজার বিলিয়ন মার্কিন ডলার পেয়েছিলেন, বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। অন্যদের ধারণা পৈতৃক সূত্রে তিনি পেয়েছেন ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমাণ একহাজার সাতশ পঞ্চাশ কোটি টাকা। তার হাতে তিনটি পবিত্র স্থান মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণের কাজ সমাধা হয়। বালক জীবন থেকেই তিনি বিলাসপ্রিয় ছিলেন না। এত বিপুল অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েও সারাজীবন তিনি সংযমী হয়ে থেকেছেন। অপরাপর আরব ধনকুবদের মত লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক, সিঙ্গাপুর কিংবা জেনেভায় অহেতুক অর্থ ও সময় নষ্ট করার পরিবর্তে তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্তি ও কল্যাণের ভাবনায়। তিনি দেশ সম্পর্কে ভাবতেন, ভাবতেন মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কেও। ওসামা সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং নিপীড়িত মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী। তাই ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে নাড়া দিয়ে উঠেছিল মানব সেবা ও জিহাদের স্পৃহা। ঠিক এ কারণেই কিং আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন লাভের পর সউদী আরবে প্রতিষ্ঠা করেন তিনি ইসলামী স্যালভেশন ফাউন্ডেশন। মূলত এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। অসহায় ও মজলুম মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানোই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।

কর্মজীবনে তিনি ইতিহাসে এবং চলমান ঘটনা প্রবাহের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণকালে গভীরভাবে লক্ষ্য করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের

www.pathagar.com

পাশাপাশি সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের ছত্রছায়ায় সাবেক সোভিয়েতে ইউনিয়ন গোটা পৃথিবীকে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। এশিয়ার এক তৃতীয়াংশ এবং ইউরোপের কিছু ভূ-খণ্ড নিয়ে কায়েম করেছে বিশাল সোভিয়েত সাম্রাজ্য। সেখানে ওরা প্রবর্তন করেছে মানব রচিত বর্বর সেক্যুলার মতবাদ। আর এই অসহিষ্ণু মূর্খ নীতির অন্তরালে একের পর এক নিধনযজ্ঞ চালিয়ে মাটির পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি করছে রক্তের দরিয়া। এছাড়াও দেশে দেশে কুফরী শক্তি কর্তৃক মুসলিম পীড়ন তাকে অতিশয় কাতর করে তোলে।

লেবানন, কাশ্মীর, আরাকান ও প্যালেস্টাইনে অবলা, নারী ও অবোধ শিশুসহ অসহায় মুসলমানদের নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের হৃদয়বিদারক ঘটনাবলী দর্শনে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। আর এ কারণেই তিনি অগ্র-পশ্চাৎ ভেবেচিন্তে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে, মুসলিম বিশ্বকে নির্যাতনমুক্ত ও ইসলামমুখী করে তুলতে হলে সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র বিরোধী মুক্তি সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে হবে।

সমসাময়িক সময়ের মধ্যে ১৯৭৯ সালে ১০০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনাবাহিনী মার্চ করলে অপ্রস্তুত আফগান মুসলমানরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। পাষণ্ড রুশ ভল্লুকদের তাণ্ডবলীলায় তারা যত্রতত্র পালাতে থাকে। মূলত সম্পূর্ণ ইসলামী ঐতিহ্য লালিত আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়ন চেয়েছিল একটি নাস্তিকপন্থী ও মার্কসবাদী দলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে। ফলে বীর শার্দূল সুলতান মাহমুদ গজনবীর যোগ্য উত্তরসূরিগণ রক্তঝরা আজাদীর ইস্পাত কঠিন শপথ গ্রহণে এক দুর্বার আন্দোলনের দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে রুশ সেনাদের ক্রুসেড আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। শুরু হয়ে যায় স্বাধীনতার খুনস্নাত এক ভয়ঙ্কর মুক্তিসংগ্রাম। বাতাসের ন্যায় এ সংবাদ তৎক্ষণাৎ বিশ্বব্যাপী প্রচার হয়ে যায়। রেডিওতে এ খবর শুনে মুসলিম দরদীপ্রাণ ওসামা বিন লাদেন শিহরিত হয়ে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন তিনি আফগান রণাঙ্গনে সংগ্রামরত মুজাহিদদের সাথে। মুহূর্তের মধ্যে প্রসারিত করেন নিংস্বার্থ সহযোগিতার উদার হস্ত। তার প্রতিষ্ঠিত ইসলামী স্যালভেশন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে হাজার হাজার বিলিয়ন ডলার অর্থের যোগান দেন, যা দিয়ে মুক্তিসংগ্রামের জন্যে ক্রয় করা হয় অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র। শুধু তাই নয়, মুসলিম উম্মাহর একটি শ্রেষ্ঠ অংশকে সার্বিক সহযোগিতা করতে ওসামা বিন লাদেন সশরীরে ছুটে আসেন রক্ত পিচ্ছিল আফগান যুদ্ধ ময়দানে। জীবন-মরণের শত ঝুঁকি নিয়ে হাতে তুলে নেন তিনি আধুনিক যুগের মরণাস্ত্রগুলো। অপরাপর বিলাসপ্রিয় সউদীদের মতো যে সময় তার হাতে থাকার কথা রঙিন পানীয় পেয়ালা, সে সময় বিশ্ববাসী দেখেছে তার হাতে শোভা পেয়েছে মুসলমানদের অস্তিত্ব চির অম্লান রাখার সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ারগুলো। অত্যাচারী পামরগোষ্ঠীকে হত্যা করার প্রবল নেশায় তিনি মসৃণ আঙ্গুলে অবিশ্রান্ত টিপতে থাকেন ক্লাশিনকভের ট্রিগার। এখানেই শেষ নয়, জানা যায়, ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসেন কয়েক হাজার সহযোদ্ধা, শত শত টন যুদ্ধোপকামী রুশ-খৃস্টান নরপশুদের শক্তিশালী বোমা, অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং রকেট লাঞ্চারের হামলার ধ্বংস এড়িয়ে যাবার মানসে সেদিন আত্মরক্ষামূলক সামান্য কিছু কিছু ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল একমাত্র তারই উদ্যোগে ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে। বানানো হয়েছিল অনেক হাসপাতালও। সেগুলোর অনেক কিছুই আজ বৃটিশ-মার্কিন হায়েনাদের নৃশংস বিমান হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্বররা প্রায়

www.pathagar.com

কিছুই আজ বাদ রাখেনি।

অপর এক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, ওসামার পিতা বিশিষ্ট আরব স্থপতি শেখ মুহাম্মদ বিন আউসের ধারণা ছিল হযরত মাহদী (আঃ)-এর আগমনের হয়তো বেশী দেরী নেই। তাই তিনি হযরত মাহদী (আঃ)-এর জিহাদী তৎপরতায় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ১২ মিলিয়ন রিয়ালের ফান্ড জমা রেখেছিলেন। তার পিতার ইন্তেকালের পর আফগানিস্তানে জিহাদ শুরু হয়। তখন তিনি সকল ভাই-বোনদের ডেকে বললেন, হযরত মাহদীর জিহাদ কবে শুরু হবে তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু আব্বা জিহাদের উদ্দেশ্যেই এই ফান্ড রেখে গেছেন। আফগানিস্তানে ইসলাম ও কুফরির জিহাদ শুরু হয়েছে, সুতরাং সেখানে আব্বার রেখে যাওয়া ফান্ড খরচ করলে জিহাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। তার প্রস্তাবে সবাই সম্মতি দিলে সব ফান্ড আফগানিস্তানের জিহাদে ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেন।

বলা বাহুল্য সে সময় পৃথিবীতে দু'টি পরাশক্তি ছিল। প্রথমটি ছিল সমাজতন্ত্রী সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং দ্বিতীয়টি বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই পরাশক্তিদ্বয় সব সময় চাইত একে অপরকে কোণঠাসা করতে কিংবা অপর পক্ষের শক্তি সমূলে বিনাশ করতে। এজন্য তারা যে কোন নীতি লংঘন এবং উপেক্ষা করতে এতটুকু কার্পণ্য ও শৈথিল্য প্রদর্শন করতো না। এমন কি স্ব স্ব রাষ্ট্রের প্রণীত সংবিধান এবং ধর্মীয় আইনের পরিধিও মাড়িয়ে যেত তারা দ্বিধাহীন চিত্তে। অহর্নিশ তারা পরস্পরের ত্রুটি ও দুর্বলতার অনুসন্ধান করতো। তাই যখন যুক্তরাষ্ট্র দেখল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়েছে আফগানিস্তানে তখন সে মুজাহিদদের প্রতি প্রসারিত করলো সাহায্যের হাত, যে সাহায্যের মধ্যে ছিল রাশি রাশি স্বার্থের গন্ধ। তার সাহায্যের পেছনে ছিল একটাই উদ্দেশ্য এবং সেটা এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যাক। তাহলে যুক্তরাষ্ট্র হবে পৃথিবীর একক পরাশক্তি। আর মূলত এ কারণেই সেদিন কুচক্রী আমেরিকা আফগান রণাঙ্গনে ওসামার আগমনকে শনান্দে স্বাগত জানিয়েছেন। যেহেতু ওসামা একজন সুবিজ্ঞ সমর কুশলী এবং প্রচুর অর্থের মালিক, সেহেতু তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সুনজরে পড়ে যান। হয়ে ওঠেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পরমপ্রিয় পাত্র। যুক্তরাষ্ট্র আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দু'হাতে সাহায্য করেছিল তার প্রিয় মিত্রশক্তি ওসামাকে। সত্যিই তিনি আফগান রণাঙ্গনে বিস্তর অবদানের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

ওসামা বিন লাদেনের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি আফগান মুজাহিদীনদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের মুখে বিশ্বের দ্বিতীয় শক্তিধর রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে অতি দুঃখজনকভাবে পরাজয়ের গ্লানি শিরোধার্য করে নিতে হয়। মার্চ করার মাত্র এক দশকের মধ্যে ১৯৮৪ সালে তারা আফগানিস্তান ছেড়ে ভীতু মেষ শাবকের মতো লেজ গুটিয়ে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। দখলদার বাহিনীর পরাজয় এবং আফগান মুক্তিসংগ্রামীদের বিজয়ের পেছনে ওসামা বিন লাদেনের অবদান ও ভূমিকা প্রসঙ্গে মার্কিন পত্রিকা দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিখেছে, 'আফগান মুজাহিদীনদের আজাদী আন্দোলনের ইতিহাস রচিত হলে দেখা যাবে, মুজাহিদীনদের প্রতি মিস্টার বিন লাদেনের নিজের অবদান, তার প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতার ফলাফল পট পরিবর্তনকারী ভূমিকা রেখেছিল।'

আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্যরা বিতাড়িত হওয়ার পর ওসামা বিন লাদেন আপন

www.pathagar.com

মাতৃভূমি সউদী আরবে ফিরে যান এবং তায়েফ ও আভায় কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু করেন। স্বল্পকালের মধ্যে উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হয় এবং ইরাকের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীরা বিজিত হয়। জাতিসংঘের আড়াল নিয়ে ইরাকের ওপর সর্বব্যাপী অবরোধ আরোপিত হয়। একই সাথে যুদ্ধ জয়ের সুযোগ নিয়ে সাহাবায়ে কেরামগণের পদসঞ্চারণে ধন্য সউদী আরবের পবিত্র ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ইহুদী, খৃস্টান তথা অমুসলিম সৈনিক ও কর্মচারীদের উগ্র চলাফেরা এবং মদ ও নারীদেহের অবাধ প্রদর্শনীসহ ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ চলতে থাকে সউদী আরবে। সব মিলিয়ে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যখন আরো একবার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঈমানী তাগিদবোধ করেন আজাদী আন্দোলনের সংগ্রামী বীর মুক্তিযোদ্ধা ওসামা বিন লাদেন। এ কারণে উপসাগরীয় যুদ্ধের স্বল্পকালের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তিনি নতুন পর্যায়ে মুসলিম উম্মাহকে জিহাদের আহ্বান জানান। ব্যাখ্যাকালে তিনি বলেন, মার্কিন সরকার অসৎ অপরাধী এবং উৎপীড়ক। সউদী আরবে অবস্থানরত অমুসলিম সৈন্যরা এমন সব কাজ করছে যেগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে চরম অন্যায়, ঘৃণ্য এবং অপরাধমূলক। তাদের জানা উচিত গোটা মুসলিম বিশ্ব তাদের পবিত্র কেবলাকে (মক্কা) আবেগের সর্বস্তরে স্থান দেয়। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীদের ঔদ্ধত্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা আজ ১২৫ কোটি মুসলমানদের কেবলাকে (সউদী আরব) দখল করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। এহেন গর্হিত অন্যায় ও আগ্রাসী আচরণের জন্যে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছি। কারণ, আমাদের ধর্মে আল্লাহর বাণীকে সর্বকিছুর উপর স্থান দেওয়া ফরজ বলা হয়েছে। আমাদের জিহাদের মূল টার্গেট সউদী আরবে অবস্থানরত মার্কিন সৈন্যরা। আমাদের ধর্ম কোন অমুসলমানকে সউদী আরবে থাকার অনুমতি দেয়নি। মুসলিম উম্মাহর জীবনে হিজরত এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ মহান ইবাদত। সত্যিই ঐ ব্যক্তি কত না ভাগ্যবান এবং মর্যাদাশীল যে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে হিজরত করে এবং দ্বীন সংরক্ষণের জন্যে প্রাণপণে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। ভাগ্যক্রমে বর্ণিত মহান ইবাদতদ্বয় ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে সম্পাদন করেছেন শাশ্বত ইসলামের মহানুভব মোহাফেজ ওসামা বিন লাদেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সহচরবৃন্দের পদাংক অনুসরণে একদিন তিনিও স্বদেশ ছেড়ে হিজরত করে চলে যান সুদানে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তাগুৎ অপশক্তি সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বজ্রদীপ্ত জিহাদের ঘোষণা দেবার অভিযোগে বিন লাদেনকে গ্রেফতারের প্রচেষ্টা চালানো হয় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক। বর্তমান সউদী শাসকগোষ্ঠীও একই কারণে তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাকে দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বলা হয়। কিন্তু তিনি সউদী সরকারের এহেন নৈতিকতা বিবর্জিত অযৌক্তিক প্রস্তাব বীরের মতো রোষভরে প্রত্যাখ্যান করেন। পরিশেষে মার্কিন সরকারের রেড সিগন্যালে সউদী শাসকগোষ্ঠী ১৯৯৪ সালে তার নাগরিকত্ব বাতিল করে। ফলে তিনি সুদানে হিজরত করতে বাধ্য হন। যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় ইরাককে সমর্থন দেবার কারণে জাতিসংঘ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা কবলিত সুদানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল বশীর এবং তার মন্ত্রী পরিষদ সম্মানিত মোহাজের ওসামা বিন লাদেনকে সাদরে গ্রহণ করেন। সুদানের সরলমতি আনসার জনসাধারণ তাকে জ্ঞাপন করেন প্রাণঢালা উষ্ণ অভ্যর্থনা। হিজরত করার পর তিনি নিজেও সুদানের

www.pathagar.com

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অনন্য অবদান রাখতে থাকেন। তাঁর আর্থিক সহায়তায় শত শত কিলোমিটার মহাসড়ক তৈরী হয়, অনেক শিল্প-কল-কারখানা গড়ে উঠতে থাকে। নিষেধাজ্ঞা কবলিত সুদানের এই উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। তাই জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র সউদী আরবসহ কয়েকটি মুসলিম দেশ সুদান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যেন তিনি বিন লাদেনকে সুদান ত্যাগে বাধ্য করেন। এ সময় তাকে হত্যার চেষ্টাও চালানো হয় বলে তিনি সিএনএনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন।

ওসামা বিন লাদেনের জীবননাশের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর সুদানের ওপর মার্কিন হামলার আশঙ্কা বাড়তে থাকে। অসহায় সুদানবাসীর ওপর আরোপিত হয় আন্তর্জাতিক অবরোধ। ওসামা জীবনকে ভালবাসেন। জীবনের প্রতি তার রয়েছে প্রগাঢ় মমত্ববোধ। তাই নিজের জীবন অপেক্ষা সুদানের মতো একটি ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্র এবং ওখানকার শক্তিহীন জনতার জীবনকে তিনি অধিক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানে দ্বিতীয়বার হিজরতের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। জাতিসংঘ ওসামার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদে মদদ দেবার মিথ্যা অভিযোগের কলংক আরোপ করে। সেসবই মাথায় নিয়ে ১৯৯৬ সালের ১৮ মে তিনি সুদানের রাজধানী খার্তুম থেকে জালালাবাদের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার হিজরত করেন। তিনি আফগানিস্তানের জালালাবাদে পৌঁছানোর মাত্র চার মাস পরই তালেবান বাহিনী ১৯৯৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর স্বজাতির বিশ্বাসঘাতক ফ্যাসিস্ট রাব্বানী সরকারের প্রশাসনিক শহর আফগান রাজধানী কাবুল দখল করে নেন।

বর্তমানে ওসামা বিন লাদেন এমারাতুল ইসলামীয়া আফগানিস্তানের মহামান্য আমিরুল মোমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের সম্মানিত অতিথি হিসেবে আশ্রিত। তিনি সেখানে সশস্ত্র তালেবানদের অতন্দ্র প্রহরার মধ্যে অবস্থান করছেন। তাঁকে আশ্রয় দেবার নিমিত্তে গৃহযুদ্ধে বিপন্ন মুসলিম দেশ আফগানিস্তানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে অতীতের স্বার্থবাজ মিত্রপ্রতিম দেশ আমেরিকা। গোটা পৃথিবী জানে সোভিয়েত ইউনিয়নকে টুকরো টুকরো করার স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্র বন্ধু সেজে সুকৌশলে একদিন কতই না একান্ত কাছের দেশ ছিল আফগানিস্তান। আজ সে প্রয়োজন শেষ হয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্র অতীতকে ভুলে একদিনের চরম হিতৈষী আফগান জাতির মাথার ওপর খড়গ উত্তোলন করছে। খড়গ হানছে চরম নিষ্ঠুরের পরিচয় দিয়ে। হায়রে পামরগোষ্ঠী! হায়রে ইয়াহুদ ও নাসারা সম্প্রদায়! সত্যিই কত নীচু এবং সংকীর্ণ মন-মানসিকতা এদের। এরা জানে না কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে, জানে না পরোপকারী বন্ধুর প্রতিদান দিতে। বস্তুত অকৃতার্থ আর কাকে বলে!

ওসামা বিন লাদেনের উপরই বা কি কম করেছে ওরা। অপবাদ দিয়ে কুৎসা প্রচার করেছে। দেশছাড়া করেছে। সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। সর্বোপরি হুমকি দিয়েছে এবং প্রচেষ্টাও চালাচ্ছে তাকে হত্যা করার জন্যে। কিন্তু অতিসাধারণ একজন মুসলমানকে নিয়ে বিশ্বব্যাপী কেন এত হৈ চৈ। তাগুত জগতের ধারণা তিনি একজন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নেতা। তবে মুসলিম উম্মাহর মতে তিনি একজন রোমান্টিক হিরো, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তিসংগ্রামের বীর যোদ্ধা, আজাদী আন্দোলনের জীবন্ত ইতিহাস, খুনঝরা ইসলামী সমরসমূহের রক্তাক্ত অধ্যায়। তিনি এক জীবন্ত কিংবদন্তী, মুজাহিদীনদের জন্যে অত্যুজ্জ্বল আদর্শ, জিহাদের রক্তসিক্ত ময়দানে তিনি এক শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

অংশ।

সত্যিই ভাবতে ভীষণ কষ্ট লাগে, কাফেরদের অকথ্য অত্যাচারে আজ মুসলমানদের সংখ্যা কমে আসছে, ধরাপৃষ্ঠ হতে সরে যাচ্ছে একের পর এক মুসলমান। তারপরও কি করে ১২৫ কোটি মুসলমান মৌন ভূমিকা পালন করতে পারে। কোন খোঁড়া যুক্তির আশ্রয়ে নীরব আজ বিশ্বমুসলিম উম্মাহ্‌র বিবেক। ওসামা বিন লাদেন আর যাই হোন না কেন তিনি একজন মুসলমান। তিনি ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল নির্বিশেষে সকল মুসলমানদের ভ্রাতা। তাঁর প্রতি কাফেরদের অত্যাচার এবং আমাদের নীরবতা মানে গোটা মুসলিম জাতির চরম অপমান। আর এই অপমানের নিরেট গ্লানি কী করে সহ্য করে ফিরছে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্‌। আমাদের নিদ্রিত বিবেক কি আদৌ জাগ্রত হবে! আমরা কি গড়ে তুলতে পারব না এর বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ। বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্‌র বিবেকের কাছে এই আমাদের জিজ্ঞাসা। আসলে জাতির কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া দরকার।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গণমানুষ যখন বুকফাটা কান্নায় আহাজারি করছে, আফগান ভাই-বোনদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে যখন উম্মুখ হয়ে উঠেছে, অনেকে যাচ্ছেনও, তখন অনেক মুসলিম দেশেরই সুবিধাভোগী একটি শ্রেণী নির্বিকারচিত্তে ইসলামের ওপর, আফগান গণমানুষের ওপর এই হামলা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তাদের যেন কিছুই করার নেই একমাত্র নরপশুদের সহযোগিতা করা ছাড়া। তবে ইহুদী-খ্রীস্টানরা কার্যত যে ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেড ঘোষণা করেছে, সেটা প্রতিহত করার জন্য শাহাদাতবরণ করার মত মানুষের অভাবও মুসলমান সমাজে হবে না। জেহাদের ডাকে তারা ঠিকই সাড়া দেবেন। ইতোমধ্যেই অনেকেই দিয়েছেন। ❑

নভেম্বর '০১

লেখক ঃ প্রাবন্ধিক।

www.pathagar.com

হাজার বছরের বীরের জাতি আফগান পরাজয় যাদের কখনো স্পর্শ করেনি

মোহাম্মদ নূর

আফগানিস্তানে লড়াইয়ের ইতিহাস হাজার বছরের। এই ইতিহাস যুদ্ধের, সংঘাতের। বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিরামহীন যুদ্ধ করে চলেছে এই আফগান জাতি। যুদ্ধ যেন তাদের ললাট লিখন হয়ে গিয়েছে। শুধু বহিঃশত্রুই নয়, গৃহযুদ্ধ, উপজাতীয় লড়াই, হানাহানি তাঁদের শান্তিতে থাকতে দেয়নি। সর্বোপরি বিদেশী আগ্রাসন ও অপশক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ের গৌরব গাঁথার যে ইতিহাস তাদের রয়েছে, তা পৃথিবীর যে কোন জাতির জন্য ঈর্ষণীয়। আফগানিস্তানের আয়তন ঃ ৬ লাখ ৪৭ হাজার ৫০০ কিঃ মিঃ। সীমাঃ উত্তরে তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, পূর্ব ও দক্ষিণে চীন ও পাকিস্তান আর পশ্চিমে ইরান। জনসংখ্যা ঃ ২ কোটি ৫৮ লাখ। জাতি ঃ পশতু ৩৮%, শিয়া ১৫%, অন্যান্য ১%। জন্মহার ৩.৫৪%। গড় আয়ুঃ ৪৭ বছর, মাথাপিছু আয় ঃ ২৩০ ডলার। শিক্ষার হার ঃ পুরুষ-৪৭%, নারী ১৫%।

আফগানিস্তান এশিয়ার একটি পার্বত্যদেশ। এ দেশের অধিকাংশ পর্বতই ১২২০ মিটারের বেশি উঁচু। ১৮শ' শতাব্দীতে আফগানিস্তান নামকরণ করা হয়। পূর্বে এ দেশের নাম ছিল এরিয়ানা। বিভিন্ন ইতিহাসের আলোকে দেখা যায় প্রায় ১ লাখ বছর আগে আফগানিস্তানে জনবসতি ছিল। জীবনধারণের জন্যে ধীরে ধীরে এরা কৃষিকাজ এবং সমাজবদ্ধভাবে ' বসবাস করতে শুরু করে। খ্রীস্টপূর্ব প্রায় ১৫শ' বছর পূর্বে আর্যরা আফগানিস্তান আক্রমণ করে এবং নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালায় এবং এখানেই বসতি গড়ে তোলে। খ্রীস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে বেকট্রিয়া নামের আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চল পারস্য সম্রাট দখল করে। এরা খ্রীস্টপূর্ব ৩৩০ অব্দ পর্যন্ত দেশটি শাসন করে। খ্রীস্টপূর্ব ২৪৬ অব্দে বেকট্রিয়ার অধিবাসীরা পারস্য শাসনমুক্ত হয়। এরপর ১৫০ বছর বেকট্রিয়া স্বাধীন সাম্রাজ্য হিসেবে শাসিত হয়। উল্লেখ্য, খ্রিস্টপূর্ব ৩২৯-৩২৬ সনে গ্রীক মহাবীর আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট আফগানিস্তানে অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গোটা বিশ্বে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটতে থাকলে, তার প্রভাব আফগানিস্তানে প্রতিফলিত হয়। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে আফগানিস্তানে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটতে থাকে এবং ৮ম

www.pathagar.com

শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এ ধর্মের প্রভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। মূলত ৩৬২-১১৪০ সন পর্যন্ত গজনবী সম্রাট এখানে ইসলাম প্রচার করেন। ৯শ থেকে ১২শ' শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ব পারস্য ও মধ্য এশিয়ার তুর্কিরা আফগানিস্তান শাসন করে। ১২১৯-২১সালে ইতিহাসখ্যাত মঙ্গল শাসক চেঙ্গিস খাঁ আফগানিস্তান আক্রমণ করে দখল করে নেন। ১৫শ' শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিয়ে পারস্য সম্রাট ও মোগল সম্রাটদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ১৭৮৭ সালে আহমদ শাহ আবদালী আফগানিস্তানকে একটি স্বাধীন সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে সম্মিলিতভাবে একক নেতৃত্বে দেশ পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করেন। ১৮শ' শতাব্দীর প্রথমার্ধে আফগানিস্তান দখল নিয়ে ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ১৮৩৯ সালে ব্রিটেন আফগানিস্তানে সৈন্য প্রেরণ করে। ১৮৩৯-৪২সাল পর্যন্ত প্রথম অংলো-আফগান যুদ্ধে আকবর খান ব্রিটিশদের পরাজিত করেন। এই যুদ্ধই 'এংলো-আফগানিস্তান যুদ্ধ-২' নামে পরিচিতি পায়। ১৮৪২ সনে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলেও ১৮৭৮ সালে পুনরায় ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধ এংলো-আফগান যুদ্ধ-২ নামে পরিচিতি পায়। ১৮৭৮-৮০ সন পর্যন্ত এই ব্রিটেন আফগান পররাষ্ট্র নীতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। আমীর আবদুর রহমানকে ব্রিটিশ প্রেসিডেন্ট রাখতে সম্মত হয়। ১৯১৯ সালে তৎকালীন আফগান আমীর ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধ 'এংলো-আফগান যুদ্ধ-৩' নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষতির পর ব্রিটেন ১৯১৯ সালের আগস্ট মাসে আফগানিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দানে বাধ্য হয়। ১৯২৬ সনে আমীর আমানুল্লাহ আফগানিস্তানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৬ সালে এ দেশটি জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। আফগানিস্তানের শেষ রাজা ছিলেন জাহির শাহ। তাঁর পিতা নাদির শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯৭৩ সালের ১৭ জুলাই এক সামরিক অভ্যুত্থানে রাজার শ্যালক জেনারেল মোহাম্মদ দাউদ খান ক্ষমতা দখল করেন। তিনি রাজতন্ত্র বিলোপ করে আফগানিস্তানকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং নিজেকে এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৯৭৮ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট দাউদ নিহত হন। লেঃ জেঃ কাদিরের নেতৃত্বে আফগানিস্তানের বিপ্লবী পরিষদ নতুন রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নূর মোহাম্মদ তারাকীর নাম ঘোষণা করে। ১৯৭৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট নূর মোহাম্মদ তারাকীকে অপসারিত করে হাফিজ উল্লাহ আমিন ক্ষমতা দখল করেন। ২৭ ডিসেম্বরের অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট হাফিজউল্লাহ আমিন ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন এবং বাবরাক কারমাল প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৭৯ সালে বাবরাক কারমালের অনুরোধে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্য প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে তারা দেশটিতে আগ্রাসন চালাতে থাকে। বাবরাক কারমালের পর জনাব নজিবুল্লাহ প্রেসিডেন্ট হন। ১৯০ সালে স্বাধীনতার পক্ষের ইসলামী গোষ্ঠীগুলোর জোট মুজাহিদীন' আগ্রাসী সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রায় এক দশক ধরে জানবাজি রেখে লড়াই করে। অবশেষে আফগান মুজাহীদ বীরদের বীরত্বের কাছে নতিস্বীকার করে রাশিয়া আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে বাধ্য হয়। ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত বাহিনীর সর্বশেষ দলটি আফগানিস্তান ছাড়ে। ১৯৯২ সালের ১৬ এপ্রিল নাজিবুল্লাহ'র কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটে। অতঃপর মোজাহেদীন গ্রুপের নেতা সিবগাতুল্লাহ মোজাদ্দেদী ও পরে বুরহানুদ্দীন রব্বানী প্রেসিডেন্ট এবং গুলবুদ্দিন

www.pathagar.com

হেকমতিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৯২-৯৪ সালে গোষ্ঠীগত লড়াইয়ে রাজধানী কাবুলেই ৫০ হাজার লোক নিহত হন। যুদ্ধরত বাহিনীরা শান্তিচুক্তি করলেও লড়াই অব্যাহত থাকে। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে সামনের কাতারের ইসলামী গোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে অপেক্ষাকৃত পেছনের কাতারের ইসলামী মনোভাবসম্পন্ন তরুণদের জোট তালেবান গোষ্ঠী কাবুল আক্রমণ করে দখল করে নেয়। তারা তাদের নিজস্ব আইন জারি করে ৬ সদস্যবিশিষ্ট শাসন পরিষদ গঠন করে। অতঃপর বিভিন্ন দেশ কর্তৃক স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করে। তাৎক্ষণিকভাবে প্রথম পাকিস্তানই আফগানিস্তানকে স্বীকৃতি দেয়। অতঃপর স্বীকৃতি দেয়। বর্তমানে খোঁড়া অজুহাতে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আফগানদের হাজার বছরের ইতিহাসে পরাজয়ের গ্লানি কখনো তাদের স্পর্শ করেনি। মার্কিন বিরোধী যুদ্ধে আফগানরাই জয়ী হবে ইনশাআল্লাহ। ❑

নভেম্বর '০১

লেখক ঃ সাংবাদিক

মানবতার কাছে জিজ্ঞাসা...............

www.pathagar.com

কাবুলের পতন ও আফগানিস্তানের ভবিষ্যত রাজনীতি

ড. তারেক শামসুর রেহমান

আফগান যুদ্ধ শুরু হওয়ার একমাস ছয়দিন পর তালেবান বিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোটের হাতে কাবুলের পতন ঘটলো। গত ১৩ নভেম্বর তালেবান যোদ্ধারা কোনোরকম যুদ্ধ ছাড়াই কাবুল ছেড়ে চলে যায়। এর আগে গত ৭ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে বোমাবর্ষণ করার মধ্য দিয়ে আফগান যুদ্ধের সূচনা করে। যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের তালেবান শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী কিন্তু কাবুলে প্রবেশ করে নি। যুদ্ধ শুরু করার শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে স্থল বাহিনী পাঠালেও তার সংখ্যা খুব বেশি ছিলো না। মাত্র কয়েকজন সৈন্য তালেবান বিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নিয়ন্ত্রণাধীন মাজার-ই-শরীফ এলাকায় অবস্থান নিয়েছিলো। শেষের দিকে তাদের সঙ্গে ব্রিটেনের কিছু সৈন্যও যোগ দেয়।

বড়ো ধরনের সরাসরি যুদ্ধে এরা অংশ নেয় নি। ১৯৯৭ সালের মে মাসে তালেবান বাহিনী মাজার-ই-শরীফ দখল করার মধ্য দিয়ে সমগ্র আফগানিস্তানে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলো। আজ চার বছর পর সেই মাজার-ই-শরীফ দিয়েই তালেবান বাহিনীর পতনের যাত্রা শুরু হলো। গত ৯ নভেম্বর জেনারেল দোস্তম পুনরায় তালেবানদের উৎখাত করে মাজার-ই-শরীফ-এ তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তালেবানরা মাজার-ই-শরীফ দখলের আগে এই শহরসহ উত্তরাঞ্চলের বিশাল এলাকা জেনারেল দোস্তামের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। তিনি সেখানে একটি 'মিনি রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে ছিলো তার নিজস্ব প্রশাসন। সেখানে তিনি আলাদা মুদ্রা ও কর ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেছিলেন। ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বুরহানউদ্দিন রাব্বানীকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তোলেন উত্তরাঞ্চলীয় জোট।

যুক্তরাষ্ট্র আফগান যুদ্ধ শুরু করার আগে উত্তরাঞ্চলীয় জোট সীমিত আকারে তালেবান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছিলো। তবে তারা বড়ো ধরনের সাফল্য পায় নি। যুক্তরাষ্ট্র উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে প্রকাশ্যে সমর্থন করায় ও তাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার পরই এই জোট তালেবানদের বিরুদ্ধে বড়ো ধরনের সাফল্য পেলো। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইঙ্গ-মার্কিন বিমান হামলা ছাড়া উত্তরাঞ্চলীয় জোটের

www.pathagar.com

পক্ষে কাবুল দখল করা সম্ভব ছিলো না। ১৯৮৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি শেষ সোভিয়েত সৈন্যটি আফগানিস্তান ত্যাগ করে গেলে ডা. নাজিবুল্লাহ'র নেতৃত্বে সেখানে একটি সরকার গঠিত হয়। কমিউনিস্ট প্রভাবাধীন এই সরকারকে উৎখাত করে মুজাহিদিনরা কাবুলের ক্ষমতা দখল করে ১৯৯২ সালের ১৫ এপ্রিল। কিন্তু মুজাহিদদের নেতৃত্বের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও ক্ষমতালিপ্সায় সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। এর পরিণতিতেই মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত তালেবান বাহিনী তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে।

বিশাল এক এলাকা নিয়ে আজকের আফগানিস্তান রাষ্ট্র। আয়তনে ৬ লাখ ৫২ হাজার ২শ' ২৫ বর্গ কিলোমিটার, বাংলাদেশের চেয়ে ৪ গুণ বড়ো। দেশটি পাহাড়-পর্বতে ঘেরা ও বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিভক্ত। এখানে রয়েছে ৩১টি প্রদেশ। এক প্রদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য প্রদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির আদৌ কোনো মিল নেই। তবে এ দেশের মানুষ অত্যন্ত ধর্মভীরু। ১৯৭৮ সাল থেকেই দেশটিতে গৃহযুদ্ধ চলে আসছে। যার শেষ আজো হয় নি। জনসংখ্যায় পাসতুনরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, শতকরা ৪০ ভাগ। এর পরে রয়েছে তাজিক শতকরা ২৫ ভাগ, হাজরা শতকরা ১৫ ভাগ, উজবেক ৫ ভাগ। পাসতুনরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণে বরাবরই আফগান রাজনীতি এদের নিয়ন্ত্রণে। তালেবানদের ধর্মীয় নেতা অর্থাৎ আমীরুল মুমেনীন হচ্ছেন-মোল্লা ওমর। তিনি নিজেও পাসতুন এবং তালেবানদের অধিকাংশই হচ্ছেন পাসতুন গোত্রভুক্ত। ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট, যিনি এখন উত্তরাঞ্চলীয় জোটের অন্যতম নেতা বুরহানউদ্দীন রাব্বানী কিন্তু আবার পাসতুন গোত্রভুক্ত নন, তিনি তাজিক উপজাতির লোক। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আরেক যুদ্ধবাজ নেতা গুলবুদ্দিন হেকমাতিয়ার অবশ্য পাসতুন উপজাতির লোক। আর দোস্তাম এসেছেন উজবেক উপজাতি থেকে। গোত্র, উপজাতিকেন্দ্রিক এই দেশটি বিভিন্নভাবে বিভক্ত। তবে তালেবানদের মধ্যে পাসতুনদের প্রাধান্য থাকলেও, অন্যান্য উপজাতির মধ্যেও তালেবানদের প্রভাব রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের নিয়েই গঠিত হয়েছে এই তালেবান বাহিনী।

কাবুলের পতনের পর যে প্রশ্নটি বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে, তা হচ্ছে কী হতে যাচ্ছে আফগানিস্তানে এখন। একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কথা বলা হচ্ছে। জাতিসংঘ এই উদ্যোগটি নিচ্ছে। বলা হচ্ছে, জাতিসংঘ অন্তত দু'বছরের জন্যে সর্বমহলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পক্ষপাতি। প্রশ্ন হচ্ছে, কে নেতৃত্ব দেবেন এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ? রোমে নির্বাসিত সাবেক রাজা জহির শাহ, না কি অন্য কেউ ? এটা এখন অনেকের কাছেই স্পষ্ট যে, যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন চাচ্ছে জহির শাহ্ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্ব দিক।

ইতোমধ্যে একাধিকবার যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের প্রতিনিধিরা জহির শাহের সঙ্গে দেখা করেছেন। জহির শাহ বিভিন্ন মিডিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতকারে তার কাবুলে ফিরে গিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করার আগ্রহের কথাও জানিয়েছেন। তবে সমস্যা হচ্ছে তার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। নিঃসন্দেহে তিনি সাধারণ আফগান জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য কিন্তু উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কাছে তিনি তেমন গ্রহণযোগ্য নন। ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বুরহানউদ্দিন রব্বানী ইতোমধ্যে কাবুলে ফিরে এসেছেন। তিনি তার প্রতিক্রিয়ায়

www.pathagar.com

জানিয়েছেন বাদশাহ্ জহির শাহ কাবুলে ফিরে আসতে পারেন। তবে তাকে সাধারণ নাগরিক হিসেবে জীবনযাপন করতে হবে। অর্থাৎ স্পষ্টতই রব্বানী জহির শাহের ক্ষমতা গ্রহণের বিরোধিতা করছেন। অনেকেরই মনে থাকার কথা ১৯৭৩ সালে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে জহির শাহ্ রোমেই নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন। তার বয়স এখন ৮৫। এ বয়সে সাধারণত কেউই দায়িত্ব নেন না। বয়সটা তার জন্যে সমস্যা হলেও, এই মুহূর্তে তিনি ছাড়া আফগানিস্তানে কোনো বিকল্প নেতৃত্বও নেই। তাই ঘুরে-ফিরে তার নামই আসছে। অতীতেও তিনি তার আগ্রহের কথা জানান নি। এবারে অবশ্য প্রেক্ষাপট ভিন্ন। উপরন্তু রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ। এ কারণেই তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়েছেন। তবে আদৌ তিনি দায়িত্ব নেবেন কিনা- তার কোনো ফয়সালা হয় নি।

উত্তরাঞ্চলীয় জোট তালেবানের কোনো বিকল্প নয়। এখানে ব্যাপক জাতিভিত্তিক একটি সরকার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে। সে ক্ষেত্রে তালেবানদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায় কিনা- সে বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হতে পারে। তবে বলাই বাহুল্য, মোল্লা ওমরের প্রভাবাধীন তালেবান জাতিসংঘ কিংবা পশ্চিমা সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। মোল্লা ওমরকে বাদ দিয়ে তালেবানদের মধ্যে যদি বিকল্প নেতৃত্ব তৈরি হয়, তাহলে তা কিছুটা হলেও পশ্চিমা সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে। তবে আদৌ বিকল্প তালেবান নেতৃত্ব তৈরি হবে কি না, তা রীতিমতো প্রশ্ন হয়েই থাকবে।

পাকিস্তানও চায় আফগানিস্তানে যে ব্যাপক জাতিভিত্তিক সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে, তাতে তালেবানদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হোক। পাকিস্তানের এই যুক্তি ফেলে দেবার মতো নয়। কেন না তালেবানরা কাবুলসহ অন্যান্য প্রদেশ থেকে বিতাড়িত হলেও, তাদের শক্তি পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে গেছে-তা বলা যাবে না। এরা আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধকে প্রলম্বিত করতে পারে। এরই মাঝে তালেবানরা পাহাড়-পর্বতে চলে গেছে। এখানে বসে তারা গুপ্ত হামলা চালাবে। আর পাহাড়-পর্বতের গুপ্তস্থান থেকে তাদের বের করে আনা হবে কঠিন একটি কাজ। সুতরাং ভয়টা থেকেই গেলো। কাবুলে একটি ব্যাপক প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও, গৃহযুদ্ধ অবসান হওয়ার পরিবর্তে তা আরো বিস্তৃত হবে এখন।

তালেবান পরবর্তী কাবুলে যে সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে, তাতে সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন উপদলকে অন্তর্ভুক্ত করলেই চলবে না বরং একই সঙ্গে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিনিধিদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। না হলে শিয়া সাম্প্রদায়ভুক্তরা ইরানের সহযোগিতায় নয়া সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারে। বুরহানউদ্দিন রব্বানী ও তার দল জামাতে ইসলামী নিঃসন্দেহে আফগানিস্তানে একটি শক্তি। রব্বানী তাজিক উপজাতির লোক ও সমর্থকদের একটি বড়ো অংশ ছড়িয়ে আছে বাদাখাস্তান প্রদেশে, পাঞ্জাহার উপত্যকা, বাগলাব ও তাকহার প্রদেশে। প্রয়াত সেনা কমান্ডার আহমেদ শাহ্ মাসুদ ছিলেন তার ক্ষমতার উৎস। মাসুদের অবর্তমানের তার সামরিক শক্তি কিছুটা দুর্বল হয়েছে, সন্দেহ নেই তাতে। এক সময় গুলবুদ্দিন হেকমাতিয়ার ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিলেন। ১৯৯২ পরবর্তী সরকারে তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হলেও, তিনি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি। তিনি নিজে পাসতুন ও কট্টরপন্থী সংগঠন হিজবে-ই ইসলামী গ্রুপের নেতা। বাগলান, কুনার, পাঞ্জাহার, কুন্দুজ প্রভৃতি প্রদেশে তার ব্যাপক

www.pathagar.com

জনপ্রিয়তা রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে তিনি কিছুটা নিষ্ক্রিয় ও তেহরানে নির্বাসিত জীবনযাপন করেছেন। কাবুল পতনের পর তার সমর্থকরা আরো সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং কোথাও কোথাও স্থানীয় ক্ষমতা দখল করে প্রশাসনিক কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেছে। তালেবান পরবর্তী আফগান রাজনীতিতে হেকমাতিয়ার একটি বড়ো ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাবে সব কিছু নির্ভর করছে তেহ্রানের ওপর। তার গতিনিধি এখন ইরান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। একমাত্র ইরান সরকারের ইচ্ছায়ই তিনি তেহ্রানে ফিরে যাবেন। এ ক্ষেত্রে তেহ্রান হেকমাতিয়ারকে ভবিষ্যত আফগান সরকার তথা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। ইতোমধ্যে হেকমাতিয়ারের বক্তব্যে এমন আভাসও পাওয়া গেছে যে, হেকমাতিয়ার যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী একটি অবস্থান গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। অতীতেও হেকমাতিয়ার জহির শাহ বিরোধী আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। তিনি চান না ভবিষ্যত রাজনীতিতে জহির শাহ-এর কোনো ভূমিকা থাকুক। সুতরাং আফগানিস্তানের ভবিষ্যত রাজনীতিতে হেকমাতিয়ার কী ভূমিকা পালন করেন, সেটাই দেখার বিষয় এখন।

আরো একজনের ভূমিকা লক্ষ্য করার বিষয়। তিনি হচ্ছেন ইউনুস খালিস। তিনি হিজবে-ইসলামী অপর গ্রুপের নেতা। সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়ে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। তালেবান শাসনামলে অনেকের মতো ইউনুস খালিসও কাবুল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। সম্প্রতি উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কাবুল অভিযানে তার নামও উল্লিখিত হয়েছে। তালেবান পরবর্তী কাবুলে খালিস একটি বড়ো ভূমিকা পালন করবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

আফগানিস্তানের ঘটনাবলী জাতিসংঘের ভূমিকাকে আবার সামনে নিয়ে এলো। যে সরকারই এখন কাবুলে গঠিত হোক না নেনো, সেই সরকারে জাতিসংঘের একটি ভূমিকা থাকবে। ন্যূনতম দু'বছরের জন্যে জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে এই সরকার আফগানিস্তনের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করবে। এই সময়ে একটি 'লয়া জিরগা' বা জাতীয় পরিষদ গঠিত হবে। জাতীয় পরিষদই পরবর্তী নেতৃত্ব নির্বাচিত করবে। জাতিসংঘের এই ভূমিকা নতুন নয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত কম্পুচিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্যে ১৯৯২ সালে সেখানে আনটাক (UNTAC-United Nations Transitional Authority in Combodia) গঠিত হয়েছিলো। আনটাকের নিয়ন্ত্রণে ১৯৯৩ সালে সেখানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ও নির্বাচনের পর সেখানে একটি জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছিলো। এল সালভাদরেও জাতিসংঘ একই ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে।

দীর্ঘ পাঁচবছরের তালেবানী শাসনের অবসানের মধ্যদিয়ে আফগান রাজনীতিতে পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছে। কিন্তু আফগানিস্তান সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা বলার সময় এখনও আসে নি। কেননা তালেবান যোদ্ধারা নতুন করে গেরিলা যুদ্ধের সূচনা করেছে। যুক্তরাষ্ট্র এখন অবধি ওসামা বিন লাদেনেকে কিংবা মোল্লা ওমরকে গ্রেফতার করতে পারে নি। উপরন্তু লাদেনের আল-কায়দার নেটওয়ার্কও ধ্বংস করা সম্ভব হয় নি। উপরন্তু লাদেন ও ওমর যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঘোষিত জেহাদ অব্যাহত রাখার কথাও ঘোষণা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিলেও কাবুলে তাদের

www.pathagar.com

টোকেন উপস্থিতি থেকে যাবে এবং তালেবানদের আক্রমণের শিকারে পরিণত হবে। ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যের উপস্থিতি সেখানে দীর্ঘ গেরিলা যুদ্ধের জন্ম দেয়। সেই যুদ্ধের অবসান হয় নি কখনও। আজ কাবুলের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে তালেবানদের বিদায়ের মধ্যদিয়ে সেখানে আবার নতুন করে নতুন আঙ্গিকে গেরিলা যুদ্ধের সূচনা হলো। কাবুলের পতন তাই মনে করিয়ে দিলো এই দেশটির জন্যে আরো অনেক দুঃখ অপেক্ষা করছে। ❑

১৯ নভেম্বর' ০২

লেখক ঃ আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক।

এই মৃত্যুর দায় কার!

www.pathagar.com

আফগানিস্তান কোন পথে ?

(দুই)

বন সম্মেলনে আফগানিস্তান প্রশ্নের একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও যে প্রশ্নটি এখন বিভিন্ন মহলে আলোচিত হচ্ছে, তা হচ্ছে কোন পথে এখন আফগানিস্তান ? অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে জাতিগতভাবে বিভক্ত আফগানিস্তানের ঐক্য কি টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে? কিংবা তালেবান পরবর্তী কাবুল সরকার আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা পেলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠ পশতুনদের কাছে তারা গ্রহণযোগ্য হবে কি ? নাকি শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তান ভেঙে যাবে ? এসব প্রশ্ন এখন বিভিন্নমহলে আলোচিত হচ্ছে এবং একটি প্রশ্নের সঙ্গে অন্য প্রশ্নটিও প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত। উল্লেখ্য, স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিশাল যুগোস্লাভিয়া রাষ্ট্রটি ভেঙে যায়। সার্ব, ক্রোট, মুসলমানদের নিয়ে যে রাষ্ট্র (বাংলাদেশের চাইতে প্রায় দ্বিগুণ) ১৯২৯ সালের পর থেকে যুগোস্লাভিয়া নামে পরিচিত ছিল, ১৯৯২ সালের পর জাতিগতভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। মুসলমানরা বসনিয়া-হারজেগোভিনায়, ক্রোটরা ক্রোয়েশিয়ায় তাদের আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আর সার্বরা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রয়ে যায় সার্বিয়ায়। কিন্তু সার্বিয়া কর্তৃক একটি গ্রেটার সার্বিয়া রাষ্ট্র গঠন করার অভিপ্রায় এ অঞ্চলে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বসনিয়া-হারজেগোভিনায় মুসলমান মেয়েদের গণহত্যা আর উচ্ছেদ অভিযানের খবরে সারা বিশ্বের মানুষ স্তম্ভিত হয়েছিল। এর পরের খবর ছিল কসোভোয়, যেখানে সার্বিয় নিরাপত্তা বাহিনী সেখানে বসবাসরত আলবেনীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যা পরিচালনা করেছিল।

এক পর্যায়ে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ন্যাটোর বিমান বহর কসোভোয় সার্বিয় অবস্থানের ওপর বোমা বর্ষণ পর্যন্ত করেছিল। আজকে বসনিয়া কিংবা কসোভোয় পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু জাতিগত দ্বন্দ্বের পুরোপুরি অবসান সেখানে হয়নি। আজ প্রশ্নটা এসেছে আফগানিস্তানে কি আমরা যুগোস্লাভিয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছি ? যুগোস্লাভিয়ার মত কি আফগানিস্তানও ভাগ হয়ে যাবে ? ইতোমধ্যে পশ্চিমা বিশ্বে বলা হচ্ছে আফগানিস্তানের শান্তি নিশ্চিত করার স্বার্থে দেশটি উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল এ দু'ভাগে ভাগ করা হোক। পরিস্থিতি সেদিকে যাচ্ছে কি না,

www.pathagar.com

তা এ মুহূর্তে বলা খুব কঠিন। কিন্তু জাতিগত দ্বন্দ্বের খবরটি সেখানে প্রাধান্য পাচ্ছে। জাতিগতভাবেই দেশটি এখন অনেকটা ভাগ হয়ে গেছে। উত্তরাঞ্চলীয় জোট গত ১৩ নভেম্বর কাবুল দখল করলেও সাবেক ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট ও উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নেতা বুরহানউদ্দীন রব্বানী, প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব আর ফিরে পাননি। কেননা তিনি তাজিক উপজাতির লোক। আফগানিস্তানের জনগোষ্ঠির শতকরা ৬০ জন হচ্ছেন পশতুন। এর বাইরে শতকরা ২৫ জন তাজিন, ১৫ জন হাজারা, ৫ জন উজবেক উপজাতির লোক। উত্তরাঞ্চলীয় জোটে কোনও পাশতুন প্রতিনিধিত্ব নেই। মূলত উজবেক, তাজিক ও হাজারাগোষ্ঠী নিয়ে এই উত্তরাঞ্চলীয় জোটটি গঠিত। আফগান রাজনীতি মূলত নিয়ন্ত্রণ করে পাশতুনরা। যে কারণে রব্বানী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হতে পারলেন না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান করা হয়েছে হামিদ কারজাইকে, যিনি পাশতুন জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের অপর এক নেতা জেনারেল রশিদ দোস্তান, যিনি মাজার-ই-শরীফ দখল করে সেখানে তার নিজস্ব প্রশাসন চালু করেছেন। উজবেক জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী এই জেনারেল অতীতেও মাজার-ই-শরীফ এলাকায় তার নিজস্ব প্রশাসন চালু করেছিলেন। তিনি তার প্রশাসনের মাধ্যমে আলাদাভাবে কর আদায় করতেন, আলাদা ব্যাংক নোটও প্রচলন করেছিলেন। তালেবানরা তাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করেছিল ১৯৯৭ সালে। তিনি তুরস্কে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরে দেশে ফিরে এসে তালেবান বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের এই নেতা কার্যত মাজার-ই-শরীফ এলাকায় তার নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। কাবুলের কর্তৃত্ব এখন তিনি মেনে নাও নিতে পারেন। এখানে আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন। তালেবানদের পক্ষে কাবুলের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল (১৯৯৬) করা সম্ভব হয়েছিল। কারণ তালেবানরা ছিলেন পাশতুন। পাশতুন জাতিগোষ্ঠীর ভেতর থেকেই তালেবান বাহিনী গড়ে উঠেছিল, পরে যা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মাঝে সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু পাশতুনদের প্রাধান্য ছিল বেশি। পাশতুনদের ছাড়া যে কোনও সমাধান গ্রহণযোগ্যতা পাবে না, তা প্রমাণিত হয়েছিল বন সম্মেলনে। শুধু একজন পাশতুন নেতাকেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান করা হয়নি, বরং ২৯ সদস্যবিশিষ্ট যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে, সেখানে ১১ জন মন্ত্রী নেয়া হয়েছে পাশতুন উপজাতির মধ্যে থেকে। তালেবান পরবর্তী রাজনীতিতে পাশতুনদের এই কর্তৃত্ব করার প্রবণতা, দেশটির অন্যান্য উপজাতির মধ্যে ভবিষ্যতে এ মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। এখানে সকল জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী একটি সরকার গঠন জরুরি। এটি না হলে দেশটিতে জাতিগত দ্বন্দ্ব থেকে যাবে, যা কি না দেশটির ভেঙে যাবার জন্য যথেষ্ট।

জাতিসংঘের উদ্যোগে বনে যে আফগান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, তাতে আফগানিস্তানের মাত্র ৪টি গ্রুপ বা গোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। উত্তরাঞ্চলীয় জোট, রোমে নির্বাসিত বাদশাহ জহির শাহ-এর প্রতিনিধি, সাইপ্রাস গ্রুপ ও পেশোয়ার গ্রুপ প্রতিনিধিত্ব করেছেন শক্তিশালী পাশতুন জাতিগোষ্ঠীর। সাইপ্রাস গ্রুপের পেছনে রয়েছে ইরান, আর পেশোয়ার গ্রুপকে সমর্থন করেছে পাকিস্তান। বলা ভাল উত্তরাঞ্চলীয় জোটের পেছনে সমর্থন ছিল রাশিয়া তথা ভারতের। এমন কি পশ্চিমা শক্তিগুলো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সমর্থন করেছিল উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে। সেই সঙ্গে বাদশাহ জহির

www.pathagar.com

শাহের পেছনেও সমর্থন ছিল বুশ প্রশাসনের। আগামী দিনে আফগানিস্তানের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রভাব বিস্তার করার রাজনীতি ধারায়ই আফগান রাজনীতির গতি প্রকৃতি নির্ধারিত হবে। কাস্পিয়ান সাগরভুক্ত এলাকার (কাজাকিস্তান উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান, আজারবাইজান, , তুর্কমেনিস্তান) তেল ও গ্যাস সম্পদ এবং এই সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব করার প্রবণতাকে কেন্দ্র করেই আফগান রাজনীতি এখন পরিচালিত হবে। এ লক্ষেই তালেবানদেরকে কাবুলের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। আইওসির (ইন্টারন্যাশনাল ওয়েল কোম্পানী) প্রভাবাধীন একটি সরকার তখন আফগানিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করবে।

বন সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছে একাধিক। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বয়স হবে ৬ মাস। অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনের পাশাপাশি হাইকোর্ট ও 'লয়া জিরগা' গঠিত হবে। প্রথম ৬ মাসের পর ১৮ মাসের জন্য একটি ট্রানজিশনাল সরকার গঠিত হবে। 'লয়া জিরগা' হচ্ছে উপজাতীয় শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের নিয়ে গঠিত একটি উপদেষ্টা পরিষদ। অতীতে এই লয়া জিরগা বাদশাহকে পরামর্শ দিতেন। ধারণা করা হচ্ছে লয়া জিরগা প্রথম অধিবেশনে বাদশাহ জহির শাহ সভাপতিত্ব করছেন এবং জিরগা একটি সংবিধান প্রণয়ন করবে। এবং দুবছরের মধ্যে সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে একটি সাংবিধানিক সরকার আফগানিস্তানের শাসনকাজ পরিচালনা করবে। আফগানিস্তানে একটি আন্তর্জাতিক বাহিনীও মোতায়েন করা হবে। বিষয়গুলো যত সহজে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, আসলে তা অত সহজ নয়। চুক্তির মধ্যে দিয়ে আফগানিস্তানকে 'পশ্চিমাকরণের' একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সংবিধান, নির্বাচন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী এগুলো সব মূলত পশ্চিমা ধারণা। এমন কি আফগান নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার স্বার্থে দুজন মহিলা সিমা সামার ও সুহেলা সিদ্দিকীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু মিসেস সামার কিংবা মিসেস সিদ্দিকী আফগান নারীদের প্রতিনিধিত্ব করেন না। পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত এই দুই মহিলা কাবুলের একটি সুবিধাভোগী পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর এদের কেটেছে দেশের বাইরে। রোমে বাদশাহ জহির শাহর সঙ্গে। এরা কখনই আফগান নারীদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। তথাকথিত নির্বাচনের সঙ্গে আফগানিস্তানের জনগণের কোন পরিচয় নেই। অতীতে এরা কোনদিন ভোটও দেয়নি। শতকরা ৭০ জন মানুষ সেখানে অশিক্ষিত। পার্বত্য অঞ্চল, গ্রামে যাদের বসবাস তারা নিয়ন্ত্রিত হন গোত্র প্রধানদের দ্বারা। ধর্মীয় পীর, মৌলভীদের প্রভাব আফগানিস্তানে বেশি। ছোট-খাট গোত্র প্রধান কিংবা সর্দাররা যা বলেন, সেটাই আইন। আর সেভাবেই আফগানিস্তান চলছে বছরের পর বছর। সাধারণত গোত্র প্রধান ও শীর্ষস্থানীয় উপজাতীয় প্রধানদের নিয়েই 'লয়া জিরগা' গঠিত হয় এবং এই জিরগা অনেকটা পার্লামেন্টের কাজ করত। নির্বাচন মানেই তো রাজনৈতিক দল। আফগানিস্তানে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের খবর আমরা পেয়েছি, কিন্তু দলগুলো গোত্র ও উপজাতীয়ভাবে বিভক্ত। যেমন উল্লেখ করা যেতে পারে হিজাব-ই-ইসলামি, জামায়াতে ইসলামি, হিজাব-ই-ইসলামি, (ইউনুস খালিস গ্রুপ), ইসলামিক এ্যালায়েন্স, মিলি ইসলাম মাহাজ, , জাবহা নিহাতই মিলি, হারাকাত-ই ইসলামি, হিজবই ওয়াহাদাত, শুরা এয়ে ইত্তেফাক-ই-ইসলামি প্রভৃতি রাজনৈতিক সংগঠনের কথা উল্লেখ

www.pathagar.com

করা যেতে পারে। এক সময় সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গুলবুদ্দিন হেকমাতিয়ার খুব পরিচিতি পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন হিজাব-ই-ইসলামি গ্রুপের নেতা এবং কট্টরপন্থী। ১৯৯২-১৯৯৬ সময়সীমায় তিনি বারেবারে সংবাদের শিরোনাম হয়েছেন। রব্বানী তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করলেও, কখনই তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেননি। তালেবান পরবর্তী রাজনীতিতে (১৯৯৬-২০০১) হেকমাতিয়ার ছিলেন নিষ্ক্রিয়। তেহরানে নির্বাসিত জীবনযাপনরত হেকমাতিয়ার আগামী আফগান রাজনীতিতে একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারেন। তেহরান তাকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। রব্বানী জামায়াতে ইসলামির নেতা। তার তেমন ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা নেই। উপরন্তু তিনি তাজিক সম্প্রদায়ের লোক। অতীতে হেকমাতিয়ারের সঙ্গে তার খাদ ছিল। হেকমাতিয়ার নিজে পাশতুন জাতিগোষ্ঠীর।

পাশতুনরা কোনদিনই তাজিক বা উজবেকদের ভালো চোখে দেখে না। এদের বাইরে প্রফেসর আবদুল রসুল সায়েফ, পীর আহমেদ গিলাবী, সিবঘাতউল্লাহ মুজাহিদ্দী, নবী মোহম্মদ, আয়াতুল্লাহ সোহসিনী কিংবা করিম খোটিলি প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অতীতে আফগান রাজনীতিতে একটি বড় ভূমিকা পালন করলেও, আগামী দিনের আফগান রাজনীতিতে এদের ভূমিকা কী হয় সেটাই দেখার বিষয় এখন। বুরহানউদ্দিন রব্বানী আপাতত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কোন পদ পাননি। যদিও উত্তরাঞ্চলীয় জোটের অনেকেই মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। বাদশাহ জহির শাহ কাবুলে ফিরে যাবেন। তিনি সরকারে থাকবেন না বটে, কিন্তু তার একটি প্রভাব থেকে যাবে। রোম গ্রুপের অনেকেই মন্ত্রিসভায় রয়েছেন। খোদ হামিদ কারজাই রোম গ্রুপের লোক। আন্তর্জাতিক বাহিনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর আফগানিস্তানে উপস্থিতি নিয়ে নানা কথা রয়েছে। রব্বানী কিংবা হেকমতিয়ার প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করেছেন। তবে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে কাসপিয়া অঞ্চলের তেল-গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার স্বার্থে অপারেশন এনডিভাওরিং ফ্রিডম, (আফগানিস্তানে তালেবান উৎখাত)কর্মসূচি শেষ হয়ে যাবার পরও মার্কিন সেনাবাহিনীর আফগানিস্তানে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সবচেয়ে বড় কথা ওসামা বিল লাদেন কিংবা মোল্লা ওমরকে এখনও খুঁজে বের করা কিংবা গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের এই 'ইঁদুর-বেড়াল খেলায়' ওসামা বিন লাদেনকে কি সত্যিকার অর্থেই গ্রেফতার করা হবে ? নাকি বুশ প্রশাসন তাকে বাঁচিয়ে রাখবে আফগানিস্তানে মার্কিন উপস্থিতি স্থায়ী করার স্বার্থে ? আগামী দিনগুলোই এর জবাব দেবে। আফগানিস্তানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা জরুরি। জরুরি লাখ লাখ লোকের পুনর্বাসনের প্রশ্নটিও। বনের শান্তি চুক্তি এ লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু শুধু চুক্তি সাক্ষরই যথেষ্ট নয়। ❑

ডিসেম্বর '০১

www.pathagar.com

বর্তমান সঙ্কটে মুসলিম মানস ও বাংলাদেশের অবস্থান

কাজী আনিস আহমেদ

১১ সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা ও তার প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন যুদ্ধ যত প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন হলো: এটা কিসের যুদ্ধ ? সন্ত্রাস বনাম সভ্যতা, না মুসলিম বনাম পশ্চিমের ? এই প্রশ্নটাই মুসলিম ও পশ্চিমা উভয় বিশ্বেই আলোচিত হয়েছে। প্রশ্নটা যে আদৌ তোলা যায় সেটাই নির্দেশ করে তাদের সাংস্কৃতিক বিরোধ বা দূরত্ব (মুসলিম বা পশ্চিমা সভ্যতা বলতে কোনো একক অস্তিত্ব নেই ঠিকই, তবে আলোচনার খাতিরে উভয় পক্ষের মূলধারাকে তাদের সামষ্টিক নামেই চিহ্নিত করা যাক)। মুসলিম ও পশ্চিমা সংস্কৃতির মধ্যে এক অনিবার্য সংঘর্ষের ভবিষ্যদ্বাণী করে স্যামুয়েল হান্টিংটন বিখ্যাত হয়েছিলেন । তার ওই কথিত 'সভ্যতার সংঘাত'-ই কি এখন আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে ?

আমার ব্যক্তিগত মত, আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা মুসলমানদের নতুন করে অবদমনের অভিপ্রায়ে সুদূরপ্রসারী কোনো পশ্চিমা অভিসন্ধির প্রাথমিক আলামত নয়। কিন্তু, অনেক মুসলমানই এটা বিশ্বাস করেন না। তাদের মনে পশ্চিমা বিশ্বের কার্যক্রম সম্পর্কে ঐতিহাসিক কারণে বোধগম্য কিছু সংশয় থাকতেই পারে । তাদের এই অনেক দিনের সংশয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূপ নেয় অযৌক্তিক পশ্চিম বিরোধিতারও। এটা সম্ভব হয়েছে তাদের নিজস্ব চিন্তাপ্রবণতার কিছু ভ্রান্তির ফলে। এ ধরনের সমস্যা পশ্চিমেও বিদ্যমান। কিন্তু আমেরিকার 'দ্য নেশন' থেকে ইংল্যান্ডের 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকা পর্যন্ত অজস্র ক্ষেত্রে তাদের আত্মসমালোচক একটা শক্ত ধারা আছে। এতটাই শক্ত এই ধারা যে, আফগানিস্তানে বোমা হামলা যেদিন শুরু হয় সেদিন খোদ নিউইয়র্কে দশ হাজার মানুষের একটি যুদ্ধবিরোধী সমাবেশ হয়। ওই সমাবেশে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং স্মরণ করছিলাম যে, এর সমকক্ষ কোনো আত্মশোধক প্রক্রিয়া কোনো মুসলমান দেশেই বিদ্যমান নয়। আমরা একতরফা পশ্চিমকে গাল-মন্দ করি কিন্তু একবারও নিজেদের তীক্ষ্ণ প্রশ্নের মুখে ফেলি না। আমরা আফগানিস্তানে মার্কিন বোমা হামলাকে যেভাবে নিন্দা করি, সমান শক্তিতে আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করি

www.pathagar.com

না। মৌখিকভাবে নিন্দা জানালেও, অন্তরে আমাদের খাদ থেকে যায়। এজন্যে আমাদের পক্ষে নিন্দার পাশাপাশি যুগপৎ বিশ্বাস করা সম্ভব হয়- ওই সন্ত্রাসী হামলার জন্যে শুধুমাত্র মার্কিন পররাষ্ট নীতিই দায়ী।

হ্যাঁ, এ সত্যও অনস্বীকার্য যে, মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির বহু দশকের বিশেষত 'শীতল যুদ্ধ' পর্যায়ের অনেক ভুল ও অপরাধ অমার্জনীয়। কমিউনিজম-এর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আমেরিকা দেশে দেশে জনপ্রতিনিধিত্বকারী সরকারের বদলে স্বৈরশাসক ও মিলিশিয়াদের মদদ দিয়েছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশে এই পক্ষপাত এখন নির্বিচারে মৌলবাদী ও বিন লাদেনের মতো ভবিষ্যত সন্ত্রাসীদের পক্ষে গেছে। এর জন্যে অবশ্যই আমেরিকার কিছু দায়বদ্ধতা আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেই সকল ভুলের মাশুল সম্পূর্ণ নিরীহ ও সাধারণ আমেরিকানদেরকে জীবন দিয়ে দিতে হবে। যারা এর বিপরীতটা মনে করেন তাহলে তাদেরকে মেনে নিতে হবে যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারের ধারাবাহিক উপজাতি নির্যাতনের মাশুল হিসেবে কোনো চাকমা যদি একটা প্লেন নিয়ে সংসদ ভবন বা বাংলাদেশ ব্যাংক বিল্ডিংয়ে আঘাত করে বসে, সেটাও ন্যায়সঙ্গত আচরণ হবে! নিজেদের বেলায় আমরা যা মেনে নেবো না, অন্যের—এক্ষেত্রে আমেরিকার বেলায় সেটাই আমরা সমর্থন করবো!

এ তো গেলো ১১ সেপ্টেম্বরের ন্যায়-অন্যায় প্রসঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত একটা মন্তব্য। এবার আসা যাক, আফগানিস্তানে মার্কিন বোমা হামলার প্রসঙ্গে। এক জায়গায় নিরীহদের প্রাণহানির উশুল আরেক জায়গায় নিরপরাধের প্রাণ দিয়ে হতে পারে না। এটা আমেরিকানরাও বোঝে, তারপরও কেনো তারা বেছে নিল এই যুদ্ধের পথ ? এ প্রসঙ্গে অনেক তত্ত্ব আছে। মুসলিম বিশ্বে তার মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা তত্ত্ব হলো যে, এই যুদ্ধ আসলে নতুনভাবে মুসলমানদের অবদমিত রাখার সুগুপ্ত পশ্চিমা অভিসন্ধির প্রকাশ। আরেকটু অসাম্প্রদায়িক মহলে অনেকে বিশ্বাস করেন এটা মার্কিন সরকারের 'একটা কিছু' করে দেখানোর জনতোষক নীতির ফল। আবার অনেকে ভাবেন এটা মার্কিনিদের প্রতিহিংসাপরায়ণতার বহিঃপ্রকাশ। অনেক রাজনৈতিক বিশারদ ভাবেন, এই যুদ্ধ আসলে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন সামরিক উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার অজুহাত মাত্র। এই এলাকায় প্রবেশ করে তারা ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি কাস্পিয়ান এলাকার তেল-গ্যাস সম্পদের ওপর দখল নিশ্চিত করতে চায়। প্রথমোক্তটি বাদে এই সকল তত্ত্বের অল্প-বিস্তর সত্যতা থাকতে পারে বা সময়কালে এই তাগিদগুলোর প্রকাশ বা বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

এখানে যেটা লক্ষ্যযোগ্য সেটা হলো যে, আমেরিকার যুদ্ধে যাওয়ার সবচেয়ে সহজ ও বোধগম্য যে কারণ সেটাকে অধিকাংশ মুসলমান বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিজীবীরা আমলে আনছেন না। সে কারণটা কী ? তাদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধান। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরে যদি মার্কিন সরকার মনে করে-এটাই তাদের সর্বোচ্চ অভীষ্ট, সেটা কি এতটাই অবিশ্বাস্য ? এই নিরাপত্তাবোধের তাগিদ থেকেও যে তারা যুদ্ধে যেতে পারে-প্রথমে তার একটা সরলরৈখিক যুক্তি নির্দেশ করি। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার সঙ্গে বিন লাদেনের 'সন্দেহাতীত প্রমাণ'-এর কথিত অভাব এখন মার্কিনিদের কাছে একটা গৌণ বিষয়। তাদের কাছে মুখ্য হলো বিন লাদেনের অব্যাহত হুমকি প্রদান। বাস্তবতারহিত মানুষ বাদে যে কেউ স্বীকার

www.pathagar.com

করবেন এই হুমকি কল্পিত বা সামান্য নয়। অতএব বিন লাদেনকে ধরা এখন মার্কিন সরকারের অন্যতম একটা লক্ষ্য (যদিও এর পাশাপাশি আরো অন্য অনেক সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধেও তাদের গোপন ও প্রকাশ্য অভিযান চলছে)। বিন লাদেনকে ধরিয়ে দিতে পারতো একমাত্র তালেবান বা পাকিস্তানিরা কিন্তু এ কাজে দু'পক্ষের অনিচ্ছা ও অপারগতা এখন সুবিদিত। অতএব এ কাজে আমেরিকাকে নিজেই নামতে হচ্ছে। কিন্তু আফগানিস্তানের মতো বন্ধুর পরিবেশে তাদের সৈন্যরা প্রবেশ করবে কি করে ? এর জন্যে প্রথমে বোমা হামলা করে তালেবান ও আল-কায়েদা সৈন্য-কর্মিদের টলানো প্রয়োজন। এই তাগিদ থেকে মার্কিন সরকার আফগানিস্তানে যুদ্ধ তথা বোমা হামলার পথ বেছে নিয়েছে।

তাদের এ কাজটা কি ন্যায় বা যৌক্তিক হয়েছে ? এক্ষেত্রে নিরীহ আফগানদের মৃত্যু তো কিছুতেই ন্যায় নয়। আর সেই চরম মানবিক মূল্য সত্ত্বেও এই নীতির কার্যকারিতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। এই বোমা হামলার মূল উদ্দেশ্য তালেবান ও আল-কায়েদাকে হটানো কি সফল হচ্ছে ? এই বোমাবাজির ফলে আফগানিস্তানে মার্কিন সেনা প্রবেশ ঘটলেও তারা কি বিন লাদনকে ধরতে পারবে ? তাকে ধরতে পারলেও বিশ্ববিস্তৃত আল-কায়েদাকে কি নির্মূল করা যাবে ? তা না গেলে তো সন্ত্রাস নিরোধের এই মহার্ঘ প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে ? তখন কি এই নিরীহ আফগানদের মৃত্যু আরো অর্থহীন হয়ে যাবে না?

এই সকল বিবেচনার বিপক্ষে আবার এটাও বলা যায়, সন্ত্রাসের আমূল উৎপাটন সামরিকভাবে সম্ভব নয়। তাই বলে বিন লাদেনের মতো একজন সন্ত্রাসী-যে কি না দিন-রাত আবারো মার্কিনিদের হামলা করার হুমকি দিয়ে চলেছে, সেটাই বা কোনো রাষ্ট্র উপেক্ষা করে কি করে ? বিন লাদেন দিন-রাত যে ধরনের হুমকি দিয়ে চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কি পৃথিবীর অন্য কোনো সামর্থ্যবান সরকার নিশ্চেষ্ট বসে থাকতো ? শুরুতেই বলেছি, এই বিতর্ক নিরন্তর চলতে পারে। এর মীমাংসা করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। এই লেখার উদ্দেশ্য এই বিতর্কে মুসলিম মানসের কিছু গতিবিধি অন্বেষণ করা। এই বিচারে আমার কাছে উল্লেখযোগ্য মনে হয় যে, যুদ্ধবিরোধী মুসলমানদের মধ্যে মার্কিনিদের অত্যন্ত সঙ্গত নিরাপত্তাবোধের প্রশ্নটা আদৌ গুরুত্ব পায় না। অনেকেই বলবেন যে, মার্কিনিদের নিরাপত্তা তারা বুঝুক, এটা আমাদের বিষয় নয়। তারা হয়তো আরো বলবেন, নিজেদের নিরাপত্তা বিধান করতে গিয়ে মার্কিনিরা যোনো কোনো আফগান বা অন্য জাতির কিন্তু কসোভোর মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধান করতে গিয়ে এই মার্কিনিরাই যখন ঠিক একই রকম বোমা হামলায় সার্বিয়ার অনেক নিরীহ খ্রিশ্চিয়ানের প্রাণহানি ঘটিয়েছিলো, তখন কেনো আমাদের বিন্দুমাত্র বিকার হয় নি ? এটা কি আমাদের উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও ধর্মগত সম্প্রদায়বোধের পরিচায়ক নয় ? অনেকেই হয়তো জানেন না যে, এ যাবত আফগানিস্তানে মার্কিনিদের বোমা হামলার দৈনিক হার সার্বিয়ার দৈনিক ১০০টির অর্ধেকেরও কম। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার কভারেজের ধরণ থেকে এই তথ্য আন্দাজ করার কোনো উপায় নেই। এটা কি আমাদের প্রগতিশীল সাংবাদিকদের ব্যর্থতা নয় ? তারা এক ধরনের একমুখী আবেগ ও অনুভূতি থেকে কাজ করায় আমাদের ধর্মগত সম্প্রদায়বোধের পরিপন্থী এ ধরনের তথ্য কেনো প্রাধান্য পাচ্ছে না। এটা কি তাদের বিবেচনা করা উচিত নয় ? আফগানদের জন্যে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত অনুভূতির কারণে অধিক সহানুভূতি আর মার্কিনিদের জন্যে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক কারণে কিছু কম সহানুভূতি আমাদের জন্যে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ক্ষেত্রভেদে আমাদের মানবিক সহমর্মিতা বন্টন এতটাই বৈষম্যমূলক যে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে-এখানে মার্কিনী তথা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে আমাদের একটা জাতিবিদ্বেষী মানসিকতা কি কার্যকর ?

ঔপনিবেশিক ইতিহাসের কারণে আমরা এতকাল নিজেদের ভিকটিম হিসেবে ভেবে এসেছি যে, আমরা যাদের শোষক-নিপীড়ক ভাবি, তাদের মানবিক সীমাবদ্ধতা যে আমাদের মধ্যেও থাকতে পারে এই জ্ঞানটা আমাদের লোপ পেয়েছে।

গোত্রনিষ্ঠ মানুষের কল্পনার আকাশ এতটাই সীমাবদ্ধ যে, যাদেরকে তারা পর ভাবে তাদের কষ্ট কখনই যাদের তারা আপন ভাবে তাদের কষ্টের মতো স্পর্শ করে না। মুসলমানরা পশ্চিমাদের পর ভাবে তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু সেই আপন-পর বিবেচনার বাইরেও কি মৌলিক মানবিক সহমর্মিতার একটা ভিত্তিভূমিতে দাঁড়ানো সম্ভব নয় ? আমার মতো নিউইয়র্কবাসীর মতো যদি রোজ সকল মুসলিম গর্ডন টাউন থেকে এখনো ভেসে আসা ধ্বংসস্তূপের পোড়া গন্ধ পেতেন, তাহলে কি একাজটা সহজ হতো ? এই সীমাবদ্ধতা পশ্চিমেও বিরাজমান; তাই এখানকার ট্র্যাজেডি যাদের উদ্বেল করে তারা কল্পনায়ও আফগানিস্তান থেকে ভেসে আসা পোড়া গন্ধটা পান না। কিন্তু তাদের নিজেদের এই সীমাবদ্ধতা প্রশ্ন করার মতো চর্চা এখানে ভালোমতই আছে। সেই তুলনায় মুসলিমদের মধ্যে নিজেরা নিজেদের প্রশ্ন করার তেমন একটা প্রবণতা এখনো আমার চোখে পড়ে নি। উল্টো আমরা নিজেদের প্রেজুডিসকে উদ্ভট সব 'ষড়যন্ত্র তত্ত্বের' মোড়কে পেঁচিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করি।

মিসরের সরকার সমর্থিত আল-আহরাম পত্রিকার সম্পাদক ইব্রাহিম নাফী সম্প্রতি লিখেছেন, 'এমনও শোনা গেছে যে মার্কিন সরকার আফগানদের স্বাস্থ্যহানির জন্যে জেনেটিকভাবে শোধিত খাদ্য সেখানে মানবিক সাহায্য হিসেবে পাঠিয়েছে।' তিনি মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে এত বড় একটা অভিযোগ তুলেছেন, অথচ এর পক্ষে কোনো তথ্য-প্রমাণ হাজির করেন নি! একই ধরনের গুজবি রিপোর্টের ভিত্তিতে বাংলাদশেসহ সকল মুসলিম দেশে এবং বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে আরো অনেক তত্ত্ব চালু হয়েছে: ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা আসলে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ-এর কাজ। ওই দিন আগে থেকে হুঁশিয়ারি থাকায় কোনো ইহুদি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে কাজে যায় নি; মার্কিনিরা আফগানিস্তানে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র ব্যবহার করেছে ইত্যাদি। অথচ এই তত্ত্বের একটার পক্ষেও কেনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। এগুলো অশিক্ষিত মোল্লা-মৌলভিদের প্রচারণা নয়। এগুলো মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও অনেক ক্ষেত্রেই উদারপন্থী পত্রিকার প্রচার। এর পাল্টা যে একেবারেই কোনো সুর নেই তা নিশ্চয়ই নয়। তবে সেগুলো এখনো ক্ষীণ ও স্বল্প। মুসলমানদের এধরনের অব্যাহত আত্মপ্রবঞ্চক ও আত্মতোষক অপপ্রচারণার বিরুদ্ধে মিসরীয় লেখক সার্মির ফরীদ লিখেছেন, 'মিসরীয় পত্রিকার লেখা যা পড়েছি তা আমার কাছে এটাই প্রমাণ করে যে অগণতান্ত্রিক, সামরিক আরব শাসকদের মিথ্যার বিষ এখন বুদ্ধিজীবীদের ধমনীতে প্রবেশ করেছে।' তারের এখন বিখ্যাত আল-জাজিরা টিভির একটা অনুষ্ঠানে কুয়েতী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শফিক ঘাবরী বলেন, 'লেবাননের গৃহযুদ্ধ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, বিল-লাদেন, এগুলোর কোনোটাই আমেরিকার

www.pathagar.com

সৃষ্টি নয়। এগুলো আমাদের নিজের সৃষ্টি। আমাদের নিজের দিকে তাকাতে হবে। চিরদিন শুধু একার দোষ দেওয়ার মানসিকতা থাকলে চলবে না। আবার কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন ড. আব্দেল বশীর আল-আনসারী আল-রায়া পত্রিকায় লিখেছেন, 'বিন লাদেনের মতো একজন সন্ত্রাসী কী করে একজন হিরোতে পরিণত হয় ? আরবদের সামষ্টিক চিন্তা এতদূর বিপথগামী হলো কী করে ?' এ ধরনের সৎ সাহসী ও নতুনভাবে চিন্তা করতে সক্ষম অল্প ক'টি আরব স্বরের সাথে গলা মেলানোর মতো কোনো বাঙালি গলার সুর এখনো শোনা যায় নি। অথচ মুষ্টিমেয় মুসলিম গণতন্ত্রের একটি হিসেবে এদিক দিয়ে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকা থাকা উচিত ছিলো।

আমরা মুসলিম এবং এক্ষেত্রে বাঙালি সমাজের প্রগতিশীলরা ভাবতে ভালোবাসি যে, আমাদের পাশ্চাত্য বিরোধিতা কেবলই আমাদের যুক্তিনিষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতারই বহিঃপ্রকাশ। এর মধ্যে কোনো ধরনের জাতি-বিদ্বেষের উপাদান নেই। আমাদের সমাজের মৌলবাদিদের মধ্যেই কেবল পশ্চিমা বিরোধিতা হিংস্র জাতি-বিদ্বেষের রূপ নেয়। কিন্তু আসলে আমরা সকলেই এখন কম-বেশি জাতি-বিদ্বেষী মনোভাব দ্বারা আক্রান্ত। আমাদের সবচেয়ে হীন প্রবৃত্তিগুলোর সবচেয়ে জঙ্গি প্রকাশ মৌলবাদিদের মধ্যে ঘটলেও নিজেদেরকে সে ধরনের প্রেজুডিস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ভাবা আত্ম-প্রবঞ্চনা হবে। আমরা এ ধরনের প্রেজুডিস থেকে মুক্ত নই বলেই পত্রিকান্তরে লন্ডন থেকে একজন প্রখ্যাত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর পক্ষে লেখা সম্ভব হয় যে, পশ্চিমারা ভাবে বর্তমান যুদ্ধের দ্বারা 'মধ্যপ্রাচ্যে কয়েকটি মুসলিম দেশকে শায়েস্তা করে শুধু ইসরায়েলকে রক্ষা নয়, নবোদ্ভিন্ন ইসলামী ব্লকের সূচনাতেই পতন ঘটানো যাবে।' এটা কি একটা বিদ্বেষহীন, যুক্তিনির্ভর, দায়িত্বশীল মন্তব্য ?

ইসরাইল একলা হাতে ১৯৪৮, ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ সালে সম্মিলিত আবর রাষ্ট্রদের যেভাবে নাস্তানাবুদ করেছে সেটা কি একথাই বলে যে, তার এখন হঠাৎ পশ্চিমা প্রটেকশন প্রয়োজন ? তাহলে বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোক এমন একটা ইঙ্গিত কেনো দিলেন ? তার উক্তিটা আসলে গভীর তাৎপর্যময়। তিনি বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের একটা মৌলিক বিশ্বাস বা প্রান্তির এখানে প্রতিধ্বনি করেছেন : পশ্চিমা সমর্থন না থাকলে, ইসরাইল থাকত না। এটা আসলে মনভুলানো কথা। ইতিহাসের পরাজিত পক্ষরা এ ধরনের ভ্রান্তির ও 'ষড়যন্ত্র তত্ত্বে'-র মধ্যে প্রবোধ খোঁজে। পশ্চিমা সমর্থন রাষ্ট্র ইরাইলের ভিত্তিকে আরো মজবুত করেছে, নিরাপত্তা দিয়েছে। কিন্তু ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা ন্যায্য যাই হোক না কেনো, বাস্তবতা হলো দেশটির অস্তিত্ব একটি অমোচনীয় সত্য। তারপরও কেনো অধিকাংশ মুসলমান এটা একেবারেই মানতে পারে না ?

এর প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো, ইসরাইলের অস্তিত্ব অমোচনীয় সত্য জানার পরেও অধিকাংশ মুসলিম ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা দশকের পর দশক তাদের জনগণকে ইসরাইলের উচ্ছেদের অলীক স্বপ্ন দেখিয়েছেন। নেতাদের এই হঠকারিতার ফলে মুসলমানদের দুটো বড় ক্ষতি হয়েছে। প্রথমত, অসম্ভব এক লক্ষ্যের জন্যে সংগ্রাম করে তারা প্রকৃত প্রতিরোধ ও অর্জনের ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এতে শুধু প্যালেস্টাইনিদের ক্ষতি হয়েছে; বিশ্বের বাকি মুসলমানদের এতে বাস্তবিক কোনো লাভ-

www.pathagar.com

ক্ষতি হয় নি। অলীক কল্পনার বদলে বাস্তবানুগ পদক্ষেপ নিলে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র এতোদিন প্রতিষ্ঠা হয়ে যেতো এবং বর্তমানের চেয়ে সে রাষ্ট্রের চেহারা আরও অনেক সুঠাম হতো। কিন্তু এই পদক্ষেপ মুসলমানরা যে কারণে নিতে পারে নি সেটা তাদের আরও একটা ক্ষতি করেছে এবং বিশ্বের সকল মুসলমানকে প্রায় সমানভাবে আক্রান্ত করেছে। ইসরাইলকে পরাস্ত করতে না পারার অসহায় আক্রোশ লালন করে মুসলমানরা এটাকে একটা অন্ধ ও অযৌক্তিক জাতি বিদ্বেষের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এতে করে ইসরাইলের কতোটুকু ক্ষতিসাধন সম্ভব হয়েছে- সে বিতর্কে না গিয়েও স্বীকার করে নেয়া সঙ্গত যে এই বিদ্বেষ মুসলমানদের মানবিক সত্তা খর্ব করেছে এবং ইসলামের মূল মর্মবাণী থেকে বিচ্যুত করে তাদের মানস গঠনে একটা বিকৃতি ঘটিয়েছে। ❑

১৯ নভেম্বর' ০১

প্রবাসী লেখক।

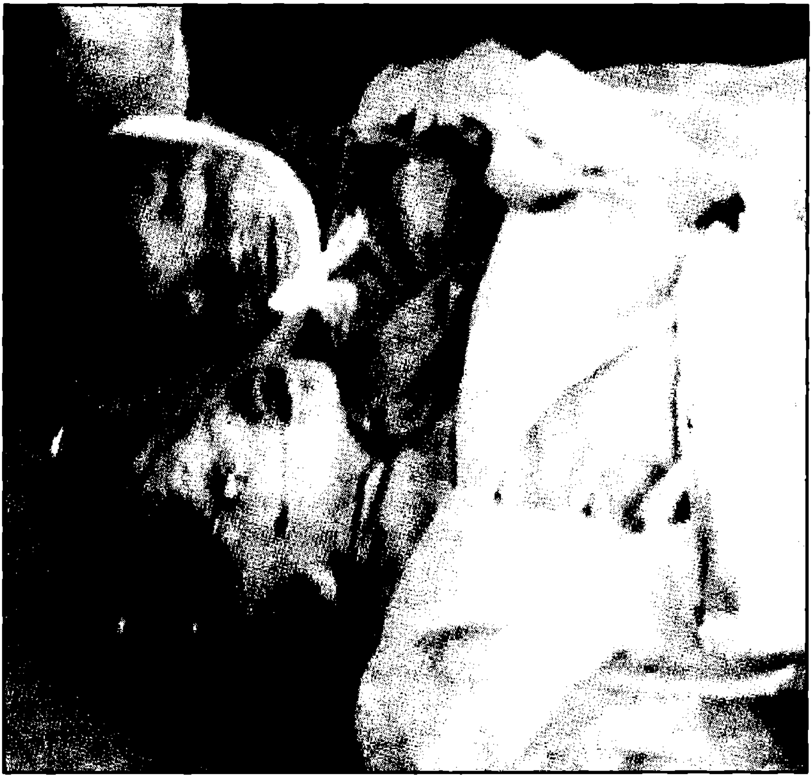

এরা জানেনা যুদ্ধ কাকে বলে।

www.pathagar.com

আফগানিস্তান ঃ গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনই আসল লক্ষ্য

আলী রীয়াজ

একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং সে বিষয়ে জনগণের অজ্ঞতা যে কি ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে জনগণের জন্য তা যে কতটা বিভীষিকার কারণ হতে পারে আফগানিস্তান তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। আফগানিস্তানের হাজার বছরের ইতিহাস এবং বর্তমান পরিস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলেই দেখা যায়, দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান এর পেছনে কতটা অবদান রেখেছে। ইতিহাসের শিক্ষার্থী মাত্রই জানেন যে, আফগানিস্তানে কখনোই কোন বিদেশী শক্তি বিজয়ী হয়নি। এই সত্যের মধ্যে যা লুকিয়ে আছে তা হল ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আফগানিস্তান বিদেশী শক্তির আক্রমণের শিকার হয়েছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে ব্রিটিশরা দু'দফা আফগানিস্তান দখলের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। ব্রিটিশ সামরিক ইতিহাসে এ ধরনের পরাজয়ের অন্য কোন নজির আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু ব্রিটিশরা বারবার আফগানিস্তান দখলের চেষ্টা করেছে যেমন ঠিক তেমনি চেষ্টা করেছে সেখানে তাদের পছন্দের শাসকদের ক্ষমতায় রাখতে। আফগানিস্তানে এমন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল না যা ব্রিটিশদের আকর্ষণ করেছিল। আকর্ষণটি ছিল ভূ-রাজনৈতিক। রুশ সাম্রাজ্য ও তার অধীশ্বর জারদেরকে ভারত থেকে দূরে রাখার জন্যই প্রয়োজন ছিল আফগানিস্তানকে একটি অন্তর্বর্তী দেশ হিসেবে নিয়ন্ত্রণে রাখা। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে পশ্চিমা দেশগুলো তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে আফগানিস্তানের ওপর। ভয় ছিল মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলোতে একই জাতিগোষ্ঠীর মানুষরা যে পথে অগ্রসর হয়েছে আফগানিস্তান সেই পথ বেছে নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সম্প্রসারিত করে কিনা। ব্রিটিশ শাসনামলের মতোই পাকিস্তানের পার্শ্ববর্তী আফগানিস্তানের ওপর নজর রাখার এই কাজটি করতে হয়েছে পাকিস্তানকে। ভয় ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নেরও। মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে আফগানিস্তানের বন্ধন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়। তার ইতিহাস এতটাই পুরনো যে, শুরুটা খুঁজতে হলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিনগুলোর দিকে তাকাতে হবে। মধ্য এশিয়া থেকে আসা জাতিগোষ্ঠী বাগদাদ পর্যন্ত পৌঁছেছিল লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে চালাতে।

www.pathagar.com

কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় তারা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল ইসলামের শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকস্পর্শ। সে কারণেই ষাটের দশকে সোভিয়েত প্রভাবিত রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল আফগানিস্তানে। শেষাবধি সত্তরের দশকে তারা ক্ষমতাও গ্রহণ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন চেয়েছিল দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিনীদের যে প্রভাব-বলয় রয়েছে তা থেকে নিজেদের দূরে রাখার জন্য আফগানিস্তানকে মধ্যবর্তী রাষ্ট্র হিসেবে ব্যবহার করতে।

পাকিস্তানের জন্য আফগানিস্তান একাধারে আপনজন এবং ঘরের শত্রু। আফগানিস্তানের অধিকাংশ মানুষ হল পশতুন জাতিগোষ্ঠীর সদস্য। এই জাতিগোষ্ঠীকে আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টায় ভাগ করে দেয়া হয় কৃত্রিম এক আন্তর্জাতিক সীমারেখা টেনে। 'ডুরান্ড লাইন' বলে পরিচিতি এই সীমান্তের অস্তিত্ব সীমান্তের দু'পাশে বসবাসকারীরা কখনই স্বীকার করেনি। 'ডুরান্ড লাইন' বরাবর যে ১ কোটি ৮০ লাখ মানুষ আজও বসবাস করে তারা কেবল যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে তাই নয়, কার্যত তারা নিজেদের মতো করেই নিজেদের এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে।

আফগানিস্তানের অন্য আরেক সীমান্ত হল ইরানের সঙ্গে। ধর্ম-বিশ্বাসে ইরানের অধিকাংশ নাগরিক মুসলমান। কিন্তু তারা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। তদুপরি ইরানের ইতিহাস হল পারস্য সভ্যতার ইতিহাস। দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষত Indus Valley তে যে সভ্যতা ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সঙ্গে পারস্য সভ্যতার বিরোধ ও বিবাদ ছিল সুবিদিত। অতীতের সেই বিরোধ হাজার বছর পরও কোন না কোনভাবে বেঁচে আছে। তদুপরি ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সফল হওয়ার পর আফগানিস্তানের শাসকশ্রেণীর মধ্যেও এরকম আশংকা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তার প্রভাব সীমান্ত পেরিয়ে বিস্তার লাভ করতে পারে। ইরান সে চেষ্টাও করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ১০ বছরের যুদ্ধে মুজাহিদদের একাংশ ইরানের সমর্থন লাভ করেছে। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে তালেবান শাসকদের বিরুদ্ধে গত পাঁচ বছর ধরে লড়াই চালাচ্ছে মোহাম্মদ ইসলাম খানের অনুগত বাহিনী। ইসলাম খান এক সময় হেরাতের গভর্নর ছিলেন এবং এখন ইরানের আশ্রয়ে রয়েছেন। ইরানভিত্তিক এই গোষ্ঠী সম্পর্কে পশ্চিমা গণমাধ্যম এবং বার্তা সংস্থাগুলো তেমন কোন খবর না দিলেও অন্যান্য বার্তা সংস্থার সূত্রে যৎকিঞ্চিত জানার সুযোগ হয়তো অনেকেরই হয়। এমন কি জুন মাসের ২১ তারিখ ইসলামাবাদ থেকে জাপানি বার্তা সংস্থা নিয়োডো জানিয়েছিল যে, ওই বাহিনী সাম্প্রতিককালে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। হেজব-এ ওয়াহদাত নামের এই শিয়াপন্থী আফগান গোষ্ঠীটি গত কয়েক বছরে শক্তিশালী হয়েছে এবং সময় ও সুযোগমতো অগ্রসর হয়েছে।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনী উপস্থিত থাকার সময় ইরান তার সমর্থক গোষ্ঠীকে যেমন অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে, ১৯৯৭ সালে উত্তরাঞ্চলীয় জোট গঠিত হওয়ার পর রাশিয়াও তালেবানবিরোধী একটি গোষ্ঠীকে সমর্থন জোগাতে শুরু করে। পরিহাসের মতো শোনালেও এটা সত্য যে, তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রুশদের সমর্থন লাভ করে তাদের এককালীন শত্রু রশীদ দোস্তামের বাহিনী। পশতুন জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি স্থানীয় তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উজবেকদের সাহায্য করার কাজে এগিয়ে আসে রাশিয়া (দ্রষ্টব্য ঃ নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদ ২৭ জুলাই ১৯৯৮)। এই প্রশ্নে তাদের সঙ্গে

www.pathagar.com

ইরানের এক ধরনের ঐকমত্যও প্রতিষ্ঠা হয়। উজবেক নেতা রশীদ দোস্তাম তার সামরিক জীবনে একাধিকবার পক্ষ পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু রুশদের সামনে এর চেয়ে ভাল বিকল্প ছিল না। তদুপরি তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে আহমেদ শাহ মাসুদের সঙ্গে। মাসুদের পরিবার তাজিকিস্তানেই বসবাস করে। রাশিয়ার লক্ষ্য দু'টি। প্রথমত পশতুনদের আধিপত্য খর্ব করা যাতে করে তাজিক ও উজবেকরা ক্ষমতায় আসতে পারে। দ্বিতীয়ত যুদ্ধকে প্রলম্বিত করা যাতে করে কাস্পিয়ান সাগর এলাকায় আবিষ্কৃত তেল ও গ্যাস আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে না যেতে পারে। একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর ব্যাপারে ইরানের সঙ্গে ঐকমত্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল কাস্পিয়ান সাগরের তেল ও গ্যাস অন্যত্র নেয়ার ব্যাপারে ইরানের স্বার্থ। ইরানও চায় না যে কাস্পিয়ানের সম্পদ আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তানে যাক। এ প্রশ্নে রাশিয়া ও ইরানের যেমন অভিন্ন অবস্থান তেমনি তার ঠিক বিপরীত অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের। আর সেটাই ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে বড় ভূমিকা পালন করছে। কাস্পিয়ান সাগর এবং তার পার্শ্ববর্তী কাজাকিস্তান তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তানে বিপুল পরিমাণ তেল এবং গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে। এই দশকের মাঝামাঝি সময়ে এসেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, কাজাকিস্তানের সমুদ্র সৈকতে ও কাস্পিয়ান সাগরে ভূ-গর্ভস্থ তেল সম্পদের পরিমাণ কমপক্ষে ২০ বিলিয়ন ব্যারল (কোন কোন হিসেব মতে ৫০ বিলিয়ন ব্যারেল)। যদি সবচেয়ে কম অনুমানটিকেও গ্রহণ করা হয় তবে সেটিও যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে তেলের যে রিজার্ভ আছে তার প্রায় কাছাকাছি। (যুক্তরাষ্ট্রের তেলের রিজার্ভ ২১ বিলিয়ন ব্যারেল) এবং যুক্তরাজ্যের নর্থ সী'র চেয়ে বেশি (নর্থ সী'তে তেলের রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন ব্যারেল)।

মধ্য এশিয়ার মাটির নিচে এই অভাবনীয় পরিমাণ তেল সম্পদের আবিষ্কার পশ্চিমা দেশগুলোকে বিস্মিত করে এবং একই সঙ্গে ওই অঞ্চল নিয়ে তাদের নতুন করে উৎসাহিত করে তোলে। অত্যুৎসাহী তেল বিশেষজ্ঞরা সে সময় এসব মন্তব্যও করেন যে, যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও উত্তোলন করা সম্ভব হলে কাজাকিস্তানের তেল সম্পদ সৌদি আরবের চেয়েও বেশি হবে, আর তুর্কমেনিস্তানে যে পরিমাণ তেল রয়েছে তা পরিমাণের দিক থেকে গোটা বিশ্বের তালিকায় পঞ্চম। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ৪টি তেল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সেখানে সাইজমিক অনুসন্ধান চালানোর কাজ শুরু করে। বিলি, মবিল, ষোল এবং টোটাল এই জন্য ব্যয় করে প্রায় ২০ কোটি ডলার।

সমস্যাটি দেখা দেয় প্রাপ্ত তেল ও গ্যাস সম্পদের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে। এই তেল উত্তোলনের পর তা ওই এলাকা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার উপায় কি ? কেননা এর আশপাশে কোন সমুদ্র বন্দর নেই। চারদিকেই হল পাহাড়-পর্বত, জমিজমা। পাইপলাইন স্থাপন করে এই সম্পদকে পণ্যের আকারে বিশ্ব বাজারে আনার জন্য ৫টি বিকল্প উপায় পাওয়া যায়। প্রথমটি চীনের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয়টি প্রতিবেশী জর্জিয়ার বাকু হয়ে কৃষ্ণ সাগরে। অথবা বাকু হয়ে তুরস্কে। চতুর্থটি আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তানে। পঞ্চমটি চেচনিয়া হয়ে রাশিয়ায় (বিস্তারিতের জন্য দ্রষ্টব্য যুক্তরাষ্ট্র জ্বালানি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে-www.eia.doe.gov/emeu/casproute.html)।

www.pathagar.com

সঙ্গত কারণেই সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে এ নিয়ে শুরু হয় টানাপোড়েন। আর অন্যদিকে শীর্ষস্থানীয় তেল কোম্পানিগুলো চেষ্টা করতে থাকে তেল উত্তোলন, পরিশোধন, পরিবহন ও বিক্রির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সম্ভাব্য বিকল্পগুলোর কোনটিই খুব আকর্ষণীয় ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলো চায়নি যে, তেলের প্রবাহ রাশিয়া বা আজারবাইজান হয়ে বিশ্ববাজারে আসুক। এতে করে গোটা মধ্য এশিয়ার রাজনীতি রুশনির্ভর হয়ে পড়বে। তদুপরি তা বিশ্ব অর্থনীতিতে রাশিয়ার ক্ষমতাকেও বৃদ্ধি করবে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যদের পরাস্ত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের ১০ বছরের লড়াইয়ের লক্ষ্যই ছিল দুর্বল রাশিয়া তৈরি। ইরানের ভেতর দিয়ে পাইপলাইন বসানো হোক এটা যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করতে পারছিল না। কেননা, তার অর্থ হবে যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোম্পানি তাতে অংশ নিতে পারবে না এবং ইরানের ক্ষমতাসীন মোল্লাতান্ত্রিক সরকারের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। চীনের মধ্য দিয়ে এই তেলের পাইপলাইন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কোন বিবেচনায়ই তেল কোম্পানি ও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গ্রহণযোগ্য সমাধান ছিল না। ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায় পশ্চিমা বিশ্বের জন্য একটি মাত্র বিকল্পই বাকি থাকে-আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তানে পাইপলাইন বসানো।

মধ্য এশিয়ার তেল ও গ্যাস সম্পদ নিয়ে বিভিন্ন দেশ এবং তেল কোম্পানি যখন বিভিন্ন বিকল্প বিবেচনা করছে তখন আফগানিস্তানে চলছে মুজাহিদদের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে তুমুল লড়াই-কে কাবুলের দখল ধরে রাখবে। বোরহানউদ্দিন রব্বানী, আহমেদ শাহ মাসুদ, গুলবুদ্দীন হেকমাতিয়ার, ইসমাইল খান রশীদ দোস্তামের নেতৃত্বে সংগঠিত হচ্ছে তালেবান। যে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান বিষয়ে তার সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল তাদেরও উৎসাহ সৃষ্টি হতে শুরু করেছে আফগানিস্তান বিষয়ে। উদ্যোগটি সরকারি পর্যায়ে না এলেও এসেছিল তেল কোম্পানি ইউনোকলের পক্ষ থেকে। সৌদি তেল কোম্পানি ডেল্টার সঙ্গে একত্রে তারা আলোচনা শুরু করে ছোট উপদল তালেবানের সঙ্গে। কারণটি হল সম্ভাব্য পাইপলাইনের পথের অধিকাংশই তখন তালেবান যোদ্ধাদের দখলে। পাকিস্তানের জন্য এই উদ্যোগ ছিল আশীর্বাদ। কেননা, তারাও চাইছিল বিবদমান উপদলগুলোর বদলে তালেবান ক্ষমতা দখল করুক। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে তাই ঘটল ঃ তালেবান কাবুল দখল করল এবং ক্রমেই দেশের অধিকাংল এলাকায় তাদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হল। তালেবানের ক্ষমতা দখলকে তেল কোম্পানিগুলো স্বাগতই জানিয়ে ছিল। কেননা, আফগানিস্তানে একটি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় থাকলে তাদের সঙ্গে আলোচনা, চুক্তি এবং নিয়ন্ত্রণ সহজতর। সাংবাদিক ও আফগানিস্তান বিষয়ক আহমেদ রশীদের গ্রন্থ 'তালেবান' যারা পড়েছেন তারা নিশ্চয় জানেন যে, সে সময় তেল কোম্পানিগুলো আফগানিস্তানকে ভবিষ্যৎ সৌদি আরব বলে বিবেচনা করছিল। ইউনোকলের একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট এমন মন্তব্যও করেছিলেন যে, তালেবান আফগানিস্তানে স্থিতিশীলতা আনতে সক্ষম হবে।

১৯৯৭ সালের অক্টোবরে আফগানিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং পাকিস্তান পাইপলাইন স্থাপনের জন্য চুক্তি করে। দু'টি আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম এই পাইপলাইনের কাজের জন্য দরপত্র জমা দিয়েছিল। একটি ছিল আর্জেন্টিনার ব্রাইডাসের নেতৃত্বে। অন্যটি ইউনোকলের নেতৃত্বে। ইউনোকলের নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়ামের অন্য সদস্যরা ছিল

www.pathagar.com

তুর্কমেনিস্তানে সরকার, সৌদি তেল কোম্পানি ডেল্টা, পাকিস্তানের ক্রিসেন্ট গ্রুপ, দক্ষিণ কোরিয়ার হুয়ানতাই, জাপানের ইটোচি। এসব কোম্পানি বা সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর জন্য তখন তালেবানের পশ্চাৎপদ নিপীড়নমূলক ধর্মান্ধ শাসন ব্যবস্থা কোন বিবেচ্য বিষয় ছিল না। অক্টোবরের এই পাইপলাইনের চুক্তি ও ইউনোকলের নেতৃত্বে কোম্পানিগুলোর কাজ পাওয়ার প্রত্যাশা অবশ্য নতুন কিছু না। মধ্য এশিয়া থেকে গ্যাস সরবরাহের জন্য ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসেই একই প্রতিষ্ঠানের গড়া আরেকটি কনসোরটিয়াম কাজ পেয়ে গিয়েছিল। এসব কাজে মোট পরিমাণ সবচেয়ে রক্ষণশীল হিসেবেও ছিল সাড়ে ৪ হাজার কোটি ডলার। যদিও যুক্তরাষ্ট্র সরকার কাবুলে ক্ষমতাসীন তালেবানকে স্বীকৃতি দেয়নি, তাদের এ নিয়ে কোন আপত্তি তারা তখন প্রকাশ করেনি। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের অনেক গণমাধ্যমে তখনই তালেবানের নীতি বিশেষত নারীদের বিষয়ে নিপীড়নমূলক নীতি নিয়ে আপত্তি করতে শুরু করেছে। ইউনোকল এই বিষয়ে কোন কর্ণপাত করেনি। উপরন্তু পাইপলাইন তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য আফগানিস্তান থেকে ১৩৭ জন আফগানকে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব নেব্রাস্কায় নিয়ে আসে (দ্রষ্টব্যঃ ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮)। সেজন্য ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৯ লাখ ডলার। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে তালেবান সরকারের সঙ্গে গ্যাস পাইপলাইন বিষয়ে ইউনোকলের আনুষ্ঠানিক চুক্তি সই হয়।

১৯৯৮ সালের গোড়াতেই আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে রণাঙ্গনে এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির জগতে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। উত্তরাঞ্চলীয় জোট তাদের অবস্থান শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়। হয় এবং রাশিয়া এই জোটকে অস্ত্র সরবরাহ শুরু করে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে তালেবানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সুদান থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ওসামা বিন লাদেন আশ্রয় নেন আফগানিস্তানে। ওসামা বিন লাদেন ও তার সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক আল কায়দার আফগানিস্তানে আশ্রয় নেয়ার পেছনে আফগানিস্তানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অন্যতম কারণ। ওসামা বিন লাদেন দেশটিতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে এর সুযোগ-সুবিধাগুলো ভাল করে জানেন। তদুপরি বিপুল অর্থের কারণে তালেবান যে তাকে আশ্রয় দেবে সেটা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এখানে লুকিয়ে থাকা কোন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা যে কত কঠিন সেটা সম্প্রতি মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফিল্ডের বক্তব্যেই স্পষ্ট : 'খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজার মতো কঠিন।' পূর্ব আফ্রিকার দু'টি দেশে মার্কিনী দূতাবাসে বোমা হামলার ঘটনার পর পর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ২০ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে বিমান হামলা চালায়। পরের দিনই ইউনোকল এক বিবৃতিতে জানায়, যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের স্বীকৃত কোন আফগান সরকার ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত তারা পাইপলাইন বসানোর কাজ স্থগিত করছে। ইউনোকল ডিসেম্বরের ৮ তারিখ কনসোরটিয়াম থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে গ্যাস (বিস্তারিতের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট : www.eia.doc.gov/emeau/cabs/afghan.html)। ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রকল্পগুলো আবার চালু করার ব্যাপারে তালেবান, পাকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান ঐকমত্যে পৌঁছেছে। মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে তেল ও গ্যাস সম্পদ আবিষ্কার হওয়ার পর থেকেই আফগানিস্তানের বিষয়ে বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠান নতুন করে উৎসাহ দেখিয়েছে। পাইপ লাইনে স্থাপনের জন্যে আফগানিস্তানের প্রয়োজন না থাকলে এই

www.pathagar.com

উৎসাহ যে থাকতো না তা সোভিয়েত বাহিনীর প্রত্যাহার ও কাবুল দখল নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপদলীয় সংঘাতের সময়টি সংবাদপত্র পড়লেই বোঝা যায়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় যদি অন্য পথে তেল ও গ্যাস নেয়া অধিকতর লাভজনক হতো তবে ভূগোলের এই দায় আফগানিস্তানকে হয়তো বইতে হতো না। কিন্তু এখন আফগানিস্তানকে সে দায় বইতেই হবে, যেমনটি অতীতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সময় বইতে হয়েছে। ❑

নভেম্বর' ০১

লেখখ ঃ প্রবাসী, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক।

তারা জানেনা তাদের কি অপরাধ।

www.pathagar.com

আফগানিস্তান ঃ রক্তাক্ত অতীত, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

(দুই)

সৌদি কোটিপতি ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতার অভিযোগ এবং তাকে আশ্রয় দেয়ার কারণে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের সূচনা হয়েছে তার কারণ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। কিন্তু আফগানিস্তানে যে উগ্র ধর্মীয় শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে এবং ১৯৯৩ সাল থেকেই একটি নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা চালু রয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করাও জরুরি। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সে বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে সত্তর ও আশির দশকের ঠাণ্ডা লড়াই, সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা, সোভিয়েত ইউনিয়নের অপরিণামদর্শী আচরণের প্রসঙ্গ উঠবে। এসবের তাৎপর্য ছোট না করেও আমাদের নজর দিতে হবে আফগানিস্তানের ইতিহাস ও সমাজ কাঠামোর দিকে। যেখানে এ ধরনের পরিস্থিতির উপাদান উপস্থিত রয়েছে। কেননা, ১৯৮৯ সালের পর বিশেষত ১৯৯২ সালে কাবুলে নজিবুল্লাহ সরকারের পতনের পর পরাশক্তিগুলো আফগানিস্তানকে বিস্মৃত হয়েছিল বলেই এখন অভিযোগ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, যে যুদ্ধের জন্য আমেরিকা আফগান জনগণকে উসকানি দিয়েছে, মদদ জুগিয়েছে, সাহায্য দিয়েছে-বিজয়ী হওয়ার পর আমেরিকা তাদের কোনরকম মূল্যই দেয়নি। আফগানিস্তানে মার্কিনবিরোধী মনোভাবের এটাই যদি প্রকৃত কারণ হয়, তবে সেখানে যে সরকার ও শাসন কাঠামো গড়ে উঠেছে তাকে একেবারে নিজস্ব বলেই মেনে নিতে হয়। ঘোর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ব্যক্তিকেও স্বীকার করতে হবে যে, তালেবান শাসকরা সে দেশের জনগণের জন্য কোন আশীর্বাদ নয়। তাহলে এরকম একটা শাসকগোষ্ঠী কিভাবে সৃষ্টি হল ? অতীতের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে যদি প্রশ্নটিকে ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় রেখে সাজাই তবে তা হবে এ রকম ঃ আফগানিস্তানে কি এ ধরনের আরেকটি শাসকগোষ্ঠী ও শাসন ব্যবস্থাই চালু হবে তালেবানের পতনের পর। আমার ব্যক্তিগত অনুমান হল এ মুহূর্তে সেটি ছাড়া আর কোন সম্ভাবনা নেই।

আমার এই অনুমানের একটি কারণ হল, তালেবানের বিকল্প হিসাবে উপস্থিত শক্তির রাজনৈতিক পরিচয়। পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলো এবং রাশিয়া এ মুহূর্তে খোলামেলাভাবেই

www.pathagar.com

উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে। পেশোয়ার, দুশানবে এবং রোমের বৈঠকগুলোতেও এটাই বলা হচ্ছে যে, দেশের উত্তরাঞ্চলের এলাকাগুলোতে যুদ্ধরত জোটকে ক্ষমতায় আনাই হচ্ছে একমাত্র পথ। কিন্তু এ কথা ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই যে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত এই জোটের সদস্যরাই কাবুলে ক্ষমতাসীন ছিল। ১৯৯৫ সালে এই জোটের শরিকদের মধ্যে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লড়াইয়ের কাবুলে গোলন্দাজ হামলায় কমপক্ষে ২৫ হাজার লোক মারা যায়। এর অধিকাংশই ছিল নিরীহ বেসামরিক ব্যক্তি। আহমেদ শাহ মাসুদের নেতৃত্বাধীন আংশিক ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে কাবুলের হাজারা অধ্যুষিত এলাকায় হত্যা ও ধর্ষণের এক মহোৎসব চালায়। গত কয়েক বছর ধরে যুদ্ধ চালানোর সময়ও তাদের বর্বরতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৯৯৭ সালের মে মাসে তালেবানরা মাজার-ই শরিফ দখলের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। সে সময় উত্তরাঞ্চলীয় জোটের জেনারেল আবদুল মালিকের সৈন্যরা ৩ হাজার যুদ্ধবন্দিকে নির্বিচারে হত্যা করে। ১৯৯৮ সালের মাসুদের অনুগত বাহিনী কাবুলের বেসামরিক এলাকায় বোমাবর্ষণ করে কমপক্ষে ১৮০ জনকে হত্যা করেছে। এসব তথ্য প্রমাণ করে যে, বর্বরতা কেবল তালেবানের একক সম্পত্তি নয়। আফগানিস্তানে উভয় পক্ষ, বলা যায় সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই বর্বরতা ও অমানবিক আচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারে।

কিন্তু আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসকদের সম্পর্কে উদ্বেগের কারণটি কেবল সেখানেই নিহিত নয়। আফগানিস্তানের গত আশি বছরের ইতিহাস লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আফগানিস্তানে একটি আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি। সমাজের অভ্যন্তরের সামন্তবাদী শক্তিই দেশের নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে এবং আফগান জনগণ একটি জাতিতে পরিণত হতে পারেনি। সহজ করে বললে, আজকে আফগানিস্তান বলে যে ভূখণ্ডকে আমরা চিনি তা কোন দেশ নয়। এখানে কোন রাষ্ট্র নেই এবং আফগান বলে কোন জাতির অস্তিত্বই নেই। আফগান ইতিহাসের আধুনিক পর্বের সূচনা হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের মধ্য দিয়ে ১৯১৯ সালে। কিন্তু ১৯২৩ সালে দেশের প্রথম সংবিধান ঘোষণার মধ্য দিয়ে আধুনিক আফগানিস্তানের যাত্রা শুরু। ক্ষমতাসীন আমীর আমানুল্লাহ সংবিধান জারি করে সংস্কারের কাজে হাত দেন। অর্থনীতি ও সমাজে গেড়ে বসা সামন্ততন্ত্রের ভিত দুর্বল করার জন্য তার চেষ্টা বেশিদূর এগুতে পারেনি। ১৯২৯ সালে বাদশাহ আমানুল্লাহ ক্ষমতাচ্যুত হন। বহিঃশত্রুর হামলা ও অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াইয়ে পরবর্তী চার বছর আফগানিস্তান কার্যত অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়। ১৯৩৩ সালে জহির শাহ ক্ষমতায় আসীন হন। বাদশাহ আমানুল্লাহর শাসনের একটি অন্যতম সাফল্য ছিল মহিলাদের বাধ্যতামূলক বোরখা পরার অবসান এবং সমাজ ও অর্থনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ। সেটি ১৯২৯ সালের পরে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। জহির শাহ ক্ষমতায় আসার পর তিনি আবার সংস্কার কাজে হাত দেন, তবে এবার তার গতি ছিল অত্যন্ত ধীর। ১৯৫২ সালে এসে এসব সংস্কারের প্রথম প্রভাবটি বোঝা যায় যখন নির্বাচনের পরে আফগান জনসাধারণ তাদের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য রাজপথে নেমে আসে। স্পষ্টতই সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন শিথিল হয়ে যাচ্ছিল এবং আধুনিক চিন্তাধারা রাজনীতিতে সংহত হচ্ছিল। ১৯৫৯ সালে কাবুলের রাস্তায় আবারও মহিলাদের বোরখা ছাড়া দেখা যায়। ১৯৬৪ সালে নতুন সংবিধান তৈরি হয় এবং পরবর্তী বছর প্রথমবারের মতো নারীরা দায়িত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বশীল পদে আসীন হতে

www.pathagar.com

থাকেন। আফগান শিক্ষার্থীরা দেশের বাইরে শিক্ষালাভ করতে শুরু করেন এবং কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তচিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। দেশের উদার রাজনৈতিক আবহাওয়ায় প্রথমবারের মতো বামপন্থীদের সংগঠন তৈরি হয় ১৯৬৫ সালে-পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব আফগানিস্তান। (পিডিপিএ)। ১৯৬৬ সালে ক্ষমতাসীনদের আনুকূল্যে উদারপন্থী বুর্জোয়া সংগঠন প্রগ্রেসিভ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির আবির্ভাব ঘটে। ষাটের দশকের এই সময়টিতে সারাবিশ্বেই বামপন্থী ও রেডিক্যাল আন্দোলনের জোয়ার চলছিল। আফগানিস্তান তা থেকে দূরে থাকেনি। বামপন্থী দলটি ১৯৬৭ সালে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভক্তির পেছনে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের পাশাপাশি (জাতিগত পশতুন বনাম অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী) কারণ হিসাবে কাজ করে। এসব সত্ত্বেও ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তানে যে সংস্কার চলছিল তাতে দেখা যায়, একটি বুর্জোয়া জাতি রাষ্ট্রগঠনের উপাদানগুলো ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর শক্তিকে দুর্বল করে ফেলছে। রাজনীতিতে তখন দু'টি বিরোধী শক্তি উপস্থিত-বিকাশমান উদারনীতিক বুর্জোয়া এবং বাম মতাবলম্বীরা। প্রথম পক্ষ চাইছে রাজতন্ত্রকে বহাল রেখে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করে মোল্লাতন্ত্র শক্তিকে ধীরে ধীরে খর্ব করে অগ্রসর হতে এবং দ্বিতীয় পক্ষ চাইছে সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ, মোল্লাতন্ত্রকে মোকাবেলা এবং জাতিগোষ্ঠীর সুবিধাকে খর্ব করতে।

রাজনীতির এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক সংকটের মুখে জহির শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করেন তারই পরিবারের সদস্য মোহাম্মদ দাউদ। ১৯৭৩ সালে এই প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও সামরিক অভ্যুত্থানের প্রতি বামপন্থীদের ছিল পূর্ণ সমর্থন। মোহাম্মদ দাউদ রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে দেশটিকে প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা দেন এবং ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে তার অভিযানের সূচনা করেন। মোল্লাতন্ত্রের প্রতিভূ নেতৃবৃন্দের মূল ভিত্তি ছিল গ্রামাঞ্চল যেখানে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বা বুর্জোয়া রাজনীতি কোনটিই বিকাশ লাভ করেনি। ফলে নগরকেন্দ্রিক এসব পরিবর্তনের অন্তর্গত কারণগুলো গ্রামাঞ্চলের ধর্মভীরু ও ঐতিহ্য আশ্রয়ী জনগণের কাছে সুস্পষ্ট ছিল না। দাউদ তার ক্ষমতা সংহত করার লক্ষ্যে শিগগিরই বামপন্থীদের বিরুদ্ধেও অভিযানের সূচনা করেন। ইতোমধ্যে ইসলামপন্থীরা দাউদের ঘনিষ্ঠ হয়েছে। দেশে নতুন সংবিধান জারি করে একদলীয় শাসন চালু করা হয়েছে এবং ক্রমাগতভাবে ডানপন্থী ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এ রকম একটা পটভূমিকায় ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে পিডিপিএ'র দুই অংশ একত্রিত হয়। দাউদের একনায়কী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের অংশ হিসাবে তারা সেনাবাহিনীর ভেতরে তাদের সংগঠনকে সম্প্রসারিত করে। ক্ষমতাসীনরা তার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে নিপীড়ন, হামলা ও হত্যাকাণ্ড বাড়িয়ে দেয়, পিডিপিএ'র অনেক নেতাই গ্রেফতার হয়ে যান। পরিণতিতে ঘটে ১৯৭৮ সালের এপ্রিলের অভ্যুত্থান। দলের সামরিক শাখা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে প্রেসিডেন্ট দাউদ ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে। আফগানিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথমবার দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করেন জহির শাহের পরিবারে বাইরের একজন ব্যক্তি ঃ নূর মোহাম্মদ তারাকী। তারাকী ক্ষমতায় এসে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য উদ্যোগী হলেন। দলের অভ্যন্তরে কলহ আর ৫ বছরের বেশি সময় ধরে সংগঠনের সঙ্গে সাধারণ জনসাধারণের যোগাযোগহীনতার কারণে তারাকীর শাসন ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। দেশের

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষিত হাফিজুল্লাহ আমিন। আমিন ছিলেন দলের ভেতর তারাকী বিরোধী অংশের নেতা। শেষাবধি ১৯৭৯ সালে অক্টোবরে নূর মোহাম্মদ তারাকীকে গোপনে হত্যা করে হাফিজুল্লাহ আমিন রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব হাতে নেন। আমিনের শাসন দু'মাসের বেশি স্থায়ী হয়নি। ডিসেম্বরে পিডিপিএ'র আমন্ত্রণে সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। আমিন আততায়ীর হাতে নিহত হন এবং চেকোস্লোভাকিয়ায় নিযুক্ত আফগান দূত বাবরাক কারমালকে দেশে এনে ক্ষমতায় আসীন করা হয়। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৯ এই ছয় বছর ধরে ক্ষমতার হাত বদল ঘটেছে। ঘটেছে হত্যা ও রক্তপাত। আর তার সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক ছিল সামান্যই কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল দেশের প্রগতিশীল অংশ যখন অভ্যন্তরীণ কলহে ব্যস্ত তখন সামন্ততান্ত্রিক শক্তি মোল্লাতন্ত্রকে আশ্রয় করে নিজেদের সংগঠিত করেছে। যে অনুকূল রাজনীতি উদারপন্থী বুর্জোয়া এবং বামপন্থীদের বিকাশের পথ করে দিয়েছিল জাতিরাষ্ট্র হিসাবে আফগানিস্তানের উদ্ভবের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল আফগানিস্তানের দীর্ঘদিনের জাতি গোষ্ঠীভিত্তিক পরিচয়ের পরিবর্তে একটি জাতির পরিচয়ে শামিল করছিল সেটাই ১৯৭৯ সালে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল। এই পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে পরবর্তী দশ বছরে। একদিকে ক্ষমতাসীনরা জনগণের চোখে বিদেশীদের পুতুল বলে বিবেচিত হতে থাকেন, আর অন্যদিকে ওই শক্তিকে মোকাবেলা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বেছে নেয় সামন্ততান্ত্রিক শক্তিকে। পশ্চাৎপদ মোল্লাদের সমর্থন ও সাহায্য যুগিয়ে তাদের অস্ত্রে সজ্জিত করে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে শিক্ষা দিতে চেয়েছে। পশ্চিমা সাংবাদিকদের ভাষায় মার্কসের বদলে মোল্লাকে কাবুলে পৌঁছে দিতে চেয়েছে, শেষাবধি তাতে মুজাহিদরা চেয়েছে দেশের ক্ষমতা এবং এক পশ্চাৎপদ সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে তার আনুগত্য হল তার জাতিগোষ্ঠীর কাছে। বহুধাবিভক্ত মুজাহিদদের একাংশ সমর্থন পেয়েছে ইরানের। ইরান চেয়েছে আফগানিস্তান যেখানে তার প্রভাব থাকবে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত বরাবর ডুরান্ড লাইনের দু'পাশের পশতুনরা স্বপ্ন দেখেছে এক উপজাতিভিত্তিক ভূখণ্ডের। দেশের অন্য উপজাতি টাজিক, হাজারা, উজবেক-তারা চেয়েছে দীর্ঘদিন ধরে পশতুন আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে তাদের নিজস্ব ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার। এসব পরস্পরবিরোধী আশঙ্কাই রক্তক্ষয়ী গোষ্ঠীগত সংঘাতের রূপ নেয় ১৯৯৩ সালে যখন মুজাহিদরা কাবুল দখল করে। সেটাই হওয়ার কথা ছিল।

আফগানিস্তানে জহির শাহের শাসন অব্যাহত থাকলে ধীরগতির সংস্কারের মধ্য দিয়ে হয়তো একটা জাতিরাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারত, একই সম্ভাবনা পিডিপিএ দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলেও তৈরি হতো। কিন্তু হঠকারী বামপন্থীরা যেমন মোহাম্মদ দাউদকে দিয়ে দ্রুত সংস্কারের চেষ্টা নস্যাৎ করেছে ঃ তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়নের অপরিণামদর্শী আফগান অভিযানও তার জন্য দায়ী। আর স্নায়ুযুদ্ধের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দশ বছরের চেষ্টা আফগানিস্তানে উদার বুর্জোয়া জাতিরাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনার কফিনে শেষ পেরেক ঠুঁকে দিয়েছে। আফগানিস্তানে তালেবান যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন এ নিয়ে পশ্চিমা গণমাধ্যমের প্রচার যদি মনে করা যায় তাহলে দেখা যাবে অধিকতর পশ্চাৎপদ এই গোষ্ঠী নিয়েও তাদের আশাবাদ কত ব্যাপক। পশ্চিমা গণমাধ্যমের পছন্দের পণ্ডিতরা এখন এমন ধারণা দিচ্ছেন যে, কোনক্রমে জহির শাহকে রোম থেকে কাবুলে এনে ক্ষমতায় বসাতে পারলেই ষাটের দশকের আবহাওয়া ফিরে আসবে। একথা বলাবাহুল্য

www.pathagar.com

যে, ২০০১ সালে গত শতাব্দীর ষাটের দশক সৃষ্টি করা অসম্ভব। তাছাড়া আফগানিস্তানে বুর্জোয়া জাতিরাষ্ট্র তৈরির চেষ্টা শুরু হয়েছিল তিরিশের দশকের কমপক্ষে তিরিশ বছর পর। সে সময় একটি আধুনিক রাষ্ট্রের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। গত কুড়ি বছরে সেই প্রক্রিয়া কতটা পিছিয়ে গেছে তা সংখ্যা দিয়ে বোঝানো যাবে না। কিন্তু আফগানিস্তানের বিবদমান জাতিগোষ্ঠীগুলোর নেতৃত্ব, তাদের ধ্যান-ধারণার দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে, তাদের আনুগত্য কোথায়।

পেশোয়ার, দুশানবে এবং রোমে যারা আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ তৈরির চেষ্টা করছেন তারা এটা জানেন, ওয়াশিংটন, লন্ডন, মস্কোর নীতিনির্ধারকরাও সেটা ভাল করেই বোঝেন। যে কারণে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য হল জাতি গঠন প্রক্রিয়ার সূচনা করা। সেই কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, পশতুন জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রয়োজন ভবিষ্যৎ সরকারে তালেবানের কেউ কেউ থাকলে তাদের আপত্তি নেই। রাশিয়ার এ নিয়ে আপত্তি রয়েছে। সেসব মতপার্থক্য শীতের আগে বা রমজান মাস শুরুর আগে সমাধান হবে আশা করা ঠিক নয়। সেই বিবেচনায় আফগানিস্তানে যুদ্ধ হবে দীর্ঘমেয়াদী, আর তার ভবিষ্যৎ ১৯৮৯ সালের মতোই অনিশ্চিত ও তমসাবৃত। ❑

নভেম্বর' ০১

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে মার্কিন বর্বরতা পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলো আড়াল করে যাচ্ছে

আহমদ জামিল

কৌশলগত কারণে তালিবান ও তাদের মিত্র ওসামা বিন লাদেনের আল কায়েদা নেটওয়ার্ক কাবুল, জালালাবাদ, মাজার-ই-শরীফসহ বেশ কিছু বড় বড় শহর থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেবার ঘটনাকে মার্কিনসহ পশ্চিমা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত ও ইহুদীবাদী ইসরাইলের সংবাদ মাধ্যমগুলো প্রচার করছে যে, আফগানিস্তানে তালিবান শাসনের অবসান ঘটেছে। ফলাও করে ছবিসহ বেপর্দা কিছু নারী এবং উচ্ছৃঙ্খল পুরুষের দাড়ি কামানো, ক্যাসেট প্লেয়ার হাতে নিয়ে নাচানাচি করে গান শোনার খবরা-খবর প্রচার করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, তালিবান শাসকরা ধর্মের নামে কিভাবে আফগান জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করেছিল। প্রচার করা হচ্ছে, তালিবান শাসন এখন আফগানদের কাছে দুঃস্বপ্নের মত।

অথচ এসব সংবাদ মাধ্যম সুকৌশলে চেপে যাচ্ছে, তালিবান শাসকরা ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের বড় অংশ জুড়ে এক ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কায়েম করার পাশাপাশি ধর্ষণ, অবৈধ যৌনাচার বন্ধ করে নারীদের মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষা এবং চুরি, ডাকাতি, হত্যা ও রাহাজানি বন্ধের মত সত্য ঘটনাগুলোকে। এই মহতী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তালিবান শাসকরা যে কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন চালু করেছিল তাকে পশ্চিমা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের সংবাদ মাধ্যমগুলো ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ বলে উল্লেখ করেছে। চলমান আফগান সংকট গোটা মুসলিম জাহানের বিরুদ্ধে খ্রীস্টবাদী, ইহুদীবাদী এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী সংবাদ মাধ্যমগুলোকে অপপ্রচার চালানোর এক সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

প্রিন্টিং ও ইলেকট্রিক সব মিডিয়া মুসলমানদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করে যাচ্ছে। মুসলমানদেরকে অন্ধ, পশ্চিমা বিদ্বেষী, উগ্র ধর্মান্ধ ও অসহনশীল হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলোর কাছে গত ১১ সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কে সংঘটিত সন্ত্রাসী বিমান হামলার সাথে ইহুদীবাদী চক্রের সংশ্লিষ্টতার তথ্য প্রমাণ থাকার পরও এই জ্ঞানপাপীরা ওসামা বিন লাদেন এবং মুসলমানদের ওপর দোষারোপ অব্যাহত

www.pathagar.com

রেখেছে। এমন কি মার্কিন মুল্লুকে সাম্প্রতিক সময়ে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী 'অ্যানথ্রাকস' হামলার সাথে ওসামা বিন লাদেন এবং তার আল কায়েদা নেটওয়ার্ক জড়িত বলে অভিযোগ করেছিল মার্কিন প্রশাসন এবং সেখানকার পত্র-পত্রিকাগুলো।

তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যে নেই তা কিন্তু নয়। এ প্রসঙ্গে গত অক্টোবর মাসে প্রকাশিত ওয়াশিংটন পোস্টের একটি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টের ওই বিপোর্টে বলা হয়েছে, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'অ্যানথ্রাকস' হামলার সাথে আরব সন্ত্রাসীরা জড়িত থাকতে পারে বলে আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় তদন্তকারীদের বেশিরভাগ মনে করেন। তারপরও অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'অ্যানথ্রাকস' হামলার ধরণ দেখে মনে হচ্ছে বাইরের কেউ এর সাথে জড়িত নয়, এ ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তর থেকেই কেউ ঘটাচ্ছে।' ওয়াশিংটন পোস্টের ওই রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়, সিআইএ এবং এফবিআই-এর তদন্তকারীরা 'অ্যানথ্রাকস' হামলার সাথে ওসামা বিন লাদেন এবং তার আল কায়েদা জড়িত আছে এমন কোন তথ্য-প্রমাণ খুঁজে পাননি।

এছাড়া ওয়াশিংটন পোস্ট আরও জানিয়েছে যে, অ্যানথ্রাকস হামলার সাথে বিদেশী কোন সরকার জড়িত কিনা তারও কোন প্রমাণ মার্কিন কর্মকর্তারা পাননি। এই জৈব সন্ত্রাসের সাথে প্রকৃতই কারা জড়িত তা এখনও খুঁজে বের করতে পারেনি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো।

যা হোক, অনুসন্ধানী, বিশ্লেষকদের কেউ কেউ এখন বলছেন, অ্যানথ্রাকস হামলার সূচনা হয় যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্য থেকে। এ অঙ্গরাজ্যে বেশীসংখ্যক ইহুদী বাস করে, যেজন্য এসব রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এ জীবাণু হামলার সাথে কট্টর ইহুদীবাদীদের সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে এসব বিশ্লেষকের অভিমত হল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত উস্কে দেয়ার উদ্দেশ্যে ইহুদীবাদী নীলনকশার আওতায় 'অ্যানথ্রাকস' হামলার সূচনা ঘটানো হয়েছে। তবে কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই ঘোষণা করেছে যে, বিদেশ থেকে অ্যানথ্রাকস আক্রমণ হয়নি, বরং যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য মূল্যবোধের অবক্ষয়কেও দায়ী করছেন কেউ কেউ। কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রে সাবেক দুই মন্ত্রী জুডিপাওয়েল এবং রবার্টসন এক টিভি সাক্ষাৎকারে বরেছিলেন, 'আমেরিকায় লাগামহীন নাগরিক স্বাধীনতা, সমকামিতার ব্যাপক প্রসার, গর্ভপাতের ঘটনা ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় মহান স্রষ্টা মার্কিন জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট এবং এর ফলে সাম্প্রতিক এসব সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে।

অথচ পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলো বারংবার এসব সত্যকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছে। পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলো আফগান সংকটকে কেন্দ্র করে কতটা পক্ষপাতদুষ্ট কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে তার প্রমাণ মিলে বিবিসি ওয়ার্ল্ড টিভি চ্যানেলে সাম্প্রতিক সময়ে পরিবেশিত কয়েকটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। গত অক্টোবর মাসে বেশ কয়েকবার বিবিসি ওয়ার্ল্ডে ১১ সেপ্টেম্বর পেন্টিগন এবং নিউইয়র্কে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনাকে উপলক্ষ করে পশ্চিমা বিশ্ব এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন পেশার নাগরিকদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া উপস্থাপনের জন্য 'প্যানোরোমা' নামের একটি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

www.pathagar.com

এ অনুষ্ঠানে পশ্চিমা বিশ্বের তরফে প্রতিনিধিত্ব করেন ওয়াশিংটনে বসবাসরত বিভিন্ন পেশার বেশকিছু মার্কিন নাগরিক এবং ইসলামী বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে পাকিস্তান। ইসলামাবাদ স্টুডিওতে এ অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা ছিলেন বিবিসি টিভি ও রেডিও'র সংবাদ পাঠিকা নিশা পিলে। এ অনুষ্ঠানে ৮ জন পাকিস্তানী অংশ নেন। এ অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ার আরিফ কোভো এবং স্কুল শিক্ষয়িত্রী আমিনা সাজ্জাদ মুসলমানদেরকে একতরফাভাবে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার বিরুদ্ধে দৃঢ় বক্তব্য রাখেন। তারা প্রশ্ন করেন, হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা ফেলা, কিউবায় আগ্রাসন চালানো- এগুলো কি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ নয়? সেই সাথে তারা জানতে চান প্যালেস্টাইনের ওপর ইসরাইলী বর্বরতা এবং কাশ্মীরে মানবাধিকার লংঘনের ব্যাপারে পশ্চিমা বিশ্ব নীরব কেন।

এ অনুষ্ঠানে পশ্চিমাদের কাছে এ ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়গুলো নিয়ে পাকিস্তানী আলোচকরা যখন আলোচনা ও একের পর এক প্রশ্ন রাখছিলেন সেসময় বিবিসি উপস্থাপিকা নিশা পিলে তাদেরকে দৃষ্টিকটুভাবে থামিয়ে দিতে থাকেন। বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ার আরিফ কোভো তার বক্তব্য পেশকালে যখন বললেন, নিউইয়র্ক ও পেন্টগনে সন্ত্রাসী বিমান হামলা চালানোর মত প্রযুক্তিগত সামর্থ্য ওসামা বিন লাদেনের নেই এবং এ ঘটনার সাথে চরমপন্থী ইহুদীদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, সেসময় নিশা পিলে একথার কোন প্রমাণ নেই বলে জনাব আরিফকে তার বক্তব্য শেষ না করতে দিয়ে তাকে থামিয়ে দেন।

আবার জনৈক বক্তা মুসলিম টেরোর কথাটির ব্যাপারে তার প্রবল আপত্তি জানিয়ে যখন প্রশ্ন তোলেন - ওকলাহামায় বোমা বিস্ফোরণ, গোল্ডস্টাইন কর্তৃক জেরুজালেমের এক মসজিদে নামাজ আদায়রত মুসল্লিদের ওপর নির্বিচারে গুলীবর্ষণ করে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার পরেও পশ্চিমা বিশ্ব কেন খ্রীস্টান সন্ত্রাসী এবং ইহুদী সন্ত্রাসী কথাটি ব্যবহার করে না। তখন একইভাবে নিশা পিলে তাকেও থামিয়ে দেন। এর আগে বিবিসি সাংবাদিক লিজ ডুসেট পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামের নেতা কাজী হোসাইন আহমদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময়ও একই আচরণ করেছিলেন। 'হার্ডটক' নামের ওই অনুষ্ঠানে তালিবান, ওসামা বিন লাদেন, আফগানিস্তানের ঘটনা এবং পশ্চিমা বিশ্বের ভূমিকার ব্যাপারে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ কথা বলার চেষ্টা করলে তাকে লিজ ডুসেট বাধা প্রদান করেছিলেন।

আর এসবই হল পশ্চিমা বিশ্বের মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদানের নমুনা। মুসলিমবিদ্বেষী পশ্চিমা বিশ্ব দুনিয়াব্যাপী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীবাদী, খ্রীস্টবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা কথিত মানবাধিকারের সত্য ঘটনাগুলো চাপা দিতে চায় নানাভাবে। তাছাড়া আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আমেরিকা বিভিন্ন পশ্চিমা দেশ এবং গণমাধ্যমগুলোর সাথে আঁতাত করে মার্কিনীদের নৃশংস হামলার খবরা-খবর প্রচার করতে দিচ্ছে না। শুধু তাই নয়, আফগান যুদ্ধের পটভূমিতে মুসলিমবিদ্বেষী পশ্চিমা বিশ্বে এবং প্রাচ্যের কিছু অমুসলিম দেশে মুসলমানদেরকে ধর্মান্ধ, উগ্রপন্থী এবং সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে। আর এর পাশাপাশি মুসলিম বীরদেরকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

এই নভেম্বর মাসে বিবিসি টিভি চ্যানেলে 'সেঞ্চুরী অব দি পিপলস' নামের এক অনুষ্ঠানে

www.pathagar.com

মৌলবাদের উত্থান বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়। অনুষ্ঠানটিতে মিসর, ইরান এবং পাকিস্তানের ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান নিয়ে বিশদ সচিত্র প্রতিবেদন দেখানো হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল ও ভারতের বেলায় তা দেখানো হয় নিছক দায়সারাভাবে। অর্থাৎ মৌলবাদ এবং ইসলাম যেন পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত সেকথাই তুলে ধরার অপপ্রয়াস চালানো হয় বিবিসি'র ওই অনুষ্ঠানটিতে। তবে মুসলিমবিদ্বেষী অপপ্রচারের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সবচাইতে এগিয়ে আছে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী কলিকাতায় সম্প্রতি সমাপ্ত দুর্গাপূজার প্রাক্কালে বেশকিছু পূজামণ্ডপে এ সময়ের মুসলিম জাহানের মহানায়ক ও প্রেরণার উৎস ওসামা বিন লাদেনকে অসুর হিসেবে দেখানোর অপপ্রয়াস চালানো হয়েছিল। মা দুর্গা ওসামা বিন লাদেনরূপী অসুরকে বধ করছে- এ ধরনের মূর্তি তৈরীতে তারা উদ্যোগী হয়েছিল। যা হোক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের প্রবল বাধার কারণে লাদেনরূপী অসুরের মূর্তি পূজামণ্ডপে তোলা সম্ভব হয়নি। ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের কেন্দ্র পাড়ায় লক্ষ্মীপূজার সময়ও একটি প্যান্ডেলে ওসামা বিন লাদেনের মূর্তি রাখা নিয়ে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হলে পুলিশের বাধার কারণে পূজা কমিটির সংগঠকরা তা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ এবং রাশিয়া, ভারত ও ইরানের পরোক্ষ সামরিক সহায়তা ও মদদে তথাকথিত উত্তরাঞ্চলীয় জোট কাবুল দখল করার পর আফগানিস্তানের বড় বড় শহরগুলোতে ভারতের অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসন শুরু হয়েছে। কাবুলসহ তথাকথিত উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নিয়ন্ত্রিত শহরগুলোতে ভারতীয় চলচ্চিত্র নায়িকাদের অর্ধনগ্ন পোস্টার প্রকাশ্যে বিক্রি শুরু হয়েছে। তালিবানরা অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য হিন্দি সিনেমার একচেটিয়া বাজার আফগানিস্তানের সিনেমা হলগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। খুব শীঘ্রই আফগানিস্তানে উত্তরাঞ্চলীয় জোট নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে সেক্স-ভায়োল্যান্স-সর্বস্ব হিন্দি সিনেমা প্রদর্শন শুরু হতে যাচ্ছে। আর এভাবেই আফগান জনগণকে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করার প্রয়াস চালানো হবে।

উল্লেখ্য, ভারত এখন তালিবানমুক্ত কাবুলে দ্রুত দূতাবাস খোলার উদ্যোগ নিয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, চলমান আফগান যুদ্ধের সময় তথাকথিত উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সৈনিকদের সামরিক ট্রেনিং দিয়েছিল এবং উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছিল দু'জন ভারতীয় জেনারেল। যা হোক, খ্রীস্টবাদী, ইহুদীবাদী এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী সংবাদ মাধ্যমগুলো আফগানিস্তানের তালিবান, ওসামা বিন লাদেন এবং তার আল কায়েদা নেটওয়ার্ককে সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করলেও, তারা আফগানিস্তানে মার্কিন নৃশংসতার কথা সুকৌশলে চেপে যাচ্ছে। আর এই তথ্য সন্ত্রাস, মিথ্যাচার ও সত্যের অপলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে আল জাজিরা। কাতারভিত্তিক আরবী ভাষী এই টিভি চ্যানেলটি আফগানদের ওপর মার্কিন বর্বরতার সচিত্র সংবাদ উপস্থাপন করে যাচ্ছে।

গোটা বিশ্ববাসীকে তারা জানিয়ে দিচ্ছে, মানবাধিকারের ধ্বজাধারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে বিমান থেকে বোমা ফেলে এবং ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে নিরীহ আফগান নারী-পুরুষ-শিশুর প্রাণবধ করছে। বহুসংখ্যক আফগানকে আহত করে চিরজীবনের জন্য পঙ্গু করে দিচ্ছে বাড়ী-ঘর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, হসপিটাল, খাদ্যগুদাম, দোকানপাটসহ

www.pathagar.com

অন্যান্য বেসামরিক স্থাপনা, এমন কি তালিবানবিরোধীদের দ্বারা দখলীকৃত এলাকাগুলোতেও মার্কিন বিমান থেকে বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হচ্ছে। আফগানিস্তানে মার্কিন বর্বরতার কথা ফাঁস করে দেবার কারণে মার্কিন ও ব্রিটিশ সরকার আল জাজিরা টেলিভিশন চ্যানেলের ওপর মহাখাপ্পা। এ কারণেই গত ১৪ নভেম্বর তালিবানরা কাবুল ছেড়ে যাবার সময় মার্কিন যুদ্ধবিমান ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে কাবুলস্থ আল জাজিরা টেলিভিশন অফিস সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলা হচ্ছে, আল জাজিরা টিভি চ্যানেল যাত্রা শুরু করে ১৯৯৬ সালে। প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মধ্যে টিভি চ্যানেলটি আরব বিশ্বের সর্বাধিক দর্শকনন্দিত টিভি চ্যানেলে পরিণত হয়েছে। কেউ কেউ এটিকে আরব বিবিসি বলে আখ্যায়িত করে থাকে। ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় সিএনএন টিভি চ্যানেল যে ভূমিকা পালন করেছিল, বর্তমান সময়ে আফগানিস্তানের ওপর মার্কিন আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে আল জাজিরা সে ভূমিকাই পালন করে যাচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে, আল জাজিরার যে শাখা অফিস কাবুলে রয়েছে তা সম্প্রতি মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস হয়েছে।

যা হোক, কিছুদিন আগেও আল জাজিরা এই স্টুডিও হতে দুঃসাহসী এই দুর্লভ চিত্র তাদের টিভি চ্যানেলে প্রচার করেছে। আল জাজিরার ফুটেজ প্রদর্শিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে সিএনএন, বিবিসি এবং স্কাই নিউজে।

আজ মুসলিম জাহানে আল জাজিরার মত আরও টিভি চ্যানেল প্রয়োজন। আরবী ভাষার পাশাপাশি ইংরেজী ভাষায় টিভির চ্যানেল চালুর বিষয়টিও বিবেচনা করা দরকার। তাহলে গোটা বিশ্বের মানুষ মুসলিম জাহানের খবরা-খবর অবিকৃতভাবে পেতে পারে। আর সেই সাথে ইহুদীবাদী এবং খ্রীস্টবাদীদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমগুলোর তথ্য সন্ত্রাসও কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো তালিবান ও ওসামা বিন লাদেন এবং তার আল কায়েদা নেটওয়ার্ককে সন্ত্রাসী এবং মানবাধিকার হরণকারী হিসেবে চিত্রিত করলেও তারা রাশিয়া, ভারত ও ইরানের মিত্র তথাকথিত উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও লুটপাটের ব্যাপারে প্রায় নীরব রয়েছে। মাজার-ই-শরীফ ও কাবুল দখলে নেয়ার পর উত্তরাঞ্চলীয় জোটে সশস্ত্র ব্যক্তিরা যে গণহত্যা, নির্যাতন ও লুণ্ঠন চালিয়েছে তা তাদের অতীত ভূমিকার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের বর্বরতার দুঃসহ স্মৃতি এখনও বহু আফগানের মনে জাজ্বল্যমান রয়েছে। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এ জোটের সদস্যরাই কাবুলে ক্ষমতাসীন ছিল।

১৯৯৫ সালে এই জোটের শরিকদের মধ্যে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লড়াইয়ে কাবুলে গোলন্দাজ হামলায় কমপক্ষে ২৫ হাজার লোক মারা যায়। এদের অধিকাংশই নিরীহ বেসামরিক ব্যক্তি। মরহুম আহমদ শাহ মাসুদের নেতৃত্বাধীন অংশটি ১৯৯৫ সালের মার্চে কাবুলের হাজারা অধ্যুষিত এলাকায় হত্যা ও ধর্ষণের এক মহোৎসব চালায়। গত কয়েক বছর ধরে যুদ্ধ চালানোর সময়ও তাদের বর্বরতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৯৯৭ সালের মে মাসে তালিবানরা মাজার-ই-শরীফ দখলের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। সে সময় উত্তরাঞ্চলীয় জোটের জেনারেল আবদুল মালিক এবং জেনারেল আবদুল রশীদ দোস্তামের সৈন্যরা ৩ হাজার তালিবান যুদ্ধবন্দীকে নির্বিচারে হত্যা করেছিল।

www.pathagar.com

১৯৯৮ সালে মাসুদের অনুগত বাহিনী কাবুলের বেসামরিক এলাকায় বোমাবর্ষণ করে কমপক্ষে ১৮০ জনকে হত্যা করে। এরপরও পশ্চিমা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের সংবাদ মাধ্যমগুলো উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নৃশংসতা ও বর্বরতার ব্যাপারে একরকম নীরবতা পালন করে চলেছে। শুধু উত্তরাঞ্চলীয় জোট নয়, পশ্চিমা প্রিন্টিং এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো একইভাবে আড়াল করে যাচ্ছে আফগানদের ওপর মার্কিন বর্বরতা ও নৃশংসতার কথাও। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে নিষিদ্ধঘোষিত জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র এবং ক্লাসটার বা গুচ্ছ বোমা ব্যবহার করেছে। মার্কিন ও ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমগুলো আফগানদের ওপর জীবাণু, রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় বোমা হামলার কথা গোপন করেছে।

উল্লেখ্য যে, গত অক্টোবর মাসে জার্মানীর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অটোসিলি বলেছিলেন, জার্মানী ৭ কোটি ৭০ লাখ মার্ক মূল্যের রাসায়নিক অস্ত্র নির্মাণের উপাদান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানী করেছে। এর আগে জার্মানীর প্রতিরক্ষামন্ত্রী রুডোল্ফ শার্পভিল বলেছিলেন, জার্মানীতে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের উৎপাদন আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা হচ্ছে, জাতিসংঘের কনভেনশন অনুযায়ী যে কোন যুদ্ধে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী জার্মানী ১৯২৫ সালের ২২ এপ্রিল সর্বপ্রথম বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬১ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সময়ে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে জীবাণু অস্ত্র 'এজেন্ট অরেঞ্জ' ব্যবহার করেছিল।

শুধু রাসায়নিক নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আফগানদের ওপর ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধ বোমাও ব্যবহার করেছে। গত অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে নিযুক্ত তালিবান রাষ্ট্রদূতের ডেপুটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, 'মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানের নিরীহ জনগণের ওপর ইউরেনিয়ামযুক্ত বোমা ব্যবহার করছে। মার্কিন হামলায় যেসব আফগান নাগরিক আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে, তাদের অনেকেরই দেহে ইউরেনিয়ামের আলামত পাওয়া গেছে'। এছাড়া তালিবান এবং আল কায়েদা নেটওয়ার্কের অবস্থান ধ্বংসের নামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখনও বেপরোয়াভাবে ক্লাসটার বোমা ব্যবহার করে যাচ্ছে। এতে হতাহত হচ্ছে অসংখ্য সাধারণ আফগান।

এই ক্লাসটার বোমা হাতের মুঠোর আকৃতির একটি শক্তিশালী ক্ষুদ্র বোমা। প্রতিপক্ষের সমরাস্ত্র ও সরঞ্জাম ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এ বোমায় সৈন্যরাও হতাহত হয়। ধাতব খোলসের আবরণে মোড়া এ বোমা অনেক জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্থলমাইনের মতই এ বোমাটি দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি বহন করে। মাটিতে বিস্ফোরিত না হওয়া বোমাগুলোর আঘাতে যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেকদিন পরও সাধারণ মানুষ হতাহত হতে পারে। এ কারণে যুদ্ধে ক্লাসটার বোমা ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯ নভেম্বর এ প্রতিবেদনটি লেখার সময় পর্যন্ত আফগানিস্তানের মাটিতে মার্কিন বিমান হতে প্রায় ২৫ হাজার ক্লাসটার বোমা ফেলা হয়েছে।

অন্যদিকে মার্কিনীরা আফগান যুদ্ধে সাত হাজার কেজি ওজনের ডেইজিকাটার বোমাও ব্যবহার করেছে। এ আলোচনা হতে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, জাপান ও ভিয়েতনামের মত আফগানিস্তানের জনগণকেও গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার

www.pathagar.com

নির্মিত অত্যাধুনিক সব অস্ত্রশস্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে চেয়েছে। মার্কিনীদের এই অমানবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার শিকার হয়েছে হাজার হাজার নিরপরাধ আফগান নারী-পুরুষ-শিশু। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখন এতই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলো শত চেষ্টা করেও আফগানিস্তানে মার্কিন বর্বরতার কথা আর আড়াল করতে পারছে না।

এমন কি মার্কিন সংবাদ মাধ্যমগুলোও এখন সত্য ঘটনা প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে। আর এ কারণেই মার্কিনসহ পশ্চিমা বিশ্বের বিবেকবান মানুষেরা আফগানিস্তানের ওপর মার্কিন সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠছে ক্রমশ। প্রতিবাদী জনতা রাজপথে নেমে এসেছে। তবে এসব কিছুর পরও একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, আফগানিস্তানে মার্কিনীদের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার কথা আড়াল করতে গিয়ে মার্কিন ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশের সংবাদ মাধ্যমগুলো শুধু মুসলিম জাহান নয়, পশ্চিমা বিশ্বের বহু সাধারণ মানুষের কাছেও তাদের আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকখানি হারিয়েছে। ❑

১৯ নভেম্বর '০১

লেখক ঃ কলামিষ্ট

আমার অপর হাতটি রক্ষা পাবে তো!

www.pathagar.com

আফগানিস্তান তালিবান নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়ার পর মহাসংকটের মুখে মুসলিম উম্মাহ

(দুই)

তালিবান শাসনের অবসান শুধু আফগানিস্তান নয়, গোটা মুসলিম জাহানের জন্যও একটা অশনি সংকেত। বিভক্তি যে মুসলমানদের কতটা ক্ষতিসাধন করতে পারে আজকের আফগানিস্তান তার জ্বলন্ত উদাহরণ। তালিবানদের বিরুদ্ধে যে উত্তরাঞ্চলীয় জোট যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে তারাও মুসলমান। এই উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নেতাদের অতি ক্ষমতা লিপ্সা এবং অন্ধ প্রতিশোধপরায়ণতার কারণে তারা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করছে। তাদের কাঁধে বন্দুক রেখে হাজার হাজার মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্য আফগানিস্তানের মাটিতে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। তারা এই পবিত্র রমজানের সময়ও বিমান থেকে নির্বিচারে বোমা ফেলে এবং ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে শত শত নিরপরাধ আফগানের প্রাণ হননের সাহস পাচ্ছে এ কারণেই।

মার্কিন বর্বরতার বিরুদ্ধে তথাকথিত উত্তরাঞ্চলীয় জোট প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। কারণ সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধাচরণ করার মত নৈতিক সাহস তাদের নেই। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের অনেকের কাছে বিধর্মী মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যরা দুশমন নয়, তাদের জানিদুশমন হল জেহাদের জন্য আফগানিস্তানে আসা পাকিস্তানী, আরব, চেচেন ও কাশ্মীরী স্বেচ্ছাসেবকরা। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সৈন্যরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের মুসলিম ভাই আফগান ও অ-আফগান তালিবানদের রক্তে হোলি খেলতে তিলমাত্র কুণ্ঠিত হচ্ছে না।

অন্যদিকে ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কে রহস্যজনক বিমান হামলার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাদেনকে গ্রেফতারের ছুতো ধরে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান যখন চূড়ান্ত করে ফেলে সে সময় তালিবান সরকারের উচিত ছিল ইসলাম ধর্ম এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের শরিকদের মধ্যে যারা তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য তাদের সাথে ঐক্য গড়ে তোলা। এটি সম্ভব হলে দেশের অভ্যন্তরে তালিবানরা এতটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ত না। তাহলে আফগানদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি মার্কিন ও ব্রিটিশ হামলা মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারত।

www.pathagar.com

কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। আফগানদের অনৈক্য ও বিভক্তির সুযোগ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ইউরোপীয় মোসাহেব গ্রেট ব্রিটেন আফগানিস্তানে ব্যাপক বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর পর এখন তারা তাদের হাজার হাজার সৈন্য আফগান ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করিয়েছে। উত্তরাঞ্চলীয় জোট নেতা অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন রাব্বানী ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য আফগান ভূখণ্ড অবতরণের ব্যাপারে যতই উদ্বেগ ও অস্বস্তি প্রকাশ করুন না কেন, তাতে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটবে বলে মনে হয় না। ধারণা করা হচ্ছে, আফগানিস্তানের মাটিতে দীর্ঘ অবস্থানের পরিকল্পনা নিয়ে মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যরা সেখানে প্রবেশ করেছে।

মার্কিন কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, তাদের সৈন্যরা কারোর নিরাপত্তা বিধান নয়, যুদ্ধ জয়ের জন্যই আফগানিস্তানের মাটিতে পা রেখেছে। এ থেকেই মার্কিনীদের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এ তো গেল আফগানিস্তানের কথা। আফগানিস্তানের দুই শক্তিধর মুসলিম প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান এবং ইরানও আফগান সংকট মোকাবিলায় সঠিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। মার্কিন চাপের কাছে নতিস্বীকার করে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ তালিবানবিরোধী অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানের অস্তিত্বের জন্য এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তালিবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তান পাকিস্তানের জন্য ভূ-রাজনৈতিক, রণকৌশলগত এবং অর্থনৈতিক দিক হতে সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরী করেছিল।

এখন তালিবানমুক্ত আফগানিস্তান এসব ক্ষেত্রে পাকিস্তান নয় বরং বৈরী দেশ ভারতের জন্যই সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করছেন অনেক বিশ্লেষক। ইতোমধ্যে ভারত কাবুলে দূতাবাস চালুর উদ্যোগ নিয়ে এবং আর্মি মেডিকেল টিম পাঠিয়ে পাকিস্তান সরকারকে বেশ অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলেছে। অন্যদিকে ইরান ইসলামের ব্যাপারে অনেক বড় বড় কথাবার্তা বললেও তাদের বাস্তব কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বিপরীত। ইরান উত্তরাঞ্চলীয় জোট, বিশেষ করে শিয়া মতাবলম্বী হাজারা উপজাতিভিত্তিক গ্রুপ হেজবে ওয়াদুদকে অস্ত্র ও রসদ সামগ্রী জুগিয়ে আসছে।

ইরানী নেতৃবৃন্দ সংকীর্ণ শিয়া মতবাদের উর্ধ্বে উঠতে না পারার কারণে এটি ঘটেছে। সুতরাং এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, ইরানের আফগাননীতি ইসলাম বা মুসলমানদের বৃহত্তর কল্যাণে নিবেদিত নয়। এ ভূমিকা পালন করে ইরানী নেতৃবৃন্দ যে আত্মঘাতী পথে পা বাড়িয়েছেন তা তারা অচিরেই বুঝতে পারবেন। কারণ মার্কিন ও তার পশ্চিমা মিত্রদের প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের অস্তিত্বের প্রতিও যে কোন সময় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। আর ইরান সমর্থিত উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কাঁধে বন্দুক রেখে মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যরা আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছে সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, আফগানিস্তান তালিবান নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়ার পর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিম দেশ এবং মুসলমানরা এক বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বুশ দম্ভভরা কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, ওসামা বিন লাদেন এবং তার আল কায়েদা নেটওয়ার্কের সদস্যরা ও তালিবান নেতা মোল্লা ওমর আফগানিস্তানের যে স্থানে কিংবা যে দেশেই আশ্রয় গ্রহণ করুক না কেন, সেখানেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালাবে। মার্কিনসহ

www.pathagar.com

পশ্চিমা পত্র-পত্রিকাগুলো গুজব রটাচ্ছে যে, ওসামা বিন লাদেন এবং তার আল কায়েদা নেটওয়ার্কের সদস্যরা আফগানিস্তান ত্যাগ করে সোমালিয়া, সুদান, ইয়েমেন, পাকিস্তান, চেচনিয়া কিংবা আজাদীকামী কাশ্মীরীদের কাছে আশ্রয় নিতে পারে।

বলা বাহুল্য, এ ধরনের অস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে এসব দেশের উপর যে কোন সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অভিযান চালাতে পারে। গত নভেম্বর মাসে মার্কিন দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্ট খবর দিয়েছে, সোমালিয়া ও সুদানে কথিত সন্ত্রাসীরা লুকিয়ে আছে- এ অজুহাতে মার্কিন সেনাবাহিনী দেশ দুটোর উপর হামলা চালাতে পারে। মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগনের বরাত দিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে যে, আফগানিস্তানের উপর হামলা শেষ হওয়ার পরপরই সোমালিয়ার উপর সামরিক হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

দৈনিকটি এর কারণ হিসেবে বলেছে, মার্কিন কর্তৃপক্ষের ধারণা, আল কায়েদার সদস্যরা সোমালিয়ায় পালিয়ে গেছে এবং তারা সে দেশের দক্ষিণে একটি ঘাঁটি নির্মাণ করেছে। এদিকে পাকিস্তান সম্পর্কেও পশ্চিমা পত্র-পত্রিকাগুলো নানা মিথ্যা খবরাখবর প্রচার করছে। কাবুল থেকে তালিবানরা নিজেদের প্রত্যাহার করার আগে ওয়াশিংটন পোস্ট খবর দিয়েছিল, পাকিস্তান গোপনে তালিবান সৈন্যদের অস্ত্র ও রসদ সামগ্রী সরবরাহ করছে। কাবুলসহ আফগানিস্তানের বড় বড় শহর ও এলাকাগুলো তালিবানবিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার পর মার্কিন টিভি চ্যানের সিএনএন এবং সিএনবিসিও পাকিস্তান সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেছিল।

গত ২ নভেম্বর সিএনএন এক খবরে বলেছিল, মার্কিন কর্তৃপক্ষ ১২ জন পাকিস্তানী পরমাণু বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে এফবিআইকে অনুমতিদানের জন্য প্রেসিডেন্ট মোশাররফের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

টিভি চ্যানেলটির ভাষ্য, আমেরিকা দাবী করছে ওই পাকিস্তানী বিজ্ঞানীরা ওসামা বিন লাদেনকে একটি পারমাণবিক গবেষণায় সাহায্যের জন্য আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন। এদিকে আরেক মার্কিন টিভি চ্যানেল সিএনবিসি তার এক প্রতিবেদনে একই ব্যাপারে তিন পাকিস্তানী পরমাণু বিজ্ঞানী সুলতান বশির উদ্দিন, আবদুল মজিদ এবং মির্জা ইউসুফ বেগের নাম উল্লেখ করেছিল। ধারণা করা হচ্ছে, মার্কিন কর্তৃপক্ষের ইশারায় ওই দুই টিভি চ্যানেল এ ধরনের মিথ্যা খবর প্রচার করেছে। এই মিথ্যা খবরের ভিত্তিতে পারভেজ মোশাররফ সরকার দুই পরমাণু বিজ্ঞানী সুলতান বশির উদ্দিন এবং আবদুল মজিদকে গ্রেফতার করে। যদিও পাক সরকার তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিবিআই-এর হাতে তুলে দেয়নি।

তারপরও বেশিরভাগ পর্যবেক্ষক দুই পাকিস্তানী পরমাণু বিজ্ঞানীর গ্রেফতারের ঘটনাকে পাকিস্তানের পরমাণু স্থাপনার উপর মার্কিন খবরদারীর প্রাথমিক সূত্রপাত হিসেবে দেখছেন। যা হোক, ওসামা বিন লাদেনকে সহায়তার জন্য ওই দুই বিশেষজ্ঞ আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন বলে প্রচার করা হলেও আসল ঘটনা হল তারা কাবুলসহ কয়েকটি শহরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পুনঃ স্থাপনের কাজে সাহায্য করার জন্য আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন এবং এ কথা পাকিস্তান সরকারও ভালভাবেই জ্ঞাত। এর আগে খবর পাওয়া

www.pathagar.com

গিয়েছিল মার্কিন সরকার ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্যে পাকিস্তানের প্রস্তুত করা ২৪টি পারমাণবিক বোমা চুরির পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছলে বলে কৌশলে পাকিস্তানের পারমাণবিক ও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনাসমূহ ধ্বংসের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এভাবে পাকিস্তানকে সামরিক দিক দিয়ে শক্তিহীন করে দেয়ার মাধ্যমে দেশটিকে অদূর ভবিষ্যতে টুকরো টুকরো করে ভাগ করা কিংবা ভারতের সাথে বিলীন করে দেয়ার মার্কিন শক্তির দিক হতে দুর্বল পাকিস্তান মুসলিম উম্মাহর জন্যও বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হবে। এর ফলে গোটা বিশ্বে মুসলমানদের উপর খ্রীস্ট, ইহুদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার হবে। বেড়ে যাবে তাদের উপর অমুসলিমদের শোষণ-বঞ্চনা।

আফগান সংকটের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুসলিম জাহানের আরেক শক্তিধর দেশ ইরাকের উপর নতুন করে হামলার পাঁয়তারা করছে। কোন কোন পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমে বলছে যে, আফগানিস্তানের পর ইরাক হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান টার্গেট। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ সম্প্রতি এ ব্যাপারে আভাস-ইঙ্গিত দিয়েছেন। আভাস-ইঙ্গিতে বললেও মার্কিন প্রেসিডেন্টের বার্তাটি ছিল খুবই পরিষ্কার।

তার কথায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইটা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সূচনা মাত্র। তিনি বলেন, বিশ্ববাসীকে সন্ত্রস্ত করে তুলতে যেমন বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র গড়ে তুলেছে ইরাক, তার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে জাতিসংঘের পরিদর্শকদের আবারও ইরাকে যেতে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ইরাকের প্রেসিডেন্ট যদি তাতে সহযোগিতা না দেন, তবে কী ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে জনৈক সাংবাদিকের এ প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট বুশ ছোট্ট করে বলেছিলেন, 'সেটা তিনি টের পাবেন'- এ ধরনের বক্তব্য থেকে অনেকেই ধরে নিচ্ছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইটা ইরাকের দিকে প্রসারিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন নীতি-নির্ধারকদের কট্টরপন্থী অংশ বলে আসছে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অংশ হিসেবে ইরাককেও টার্গেট করতে হবে, তা সে ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে সন্ত্রাসবাদী হামলার সাথে সেদেশের যোগাযোগ থাকুক বা না থাকুক। এসব কট্টরপন্থী মার্কিন নীতি-নির্ধারকের যুক্তি হল পুরনো শত্রুতার হিসাব-নিকাশ করা এবং সেই সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করার এ সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না। সুতরাং জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকদের ইরাকে প্রবেশের অনুমতিদানের বিষয়টি নতুন করে ইরাক আক্রমণের জন্য মার্কিনীদের অজুহাত ছাড়া আর কিছু নয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা হচ্ছে যে, জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শক দলের কেউ কেউ সিআইএ'র হয়ে গোয়েন্দাগিরি এবং ইরাকের সার্বভৌমত্ববিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার কারণে সাদ্দাম হোসেন সরকার জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শক দলকে ইরাক হতে বহিষ্কার করে এবং পুনরায় সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি।

আফগান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানদের উপর দমন-পীড়ন ও হয়রানি বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে মুসলমানদের সম্পর্কে অপপ্রচার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক

www.pathagar.com

'এনথ্রাক্স' হামলার জন্য মুসলমান, বিশেষ করে আরব ও পাকিস্তানীদের দায়ী করা হচ্ছে। এনথ্রাক্স হামলার সন্দেহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা রাজ্যে কয়েকজন পাকিস্তানীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে একজন ডাক্তার এবং দু'জন রসায়নবিদ রয়েছে। অথচ গত ২৮ নভেম্বর জার্মানীর পরিবেশবাদী আন্দোলন 'গ্রীন পীস' তাদের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, আমেরিকার ওষুধ কোম্পানীগুলো এনথ্রাক্স প্রতিরোধক এন্টিবায়োটিক ওষুধের ব্যবসা প্রসারের জন্য সুকৌশলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে এনথ্রাক্সের জীবাণু ছড়িয়ে মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, আফগানিস্তানের যুদ্ধের পটভূমিতে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উপর দমন-পীড়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। চেচেনদের উপর রুশ, ফিলিস্তিনীদের উপর ইসরাইলী এবং কাশ্মীরীদের উপর ভারতীয় শাসকদের অত্যাচারের মাত্রা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। চেচেন, ফিলিস্তিনী ও কাশ্মীরী মুসলমানরা প্রায় প্রতিনিয়ত গণহত্যাযজ্ঞের শিকার হচ্ছেন। পিটিভি পরিবেশিত খবর হতে জানা যায় যে, গত নভেম্বর মাসে ভারতীয় সৈন্যরা ৫২৮ জন নিরপরাধ কাশ্মীরী মুসলমানকে হত্যা করে। শহীদ কাশ্মীরীদের মধ্যে রয়েছে ৩১০ জন পুরুষ, ১১ জন নারী এবং ১০ জন শিশু। এছাড়াও ১৯১ জন কাশ্মীরী নিরাপত্তা হেফাজতে নিহত হয়েছেন। নিরাপত্তা হেফাজতে থাকা ৩০ জন কাশ্মীরী এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।

এছাড়াও ৫৮৮ জন বন্দী কাশ্মীরী মুসলমানকে আটকাবস্থায় প্রচণ্ড নির্যাতন করা হয়। ৩৯৯টি বাড়ীঘর ও দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ করে সেগুলো ভস্মীভূত করা হয়। ৬৭ জন কাশ্মীরী মুসলিম নারীর সম্ভ্রমহানি করেছে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা।

আর আফগানিস্তান তালিবানদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়ার পর সেখানেও চলছে গণহত্যাযজ্ঞ। গত ২৭ নভেম্বর উত্তরাঞ্চলীয় জোটের দখলীকৃত মাজার-ই-শরীফের কালা-ই-জঙ্গী দুর্গে বন্দী ৪৫০ অ-আফগান তালিবানের হত্যারহস্য এখন অনেকখানি উদঘাটিত হয়েছে। স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট বোরহান উদ্দিন রাব্বানী জানিয়েছেন, মাজার-ই-শরীফে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তা উত্তরাঞ্চরীয় জোটের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। তিনি এ ঘটনাকে একটি ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে এর তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন।

এই বর্বর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সউদী আরবের দৈনিক 'আলহায়াত' জানিয়েছে যে, কালা-ই-জঙ্গী কেল্লায় আটক বিদেশী তালিবান যোদ্ধাদের কারাগার রক্ষীরা যখন হাতকড়া লাগাচ্ছিল সে সময় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র দু'জন এজেন্ট বন্দীদের প্রতি উসকানিমূলক মন্তব্য করে তাদের ক্ষেপিয়ে তোলে। এরপরই আমেরিকা ৪০টি হেলিকপ্টার এবং সাহায্যকারী সেনা পাঠিয়ে ৩ দিন ধরে হামলা চালিয়ে ৪৫০ জনের মত বিদেশী তালিবান যোদ্ধাকে হত্যা করে। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বিশ্ব বিবেককে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে এর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানিয়েছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিস ম্যারি রবিনসন কালা-ই-জঙ্গী দুর্গে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের তদন্ত দাবী করে দায়ী ব্যক্তিদের বিচার করার আহ্বান জানিয়েছেন। লন্ডনভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'এ্যমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'ও কালাই-ই-

www.pathagar.com

জঙ্গীতে ৪৫০ জন তালিবান নিহত হওয়ার ঘটনাকে মারাত্মকভাবে মানবাধিকার লংঘন বলে অভিহিত করেছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকার এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চালাতে দিতে জোর আপত্তি জানিয়েছে। কারণ তদন্ত হলে তাদের সন্ত্রাসী ও মানবাধিকার হরণকারীর প্রকৃত চেহারা উন্মোচিত হবে। যা হোক এ প্রেক্ষাপটে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট যদি তদন্ত চালাতে অস্বীকার করে, তাহলে আন্তর্জাতিক তদন্ত চালানো উচিত।

পবিত্র রমজানের এই সিয়াম সাধনার মাসেও হানাদার মার্কিনীরা আফগানদের ওপর সীমাহীন নৃশংসতা চালাচ্ছে। খবরে প্রকাশ, আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে জালালাবাদের ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণের কামা আদো গ্রামে সেহরীর সময় মার্কিন বিমান ২৫টিরও বেশী বোমাবর্ষণ করে। এতে দু'শ নিরীহ গ্রামবাসী নিহত হয়। বোমা বিস্ফোরণে ৩০টি ঘর মাটির সাথে মিশে যায়। সুতরাং এখন উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নেতাদের এ সত্য অনুধাবন করতে হবে যে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্র তালিবানদের উৎখাত কিংবা ওসামা বিন লাদেনকে ধরা বা হত্যা করা নয়, তাদের আসল উদ্দেশ্য হল আফগানিস্তান থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করা।

সুতরাং মুসলিম আত্মপরিচিত এবং অস্তিত্বের স্বার্থে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নেতৃবৃন্দকে আফগান ও বিদেশী তালিবান এবং ওসামা বিন লাদেন ও তার আল কায়েদা সংগঠনের সদস্যদের প্রতি বিদ্বেষী ও প্রতিহিংসামূলক মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে। ইসলামী ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাদেরকে আফগানিস্তানের মাটি থেকে ইসলাম ও মানবতার দুশমন মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীকে বিতাড়িত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এক মুসলমান কখনো আরেক মুসলমান ভাইয়ের দুশমন হতে পারে না। তাই আফগানিস্তানে জেহাদ করতে আসা পাকিস্তানী, আরব, চেচেন, কাশ্মীরী ও বাংলাদেশী কেউই আফগানিস্তানের মুসলমানদের শত্রু হতে পারে না। তাদের আসল দুশমন হল বর্তমান বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

তবে এই রকম বিপর্যয়কর পরিস্থিতি এবং প্রতিকূল অবস্থার মাঝে মুসলিম জাহানের জন্য কিছু স্বস্তিকর ঘটনাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। আফগানিস্তানে তথাকথিত সন্ত্রাসী দমনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করেছিল তা কার্যত ভেস্তে গেছে। কোন মুসলিম দেশ তো দূরে থাক পশ্চিমা দেশগুলোও সাড়া দেয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনকেই শুধু পাশে পেয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণের যে পরিকল্পনা করেছে পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে ফ্রান্স ও জার্মানী তাতে প্রবল আপত্তি জানিয়েছে।

জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইয়োসগার ফিশাস বলেছেন, 'জার্মানীসহ গোটা ইউরোপ বলতে গেলে এ ব্যাপারে পুরোপুরি একমত যে, আমরা ইরাকের দিকে সন্ত্রাসবিরোধী সামরিক অভিযানের বিষয়টিকে অত্যন্ত সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখছি।' আফগানিস্তান কিংবা ইরাকের বিরুদ্ধে যে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চলছে তার বিরুদ্ধে যে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চলছে তার বিরুদ্ধে শুধু মুসলিম উম্মাহই নয়, অমুসলিম বিবেকবান মানুষেরাও প্রতিবাদে শরিক হয়েছেন। লন্ডন, নিউইয়র্ক, মিউনিক ও এথেন্সে শত শত শান্তিবাদী মানুষ

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের ওপর মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ জানাচ্ছে। গত নভেম্বর মাসে ১৬ বছর বয়সী এক লাটভীয় কিশোরী ব্রিটেনের প্রিন্স চার্লসের মুখে চপেটাঘাত করে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার প্রতিবাদ করে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর ওই লাটভীর কিশোরী ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে ১৫ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে।

সুতরাং আফগানিস্তানের ওপর ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এখন বিশ্ব মানবতার প্রতিবাদে রূপ নিয়েছে। যা হোক, এ ধরনের ইতিবাচক ঘটনার পাশাপাশি আর একটি ইতিবাচক ঘটনা ঘটেছে সম্প্রতি। পাকিস্তান এবং ইরান এখন আফগান সংকটকে কেন্দ্র করে পরস্পরের সাথে একটা সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল খারাজি কিছুদিন আগে ইসলামাবাদে এক সফল সফর সম্পন্ন করেছেন। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ কামাল খারাজি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুল সাত্তারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। দু'দেশের কর্মকর্তারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়ন, আফগানিস্তানে একটি ব্যাপকভিত্তিক সরকার গঠন এবং সে দেশের পুনঃগঠনের ব্যাপারে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে সম্মত হয়েছে।

পর্যবেক্ষকরা পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগকে কল্যাণকর বলে বর্ণনা করেছেন। পাকিস্তানের মত ইরানও মুসলিম জাহানের শক্তিধর দেশ। এই দুই দেশের মৈত্রী মুসলিম জাহানের শক্তিকে আরও সংহত করবে সন্দেহ নেই। উল্লেখ্য, ইরানও ব্যালিস্টিক মিসাইল তৈরী করেছে এবং সে অচিরেই পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হতে চলেছে। অন্যদিকে বোরহান উদ্দিন রাব্বানী খুব শীঘ্রই পাকিস্তান সফরে আসছেন বলে শোনা যাচ্ছে। ইরান এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করছে। এটি ঘটলে মুসলিম উম্মাহর দেশগুলোর মধ্যে এক সৌভ্রাতৃত্ব ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরেকধাপ অগ্রগতি ঘটবে। তবে ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নতুন করে আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে মুসলিম দেশগুলো দৃঢ়ভাবে ইরাকের পক্ষ নিয়েছে। উল্লেখ্য, ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনের তীব্র বিরোধিতা করেছে।

সউদী আরব, মিসর, ইউএই'র মত পশ্চিমাঘেঁষা দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক নীতির প্রকাশ্য বিরোধিতা করছে। উল্লেখ্য, সউদী আরব এখন মধ্যপ্রাচ্যে ও আফগানিস্তান ইস্যুতে মার্কিন অবস্থানের কঠোর সমালোচনা করছে। গত ১১ অক্টোবর সউদী বাদশাহ ফাহাদের ভাতিজা ওয়াহিদ বিন তালাল নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারের ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শনের সময়ে আমেরিকানদের মধ্য প্রাচ্যনীতির সমালোচনা করলে নিউইয়র্কের তৎকালীন মেয়র রুডলফ জুলিয়ানী ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে তার দেয়া এক কোটি ডলারের চেক ফেরত দেন। প্রিন্স তালাল সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের পরিবারবর্গকে সাহায্যের জন্য ১ কোটি ডলারের ওই চেক দিয়েছিলেন।

এসব ঘটনার পাশাপাশি আফগানিস্তানের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর সৈন্য মোতায়েনের ব্যাপারেও মুসলিম দেশগুলো সোচ্চার হচ্ছে। ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর সৈন্য আফগানিস্তানে মোতায়েন করা হলে এর একটা

www.pathagar.com

ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে বলে বেশিরভাগ পর্যবেক্ষক মনে করছেন। কারণ মুসলিম দেশগুলো মনেপ্রাণে আফগানিস্তানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা কামনা করে। সবশেষে একথাই বলা যায় যে, আফগানিস্তানের দুঃখজনক ঘটনাপ্রবাহ একদিকে যেমন মুসলিম উম্মাহকে চরম সংকটের মুখোমুখি করেছে, অন্যদিকে এই বিপর্যয় আবার মুসলিম দেশগুলোর মাঝে ঐক্যের চেতনাও জোরদার করেছে। বিভক্তি নয়, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বই যে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে এ উপলব্ধি বোধ এখন সর্বত্রই প্রতিফলিত হচ্ছে। ❑

ডিসেম্বর '০১

বোমায় বিধ্বস্ত বাড়ীঘর।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য শক্তি ও ইসলামী আন্দোলন

আবু হাসান

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর পরই টনি ব্লেয়ার তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে লেকটার্নে দুহাত রেখে ঘাড় কাত করে পরিষ্কারভাবে বললেন, এটি নাকি পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! তিনি এবং তার পর পরই বুশ পাশ্চাত্য সভ্যতার যে মূল কথা লিবার্টি, সেটা ধ্বংস করার জন্যই পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্নতির প্রতীক টুইন টাওয়ারে আঘাত করা হয়েছে, সেটা বলেই ক্ষান্ত হলেন না, বিনা প্রমাণেই দোষ দিলেন ইসলামী (তাদের ভাষায় মৌলবাদী) আন্দোলনকারীদের। সেই সঙ্গে সমগ্র পশ্চিমা মিডিয়া এবং ইটালীর প্রধানমন্ত্রী শুধু পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বই ঘোষণা করলেন না, ইসলাম যে দুর্বৃত্তের ধর্ম- এই ভাবমূর্তিটা তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। এটা শুধু তাদের কথা নয়, দীর্ঘদিন ধরে পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীরা পতনের যুগের ইসলামের সঙ্গে উন্নতির যুগের ইউরোপের তুলনা করে ইসলামকে হেয় করার চেষ্টা করে এসেছেন। এ বিষয়ে অনেক তথ্য শুধু তারা বিকৃতই করেননি, অনেক সময় বানিয়ে মিথ্যা বলতেও তারা কুণ্ঠিত হননি। এর ফলে আমাদের কারও কারও মনে কিছুটা হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়েছে বৈকি। তাই ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের জাতক্রোধের কারণ অনুসন্ধানের আগে আমরা খুব স্বল্পপরিসরে দুটি সভ্যতার তুলনা করব।

আধুনিক ধনতন্ত্রের বীভৎস রূপ এবং সমাজতন্ত্রের কঠোরতা লক্ষ্য করে বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কথা বলেন এবং পৃথিবীর বহু দেশেই এই আদর্শ বাস্তবায়িত হয়েছে। এই আদর্শ অনুসারে এসব দেশে বিনামূল্যে শিক্ষা ও চিকিৎসা এবং দরিদ্র ও দুস্থদের জন্য সরকারের কাছ থেকে ভাতা ও বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। অথচ চৌদ্দশ' বছর আগে ইসলামী রাষ্ট্রে এই প্রথা চালু ছিল। মুয়াবিয়ার চক্রান্তে গণতন্ত্র রাজতন্ত্রে পরিণত হলেও ইসলামী রাষ্ট্রের এই আদর্শের পরিবর্তন ঘটেনি। তাই উমাইয়া বা আব্বাসীয় আমলেও আমরা চিকিৎসা ও শিক্ষা সরকারী ব্যবস্থায় চালু হতে দেখি এবং ভাতা ও বৃত্তির ব্যবস্থাও চালু ছিল। পারস্যে নিযাম-উল মুল্‌ক প্রতিষ্ঠিত নিযামিয়া মাদ্রাসা পরবর্তীকালে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। মুসলিম শাসনামলে কৃষকরা কখনও ভূমিদাস ছিল না।

মোঙ্গল আক্রমণে আব্বাসীয় বংশের পতনের পর ভিন্ন ভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হলেও

www.pathagar.com

সর্বত্র শাসন-ব্যবস্থার একই রূপ আমরা দেখতে পাই। সমস্ত মুসলিম দেশেই সুলতানগণ মসজিদ, মাদ্রাসা, লাইব্রেরী এবং হাসপাতাল তৈরী করেছেন এবং বিনামূল্যে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, ইউরোপে অষ্টাদশ শতকের আগে সরকারীভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা ভাবাই হয়নি এবং ইংল্যান্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হতে সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের আগে বিনামূল্যে চিকিৎসার কথা ভাবাই যেত না।

পাশ্চাত্যের চোখ ঝলসানো ঐশ্বর্য ও আনন্দময়ী রূপে বিজ্ঞাপন দেখে যারা বিমোহিত হন, তাদের জন্য অজ্ঞেয়বাদী আধুনিকতম চিন্তার অধিকারী জর্জ বার্নার্ড শ'র মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "Now consider the so-called pleasures that are so-called pleasures, that are sold to us as more enjoyable than works. The escursion trains, the sea side lodgings, the catch penny shows, the drink, the childish excitement about football and cricket, the little bands of Follies and Piererrots Pretendies to be funnyand cute when they are only vulgar and silly - and all the rest of the attempts to persuade the intelligent woman that she is having the glorious treat when she is in fact being plundered and bored and tired out and sent home cross and miserable" এখন যে আমোদ-প্রমোদগুলো কাজের চেয়ে উপভোগ্য বলে বিজ্ঞাপিত হয়, সেগুলো বিবেচনা করা যাক ঃ ট্রেনে প্রমোদ ভ্রমণ, সমুদ্রতীরের বাসস্থান, সস্তা নাটক, মদ, ফুটবল বা ক্রিকেট প্রদর্শনীর ছেলেমানুষি উত্তেজনা, ভাঁড় ও বিদূষকদের হাস্যকর হবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা যেগুলো অত্যন্ত স্থূল এবং নির্বুদ্ধিতাপ্রসূতা মনে হয় এবং আরও অনেক প্রচেষ্টা, যা বুদ্ধিমতী রমণীকে এই ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে যে, তিনি সত্যিই খুব ভাল সময় কাটাচ্ছেন যখন প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন লুণ্ঠিত এবং একঘেঁয়েমিতে আক্রান্ত এবং বাড়ীতে ফিরে আসেন আরও ক্লান্তি নিয়ে। (Intelligent Women's Guide to Socialism, P-91).

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার এই স্থূল হৈ-হুল্লোড় শেষ পর্যন্ত বিষাদের (Depression) ই সৃষ্টি করে। যেমন, মদ্যপান সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও এর ফলে মানুষ বিষাদাক্রান্ত হয় তেমনি।

এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বাধীনতা (Liberty) সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। আসলে শিল্প-বিপ্লবের যুগে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের দ্বারা এই স্বাধীনতা (Liberty) এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের ধারণা খুব জোরেশোরে প্রচারিত হয়। এর অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্র কর্তৃক কোন রকম বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে প্রত্যেকে তার নিজ স্বার্থের জন্য কাজ করতে পারবে। সমাজ এমনই যে, প্রত্যেকে তার নিজ স্বার্থোদ্ধারের জন্য কাজ করতে থাকলে সমাজের এবং সকলেরই উপকার হবে। এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের নামে যে আত্মপরায়ণতার উদ্ভব হয়েছিল, তার রূপ দেখে দার্শনিক জন রাস্কিন (John Ruskin), অ্যাডাম স্মিথের Wealth of Nation (ওয়েলথ অব নেশন) বইটিকে Gospel of Mammon বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। মজার কথা এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই লিবার্টি বা

www.pathagar.com

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের নামে শ্রমিক সংগঠন করা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ধনীদের যৌথ সংগঠন যথা Cantel বা Trust করা নিষিদ্ধ ছিল না।

এখন দেখি এই লিবার্টির দেশ আমেরিকার বর্তমান অবস্থা। এখানে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত কৃষ্ণাঙ্গদের প্রকাশ্যে Lynch করা হত-ডেক কার্নেগীর বইয়ে এ রকম একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। এখনও কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থা আগের চেয়ে খুব বেশী ভাল নয়। আমেরিকায় নিগ্রো পুরুষদের চেয়ে নিগ্রো নারীরা শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে আছে কারণ নিগ্রো পুরুষদের সর্বদা শঙ্কিত থাকতে হয়। ১৯৯৫-এ লুই ফারাহ খান যখন মিলিয়ন ম্যান মার্চের ব্যবস্থা করেন, তখন New Nation-এ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস পরিবেশিত একটি খবরের হেডলাইন ছিল, 'American Blackman Feel feared, maltreated'. এর তাৎপর্য হচ্ছে আমেরিকান মিডিয়া এবং হলিউড মিলে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের এমনই ভাবমূর্তি এঁকেছে যেন তারা সকলেই ক্রিমিনাল। মনোবিজ্ঞানে ডক্টরেট প্রাপ্ত কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ মেজরস বলেন, 'সমাজ যা চেয়েছে আমি তা-ই করেছি, কঠোর পরিশ্রম করেছি, ভাল স্কুলে গিয়েছি এবং ভাল পোশাক পরিধান করি অথচ কোন ট্যাক্সিতেই আমি চড়তে পারি না।' একই রকমভাবে কলেজ ছাত্র Shawn Barney সব সময় শঙ্কিত থাকে, কারণ কলেজে যাওয়ার পথে বিনা কারণে প্রায়ই যে পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হয়। অর্থাৎ অধিকাংশ কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষই বিশেষ করে তরুণরা প্রায় প্রতিদিনই তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার যে অন্তঃস্রোত বইছে তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর তিক্ত ফল বহন করতে হচ্ছে সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ সমাজকে। সেখানে একজন শ্বেতাঙ্গ অপেক্ষা একজন কৃষ্ণাঙ্গ খুন হওয়ার সম্ভাবনা ৮ গুণ বেশী। হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ হয় কলেজে Dropout হচ্ছে, নয় কারাগারে পচছে। এর বিপরীতে ৯ গুণ বেশী শ্বেতাঙ্গ কলেজে ক্লাস করে।

এই হচ্ছে স্বাধীনতার (Liberty) দেশ, সভ্যতার দেশ আমেরিকার অবস্থা। বিপরীতে দেখুন, আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে ইসলাম শুধু তত্ত্বগতভাবেই মানুষের সাম্যের কথা বলেনি, বাস্তবে তা প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন - "খলিফা মাহদীর পুত্র ইব্রাহীম এক নিগ্রো স্ত্রীলোকের সন্তান ছিলেন, কিন্তু সে কারণে অন্যান্য মুসলমানের আনুগত্যপ্রাপ্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হননি, কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, তিনি হারুন-অর-রশিদের পুত্র ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র মামুন অপেক্ষা খেলাফতের অধিক যোগ্য ছিলেন।" (রুবেন লেভী ঃ সোশ্যাল স্ট্রাকচার অব ইসলাম, পৃঃ ১৩)।

"শুধু তা-ই নয়, নবম শতাব্দীতে বসরার জাহিজ বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া দেখান যে, শ্বেতবর্ণের ব্যক্তির তুলনায় একজন নিগ্রো সমকক্ষ তো বটেই, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবার গর্বও বোধ করিতে পারে।" (ঐ পৃঃ ১৩)

দেখা যাচ্ছে, সমাজবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির পর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কিছু কিছু পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী মানব জাতির একতা সম্বন্ধে যে কথা বলতে শুরু করেছেন সে কথা মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা নবম শতাব্দীতেই বলে গেছেন। এ কথা শুনতে অনেকের কাছেই অবাক লাগবে যে, Fabian Socialist-দের অনেকে ছিলেন Racist (বর্ণবাদী)।

আমরা এই সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনায় দেখছি যে, ইসলামী সভ্যতা সম্পর্কে

www.pathagar.com

হীনমন্যতাবোধ করার কোন কারণ নেই। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পতন ঘটেছে ইসলামের কারণে নয়, ইসলাম হতে বিচ্যুতির কারণে। সুরা, নারী ও সার্কাসের কারণে যেমন রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল; তেমনি নারী ও সুরার কারণেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পতন ত্বরান্বিত হয়েছে। এ কথা এখানে বলে রাখা ভাল যে, হারেম, অবরোধ বা খোজা প্রথা ইসলামের সৃষ্ট নয়, এগুলো বিলাসী মুসলিম নৃপতিরা ধার করেছিলেন গ্রীক, বাইজান্টাইন ও পারসিক সভ্যতা থেকে।

এখন আমাদের বিচার্য, পশ্চিমা দেশগুলোর অন্ধ মুসলিম বিদ্বেষ কেন ? আসলে ইসলামের উত্থানের যুগেই খ্রিস্টান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে তার সংঘাত শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত বাইজান্টাইনদের সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। খ্রিস্টানরা এর কথা কখনও ভুলতে পারেনি। অধিকাংশ খ্রিস্টান ঐতিহাসিকরা মুসলিম সুলতানদের সঙ্গে যে কোন যুদ্ধকেই রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব হিসেবে না দেখে যেমন ধর্মীয় দ্বন্দ্ব হিসেবে চিত্রিত করে, সে যুগের খ্রিস্টানরাজগণও বিষয়টিকে সেভাবেই দেখত। যেমন চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কী সুলতান মুরাদ গ্রীসের আদ্রিয়ানোপল শহর দখল করলে পোপ আরবান মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়া এই ধর্মযুদ্ধে যোগদান করে। অবশ্য এই সম্মিলিত বাহিনী তুর্কীদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আবার চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে অর্থাৎ ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে যখন তুর্কী সুলতান বায়েজীদ হাঙ্গেরি আক্রমণ করেন, তখন পোপ বেনিফাস তুর্কীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত খ্রিস্টান শক্তির ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এর ফলে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ডসহ সমগ্র ইউরোপ হতে খ্রিস্টান সেনাবাহিনী এসে তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। মাত্র তিন ঘন্টাব্যাপী এক যুদ্ধে এই সেনাবাহিনী তুর্কীদের হাতে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এরপর পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৫৩) কনস্ট্যান্টিনোপল তুর্কীদের হস্তগত হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ক্রুসেডের যুদ্ধ বলতে আমরা যেগুলোকে বুঝি (৮টি ক্রুসেড ঃ ১০৯৬-এ শুরু ও ১১৯৬-এ শেষ), জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে ২০ বছর ধরে সংঘটিত সেই ক্রুসেডগুলোর বাইরেও আরও অনেক ক্রুসেডের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে কোন যুদ্ধকেই খ্রিস্টানরা সম্মিলিতভাবে ক্রুসেড বানিয়েছে অর্থাৎ এই ক্রুসেড মনোভাব তাদের অবচেতনায় সব সময় উপস্থিত।

এজন্যই আমরা দেখি, তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ১১ ডিসেম্বর ১৯১৭-তে জেনারেল অ্যালেনবি যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করলেন, তখন আর্মি ইউনিফর্ম পরা অবস্থাতেও খালি পা এবং খালি মাথায় ছিলেন এবং প্রবেশ করেই আবেগভরে বলে উঠলেন, 'Oh god, oh holy Christ, the crusades have been ended with the grace' (M. S. qureshi Zionism and racism, page-64'. একই সময় তার সংবর্ধনা সভায় বক্তারা বলে উঠলেন, 'Today, the last of the crusades has ended and Allenby is its hero'. ঠিক এই রকমই আমরা দেখি ১৯৯১-এ উপসাগরীয় যুদ্ধের বেলায়। তখনও বহু আরব মুসলিম রাজ্যগুলো ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষভুক্ত থাকলেও পশ্চিমা মিডিয়া একে ক্রুসেড বলেই অভিহিত করেছে। সুতরাং আশ্চর্য নয় যে, প্রেসিডেন্ট বুশ তালিবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ক্রুসেড বলে অভিহিত

www.pathagar.com

করেছেন। ক্রুসেড এদের মনের মধ্যে গেঁথে আছে।

পশ্চিমা খ্রিস্টানদের চরম মুসলিম-বিদ্বেষের কারণ এই যে, প্রায় স্বভাবগতভাবেই পশ্চিমা খ্রিস্টানরা ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণু এবং পরধর্ম-বিদ্বেষী। যদিও ভিন্নমত পোষণের স্বাধীনতার নামে বিদ্রোহ করে Calvinism-এর জন্ম হয়েছিল, তবু এর প্রতিষ্ঠাতা Calvin ভিন্নমতাবলম্বীদের পুড়িয়ে মারতেন, এমনকি তিনি একটি শিশুর শিরচ্ছেদ করেন সে তার পিতাকে আঘাত করেছিল বলে।

পশ্চিমা খ্রিস্টানদের এই ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠুরতাই আজ প্রতিফলিত হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে তাদের আচরণে। পরবর্তীকালে এই বিদ্বেষের সঙ্গে যোগ হয়েছে শিল্প-বিপ্লবজাত শক্তি হতে উৎপন্ন অহংবোধ। যেহেতু শিল্প-বিপ্লবে সবচেয়ে অগ্রণী ছিল Anglo-Saxon গোষ্ঠী, সেই কারণে খ্রিস্টধর্ম ও বর্ণগত উচ্চম্মন্যতা প্রচারে তারাই উদ্যোগী হয় বেশী। এক আমেরিকান ধর্মযাজক JOSIA STRONG তার 'Our Country' নামক প্রবন্ধে লেখেন, "The Anglo-Saxon is the representative of two great ideas, which are closely related, one of them is that of liberty. The other great idea of which the Anglo-Saxon is the exponent is that of pure Christianity" (Brian Tierneyese (ed) : The Origins of Modern Imperialism Ideological or Economic ?. Page-26)।

এই বর্ণগত (Racially) ভাবে শ্রেষ্ঠ Anglo-Saxon-রা কি করবে। সে বিষয়ে এই ধর্মযাজকের মত হল "Then this race of unequalled energy, with all the majesty of numbers and the might of wealth behind it - the representative, let us hope, the largest liberty, the purest Christianity, the highest civilisation - having developed the peculiarly aggressive traits calculated to impress its institutions upon mankind, will spread over the earth". এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে, এতদিন পরেও টনি ব্লেয়ার এবং বুশের কণ্ঠে আমরা তার প্রতিধ্বনি পাই। এই হচ্ছে পশ্চিমা সভ্যতার মানসিক গঠন; একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী এবং ইসলাম বিদ্বেষী।

ইসলামের বিরুদ্ধে জেহাদের কিছু বস্তুগত কারণও রয়েছে। যে কেউ সংশ্লিষ্ট মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, মুসলিম দেশগুলো তেল-সমুদ্রের পঁচাত্তর ভাগের অধিকারী। সুতরাং যে কোন ছুতোতেই হোক এসব দেশকে দুর্বল এবং অনুন্নত রেখে তাদের ওপর আধিপত্য বজায় রাখা চাই। এর সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, দেশগুলোকে যেমন বিভিন্ন ছুতোয় পরস্পরের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত রাখা, তেমনি আভ্যন্তরীণভাবেও দেশকে বিভক্ত রাখা। এর একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ দেখতে পাই ১০ বছরব্যাপী ইরাক-ইরান যুদ্ধে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, কি করে তারা মুসলিম অঞ্চলে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হল এবং কিভাবে তারা মধ্যপ্রাচ্যে তাদের কিছু অনুগত সরকার কায়েম করল। এ বিষয়ে এককভাবে যদি কাউকে দায়ী করতে হয়, তবে নিশ্চিত করে বলা যায়, মক্কার

www.pathagar.com

শরীফ হোসেন এবং তার বংশধরগণ এবং তরুণ তুর্কীরা পশ্চিমা মডেলের জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করেছিল। যদিও ইহুদী ও খ্রিস্টানদের আনুগত্য ঠিকই আন্তর্জাতিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতি ছিল, কিন্তু তাদের প্রভাবিত তুর্কীবাদ ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে তুর্কীদের সম্পর্ক বিষাক্ত করে তুলেছিল এবং এভাবেই তুর্কী সাম্রাজ্য ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আভ্যন্তরীণ এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই শরীফ হোসেনকে হাত করে তুর্কীদের পরাজিত করেছে বৃটিশ শক্তি। তুর্কীদের আগ্রাসী ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের ছোঁয়া আরব জাতীয়তাবাদের গায়েও লাগে। এভাবে জর্ডান, ইরাক, লেবানন বা সিরিয়া হিসেবে যে রাষ্ট্রগুলো বৃটিশ চক্রান্তে গড়ে ওঠে, তাদের পারস্পরিক বিবাদই ইঙ্গ-মার্কিন এবং ইহুদী চক্রের প্রধান শক্তি। একই রকমভাবে আরব জাতীয়তাবাদ এবং ইরান জাতীয়তাবাদের কারণে পরস্পরের সম্পর্ক তিক্ত ছিল এবং অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে পশ্চিমারা এটা কাজে লাগিয়েছে।

এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ বৃহত্তর মুসলিম সমাজের এবং বিশেষ করে আরব স্বার্থের কি ক্ষতি করতে পারে তার প্রমাণ জর্ডান। জর্ডানের বাদশা হোসেন নিজ স্বার্থ সংরক্ষণে সারাজীবন আরবদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পশ্চিমা শক্তির এবং ইসরাইলের বশংবদ ভূমিকা পালন করেন। তিনিই হাজার হাজার প্যালেস্টাইনী হত্যা করে তাদের লেবাননে বিতাড়িত করেন এবং সেখানে তারা খ্রিস্টানদের প্রতিহিংসার শিকারে পরিণত হয় এবং আশ্চর্যের বিষয়, সিরিয়া খ্রিস্টানদের পক্ষাবলম্বন করে। এই পরিস্থিতিতেই নতুন করে ইসলামী আদর্শেরও উত্থান ঘটে। এই উত্থানে ইরানীদের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। প্যালেস্টাইনীরা শিয়া, কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে তারা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগত স্বার্থ ত্যাগ করে প্যালেস্টাইনীদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওয়ালিদ জুমলাদের দ্রুজ গোষ্ঠীও প্যালেস্টাইনীদের পেছনে দাঁড়িয়েছে। এর প্রভাব সারা বিশ্বে পড়েছে। এখানেই পশ্চিমা বিশ্বের ভয়। ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত এবং নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষে পশ্চিমারা সব সময় এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই ক্রুসেডের সময় থেকে এখন পর্যন্ত। তারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও খ্রিস্টীয় ঐক্যবোধ তাদের মধ্যে সব সময় কাজ করেছে। তাই দেখা যাচ্ছে, ক্ষুদ্র আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেও তারা একতাবদ্ধ। অথচ খুব কম সময়ই বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর পর হতে মুসলিম বিশ্ব পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে এক হতে পেরেছে। বর্তমানে দেশে দেশে যে ইসলামী আন্দোলন চলছে তা এই বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে ঐক্য সৃষ্টির যে স্বপ্ন সৃষ্টি করেছে, এটিকেই আমেরিকাসহ পশ্চিমা শক্তিগুলোর ভয়। তাই বিভিন্নভাবে এই আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার চেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছে এবং বিকৃত প্রচারণা দ্বারা এই আন্দোলনের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। IRA সন্ত্রাসী নয় বা হিন্দু স্বয়ংসেবকপক্ষ সন্ত্রাসী নয়, শুধু ইসলামী আন্দোলনকারীরাই সন্ত্রাসী - এই হচ্ছে আমেরিকার প্রচারণা। এ কথা ঠিক, শক্তির কোন বিকল্প নেই। ইহুদীদের নির্যাতিত করেছে ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা, কিন্তু তারা পাইকারিভাবে হত্যা করছে প্যালেস্টাইনীদের। এর একমাত্র কারণ তারা দুর্বল। এবং এ কারণেই ইঙ্গ-মার্কিন ইহুদী চক্র চায় যে, মুসলমানরা দুর্বল থাকুক। এটাই একমাত্র কারণ, যার জন্য ভারত আণবিক বোমা তৈরী করলে তারা কিছু বলে না, কিন্তু পাকিস্তান আণবিক বোমা বানালে তারা হৈ চৈ বাধিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে এক যুগ আগে মেজর জেনারেল ডি কে পাখিতের সাড়া জাগানো 'Pakistan's

www.pathagar.com

Islamic Bomb' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ওই বইয়ে পাকিস্তানে পারমাণবিক শক্তি অর্জনের ভূমণ্ডলীয় প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে ছয়টি বিষয়ের উল্লেখ করছেন ঃ

'১. পাকিস্তানে বোমার প্রতিক্রিয়া পড়বে ইসরাইলের ওপর। কারণ, আরব ভূখণ্ড গ্রাসকারী ইসরাইল পরবর্তী আরববিরোধী অভিযানে যাওয়ার আগে পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তির কথা চিন্তা করবে।

২. কোন আরব শক্তির বিরুদ্ধে ইসরাইলের পরমাণু শক্তি প্রয়োগ বা হুমকি প্রতিহত করবে।

৩.........

৪. ফিলিস্তিনীরা পাকিস্তানের 'ইসলামিক বোমা' ব্যবহার করুক বা না করুক, যে কোন অভিযানে একটি সার্বক্ষণিক হুমকি দিতে থাকবে যা দ্বারা তাদের সংগ্রাম আরও সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে।

৫.........

৬. পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমা গোটা দুনিয়ার মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে সংহত করবে, তা সে মধ্য এশিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রই হোক, আর চীনের সিনকিয়াং হোকনা কেন।"

(উদ্ধৃত, মোহাম্মদ রেজাউল করীম ফিলিস্তিনী সমস্যার ক্রমবিবর্তন, পৃঃ ২৩৯)।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ইসরাইলের পিতা আমেরিকা পাকিস্তানের আণবিক বোমা নিয়ে এত হৈ চৈ করছে, এতে বোঝা যাচ্ছে শক্তি অর্জন এবং ঐক্য সাধন ছাড়া মুসলিম জাতির কোন বিকল্প নেই এবং বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলন এই পথেই এগুচ্ছে এবং এখানেই আমেরিকার ভয়। ❑

২২ নভেম্বর '০১

লেখক ঃ গবেষক।

www.pathagar.com

শান্তির অন্বেষা, না মারণাস্ত্র ব্যবসা ?

আবদুল গাফফার চৌধুরী

আজ থেকে প্রায় আড়াইশ বছর আগে ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক কেরানি রবার্ট ক্লাইভ তার কোম্পানির চাকরি নিয়ে ভারত উপমহাদেশে এসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ঘাঁটি গেড়েছিলেন বাংলাদেশে। তখন বাংলা বিহার উড়িস্যা মিলিয়ে ছিল সুবা বাংলা। এই ক্লাইভের বাংলাদেশে আসার পরিণতি কি দাঁড়িয়েছিল তা আজ স্কুলের একজন কিশোর ছাত্রেরও জানা। কেরানি ক্লাইভ অল্পদিনের মধ্যে হয়েছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড রবার্ট ক্লাইভ। আর বাংলাদেশ-গোটা উপমহাদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হয়ে একদল লুন্ঠনপ্রিয় বিদেশীর অত্যাচার, শাসন, শোষণ ও লন্ঠনের এবং যুদ্ধ বিস্তারের লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। আড়াইশ বছর পরে স্বাধীন বাংলাদেশে এই সেদিন কোন ব্রিটিশ ব্যবসা কোম্পানির কেরানি বা কর্মকর্তা নয়, স্বয়ং দেশটির প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার এসে ঘুরে গেছেন। উদ্দেশ্য ছিল উপমহাদেশে শান্তির অন্বেষা। তিনি সস্ত্রীক দিল্লী, ইসলামাবাদ এবং ঢাকায় ঘুরেছেন। ঢাকার একটি এনজিওর প্রজেক্ট দেখতে গিয়ে সেখানকার গরিব নারী ও শিশুদের সঙ্গে মাটিতে মাদুরে বসে খানাপিনা করেছেন। বিশ্ব-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশের খালেদা-নিজামী সরকারকে উপদেশ দিয়েছেন। লোভ দেখিয়েছেন, আফগানিস্তানে শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশেরও একটা ভূমিকা থাকবে- অর্থাৎ ডলার বা স্টার্লিংয়ের বেতনে বাংলাদেশের একদল সেনা বা সেনা অফিসারকে আমেরিকার বোমায় বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের শান্তিরক্ষাকারী আন্তর্জাতিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

টনি ব্লেয়ারের উপমহাদেশ সফরের আসল উদ্দেশ্যটি আরও মহৎ। এই ঘোষিত উদ্দেশ্য, ভারতের পার্লামেন্টে সন্ত্রাসী হামলার পর দিল্লী ও ইসলামাবাদে যে ভয়াবহ যুদ্ধপ্রস্তুতি দেখা দিয়েছে এবং পরমাণু অস্ত্র সজ্জিত দু'টি সেনাবাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে, তা থেকে তাদের নিরস্ত্র ও নিবৃত্ত করা এবং বিশ্ব সন্ত্রাস দমনে বাজপেয়ি ও মোশাররফকে সহোদর ভাইয়ের মতো করে তোলা। এরপর কাশ্মীরীদের ওপর যত অত্যাচার চলুক, সন্ত্রাসী নাম দিয়ে কাশ্মীরের মুক্তি সংগ্রামীদেরও যতই হনন করা চলুক, তাতে এ যুগের

www.pathagar.com

ব্রিটিশ মহাত্মা টনি ব্লেয়ারের কিছু যায় আসে না। যেমন সন্ত্রাস দমনের নামে মুক্তিকামী প্যালেস্টাইনিদের ওপর শ্যারন যত বর্বর নির্যাতন চালাক, তাতে টনি সাহেবের বন্ধু আরেক মহাত্মা বুশ সাহেবের কিছু আসে যায় না।

বুশ সাহেব বিশ্ব শান্তির মহৎ অন্বেষায় আফগানিস্তানে অনবরত বোমা মেরে চলেছেন। তার বন্ধু এবং সহযোগী টনি ব্লেয়ার একদিকে আফগানিস্তানে পাঠাচ্ছেন ব্রিটিশ সৈন্য ; অন্যদিকে নিজে শান্তিদূত সেজে মধ্যপ্রাচ্যের পর এখন উপমহাদেশ ঘুরে গেলেন। অথচ তার নিজের দেশ গ্রেট ব্রিটেনে শান্তি নেই। শিক্ষা ব্যবস্থা, হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়ার পথে। ক্রাইম রেট হু হু করে বাড়ছে। ইউরো মুদ্রা নিয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিতর্ক প্রায় তুঙ্গে। সবচেয়ে বড় কথা, রেল স্ট্রাইক, রেল চলাচলে অব্যবস্থায় সারা ব্রিটেনের জনজীবন জর্জরিত। অধিকাংশ পত্রিকায় দিনের পর দিন কাতর নিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, প্লিজ টনি দেশে ফিরে আস। আগে নিজের দেশের মানুষকে বাঁচাও, তাপর অন্য দেশে মানুষের কথা ভেবো।

টনি ব্লেয়ার স্বদেশে ফিরে এসেছেন। কিন্তু সরকার পরিচালনায়, চলনে-বলনে তার প্রেসিডেন্সিয়ল কায়দাটি বদলায়নি। লন্ডনের সংবাদপত্রেই তার সম্পর্কে অভিযোগ বেরিয়েছে, তিনি আন্তর্জাতিক ব্যাপারে মাতব্বরি করতে চান। ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি পদ্ধতির প্রধানমন্ত্রী পদের দিকে তার নজর আর নেই। তিনি সম্ভব্য ইউনাইটেড স্টেটস অব ইউরোপের প্রেসিডেন্ট হতে চান। তিনি চান আরেকজন প্রেসিডেন্ট বুশ হতে।

ব্রিটিশ লেবার পার্টির ব্লেয়ারপন্থী গ্রুপের কোন কোন নেতা বলেন, টনি চলনে-বলনে বুশের প্রেসিডেন্সিয়াল কায়দা অনুকরণ করতে চাইলেও বুশের চরিত্র তিনি অর্জন করতে চাইবেন না, অথবা পাবেন না। শত হোক শতবর্ষ যাবৎ মেহনতী মানুষের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং এই সেদিনও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল এমন রাজনৈতিক দল লেবার পার্টির সরকারের তিনি নেতা। অন্যদিকে জুনিয়র জর্জ বুশ আমেরিকায় কট্টর ডানপন্থী, যুদ্ধবাজ রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট। ব্রিটেন ও আমেরিকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে গত ৫০ বছরের ইতিহাস হচ্ছে, ব্রিটিশ লেবার পার্টি ও আমেরিকান ডেমোক্র্যাট পার্টির এবং ব্রিটিশ টোরি বা কনজারভেটিভ পার্টি ও আমেরিকান রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে সখ্য। ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের যতোটা কাছাকাছি হয়েছিলেন টনি ব্লেয়ার, রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বুশের ততোটা কাছাকাছি তিনি হতে পারবেন কেউ তা গোড়ায় আশা করেননি। কিন্তু লেবার পার্টির নেতা হিসাবে টনি ব্লেয়ার অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। জাতীয় রাজনীতিতে লেবার দলের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রের রীতিনীতি সব ধুয়ে মুছে তিনি যেমন দলকে নিউ মিডলক্লাসের দল হিসাবে, ট্রেড ইউনিয়নের চাঁদানির্ভর দল নয়, বিগ বিজনেসের ডোনেশন-নির্ভর দল হিসাবে গড়ে তুলেছেন, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ লেবার পার্টির আগে সেই উপনিবেশবাদবিরোধী, মারণাস্ত্র বিক্রির অনৈতিক ব্যবসা সম্প্রসারণবিরোধী সর্বোপরি যুদ্ধবিরোধী ভূমিকাটি আর নেই। টনি ব্লেয়ার নেতৃত্বে আসার আগেই লেবার পার্টি নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলন থেকে সরে এসেছে। আমেরিকার যুদ্ধজোটে অস্তিত্ব বজায় রাখা, বিশ্বময় সামরিক ঘাঁটির বিস্তার এবং ধনবাদী নয়া বিশ্ববিধানের (New world order) স্বার্থে বিভিন্ন ছুঁতোয় যুদ্ধ বাধানোর মার্কিনী নীতিতে নিঃশর্ত সমর্থন জুগিয়ে

www.pathagar.com

চলেছে। এজন্যই ব্রিটিশ টোরি পার্টির সমর্থক একটি পত্রিকা খুশি হয়ে বলেছে, টোরি পার্টি এখন ব্রিটেনে ক্ষমতায় নেই বটে, কিন্তু টনি ব্লেয়ার এখন টোরি নীতির নতুন ভ্যানগার্ড।

মনে হয় না, ব্রিটিশ লেবার পার্টির শতবর্ষের রাজনৈতিক ঐতিহ্য, নীতি-নৈতিকতার কোন ধার ধারেন টনি ব্লেয়ার। ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির কয়েকশ'-বছরের ঐতিহ্যকে তিনি সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছেন। তার মন্ত্রিসভা এখন আর কেবিনেটে যাওয়ার ক্ষমতা নেই বললেই চলে। জর্জ বুশ পপুলার ভোটে নয়, জুডিসিয়াল সিদ্ধান্তের পেছনের দরজা দিয়ে আমেরিকার তেল ও অস্ত্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থে ও সমর্থনে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ইরাকের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ চালিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে তারকা যুদ্ধের প্রস্তুতি- এমন কি জাতিসংঘকে পাশ কাটিয়ে আফগানিস্তানে একতরফা ভয়াবহ বোমা হামলা শুরু করার ব্যাপারেও তার সকল যুদ্ধবাদী কার্যকলাপে টনি ব্লেয়ার নিঃশর্ত সমর্থন ও সহযোদিতা দানের নীতি গ্রহণ করেন। আমেরিকার নেতৃত্বে আফগান যুদ্ধে একটি জোট গড়ে তোলার ব্যাপারে টনি ব্লেয়ার অতি উৎসাহ এবং বিভিন্ন দেশে শাট্‌লট্র্যুর দেখে লন্ডনে পত্রপত্রিকাই মন্তব্য করেছিল, টনি ব্লেয়ার এখন আমেরিকার 'অ্যাম্বাসাডার অ্যাট লার্জ'।

এই টনি ব্লেয়ার সম্প্রতি বাংলাদেশসহ উপমহাদেশ সফর করেছেন। বলা হয়েছে তার এই সফর শান্তি অন্বেষার সফর। উপমহাদেশে যাতে সন্ত্রাস দূর হয়, কাশ্মীর নিয়ে যাতে পরমাণু যুদ্ধ না বাধে, সেজন্যই নিজের দেশকে সমস্যা জর্জরিত রেখে দূর দেশগুলোতে সস্ত্রীক তার এই কষ্টকর ভ্রমণ। টনি ব্লেয়ারের আগে আরেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরও বাংলাদেশ সফর করেছেন। কিন্তু তার সফর ছিল রাজনৈতিক এবং সৌজন্যমূলক। তার পেছনে কোন 'মহৎ উদ্দেশ্য' ছিল না। টনি ব্লেয়ারের সফরের পেছনে ছিল উপমহাদেশে সন্ত্রাস দমন শান্তিরক্ষার 'মহত্তম উদ্দেশ্য'। স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, আড়াইশ বছর আগে ব্রিটিশ ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে বাণিজ্য করার সনদ নিতে এসে সারা বাংলা বিহার উড়িষ্যায় যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, শঠতা ও লুণ্ঠনের যে ইতিহাস রচনা করে গেছেন, ব্রিটিশ টনি ব্লেয়ার ঠিক তার বিপরীত উদ্দেশ্যে আড়াইশ' বছর পর এদেশে পা দিয়েছিলেন। তার সফরের উদ্দেশ্য ছিল, সন্ত্রাস দমনে উপদেশ দেয়া, উপমহাদেশব্যাপী যুদ্ধ তৎপরতা বন্ধে সক্রিয় ভূমিকা নেয়া, জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে তাদের পাশে মাদুরে বসে প্রেরণা যোগানো।

কিন্তু তার এই সফরের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে হঁটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে লন্ডনের উদারনৈতিক দৈনিক সংবাদপত্র 'গার্ডিয়ান'। গত ১২ জানুয়ারী শনিবারে 'গার্ডিয়ানের' প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম লীড স্টৈরি ছিল '£ Ibn arms push to Inddian. Blair criticised over dral days after promoting peace. (ভারতে এক বিলিয়ন পাউন্ডের অস্ত্র প্রেরণ। শান্তি উদ্যোগের পর পরই এই অস্ত্র ব্যবসায়ের জন্য ব্লেয়ার সমালোচিত)। গার্ডিয়ানে বলা হয়, 'ব্রিটিশ সরকার ভারতে অস্ত্র বিক্রি বাড়ানোর জন্য ব্যাপক ক্যাম্পেইন শুরু করেছে। এর ভেতরে রয়েছে এক বিলিয়ন পাউন্ড দামের ৬০টি হক জেট (hawk jets) কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়া এবং গোটা এলাকায় তা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা সত্তেও এই অস্ত্র ব্যবসায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।'

www.pathagar.com

'গার্ডিগান' মন্তব্য করেছে, 'টনি ব্লেয়ারের উপমহদেশ সফরের মাত্র এক সপ্তাহ পরেই এই অস্ত্র বিক্রির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ টনি ব্লেয়ার উপমহাদেশ সফরের সময় বলেছেন, আমরা পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করতে পারি। যদি ঘটনা অন্যদিকে গড়ায়, তাহলে সারাবিশ্বের জন্য দারুণ সমস্যা দেখা দিতে পারে। তার এই বক্তব্যের পাশাপাশি ব্রিটিশ হক বিমানের নির্মাতা বিএই সিস্টেম কোম্পানির ভারতের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনে ভারত যাতে রাজি হয় সেজন্য ব্রিটিশ মন্ত্রীদের অক্লান্তভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া রীতিমতো বিস্ময়কর। ব্লেয়ার মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জিওফ হুন এবং স্বয়ং ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী জন প্রেসকোট এই মারণাস্ত্র ক্রয়ে ভারতকে রাজি করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং জানা গেছে, ভারতের কাছে হক বিমান বিক্রির কথা তিনি তুলবেন। গত বছর নয়াদিল্লী সফরের সময় তিনি এই বিমান বিক্রির প্রস্তাব দেন।

'গার্ডিয়ানের' এই খবর এবং মন্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, ব্রিটেনের বর্তমান লেবার গভর্নমেন্টের আসল চরিত্র হচ্ছে ডা. জেকিল এবং মি. হাইডের। ব্রিটেনের যুদ্ধাস্ত্র ব্যবসায়ীদের ২০০০ সালে লেবার গভর্নমেন্ট ভারতে সমরাস্ত্র বিক্রির ৭০০ রফতানি লাইসেন্স দিয়েছে। তার আগের বছরের চাইতে তা বহুগুণ বেশি এবং ৬৪ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি সমরাস্ত্র বিক্রির। এই যুদ্ধ সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে যুদ্ধে ব্যবহৃত প্লেন ও হেলিকপ্টার।

অথচ ১৯৯৭ সালে ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে টনি ব্লেয়ারের সরকার যুদ্ধাস্ত্র বিক্রির একটা গাইড লাইন ঘোষণা করেছিলেন। তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী রবিন কুক বলেছিলেন, 'যদি অস্ত্র ক্রয় করবে এমন দেশের সঙ্গে অন্য একটি দেশের যুদ্ধের আশংকা থাকে এবং তাতে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে পারে, তাহলে সরকার সে পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নেবে।' এখানেই প্রশ্ন ওঠে ভারতের পার্লামেন্টে সন্ত্রাসী হামলাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ও ভারত দুটো দেশই ভয়াবহ যুদ্ধ শঙ্কার মুখোমুখি, তখন একটি দেশকে একতরফাভাবে সমরাস্ত্র সরবরাহ ও বিক্রি কি লেবার সরকারের ঘোষিত নীতির বরখেলাপ ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নস্ট করার কাজে প্রত্যক্ষ সহায়তা দেয়া নয় ? এই কাজটি ব্রিটেনের লেবার সরকার কাদের স্বার্থে করছেন ? উপমহাদেশের জনগণের বা ব্রিটিশ জনগণের স্বার্থে না মারণাস্ত্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থে ? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ যেমন তেল ও অস্ত্র ব্যবসায়ের টাইকুনদের স্বার্থে বিশ্ব সন্ত্রাস দমনের নামে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সম্প্রসারণের তৎপরতায় লিপ্ত, ব্রিটেনের টনি ব্লেয়ারও তেমনি ব্রিটিশ মারণাস্ত্র ব্যবসায়ী আরও স্পষ্ট ভাষায় 'মার্চেন্টস অব ডেথের' স্বার্থে প্রেসিডেন্ট বুশের তৎপরতায় সাহায্য জুগিয়ে চলেছেন। দু'জনেরই ভণ্ডামির মুখোশ হচ্ছে সন্ত্রাস দমন ও শান্তির অন্বেষা।

পাকিস্তানের মোশাররফ সরকার বা সামরিক জান্তার প্রতি আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই। তাই বলে পাকিস্তানের শান্তিপ্রিয় নিরীহ জনগণের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার কোন ষড়যন্ত্রকে সমর্থন দেয়া চলে না। এতকাল ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে ব্যবহারের পর এখন ভারতের বাজপেয়ি সরকারের মধ্যে ইসরায়েলের শ্রারন সরকারের মতো নতুন মিত্র খুঁজে পেয়ে বুশ এবং ব্লেয়ার চান পাকিস্তানের ওপর আরও চাপ সৃষ্টির কাজে ভারতের সামরিক শক্তি ও হুমকিকে কাজে লাগাতে। লাদেনকে খোঁজার নামে

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে যেমন অসংখ্য নিরীহ নরনারীকে হত্যা এবং দেশটিকে ধ্বংস্তূপে পরিণত করা হয়েছে, তেমনি সন্ত্রাস দমনে ভারতকে সাহায্যের নামে যদি পাকিস্তানে অবৈধভাবে ক্ষমতাদখলকারী সামরিক শাসকদের চাপের মুখে রেখে সেদেশের নিরীহ মানুষের ওপর যুদ্ধের হুমকির তলোয়ার ঝুলিয়ে রাখা হয় তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই। এটাই মনে হয় একক সুপার পাওয়ারের যুদের ইঙ্গ-মার্কিন নীতি।

বাজপেয়ি সরকার দিল্লিতে ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিঙ্গোইস্টিক এবং যুদ্ধবাদী নীতি গ্রহণ করে। প্রথমেই তারা প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতিক্রিয়ার কথা না ভেবে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। (পাকিস্তান অবশ্য তাদের অনুসরণ করে)। বাজপেয়ি সরকার গত দু'বছর ধরে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়িয়েছে শতকরা ২৮ ভাগ। অথচ পশ্চিমা চাপের মুখে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাজেটগত দু'বছরে কার্যত 'ফ্রোজেন' অবস্থায় রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। একদিকে ভারতের কাছে বিপুল হারে সমরাস্ত্র বিক্রির তোড়জোর চলছে, অন্যদিকে ব্রিটেনের ব্লেয়ার সরকার তিন বছর আগে পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রির ওপর যে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল, তা এখনও শিথিল করা হয়নি বলে লন্ডনের পাকিস্তানি দূতাবাস এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেছে। কেবল গত বছরের শেষদিকে আমেরিকা তার নিজের গরজে (আফগান যুদ্ধের স্বার্থে) এই বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছে।

ব্লেয়ার সরকারের মারণাস্ত্র বিক্রির দ্'মুখো নীতি অত্যন্ত দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত (diabolical) বলে আখ্যা দিয়েছেন 'ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট দ্য আর্মস ট্রেডে'র মুখপাত্র। তিনি বলেছেন 'ভারত উপমহাদেশে শান্তিরক্ষার উদ্যোগ গ্রহনের কথা বলার পর পরই টনি ব্লেয়ারের সরকার ট্যাক্স দাতাদের অর্থের অপব্যাবহার দারা যুদ্ধাস্ত্র বিক্রির যে তৎপরতা শুরু করেছে, তা উপমহাদেশে শান্তির বিপরীত অবস্থাই সৃষ্টি করবে'। তিনি কোন অত্যুক্তি করেননি। ভারতের বাজপেয়ি সরকারের যুদ্ধবাদীনীতি শান্তি কালীন সময়ে সকল রেকর্ড ভঙ্গ করতে চলেছে। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ডিফেক্সপো/২০০২ (Depexpo 2002) নামে এক বিশাল যুদ্ধাস্ত্র মেলা। তাতে স্থল ও নৌ যুদ্ধের অস্ত্রের মহড়া দেখানো হবে। আগামী মাসের এই মেলায়, গার্ডিয়ানের খবর অনুযায়ী হাউইটজার, এন্টি এয়ারক্রাফট গান, মিশাইল এবং ট্যাংকের বিরাট সমাবেশ ঘটানো হবে।

এই মেলায় ব্রিটেন একটি অতিকায় প্যাভিলিয়ন বসাবে। এর উদ্যোক্তা ব্রিটেনের ডিফেন্স ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশন। তাদের আর্থিক সাহায্য যোগাচ্ছে বৃটিশ সরকারি সংস্থা ট্রেড পার্টনারস ইউকে। এই মেলার ইশতেহারে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে' দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপেক্ষিতে ভারত সরকার তার প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানো নীতি গ্রহন করেছে। যে ভারত কোল্ড ওয়ারের আমলেও দুই পরশক্তির মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধাশংকা সামনে নিয়ে শান্তিবাদী নীতি অনুসরণ করেছে, যে দেশের নেহেরু ছিলেন বান্দুং সম্মেলনে পঞ্চশীলা নীতির অন্যতম উদ্যোক্তা, দুই পরাশক্তির মধ্যে শান্তিবাদী নিরপেক্ষ তৃতীয় জোট গঠনের অন্যতম নেতা এবং নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি প্রবক্তা সেই ভারতে হিন্দুত্ববাদী একটি সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত রণদামামা বাজানো হচ্ছে। আমেরিকার সকল সমরপ্রস্তুতিতে দিল্লি এখনসমর্থক ও অংশিদার। ভারতের শান্তিকালীন প্রতিরক্ষা বাজেট ক্রমশই স্ফীত

www.pathagar.com

হয়ে চলেছে এবং ২০০2 সালে দিল্লিতে যে সুবিশাল যুদ্ধাস্ত্র মেলার অনুষ্ঠান হচ্ছে তার মাধ্যমে ভারত পশ্চিমা দেশগুলোর কাছথেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ও পাউন্ডের অত্যাধুনিক মরণাস্ত্র কিনবে। ভারতের বাজারে এই মারণাস্ত্র বিক্রয়েই বৃটেন এখন একটি প্রতিযোগী বিক্রেতা দেশ। পশ্চিমা ধনবাদের অস্তিত্ব আজ সেখানে ওয়ার ইন্ডাস্ট্রি এবং মরণাস্ত্র বিক্রির বাজার তৈরি ও বিক্রয়লব্ধ মুনাফার উপর নির্ভরশীল যেখানে ব্রিটেনের লেবার সরকারও সেই মরণাস্ত্র বিক্রির প্রতিযোগিতা থেকে পিছিয়ে থাকবে কিভাবে ? আজ থেকে আড়াইশ' বছর পর টনি ব্লেয়ারও শান্তির অন্বেষায় উপমহাদেশে আসেননি। প্রকৃতপক্ষে এসেছিলেন ব্রিটেনের মারণাস্ত্র নির্মাতা কোম্পানিগুলোর এজেন্ট হয়ে।

এই উপমহাদেশের মানুষের দুর্ভাগ্য ক্লাইভের যুগের শঠতা ও ষড়যন্ত্রের চাইতেও ভয়াবহ চক্রান্ত, শঠতা ও শান্তিবাদী প্রতিরক্ষা ছাতা তাদের মাথার ওপরে নেই। বুদ্ধ, গান্ধী ও নেহেরুর দেশ ভারতে এখন ক্ষমতাসীন হিন্দত্ববাদী জিঙ্গোইস্টিক সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চক্র। পাকিস্তানে আরও ভয়ঙ্কর তালেবান প্রভাবিত সামরিক চক্র এখন ক্ষমতায় এবং পশ্চিমা চাপের মুখে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদের সামনে। উপমহাদেশে একমাত্র বাংলাদেশে ভাল হোক আর মন্দ হোক একটি অর্ধশতাব্দীর পুরনো গণতান্ত্রিক দল ক্ষমতায় অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। তাদেরও পতন ঘটানো হয়েছে এবং উগ্র মৌলবাদী সন্ত্রাসী শক্তির সমর্থনপুষ্ট একটি জোট ক্ষমতায় উঠে এসেছে। শুধু আফগানিস্তান নয়, এই উপমহাদেশের সকল দেশেরই ভবিষ্যৎ কি এই প্রশ্নটি আজ একেবারে সামনে চলে এসেছে।

উপমহাদেশে যদি শান্তি ভঙ্গ হয় তাহলে পাকিস্তানে ও ভারতেই শুধু আগুন জ্বলবে না আগুন জ্বলবে বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমারসহ সকল দেশে। ধ্বংসের যে ভয়ঙ্কর বিষাণ বেজে উঠবে তা থেকে উপমহাদেশের কোন অঞ্চলের মানুষ আত্মরক্ষা করতে পারবে না। বুশ ও ব্লেয়ারের মুখনিঃসৃত শান্তির বাণী এই উপমহাদেশের মানুষের জন্য ব্যর্থ পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। যদি বাঁচতে হয় এই উপমহাদেশের প্রত্যেকটি দেশের শান্তিকামী মানুষকে একটি যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। উপমহাদেশে যুদ্ধায়োজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রির বিরুদ্ধে ক্ষমতায় সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী ও সামরিক সরকারের অধিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একাট্টা হতে হবে। গণতন্ত্র এবং শান্তি মাত্র এ দু'টি লক্ষ্য সামনে নিয়ে উপমহাদেশে যদি একটি তৃণমূল পর্যাযের আন্দোলন গড়ে না ওঠে তাহলে সমাজ ও রাজনীতি থেকে সন্ত্রাস উচ্ছেদ হওয়া দূরে থাক পশ্চিমা আগ্রাসী ধনবাদ ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রশ্রয়ে উপমহাদেশে আরও একাধিক আফগানিস্তান তৈরি হবে। ❑

লেখক ঃ প্রবাসী সাংবাদিক, কলামিষ্ট।

নভেম্বর '০১

www.pathagar.com

আফগানিস্তান ঃ বুশের ক্রুসেড ঃ তাঁবেদারদের যুদ্ধ এবং মুজাহিদদের জিহাদ

মাসুদ মজুমদার

আফগান জাতি এবং যুদ্ধ যেন সমার্থক। এই জাতিসত্তার ইতিহাসের সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে যত পেছনে যাওয়া যায়, অজস্র যুদ্ধের সন্ধান মেলে। যেন যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার জন্যই এ জাতিটির জন্ম হয়েছিল। তাদের জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা জুড়ে শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ। তবে এই জাতি-গোষ্ঠীটির ইতিহাস যুদ্ধকেন্দ্রিক হলেও জিহাদকেন্দ্রিক ঘটনা অনেক বেশি নেই। অতীতে তারা বার দু'য়েক জিহাদ করেছে। একেবারে নিকট অতীতে জিহাদ করেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। বর্তমানে চলছে পশ্চিমা বিশ্বসহ পৃথিবীর তাবৎ অশুভ শক্তি ও সরকারের বিরুদ্ধে। এই অশুভ শক্তি ও সরকারগুলোর আলাদা কোন অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা নেই। এরা পশ্চিমা শক্তির তাঁবেদার এবং তাদের সকল অপকর্মের দোসর। তবে এই কথা মানতেই হবে, আফগানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা ও তাদের দোসরদের যুদ্ধে জনগণ সরকারগুলোর সমান্তরাল অবস্থান নেয়নি। কিন্তু ইউরোপীয় দেশের ইহুদী-খৃস্টান, মুসলিম দেশের বর্ণচোরা ধর্মবিদ্বেষী বিবেকহীন মানুষ এই যুদ্ধে পশ্চিমাদের বিশেষত শাসকদের প্রতি সমর্থন যোগালেও অধিকাংশ মানুষ এই যুদ্ধকে অন্যায়, জুলুম এবং আরোপিত যুদ্ধ বিবেচনা করে। খোদ মার্কিনী জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশ শাসকদের যুদ্ধনীতি সমর্থন করেনি। অবশ্য আমেরিকা-ইউরোপের ধর্মান্ধ ইহুদীরা এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। খৃস্টানদের মধ্যে মানবতাবোধহীন গোষ্ঠীটিই শুধু আরোপিত যুদ্ধে মদদ যোগাচ্ছে। তাই এই যুদ্ধকে আফগান জনগণের বিরুদ্ধে পশ্চিমা জনগণের যুদ্ধ বলা যাচ্ছে না বা বলা ঠিক হবে না।

অপরপক্ষে আফগান জাতির এই যুদ্ধ এবং জিহাদকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বুঝতে হবে। এটি একটি মিশ্র গোত্র ও জাতিগোষ্ঠীর দেশ। প্রতিটি গোত্র নিজস্ব বিবেচনায় জাতীয় কর্তব্য নির্ধারণ করে। এখানে একের ভেতর পাঁচের সমন্বয় হলে জাতীয় সরকার দাঁড়ায়, নয়তো সরকার অঞ্চলের, গোত্রের-গোষ্ঠীর খেতাব পায়।

অনেকেই তালেবান সরকারের পতনের সাথে মিশ্র প্রতিক্রিয়া নিয়ে স্ববিরোধী আবস্থান

www.pathagar.com

গ্রহণ করেছেন। তারা তালেবানদের পাগড়ী-দাড়ি-টুপি এবং নর্দার্ন এলায়েন্স নামক এই মুহূর্তের কাগুজে বাহিনীর পাগড়ী, দাড়ি, টুপি এবং ধর্ম বিশ্বাসের ভেতর তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। পশ্চিমা আশ্রিত নর্দার্ন এলায়েন্স বুশ-ব্লেয়ারের নেতৃত্বে যুদ্ধ করছে। আর তালেবানরা করছে জিহাদ। এই গুণগত পার্থক্য বুঝবার জন্য পৃথক পৃথক অবস্থান থেকে পৌনে চার বছরের তালেবান সরকার-এর নীতি-কৌশল এবং কথিত নর্দার্ন এলায়েন্সের ভূমিকা, সোভিয়েত দখলদারিত্বে অবসানের পর গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বুঝতে হবে।

অনেকেই ঋজুভাষায় বলে বসেন, এখানে যুদ্ধও নেই জিহাদও নেই, আছে জাতিগত সংঘাত এবং পশ্চিমা দুনিয়ার স্বার্থের বোঝাপড়া। সত্য বলতে কি, এটি ঘটনার এক পিঠ। অপর পিঠে আছে মৌল আদর্শিক বিভাজন। এটি দু'টি পক্ষের অভিন্ন চেহারা এবং শুধু তাকবীর ধ্বনি দিয়ে বোঝা ঠিক হবে না। বুশের হুংকার দিয়ে এবং তাদের মিথ্যাচার দিয়েও ভাবা ঠিক নয়।

এ কথাও ঠিক যে, তালেবান আকাশ থেকে নাজিল হয়নি, মাটি ফুঁড়েও ওঠেনি। গৃহযুদ্ধের দুঃখজনক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তালেবান ধারণা প্রাধান্য পায়। পাকিস্তান পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। পাকিস্তানকে মাধ্যম করে পশ্চিমারাও একটি স্থিতিশীল সরকারের প্রত্যাশায় মৃদু সমর্থন যোগায়। তাদের এই সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার পেছনে ছিল ভূখণ্ডগত স্বার্থ, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি মোহ, বেনিয়া চিন্তা এবং এশিয়ার এই অঞ্চলের দিকে আধিপত্য সম্প্রসারণের পশ্চাদ্ভূমি হিসেবে আফগানিস্তানের ভূখণ্ড ব্যবহারের পরিকল্পনা। এদের ধারণা ছিল তালেবান একটি দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু সরকারের জন্ম দেবে। এদের ওপর ভর করা যাবে, ব্যবহার করা যাবে, নির্ভর করা যাবে। বাস্তবে তালেবান সরকার হল উল্টো। দীর্ঘ রক্তক্ষরণের পর তালেবান সরকার জনগণের মনে স্থিতির প্রত্যাশা জাগাল। ইসলামীকরণের গোড়ায় হাত দিল বলে আজন্ম ধর্মাশ্রয়ী এই জাতি-গোষ্ঠীটির মনে এই আশাবাদ জন্মালো যে, সম্ভবত এরাই তাদের 'ত্রাতার' ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। ততদিনে মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে একটি পোক্ত সরকার দাঁড়িয়ে যায়। তাদের নেটওয়ার্ক সৃষ্টি হয় উপর থেকে নীচ নাগাদ। নীচু স্তর থেকে উপরি কাঠামো পর্যন্ত। এটাই হল কাল। পশ্চিমারা ভাবল, তাদের ভাষায় একটি 'মৌলবাদী' সরকারই শুধু দাঁড়াল না। তারা নিকটতম প্রতিবেশীদের জন্য হল বেপরোয়া, আর পশ্চিমা স্বার্থের প্রতিপক্ষে বাঁক ঘুরে দাঁড়াল একটি কঠিন প্রতিরোধ্য শক্তি।

কোন একটি সরকারের সকল নীতি-কৌশলের প্রতি সবাই একমত হবেন- এটা ভাবা যায় না। জটিল ও কুটিল রাজনীতি, পরাশক্তি নির্ভর অনৈতিক কূটনৈতিক শিষ্টাচার ও ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের মানবাধিকারের এই যুগে তালেবান সরকার আদর্শের উপর অবিচল থেকে সবার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে এটা আশা করা যাবে কিভাবে! আর তারাই বা ষোল আনা নিষ্ঠার দাবিদার- এটাই বা পৃথিবী আশা করবে কেন। তাদের ভুল থাকতে পারে। সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। থাকতে পারে নিজস্ব মেজাজগত বিষয় আশয়-যা অন্যদের কাছে গোঁড়ামি বিবেচিত হতে পারে। হয়তবা সময়ের ব্যবধানে তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাথে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পথ চলতে চেয়েছিল। এটা তো তাদের অপরাধ ছিল না। এটা তো অহংকার। সময় বলে দিত তাদের কি ছাড় দেয়া উচিত, কি

www.pathagar.com

সংরক্ষণ করা জরুরী। কোন্‌টি গ্রহণের, কোন্‌টি বর্জনের। তাই বলে আদিম খেয়ালীপনায় বন্য মাতালের মত একটি জনপদের ওপর বিনা কারণে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে হবে- এটা কিভাবে মানা যায়?

শুরুতেই আমি যুদ্ধ এবং জিহাদ শব্দ দুটোকে আলাদা বিবেচনা করেছি। বাস্তবেও তাই। সকল যুদ্ধ জিহাদ নয়, সকল জিহাদকে যুদ্ধ ভাবতে আপত্তি নেই। বর্তমানে উত্তরাঞ্চলীয় জোট নামক যে পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় চলছে, এটাই কি বুশ-ব্লেয়ারদের টার্গেট ছিল? তাহলে লাদেন প্রসঙ্গ উঠল কেন! কেনই বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলে আফগানের বনি-আদমের আহাজারিতে পৃথিবীর বাতাসকে ভারী করে তোলা হল। আফগানদের জন্য সরকার, তার জন্ম হচ্ছে জার্মানীর বনে। এর মধ্য দিয়েই কি পশ্চিমারা বুঝিয়ে দিল না তারা লাদেনকে উপলক্ষ্য বানিয়ে নিজেদের অন্তর্ঘাতকে পৃথিবীর একটি হতদরিদ্র যুদ্ধবিধ্বস্ত মজলুম জাতির উপর চাপিয়ে দিয়েছে। পাঁচ বছর পর নির্জীব, নিষ্ক্রীয় উত্তরাঞ্চলীয় জোট নামক একটি মেরুদণ্ডহীন মীরজাফর গোত্রীয় সরকারকে কৃতিমভাবে উজ্জীবিত করে আফগানদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। যে সরকারের জন্ম অবৈধ, অন্যের জঠর থেকে, সেই সরকার একটি জাতির জাতীয় সরকার কিভাবে হতে পারে। কিভাবে স্থিতিশীল আদর্শিক সরকারের বিকল্প হতে পারে।

প্রথমে বিশ্ব বিবেক লক্ষ্য করল লাদেন নামক একটি মিথ্যা-অলিক আরোপিত জুজুর ভয় দেখিয়ে নানামুখী আজগুবি প্রচারণা চালিয়ে ঘোষণাহীন একটি যুদ্ধ চাপান হল। জীবিত কিংবা মৃত লাদেনকে ধরার শয়তানি আস্ফালন মুহূর্তে রূপ নিল তালেবান সরকারকে উৎখাতের সর্বাত্মক যুদ্ধ হিসেবে। কোটি কোটি টন বোমা আর অসংখ্য রাসায়নিক অস্ত্রের আঘাতে একটি ইসলামী সভ্যতার নব উত্থিত শক্তিকে অংকুরে ধ্বংস করে দেয়ার খেলায় মেতে উঠল। টেনে তোলা হল উত্তরাঞ্চলীয় জোট নামক জাতীয় বেঈমানদের। এখন তাদের নিয়ে সরকার নামক পুতুল খেলার মহড়া চলছে। এর ফাঁকে দুনিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়ে নির্বিচারে দানবীয় কায়দায় শহীদ করা হল শত শত যুদ্ধবন্দীকে, নারী-শিশু-বৃদ্ধ এবং মজলুম বেসামরিক মানুষকে। বুশের সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ মাত্র চোখের পলকে বাস্তব ক্রুসেডে রূপ নিল, আক্রান্ত হল ইসলাম-মুসলমান। বর্বরতার পুনরাবৃত্তির এই নজির কথিত ক্রুসেডেই শুধু সম্ভব। কোথায় এখন ক্রুসেডের মানবাধিকার। সভ্যতার মায়াকান্না, মানবতার জন্য মিথ্যা আহাজারি, জেনেভা কনভেনশনই বা কোথায় গেল? এখানে আফগান যুদ্ধের প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। সহজ কথায়, কারণগুলোর সহজ উচ্চারণে দাঁড়ায় এভাবে-

ক) বুশের নেতৃত্বে পশ্চিমা জগত এবং তাদের তাঁবেদারদের প্রধান টার্গেট বিকাশমান শক্তি ইসলামী সভ্যতা এবং ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত মুসলমান মুজাহিদরা।

খ) তাদের আশু লক্ষ্য ছিল নব উত্থিত ইসলামী আফগানকে অংকুরেই গুঁড়িয়ে দেয়া।

গ) সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মুখরোচক আপাত মধুর এই শ্লোগানের আড়ালে কাশ্মীর, ফিলিস্তিনসহ সমগ্র পৃথিবীজুড়ে মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্যে পরিচালিত মুসলিম ও ইসলামী শক্তির উত্থানকে গলা টিপে হত্যা করা।

ঘ) পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার উপর শতভাগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

www.pathagar.com

ঙ) আফগানিস্তানের ভূখণ্ডগত সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে তাদের সম্পদ ও মধ্য এশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর একক আধিপত্য বিস্তার করা।

চ) মধ্য এশিয়ার কৌশলগত এই ভূখণ্ডে এমন একটি সামরিক স্থাপনার গোড়াপত্তন করা, যার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য থেকে চীন নাগাদ, সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে জাপান পর্যন্ত, ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়াসহ সমগ্র এশিয়ার উপর খবরদারি-নজরদারি এবং শক্তির বলয় বৃদ্ধি করা যায়।

ছ) পাকিস্তান-বাংলাদেশের মত মুসলিম দেশগুলোর ভেতর ইসলামী শক্তির উজ্জীবনী শক্তিকে স্তিমিত করে দেয়া। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে প্রলম্বিত করে আরব জাহানকে নতজানু করে রাখা। ভারত ও ইসরাইলী শক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে সারা পৃথিবীতে একাধিপত্যকে আরো দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং সমুন্নত করা।

এসব লক্ষ্য অর্জনে তাদের বেনিয়া চরিত্রের আড়ালে ইসলামী শক্তির উত্থান ঠেকানো এবং ইহুদী-খৃস্টান বলয় বৃদ্ধির তৎপরতা প্রাধান্য পাবে। যেমনটি ইহুদী পন্ডিত স্যামুয়েল হান্টিংটন তার 'সভ্যতার সংঘাত' নামক বইতে খোলামেলা উল্লেখ করেছেন।

আসল কথা হচ্ছে, যুগ যুগ ধরে নমরূদ, ফেরাউন, আবু লাহাব, আবু জেহেল এবং মীরজাফররা তাদের বুদ্ধিগত পরিকল্পনা সাজায়। তাদের পরিকল্পনামত অনেক অঘটনও ঘটে, কিন্তু প্রতিপক্ষ সজাগ হয়ে গেলে তাদের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বিফলে যায়। সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অসত্যের পতন অনিবার্য হয়। দুর্বল চিত্তের লোকেরা দুটো ভুল করে তারা ঈমানের পরীক্ষা দিতে ভয় পায়, এবং অলৌকিক বিজয় কামনা করে। প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তাদেরই বিজয় দেন, যারা মানবীয় গুণাবলী ও প্রযুক্তির যোগ্যতায় উত্তীর্ণ। হোক তারা দুর্বিনীত এবং খোদাদ্রোহী। দুনিয়াতে জয়-পরাজয় শক্তি এবং যোগ্যতার মাপকাঠিতে হবে। আখেরাতে হবে সত্য-মিথ্যার ভিত্তিতে। জালেম-মজলুম বিবেচনা করে। ঈমান আর শেরকের মানদণ্ডে।

তাই কোন জনপদে, কোন বিশেষ সময়ে কোন একটি শক্তির উত্থান ও পতনে আদর্শের উত্থান-পতন নির্ণীত হয় না। দুনিয়াবী যোগ্যতা ও ঈমানকে পুঁজি করতে পারলে আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে একজনের মোকাবেলায় দশজনের মতান্তরে বিশজনের ওপর বিজয় দেবেন। এ ছাড়া চূড়ান্ত বিজয়ের মালিক আল্লাহ মুমিনদের জন্য ঈমান নির্ভর দু'টো পথই খোলা রেখেছেন। হয় তারা বিজয়ী হিসেবে গাজী হয়ে সাহায্য পাবে, নয়তো শহীদ হয়ে উত্তম মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবে। এর বাইরে মুমিনদের জন্য কোন বিকল্প পথ খোলা রাখা হয়নি।

তাই বিভীষিকাময় মৃত্যু আর জালেমের বর্বরতায় ঈমানদার দাঁড়িয়ে থাকে সত্যের উপর। কারণ, মৃত্যু একবারই শুধু একটি প্রাণকে স্পর্শ করে। সেই প্রাণ হযরত হামজা, হোসাইন (রাঃ) এবং হাজারো শহীদের মত হতে পারে, আবার হতে পারে তারেক বিন জিয়াদ, ওসামা কিংবা খালেদের মত। হযরত আলী কিংবা ওসমানের মত মৃত্যুও অস্বাভাবিক বিবেচনা করা হয় না। এই কারণেই জন্ম-মৃত্যুর বাগডোর সেই আরশের মালিকের হাতে এবং মৃত্যুর চূড়ান্ত ফায়সালা তিনিই দিয়ে থাকেন। এর বাইরে ভয়-ভীতি দুর্বলচিত্তের উপমা, নতজানু আপোষী চিন্তা ঈমান বিচ্যুতির প্রমাণ। গাফেল-নির্লিপ্ততা বেঈমানীর লক্ষণ। আর আত্মঘাতী উম্মাহঘাতী তৎপরতা আদর্শের প্রতিপক্ষে অবস্থান-

www.pathagar.com

মোনাফেকী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ।

প্রসঙ্গে এই ভবিষ্যদ্বাণীও করে রাখা সঙ্গত, সভ্যতা বাঁক ঘুরে, স্থানান্তরিত হয়। একটি শক্তি দীর্ঘদিন আস্ফালন করার সুযোগ পায় না। সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ির জের ধরে দাম্ভিক শক্তির পতন অনিবার্য হয়ে যায়। নিকট অতীতে আফগানিস্তানে কামড় বসিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন কপালে পতনের তিলক পরেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যে ধস্ নেমেছে অনেক আগেই। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও জুলুমের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তারাই তাদের পতনের পথ তৈরি করছে এবং নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখ ধাঁধানো জৌলুস, প্রচারণার ধূম্রজাল আর প্রযুক্তির বেপরোয়া ব্যবহার তাদেরকে শুধু আত্মহননের পথেই ঠেলে দিচ্ছে না, ক্ষমতার হাত বদল অনিবার্য করে তুলছে।

হ্যাঁ, ক্ষমতার এই হাত বদলে মুসলিম উম্মাহর প্রস্তুতি এতোটা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় যে, বুশ-ব্লেয়ারদের পতনের বেলাভূমিতে কোন মুসলিম শক্তি দাঁড়িয়ে যাবে। তবে ঘাত-প্রতিঘাত মুসলিম উম্মাহকে উজ্জীবিত হবার পথ করে দিচ্ছে। সেই পথে আমরা কতটা যোগ্যতা ও সাফল্য প্রদর্শন করতে পারব, তার উপরই নির্ভর করছে উম্মাহর ভবিষ্যৎ।. অধিকন্তু খোদায়ী ফয়সালার ব্যাপার তো আছেই। ❑

লেখক ঃ সাংবাদিক, কলামিস্ট।

নভেম্বর '০১

www.pathagar.com

আমেরিকা ঃ পঁচন ও পতন অবশ্যম্ভাবী লাদেন উপসর্গ, ফেরাউনী উক্তি তার প্রমাণ

(দুই)

এখন সবার দৃষ্টি ওসামা বিন লাদেনের দিকে। তিনি এখন বিশ্বজুড়ে আলোচনার প্রথম প্রসঙ্গ।

মানুষ খতিয়ে দেখছে, কে এই লাদেন। নন্দিত মানুষ হিসেবে তার প্রতিবাদী জীবন শুরু। আলোচিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে তার খ্যাতির মহিমা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বজুড়ে। এই সময় পুরো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার প্রতিপক্ষে অবস্থান নেয়।

নন্দিত এই মজলুম নেতাকে, সাহসী এই মুক্তিযোদ্ধাকে নিন্দিত করার অপপ্রয়াস শুরু হয়। এবার সবার দৃষ্টি খুলতে থাকে, মুসলিম উম্মাহ্‌র সক্রিয় সদস্যরা, দুনিয়াজোড়া প্রতিবাদী মুক্তিকামী মানুষগুলোর সামনে লাদেন হয়ে ওঠেন প্রেরণার উৎস।

জীবনে দেখেনি, তার কথা শোনেনি, কর্মপরিধি জানে না- অথচ তাকে ভালবাসে, এ যুগের সালাহউদ্দীন আইয়ুবী মনে করে, এমন তরুণ অসংখ্য। কারণ লাদেনের কেরামতি নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সীমাহীন বাড়াবাড়ি। লাদেন জিহাদ ও মুক্তির সমার্থক, ইসলামের প্রতিনিধি- এই পরিচিতি দিয়েছে পাশ্চাত্য- বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ইসলামকে 'সন্ত্রাসী আদর্শ' প্রমাণে সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী কথিত বাম বিশ্বও লাদেনকে টার্গেট বানিয়ে অপপ্রচার চালাতে শুরু করে। 'শত্রুর শত্রু বন্ধু' বিবেচনায় লাদেন এবারও ওঠে আসলেন প্রতিবাদী মানুষের বরপুত্র হিসেবে। ধারণাটা এমন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যাকে প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে প্রতিপক্ষে নায়ক বানিয়ে দিয়েছেন, তিনি নিঃসন্দেহে ভাল ও মজলুমের বন্ধু। এটা যেন শয়তানের প্রতিপক্ষে সত্যনিষ্ঠ একজন মুজাহিদের উপস্থিতি, পাপাত্মার মোকাবেলায় জিন্দাদিল মোমেনের প্রতিকৃতি।

আমি নিজেও লাদেন নিয়ে উৎসাহী ছিলাম না। যখন শুনলাম, তিনি রাজতান্ত্রিক ধারণার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহী, যেখানে মুক্তিযুদ্ধ সেখানেই তার উপস্থিতি, মজলুম মানুষের কান্নাকাতর আহাজারি তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়, মুক্তিযোদ্ধাদের তকবীর তার আরামকে করে হারাম, সাম্রাজ্যবাদী হায়নাদের মোকাবেলায় গর্জে উঠেন তিনি, ইসলামী শৌর্য-বীর্যের

www.pathagar.com

বাইরে তার কোন স্বপ্ন নেই, বর্ণাঢ্য পরিবারের আদরের দুলাল গিরি-কন্দরে মজলুমের মত জীবন অতিবাহিত করেন, শুধুই ইসলামের বিজয় কামনা করে। তার শক্তিমত্তা আর আপোসহীন ঈমানী চেতনাকেই প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে তাবৎ ইসলামের দুশমনেরা, খোদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, মোনাফেকরা; তাকে অসহিষ্ণু বিবেচনা করে, তখনই তিনি আমার আগ্রহের কারণ হয়ে দাঁড়ান। আমার বিবেক আমাকে বাধ্য করে তার সম্পর্কে উৎসাহী হতে। এখন আমার বিশ্বাস আরো পোক্ত হল যখন প্রত্যক্ষ করলাম নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন ট্র্যাজেডির জন্য তথ্য-উপাত্য ও দলিল-প্রমাণ ছাড়াই মার্কিনী প্রশাসন তাকে দায়ী করে কোরাস গাইতে শুরু করল। আর নব্য এজিদের মত জীবিত কিংবা মৃত তার লাশ চেয়ে অহমিকা প্রকাশের শেষ চূড়া স্পর্শ করল। এখন আমারও লাদেন হতে ইচ্ছে জাগে। বোধ করি, আল্লাহ্ এভাবেই অহংকারী ও দাম্ভিকদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেন। তাদের আস্ফালনকে গুড়িয়ে দেন। ভরসাহীন দুর্বল চিত্তের ঈমানদারদের ঈমানকে মজবুত করে দেন। এভাবেই পৃথিবীতে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। নয়তো পৃথিবী দাম্ভিকদের অন্যায় আস্ফালনের পদতলে পিষ্ট হত, মানবতা হত লাঞ্ছিত, খোদার অস্তিত্ব মানুষের মন থেকে মুছে যেত।

আমি ইতিহাসের ছাত্র। সমাজবিজ্ঞানের অণুসন্ধিৎসু পাঠক। খোদায়ী আজাব নাজিলের বিধি আমি জেনেছি কুরআনে। পড়েছি বাইলের দুটো সংস্করণে। তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল যতটুকু বিকৃত অবয়বে আছে, তাতেও অসংখ্য খোদায়ী গজবের বর্ণনা আছে। কুরআনে আছে খোদায়ী গজব-আজাব নাজিলের কারণসহ। ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে আবু লাহাব, আবু জেহেল, আবরাহা থেকে শাহ বারবাক কারমাল হয়ে একেবারে রুশীয় পতনের সময় নাগাদ আমরা ধর্মগ্রন্থের বাইরেও অজস্র ঘটনার প্রমাণ পাই। দাম্ভিক অহংকারী যখন সীমালংঘন করে, তখনই খোদায়ী প্রতিশোধ এসে তাকে দমিয়ে দেয়। অবিশ্বাসীরা এটাকে বলেন প্রকৃতির প্রতিশোধ, বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘনের খেসারত।

নিউইয়র্ক ও পেন্টাগন ট্র্যাজেডির পর প্রথমই আমার স্মরণে এলো টাইটানিকের কথা। এটা ডুববে না, এটাই ছিল এর স্রষ্টা তথা নির্মাতাদের আস্ফালনমূলক ধৃষ্টতাভরা উক্তি ও দাবী। বাস্তবে প্রথম দিনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মদ্যপ নৃত্যরত নর-নারীগুলো যখন উল্লাসে মেতে নেশায় বুঁদ হয়ে গেল, তাদেরকে যখন ডুবে যাবার খবর দেয়া হল, তখন তারা বলছিল, টাইটানিক ডুববার জন্য নয়। যেমনটি ফেরাউন নীল নদের তটে পা রেখেও খোদায়ী দাবী ছাড়তে পারেনি। যেমনি পারেনি পাপিষ্ঠ আবরাহা।

আমার জিজ্ঞাসা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কি ভয়ংকর সেই সব পাপীষ্ঠদের মত দম্ভ ও অহংকারে ঠিকরে পড়ছে, তাদের পাপের বোঝা কি সেইসব পাপী-তাপিদের মত পর্বত-তুল্য হয়ে গেছে, যাতে আল্লাহও আর সহ্য করতে চাইছেন না?

আমার এই জিজ্ঞাসাকে আমি যৌক্তিক ভাষায় খতিয়ে দেখতে চাই। ইতিহাস বলে, কোন জাতি-গোষ্ঠী কিংবা সভ্যতা টানা একশ' বছরের বেশী সময়ে শৌর্য-বীর্য নিয়ে টিকে থাকে না, একশ' বছরের মধ্যে উত্থান, বিকাশ ও পতন স্পর্শ করে। প্রাক ইতিহাস যুগের তথ্য আমার জানার বাইরে। ইতিহাসের আওতায় একশ' বছরের এই তত্ত্ব একটি প্রমাণ বহন করে। এই যে সোভিয়েত ইউনিয়ন মাত্র ৭৭ বছরের মাথায় ধ্বংস হয়ে গেল, তারা যেদিন শ্বেত ভল্লুক হয়ে কাবুলের দখলদারিত্ব নিচ্ছিল, তখনও তারা জানত না, তাদের ললাটের

www.pathagar.com

লিখন তারা খণ্ডাতে পারবে না। আমাদের চোখের সামনে কাঁচের টুকরোর মত সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। লেনিন থেকে গর্বাচভ অনেক দিনের ইতিহাস নয়। ইতিহাস সূত্রের বাস্তব প্রমাণ। এভাবেই অতীতের সভ্যতাগুলো নিঃশেষ হয়ে গেছে। আজ আমরা ইতিহাসের গরজে তা শুধু পাঠ্য-পুস্তকে পাই। মহাস্থান গড়, সাল বন বিহার, সোনারগাঁও, আগ্রা-দিল্লী তো আমাদের নখদর্পের ইতিহাস।

কুরআন সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ অতীতে নবীর উপস্থিতিতে তার উম্মাতকে, পুরো একটি জাতিকে, কোন একটি জনপদকে, কোন একটি সভ্যতাকে, কোন একটি ব্যক্তিকে নিমিষে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। আমাদের দেশে পর্বততুল্য ব্যক্তিত্ব, খ্যাতির অহংকারে ভারাক্রান্ত মানুষ অতীতে নিঃশেষ হয়ে যায়নি? অহংকার পতনের মূল- এটি খনার বচন নয়- ইতিহাসের নির্যাস, প্রমাণিত সত্য একটি প্রবচন। জাতি হিসেবে আমেরিকানরা সংকর, কিন্তু আমেরিকার পত্তন হয়েছে জুলুমের মাধ্যমে নেটিভ-রেড ইন্ডিয়ানদের হটিয়ে, জুলুম-পীড়নের মাধ্যমে জন্ম নেয়া- তাদের জন্মটাই আজন্ম পাপ। আজকের ঘটনাপ্রবাহ অদৃষ্টবাদীদের ভাষায় সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিশোধ কিনা সেটাও ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

অনেক সমাজ বিজ্ঞানীর মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসলে রাষ্ট্র নয়। এটি একক জাতিসত্তার পরিচয়বাহী কোন দেশও নয়। যে ধারণার উপর অর্ধশত অঙ্গরাজ্যের সমন্বয়ে এর ভিত্তি, তা একটি চুক্তিনির্ভর ধারণা। সমন্বিত এই ধারণা যে কোন কারণে ভেঙ্গে যেতে পারে। সমঝোতা ও ধারণাগত মিল ভেঙ্গে গেলে মার্কিন সমাজ টিকে থাকবে না।

সমাজতাত্ত্বিকদের ভাষায় একটা সমাজ যেসব কাঠামোর ওপর দাঁড়ায় বা গড়ে ওঠে, মার্কিন সমাজে সেই সকল শর্ত পূরণ করেনি। তাছাড়া একটা সমাজ নিজস্ব দুর্বলতার কারণেও ভেঙ্গে যেতে পারে। পাপাচার, আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও সমাজকে ধরে রাখার মত মূল্যবোধগুলো শিথিল হয়ে গেলেও সমাজ ভেঙ্গে যায়। প্রত্যেক বস্তুর যেমন নিজস্ব একটা ধারণ ক্ষমতা থাকে, অনুরূপ থাকে সমাজেরও। এটা নৈতিক কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সমাজতান্ত্রিক কারণেও সমাজ ভেঙ্গে যায়। পাশ্চাত্যে আজ পাপাচার ও নষ্ট সভ্যতার যে চর্চা, নৈতিক মূল্যবোধের যে ধস, তাতে একটি সমাজ না টিকে থাকার মত কারণ ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

মার্কিনীরা পৃথিবীকে প্রচুর দিয়েছে। যে অর্থেই হোক একটা চমক লাগানো চোখ ধাঁধানো সভ্যতা দিয়েছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উৎকর্ষ প্রদান করেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাদের অবদান অসাধারণ; এটা ভাবনার একদিক। হয়তো এমনও হতে পারে, এই 'সভ্যতা' আর দেবার ক্ষমতা রাখে না। তারা নিঃশেষ হয়ে গেছে অথবা এমন কোন স্তরে তারা পৌঁছে গেছে তারপর আর যাবার পথ নেই। প্রকৃতি আর সহ্য করতে চাইছে না। অতীত বহু সভ্যতা পৃথিবীকে অনেক উপহার দিয়েছে। রোমান, পারস্য, ব্যাবিলনীয় সভ্যতার কথাই ভাবা যায়। কিন্তু দেখা যায়, একটি সময়ের পর তারা তাদের সভ্যতা তো দূরের কথা নিজেদের সাধারণ অস্তিত্বও ধরে রাখতে পারেনি। রাণী সাবার প্রাসাদের যে বর্ণনা, হযরত সুলাইমান নবীর বাদশাহীর যে ইতিহাস, ফেরাউনদের অসীম ক্ষমতার যেসব নমুনা, এমনি অজস্র সভ্যতার কথা আমরা জানি যে সভ্যতাগুলো উৎকর্ষ নিয়েও নৈতিক অধঃপাতের কারণে বিলীন হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

অতীতে যেসব সীমালংঘনের কারণে জাতিগোষ্ঠীর ধ্বংসের বর্ণনা পাওয়া যায়, সেইসব প্রমাণের সাথে সাযুজ্য খুঁজলে মার্কিন সমাজ আরো অর্ধশত বছর আগেই ধ্বংস হয়ে যাবার কথা ছিলো। হয়তো বা পৃথিবীর মানুষ যারা অনাগত দিনে আসবে, তাদের সামনে নমুনা হিসেবে বা উপমা হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য আল্লাহ এ সমাজটিকে এতদিন টিকিয়ে রেখেছেন। তাছাড়া এ শংকর জাতিটি মৌলিক কিছু মানবীয় গুণাবলী সংরক্ষণ করে। হয়তো বা ভাঙ্গার চেয়ে তাদের গড়ার কাজ এখনো বেশি। তাই খোদায়ী আজাব নাজিলের বিধি মোতাবেক তাদেরকে কার্যকারণ দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া হল, তোমরা নিজেদের অহংকারকে সংযত কর অথবা সতর্ক সংকেত হতে পারে যে, তোমরা নিজেদেরকে যে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনীর হোতা ভাব, এটার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। অতএব সাবধান! সতর্ক হও। মিথ্যা অহংকার পরিত্যাগ কর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর মানুষ একবার উচ্চারণ করেছিল, বিজ্ঞান শুধু আশীর্বাদ নয়, অভিশাপও। তারপর মানুষ আর ভাবেনি। ভাবতে চায়নি। আজ নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। মুহাম্মদ আসাদ বিজ্ঞানের নেতিবাচক প্রয়োগকে দাজ্জালের সাথে তুলনা করেছেন। এটাও ভেবে দেখার বিষয় যে, মানুষ আজ বিজ্ঞানের নামে যা চর্চা করছে, এ ক্ষেত্রে সীমালংঘনের মাত্রা অতিক্রান্ত হয়ে গেল কিনা। কারণ অতলস্পর্শী অবদানেরও তল আছে, শেষও আছে। কারণ আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করেছেন, তোমরা ইচ্ছে করলেই আকাশ ফুড়ে নীলীমা অতিক্রম করতে পারনা, পারনা পাতাল ফুড়ে কোথাও পালিয়ে স্রষ্টার সৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে। মার্কিনীরা ধৃষ্টতা প্রদর্শনের শেষসীমায় পৌছে গেল কিনা সেটাও আমাদের ভাবনায় থাকা প্রয়োজন। কারণ, আজ কয়শ' বছরের মাথায় এসে আমরা বুঝতে পারছি না, হরপ্পা-মোহেঞ্জোদারো কি। কারা এখানে বাস করত। মৃত সাগর কেন মৃত। বিবেকী মানুষকে ভাবতে হবে, প্রথম নবী শুধু মানুষ ছিলেন না, ছিলেন নবী। তিনি এত প্রাজ্ঞ ছিলেন যে, আল্লাহই বলছেন, আমি তাকে সবকিছু শিখিয়ে দিয়েছি, যা অতিক্রম করা বা বুঝবার সাধ্য ফেরেশতারও ছিল না। আদম (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস আছে ইহুদীদের, খৃস্টানদের। এরা আহলে কিতাবী। বিকৃত বাইবেলেও এর অজস্র প্রমাণ মিলে। তাহলে সভ্যতার বড়াই করা মানুষ হিসেবে কতটা যৌক্তিক। তাছাড়া আমরা যারা নিজের পেছনের অংশ দেখি না, অন্ধকারে হাতিয়ে মরি, সকল কার্যকারণের ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। সকল কিন্তু ও প্রশ্নের জবাব দিতে যারা অক্ষম তারা কিভাবে দম্ভ, অহমিকাকে খোদায়ী সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারি।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সভ্যতা স্থানান্তরিত হয়। সময়ের সাথে সভ্যতা যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায়। 'সময় বৃদ্ধ যাযাবর' বিখ্যাত ইংরেজি কবিতা যাদের পড়া আছে, তারা সহজে বুঝেন, যে বৃটিশ সাম্রাজ্যে একসময় সূর্য অস্ত যেত না তারা কেন মার্কিনী তাঁবেদার। রোমানদের, পারস্যবাসীর নেই সোনালী দিনের কথাই ভাবুন, ইসলামের ওপর আমল করে মুসলিম উম্মাহ কতবার পৃথিবীকে রাঙ্গিয়েছে। সেই দামেস্ক, সেই বাগদাদ, সেই স্পেন আজ কোথায়? অর্ধ জাহানের নেতৃত্ব দিয়ে যে জাতি ধরাকে দু'হাতে সভ্যতা শিখিয়েছে, তারা আজ ভিখারী। এভাবে ইতিহাসের রশি ধরে যতই পেছনে হাঁটা যাবে আমরা প্রত্যক্ষ করব-খেলাঘরের মত শিশুতুল্য মানুষ বারবার সভ্যতা বিনির্মাণ করেছে, আবার তা খান খান হয়েছে। কারো ধ্বংসের ধরন একেবারে ওলট-পালট করা, কারো বা ধ্বংসের নজির ধীরে ধীরে।

www.pathagar.com

এই যে মস্কো। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী। আগামী প্রজন্মকে জিজ্ঞাসা করলে তারা হয়ত চিনবেও না। অথচ আমরা অর্ধশতক জুড়ে তাদের অবিরাম প্রতাপ প্রত্যক্ষ করলাম। অতীতের কথা টেনে লাভ নেই। বর্তমানকে সামনে নিয়ে ভাবুন। ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে নরিয়েগা, উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে আফ্রিকান জনপদ, ইরাক-কুয়েত থেকে আজকের ফিলিস্তিন, ইসরাইল, লেবান- মানুষের ওপর গজবের মতো মার্কিনী প্রেতরা কি আবির্ভূত হয়নি? আফগানিস্তান তো নতুন উপসর্গ। যেখানেই শক্তি প্রয়োগের প্রশ্ন উঠেছে, মানুষের ওপর আস্ফালন প্রদর্শনের প্রসঙ্গ এসেছে, সেখানেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দারোগার মতো ছড়ি ঘুড়িয়ে দম্ভভরে নিজের অহমিকা ও শক্তিমত্তা জাহির করেছে। পৃথিবীর তাবৎ সরকারকে তারা ভাবে তাদের অনুগত তাঁবেদার। যারাই একটু মাথা তুলতে চেয়েছে তাদেরকে দাবিয়ে দেয়ার সকল চেষ্টা করা হয়েছে। ইরান, ইরাক, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, তুরস্ক কোথায় তারা হানা দেবার চেষ্টা করেনি। গাদ্দাফী, ইদি আমীনদের তারা পাগল বানিয়ে ছেড়েছে। বাদশাহ ফয়সালেরা খুন হয় তাদের চক্রান্তে, জিয়াউল হকরা বাঁচতে পারেননি প্রতিবাদী হয়ে। মাহাথিরদের গলাটিপে ধরার জন্য তাদের অপচেষ্টার শেষ নেই। ইন্দোনেশিয়াকে ধ্বংস করে খৃস্টান জগত গড়ার স্বপ্ন তাদের দীর্ঘদিনের। মধ্যপ্রাচ্যের নেতৃত্ব নেয়ার অভিলাষও অনেক পুরনো। এখানেই শেষ নয়। আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতির যে দিকেই তাকানো যাক, আমরা ক্ষমতাধর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া প্রাধান্য ও খবরদারী লক্ষ্য করছি। তারা নিজ দেশে অন্যায়-ন্যায় বিবেচনা করলেও তাদের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে অহংকারের বহিঃপ্রকাশ। অন্য সকল শক্তি-রাষ্ট্রকে অনুগত করে রাখার কৌশল মাত্র। আজ আর তারা সামরিক শক্তির বাইরে নিজেদের অস্তিত্ব কল্পনা করে না। জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থাকে তারা ইচ্ছে অনুযায়ী অবদমিত করে। নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে বশংবদ করে রেখেছে। এভাবে পৃথিবীতে শক্তির ভারসাম্যহীনতা দীর্ঘদিন চলার কথা নয়। ইতিহাসের নিয়ম অনুযায়ী এই একচেটিয়া আধিপত্যের পরিসমাপ্তি ঘটতে বাধ্য।

আদর্শিক প্রসঙ্গটি আদৌ ঠুনকো নয়। পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী অর্থনীতি জুলুম ও সুদনির্ভর। এটা এতটা স্ফীত হয়েছে যে, নিজেই নিজের ধ্বংসের কারণ হতে শুরু করেছে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও সরকার পদ্ধতির স্খলন ও দুর্বল দিকগুলো উৎকটভাবে ধরা পড়ছে। তারা নিজেরাই প্রশ্ন তুলছে, এটা আর মানুষের তুষ্টির কোন নিয়ামক হতে পারছে না। তাছাড়া ভোগবাদী বস্তুবাদী দর্শন জনগণকে স্বস্তি দেয়নি। শান্তি, স্থিতিও দেয়নি। পিতৃ মাতৃ পরিচয়হীন শিশুটি যেমন প্রশ্ন তুলছে- এই নরকতুল্য পৃথিবীর প্রয়োজন আছে কি? তেমনি প্রশ্ন উঠছে, গীর্জায় বিবেকী মানুষের অন্তরের অন্তস্থল থেকেও। এই প্রশ্নের জবাব মার্কিন বিজ্ঞান, সমাজপতি ও রাষ্ট্রীয় নেতাদের ঝুড়িতে নেই। এর জবাব যেখানে আছে সভ্যতা এবার সেইমুখী হবে এটাই যুক্তি বলে।

এটা সত্য যে, মার্কিনী নেতৃত্ব একসময় পৃথিবীতে মানবাধিকার, মানুষের স্বাধীনতা ও বিবেকের কথা শোনাত। সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখাত। মানবিক সাহায্যের কথা বলে মানবিকতা দেখাত। আজ পৃথিবীর মানুষ মার্কিনী নেতৃত্বের ব্যাভিচারই শুধু প্রত্যক্ষ করেনি, নির্বাচনী ভেজালের ফানুসই শুধু দেখল না, সর্বত্র তাদের দ্বৈত চরিত্রের মাঝে শয়তানের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তিও অবলোকন করেছে। তারা যেন 'শয়তানে বুজুর্গ'। যা বলে তা প্রতারণার ছলে বলে, যা দেখায় তা লোক দেখানো, যা করে

www.pathagar.com

তা নিজস্ব হীন স্বার্থে। তৃতীয় বিশ্বের নেতৃত্ব আজ তাদের হাতে জিম্মি। জনগণ গিনিপিগ, মানবাধিকার শুধু কাগুজে প্রলাপ। এত দ্বৈতনীতি নিয়ে মানুষ বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না। আজকের দাম্ভিক মার্কিনী শাসকরা কি সেই স্তরে নেমে যায়নি?

পেন্টাগন সেই সামরিক হেড কোয়ার্টার, যেখান থেকে সমগ্র পৃথিবীর উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একাধিপত্য বিস্তারের নীলনকশা আঁটে। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। এখানে বসেই বুতাম টিপে ইরাকে হামলা হয়। ইরানে যুদ্ধ বাধায়। কুয়েতে মানুষ মারে। আফগানিস্তানে বোমা ছোঁড়ে। লিবিয়ায় হামলা চালায়। সাগরে সাগরে রণতরী। আকাশে বোমারু বিমান আর স্থলে যুদ্ধবাজ নীতি বাস্তবায়ন। এখানে সেখানে দখলদারিত্ব- সবই তো হয় এই পেন্টাগনের পরিকল্পনা মোতাবেক। পটোম্যাস নদীর পশ্চিম তীরে ভার্জিনীয় রাজ্যের অলিংটনে ১৯৪৩ সালে এটি নির্মিত হয়। ৫ম তলা বিশিষ্ট পাঁচটি ভুজযুক্ত ৮ কোটি ৩০ লাখ ডলার ব্যয়ে এটি সেই সময় নির্মিত হয়েছিল। সেই ডলার আজকের হিসেবে কত একবার ভাবুন। এখানে জানালা সংখ্যা ৭ হাজার ৭শ' ৪৮টি। কর্মকর্তা-কর্মচারী ২৯ হাজার। টেলিফোন সংখ্যা ৪৫ হাজার। পেন্টাগন ভবনে রয়েছে ২টি রেস্টুরেন্ট, ৬টি ক্যাফেটেরিয়া, ৬টি স্ন্যাকবার। নীচু থেকে পেন্টাগনের ভবনের বিভিন্ন অংশ করিডোর ঘুরে পুরো ভবন দেখতে হলে হাঁটতে হয় ২৭ কিলোমিটার। মনে করা হয়, এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতটা প্রযুক্তিনির্ভর যে, মাছি উড়লেও সিগন্যালের দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করতে পারে না।

আর নিউনিয়র্ক বর্তমান বিশ্বের অন্যতম যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম নগর। জাতিসংঘের সদর দফতরের কারণে ভাবা হয় নিউইয়র্ক বিশ্ব রাজধানী। আটলান্টিকের তীরে ১৬১৫ সালে এর গোড়াপত্তন হয়। ১৬২৬ সালে একজন ডাচ (হল্যান্ডের লোক পিটার মিনুইট) ২৪ ডলার মূল্যের বদলায় নেটিভ আমেরিকানদের কাছ থেকে এটি কিনে নেয়। নগদ ডলার দিতে ব্যর্থ হয়ে দামী পাথর, পুতির মালা, নেকলেস দিয়ে মূল্য পরিশোধ করেন। তখন এ জায়গার নাম ছিল নিউ আর্মস্টারডম। বৃটিশরা ১৬৬৪ সালে আক্রমণ করে এই জায়গার দখল নেয়। বৃটিশরা তাদের ইয়র্ক শহরের ডিউক এর সম্মানে এর নাম দেয় নিউ ইয়র্ক। ১৭৮৯ সালের ৩০শে এপ্রিল জর্জ ওয়াশিংটন নতুন করে উদ্বোধন করেন। বর্তমানে নিউইয়র্ক পাঁচটি ডিস্ট্রিক্ট শহরে বিভক্ত। কুইন্স, ব্রুকলীন, ব্রংকস, ম্যানহাটন ও স্টেটের আইল্যান্ড। এর রাজধানী আলবেনী। ব্যপ্তি ৭৮০ কিলোমিটার। শতাধিক দেশের ৩৫ মিলিয়নেরও বেশী লোক প্রতিবছর এখানে যাতায়াত করে।

অন্তর্ঘাত কিংবা ভেতরের আক্রোশী কোন মানুষ অথবা সন্ত্রাসী নামের কোন্ মহল বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগনে অভিনব কায়দায় বিমান হামলা করে। এখনো বিষয়টি সন্দেহ পর্যায়। কিন্তু ধ্বংসলীলা যা হবার তা হয়ে গেছে। কোন নাৎসী করুক, ইহুদী চক্র আর রেড ইন্ডিয়ান করুক, আমাদের বিগত সরকারের বোমা নাটকের মতো মার্কিন প্রশাসন বন্দুক তাক করেছে ওসামা বিন লাদেনের দিকে। আমার জিজ্ঞাসা- লাদেন যদি সত্যিই এত ক্ষমাতধর হয়ে উঠেন, তাহলে মার্কিনীদের ভাবতে হবে- ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক যে কোন কারণেই হোক মার্কিন সমাজের আস্ফালন, অহমিকা, দম্ভ নিঃশেষ হয়ে গেছে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ডব্লিউ বুশকে সাথে সাথে ৪০ হাজার ফিট ওপরে পালিয়েছে। লাদেন এখানে কার্যকারণ মাত্র।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, এর মাধ্যমে মার্কিনীরা মুসলমানদের ওপর জুলুম বাড়িয়েছে হাজার গুণ। আফগানদের ওপর সৃষ্টি করছে– লাখ লাখ টনের মনস্তাত্ত্বিক ও সামরিক চাপ। পাকিস্তান হুমকির মুখে। তাদের পারমানবিক স্থাপনা উড়িয়ে দিতে পারে। মুসলমানদের রক্ত পটোন্যাস নদী হয়ে দজলা ফোরাত, নীল-সিন্ধু দিয়ে বঙ্গোপসাগর নাগাদ পৌঁছতে পারে। এতো গেলো একটি অপ্রমাণিত প্রতিহিংসার ফল। অপরদিকে এটাও তো প্রমাণিত হয়ে যাবে, প্রতিপক্ষে খেলার যোগ্যতা শুধু মুসলমানের আছে। ইসলামই পরবর্তী সভ্যতার নিয়ামক। এর ফাঁক দিয়ে এটাও দুনিয়াবাসীকে জানান দেয়া হল, ক্রেমলিন নিস্তেজ হয়েছে কাবুলে কামড় বসিয়ে। লাদেনকেন্দ্রিক এবার যদি হামলা হয় তাহলে পেন্টাগনের ইটও ঝরে পড়ে যাবে। সেই সাথে নিঃশেষ হয়ে যাবে আটলান্টিকের পাড়ে গড়ে ওঠা একশ' বছর অতিক্রান্ত মার্কিনী সভ্যতা নামক আজকের নষ্ট সভ্যতার পাদপীঠ খ্যাত আমেরিকা। উত্থান-বিকাশ পর্ব হিসেবে বিংশ শতককেই আমরা মার্কিন সমাজের সূচক বিবেচনা করছি।

আমি সন্ত্রাসকে আমলে নিতে চাই না। লাদেন ও ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু যেভাবে মার্কিন নেতৃত্ব তাদের দুর্বলতা ঢাকার অপপ্রয়াস চালিয়ে পুরো দোষ বিনা বিচারে লাদেনের উপর চাপাচ্ছে, তাতে ইরানের দু'দশক আগের কথাই আমার স্মৃতিকে নাড়া দিচ্ছে। পৃথিবীর যে কোন কোণ দেশ থেকে যে কোন মানুষ মার্কিনী সমাজকে-রাষ্ট্রকে-নেতৃত্বকে সমালোচনা করুক তারা তাকে অসহ্য বিবেচনা করে। সেটা জামাল আফগানী হোন, খোমেনী হোন, হাসান তুরাবী-লাদেন হোন, হাসান আলবান্না, মোল্লা ওমর হোন কিংবা মাসুদ আজহার হোন, গাদ্দাফী, সাদ্দাম, মাহাথির যেই হোন না কেন, তিনি মার্কিনী টার্গেট হবেন। এ ক্ষেত্রে যখন যিনি যতো বেশী প্রতিবাদী, তখন তিনিই বেশী আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়াবেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কাল যদি বাংলাদেশ থেকে কোন বিপ্লবী আলেম জিহাদের ডাক দেন, পরদিন তিনিই টার্গেট হবেন। যদি তার ক্ষমতার চৌহদ্দি বিশ্ব মুসলিম তারুণ্যকে নাড়া দেয়, তাহলে বোমা ঘুরে দাঁড়াবে তার দিকে। এটাই বাস্তব সত্য। এই সত্য দীর্ঘদিন আড়ালে ছিল, আমাদের উপলব্ধির বাইরে ছিল।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ইসলামের সত্যের মধ্যে যে শক্তি ও সত্যতার প্রমাণ রয়েছে, তা পাশ্চাত্য বিলম্বে হলেও বুঝেছে। তাই মরণ কামড়টা আসছে ব্যাপকভাবে। দাজ্জালের অবয়বে। ইসলামী শক্তিকে আত্মস্থ করার মাধ্যমে বলীয়ান হতে ব্যর্থ হলে আমরা হবো পরিস্থিতির শিকার। তবে খোদায়ী আজাব নাজিলের বিধি অনুসারে ক্ষমতাদর্পী অহংকারী শয়তানী চক্রের পতন অবশ্যম্ভাবী। সেক্ষেত্রে আল্লাহ নেতৃত্ব তুলে দেবেন অন্য কোন জাতির হাতে, যারা দুনিয়াকে পালন ও সংরক্ষণে অধিকতর যত্নবান। ইসলামী নৈতিকতা সেখানে গৌন হয়ে যাবে। কারণ এটাই খোদায়ী বিধান। ইতিহাস এভাবেই বিনির্মিত হয়ে আসছে।

এ প্রসঙ্গে আমি এ কথাও বলব যে, যদি সত্যিই খোদায়ী আজাব হিসেবে মার্কিনীদের ওপর এ বিপদ আপাতিত হয়, তা রোধ করার সাধ্য কারো নেই। এ ক্ষেত্রে সাধারণ হঠকারিতা নিন্দার কারণ হোক আপত্তি নেই। সাধারণ নিরপরাধ মানুষ মৃত্যুতে আমাদের মানবিক হৃদয় কাঁদুক সেটাও ইতিবাচক দিক। তবে এটাও মানতে হবে, গজব যদি আপতিত হয়, তখন আলেম-শিশু-নারী কেউ রেহাই পায় না। যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ জালেম নন,

www.pathagar.com

তাদের জন্য শান্ত্বনা এই যে, আল্লাহর কাছে নিরপরাধ লোকের জন্য বিনিময়ের কোন অভাব নেই।

আর একজন লাদেন এবং একটি জনপদ মানুষের মুক্তির জন্য যদি শয়তানের হাতে ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়, তাতে পরোয়া করার কিছুই নেই। কারণ মাও সেতুং বস্তুবাদী ও নাস্তিক হয়ে যদি বলতে পারেন, বিপ্লব ধ্বংস নয়, সৃষ্টির প্রসব বেদনা, তাহলে ঈমান নিয়ে আমি কেন পাঁচশ' কোটি মানুষের মুক্তির জন্য কয়েক লক্ষ মানুষের কুরবানী মানব না? কেনই বা আফগান-লাদেন নিয়ে আহাজারী করব। যে মৃত্যু যত বেশী অহংকারের, সেই মৃত্যু ততবেশী ভয়ানক হয়ে আসে। এটাই ঈমানের পরীক্ষা এবং নাজাতের প্রকৃষ্ট পন্থা।

আমেরিকা তার পতনকে অনিবার্য করে তুলেছে

মুসলিম উম্মাহর উপর বুশ-ব্লেয়ার চক্র ক্রুসেড চাপিয়ে দিয়েছে। ইহুদী-খৃস্টানরা আজ একাট্টা হয়ে লড়ছে। তাদের এই লড়াই শুধু একটি দেশের বিরুদ্ধে নয়, ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে। সঙ্গত কারণেই দুনিয়ার মুসলিম আজ আক্রান্ত। মুসলিম বিশ্ব আজ ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ও ভয়াবহ নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার। আফগানিস্তানসহ সমগ্র মুসলিম জাতির উপর মানবতার দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও বৃটেনের নেতৃত্বে এক দুঃসহ অমানবিক যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। কার্যত বিশ্বের তাবৎ মুসলমানের বিরুদ্ধে ইহুদী-খৃস্টান-মোনাফেক-মোশরেক চক্রের আরোপিত এই ক্রুসেড সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধে, দুনিয়ার সমস্ত মজলুম-মুসলমানের বিরুদ্ধে।

যে সন্ত্রাসের কথা বলে, মানবতার কথা বলে আমেরিকার নেতৃত্বে সমগ্র কুফর এক সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে, বাস্তবতা হচ্ছে ইতিহাসের আদিপট থেকেই এরা মুসলমানদের দুশমন, ঈমানদারের প্রতিপক্ষে শয়তানী শক্তির প্রতিভূ। এরা মজলুমের বিরুদ্ধে জালেম হিসেবে বারবার বর্বরতার ও নিষ্ঠুরতার প্রতীক দাজ্জালরূপে আবির্ভূত হয়েছে। অথচ ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস, এরাই প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে মিথ্যার বেসাতি চালিয়ে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করছে। পৃথিবীর মানচিত্র জুড়ে এদের দস্যুবৃত্তি, আগ্রাসী নীতি মানবতাকে বিপর্যয়ের শেষ প্রান্তে নিয়ে গেছে। যে আমেরিকা আজ সন্ত্রাসের কথা বলে মজলুমদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, এ তো সেই আমেরিকা, যারা দস্যুবৃত্তি ও জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের হটিয়ে হাজার হাজার নিরীহ-নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে মার্কিন সমাজ ও রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছে।

এই তো সেই আমেরিকা, যারা দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ বিভীষিকা সৃষ্টি করে এক কোটির ওপরে মানুষ হত্যা করেছে। জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিকে এটম বোমা মেরে শুধু উড়িয়েই দেয়নি, লক্ষ-কোটি মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছে। পঙ্গু-অসহায়-বিকলাঙ্গ মানুষের সেই আহাজারি আজও বিশ্ব বিবেককে ব্যথাতুর করে তোলে।

এ তো সেই আমেরিকা-ইউরোপ, যারা তেলসম্পদ লুণ্ঠনের জন্য সমগ্র আরব জাহানের উপর জবরদস্তির মাধমে এক আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। অনুগত দাসের মত ব্যবহার করছে মোনাফেক শাসক-রাজা-বাদশা-শেখ নামক মেরুদণ্ডহীন মুসলিম নামধারী জাতির কুলাঙ্গারদের।

www.pathagar.com

সাদ্দাম সৃষ্টি করেছে আমেরিকা। তাকে লেলিয়ে দিয়েছে ইরানকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য। ইরাক-ইরান যুদ্ধের প্রত্যক্ষ মদদদাতা খোদ আমেরিকাই আবার কুয়েত দখলের নাটক করেছে। সেই দখলমুক্তির কথা বলে তারাই আবার সাদ্দাম ধ্বংসের নামে কুয়েত ও ইরাকে নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হাজার হাজার বনি আদমকে বর্বরোচিত ও ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম কায়দায় দিনের পর দিন হত্যা করেছে। ইরানকে ধ্বংসের জন্য তারা জীবন-বিধ্বংসী রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বেসামরিক বিমান ধ্বংস করেছে, বোমা মেরে এক সাথে ৭২ জন নেতাকে হত্যা করেছে।

ইসরাইল নামক অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্রটির জন্মদাতা এই আমেরিকা ও ইউরোপ। আমেরিকার অস্ত্র, গোপন গোয়েন্দা সংস্থা ও সৈন্য বাহিনী দিয়ে ইতিহাসের ট্র্যাজেডি খ্যাত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবত আরব-ইসরাইল যুদ্ধের নামে আমেরিকা আরব মুসলিম তথা মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। এমন দিন নেই, যেদিন দু'চারজন ফিলিস্তিনী মুক্তিযোদ্ধা ও শিশু-নারীকে হত্যা করা হচ্ছে না। তারাই আবার শান্তির ললিত বাণী শুনিয়ে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি করে। তারাই যুদ্ধ বিরতির নামে ইসরাইলকে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ করে দেয়।

নাইজেরিয়াকে দেউলে করে দিয়েছে আমেরিকা। আলজেরিয়া, সুদানকে অস্থিতিশীল করে রাখার একক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। লিবিয়া ও সিরিয়ার উপর আক্রমণের প্রেক্ষিত রচনা করেছে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কর্নেল গাদ্দাফীকে হত্যার পরিকল্পনা, বোমা হামলা, ইদি আমীনকে পাগল বলে প্রচারণা, নরিয়েগাকে তুলে আনা, লেবাননে প্রতিনিয়ত রক্ত ঝরাবার ফন্দি আঁটা-সবটাই তো আমেরিকার প্রতক্ষ দম্ভ ও অহমিকার ঘৃণ্য ফসল।

পৃথিবীর মানুষ ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিভীষিকা আজও ভুলেনি। লাশের স্তূপ আর মানবতার বিপর্যয়কে একদিকে রেখে এরাই আবার মানবতার কথা বলে। '৭১-এ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের সপ্তম নৌ-বহর নাটক ও ৫০ বছরের কাশ্মীরীদের মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে আমেরিকা কি জঘন্য খেলাই না খেলেছে। বসনিয়া-চেচনিয়া-পূর্ব তিমুর নিয়ে তাদের মোনাফেকী চরিত্রের দ্বিমুখী আচরণ তো কেউ ভুলে যায়নি।

এই আমেরিকাই তো রুশ আগ্রাসনের সময় আফগানদের প্রতি মায়াকান্না দেখিয়েছে। তারাই আবার আক্রমণ করছে আফগানের নিরপরাধ মানুষের উপর। এরাই দুনিয়াজুড়ে স্বঘোষিত দারোগার মত ফেরাউনী আচরণ করে। আবার শান্তির দূত সেজে খোদ শয়তান-প্রেত হয়ে দানবের বেশে আক্রমণ করে। একদিকে তারা সাপ হয়ে দুশমনি করে, অপরদিকে ওজা হয়ে ঝাড়ার ভান করে।

বিগত একশ' বছরে পৃথিবীর এমন কোন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেনি, যেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাত নেই। এমন কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটেনি, যেখানে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আমেরিকা জড়িত নয়। অথচ তারাই দুনিয়ার সকল সম্পদ লুণ্ঠন করছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বজুড়ে। খবরদারী করে জাতিসংঘসহ বিশ্বের সকল আন্তর্জাতিক ফোরামকে দখল করে রেখেছে, দুনিয়ার সমস্ত শাসকদের উপর সৃষ্টি করে রেখেছে এমন এক ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক চাপ, যার কাছে নতি স্বীকার করে টিকে আছে অনুগত রাষ্ট্রের শাসকরা। আমেরিকা হচ্ছে সেই রাষ্ট্র, যাদের

www.pathagar.com

জন্মটাই আজন্ম পাপের ওপর, দস্যুবৃত্তি ও সন্ত্রাসের ওপর, জবর-দখল ও হত্যা-লুণ্ঠনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী নীতি বাস্তবায়নের ওপর।

ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে শরণার্থী শিবিরে জন্ম নেয়া মজলুম কোন প্রতিবাদী মানুষ, মুক্তিকামী কোন মুজাহিদ, জুলুমে জর্জরিত কোন বনি আদম, সন্ত্রাসের শিকার কোন লড়াকু যোদ্ধা যখন আমেরিকা-ইউরোপের সন্ত্রাসী বর্বরতার প্রতিবাদে সামনে এসে দাঁড়ায়, তখনই সেই দেশ-রাষ্ট্র-ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী আখ্যা পায় সন্ত্রাসী, মৌলবাদী, ধর্মান্ধ কিংবা জঙ্গী অথবা অন্য কোন অভিযোগ তাদের ওপর আরোপ করা হয়। যারা সন্ত্রাসের জন্মদাতা, সন্ত্রাসের লালনকর্তা, সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়ার হোতা, তারাই আবার মানবতার জন্য মায়াকান্না প্রদর্শন করে।

সন্ত্রাসের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আখ্যা পায়, জুলুমের মোকাবেলায় উচ্চস্তরের আহাজারিও যদি জালেমের অসহ্য হয়, বর্বরতার মোকাবেলায় বুকফাটা কান্নাও যদি অপরাধ বিবেচিত হয়; তাহলে আরশের প্রভুর শপথ, পবিত্র কোরানের ঘোষণা, নবী আলাইহিস সালামের আহ্বান, যুগ যুগ ধরে মানবতাবাদী মানুষের নির্দেশনা লড়াই ছাড়া মজলুমের আর কোন পথ নেই। জিহাদ ছাড়া মুমিনের পথ নেই। সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের আর কি-ইবা করার আছে!

শয়তানী চক্র ও দাজ্জাল পৃথিবীর জনপদগুলোকে তাদের চারণভূমি বিবেচনা করছে। সমগ্র মানুষকে ভাবছে দাস আর রাষ্ট্রগুলোর শাসকদের ভাবছে ক্রীড়নক। আমাদের সম্পদকে লুণ্ঠন করছে দস্যুর মত। মানুষের উপর চাপাচ্ছে স্নায়ু, রাসায়নিক ও আণবিক যুদ্ধ। লাখ লাখ মানুষ তা চেয়ে চেয়ে দেখবে- এটা কিভাবে সম্ভব হবে পারে?

দম্ভ, অহমিকা, একক আধিপত্য প্রদর্শনের খেয়ালীপনা, মানুষের জীবন নিয়ে হেয়ালিপনা, কামান দাগিয়ে উৎসব করা, বোমা মেরে উল্লাস প্রকাশ, মানবতার বিপর্যয় ঘটিয়ে আস্ফালন প্রদর্শন কোনো মানুষ, কোন ঈমানদার মানতে পারে না। অতএব উঠুন, জাগ্রত হন, প্রতিবাদ করুন, প্রতিরোধের ব্যূহ রচনা করুন। শান্তির সপক্ষে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করুন। জালেম, সন্ত্রাসী, আমেরিকা-ইউরোপীয় কুফরী শক্তির দম্ভ-অহমিকা গুঁড়িয়ে দিন। জালেমের মোকাবেলায় মজলুমের বিজয় অনিবার্য। দম্ভ-অহমিকা-নির্ভর শয়তানী চক্রের পতন অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ্ সকল জালেমের মোকাবেলায় মজলুমের বিজয় দিন। সন্ত্রাসমুক্ত শান্তিকামী বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের সহায় হন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, দম্ভ, অহমিকা, অন্যায় আস্ফালনকারী নব্য ফেরাউনরূপী খোদায়ী শক্তির মিথ্যা দাবীদার ইহুদী-খৃস্টান মোশরেক-কাফেরদের সম্মিলিত শক্তির প্রতিভূ আমেরিকা-ইউরোপের পাপিষ্ঠ শাসকদের হাত থেকে মানবতা মুক্তি পাক।

আমাদেরকে জানতে হবে ন্যাটোর আড়ালে ইহুদী-খৃস্টান শক্তি কেন আজ একজোট হয়েছে। 'ন্যাম' নাম নিয়ে তারা কিসের আয়োজন করছে। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ইহুদী-খৃস্টানরা কি কখনো মুসলিমদের বন্ধু হয়েছে, না কেয়ামত নাগাদ হবে। তারা যখন মূলে ফিরে গিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বর্ণচোরা নয়া ক্রুসেডের ডাক দিয়েছে, এখনও কি আমরা আমাদের মুসলিম জাতিসত্তার স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করব না? ঈমানকে শাণিত করে শত্রু-বন্ধু চিনবার প্রয়াস চালাব না? আজও কি আমরা তাদের

www.pathagar.com

আরোপিত শব্দ মৌলবাদ আর নানা ভাষায় মিথ্যা বেসাতির কাছে মাথানত করে দাসত্ব মেনে নেব?

এক দেহতুল্য ঈমানদাররা যেমন পরস্পরের ভাই, ঈমানদার মুসলিমের মোকাবেলায় সমস্ত কুফরও এক ও অভিন্ন। কোরান-হাদীসের এ নিখাদ সত্য উক্তি আজও যদি আমরা বুঝতে চেষ্টা না করি, তাহলে আর কখন আমরা পবিত্র কোরানের সেই বাণী- "মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ছাড়া কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে, যে কেউ এরূপ করবে, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই" এ সত্য বুঝব এবং মানব?

আজকের পরিবেশকে নব্য ক্রুসেডাররা এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে, একদিকে তারা বিমানে খাদ্য ছুঁড়ে দেয়ার মহড়া প্রদর্শন করছে, অপরদিকে ছুঁড়ে মারছে লক্ষ লক্ষ টন বোমা। মানুষ এবং মানবতা নিয়ে এমন ঘৃণ্য আচরণ ও হেঁয়ালিপনা পৃথিবীর বিবেকবান মানুষকেও প্রতারিত করছে। আজ তারা এবং তাদের দোসররা আরো একটি নতুন খেলায় মেতেছে। জহির শাহ নামক আরেক পুতুলকে বসিয়ে ঘটনার নাটকীয় মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাচ্ছে। এভাবে মুসলমানের রক্ত নিয়ে উৎসবসম আচরণ করে তালেবান সরকার উৎখাতের মহড়া মুসলিম নামধারীরা কিভাবে হজম করছে, এটা ভাবতেও আমাদের তাজ্জব লাগে। এখন স্পষ্ট, লাদেন উপসর্গ মাত্র, মূলত তালেবান ইসলামী সরকারকে উৎখাত করাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের সমস্ত চর-অনুচরদের একমাত্র লক্ষ্য। ঘটনা এতটা পরিষ্কার হওয়ার পরও যেসব মুসলিম নামধারী শাসক মার্কিনী ফাঁদে পা দিচ্ছে, তাদের জন্য গজব কামনা করা ছাড়া আমাদের আর কিইবা করার আছে।

হ্যাঁ, দায়িত্ব আছে আমাদের। স্ব-স্ব অবস্থান থেকে কুফরের মোকাবেলায় ঈমানদারের ভূমিকা পালন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে যার সামর্থ্য আছে, তার উচিৎ হামাগুড়ি দিয়ে জিহাদে শরীক হওয়া। আত্মরক্ষার এ জিহাদ, শান্তি রক্ষার এ জিহাদ, জালেমের মোকাবেলায় মজলুমের সপক্ষের এ জিহাদ, মানবতার বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় এ জিহাদ, দস্যুদের মোকাবেলায় শান্তিকামী মানুষের এ জিহাদ অবশ্যই বিজয় স্পর্শ করবে। কারণ জালেম যে পরিমাণ সীমালংঘন করে ফেলেছে, মজলুমের আহাজারি খোদার আরশকে কাঁপিয়ে তুলছে। অতএব, আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় নিকটে। শুধু আমাদেরকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করার অপেক্ষা।

"তোমরা নিথর হয়ো না, ভীতসন্ত্রস্ত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও"। এ ধরনের অভয় বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য অপেক্ষমান। ❑

www.pathagar.com

ইঙ্গ-মার্কিন সন্ত্রাস ঃ আফগানকে দিয়ে আফগান হত্যা

আবদুল মতিন খান

মাসের ওপরে হল আফগানিস্তানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমানবাহিত বোমা পড়ছে। এ সব বোমা পড়ছে রাতের যে কোনো সময় এবং দিনের যে কোনো সময়। এ সকল বোমার এক একটি দু'হাজার থেকে পাঁচ হাজার পাউন্ড ওজনের। এ সব বোমার মধ্যে রয়েছে ক্লাস্টার বা গুচ্ছবোমা যার প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে শ' শ' বোমা যা কেউ স্পর্শ না করা পর্যন্ত ফাটে না; এ বোমাগুলো কাজ করে ভূমি মাইনের মতো, যে অঞ্চলে বোমাগুলো ফেলা হয় সে অঞ্চল চলাচলের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়ে। বোমাগুলো দেখতে খুব সুন্দর হওয়ায় সহজেই সেগুলো শিশু ও শিশুতুল্যদের আকৃষ্ট করে। যুক্তরাষ্ট্র বোমার সঙ্গে বিমান থেকে আফগানিস্তানে 'দুস্থ ও নিরপরাধ' জনগণের জন্যে খাবারের প্যাকেটও ফেলেছে। ব্যাপক বোমা বর্ষণের কারণে লাখ লাখ আফগান আজ ঘর-ছাড়া, প্রাণ হাতে করে তারা ছুটছে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে। গৃহহীন এ সব ছিন্নমূলদের ওপরও পড়ছে বোমা এই গোয়েন্দা রিপোর্টের ওপর নিশ্চিত আস্থা রেখে যে তার মধ্যে তালেবানরা লুকিয়ে জায়গা বদল করেও রক্ষা পায় নি। তাদের পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। ইতোমধ্যে কুন্দুজ শহরের পতন হয়েছে। হয় আত্মহত্যা, না হয় আত্মসমর্পণ করছে তালেবানরা। শরণার্থীর কাফেলাও ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে হয়ে যাচ্ছে ছিন্নভিন্ন। এতো সব মৃত্যুফাঁদের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেও যারা বেঁচে থাকছে তাদের জন্যে দয়ার সাগর যুক্তরাষ্ট্রের শাসকরা আকাশ থেকে বোমার সমান্তরালে না কি ফেলছে দিনের পর দিন অভুক্তদের জন্যে খাবারের সুদৃশ্য প্যাকেট যা দেখতে অবিকল ক্লাস্টার বোমার মতো। ক্লাস্টার বোমার দ্বারা দলে দলে নিহত হতেই যে পিশাচরা এ কাজ করছে যাতে কারো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। আফগানদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের নরঘাতকদের যদি সামান্যতম মানবিক করুণাও থাকতো তাহলে এ কাজ তারা করতো না এবং নির্ভুলভাবে ধ্বংস করতো না কাবুলের জাতিসংঘ ভবন, রেড ক্রিসেন্ট কার্যালয় ও তৎসংলগ্ন খাদ্য ও ওষুধের গুদাম এবং ডাক্তার, নার্স ও রোগীসহ হেরাতের পরো হাসপাতাল। যুক্তরাষ্ট্রের কারণে বিগত সিকি শতাব্দী যাবত আফগানিস্তান বোমার আঘাতে আঘাতে খোয়ায় পরিণত। যে সামান্য কিছু অবকাঠামো সে দেশে অবশিষ্ট

www.pathagar.com

ছিলো তালেবান শায়েস্তা করার নামে সেগুলো এখন দুমড়ানো ইস্পাত খণ্ড ছাড়া কিছু নয়। বিমানবন্দর, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কলকারখানা, দুধের খামার, হোটেল সবকিছু এখন ধ্বংসস্তূপ। সন্ত্রাস দমনের নামে এতো বড়ো সন্ত্রাস মানবজাতির ইতিহাসে ইসরাইলিদের দিয়ে ফিলিস্তিনিদের উৎখাত, হত্যা ও কামান ক্ষেপণাস্ত্র ও বুলডোজার দিয়ে তাদের ঘরবাড়ি, কলকারখানা ও ব্যবসায়কেন্দ্র ধূলির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া ছাড়া আর নেই। একই ধরনের মারাত্মক সন্ত্রাস যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন চালিয়েছিলো ইরাকিদের বিরুদ্ধে সাদ্দাম হোসেনকে শায়েস্তা করার নামে, যার অবসান আজও হয় নি; অবরোধের শিকার হয়ে খাদ্য ও ওষুধের অভাবে হাজার হাজার ইরাকি শিশু, মাতা ও বয়স্করা প্রাণ হারিয়ে চলেছে উপসাগর যুদ্ধের সময় থেকে। উপসাগর যুদ্ধের শেষ লগ্নে ইরাকিরা যখন ফ্রন্ট থেকে পশ্চাদপসরণ করছিলো তখন দশ মাইল লম্বা তাদের বহরের ওপর পরমাণু বর্জ্য দিয়ে তৈরি আগুনে বোমা ফেলে তাদের লটবহরসহ পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়। এতো বড়ো গণহত্যার দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বেশি মিলবে না।

এই যে সব হত্যাযজ্ঞ ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের পিশাচেরও অধম শাসকরা কেনো চালিয়ে যাচ্ছে? চালিয়ে যাবার একটাই কারণ, তাহলো তাদের অর্থনীতির বাধকতা। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা। এই অর্থ-ব্যবস্থা নির্দয় নির্মম শোষণ ছাড়া টিকতে পারে না। শোষণ কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে এ ব্যবস্থা আপনাতেই ভেঙে পড়ে। পুঁজিবাদ যাকে আজকাল বলা হয় বাজার অর্থনীতি, টিকিয়ে রাখতে গেলে শোষণ ছাড়া চলবে না। প্রবলকে শোষণ করা যায় না। করতে গেলে বেধে যায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এর প্রমাণ ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো দু দু'টো বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে পেয়েছে। অতএব, সে পথে তারা আর পা বাড়াবে না। তাদের দ্বারা দুর্বলকে শোষণ যাতে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ছাড়াই চলতে পারে, তার জন্যে তারা প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে জাতিসংঘ এবং বিশ্ব ব্যাংক। আজ প্রধানত এই দুই সংস্থা ও তাদের অঙ্গ সংগঠনগুলোর মাধ্যমেই বিশ্বের আটটি ধনী রাষ্ট্র (জি-এইট না স-আট) তাদের বলগাহীন শোষণ-নির্যাতন চালিয়ে থাকে। তাদের বাধা দেবার কেউ নেই। আজ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। এ আন্দোলনকে কার্যকর করে তোলার মধ্যেই নিহিত দুর্বল দেশগুলোর বেঁচে থাকার উপায়। কিন্তু কে সে আন্দোলনকে বেগবান করে তুলবে ? হুলোর ভয়ে সব ইঁদুরই আজ কম্পমান। তাদের পক্ষে এ আন্দোলনকে লাশ ভাবা ছাড়া উপায় নেই। অথচ ন্যামই হতে পারতো দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

আফগানিস্তানের অস্ত্রবল বলতে কিছু নেই। যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্যে প্রথমে মুজাহিদিন (আজকে যাদের বলা হচ্ছে উত্তরের জোট) ও পরে তালেবান সৃষ্টি করে মুজাহিদিনদের (তাদের পাকিস্তান ও পাশ্চাত্য-বিরোধী অবস্থান নেয়ার কারণে) হটিয়ে তাদের আফগানিস্তানের গদিতে বসিয়ে দেয়া হয়। তালেবানদের দিয়ে মুজাহিদিনদের উৎখাত করার সময় যুক্তরাষ্ট্র তাদের অস্ত্রের জোগান দেয়। যুদ্ধে তাদের অনেক অস্ত্র ব্যয় হয়। তারপর সামান্যই তাদের হাতে ছিলো। সেই অস্ত্র নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সমরাস্ত্রের মোকাবেলা করতে যাওয়া কেবল অসম্ভব নয় নিরর্থক। তবু যুক্তরাষ্ট্রের বীরপুরুষেরা তালেবানদের ভয়ে এতো ভীত যে এক মাসের অধিককাল ধরে দিবারাত্র বোমা মেরে সব কিছু ধ্বংস করে দেবার পরও আকাশ থেকে বোমা ফেলা ছাড়া স্থলযুদ্ধের কথা স্বপ্নেও ভাবছে না। বীরেরা নিরস্ত্রকে আঘাত করে না। যুদ্ধে এ নিয়ম প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে আছে। যারা

www.pathagar.com

কাপুরুষ তারাই কেবল অস্ত্র নিয়ে নিরস্ত্রকে আঘাত করে ও হত্যা করে। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন চরম কাপুরুষের মতো তাই করছে। তবু জয়ের চিন্তা তাদের মনের মধ্যে এখনও ঠাঁই পেলো না।

যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও তালেবানের পতন সত্ত্বেও আফগানিস্তানে যে শেষ পর্যন্ত জিতবে না তা তারা ভালো করেই জানে। এ জন্যই তারা তথাকথিত 'উত্তরের জোট'-এর সহায়তা নিয়ে অর্থাৎ আফগানদের দিয়ে আফগানদের হত্যা করিয়ে অগ্রসর হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো আফগানদের দিয়ে আফগান হত্যায় তারা যে কৌশল নিয়েছে সেটা অতীতের মতো আজও কাজ করছে। হিন্দুস্তান দখলের সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও এ কৌশলই সফলভাবে কাজে লাগিয়েছিলো, তারা সমগ্র ভারতবর্ষ দখলে প্রধানত ভারতীয় রাজন্যবর্গের একাংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলো। একাংশের পরাজয়ের পর অন্য অংশকেও ব্রিটিশ বাহিনী (যার সেপাইদের সকলেই ছিলো ভারতীয়) সহজেই বশীভূত করে। দেশবাসীর একাংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো এই যে সাফল্য এর কারণ হলো তাদের রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতা। রাজনৈতিকভাবে পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া (অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশ) আধুনিক হলে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পক্ষে এ বিশাল অঞ্চলের সম্পদ শোষণ করা এতো সহজ হতো না। পুরো অঞ্চলটাই এতো পিছিয়ে থাকা যে এ দেশগুলোর শোষিত হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই।

এ অঞ্চলগুলো যে রাজনৈতিকভাবে তাদের শৈশবও অতিক্রম করতে পারে নি তার প্রমাণ জাতির পরিচয়ে নয় ধর্মের পরিচয়ে এবং আফগানিস্তানে গোত্রের পরিচয়ে এ সব দেশের মানুষের পরিচয় দিয়ে সুখ পাওয়া। জনগণের এই পশ্চাৎপদতাকেই কাজে লাগিয়ে চলেছে স-আট। ধর্ম ও গোত্র পরিচয়কে মুখ্য করে দিয়ে জি-এইট এই দেশগুলোর মানুষকে একের বিরুদ্ধে অন্যকে লেলিয়ে দেয়ার একই সঙ্গে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে তাদের মৌলবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা বন্ধ করে দিয়ে তাদের তালেবানি মাদ্রাসা শিক্ষায় দীক্ষা দেয়া হচ্ছে। জেনে কেউ হাসবে না কাঁদবে বোঝা দুষ্কর। পাকিস্তানের একদল ধর্মান্ধ উন্মুক্ত তরবারি হাতে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ছুটেছিলো আফগানিস্তানের দিকে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেখানে মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্য তরবারি হাতে তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে দাঁড়িয়ে নেই! শেষ পর্যন্ত ফল শুভ হয় নি। এই বোধ নিয়ে ধর্মযুদ্ধ করতে গিয়েছিলো বলেই যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের শাসকরা তাদের প্রতি এতো প্রীত। তারা চায় উপদ্রুত জনতার মধ্যে এ বোধ যেনো চিরস্থায়ী হয়। জনতার মধ্যে এ বোধ যতো তীব্র হবে বিনা যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা তাদের হবে ততো উজ্জ্বল।

পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হলো জীবন ধারণের সকল উপকরণ সহজে সংগ্রহ, আহরণ, উৎপাদন ও ভোগ করতে পারা। এর ব্যত্যয় ঘটে যখন কেউ বা একদল তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই সব উপকরণ দখল করে নিয়ে অন্যকে বঞ্চিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার মাত্র ছয় ভাগ অথচ তারা ভোগ করে বিশ্বের তাবত সম্পদের ষাট ভাগের ওপরে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরিদ্র বিশ্বের দ্বন্দ্ব এটা নিয়েই। দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যেও ধনী-দরিদ্রের ভোগের অনুপাত এর চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। এ পর্বতপ্রমাণ বৈষম্যের অবসানই আসল বিষয় বা ইস্যু। দ্বন্দ্বটা ধনী-গরিবের মুসলমান-খ্রীস্টানে, মুসলমান-ইহুদিতে অথবা মুসলমান হিন্দুতে নয়। ধর্ম নিয়ে মানুষে মানুষে ঝগড়া-ফ্যাসাদের কোনো ব্যাপারই নেই। মূল ইস্যু থেকে দরিদ্র গণনাতীত মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে

www.pathagar.com

রাখতে ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে হানাহানির সূত্রপাত ঘটানো হয়েছে। সন্ত্রাসিরা যাদের ওপর সন্ত্রাস করছে তাদেরকেই উল্টো আখ্যা দিয়ে তাদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাবার সুযোগ করে নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন আন্তর্জাতিক কোয়ালিশন করে এ জঘন্য কুকর্ম করেছে। তারা করেছে তাদের এককালের সুহৃদ ও অন্তরঙ্গ সহযোদ্ধা ওসামা বিন লাদেন ও তার আশ্রয়দাতা তালেবানদের ওপর। প্যালেস্টাইন ভূমিতে উড়ে এসে জুড়ে বসা ইসরাইলিরা করছে ফিলিস্তিনিদের ওপর। এ কুকর্ম রুশরা করছে চেচেনদের ওপর। ভারতীয়রা করছে কাশ্মীর, পূর্বভারত ও অংশত বাংলাদেশের ওপর। চীনারা সিওজিয়ানের ওপর। এ যে কত ভয়ঙ্কর রকমের সন্ত্রাস বলে কূল করা যাবে না।

কিন্তু পৃথিবীতে আজ দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া। সন্ত্রাসিরা যাদের ওপর সন্ত্রাস করছে, কাকতালীয়ভাবে তারা অধিকাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। ফলে প্রপাগান্ডার জোরে আজ ইসলাম, মুসলমান ও সন্ত্রাস এক হয়ে গেছে। যাবার কারণ হল, যাকে বলা যায়, সামাজিক আপেক্ষিকতাবাদ (থিয়োরি অব সোশ্যাল রিলেটিভিটি)। দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ফিলিস্তিনি, চেচেন এবং আফগানিদের ওপর যে নৃশংস নির্যাতন চলছে তার দ্বারা বিশ্বের মুসলমান ছাড়া আর কেউ মোটেই বিচলিতবোধ করছে না। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরা এর ব্যতিক্রম। তারা মিছিল ও সভা করে এ সব আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে শান্তি সমাবেশ হয়েছে, কিন্তু সেটা তাদের জনগণের যুদ্ধে জড়িয়ে মারা পড়ার সম্ভাবনা থেকে। কিন্তু প্রায় সকল দেশের মুসলমান শাসকরাসহ (ব্যতিক্রম মালয়েশিয়া) পৃথিবীর সকল সরকারই বুশ-ব্লেয়ারের সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের প্রতি সমর্থন দিচ্ছে। অটল বিহারী বাজপেয়ীর রয়েছে কাশ্মীর সমস্যা এবং ভ্লাদিমির পুতিনের রয়েছে চেচেন সমস্যা। তারা মস্কোতে সন্ত্রাস নিয়ে বৈঠক করেছেন (০৮-১১-০১) এবং সন্ত্রাসিদের পেটাতে একমত হয়েছেন। কিন্তু চেচেনরা যদি উদাহরণস্বরূপ হিন্দু হত এবং কাশ্মীরীরা অর্থডক্স রুশ গির্জার খ্রিস্টান তাহলে তাদের মধ্যকার আজকের এই সমঝোতা হত না। পূর্ব তিমুরিরা খ্রিস্টান ছিলো বলেই যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ইন্দোনেশিয়ার ওপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করে ইন্দোনেশিয়ার ভূভাগ এই দ্বীপটিকে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন করে দিয়েছে। পাকিস্তানি ও কাশ্মীরীরা খ্রিস্টান থাকলে মাউন্ট ব্যাটেন ভারতীয় সৈন্য চালিয়ে দিয়ে (১৯৪৭) কাশ্মীরকে ভারতের অংশ করার মোটেও চেষ্টা করতেন না। ফিলিস্তিনিরা সকলে খ্রিস্টান হলে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র ওখানে ইসরাইল রাষ্ট্র হতে দিত না। মোল্লা ওমর ও বাজপেয়ী মৌলবাদী জঠরে একই ভ্রূণ থেকে বর্ধিত দুই সহোদর। তবু তাদের ধর্মবিশ্বাস পৃথক হবার দরুন রাজপেয়ী যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রাশিয়া সকল দেশেরই কোল পাচ্ছেন কেবল অমুসলিম হবার কারণে। মুসলিম হবার অপরাধে মোল্লা ওমর হয়েছেন তাদের শত্রু। এর প্রত্যেকটি হল সামাজিক আপেক্ষিকতাবাদের নমুনা। ধর্মের এই অবৈজ্ঞানিক আপেক্ষিকতাবাদ প্রচার করেই পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী অমানবিক তথাকথিত সভ্যতা যা বর্বরতারও অধিক এখনও শ্বাস ফেলছে। একে পরাভূত না করা পর্যন্ত সর্ব মানবীয় সভ্যতার উন্মেষ সম্ভব নয়। খ্রিস্টান হলে খ্রিস্টানকে সমর্থন দিতে হবে, মুসলমান হলে মুসলমানকে এবং হিন্দু হলে হিন্দুকে ন্যায়-অন্যায় বাছবিচার না করে এবং এর ব্যত্যয় হলে হবে না সামাজিক এই আপেক্ষিকত্ব একটি পশ্চাৎপদ মনোভঙ্গি যা নিঃসন্দেহে মানব জাতির অগ্রগমনের পথে বাধা। এ বাধা আমাদের মানুষ হিসেবে দূর করতে হবে। ❑

২৮ নভেম্বর ২০০১

www.pathagar.com

এসব দেশের কপালে এই-ই থাকে

(দুই)

এ বছরের সেপ্টেম্বরের এগারো তারিখ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিরক্ষা সদর পেন্টাগনের একাংশ ও নিউইয়র্ক নগরীর জোড়া টাওয়ার সম্পূর্ণরূপে যাত্রীবাহী বিমানের সাহায্যে সার্থক হামলায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। একটি বিমান উড্ডয়নের পর পরই ভেঙ্গে পড়ায় তৃতীয় অথবা প্রধান লক্ষ্যবস্তু হোয়াইট হাউস রক্ষা পায়। হামলার পর ব্যাপক অনুসন্ধানে মার্কিন কর্তৃপক্ষ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে উনিশ ব্যক্তির একটি তালিকা তাদের ছবিসহ প্রকাশ করে। সন্দেহাধীন এদের কেউ আফগানিস্তানের নাগরিক অথবা অভিবাসী নন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার দাবি করে এগারোই সেপ্টেম্বরের দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সৌদি ধনকুবের ওসামা বিন লাদেন এবং তার দ্বারা পরিচালিত আল কায়দা নেটওয়ার্ক- যার জাল সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত। যুক্তরাষ্ট্রও তার পো-ধরে ব্রিটেন এ দাবি জোরেশোরে উত্থাপন করলেও তাদের দাবির সমর্থনে একটি প্রমাণও দেখাতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র ও তার ফেউ ব্রিটেন এ হামলাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে প্রচার করে হই চই শুরু করে দেয় যে, হামলা যারা করেছে এবং সন্ত্রাসীদের যারা আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে তাদের সকলকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে।

হামলার জন্যে কথিত দায়ী ওসামা ও তার নেটওয়ার্ক স্বভাবতই যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের রোষানলে পড়ে। তাদের আশ্রয়দাতা হিসেবে আক্রোশ গিয়ে পড়ে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের ওপরও। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের কাছে দাবি করে বসে ওসামা বিন লাদেন ও তার আল কায়দা নেটওয়ার্কের সকলকে অবিলম্বে তাদের হাতে তুলে দিতে। প্রেসিডেন্ট বুশ আরো একধাপ এগিয়ে বলেন যে, তিনি ওসামাকে জীবিত অথবা মৃত যে কোনো অবস্থাতে তার হাতে পেতে চান এবং এই মর্মে তিনি বিরাট অর্থমূল্যের পুরস্কার ঘোষণা করেন। তালেবান নেতা মোল্লা ওমর তার প্রতিক্রিয়ায় জানান যে, ওসামা বিন লাদেনের সেপ্টেম্বরের এগারোর ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ তার কাছে হাজির করলে তিনি ওসামা ও তার সঙ্গীদের যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেবেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রমাণ দেখাবার দিকে না গিয়ে তোতার মতো তাদের দাবির কেবল পুনরুল্লেখ করে যেতে থাকে এবং একই সঙ্গে আফগানিস্তানকে ধূলির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারস্য উপসাগর ও আরব সাগরে তার সকল ভাসমান বিমানগ্রহ ও ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধ বিমানবাহী সকল পোত নিয়ে সমাবেশ করতে থাকে। ব্রিটেনও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

www.pathagar.com

স্মরণকালের সর্বাধিক ধ্বংস ক্ষমতাসম্পন্ন নৌ-বহরে গিয়ে ওই অঞ্চলের জলসীমায় অবস্থান নেয়। তালেবানরাও তাদের প্রমাণ চাওয়ার দাবিতে অটল থাকে। কিন্তু প্রমাণ দেখাবার কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে বুশ ও ব্লেয়ার তাদের অযৌক্তিক ও অন্যায় দাবি মেটানোর সময়সীমা দেন বেঁধে। তালেবানরা তাদের সন্ত্রাসমূলক দাবির কাছে মাথা নত না করলে আফগানিস্তানের ওপর শুরু হয়ে যায় ইঙ্গ-মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হামলা (অক্টোবর ৭)। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের তুলনায় তালেবানদের নিরস্ত্র করলেও কম বলা হয়। তবু তারা যে তাদের বিপুলকায় শত্রুর হুমকির কাছে মাথা নত করে নি এ কেবল তাদের 'ঈমান'-এর জোরে। প্রায় দু'মাসের ক্ষেপণাস্ত্র এবং বিমান হামলার তুলনায় নিরস্ত্র তালেবানরা আজ চূড়ান্ত কোণঠাসা ও নিশ্চিহ্ন হবার পথে। তাদের ক্ষমতা হারানো এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

তালেবান রাজত্বের অবসানে আফগানিস্তানের জনগণ স্বভাবতই উল্লসিত। তাদের উল্লাস প্রকাশের কারণ তাদের মুক্ত জীবনের স্বাদ পাওয়া। কুরআন-হাদিসে নেই কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক এবং মূর্খ ধর্মান্ধ করে নির্মিত তালেবানরা আফগানিস্তানের মানুষকে আদি মধ্যযুগের পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিতে নানা ধরনের আইন-কানুন দেশে চালু করেছিলো। তালেবানদের নির্মাণ করে পেন্টাগন তাদের ক্রীতদাস পাকিস্তানের সামরিক আমলাদের সহায়তায়।

যুক্তরাষ্ট্র-সৃষ্ট দেশের যুদ্ধজনিত নিরাপত্তাহীনতা ও দুর্ভিক্ষাবস্থার জন্যে বিগত দু'আড়াই দশক ধরে নিরুপায় আফগানরা দলে দলে দেশত্যাগ করে পাকিস্তানে এসে শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকে। আফগানিস্তান যখন তাদের বিবিসি'র ভাষায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা নাজিবুল্লার নেতৃত্বে ধীরে ধীরে আদি মধ্যযুগের তিমিরান্ধতা থেকে আধুনিক যুগের আলোয় প্রবেশ করছিলো তখন যুক্তরাষ্ট্রে রক্তপিপাসু শাসকরা, পৃথিবীর অপরাপর কোণের প্রগতিপন্থিদের শাসন শেষ করে দিয়ে চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের সে সব জায়গায় বসিয়ে দেশ ও জনগণকে আদি মধ্যযুগে ঠেলে দেয়ার চক্রান্ত বাস্তবায়নের মতোই, আফগানিস্তানে মুজাহিদিন নামের একদল মাদক চোরাকারবারিকে শরণার্থী শিবিরগুলো থেকে অর্থের প্রলোভন দিয়ে ধরে এনে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয় পাকিস্তানের সামরিক প্রশিক্ষকরা এবং এদের ধর্মীয় গোঁড়ামিতে দীক্ষিত করে পেন্টাগন।

পেন্টাগনকৃত সিলেবাস অনুযায়ী তাদের ধর্মান্ধ করে গড়ে তোলা হয়। নজিবুল্লা সরকারকে উৎখাত করতে যুক্তরাষ্ট্র মুজাহিদিন বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দেয়। কিন্তু মুজাহিদিনরা তেমন সুবিধা করতে পারে না। এর মধ্যে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে যায়। নাজিবুল্লা সরকারকে মার্কিন অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে সামরিক ও রাজনৈতিক সহায়তা দিতো সোভিয়েত সরকার। এই সরকারের নেতৃত্বে ছিলো সংশোধনবাদী। সংশোধনবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমাজতন্ত্রমুক্ত করতে স্ট্যালিনের সময় থেকেই সক্রিয় ছিলো। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তাদের পথ অনেক সহজ হয়ে গেলেও শ্রমিকশ্রেণীর ভয়ে তারা মতাদর্শ বগলের সাহস করে না। তারা সময়-ক্ষেপণ করতে থাকে এবং লম্বা সময়ের পরিকল্পনা নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীচেতনা নষ্ট করে দিতে থাকে।

www.pathagar.com

প্রায় চার দশক প্রচেষ্টা চালিয়ে বিশ শতকের আশির দশকের শেষে এসে একটি ক্যু-এর মাধ্যমে তারা স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয় এবং মতাদর্শ ও পতাকা দুই বদলে ফেলে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায় এবং প্রজাতন্ত্রগুলোর সবচে' বড়োটি রাশিয়া নাম গ্রহণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নজিবুল্লা সরকার সামরিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা থেকে হয় বঞ্চিত। সেটা দেখে যুক্তরাষ্ট্র মুজাহিদিন বাহিনীকে আরো বড়ো অস্ত্র যুগিয়ে সাহায্য করতে থাকে। অসম যুদ্ধে নাজিবুল্লা সরকারের পতন ঘটে। তিনি ও তার ভাই জাতিসংঘ ভবনে গিয়ে আশ্রয় নেন।

নজিবুল্লার পর ক্ষমতা দখল করে প্রধানত উত্তরের সমরনায়করা। আফগানিস্তানের সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী পশতুনদের প্রতিনিধিত্ব নজিবুল্লা পরবর্তী সরকারের মধ্যে প্রায় ছিলোই না। যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের সমর প্রভুদের সহায়তায় এরা গদি পেলেও মুজাহিদিন সরকার অচিরেই রাশিয়া, ভারত ও ইরানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এতে স্বভাবতই যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান এই সরকারের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। তারা এই সরকারকে হটিয়ে তার জায়গায় তাদের অনুগত একটি সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। যুক্তরাষ্ট্র এ লক্ষ্যে আবার যোদ্ধা সংগ্রহে লেগে যায়। এবার তারা এককভাবে সংগ্রহ করে দক্ষিণের অর্থাৎ পাকিস্তান-লাগোয়া পশতুন গোত্রের তরুণদের। এদের জন্যে বিশেষ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ধর্মযোদ্ধারূপে তাদের তৈরী করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে এদের পৌঁছে দেয়া হয় ইসলামপূর্ব যুগে। ইসলামে, উদাহরণস্বরূপ, নারীর অবরোধ নেই। ইসলামে বিদ্যার্জন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে ফরজ বা অবশ্য প্রতিপালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য।

ইসলামে দাড়ি রাখার কথা কোথাও বলা নেই। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এবং তারপরও বহুকাল পৃথিবীর সকল প্রান্তের পুরুষরাই দাড়ি রাখতো, এখনও রাখে। অতএব মুসলমানরাও রাখতো। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশিক্ষকরা তালেবানদের উল্টো সব জিনিস শিখিয়ে তাদের পশ্চাৎমুখো রবোট হিসেবে নির্মাণ করে উত্তম অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আফগানিস্তানে পাঠায়। উন্নত অস্ত্রের জোরে তারা আফগানিস্তানের কাবুলসহ সকল নগরকে খোয়ায় পরিণত করে আফগানিস্তানের শাসক হয়ে বসে। বসার পর তাদের প্রথম আঘাত গিয়ে পড়ে নারী সমাজের ওপর। তাদের তারা সকল কর্মস্থল থেকে বিতাড়িত করে। তাদের লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়। বোরকা পরা বাধ্যতামূলক হয়। নিকটাত্মীয় ছাড়া বোরকা পরেও মহিলাদের একাকী পথে বের হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়।

পুরুষদের জন্যে দাড়ি রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়। টিভি স্টেশন বন্ধ করে দেয়া হয়। রেডিও চালু থাকে, কিন্তু তাতে কবিতা পাঠ, গান, নাটক ইত্যাদির প্রযোজনা বন্ধ করে দেয়া হয়। এসব বিধান কার্যকর করা হয় ব্যাপক হত্যা ও শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে। প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লা ও তার ভাইকে হত্যা করা হয়। আফগানিস্তান হয়ে যায় পৃথিবীরই একটি দোজখ। তালেবানরা এসব করায় উল্লাসিত হয় যুক্তরাষ্ট্র ও তার গোলাম পাকিস্তানের সামরিক আমলারা।

আফগানিস্তানকে আদি মধ্যযুগে নিয়ে যেতে যুক্তরাষ্ট্র আর্থিক সহায়তা নেয় ওসামা বিন লাদেনের। লাদেন পরিবারের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের পরিবারের ঐতিহাসিক ঘনিষ্ঠতা এখন সর্বজনবিদিত। ওসামাদের পিতার তেল ব্যবসা দেখাশোনার জন্যে জর্জ

www.pathagar.com

বুশ (নবীন)-এর পিতা সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ (প্রবীণ) এক লাখ ডলার বেতনে এক সময় কাজ করতেন। ওসামার সঙ্গেও ব্যবসায় করতেন নবীন বুশ। ওসামার আল কায়দা নেটওয়ার্ক গড়ে দেয় পেন্টাগন সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঠেকাতে ও মুসলিম বিশ্বে সকল প্রগতিশীল কাজকর্ম বন্ধ করে দিতে। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার সঙ্গে ওসামা বিন লাদেনের যে সংশ্লিষ্টতা আছে (ওসামা তার সংশ্লিষ্টতার কথা জোর দিয়ে অস্বীকার করেছেন) যুক্তরাষ্ট্র সরকার তার প্রমাণ প্রকাশ করতে পারছে না সম্ভবত এই কারণে যে, বুশ পরিবার ও মার্কিন গোয়েন্দা চক্রের বহু ব্যক্তি তাতে জড়িত বলে দেখা যাবে।

প্রমাণ আছে এ কথা কেবল মুখে বলে মার্কিন সমর প্রভুরা তাদের এককালের সুহৃদ ও নয়নের মণি এবং অবশ্যই সহযোদ্ধা ওসামা বিন লাদেনকে ধরতে ও তার আশ্রয়দাতা তালেবানদের আফগান জাতির সঙ্গে ধ্বংস করতে সর্বাধিক হিংস্রতার সঙ্গে আকাশ থেকে বোমার আকারে মৃত্যুবর্ষণ করে চলেছে। তাদের এই সার্বিক ধ্বংসের কাজে তারা জোগানদার হিসেবে পেয়েছে পাকিস্তানের মিলিটারিকে। তালেবান ধ্বংসের ব্যাপারে ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে না চাইতেই সব রকমের সহায়তা দেবে অঙ্গীকার ঘোষণা করায় পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা দেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। বন্ধু তালেবানদের ত্যাগ করে তালেবানের শত্রু যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পক্ষাবলম্বন পাকিস্তানের এক নেতা ঠিক সিদ্ধান্ত বললে বিবিসি'র সাক্ষাত গ্রহণকারী তাকে শুধরে দিলেন এই বলে সিদ্ধান্তটি পাক সরকারের জন্যে ঠিক সিদ্ধান্ত ছিলো না, ছিলো একমাত্র সিদ্ধান্ত! তিনি আমতা আমতা করে এই শুধরানো মেনে নিলেন। তিনি অবশ্য বললেন না এটা ছিলো একটি বিরাট বিশ্বাসঘাতকতাও।

জর্জ বুশ (নবীন)-এর সমান অনুপযুক্ত কোনো লোক আজ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন নি। বুশ দুটো কথা গুছিয়ে বলতে পারেন না, রাষ্ট্রনায়কোচিতভাবে তো বহু দূরের কথা। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর অন্য কোনো দেশ হলে বুশকে পদত্যাগ করতে হতো। নিজের ও মার্কিন মিলিটারির ব্যর্থতা ঢাকতেই বুশকে আফগানিস্তান ধ্বংস করতে আদেশ দিতে হয়েছে। স্থলযুদ্ধে সৈন্য ক্ষয়ের ভয়েই বুশকে কেবল আকাশ থেকে বিনা বাধায় একতরফা বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে বাধ্য হতে হয়েছে। আফগানদের বিরুদ্ধে নয় কেবল ওসামা ও তালেবানদের ধ্বংস করতেই এ আক্রমণ এ কথা বুশ ও ব্লেয়ার বললেও আফগানিস্তানের সব মানুষ মারা গেলে অথবা পঙ্গু হলে বুশ ও ব্লেয়ারের তাতে কী এসে যায়? সেটা না বুঝেই উত্তরের জোট গদিতে বসতে ইঙ্গ-মার্কিন হামলাকে স্বাগত জানিয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিনের সহায়তায় তারা এখন গদিতে আরূঢ় হবার দ্বারপ্রান্তে। এ কথা তাদের আজ মনে নেই যে. তাদের মার্কিনিরা একবার গদিতে বসিয়ে তালেবান সৃষ্টি করে আরেকবার তাদের দিয়ে গদিচ্যুত করেছিলো! উপকারীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে ইঙ্গ-মার্কিনের এক মুহূর্ত দেরি লাগে না। প্রয়োজন হলে উত্তরের জোটকে তারা ফের গদিহারা করবে। দরিদ্রদের এই যে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে জানমাল হারানো-এ অতি পুরনো ঘটনা। মীরজাফরকে আজ সকলে বিশ্বাসঘাতক বলে। বিশ্বাসঘাতকতা আর মীরজাফরী আজ বাংলা ভাষার সমার্থক শব্দ। মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে করানো হয়েছিলো, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করে নি। শূন্য প্রাসাদের সিংহাসনে বসতেও সে ইতস্তত করেছিলো। শেষে ক্লাইভ

www.pathagar.com

তাকে হাত দিয়ে ধরে নিয়ে বসিয়ে দেয়। ক্লাইভের এতো বড়ো উপকারীর সঙ্গেও ক্লাইভ বিশ্বাসঘাতকতা করে; তার বর্ধমান খাই মেটাতে অতি সঙ্গত কারণে মীরজাফর ব্যর্থ হলে তাকে অপদার্থ আখ্যা দিয়ে ক্লাইভ তাকে নবাবীচ্যুত করে।

নবাব সিরাজের প্রাসাদের মণি-মুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদের ভাগাভাগিতেও ক্লাইভ বিশ্বাসঘাতকতা করে। মীরজাফরকে সামান্য দেয়, কিন্তু উমি চাঁদকে, আমির চাঁদকে জাল দলিলের সাহায্যে বঞ্চিত করলে বেচারা পাগল হয়ে যায়; ক্লাইভ সাত বজরা বোঝাই দিয়ে সকল মালমাত্তা নিয়ে কলকাতায় পাড়ি দেয় এবং সেখান থেকে যথাসময়ে বিলেতে। প্রকৃত বিশ্বাসঘাতক ক্লাইভ হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতক হয়ে রয়েছে মীরজাফর!

আজকেও একই ঘটনা ঘটে চলেছে। বিশ্বাসঘাতকতা করছে ইঙ্গ-মার্কিন জোট ও তাদের সংঘ জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংক, অথচ বিশ্বাসঘাতকের শিরোপা পাচ্ছে দরিদ্র বিশ্বের অমেরুদণ্ডী শাসকরা। ইয়াসির আরাফাত, মুজাহিদিন, তালেবান, পাকিস্তান মিলিটারি সকলের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে ইঙ্গ-মার্কিন জোট। এরা প্রত্যেকে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে হচ্ছে ব্যবহৃত। তারা সেটা শেষে বুঝলে তাদের করার কিছু থাকছে না। তাদের কিছু করতে না পারার কারণ হলো তারা তাদের জনসমষ্টিসহ আজও রয়ে গেছে মধ্যযুগের পৃথিবীতে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে না পারা পর্যন্ত তাদের কপালে এই-ই থাকবে। ❑

৫ ডিসেম্বর '০১

লেখক ঃ রাজনীতিবিদ, কলামিষ্ট।

www.pathagar.com

অদৃশ্য শক্তি বনাম বুশ অতঃপর 'আমেরিকার' তোপের মুখে 'মার্কিন'

বেনজীন খান

এত রক্তের বিনিময়ে একবিংশ শতাব্দীকে বরণ করতে হবে আমাদের জানা ছিল না। এ সময়ের আলো-বাতাস দেখতে এককালীন ভাড়া বাবদ দিতে হবে এত মানুষের জীবন তাও জানা ছিল না। আরো কত আহাজারি দিয়ে কিনতে হবে আগামী কিছুদিন সময় সেটিও জানি না। ভাল হত সভ্যতা যদি দয়া করে আগাম জানিয়ে দিত সে মূল্য! কারণ আমরা অন্তত শান্তিতে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম। আপনজনের বিচ্ছেদ দেখার চেয়ে সচেতনভাবে অন্তত সহমরণের পথ বেছে নিতে পারতাম। দেখলাম তো কতই। জল-স্থল-আকাশ জয় দেখলাম। দেখলাম, নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডলের উপরে অপ্রয়োজনীয় কতসব লাঠি-পেটা; দাপা-দাপি। সভ্যতার নামে শত্রু করেছি সবাইকে। সূর্য আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে তাপ দিচ্ছে বেশি, ওজন স্তর তার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে; একেবারে অরক্ষিত এখন আমাদের আবহাওয়া মণ্ডল। অবাধে এখানে এখন প্রবেশ করছে অতি বেগুনি রশ্মিসহ সবাই। আমাদের ছেড়ে চলে গেছে নদীর স্রোত, আর সেই সাথে সবুজ প্রকৃতি। সমুদ্র হয়েছে ক্ষিপ্ত। সে তার পৃষ্ঠদেশ তুলে এনে ডুবিয়ে মারতে চায় আমাদের। আমরাই আমাদের শত্রুকে আমন্ত্রণ করে চলেছি। এতেও যেন অতৃপ্ত আমাদের আত্মা। এখন আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছি আমাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমরা জানি না। আসলে যুদ্ধ শুরু করেছি আপনার বিরুদ্ধে। সুতরাং আর নয়। প্রমাণ হয়ে গেছে সভ্যতার নামে আমরা অসভ্য হয়েছি। প্রগতির নামে পশ্চাদপদ হয়েছি। জীবনের পরিবর্তে মৃত্যুকে ক্রয় করে চলেছি প্রতি মুহূর্তে। হয়তোবা আমরা মরে গেছি আরো কিছুদিন আগে। জঙ্গলের পশুরা মানুষ হয়ে গেছে। আর বিবর্তনের ধারায় আমরা তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছি। এ অবস্থায় ডিমোক্রিটাস অথবা রাম'র মত আত্মহননের পথই বোধ হয় অধিকতর সম্মানের, মর্যাদার।

আমার বিবেচনায় একবিংশ শতাব্দীর শুরু ২০০০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের রাতের ১২টা এক মিনিট থেকে। আর সেই কারণেই চলতি বছর একবিংশ শতাব্দীর প্রথম বছর। এ

www.pathagar.com

বছর এখনও শেষ হয়নি। এরই মধ্যে গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ মঙ্গলবার সকাল ৮টা ৪৮ মিনিটে ৪টি আত্মঘাতী বিমানের হামলা ও বিস্ফোরণে একক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দম্ভ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ক্যাপিটাল হিল (কংগ্রেস ভবন) এক ভয়াবহ আক্রমণের শিকার হয়। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্ডারের দু'টি ১১০ তলা ভবনই আত্মঘাতী বিমান হামলা ও বোমা বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গেছে। ধসে পড়েছে পার্শ্ববর্তী ৪৭ তলা সুলেমান ব্রাদার্স টাওয়ার। ধসে গেছে পেন্টাগনের ৫টি ফ্লোর। সেই সাথে মারা গেছে মানুষ। ধারণা করা হচ্ছে, শুধুমাত্র ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার তথা টুইন টাওয়ারেই নিহত হয়েছে পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা অন্তত ২০ হাজারে গেছে বলে ধারণা করা যাচ্ছে।

আমেরিকার ইতিহাসে এখন পর্যন্ত এটিই সর্ববৃহৎ আক্রমণ তথা হত্যাযজ্ঞ। এর আগে ১৯৪১ সালে একবার মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ পার্ল হারবারে ঘটেছিল বিমান হামলা। জাপানি বিমান উড়ে এসে ঢুকে গিয়েছিলো পার্ল হারবারের চিমনির ভিতর। মারা গিয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। দু'টি হামলারই প্রকৃতি একই ধরনের। আত্মঘাতী বিমান হামলা। কিন্তু পার্থক্য রয়েছে এক জায়গায়, তা হলো ১৯৪১ সালের বিপর্যয়ের হোতা ছিল চিহ্নিত। কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ হামলার হোতা রয়েছে অদৃশ্য। এই অদৃশ্য শক্তি কে ? নিশ্চয় বাইবেলে হাত রেখে শপথ পাঠকারী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লু বুশের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। এই অদৃশ্য শক্তি 'গড' বা ঈশ্বর। তাহলে এই আক্রমণ ছিল ঈশ্বরের গজব। কথিত বিজ্ঞান মনস্ক মার্কিন জাতির প্রেসিডেন্ট তা যদি বুঝতে না চান, তাহলে দ্বিতীয় অদৃশ্য শক্তিকে খুঁজতে হবে। আর তা হলো ধারাবাহিক দুঃখ থেকে উৎসারিত পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। এই ক্ষোভ নামক শক্তিকে দেখা যায় না। দেখা যায় তার প্রকাশকে। অবশ্য অন্তর্চক্ষু দিয়ে দেখতে চাইলে দেখা যায় সেই স্বয়ং শক্তিকে। যেমন দেখে থাকে ধার্মিক কথিত ঈশ্বরকে। যাই হোক, এ ঘটনায় যেমন স্তম্ভিত আমেরিকাবাসী তেমনি গোটা দুনিয়া। কেউই সঠিক জানে না কে বা কারা এই আক্রমণ চালিয়েছে। যেমন জানে না দুনিয়ার মানুষ; তেমন মার্কিন নাগরিক; এমন কি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই। ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এফবিআই জানায়, বিমান ছিনতাইকারীদের পরিচয়ের ব্যাপারে তাদের মনে দ্বিধা আছে' আর ওই একই দিনে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বলছেন, আমরা নিশ্চিতভাবে জানি কারা এরা এবং কোন কোন রাষ্ট্র এদের মদদ দিচ্ছে। অর্থাৎ দুনিয়া জানলো না, আমেরিকান জনগণ জানলো না, এমন কি এফবিআই জানলো না অথচ একজন মাত্র মানুষ জেনে ফেলেন সবকিছু। তিনি জর্জ ডব্লু বুশ। সুতরাং ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ যেমন রহস্যময় তেমনি রহস্যময় জর্জ বুশের এই সব জানাটা। রহস্যময় তার সূত্রটা। মানুষ কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি এককভাবে শত্রু চিহ্নিত করে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ওসামা বিন লাদেন এবং তার দল আল-কায়েদা এই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনি আফগানিস্তানে তালেবান সরকারকে নির্দেশ দিলেন, লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে হবে। নচেত যুদ্ধ। অবশেষে ৭ অক্টোবর' ০১ রোববার থেকে এক দরিদ্র অসহায় জনপদ আফগানিস্তানের উপরে শুরু হলো ইঙ্গ-মার্কিন হামলা। অর্থাৎ সহস্যময়তায় ডুবে গেল গোটা বিশ্ব পরিস্থিতি। বিশ্ব অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই।

www.pathagar.com

কতিপয় প্রশ্ন

- খুবই সংগত কারণে প্রশ্ন উঠেছে-
- আমেরিকা আক্রমণের হোতা কে ? এবং কেন আক্রমণ করল ?
- আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র এবং পেন্টাগন হল কেন ?
- ইতোমধ্যে তাদের কোন লাভ হয়েছে কি ?
- এই আক্রমণ কি আমেরিকার অভ্যন্তরের কোন বিদ্রোহী গ্রুপ সংগঠিত করেছে ?
- নাকি বুশ প্রশাসন নিজেই এই ঘটনার জনক ?
- এ ঘটনা কি আমেরিকার বাইরের কোন শক্তি ঘটিয়েছে ? ঘটালে তার কারা ?
- তারা কি ইহুদি না মুসলমান ?
- এ ঘটনা কি সাম্রাজ্যবাদীদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বহিপ্রকাশ ?

অপরদিকে

- আমেরিকা তড়িঘড়ি করে ওসামা বিন লাদেন এবং তার সংগঠন আল কায়েদাকে দোষারোপ করল কেন ?
- আমেরিকা লাদেনকে গ্রেফতার বা হত্যার অযুহাতে আফগানিস্তান আক্রমণ করল কেন ?
- আমেরিকার লক্ষ্যবস্তু কি ওসামা বিন লাদেন না তালেবান ?
- লক্ষ্যবস্তু আফগানিস্তান না মধ্যপ্রাচ্য ?
- আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু কি চীন-পাকিস্তান-ভারত ?
- এ যুদ্ধ কি সাম্রাজ্যবাদের মঞ্চ থেকে মার্কিনিদের বিদায়ের যন্ত্রণা ?
- আমেরিকা এবং আফগানিস্তান আক্রমণে প্রাথমিকভাবে লাভবান হয়েছে কে ?
- এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নিকট এবং দূর ভবিষ্যতে লাভবান হবে কে ?
- এ যুদ্ধের শেষ পরিণতি কি ?

আমাদের উত্তর খুঁজতে হবে এবংবিধ নানা প্রশ্নের। আমাদের দেখতে হবে ঘটনার পরম্পরা যেমন, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তেমনি রাজনৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে। কারণ এইতো সেদিন; একজন ডাক্তার চিকিৎসা করত একজন পুরো মানুষকে। মানব দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে। কিন্তু না; আর তা হয় না। একজন ডাক্তার একজন মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমস্ত অসুখের চিকিৎসা করতে পারে না। এখন দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই পৃথক-পৃথক একেকজন মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে; বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর বিভাজিত হয়েছে চিকিৎসাবিদ্যাও। একজন ডাক্তার এখন দেহের একেকটি অঙ্গের বিশেষজ্ঞে পরিণত হয়েছে। এখন যে ডাক্তার দেহের হার্টের চিকিৎসা করে সে দাঁতের চিকিৎসা জানে না। যে চোখের ডাক্তার সে ত্বকের চিকিৎসা জানে না। যে ইউরিন টেস্ট করতে জানে সে ব্লাড টেস্ট করতে পারে না। এটা খুবই সংগত। আর

www.pathagar.com

এ কারণেই মানব দেহের অদৃশ্য রোগের চিকিৎসা করতে হলে পৃথক পৃথকভাবে দেহের নানা অঙ্গের টেস্ট করতে হয়; তবেই ধরা পড়ে প্রকৃত অসুখটা কি। এবং তখনই কেবল ঐ মানুষটার প্রকৃত চিকিৎসা করা সম্ভব হয়।

জগতের আজ প্রতিটি বিষয়েরই এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটেছে। সুতরাং কোন একটি ঘটনা বা বিষয়কে আজ মোটা দাগে বিচারের কোন অবকাশ নেই। কারণ তাতে করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন হবে না। আজকে ঘটনা প্রবাহকে যেমন পৃথক পৃথকভাবে তেমনি সামগ্রিকভাবে বিচার করতে হবে। যাকে বলে 'চুলচেরা' বিচার। অর্থাৎ ঘটনাকে পোস্টমর্টেম করতে হবে। এবং তার ভিসেরা রিপোর্টের মধ্যদিয়ে ঘটনার কারণ জানতে হবে। অবশ্য যদি আমরা সত্যিকার অর্থে সত্য জানতে চাই। এখন আমরা বিচার করব সর্বকালের সর্বোচ্চ ভয়াবহ কথিত 'সন্ত্রাসী' ঘটনাকে। ১১ সেপ্টেম্বর 'আমেরিকা' আক্রমণকে। হতে পারে এই ১১ সেপ্টেম্বরই একবিংশ শতাব্দীর 'দুঃখ'। আবার হতে পারে এই ১১ সেপ্টেম্বরকে দেখার কোন জায়গা নেই। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োগ করতে হবে অবশ্যই আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি। ১১ সেপ্টেম্বরকে দাঁড় করাতে হবে ভীষণ রোগাক্রান্ত, একজন মানুষের কাতারে। এখন আমাদের সন্ধান করতে হবে রোগটি কি ? এর উৎস কোথায় ? আর এখনই টেস্ট করতে হবে এর রক্ত, মূত্র, পায়খানা, আর করতে হবে এক্স-রে, ইসিজি, এন্ডোসকপি, আল্ট্রাসনোগ্রাম, লিপ্রোস কপি, মাইলোগ্রাম, এনজিও গ্রাম সর্বোপরি সাইকোলজি টেস্ট প্রভৃতি। হয়তো বা তবেই মাত্র আবিষ্কার করা যাবে ১১ সেপ্টেম্বর নামক ম্যাসাকারের কার্যকারণ সম্পর্ক এবং তার পরম্পরা গত পরিণতি।

আমরা প্রথমে সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতিকে প্রধান দু'টি পর্বে ভাগ করব। প্রথম পর্ব আমেরিকা আক্রমণ, দ্বিতীয় পর্ব আফগানিস্তান আক্রমণ।

প্রথম পর্ব ঃ আমেরিকা আক্রমণ

১১ সেপ্টেম্বর কারা আমেরিকা আক্রমণ করেছিল ? কেউ কেউ বলছে আমেরিকার ভিতরেরই কোন শক্তি এই আক্রমণ চালিয়েছে। ঘটনা বুঝতে হলে প্রথমে আক্রান্ত স্থানে যেতে হবে। আলামত জব্দ করতে হবে। ঘটনার প্রকৃতি বুঝতে হবে।

আক্রান্ত স্থান ওয়ার্ল্ড সেন্টার

বস্তুত টুইন টাওয়ার তথা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ছিল একটি অতি আধুনিক ও সমৃদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ শহর। ১১০ তলা বিশিষ্ট দু'টি টাওয়ারসহ সাতটি ভবন নিয়ে ১৬ একর জমির ওপর তৈরি এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নামে কমপ্লেক্সটি। এই টাওয়ারের ডিজাইন করেছিলেন আর্কিটেক্ট মিনরু ইয়ামাসাকি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সটি। নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৬৬ সালে এবং শেষ হয় ১৯৭৩ সালে। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৯৭৫ সালে। এই কমপ্লেক্সটির মালিক নিউ ইয়র্ক পোর্ট অথরিটি। টাওয়ার দু'টির একটির উচ্চতা ছিল ১ হাজার ৩শ ৬৭ ফুট, অপরটির উচ্চতা ছিল ১ হাজার ৩শ ৬২ ফুট। ভবন দু'টির ভিত্ মাটির ৭০ ফুট নিচ থেকে তৈরি। প্রতিটি টাওয়ারে ২৫০ টা লিফট ছিল অর্থাৎ দুই টাওয়ারে ছিল ৫০০ লিফট। বাকি পাঁচটা টাওয়ারে ছিল আরো কয়েকশ' লিফট। মরগান স্ট্যানলি, আমেরিকান এক্সপ্রেসসহ বড় বড় ব্যাংক ও ইনস্যুরেন্স কোম্পানি এই ভবনগুলোতে তাদের অফিস স্থাপন করেছিল।

www.pathagar.com

টাওয়ার দু'টিতে ২৬টি দেশের ৪৩০টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অফিস ছিল। শুধু টুইন টাওয়ারেই দৈনিক প্রায় ৫০,০০০ লোক কাজ করতেন। এরা শুধু আমেরিকানই নয়, দুনিয়ার প্রায় তাবৎ দেশের নাগরিকই সেখানে ছিলেন। ফলে এই হত্যাকান্ডের দায় যার বা যাদের ঘাড়ে বর্তাবে বা বর্তানো যাবে বিশ্ব জনমত তাদের বিরুদ্ধে নেয়া সহজ হবে। প্রশ্ন হলো, এই সুযোগ কার হাতে। নিশ্চয় আমেরিকার হাতে। আমেরিকা যাদের দোষারোপ করবে দোষী তারাই হবে। ফলে বিষয়টি প্রশ্নের দাবি রাখে।

এখন জানা প্রয়োজন টুইন টাওয়ারের স্থাপত্য বিষয়ে। যে ভবনগুলো নিয়ে এই শহর তৈরি হয়েছিল তার আর্কিটেকচার ছিল কৌতূহল ও রিসার্চের বিষয়। এর থামগুলো ছিল স্টিলের, দেয়াল ছিল কাচ ও স্টিলের এবং মেঝে ছিল কংক্রিট ও স্টিলের। চকচকে ইস্পাত প্রধান এই টুইন টাওয়ার সম্পর্কে আর্কিটেক্ট ইয়ামাসাকি গর্ব করে বলেছিলেন, বড় একটা জাম্বো জেট একে আঘাত করলেও পড়ে যাবে না। প্রচণ্ড ভূমিকম্প এবং সাইক্লোনেও দাঁড়িয়ে থাকবে এই ভবন। কিন্তু না। সেই ভবনও শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে নি। মিশে গিয়েছে একেবারে মাটির সঙ্গে। কারণ সেই ইস্পাত। যে দু'টি প্লেন এই ভবনটিকে আঘাত করে সে দু'টি ছিল দূরপাল্লার বিমান। সংগত কারণেই তাতে ভরা ছিল হাজার হাজার গ্যালন তেল। এই তেল ছড়িয়ে পড়ে ওপর থেকে নিচে সারা ভবনে। আর এই তেলে আগুন ধরে গেলে ১০০০ ডিগ্রি ২০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপের সৃষ্টি হয়। এই প্রচণ্ড তাপে ইস্পাত যায় গলে। তখন কংক্রিটের মেঝে তার নিজের ভারে নিচে পড়ে যায়। মেঝের এই ভারের সাথে যুক্ত হয় হাজার হাজার ফার্নিচার ও অফিস যন্ত্রের ভার। পড়ন্ত প্রতিটি তলার ভার যুক্ত হয় নিচের তলার সঙ্গে। পরে ধাপে ধাপে দ্রুত ধসে পড়ে টুইন টাওয়ার। এই প্রভাবে টাওয়ার সেভেনও ধসে পড়ে। এখন প্রশ্ন হলো, এই কমপ্লেক্সের এত বৈজ্ঞানিক কারিকুলাম এবং তা ধ্বংসের জন্য গভীর পরিকল্পনা শক্তি ও দক্ষতা দুনিয়ায় কার আছে ? আর সে কারণেই অনেকে মনে করছেন 'এই ধ্বংসযজ্ঞের সাথে অবশ্যই আমেরিকার হাত আছে। আমেরিকান এলিমেন্ট আছে। আমেরিকা ট্রেনিং ও আমেরিকান এফিসেয়েন্সি আছে। এখন প্রশ্ন হল এই এলিমেন্ট কে ?

অনেকেই মনে করছে এই এলিমেন্ট বা এফিসিয়েন্সি হচ্ছে আমেরিকার অভ্যন্তরে সীমাহীন অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার লাঞ্ছিত বঞ্চিত শ্রেণী। এ আক্রমণ তাদের অসম্ভব রকমের ক্ষোভ তথা ঘৃণা তথা প্রতিশোধের প্রকাশ। হয়তো বা এই ঘটনার সাথে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থার নানা অংশ জড়িত। নচেৎ যারা মহাশূন্যের গ্যালাক্সি সমূহের ভিতরে কোন গ্রহের বুকে কী আছে তার খবর রাখে। যারা প্রশান্ত মহাসাগরের মাটির নিচে কী কী মহামূল্যবান সম্পদ আছে তার খবর রাখে। দুনিয়ার কোথায় তাদের বিরুদ্ধে কোন ওষুধ কারখানায় পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি হচ্ছে জানে। যারা আমাদের ঢাকা শহরের বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে ব্যস্ত সময়ে একজন রিকশা চালক চলন্ত অবস্থায় কী বিড়ি টানছে এমন কি আর এল টু নং কত তার ছবি তুলতে পারে দক্ষতার সাথে। সেই আমেরিকা তাদের নাভিমূলে বুড়ো আঙ্গুল টিপে দিতে আসছে যে দানব তার খবর রাখে না এ হতে পারে না।

টুইন টাওয়ার এবং পেন্টাগন কেন আক্রমণ হল ?

প্রশ্ন উঠেছে, যারাই আক্রমণ করুক তারা এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে হামলা

www.pathagar.com

করল কেন ? উত্তর সহজ কারণ এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগন হল আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভুত্বের প্রতীক। সুতরাং মার্কিন প্রশাসন তাদের নিজেদের সম্পর্কে যে মহান স্বরূপ প্রচার করুন না কেন আক্রমণকারীদের ঘৃণা নিহিত রয়েছে সে প্রচারের ঠিক সমান বিপরীতে অর্থাৎ তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক সন্ত্রাসবাদ, অভ্যুত্থান, সামরিক একনায়কতন্ত্র, ধর্মীয় গোঁড়ামি সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অকল্পনীয় গণহত্যা ইত্যাদির প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে।

আমেরিকা আক্রমণে বুশ জড়িত!

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, হয়তো বা বুশ প্রশাসন নিজেই এ ঘটনার সাথে জড়িত। কারণ এত বড় একটি বিপর্যয় ঠেকাতে এফবিআইসহ গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন প্রশাসন কোন প্রধান সারির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি কেন ? অথচ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা, ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির পেছনে প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে বছরে ৩০০০ কোটি ডলার খরচ করতে হয়। এছাড়াও দেখা গেছে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে মার্কিন কর্তৃপক্ষের একটি অংশ সন্দেহভাজন ৬ জন ইসরাইলিকে গ্রেফতার করলেও কার নির্দেশে (!) কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই পরক্ষণে তাদের ছেড়ে দেয়া হয় (!!) অপর দিকে বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' এজেন্টরাই আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি প্রবাবশালী। এত বেশি প্রভাব সেখানে অন্য কোন দেশের কোন সংস্থার নেই। তা ছাড়াও টুইন টাওয়ারে চাকরি করে প্রায় সাড়ে চার হাজার ইসরাইলি ইহুদি ঐদিন চাকরিতে যোগ দেয়নি। এরপরও সেদিকে সন্দেহের দৃষ্টি না রেখে কোন প্রকার অকাট্য প্রমাণ ছাড়াই মুসলমানদের দায়ী করতে কেন বুশ প্রশাসন এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল ?

অপরদিকে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যেটি তা হলো, বিল ক্লিনটনের পর জর্জ ডবিউ্র বুশ ব্যক্তিগতভাবে একজন প্যালেস্টাইন বিরোধী রূপে প্রতিভাত হয়েছেন। অন্যদিকে ইসরাইলেও তুলনামূলকভাবে উদার প্রধানমন্ত্রী ইহুদ বারাক-এর পর একজন জঙ্গি প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন ক্ষমতায় এসেছেন। বুশ ও শ্যারন জুটি প্যালেস্টাইন সমস্যাকে দ্রুত বিস্ফোরণেমুখ করে তোলে। তারই একটা পরিণতি হয়তো ১১ সেপ্টেম্বরের প্লেন হাইজ্যাকিং ও আত্মঘাতী হামলা। আর তাই যদি হয় সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠবে- তাহলে কি বুশ নিজেই এই হামলার সাথে জড়িত ?

প্রশ্ন এ কারণেই উঠেছে আর তা হলো অভ্যন্তরের কোন বড় সংকট ঢাকতে গিয়ে তাদের নিজেদের থেকে কিছু সংকট সৃষ্টি করার। প্রশ্ন এই কারণেই যে দুনিয়ার মানুষ, আমেরিকাবাসী এমন কি তাদের নিজেদের গোয়েন্দা সংস্থা পর্যন্ত এই ধ্বংসযজ্ঞের কর্তা নিয়ে যখন সংশয়ে রয়েছে তখন প্রেসিডেন্ট বুশ তার ভাষণে কিভাবে বললেন, 'আমরা জানি কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে এবং এখানেই তিনি ক্ষ্যান্ত হননি। তিনি আরো এগিয়ে গিয়ে শত্রু চিহ্নিত করেছেন 'ওসামা বিন লাদেনকে' অর্থাৎ আফগানিস্তানকে' তথা 'মুসলমানদেরকে'। প্রশ্ন একারণেই যে, বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ আমেরিকার ইতিহাসে সবথেকে বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট। তার বিরুদ্ধে রয়েছে ভোট কারচুপির অভিযোগ। মাত্র কয়েক ভোটে তাও কারচুপি করে তিনি ক্ষমতায় এসেছেন। অর্থাৎ

www.pathagar.com

বিধ্বস্ত এক ভাবমূর্তি নিয়ে তিনি ক্ষমতায় এসেছেন। আর ক্ষমতায় এসেই তাকে আকাশ সীমা লঙ্ঘনের দায়ে চীনের কাছে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। ৫৪ বছর পর জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সদস্যপদ হারাতে হয়েছে। (ভয়েস অফ আমেরিকা ৫ মে ০১). বিশ্ব পরিবেশবাদীরা আমেরিকার বিপক্ষে জোট গঠন করতে যাচ্ছিল। আর সে দেশের অভ্যন্তরে সীমাহীন অর্থনৈতিক সংকট তো দিনে দিনে সর্বগ্রাসী দানব হতে চলেছে। এমতাবস্থায় পূর্ব পুরুষদের পথ অনুসরণ করা ছাড়া হয়তো বা বুশের আর কোন উপায় ছিল না। তার এখন প্রয়োজন বীরের ভাবমূর্তি। প্রয়োজন যুদ্ধ। যুদ্ধ নিয়ে ব্যবসা। অস্ত্রের ব্যবসা। এমনিতেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনের হাতিয়ার তাদের বেশ আগেই হাতছাড়া হয়ে গেছে, এখন আছে উৎপাদনে বলতে কেবল অস্ত্র। সুতরাং এ পণ্য বিক্রির জন্য চাই বাজার। আর তার জন্য চাই যুদ্ধ। আমেরিকার অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক সংকট থেকে উদগীরণ হওয়া রাজনৈতিক প্রকাশগুলো পর্যবেক্ষণ করলে আমেরিকা আক্রমণে প্রথমেই তাই সন্দেহ হয় খোদ মার্কিন প্রশাসনকে, তারপর তাদের অভ্যন্তরের শ্রেণী বিরোধকে যেমন :

"আই অ্যাম দ্য মাস্টার অফ মাই ফেইট'

আই অ্যাম দ্য ক্যাপটেন অফ মাই সৌল"

আমিই আমার ভাগ্য বিধাতা, আমিই আমার আত্মার চালক,

১৯ শতকের ব্রিটিশ কবি উইলিয়াম আর্নেস্ট হেনলি'র একটি কবিতার এই দু'টি লাইনই ছিল ১৯৯৫ সালে আমেরিকার ওকলাহামা শহরে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ১৬৮ জনকে হত্যার দায়ে ১১ জুন' ০১ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ৩৩ বছর বয়স্ক যুবক টিমোথি ম্যাকভেই নামক একজন দক্ষিণপন্থী গোড়া খ্রিস্টান আমেরিকানের। অথচ ১৯৯৫ সালে ঘটনা ঘটার পর আমেরিকান প্রশাসন বিশ্ববাসীকে জানিয়েছিল এ ঘটনার পিছনে ইরানের হাত রয়েছে। তারাই ওকলাহামা শহরের বস্তিগুলোতে সন্ত্রাসীদের নানাভাবে মদদ দিয়ে চলেছে।' কিন্তু সব ভেদ ভেঙ্গে দিয়ে গেছে টিমোথি ম্যাকভেই নিজেই। বিচারে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা হলে টিমোথির বিজ্ঞ উকিল রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট টিমোথির জীবন ভিক্ষা চেয়ে আবেদন জানালে টিমোথি তার উকিলকে নিষেধ করেন। তিনি জানান, 'অত্যন্ত সুস্থ ও সজ্ঞানে ওই দিন তিনি গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন।' বাস্তবে ১৬৮ জন সাধারণ মানুষ মারা গেলেও এই নাশকতামূলক হত্যাকাণ্ডের পিছনে তার যে অনুপ্রেরণা কাজ করেছিল তা হলো আমেরিকার মিথ্যা অহমবোধ তথা অসভ্য ভব্যতার বিরুদ্ধে এক পবিত্র ক্ষোভ। আর এ ভাষণের মধ্য দিয়েই ঘটনার পিছনে ইরানের হাত রয়েছে সম্পর্কিত আমেরিকার অভিযোগ যে কত অসার, মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যমূলক তা প্রমাণ হয়ে যায়।

কয়েক বছর আগে আমেরিকার লসএঞ্জেলস শহরে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্তৃক একজন কৃষ্ণকায় ট্যাক্সী ড্রাইভার রডনি কিং মার খেলে তার প্রতিক্রিয়ায় আগুন জ্বলেছিল সমগ্র লসএঞ্জেলস জুড়ে। আমেরিকা তখন বিশ্বকে জানিয়েছিল এটা স্রেফই বর্ণবাদী দ্বন্দ্ব যা আমেরিকায় প্রায়ই ঘটে থাকে। কিন্তু সেই ব্যাপক ডামাডোলের মধ্যেও আকাশ মিডিয়ায় দেখা গেছে শহরের দোকানে একজন শ্বেতাঙ্গের ঘাড়ে চড়ে একজন কৃষ্ণাঙ্গ উঁচু স্থান থেকে মালামাল লুট করছে। এবং দু'জনে সমানভাবে ভাগাভাগি করে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে

www.pathagar.com

যাচ্ছে। তার এই চিত্র অন্তত ওই সত্যই প্রমাণ করে আর তাহলো আমেরিকা সরকারের বক্তব্য শুধুই মিথ্যা। অর্থাৎ বিষয়টি শুধুই বর্ণবাদী দ্বন্দ্ব ছিল না। বরং তা ছিল আমেরিকার সমাজের অভ্যন্তরের চেপে রাখা চরম অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিস্ফোরণ। ড্রাইভার ও তার শ্রেণীর সাথে উঁচুতলার পুঁজিওয়ালাদের দ্বন্দ্ব।

কয়েক বছর আগে আমেরিকার অন্তত ৬৯ জন পাহাড়ের ওপর থেকে লাফ দিয়েছিল স্বর্গে যাওয়ার জন্য। তবে এরা স্বর্গে গিয়েছে কিনা দুনিয়া জানে না-মারা গিয়েছে এতটুকু ছাড়া। সে সময় আমেরিকা কর্তৃপক্ষ বলেছিল 'এটি একটি উপজাতীয় বিশ্বাসের পরিণতি।' কিন্তু আসলে ব্যাপারটি কেবল কোন উপজাতির ধর্মবিশ্বাসের বিষয় ছিল না। ছিল জীবনের প্রতি চরম হতাশার বহিঃপ্রকাশ। হয়তো বা এভাবেই একদিন প্রমাণ হবে বিন লাদেন এবং আফগানিস্তান তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমেরিকার আজকের অভিযোগও কতটা মিথ্যা।

ইতিহাসে এ নজিরও আছে তা হলো, জর্জ বুশ (সিনিয়র) যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন একবার তিনি বাণিজ্য সংক্রান্ত সফরে গিয়েছিলেন জাপানে। এক হোটেলে তিনি হঠাৎ করেই মূর্ছা গিয়েছিলেন। জাপান সরকার যারপরনাই চেষ্টা করে সুস্থ করে তোলেন। জানানো হয়েছিল শারীরিক অসুস্থতার কারণে জর্জ বুশ জ্ঞান হারিয়েছিলেন।' কিন্তু পরক্ষণেই জানা যায় বিস্তারিত, আর তা হলো জাপান সরকার ব্যবসায়িক কোন এক শর্তে ঠিক রাজি হচ্ছিল না। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অসুস্থতার কারণেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সেদিন মূর্ছা গিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন প্রয়োজন 'যুদ্ধ'।

জর্জ বুশ (সিনিয়র)'র সময় উপসাগরীয় যুদ্ধ তথা ইরাকের সাথে যুদ্ধের সময় সেখানে সর্বাত্মক আক্রমণের জন্য তিনি যখন মার্কিন সিনেটের ভোট চান, সিনেট তখন গর রাজি হয়। প্রেসিডেন্ট তখন তাঁর ভাষণে বলতে বাধ্য হন, তাহলে মার্কিন জাতিকে ইরাকের কাছে পরাজয় দেখার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। "অর্থাৎ মার্কিন ইগোকে" ব্যবহার করতে হয়েছিল। পরবর্তীতে প্রকাশ পায়, এই 'গালফ' যুদ্ধ উপলক্ষে আমেরিকা পেয়েছে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর নাম মাত্র মূল্যে তেল ক্রয়ের অধিকার। আর অবাধে মধ্যপ্রাচ্যে চলাচলের অধিকার।

এই ঘটনাগুলো উল্লেখ করলাম এ জন্য যে, আমেরিকার সমাজের অভ্যন্তরের প্রতি মুহূর্তের অবস্থাটা একটু স্মরণ রাখা দরকার। কেননা এই চরম সত্যকে ঢাকার জন্যই তারা নানা কাহিনীর অবতারণা করে। মিথ্যার জাল বোনে। আর এ সত্য আজ কে না জানে যে, রুশ পরাশক্তির সাথে অস্ত্র প্রতিযোগিতা তথা স্নায়ুযুদ্ধ চালাতে যেয়ে রাশিয়ায় যেমন দেউলিয়া হয়েছিল দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনের উৎসসমূহ। পরিণামে রাশিয়া হয়েছে ভেঙ্গে খান খান। ঠিক তদ্রুপ আমেরিকায়ও দেউলিয়া হয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমূহের শিল্প ইন্ড্রাস্ট্রী। অসংখ্য শিল্পের মালিকানা বদল হয়েছে। অনেক শিল্পের মালিক হয়েছে জাপান। আমেরিকার হাতে আছে শুধু অস্ত্র তৈরির কারখানা। আর এ পণ্য স্থিতিশীল বিশ্বে একেবারেই মূল্যহীন, অপ্রয়োজনীয়। এমনিতেই আমেরিকা এখন বিশ্ব সেরা ঋণগ্রস্ত দেশ। কিন্তু তাদের ঋণ কখনো শোধ করতে হয় না। অন্যান্য দেশসমূহের ঋণ শোধ করতে হয়, মূল্য দিতে হয় এই যা। সুতরাং যুদ্ধ ছাড়া মার্কিন অর্থনীতি বাঁচার আর কোন উপায় নেই। অরুন্ধতী রায় তাঁর ইনফাইনিট

www.pathagar.com

জাস্টিস-এর বীজগণিত প্রবন্ধে তাই ঠিকই বলেছেন- 'ওসামা বিন লাদেনের অস্তিত্ব না থাকলে যুক্তরাষ্ট্রই একটা ওসামা বানিয়ে নিতো।' এক হিসেবে তা নিয়েছেও। আসলে যুদ্ধই হলো যেমন সাম্রাজ্যবাদের অবধারিত পরিণতি তেমনি যুদ্ধ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের টিকে থাকাও সম্ভব নয়। আর এ কাজে তারা সিদ্ধহস্ত। তাদের হাত কাঁপে না। বিবেক কাঁদে না। সুতরাং আমেরিকার শত্রু খুঁজতে হবে এখন প্রথমেই আমেরিকায়।

আমেরিকা আক্রমণে কি বাইরের কোন শক্তির হাত রয়েছে ?

অরুন্ধতী রায় তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, "১১ সেপ্টেম্বরের হামলা ভীষণ রকমের উচ্ছন্নে যাওয়া এক বিশ্বের কাছ থেকে আসা এক সাবধান বাণী। বার্তাটা হয়তো লিখেছে বিন লাদেন এবং পৌঁছে দিয়েছে তার বার্তাবাহকরা। কিন্তু আমেরিকার পুরানো যুদ্ধের লাশগুলোর প্রেতাত্মারাও এ বার্তা লিখে থাকতে পারতো। কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার লাখ লাখ লোককে মারা হয়েছে, ১৯৮২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মদদে লেবাননে আগ্রাসন চালিয়ে ইসরাইল সাড়ে ১৭ হাজার মানুষ মেরেছে, অপারেশন জেডার্ট স্টর্মে (বর্তমান বুশের পিতা যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন সে সময়) হত্যা করা হয়েছে ২ লাখ ইরাকিকে, হাজার হাজার ফিলিস্তিন মারা গেছে পশ্চিম তীরে ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে। আমেরিকার সরকারের মদদে, প্রশিক্ষণে, অর্থে লালিত সন্ত্রাসবাদী, স্বৈরাচারী শাসক ও গণহত্যাকারীদের হাতে যুগোস্লাভিয়া, সোমালিয়া, হাইতি, চিলি, নিকারাগুয়া, এল সালভেদর, ডোমিনিকান রিপাবলিক আর পানামায় লাখ লাখ লোক মারা গেছে। এ তালিকা আরো বহুগুণে দীর্ঘ করা যায়। এতো বিপুল যুদ্ধ বিগ্রহে যে দেশের হাত রঞ্জিত সেদেশের বিরুদ্ধে তো প্রতিবাদ জন্মাবেই।

'অবিচারই সন্ত্রাসের মূল কারণ' প্রবন্ধে এডওয়ার্ড সাঈদ লিখেছেন- "ইসলামী ও আরব বিশ্বের অধিকাংশ লোকের কাছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার আর উদ্ধত শক্তি সমান অর্থ বহন করে। তারা আরো জানে যে, এই দেশটি কেবল ইসরাইল নয়, আরব বিশ্বের নিপীড়নমূলক সরকারগুলোকে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে এবং ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন ও প্রকৃত ভুক্তভোগীদের সঙ্গে আলোচনা সম্ভাবনা থাকলেও তাতে কর্ণপাত করে না। এরই পরিণতিতে আমেরিকার বিরোধিতা করাকে আধুনিকতার প্রতি ঘৃণা কিংবা প্রযুক্তির প্রতি ঈর্ষা বলা যায় না। যুক্তরাষ্ট্র আরোপিত নিষেধাজ্ঞায় ইরাকি জনগণের দুর্ভোগ এবং মার্কিন মদদে গত ৩৪ বছর যাবৎ ফিলিস্তিনি এলাকার ওপর ইসরাইলের দখলদারিত্বসহ আরো অনেক হস্তক্ষেপ ও লুণ্ঠনের ঘটনাই এ মার্কিন বিরোধিতার মূল কারণ।"

নোয়াম চমস্কি 'নিজেদের কৃতকর্ম যেন ভুলে না যায়' প্রবন্ধে লিখেছেন "সন্ত্রাসী হামলাগুলো ছিল বড় ধরনের নৃশংসতা। মাত্রার বিচারে এসব হয়তো অন্য অনেক হামলার সমতুল্য হবে না। উদাহরণ হিসেবে সুদানের উপর ক্লিনটন প্রশাসনের বোমা হামলার কথা ধরা যাক। তেমন কোন বিশ্বাসযোগ্য অজুহাত ছাড়াই বোমা হামলা চালিয়ে সুদানে ওষুধ শিল্পকে এমনি ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছিল যার ফলে দেশটির মোট ওষুধ সরবরাহ অর্ধেকে নেমে গিয়েছিল। আর সে হামলায় কত লোক মারা গিয়েছিল তা জানা যায়নি— কেউ তা জানে না, কারণ জাতিসংঘ পরিচালিত তদন্ত যুক্তরাষ্ট্র আটকে দিয়েছিল আর সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করার গরজও কারো নেই। আরো বহু ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা সহজেই স্মৃতিতে আসে, সেগুলোর প্রসঙ্গ আর বলতে চাই না।' তিনি

www.pathagar.com

মধ্যপ্রাচ্য ও আফগানিস্তান বিষয়ক একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন অভিজ্ঞ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, "এটা গণতন্ত্র আর সন্ত্রাসবাদের মধ্যে যুদ্ধ নয় যা কিনা সামনের দিনগুলোতে বিশ্ববাসীকে বিশ্বাস করতে বলা হবে। এর পেছনে আছে আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্র, আর হেলিকপ্টারের গল্প। ঝাঁকে ঝাঁকে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্রে ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, ১৯৯৬ সালে মার্কিন হেলিকপ্টার থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছিল এক লেবানিক অ্যাম্বুলেন্সে, আমেরিকান গোলা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল কানা নামের একটি গ্রাম, আর আমেরিকা-ইসরাইলের পোষা একদল লেবানিক মিলিশিয়া শরণার্থী শিবিরগুলো জুড়ে দাবিয়ে বেড়িয়েছে, ধর্ষণ আর হত্যাযজ্ঞ...আরো কত কিছু'। সুতরাং সে দেশের বিরুদ্ধে দুনিয়ার দেশে দেশে সমপরিমাণ শক্তিসম্পন্ন শত্রু জন্মাবে এটাই স্বাভাবিক।

আমেরিকা হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী কি ইসরাইল ?

আমেরিকা আক্রমণ এবং বিশ্বমানের বিবেকদের বিশেষ করে এডওয়ার্ড সাঈদ, নোয়াম চমস্কি, অরুন্ধতী রায়, তারিক আলী, ভিনসেন্ট ক্যানিস্ট্রারো, ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা, সালমান রুশদী এবং আর ডব্লিউ অ্যাপল জুনিয়র-এদের লেখা পড়ে বিশ্ববাসী অভিভূত হয়েছেন একথা সত্য। তাঁরা যোগ্যতার সাথে আমেরিকাকে সমালোচনা করেছেন সত্য। আমেরিকার বিবেক বর্জিত শোষণ ও হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষুব্ধ হওয়ার অধিকার আছে একথাও তারা বলেছেন। আর আমেরিকা এ যাবৎ মুসলমানদের উপরেই বেশি নির্যাতন চালিয়েছে, সুতরাং তোপের গোলাটি ওদিক থেকেই এসেছে, প্রকারান্তরে এ কথাই তারা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কেন তারা সমগ্র পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক মর্মহেতুটি বলতে চাইছেন না ? আর তা হলো অর্থনীতির ঘনীভূত প্রকাশ যে সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের অবধারিত পরিণতি পর পর শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধের মধ্যদিয়ে তার মৃত্যুর সংবাদটির কথা। অর্থাৎ এই হত্যাযজ্ঞের সাথে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ স্বয়ং জড়িত থাকার সম্ভাবনার কথা। কেন বলতে চাইছেন না সাম্রাজ্যবাদের গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া আশ্রয়হীন অভাবী মানুষের এক দানবীয় প্রতিবাদের সম্পৃক্ততার কথা। অথবা শুধুই যদি ধর্মীয় কোন সম্প্রদায়ের কথা ভাবতে হয় তবে এক প্রাচীন ধর্মীয় অনুসারীদের অর্থাৎ ইহুদিদের ইতিহাস অধ্যয়ন হচ্ছে না কেন ? নাকি পবিত্র বাইবেল নামক গ্রন্থের ভিতরে আদিপুস্তক আর নতুন পুস্তক সংযুক্ত হয়ে তা এক 'অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মত' এ রূপ নিয়েছে ? আমরা সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদ খুঁজে বেড়াচ্ছি। এর বিরোধিতা করছি কারণ তা সমাজ প্রগতিতে অন্তরায়। এ বিরোধিতা ন্যায়সংগত। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ কি ইসলামের ভিতরে অবস্থান করে ? না কি ধর্মের ভিতরে লুকিয়ে থাকে। তাহলে আমরা ইহুদি খ্রিস্টান হিন্দু ধর্মের মধ্যে তা খুঁজছি না কেন ? ভি.এস ন্যায়পল দেশ ভ্রমণ করেছেন। ভ্রমণ কাহিনী লিখছেন। প্রথিতযশা, শক্তিমান লেখক হিসেবে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেছে। তিনি চারটি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা ঘুরে সাম্প্রদায়িকতা দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু তিনি ভারত ঘুরে তা দেখতে পাননি। আমেরিকা ঘুরেও দেখতে পাননি। অথচ এইতো সেদিন আফগানিস্তানে বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙ্গার প্রতিবাদে সর্বভারতীয় হিন্দু পরিষদ পাঞ্জাবে একাধিক কোরআন শরিফ পোড়ায় এবং সেই সাথে ৫ জন মুসলমানকে হত্যা করে (ই.ই.ঈ-২৩ মার্চ ০১) এটা কি ? নোবেল বিজয়ী ভি. এস. ন্যায়পাল কোনদিন দেখতে পারলেন না আমেরিকার

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িকতা। সেখানে সাংবিধানিকভাবে সাম্প্রদায়িকতা এবং বর্ণবাদ স্বীকৃত রয়েছে। আমেরিকার সংবিধানে আছে কোন অখ্রিস্টান এবং কৃষ্ণাঙ্গ কখনো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করতে পারবেন না।' সে দেশের প্রেসিডেন্টকে শপথ পাঠ করতে হয় পবিত্র বাইবেলে হাত রেখে। এগুলো কোন ধরনের মুক্ত চিন্তা, গণতন্ত্র ও প্রগতি ? বিশ্ব বিবেক এগুলো লেখে না। সে জন্যই বলছিলাম তারপরেও বিশ্বমানের বিবেকদের কণ্ঠস্বর কোথায় যেন বুশের কণ্ঠস্বরের সাথে একাকার হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমেরিকা আক্রমণে মুসলিম মৌলবাদী শক্তি জড়িত।

আমাদের আজ প্রথমে আমেরিকা প্রশাসন, দ্বিতীয়ত, সে দেশের অভ্যন্তরের শ্রেণী বিরোধী এবং তার পরেই যাকে সন্দেহ করতে হবে সে হলো আমেরিকার লালিত পালিত ইসরাইলি ইহুদি শক্তিকে। সন্দেহ প্রধানত যে কারণে তাহলো ১১ সেপ্টেম্বর হত্যাযজ্ঞের দিন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে চাকরি করে অন্তত চার হাজার ইহুদি ওই দিন অফিসে যায়নি (ইন্টারনেট থেকে ইনকিলাব)।

দ্বিতীয়, ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে মার্কিন কর্তৃপক্ষ সন্দেহভাজন ৬ জন ইসরাইলিকে গ্রেফতারও করেছিল। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছেড়েও দেয়া হয়।

তৃতীয়, সৌদি আরবের বহুল প্রচারিত পত্রিকা ওকাজ ৩ নভেম্বর সংখ্যায় এ অভিযোগ তুলেছে। পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয় আমেরিকার অভ্যন্তরের কিংবা ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষাকারী কোন মহলের সহায়তা ছাড়া এত নিখুঁত, নির্ভুল ও যথাযথভাবে এ ধরনের ভয়াবহ হামলা চালানো সম্ভব নয়। সৌদি পত্রিকা ওকাজ আরো জানায়-একটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায়, ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ এজেন্টরাই আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী। এত বেশি প্রভাব সেখানে অন্য কোন দেশের কোন সংস্থার নেই। একমাত্র মোসাদের পক্ষেই সম্ভব মার্কিন কর্তৃপক্ষের ভেতরে ঢুকে পড়া এবং এত বিশাল পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে কার্যকর করা।' ওকাজ আরো জানায় ওই হামলায় আরব কিংবা মুসলমানরা জড়িত বলে অকাট্য প্রমাণ নেই।

পত্রিকার মতে, এই ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আরবের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক ক্ষুন্ন করা। বিশেষ করে মডারেট মুসলিম দেশগুলো থেকে আমেরিকাকে দূরে সরানো, ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া এবং উভয় ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো। ওকাজের মতে, স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে সম্প্রতি ওয়াশিংটনের মধ্যপ্রাচ্য নীতির ইতিবাচক পরিবর্তনও ইঙ্গিত দেয়, সন্ত্রাসী হামলায় যে মোসাদই জড়িত আমেরিকাও সেটা বুঝতে পেরেছে (যুগান্তর, ৪ নভেম্বর ০১)

চতুর্থত, মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির প্রতীক স্থাপনাগুলোর ওপর হামলার ঘটনায় সরাসরি লাভ হয়েছে ইসরাইলি শাসকের।

পঞ্চমত, হামলার দিন ভয়েস অফ আমেরিকা (ভোয়া) পাকিস্তানে নিযুক্ত আফগান রাষ্ট্রদূত আবদুল সালাম যায়েফের বরাত দিয়ে জানায়, এটা ছিল একটি সুপরিকল্পিত ও নিখুঁত পরিকল্পনা। এত ব্যাপক মাত্রার হামলা চালাতে যে সব যন্ত্রপাতি ও যোগাযোগ সুবিধা দরকার সে ধরনের সুবিধা বিন লাদেনের (যেহেতু তাকে দায়ী করা হচ্ছে) নেই।

www.pathagar.com

পেন্টাগন ও বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালানোর মতো সুদক্ষ পাইলট, অস্ত্র, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থ-সবই ইসরাইলের রয়েছে।

ষষ্ঠত, ১৯৬৭ সালের ৮ জুন ইসরাইলি সশস্ত্র বাহিনী মার্কিন গোয়েন্দা জাহাজ ইউ এস এস লিবার্টির ওপর বিমান ও নৌ-হামলা চালায়। এতে ৩৪ জন তরুণ মার্কিন নাগরিক নিহত ও আহত হয় ১৭১ জন। আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ছ'দিনের যুদ্ধ চলাকালে মার্কিন নৌ-জাহাজের ওপর ইসরাইল এ হামলা চালালেও যাবতীয় দোষ চাপানো হয় আরব সৈন্যদের ওপর। ইউ এস এস লিবার্টির বেঁচে যাওয়া অনেকেসহ মার্কিন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা এবং সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিন রুস্ক, সাবেক জেসিএস চেয়ারম্যান অ্যাডমিরাল টমাস মুরার নির্দিষ্ট করে বলেন, 'লিবার্টির ওপর ইসরাইলি হামলা কোন দুর্ঘটনা নয়। অথচ তারা নিজে থেকে এ হামলা চালিয়ে এ ব্যাপারে মিথ্যা বলেছে। আজ আমেরিকার মধ্য থেকেই আওয়াজ উঠেছে—'মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কলিন পাওয়েল, ইসরাইলকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করুন এবং সময় এসেছে ইসরাইল, দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে মার্কিন নীতি ঢেলে সাজানো। এখন মার্কিন সামরিক ও বেসামরিক নাগরিকদের প্রাণরক্ষার স্বার্থেই, বিশেষ করে প্রয়োজন আরব-ইসরাইল বিরোধ, কাশ্মীর সংকট ও আফগানিস্তান নীতি ঢেলে সাজানোর ওপর গুরুত্ব দেয়া। এর কারণ, অনেক ফিলিস্তিন নেতা এবং হাজার হাজার নিরপরাধ বেসামরিক লোক হত্যাসহ আরব মুসলিম, কাশ্মীর এবং খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বর্বর হামলার পেছনে ইসরাইল জড়িত।

মধ্যপ্রাচ্যের দুঃখ ইসরাইল রাষ্ট্রের উদ্ভব

বর্তমান বিশ্ব সভ্যতা আজ হুমকির সম্মুখীন। এর পেছনে রয়েছে একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র 'ইসরাইল'। এ রাষ্ট্রের উদ্ভবের সাথে জড়িয়ে রয়েছে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপরে ইঙ্গ-মার্কিন ইউরোপীয় জোটের দখলদারিত্ব। অথচ ইহুদিদের জন্য একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন এই দাবিতে প্রথম আন্দোলন শুরু হয় ইউরোপেই। উনবিংশ শতাব্দীর (১৮৯৭ খ্রিঃ) শেষ ভাগে ইউরোপে শুরু হয় জায়োনিস্ট আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় ইহুদিদের জন্য নিজস্ব বাসভূমি পত্তন। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি এই আন্দোলন রফতানি করে মধ্যপ্রাচ্যে। তারা এক ঢিলে একাধিক পাখি শিকার করে। প্রথমত আন্দোলনকে ইউরোপের মাটি থেকে সরিয়ে দেয়া। দ্বিতীয়ত ইহুদিদের বন্ধু বনে যাওয়া। তৃতীয়ত এই শক্তিকে দিয়ে মুসলমানদের অস্থিতিশীল করে তোলা। চতুর্থত এদের ওপরে ভর করে ভূমধ্যসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলোর ওপর রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং পঞ্চমত গোটা আরব জাহানের তেলের বাজার দখলে রাখা। ইহুদি রাষ্ট্রের উদ্ভবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে অটোমান তুর্কির প্রজা উপনিবেশ প্যালেস্টাইন দখলের পর ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে স্থানীয় প্যালেস্টাইনীয় জনসাধারণের অজ্ঞাতে ইউরোপীয় ইহুদি অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। পরিণতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে মূল প্যালেস্টাইনের মাটিতে পশ্চিমী শক্তি দ্বারা প্যালেস্টাইন বিভাজন ও ইহুদি রাষ্ট্র 'ইসরাইলের' আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার ঘোষণা' (ইউরোপের ইহুদিরা বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে নিজেদের বাসভূমির দাবিতে যখন ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দিচ্ছিল) তখন তৎকালীন ব্রিটিশ বিদেশ মন্ত্রী আর্থার জেমস ব্যালফোর (২ নভেম্বর, ১৯১৭) জায়নিস্ট ইহুদি নেতা লর্ড রথচাইলকে ইউরোপীয়

www.pathagar.com

ইহুদিদের অটোমান প্যালেস্টাইনে উপনিবেশ করার অধিকার দিয়ে একটি চিঠি লেখেন। এই একতরফা অধিকার প্রদানকে বলা হয় বেলফোর ঘোষণা) বাস্তবায়ন হয় ১৯৪৮ সালের ১৫ মে।

সে সময় শতকরা ৯০ ভাগ প্যালেস্টাইনীয় জনসাধারণ ছিল অশিক্ষিত ও প্রায় নিরক্ষর। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ষড়যন্ত্র তারা আদৌ বুঝত না। তারা মরুভূমির বেদুইন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাদের আন্তর্জাতিক নাম ছিল শেপার্ডি প্যালেস্টাইনিয়াম বা মেষ পালক। ভূ-রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমী শক্তির দেশটিকে দখলের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মানুষগুলোকে প্রয়োজন ছিল না। অটোমান তুর্কির পতনের পর মূল প্যালেস্টাইনের জমি যখন ব্রিটিশ অধীনে, তখন ইউরোপীয় ইহুদিরা ইঙ্গ-মার্কিন সহায়তায় অধিকাংশ মরুভূমির জমি এফেন্দি প্যালেস্টাইনের কাছ থেকে টাকা দিয়ে কিনে নেয় (এফেন্দি ফরাসী শব্দ-অর্থ, কর্তা বা মালিক, এ ক্ষেত্রে এফেন্দি প্যালেস্টাইনিয়ান বলতে ধনী প্যালেস্টাইনিয়ান শেখ বোঝানো হয়েছে) এরা প্রচুর অনাবাদী জমির মালিক ছিল। জমি চাষের উপযোগী ছিল না বলে তারা দেশে বসবাস না করে আরবের অন্য রাষ্ট্রে বসবাস করত। এরা প্যালেস্টাইনীয় সমাজে সংখ্যালঘু ধনী শ্রেণী। যেহেতু এরা কোনদিনও দেশে ফিরে যাবে না, তাই তারা ইউরোপীয় ইহুদিদের কাছে জমিগুলো বিক্রি করে দেয়। পরিকল্পিতভাবে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটে প্যালেস্টাইনে ইহুদিরা যখন এসে হাজির হয়-অনেকেই তখন বৈধ জমির মালিক। এভাবে প্রায় এক চতুর্থাংশ প্যালেস্টাইন প্রথমে টাকা দিয়ে কিনে নেয়া হয় যা শতকরা ৯০ ভাগ অশিক্ষিত প্যালেস্টাইনীয় আদৌ বুঝতে পারেনি। যখন বুঝতে পারে তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। ১৯৪৮ সালে প্রায় জোর করেই জাতিসংঘের পৌরহিত্যে প্যালেস্টাইন ভাগ করা হয়। এভাবে ইঙ্গ-মার্কিন ও জাতিসংঘের সহায়তায় প্যালেস্টাইন ভাগ করে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের পত্তন করা হয়।

১৯৪৮ সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমী শক্তির সহায়ক ও তৃতীয় শক্তি হিসেবে ইসরাইল বিরাজ করছে। ইসরাইলের উপস্থিতিতে সারা মধ্যপ্রাচ্যে ৫০-এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত এক যুদ্ধের আবহাওয়া তৈরি করা হয়েছে। যার নিয়ামক পশ্চিমী শক্তি। এই যুদ্ধাবস্থার জন্য আরব মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নিজেদের তেলের বাজার দখলে রাখে।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ আফগান আক্রমণ

অবশেষে বুশের কথা কার্যকর হল। আমেরিকা আফগানিস্তান আক্রমণ করল গত ৭ অক্টোবর, রোববার বাংলাদেশ সময় রাত্র ১০টার কিছু পরে। রাজধানী কাবুল, কান্দাহার ও জালালাবাদসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হল। এ কোন সভ্যতা, কোন গণতন্ত্র!! তাহলে প্রগতির সাথে বন্যতার পার্থক্য কোথায় ? যে কোনো তদন্তের আগেই বিচার শুরু হয়, বিচারের আগেই রায় কার্যকর হয়!!

যারা ১১ সেপ্টেম্বরের মত হত্যাযজ্ঞের আগাম সংবাদ জানতে পারল না। শেষ পর্যন্ত এত বিশাল সংখ্যক মানুষের নির্মম মৃত্যু ঠেকাতে পারল না। এমন কি শত্রুকে পর্যন্ত এখনো অকাট্য প্রমাণসহ চিহ্নিত করতে পারল না। সেই তারাই মাত্র ৩৬ দিনের মাথায় 'প্রতিশোধ-প্রতিশোধ' ধ্বনি তুলে এক অনির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। এ কোন ঔদ্ধত্য!!! কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ইনসাফ'র (ইনফাইনিট জাস্টিস) ধুয়ো তুলে সর্বগ্রাসী সন্ত্রাসী সৃষ্টি করে বিশ্বব্যাপী মানুষের আরামকে হারাম করে তোলা!!

www.pathagar.com

এ অধিকার বুশকে কে দিল ? বুশ কে ?? প্রথমে মানুষ, তারপর আর দশজর্ন প্রেসিডেন্টের মত একটি রাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট এর থেকেও কি বেশি কিছু??? যদি বেশি কিছু ভেবে থাকেন-তা হলে একথাও ভাবতে হবে ১১ সেপ্টেম্বর তাকে ৪০,০০০ ফুট শূন্যে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আর ৭ অক্টোবরের পর থেকে তাকেও বিন লাদেনের মত নিরাপদ গুহায় আশ্রয় নিতে হচ্ছে। অর্থাৎ একজন আরব সাধারণ মানুষ যার দেহে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সার্টিফিকেট অংকিত অলঙ্কার নেই তার অবস্থা আর আমেরিকার প্রেসিডেন্টের অবস্থা আজ সমান সমান।

বরং একথা বুশের স্মরণ রাখতে হবে যে, উপসাগরীয় যুদ্ধে সারা দুনিয়ার শাসক শ্রেণীকে নিয়ে জোট বেঁধে একজন মাত্র রাষ্ট্রনায়ক সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত তথা হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তার বাবা জর্জ বুশ (সিনিয়র)। এমন কি সাদ্দাম এখনো ইরাকের প্রেসিডেন্টই আছে, কিন্তু বুশ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন, জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। সুতরাং তারই ছেলে জনগণের রায় কারচুপির অভিযোগে অভিযুক্ত ডব্লিউ বুশের এত আস্ফালন কেন ? যে তিনি যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। যে যুদ্ধ সর্বধ্বংসী যুদ্ধে রূপ নিতে পারে। আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহকে চিহ্নহীন করে দিতে পারে!!!

যা হোক, বুশ প্রশাসন ১১ সেপ্টেম্বরের জন্য আর মুসলমান ওসামা বিন লাদেনকে অভিযুক্ত করেছেন। লাদেন আফগানিস্তানে অবস্থান করেছেন। বুশ প্রশাসন লাদেনকে তাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে জানিয়েছেন। তালেবান সরকার লাদেনের বিরুদ্ধে অভিযোগের অকাট্য প্রমাণ ছাড়া তাকে শুধু আমেরিকা কেন কারো হাতেই তুলে দিতে রাজি হয় নি। আমেরিকা যুদ্ধ শুরু করেছে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। আফগানিস্তানের লাঞ্ছিত, অভাবী নিরীহ জনসাধারণের বিরুদ্ধে। এ এক অসম শক্তির মধ্যে যুদ্ধ। একজনের কাছে রয়েছে জীবন উৎসর্গ করার প্রস্তুতি, অপরজনের হাতে রয়েছে জীবন কেড়ে নেওয়ার হাতিয়ার। আমেরিকা তার জোট নিয়ে আকাশ ও সমুদ্র উভয়ই ব্যবহার করছে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। আর সেই সাথে খোদ আফগানিস্তানের ভিতরেই তালেবান সরকার বিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নামে আফগান নাগরিকদের একটি অংশকেই ব্যবহার করছে।

কেন আমেরিকা আক্রমণে লাদেন জড়িত নয় ?

বুশ প্রশাসনের কাছে ১১ সেপ্টেম্বর হামলার জন্য ওসামা বিল লাদেন প্রধান সন্দেহ ভাজন। দ্বিতীয় সন্দেহের কাতারে রয়েছে ইরাক তথা সাদ্দাম হোসেন। সর্বোপরি মুসলমানরা। কিন্তু কেন লাদেন ওই হামলায় জড়িত নয় ? লাদেন যদি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অংশ হিসেবে ১১ সেপ্টেম্বর ঘটাতো। তাহলে সে আমেরিকার দিক থেকে পরবর্তী হামলার বিষয়টিও মাথায় রাখতো। যেহেতু লাদেনের বর্তমান অবস্থান অনেকটা ওপেন সিক্রেট সেহেতু তিনি ওই হামলার পর আফগানিস্তানে অন্তত থাকতেন না। দ্বিতীয়ত যুদ্ধ শুরু হলে আমেরিকাকে আরো অন্তত দুই থেকে তিনটি হামলার পরিকল্পনা রাখতো। কারণ বুশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকার ভিতর থেকেই প্রতিরোধের সেটিই হতো যুদ্ধ ব্যকরণের ভাষা। কারণ তাতে করে মার্কিন জাতির ভিতরে এমন প্যানিক সৃষ্টি হতো যে তারা তাদের দুঃখের জন্য শেষ পর্যন্ত বুশকেই দায়ী করত। এবং মার্কিন জাতিই হতো যুদ্ধ বিরোধী সব থেকে কার্যকর কণ্ঠ। কিন্তু তা ঘটে

www.pathagar.com

নি। তৃতীয়ত যুদ্ধ ঘোষণাকারী নিজেকে অদৃশ্য রাখতো না। সে তার আপন অভিমত ও লক্ষ্য অবশ্যই প্রকাশ্যে ঘোষণা করত। চতুর্থত কোন পরাশক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তি বা গ্রুপ যুদ্ধ করতে পারে না। এর জন্য অবশ্যই ওই ব্যক্তি বা গ্রুপ বিশ্বব্যাপী, হোক সে দুর্বল তবুও জোট গঠন করত। আর তালেবান সরকার যেহেতু নিজ রাষ্ট্রই এখনো নিরঙ্কুশ শাসনের আওতায় আনতে পারেনি সেহেতু তাদের এত বড় যুদ্ধ ঘোষণার প্রশ্নই ওঠে না।

অপর দিকে ইরাক তথা সাদ্দামকে সন্দেহ শুধুই অবান্তর। যে নিজ মাটিতে বহিঃশত্রুকে শেষ ধ্বংস করতে পারেনি, সে সাত সাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকা আক্রমণ করতে যাবে, হতে পারে না।

সবথেকে বড় কথা ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায়-এখন পর্যন্ত লাদেন ও সাদ্দাম তথা আফগান ও ইরাককে কোনভাবেই বস্তুগত বেনিফিশিয়ারি হতে দেখা যাচ্ছে না। তবে একথা সত্য, পরাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র তাদের না থাকলেও কোন জাতির যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য যে অপরেস্ট-ডিপরেস্ট জীবন লাগে তা তাদের আছে। আছে গোটা মধ্য প্রাচ্য, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার মানুষদের মধ্যেও।

যে কারণে আমেরিকা আফগান আক্রমণ করল

আমেরিকা ও বুশ সরকারের জন্য কেন 'যুদ্ধ' প্রয়োজন সে কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখন দেখতে হবে লাদেনকে অভিযুক্ত করে আফগান আক্রমণ করল কেন ? আর এখানেই রয়েছে-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির এক অভিন্ন স্বার্থের মিলন।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

আফগানিস্তান আক্রমণের পেছনে আমেরিকার অর্থনৈতিক দৃষ্টিটাই প্রধান। এই যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু যতটা না লাদেন তথা আফগানিস্তান তার চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার মাটির তলের তেলসহ খনিজ সম্পদ। এই যুদ্ধে জয় মানেই আরবীয় 'আলাদিনের জাদুর চেরাগ' হাতে পাওয়া।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

অর্থনীতিরই ঘনীভূত প্রকাশ রাজনীতি। লুণ্ঠিত অর্থের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যে রাজনীতি; সে রাজনীতি লুণ্ঠন বা ডাকাতি রাজনীতি। আর এই রাজনীতির ধার করা হল তস্কর, সন্ত্রাসী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে বিশ্বের সেরা সন্ত্রাসী সে কথা এখন নতুন করে বলার অবকাশ নেই। যেহেতু সন্ত্রাসীকে সন্ত্রাস করে টিকে থাকতে হয় সেহেতু সে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী-শত্রুও জন্ম দেয় প্রতিনিয়ত; এবং সন্ত্রাসী প্রতিটা মুহূর্ত আতঙ্কে থাকে পরবর্তী সন্ত্রাসের সম্ভাবনার কথা ভেবে। সে তখন একাধিক সা কিরণ মিলনের চেষ্টা করে। আর দৃষ্টি রাখে কোথা থেকে ফুঁসে উঠতে পারে আগ্নেয়গিরি র মুখ।

বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা এই আতঙ্কেই যত্রতত্র আঘাত করে বসে। সে আঘাত করে কিউবায়, রাশিয়ায়, ইরানে, লিবিয়ায়, ইরাকে এবং আফগানিস্তানে। ভূরাজনৈতিক দিক দিয়ে এখনও আফগানিস্তানে। ভূরাজনৈতিক দিক দিয়ে এখনও আফগানিস্তান এশিয়ার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঐতিহাসিক কাল ধরে ইউরোপ ও আরবদের জন্য এশিয়ায়

www.pathagar.com

ঢোকার গেট বা দরজা হলো আফগানিস্তান। সে কারণেই তাদেরকে বার বার শুধু মূল্যই দিয়ে যেতে হচ্ছে। জীবন আর রক্ত দিয়ে সে মূল্য শোধ হচ্ছে। বর্তমানে আমেরিকার কাছে আফগানিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব এই কারণে যে, এই দেশটির সাথে এখন সীমান্ত সম্পর্ক রয়েছে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ দেশের। এর দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে পাকিস্তান, পূর্বে চীন, পূর্ব-উত্তরে তাজাকিস্তান, উত্তরে উজবেকিস্তান, উত্তর-পশ্চিমে তুর্কমেনিস্তান, আর পশ্চিম-দক্ষিণে ইরান। এরা প্রত্যেক্যেই আগামী দিনে আমেরিকার তথা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য থ্রেট। সুতরাং আফগানিস্তানে এখন আমেরিকাকে সশরীরে থাকতে হবে। চীনের কমিউনিজম সমাজের নাকের উপরে, পাকিস্তানের পারমাণবিক চুল্লির জ্বালানির ধারে, ইরানের মুসলিম নৈতিকতার শীর্ষে, তাজাক-উজবেক-তুর্কমেনিস্তানের অর্থনৈতিক যন্ত্রণা মুখে আর তুর্কী ও মধ্য এশিয়ার ঘাড়ের ওপরে সশরীরে জগদ্দল পাথর হয়ে ঝেঁকে বসতে হবে। বসে থাকতে হবে হাজার বছরের লড়িয়ে এবং বার বার বিজয়ী আফগান জাতির ঘাড়ের উপরে। আফগানিস্তানে খনিজ সম্পদ, কৃষি ব্যবস্থা না থাকলেও এখানে বসে সহজেই নজর রাখা যাবে ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রের উপরে। ইরাকের বাথ অর্থনীতির উপরে এবং সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা যাবে পারস্য উপসাগর ও আরব সাগর।

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি

মুসলিম নৈতিকতার প্রতি ভীতি আমেরিকাকে আফগানিস্তান আক্রমণে প্ররোচিত করেছে। মুসলমানরা এখন পর্যন্ত বহুধা ভাগে বিভক্ত সত্য, কিন্তু ইহুদি, খ্রিস্টান আস্ফালনের বিরুদ্ধে ঐক্য হতে কতক্ষণ। আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যক্তি, গ্রুপ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীদের মধ্যে পৃথিবীতে এখন মুসলমানরাই এগিয়ে। এখন পর্যন্ত এটা সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম কিন্তু আগামীকাল যে এটা দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদী পোশাকে আচ্ছাদিত হবে না তা কি নিশ্চিত করে বলা যায়? এ প্রশ্ন থেকেও খ্রিস্টান আমেরিকা ইউরোপের প্রয়োজন রয়েছে মুসলিম আফগানিস্তান আক্রমণ।

দার্শনিক কারণ

জগতের কোন কিছুই স্থির নয়-সবকিছুই পরিবর্তনশীল এবং প্রতিনিয়তই তা হচ্ছে। প্রতিটা বস্তুরই একটা ইলাস্টিসিটি আছে। এরপর সে পরিবর্তিত হয়; পরিমাণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একেবারে গুণগত পরিবর্তনে; সম্পূর্ণ নতুনে। আমেরিকা জানে রাজনীতির ইতিহাসেও কোন সাম্রাজ্য চিরকাল টিকে থাকে নি। গ্রীক সাম্রাজ্য টিকে থাকেনি, রোমান-ফরাসি-ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকে থাকেনি। মার্কিন সাম্রাজ্যও চিরকাল টিকে থাকবে না। কিন্তু আধুনিককালে দেখা গেছে। সাম্রাজ্য হাত বদল হলেও অর্থাৎ রোমের হাত থেকে ফ্রান্স বা ব্রিটেন হয়ে আমেরিকার হাতে পৌঁছালেও দুটো জায়গা থেকে কিন্তু তা সরেনি। অর্থাৎ প্রথমত-সাদা চামড়া, দ্বিতীয়ত-খ্রিস্টান ধর্ম থেকে। মুখে এরা নিজেদের সম্পর্কে যাই ঘোষণা দিক না কেন, মুক্তবুদ্ধি, প্রগতি, উদার গণতন্ত্রী যাই বলুক না কেন তারা কিন্তু কখনোই 'সাদা' এবং খ্রিস্টান এখান থেকে সরে দাঁড়াতে পারেনি। আর আজ বিশ্ব সভ্যতার এই চরম বিকাশের যুগে মানুষ যখন অর্থনৈতিক ও চেতনার মুক্তি খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত এমন কি কোথাও কোন সামান্যতম নৈতিকতারও সন্ধান খুঁজে পায়নি তখন সে বেশি বেশি করে ধার্মিক হয়ে উঠেছে। সে বেশি বেশি করে

www.pathagar.com

হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি অথবা খ্রিস্টান হয়ে উঠেছে। সে বৌদ্ধ হয়ে উঠেছে। যেহেতু হিন্দু এবং ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করা যায় না সেহেতু এই ধর্মের ব্যাপ্তি নেই। ফলে প্রতিযোগিতায় এসেছে মুসলিম-খ্রিস্টান-হয়ে বৌদ্ধ। বৌদ্ধ ওই অর্থে ধর্মই নয় 'মত নিরীশ্বরবাদী দর্শন'। আর এ দর্শনে জীব হত্যা মহাপাপ ফলে যুদ্ধ তাদের দর্শন বিরোধী ফলে যুদ্ধের মাঠে অবশিষ্ট থাকার কথা মুসলিম বনাম খ্রিস্টানের।

খ্রিস্টান এখন বিশ্ব শাসক। সুতরাং দুনিয়ায় মুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থতার যে দায় তা বর্তাচ্ছে খ্রিস্টধর্মের শরীরে। সংগত কারণেই মানুষকে মোহগ্রস্ত করে তোলার সুযোগ রয়েছে যার সে হল মুসলমান তথা ইসলামের। সুতরাং সমুদ্রের বানের মত ধেয়ে আসা ইসলামিক মূল্যবোধকে এখনি রেজিস্ট্রী করতে হবে। আফগানিস্তান আক্রমণের পেছনে হয়তো বা এই রয়েছে আমেরিকানদের দার্শনিক কারণ।

জাপান-জার্মানি, রাশিয়া-চীন,পাকিস্তান

প্রশ্ন উঠেছে এদের ভূমিকা নিয়ে। জাপান, জার্মানি, রাশিয়া তো এখন প্রতিশোধ নিতে পারতো আমেরিকার বিরুদ্ধে। বিগত দিনে বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানের পরাজয়, জাপানে পারমাণবিক বোমার জবাবে আর রাশিয়া আফগানিস্তানে মার খাওয়ার পেছনে আমেরিকার ভূমিকার প্রশ্নে। কিন্তু তারা সে সুযোগ নেয়নি প্রথমত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেউই চাচ্ছে না। দ্বিতীয় শ্রেণীগত ও ধর্মগত অবস্থানের কারণে।

প্রশ্ন উঠেছে, চীনের ভূমিকা নিয়ে। তারা কেন এই যুদ্ধ তথা হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে জোরালো কোন ভূমিকা রাখছে না ? আসলে চীনের ইতিহাসই এমন। মঙ্গলরা আক্রমণ করে। ঠিক আছে, প্রাচীর দিয়ে দাও। ২০০ বছর ধরে তারা প্রাচীর নির্মাণ করবে, কিন্তু মঙ্গলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। এটা যেন তাদের নৃ-জাতিগত বৈশিষ্ট্য। তার উপরে বৌদ্ধ। ধর্মগত বাধা। এদিক থেকে তারা অনেকটা আত্ম-কেন্দ্রিক। কসোভো সংকটের সময় তাদের দূতাবাসে আমেরিকা বোমা ফেললে, আমেরিকান বিমান চীনের আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করে চীনা পাইলটকে মেরে ফেললে 'ভেরি সরি' বল্লেই খুশি হয়ে যায়। এ হলো চীনা জাতির বৈশিষ্ট্য। তবে, তেং সিয়াও পিং-এর তৃ-বিশ্ব তত্ত্বের অর্থনীতি ভিয়েতনাম যুদ্ধে ভূমিকা রেখেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে রুশ পতন থেকে তারা শিক্ষা নিয়েছে। তাদের গতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মারমুখী নয় অনেকটা প্রজ্ঞা ও সজ্ঞাভিত্তিক।

প্রশ্ন উঠেছে, পাকিস্তানের অবস্থান নিয়ে। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট মোশাররফের ভূমিকা নিয়ে। মোশাররফের অবস্থান হয়তোবা ঠিকই আছে। তা না হলে আমেরিকা আফগানের পাশাপাশি পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করত। এই সুযোগে ভারত দখল করে নিতো পুরো কাশ্মীর। আর তাতে করে এখনি পারমাণবিক যুদ্ধের আর কোন বিকল্প থাকতো না।

আফগান যুদ্ধের শেষ কোথায়

সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠেছে এই চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির শেষ কোথায় ? হ্যাঁ, এখন এটিই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এক কথায় বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত মানুষের এই যুদ্ধে দৃশ্যত বস্তুগত কোন সম্ভাবনা নেই। যেমনটা তারা অর্জন করেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 'সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তারা অর্জন করেছিল 'গণচীনসহ

www.pathagar.com

পূর্ব ইউরোপের অন্তর ৮টি দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কিন্তু এই যুদ্ধে সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই। কারণ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, কমিউনিস্ট সংগঠন তথা বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাব রয়েছে পুরোপুরিই। সুতরাং এই যুদ্ধে আমাদের শুধুমাত্র দেখার বিষয় রয়েছে কে হারে-কে জেতে। এখনি হয়তো নিশ্চিত করে তা বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আফগানিস্তানের স্থলযুদ্ধের ইতিহাস হল এই মাটিতে তারা শুধু বিজয়ী হয়েছে। ১৮৩০-১৯২০ সময়কালে ব্রিটিশরাজ আফগান দখল করতে দিয়ে তিনটি বড় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু প্রচণ্ড স্বাধীনচেতা আফগান গোত্রগুলোর কাছ থেকে বারবারই বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে তাদের। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্রিটিশ রেজিমেন্টের ১৬ হাজার সৈন্য সে সময় মারা যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পর জেনারেল উইলিয়াম এলফিন স্টোনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীও আফগানিস্তানে অভিযান চালিয়েছিল। কথিত আছে- আফগান যোদ্ধারা ব্রিটিশ সৈন্যদের সেদিন কচুকাটা করেছিল। এর ১০০-রও বেশি বছর পর ১৯৮৯-তে মাথা নীচু করে আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার সময় এক দশক ধরে ১ হাজারেরও বেশি সহযোদ্ধাকে হারাতে হয়েছে সোভিয়েত বাহিনীকে। অর্থাৎ আফগানিস্তানের মাটিতে স্থলযুদ্ধে আমেরিকা যে বিশেষ কোন সুবিধা করতে পারবে না এটা অনেকটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। সুতরাং আমেরিকাকে যা করতে হবে তা আকাশ যুদ্ধ দিয়েই। আর এতে করে আফগান প্রস্তর যুগে ফিরে যাবে। বেসামরিক মানুষ, নারী, শিশু নিশ্চিহ্ন হবে, কিন্তু শত্রু নিধন কতটুকু হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অন্যদিকে দিনে দিনে দুনিয়াব্যাপী মানুষের সেন্টিমেন্ট মার্কিনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠবে। আর সম্মিলিত নিরস্ত্র মানুষের মুষ্ঠিবদ্ধ হাত যে পারমাণবিক বোমার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী সেটিও সকলের জানা। কিন্তু তারপরেও আমেরিকাকে জিততেই হবে যে কোন কিছুর মূল্যে হলেও। মরু বালি মানুষের রক্তে পঙ্কিলে পরিণত করে হলেও। পাহাড়ের খাদসমূহ রক্ত দিয়ে ভরে সাগর বানিয়ে হলেও।

কিন্তু একথাও সত্য, পৃথিবীর সেই সৌভাগ্যবান জাতি 'মার্কিন' যারা বার বার যুদ্ধ রপ্তানি করে এশিয়ায় ও ইউরোপের মাটিতে, আর এখন থেকে খোদ আমেরিকার মাটিতেই সেই যুদ্ধ আমদানি হবে তা দেখার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আর দেখতে হবে আপনজনের বিচ্ছেদ, হাহাকার, আর আহাজারি। এবং মনে রাখতে হবে-আর কেউ নয় মার্কিন জাতির শত্রু খোদ আমেরিকা রাষ্ট্র-ই। অর্থাৎ আমেরিকার তোপের মুখে আজ মার্কিন। সুতরাং সবার আগে শ্লোগান তুলতে হবে মার্কিনিদেরই— 'থামাও যুদ্ধ বাঁচাও আফগান, রক্ষা কর বিশ্ব সভ্যতা সর্বোপরি মানুষ। ❑

লেখক ঃ পাক্ষিক 'চিন্তা'র প্রতিবেদক।

নভেম্বর '০১

www.pathagar.com

সারাবিশ্ব কাঁপিয়েছেন ওসামা বিন লাদেন

তৌফিক আজিজ

২০০১ সালের শেষে হলেও বছরের সবচেয়ে আলোচিত ব্যাক্তিত্ব হলেন সৌদি ভিন্ন মতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেন। ১৯৯১ সালের দিকে প্রথমে বিশ্বের এ মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তিত্বটির নাম শোনা যায়। লাদেনের বিশ্বব্যাপী পরিচিতির মূলে রয়েছে তার মার্কিন বিরোধী জিহাদ। যার ফলশ্রুতিতে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে গত বছর ৭ অক্টোবর শুরু হয় আফগান যুদ্ধ। নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে আত্মঘাতী বিমান হামলার পেছনে বিন লাদেনের সম্পৃক্ততা কতটুকু তা প্রশ্নাতীত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের প্রধান টার্গেট ওসামা বিন লাদেন। আফগান যুদ্ধের ইতি ঘটলেও বিন লাদেনের সন্ধান পায়নি মার্কিন কমান্ডোরা। পুরো আফগান সংকটেই লাদেন এখনও এক রহস্য পুরুষ। তার অবস্থান সম্পর্কে কিছুই জানে না বহির্বিশ্ব। তবে লাদেন আফগানিস্তানের তোরাবোরায় মারা গেছেন এমন খবর প্রচার করেছে পশ্চিমা মিডিয়া। অবশ্য লাদেনের জীবনীকার পাকিস্তানি নাগরিক হামিদ মীর বলেছেন, লাদেন বেঁচে আছেন এবং আফগান-ইরান সীমান্তের কোথাও লুকিয়ে আছেন।

ওসামা বিন লাদেনের মা ছিলেন একজন সিরীয় নাগরিক এবং বাবা ইয়েমেনী। লাদেনের বাবা সৌদি আরবে ব্যবসা করতে আসার পর বাদশা আব্দুল আজিজ আল গোয়াদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর পরই গড়ে ওঠে বিন লাদেনের গ্রুপ। লাদেনের বাবা চারটি বিয়ে করেছিলেন এবং তার সন্তান সংখ্যা ৫২ জন। বাবার মৃত্যুর পর লাদেন প্রায় ২৫ কোটি ডলারের সম্পদ পেয়েছিলেন। জেদ্দায় বাদশা আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালে লাদেন জিহাদী মনোভাব ধারণ করেছেন। লাদেনের পছন্দনীয় শিক্ষক আব্দুল্লাহ আজমের সরাসরি প্রভাবে তিনি কট্টর সুন্নি মুসলমান হয়ে ওঠেন। বিন লাদেন ছোট্টবেলায় হই হট্টগোল এবং বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা পছন্দ করলেও ২২ বছর বয়সে তিনি মুজাহিদ হয়ে ওঠেন। ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে রুশ অনুপ্রবেশের পর লাদেন সোভিয়েত বিরোধী ধর্মযুদ্ধে যোগ দিতে কাবুলে যান। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগের পর লাদেন তার জঙ্গি সংগঠন আল-কায়দা গঠন করেন।

লাদেন বিয়ে করেছেন তিনটি এবং তার সন্তান সংখ্যা ১০। আফগানিস্তানে

www.pathagar.com

মার্কিনবিরোধী যুদ্ধে লাদেনের দু'ছেলে হামজা এবং মুহাম্মদকে সরাসরি অংশ নিতে দেখা গেছে। পশ্চিমা মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর মতে, লাদেনের দু'ছেলে তোরাবোরায় মার্কিন বোমা হামলায় নিহত হয়েছেন। লাদেন তালেবান নেতা মোল্লা ওমরের বোনকেও বিয়ে করেছেন বলে শোনা যায়। লাদেন সম্পর্কে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই এবং সিআইএ-এর দেয়া তথ্য মতে, ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি ইয়েমেনে জন্মগ্রহণ করেন। সৌদি নাগরিক বিন লাদেনের উচ্চতা ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং ওজন ৮০ কেজি। লাদেনের আল-কায়দা সংগঠন ছড়িয়ে আছে মিসর, সৌদি আরব, সুদান, কোরিয়া, তাঞ্জানিয়া, ইরান, ইরাক, মিসর, ফিলিপাইন, ফিলিস্তিন, পাকিস্তান, ভারত, চেচনিয়া, আলবেনিয়া, আলজেরিয়াসহ বিশ্বের ৬০টি দেশে। লাদেনের আল-কায়দা সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে ইসলামী জঙ্গি সংগঠন আল-জিহাদ, লস্কর-ই-তৈয়বা, আবু-সায়াক, হামাসসহ ৩০টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের। মার্কিন কর্তৃপক্ষ এদের অধিকাংশকেই নিষিদ্ধ করেছে। ১৯৯৬ সাল থেকে লাদেন আফগানিস্তানে অবস্থান করছেন। সর্বশেষ তোরাবোরার গোপন আস্তানায় লাদেন তার প্রায় দু'হাজার সশস্ত্র সহযোগী নিয়ে অবস্থান নিলেও মার্কিন বাহিনীর হাতে তোরাবোরার পতনের পর তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর এক কর্মকর্তার মতে, লাদেন পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে বর্তমানে অবস্থান করছেন।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও বিন লাদেন মুসলিম বিশ্বের তরুণদের মধ্যে পাবলিক হিরো হিসেবে জনপ্রিয় । কেনিয়া এবং তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলা, সৌদি আরবে মার্কিন সেনা ঘাঁটিতে বোমা হামলা, ইয়েমেনে মার্কিন যুদ্ধ জাহাজে বোমা হামলা এবং নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে বিমান হামলার সঙ্গে লাদেন সরাসরি জড়িত বলে অভিযোগ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত ১১ সেপ্টেম্বরের আত্মঘাতী বিমান হামলার পর ওসামা বিন লাদেন যদি মুসলিম বিশ্বে নায়ক হিসেবে পরিচিত হন তাহলে ৭ অক্টোবর আফগান যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিয়ে খলনায়কে পরিণত হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। প্রেসিডেন্ট বুশের লাদেনবিরোধী 'ক্রুসেড' এখন ইসলামের বিপক্ষে চলে গেছে বলা চলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৩ তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে বুশের দায়িত্ব গ্রহণটা ছিল নাটকীয়। বুশ ১৯৪৬ সালের ৬ জুলাই টেক্সাসের মিডল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট বুশ ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তেল-গ্যাসের ব্যবসা করেছেন। ১৯৮৮ সালে বাবা জর্জ বুশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়ে ডব্লিউ বুশ রাজনীতিতে আসেন। পরে ১৯৯৪ সালে তিনি টেক্সাসের গভর্নর নির্বাচিত হন। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার সময় বুশ এবং তার পরিবার ফ্লোরিডার এক পরমাণু বাংকারে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। আত্মঘাতী হামলার পর বুশ এর জন্য সরাসরি বিন লাদেনকে দায়ী করে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বুশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মুসলিম সংগঠনের তহবিল ফ্রিজ করেছেন। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধ পরিচালনায় বুশ ওয়ার ক্যাবিনেট গঠন করেছেন। এছাড়া লাদেনকে অভিযুক্ত করে বুশ সম্প্রতি একটি ভিডিও টেপও প্রকাশ করেছেন। যদিও মুসলিম বিশ্বে এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। ❑

নভেম্বর '০১

লেখক : সাংবাদিক।

www.pathagar.com

আফগানিস্তান ঃ রক্তাক্ত প্রান্তরে শান্তির মায়া মরীচিকা

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

ক. চিরস্বাধীন আফগানিস্তান এখন রক্তাক্ত প্রান্তর। বিগত প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে পরাশক্তির পরাক্রম আর অভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত আফগানিস্তান। দুই কোটি আফগান জনগণ ১৯৭৯ থেকে আজ অবধি মৃত্যু, ক্ষুধা, হাহাকারে হতচকিত। একদা কাশ্মীরের মত কথিত বৈচিত্র্যময় ভূস্বর্গ আফগানিস্তান এখন বোমারু বিমানের পরিত্যক্ত বর্ষণ ক্ষেত্র। আফগান মাটির যে কোন অংশ পর্বতশৃঙ্গ, গিরিবর্ত, অগম্য গুহা, হ্রদ অথবা সমতল ভূমি সর্বত্রই যুদ্ধের বিভীষিকা। উত্তরের তাজাক, কাজাক, উজবেক অথবা দক্ষিণের গরিষ্ঠ পাখতুন জনগণ সকলেই দিশেহারা। লক্ষ লক্ষ মানুষ আশ্রয় নিয়েছে প্রতিবেশী পাকিস্তান, ইরান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান অথবা উজবেকিস্তানে। পৃথিবীর ভূরাজনীতির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আফগানিস্তানের অবস্থান। সে কারণেই প্রাচীনে আর্য-অনার্য, হিন্দু-মুসলিম, জার-বৃটিশের সংঘাতের চারণভূমি হিসেবে দলিত-মথিত হয়েছে আফগানিস্তান। তবুও কারাকোরাম হিন্দুকুশের দৃঢ় শাসক মোহাম্মদ ঘোরি, সুলতান মাহমুদ, আহমাদ শাহ আবদালী অথবা পশতুন দূররাণী উচ্চারণ করেছেন সেই শাশ্বত স্বাধীনতার বাণী ঃ 'শির দেগা নেহি দেগা আমামা'।

খ. চিরস্বাধীন অথচ চিরসংঘাতের এই জনপদ গত সপ্তাহে অতিক্রান্ত করেছে আর এক পালাবদল। পতন হয়েছে মৌলবাদী অভিধায় অভিযুক্ত তালেবান সরকারের। পালিয়ে গেছে মোল্লাতন্ত্রের যথার্থ প্রতিভূ মোল্লা ওমর। পাঁচ বছর পর রাজধানী কাবুলে ফিরে এসেছেন পাশ্চাত্য স্বীকৃত আফগান প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট বোরহান উদ্দিন রাব্বানী। অবশ্য তাদের এই ফিরে আসার কৃতিত্ব তাদের নয়।

সোভিয়েত প্রত্যাহারের অব্যবহিত পরে গোত্র আর বর্ণগত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ক্ষত-বিক্ষত যে আফগানিস্তান সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল পাশ্চাত্য, একটি ঘটনা তাদেরকে আবার আফগানমুখী করে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ঘটনায় টনক নড়ে যুক্তরাষ্ট্রের। সোভিয়েত বিরোধী যুগে যে ওসামা বিন লাদেনকে লালন করেছেন তারা তাকেই মনে করা হয় প্রধান সন্দেহভাজন। সেই সন্দেহভাজন তালেবান

www.pathagar.com

সরকারের অঘোষিত অভিভাবক হিসেবে অবস্থান করছিলেন আফগানিস্তানে। শুধুমাত্র সন্দেহের বসে অভিযুক্ত লাদেনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করে তালেবান সরকার। সুতরাং মার্কিন পরাশক্তির জন্য 'মারাত্মক ক্ষতিকর' লাদেনকে 'জীবিত অথবা মৃত' পাবার জন্য খুব স্বাভাবিকভাবে 'জলে স্থলে অন্তরীক্ষে' আক্রমণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাঘে-মোষের যুদ্ধে উলু-খাগড়ায় পরিণত হয় আফগান জনগণ। পৃথিবীর অধিকাংশ যুদ্ধ যেমন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে সম্ভব হয়েছে তেমনি আফগান যুদ্ধে এই মার্কিন বিজয়ও সম্ভব হয়েছে তালেবান প্রতিপক্ষ উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কারণে। ১৯৯৬ সালে তালেবানরা যখন কাবুল দখল করে নেয় তখন তালেবান বিরোধী জোট উত্তর দিকে সরে যায় এবং প্রতিবেশী দেশসমূহে বিশেষত উজবেকিস্তানের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করে। সাম্প্রতিক আক্রমণে মার্কিন জোট উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে সর্বাত্মক সহায়তা দেয়। বিগত ৪৫ দিনের বেপরোয়া নির্বিচার নির্মম বোমা হামলা তালেবানদের বিপর্যস্ত করে তোলে। উপরন্তু মাটিতে যুদ্ধরত উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে বোমারু বিমানের অপ্রতিহত অব্যাহত সহায়তা দিয়ে অতি অল্পদিনেই কাবুল পৌঁছে দেয় মার্কিন মিত্রশক্তি।

কিন্তু এখনও তালেবানরা ঘিরে রয়েছে দক্ষিণ অঞ্চল। অসংখ্য পাহাড়-পর্বত অধ্যুষিত দক্ষিণ অঞ্চল থেকে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করবে তালেবানরা-এ ধারণা সকল যুদ্ধ বিশারদের। তাই গুহায় গুহায়, পর্বতগাত্রে-উপত্যকায় দুর্বার হামলা চালাচ্ছে মার্কিন মিত্র পক্ষ। বিমান হামলার সাথে সাথে পরিচালিত হচ্ছে স্থলযুদ্ধ। মার্কিন-বৃটিশ কমান্ডো নেমেছে ঐসব এলাকায়। ওসামা বিন লাদেনকে তাদের চাই-ই চাই। সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে লাদেন ধরা দেবেন না বরং মৃত্যুকে বরণ করবেন। পর্যবেক্ষকরা বলছেন লাদেনকে ধরা অত সহজ নয়। আবার কেউবা বলছেন, তিনি পালিয়ে গেছেন পাকিস্তান, কাশ্মীর বা চেচনিয়ায়। কিন্তু পৃথিবীর শক্তিধররা তাঁর জন্য ছোট করে ফেলতে চায় পৃথিবীকে। যেখানে লাদেন সেখানেই প্রত্যাঘাত। সুতরাং কে যেচে নেবে মার্কিন আগ্রাসন ?

গ. আফগানিস্তানের কৌশলগত অবস্থানই দেশটিকে শান্তিতে বসবাস করতে দেবে না। মধ্য এশিয়ার এবং দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থলে অবস্থান হওয়ার কারণে একে ঘিরে রয়েছে হাজার স্বার্থ শত সমীকরণ। পাকিস্তানের গ্যাস রফতানীর জন্য আফগানিস্তানে তার সমর্থিত সরকার প্রয়োজন। তাই তালেবানকে মদদ দিয়ে দাঁড় করিয়েছে পাকিস্তান। ইরান আদর্শিক কৌশলগত এবং এথনিক কারণে তালেবানকে পছন্দ করে না। উত্তরঞ্চলীয় জোটের প্রতি রয়েছে তাদের অনুক্ত সমর্থন। তাজাকিস্তান তাজাক গোত্রীয় স্বার্থে তাজাক সমর্থিত উত্তরঞ্চলীয় জোটকে সমর্থন দিচ্ছে। বাম ঘেঁষা উজবেকিস্তান ঘরের কাছে মোল্লামন্ত্র চায় না। রাশিয়া পুরনো ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চায় উত্তরাঞ্চলীয় জোটের মাধ্যমে। পাকিস্তান তালেবান পক্ষে থাকলেও মার্কিন হুমকির মুখে নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তালেবানকে আর সমর্থন দিতে পারছে না। ভারত বরাবরই কাশ্মীর সংলগ্ন আফগানিস্তানে বৈরী তালেবান বিরোধী। সুতরাং 'দশ চক্রে ভগবান ভূত'। সবার সাধারণ শত্রুতে পরিণত হয়েছে তালেবানরা।

ঘ. তালেবান পরাজয়ের পর আফগানিস্তানে শান্তি চায় সবাই। কিন্তু নিজের মত করে। জাতিসংঘ প্রতিনিধি লাখদার ইব্রাহিমী সকল জাতিগোষ্ঠী সমন্বয়ে একটি জাতীয় সরকার

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছেন। পাশ্চত্যের সমর্থনপুষ্ট ইব্রাহিমি ৩০ বছর আগে পদচ্যুত বাদশাহ জহির শাহকে ফিরিয়ে আনতে চান-জাতীয় ঐক্যের প্রতিভূ হিসেবে। প্রেসিডেন্ট রাব্বানী এর মাঝে নিজের ক্ষমতা হারানোর আলামত দেখছেন। পাকিস্তান চাপ দিচ্ছে প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারে তালেবান অন্তর্ভুক্তির জন্য তাদের যুক্তি ঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ পাখতুন সমর্থিত তালেবানদের বাদ দিয়ে আফগানিস্তানে স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

এছাড়া রাজনৈতিকভাবে বহুধাবিভক্ত আফগানিস্তান। গোত্র তথা জাতিগত বিরোধ আফগান মানচিত্রকে অসংখ্য খণ্ড-বিখণ্ড করে রেখেছে। উত্তরাঞ্চলীয় জোটে রয়েছে পরস্পর শত্রুতা-ভাবাপন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহ। তারা জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশ। বৃহত্তর এথনিক গোষ্ঠীরা পাখতুন। এরা পাকিস্তান সংলগ্ন পশতু ভাষাভাষী। তালেবানদের প্রতি তাদের সমর্থন এতটাই নিরঙ্কুশ যে, প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারে পাখতুন প্রতিনিধিত্বের জন্য গোত্র 'নেতা' পাওয়া যাচ্ছে না।

৬. এই অনৈক্য আর দুর্বলতার সুযোগে পাশ্চাত্য সেখানে স্থায়ী সেনাছাউনি ফেলার উদ্যোগ নিচ্ছে। জাতিসংঘের নামে বা যুদ্ধবিরতির নামে বা শান্তির নামে সেখানে শ্বেতকায়দের উপস্থিতি কিছুকালের মধ্যে আবার অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেবে। বিবর্তনময় ইতিহাসের ধারায় ফিরে আসবে আবার তালেবানদের মত শক্তি আর ওসামা বিন লাদেনের মত নেতা। সুতরাং আফগানিস্তানের ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত প্রান্তরে শান্তির অন্বেষা মায়া-মরীচিকার মত তাড়িয়ে বেড়াবে সকলকে হয়তো বেশ কিছুকালের জন্য। ❑

নভেম্বর' ০১

প্রফেসর, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসন

এবনে গোলাম সামাদ

আজকের আফগানিস্তানের সীমানা ইংরেজের সৃষ্টি। ইংরেজরাই প্রথম আফগানিস্তানকে একটা বাফার (Buffer) রাজ্য হিসেবে গঠন করে। রাশিয়ার এই অগ্রগতিকে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিরোধের লক্ষ্যে ইংরাজ সৃষ্টি করে আজকের আফগানিস্তান। মুঘল আমলে আফগানিস্তান একটা আলাদা রাজ্য ছিল না। ছিল মুঘল সাম্রাজ্যেরই অংশ। ইংরাজ শাসনামলে আফগানিস্তান পায় তার বর্তমান স্বাতন্ত্র্য। একটা পৃথক রাজ্য হিসাবে।

আফগানিস্তান এক ভাষাভাষী মানুষের রাজ্য নয়। তিনটি ভাষা চলে আফগানিস্তানে। পশতু, ফারসী আর এক প্রকার তুর্কী। এই তুর্কী আর ফারসী ভাষা বলে প্রধানত উত্তরে। ফারসী তাজিকদের ভাষা। এছাড়া আফগান সম্ভ্রান্ত পরিবারেরও ভাষা।

আফগানিস্তানের শাসকরা ফারসী ভাষার মাধ্যমেই চালিয়েছে শাসনকার্য। যেমন শাসনকার্য চালিয়েছেন, মুঘল সম্রাটরা ফারসী ভাষার মাধ্যমে এই উপমহাদেশে। যে 'নর্দার্ন অ্যালায়েন্স'-এর কথা এখন আমরা যথেষ্ট শুনছি, তা মূলত ফারসী ভাষী তাজিক আর তুর্কী ভাষী তুর্কমেনদের নিয়ে গঠিত। আফগানিস্তানের প্রধান জনগোষ্ঠী হল পশতু ভাষী পাঠান। পাঠানরা বাস করে দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানে। পাঠানরা বাস করে পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও। অর্থাৎ পাঠানরা ভাগ হয়ে আছে দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে। আজকের পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমারেখাকে বলে ডুরান্ড লাইন (Durand line) যা রচিত হয় ১৮৯২ খৃস্টাব্দে। যে নির্বাসিত রাজা জহির শাহকে (জন্ম ১৯১৪) রোম থেকে ফিরিয়ে এনে এখন আফগানিস্তানের সমস্যা সমাধানের কথা অনেকে বলছেন, তিনি ১৯৬০ এর দশকে তোলেন পাকতুনিস্তানের দাবী। তিনি মানতে চান না ডুরান্ড রেখাকে পাক-সীমান্ত হিসাবে।

এখন তালেবানদের দমন করবার চেষ্টা করা হচ্ছে 'নর্দার্ন এলায়েন্স' এর সাহায্যে। কিন্তু উত্তরের তাজিক ও তুর্কমেনদের সঙ্গে পাঠানদের সম্বন্ধ বহুকাল থেকেই ভাল নয়। নর্দার্ন এলায়েন্স অনিবার্যভাবেই সৃষ্টি করতে বাধ্য রাজনৈতিক জটিলতা। ইঙ্গো-মার্কিন নীতি তাই আফগানিস্তানে বাড়াতে যাচ্ছে আরও আরও সংঘাত। আর পাকিস্তান করছে ইঙ্গ-মার্কিন এই পরিকল্পনার বিশেষ বিরোধিতা। পাকিস্তান কখনই আফগানিস্তানে একটা

www.pathagar.com

পাকিস্তান বৈরী সরকারের প্রতিষ্ঠাকে মেনে নিতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন প্রথম বলেছে, তাদের লক্ষ্য হল সন্ত্রাস দমন। কিন্তু বর্তমানে মনে হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন চাচ্ছে আফগানিস্তানে তাদের একটি আজ্ঞাবহ সরকারের প্রতিষ্ঠা। আর সেটা করলে, আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ বন্ধ হবে না। চলতেই থাকবে। কারণ, কোন নর্দার্ন এলায়েন্স কর্তৃক পরিচালিত সরকার সহ্য করতে পারবে না পাঠানরা।

আজকের বিশ্ব রাজনীতিতে পেট্রোলিয়াম একটা বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। সমস্ত উত্তর আফগানিস্তানের মাটির নিচে পেট্রোলিয়াম আছে। আফগানিস্তানের এই তেল তুলবার জন্য ভবিষ্যতে মার্কিন কোম্পানীরা চাইতে পারে পুঁজি বিনিয়োগ করতে। অর্থাৎ, যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলছে, কেবলমাত্র দমনই তার লক্ষ্য, কিন্তু বাস্তবে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ায় মার্কিন পুঁজিপতিদের দৃষ্টি পড়ছে তেলের জন্য অর্থাৎ কেউ বলতে পারে না শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কি দাঁড়াবে। সন্ত্রাস ধ্বংসের নামে হয়ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছে এই অঞ্চলে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। তেল তার অন্তিম লক্ষ্য। কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমনের জন্যই মার্কিন শাসকগোষ্ঠী আফগানিস্তানে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে, এমন ভাববার কোন কারণ নেই। এর মধ্যে হতে পারে, কাজ করছে এক দূরপ্রসারী পরিকল্পনা। তাই মার্কিন নীতি বিচারের সময়, কেবলমাত্র সন্ত্রাস দমনকেই একমাত্র বিচার্য বলা যায় না। যদিও সেটাকেই এখন লক্ষ্য হিসাবে তুলে ধরবার জোর চেষ্টা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের পক্ষ থেকে। বৃটেনের অবশ্য অন্য উদ্দেশ্যও আছে। বৃটেনের ছিল বিরাট সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য হারানোর বেদনা এখনও সরে যায়নি তার মন থেকে। বৃটেন চাচ্ছে, মার্কিন সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বে তার সাবেক কর্তৃত্বের কিছুটা ফিরে পেতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সে তাই দিচ্ছে সক্রিয় সমর্থন। এর পশ্চাতে কাজ করছে তার সেই সাবেক সাম্রাজ্যবাদী চেতনা। কেবলই 'সন্ত্রাস' দমনের উদ্দেশ্য নয়। সন্ত্রাসীরা এ পর্যন্ত বৃটেনের উপর কোন হামলাই করেনি। কিন্তু বৃটেন দিচ্ছে বর্তমান আফগান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভূমিকা। মনে হয়, এ ব্যাপারে ইংরেজী ভাষাভাষী বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র যেন একটি দেশে পরিণত হয়ে পড়েছে। আফগানিস্তানে কেবল যুদ্ধ শুরু। কেউ বলতে পারে না, এ যুদ্ধ কি রূপ নিতে যাচ্ছে। তবে অতীতে পাঠানদের হাতে আফগানিস্তানে পরাজিত হয়েছিল বৃটেন। আফগানিস্তান পাহাড়ী দেশ। শীতে সমস্ত উত্তরাঞ্চল জুড়ে যথেষ্ট বরফ পড়ে। প্রাকৃতিক কারণে এই অঞ্চলে যুদ্ধ করা সহজ নয়। আর ক'দিন পরই আফগানিস্তানের উত্তরে আরম্ভ হবে তুষার ঝরা। আফগানিস্তানের অধিকাংশটাই সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০০০ ফিট উঁচু। আফগানিস্তানের পর্বমতালা ১৫,০০০ ফিট অথবা তার চেয়েও উঁচু। এই অঞ্চলে যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনকে, যুদ্ধ প্রলম্বিত হলে স্বীকার করতে হবে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি। ভিয়েতনামের চাইতেও অনেক কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে এখানে। যুদ্ধ প্রলম্বিত হলে পাকিস্তান জুড়ে সৃষ্টি হতে পারে একটা বিরাট রণক্ষেত্র। আফগানিস্তান আর পাকিস্তান, উভয় রাষ্ট্রেই আছে পাঠানদের বাস। পাঠানরা রণনিপুন জাতি। এখন বিশ্বের সমস্ত মুসলিম অধ্যুষিত দেশে সৃষ্টি হচ্ছে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার বিরূপ প্রতিক্রিয়া। মালয়েশিয়ায় মাহাথীর মুহাম্মদ করেছেন আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার তীব্র সমালোচনা। যদিও ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট মেঘবতী সুকর্ন পুত্রী প্রেসিডেন্ট বুশকে প্রদান করেছিলেন সাহায্যের বিশেষ প্রতিশ্রুতি, কিন্তু তিনি এখন তার দেশের

www.pathagar.com

জনমতের চাপে বলছেন ভিন্ন কথা। বিশ্ব রাজনীতিতে হতে যাচ্ছে বিশেষ মেরুকরণ। বাংলাদেশ সরকারকেও চলতে হবে সাবধানে। এদেশের মুসলিম মনেও জেগে উঠেছে মার্কিন বিরোধী প্রতিক্রিয়া। দেশের নতুন সরকারকে বুঝতে হবে এর স্বরূপ। কেবল 'মুসলিম বিশ্বের নয়, সারা বিশ্বেই উদারমনা ব্যক্তিরা প্রশ্ন তুলছেন মার্কিন নীতি নিয়ে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলছেন, যারা তার নীতিতে সায় দেবেন না তারা সবাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু। তার এই উক্তির বাস্তব অর্থ হচ্ছে, বিশ্বের সব রাষ্ট্রকেই চলতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক নির্দেশে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশ, একমাত্র বৃটেন ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কর্তৃত্ববাদী মনোভাবকে মেনে নিতে পারে না। বিশেষ করে ফ্রান্স ও জার্মানী।

জার্মানীর রাস্তায় বেরিয়েছে বিরাট যুদ্ধ বিরোধী মিছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজকের বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিমান ও সম্পদশালী রাষ্ট্র। পক্ষান্তরে আফগানিস্তান একটা দরিদ্রতম দেশ। সেই দেশের উপর শক্তি প্রয়োগ করে বুশ প্রশাসন যেভাবে উল্লাস প্রকাশ করছেন, তা সত্যিই ঘৃণাবহ ব্যাপার। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেসব অস্ত্র ব্যবহার করছে, তা শিল্প-সমৃদ্ধ দেশকে ধ্বংস করবার ক্ষেত্রে যতটা কার্যকরী, আফগানিস্তানের মত দেশকে তা নয়। আফগানিস্তানে বড় শহর নেই। নেই কলকারখানার অর্থনীতি। মানুষ সে দেশে বাস করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বোমা মেরে তাই তাদের উড়িয়ে দেয়া যাবে না। দেশটাকে জয় করতে হলে সৈন্য ঢোকাতে হবে। আকাশ থেকে নামাতে হবে ছত্রীসেনা (পারাট্রুপার) অনুমান করা চলে, কাজটা খুব সহজ হবে না।

ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার স্থল ও আকাশ ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। তাই তার মধ্য দিয়ে মার্কিন সেনাবাহিনী আসবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। পক্ষান্তরে পাকিস্তান থেকে বোলাম, গোমাল এবং খাইবার গিরিপথের মধ্য দিয়ে সৈন্য এবং রসদ নেয়া সহজ নয়। একমাত্র ভরসা 'নর্দার্ন অ্যালায়েন্স'। উত্তর থেকে আক্রমণ। আপাতত রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু সেজেছে। চীনও বলছে সন্ত্রাসবাদ দমনের কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এরা কেউ চাইবে না আফগানিস্তানে মার্কিন প্রতিপত্তি। এরা কেউই চাইতে পারে না তাদের সীমান্তের ধারে মার্কিন উপস্থিতি। যুদ্ধ প্রলম্বিত হলে, রুশ-চীন মনোভাব অনেকভাবে বদলে যেতে পারে।

তালেবানরা জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তারা কঠোর ইসলামপন্থী। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বামপন্থীদের একাংশ হয়ে উঠতে চাচ্ছেন যেন সহানুভূতি সম্পন্ন। কারণ তারা মনে করছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল হবার অর্থ দাঁড়াবে বিশ্বে পুঁজিবাদের পরাজয়। ইউরোপে গণতান্ত্রিক বামরা মিছিল করছে মার্কিন আগ্রাসনের সমালোচনা করে। এমন কি কলিকাতার পথে সিপিএমকে মিছিল করতে দেখা গেল মার্কিন নীতির বিপক্ষে। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার সমর্থন করছেন না তারা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ আর বিলাতের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলছেন, তাদের যুদ্ধ ইসলামের বিপক্ষে নয়, কেবলমাত্র সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত বিখ্যাত Foreign Affair নামক পত্রিকায় ১৯৯৩ সালের গ্রীষ্মকালীন সংখ্যায় "Clash of civilizations" (সভ্যতার সংঘাত) নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি লেখেন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যামুয়েল হানটিংটন। এতে তিনি

www.pathagar.com

প্রমাণ করতে চান ঃ বিশ্ব রাজনীতিতে এখন আর জাতি-রাষ্ট্রের প্রাধান্য থাকতে যাচ্ছে না। তা নিয়ন্ত্রিত হতে যাচ্ছে সভ্যতার সংঘাতের দ্বারা। হানটিংটন বর্তমান বিশ্বের মানবসমাজকে আটটি, সভ্যতায় বিভক্ত করেছেন। তিনি অভিমত প্রদান করেছেন, এই আটটি সভ্যতার মধ্যে আপাতত ইসলাম ও ইউরো-আমেরিকান সভ্যতার মধ্যে সংঘাত প্রাধান্য পেতে যাচ্ছে। নিকট ভাবিষ্যতে এই সংঘাতকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে বিশ্ব রাজনীতি। হানটিংটন-এর এই থিসিস-এর উপর মন্তব্য করতে যেয়ে বিলাতের বিখ্যাত সাপ্তাহিক Economist পত্রিকায় ৬ আগস্ট ১৯৯৪-এর সংখ্যায় বলা হয়, ইউরো-আমেরিকান সভ্যতা বলতে হানটিংটন যা বোঝাতে চাচ্ছেন, তার ভিত্তি হলো এক চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণা। এখানে ব্যক্তিকে দেবার চেষ্টা চলেছে এক লাগামছাড়া স্বাধীনতা। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যার তাৎপর্য হলো রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণবিহীন বাজার অর্থনীতি। কিন্তু ইসলাম চেয়েছে এবং চায় অর্থনীতির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। এদিক থেকে বাম চিন্তার সঙ্গে আছে তার আদর্শিক মিল। তাই ইসলাম এর ইউরো-আমেরিকান সভ্যতার মধ্যে যদি সত্যিই তেমন কোন সংঘাত বাধে, তবে সারা বিশ্বে বামপন্থীদের একাংশের সমর্থন শেষ পর্যন্ত ঝুঁকে পড়বে ইসলামেরই প্রতি। তথাকথিত মুক্তবাজার গণতন্ত্রের দিকে নয়। বিশ্ব রাজনীতির ধারা যেন এখন পেতে যাচ্ছে কতকটা এরকমই একটা ছক। আমরা এখন দেখছি, আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পর সারাবিশ্বের বাম রাজনীতিকদের এক অংশ সোচ্চার হয়ে উঠেছেন মার্কিন বিরোধিতায়। বুশ বলেছেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। যারা সন্ত্রাস করে তারা আসলে প্রকৃত ইসলামের অনুসারী নয়। ইসলাম অবশ্যই শান্তির ধর্ম। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, "আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না (সূরা বাকারা)।" কিন্তু কুরআন শরীফে একথাও বলা হয়েছে, আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা যাবে। বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ ন্যায়সঙ্গত। ভুলে গেলে চলে না, ইসলামের নবী প্রয়োজনে নিজেই অসি হাতে যুদ্ধ করেছেন। দেশ হিসাবে আফগানিস্তান কখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করতে যায়নি। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানকে আক্রমণ করে বসেছে। সে এই আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে জাতিসংঘের কোন অনুমোদন না নিয়েই। কোন আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা করছে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর তার তল্পিবাহক গ্রেট বৃটেন। ❑

নভেম্বর '০১

নৃবিজ্ঞানী, গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

বন্দী তালিবান হত্যা ঃ এক নজিরবিহীন বর্বরতা

মুন্‌শী আবদুল মাননান

মার্কিন বিমান থেকে তিনদিন ধরে বোমা হামলা চালিয়ে মাজার-ই-শরীফের কালা-ই-জঙ্গী কারাগারে আটক ছয়শ' তালিবান বন্দীর সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এরূপ প্রকাশ্যে পারিকল্পিতভাবে বিমান হামলা চালিয়ে যুদ্ধবন্দী হত্যার ঘটনা নজিরবিহীন । হামলার ধরন ও প্রকৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে, তাদের হত্যা করার জন্যই এই বর্বরোচিত হামলা পরিচালিত হয়। এই নৃশংসতার কোন তুলনা হয় না।

দুর্জনের ছলের কোন অভাব হয় না। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ঘাতকচক্রের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, বন্দী তালিবান যোদ্ধারা নাকি উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনীর সৈন্যদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। উভয় পক্ষের মধ্যে মর্টার ও মেশিনগানের গুলী বিনিময় হয়। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, তালিবান বন্দীদের হাতে ৫০ জন উত্তরাঞ্চলীয় সৈন্য নিহত হয়। বলা হয়েছে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক উপদেষ্টাদের সহায়তায় উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনী তালিবান বন্দীদের ওপর হামলা চালাতে থাকে। এতে কাজ না হওয়ায় কারাগারের ওপর মার্কিন এসি-১৩০ বিমান থেকে বোমা হামলা শুরু করা হয়। একটানা তিনদিনের বিষাক্ত বোমা হামলায় বন্দী তালিবান যোদ্ধারা সবাই প্রাণ হারায়।

'যত দোষ নন্দ ঘোষ', বলে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে। ঘটনার কারণ ও বিবরণ যা পেশ করা হয়েছে, তাতে সেই নন্দ ঘোষকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। ছয়শ' বন্দী তালিবান যোদ্ধা মারা গেছে যুগপৎ উত্তরাঞ্চলীয় বাহিনী ও মার্কিন বিমান হামলায়। অথচ তাদের মৃত্যুর জন্য তাদেরই দায়ী করা হয়েছে।

ঘটনার যে কারণ ও কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তালিবান যোদ্ধাদের যখন বন্দী করা হয়। তখন নিয়মানুযায়ী তাদের নিরস্ত্র করা হয়। নিরস্ত্র যোদ্ধাদেরই পক্ষে অস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। প্রহরীদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে উত্তরাঞ্চলীয় জোট সৈন্যদের হত্যা করা কিংবা একটানা কয়েকদিন কারাগার নিয়ন্ত্রণ করা কি বন্দী তালিবান যোদ্ধাদের পক্ষে সম্ভব ? আর পর্যাপ্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ যদি তারা সংগ্রহই করতে পারে, তবে কারাগারের মধ্যে নিজেদের আটকে রাখবে কেন ? তাদের তো বাইরে বেরিয়ে

www.pathagar.com

আসার কথা। এমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি যে, তালিবান বন্দীরা সশস্ত্র অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে এসে কাউকে হামলা করেছে। কারাগারের বাইরে বিমান হামলার কোন খবরও পাওয়া যায়নি। এতে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তালিবান বন্দীরা কারাগারের অভ্যন্তরে ছিল এবং সেখানেই তাদের বিমান হামলা করে হত্যা করা হয়েছে। তালিবান যুদ্ধবন্দীদের সবাইকে হত্যা করাই ছিল এ হামলার লক্ষ্য এবং তা ষোল আনাই অর্জিত হয়েছে।

যেহেতু তাদের এমন এক প্রক্রিয়ায় হত্যা করা হয়েছে, যা মানবাধিকার, যুদ্ধনীতি ও আন্তর্জাতিক কানুনের খেলাপ, সুতরাং একটা অজুহাত দাঁড় করানো হয়েছে। যুদ্ধবন্দীরা যে কোন বিবেচনায় উপযুক্ত নিরাপত্তার অধিকারী। তাদের হত্যা করার সুযোগ বা বৈধ অধিকার প্রতিপক্ষের নেই। তালিবান যুদ্ধবন্দীরা সযত্ন নিরাপত্তা লাভের অধিকার পেয়েছিল বন্দী হওয়ার পর পরই। এই অধিকার শুধু লংঘনই করা হয়নি, তাদের হত্যা করে এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে, যা বিশ্ব প্রেক্ষাপটে উদ্বেগজনক। বিবেকবান ও শান্তিবাদী মানুষ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতি কখনই সমর্থন জানাতে পারে না।

এর আগে আরেক ঘটনায় কয়েকশ' যোদ্ধার মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল। তখনই প্রশ্ন উঠেছিল ঃ তারা কি যুদ্ধে নিহত হয়েছে নাকি তাদের হত্যা করা হয়েছে ? এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। কারাগারে হত্যাকাণ্ডের পর প্রতীয়মান হচ্ছে, তাদেরও হয়তো হত্যা করা হয়েছিল। উভয় হত্যাকাণ্ড পরিকল্পিতভাবে ও ঠাণ্ডা মাথায় করা হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে অনুরূপ হত্যাকাণ্ড আরও সংঘটিত হতে পারে। ইঙ্গ-মার্কিন-উত্তরাঞ্চলীয় জোট চক্র যে কোন মূল্যে আফগানিস্তানকে তালিবানমুক্ত করতে চায়া, এ বিষয়ে সম্ভবত এখন আর কোন সন্দেহ নেই।

আফগানিস্তান পরিস্থিতিতে উত্তরাঞ্চলীয় জোট কোন নিয়ামক শক্তি নয়। ইঙ্গ-মার্কিন হানাদারদের শিখণ্ডি হিসেবেই তারা কাজ করছে বা ব্যবহৃত হচ্ছে। যা কিছু পরিকল্পনা ও কাজ, ইঙ্গ-মার্কিন হানাদাররাই করছে। হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে উত্তরাঞ্চলীয় জোট। কেন ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আফগানিস্তানকে তালিবানমুক্ত করতে চায়, তার বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা অনেক হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তালিবান আফগানিস্তানে ঐক্য-সংহতি, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় উন্নয়ন অগ্রগতির প্রতীক। তারা ঐক্যবদ্ধ, সুদৃঢ়, সমৃদ্ধ ও ইসলামী আফগানিস্তান গঠনে নিয়োজিত। যে কোন আগ্রাসন, উপনিবেশবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরোধী তারা। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আফগানিস্তানকে কব্জাবদ্ধ করতে চায় এবং এর মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। দ্বিতীয়তঃ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইসলামেরও ঘোর বিরোধী। ইসলামী আফগানিস্তানের অস্তিত্ব তার একেবারেই কাম্য নয়। বিভক্ত-বিক্ষুব্ধ, সংঘাতপূর্ণ, দুর্বল ও ধর্মনিরপেক্ষ আফগানিস্তান প্রতিষ্ঠাই তার উদ্দেশ্য। এ সকল উদ্দেশ্য সাধনের পথে তালিবানই 'পথের কাঁটা'। কাজেই, যে কোন মূল্যে ও প্রক্রিয়ায় তাদের নির্মূল করা হবে এবং এখন চলছে সেই নির্মূল অভিযান। দৈনিক ইনকিলাবের বিশেষ সংবাদদাতা মোবায়েদুর রহমান ক'দিন আগে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সফর করে এসেছেন। তার কিছু রিপোর্ট ইতোমধ্যেই দৈনিক ইনকিলাবে

www.pathagar.com

প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তার একটি উপসম্পাদকীয় নিবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সরেজমিনে আফগান যুদ্ধ ও যুদ্ধজনিত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এসে যা লিখেছেন ও বলেছেন তাতে বহু ব্যতিক্রমী ধারণা ও চিত্র বেরিয়ে এসেছে। আফগানিস্তান প্রসঙ্গে তার তিনটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি, যা থেকে তিনটি চিত্র বেরিয়ে আসবে।

এক ঃ আমি জানতে পেরেছি, তালিবানের কাছে যে অস্ত্র রয়েছে সেই অস্ত্র দিয়ে তারা অন্তত এক বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবেন। আর এটি যদি গেরিলা যুদ্ধে রূপান্তরিত হয় তাহলে তারা বেশ কয়েক বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবেন।

দুই ঃ মার্কিন বিমান আগ্রাসন নর্দার্ন এলায়েন্সকে কাচের ঘর বানিয়ে দিয়েছে। সেখানে বসে তারা ছড়ি ঘোরাচ্ছে। যেদিন মার্কিন বিমান হামলা বন্ধ হবে সেদিন থেকে ১০ দিনের মধ্যে ঐ কাচের ঘর ঝনঝন করে ভেঙে পড়বে।

তিন ঃ আমি চমন পার হয়ে স্পিনবোল্ডাকে যাই। সেখানে দেখি এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য। শত শত তাঁবু খাটিয়ে বানানো হয়েছে শরণার্থী শিবির। খোলা প্রান্তরে হু হু বাতাস। সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে তাপমাত্র হিমাঙ্কের কাছে ১ ডিগ্রীতে নেমে এসেছে। মার্কিন আগ্রাসনের বদৌলতে লাখ লাখ নিরীহ আফগান আজ অনাহার, অপুষ্টি, বোমা হামলা এবং রক্ত হিম করা ঠাণ্ডায় মৃত্যুপথযাত্রী। এই অবস্থা পেশোয়ার পর্যন্ত সীমান্তজুড়ে। এ অবস্থা সারা আফগানিস্তানে।

এক ও দুই নম্বর উদ্ধৃতিতে আফগানিস্তানে তালিবানের শক্তি ও অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় মোবায়েদুর রহমান জানিয়েছেন, সাধারণ আফগানদের মধ্যে তালিবান শীর্ষনেতা মোল্লা ওমর ও ওসামা বিন লাদেনের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। আফগানিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশেরও বেশী পশতুন। তাদের শতকরা ৯৫ জনই তালিবান সমর্থক। অনুকূল সময় এলে তালিবানদের অগ্রাভিযান ও বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। তিন নম্বর উদ্ধৃতিতে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনে সাধারণ আফগান নাগরিকদের করুণ দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে।

তালিবানের শক্তি ও অবস্থান সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ওয়াকিবহাল নয়, এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। বস্তুত ওয়াকিবহাল বলেই হানাদারচক্র তালিবান যোদ্ধাদের নির্মূল অভিযানে নেমে পড়েছে। একই সঙ্গে আফগানিস্তানকে তালিবান-পূর্ব অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্যও তৎপর হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সংহতিবর্জিত, গৃহযুদ্ধ ও হানাহানিকবলিত আফগানিস্তানই তারা কায়েম করতে চাচ্ছে। চক্রের কার্যপ্রক্রিয়া থেকে এটা মনে হচ্ছে, তারা শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তানকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে ফেলতেও পারে। সাধারণ আফগানরাও জুলুম-নির্যাতন ও চরম মানবিক বিপর্যয়ের শিকার। এদিকে এই চক্রের কোন নজর নেই। তালিবান তো বটেই, সাধারণ আফগান জনগণও তাদের টার্গেট। কিছু হুকুমবরদার এবং আফগানিস্তানের মাটিই যেন তারা কামনা করছে।

ইঙ্গ-মার্কিন হানাদারও তাদের শিখণ্ডিরা যা চাইবে, তা-ই হবে, আফগানিস্তানের ইতিহাস তা সমর্থন করে না। এযাবৎ বহু ঝড়-ঝাপটায় আফগানিস্তান তার অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে। আফগান জনগণকে কোনভাবে অবদমিত করে রাখা যায়নি। পরাস্ত করা যায়নি। বর্তমান অবস্থা যেভাবে চলছে, সেভাবে চলবে বলে মনে হয় না। দৈনিক ইনকিলাবে

www.pathagar.com

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাবেক লেঃ জেনারেল হামিদ গুল এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তালিবান যোদ্ধারা তাদের রণকৌশল পরিবর্তন করেছে। আমেরিকার প্রচণ্ডতম বিমান হামলার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাণহানি এড়ানো এবং ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে স্থানীয় যুদ্ধে জড়িত করা। লেঃ জেনারেল (অবঃ) হামিদ গুল খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন, আসল যুদ্ধ শুরু হয়নি।। শিগগিরই প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হবে। এই যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী এবং ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই ইসলামী শক্তির বিজয় হবে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আরেক সাবেক জেনারেল ও প্রাক্তন সেনাপ্রধান আসলাম বেগ দৈনিক ইনকিলাবের সঙ্গে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে প্রায় অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরও একটি নতুন তথ্য দিয়েছেন। বলেছেন, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে পশতু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আড়াই কোটির ওপরে। আফগানিস্তানে তালিবানের নাম করে পশতুনদের ওপর হামলার ফলে পাক-আফগান পশতুনরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে।

পাকিস্তানের সাবেক এই দুই জেনারেলই পাকিস্তানের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতামত থেকে মনে হয়েছে, বিদ্যমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পাকিস্তানে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে পরিবর্তন আসতে পারে, এমন কি পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতিতে চিড় ধরার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেয়ার মত নয়।

আফগানিস্তানে যে 'খেলা' চলছে, তার এক সক্রিয় অংশীদার পাকিস্তানের বর্তমান সামরিক শাসকগোষ্ঠী। তালিবানের বিপর্যয়ে সামরিক শাসকগোষ্ঠীরও ভূমিকা রয়েছে। আফগান পরিস্থিতিতে এই শাসকগোষ্ঠী ইঙ্গ-মার্কিন সামাজ্যবাদকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের জনগণ এতে বিক্ষুব্ধ। সে দেশের অন্তত ৯০ শতাংশ মানুষ সামরিক শাসকগোষ্ঠীর ভূমিকাকে সমর্থন করে না। এর প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হতে পারে। জানা গেছে, প্রবাসী সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো ও তার দলকে ক্ষমতাসীন করার একটা প্রক্রিয়া চলছে। বেনজীর ভুট্টো সম্প্রতি ভারত সফর করেছেন। সেখানে তিনি তালিবানের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন এবং প্রকারান্তরে সামরিক শাসকগোষ্ঠীর ভূমিকাকে সমর্থন করেছেন। এও আভাস পাওয়া গেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও তালিবান-বৈরী সরকার পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে এবং তার পছন্দের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন বেনজীর ভুট্টো।

ঘটনাপ্রবাহের এই বিশ্লেষণ ও বিবেচনা থেকে সহজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আফগানিস্তানে শান্তি-স্থিতি সুদূরপরাহত। এই সূত্রে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও হয়ে উঠতে পারে বিবাদ ও সংঘাতপূর্ণ। নির্বিচারে তালিবান হত্যা কিংবা ক্ষুধা ও অনাহারে ফেলে সাধারণ আফগান হত্যার মাধ্যমে দুর্দমনীয় আফগান জাতিকে নির্মূল করা যাবে না। বিশ্ববাসী আফগান জাতির বিপুল ও ঐতিহাসিক বিজয় প্রত্যক্ষ করার জন্য এখন অপেক্ষা করতে পারে। ❑

ডিসেম্বর '০১
সাংবাদিক, কলামিস্ট।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে অন্তর্বর্তী সরকার এবং তেল সাম্রাজ্য

হায়দার আকবর খান রনো

আফগান যুদ্ধ এখন একেবারে শেষ পর্যায়ে। নতুন আফগান সরকার কি হবে তা নিয়ে বিশ্বের বড় বড় শক্তিগুলো আলোচনায় বসেছে এবং অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান কে হবেন তাও চূড়ান্ত করে ফেলেছে। আফগানিস্তানের ভবিষ্যত নিয়ে আমি এই নিবন্ধে আলোচনা করছি না। তালেবান সরকার ছিলো একটি বর্বর সরকার। তার পতনে আমাদের দুঃখ পাবার কিছু নেই। তবে নতুন সরকার গঠিত হলেও শিগগিরই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে তেমন কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে না, দুঃখ এটাই।

প্রথমে দেখা যাক এতো আড়ম্বর করে মার্কিনিদের যুদ্ধের প্রয়োজনটাই বা কি ছিলো। তালেবানদের তো এক সময় অস্ত্রেসজ্জিত করেছিলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। আর এখন সেই তালেবানদের উৎখাত করার জন্যে তাদের এতো তাগিদটাই বা কিসের ছিলো। মার্কিনিরা যে অজুহাত দেখিয়েছে, সেটা খুব বিশ্বাসযোগ্যতা পায় নি। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার সঙ্গে ওসামা বিন লাদেন কতখানি জড়িত, তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বুশ প্রশাসন দুনিয়াকে দেখাতে পারে নি।

যদিও পরবর্তীসময়ে প্রচার করা হয় যে, বিন লাদেনই ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার জন্যে স্বীয় দায়িত্ব স্বীকার করেছেন, তবু সন্দেহের অবসান ঘটে নি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অবশ্য বিশ্ববাসীকে তাদের আগ্রাসনের সপক্ষে কোনো যুক্তি দেখানোর ক্ষেত্রে কখনই কোনো আগ্রহ প্রকাশ করে নি। সামরিক শক্তি আছে, তাই যা খুশি তাই-ই করবো, এটাই হলো তাদের নীতি। একেই বলে সাম্রাজ্যবাদী নীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই কোরিয়া থেকে শুরু করে সর্বশেষ ইরাক, যুগোশ্লাভিয়া কোনো ক্ষেত্রে তারা নৈতিকতা, বিশ্ব জনমত বা আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নীতির ধার ধারে নি। আফগান যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। তাই এই যুদ্ধের পেছনে আসল কারণটা কী, তা বাংলাদেশের সচেতন মানুষের জানা দরকার।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী রাষ্ট্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের নামে আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালিয়েছে, তা দুনিয়ার সচেতন মানুষের কাছে পরিহাস বলেই মনে হয়েছে। মার্কিনি অনুকম্পার ওপর নির্ভরশীল বুদ্ধিজীবী,

www.pathagar.com

মিডিয়া বা রাজনীতিবিদরা যাই বলুক না কেনো, দুনিয়ার সচেতন মানুষ আফগানিস্তানে মার্কিনি আগ্রাসনের পেছনে অন্য কোনো অভিসন্ধি আছে বলেই ধরে নিয়েছে। সে মতলব কি তাও অপরিষ্কার নয়। আফগানিস্তানের পাশ দিয়ে যেসব মধ্য এশীয় দেশ রয়েছে, সেই সব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই এই যুদ্ধের লক্ষ্য ছিলো।

মার্কিন প্রশাসন মানবিক অধিকার, গণতন্ত্র বা সন্ত্রাসবাদ নির্মূল বা উচ্চতর মূল্যবোধ এসবের তোয়াক্কা করে না। তাদের চোখে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সংগ্রামই হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ আর তারা নিজেরা যে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড করে চলেছে, সেটা নাকি ন্যায়সঙ্গত। পৃথিবীতে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এটমবোমা নিক্ষেপ করেছে। তারাই আবার অন্যদের হাতে আণবিক অস্ত্র থাকাকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করে। মোট কথা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মুখের কথা বা বড় বড় বুলির সামান্যতম দাম নেই। আসলে মার্কিনি নীতি পরিচালিত হয় সেখানকার বড় বড় পুঁজিপতি গোষ্ঠী বা বহুজাতিক কর্পোরেশনসমূহের স্বার্থে। অপরিসীম লোভ মুনাফার তাগিদই হলো আসল কথা।

এ জন্যে তারা যুদ্ধ বাঁধায়, লাখ লাখ মানুষ খুন করতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করে না। এজন্যেই তারা অন্যান্য দেশে নাক গলায়, গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে, সব রকম পশ্চাৎপদতা, প্রতিক্রিয়াশীলতাকে উৎসাহিত করে। আফগানিস্তানে তালেবান ও অন্যান্য মৌলবাদী শক্তিকে তারাই মদদ দিয়ে এসেছে। কতিপয় পুঁজিপতি গোষ্ঠীর লোভ আর লোভ, মুনাফা আর মুনাফা; তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় মার্কিন প্রশাসনের নীতি, বিশেষ করে বৈদেশিক নীতি। আফগান যুদ্ধের পেছনেও কাজ করেছে অতিকায় পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সে সীমাহীন লোভ আর মুনাফার অপরিসীম লালসা। আমাদের জানা দরকার কোন সেই পুঁজিপতিগোষ্ঠী যার লালসার কাছে বলী হলো অসংখ্য নিরীহ আফগান। আমাদের আরো জানা দরকার, সুনির্দিষ্টভাবে এখানে মার্কিনি সেই পুঁজিপতিগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষাটা কী?

এ সম্পর্কে আরো আলোচনায় যাবার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়া প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবলু বুশ এবং উপরাষ্ট্রপতি ডিক চেনি দুজনেই একসময় মার্কিন বহুজাতিক তেল কোম্পানির উচ্চতর পদে কর্মরত ছিলেন। হ্যাঁ, তাদেরই স্বার্থে আফগান যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। অবশ্য অন্য কেউ রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি থাকলেও ভিন্নতর হবার সম্ভাবনা ছিলো না। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা যে কোনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রে সরকার প্রধানরা বাহ্যিকভাবে নীতি প্রণয়ন করলেও আসলে নীতি নির্ধারণ করে শক্তিশালী বুর্জোয়া গোষ্ঠী। এখানেও বহুজাতিক তেল কোম্পানির তেল সম্পদ দখল ও মুনাফার নিরিখেই সরকারি সিদ্ধান্ত তৈরি হয়।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর একই সঙ্গে দিয়ে যাই। তালেবান সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরপরই তালেবান কর্মকর্তাদের একটি দল মার্কিন বহুজাতিক তেল কোম্পানি ইউনিকলের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন। কী কারণে মার্কিনি পুঁজিপতিগোষ্ঠী ও মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে তালেবানদের সুসম্পর্ক নষ্ট হলো সে আরেক কাহিনী। এখন মার্কিন তেল কোম্পানীদের দরকার তাদের অনুগত একটা আফগান সরকার যাতে মধ্য এশিয়ার তেল সম্পদ তারা দখল করতে পারে। তাই এই যুদ্ধ এবং সে লক্ষ্যকে সামনে

www.pathagar.com

রেখেই প্রাক্তন বাদশাহ জহির শাহের একান্ত অনুগত একজনকেই অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান করা হয়েছে। আফগানিস্তানকে ঘিরে কয়েকটি মধ্য এশীয় দেশে রয়েছে প্রচুর খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ। এই দেশগুলো হচ্ছে তুর্কমেনিস্তান, কাজাকিস্তান, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান ইত্যাদি। কাস্পিয়ান সাগর ও তার উপকূলবর্তী অঞ্চলেও সঞ্চিত রয়েছে যথেষ্ট তেল সম্পদ। কাজাকিস্তানের মাটির তলায় যে তেল রয়েছে তার পরিমাণ নাইজেরিয়া বা লিবিয়ার চেয়ে বেশি। তুর্কমেনিস্তানে রয়েছে বিপুল প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ। এইসব দেশ ইতিপূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তাদের তেল কোম্পানিগুলো ওদিকে লোলুপ দৃষ্টি দেবার সাহস পায় নি। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই তাদের চোখ পড়েছে এই অঞ্চলে। এই তেল সম্পদ তাদের দখল করতে হবে। এজন্যে এই অঞ্চলে তাদের খবরদারী নিশ্চিত করতে আফগানিস্তানকে দরকার। আরো দরকার আফগানিস্তানে তাদের অনুগত এক সরকার। ইজরাইলকে দিয়ে যেমন মধ্যপ্রাচ্যে খবরদারী চালাচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস রয়েছে, ঠিক তেমনই আফগানিস্তানকেও ব্যবহার করার একটি সুদূরপ্রসারী চিন্তা মার্কিন প্রশাসনের আছে।

তাছাড়া ওই অঞ্চলের তেল ও গ্যাস রফতানির জন্যেও আফগানিস্তানকে দরকার। মার্কিনী বহুজাতিক সংস্থা ইউনিকল পরিকল্পনা করেছিলো তুর্কমেনিস্তানের বিপুল প্রাকৃতিক গ্যাস আফগানিস্তানের মধ্যদিয়ে ভারতে নিয়ে আসা। এ সম্পর্কে ১৯৯৭ সালের বিশ্বব্যাংকের এক স্টাডি রিপোর্টে বলা হয় যে, আফগানিস্তানে যদি তালেবান শাসন স্থায়ী হয় এবং তা যদি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে, তাহলেই এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। হায়! ইতিহাসের কি বিচিত্র খেলা। তাহলে তালেবান সরকার স্থায়ী হোক, এমন একটা চিন্তা বিশ্বব্যাংকের ছিলো। তার মানে বিশ্বব্যাংকের প্রধান নিয়ন্ত্রক আমেরিকারও ছিলো। যে কোনো কারণে হোক, তালেবান সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া ঠিকমতো না হওয়ায় এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তালেবানদের বিতাড়িত করে নতুন অনুগত সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। আর এটাই হলো আফগান যুদ্ধের আসল রহস্য।

আফগানিস্তানের নিজস্ব তেমন প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকলেও তার ভৌগোলিক গুরুত্ব আছে। আবার আফগানিস্তানের কোনো সমুদ্র উপকূল নেই। মধ্য এশিয়ার তেল সম্পদ ব্যবহার করতে হলে আফগানিস্তানে মার্কিন অনুগত এমন এক সরকার দরকার- যার সঙ্গে একদিকে পাকিস্তান, অপরদিকে মধ্যএশীয় দেশগুলোর সঙ্গেও সুসম্পর্ক থাকবে। তালেবানদের নিয়ে সমস্যা ছিলো এই যে, তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের সুসম্পর্ক থাকলেও তাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিলো শত্রুতামূলক। ওই দেশগুলোর সঙ্গে আবার নর্দার্ন এল্যায়েন্সের ভালো সম্পর্ক। এই জটিলতা থেকেই আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনের কারণ সৃষ্টি হয়েছে।

পাশাপাশি আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। ক্যাস্পিয়ান সাগরের তেল পরিবহনের জন্যে একটি পরিকল্পনা প্রায় সম্পন্ন। উপবেকিস্তানের রাজধানী বাকু থেকে শুরু করে তুরস্কের দক্ষিণে পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে সেহান বন্দরে এই তেল আসবে। এজন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের সরকারকে সব রকম সাহায্য করছে এবং কুর্দি বিরোধী রাষ্ট্রীয় নিপীড়নকেও সমর্থন করছে। এখানে আর মানবাধিকারের প্রশ্ন ওঠে না। প্রায় এক বছর

www.pathagar.com

আগে ২০০০ সালের ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জি সংক্রান্ত তথ্যপুঞ্জিতে উল্লেখ আছে যে, মধ্য এশিয়া থেকে আরব সাগর পর্যন্ত তেল ও গ্যাসের পাইপ লাইন নির্মাণের যে পরিকল্পনা আছে, সেই প্রেক্ষাপটে আফগানিস্তানের ভৌগোলিক গুরুত্ব অপরিসীম। তাই তেল সাম্রাজ্যের সঙ্গে আফগান যুদ্ধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে খনিজ তেল সম্পদ একটি অতীব মূল্যবান সম্পদ। বিংশ শতাব্দির শুরু থেকেই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদিরা এই মূল্যবান সম্পদ লুণ্ঠনের দিকে নজর দেয়। বিংশ শতাব্দির শুরুতেই আরব জগত ও মধ্যপ্রাচ্যের (সৌদি আরব, ইরাক, কুয়েত, ইরান ইত্যাদি) তেল আবিষ্কৃত হয়। তেল সম্পদের লোভে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই অঞ্চলটিকে দখলে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। বড় বড় মার্কিনি কোম্পানিগুলো এই অঞ্চলে ঘাঁটি করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে এইসব অঞ্চলে আবার কিছুটা জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। তারই ফলে তেল উৎপাদন ও রফতানিকারক দেশগুলো নিজেরা মিলে একটি সংগঠন গড়ে তোলে ষাটের দশকে, যা ওপেক নামে পরিচিত। বিদেশি কোম্পানির হাত থেকে ওই দেশগুলো নিজেরাই তেলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার গ্রহণ করে। সত্তরের দশকের প্রথমে ও শেষে দুইবার ওপেক তেলের দাম বাড়ায়। এর ফলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদী বিশ্বের টানা প্রবৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি হয়। দেখা দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রথম দুনিয়াব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট। তবে তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে আবার যে পেট্রো ডলার তৈরি হয়েছে, তা জমা পড়েছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলোর ব্যাংকে। ফলে মার্কিন ও ইউরোপের খুব তেমন অসুবিধা হয় নি।

মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্যেই তারা তৈরি করেছে ইজরাইল রাষ্ট্র এবং আরব বিশ্বের বিরুদ্ধে ইসরাইলকে মদদ দিয়ে চলেছে। উপরন্তু আরব দেশগুলোর মধ্যে অনৈক্য এবং সেইসব দেশে ন্যূনতম গণতন্ত্রের অভাবের কারণে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখনো পর্যন্ত ওই অঞ্চলের তেল সম্পদ লুণ্ঠন অব্যাহত রাখতে পেরেছে। ইরাকের বিরুদ্ধে আগ্রাসন ও উপসাগরীয় যুদ্ধের কারণও হচ্ছে তেল সম্পদ লুণ্ঠনকে নিশ্চিত করা। আফগান যুদ্ধের আসল কারণও তাই। ❑

৭ ডিসেম্বর '০১
লেখক : রাজনীতিক, প্রাবন্ধিক ও কলামিষ্ট।

www.pathagar.com

পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম মুসলিম বিশ্বকে বিভ্রান্ত করছে তালিবানরা পূর্ণ উৎসাহে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

আবু তামিমা মোঃ দেলাওয়ার হোসাইন

পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম মুসলিম বিশ্বকে বিভ্রান্ত করছে। তালিবান, আল-কায়েদা এবং ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নিরুৎসাহিত করার জন্য প্রতিনিয়ত মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ প্রচার করে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা তার উল্টো। অযথা প্রাণহানি ও সাধারণ জনগণের জানমাল রক্ষার জন্য কৌশলগত কারণে তালিবানরা অনেকগুলো শহর ছেড়ে দিয়েছে, তবে তাদের অস্ত্র ও শক্তি ৮০ ভাগ পুরোপুরি নিরাপদে রক্ষিত রয়েছে। এ কথা গোপন নয় যে, নর্দার্ন এলায়েন্স লড়াই করে নয়, বরং তালিবানরা স্বেচ্ছায় বিভিন্ন শহর খালি করে দেয়ার কারণেই সেগুলোতে তারা ঢুকতে পেরেছে। খোস্ত জালালাবাদসহ কতগুলো শহর কট্টর নর্দার্ন এলায়েন্সবিরোধী নেতৃত্বের হাতে ছেড়ে দিয়ে লড়াইয়ের চাপ কিছুটা কমিয়ে নিয়েছে তালিবানরা। ঐদিকে কুন্দুজ, উরজগান, যাবল ও কান্দাহারে মজবুত অবস্থান নিয়েছে তালিবান লড়াকুরা। কাবুল, মাজার-ই-শরীফ, হিরাত ও অন্যান্য শহর যেখানে নর্দার্ন এলায়েন্স ও ইঙ্গ-মার্কিনরা অবস্থান করছে ঐ সমস্ত শহরের পাশে দুর্গম পাহাড় ও গুহায় দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে তালিবান, যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে প্রতিপক্ষের উপর।

নর্দার্ন এলায়েন্সের মাঝে শুরু হয়েছে চরম দ্বন্দ্ব ও অনাস্থা

মার্কিন কূটচালে দৃশ্যত ২৯ সদস্যের আফগান অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলেও ইতিমধ্যেই ক্ষমতা নিয়ে নর্দার্ন এলায়েন্সের মাঝে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব। তাজিক, উজবেক, শিয়া, মাসুদ গ্রুপ ও জেনারেল দুস্তাম গ্রুপ নিয়ে গঠিত নর্দার্ন এলায়েন্স। ভবিষ্যৎ ক্ষমতা নিয়ে এখনই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষ চরম আকার ধারণ করছে। তালিবানদের পূর্বে ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫-এর শেষদিক নাগাদ সময়ে কাবুলের ক্ষমতায় বসেছিল নর্দার্ন এলায়েন্স। পৃথিবী তখন তাদের পরস্পরে হানাহানি, মারামারি ও লড়াই ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করেছে। সমগ্র আফগানিস্তানের উপর ঐ পাঁচ বছরেও তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ৩২টি প্রদেশের প্রত্যেকটিতে এক বা একাধিক সরদার ও গোষ্ঠী তখন শাসন করত। এদের মধ্যে হরহামেশা লড়াই-ঝগড়া লেগেই ছিল। এমতাবস্থায় ১৯৯৬

www.pathagar.com

হাতে নেয় এবং দেশের ৯৫ ভাগ এলাকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তারপর পূর্ণ শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তার সাথে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় তারা দেশটি গত ৬ অক্টোবর পর্যন্ত পরিচালনা করে। আমেরিকা ও পশ্চিমা শক্তি কোন তথ্য-প্রমাণ উল্লেখ না করেই গত ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার দায়ভার চাপিয়ে দেয় ওসামা বিন লাদেন এবং তালিবানের উপর। এই মিথ্যা অজুহাতে তারা বিশ্বের একমাত্র ইসলামী শরীয়া রাষ্ট্র আফগানিস্তানের ইসলামী সরকারকে উৎখাতের উদ্দেশ্যে একটি দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে হায়েনার মত বিভীষিকাময় ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালাচ্ছে। নির্লজ্জভাবে মুসলিম দেশগুলোর সরকার আপন মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে ইহুদী খৃষ্টান ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে সমর্থন দিচ্ছে।

মুসলমানদের পরস্পরে খুনাখুনি ও যুদ্ধ বাধানোর হীন ষড়যন্ত্র

জাতিসংঘের মাধ্যমে আমেরিকা ও পশ্চিমারা আফগানিস্তানে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগের জন্য মুসলিম দেশ তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশ থেকে মুসলমান সৈন্য মোতায়েন করতে চাচ্ছে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, তালিবানরা নর্দার্ন এলায়েন্সের সাথে গেরিলা যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে সময়ের অপেক্ষা করছে। এমতাবস্থায় মুসলিম দেশগুলো থেকে মুসলমান সৈন্যদেরকে আফগানিস্তানে মোতায়েনের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধানো। যার ফলশ্রুতিতে রক্তক্ষয় হবে শুধু মুসলমানদের। ওদিকে প্রশ্চিমা ইহুদী-খ্রষ্টান চক্র দূরে থেকে তামাশা দেখবে আর হাততালি দেবে।

তালিবানদের ভবিষ্যৎ রণকৌশল

সাধারণ নাগরিকদের জানমালের কথা চিন্তা করেই তালিবানরা আমেরিকার বিমান আক্রমণের মুখে আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহর খালি করে পিছু হটে এসেছে। প্রয়োজনে তারা কান্দাহার, উরজগনের অন্যান্য শহরও ছেড়ে দেবে। তখন আমেরিকা ও নর্দার্ন এলায়েন্সকে ক্ষমতায় বসাবে, কিন্তু এটি চরম সত্য যে, ৬ মাস সময়ও ঐ সরকার শান্তি-শৃংখলার সাথে দেশ পরিচালনা করতে পারবে না। শুরু হবে নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার ও স্বার্থের লড়াই (এর জ্বলন্ত প্রমাণ ১৯৯০ থেকে নিয়ে ১৯৯৫ সাল)। তালিবানদের শীর্ষস্থানীয় একটি সূত্র জানিয়েছে, আমেরিকা ও পশ্চিমাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কাবুলের গোষ্ঠী সরকারের বিভিন্ন গ্রুপ ও জোটের পরস্পরের খুনাখুনি, কলহ ও লড়াই কিছু দিন তারা দূরে থেকে উপভোগ করবে। এক সময় পশ্চিমা জগৎ নর্দার্ন এলায়েন্সসহ কাবুলের ঐ গোষ্ঠী সরকার থেকে আস্থা হারাবে। দেশে আইন-শংখলা ও নিরাপত্তার চরম অবনিতির কারণে তখন আফগান জনগণও অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

ঠিক তখনই দেশের ৭০ ভাগ পশতুভাষী জনগণের সমর্থনপ্রাপ্ত তালিবানরা তীব্র গতিতে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করবে এবং অল্পদিনেই তারা আবার কাবুলের ক্ষমতায় ফিরে আসবে। সমগ্র বিশ্বের কাছে তখন সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তালিবান ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ছাড়া আফগানিস্তানে কখনও স্থিতিশীল অবস্থা, শান্তি ও শৃংখলা ফিরে আসবে না। ❑

৮ ডিসেম্বর '০১

লেখক : আফগানিস্তান থেকে মিডিয়া কর্মী।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে স্থায়ী শান্তি কতদূর ?

রহমান মুখলেস

আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ এবং অন্তর্বর্তী সরকার প্রশ্নে বন সম্মেলনের সমঝোতা শেষ পর্যন্ত টিকবে তো? আপাতঃদৃষ্টিতে বন সম্মেলনে ইতিবাচক অগ্রগতি হলেও স্থায়ী শান্তি ও অন্তর্বর্তী সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

একটি ব্যাপকভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে বন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও সম্মেলনে উত্তর জোটের প্রাধান্যই ছিল প্রধান। সম্মেলনে সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিনিধিই ছিল উত্তর জোটের। আফগান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধিত্ব ছিল উপেক্ষণীয়। এদিকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত এবং একদিন আফগান সংখ্যাগরিষ্ঠ পশতুন জনগণের মাঝ থেকে উত্থান তালিবানের কোন প্রতিনিধি ছিল না সম্মেলনে। অবশ্য জাতিসংঘ আয়োজিত বন সম্মেলনে তাদের ডাকাও হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র কোনভাবেই চায়নি তালিবান আফগানিস্তানের ক্ষমতার হিস্যায় থাক। অবশ্য পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছে ক্ষমতার হিস্যায় মধ্যপন্থী তালিবান প্রতিনিধি রাখার জন্য।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তালিবান প্রতিনিধিত্বহীন বন সম্মেলনের মধ্য দিয়ে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে তা ব্যাপকভিত্তিক সরকার গঠনের নামান্তর মাত্র, বহু উপজাতি ও গোত্রে বিভক্ত ৪টি আফগান প্রতিনিধি দল এ সম্মেলনে যোগ দেয়। তারপর নেতারা নিজে এ সম্মেলনে যোগ দেননি। যোগ দিয়েছিলেন তাদের প্রতিনিধিরা। তাই বন সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানের শান্তি নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে এটা আশা করা যায় না। বরং মাঝপথেই সম্মেলন ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সম্মেলনের চতুর্থ দিনে উত্তর জোটের প্রতিনিধি হয়ে যোগ দেয়া নানগারহার প্রদেশের গভর্নর আবদুল কাদির বৈঠক থেকে ওয়াকআউট করলে সৃষ্টি হয়েছিল অচলাবস্থার।

সম্মেলনে উত্তর জোটের প্রতিনিধিরা ছাড়াও অংশ নেয় রোম থেকে সাবেক বাদশাহ জহির শাহর প্রতিনিধি, পাকিস্তানের পেশোয়ারে বসবাসরত পশতুন (পাখতুন) শরণার্থী এবং সাইপ্রাসে নির্বাসিত আফগান গোষ্ঠী (ইরান সমর্থিত)'র প্রতিনিধিগণ। সম্মেলনে উত্তর জোটের প্রতিনিধিরা জোরের সাথে এ ঘোষণা করে যে, ভবিষ্যতে আফগান বিষয়ে আর কোন সম্মেলন আফগানিস্তানের বাইরে হবে না। আফগানদের ভাগ্য আফগানরাই আফগানিস্তানে বসে নির্ধারণ করবে।

www.pathagar.com

উত্তর জোট আফগানিস্তানে কিছুতেই আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উপস্থিতি মেনে নিতে রাজি নয়। এ নিয়ে প্রথম থেকেই সম্মেলনে সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাপক মতানৈক্য। উত্তর জোটের সাফ জবাব, তালিবান উৎখাত হয়েছে। এখন আর কোন বিদেশী সৈন্যের প্রয়োজন নেই আফগানিস্তানে। বিন লাদেন বিংবা মোল্লা ওমরকে ধরতে বড় জোর দুশ' মার্কিন সৈন্য সেখানে থাকতে পারে। তার বেশী নয়। এ থেকেই অনুমান করা যায়, মার্কিন সেনাদের সাথে উত্তর জোটের সৈন্যদের এতদিনকার দহরম-মহরমে চিড় ধরতে শুরু করেছে। এতে হতবাক হয়েছে খোদ মার্কিনীরাও।

এর মধ্যে শক্তিশালী পক্ষ উজবেক জেনারেল দোস্তাম অন্তর্বর্তী সরকারকে বয়কটের ঘোষণা দিয়েছেন। তা ছাড়া পশতু নেতা পীর সৈয়দ আহমদ গিলানী ও অন্য উপদল নেতা আবদুল রসুল সাইয়াফ নয়া চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

আফগানিস্তানের বিবদমান উপজাতি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তারাই এখন সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক জোট। ১৯৯৬ সালে এই উত্তর জোটকেই ক্ষমতাচ্যুত করেছিল তালিবান। কাজেই ব্যাপকভিত্তিক সরকারের এমন কি কোন মধ্যপন্থী তালিবান প্রতিনিধির উপস্থিতিও বরদাশত করার কথা নয় উত্তর জোটের এবং শেষ পর্যন্ত তালিবানের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই ব্যাপকভিত্তিক সরকার হতে যাচ্ছে আফগানিস্তানে।

কিন্তু ৬ মাসের এ অন্তর্বর্তী সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে শুধু পর্যবেক্ষক মহলই নয়, খোদ আফগানরাও সন্দিহান। অনেকেরই ধারণা, এটা জাতিসংঘের ছদ্মাবরণে মার্কিনীদের চাপিয়ে দেয়া সরকার। বন সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা অনেক মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও জাতিসংঘের চাপের মুখেই একটা জোড়াতালির সমঝোতায় পৌঁছতে বাধ্য হয়েছেন। তাই এ জোড়াতালির সমঝোতা ও শান্তির স্থায়িত্ব নিয়ে অনেকের প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত শান্তি টিকবে তো?

বিভিন্ন উপজাতি বাহিনী ও যুদ্ধবাজ নেতারা এ মুহূর্তে আফগানিস্তানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ন্ত্রণ করছে। কাবুলে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে উত্তর জোটের তাজিক যোদ্ধারা। সামরিক দিক থেকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর মাজার-ই-শরিফ নিয়ন্ত্রণ করছে উত্তর জোটের যুদ্ধবাজ উজবেক নেতা রশীদ দোস্তাম।

পশ্চিমাঞ্চলীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর হেরাত নিয়ন্ত্রণ করছে এলাকার উপজাতীয় নেতা মোহাম্মদ ইসমাইল। পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ গ্যারিসন শহর জালালাবাদের নিয়ন্ত্রণে উত্তর জোটের একটি ভিন্ন গ্রুপ। তালিবানের সদর দফতর এবং সর্বশেষ শক্তিশালী ঘাঁটি কান্দাহারের নিয়ন্ত্রণ নিতে লড়ছে তালিবানবিরোধী স্থানীয় একটি শক্তিশালী পশতুন গ্রুপ। এ গ্রুপের নেতা হামিদ কারজাই।

এদিকে উত্তর জোট আফগানিস্তানের প্রায় ৮০ ভাগ এলাকায় ইতোমধ্যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলেও তাদের অবস্থাও লেজেগোবরে। উপজাতি গোত্র-গোষ্ঠীগত বিরোধ চরমে। ফলে উত্তর জোটের ভেতরেই চলছে ক্ষমতার লড়াই। জোটে তাজিক-উজবেক দ্বন্দ্ব ক্রমেই প্রকট রূপ নিচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, শিগগিরই এ দ্বন্দ্ব আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। তাজিক যুদ্ধবাজ নেতারা চাইবে না কাবুল কিংবা জালালাবাদের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতছাড়া হোক। উজবেক যুদ্ধবাজ জেনারেল রশীদ দোস্তামও চাইবে না মাজার-ই শরীফের নিয়ন্ত্রণ তার হাত থেকে চলে যাক। একইভাবে হাজারা উপজাতির যুদ্ধবাজ

www.pathagar.com

নেতারা চাইবে না তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা তাদের হাতছাড়া হোক। অন্যদিকে হেরাত থেকে মোহাম্মদ ইসমাইল এবং কান্দাহার থেকে তালিবানবিরোধী পশতুন নেতারাও নিশ্চয়ই সেই একটি পথ অনুসরণ করবে। অন্তত আফগানদের অতীত ইতিহাস তাই বলে। ১৯৯২ সালে কমিউনিস্ট শাসক নজিবুল্লাহর পতনের পর কাবুল দখল এবং একটি সরকার গঠনে মুজাহিদ গ্রুপগুলো সক্ষম হলেও খুব দ্রুত তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা সমঝোতায় ফাটল ধরে এবং তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুজাহিদ গ্রুপগুলোর এই অনৈক্য ও যুদ্ধের সুযোগে আফগানিস্তানে উত্থান ঘটে তালিবানের। আর উত্থানের ২ বছরের মধ্যেই কাবুল দখল।

বন সম্মেলনের মাধ্যমে আফগানিস্তানে একটি অন্তর্বর্তী সরকার এবং ২ বছরের মধ্যেই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একটি স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও বর্তমানে আফগানিস্তানে অবস্থানরত মার্কিন সৈন্যদের নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কতসংখ্যক সৈন্য আফগান ভূমিতে অবস্থান করছে, তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি হবে কিংবা আরও কতসংখ্যক মার্কিন সৈন্য আফগানিস্তানে আসছে এ বিষয়ে আফগানরা কিছুই জানে না। বিন লাদেন কিংবা মোল্লা ওমরকে ধরার নামে যুক্তরাষ্ট্র গত ২ মাস ধরে আফগানিস্তানে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে এবং যে হারে নারী, শিশু ও বৃদ্ধসহ নিরীহ আফগানদের হত্যা করছে তা বসনিয়ায় সার্ব হত্যাযজ্ঞকেও হার মানিয়েছে।

বন সম্মেলনের সমঝোতা এবং স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী খুব শিগগিরই আফগানিস্তানে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেবে। ২৯ সদস্যবিশিষ্ট নতুন সরকারে থাকবে একজন প্রেসিডেন্ট, ৫ জন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ২৩ জন মন্ত্রী। জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে বিভিন্ন আফগান উপজাতি, গোত্র ও গোষ্ঠীর মধ্য থেকে সরকারের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হবে। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাখতুনদের অন্তত ১১ জন সদস্যের সরকারে থাকার কথা। মার্কিন ও জাতিসংঘের প্রবল চাপের মুখে বন সম্মেলনে উত্তর জোট অন্তর্বর্তী সরকারের পাখতুনদের প্রাধান্যে সম্মত হলেও বাস্তবে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান উত্তর জোট কতখানি তা মানবে তা বোঝা যাবে সরকারের যাত্রা শুরুর পর। উত্তর জোট নিশ্চয়ই তাদের সামরিক আধিপত্য হারাতে চাইবে না। আর তখনই শুরু হবে নয়া সরকারের টানাপোড়েন। সামরিক আধিপত্য যাতে হারাতে না হয়, এ জন্য উত্তর জোট আফগানিস্তানে আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েনেরও বিরোধী। উত্তর জোট তার একচ্ছত্র সামরিক আধিপত্য কিছুতেই খর্ব হতে দিতে রাজি নয়। আর এ অবস্থায় আফগানিস্তানে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে তা বাস্তবে কতখানি শক্তিশালী হবে সে বিষয়েও সন্দেহ রয়েছে। আর তালিবান আফগানিস্তানে তাদের নিয়ন্ত্রণ হারালেও ভবিষ্যতে যে তাদের তৎপরতা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে তার নিশ্চয়তাও নেই। বহু তালিবান যোদ্ধা এখনও পাহাড়ের গুহায় গুহায় আত্মগোপন করে রয়েছে। ভবিষ্যতে একটি বৃহত্তর গেরিলা যুদ্ধের শুরুর প্রস্তুতির জন্য। আফগান জনগণের একাংশের মাঝে এখনও তালিবানের সমর্থক রয়েছে। তাই তালিবান ভিন্ন আফগানিস্তানে এই শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত সফল নাও হতে পারে। তালিবানকে শান্তি আলোচনা এবং অন্তর্বর্তী সরকার থেকে দূরে রেখে আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কার্যত নেতিবাচক মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মহলের মতে,

www.pathagar.com

জাতিসংঘ দৃশ্যত মার্কিন চাপের মুখে আফগানিস্তানে একটি স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগকে হারাল। মরণপণ যুদ্ধরত তালিবান মার্কিন হামলার মুখে এখন হয়ত পরাজিত তারা বিধ্বস্ত এবং অনিবার্য পতন ও ধ্বংসের মুখে। কিন্তু প্রতিটি ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে। Action-এর বিপরীতে Reaction। এই ধ্বংসস্তূপের মাঝ থেকেই হয়ত ভবিষ্যতে (তা বহুযুগ পরেও হতে পারে) আবারও তালিবানের উত্থান ঘটতে পারে। একজন মোল্লা ওমর কিংবা বিন লাদেনই শেষ কথা নয়। আল কায়েদার নেতা বিন লাদেন যে প্যান ইসলামিজমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন তালিবানদের তা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা নয়। মোল্লা ওমর থাকবে না, বিন লাদেন থাকবে না, কিন্তু প্যান-ইসলামিজমের চেতনা থাকবে। আল কায়েদা ও তালিবানের বর্তমান ব্যর্থতার মাঝে জন্ম নেবে নতুন তালিবান। আল কায়েদার নতুন যোদ্ধা। তাই আফগানিস্তানের যুধ্যমান সকল পক্ষগুলোকে নিয়েই আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া উচিত ছিল। কাবুল কিংবা কান্দাহারের নিয়ন্ত্রণই শেষ কথা নয়। অন্তত আফগান অতীত ইতিহাস তা বলে না।

তাই আজ অনেকেরই প্রশ্ন, আফগানিস্তানে পক্ষপাতদুষ্ট জোড়াতালির অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে আসলেই কি স্থায়ী শান্তি সম্ভব? এছাড়া উত্তর জোটের সামরিক প্রধানের মুখে অন্তর্বর্তী সরকারের স্থায়িত্ব নিয়েও রয়েছে সন্দেহ। ❑

৮ ডিসেম্বর '০১
লেখক।

www.pathagar.com

যুগে যুগে আমেরিকার আধিপত্যবাদ

ওয়াহিদুল ইসলাম মামুন

এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার ধারক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গর্ব টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে ১১ সেপ্টেম্বর বিমান হামলার ফলে সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপট পাল্টে গেছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ পেয়েছে নতুন প্রেক্ষাপট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে Operation Infinite Justice বা Operation Enduring Freedom নামকরণ করে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বুশ 'সন্ত্রাসের' বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের বাজেট ঘোষণা করেছেন ৪০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু কোথায় জন্ম এই সন্ত্রাসবাদের ? কারা এই সন্ত্রাসবাদের জন্মদাতা ? আমরা একটু পেছনে তাকালেই ওদের মুখোশ চিনতে পারব-সন্ত্রাসবাদ শব্দটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় হয় প্রথম বিশ্বেযুদ্ধের পর থেকে। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় নিজেরাই সন্ত্রাসের লালন-পালন করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তির ঐতিহাসিক বিজয়ের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব নেতৃত্বের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয় দারুণভাবে। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন শক্তিই বেশী লাভবান হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর কাছে যুক্তরাষ্ট্র ঋণী ছিল ৩০০ কোটি ডলার। কিন্তু যুদ্ধের পর পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তার পাওনা দাঁড়ায় ১০০ কোটি ডলার। সকল মিত্রশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ঋণী হয়ে পড়ে। বিশ্ব অর্থনীতি লন্ডনের হাত বদল হয়ে চলে যায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের Wall Street-এ। War is the Business of Barbarism অর্থাৎ যুদ্ধ যে বর্বরদের ব্যবসা এ কথাটির প্রমাণ আমরা দেখতে পাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে মার্কিনীরা বিশ্ব নেতৃত্ব ও বিশ্বজুড়ে তাদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করে নেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই নিউ মেক্সিকোতে পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এরপর ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে Little boy ও Fatman নামক বোমার নারকীয় তাণ্ডব চালায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কলংকজনক অধ্যায়। মার্কিন অশুভ শক্তির নখরাঘাতে বিশ্ব বিবেক হয় ভূলুণ্ঠিত, থমকে দাঁড়ায় মানব সভ্যতা। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই উত্তর ভিয়েতনামে নির্বিচারে নাপাম বোমা ও মারাত্মক অস্ত্র প্রয়োগ করে

www.pathagar.com

এবং কম্বোডিয়ার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে মার্কিন শক্তিই সে সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিবেশ জটিল করে তুলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর Cold War-এর যুগে সমাজতান্ত্রিক সম্প্রসারণকে গতিরোধ করার জন্য মার্কিন কর্তৃক গৃহীত হয় Policy of Containment অর্থাৎ বেষ্টন নীতি। এ উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে প্রবর্তিত ট্রুম্যান ডকট্রিন ও মার্শাল প্ল্যানের মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ব্লকের পাশাপাশি পশ্চিম ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে শক্তিশালী রাজনৈতিক বলয় 'পশ্চিম ব্লক'। ১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়াকে সামরিক সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে মার্কিন সামরিক নীতির প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ১৯৬১ সালে কিউবা সংকট, ১৯৭৬ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আফগানিস্তানে সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও সামরিক মদদ দিয়ে আসছিল। তারপর ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর বার্লিন প্রাচীর পতন, ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর দুই জার্মানীর একত্রীকরণ এবং ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বজুড়ে। শুরু হয় মার্কিন আধিপত্যবাদের এক নয়া কৌশল। পাশ্চাত্য শক্তি আজ সন্ত্রাসবাদের জন্মদাতা বলছে মধ্যপ্রাচ্যকে। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Illegitimate Son বা জারজ সন্তান বলে খ্যাত ইসরাইল আজ মধ্যপ্রাচ্যের একটি বিষফোঁড়া সমতুল্য। অথচ ফিলিস্তিন তাদের নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে যদি হয় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী, তাহলে ইসরাইলকে কোন্ গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলবে ঐ তাঁবেদারী রাষ্ট্রগুলো? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিনীদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ইসরাইল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের আধিপত্য মধ্যপ্রাচ্যের দুই ডজন আরব রাষ্ট্রের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে রেখেছে।

আজ ইরাক-ইরানের এবং ইরান-ইরাকের শত্রু। ইরান-সউদী আরবসহ রাজতান্ত্রিক দেশগুলোর এবং মিসরের শত্রু। লিবিয়াকে কেউ দেখতে পারে না। সিরিয়া রয়েছে একঘরে, মিসর, সউদী আরব, জর্ডান, কুয়েত ইত্যাদি আরব দেশ দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র। মিসর, জর্ডান ও তুরস্ক এ তিনটি মুসলিম দেশের সাথে রয়েছে ইসরাইলের পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক। এভাবে আরব দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃকোন্দল সৃষ্টি করে যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের উপর আধিপত্য বিস্তার করছে। যুক্তরাষ্ট্র ভাল করেই জানে যে, যদি সে পশ্চিম গোলার্ধ থেকে পূর্ব গোলার্ধে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তালিবান গোষ্ঠী ধ্বংস করে দিতে পারলেই বিশ্বের সব সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তালিবান ধ্বংস না আফগানিস্তানে আধিপত্য?

যুক্তরাষ্ট্র ভালভাবেই অবগত যে, The Citadel of Asia বা এশিয়ার দুর্গ নামে আফগানিস্তান পৃথিবীর বড় বড় সভ্যতার মিলনস্থল। ব্রিটিশ ভূগোলবিদ স্যার ম্যাকাইন্ডার এ অঞ্চলকে Heart land বা হৃদয়ভূমি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই হৃদয়ভূমি এমন একটি কেন্দ্র যেখান থেকে পৃথিবীকে ভৌগোলিকভাবে অবশ্যই, রাজনৈতিকভাবেও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। উপমহাদেশের প্রবেশদ্বার খাইবার গিরিপথের

www.pathagar.com

ওপারের এদেশ আফগানিস্তান অবশ্য ঐতিহাসিকভাবে একটি রণাঙ্গন। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ও চীনের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী বিখ্যাত সিল্করোড এই দেশের উপর দিয়েই চলে গেছে। ১৯৯২ সালে তেহরানে মধ্য এশীয় দেশগুলো নিয়ে গঠিত হয় ECO (Economic Co-operation Organization)। এভাবে অর্থনৈতিক শক্তির পাশাপাশি সামরিক শক্তি হিসেবেও এ অঞ্চলের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গত কারণেই মার্কিনীরা এই নবোত্থিত বলয় থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখবে না সেটাই স্বাভাবিক।

ধারণা করা হয়েছিল এ অঞ্চলে অচিরেই বিপ্লবী ধর্ম ইসলাম প্রসারের তীর্থভূমিতে পরিণত হবে, যা মার্কিন স্বার্থকে প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করবে। একজন পাশ্চাত্য বিশ্লেষক মন্তব্য করেছেন, পাশ্চাত্য সোভিয়েত ইউনিয়ন বা কমিউনিজম নিয়ে যতটা না ভীত ছিল, তার চেয়ে বেশী সন্ত্রস্ত ছিল ইসলামী শক্তির উত্থানে। তাই তো আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি যুক্তরাষ্ট্রের মূল টার্গেট ওসামা বিন লাদেন নয়, তাদের মূল টার্গেট হল ইসলাম। বুশের সেই অন্তরের কথাটির প্রকাশ পেয়েছিল যখন তিনি বলেছেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণার কথা। মার্কিনীরা ইতোমধ্যে বিশ্বের ৩০টি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর নাম প্রকাশ করেছে, যে তালিকায় ১ম স্থানে থাকার কথা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নিজের নাম। বিগত বেশ কয়েক দিন যাবৎ আমরা বিভিন্ন পত্রিকায় দেখতে পাই আফগানিস্তানের পর তাদের এবারের টার্গেট ইরাক, সোমালিয়া, সুদান, ইয়েমেন ইত্যাদি। মূলত Power Politics দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রগুলোকে নিজের শক্তি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার অপচেষ্টা করছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্তির পর আজ সারাবিশ্বে মার্কিন Monopoly শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। Balance of Power বিনষ্ট হয়ে ন্যায়বিচার ও Human Right হয়েছে ভূলুণ্ঠিত। ইরাক বলেছে, জাতিসংঘ আজ পশ্চিমা শক্তির কাছে ছিনতাই হয়ে গেছে। সাদ্দাম হোসেন বলেছেন, জাতিসংঘের কাজকর্ম আজ হোয়াইট হাউজে বসে করা হচ্ছে। আজ মার্কিন নীতির কারণে জাতিসংঘকে বিদ্রুপ করে United States Organization বা যুক্তরাষ্ট্র সংঘ নামকরণ করেছেন। ১৯৯০ সালে ১১ সেপ্টেম্বর সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশ New World Order বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন, এটি এমন একটি যুগ, যা সব ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ভীতি থেকে মুক্ত, ন্যায়বিচারের অনুসরণে শক্তিশালী এবং শক্তির অন্বেষায় অধিক নিরাপদ। মূলত বুশের এই নীতি হল মুসলিম বিশ্বকে পদানত করার গোপন কৌশল। চীনা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বুশের নতুন বিশ্বব্যবস্থা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের একটি অপকৌশল। বর্তমানে মার্কিন ও রাশিয়ার হাতে প্রায় ১২ হাজার মেগাটন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য মাথাপিছু বিস্ফোরক বরাদ্দ ৩ টন টিএনটি। (২১ নভেম্বর ২০০১, দৈনিক ইত্তেফাক)। দুনিয়াতে যেখানে যত যুদ্ধ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, গৃহযুদ্ধ এবং সন্ত্রাস, অশান্তি ঘটেছে সেসব স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিহ্নিত অস্ত্রের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। মূলত যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছে বিশ্বের বুকে একটি Military Industrial Complex. নির্মাণ করতে। আজকে আফগানিস্তানে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে গিয়ে সারাবিশ্বে যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ক্রমে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বময়। আর যুদ্ধ যত স্থায়ী হবে

www.pathagar.com

ফায়দা তত বেশী হবে মার্কিনীদের। পৃথিবী আজ সন্ত্রাস থেকে মহাসন্ত্রাসের ভয়ে ভীত, বিপন্ন।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের ফলে দু'টি বিশ্বযুদ্ধে ৫০ লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছে। বিচার হয়নি ঐ তাঁবেদারি সন্ত্রাসী রাষ্ট্রগুলোর একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে এসেও আজ মার্কিনীদের মহাসন্ত্রাসের শিকার আফগানিস্তান। প্রাচীনকাল থেকে এই আফগানিস্তানের উপর নজর দিয়েছিলেন গ্রীক বীর আলেকজান্ডার (খ্রীঃ পূর্ব ৩২৮ অব্দে), চেঙ্গিস খান, তৈমুর লং, ভারত বর্ষ, পারস্য সাম্রাজ্য, কিন্তু কোন শক্তিই পরিপূর্ণভাবে সফল হয়নি। আজ আমেরিকা যখন তালিবান ধ্বংসের নামে এই দেশটির প্রতি নজর দিয়েছে তখন বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নীরব, নিথর ও নিস্তব্ধে আমেরিকাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমেরিকা বিশ্বজুড়ে একক আধিপত্য বিস্তার করেও সন্তুষ্ট হতে পারছে না। সে বিশ্বকে মুষ্টিবদ্ধ করে রাখতে চায়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য যুগে যুগে সকল অত্যাচারী শাসক, তাঁবেদারি সাম্রাজ্য, সন্ত্রাসী রাষ্ট্র কেউ ক্ষমা পেয়ে যায়নি, সকল অপশক্তি নিশ্চিহ্ন হয়েছে কালের অন্তরালে। মার্কিন বিশেষজ্ঞ ডঃ নোয়াম চমস্কি সম্প্রতি বলেন, ১৯৪৫ সালে বিশ্বের অর্ধেক সম্পদের মালিক ছিল যুক্তরাষ্ট্র আর ১৯৭০ সালে এই সম্পদের পরিমাণ ২৫ শতাংশ হ্রাস পায়। এভাবে সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পেতে পেতে মার্কিন শক্তিও পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে একদিন। আমেরিকার স্মরণ রাখা উচিত যে, একদা বলা হত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, কিন্তু আজ তা গল্পের মত শোনায়। ❑

লেখক

৮ ডিসেম্বর '০১

www.pathagar.com

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের অবদান কী ?

মোহাম্মদ তজিবর রহমান

১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই একটি হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ভয়ংকর বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর শেষ হয়। অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্ক ডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিন্যান্ড ও তার স্ত্রীকে এক সার্বিয়ান আততায়ী হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার ওপর আক্রমণ চালায়। দেখতে দেখতে দাবানলের মত এই যুদ্ধ প্রথমে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এই যুদ্ধ বিস্তার লাভ করে। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশগুলো দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক পক্ষে থাকে অষ্ট্রিয়া, জার্মানী, হাঙ্গেরী ও ইতালী। অপরপক্ষে মিত্রশক্তি হিসেবে থাকে সার্বিয়া, রাশিয়া, ফ্রান্স, বৃটেন, কানাডা ও জাপান। যুদ্ধের কিছুদিন পরে আমেরিকা মিত্র পক্ষে যোগ দেয়। পরে এই যুদ্ধে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ জড়িয়ে পড়ে এবং তা বিশ্বযুদ্ধে রূপলাভ করে। দীর্ঘ চার বছর বিশ্বে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে ১৯১৮ সালে প্যারিসে জার্মানী ও মিত্রশক্তির মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়। এই চুক্তি প্যারিস শান্তিচুক্তি নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে পরাজিত জার্মানীর নিকট থেকে বিরাট অংকের ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়। তাছাড়া ভবিষ্যতে জার্মানী যাতে আর যুদ্ধ বাধাবার সাহস না পায় তার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা মিত্রশক্তি গ্রহণ করল। এরপরেও পৃথিবীতে সুদৃঢ়ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও তা স্থানীয়ভাবে রক্ষার জন্য 'লীগ অব নেশনস' গঠিত হল ১৯২০ সালে এবং এর সদর দপ্তর হল ইতালীর জেনেভা শহরে। বিশ্বের বহু দেশ এই সংস্থার সদস্য হল। কিন্তু আগেই বলেছি মানুষ অত্যন্ত ক্ষমতালোভী, স্বার্থবাদী ও হিংসাপরায়ণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 'ঘা' শুকাতে না শুকাতে মাত্র একুশ বছরের ব্যবধানে 'প্যারিস শান্তিচুক্তি', 'ভার্সাই চুক্তি' ও সর্বোপরি 'লীগ অব নেশন্স'- এর সকল শর্তের প্রতি কলা দেখিয়ে জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা করে। একের পর এক ইউরোপের দেশগুলো এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকা মিত্রশক্তিতে অর্থাৎ পোল্যান্ডের পক্ষে যোগ দেয় এবং জার্মানীর পক্ষে যোগ দেয় ইতালী ও জাপান। দিনে দিনে এই যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ যথা - ভারত, বার্মা, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো মিত্রশক্তিকে সমর্থন দেয়। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর এই যুদ্ধ শুরু হয় এবং দীর্ঘ ৬ বছর পর ইতালী, জার্মানী ও জাপানের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসান হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু ইতোমধ্যে সারাবিশ্বে বহু সহায়সম্পদ ও জীবনহানি ঘটে যায়। জলে-স্থলে, অন্তরীক্ষে এই ভয়াবহ যুদ্ধ চলে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকার স্বাদ গ্রহণ করে। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান উড়ে, ভূমিতে অস্ত্রের ঝলকানি, বোমাবর্ষণের শব্দ, কামানের ও বন্দুকের গোলাগুলির আওয়াজ, নদীতে, সাগরে, মহাসাগরে যুদ্ধ জাহাজের বহর - সব মিলিয়ে সে এক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা। আমেরিকা জাপানের জনবহুল দু'টি শহর নাগাসাকি ও হিরোশিমায় এ্যটম বোমার আঘাতে দু'লাখ নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটায় এবং লাখ লাখ মানুষকে পঙ্গু করে দেয়। এখনও তারা এই পঙ্গুত্বের অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছে বংশানুক্রমিকভাবে। এছাড়া সারাবিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া জার্মানীকে এই যুদ্ধ বাধাবার জন্য বহু কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় এবং জার্মানীকে বার্লিন প্রাচীর দ্বারা দু'ভাগে ভাগ করে দুই বিশ্ব মোড়লের (তৎকালীন) পুরস্কারস্বরূপ দেয়া হয়। আমেরিকা পায় পশ্চিম জার্মানী এবং রাশিয়া পায় পূর্ব জার্মানী। এই সময় আমেরিকা ১ম ও রাশিয়া ২য় বিশ্বমোড়ল হিসেবে খ্যাতিলাভ করে। এবারে ভেবে দেখুন বিশ্বশান্তির হাতিয়ার 'লীগ অব নেশনস্' (অর্থাৎ জাতিপুঞ্জ) কি বিশ্বে শান্তিরক্ষায় কোন অবদান রাখতে পেরেছিল ? আমার তো মনে হয় বরং অশান্তি করার ইন্ধন যুগিয়েছিল। এরপর আমি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষার জন্য জাতিসংঘের (UNO) প্রতিষ্ঠা, তার সফলতা ও ব্যর্থতার কথা বলব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পরে বিশ্বে শান্তি স্থাপন ও তা রক্ষার জন্য আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো শহরে জাতিসংঘ সনদ রচিত হয়। তারপর ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন ৫১টি দেশ এই সনদ অনুমোদন করে। সেই থেকে সমগ্র বিশ্বে শান্তিরক্ষার জন্য এই সংঘের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৮৮টি দেশ। এই সংঘের প্রধান অংগ নিরাপত্তা পরিষদ। এই পরিষদে ৫টি স্থায়ী সদস্য আছে। তারা হল -আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন। এদের হাতে ভেটো পাওয়ার (প্রস্তাব বাতিল করার একক ক্ষমতা) আছে। এরা যে কোন সর্বসম্মত প্রস্তাবে ভোটো প্রয়োগ করতে পারে। তাছাড়া নিরাপত্তা পরিষদের আরও ১০টি দেশ অস্থায়ী সদস্য আছে। এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে। এর বর্তমান মহাসচিব কফি আনান। নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালত অবস্থিত।

সত্যিকার অর্থে এই বিশ্ব সংস্থা শান্তি প্রতিষ্ঠায় বা শান্তিরক্ষায় কোন অবদান রাখতে পেরেছে না ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে চলেছে ? আমি বলব ব্যর্থতার তুলনায় সফলতা অতি নগণ্য এবং তা ধর্তব্যের মধ্যে আসে না।

জাতিসংঘের প্রথম ও প্রধান ব্যর্থতা হচ্ছে ফিলিস্তিন সমস্যা সৃষ্টি করা এবং তা অদ্যাবধি মীমাংসা করতে না পারা। আর পারেনি যে তার মূল কারণ বিশ্বের এক নম্বর মোড়ল আমেরিকা। এখন থেকে ৫৩ বছর আগে ১৯৪৮ সালের ১ মে তারিখে বৃটেন, আমেরিকা ও তাদের মিত্রদের মদদে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিতাড়িত ইহুদীরা ফিলিস্তিনী ভূখণ্ড জবরদখল করে তথায় ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। সেই থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ফিলিস্তিনে ইহুদী আমদানী চলতে থাকে। আরব ও মুসলিম বিশ্বে এ নিয়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকায় জাতিসংঘে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ফিলিস্তিনের একটি অংশে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল এবং অপর অংশে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় জাতিসংঘের সেই প্রস্তাব জাতিসংঘের

www.pathagar.com

বড় মোড়লরা এখনও পর্যন্ত পূরণ করেনি। জাতিসংঘের সেই ওয়াদা ভঙ্গ করায় আরব বিশ্ব তা কখনও মেনে নেয়নি এবং এখনও নিচ্ছে না। ফিলিস্তিন জনগণ এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে দেয়। আরব বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র এই সংগ্রামে ফিলিস্তিনী জনগণের পাশে এসে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ইসরাইল রক্ষা করার নামে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বিশেষ করে আমেরিকা ও বৃটেন আরবদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ নিয়ে বহুবার যুদ্ধ হয় এবং আশপাশের মুসলিম দেশের বহু ভূখণ্ড দখল করে ইসরাইল রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ ঘটায়। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে আরব বিশ্ব সম্মিলিত পশ্চিমা জোটের কাছে চরমভাবে পরাজয়বরণ করে। ফলে ফিলিস্তিনীদের হারানো ভূখণ্ড আর উদ্ধার হল না। ফিলিস্তিনী সমস্যা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত জাতিসংঘ এ সমস্যার সমাধান করতে পারল না। বরং আমেরিকার নিয়ন্ত্রণাধীন জাতিসংঘ নির্বাক দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। ফলে প্রতিদিন ফিলিস্তিনীদের তাজা রক্তে সিক্ত হচ্ছে ফিলিস্তিনের মাটি, তাদের পাখির মত গুলী করে মারা হচ্ছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাউকেও বাদ দেয়া হচ্ছে না। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ ও সব প্রভাবশালী ব্যক্তি এই বর্বর ইসরাইলী আগ্রাসনের কথা স্বীকার করেছেন, অনেকেই নিন্দা করেছেন। বিশ্ব মোড়ল বুশ বলেছেন, 'ফিলিস্তিনে নৃশংসতা চলছে।' জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান সাহেবও (শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত) এটাকে বাড়াবাড়ি বলে মন্তব্য করেছেন। তবুও বুশের হুঁশ হচ্ছে না। জাতিসংঘের প্রস্তাবে বারবারই বুশেরাই 'ভেটো' দিয়ে যাচ্ছে। তারা মনে করছেন বিশ্ববাসী নির্বোধ।

তার ভেটোশক্তি প্রয়োগ করে ইসরাইলকে সাহায্য করে সব শান্তির চেষ্টা ভণ্ডুল করে দিয়েছে। জাতিসংঘের প্রস্তাব মতে, ফিলিস্তিনীদের স্বাধীনতা দেয়া দূরে থাক স্বায়ত্তশাসনও তারা পাচ্ছে না। শুধু মারই খেয়ে যাচ্ছে। আফগানিস্তান আক্রমণে বিশ্বে যখন ঝড় বয়ে যাচ্ছে তখন আমেরিকা ফিলিস্তিন সমস্যা মীমাংসার চেষ্টা করে মুসলিম বিশ্বে সহানুভূতি কুড়োবার বৃথা চেষ্টা করছে। অতএব বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের অবদানের কথা সবাই মিলে একটু ভাবুন। ❑

৮ ডিসেম্বর '০১

লেখক ঃ সাংবাদিক।

www.pathagar.com

নয়া ক্রুসেড, নয়া জিহাদ

আহমদ আবদুল কাদের

মিলিনিয়াম বা সহস্রাব্দের ধারণার মধ্যে খ্রিস্ট্রীয় ধর্মীয় বোধ সম্পৃক্ত রয়েছে। কোন মিলিনিয়ামের প্রাক্কালেই যীশুর পুনরায় পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটবে বলে খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিকরা মনে করেন। কাজেই একটি মিলিনিয়াম শুরু খ্রিস্টজগতের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

প্রথম খ্রিস্টীয় মিলিনিয়ামের শুরুতেই সমস্ত খ্রিস্টজগতে এ ধারণা প্রচার করা হয়েছিল যে, যীশু আসার সময় হয়ে গেছে। তবে যেহেতু পবিত্র জেরুজালেম এখনও মুসলমানদের অধীনে তাই যীশুর আগমনকে ত্বরান্বিত করতে হলে মুসলমানদের হাত থেকে একে উদ্ধার করতে হবে। এ লক্ষ্যে পোপ উবরান সমগ্র খ্রিস্টজগতে ক্রুসেডের আওয়াজ তোলেন। শুরু হয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টজগতের ক্রুসেড। ক্রুসেডের প্রথম পর্বে তারা মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম কেড়ে নেয়। দ্বিতীয় পর্বে সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর নেতৃত্বে জেরুজালেম আবার মুক্ত হয়। তৃতীয় পর্বে সমগ্র ইউরোপের রাজন্যবর্গ সম্মিলিতভাব ক্রুসেডে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ইউরোপ প্রত্যক্ষ ক্রুসেডে ব্যর্থ হয়ে নতুন কৌশল অবলম্বন করে। তারা অঘোষিত ক্রুসেড শুরু করে। প্রথমে ইউরোপ থেকে মুসলিম শাসন ও মুসলিম উৎখাতের ব্যবস্থা করা হয়। মুসলিম শাসনাধীনে স্পেন থেকে মুসলমানদের নির্মূল করা হয়। এর সঙ্গে শুরু হয় উপনিবেশবাদী তৎপরতা। মুসলিম বিশ্ব হয় তাদের প্রধান টার্গেট। ক্রুসেডীয় মনোভাব নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে। প্রথম মিলিনিয়ামের নয়া এই ক্রুসেডের লক্ষ্য ছিল ইউরোপ থেকে মুসলিম শাসনের অবসান মুসলমানদের নির্মূল করা, বিভিন্ন দেশে আক্রমণ ও সাম্রাজ্য বিস্তার, উপনিবেশ স্থাপন ও সারা দুনিয়ায় ইউরোপীয় বাণিজ্যিক আধিপত্য স্থাপন, লুণ্ঠন, শোষণের মাধ্যমে ইউরোপে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন, খ্রিস্ট ধর্ম ও ইউরোপের সভ্যতা সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার।

মুসলিম বিশ্ব ক্রুসেডের মোকাবিলা করতে সক্ষম হলেও এই নয়া ক্রুসেডের মোকাবিলা করতে পারেনি। একে একে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো ইউরোপের উপনিবেশে পরিণত হয়ে যায়। মুসলিম খেলাফত দুর্বল হতে হতে তা এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যায়। সারা দুনিয়ায় ইউরোপের আধিপত্য স্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

আজকের নয়া ক্রুসেড

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে মুসলিম বিশ্ব আবার জেগে ওঠে। তারা ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলমুক্ত হয়। দেশে দেশে ইসলামের পুনর্জাগরণ শুরু হয়। বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী ভাবাদর্শের সরকার গঠনের সম্ভাবনা তৈরী হয়। কার্যত কোথাও কোথাও তা হয়েও যায়। পশ্চিমা খ্রিস্টীয়-ইহুদীবাদী পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জন্য ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের জাগরণ হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ হুমকি মোকাবিলায় মরিয়া হয়ে ওঠে। এ মোকাবিলারই অপর নাম নয়া ক্রুসেড। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শুরুতেই নয়া ক্রুসেডের প্রেরণা পশ্চিমা জগতে প্রবল হয়ে উঠেছে। এমন কি প্রত্যক্ষ ক্রুসেডের চিন্তাও অনেকের মনে রয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ তো মুখ ফসকে কথাটা বলেই ফেলেছিলেন।। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে এক নয়া ক্রুসেড শুরু করেছে। এ ক্রুসেডের লক্ষ্য বহুবিধ-ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক সবই। নয়া ক্রুসেডাররা চায় (১) সারা দুনিয়ায় পশ্চিমা সভ্যতা-সাংস্কৃতির একক আধিপত্য থাকুক। কেউ তাদের চ্যালেঞ্জ করতে যেন সাহস না পায়। দুনিয়ার অর্থনীতির চালিকাশক্তি গ্যাস-তেলের ওপর তাদের একক আধিপত্য থাকতে হবে। এতে কেউ ভাগ বসাতে আসলে তা সহ্য করা হবে না। (২) সাম্রাজ্যবাদের সন্ত্রাসী এজেন্ট ইহুদীবাদী ইসরাইল রাষ্ট্রটিকে যে কোন মূল্যে টিকিয়ে রাখা। (৩) ইসলামের উত্থানকে যে কোন মূল্যে প্রতিরোধ করা। (৪) পশ্চিমা সংস্কৃতি-ভোগবাদী অশ্লীল জীবনধারাকে সর্বত্র ব্যাপক প্রসার ঘটানো। (৫) কোন ছোট রাষ্ট্র বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্র যাতে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী না হতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করা। আর কোনক্রমে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়ে গেলেও তাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা। (৬) কোন মুসলিম রাষ্ট্রে যাতে ইসলামী শক্তি ক্ষমতায় আসতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা শক্তি ও সমস্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নয়া ক্রুসেড শুরু করেছে। এ ক্রুসেডে তারা গ্রহণ করেছে নানামুখী কৌশল।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রেই এ নয়া ক্রুসেড পরিব্যাপ্ত। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠন ও লালন এ নয়া ক্রুসেডেরই অংশ। হেজাজভূমিতে মার্কিন ঘাঁটি তৈরী একই লক্ষ্যে নিবেদিত। লিবিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান, ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণ এ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি, ইরানকে চাপের মুখে রাখা আর পরিশেষে আফগানিস্তান আক্রমণ- সবই এই নয়া ক্রুসেডেরই অংশ। তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী কোয়ালিশন, ব্যক্তি সন্ত্রাসের মোকাবিলার নামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সৃষ্টি-নয়া ক্রুসেডেরই আরেক রূপ।

নতুন সহস্রাব্দের নয়া ক্রুসেডীয় তৎপরতায় মানব জাতি আজ বিপর্যস্ত। মুসলিম বিশ্ব আজ ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন। প্রথম সহস্রাব্দের ক্রুসেড যেমন মানব ইতিহাসের এক কলংকতম অধ্যায় তেমনি দ্বিতীয় সহস্রাব্দের নয়া ক্রুসেডও আজকের পৃথিবীর ঘৃণ্যতম অধ্যায় রচনা করছে। এ নয়া ক্রুসেডের মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে-পৃথিবীর নিপীড়িত মানবতাকে, মুসলিম বিশ্বকে। নয়া ক্রুসেডের মোকাবিলায় প্রয়োজন নয়া এক জিহাদের। নয়া জিহাদ ছাড়া নয়া ক্রুসেডের মোকাবিলা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

নয়া জিহাদ

জিহাদ ইসলামের অন্যতম অঙ্গ। জিহাদ ছাড়া ইসলামের উত্থান ও সংরক্ষণ সম্ভব নয়। তাই হাদিসে কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ জারি থাকার কথা বলা হয়েছে।

জিহাদের লক্ষ্য ঃ ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করা, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বিজয় দান করা, নির্যাতিত মানবতাকে রক্ষা করা, মানবীয় স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করা, পৃথিবী থেকে ফেতনা-ফাসাদ নির্মূল করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি। জিহাদের প্রচলিত ধারণা হচ্ছে মূলত সামরিক। প্রকৃতপক্ষে জিহাদ আরো ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। লক্ষ্য অর্জনের যাবতীয় প্রয়াস-প্রচেষ্টাই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। সামরিক তৎপরতা তার একটি অংশ চূড়ান্ত স্তর মাত্র। আজকের নয়া ক্রুসেডকে মোকাবিলা করতে হলে নিছক জিহাদের সামরিক ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। ক্রুসেডের মোকাবিলায় বস্তুত প্রয়োজন নবতর এক জিহাদের। এ নয়া জিহাদ হবে ব্যাপকভিত্তিক। চিন্তার পরিশুদ্ধি, আত্মগঠন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক তৎপরতার সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে সভ্যতার লড়াইয়ের প্রস্তুতি গ্রহণই এই নয়া জিহাদের মূল লক্ষ্য হবে। এ জন্য প্রধানত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর দিকে সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে ঃ

১) প্রতিটি দেশের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি ঃ আজকের সভ্যতার লড়াইয়ে, জিততে হলে নয়া ক্রুসেডের সফল মোকাবিলা করতে হলে সর্বাগ্রে বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। তাদের মধ্যে ঈমানী চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে। সৃষ্টি করতে হবে আত্মবিশ্বাস। ইসলামের প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও ইসলামী চিন্তা-চেতনার জাগরণ ছাড়া জনতার উত্থান সম্ভব নয়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতি যদি মুসলমানদেরই সঠিক আনুগত্য না থাকে তাহলে সে জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে সমাজ রাষ্ট্র গঠন কি করে সম্ভব ? কি করে তার ভিত্তিতে জনগণের জাগরণ সম্ভব হতে পারে ? তাই সর্বাগ্রে নজর দিতে হবে মুসলিম জাগরণের ওপর। ইসলাম একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা। মুসলমানদের ও মানবতার কল্যাণ যে ইসলামের মাধ্যমেই সম্ভব, পশ্চিমা সভ্যতার অনুকরণ যে মুসলমানদের জন্য কোন কল্যাণ দেবে না এ কথা স্পষ্টভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামনে তুলে ধরতে হবে। আমাদের সম্মান, আমাদের গৌরব, সমৃদ্ধি সবই নির্ভর করে ইসলামের ওপর। অন্য কোন তন্ত্র-মন্ত্র বা পাশ্চাত্যের অনুসরণ-অনুকরণের ওপর নয়। তাই ইসলামী চিন্তা-চেতনার আগেই মুসলিম জাতিকে উঠে দাঁড়াতে হবে, মুসলিম জনসাধারণকে বোঝাতে হবে যে, ইসলামে মৌলবাদ বলে পৃথক কোন বস্তু নেই। প্রতিটি মুসলমানই ইসলামের মৌল বিষয়ে বিশ্বাসী। আর এ বিশ্বাসের আলোকে তাদের গোটা জীবন ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। কাজেই আমাদের সার্বিক মুক্তি, কল্যাণ, সমৃদ্ধি, নেতৃত্ব-সবই নির্ভর করে ইসলামের ওপর একথা মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলেই সম্ভব ব্যাপকভিত্তিক জাগরণ। নয়া জিহাদের এ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২) অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ঃ মুসলিম দেশগুলো আজ বিভিন্নভাবে পাশ্চাত্যের উপর অমুসলিম দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীল। মুসলিম দেশগুলোর অর্থনীতি এখনও মজবুত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অনেক দেশকেই বিদেশী ঋণের/সাহায্যের উপর

www.pathagar.com

নির্ভর করতে হচ্ছে। যাদের সাহায্য নিয়ে দেশ চালাতে হবে তাদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক মুসলিম দেশকে যে কোন মূল্যে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে ধনী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে অধিকতর দরিদ্র দেশগুলোর পাশে দাঁড়াতে হবে। মনে রাখা দরকার, বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হলে কোন কিছুই টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় ধস্ নামার একটি বড় কারণ হচ্ছে তারা অর্থনীতিতে মজবুত ভিত্ নির্মাণ করতে পারেনি। কাজেই মুসলিম জাতিসমূহকে বিদেশ-নির্ভরতা পরিহার করে স্বকীয় অর্থনৈতিক মজবুত অর্জন করতে হবে। দেশের মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

৩) উন্নত প্রযুক্তি অর্জন ঃ মুসলিম দেশগুলোর নিজস্ব প্রযুক্তি নেই। তারা প্রযুক্তির ব্যাপারে ব্যাপকভাবে পাশ্চাত্যের ওপর, অমুসলিম দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে পিছিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। তাই প্রযুক্তির দিক থেকেও স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। এর জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা বাড়াতে হবে। উন্নত দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। সামরিক প্রস্তুতির দিক থেকেও মুসলিম বিশ্বের অবস্থা উন্নত নয়। অত্যাধুনিক তো দূরের কথা সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর সামর্থ্যও আমরা এখনও অর্জন করতে পারিনি। শত্রুর কাছ থেকে অস্ত্র কিনে শত্রুকে পরাজিত করার চিন্তা আজকের যুগে অবান্তর। যাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে আমাদের সামরিক প্রস্তুতি তাদের ধারে-কাছেও আছে কি ? আমাদেরকে তা নিছক প্রতিষ্ঠার জন্যেও পাশ্চাত্যের সামরিক সরঞ্জামের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রেরই তো একই অবস্থা। আফগানিস্তানে কি দেখলাম! মার্কিন বোমারু বিমানগুলো মোকাবিলা করার সামান্যতম ব্যবস্থাও তো আফগানদের ছিল না। ইরাকের অবস্থাও একই। কাজেই সামরিক জিহাদ করবার আগে আমাদের যথার্থ প্রস্তুতি প্রয়োজন। পবিত্র কোরআন আমাদের বলেছে ঃ আল্লাহ ও মুসলমানদের দুশমনদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করার মত সামরিক প্রস্তুতি আমাদের থাকতে হবে (সূরা আনফাল ঃ ৫৯) অথচ আমরা অনেক সময় বড় গলায় জিহাদের কথা বলি। কিন্তু জিহাদ করার জন্য ন্যূনতম প্রস্তুতিও আমাদের নেই। কাজেই যথার্থ প্রস্তুতির আগেই সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা করা আত্মহত্যারই নামান্তর। মোটকথা, পাশ্চাত্যের মোকাবিলায় সশস্ত্র জিহাদ করতে হলে তাদের সামরিক ও অন্যান্য শক্তি-সামর্থ্য মনে রেখে আমাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে। সামরিক দিক থেকেও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। অবশ্য বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোর কথা স্বতন্ত্র।

(৫) জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা ঃ আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও সুশৃঙ্খল জনসমর্থিত ও স্থিতিশীল নয়। বেশীর ভাগ দেশেই বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, অস্থিতিশীলতা বিরাজমান। কোথাও আছে উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজনীতি, রাজতন্ত্র-স্বৈরতন্ত্র, কোথাও আছে সামরিক ও একদলীয় স্বৈরতন্ত্র। এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে পাশ্চাত্যের মোকাবিলা করা দুরূহ ব্যাপার। প্রত্যেক দেশেরই গণসমর্থিত ইসলামী সরকার ছাড়া মুসলিম বিশ্বের কাঙ্ক্ষিত নেতৃত্ব গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

(৬) ব্যাপকভিত্তিক ঐক্য গড়ে তোলা ঃ মুসলিম বিশ্ব আজ নানাভাবে অনৈক্যের শিকার। অথচ এক কালেমার ভিত্তিতে তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা ছিল। বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠী, গোত্র ও ধর্মীয় মজহাব-পরিবারের কারণে মুসলমানরা আজ শতধাবিভক্ত। সবাইকে নিয়ে কালেমার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা ও রাখার কাজটি করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। অথচ আমাদের দুশমনরা ঐক্যবদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে তাদের ঐক্যে মুসলিম দেশগুলো পর্যন্ত শরিক হচ্ছে। শুধু পারলাম না আমাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে। যদি আমরা সত্যিই নয়া জিহাদ করতে চাই, নয়া ক্রুসেডের মোকাবিলা করতে চাই তাহলে ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা ও আগ্রাসন কি এত সহজে সফল হতো যদি আফগানিদের একটি অংশ তাদের প্রকাশ্যে সহযোগিতা না করত ? আফগানিস্তানে যদি পূর্ব থেকে গৃহযুদ্ধ না থাকত তাহলে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী কি এত তাড়াতাড়ি কাবুল সরকারের পতন ঘটাতে পারত ? নিশ্চয়ই নয়। তাছাড়া পাকিস্তানসহ পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলো যদি মার্কিনীদের সহায়তা না করতো তাহলে কি মার্কিন বাহিনী অত সহজে সাফল্য লাভ করতে পারত ? নিশ্চয়ই নয়। মোটকথা, যে কারণেই হোক মুসলিম বিশ্ব তার নিজের ঘর সামলাতে ব্যর্থ হয়েছে। নিজেদের অনৈক্য দূর করতে পারেনি। শত্রুরা আমাদের এ অনৈক্যেরই সুযোগ নিয়েছে বারবার, এবারও নিল।

(৭) চরমপন্থী মনোভাব ও ধ্যান-ধারণা পরিহার ঃ ইসলাম মধ্যপন্থী আদর্শ। এখানে চরমপন্থার কোন স্থান নেই। ইসলাম গোটা মানব জাতির কল্যাণের জন্য। শুধু বিশেষ কোন শ্রেণীর গোষ্ঠীর মধ্যেই ইসলাম নয়। তাই ইসলামের আবেদন মানবিক, সার্বজনীন, বিশ্বজনীন। ইসলাম মানব জাতির আশীর্বাদ, কল্যাণের বার্তাবহ। ইসলামে 'সন্ত্রাসের' কোন স্থান নেই। অবশ্যই ইসলামে জিহাদ আছে। কিন্তু জিহাদ মানে সন্ত্রাস নয়, নিরীহ নারী-পুরুষের ওপর আক্রমণ করা নয়। ইসলাম ইনসাফের আদর্শ। ইসলাম যুদ্ধক্ষেত্রেও সীমালংঘনে বাধা দেয়, ইনসাফ রক্ষা করতে বলে। হতাশা বা ক্ষিপ্ত হয়ে যা খুশি করা যায় না। ইসলাম ভীতিপ্রদ কোন আদর্শ নয়। ইসলাম মানবিকতাপূর্ণ আদর্শ, রহমতের আদর্শ। ইসলাম মানবতার নিরাপত্তার কথা বলে, নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে না। ইসলাম লড়াইয়ের ময়দানে ইস্পাতের মত কঠিন-কঠোর হতে বলে আমার সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হবারও শিক্ষা দেয়। বস্তুত ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ এক আদর্শ। চরমপন্থা ও হঠকারিতার কোন স্থান ইসলামে নেই। একটি সভ্যতা হিসেবে ইসলামকে বিজয়ী করতে হলে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ মানবিক আবেদন মানব জাতির কাছে তুলে ধরতে হবে। সমস্ত চরমপন্থা পরিহার করতে হবে।

মনে রাখা দরকার, চরমপন্থী কার্যক্রমের মাধ্যমে সাময়িক সাফল্য লাভ করা যেতে পারে কিন্তু পরিণামে এর ফলাফল শুভ ও স্থায়ী হয় না। ইতিহাস বারবার এ কথাই প্রমাণ করেছে। কাজেই ইসলামী আন্দোলনের পরিমণ্ডলে চরমপন্থী মনোভাব ও তৎপরতার কোন প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। মধ্যপন্থী ভারসাম্য রক্ষা করেই আন্দোলন চালাতে হবে।

(৮) কূটনৈতিক লড়াই ঃ এটি নয়া জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। একসাথে সব শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা যায় না, শত্রুর মধ্যেও পার্থক্য আছে। বড় শত্রুর মোকাবিলায়, ছোট শত্রুকে নিরপেক্ষ রাখতে হয়। মহানবীর (সাঃ) মদীনায় এসে প্রথমে মক্কার কুরাইশদের মোকাবিলায় মদীনার ইহুদী গোত্রগুলোকে মিত্র বানাবার ব্যবস্থা করেন।

www.pathagar.com

মদীনার সনদ তার প্রমাণ। মক্কার কুরাইশদের ওপর চূড়ান্ত বিজয়ের আগ পর্যন্ত তিনি রোমান-পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে সংঘাত সৃষ্টি হয় এমন কিছু করেননি। কাজেই আজকের যুগেও আমাদের সেই নীতি সামনে রাখতে হবে। সমস্ত কুফরি শক্তি ঐক্যবদ্ধ জানার পরও আমাদের সব শক্তির বিরুদ্ধে একই সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত নয়। হ্যাঁ, আদর্শিক যুদ্ধ সবার বিরুদ্ধেই হবে। কিন্তু বাস্তব যুদ্ধের ব্যাপারে বিবেচনা কুশলী ও বাস্তববাদী হতে হবে। বর্তমান দুনিয়ায় কূটনৈতিক যুদ্ধ একটি বড় হাতিয়ার। এক্ষেত্রে নির্বুদ্ধিতা করলে চলবে না, সামর্থ্যমত কূটনৈতিক কার্যক্রম চালাতে হবে। যত বেশী সম্ভব দেশকে নিরপেক্ষ রাখার চেষ্টা করতে হবে। এমন কার্যক্রম থেকে দূরে থাকতে হবে যাতে করে সবাই একসঙ্গে শত্রু হয়ে না যায়। মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর দেশগুলো শুধু আদর্শ মতবাদ দ্বারাই পরিচালিত হয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। কাজেই একজন আদর্শিক শত্রু হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ স্বার্থে বা সুবিধার কারণে মিত্র হতে পারে, নিরপেক্ষ থাকতে পারে-এ বিষয়টি মনে রেখে কূটনৈতিক কার্যক্রম চালাতে হবে।

মিডিয়ার জিহাদ ঃ নয়া জিহাদের একটি বড় অঙ্গ হচ্ছে মিডিয়া লড়াই। বর্তমান যুগ মিডিয়ার যুগ। মিডিয়ার মাধ্যমে রাতকে দিন আর দিনকে রাত করা হচ্ছে। কাজেই মুসলিম বিশ্বকেও শক্তিশালী, অর্থবহ কার্যকর মিডিয়া গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করতে হবে। বিশ্বের সাধারণ জনমতকে প্রভাবিত করার মত শক্তিশালী মিডিয়া চাই। এর কোন বিকল্প নেই। অথচ মিডিয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানরা ভীষণভাবে পিছিয়ে আছে। এর সমাধান প্রয়োজন। মিডিয়ার জিহাদ ক্ষেত্রবিশেষে সামরিক জিহাদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। তাই একে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

বস্তুত পশ্চিমা বস্তুবাদী খ্রিস্টবাদী পুঁজিবাদী সভ্যতার বর্তমান মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত নয়া ক্রুসেডের সফল মোকাবিলা করতে হলে গতানুগতিক জিহাদের চিন্তা যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন এক নবতর জেহাদের কর্মসূচী। জিহাদের মনোভাব ও স্পিরিট নিয়ে আজ মুসলিম দেশগুলোকে গড়ে তুলতে হবে, আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, উন্নয়নের পথে এগোতে হবে। পশ্চিমা যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার শক্তি অর্জন করতে হবে। এগুলো হচ্ছে এক নতুন ধরনের জিহাদ। প্রকৃত জিহাদ এক চূড়ান্ত বিজয় লাভ করার জন্য। এই নয়া জিহাদ কর্মসূচী সর্বাগ্রে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। আজকের পরিস্থিতি তাই দাবী করছে। ❑

১৪ ডিসেম্বর '০১

লেখক ঃ গবেষক, কলামিষ্ট।

www.pathagar.com

নয়া জামানায় নয়া ক্রুসেড

সাহাদত হোসেন খান

বছর ঘুরে আবার একটি ঈদ আমাদের সামনে এসেছে। আমরা প্রত্যেকেই ঈদের আনন্দের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। ঘরে ঘরে উৎসবের আমেজ। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন ছুটে যাচ্ছে তাদের আপনজনদের কাছে। এ ঈদে প্রবাসী ছেলেকে কাছে পেয়ে বিরহিনী মায়ের বুক ভরে উঠবে। পিতার সঙ্গে দেখা হবে পুত্রের, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের এবং বোনের সঙ্গে বোনের। খুশীর জোয়ারে ভেসে যাব আমরা। কিন্তু আমাদের ক'জনের ঘরে সুখের প্রদীপ জ্বলবে? আমরা তো একা নই। পৃথিবীর প্রতিটি মুসলমান আমাদের আপনজন। তাদের সুখ-দুঃখের কথা বাদ দিয়ে আমরা শুধু নিজেদের নিয়ে সুখী হতে পারি না। ঈদ এলেই তাদের কথা মনে পড়ে। মনটা তখন আপনা-আপনি ভারি হয়ে ওঠে। বলতে ইচ্ছে করে, ঈদ তুমি ফিরে যাও।

আনন্দের জন্যই ঈদ। কিন্তু আমরা আনন্দ করবো কিভাবে? মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা বিষাদের ছায়া ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। আজ বিশ্বে এমনি এক অবস্থা বিরাজ করছে যেখানে মুসলমানদের কোন বন্ধু নেই। প্রতিটি অমুসলিম দেশ এক জোট হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে এ জোটের অভিভাবক। মুসলিম বিদ্বেষ আগেও ছিল। তবে আজকের মত এত প্রকট ছিল না। যতই দিন যাচ্ছে পরিস্থিতি ততই জটিল হয়ে উঠছে। মুসলিম দেশগুলো বলির পাঁঠার মত কাঁপছে। একটির পর একটি মুসলিম দেশ আক্রান্ত হচ্ছে। যে সব দেশ এখনও অক্ষত রয়েছে, তারাও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা করছে। এ কথা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুসলিম পরিচয় নিয়ে বাঁচতে চাইলে অথবা অমুসলিম দেশে স্বাধীনতার আশঙ্কা পোষণ করলে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত হতে হবে। সে ক্ষেত্রে আম-ছালা দু'টিই যাবে। বাঁচতে চাইলে পাশ্চাত্য নির্দেশিত পথে বাঁচতে হবে। একটু এদিক-সেদিক হলেই বিপদ। বৌদ্ধরা বৌদ্ধ হিসেবে বাঁচতে চাইলে হিন্দুরা মৌলবাদী হলে অথবা ইহুদীরা ফ্যাসিবাদী হলে কোন ক্ষতি নেই। এ বিষয়টি আমরা ইরাকের কুয়েত দখল এবং ইসরাইলের আরব ভূমি দখলের ঘটনার দিকে তাকালেই বুঝতে পারি। ইরাক প্রতিবেশী কুয়েতে সৈন্য পাঠানোর পর যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন আকাশ-পাতাল মাতিয়ে তুলে। জাতিসংঘ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নিরাপত্তা পরিষদ ইরাকের ওপর অবরোধ আরোপ করে। কুয়েত দখলের ৫ মাস পর ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন

www.pathagar.com

বহুজাতিক বাহিনীর হামলা শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন ঘোরতর লড়াই আর হয়নি। এ লড়াইয়ে একদিকে ছিল ইরাক এবং অন্যদিকে ছিল বাদবাকি বিশ্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপেই গোটা বিশ্ব ইরাকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। তবে সাধারণ জনগণের অধিকাংশই ছিল ইরাকের পক্ষে। একজন নিরক্ষর ব্যক্তিও সেদিন বিশ্ব রাজনীতির কুটিলতা বুঝতে পেরেছিল। প্রত্যেকের মনেই একটি জিজ্ঞাসা উঁকি দিচ্ছিল। দেশ-জাতি নির্বিশেষে শান্তিকামী মানুষ সমস্বরে বলছিল, কুয়েত দখলের জন্য ইরাক শাস্তি পেলে একই ধরনের অপরাধের জন্য ইসরাইল শাস্তি পাবে না কেন ? আজও এ প্রশ্ন আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এ প্রশ্নের জবাব পাশ্চাত্যের নেই। তারা এ প্রশ্নের জবাব দেবেও না। গত অক্টোবরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ওমান সফরে এসেছিলেন। সে সময় আল-জাজিরার প্রতিনিধি তাকে এ প্রশ্নটি করেছিল। তাকে আরও প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ইরাকের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংসে যে রকম মাতামাতি করা হচ্ছে ইসরাইলের পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কে সে ধরনের কোন তৎপরতা নেই কেন ? টনি ব্লেয়ার এসব প্রশ্নের যে দুর্বোধ্য জবাব দেন, তা কারো মাথায় ঢুকবে না। সত্য কথা বলার সাহস তার ছিল না। এ জন্য সত্য লুকাতে গিয়ে তিনি দুর্বোধ্য ভাষায় জবাব দেন যাতে কেউ বুঝতেই না পারে। তবে লুকোচুরি করলেও তিনি ইসরাইলের প্রতি পাশ্চাত্যের পক্ষপাতিত্বকে লুকিয়ে রাখতে পারেননি। ইসরাইলের কি গুণ আছে যে জন্য পাশ্চাত্য তাকে খাতির করছে এবং তার সব অপরাধ মাফ করে দিচ্ছে ? এ গুণ হচ্ছে সে ইহুদী। মুসলিম দেশ হলে সে বুঝত কত ধানে কত চাল। তাকে ভোগ করতে হত ইরাক অথবা আফগানিস্তানের পরিণতি।

বিশ্বে এক নতুন আন্দোলন শুরু হয়েছে। এ আন্দোলনের নাম সন্ত্রাসবিরোধী আন্দোলন। ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর এ আন্দোলন শুরু হয়। ঘটনার পরক্ষণেই মুসলমানদের সন্দেহ করা হয়। কিন্তু এ সন্দেহের কোন ভিত্তি ছিল না। যখন কেউ অপরাধ করে তখন তার মধ্যে সর্বক্ষণ পরিণতির কথা জেগে ওঠে। মন শুধু পুলিশ পুলিশ করে। দড়িকে সাপ বলে মনে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান হয়েছে তাই। কোথাও কিছু হলেই সে মুসলমানদের সন্দেহ করে। এ ধরনের সন্দেহ করে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, সে মুসলমানদের সঙ্গে এমন অন্যায় করেছে, যে জন্য সুযোগ পেলেই মুসলমানেরা প্রতিশোধ নেবে। আমরা প্রায়ই দেখি কোন কিছু হলেই বিশ্বব্যাপী মার্কিন নাগরিকদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়া হয়। কেন ? পৃথিবীতে তো মার্কিন নাগরিক ছাড়া অন্যান্য দেশের নাগরিকরাও এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাচ্ছে। কই, তাদের তো কোন সমস্যা হচ্ছে না। তাহলে শুধু মার্কিন নাগরিকদের সমস্যা হচ্ছে কেন ? পৃথিবী এখনও এমন হয়নি যে, মানুষখেকোতে ভরে গেছে এবং তারা দেশে দেশে মার্কিনীদের খেয়ে ফেলেছে। এমন না হলেও মার্কিনীদের ভয় পাচ্ছে এবং তাদেরকে প্রায়ই অমুক দেশ তমুক দেশ ভ্রমণে যেতে নিষেধ করা হচ্ছে। অন্তরে সৎ সাহস থাকলে কথায় কথায় মার্কিনীরা ভয় পেত না এবং টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে আত্মঘাতী বিমান হামলার জন্য বিনা প্রমাণে মুসলমানদের দোষারোপ করত না। যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার জন্য সবাইকে বাদ দিয়ে এককভাবে মুসলমানদের অভিযুক্ত করে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এটা প্রমাণ করলেন যে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তাদের কোন বিরোধ নেই। এদের

www.pathagar.com

কেউ তাদের শত্রু নয়। প্রতিপক্ষ হচ্ছে কেবলমাত্র মুসলমান। প্রশ্নটা এখানেই। ইসলাম সন্ত্রাসকে সমর্থন করে না। আদর্শই হচ্ছে মুসলমানদের শক্তি। এ জন্যই ইসলাম কনিষ্ঠতম ধর্ম হয়েও পূর্ববর্তী ধর্মগুলোকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ইসলাম এমন এক ধর্ম, যাকে সংশোধন করা সম্ভব নয়। সংশোধন করার প্রয়োজনও নেই। কোরআন হচ্ছে একটি পরশপাথর। এ পরশপাথরের স্পর্শে ওমর ইবনুল খাত্তাবের মত পশু স্বভাবের মানুষ ফেরেশতাসদৃশ পুণ্যব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। গোটা আরবের অধঃপতিত মানুষগুলো আদর্শ মানুষ হয়েছিলেন। ইসলামই মানুষকে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিচ্ছে। ইতিহাস এটাই সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্ব ব্যবস্থা এ ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করছে। আজ সন্ত্রাসী বলতে শুধু মুসলমানদেরই বুঝানো হচ্ছে। সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ও সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে যে সব দেশ ও সংগঠনকে টার্গেট করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিটিই মুসলিম। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর শীর্ষ ২২ জন সন্ত্রাসীর একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে একজনও অমুসলিম নেই। টুইন টাওয়ারের সন্ত্রাসী হামলা বিশ্বকে বদলে দিয়েছে। নতুন করে মেরুকরণ শুরু হয়েছে। এ মেরুর একদিকে রয়েছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন অমুসলিম বিশ্ব এবং অন্যদিকে রয়েছে অসংগঠিত মুসলিম বিশ্ব। মুসলিম দেশগুলো মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটকে সমর্থন করছে ঠিকই। কিন্তু এ সমর্থন কেবল বাইরের। ভেতরে ভেতরে কেউ যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করে না। যুক্তরাষ্ট্রও এটা বোঝে। এ জন্যই সে মুসলিম দেশগুলোকে আস্থায় আনতে পারছে না। সে জানে যে, সে যাদেরকে টার্গেট করে কথিত সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযানে নেমেছে তাদের প্রত্যেকে মুসলিম। তাই সে অমুসলিম দেশগুলোর দিকে হাত বাড়িয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ওই সব দেশগুলোর ওপরই বেশী ভরসা করছে যে সব দেশের সঙ্গে মুসলমানদের কোন না কোন বিরোধ রয়েছে।

ভারত, ইসরাইল, রাশিয়া, চীন ও ফিলিপাইনের সঙ্গে বর্তমান পর্যায়ে ওয়াশিংটনের উষ্ণ সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে মুসলিম ইস্যু। এ ইস্যুতে এরা পরস্পরের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। প্রত্যেকে প্রত্যেককে সহায়তা করছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলায় অমুসলিম দেশগুলোর ভূমিকা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। একটি অমুসলিম দেশও আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার বিরোধিতা করেনি বরং প্রত্যেকে মার্কিন হামলার সবার্ত্মক সমর্থন দিয়েছে। একটি অমুসলিম দেশও বলল না যে, জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী একটি দেশ আরেকটি দেশের ওপর হামলা চালাতে পারে না। তার বিচার করতে পারে না। এক দেশ নিজ দেশের বাইরের কোন ব্যক্তির বিচার করতে পারে না। এ ব্যাপারে তাকে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের কাছে যেতে হবে। আন্তর্জাতিক আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারে। হেগ শহরে আন্তর্জাতিক আদালতে যুগোশ্লাভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচের বিচার চলছে। জাতিসংঘের নির্দেশে গত এপ্রিলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। যুগোশ্লাভ সরকারই তাকে গ্রেফতার করেছে। তাকে গ্রেফতারে খুব একটা ঝামেলা হয়নি। কোন আন্তর্জাতিক সংকটও দেখা দেয়নি। তবে হতে পারত যদি জাতিসংঘের স্থলে অন্য কেউ মিলোসেভিচকে গ্রেফতার করতে আসত। যুক্তরাষ্ট্র ওসামা বিন লাদেনকে যে যুক্তিতে গ্রেফতার করতে চাচ্ছে একই যুক্তিতে মিলোসেভিচকে গ্রেফতার

www.pathagar.com

করার কথা ছিল কসভোর। কিন্তু কসভো নিজের হাতে আইন তুলে নেয়নি। সে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। কসভোয় গণহত্যা চালানোর জন্য জাতিসংঘ মিলোসেভিচের বিচার করছে। একই ধরনের বিচার করা হয়েছে দু'জন লিবীয় নাগরিকের।

১৯৮৮ সালে স্কটল্যান্ডের লকারবিতে মার্কিন বিমান সংস্থা প্যান এম'র একটি বিমান রহস্যজনকভাবে বিধ্বস্ত হয়। প্যান এম বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য লিবিয়াকে দায়ী করা হয়। বলা হয় যে, দু'জন লিবীয় গোয়েন্দা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্যান এম ফ্লাইট উড়িয়ে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এ দু'জন লিবীয়কে বিচারের জন্য তাদের কাছে হস্তান্তরের জন্য উপর্যুপরি লিবিয়ার ওপর চাপ দিতে থাকে। কিন্তু লিবিয়া মার্কিন চাপ ক্রমাগত উপেক্ষা করে যেতে থাকে। ত্রিপোলি জানিয়ে দেয় যে, ওই দু'জন লিবীয় নাগরিককে সে বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে বিচারের জন্য সোপর্দ করতে পারে না। কারণ এতে তার সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হবে। লিবিয়া এই অবস্থান নেয়ায় যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের ঘাড়ে সওয়ার হয়। ১১৯২ সালে জাতিসংঘ লিবিয়ার ওপর বিমান ও অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এভাবে কেটে যায় কয়েক বছর। এক সময় দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা দূতিয়ালিতে নামেন। লিবিয়া তাকে জানিয়ে দেয় যে, কোন তৃতীয় দেশে বিচার হলে সে তার দু'জন নাগরিককে হস্তান্তরে রাজি আছে। অগত্যা যুক্তরাষ্ট্রকে লিবীয় প্রস্তাব মেনে নিতে হয়। এ প্রস্তাব অনুযায়ী লিবিয়া নেদারল্যান্ডের কাছে তার দু'জন নাগরিককে হস্তান্তর করে। এভাবে একটি আন্তর্জাতিক সংকটের নিষ্পত্তি হয়।

ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে বিরোধও এভাবে নিষ্পত্তি হতে পারত। তালেবান সরকার তাকে তৃতীয় একটি মুসলিম দেশের কাছে বিচারের জন্য হস্তান্তর করার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। সে নিজের হাতে বিচারের জন্য গোঁ ধরে। তালেবান সরকার এ অন্যায় দাবী মেনে নিতে পারেনি। এ জন্য সে মার্কিন রোষানলে পড়েছে। দু'মাসব্যাপী মার্কিন হামলা তারা মুখ বুঁজে সহ্য করেছে। কিন্তু তারা শেষ রক্ষা করতে পারেনি। এ বিপর্যয় তালেবান সরকারের নয়। আফগানিস্তানের বর্তমান দৃশ্য দেখলে স্বীকার করতেই হবে যে, এ বিপর্যয় ইসলামের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেদ শুধু লাদেনের ওপরই নয়, আফগানিস্তানের জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রীতি-নীতিও তার কাছে অসহ্য। কাবুল থেকে তালেবান যোদ্ধাদের পিছু হটে আসার পর সেখানে দাড়ি কাটার ধুম পড়ে যায়। মহিলারা বোরখা ফেলে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। কাবুল রেডিওতে সঙ্গীত বাজানো শুরু হয়। বাড়ী বাড়ী ডিশ এ্যান্টেনা সংযোগ নেয়া হয়। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। জার্মানীর বন সম্মেলনে রোম গ্রুপের দু'জন মহিলা প্রতিনিধি যোগ দেয় এবং ২৯ সদস্যের আফগান অন্তর্বর্তী সরকারে দু'জন মহিলাকে নিয়োগ দান করা হয়। টিভিতে বন সম্মেলনে যোগদানকারী দু'জন মহিলাকে বার বার দেখানো হয়। এদেরকে এমনভাবে দেখানো হয় যে, তালেবান সরকার নারীদের যেন চার দেয়ালের ভেতর বন্দী করে রেখেছিল। এবার তারা মুক্তি পেয়েছে। তালেবান সরকারের আমলে চালু প্রতিটি ইসলামী আইন-কানুন সম্পর্কে পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমে কটাক্ষপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। পাশ্চাত্যের এরূপ বিদ্বিষ্ট প্রচারণা এটাই প্রমাণ করছে যে, আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার লক্ষ্য ইসলাম ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে কথাটা

www.pathagar.com

সরাসরি স্বীকার করা হচ্ছে না। এটা স্বীকার করার মত কথাও নয়। তাই এ ব্যাপারে ছলাকলার আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, ওসামা বিন লাদেনকে ধরার জন্যই আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক অভিযান চালানো হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা মোটেও তা নয়। মার্কিন কর্মকর্তারা জানেন যে, ঘোষণা দিয়ে ইসলামের ওপর আক্রমণ করা অসম্ভব। এজন্য তারা ওসামা বিন লাদেনের মত একজন ব্যক্তি এবং তালেবান আন্দোলনের মত একটি শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। তারা বুঝতে পেরেছেন যে, লাদেন ও তালেবান আন্দোলন ধ্বংস হয়ে গেলে বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে।

পাশ্চাত্যের বৃহৎশক্তি কখনো মুসলমানদের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। পাশ্চাত্যে ইসলাম সম্পর্কেও রয়েছে ভুল ধারণা। তাদের বিশ্বাস যে, ইসলাম তরবারির জোরে প্রচারিত হয়েছে এবং এ ধর্মের অনুসারীরা সবাই 'বর্বর' ও নীচ প্রকৃতির লোক। তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়তিতেও সন্দেহ করে। তারা আমাদের নবী সম্পর্কে এমন কুৎসিত ধারণা পোষণ করে যা লেখার ও বলার অযোগ্য। ইসলামের নবী সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে কুখ্যাত সালমান রুশদীর স্যাটানিক ভার্সেস গ্রন্থে। রুশদীর স্যাটানিক ভার্সেস মুসলমানদের হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কোন অমুসলিমের এতটুকু কষ্ট হয়নি। এখানেই মুসলিম ও অমুসলিমদের মানসিকতার স্পষ্ট পার্থক্য ফুটে উঠে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, মুসলমানরা যেখানে কষ্ট পায় অমুসলিমরা সেখানে আনন্দে হাসে। সালমান রুশদী প্রশ্নে তাই ঘটেছে। যার ব্যথা সেই শুধু বুঝে। টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় আমেরিকা ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু সালমান রুশদীর স্যাটানিক ভার্সেস মুসলমানদের কতটুকু কষ্ট দিচ্ছে তা সে বুঝতে পারছে না। বুঝার তার প্রয়োজনও নেই। বরং সে খুশি হয়েছে এবং সালমান রুশদীকে রক্ষা করছে। সালমান রুশদীর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে মার্কিন সিআইএ। আমেরিকার ভাগ্যকে প্রশংসা করতে হয় এ কারণে যে, মুসলিম বিশ্বে কোন একটি দেশ পরাশক্তি নয় অথবা আমেরিকার সমকক্ষ কেউ নেই। আমেরিকাকে এক হাত দেখিয়ে দেয়ার মত শক্তি মুসলমানদের থাকলে বিশ্বের চেহারাটাই হত অন্য রকম। কিন্তু আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য যে, মুসলিম দেশগুলো একে তো ভৌগোলিক আয়তনে ছোট আবার সামরিক শক্তিতে খুবই দুর্বল। এরকম না হলে আমেরিকা টের পেত। সালমান রুশদীকে আশ্রয় ও রক্ষা করার খেসারত তাকে দিতে হত।

আমেরিকাকে দোষারোপ করার আগে আমাদের দোষ কোথায় এবং আমাদের দুর্বলতা কি, সেগুলো আগে খুঁজে বের করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা আমেরিকাকেই একটি উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। উত্তর আমেরিকার যে দেশটিকে আমরা আমেরিকা হিসেবে চিনি সে দেশটি হচ্ছে ৫০টি অঙ্গরাজ্যের সমন্বয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র। আয়তনে ৩৬ লাখ বর্গমাইল বা বাংলাদেশের মত ৬৫টি দেশের সমান। যুক্তরাষ্ট্রের শক্তির উৎস নিহিত রয়েছে এর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়। দেশটি যুক্তরাষ্ট্র না হয়ে ৫০টি খণ্ডে বিভক্ত থাকলে মুসলিম বিশ্বের যে অবস্থা এদের অবস্থা হত তার চেয়েও করুণ। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ একটি রাষ্ট্রসত্তা হওয়ায় এদেরকে মুসলিম বিশ্বের পর্যায়ে নেমে আসতে হয়নি। ১৮৬২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যায়। সে সময় দক্ষিণাঞ্চলের ১১টি অঙ্গরাজ্য বিদ্রোহ করে এবং

www.pathagar.com

স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন কঠোর হস্তে দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রকে ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করেন। সেদিন লিংকন যুক্তরাষ্ট্রের ভাঙ্গন ঠেকাতে না পারলে সে অঞ্চলে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রের জন্ম হত। সেক্ষেত্রে এসব রাষ্ট্র হত আমাদের মত দুর্বল এবং বিশ্বসভায় থাকতো অপরিচিত। আটলান্টিকের ওপারে ওরা আছে কিনা বোঝাই যেত না। যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনা থেকে আমরা একথা বুঝতে পারছি যে, মুসলিম দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে না পারার দরুন মার খাচ্ছে। আমরা যতক্ষণ বিভক্ত হয়ে থাকবো ততক্ষণ আমাদের মার খেয়েই যেতে হবে। এই যে এত মার আমাদের পিঠে পড়ছে তাতেও আমাদের হুঁশ হচ্ছে না। কেউ বলছে না, চল আমরা এক হয়ে যাই। প্রত্যেকেই আমরা নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। আমরা ভুলে যাই যে, আমরা মুসলমান। মুসলমানরা যতদিন মুসলমান ছাড়া নিজেদেরকে অন্যকিছু ভাবতো না ততদিন তারাই ছিল দুনিয়ার শাসক। আর যখনি তাদের মধ্যে সংকীর্ণ বিভক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তখনি তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। এখনো লাঞ্ছিত হচ্ছে একই কারণে।

আমাদের জন্য দুঃখ এটাই যে, মুসলমানরা অমুসলিমদের দিকে তাকায় না। তাকালে তারা দেখতে পেত যে, অমুসলিমদের অন্তরে মুসলিম বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু নেই। এ বিদ্বেষ থেকে গোটা অমুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তারা বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানে নেমেছে। এ অভিযানের প্রথম পর্যায়ে আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক অভিযান চলছে। এ অভিযান শেষ হলে আরেকটি টার্গেটে আঘাত হানা হবে। এভাবে একটির পর একটি টার্গেটে আঘাত করা হবে। ১৬টি লক্ষ্যবস্তু ইতোমধ্যে স্থির করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যবস্তুর প্রতিটি হয়তো মুসলিম দেশ নয়তো মুসলিম স্বাধীনতাকামী সংগঠন। পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমগুলো কথিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জোরেশোরে প্রচারণা চালাচ্ছে। প্রতিদিনই আমরা টিভি ও পত্র-পত্রিকায় 'সন্ত্রাসীদের' চেহারা দেখতে পাচ্ছি। প্রত্যেকের অবচেতন মনেই সন্ত্রাসীদের একটি চেহারা অঙ্কিত থাকে। কিন্তু টিভির পর্দায় ভেসে উঠা 'সন্ত্রাসীর' সঙ্গে সেই চেহারার কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না। আজকের 'সন্ত্রাসী' দেখতে ঠিক আমাদের পিতা অথবা মুরুব্বীদের মত যারা দাড়ি রাখতেন এবং টুপি মাথায় দিতেন। এই যদি হয় সন্ত্রাসীদের অবয়ব তাহলে আমাদের প্রিয়নবী (সঃ) পড়ছেন কোন কাতারে? ষড়যন্ত্র আজ কোন পর্যায়ে চলে গেছে তা ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। আমাদের মাথার ওপর খড়গ ঝুলছে। কার ঘাড়ে কখন পড়বে কেউ জানে না। আজ আফগানিস্তান, কাল সোমালিয়া, পরশু ইয়েমেন অথবা ইরাক এভাবেই চলবে। সন্ত্রাসবাদের যে সংজ্ঞা দাঁড় করানো হয়েছে তাতে মুসলমান মাত্রই সন্ত্রাসী। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কংগ্রেস তাকে যে কোন দেশের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থনও তিনি পাচ্ছেন। এ মুহূর্তে প্রত্যেক ক্ষুদ্র মতপার্থক্যগুলো ভুলে যাচ্ছে এবং একটি কেন্দ্রের দিকে তর তর করে এগিয়ে আসছে রাশিয়া, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশ এবং অন্যান্য দেশের মধ্যেও হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ঝড়ের গতিতে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাচ্ছেন। মুসলিম দেশও তিনি বাদ দেননি। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে নির্লজ্জ দালালিতে তার এতটুকু লজ্জা নেই। ক্রুসেডে লজ্জা পেলে কি চলে? তারা মুসলমানদের রক্তে হাত রঞ্জিত করে যীশুর

www.pathagar.com

সঙ্গে স্বর্গে যেতে চায়। ইসরাইলকে দিয়ে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের হত্যা করানো হচ্ছে। চেচনিয়ার মুসলমানদের রক্তে মধ্য এশিয়ার মাটি লাল করে দেয়ার জন্য রাশিয়াকে গ্রীন সিগন্যাল দেয়া হয়েছে। ভারতকেও কাশ্মীরী মুসলমানদের হত্যা করার জন্য লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ভারত সফরকালে কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধাদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন, সময়মত যুক্তরাষ্ট্র এদের প্রতি মনোযোগ দেবে। ফিলিপাইন সরকারও মার্কিন সহায়তা পাচ্ছে। তিনি গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছিলেন। সে সময় প্রেসিডেন্ট বুশ তাকে খুব খাতির-যত্ন করেছেন এবং শ' শ' কোটি ডলারের অস্ত্র সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইতোমধ্যেই এসব অস্ত্রশস্ত্রের চালান ফিলিপাইনে আসছে। মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের একটি ইউনিটও এসে গেছে। মার্কিন সৈন্যরা আবু সায়াফ গেরিলাদের সঙ্গে লড়াইয়ে ফিলিপিনো বাহিনীকে সহায়তা দিচ্ছে। চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মিটমাট হয়ে গেছে। উভয়ের মধ্যে এরকম একটা ঐকমত্য হয়েছে যে, চীন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানে সহায়তা দেবে এবং বিনিময়ে সে পাবে তাইওয়ান ও জিনজিয়াংয়ে যা খুশি তা করার স্বাধীনতা। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান চলছে তা মূলত ক্রুসেড। দ্বাদশ শতাব্দীতে পরিচালিত ব্যর্থ ক্রুসেডের শোধ নেয়ার জন্য এ নয়া ক্রুসেড শুরু হয়েছে। কিন্তু ক্রুসেডকে ক্রুসেড হিসেবে অভিহিত না করে যুৎসই নামকরণ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এটি ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটি লড়াই। কিন্তু সত্য কখনো চাপা থাকে না। প্রেসিডেন্ট বুশও চাপিয়ে রাখতে পারেননি। ফস করে তিনি বলেছেন যে, এটা ক্রুসেড। হ্যাঁ, সত্যি এটা তাই। কিন্তু আমাদের বিভ্রান্তি দূর হচ্ছে না। আমরা ভাবছি লাদেনকে ধরা পর্যন্তই মার্কিন অভিযানের শেষ সীমানা। আমাদের এরূপ ধারণা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ও মনে হয়েছিল যে, ইরানের পরে আর কোন মুসলিম দেশ আক্রান্ত হবে না। কিন্তু ১০ বছর না যেতেই দেখা যাচ্ছে যে, সুদান ও আফগানিস্তান আক্রান্ত হচ্ছে। আগামী ১০ বছরে মুসলিম দেশগুলোর অবস্থা কী হয় বলা যায় না। প্রত্যেকে ইরাক অথবা আফগানিস্তান হলেও বিস্মিত হওয়ার কিছুই থাকবে না।

১৪ ডিসেম্বর '০১
কলামিস্ট, সাংবাদিক।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার ঘটনাক্রম

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১, মঙ্গলবার ঃ যুক্তরাষ্ট্রে বিমান হামলায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগন বিধ্বস্ত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বুশ এই হামলাকে জাতীয় দুর্যোগ ঘোষণা করেন।

১২ সেপ্টেম্বর ২০০১, বুধবার ঃ যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলায় বিশ্বব্যাপী ক্ষোভ ও শোক প্রকাশিত হয়। সারা বিশ্বে শত শত ফ্লাইট বাতিল হয় এবং এয়ারপোর্টগুলোতে হাজার হাজার যাত্রী আটকা পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রে হামলাকারীকে অভিনন্দন জানায় ওসামা বিন লাদেন। প্রেসিডেন্ট বুশ হামলার প্রতিশোধ নেয়ার অঙ্গীকার করেন।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০১, বৃহস্পতিবার ঃ যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে ঢাকার সমর্থন। উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০০১, শনিবার যুক্তরাষ্ট্রে বিমান হামলায় অভিযুক্ত ১২ জন আরব মুসলমান নির্দোষ প্রমাণিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ ৪২০-১ ভোটে প্রেসিডেন্ট বুশকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি দেয়।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০০১, রোববার ঃ ওসামা বিন লাদেনকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়ে দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণা।

২১ সেপ্টেম্বর ২০০১, সোমবার ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ আফগানিস্তানের তালেবান প্রশাসনের প্রতি কড়া হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন-অবিলম্বে লাদেনকে হস্তান্তর করা না হলে কঠোর পরিণতি ভোগ করতে হবে। জাপান থেকে ভারত মহাসাগরে অভিমুখে রওনা দেয় মার্কিন রণতরী কিটি হক।

২২ সেপ্টেম্বর ২০০১, মঙ্গলবার ঃ মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ভূপাতিত করে তালেবানরা। সংযুক্ত আরব আমিরাত তালেবান প্রশাসনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। তালেবানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না বলে ঘোষণা দেয় পাকিস্তান।

২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১, বুধবার ঃ আফগানিস্তানের তালেবান সৈন্য সামানগান প্রদেশের রাজধানী আইবাকের অদূরে মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ভূপাতিত করে। তারা সম্ভাব্য মার্কিন হামলা প্রতিহত করার জন্য আফগান নাগরিকদের মধ্যে কালাশনিকভ রাইফেল বিতরণ করে। যুক্তরাষ্ট্রে বিধ্বংসী হামলায় অনুষ্কান ও উদ্ধার তৎপরতার জন্য জাপান সরকার ১ কোটি ডলার সাহায্য দেবে বলে ঘোষণা করে।

www.pathagar.com

২৬ সেপ্টেম্বর ২০০১, বৃহস্পতিবার ঃ জিয়া বিমান বন্দরে মার্কিন সামরিক বাহিনীর একটি বিমান অনির্ধারিত অবতরণ করে এবং তিন ঘন্টা অবস্থানের পর যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কাবুলে ব্যাপক বিক্ষোভ হয় এবং জনতা পরিত্যক্ত মার্কিন দূতাবাস ভবনে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। এ দিন মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে ৩৪ হাজার ৪ শত কোটি ডলারের সামরিক বিল অনুমোদন হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১, শুক্রবার ঃ যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত সন্দেহভাজন ১৯ জন বিমান ছিনতাইকারীর নামের তালিকা ও ছবি প্রকাশ করে।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০০১, শনিবার ঃ যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার কারণে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। অক্টোবর মাসের ৬-৯ তারিখে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবনে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১, রোববার ঃ আফগানিস্তানে ৮ বিদেশী ত্রাণকর্মীর বিচার আবার শুরু করে তালেবানরা। আফগান সরকার খ্রীস্টধর্ম প্রচারের অভিযোগে উক্ত ত্রাণ কর্মীদের গ্রেপ্তার করে।

০২ অক্টোবর ২০০১, সোমবার ঃ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ১২টি প্রজাতন্ত্র নিয়ে গঠিত 'কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস' (সিআইএস)-এর গোয়েন্দা প্রধানদের এক বৈঠক তাজিকিস্তানের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাস মোকাবিলায় সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মার্কিন সিনেট (৯৯-০ ভোটে) সর্বসম্মতিক্রমে ৩৪,৫০০ কোটি ডলারের প্রতিরক্ষা বিল পাস করে। এ অর্থ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা কর্মসূচি এবং সামরিক আবাসন ও সৈন্যদের বেতন বৃদ্ধিতে করা হবে।

০৫ অক্টোবর ২০০১, মঙ্গলবার ঃ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সপ্তাহব্যাপী সন্ত্রাস বিরোধী বিতর্ক শেষ হয়। ১৮৯ সদস্যের মধ্যে ১৬৭টি দেশ আলোচনায় অংশ নেয়। লিবিয়া এবং ইরাক জাতিসংঘের সন্ত্রাস বিরোধী প্রচারণায় কাজ করতে রাজি হয় নি। কারণ তারা মনে করে মার্কিন সরকারই সন্ত্রাসের মদদদাতা।

০৭ অক্টোবর ২০০১, রোববার ঃ টুইন টাওয়ার ট্র্যাজেডির ২৭ দিন পর ৭ অক্টোবর রোববার বাংলাদেশ সময় রাত ১০টা ২৫ মিনিটে মার্কিন ও ব্রিটিশ বিমান এবং যুদ্ধজাহাজ থেকে আফগানিস্তানে প্রচণ্ড হামলা শুরু হয়। মার্কিন ও ব্রিটিশ বিমান বহর কাবুল, কান্দাহার, মাজার-ই-শরিফ ও পূর্বাঞ্চলীয় জালালাবাদ শহরে বোমাবর্ষণ করে। এতে তালেবান সদর দফতরের শহর কান্দাহারের বিমানবন্দরসহ অধিকাংশ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ঘোষণা করেন, আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছি। হামলায় বি ৫২ ও উপগ্রহ নিয়ন্ত্রিত বি-১ বোমারু বিমান থেকে ৫টি ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এছাড়া ৫০টি টোমাহক ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়। এর জন্য ১৫টি বোমারু বিমান ও ২৫টি এফ-১৬ ও এফ-১৫ ঈগল যুদ্ধবিমান ব্যবহার করা হয়।

০৮ অক্টোবর ২০০১, সোমবার ঃ পেন্টাগন জানায় তালেবান, লাদেন ও আল কায়দার

www.pathagar.com

৩১টি লক্ষ্যস্থলে হামলা করা হয়েছে। তালেবান কর্তৃপক্ষ জানায়, রোববারের হামলায় পাঁচটি শহরে কমপক্ষে ২০ জন শিশু ও বৃদ্ধ নিহত হয়েছে। রাতে দ্বিতীয় পর্যায়ে থেমে থেমে কয়েক দফা হামলায় কান্দাহারে একটি বিমান ঘাঁটি, কয়েকটি তেলের ডিপো ও কাবুলে জাতিসংঘ পরিচালিত স্থলমাইন অপসারণ অফিস বিধ্বস্ত হয়। বোমার আঘাতে এ অফিসের দু'জন কর্মচারী সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হয়। চারতলা ভবনের ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে আরও দুজন নিহত হয়।

০৯ অক্টোবর ২০০১, মঙ্গলবার ঃ সকালে মার্কিন বাহিনী কান্দাহারে তালেবান শীর্ষনেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের বাড়িতে টোমাহক ক্রুজ মিসাইল হামলা চালায়। এতে বাড়িটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অল্পের জন্য বেঁচে যান মোল্লা ওমর। নিহত হন আবদুল রহমান নামের এক প্রতিবেশী। প্রথমবারের মতো দিনের আলোয় এফ-১৮ ফাইটার ও বি-১ বোমারু বিমান কাবুল, কান্দাহার ও মাজার-ই-শরিফে হামলা চালায়। এ সময় ১৫ টোমাহক ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করা হয় এবং কয়েকটি যুদ্ধবিমান কাবুলের আকাশে কয়েকদফা চক্কর দেয়। রাত ৯টার দিকে মার্কিন বি-১ বোমারু বিমান ও এফ-১৮ জেট ফাইটার থেকে মিসাইল ও বোমাবর্ষণ করা হয়।

১০ অক্টোবর ২০০১, বুধবার ঃ চতুর্থ দিনের মতো কান্দাহার বিমানবন্দর ও কাবুলসহ কয়েকটি শহরে দিন-রাত ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমা হামলা করা হয়। এসময় তালেবান যোদ্ধারা পাল্টা বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। রোববার থেকে মার্কিন হামলায় এ পর্যন্ত ৭০ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে বলে তালেবান কর্তৃপক্ষ দাবি করে।

লাদেনের আল কায়েদা গ্রুপ কাতারের আল-জাজিরা টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভিডিও বিবৃতিতে সারাবিশ্বের মুসলমানদের প্রতি আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং যেখানেই মার্কিন স্বার্থ সেখানেই আঘাত হানার আহ্বান জানায়। তালেবান কর্তৃপক্ষ লাদেনের ওপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে জানায়, বিন লাদেন এখন জেহাদে আছেন। মার্কিন বাহিনীকে সহায়তার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকার সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের দু'টি বিমান ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দেয়। তবে এই দু'টি ঘাঁটি কেবল উদ্ধার কার্যক্রম খাদ্য, ওষুধ ও জ্বালানি সরবরাহের মতো জরুরি প্রয়োজনে মার্কিন বাহিনী ব্যবহার করতে পারবে। আমেরিকা কোন অবস্থাতেই এ দু'টি ঘাঁটি থেকে আক্রমণ চালাতে পারবে না বলে পাকিস্তান শর্ত দিয়েছে।

১১ অক্টোবর ২০০১, বৃহস্পতিবার ঃ সকালে ভয়াবহ আক্রমণে রাজধানী কাবুল, তালেবানের শক্ত ঘাঁটি কান্দাহার, মাজার-ই-শরিফ এবং জালালাবাদ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আক্রমণ শুরুর পর থেকে সবচেয়ে ভয়াবহ এই হামলায় পাহাড় ধ্বংস করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি লেজার নিয়ন্ত্রিত ৫০০০ বাংকার বোমা'য় ধ্বংস করা পাউন্ড ওজনের 'জিবিইউ-২৮ বাংকার বোমায় ধ্বংস করা হয় তালেবানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। জালালাবাদে একটি মসজিদে মিসাইল নিক্ষেপে ১৫ জন মুসুল্লি নিহত হয় এবং মসজিদটিও ধ্বংস হয়।

১২ অক্টোবর ২০০১, শুক্রবার ঃ তালেবান সংবাদ সংস্থা বাখতার নিউজ এজেন্সি জানায় বুধবার রাতে কাবুলের ১২৫ কিলোমিটার পূর্বে একটি প্রত্যন্ত গ্রামে মার্কিন বোমায় কমপক্ষে ২০০ গ্রামবাসী নিহত হয়। তালেবান কর্তৃপক্ষ আরব ও পশ্চিমা সাংবাদিকদের

www.pathagar.com

কারাম গ্রাম সরেজমিন পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানায়।

১৩ অক্টোবর ২০০১, শনিবার ঃ আফগানিস্তানে মার্কিন হামলাকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় কানো শহরে অন্তত ২শ' জন নিহত হয়।

১৪ অক্টোবর ২০০১, রোববার ঃ রোববার রাতে বাদঘিস প্রদেশের রাজধানী কুয়ানওতে বিমান হামলায় ১২ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়।

১৪ অক্টোবর ২০০১, সোমবার ঃ প্রায় ৫০টি জঙ্গি বিমান ও বিমানবাহিনীর ১০টি বি-১ ও বি-৫২ ভারী বোমারু বিমান কাবুল বিমানবন্দরসহ ১৩টি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। তালেবান কর্তৃপক্ষ জানায়, সোমবার দিন ও রাতে মার্কিন হামলায় কমপক্ষে ৬১ জন নিরীহ আফগান নিহত হয়। রাত থেকে যুদ্ধ ও বোমারু বিমানের সঙ্গে যোগ দেয় ভয়ংকর কমান্ডো বিমান এসি-১৩০।

১৬ অক্টোবর ২০০১, মঙ্গলবার ঃ কাবুল কান্দাহার ও জালালাবাদের আক্রমণ অব্যাহত থাকে। কাবুল বিমানবন্দর সংলগ্ন আন্তর্জাতিক রেডক্রসের একটি ভবন গতকাল মার্কিন বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বিধ্বস্ত হয়।

১৭ অক্টোবর ২০০১, বুধবার ঃ কুয়াশায় ঢাকা ভোরে এসি-১৩০ খুব কাছে থেকে কান্দাহার ও এর আশপাশের এলাকায় বৃষ্টির মতো গোলা ও বোমাবর্ষণ করে। এতে কান্দাহারের বিদ্যুৎ ও টেলিফোন যোগাযোগ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। শহরের অদূরে আঘ্রানবাদে একটি যাত্রীবাহী বাসের ওপর বোমা পড়ে কমপক্ষে ১৮ জন নিহত হয়। কান্দাহারের একটি শরণার্থী শিবিরে বোমাবর্ষণে বেশ কিছু লোক হতাহত হয়। এদিন থেকে লক্ষ্যবস্তু স্থির করার জন্য মার্কিন বাহিনী মনুষ্যবিহীন গোয়েন্দা বিমান আরকিউ-১ ব্যবহার করা হয়।

১৮ অক্টোবর ২০০১, বৃহস্পতিবার ঃ তালেবান সামরিক স্থাপনাগুলোর ওপর প্রথমবারের মতো এফ-১৫ ঈগল যুদ্ধবিমানগুলো হামলা চালায়। প্রচণ্ড ক্ষিপ্রগতির এই ঈগলের হামলার ফলে কাবুলের উত্তরে তালেবানের ২টি মাদ্রাসা ও একটি তেলের গুদাম ভস্মীভূত হয়। এ সময় তেল আর গোলাবারুদ পোড়ার কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যায় কাবুলের আকাশ।

১৯ অক্টোবর ২০০১, শুক্রবার ঃ মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো জুমার দিনেও রাজধানী কাবুল ও তালেবানের শক্ত ঘাঁটি কান্দাহারে বোমাবর্ষণের ফলে ৭ জন পুলিশ নিহত হয়। তালেবানের আকাশ প্রতিরক্ষা ভেঙে পড়ার পর যৌথ বাহিনী তালেবানের গ্যারিসন ও অস্ত্র ভাণ্ডারগুলোতে আঘাত হানা শুরু করে। এ দিন আফগানিস্তানে মার্কিন স্পেশাল ফোর্স নামানো হয়।

২০ অক্টোবর ২০০১, শনিবার ঃ রাত ১১টার দিকে স্থল অভিযানে স্পেশাল ফোর্স তালেবান শীর্ষনেতা মোল্লা ওমরের কান্দাহারের বাড়িতে হামলা চালায়। তবে মোল্লা ওমর তখন বাড়ি ছিলেন না। তালেবান কর্তৃক দাবি করে, কান্দাহারের কাছে তারা একটি মার্কিন হেলিকপ্টারকে গুলি করেছে, যেটি পরে আফগান সীমান্তের কাছে এসে পাকিস্তানের ভূমিতে বিধ্বস্ত হয়। এতে দুজন মার্কিন সেনা কর্মকর্তা নিহত ও বেশ ক'জন

www.pathagar.com

আহত হয়। ২৪ ঘন্টায় কাবুল ও কান্দাহারে বোমা হামলায় প্রায় ৮০ জন নিরীহ আফগান নিহত হয়।

২১ অক্টোবর ২০০১, রোববার : মার্কিন বোমারু বিমান রাজধানী কাবুল, কান্দাহার ও মাজার-ই-শরিফে বোমাবর্ষণ করে। নির্বিচার বোমা হামলায় কান্দাহার নগরী তছনছ হয়ে যায়। শহরে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। কাবুলে বিমান হামলায় নারী ও শিশুসহ কমপক্ষে ১৮ জন বেসামরিক লোক নিহত ও প্রায় ২৫ জন মার্কিন কমান্ডো নিহত হয়েছে। শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় দক্ষিণাঞ্চলীয় তিরিনকোট শহরের কাছে একটি শরণার্থী বহরের ওপর মার্কিন বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত বোমায় ৯ শিশুসহ অন্তত ২০ জন শরণার্থী নিহত হয়।

প্রেসিডেন্ট বুশ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে আফগানিস্তানে যুদ্ধরত মার্কিন বাহিনীকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সহায়তা করার জন্য সিআইএ'কে আরও এক'শ কোটি ডলার অতিরিক্ত বরাদ্দ দেন। ১৯৪৭ সালে এই গোয়েন্দা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম এটিকে এত ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হল।

২২ অক্টোবর ২০০১, সোমবার : কাবুলে তালেবান নিয়ন্ত্রিত বার্তা সংস্থা বখতার রাজধানীর ৫০ কি.মি উত্তরের যুদ্ধ আবস্থানেও ব্যাপক মার্কিন বোমাবর্ষণের কথা জানায়। এর আগে মধ্য দক্ষিণাঞ্চলের উরুজগান প্রদেশের দু'টি স্বাস্থ্য ক্লিনিকেও মার্কিন বিমান হামলা চালায়ে ১৮ জন বেসামরিক লোক নিহত ও ২৫ থেকে ৩৫ জন আহত করে।

২৩ অক্টোবর ২০০১, মঙ্গলবার : টানা ১৭ দিনের মতো মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো কাবুল, কান্দাহার, মাজার-ই-শরিফ ও হেরাতে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে। পশ্চিমাঞ্চলীয় হেরাত শহরে একটি মসজিদে বোমা হামলায় নামাজরত অবস্থায় ১৫ জন মুসল্লি নিহত ও অর্ধশতাধিক আহত হয়। কান্দাহারে তালেবানের একটি তেলের ট্যাংকলরির ওপর বোমা বর্ষণে পাঁচজন নিহত ও ১০ জন আহত হয়। কান্দাহারের ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে একটি গ্রামে বোমা হামলায় নিহত হয় ৯৩ জন।

২৪ অক্টোবর ২০০১, বুধবার : পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি কাশ্মীরী গ্রুপ হরকাত-উল-মুজাহেদিনের ৩৫ জন সদস্য কাবুলে মার্কিন বোমা হামলায় নিহত হয়। পাকিস্তান প্রথমে তাদের মৃতদেহ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে তালেবান গোষ্ঠীর প্রতি কোন পাকিস্তানীকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না দেয়ার আহ্বান জানায়। মার্কিন গোলাবর্ষণে দক্ষিণাঞ্চলীয় দেহ রাউদের নিকটকর্তী একটি গ্রামে ১২ জন নিহত হয়। রাতে রাজধানী কাবুল এবং উত্তরের মাজার-ই-শরিফের কাজে একাধিক যুদ্ধ অবস্থানে ব্যাপক ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ৭ অক্টোবর শুরু হওয়া বিমান হামলায় তালেবানের যুদ্ধ অবস্থানে ব্যাপক ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ৭ অক্টোবর শুরু হওয়া বিমান হামলায় তালেবানের যুদ্ধ অবস্থান সামরিক সরঞ্জাম ও মানব-বিধ্বংসী মারাত্মক ক্লাস্টার বোমা ব্যবহারের ঘটনা এটাই প্রথম।

২৫ অক্টোবর ২০০১, বৃহস্পতিবার : মার্কিন জঙ্গি বিমান তালেবান বাহিনীর অবস্থানে ব্যাপক ক্লাস্টার বোমা ফেলে। মার্কিন বিমান তালেবান সদর দপ্তর কান্দাহারে প্রচণ্ড

www.pathagar.com

বোমাবর্ষণ করে। বিমান থেকে ফেলা বোমা যাত্রীভর্তি একটি বাসে আঘাত হানে, যাতে গাড়িটি পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়।

২৬ অক্টোবর ২০০১, শুক্রবার ঃ কাবুল ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে। রাতের অন্ধকারে তিন দফা বিমান হামলায় অন্তত সাতজন নিরীহ বেসামরিক নাগরিক প্রাণ হারায় এবং আফগান বিধবা ও পঙ্গুদের সাহায্যের জন্য রেডক্রসের ত্রাণসামগ্রীর দু'টি গুদাম ধ্বংস হয়। রাজধানীর উপকণ্ঠে ওয়াজিব আবাদ গ্রামে একটি বোমার আঘাতে তিনটি বাড়ি মাটির সঙ্গে মিশে গেলে ৬ ও ১১ বছরের দুই বোন নিহত হয়। গ্রেফতারকৃত বিরোধী নেতা আবদুল হককে শুক্রবার রাত ১টায় কালাশনিকভ রাইফেলের গুলিতে হত্যা করা হয়। আবদুল হক সাবেক বাদশাহ জহির শাহের পক্ষ থেকে শান্তি প্রক্রিয়ার উদ্যোগ নিতে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিলেন।

২৭ অক্টোবর ২০০১, শনিবার ঃ কাবুলে, কান্দাহার ও মাজার-ই-শরিফে তালেবান ফ্রন্টলাইনগুলোতে মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো দিনভর বোমাবর্ষণ করে। এ সময় তালেবান যোদ্ধারাও পাল্টা বিমানবিধ্বংসী রকেট লাঞ্চার নিক্ষেপ করে। উত্তরাঞ্চলীয় জোট নিয়ন্ত্রিত একটি গ্রামে লক্ষ্যভ্রষ্ট মার্কিন বোমায় এক মহিলার মৃত্যু ও ১০ জন আহত হয়। তালেবান কর্তৃপক্ষ বিরোধী জোটের আরও ৫ কমান্ডার ও ১৫ সৈন্যকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের খবর জানায়। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ভারতের মহারাষ্ট্রে পুলিশের গুলিতে ৭ জন নিহত হয়।

২৮ অক্টোবর ২০০১, রোববার ঃ সকালে কাবুলে মার্কিন বিমানগুলো কয়েকটি বোমা ফেলে। একটি বোমা একটি মাটির বাড়ি গুঁড়িয়ে দিলে বাবার সঙ্গে নাশতা করার সময় সাতটি শিশু প্রাণ হারায়। সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মাকে বিলাপ করতে দেখেন।

বোমায় পাশের আরেকটি বাড়ি বিধ্বস্ত হলে সেখানেও দু'টি শিশুর মৃত্যু হয়। মিনিবাসে করে কাবুল ছেড়ে পালানোর সময় বোমা পড়লে আরো দুজন বেসামরিক লোক নিহত হয়।

২৯ অক্টোবর ২০০১, সোমবার, মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় গোরাটঙ্গির দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় ওসামা বিন লাদেনের আস্তানায় বোমা হামলা চালায়। এলাকাটিতে বিন লাদেন একসময় আত্মগোপন করে থাকতেন। হামলায় ২ জন বেসামরিক আফগান নিহত হয়।

৩০ অক্টোবর ২০০১, মঙ্গলবার ঃ ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ তদন্তের জন্য পাকিস্তান তিনজন অবসরপ্রাপ্ত পরমাণু বিজ্ঞানীকে পক্ষ এফবিআই সিআইএ'র জয়েন্ট টিমের কাছে হস্তান্তর করে। এরা হলেন পাকিস্তানের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় পরমাণু বিজ্ঞানী সুলতান বশিরুদ্দীন মাহমুদ, পাকিস্তান এটমিক এনার্জি কমিশনের (পিএইসি) সাবেক প্রধান প্রকৌশলী আবদুল মাজেদ এবং ওই সংস্থারই সাবেক বিজজ্ঞানী মির্জা ইউসুফ।

৩১ অক্টোবর ২০০১, বুধবার ঃ আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল, তালেবান ঘাঁটি কান্দাহার ও মাজার-ই-শরিফসহ বিভিন্ন স্থানে মার্কিন বিমানবহরের হামলা অব্যাহত থাকে। ভোররাতে কান্দাহারে রেড ক্রিসেন্টের একটি ক্লিনিকে মার্কিন বোমা হামলায় ৫

www.pathagar.com

জন নারী ও শিশুসহ ১৩ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়। বোমার আঘাতে ক্লিনিকটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। তালেবান কর্তৃপক্ষ প্রথমবারের মতো একদল বিদেশী সাংবাদিককে কান্দাহার নিয়ে যায়। তাদেরকে রেড ক্রিসেন্টের বিধ্বস্ত ভবনটি দেখানো হয়। তালেবান কর্তৃপক্ষ মার্কিন ছোট্ট দল তালেবানবিরোধী জোট নিয়ন্ত্রিত উত্তরাঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে বসে।

০১ নভেম্বর ২০০১, বৃহস্পতিবার ঃ কান্দাহারের ৯০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে কাজাকি বিদ্যুৎ কমপ্লেক্সটি মার্কিন হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে তালেবান কর্তৃপক্ষ জানায়। তবে বাঁধ ভেঙে পানির স্রোত শুরু হয়নি। বাঁধটি ভেঙে আটকানো পানি বের হয়ে এলে ব্যাপক বন্যায় হাজার হাজার মানুষের জীবন বিপন্ন হবে।

০২ নভেম্বর ২০০১, শুক্রবার ঃ যুক্তরাষ্ট্রের বি-৫২ বোমারু বিমান আফগানিস্তানে কার্পেট বোমা বর্ষণ করে। কাবুলের উত্তরে তালেবান ফ্রন্টলাইনে ভয়াবহ হামলা চালায়। রমজান মাসেও আফগানিস্তানে হামলা অব্যাহত থাকবে বলে মার্কিন সরকার ঘোষণা দেয়। তালেবানরা দাবি করে দু'টি মার্কিন হেলিকপ্টার গুলি করে ভূপাতিত করা হয় এবং এগুলোতে প্রায় ৪০-৪৫ জন সৈন্য ছিল যাদের হত্যা করা হয়েছে।

০৩ নভেম্বর ২০০১, শনিবার ঃ মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের উত্তরে এবং তাজিকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি তালেবান ফ্রন্টলাইনে দিনভর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে। বিমান হামলায় কাবুলের ২১৫ মাইল উত্তরে স্টারকাশ গ্রামে তালেবানের প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙে পড়ে। শুক্রবার রাতে মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারের আহত চার ক্রুকে উদ্ধারের পর যৌথ বাহিনী হামলা আরও জোরদার করে।

০৪ নভেম্বর ২০০১, রোববার ঃ ১০ দিন আগে মাজহার আয়ুব খান নামে যে মার্কিনীকে আটক সিএনএন কর্মী জন পলেটন মারা যায়। সকালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় দাসতিকালায় ফ্রন্টলাইনে এযাবৎকালের ভয়াবহতম হামলা চালানো হয়। বি-৫২ বোমারু বিমান থেকে এই ফ্রন্টলাইনে সকাল ৯টায় মাত্র ১৫ মিনিটে কমপক্ষে ১০০ কার্পেট বোমাবর্ষণ করা হয়।

০৫ নভেম্বর ২০০১, সোমবার ঃ ভোর ৫টার দিকে কাবুল শহরে বোমাবর্ষণে ৮ জন নিহত হয়। মাজার-ই-শরিফের কাছে গ্রামে বোমাবর্ষণের ফলে ১০ জন গ্রামবাসী নিহত ও ১৫ জন আহত এবং কান্দাহারের কাছে ৫ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়। দক্ষিণাঞ্চলীয় দামান জেলায় ও বাখ প্রদেশের কাশেনদহ এলাকায় বোমায় ১৮ জন গ্রামবাসী নিহত ও ২২ জন আহত হয়।

০৬ নভেম্বর ২০০১, মঙ্গলবার ঃ ডেইজি কাটার্স নামের ১৫ হাজার পাউন্ড ওজনের ব্যাপক ধ্বংসাত্মক এ বোমাটি বিস্ফোরিত হলে আশপাশের ৬০০ গজের মধ্যে সবকিছু ধূলিসাৎ হয়ে যায়। জার্মান মন্ত্রীসভা গতকাল মার্কিন বাহিনীর সহায়তায় প্রায় ৪ হাজার সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সামরিক অভিযান জোরদার করতে পেন্টাগন আরও ২ হাজার কোটি ডলার মঞ্জুরী পায়।

০৭ নভেম্বর ২০০১, বুধবার ঃ মার্কিন বাহিনী মঙ্গলবার রাজধানী কাবুলের উত্তরে এবং তাজিক সীমান্তের কাছাকাছি তালোকানে তালেবান ফ্রন্টলাইনে প্রবল বোমাবর্ষণ করে।

www.pathagar.com

তালোকানে বি-৫২ বোমারু বিমানের প্রবল শক্তিশালী বোমায় চারপাশের ৩০ কিলোমিটার এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। মাজার-ই-শরিফে তালেবান ফ্রন্টলাইনেও বোমা হামলা জোরদার করা হয়। বিরোধী জোট কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ এ শহর অভিমুখে অভিযানে গতকাল যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করে। এ শহরের ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে শোলঘেরা জেলা গতকাল দখল করে নেয়। মাজার-ই-শরিফ ফ্রন্টলাইনে থেকে বিশ্বের এ যাবৎকালের বৃহত্তম সাধারণ বোমা বিএলইউ-৮২ বর্ষণ করে বিরোধী জোট।

০৮ নভেম্বর ২০০১, বৃহস্পতিবার ঃ প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ তালেবান কনসাল রহমতউল্লাহ কাকজাদা মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভে ইন্ধন জোগাচ্ছেন-এ অভিযোগে করাচিতে তালেবান কনস্যুলেট বন্ধ করার ঘোষণা দেন। আফগানিস্তানের তালেবান কর্তৃপক্ষ আমেরিকার পক্ষে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে ২০ জন আফগানকে গ্রেফতার করে। তালেবান ফ্রন্টলাইন দুর্বল করার মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের অগ্রযাত্রায় সহায়তা করার উদ্দেশ্যে উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের তাজিকিস্তান সীমান্তের কাছেও তালেবান অবস্থানে মার্কিন বিমান বোমাবর্ষণ করে। ১২ দিনে এ নিয়ে ৮ বার ওই এলাকায় বোমাবর্ষণ করা হয়।

০৯ নভেম্বর ২০০১, শুক্রবার ঃ আফগানিস্তানে বিরোধী জোটের হাতে উত্তরাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শহর মাজার-ই-শরিফের পতন ঘটে। মার্কিন বিমান হামলার সহায়তায় জোটের প্রবল আক্রমণের মুখে তালেবান যোদ্ধারা শহর ছেড়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। শহর দখলে জোটের অভিযানে ৯০ জন তালেবান যোদ্ধা নিহত হয়।

১০ নভেম্বর ২০০১, শনিবার ঃ পাকিস্তানী সাংবাদিক হামিদ মিরকে দেয়া সাক্ষাৎকারে লাদেন বলেন, আত্মরক্ষার জন্য তাদের কাছে রাসায়নিক ও পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে এবং আমেরিকা তাদের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করলে তারা পাল্টা জবাব দেবেন।

১১ নভেম্বর ২০০১, রোববার ঃ উত্তরাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শহর মাজার-ই-শরিফ এবং সামানগান, জোজজান, বালখ, সারা-ই-পুল, ফারিয়াব, বাদঘিস ও তাখার-এই সাতটি প্রদেশ দখলের পর বিরোধী জোট কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। তারা কাবুলের প্রধান সড়ক অভিমুখী পুল-ই-খুমার শহর দখলের দাবি করে বলে, যে কোন মুহূর্তে কাবুল দখলের অভিযান শুরু হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ বিরোধী জোটকে এ মুহূর্তে কাবুল দখল না করে দক্ষিণ আফগানিস্তানে অগ্রাভিযান চালানোর আহ্বান জানান।

১২ নভেম্বর ২০০১, সোমবার ঃ সকালে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কাছে কাবুলের পতন হয়। এর আগের রাতে তালেবানরা এই শহর ত্যাগ করে চলে যায়। বিরোধী জোট শক্তিশালী তালেবান ঘাঁটি দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার বিমানবন্দরও দখল করে নেয়। তারা ইরান সীমান্তবর্তী দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নিমরুজ প্রদেশও দখল করে নেয়।

দুই মাস একদিন পর আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটিতে আবারও একটি যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত হয়। মার্কিন সময় সকাল ৯ টার কিছুক্ষণ পর নিউইয়র্কের অদূরে কুইন্স এলাকার দক্ষিণ উপকূলের রকওয়েরে একটি আবাসিক এলাকায় ২৪৬ জন যাত্রী ও ৯ জন ক্রুসহ

www.pathagar.com

মোট ২৫৫ জন আরোহী নিয়ে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের যাত্রীবাহী দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট বিমান এয়ারবাস এ-৩০০-এর ৫৮৭ নম্বর ফ্লাইটটি বিধ্বস্ত হয়।

১৩ নভেম্বর ২০০১, মঙ্গলবার ঃ একজন তালেবান কর্মকর্তা ইরানী বার্তা সংস্থা ইরানকে জানায়, তালেবান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর, ওসামা বিন লাদেন ও শীর্ষ মিলিশিয়া কর্মকর্তারা নিরাপদ এবং সুস্থ রয়েছেন। আফগান ইসলামী প্রেসের এক খবরে বলা হয়, তালেবান নেতা মোল্লা ওমর তার বাহিনীকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কান্দাহার থেকে স্থানীয় সময় বিকেলে দেয়া এক বেতার ভাষণে তালেবান নেতা বলেন, আমি আপনাদের কমান্ডারদের নির্দেশ পুরোপুরিভাবে মেনে চলার নির্দেশ দিচ্ছি। এদিক-ওদিক না গিয়ে নিজেদের পুনর্গঠিত করুন।

১৪ নভেম্বর ২০০১, বুধবার ঃ সকালে তীব্র লড়াইয়ের মুখে আফগানিস্তানে উত্তরাঞ্চলীয় জোট তালেবানের মূল ঘাঁটি কান্দাহারের কাছাকাছি চলে যায়। এ সময় শহরে হাজার হাজার তালেবান যোদ্ধা বিরোধী জোটের হাতে ধরা পড়ে। এর আগে তারা জালালাবাদ শহর দখল করে।

১৫ নভেম্বর ২০০১, বৃহস্পতিবার ঃ তালেবান শীর্ষনেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর বিবিসি রেডিওকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আমেরিকাকে ধ্বংস করে দেয়ার বিশাল এক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। খুব শিগগিরই তা বাস্তবায়ন করা হবে বলে তিনি জানান। তালেবানের পতনের পর লাদেন যাতে সীমান্ত পার হয়ে পাকিস্তানে ঢুকতে না পারে সেজন্য পাক-আফগান সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। লাদেনকে গ্রেফতার বা হত্যার জন্য মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডোরা আফগান ভূমিতে পুরোদমে অভিযানে নেমে পড়ে।

১৬ নভেম্বর ২০০১, শুক্রবার ঃ ওসামা বিন লাদেনের খোঁজে আফগানিস্তানের গুহায় গুহায় শুরু হয় মার্কিন কমান্ডো বাহিনীর অভিযান। পাশাপাশি মার্কিন বোমাবর্ষণে কান্দাহারে তালেবানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভবন ও একটি মসজিদ ধ্বংস হয়। এতে কয়েকজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়। এদিন আফগানিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন পাকিস্তানী ভূমিতে লক্ষ্যভ্রষ্ট ৪টি মার্কিন বোমা পড়ে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিণত হয়েছে।

১৭ নভেম্বর ২০০১, শনিবার ঃ বি-৫২ বোমারু বিমান রোজার প্রথম দিনে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উত্তরাঞ্চলীয় কুন্দুজ শহর ও এর আশপাশের বাড়িঘরে প্রবল বোমাবর্ষণ করে। কুন্দুজ শহরে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তালেবান আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বলে বিরোধী জোটের কর্মকর্তারা জানান। তালেবানের একজন কর্মকর্তা ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের সামরিক প্রধান মোহাম্মদ আতেফের নিহত হওয়ার খবরটি নিশ্চিত করেন। পাঁচ বছর আগে তালেবান কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর আফগান রাজধানী কাবুলে উপস্থিত হন এক সাংবাদিক সম্মেলনে আফগানিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট বোরহানউদ্দিন রব্বানী। তিনি নিজেকে দেশের বৈধ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা দেন। কাবুলের উত্তরে বাগরাম বিমান ঘাঁটিতে ১শ' ব্রিটিশ সৈন্য

www.pathagar.com

মোতায়েন করা হয়।

১৮ নভেম্বর ২০০১, রোববার : মার্কিন ও ব্রিটিশ স্থলবাহিনী দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় আফগানিস্তানে ওসামা বিন লাদেনের অবস্থান সম্পর্কে এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে সেখানকার ৩০ বর্গমাইল এলাকা চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। উত্তর আফগানিস্তানে তালেবানের সর্বশেষ শক্তিশালী অবস্থান কুন্দুজের উপর মার্কিন বোমারু বিমান প্রচণ্ড রকমের হামলা চালায়। বোমার আঘাতে লণ্ডভণ্ড কুন্দুজের উপকণ্ঠ ঘন ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যায়। উত্তরাঞ্চলীয় জোট নতুন ক্ষমতা ভাগাভাগির সরকার গঠনে জাতিসংঘের উদ্যোগে দেশের বাইরে আলোচনায় বসতে রাজি হয়। জাতিসংঘ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি দুই বছরমেয়াদী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব দেয়। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী লন্ডনের দি অবজার্ভার পত্রিকাকে বলেন, ৪৮ ঘন্টার নোটিশে আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্য কয়েক হাজার ব্রিটিশ সৈন্য প্রস্তুত রয়েছে। স্পেনের একজন বিচারক ৮ জন ইসলামী জঙ্গীকে যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী হামলায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন।

১৯ নভেম্বর ২০০১, সোমবার : আফগানিস্তানে কোণঠাসা হয়ে পড়া তালেবান বাহিনী শর্ত সাপেক্ষে তাদের উত্তরাঞ্চলীয় শক্ত ঘাঁটি কুন্দুজ নগরীর নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে। তবে আল-কায়েদা সংগঠনের কট্টরপন্থী যোদ্ধারা কুন্দুজ দখলে রেখে আমরণ লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করে।

২০ নভেম্বর ২০০১, মঙ্গলবার : তালেবানের আত্মসমর্পণের সরাসরি বিরোধিতা করে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড পেন্টাগনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, ওয়াশিংটন তালেবান শীর্ষনেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর এবং আল-কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে নিহত দেখতে চায়। তাদের জীবিত অবস্থায় পাকড়াও করতে চায় না। তালেবান কর্তৃপক্ষ জানায়, দক্ষিণ আফগানিস্তানের কান্দাহার নগরীতে তাদের দৃঢ় অবস্থান অটুট রয়েছে। তাই কারো কাছে আত্মসমর্পণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আফগানিস্তানে তালেবানোত্তর একটি ব্যাপকভিত্তিক সরকার গঠনের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ২৬ নভেম্বর বার্লিনে এক সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করে।

২১ নভেম্বর ২০০১, বুধবার : কান্দাহারের সীমান্ত শহর স্পীন বোলদাকের নিরাপত্তা প্রধান মোহাম্মদ সাঈদ হাক্কানী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশকে ধরার জন্য ৫ কোটি ডলারের পুরস্কার ঘোষণা করেন। আফগানিস্তানের তালিবান নিয়ন্ত্রিত কান্দাহার ও কুন্দুজ শহরে ব্যাপক মার্কিন বিমান হামলা চালানো হলে এতে আবাসিক এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আফগানিস্তানে মোতায়েনের জন্য দু'হাজারের বেশী মার্কিন মেরিন সৈন্য প্রস্তুত রাখা হয়। ভারতীয় কূটনীতিক ও সেনা চিকিৎসক দল আফগানিস্তানে পৌঁছে।

২২ নভেম্বর ২০০১, বৃহস্পতিবার : মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড এইচ রামসফেল্ড বলেন, লাদেন যা করেছেন তাতে তাকে আমরা জীবিত ধরতে সক্ষম না হলে মৃতই ধরব। লাদেন যাতে তার আস্তানা থেকে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য মার্কিন কমান্ডোরা তার সম্ভাব্য সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

২৩ নভেম্বর ২০০১, শুক্রবার : টানা তিনদিন আত্মসমর্পণের ব্যর্থ চেষ্টার পর

www.pathagar.com

আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় কুন্দুজ শহরে অবরুদ্ধ তালেবানের ওপর মার্কিন বাহিনীর বিমান হামলার সহায়তায় উত্তরাঞ্চলীয় জোট সর্বাত্মক আক্রমণ চালায়। আমেরিকা এ শহরে অবরুদ্ধ হাজার হাজার দেশী-বিদেশী তালেবান যোদ্ধাকে ক্ষমা প্রদর্শন কিংবা আত্মসমর্পণের সুযোগ না দিয়ে হত্যা অথবা চিরবন্দী করার জন্য জোটের প্রতি আহ্বান জানায়।

২৪ নভেম্বর ২০০১, শনিবার ঃ আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে তালেবানের সর্বশেষ ঘাঁটি কুন্দুজের পতন শুরু হয়। অবরুদ্ধ তালেবান যোদ্ধারা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে রাজি হয়। পূর্ব ও পশ্চিম কুন্দুজে কয়েক হাজার তালেবান তাদের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কাছে আত্মসমর্পণ করে। দুপুর থেকে আত্মসমর্পণ ও তাদের অবরুদ্ধ কুন্দুজ থেকে সরিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

২৫ নভেম্বর ২০০১, রোববার ঃ উত্তরাঞ্চলীয় জোটের হাতে তালেবান ঘাঁটি কুন্দুজের পতন হয়। মাজার-ই শরিফে কারা বিদ্রোহে শত শত বিদেশী তালেবান নিহত হয়। সানডে টাইমসের খবরে জানা যায়, ইঙ্গ-মার্কিন জোট আফগানিস্তানের পর সুদান, সোমালিয়া ও ইয়েমেনে আক্রমণ চালায়। ❑

গ্রন্থনা মা, ম

১৫ ডিসেম্বর '০১

সংকলিত

www.pathagar.com

না-শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

মোহ্সেন মাখমালবাফ

ইরানের খ্যাতনামা চলচ্চিত্রকার। আফগান অন্ত-প্রাণ এই ব্যক্তি দেশটিকে উপজীব্য করে 'সাইক্লিস্ট' ও 'কান্দাহার' নামের দুটো ছবি তৈরী করেছেন। তাঁর পরবর্তী ছবি 'আফগানিস্তান'।

লেখাটা মনোযোগ দিয়ে পড়তে আপনার ঘন্টাখানেক মতো লাগবে। এই এক ঘন্টায় আফগানিস্তানে ক্ষুধা আর যুদ্ধে মারা যাবে আরো ১৪ জন। ৬০ জন হবে পরদেশে উদ্বাস্তু। এ বিপর্যয়, মৃত্যু আর ক্ষুধার কারণ অনুসন্ধান করা হবে এ নিবন্ধে। এই তিক্ত প্রসঙ্গটি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে কোন আনন্দ দিতে পারবে না মনে হলে দয়া করে এ লেখা পড়বেন না।

আফগানিস্তান সম্পর্কে বিশ্ব সম্প্রদায়ের ধারণা

২০০০ সালে দক্ষিণ কোরিয়া পুসান চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিয়েছিলাম। আমাকে আমার পরবর্তী চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু জিজ্ঞেস করা হলে বললাম, আফগনিস্তান। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো 'আফগানিস্তান জিনিসটা কী ? এটা কেন হবে ? একটা দেশ এমন বাতিল আর রদ্দি কেন হয়ে যাবে যে, এশিয়ারই আরেকটি দেশ দক্ষিণ কোরিয়া তার নামও শুনবে না ? কারণটা সবার জানা। আজকের পৃথিবীতে আফগানিস্তানের কোনো ইতিবাচক ভূমিকা নেই। কোনো বিশেষ পণ্য তৈরির কৃতিত্বের জন্য কিংবা বিজ্ঞানের কোনো অগ্রগতি কিংবা শৈল্পিক সম্মানের জন্য আফগানিস্তানের নাম কখনো উচ্চারিত হওয়ার কথা নয়। যারা আফগানিস্তান নামটার সঙ্গে পরিচিত, তারা এটিকে চোরাচালান, তালেবান, ইসলামী মৌলবাদ, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ এবং অন্তহীন গৃহযুদ্ধের নামান্তর মনে করেন।

এই মনগড়া ছবিতে কোথাও শান্তি, স্থিতিশীলতা অথবা উন্নয়নের ছিঁটেফোঁটা নেই। এ কারণে কোনো পর্যটক এ জায়গা ভ্রমণের স্বপ্ন দেখেন না, কোনো ব্যবসায়ীও এখানে অর্থ খাটিয়ে লাভ করার চিন্তা করেন না। তাহলে এ দেশ বিস্মৃতির অতলে তালিয়ে যাবে না তো কী? এ দুর্নাম এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, শিগগিরই অভিধানে লেখা হবে: আফগানিস্তান সেই মাদক প্রস্তুতকারী দেশ যার জনগণ বদমাশ, মারমুখি ও মৌলবাদী। এরা মেয়েদের পর্দায় মুড়ে রাখে। বাইরে বেরুতে দেয় না।

www.pathagar.com

এবার এই পুরো চিত্রটির সঙ্গে যোগ করুন বামিয়ানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের ঘটনাটি। এটি সম্প্রতি সারা বিশ্বে সহমর্মিতার ঝড় তুলেছে এবং শিল্প-সংস্কৃতির সমর্থকরা এ আক্রান্ত মূর্তি রক্ষার জন্য একাট্টা হয়েছেন। ভালো কথা। কিন্তু জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার জাপানের সাদাকো ওগাতা যখন সন্তাপ করে বলেন, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে আফগানিস্তানে ১০ লাখ লোক মৃত্যুর মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে-তখন কারো টনক নড়ে না কেন? কেন তখন কেউ এসব মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে না? ক্ষুধার্ত আফগানদের মৃত্যু প্রতিরোধে যখন কারো মুখে রা নেই, তখন বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করার বিরুদ্ধে এই উচ্চারিত আহাজারি কিসের? আজকের পৃথিবীতে কি তাহলে রক্তমাংসের মানুষের চেয়ে পাথরের মূর্তি বেশী মূল্যবান?

বাকি বিশ্ব যে চোখে দেখে, আমার চোখে কিন্তু তার চেয়ে আফগানিস্তান ভিন্ন-খুব জটিল, অন্যরকম আর ট্র্যাজিক এক চিত্র। সেই চিত্রে আফগানিস্তানের জনগণ খুবই ইতিবাচক এবং শান্তিপ্রিয় জনগোষ্ঠী হিসেবে উঠে আসে। এ চিত্র বিস্মৃতির বদলে দাবি করে মনোযোগ। দুর্ভাগ্যবশত কবি শেখ সাদির এ পংক্তি 'সব মানুষ একটি শরীরেরই অঙ্গ'-জাতিসংঘের এক চটকদার শ্লোগানই থেকে গেছে।

পরিসংখ্যানে আফগানিস্তান ট্র্যাজেডি

সোভিয়েত বাহিনীর দখলদারিত্ব থেকে শুরু করে গত ২০ বছরে ২৫ লাখ আফগান নিহত হয়েছে। এসব মৃত্যুর কারণ সামরিক হামলা, দুর্ভিক্ষ কিংবা চিকিৎসার অভাব। অন্য কথায়, এ ট্র্যাজেডিতে প্রতি বছর সোয়া লাখ কিংবা প্রতিদিন ৩৪০ জন কিংবা প্রতি ঘন্টায় ১৪ জন অথবা প্রতি ৫ মিনিটে একজন করে নিহত হয়েছে। আমাদের এ দুনিয়াতে মাসকয়েক আগে যে রুশ ডুবোজাহাজের ক্রুদের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিটি মিনিটের খবর প্রচার করেছে স্যাটেলাইট টিভিগুলো, সেখানেই বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের খবর অবিরত প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু গত ২০ বছরে প্রতি ৫ মিনিটে একজন আফগানের ট্র্যাজিক মৃত্যুর কথা কেউ বলে না।

আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে দোঘারুন শুল্ক দপ্তর পেরুতেই দেখলাম সাইনবোর্ডের অদ্ভুত দর্শন। কোনো জিনিস পড়ে থাকতে দেখার ব্যাপারে দর্শনার্থীদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। ওগুলো আর কিছুই না, মাইন। সাইনবোর্ডে লেখা আছে: 'আফগানিস্তানে প্রতি ২৪ ঘন্টায় সাতজন লোক মাইনের শরীরে পাড়া দিচ্ছে। সাবধান, আজ বা কাল না তাদের একজন হয়ে যান।' আমি দেখেছি, হেরাত শহরে ২০ হাজার নারী-পুরুষ-শিশু অভুক্ত অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুনেছে। ওদের হাঁটার শক্তিও নিঃশেষ। মাটিতে এলোমেলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ওরা অমোঘ নিয়তির প্রতীক্ষা করছে। দুর্ভিক্ষের কারণে ওদের এ অবস্থা। একই দিন সাদাকো ওগাতা সে এলাকা ঘুরে গেছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন, বিশ্ব তাদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে। তিনমাস ইরানি রেডিওতে শুনলাম, মাদাম ওগাতা ঘোষণা করছেন, আফগানিস্তান জুড়ে ক্ষুধায় ১০ লাখ মানুষ মৃত্যুমুখে।

এসব দেখেশুনে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, বুদ্ধের মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়নি, বুদ্ধ নিজেই লজ্জায় ভেঙে পড়েছেন। সে লজ্জা আফগানিস্তানের প্রতি বিশ্ববাসীর অজ্ঞতা দেখে। নিজেই বিশালত্বের মহিমা দিয়ে কিছুই করা যাবে না বুঝতে পেরে ভেঙে পড়েছেন বুদ্ধ।

www.pathagar.com

তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবেতে দেখলাম, এক লাখ আফগান শরণার্থী খালি পায়ে দক্ষিণ থেকে ছুটছে উত্তরে। মনে হচ্ছিল কেয়ামতের দৃশ্য দেখছি। বিশ্বের কোনো মিডিয়ায় এসব দৃশ্য দেখানো হয়নি। যুদ্ধকবলিত, ক্ষুধার্ত শিশুরা ছুটে বেড়াচ্ছে মাইলের পর মাইল। খালি পা। পরে ওই পলায়নের লোকগুলোর ওপর স্থানীয় শত্রুদের হামলা তারপর আশ্রয় দিতে তাজিক সরকারের অস্বীকৃতি। হাজারে হাজারে তারা মরতে লাগল। মরতে লাগল আফগানিস্তান আর তাজিকিস্তানের মধ্যে এক নো-ম্যানস ল্যান্ডে। কেউ তাদের খোঁজ নেয়নি। বিখ্যাত তাজিক কবি গোলরোশকার লিখেছেন, 'আফগানিস্তানের মনে যত দুঃখ, তত দুঃখে কেউ যদি মরে, অবাক হওয়ার কিছু নেই। অবাক শুধু এত দুঃখে আজও কেউ মরছে না।'

আফগানিস্তান ঃ চেহারাহীন এক দেশ

নানা কারণে আফগানিস্তানের কোনো চেহারা নেই। আফগান মেয়েরা চেহারাহীন। মানে দুই কোটি জনসংখ্যার এক কোটিকে চোখেই দেখা যায় না। যে জাতির অর্ধেক অংশকে দেখাই যায় না, সে জাতির চেহারা থাকে কী করে ? গত কয়েক বছরে কোনো টেলিভিশন প্রচারিত হয়নি এ দেশে। শুধু প্রচার করা হয়েছে শরিয়ত, হিভাদ ও আনিস প্রভৃত দুপৃষ্ঠায় সাদাকালো গুটিকয় পত্রিকা। তাও পত্রিকার শরীরে কোথাও কোনো ছবি নেই। শুধু ছাপানো অক্ষর। আফগানিস্তানে মিডিয়া বলতে এ সব। চিত্রকলা ও আলোকচিত্র কড়াভাবে নিষিদ্ধ। কোনো সাংবাদিককে দেশে ঢুকতে দেয়া হয় না। যদি কাউকে কখনো ঢুকতে দেওয়া হয়ও, কোথাও থেকে কোনো ছবি তোলা যাবে না।

সিনেমার জগতে বছরে দুই থেকে তিন হাজার চলচ্চিত্র তৈরী হয়। কিন্তু কোনোটাই আফগানিস্তানে নয়। আফগানিস্তানের ওপর ভিত্তি করে একটি হলিউডি ছবি তৈরী হয়েছে, র‍্যাম্বো। কিন্তু পুরো ছবিটিই তৈরি হয়েছে হলিউডে। একজন আফগানকেও সে ছবিতে নেয়া হয়নি। রুশ সৈন্যদের আফগানিস্তানে দখলদারিত্বের সময়কার স্মৃতিকে ভিত্তি করে দু'টি রুশ ছবি তৈরি হয়েছে। রুশরা বিদায় নেওয়ার পর মুজাহিদনিরা গুটিকয়েক ছবি তৈরি করেছিল। ছবিগুলো, বলাই বাহুল্য যুদ্ধের প্রোপাগান্ডা। আফগান শরণার্থীদের নিয়ে ইরানে দু'টি চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। আমি নিজে বানিয়েছি দু'টি ছবি। এই হলো ইরানী ও বিশ্ব মিডিয়ায় আফগানিস্তানের চেহারার তালিকা। এমন কি বিশ্বজুড়ে টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানগুলোতেও মাত্র সীমিতসংখ্যক প্রামাণ্যচিত্র বানানো হয়েছে। বিশ্বব্যাপী হয়তো একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যে আফগানিস্তানকে চেহারাহীন রাখতে হবে।

চেহারাহীন দেশের ঐতিহাসিক চেহারা

আড়াইশ বছর আগে আফগানিস্তান ছিল ইরানের একটি প্রদেশ। নাদির শাহের আমলে এটি ছিল বৃহত্তর খোরাসানের অংশ। ভারত থেকে ফেরার পথে এক মাঝ রাতে ঘুচানো মেরে ফেলা হলো নাদির শাহকে। নাদির শাহর সেনাবাহিনীর আফগান অধিনায়ক আহমাদ আবদালি চার হাজার সৈন্য নিয়ে পালিয়ে আসেন। ইরানের খানিকটা অংশ নিয়ে তিনি স্বাধীন রাজ্য ঘোষণা করেন। এভাবেই আফগানিস্তানের জন্ম।

সে আমলে আফগানিস্তানে মানুষ বলতে অধিকাংশই ছিল মেষপালক। ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল তারা। আহমাদ আবদালি পশতু গোষ্ঠীর লোক ছিলেন বলে তাজিক, হাজারো উজবেক প্রভৃতি গোষ্ঠী তার কর্তৃত্ব পুরোপুরি মেনে নিল না। এ কারণে

www.pathagar.com

চুক্তি হলো, গোষ্ঠী শাসন করবে সে গোষ্ঠীর নেতা, আর এসব স্থানীয় শাসক মিলে যৌথভাবে গঠন করবেন একটি গোষ্ঠীগত ফেডারেশন। তার নাম রাখা হলো 'লোয়া জিরগা'। আফগানিস্তানে এর চেয়ে ন্যায্য এবং কার্যকর আর কখনো সরকার ব্যবস্থা তৈরী করা যায়নি। এই 'লোয়া জিরগা' দেখলেই বোঝা যায়, আফগানিস্তানের মানুষ যে শুধু অর্থনৈতিকভাবে মেষপালনের অবস্থা থেকে খুব বেশিদূর এগোতে পারে নি তা নয়, গোষ্ঠীশাসন থেকেও এক পা এগোতে পারেনি তারা। আর এ কারণে কোনো মাতৃভূমি ত্যাগ না করা পর্যন্ত একজন আফগান তার আফগান সত্তা টের পায় না। কিন্তু আফগানিস্তানের ভেতরে তারা হয় পশতু, হাজারো উজবেক, নয়তো তাজিক।

আমি একবার দেখেছি, শুধু রুটির জন্য দাঁড়ানো লাইনে একজন আরেকজনকে টপকে যাওয়া নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সহিংসতা সংঘাত শুরু হয়ে গেছে। ইরান সীমান্তবর্তী নিয়াতাক শরণার্থী শিবিরে একটা পশতু আর হাজারা শিশু পরস্পরের সঙ্গে খেলাও বিপজ্জনক। কেননা এ রকম খেলাচ্ছলে বড়দের মধ্যেও ভয়াবহ দাঙ্গা বেঁধে যায়। তাজিক আর হাজারারা পশতুদের পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করে। পশতুরাও তাই। একে অন্যের মসজিদে নামাজ পর্যন্ত পড়তে যায় না।

আফগানিস্তানের এ চিরস্থায়ী গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতার মূলে রয়েছে মেষপালন-নির্ভর অর্থনীতি। প্রতিটি আফগান এক একটি উপত্যকায় ভৌগোলিক প্রাচীরের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকে। পার্বত্য পরিবেশ আর মেষপালন অর্থনীতির গহন থেকে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির ভেতর সে বন্দী হয়ে যায়। আফগানিস্তানের দুর্গম উপত্যকায় এ পশুপালন সংস্কৃতিরই ফসল তাদের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক মনোভাব।

আধুনিকতা বিরোধী আফগান সংস্কৃতি

১৯১৯ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত আফগানিস্তান শাসন করেছেন আমানুল্লাহ খান। তিনি ছিলেন রেজাশাহ ও কামাল আতাতুর্কের সমসাময়িক। ব্যক্তিগত জীবনে আমানুল্লাহ ছিলেন খুবই আধুনিক। ১৯২৪ সালে তিনি ইউরোপ সফরে যান। ফেরেন একটা রোলস রয়েস সঙ্গে নিয়ে। ফিরেই সংস্কার কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ সংস্কার কর্মসূচিতে আফগানদের পোশাক পরিচ্ছেদেরও পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা ছিল। নিজের স্ত্রীকে তিনি নেকাব সরিয়ে নিতে বললেন। পুরুষদের বললেন আফগান বস্ত্র পরিহার করে পশ্চিমা স্যুট ধরতে। আফগান রীতি লঙ্ঘন করে তিনি পুরুষদের বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করলেন। ঐতিহ্যবাদীরা শিগগিরই আমানুল্লাহর আধুনিকায়ন কর্মসূচির বিরোধিতা করতে শুরু করলেন।

পশুপালক গোষ্ঠীগুলোর কোনটিই এসব পরিবর্তন মেনে নিল না। শুরু হলো দাঙ্গা। এখানে আর্থ-সামাজিক ভিত্তি ছাড়াই আধুনিকতা একটি বিসদৃশ উপজাতি সমাজের ওপর সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এ এমন এক সমাজ, পশুপালনের ওপর যার অর্থনীতি নির্ভরশীল। কোনো শিল্প নেই, কৃষি নেই; এমন কি নেই সম্পদের ব্যবহারের প্রাথমিক উপকরণগুলোও। এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর বিয়েও হয় না।

এই ২০০১ সালে এমন কি ইরান-আফগান সীমান্তের শরণার্থী শিবিরগুলোয় পুরুষদের বহুগামিতা মেয়েদের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি চর্চা। পশতু ও হাজারা গোষ্ঠীর বিয়ের অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত থেকেছি। দেখেছি এসব বিয়েতে দোয়া করা হচ্ছে বরের যেন

www.pathagar.com

আরো জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ে হয়। প্রথমটায় ভেবেছিলাম ব্যাপারটা ঠাট্টা। আরেকটি বিয়ের অনুষ্ঠানে শুনলাম কনেপক্ষ বলছে, 'বরের পক্ষে যদি সম্ভব হয়, চারটি পর্যন্ত বউ রাখা উচিত। এটা ধর্মীয় প্রথা। তাছাড়া একদঙ্গল ক্ষুধার্ত মানুষেরও তো গতি হচ্ছে।'

কান্দাহারের বিয়ের গীত রেকর্ড করতে সাবেহ শিবিরে গিয়েছিলাম। দেখলাম দু'বছরের এক মেয়েশিশুর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সাত বছর বয়সী এক শিশুর। এ বিয়ের মাথামুণ্ডু বুঝলাম না। ছেলে বা মেয়েটির মতামত দেয়ার কোন ক্ষমতা নেই। আধুনিকতার প্রতি বিরোধিতা শুধু প্রথাগত সংগঠনের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় না, কখনো কখনো এ বিরোধী ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের মনোভাবের মধ্য দিয়েও প্রতিফলিত হয়। আমানুল্লাহর আমলে দরিদ্র সমাজে খচ্চরের জায়গায় ঘোড়া রাখাই ছিল সম্মান আর বনেদিয়ানার প্রতীক। কিন্তু রোলস রয়েস কেনা বঞ্চিতদের আরেক দফা বেশি অপমান। রোলস রয়েস আর খচ্চরের মধ্যে যে বিরোধ সেই একই বিরোধ ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মধ্যে। এ লড়াই আসলে দারিদ্র্য আর সম্পদের মধ্যেকার।

আজকের আফগানিস্তানে আধুনিকতার একমাত্র প্রতিনিধি অস্ত্র। দেশজুড়ে গৃহযুদ্ধ রাজনৈতিক সামরিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করার পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক অস্ত্রেরও বাজার। লম্বা দাড়ি আর বোরখার পাশে স্ট্রিংগার ক্ষেপণাস্ত্রের ছবি গভীর আধুনিকতার প্রতীক। ভোগ আর আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। অস্ত্র আফগান মুজাহিদদের দিয়েছে অর্থনৈতিক ভিত্তি। অস্ত্র কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। যদি আফগানিস্তান থেকে সব অস্ত্র সরিয়ে ফেলা হয়, যদি যুদ্ধ থেমে যায় এবং সবাই অঙ্গীকার করে কেউ কাউকে আর আক্রমণ করবে না- তাহলে আজকের সব মুজাহিদিনকে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে হবে।

তালেবান কারা ?

সমাজতত্ত্ববিদরা বলেন, একটি জাতি সরকারের কাছ থেকে প্রথম যা চায় তা হলো নিরাপত্তা। এরপর তারা দাবি করে কল্যাণ। পরিশেষে চায় উন্নয়ন ও মুক্তি। সোভিয়েত সৈন্যদের আফগানিস্তান ত্যাগের পর তুমুল গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ায় দেশজুড়ে নিরাপত্তাহীনতা তীব্র হয়ে ওঠে। নিরন্তর লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের নিজেদের নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা নিজেরাই করতে থাকে। এর ফলে কেউই গোটা দেশকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি। নির্মম পরিহাস হলো, প্রত্যেকে দেশকে নিরাপত্তাহীনতার আঁধারে ঠেলে দিয়ে নিজের নিরাপত্তা করার চেষ্টা করেছে।

ধর্মপ্রাণ তালেবানরা নিরস্ত্রীকরণের কৌশল নিয়ে এগিয়ে এল। তারা নিজেদের শান্তির দূত হিসেবে প্রচার করল। খুব দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠল তারা। অন্য কোনো গোষ্ঠী আফগানিস্তানে শাসনভার কব্জা করতে ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ তারা যুদ্ধ আর নিরাপত্তাহীনতা ছাড়া আর কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনি। হেরাতের লোকেরা কথা বলে ফারসি ভাষায়। আর তালেবানদের ভাষা পশতু। অথচ হেরাতে তালেবানদের সম্পর্কে যখন জানতে চাইলাম, এক দোকানদার জানাল, তালেবানরা আসার আগে সশস্ত্র লোকজনেরা নিয়মিত তার দোকান লুট করত। এখন আর তা হয় না। এমন কি যারা তালেবানদের বিরোধী তারাও স্বীকার করল, তালেবানরা যে নিরাপত্তা দিয়েছে তাতে তারা নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারছে।

www.pathagar.com

দু'টি কারণে তালেবানদের সময়ে নিরাপত্তা ফিরে এসেছে। প্রথম কারণটি হলো আমজনতার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো তালেবানদের দেওয়া কঠোর শাস্তি। যেমন, চুরির দায়ে শিরোচ্ছেদ করা হতো। এসব শাস্তি এতো কঠোর, অসহনীয় ও দ্রুত যে, হেরাতে ২০ হাজার অভুক্ত আফগানের চোখের সামনে একখণ্ড রুটি ফেলে রাখা হলেও কেউ সাহস করে তা কুড়িয়ে নেবে না। খোঁজ-খবর নিয়ে আমি জানতে পেলাম, তালেবানরা আসার আগেই বরং এক গোষ্ঠীর লোক আরেক গোষ্ঠীর ওপর হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটতো। নিরস্ত্রীকরণ ও পাথর ছুঁড়ে শাস্তি দেওয়ার বিধান এসব সহিংসতার অনেকাংশে হ্রাস করেছে।

আফগানিস্তানের দুর্দশা দেখে কারো হৃদয় গলেনি। পাষাণ হয়ে থেকেছে। শুধু যে একটি হৃদয় পাষাণ হতে পারেনি, সেটি বামিয়ান প্রদেশের সুবিশাল বুদ্ধমূর্তির হৃদয়। আফগান ট্র্যাজেডির করুণ দৃশ্য দেখে বিশালত্বের শত অহংকার সত্ত্বেও বুদ্ধ অপমানিত বোধ করেছেন। তিনি ভেঙ্গে পড়েছেন।

একটুকরো রুটির জন্য কাতরানো এক জাতির সামনে বুদ্ধ তার সৌম্যভাব আর টিকিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি লজ্জায় নিজেকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধ ধুলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে বিশ্বকে জানাতে চেয়েছেন আফগানিস্তানের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, নির্যাতন ও পিঁপড়ের মতো মানুষের মৃত্যুর কথা। কিন্তু বিশ্ববাসী শুধু বুদ্ধের ভেঙে পড়ারই শব্দ শুনতে পেল।

চীনা প্রবাদ আছে: 'আপনি আঙুল দিয়ে চাঁদ দেখাচ্ছেন, আর বোকা তাকিয়ে আছে আপনার আঙুলের দিকে।' কেউ বুদ্ধের আঙুলের ইশারা অনুসরণ করে একটা বিপন্ন দেশ দেখতে পেল না। যোগাযোগের বিষয়বস্তুর দিকে খেয়াল না করে আমরা কি কেবল যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকব? তালেবানদের অজ্ঞতা বা তাদের মৌলবাদ কি আফগানিস্তান নামক দেশটির ভয়ঙ্কর নিয়তির প্রতি বিশ্ববাসীর অজ্ঞতার চেয়েও গভীর?

আমজনতার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ও শাস্তির বিধান করে তালেবানরা দৃশ্যত আফগানিস্তানে নিরাপত্তা নিয়ে এসেছে। দিনে দু'ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার করে শরিয়ত রেডিও। দেশের কোথাও যদি যুদ্ধ চলে, শুধু জনমনে নিরাপত্তার বোধ যাতে নষ্ট না হয়, এজন্য তারা তা প্রচার করে না। কিছু প্রচার করলে তারা তা করে পরোক্ষভাবে। ধরা যাক যদি তারা বলে, তাখার প্রদেশের জনগণ তালেবানদের স্বাগত জানিয়েছে। আপনি ভালো করেই বুঝবেন, এর অর্থ হলো তালেবানরা তাখারে হামলা চালিয়ে তা দখল করে নিয়েছে। নিরস্ত্রীকরণ, শাস্তিবিধান ও এ জাতীয় প্রপাগান্ডা আফগানিস্তানে এমন এক নিরাপত্তার বোধ তৈরী হয়েছে, তালেবানরা আসার আগেকার নিরাপত্তাহীনতার বোধ থেকে যা ভিন্ন।

কে এই মোল্লা ওমর?

কান্দাহারের পথে আমার দৃশ্যত অন্তহীন যাত্রাপথের সর্বত্র মোল্লা ওমরের কথা শুনি। তার পদবি রাখা হয়েছে 'আমিরুল মোমেনীন' (বিশ্বাসীদের নেতা)। ইরানের রাজনীতিবিদদের কেউ কেউ মনে করে ইরানি সরকারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে মোল্লা ওমরের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কেউ

www.pathagar.com

কিছুই জানে না। কেউ বলে তার বয়স ৪০ ও এক চোখ অন্ধ। কিন্তু তার কোনো ফটোগ্রাফ না থাকায় এ তথ্যের সত্যাসত্য নিরূপণ করতে পারেনি কেউ। যার ছবি কেউ দেখেওনি একটি জাতি তাকে রাতারাতি নিজেদের নেতা কী করে বানাতে পারে? মোল্লা ওমরকে নিয়ে একটি সিনেমা বানাবার ইচ্ছে জাগলো আমার। রাজনৈতিক কারণে আমাকে এ পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করতে হয়েছে। কিন্তু আমার কৌতূহল আজও নিবৃত্ত হয়নি। আফগানিস্তানের যুদ্ধবিধ্বস্ত জনগণকে নিয়ে নিরস্ত্রীকরণ শিরোনামে পাকিস্তান যদি একটি চিত্রনাট্য তৈরী করতে পারে ও তা গ্রহণযোগ্যতা পায়, সে ক্ষেত্রে মোল্লা ওমর নামে যে নেতার কোন চেহারাই কেউ দেখেনি, তার চরিত্র কী করে রূপ দেবে? যে দেশের প্রতিটি গোষ্ঠীর রয়েছে নিজেদের একেকজন নেতা, সে দেশে কেউ একবার চোখেও দেখেনি এমন এক অদৃশ্য মানুষ কি করে সবার নেতা হয়ে উঠলেন? সম্ভবত এখানেই রয়েছে রহস্যের মূল চাবিকাঠি। পরিচিত জানাশোনা কাউকে আফগানিস্তানের নেতা করা হলে বরং তাকে অস্বীকার করা বা তার বিরোধিতা করার একটা কৌতুক শুনেছি। এক চায়ের দোকানে আফগান গ্রাহকরা নিয়মিত বসে আড্ডা দেয়। ওই দোকানে মালিকের একটি টিভি রাখা ছিল। সঙ্গে গাড়ির উইন্ডশিল্ড পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত উইন্ডওয়াপার চালু হয়ে যায়। মুহূর্তে টিভির পর্দা ঝকঝকে। মালিককে জিজ্ঞেস করা হলো, উইন্ডওয়াপারের বিষয়টা কী? জবাবে সে জানায়, টিভিতে কোনো অনুষ্ঠানে মুজাহিদিনদের কাউকেই দেখালেই তাদের বিরোধী আফগান দর্শকরা টিভির পর্দায় থু থু ছিটাতে থাকে। আফগানরা খুব জর্দা খায় বলে তাদের থুথুও হয় বাহারি রঙের। ফলে কিছুক্ষণ পরে টিভিতে আর কিছুই দেখা যায় না। এ কারণেই রাখা হয়েছে উইন্ডওয়াপার।

আফগান নেতাদের ভাবমূর্তি এমন বিতর্কিত ও সমালোচিত হওয়া সত্ত্বেও আফগানিস্তানে একজন নেতার অভাব সবাই অনুভব করছিল। এর একটাই যুৎসই সমাধান। এমন এক নেতা বানাতে হবে যার চেহারা বা অতীত ইতিহাস বলে কিছুই নেই। যার সমালোচনা করার কোনো রাস্তা নেই, যার শাসনকালে সীমান্তে টিভি দেখতে হলে উইন্ডওয়াপার প্রয়োজন হবে না। বুদ্ধের লজ্জার কারণে নিজে লজ্জিত হয়ে না পড়লে আমি এ নিবন্ধের নাম রাখতাম, 'আফগানিস্তান; চেহারাহীন এক দেশ'। মোল্লা ওমরের কথা যাকেই জিজ্ঞেস করেছি সেই বলেছে, তিনি পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। তিনি মানুষের আইনের বদলে কোরানকে দেশের সংবিধান বানিয়েছেন। তার শিষ্যরাও তার মতো ধার্মিক। আফগানিস্তানের পথের ভিক্ষুকটির মতো হতদরিদ্র জীবনযাপন করেন তিনি। আমি বুঝতে পারলাম এই চেহারাহীন লোকটির চেহারাই সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও আবেদন সৃষ্টিকারী। কেননা প্রাচ্যে কেউ আশা করে না যে, তাদের নেতা সবচেয়ে প্রাজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হোক। এখানে নেতাকে যদি আর দশটা মানুষের মতোই সাধারণ মনে হয় তাহলেই যথেষ্ট। এক আফগান আমাকে বলেছে, তার পেটে যখন ক্ষুধার আগুন জ্বলে, তখন সে এই ভেবে সান্ত্বনা পায় যে, মোল্লা ওমর সব সময় রোযা রাখেন। সে কারণে এ মুহূর্তে তাদের দুজনের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তাদের এমন একজন নেতা উপহার দেওয়ার জন্য ওই আফগান খোদাকে শুকরিয়া জানালো।

পশতুভাষী শরণার্থীদের মধ্যে একজনকে আমি পেয়েছিলাম যে, মোল্লা ওমরকে না দেখলেও, তাদের চেনে। আমি এমন কি এমন অনেক ইরানি রাজনীতিবিদ দেখেছি, যারা

www.pathagar.com

মনে করেন মোল্লা ওমর নামে সত্যি সত্যি একজনের অস্তিত্ব আছে এবং তিনি বেশ সুদর্শন। রাতের বেলা ইরানে ঘুমায় আর দিনের বেলা সীমান্ত পেরিয়ে আফগানিস্তানে খেজুর বেঁচে এমন একদল আফগানকে দেখেছি মোল্লা ওমরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে। তারা জানালো, মোল্লা ওমর সাধারণ এক মাওলানা ছিলেন। এক রাতে মহানবী তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে আফগানিস্তানকে রক্ষার দায়িত্ব দেন। যেহেতু খোদা তার সঙ্গে আছেন, সে কারণে আফগানিস্তান দখল করতে মোল্লা ওমরের মাত্র এক মাস সময় লেগেছে।

আফগান নারী ঃ সবচেয়ে শৃঙ্খলিত

আফগানিস্তানে দেখলাম মেয়েরা রাস্তায় বোরকা পরে ভিক্ষা করছে। পুরনো পণ্যের দোকানেও কেনাকাটা করতে দেখলাম মেয়েদের। মনোযোগ কাড়লো বোরকার ভেতর থেকে ফেরিওয়ালা বালকদের দিকে মেয়েদের বাড়িয়ে দেওয়া হাত। ফেরিওয়ালা মেয়েদের নেইলপলিশ লাগিয়ে দেয়। বহুদিন পর্যন্ত আমার মাথায় প্রশ্নটা খচখচ করেছে। নিজেরা নেইলপলিশ না কিনে আফগান মেয়েরা কেন ফেরিওয়ালার কাছ থেকে নেইলপলিশ লাগিয়ে নেয় ? অনেক পরে জানতে পারি, এতে নাকি সস্তা পড়ে। আমি নিজেকে বললাম, তীব্র দারিদ্র্য সত্ত্বেও বোরকার নিচে বন্দী আফগান মেয়েরা জীবন ও সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহ একেবারে বিসর্জন যে দেয়নি, এটা তারই ইঙ্গিত বহন করছে। আফগান নারীরা সামান্য হলেও রূপের প্রতি মনোযোগ দেয়। পরে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, সমাজে মেয়েদের বন্দি করে আসলে জীবনের ওপর নারীর অধিকারকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে যায় না। পর্দারূপী জেলখানার মধ্যেও আফগান মেয়েদের রূপচর্চা করতে হয়। স্বামীর অন্য স্ত্রীদের সঙ্গে রূপের প্রতিযোগিতা তাকে করতে হয়। আফগানিস্তানে তরুণদের মধ্যেও বহুগামিতা লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে অনেক আফগান বাড়িই এককেটি হারেমে পর্যবসিত হয়েছে। বিয়ের পণ এত চড়া যে বিয়ে করা মানে মোটামুটি একটি মেয়ে কেনা।

সিনেমার জন্য দৃশ্য সংগ্রহ করতে দিয়ে দেখলাম বুড়োরা ১০ বছর বয়সের কন্যা সন্তানকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে এবং পণের টাকা দিয়ে আবার নিজের জন্য ১০ বছর বয়সী আরেকটা বউ কিনেছে। দেখেশুনে মনে হলো সামান্য একটুখানি পুঁজির ক্রমাগত হাতবদল আফগান মেয়েদের এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি স্থানান্তর ঘটাচ্ছে। এর ফলে স্বামীর সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ বছর বয়সের তফাৎ বিশিষ্ট মেয়েদের সংখ্যা আফগানিস্তানে কম নয়। এসব মেয়ে অনেকক্ষেত্রে একই ছাদের নিচে বসবাস করে। তারা শুধু নিয়তির কাছে বশ্যতাই স্বীকার করেছে তাই নয়, তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

একবার এক আফগান মহিলাকে বলা হলো তাকে চলচ্চিত্রে নেয়া হবে। এতে তার স্বামী বলল, 'ওকি অসতী নাকি যে বেপর্দা হবে?' আমরা জানালাম বোরকাসহই তার ছবি নেওয়া হবে। স্বামী এবারও আপত্তি জানালো এই বলে যে, দর্শক তো বুঝতে পারবে বোরকার তলে একটা মেয়েমানুষ। তাতেই সতীত্ব চলে যাবে। নিজেকেই আমি বহুবার প্রশ্ন করেছি, তালেবানরা কি বোরকা এনেছে, নাকি বোরকাই এনেছে তালেবানদের ? রাজনীতি কি সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ডেকে আনে, নাকি সংস্কৃতিই রাজনীতিকে গড়ে তোলে ?

ইরানের নিয়াতাকে অবস্থিত শরণার্থী শিবিরে আফগান শরণার্থীরা নিজেরা পুরুষ ও মহিলাদের গণগোসলখানা বন্ধ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে দেয়ালের ওপাশে দিয়ে কেউ

www.pathagar.com

যাওয়ার সময় সে তো টের পাবে এপাশে নগ্ন মেয়েরা গোসল করছে। এতেই গুনাহ হবে। বর্তমানে আফগানিস্তানে মেয়ে ডাক্তার নেই। মহিলারা ডাক্তার দেখালে সন্তান অথবা স্বামীর সাথে কথা বলে। বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েরা কবুল বলে না। তার হয়ে বাবা বা ভাই কবুল বলে দেয়।

আফগান সহিংসতা

ফ্রয়েডের মতে মানুষের ভেতরে লুকিয়ে থাকা পশুই তার আগ্রাসী মনোভাবের উৎস। সভ্যতা এ পশুত্বের ওপর শুধু একটা পাতলা আস্তরণ হিসেবে কাজ করে। যখনই সংবাদ কিংবা যুদ্ধ বিগ্রহের আলোড়ন ওঠে, ওই হালকা পর্দা ছিঁড়ে যায়। বেরিয়ে আসে মানুষের পশুসত্তা। আমার বিশ্বাস এমন কি অত্যন্ত অগ্রসর সভ্যতাগুলোকে মানুষের সহিংসতা কেবল তার পদ্ধতিকে বদল করেছে। সভ্যতার কারণে মানুষ অহিংস হয়ে যায়নি। তলোয়ারের কোপে মাথা কেটে ফেলা আর বুলেট, গ্রেনেড মাইন ও মিসাইলের আঘাতে মানুষ মারার মধ্যে তফাৎটা কোথায়? অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনাটা আসলে আগ্রাসনের পদ্ধতির সমালোচনা মাত্র। আজকের পৃথিবীতে কেউ লাখ লাখ আফগানের মৃত্যুকে বিশ্বের অবিচার বলে আখ্যায়িত করে না। গৃহযুদ্ধ বা সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে আফগান জনসংখ্যার ১০ শতাংশের মৃত্যুকে কেউ আগ্রাসন বলে না। তরবারির কোপে কারো শিরচ্ছেদ ঘটানো হলে সেটা স্যাটেলাইট টিভির মূল শিরোনাম হয়ে দাঁড়ায়।

তরবারির কোপে কারো শিরচ্ছেদ দৃশ্য বীভৎস লাগে, কিন্তু ভূমি মাইনে প্রতিদিন সাতজন মানুষের মৃত্যুর খবর কেন বীভৎস নয়? কেন তলোয়ার আগ্রাসন মাইন নয়? আফগান আগ্রাসনের নামে আসলে যারা সমালোচনা করা হচ্ছে সেটি হলো আগ্রাসনের তরিকা। আগ্রাসনের মর্মবস্তুর সমালোচনা হচ্ছে না। একটা পাথরের মূর্তির জন্য বিশ্ব শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়, কিন্তু লাখ লাখ লোকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে তারা আশ্রয় নেয় পরিসংখ্যানের। স্তালিন যেমনটা বলেছিলেন, 'একজন মানুষের মৃত্যু ট্র্যাজেডি, কিন্তু লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু কেবল পরিসংখ্যান।'

আফগানিস্তানে যুদ্ধের নিয়তি

দোখারুন থেকে হেরাতে যাওয়ার সময় মনে হলো এক উত্তাল সাগর পাড়ি দিচ্ছি। মনে পড়লো, ক্যামেরায় দৃশ্য ধারণ করতে গিয়ে পারস্য উপসাগরে ঝড়ের মুখে পড়ার স্মৃতি। ঢেউয়ের ধাক্কায় ক্ষুদ্র নৌকা কয়েক মিটার পর্যন্ত উঁচুতে লাফিয়ে উঠছে, তারপর আছড়ে পড়ছে জলের ওপর। মাঝি বলল, নৌকা উল্টে গেলে আল-বিদা।

এবার সেই একই ঢেউ দেখলাম। তবে এবার ময়লার ঢেউ। শুরুতে আমাদের গাড়ি উতরায় বেয়ে নামল, তারপর চড়াই বেয়ে আবার পাহাড়ের মাথায় মাঝখানে গাড়ি ঠেলে এল আবর্জনার ঢেউ। এরপর গাড়ি সমতল এলাকা দিয়ে যেতে থাকল। রাস্তার অবস্থা জঘন্য। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের মতো উঠে আসছে কোদাল হাতে মানুষের ভিড়। যতদূর চোখ যায় শুধু কোদাল হাতে নেওয়া মানুষ। আমাদের গাড়ি তাদের কাছাকাছি যেতেই তারা কোদাল খোঁড়া গর্তে ময়লা ফেলে ভরাট করছে।

হেরাতে পৌঁছে দেখি রাস্তায় রাস্তায় কার্পেটের মতো ছড়িয়ে আছে মুমূর্ষু মানুষ। আমার

www.pathagar.com

কাছে এটাকে আর কোন দৃশ্য বলে মনে হলো না। ইচ্ছে হলো সিনেমা করা ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু করি। আফগানিস্তানের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা মাসুদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, নিজের ছেলেকে কি বানাতে চায় ? জবাবে বলেছিলেন, 'রাজনীতিবিদ'। এর অর্থ সমস্যা সমাধানের পথ হিসেবে যুদ্ধও অসার হয়ে পড়েছে এক সেনা অধিনায়কের কাছে। তিনি ভাবছেন আফগানিস্তানের সংকটের নিষ্পত্তি রাজনীতির পথে আসবে। আমার মতে, আফগানিস্তান সংকটের একমাত্র সমাধান হলো নিজেদের সমস্যাগুলো কঠোরভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শনাক্ত করা এবং যে দেশ নিজের ও বিশ্বের কাছে এতদিন চেহারাহীন থেকেছে সে দেশের সঠিক চেহারা তুলে ধরা।

কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধান

নিজেদের অভ্যন্তরীণ বাজার ফুরিয়ে যাওয়ার পর শিল্পোন্নত দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে হাত বাড়িয়েছে। নিজেদের পণ্যভোগের দাম চুকাতে অশিল্পায়িত দেশগুলোও একটা দুটো পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে ছাড়তে হয়েছে। যারা তাও পারেনি, তারা দিয়েছে সস্তা শ্রম। এই দেওয়া-নেওয়ার খেলায় পার্বত্য ভূমি এবং রাস্তাঘাটের অভাবের কারণে আফগানিস্তান তার কাঁচামাল সেভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে।

উৎপাদনে ভোগের এই বিশ্বব্যবস্থায় প্রবেশের ক্ষেত্রে হাতের কাছে সবচেয়ে সহজ সম্পদ কোনটা ? আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সেটা সস্তা শ্রম। রাস্তাঘাটহীন পার্বত্য আফগানিস্তানের কাঁচামালকে শিল্পোৎপাদনে ব্যবহার করার চেয়ে শ্রম একীভূত করা অনেক সহজ। আফগানিস্তানের ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে সামরিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে হবে। তার বদলে অর্থনৈতিক দিকনির্দেশনার কথা বিবেচনা করতে হবে। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, বর্তমান সংকটের একেবারে মূলগত এবং চূড়ান্ত সমাধান কর্মসংস্থান, সেক্ষেত্রে মাওয়ের চীন বা গান্ধীর ভারত কিংবা জাপানের মতো সরকারের সঠিক নীতিমালার মাধ্যমে আফগানিস্তানও বিশ্বময় বাণিজ্য এবং টিকে থাকার আন্তর্জাতিক চক্রে প্রবেশ করতে পারবে। আফগানিস্তানও বিশ্বময় লেনদেনে তার প্রকৃত অংশীদারিত্ব অর্জন করে নিতে পারবে, এবং পারবে এ অংশীদারিত্বের ব্যয়ভার বহন করতে। বর্তমান যুগের সভ্যতা ও আধুনিকায়নের সুবিধা আফগানিস্তানও নিতে পারবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আফগানিস্তানের অসুখ মোটেই বিপর্যয়ের পর্যায়ে চলে আসেনি। আফগানিস্তানের চিকিৎসকদের চমৎকার বাজার আছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব কোনো বিপর্যয় নয়। প্যারামেডিকসদের কয়েক মাসের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উপযোগী বাজার আছে এখানে। ক্ষুধা কোনো বিপর্যয় নয়। এ বাজারে বরং রুটির ভালো চাহিদা আছে। বরং এর মানে হলো এখানে গমের ভালো বাজার আছে। গমের অভাব আছে বাজারে। কিন্তু সেটাও তো কোনো বিপর্যয় নয়। গমের অভাব মানেই পানি সেচের বাজার রমরমা। পানি সেচ মানেই বাঁধ বানাতে শ্রমের দরকার। শ্রমিকদের বাঁধ কাজে শ্রম ব্যয় মানেই গমের উৎপাদন। গম উৎপাদন মানেই রুটির ছড়াছড়ি। রুটির বাজার ফুরিয়ে যাওয়া মানেই রুটি উদ্বৃত্ত হওয়া। এই উদ্বৃত্ত অংশই উন্নয়নের পেছনে ব্যয়। উন্নয়ন মানেই সভ্যতা।

যে দিন আমি আমার কোলে আমার নিজের মেয়ে হান্নার সমান বয়সী ১২ বছরের এক আফগান বালিকাকে ক্ষুধায় কাতরাতে দেখেছি, আমি এই ক্ষুধার ট্র্যাজেডিকে তুলে ধরার

www.pathagar.com

চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রতিবারই পরিসংখ্যান গিয়ে ঠেকেছে আমার বক্তব্য। ও আল্লাহ! আফগানিস্তানের মতো এতো নিঃসহায়, দুর্বল হয়ে গেলাম কেন সেই কবিতাটির মতো ভবঘুরে হয়ে পড়েছি, সেই হেরাতি কবির মতোই হারিয়ে গেছি কোথাও, কিংবা বামিয়ানের বুদ্ধের মতো ভেঙে পড়েছি লজ্জায়:

পায়ে হেঁটে এসেছি এখানে, হেঁটেই ফিরে যাব / যার ধন নেই, লোভ নেই সেই একই আগন্তুক ফিরে যাবে।

আমার নির্বাসনের দণ্ড আজ রাতে শেষ হয়ে যাবে / সরিয়ে ফেলা হবে শূন্য টেবিল।

বড় ব্যথা নিয়ে দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছি / আমাকেই সবাই দেখেছে ছুটে যেতে

যা আমার নয় সব রেখে চলে যাব / পায়ে হেঁটে এসেছি, হেঁটেই বিদায় নেব। ❑

১৫ ডিসেম্বর '০১

বিধ্বস্ত নগরী।

www.pathagar.com

ক্রুসেড ও জেহাদ

ফরহাদ মজহার

ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধর্মের ভূমিকা

একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করি। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে "লা-মজহাবি', 'ফরায়জি' বা "ওয়াহাবি"-দের ইতিহাস আমরা ভুলে গিয়েছি, কিম্বা জানা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি না। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার ইতিহাস কেচ্ছা আকারে আমাদের কানে আসে, কিন্তু ইতিহাস আকারে আসে না। আফটার অল এগুলো মুসলমানদের লড়াই এবং তা সাম্প্রদায়িক হতে বাধ্য। এটাই প্রথাগত ধারণা। ঠিক তেমনি "তালেবান' নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মধ্যে, বিশেষত মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের মধ্যে একটা ঘৃণার ভাব জাগে। তালেবান মাত্রই ঘৃণার যোগ্য। মধ্যযুগীয়, বর্বর ও হিংস্র। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে যে ভাবমূর্তি তৈরি করেছে সেটাই আমরা সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে গ্রহণ করি। জন্মসূত্রে আমরা মুসলমানের ঘরে জন্মেছি বলে অনেকে হয়তো লজ্জাও বোধ করেন। যাঁরা অতোটা হীনমন্যতায় ভোগেন না কিন্তু নিজেদের সভ্য ও আলোকিত বোধ করেন তাঁরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামের জঙ্গী রূপকে, বিশেষত পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে ইসলামের লড়াকু রাজনৈতিক অভিব্যক্তিকে তাঁদের দারুণ ভয়।

ইসলাম যেহেতু পশ্চিমা সভ্যতা বা সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার সমার্থক নয়, অতএব পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইসলামের একটা সুশীল ব্যাখ্যাও তাঁরা খাড়া করেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা যতোই হুংকার করি না কেন, নিপীড়িত শ্রেণী নানান কায়দায় নানান রূপে সেই সংগ্রাম করে। কিন্তু তাকে তার ঐতিহাসিক মর্যাদা দিতে আমরা নারাজ। নিশ্চয়ই নিপীড়িত শ্রেণী বা জনগোষ্ঠী কার্ল মার্কস বা লেনিনকে গুরু গণ্য করতে বাধ্য নয়। তাহলে তাদের সংগ্রাম কি তাদের শ্রেণীর সংগ্রাম হবে না ? নবী মুহম্মদ অনেকের লড়াকু আদর্শের নেতা হতেই পারেন। বিচারটা হবে তাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্যে বা চরিত্রটা কেমন ? জার্মানের কৃষক যুদ্ধ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, কী করে নিপীড়িত শ্রেণী ধর্মকে তাদের লড়াইয়ের মতাদর্শ আকারে গ্রহণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা সফলও হয়। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের গোড়াতেও

www.pathagar.com

ধর্মের ভূমিকা আছে। আল্লাহর চোখে সকলে সমান, অতএব মানুষের মধ্যে রাজা-প্রজা বা সামন্ত ও শাসিতের ভেদ নাই- এই ধারণার উৎপত্তি প্রথমে ধর্মতত্ত্বে। চার্চের বিরুদ্ধে লুথারের লড়াই - যার ফলে রাষ্ট্র থেকে চার্চ বাহ্যিক অর্থে আলাদা হয়ে গিয়েছে- সেখানেও ধর্মই প্রেরণা। কিন্তু সেটা খ্রিস্ট ধর্ম সম্পর্কে আমরা মানতে রাজি, এমন কি ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরাইলও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে আমরা সেটা মানতে রাজি নই। কেন এই অবস্থা তারও নিশ্চয়ই একটা ব্যাখ্যা দরকার। কেন ইসলাম বা মুসলমানদের সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্ব এবং "মানুষ এমন একটা ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে যার ফলে স্যামুয়েল হান্টিংটনের Clash of Civilisation বা সভ্যতার সংঘর্ষ অনিবার্য বলেই অনেকের কাছে মনে হয়। আসলেই ইসলাম কি সভ্যতার শত্রু ? কার সভ্যতা ? আর সভ্যতা ব্যাপারটাই বা আসলে কি ?

'তালেবান'-দের আমরা নিছকই মধ্যযুগীয়, বর্বর ও সভ্যতার দুশমন বলে গণ্য করতে শিখেছি। আমরা যারা অতি প্রগতিশীল তারা জানি যে, আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক বাহিনী উচ্ছেদের জন্য ওসামা বিন লাদেন ও তালেবান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র বিশদ ভূমিকা আমাদের জানা। এই জানার বরাতে আমরা বলি, যেহেতু আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অতএব তাদের সৃষ্ট তালেবানদেরও বিরোধী। কিন্তু মার্কিনীদের তৈয়ারি হয়েও ওসামা বিন লাদেন ও তালেবানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়ছে কেন ? প্রাণ দিচ্ছে কেন অকাতরে ? সেই প্রশ্ন কিন্তু তুলি না। উঠলেও সেটা বিস্ময়করভাবে চেপে যাই। এই ধরনের বহু যুক্তি ও কুযুক্তি, আবেগ ও ঘৃণা, নানাবিধ হীনমন্যতা এবং দিশাহারার মধ্যেই আমরা আছি।

তালেবানরা যখন বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙল তখন তাদের অসভ্য ও বর্বর বলে সারা পৃথিবীতে রব উঠল। তখনও আহমদ ছফা জীবিত। যখন আফগানিস্তানের শিশুরা না খেয়ে মারা যাচ্ছে তখন তালেবানরা মানবিক সহায়তা চেয়েছিল "সভ্য" দুনিয়ার কাছে। "সভ্য" দুনিয়া শিশুদের অনাহার, অপুষ্টি ও মৃত্যু রোধের জন্য এগিয়ে এলো না। কিন্তু বুদ্ধের মূর্তি রক্ষার জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার নিয়ে হাজির হোল। তালেবানরা বলল, আমরা অন্তত কিছুটা অর্থ শিশুদের জন্য ব্যয় করি। "সভ্য" দুনিয়া রাজি হোল না। ওটা নাকি মৃত মূর্তির জন্যই ব্যয় হবে, জীবিত শিশুদের জন্য নয়। তালেবানরা তখন মূর্তি ভেঙে দিল। চতুর্দিকে মূর্তিবাদী সভ্যতার জয়জয়কার শুরু হোল এবং তালেবানদের বিরুদ্ধে বর্ষিত হোল ঘৃণা। কেউই কিন্তু ব্যাপারটা আর খতিয়ে দেখল না। 'সভ্যতা'রই জয় হোল। "অসভ্য" ও "বর্বর" দের ওপর নির্বিচারে বোমা মারা এবং নারী ও শিশুদের ধ্বংস করাসহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এতো অবিশ্বাস্য ও নির্মম ঘটনা আর ঘটে নি। তালেবানদের সন্ত্রাসী ও বর্বর প্রমাণ করে অভাবনীয় মানবিক সংকট সৃষ্টির যুক্তি ও বৈধতা তৈরি করা হোল। এ ভাবেই। ধীরে ধীরে। অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ইরাকি শিশুদের মৃত্যু এবং ইরাকি জনগণের অবর্ণনীয় দুর্দশা 'সভ্যতা'-র কলিজায় কোন দয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। এখন আমাদের চোখের সামনেই আমরা আফগান জনগণের ওপর নারকীয় বোমাবর্ষণ লক্ষ্য করলাম। এই হচ্ছে বিশ্ব সভ্যতা। যাকে রক্ষার জন্য তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। আফগানিস্তানের যুদ্ধের দিকে তাকালে আমরা বুঝব ক্রমশ যুদ্ধের তীব্রতা বাড়ছে ও মেরুকরণও তীব্র হচ্ছে। এই যুদ্ধ, জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার ঠিকই

www.pathagar.com

বলেছেন ক্রুসেডের মতো দীর্ঘস্থায়ী হবে।

বৌদ্ধমূর্তি ভাঙার পক্ষে তালেবানদের যুক্তি সম্পর্কে আহমদ ছফা আমাকে প্রথমে অবহিত করেন এবং 'সভ্যতা' রক্ষার জন্য তালেবানদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে বাংলাদেশে যাঁরা বিবৃতি দিয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে তাঁর স্বভাবসুলভ হাসিতামাশা করেছেন। পরে এ সম্পর্কে দুজনেই আরও খোঁজ খবর নেই এবং পশ্চিমা প্রপাগান্ডায় বিভ্রান্ত না হয়ে এই দেশের জনগণের জন্য সঠিক অবস্থান অনুসন্ধানের তাগিদ অনুভব করি। কিন্তু এই কাজটি হবার আগেই ছফা চলে গেলেন। এই সম্পর্কে ছফার সঙ্গে আমি ছাড়াও আরও অনেকেরই কথা হয়েছে নিশ্চয়ই। আমার সঙ্গে নানান আলোচনার মধ্যে যে দিকটা প্রাসঙ্গিক আমি সে দিকটার এখন খানিকটা তুলে অন্য প্রসঙ্গে যাব।

মূর্তি বনাম জীবন্ত শিশু

আহমদ ছফা "আধুনিক সভ্যতা"-র সমালোচক ছিলেন সত্যি, কিন্তু বিদ্যমান সভ্যতার দিগন্ত বা মূল জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি বড়ো ধরনের কোন সন্দেহ তাঁর ছিল না। আধুনিকতা বা এই যুগের অগ্রগামিতা তিনি মানতেন। "প্রগতি"-র ধারণার মধ্যেই যে একটা মুশকিল আছে এটা তিনি সম্ভবত টের পেতেন, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে আলাপচারিতা ছাড়া বিষয়টি খোলাখুলি লিখিতভাবে মোকাবিলা করেছেন বলে আমার চোখে পড়ে নি। কোন্ সভ্যতা বা জীবনযাপন পদ্ধতি "আধুনিক", "প্রগতিশীল" বা "সভ্য" আর কোন্ জীবনযাপন "মধ্যযুগীয়", "পশ্চাতপদ" বা "বর্বর", কে, কীভাবে, কোন্ মানদণ্ড দিয়ে সেটা ঠিক করে — এই প্রশ্ন তাঁরও ছিলো। তবুও তিনি "রেনেসাঁ"পন্থী ছিলেন। সংস্কার ও নব জাগরণের প্রতি তাঁর আস্থা ছিলো। বিপ্লবী রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ছিলো, কিন্তু সশস্ত্রতা বা রক্তপাতকে সহজে মেনে নিতে পারতেন না। বাংলাদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীকে "আলোকিত" পথে নেবার একটা কর্তব্য রয়ে গিয়েছে, এটা মানতেন। তাদের "মধ্যযুগীয়" ধ্যানধারণা ও পশ্চাতপদতা থেকে তাদের "যুগোপযোগী" করে গড়ে তোলাটা তাঁর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্তব্য। এই জ্ঞান তাঁর ছিল। কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও তালেবানদের প্রতিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একই রকমই ছিল। তাঁর বরাতে এর বেশী কিছু বলার এখন দরকার নেই।

কিন্তু বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙার বিষয়টা তাঁকে "সভ্যতা" সম্পর্কে দারুণ ভাবিয়েছে। তেমনি হয়তো আরও অনেককেও। মূর্তি বনাম জীবন্ত শিশু। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের দুনিয়ায় লড়াইটা কার সঙ্গে কার সেই প্রশ্নের উত্তর বিমূর্ত কায়দায় তুলতে ছফা নারাজ ছিলেন। ঝগড়াটা কমিউনিজমের পতনের পর ইসলামের সঙ্গে কেন ? পশ্চিমা বিশ্ব ইহুদিবাদী ইসরাইলী রাষ্ট্রকে মানতে পারে কিন্তু ফিলিস্তিনী জনগণের জন্য স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র মেনে নিতে পারে না কেন ? সেটাও যদি মেনে নেওয়া যায় তবুও দ্বিতীয় ইন্তিফাদায় আমরা দেখলাম গুলতি দিয়ে যে ফিলিস্তিনী কিশোর ইসরাইলী ট্যাংকের বিরুদ্ধে লড়ছে সেটা হয়ে যাচ্ছে "সন্ত্রাসী" কর্মকাণ্ড। মুসলমান কিশোর মাত্রই "সন্ত্রাসী" হয়ে পশ্চিমের বিরুদ্ধে জেহাদ করবার জন্য প্রশিক্ষিত হচ্ছে। মাদ্রাসা মানেই জেহাদি মুসলমান তৈরির কারখানা। অসভ্যতা, বর্বরতা ও হিংস্রতা শেখাবার জন্যই নাকি

www.pathagar.com

মাদ্রাসা। আর "আধুনিক পশ্চিমা শিক্ষা"-য় শিক্ষিতরা ও পশ্চিমা সভ্যতায় বিশ্বাসীরা সুশীল। তাঁরা সন্ত্রাস করেন না। যুদ্ধ করেন না। কাউকে মারেন না। তাহলে দুনিয়ায় এই যে বোমাবাজি, বিপুল সমরাস্ত্র, মানুষ হত্যার অবিশ্বাস্য আয়োজন একমাত্র মাদ্রাসার ছাত্রদেরই জন্যই ঘটেছে। নয় কি ? আধুনিক শিক্ষা বা বিজ্ঞান চর্চার জন্য নয়। মুসলমানরাই পারমাণবিক অস্ত্র বানিয়েছে, হিরোশিমা-নাগাসাকিতে বোমা বর্ষণ করেছে। একমাত্র সাদ্দাম হোসেনই বায়োলজিক্যাল যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করছে। মুসলমান ছাড়া এই বদ কাজগুলো করবেটা কে ?

জীবিত শিশু নাকি মৃত মূর্তি ? আমাদের শুরুতেই এই প্রশ্নটা তুলতে চাইছি এই সভ্যতার চরিত্র সম্পর্কে তর্ক আরও খোলাসা করে তোলার জন্য। এই প্রসঙ্গে "দি ইকনমিস্ট" পত্রিকার (৩ নভেম্বর ২০০১) একটি ছবির প্রতি নজর দেবার সবাইকে অনুরোধ করব। একটি শিশু আরেকটি শিশুকে কাঁধে করে যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা থেকে প্রাণে বাঁচবার জন্য ছুটে যাচ্ছে। এই ছবির পাশে ইকনমিস্টের ঘোষণা হোল, "এতে আমাদের প্রাণ কাঁদে ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধটা খুবই দরকার" (A heart-rending but necessary war)" কথাটা পরিষ্কার। বলা হচ্ছে, আমাদের স্বার্থের জন্য আমরা এই শিশুদের হত্যা করবই। আমাদের মন খারাপ লাগবে। কিন্তু "In this war, there will be no going back "। মরুক নারী, শিশু আর সাধারণ মানুষ—কিন্তু এই যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা যাবে না।

এই হোল পশ্চিমা সভ্যতা। তথাকথিত "আধুনিক সভ্যতা"। ইকনমিস্ট যেমন তেমন পত্রিকা নয়। ব্যাপারটিকে নিছকই একটি পত্রিকার ব্যাপার গণ্য করলে আমরা মারাত্মক ভুল করব। এখানে খেয়াল করতে হবে এই কথাগুলো লিখিতভাবে বলা হচ্ছে। এই যুদ্ধ ও সহিংসতার পক্ষে এই নীতিবর্জিত ও নির্মম সিদ্ধান্ত। এই হচ্ছে "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"। ছবি ছাপিয়ে, এমন কি যে ধরনের শিশুদের মারা হবে তাদের ছবি ছেপে দিয়ে অনায়াসে ও অকাতরে শিশুদের জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা লেখা হয়েছে, হচ্ছে। বলছে ইকনমিস্ট, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অতি সামনের সারির মতাদর্শিক প্রতিনিধি। প্রধান প্রধান পশ্চিমা পত্র-পত্রিকায় এ ভাবেই হত্যার কথা বলা হয়। শুধু সাদ্দাম হোসেন, মোল্লা ওমর বা ওসামা বিন লাদেন নয় — শিশু ও নিরীহ মানুষও তাদের টার্গেট। নিরীহ অবোধ শিশু মরুক কিন্তু আমাদের স্বার্থই বহাল থাকবে। অতএব যুদ্ধ মাত্রই সকলকেই আমাদের অধীন করা—এই হচ্ছে এই ধরনের স্টোরির মর্মার্থ।

ক্লিনটন প্রশাসনের সেক্রেটারি ম্যাডেলিন অলব্রাইটকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল ইরাকে মার্কিন অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে পাঁচ লক্ষ ইরাকি শিশু মারা গিয়েছে, এই সম্পর্কে তাঁর মতামত কি ? তিনি বললেন, "এটা শক্ত সিদ্ধান্ত"। তবে সবদিক বিবেচনা করে we think the price is worth it। 'আমরা সবকিছু বিবেচনা করে যা করেছি তার জন্য পাঁচ লাখ ইরাকি শিশুর মৃত্যু এমন কিছু নয়। ঠিকই আছে'।

এটাই যখন বাস্তবতা তখন বিপরীতে ওসামা বিন লাদেন বা তালেবানদের কর্মকাণ্ডের নৈতিক মূল্যায়ন রীতিমতো হাস্যকর ও তুমুল তামাশা ছাড়া কিছুই না। কে সন্ত্রাসী আর কে সন্ত্রাসী নয় সেটা বৃথা বাহাস। "সন্ত্রাস" সম্পর্কে গুরুগম্ভীর তত্ত্ব ও নীতিকথাও বাজে

www.pathagar.com

ও ফালতু তর্ক। প্রশ্নটা আসলে অতি সহজ ও সরল। জর্জ বুশ সেটা খুব সুন্দর ভাষায় পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আমরা এবং তোমরা। হয় তোমরা আমাদের সঙ্গে অথবা তোমরা ওদের পক্ষে—অতএব আমাদের দুশমন। সন্ত্রাসী। তোমাদের বরাতে ওদের মতোই ধ্বংস তোমাদের অবধারিত। আমাদের শত্রু হবার শাস্তি তোমাদের ভোগ করতেই হবে। হয় তোমরা আমাদের আধিপত্য ও অধীনতা মেনে নাও—অথবা ধ্বংস হয়ে যাও। এই হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিত। এখানে এসে "আধুনিক সভ্যতা"-র দিগন্ত হঠাৎ প্যান্ট এমন কি প্যান্টের তলের আন্ডারওয়ার খুলে ল্যাংটা হয়ে আমাদের সামনে ঝুলে পড়েছে। এখন আমাদের কী কর্তব্য? বৌদ্ধ মূর্তি বনাম আফগান শিশু নিয়ে আহমদ ছফার উদ্বিগ্নতাই আরও তীব্রভাবে ইকনমিস্টের ছবির মধ্য দিয়ে হাজির হয়েছে। আহমদ ছফা রাষ্ট্র সভার প্রথম আলোচনার জন্য আমরা যে বিষয় স্থির করেছি তার গোড়ায় এই গুরুতর প্রশ্নগুলো রয়েছে।

ক্রুসেড জেহাদ বা শ্রেণী সংগ্রাম শিরোনামে আমাদের আলোচনার প্রস্তাব অবিলম্বে কোন একটা শেষ, চরম বা পরম সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য নয়। বরং এই কালে বিপ্লবী রাজনীতি পুনর্গঠনের জন্য জরুরী মূল প্রশ্নগুলোকে ঠিকভাবে তুলবার চেষ্টা। প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমরা আলোচনা শুরু করছি না। বরং তুলতে পারছি কিনা সেটা পরখ করবার জন্যই আলোচনা। আমাদের আশা এই আলোচনা আমরা চালিয়ে যেতে পারব এবং বাংলাদেশে আমাদের বাস্তব কর্তব্যগুলো সম্পর্কে কর্তব্যকর্ম নির্ধারণের একটা দিশা আমরা খুঁজে পাব।

এটা কি আসলেই ক্রুসেড

জর্জ বুশ প্রথমেই বলেছিলেন ওসামা বিন লাদেন ও আল কায়দার ইসলামী সন্ত্রাস বা জেহাদের বিরুদ্ধে এটা "ক্রুসেড"। নিজের কথা নিজে গিলে খেতে তাঁর বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। যাঁরা ক্রুসেডের ভয়াবহতা ও হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে জানেন তাঁরা প্রমাদ গুনেছিলেন। পোপ জন পলও এতে বিব্রত হয়েছিলেন। তাঁর নীতি-নির্ধারকরা তাঁকে বলেছিলেন বিশ্বের মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে এবং মুসলমান দেশগুলোর ওপর এর প্রতিক্রিয়া ভাল হবে না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে "গ্লোবাল কোয়ালিশন" করার পরিকল্পনা তিনি হাতে নিয়েছেন, সেটাও কাজ করবে না। কিন্তু কথাটা বলে জর্জ বুশ ভাল করেছেন। তাঁর দিক থেকে যুদ্ধের চরিত্রটা কেমন এবং তাঁর "নতুন বিশ্বযুদ্ধ" সম্পর্কে ধারণাটা কি সেটা আমরা বুঝতে পারলাম।

অনেকের ধারণা রাষ্ট্র পরিচালনায় অনভিজ্ঞতা এবং মাথায় মগজের চেয়ে মাংসের পরিমাণ বেশী বলে জর্জ বুশ মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলেছেন। এই যুক্তি মানা যেতো যদি ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু "ক্রুসেড" সংক্রান্ত ধারণাটাই আবার নতুনভাবে তিনি হাজির করলেন Infinite Justice বা "অনন্ত ন্যায়বিচার"-এর জন্য যুদ্ধের কথা কয়ে। ঈশ্বরই অনন্ত ন্যায়বিচার করেন, মানুষ নয়। তাহলে তিনি ঈশ্বর নির্ধারিত বা প্রদত্ত বিচারই ইহলোকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে সন্ত্রাসী মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাস্তবায়ন করছেন। এটা ক্রুসেড ছাড়া আর কি? সেখানেই তিনি আবার ধরা পড়ে গেলেন। তরপর তাঁর যুদ্ধের নাম বদলিয়ে রাখা হোল অপারেশন এনডিউরিং

www.pathagar.com

ফ্রিডম।

টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগন হামলার পেছনে ওসামা বিন লাদেন ও আল কায়দাকে নিছকই সন্দেহ করে "বিশ্বযুদ্ধ" শুরু করে দেবার নজির "সভ্য" জগতে নাই। শুরু থেকেই ওসামা এই হামলার সঙ্গে জড়িত নন বলে দাবি করেছেন। তাঁর সম্পৃক্তির কোন প্রমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজও দাখিল করতে পারে নি। পরবর্তীতে এনথ্রাক্স বা বায়োলজিক্যাল যুদ্ধাস্ত্রের হামলা যখন শুরু হোল, দেখা গেল তার উৎপত্তি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই। প্রথমত এনথ্রাক্স হামলার সঙ্গে সাদ্দাম হোসেন জড়িত বলে এই যুদ্ধ সম্প্রসারিত করার প্রয়াস চালিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। কিন্তু তার পরিণতি মন্দ হতে পারে বলে প্রকাশ্যে বাড়াবাড়ি করে নি।

ওসামা বিন লাদেন কোন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নন, এমন কি তিনি আফগান নাগরিকও নন। যদি এই হামলা ওসামা করেও থাকে তাহলে তা বড়জোর একজন ব্যক্তি বা সংগঠনের ক্রিমিন্যাল এক্ট হতে পারে। কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরেকটি রাষ্ট্রের যুদ্ধ হতে পারে না। সেটা Crime against humanity বা "মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধ" হতে পারে। জাতিসংঘ সনদের ৫১ নম্বর চার্টার অনুযায়ী একটি দেশের বিরুদ্ধে আরেকটি দেশের যুদ্ধ হতে পারে না। তাহলে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের ঘটনার কারণে একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কোন্ আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে পড়ে? তাও এমন এক রাষ্ট্র ও এমনই জনগোষ্ঠী যারা ইতোমধ্যেই যুদ্ধে বিধ্বস্ত। সবচেয়ে প্রহসন হোল এমনই রাষ্ট্র যারা এই কিছুদিন আগেও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হয়ে লড়েছে এবং জান দিয়েছে। আফগানিস্তানে নির্বিচারে বোমাবর্ষণের যে নৃশংসতা ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি দেখিয়েছে তার কোন নজির নেই।

একটি রাষ্ট্র আরেকটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী নিজেকে আত্মরক্ষার বৈধতা ৫১ অনুচ্ছেদ দেয়। কিন্তু জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিল সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখেই জাতিসংঘের ৫১ সনদ অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেই বৈধতা দিয়েছে। এরই অনুসরণে একই দিনে নর্থ আটলান্টিক কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেয় যে, এই ধরনের "সন্ত্রাসী" হামলা ন্যাটো ওয়াশিংটন চুক্তির ৫ নম্বর আর্টিকেলের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ এটা ব্যক্তি বা কোন সংগঠনের বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নয়। এটা একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। অতএব নিজের প্রতিরক্ষার জন্য এর পাল্টা যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে। এই প্রথম উত্তর আটলান্টিক আঁতাতের ইতিহাসে পাঁচ নম্বর অনুচ্ছেদ কার্যকর করবার তড়িঘড়ি উদ্যোগ আমরা লক্ষ্য করলাম।

পাঁচ নম্বর অনুচ্ছেদ কার্যকর করবার মধ্য দিয়ে ন্যাটো তাদের "Principal of collective defence"-কে সক্রিয় করল। এর অর্থ কি এই যে ইসলামী হামলার বিরুদ্ধে খ্রিস্ট্রীয় দেশগুলোকে যুদ্ধের জন্য সংঘবদ্ধ করা? পাঁচ নম্বর আর্টিকেল অনুযায়ী যদি ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সদস্যভুক্ত এক বা একাধিক দেশের ওপর সামরিক হামলা হয় তাহলে সেটা সকল দেশের বিরুদ্ধে হামলা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সকলে মিলে তার পাল্টা সামরিক ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় যে কোন প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একজন "সন্ত্রাসী"-র বিচ্ছিন্ন হামলার অভিযোগে জাতিসংঘের আর্টিকেল ৫১ ব্যবহার

www.pathagar.com

করার ব্যাপারটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

এভাবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার অবাধ ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেলো। এর পাল্টা পদক্ষেপ হতে পারতো জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনার মেরি রবিনসনের প্রস্তাব। সেপ্টেম্বরের ২৫ তারিখে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে মেরি রবিনসন যে কথাগুলো বলেছিলেন সেটা হোল, সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখের ঘটনা কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের যুদ্ধ নয়। এটা "মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধ"। তার বিচার আন্তর্জাতিক আদালতে হতে পারে। প্রয়োজনে "সন্ত্রাসী" অপরাধের জন্য একটি বিশেষ আদালতও গঠন করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর কথা বাতাসে মিলিয়ে গেল। এই ধরনের অপরাধ বিচারের জন্য একটি International Criminal Court গঠন নিয়ে কথাবার্তা চলছে। তবে সেটা গঠিত হবে ২০০১ বা ২০০৩ সালে। সেই আদালতে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার বিচার করা যাবে না। আদালত গঠিত হবার পরে এই ধরনের ঘটনার বিচার হতে পারে।

জর্জ বুশ, টনি ব্লেয়ার ও খ্রিস্ট্রীয় জগতের অধিপতি শক্তির দিক থেকে আসলেই তাহলে এটা ক্রুসেড। মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের ধর্মযুদ্ধ। ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম বা পরবর্তী ক্রুসেডের সঙ্গে এখনকার ক্রুসেডের অমিল নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু মিল কম নাই। আরবে ইসলাম আবির্ভাবের অতি অল্প সময়ের মধ্যে হজরত ঈসা যে ভূখণ্ডে জন্ম গ্রহণ ও বসবাস করেছিলেন সেটা মুসলমানদের দখলে চলে আসে। সেটা ঘটে ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। ক্রুসেডের যোদ্ধারা তাদের "পবিত্র ভূমি" জেরুজালেম মুসলমান অধিকার থেকে উদ্ধার করার জন্য ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যায়। ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের "পবিত্র ভূমি" জেরুজালেম মুসলমান অধিকার থেকে উদ্ধার করবার জন্য দ্বিতীয় পোপ আরবান যে War of the Cross বা ক্রুসেডের ডাক দেন তারই প্রতিধ্বনি যেন এই যুগেও শোনা যাচ্ছে। খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধারা দ্বিতীয় ক্রুসেডে জেরুজালেম দখল করে নেয়। ক্রুসেডে শুধু সৈনিক নয়, নারী-পুরুষদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই হত্যাযজ্ঞের নিষ্ঠুর ইতিহাস স্মরণ করেই পোপ জন পল জর্জ বুশের ক্রুসেডের কথা শুনে আতংকিত হয়েছিলেন। সেই কালে ক্রুসেডের নেতা ছিলেন পোপ স্বয়ং। এই কালে তার সর্দার হচ্ছে জর্জ বুশ আর টনি ব্লেয়ার।

আদি ক্রুসেড আর ২০০১ সালের ক্রুসেডের মধ্যে পার্থক্য কি? তখনও যুদ্ধটা ছিল জমি দখল নিয়ে। এখনও হামলা ভূখণ্ড নিয়েই। আদি ক্রুসেডে জমি ছাড়া প্রকাশ্য কোন দাহ্য পদার্থ ছিল না। যীশুর জন্মভূমি পুনরুদ্ধারের পেছনে কিম্বা মুসলমানদের জেরুজালেম দখল করে রাখার পেছনে আত্মার দাহ্যিক ভূমিকা থাকতে পারে। দুই হাজার এক সালের ক্রুসেডকে শুধু জমি দিয়ে বোঝা যাবে না। ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠা এবং তার পেছনে খ্রিস্ট্রীয় বিশ্বের অকুণ্ঠ সমর্থনের মধ্য দিয়ে এক প্রকার হাসিলই হয়েছে বলা যায়। এবারের ক্রুসেডের দাহ্য পদার্থ আসলে তেল এবং গ্যাস। প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতার ভূখণ্ড বৈষয়িক ও আত্মিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতএব মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করবার লড়াইয়ের বৈষয়িক ও আত্মিক কারণ পুরো মাত্রায় বর্তমান ছিল।

www.pathagar.com

ক্রুসেড বা জেহাদকে ধর্মযুদ্ধ জ্ঞান করে তার বিচার বা বিশ্লেষণ ওখানেই সমাপ্ত করে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। মার্কসীয় বিচার জেহাদ বা ক্রুসেডের বাহ্যিক রূপ দেখে সন্তুষ্ট নয়। সেটা ধর্মযুদ্ধ ঠিকই কিন্তু অভ্যন্তরের বৈষয়িক কারণটা অনুসন্ধান করা জরুরী। যে বিশ্বাসে বা যে মতাদর্শের ভিত্তিতে ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয় তার সঙ্গে মার্কসীয় বিচার পদ্ধতি সেই যুদ্ধের বৈষয়িক কারণ গুলিয়ে ফেলে না। যুদ্ধের মতাদর্শ এক জিনিস আর তার অন্তর্লীন কারণ অন্য কথা।

প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতা এখনকার আধুনিক বিশ্ব-পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতা হয়ে উঠলেও পুরনো ক্রুসেডের সঙ্গে এখনকার ক্রুসেডের এক বিস্ময়কর মিল আছে। পুরনো ক্রুসেডের সময় হজরত ঈসার জন্মস্থান ও জেরুজালেম ছিল মুসলমানদের দখলে। প্রবল ধর্মের সেই যুগে এটাই ছিল সর্বোচ্চ সম্পদ, যার জন্য জান দিতে দুই পক্ষই প্রস্তুত ছিল। বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম জ্বালানি, তেল ও গ্যাস। যাকে আমরা বিশ্বসভ্যতা বলি তার বৈষয়িক ভিত্তির মূল উপাদান তেল এবং গ্যাস। এই তেল ও গ্যাসের নিশ্চয়তা ছাড়া আধুনিক সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না।

কিন্তু ইতিহাসের প্রহসন এই যে, হজরত ঈসার জন্মস্থান বা পবিত্র ভূমি যেমন মুসলমানদের দখলে ছিল, ঠিক তেমনি তেল গ্যাস কী এক অজ্ঞাত কারণে মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ইত্যাদি ইসলাম প্রধান দেশগুলোর দখলে। ক্রুসেডের পুরনো আধ্যাত্মিক স্বার্থের জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে তেলের স্বার্থ। তেলই বর্তমান বিশ্ব-সভ্যতার ঈশ্বর। অতএব এই ঈশ্বরের জন্য যুদ্ধ অনিবার্য। যেহেতু এই তেল প্রধানত ইসলাম প্রধান দেশগুলোতেই বেশিরভাগ মজুদ, অতএব যুদ্ধটার রূপ ধর্মযুদ্ধের আকার পরিগ্রহণ করছে। আরও করবে। এটাই স্বাভাবিক। স্যামুয়েল হান্টিংটন তাঁর "সভ্যতার সংঘর্ষ" নামক থিসিসে খুব একটা ভুল করেন নি। তেলই যেহেতু বর্তমান বিশ্বসভ্যতার প্রাণ, অতএব তাঁর "সভ্যতার সংঘর্ষ" কথাটিকে পাঠ করতে হবে তেলের সংঘর্ষ হিসাবে। এই তেল আছে ইসলাম প্রধান দেশগুলোতে। কিন্তু খ্রিস্টান প্রধান শিল্পসভ্যতা এই তেল ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। তেল শিল্প সভ্যতার অতিশয় অবশ্যিক, অতএব পরম পবিত্র জিনিস। সেই কারণে যুদ্ধের রূপটা আমরা চাই বা না চাই ধর্ম যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহণ করতে বাধ্য। সেই কারণে জর্জ বুশের ক্রুসেডের ডাক কিম্বা ওসামা বিন লাদেন ও মোল্লা ওমরের জেহাদ পবিত্র তেলের লড়াই ছাড়া আর কি? ক্রুসেড ও জিহাদ দুটোই তৈলাক্ত।

মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৯৬ সালে যখন তালিবানরা সরকার গঠন করলো তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তালিবানদের সম্পর্ক বেশ ভালো। তালিবান নেতারা টেক্সাসের হিউসটনে তেল কোম্পানি ইউনোকল (Unocal) এর কর্মকর্তাদের সাথে চা-নাস্তা খেতে গিয়েছিল। কোম্পানির তেল এবং গ্যাস উত্তোলন থেকে মুনাফার একটা বড় অংশ তালিবানদের দেওয়া হবে বলে তাদের লোভ দেখানো হয়। কোম্পানি চেয়েছিল তেল এবং গ্যাসের জন্যে সোভিয়েত সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে আফগানিস্তান হয়ে একটি পাইপলাইন বসাতে। একজন মার্কিন কূটনীতিক এই কথা বলতেও দ্বিধা করেন নি যে, আফগানিস্তান একটি আমেরিকার তেল কলোনী হয়ে উঠবে, সেখানে পশ্চিমা দেশ থেকে আসা বিরাট অংকের মুনাফা থাকবে, কিন্তু কোন গণতন্ত্র থাকবে না। নারীদের

www.pathagar.com

কোন আইনগত অধিকার না থাকলেও অসুবিধা নেই।

খবর হোল, চুক্তিটি হয় নি। এখন এই তেলের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করা বুশ প্রশাসনের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। বুশের গোপন ইচ্ছা হচ্ছে কাস্পিয়ান বেসিনের (Caspian basin) মাটির নিচের সর্ববৃহৎ তেল এবং গ্যাসের মওজুদের সন্ধান করা। যে তথ্য আমাদের পরিষ্কার খেয়াল রাখা দরকার সেটা হোল এই তেল ও গ্যাস পেলে আমেরিকার আরও একটি জেনারেশন অনায়াসে চলতে পারবে। জীবাশ্ম ভিত্তিক সভ্যতার আয়ু আরও দীর্ঘকাল বাড়বে।

কিন্তু যদি এটা পেতে হয় তাহলে পাইপলাইনগুলো আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তালেবানরা বাধা হয়ে উঠলো। এখন তেল ও গ্যাস পেতে হলে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতেই হবে। মার্কিনীরা আফগানিস্তানে একটু মডারেট বা মাঝারি ধরনের তালেবান সরকার চায়, তারা যেন আফগানিস্তানে একটি ঢিলেঢালা ফেডারেশন চালাতে পারে। তাই জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারের "সন্ত্রাস বিরোধী" যুদ্ধ নিছকই একটা ভুয়া কথা। নেহায়েতই লোক দেখানো।

বিন লাদেন ঃ যে সত্য নিষিদ্ধ

তেল ও গ্যাসের ব্যাপারটা আরও প্রমাণ পত্রাদিসহ হাজির করা যাক। "বিন লাদেন ঃ যে সত্য নিষিদ্ধ" (Bin Laden, Le Verite Interdite) নামে একটি বই সম্প্রতি ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন জাঁ শার্ল ব্রিসকা (Jean-Charles Briscard) এবং গিওম দাসকি (Guillaume Dasqui)। সেই বইয়ের মূলকথা হোল, "সন্ত্রাসী" তালেবান বা আল কায়দা নেটওয়ার্ক ধ্বংসের যে চোটপাট আমরা বুশ-ব্লেয়ার চক্রের মুখে শুনছি সেটা ভুয়া। লড়াইটা আসলেই তেল-গ্যাসের জন্য। কথাটা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য নতুন নয়। কিন্তু এই দুজনই পৃথিবী বিখ্যাত "Intelligenece analyst" অর্থাৎ গোপন গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষক। বইটি বেরুবার পর অনেকেই দাবি করছেন বিপুল তথ্যে সমৃদ্ধ এই বই বুশ আর ব্লেয়ারকে বিপদেই ফেলবে এবং তাদের "Dirty Afgan War" বা নোংরা আফগান যুদ্ধের গোমর ফাঁস করে দেবে।

নব্বই দশকের শেষের দিক অবধি ব্রিসকা ছিলেন ভিভেনদি (Vivendi) নামে একটি ফরাসি কোম্পানির অর্থনৈতিক বিশ্লেষক। ব্রিসকা ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থা (DST) জন্যও কাজ করেছেন এবং ১৯৯৭ সালের ফরাসি গোয়েন্দাদের জন্য বিন লাদেনের নেতৃত্বাধীন আল কায়দা নেটওয়ার্কের জন্য একটি রিপোর্ট তৈরি করেছেন। দাসকি একজন গোয়েন্দা বিষয়ক সাংবাদিক এবং Intelligence Online নামে একটি পত্রিকা বের করেন।

এগারোই সেপ্টেম্বরের আগে তালেবানদের সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সদয়, এমন কি দোস্তির। তালেবানদের দেখা হোত, "মধ্য এশিয়ার স্থিতিশীলতার উৎস হিসাবে যারা মধ্য এশিয়া ভেদ করে তেলের পাইপ লাইন নির্মাণ করার জন্য জরুরী।...তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান এবং কাজাকিস্তানের সমৃদ্ধ তেলক্ষেত্রগুলো থেকে তেল টেনে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান হয়ে ভারত মহাসাগর অবধি নিয়ে পাইপ লাইন নিয়ে যাওয়ার" জন্য তালেবানদের ওপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্ভর করছিলো। কিন্তু

www.pathagar.com

তালেবানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তেল কোম্পানির লুটপাটের প্রস্তাবে সম্মত হয় নি। সেখানেই গোলমাল দেখা দিল।

কাসপিয়ান সাগর অঞ্চলের ভূগোলে বা দেশগুলোতে (আজারবাইজান, কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তানে) যে তেলের রিজার্ভ আছে তার পরিমাণ কমপক্ষে দুইশ বিলিয়ন ব্যারেল। পারস্য উপসাগরীয় এলাকার তেলের পরিমাণের তুলনায় এটা হচ্ছে তিন ভাগের একভাগ। এই বিপুল তেল সম্পদ লুটের জন্যই আজ আফগানিস্তানের যুদ্ধ।

এই তথ্যগুলো যার বরাতে বলা হয়েছে তাঁর নাম ও নীল (O Neill)। ইনি একজন আইরিশ-আমেরিকান। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তেল কোম্পানিগুলো তালেবানদের কাছ থেকে আপোষে তেল পেয়ে যেতো তাহলে তেলের বিশাল বিকল্প উৎসের ওপর তাদের একচেটিয়া দখল কায়েম হয়ে যেতো। ব্রিসকা ও দাসকি বলছেন, "রাশিয়া মধ্য এশিয়ার এই তেল গ্যাস খবরদারি করত। বুশ সরকার সেটা বদলে দিতে চেয়েছেন এবং বদলাতে গিয়েই এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া।"

নভেম্বর ১৯ তারিখের Irish Times-এর একটি প্রতিবেদনে জানা যায় ও নীল ১৯৯৩ সালে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের বোমার ঘটনা, ১৯৯৬ সালের সৌদি আরবের মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা, ১৯৯৮ সালে নাইরোবি ও দর-এর-সালামের মার্কিন দূতাবাসের আক্রমণ এবং ২০০০ সালে ইএসএস কোলের ঘটনা তদন্ত করেছেন। এই তদন্ত করার কাজ করতে গিয়েই তার মনে হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসলে "সন্ত্রাস" সংক্রান্ত কোন তদন্তে মোটেও উৎসাহী নয়। বরং তদন্তে তাকে পদে পদে বাধা দেওয়া হয়েছে। বিরক্ত হয়ে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে নিরাপত্তা প্রধান হিসাবে নতুন চাকরি গ্রহণ করেন। এগারোই সেপ্টেম্বরের ঘটনায় নীলও মারা যান। ব্রিসকা ও দাসকিও নীলের সঙ্গে যে-সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে রেখেছিলেন তার মূল্য অতএব অপরিসীম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর কষাকষির এক পর্যায়ে মার্কিন প্রশাসন তালেবানদের বলেছে, "হয় আমাদের সোনার কার্পেটে তোমাদের মুড়ে দেবার প্রস্তাব গ্রহণ কর, অথবা অবিরাম বোমা বর্ষণের কার্পেট বিছিয়ে আমরা তোমাদের কবর রচনা করব"। এই লেখা যখন লিখছি তখন নর্দার্ন এলায়েন্স, আফগানিস্তানের প্রাক্তন রাজা জাহির শাহ এবং তালেবানপন্থী নয় এমন পশতুন নেতাদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশের তালেবান-উত্তর সরকার গঠন নিয়ে কথাবার্তা চলছে। প্রহসন হোল এই শহরেই তালেবানদের সঙ্গে দর কষাকষি হয়েছিলো।

বইটির তথ্যানুসারে বুশ প্রশাসন তালেবানদের সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করে ২০০১ সালের শুরুর দিকে। ওয়াশিংটন ও ইসলামাবাদেও কথাবার্তা হয়। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে এশিয়া বিভাগের দেখাশোনা করেন ক্রিস্টিনা রকা (Christina Rocca)। সেপ্টেম্বর ১১ তারিখের ঘটনার আগে ক্রিস্টিনা পাকিস্তানে তালেবান রাষ্ট্রদূত আবদুল সালাম জায়িফের সঙ্গে অগাস্টের দুই তারিখে কথা বলেন। জেনে রাখা ভাল যে ক্রিস্টিনা রকা হচ্ছেন এক কালে আফগানিস্তানে "মৌলবাদী" গেরিলাদের পক্ষে কাজ করবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতি অভিজ্ঞ প্রশাসনিক ব্যক্তি। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

www.pathagar.com

গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র অধীনে "মৌলবাদী" ইসলামী গোষ্ঠীকে অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত করার দায়িত্বে ছিলেন। বিশেষত আফগান মুজাহেদিনদের স্টিংগার মিসাইল হস্তান্তরের দায়িত্ব তিনিই পালন করেছেন। তাঁর মাধ্যমে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মুজাহেদিনরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়েছে।

ব্রিসকা এবং দাসকির তথ্য থেকে এটাও জানা যায় যে, তালেবানদের অতি গোঁড়া বা অতিশয় "মৌলবাদী" বলে যে ধারণা তৈরি হয়েছে সেটাও পুরোপুরি সত্য নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বহাল থাকার সময় এই সত্য নানাভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। তালেবানরা পশ্চিমা বিশ্বে তাদের ভাবমূর্তি পরিচ্ছন্ন করার জন্য সচেষ্ট ছিলো। তারা লায়লা হেলমস (Laila Helms) নামে একজন বিশেষজ্ঞকে এই কাজের জন্য নিয়োগ দেয়। লায়লা হেলমসের আবার আরেকটি পরিচয়ও ছিলো। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা কী করে কাজ করে তিনি সেই বিষয়েও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তার কাজ ছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তালেবানদের স্বীকৃতি আদায় করা। লায়লার চাচা হলেন রিচার্ড হেলমস (Richard Helms)। ইনি হলেন সিআইএর প্রাক্তন ডিরেক্টর এবং তেহরানের প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা কী করে কাজ করে তার খবরাখবর লায়লা তাঁর চাচার মাধ্যমেই জানতেন।

ও নীল দাবি করেছেন যে, ওসামা বিন লাদেন ও আল কায়দা নেটওয়ার্ক সম্পর্কে সকল তথ্যই সৌদি আরবের কাছে পাওয়া যাবে। কিন্তু সৌদী রাজ পরিবারকে বিব্রত করতে যুক্তরাষ্ট্র রাজি নয়। দাহরানে ১৯৯৬ সালের জুন মাসে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে বোমা হামলায় ১৯ জন মার্কিন সৈন্য নিহত হবার তদন্ত করতে গিয়ে এফবিআই অভিযুক্ত সন্দেহভাজনদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর এই বিষয়ে কোন হৈ চৈ করতে রাজি হয় নি। সৌদি সরকারি কর্মকর্তারা অবশ্য সন্দেহভাজনদের নিজেরাই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবং বিচার করে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। ও নীল তাঁর তদন্ত টিম নিয়ে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন কিন্তু নভেম্বর ১৯ তারিখে প্রকাশিত Irish Times তথ্য অনুযায়ী তাঁদের ভূমিকা বোমা হামলার জায়গা থেকে কিছু জিনিসপত্র কুড়িয়ে আনার অধিক কোন কাজের সুযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন করে দেয় নি।

ইরান, ইরাক, কুয়েত, ওমান, সৌদি আরাবিয়া, আরব আমীরাত ও উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্য দেশগুলো সবসময়ই তেলের অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে পাক খাচ্ছে। প্রথমে ইংরেজ এই অঞ্চলের তেলের ওপর দখলদারি কায়েমের জন্য লড়েছে, তারপর হামলা করেছে ফরাসিরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তেলের থিয়েটারে অবতীর্ণ হয়েছে। জীবাশ্মভিত্তিক শিল্পসভ্যতা ততোদিনে যে-অবস্থায় পৌঁছেছে তার কারণে তেল সরবরাহের নিশ্চয়তা এবং তেলের উৎসের নিরাপত্তা বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট এবং সৌদি বাদশাহ আবদুল আজিজ ইবনে সউদ ১৯৪৫ সালের মার্চে একটি গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যে দীর্ঘকালীন সামরিক-ভৌগলিক কৌশলগত মৈত্রীর দাসখত বলা যায়। জর্জ বুশের অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম সম্পর্কে এমন কি তেল সম্পদ বিশেষজ্ঞদের অভিমত হোল, এর দুটো লক্ষ্য। এক

www.pathagar.com

নম্বরে "সন্ত্রাসী"-দের পাকড়াও করা, সেটাই ফলাও করে বলা হয়। দুই নম্বরে পারস্য উপসাগর ও কাস্পিয়ান সাগর সন্নিহিত ভূগোলে তেল ও গ্যাসের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলদারিত্ব পাকাপোক্ত করা। প্রথম কথাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যতোই জোর গলায় মুখ্য ব্যাপার বলে হৈ হল্লা করুক, দুই নম্বর লক্ষ্যটার গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়। এই কথা নোয়াম চমস্কি বা এডওয়ার্ড সায়িদের মতে বাম ঘেঁষা মানুষ নয়, বলছেন আমহার্স্ট শহরের হ্যাম্পশায়ার কলেজের প্রফেসর মাইকেল টি ক্লেয়ারের (Michael T Clare) মতো তেল বিশেষজ্ঞ, যিনি Resources Wars : The New Landscape of Global Conflict নামক বই লিখে বিখ্যাত।

বুশ প্রশাসনের বহু কর্মকর্তাই তেল কোম্পানির সঙ্গে জড়িত। গত বছর পর্যন্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি ছিলেন হেলিবারটন (Halliburton) নামে কোম্পানির প্রেসিডেন্ট। এই কোম্পানি তেল কোম্পানিগুলোর জন্য কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কনডোলেজা রাইস (Condoleezza Rice) ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত শেভরন (Chevron) তেল কোম্পানির ম্যানেজার ছিলেন। বাণিজ্য সেক্রেটারি ডোনাল্ড ইভানস (Donald Evans) এবং স্ট্যানলি আবরাহাম (Stanley Abraham) টম ব্রাউন (Tom Brown) নামে আরেকটি তেল কোম্পানির কর্মকর্তা ছিলেন।

তাহলে অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম তালিবান ও আল কায়দাকে ধ্বংস করতে চায় কেন ?

এক. মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য যেসব ইসলামপন্থী দলগুলো লড়ছে তাদের "মৌলবাদী" বলে বর্বর ও অসভ্য প্রমাণ করা ও তাদের ধ্বংস করে মার্কিন দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

দুই. বিন লাদেন ও তালেবানরা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো বাধা এবং মতাদর্শিকভাবেও বিপজ্জনক হওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং এই ধরনের প্রতিটি সামরিক সংগঠনকে উচিৎ শিক্ষা দান করা।

তিন. মধ্য এশিয়ায় মার্কিন তাঁবেদার সরকার উৎখাত করে জঙ্গী ইসলামপন্থী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সরকার কায়েমের সম্ভাবনা নস্যাৎ করা।

লক্ষ্য করার বিষয় যে যুদ্ধ শুরুর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান এবং কিরগিজিস্তানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

বুশের চেয়ে ব্লেয়ার কোন অংশে কম নয়। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমনি নিরপরাধ মানুষ হত্যাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যারা ক্লাস্টার বোমা মেরে বলে ভুল হয়েছে এটা তাদের ভান ছাড়া আর কিছুই নয়। হত্যা মানে হত্যা। এটা একটি প্লেন নিয়ে একটি বিল্ডিং-এর ওপর ধাক্কা মারলে যেমন অপরাধ তেমনি হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিস কিংবা লন্ডনের ডাউনিং স্ট্রিটে বসে হুকুম দিলেও একই ধরনের অপরাধ হয়। যদি ব্লেয়ার আসলেই সন্ত্রাসের বিরোধিতা করতে চান তাহলে তাঁকে প্রথমেই অস্ত্র ব্যবসা থেকে সরে আসতে হবে। ব্লেয়ার যদি আসলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হন তাহলে তাকে ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধ থেকে সরে আসতে হবে।

www.pathagar.com

ওসামা বিন লাদেনের দুর্ভাগ্য হোল তিনি ধনী এবং সৌদী। সোভিয়েত দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে লড়ে দেশে ফিরে এসে তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর নিজের দেশটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দখল করে রেখেছে। সেটাও তেলের সরবরাহ নিশ্চিত করবার জন্য। ফলে তাঁর বন্দুকের নল ঘুরে গেল। কিন্তু সৌদী হবার কারণে ওসামা হয়ে উঠলেন রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক। কারণ সৌদি আরবে ও মধ্যপ্রাচ্যে দ্রুত তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বেড়েই চলল। তাঁর কারণে সৌদি আরবের রাজতন্ত্রের যদি পতন ঘটে তবে সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা সভ্যতার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার সমীকরণে আমূল পরিবর্তন ঘটবে। অতএব ওসামা বিন লাদেনকে জীবিত বা মৃত ধরতেই হবে। এখন প্রচার করা হচ্ছে তিনি নাকি বলে গিয়েছেন যে, তিনি শত্রুর হাতে ধরা দেবেন না। তাঁর দেহরক্ষীরাই যেন তাঁকে ধরা পড়বার আগে মেরে ফেলে। অর্থাৎ নিজেদের হাতে ওসামা বিন লাদেনকে মারবার দায়দায়িত্ব পশ্চিমা দেশগুলো নিতে চাইছে না। তাকে গ্রেফতার করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোটাও হবে বিপজ্জনক। এগারোই সেপ্টেম্বরের ঘটনায় ওসামা বিন লাদেন আদৌ যুক্ত ছিলেন তার কোন প্রমাণ আছে বলে মনে হয় না। ওসামা নিজেও তা অস্বীকার করেছেন।

ক্রুসেড ও জেহাদ

তেল ও গ্যাসের যুদ্ধটাই ধর্মযুদ্ধের রূপ নিচ্ছে এবং আসলেই এই দাহ্য পদার্থগুলোই সভ্যতার প্রধান সংকট। গোড়ার এই কথাটা আমাদের ভালোভাবে মনে রাখতে হবে। সভ্যতার সংকট কথাটা আমরা এখানে উল্লেখ করছি সভ্যতা সম্পর্কে হাওয়াই ধারণা থেকে নয়। আমরা বলছি শিল্পসভ্যতার গোড়ায় রয়েছে জ্বালানি। তেল এবং গ্যাস। যদি এই জ্বালানি শিল্পসভ্যতা নিশ্চিত করতে না পারে তাহলে তার পতন বা ধ্বংস অনিবার্য। লড়াইটা কিন্তু এখন শুরু হয় নি। শুরু হয়েছে সত্তর দশকের গোড়া থেকে।

যদি সভ্যতার সংকটের এই বিশেষ চরিত্রের দিকে আমরা মনোযোগ দেই তাহলে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথাগত শ্রেণী সংগ্রামের ধারণার ক্ষেত্রে নতুন কিছু বিষয় আমাদের ভাবার দরকার আছে। পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতা কথাটা আমরা অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিচার থেকে বলি, প্রাকৃতিক বা সভ্যতার বস্তুগত উপাদানের দিক থেকে বিচার করে বলি না। "আধুনিক সভ্যতা"-র জীবাশ্ম ভিত্তি সম্পর্কে কমিউনিস্টদের ধারণা দুর্বল। এই সম্পর্কে মূল সংগ্রামের ধারাটা পরিবেশ ও নারী আন্দোলন থেকে এসেছে।

ধরা যাক, পশ্চিমা সভ্যতার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটল। কিন্তু এতে জীবাশ্ম-ভিত্তিক শিল্পসভ্যতার কোন পরিবর্তন হবে না। এতে তেল ও গ্যাসের ওপর দখলদারিত্বের দ্বন্দ্ব কিন্তু শেষ হয়ে যাবে আশা করা দুরাশা মাত্র। কিন্তু ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমান না করে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে নজর ফেরানো দরকার।

জর্জ বুশের এই ক্রুসেড একই সঙ্গে বর্ণবাদী যুদ্ধ। সেই কারণে আরব, আফগান ও ইসলাম প্রধান দেশের জনগোষ্ঠীকে বর্বর, ট্রাইবাল ও পশ্চাৎপদ প্রমাণ তাকে করতেই হচ্ছে। কারণ কাউকে অমানুষ বা সভ্য জগতের অংশ নয় প্রমাণ করা গেলেই তাকে সহজে বোমা মেরে হত্যা করলে কোন দয়া বা মায়ামমতা জাগে না। এই যুদ্ধ ক্রুসেড এই কারণে যে, জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারকে একটি মতাদর্শ হিসেবে জঙ্গী ইসলামের ও

www.pathagar.com

জঙ্গী মুসলমানদের মোকাবিলা করতেই হবে। তেল ও গ্যাসের দখল থেকে মুসলমানদের উৎখাত করতেই হবে। তাঁরা সেটা জানেন এবং আগে থাকতেই এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে তাঁরা বারবার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু মুসলমানদের বিভক্ত রাখবার জন্য তাঁদের বলতে হচ্ছে 'এই যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়।' এই যুদ্ধ নাকি "সন্ত্রাসী"-দের বিরুদ্ধে। মনে আছে কিনা ভিয়েতনাম যদ্ধের সময়ও বলা হয়েছিলো এই যুদ্ধ ভিয়েতনামীদের বিরুদ্ধে নয় বরং সন্ত্রাসী "কমিউনিস্টদের" বিরুদ্ধে যারা স্বাধীনতা ও সভ্যতার শত্রু। ইরাকে অর্থনৈতিক অবরোধ ঠিকই জারী রয়েছে। ফিলিস্তিনে ইসরাইলী হামলা এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ হয় নি। চলছে। ক্রুসেড হলেও জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ারকে এই যুদ্ধ চালাতে হবে "সভ্যতা", "মুক্তি" বা সন্ত্রাস বিরোধিতার নামে। ভূতের মুখে রাম নাম।

অন্যদিকে ওসামা বিন লাদেনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ফাঁকি খুঁজে আমরা কূটতর্ক করতে পারি। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি তারা ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে পিছু হটে আসে নি। এই যুদ্ধে বিপুল সংখ্যায় সংগ্রামীকে একত্র করার জন্যে তারা "জেহাদের" ডাক দিয়েছে। "দুনিয়ার মজদুর এক হও" বলে এই কালে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই আদৌ সম্ভব হোত কিনা সেটা বিচক্ষণ যে কেউই ভেবে দেখতে পারেন। বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিপীড়িত শ্রেণী, জাতি ও জনগোষ্ঠীর লড়াই পরিগঠিত করে তোলার ব্যর্থতার জন্য ক্রুসেডের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ জেহাদের রূপ নিচ্ছে। ফলে ওসামা বিন লাদেন বা তালেবানদের "মৌলবাদী" বলে আমাদের সুখানুভূতি হতে পারে, কিন্তু সেটা আমাদের ইতিহাসবোধের ঘোরতর অভাবেরই পরিচয়। যে লড়াই বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সকল ভুক্তভোগী শ্রেণী, জাতি ও জনগোষ্ঠির লড়াই হবার কথা তাকে মুসলমানদের জেহাদি লড়াইয়ে সংকীর্ণ করে এনে ওসামা নিজের ধ্বংস যেমন ত্বরান্বিত করেছেন, তালেবানরাও নিজেদের নিশ্চিহ্ন করার বাস্তবিক শর্ত তৈরি করেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি ছাড়া অন্য কোন পরিস্থিতি কি আদৌ সম্ভব ছিল ?

যুদ্ধের মতাদর্শ দুই ক্ষেত্রেই উল্টোভাবে হাজির হচ্ছে। বুশ আর টনি ব্লেয়ার তাঁদের বলছেন, ইনফিনিট জাস্টিস, বলছেন অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম—সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। অন্যদিকে ওসামা, মোল্লা ওমর আর তালেবানরা একে বলছে "জেহাদ"- আল্লাহর পথে সংগ্রাম। যদি এটা জ্বালানি যুদ্ধ হয় এবং তেল ও গ্যাস যদি ইসলাম প্রধান দেশগুলোতেই থেকে থাকে তাহলে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে লড়বার আর কি মতাদর্শ তেল সমৃদ্ধ দেশগুলোর জনগণের কাছে রয়েছে ? কি বলে তারা এই যুদ্ধে সৈনিক সংগ্রহ করবে ? যে যুদ্ধ বৈশ্বিক, তার যোদ্ধাও নিশ্চয়ই এক দেশের হবে না। সত্যি যে আফগানিস্তানে বাংলাদেশের তরুণরাও লড়তে গিয়েছে। কি ভাষায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করলে সেটা আমাদের কাছে "মৌলবাদ" বলে মনে হবে না। এই কালে বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বর্তমান কালপর্বে শ্রেণী সংগ্রামের ভাষা কি হবে ?

এর উত্তর আমি দেব না। শুধু সকলকে ভাববার আহ্বান জানিয়ে শেষ করবো। কিন্তু শেষ করবো করাচির "উম্মত" পত্রিকায় ওসামা বিন লাদেনের একটি সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ঃ

www.pathagar.com

"আমি ইতোমধ্যেই বলেছি যে যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে আক্রমণের সাথে আমি যুক্ত নই। একজন মুসলমান হিসেবে আমি মিথ্যে কথা যেন না বলতে হয়, তার চেষ্টা করি। আমি আক্রমণ সম্পর্কে কিছু জানি না এবং আমি মনে করি নিষ্পাপ শিশু, নারী এবং অন্যান্য মানুষকে হত্যা করা কোন প্রশংসা করার মতো কাজ নয়। ইসলামে শিশু, নারী এবং অন্য মানুষদের হত্যা করার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি যুদ্ধের সময়ও এমন হত্যাকাণ্ড গ্রহণযোগ্য নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই নারী, শিশু এবং অন্য ধর্মের মানুষ, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের মানুষের ওপর এমন হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। গত ১১ মাস ধরে ফিলিস্তিনে যা ঘটছে তাতেই যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের ওপর আল্লাহর গজব পড়ার কথা। যে সকল মুসলমান রাষ্ট্র এই অত্যাচার নীরবে দেখেছে তাদেরও এই ঘটনা দেখে সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত। এর আগে ইরাক, চেচনিয়া এবং বসনিয়ার নিরপরাধ মানুষের ওপর কী হয়েছে? এই সকল ঘটনায় আমেরিকা এবং পশ্চিমা দেশের নিস্পৃহতা এবং সন্ত্রাসীদের প্রতি তাদের সহযোগিতা দেখে একটি কথাই বলা যায়, তা হচ্ছে আমেরিকা একটি ইসলাম বিরোধী শক্তি এবং তারা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে মদদ দিচ্ছে। আমেরিকার সাথে মুসলিম বিশ্বের যে সখ্য তা নিছক লোক দেখানো এবং প্রতারণামূলক। যুক্তরাষ্ট্র এসব মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে একদিকে ভয় দেখিয়ে অন্যদিকে লোভ দেখিয়ে তার মতো করে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। আপনি চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, দেখবেন যুক্তরাষ্ট্রের দাস রাষ্ট্রগুলো মুসলমানদের শাসক কিংবা শত্রু।"

১৫ ডিসেম্বর '০১

গবেষক, কলামিষ্ট।

www.pathagar.com

আমেরিকা টুইন টাওয়ারে হামলার রক্তাক্ত বদলা নিয়েছে

পারভেজ হুদবি

আমেরিকা টুইন টাওয়ারে হামলার রক্তাক্ত বদলা নিয়েছে। মার্কিন বোমা হামলা এড়ানোর জন্য ১০ লাখ আফগান বাস্তুহারা হয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃত্যুর প্রহর গুনছে। বি-৫২ বোমারু বিমান তালেবানদের অবস্থান গুঁড়ো করে দিয়েছে এবং মোল্লা ওমরকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে এবং ওসামা বিন লাদেন এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। (এই লেখা যে সময় পাঠকের হাতে গিয়ে পৌঁছবে সে সময় তিনি আর নাও বেঁচে থাকতে পারেন)। এজন্য হোয়াইট হাউসে আনন্দের বন্যার পাশাপাশি শ্যাম্পেনের বন্যাও বয়ে যাচ্ছে। তারপরও আমেরিকা আতংকের মধ্যে রয়েছে এবং এর পেছনে বেশ কারণও আছে।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর আমরা একটা পরিবর্তিত ও ভিন্ন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে বসবাস করছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন ? মানুষ কি কারণে এত বেপরোয়া হয়ে যাত্রীভর্তি বিমান ছিনতাই করে সে বিমান নিয়ে গগনচুম্বি অট্টালিকার উপর সন্ত্রাসী হামলা চালায়? তার পশ্চাতে মানবিক আচরণের অসুস্থ দিকটাকে ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিস্টদের ন্যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। আমাদেরকে এটাও জানতে হবে যে, কেন অন্যের মৃত্যুতে কোটি কোটি মানুষ আনন্দে উৎফুল্ল হয়। এ সংক্রান্ত কোনরূপ বোঝাপড়ার অনুপস্থিতিতে মধ্যযুগীয় চিকিৎসা ওঝার যন্ত্রই ব্যবহৃত হচ্ছে। আর ওঝার চিকিৎসা হচ্ছে- শক্তিমানের পক্ষে দুর্বলকে পিটিয়ে তার ভূত ছাড়ানো। বস্তুত আজ বিশ্বদানব আমেরিকা আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি তোয়াক্কা না করে এবং এমন কি তার ঘনিষ্ঠ মিত্রদের উদ্বেগকে উপেক্ষা করে অন্যান্য মুসলিম দেশের উপর আঘাত হানার জন্য একটি তালিকা প্রণয়ন করছে- যে তালিকায় ইরাক, সোমালিয়া ও লিবিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমেরিকার কথা হচ্ছে 'আমরা আমাদের ইচ্ছামত মারব।' এই চিকিৎসার কাজে আসবে না। সন্ত্রাসবাদের কোন সামরিক সমাধান নেই। আমার আশংকা শিগ্‌গিরই আরো কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আজকের প্রযুক্তিগত উন্নতির এই যুগে ব্যাপক মাত্রার ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা অপরিসীম। মানুষের মধ্যকার পুঞ্জীভূত ক্ষোভের মাত্রা বেড়ে গেলে রাষ্ট্রবিহীন কোন ক্ষুদ্র ব্যক্তি সমষ্টি কিংবা ব্যক্তি

www.pathagar.com

বিশেষ পর্যন্ত অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। আজ মুসলিম বিশ্বে সর্বব্যাপী ক্ষোভ বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে আমি একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাই। গত ১২ সেপ্টেম্বর ইসলামাবাদে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান সাপ্তাহিক সেমিনারে আমার যোগদানের কথা ছিল। আগের দিন তথা ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় মনটা খারাপ থাকলেও আমি সেমিনারটি বাতিল করতে পারিনি। কেননা ৬০ জন ছাত্র ইতোমধ্যেই সেমিনারে এসে গিয়েছিল। তাই আমি বললাম, আমাদের আজকের সেমিনারের বিষয়টি হবে সম্পূর্ণ নতুন বিষয়ে–গতকালের সন্ত্রাসী হামলার উপরে।

কিন্তু আমি তাদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেলাম না। বরং ছাত্রদের কেউ কেউ নির্বোধের মত আনন্দ প্রকাশ করছিল। একজন ছাত্র বললো, 'আপনি এটাকে সন্ত্রাস বলতে পারেন না'। অন্যজন বললো, 'যারা মারা গেছে তারা আমেরিকান এজন্যই কি আপনি তাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন?' আমাকে একটানা দু'ঘন্টা ধরে বক্তৃতা দিয়ে একথা বোঝাতে হয়েছে যে, সাধারণ আমেরিকানরা দেশের নীতি নির্ধারণ করেন না। তাই তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা একটি জঘন্য কাজ। আমার বিশ্বাস সমগ্র বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান ছাত্র আমার ছাত্রদেরই মত দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন। কিন্তু তারা পাল্টা কোন বক্তব্য সম্ভবত শুনছে না। আগামী দিনের ঐতিহাসিকরা হয়তো এ শতাব্দীকে 'সন্ত্রাসের শতাব্দী' বলে অভিহিত করবেন। আমরা যদি এ অভিধা থেকে আমাদের আগামী বংশধরদের মুক্তি দিতে চাই তাহলে আমাদেরকে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্য ও মুসলমানদের কট্টর ধর্মীয় মনোভাবের মধ্যকার বিপজ্জনক পথটিকে চিহ্নিত করতে হবে। এই পরস্পর বিরোধী মত ও পথের মধ্যে একটা সমন্বয় বা সেতুবন্ধ রচনা না করতে পারলে মানব সভ্যতা বিপর্যস্ত হবে। ❑

২০ ডিসেম্বর '০১

পাকিস্তান প্রবাসী শিক্ষাবিদ।

www.pathagar.com

দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ কৌশলে আফগানরা বিজয়ী হবে

অধ্যাপিকা সৈয়দা জাকিয়া খাতুন

প্রেসিডেন্ট বুশও সামান্য একটা অজুহাত দাঁড় করে আফগানিস্তানের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন। অবশ্য তিনি একা নন। বৃটেনও তার সঙ্গী হয়েছে। অস্ট্রেলিয়াও তার সাহায্য পাঠাবে বলেছে। এ যেন মশা মারতে কামান দাগা। তবে বুশ যে আফগানিস্তানকে মশা বা মেষ শাবক মনে করেন না তা তার যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে বোঝা যায়। আমেরিকা বিশাল দেশ। তেমনি তার বিশাল যুদ্ধ সরঞ্জাম, সৈন্যসামন্ত, কিছুরই তার কমতি নেই। কিন্তু আমেরিকা একা আফগানিস্তান আক্রমণ করতে সাহস পায়নি, সাথে বৃটেন আছে, কী বীরত্ব দেখাচ্ছে তারা ? একটা দুর্বল, দুর্দশাগ্রস্ত দেশকে ধ্বংস করার জন্য কী বিশাল আয়োজন। তারা ভেবেছিল 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা' পড়লে ১/২ দিনেই কাবু হয়ে আমার বশ্যতা স্বীকার করবে এবং আমার কাছে নত হবে। কিন্তু আমেরিকার হিসাবে ভুল হয়েছে। তার জানা উচিত ছিলও ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত যে, আফগানরা সে জাতি যাদের ইতিহাস 'শির দিয়েছে মগর আমামা নাহি দিয়েঙ্গে।' অর্থাৎ মরব তবু নত হব না।

বেশী দিনের কথা নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানের সাথে যুদ্ধ করে নিজেরা পরাজিত হয়ে নিজেরা ধ্বংস হয়েছে। ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে সোভিয়েত। পার্শ্ববর্তী দেশ হয়েই তার এই অবস্থা, তার এই পরিণতি। আর আমেরিকা যোজন যোজন দূর থেকে এসে আফগানিস্তানকে কাবু করবে সেই আশা সুদূরপরাহত। তবুও তারা যে শক্তিধর, পৃথিবীকে এটা দেখাবার জন্য এ যুদ্ধ। আমেরিকা যে শক্তিধর এটা কে না জানে ? এটা যুদ্ধ করে দেখাতে হবে? পৃথিবী চেয়ে চেয়ে দেখছে আমেরিকা সন্ত্রাস দমনের কথা বলে নিরীহ জনসাধারণ, অসহায় শিশু ও মহিলাদের হত্যা করছে, খাদ্য গুদাম ধ্বংস করছে, হাসপাতাল ধ্বংস করছে, রেডক্রসের প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করছে। এগুলোই তাদের সন্ত্রাস দমনের নমুনা। আমেরিকা কি মনে করছে তাদের এই জঘন্য কার্যকলাপের জন্য পৃথিবী তাকে বাহ্‌বা দিচ্ছে? চোখ থাকলে চেয়ে দেখুক এবং কান থাকলে শুনুক পৃথিবীর লোক তাকে কি পরিমাণ ধিক্কার দিচ্ছে এবং কি পরিমাণ ঘৃণা প্রকাশ করছে। যে আমেরিকা এতদিন শ্রদ্ধার পাত্র ছিল সেই আমেরিকা ধিকৃত হচ্ছে। আর যে লাদেনকে আমেরিকা সন্ত্রাসী বলে ঘৃণার পাত্র করতে চেয়েছিল, তিনি আজ

www.pathagar.com

পৃথিবীর বীর হতে চলেছেন। যে আফগানিস্তানকে আমেরিকা কয়েকদিনের মধ্যে শেষ করে দিবে ভেবেছিল আজ সেখানে তারা নিজেরাই নাস্তানাবুদ হচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ, কয়েক সপ্তাহ ধরে যুদ্ধ করেও নিট ফল তারা কিছুই পায়নি।

এক সময় ভিয়েতনামের সাথে যুদ্ধ করে তাদের যে পরিমাণ ফল ভোগ করতে হয়েছিল তার চেয়েও চরম পরাজয় ও লাঞ্ছনা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন আমেরিকাকে পাততাড়ি গুটিয়ে লেজ তুলে পালাতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মত তাদেরকেও ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেতে হবে। সেদিন পৃথিবীর কাছে মুখ দেখাবে কি করে ? নিজের দেশেও মুখ দেখাতে পারবে না। এখনই বুশ খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন যে, এ যুদ্ধে দেশের ক'জন লোক সমর্থন জানাচ্ছে। এ যুদ্ধে তাদের কি স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে ? কি লাভ হচ্ছে তাদের ? এমনিতেই টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। তদুপরি এ যুদ্ধের পরিণামে তাদের সামনে যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক দুর্দিন আসছে সেটা চিন্তা করে তারা আতঙ্কিত না হয়ে পারবে না। নেতার কাজ হল— তার কথা এবং কাজ এমন হবে, যাতে দেশের লোক শান্তি ও নিরাপত্তায় বসবাস করবে এবং যিনি নিজেকে বিশ্বের নেতা মনে করেন তাকে এতটা ধৈর্য, সংযম অবলম্বন করতে হবে যেন পৃথিবী তার কথা ও কার্যকলাপে স্বস্তি অনুভব করতে পারে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বুশ এ কী করলেন ? তিনি কি ভুলে গেলেন যে, তিনি একটা বিশাল দেশের নেতা ? তার একটা কথার যে কত মূল্য তা তিনি বুঝতে পারেন কি ? তিনি কি করে বলতে পারলেন যে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের মূল নায়ক ওসামা বিন লাদেন ? তিনি কি বোঝেননি তার দেশে যে লাখ লাখ মুসলমান বাস করে, এ কথার প্রতিক্রিয়ায় তারা বিপদগ্রস্ত হবে ? আজ তাদের জীবনে কি বিপদ নেমে এসেছে। তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। কতজন তো মারাই গেছে। মসজিদ ধ্বংস হচ্ছে। শুধুই কি আমেরিকায়, সারা পাশ্চাত্য জগতে আজ মুসলমানরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আর আফগানিস্তানে যুদ্ধ শুরু করে দিয়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। তারা আজ আমেরিকার প্রতি বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। এতে কি আমেরিকার কিছুই ক্ষতি হচ্ছে না ? তাদের মানমর্যাদা কি বাড়ছে ? এতদিন যিনি সবার কাছে সমীহ হয়েছিলেন, আজ তিনি ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট বুশের একটি কথায় আজ পৃথিবীময় মুসলমান ও খৃস্টান বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ছে। আজ পৃথিবীময় অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট বুশ কি পারবেন এ আগুন নিভাতে ?

আজ বিশ্বময় প্রশ্ন উঠেছে- টুইনটাওয়ার ধ্বংসের সাথে সাথে কেন তদন্ত করা হল না ? এটা কে করেছে ? আমেরিকার এত বড় শক্তিশালী গোয়েন্দা বাহিনী রয়েছে, যারা পৃথিবীময় সমস্ত দেশের অভ্যন্তরীণ খবর বের করে নিয়ে আসে। তারা টুইন টাওয়ার ধ্বংসের সময় কোথায় ছিল? এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল তারা খবর পেল না কেন ? খবরে প্রকাশ, একটা প্লেন আঘাত করার ১৮ মিনিট পর আরেকটা প্লেন আঘাত করেছে, তারপর পেন্টাগনে আরেকটা প্লেন আঘাত করেছে এবং আরেকটা প্লেন মাঝপথে ধ্বংস হয়েছে। নতুবা এটা হয়ত পেন্টাগন বা হোয়াইট হাউসে আঘাত হানত। তাহলে হয়ত পেন্টাগন ধ্বংস হয়ে যেত বা হোয়াইট হাউস ধ্বংস হয়ে যেত। অথচ গোয়েন্দা বাহিনী কোন খবর পেল না কিংবা কোন প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারল না ? এটা যে

www.pathagar.com

আমেরিকার জন্য কত বড় লজ্জার কথা তা কি প্রেসিডেন্ট বুশ বুঝতে পারছেন না ? না কি সবই বুঝে এ লজ্জা ঢাকতেই আমেরিকাবাসী ও বিশ্বের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরাবার জন্য মুসলমানদের দিকে আঙুলি নির্দেশ করছেন?

১৯৯৫ সালে আমেরিকার ওকলাহোমায় বোমার আঘাতে এক ট্রেড সেন্টার ধ্বংস হয়ে বহু লোক মারা যায় এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তখন আমেরিকানরা জিগির তোলে যে, এ কাজ মুসলমানরা করেছে। একজন মিসরীয় মুসলমানকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারও করা হয়। এরপর তদন্তে একজন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান খৃস্টান টিমোথী ধরা পড়ল। ৭/৮ বছর ধরে তার বিচার কাজ চলল। ২০০১ সালে এসে সে শাস্তি পেল, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল। অথচ প্রেসিডেন্ট বুশ কিসের ভিত্তিতে ওসামা বিন লাদেনকে দোষী সাব্যস্ত করলেন ? তিনি কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পেরেছেন কি ? ব্লাকবক্স তো উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে কি পাওয়া গেল? বিশ্ববাসীকে কেন সেটা জানতে দেয়া হচ্ছে না। সংবাদে প্রকাশ, সেদিন টুইন টাওয়ারে সাড়ে ৪ হাজার ইহুদী যারা সেখানে কাজ করত, অনুপস্থিত ছিল। তারা মারা যায়নি। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর সেদিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের নিষেধ শুনে তার যাওয়া স্থগিত হয়। এতে কি বোঝা যায় ? এতে তো দিনের মত পরিষ্কার হয়ে যায়, এটা ইহুদীদের কারসাজি। আর যে কেউ-ই করে থাকুক, এটা বহুদিনের পরিকল্পনা মাফিক করা হয়েছে এবং যারা করেছে তারা অবশ্যই বিজ্ঞানমনস্ক। আর কে না জানে যে, পশ্চিমা জগত বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক সেদেশে আছে। তাদের গবেষণালব্ধ নতুন নতুন আগ্নেয়াস্ত্র, রকেট বিমান পৃথিবী বিখ্যাত। প্রেসিডেন্ট বুশ কি জানেন না যে, তাদের দেশে শ' শ' সন্ত্রাসী সংগঠন এবং বহু সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। তাদের কাজ এটা। প্রেসিডেন্ট বুশের জানা উচিৎ, কিছুদিন পূর্বে মুসলমানরা ভোট দিয়ে তাকে জয়যুক্ত করেছে। অথচ আজ সে জয়ী হয়েই সেই মুসলমানদের ধ্বংসের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছেন? তিনি আফগানিস্তানে যেটা করছেন, সেটাকে যুদ্ধ বলা যাবে না। এটা নিষ্ঠুর নির্যাতন ও বর্বর হত্যাকাণ্ড। তিনি শক্তিধর বলেই কি তিনি দুর্বলকে হত্যার অধিকার রাখেন ? একবার নিজেকে, নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন।

আসলে প্রেসিডেন্ট বুশের এই আফগানিস্তান হামলার পেছনে অন্য উদ্দেশ্য কাজ করছে। সেটা হল- মুসলমান ও মুসলমানদের ঈমানী চেতনা ধ্বংস করা। আমেরিকা একমাত্র শত্রু মনে করত সোভিয়েত ইউনিয়নকে। সেই সোভিয়েত আশির দশকে যখন আফগানিস্তান আক্রমণ করে তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিল, তখন আফগানরা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করল। এরপর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমেরিকা শত্রুমুক্ত হয়ে গেল। পৃথিবীতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিধর শত্রু আর কেউ রইল না। আফগানিস্তানের সেই যুদ্ধে আমেরিকা প্রচুর অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে আফগানদের সাহায্য করেছে। যুদ্ধের পর আফগানরা আর স্থিতিশীল সরকার গঠন করতে পারল না। যে আফগানরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তারাই আবার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেল। আমেরিকাও তাদের ইন্ধন যোগাতে লাগল, যাতে তারা নিজেরাই যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যায়। এই অবস্থা দেখে কিছু মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষক মিলে এই বিবদমান গ্রুপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল ও দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে

www.pathagar.com

বাঁচাতে জোটবদ্ধ হল এবং আফগানিস্তানের প্রায় ৯৫ ভাগ এলাকার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখল। তারা দেশে স্থিতিশীলতা আনয়ন করার পর সেখানে শরিয়া আইন জারি করল। দেশ এক ভয়াবহ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচল। এখন সেখানকার অধিবাসী শান্তিতে বাস করতে লাগল। কিন্তু একটা যুদ্ধবিধ্বংস্ত দেশ হিসেবে দুর্ভিক্ষকবলিত হয়ে পড়ল। সেই দুর্ভিক্ষকবলিত দেশকে কোন পাশ্চাত্য জগত স্বীকৃতি তো দিলই না, উপরন্তু ওসামা বিন লাদেনের অজুহাত সৃষ্টি করে আফগানিস্তানের ওপর অবরোধ আরোপ করে রাখল। আফগানিস্তান আজ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। তবুও তারা কারও সাহায্য চায়নি। ওসামা বিন লাদেন তার ধনসম্পদ নিয়ে তাদের বিপদে এগিয়ে এসেছে এবং আমেরিকার কার্যকলাপের নিন্দা জানিয়েছে। এটা বিন লাদেনের অপরাধ। মাদ্রাসার সেই ছাত্র-শিক্ষকরাই বর্তমানে আফগানিস্তানের শাসক দল। আরবীতে ছাত্রদের 'তালিবে ইলম' অর্থাৎ বিদ্যা শিক্ষার্থী বলা হয়। সেখান থেকে 'তালিবান' সংক্ষিপ্ত নাম হয়েছে। যেহেতু এই মুসলিম তালিবানরা অর্থাৎ ছাত্ররা এত বড় বিজয় এনেছে এবং সুন্দরভাবে টিকে আছে, সেটাই আমেরিকার মাথাব্যথা। তারা ঈমানের বলে বলীয়ান। এরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও কাছে মাথা নত করে না। তালিবানদের বিজয় ও ঈমানের শক্তি দেখে আমেরিকার হৃদকম্পন শুরু হয়েছে। তালিবানভীতি তাদের পেয়ে বসেছে। কাজেই সব জায়গায় তারা তালিবান হরকাতুল জিহাদ বাহিনী দেখতে পাচ্ছে এবং তাদের নির্মূল করার জন্য ওঠেপড়ে লেগেছে।

আমেরিকা মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলে। আমেরিকা জোর-জবরদস্তি করে ফিলিস্তিনীদের দেশ দখল করে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে ইসরাইলীদের এনে বসতি স্থাপন করাল। আর ফিলিস্তিনীরা আজ ৫০ বছর ধরে দেশে দেশে যাযাবরের মত ঘুরছে। সেই ফিলিস্তিনীরা যখন নিজ দেশ উদ্ধারের সংগ্রাম করছে তখন তাদের 'সন্ত্রাসী' বলে আখ্যায়িত করছে। আর আমেরিকা অন্যের দেশ দখল করেও আজ ভাল মানুষ। সেই কবির ভাষায় বলতে হয়, 'তুমি বেটা সাধু হলে, আর আমি আজ চোর বটে'। আমেরিকার এসব সন্ত্রাসী কাজের সমালোচনা করে বলেই ওসামা আজ সন্ত্রাসী। আর আফগানরা খাঁটি মুসলমান, তাই তারাও সন্ত্রাসী। এসব অজুহাত তুলে আসলে মুসলমানদের ধ্বংস করা, আর একটি ইসলামী দেশকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার বাসনা তাদের। আজ সময় এসেছে পাশ্চাত্য চক্রান্ত ছিন্ন করে বিশ্ব মুসলিম এক হওয়ার। মুসলমানরা এক আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় পায় না। এক অসহায় দেশের ওপর এক শক্তিশালী দেশ নির্বিচারে ধ্বংস করে চলেছে অথবা 'জাতিসংঘ' নীরব দর্শক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে। কিছু প্রতিবাদ করছে না। মুসলমানদের যেখানে স্বার্থ সেখানে জাতিসংঘ নীরব, এমন জাতিসংঘ মুসলমানদের দরকার নেই। পৃথিবীতে মুসলমান কম নেই। মুসলিমদের স্বার্থের জন্য মুসলিম জাতিসংঘ গঠন করা জরুরী হয়ে পড়েছে। আল্লাহপাক মুসলমানদের সম্পদ কম দেননি। এই সম্পদ মুসলমানদের জন্য ব্যবহার করতে হবে। আমেরিকার সাথে সমস্ত সম্পর্ক মুসলমানদের বয়কট করতে হবে। ওআইসি একটি প্রতিবাদও জানাল না। এতে আশ্চর্য হতে হয়, কেন এত ভয় ? কিসের এত ভয় ? ভয় করতে হবে আল্লাহকে। আল্লাহপাক শক্তিধরদের শক্তি চুরমার করে দিতে পারেন। যেমন তিনি ধ্বংস করেছিলেন 'আবরাহা'র সৈন্য বাহিনীকে। আজকাল সামরিক

www.pathagar.com

পর্যবেক্ষকরা বলেছেন আফগানিস্তানে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ আসন্ন। অবশ্য এতে আফগানরা বিজয়ী হবে এটা নিশ্চিত বলা যায়।

কাজেই সমস্ত মুসলমান হুঁশিয়ার। এ খলদের বিশ্বাস করবেন না। যুগে যুগে মুসলমানদের বিপদ এসেছে। আল্লাহপাক রক্ষা করেছেন। এবারও রক্ষা করবেন। কবির ভাষায় বলতে হয়, 'মুসলিম জিন্দা হোতা হ্যায়, হার কারবালাকে বাদ'। ❑

ডিসেম্বর '০১
প্রাবন্ধিক।

যে মৃত্যুর জবাব মিলেনা।

www.pathagar.com

বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের হোতা আমেরিকা

কমোডর এম আতাউর রহমান

কি যে সময় এলো-যেদিকে তাকাই শুধু সন্ত্রাসের খবরই দেখতে পাই। পত্র-পত্রিকায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মারামারি ও হানাহানির খবর ছাপানো হচ্ছে। রেডিও-টেলিভিশন ও প্রচার মাধ্যমে ঘন্টার পর ঘন্টা দেখানো হচ্ছে সন্ত্রাসী কার্যক্রম। মনে হয় ঘরে বসেও সন্ত্রাসীদের হাতের নাগাল থেকে রেহাই পাচ্ছি না। এই সন্ত্রাস ছড়ানোর ব্যাপারে সব চাইতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে আমেরিকা এবং তার প্রচার মাধ্যম সিএনএন। এরা দিন-রাত তাদের শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে, কেবলই বিশ্বের চারদিকে সন্ত্রাসযুক্ত সংবাদ ছড়াচ্ছে এবং ত্রাস সৃষ্টিকারক তথ্য পরিবেশন করছে।

আমেরিকা একদিকে বীরপুরুষোচিত হাঁক-ডাক ছাড়ছে যে, সন্ত্রাস তারা দূর করবেই। আবার অন্যদিকে ভীরু কাপুরুষের মত এক ব্যক্তির ভয়ে থর থর করে কাঁপছে আর হাজার হাজার মাইল দূরে নিরাপদ স্থানে বসে ক্রমাগতই ঢিল ছুঁড়ছে সেই ব্যক্তির দিকে যার নাম ওসামা বিন লাদেন। এক ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার নেতৃত্বে ইসলাম ধর্মবিরোধী দেশসমূহ সম্মিলিতভাবে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে ক্রুসেডের ডাক দিয়েছেন। পরে যখন অনুভব করলেন যে, অর্বাচীনের মত ক্রুসেড শব্দটি ব্যবহার করে ফেলেছেন, তখন সংশোধন করে ধর্মযুদ্ধের নামে না লড়ে শান্তির জন্য লড়ছেন বলে বিশ্বকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করলেন। যাক সে কথা। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা কি ন্যায়ভিত্তিক বিশ্বাস নিয়ে লড়ছেন না অন্যায় ও বিদ্বেষপ্রসূত বিশ্বাস অনুযায়ী লড়ছেন, তা আপনারাই ভাল জানেন। যদি দৃঢ়প্রত্যয় থাকে এবং বীরের জাতি হয়ে থাকেন তাহলে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হোন, দূর থেকে রাতের আঁধারে ঢিল মারবেন না। ঢিল ছোঁড়ে কারা ? যারা সামনে এগিয়ে এসে ঝুঁকি মোকাবিলা করতে ভয় পায় তারাই দূর থেকে ঢিল ছোঁড়ে। আপনাদের ঢিল হচ্ছে বৈজ্ঞানিক যুগে উদ্ভাবিত উড়োজাহাজের মাধ্যমে দূর থেকে মিসাইল ক্ষেপণ, বোমা নিক্ষেপ। আপনারা এলোপাথাড়ি বোমা বর্ষণ করে অসংখ্য নিরীহ নিরুপায় ও অসহায় আফগান নারী-পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করছেন। সাবাস আমেরিকা! সাবাস বুশ! আপনারা বীরের জাতই বটে।

আমেরিকাবাসী আপনারা মাত্র ৪০ বছর পূর্বেই ভিয়েতনামে গিয়েছিলেন তেজ দেখাতে। আপনাদের প্রেসিডেন্ট লিনডন বি জনসন বোমা মেরে ভিয়েতনামকে গুঁড়িয়ে দেবেন এই

www.pathagar.com

ছিল আপনাদের নিকট তার শপথ। কিন্তু আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, জনসন ফেল মারলেন এবং তারপর আপনাদের বলিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট নিক্সন গেলেন একই উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু ভিয়েতনাম থেকে ফিরে এলেন লেজ খুইয়ে। দুর্বল ভিয়েতনামীরা আপনাদের মুখে চুন-কালি মাখিয়ে নিক্সনকে ফেরত পাঠালো আমেরিকায়। তারপর আপনারাই আপনাদের প্রেসিডেন্টকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন, খুনী বলে ধিক্কার দিয়েছিলেন এবং তাকে গদিচ্যুত করেছিলেন। আপনাদের ইতিহাস আপনাদেরই বেশী জানা উচিত। ভিয়েতনামবাসীদের ওপর আপনাদের সন্ত্রাস ও বর্বরতার ইতিহাস ৩০ বছরের বেশী পুরোনো হয়নি। কিন্তু আপনারা বেমালুম ভুলে বসে আছেন কেননা সেটা ছিল লজ্জার ইতিহাস-বীরত্বের ইতিহাস হলে মনে থাকতো। ইতিহাসের দেয়াল লেখনী যদি সত্য হয় তাহলে আফগানিস্তানে অমানুষিক অত্যাচার করার জন্য আপনাদের বুশ সাহেবের পরিণতিও তার পূর্বসূরীদের মতই হবে। তখন কিন্তু তিনি লুকোবার স্থানও খুঁজে পাবেন না, বুশকে ঝোপ-ঝাড়েই আশ্রয় নিতে হবে। আপনারাই তখন তাকে তুই-তোকারি করবেন, ধিক্কার দেবেন এবং ঠেলে ফেলে দেবেন।

আমেরিকার মা-বোনেরা- আপনাদের টুইন টাওয়ার যখন বিধ্বস্ত হলো তখন শুধু আমেরিকান রক্তই ক্ষরিত হয়নি, বিশ্বের আরো বহু দেশের মা-বোনদের অতি প্রিয়জনদের রক্তও আমেরিকান রক্তের সাথে মিশেছিল। আমাদের দেশের অভাগারাও আপনাদের দেশের টুইন টাওয়ারের ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েছিল। আমরা সকলের জন্যই ব্যথিত হয়েছিলাম। আপনাদের সাথে একই সুরে কেঁদেছিলাম, একই সাথে প্রার্থনা করেছিলাম, সন্ত্রাস দমনের আহ্বানে পূর্ণভাবে সাড়া দিয়েছিলাম, এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সন্ত্রাস দমনের কাজে এগিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, আপনাদের বুশ সাহেব সন্ত্রাস দমনের পরিবর্তে নিজেই মহা সন্ত্রাসী হয়ে পড়েছেন। তিনি সন্ত্রাস দমনের অছিলায় আমেরিকার জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করতে চাচ্ছেন। এতে কি হচ্ছে ? তিনি এক লাদেনের পরিবর্তে বহু ক্ষুদে লাদেন সৃষ্টি করে চলেছেন। আমেরিকার মা-বোনেরা- আপনাদের হৃদয় কি পাথর দিয়ে তৈরী ? আপনারা কি উপলব্ধি করতে পারছেন না যে, আপনাদের বর্বরতম বোমা বর্ষণে আফগানিস্তানে অসংখ্য নিরীহ নারী-শিশু মারা যাচ্ছে এবং তাদের মা-বোনদের আর্তনাদে বুশের ও তাদের দোসরদের বোমাবর্ষণের প্রচণ্ড আওয়াজকেও বোবা বানিয়ে দিচ্ছে।

আমেরিকান দুর্বৃত্তরা হাসপাতাল, বাজার, আবাসিক এলাকা, স্কুল, মসজিদ ও খাদ্য ভাণ্ডারসমূহে নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে চলেছে এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। বাধ্য হয়ে লাখ লাখ লোক বোমা থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে অন্য দেশে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছে। সেখানেও তাদের কেউ আশ্রয় দিতে চাচ্ছে না। আফগান উদ্বাস্তুদের হতাশার করুণ চিত্র হৃদয় দিয়ে একটু ভাববার চেষ্টা করুন। অনুধাবন করতে পারবেন যে, ছোট ছোট শিশুরা অনাহারে মারা যাচ্ছে, ওষুধের অভাবে, চিকিৎসার অভাবে, ক্লাস্টার বোমায় আঘাতপ্রাপ্ত আফগনরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, পানি নেই, মাথার ওপর ছাউনি নেই আছে শুধু হতাশা এবং দুর্দশা। আফগানিস্তানে এই করুণ অবস্থার জন্য দায়ী কে ? বিন লাদেন না বুশ ? নির্দ্বিধায় বলা চলে এর জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী আমেরিকার বুশ, বুশ এবং বুশ। বিন লাদেনের সাথে পেরে উঠছেন না তাই তিনি নিরীহ মুসলিম

www.pathagar.com

হত্যা করে চলেছেন।

আমেরিকার মা-বোনেরা- আপনারা বোমাবাজিতে সত্যি শক্তিশালী দেশ। এটা আমরা জানি এবং মানি আপনাদের দাপটে আমরা কেউ মুখ খুলতে সাহস পাই না। কেননা আপনারা যে ভীষণ সন্ত্রাসী, আপনারাই যে সন্ত্রাসের হোতা। আপনাদের কথামতো না চললে আপনাদের সিআইএ আমাদের পথে বসাতে পারে। আমাদের অনাহারে মারতে পারে। আপনারা আমাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতে পারেন যেমন আফগানদের করছেন। আমাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও হরণ করতে পারেন। তাই চুপ করে থাকতে বাধ্য হচ্ছি।

ধরুন, আজ যদি আফগানিস্তান আপনাদের মত ক্ষমতাধর হতো, তাহলে কি তারা আপনাদের ছেড়ে কথা বলতো ? তখন তারা আপনাদেরই অনুকরণে শুধু টুইন টাওয়ার নয় বরং সমগ্র আমেরিকাকে ধূলিসাৎ করার জন্য বোমা বর্ষণ করতো। বলতো বুশ মহা সন্ত্রাসী তাকে ফেরত দাও তাহলেই তোমাদের মুক্তি। আমেরিকার মা-বোনদের সাধের সংসার তছনছ হয়ে যেতো এবং আমেরিকানদের কান্না বিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো এবং ঘন কুয়াশার মত এখানে-ওখানে জমাট বেঁধে থাকতো। তখন আপনারা এবং আমরা বলতাম যে, আফগানিস্তান একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। কারণ তারা নির্বিচারে গণহত্যা করছে। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী আজ আমরা আপনাদের সন্ত্রাসী বলতে পারি। কি পারি না ? ভেবে দেখুন।

আপনারা সন্দেহবশত ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে উন্মাদের মত যে খেলা খেলছেন- পাশবিক শক্তি বলে যেভাবে দুর্বলের ওপর হামলা করছেন তারই অনুকরণে, ইসরাইল প্যালেস্টাইনে কামান দাগাচ্ছে কারণ ইসরাইল শক্তিশালী। ইসরাইলকে সংযত করার মত নৈতিক বল আপনাদের নেই। কারণ আপনারা নিজেরাই পাপী এবং সন্ত্রাসী। আপনাদের বাইরে পশু শক্তির দম্ভ আছে কিন্তু নৈতিকতার বিচারে আপনারা অতি দুর্বল। আপনারা যদি ভাবেন যে, বিশ্বের বড় বড় ক্ষমতাশালী দেশসমূহ আপনাদেরকে নেতা হিসেবে মানছে তাহলে সেটাও হবে ভুল। আপনাদের মেকি নেতৃত্বের পেছনে ওরা ছুটছে না, তারা ছুটছে আপনাদের ধন-দৌলতের পেছনে। সুতরাং আপনারা মোহাবিষ্ট না হয়ে বাস্তববাদী হোন। এতে আপনাদেরও মঙ্গল হবে এবং অন্যদেরও মঙ্গল হবে।

সমগ্র ব্যাপারটাকে অন্য একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখার চেষ্টা করি। একটি দুর্বল লোককে আপনারা কয়েকজন সবল সন্ত্রাসী যদি খুব করে মারধর করেন, তাহলে সেই মুহূর্তে দুর্বল লোকটির পক্ষে চুপ করে মার খাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। কিন্তু তার মনের মধ্যে আপনাদের বিরুদ্ধে এমন ক্ষোভ জন্মাবে যে, সুযোগ পেলেই সে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে। সে তার সুযোগমত, তার পছন্দসই ভূমিতে আপনাদের কারো ওপর হামলা চালাবে। আপনি এবং আপনার বংশধররা যে অত্যাচার করেছেন তারই জন্য দুর্বলদের এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। দুর্বলদের অস্ত্রবল এবং অর্থবল নেই বললেই চলে। তাই তারা মনের খেদ মেটানোর জন্য যখন ছুরি, খেলনা পিস্তল, ককটেল এবং অন্যান্য ছোটখাট বোমা কোথাও ফাটায়, প্লেন হাইজ্যাক করে এবং তাতে কিছু নিরীহ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা প্রাণে মারা যায়, তক্ষুণি আপনারা সন্ত্রাস সন্ত্রাস বলে চেঁচিয়ে ওঠেন। আপনাদের কি কখনো মনে হয় না যে, হাজার হাজার টন বোমা মেরে লাখ লাখ নিরীহ

www.pathagar.com

লোক যখন মারেন তখন সেটা হয় প্রচণ্ডতম সন্ত্রাস। এই ছোট সাধারণ উদাহরণ এই জন্য দিলাম যাতে উপলব্ধি করতে পারেন যে, সন্ত্রাসের জন্ম কোথায় এবং কিভাবে হয়। বলবানদের অত্যাচারের তাৎক্ষণিক জবাব যখন দুর্বলদের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয় না তখনই মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে এবং তারই ফলে ঘটতে থাকে ছোট ছোট সন্ত্রাস। সুতরাং আমেরিকানদের বোমাবাজির ফলে বিশ্বের সর্বত্র অনবরতই সৃষ্টি হচ্ছে সন্ত্রাসী যারা পরবর্তীকালে সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রতিশোধ নেবে।

আমেরিকার বুশ সাহেব, আপনারা ভুল পথ অনুসরণ করছেন। সন্ত্রাসের মাধ্যমে সন্ত্রাস দমন করা যায় না। সাময়িভাবে দুর্ধর্ষ মস্তানের সামনে যেমন ছোট ছোট অত্যাচারিতরা নিশ্চুপ থাকে তেমনি সুপার পাওয়ার মস্তানদের দাপটে সব দেশেরই ছোট ছোট অবহেলিত ও বঞ্চিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীরা গা-ঢাকা দিয়ে থাকে এবং তাদের সুযোগ বুঝে প্রতিশোধ নেয়। তাদের পক্ষে এ পন্থাই স্বাভাবিক এবং এছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই।

সত্যিকারভাবে সন্ত্রাস দমন করতে হলে সুপার পাওয়ারদের একটা শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে এবং ভালবাসার মাধ্যমে, পথ ও পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে যাতে মানুষ মানুষকে ভালবাসতে শেখে। একজনের ব্যথায় সমাজের সকলেই ব্যথা অনুভব করে এবং তার ব্যথা ও অসুবিধা উপশমের জন্য এগিয়ে আসে। সুতরাং আমেরিকার বুশ সাহেবকে হিংসার বশবর্তী না হয়ে, মানবতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভালবাসা দিয়ে সকলের মন জয় করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বিশ্বের সর্বক্ষেত্রে এবং জাতীয় এবং সমাজ জীবনের সর্বস্তরে। ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা সাধনের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে আরবদের হৃদয় জয় করতে হবে, তবেই তারা আপনাদের সন্ত্রাসী ভাববে না এবং আপনাদের বিরুদ্ধে ছোট ছোট সন্ত্রাসমূলক কাজে লিপ্ত হবে না। মনের গভীরে আপনাদের প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ জাগবে। আপনারা উদার হলেই সকলকে বন্ধুরূপে দেখতে পারেন। তখন সন্ত্রাসের ভয়ে ভীত থাকবেন না। একটু আঁধার হলেই ভূত-পেত্নী দেখে চিৎকার করে উঠবেন না। চারদিকে সন্ত্রাস দেখবেন না, সন্ত্রাস আপনাদের ধাওয়া করবে না। স্বাভাবিক জীবন তখন আপনারা যাপন করতে পারবেন।

আমি আশ্চর্য হই যখন ভাবি যে, মোসাহেবের দল তথাকথিত আমেরিকার দোসররা সকলে মিলে এই দুনিয়াটাকে ভয়াবহ সন্ত্রাসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যেখানে মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে পারবে না, ভালবাসতে পারবে না। সকলেই প্রতিহিংসা নেবার তালে ঘুরবে এবং সুযোগ পেলেই আঘাত হানবে। আপনাদের বর্তমান কর্মকাণ্ড দুনিয়াটাকে সেদিকেই ঠেলে দিচ্ছে। আপনারা কি মুসলিম নিধন করার নামে ও রকম একটা দুনিয়া সৃষ্টি করতে চান?

আমার বিশ্বাস আপনাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কখনও বুশের ভ্রান্ত মত ও পথ সমর্থন করবেন না। ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত না হয়ে এই পৃথিবীতে প্রকৃত ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দেবেন। ইসরাইল যদি অন্যায় করে তাহলে আপনারা ও আপনাদের দোসররা সকলে মিলে শুধু চাপ সৃষ্টি নয়, প্রয়োজনবোধে শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যেদিন তাদেরকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেন সেদিন অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, আপনারা আরবদের সহযোগিতা পাচ্ছেন এবং তখনই দেখবেন যে, ওসামা বিন লাদেনদের সন্ত্রাসী

www.pathagar.com

কার্যক্রম গ্রহণ করার আর প্রয়োজন পড়ছে না। খৃস্ট ধর্মাবলম্বী হয়ে যদি আপনাদেরই প্রেরিত পুরুষ মহান যীশুখৃস্টের উদারতম মর্মবাণীকে (ডান গালে চড় খেলে-বাম গাল পেতে দিন) অবজ্ঞা করেন এবং এই দুনিয়ার ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা এভাবে অব্যাহত রাখেন তাহলে মুসলিমদের প্রত্যাঘাত করার অধিকার কোন্ যুক্তিবলে অস্বীকার করবেন? মুসলিমদের আপনারা ঘৃণা করেন এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। প্রতারণার ছদ্মাবরণ ফেলে দিয়ে বুশ সাহেবকে সামনে দাঁড়াতে বলুন, আপনারাই প্রত্যক্ষ করবেন, তার চেহারায় ও কথাবার্তায় কতটা মুসলিম বিদ্বেষপ্রসূত ভাব ফুটে ওঠে। বুশকে লাদেনের মত শান্ত-শিষ্ট হতে হবে। তবেই আরববাসী এবং বিশ্বের মুসলিমরা তাকে এবং আমেরিকাকে আপন করে নিতে পারবে এবং তখনই সন্ত্রাসের অবসান ঘটবে। আর তা যদি না পারেন তাহলে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন তার ওপর একটু আলোকপাত করছি।

১) বিশ্বের যে কোন স্থানে যে কোন সময় সুযোগ পেলেই হৃদয়ে আঘাতপ্রাপ্ত এবং আপনাদের দ্বারা নির্যাতিত মুসলিমগণ আপনাদের ওপর হামলা চালাবে। আপনাদের নির্বিচার বোমাবাজির ফলে আপনারা গত এক মাসে অন্তত কয়েক লক্ষ ক্ষুদে শত্রু তৈরী করেছেন। ন্যায় বিচারে তাদের প্রত্যেকেরই আপনাদের ওপর আঘাত হানার অধিকার আছে এবং এ ধরনের আঘাত হানার কাজকে তার নৈতিক বিচারে সম্পূর্ণ বৈধ বলে মনে করবে। তাই আপনারাই বিচার করুন- বল প্রয়োগের মাধ্যমে আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হলো কি হলো না। তবে উদ্দেশ্য যদি মুসলিম নিধন হয় তাহলে সাময়িকভাবে তা সফল হচ্ছে।

২) নির্যাতিত মুসলিমরা সামরিক বিচারে আপনাদের চাইতে অনেক দুর্বল তাই তাদের পক্ষে আপনাদের সাথে সম্মুখ সমরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। বিশ্বের উন্নয়নশীল খৃস্টান ধর্মাবলম্বী দেশসমূহ যে আজ মুসলিম দেশসমূহের বিরুদ্ধে লেগেছে সেটা বিশ্বব্যাপী সমস্ত মুসলিম দেশের জনগণ পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করছে। আমেরিকা এবং তার বংশধর খৃস্টান দেশসমূহের গুপ্তচর সংস্থাসমূহ এই সরল সত্যটি অবশ্যই জানেন। তবে কূটনৈতিক কারণে না জানার ভান করে থাকেন। মুসলিম বিশ্ব এটাও জানে যে, আপনারা মুসলিম বিশ্বে বিভেদ সৃষ্টি করে আপনাদের শাসন বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা গঠিত পুতুল সরকারের মাধ্যমে কায়েম করতে চান। ২শ'- আড়াইশ' বছর পূর্বে প্রতারণার মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করে কলোনি স্থাপন করা যতটা সহজ ছিল, আজ আইটি টেকনোলজি প্রত্যেকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়ায় প্রতারণা করে তা অর্জন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩) আজ মুসলিম বিশ্ব উপলব্ধি করতে পারছে যে, তাদের মধ্যে একতা একান্ত প্রয়োজন। শুধু এটুকু উপলব্ধি করে যদি নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয় তাহলেই অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রয়োজন হবে না। প্রতি বছর আপনাদের নিকট থেকে কয়েক বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র আমদানী করার প্রয়োজন হবে না। মুসলিম দেশসমূহের অর্থনীতি বলিষ্ঠ হবে এবং আপনাদের সমরাস্ত্র শিল্প মুখ থুবড়ে পড়বে এবং আপনাদের অর্থনীতিতে দেখা দেবে মন্দা। আপনাদের বর্তমান মুসলিম নিধন নীতি মুসলিম বিশ্বের জন্য শাপে বর হিসেবে দেখা দেবে।

www.pathagar.com

৪) মুসলিম বিশ্বকে নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্যাদির ওপর নির্ভরশীলতার নীতি প্রণয়ন করতে হবে। আর সেটা করতে গেলেই বৈদেশিক মূল্যের ভারসাম্যের জন্য বিদেশী পণ্য বর্জনের প্রয়োজন হবে। এটাতেও একদিকে মুসলিম বিশ্বের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে অন্যদিকে আপনাদের অর্থনীতি আঘাতপ্রাপ্ত হবে। আপনারা বিরাট বাজার হারাবেন।

এসব বিবেচনায় আমেরিকাবাসী আপনারাই ভেবে দেখুন, এই নিষ্ঠুর ও অমানবিক যুদ্ধ আপনারা চালিয়ে যাবেন কিনা। গত এক মাসে মুসলিম বিশ্বের ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই অর্জন করেননি। প্রতিদিনই মুসলিম রক্ত ঝরছে এবং ক্ষুদে ক্ষুদে লাদেন সৃষ্টি হচ্ছে যা একদিন আপনাদেরই চরম শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হবে। তাই বিশ্বের স্থিতিশীলতার জন্য আপনাদের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করুন এবং শান্তির পথ বেছে নিন। ❑

ডিসেম্বর '০১
প্রাবন্ধিক, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা।

www.pathagar.com

বধ্যভূমি আফগানিস্তান

রেভলিউশনারি অ্যাসোসিয়েশন অব দি উইমেনস অব আফগানিস্তান বা রাওয়া আফগানিস্তানের বড় দীর্ঘ তমসার মাঝে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের একটি উজ্জ্বল আলো। মৌলবাদী মুজাহিদিন ও তালিবান, সুবিধাবাদীদের জোট নর্দার্ন অ্যালায়েন্স এবং তাদের সাম্প্রতিক মুরুব্বি মার্কিন সরকার-সর্বপক্ষেরই সমান চক্ষুশূল এই প্রবল সক্রিয় নারী সংগঠনটি। কারণ 'রাওয়া' এদের সকলেরই ভণ্ডামি-নষ্টামি, তা ইসলামের নামেই হোক বা আধুনিকতা ও গণতন্ত্রের নামে, ধারাবাহিকভাবে উন্মোচিত করেছে। রাওয়ার সংগৃহীত অজস্র রিপোর্ট থেকে মাত্র কয়েকটি আমরা এখানে সংকলিত করেছি। উপজাতীয় দ্বন্দ্বে দীর্ণ আফগান রাজনীতির টানাপোড়েনকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন-সোভিয়েত ছায়াযুদ্ধের পর্ব থেকে মুজাহিদিনদের মুষল-পর্ব, তালিবান-জমানা থেকে আমেরিকার সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী যুদ্ধ-নানা সময়ে বিজয়ীদের রণ-রক্ত-সফলতার নেপথ্যে লক্ষ লক্ষ আমজনতার ছিন্নভিন্ন জীবনের মর্মান্তিক মন্তাজ এতে ফুটে উঠেছে।

আমেরিকান বোমাবর্ষণে ক্ষেত-খামারসহ গ্রাম নিশ্চিহ্ন

কামা আডো ঃ বাচ্চাদের জুতো, ছেঁড়া কার্পেটের টুকরো, রান্নার বাসনপত্র এসব ছড়িয়ে পড়ে আছে। মরা গরু-ভেড়ার লাশ এখানে ওখানে। এই ক্ষুদ্র আফগান গ্রামটিতে চারদিকে বোমাবর্ষণের ফলে বড় বড় গর্ত-একেকটা ২০ ফুটের মত চওড়া।

আমেরিকা বলছে, ওসামা বিন লাদেন এবং তার অনুগামীরা আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব দিকের এসব গ্রামে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তালিবান-বিরোধী নেতারাও জানাচ্ছেন এই গ্রামে সন্ত্রাসবাদীরা নয়, সাধারণ গ্রামবাসীরাই মরেছে। আমেরিকার গোয়েন্দা দপ্তরের তথ্যেই গলদ রয়েছে বলে তাদের অভিযোগ।

"এর কী গুনাহ্ ছিল ?" এক প্রত্যক্ষদর্শী একটি বাচ্চার মাথা দেখিয়ে বললেন। ২৮ অক্টোবর কাবুলে বোমাবর্ষণের ফলে ১১ জন অসামরিক ব্যক্তি মারা যায়, তাদের মধ্যে ৭টি ছিল বাচ্চা।

আর এক প্রত্যক্ষদর্শী জানালেন, গ্রামের চারধারে প্রায় ২৫টি বোমা ফেলা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী কামালউদ্দিন জানালেন, এখানকার ৩০০ জন গ্রামবাসীর মধ্যে ১৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার কথায়, "আমরা কৃষক, আমরা গরীব। আমরা কোনও দলের সাথে

www.pathagar.com

যুক্ত নই।" তার ধূলিধূসরিত মুখ কান্নায় ভিজে গেল। তার কাছে একটি কাঠের লাঙল ও কিছু পুরোনো জামাকাপড় ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই।

ওয়াশিংটনে পেন্টাগনের জনৈক মুখপাত্র জন স্টাফলবীম অবশ্য সাংবাদিকদের বলে দেন, তার কাছে প্রমাণ নেই যে, আমেরিকান বোমায় ওই গ্রামের নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে, তাদের কাছে খবর ছিল, ওসামা বিন লাদেন স্থানীয় গ্রামপ্রধানদের সমর্থন আদায়ের জন্য তার সম্পত্তির কিছুটা অংশ ওখানে ব্যয় করেছে।

তালিবান বিরোধী নেতা মুহম্মদ জেমান জানিয়েছেন প্রায় ১২০০ আফগান নয় এরকম যোদ্ধা, কামা আডো থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরে তারা বোরা ও মাওল অঞ্চলে রয়েছে। জেমানের কথায়, তালিবান-বিরোধীরাও এই বোমাবর্ষণে মারা যাচ্ছে। তিনি ৭টি লোকের মৃতদেহ দেখিয়ে বললেন, "এরা আমার গ্রামবাসী। পরশুদিন আমি তাদের গ্রাম পাহারা দেবার জন্য পাঠিয়েছিলাম। আমেরিকান কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম আক্রমণ বন্ধ করার জন্য। কিন্তু তারা কর্ণপাত করে নি।"

যদি বিন লাদেন কামা-আডোতে টাকা ছড়িয়েও থাকে, তবু তার কোন চিহ্ন দেখা গেল না গ্রামটিতে। কারণ সেখানে প্রায় তিরিশটার মতো সাধারণ মাটির বাড়ি আর খড়ের ছাউনি ছাড়া কিছুই ছিল না।

ক্রিশ টমলিনসন

(এ পি নিউজ, ৩ ডিসেম্বর, ২০০১)

পুনশ্চ ঃ এরকমই এক কামা আডোর খবর দিয়েছেন রয়টার্সের কাবুল সংবাদদাতা সৈয়দ সালাউদ্দিন। তার ক্যামেরাম্যান পাকতিয়া প্রদেশের কোয়ালে লিয়াজি গ্রামে গিয়ে দেখেছেন সেখানে শুধু ছিন্নভিন্ন মাংসের টুকরো, রক্তের শুকনো স্রোত আর বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ঘরবাড়ি। ওসামা দলবল নিয়ে লুকিয়ে এখানে, খবর পেয়েই নাকি এই মার্কিন বিমান হানা। প্রাণ হারিয়েছেন ১০৭ জন। এরা কেউ ওসামা বা মোল্লা ওমরের সমর্থক নন, জানিয়েছেন তালিবান বিরোধীরাই। ওসামা বা ওমরের টিকি ছুঁতে না পারলেও মার্কিন বোমারু বিমানের লাগাতার হানায় এখনও ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে আফগানিস্তান। কাবুলের অন্তবর্তী সরকারের মন্ত্রীদের কাতর মিনতি-বোমাবর্ষণ থামাও। লাদেনরা পালিয়েছে। মরছে সাধারণ মানুষ। কিন্তু পেন্টাগন আফগান পাহাড়গুলোকে গুঁড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর।

কাপুরুষদের যুদ্ধে নিরীহের মৃত্যুর খতিয়ান

আমেরিকা-ঘোষিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রক্তঋণ মেটাচ্ছেন আফগান সাধারণ মানুষ। ব্রিটেন-আমেরিকা, লাদেন বা আল কায়দার বাকি নেতা অথবা তালিবান নেতা ওমর-এরা কেউই এই মূল্য দিচ্ছে না। সাধারণ আফগান জনসাধারণের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। অথচ এদের সঙ্গে ১১ সেপ্টেম্বরের বর্বরোচিত কাজের কোন যোগাযোগ নেই। তারা তালিবান শাসকদের নির্বাচিতও করেন নি। বা বিন লাদেন ও তার সঙ্গীদের কৃতকর্মের সঙ্গে এরা জড়িতও নন।

www.pathagar.com

অবশ্য পেন্টাগনের কর্তারা মার্কিন বোমাবর্ষণে সাধারণ আফগান জনগণের মৃত্যুর খবর শুনলেই আকাশ থেকে পড়েন। তারা যথেষ্ট সচেতন, তাদের যুদ্ধের পিছনে আন্তর্জাতিক সমর্থন আছে। তাই এই প্রাণহানি সম্বন্ধে পেন্টাগণের মুখপাত্রদের বাধা বুলি ঃ এই সংবাদগুলো নিজস্ব সূত্রে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তারা অসামরিক ব্যক্তিদের মৃত্যু অস্বীকার করে। সংবাদমাধ্যমগুলোও যথেষ্ট সাহায্য করেছে মার্কিন প্রশাসনকে। সাত সপ্তাহ ধরে বোমাবর্ষণ চলার পর দ্য লস এঞ্জেলস্ টাইমস্ বলছে, ৭২ জন অসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

বর্তমানে নিউ হ্যাম্পশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মার্ক হেরল্ড একটি নিরপেক্ষ রিপোর্ট তৈরি করেছেন- আনুমানিক কতজন অসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে আফগানিস্তানে। এই ব্যাপারে তিনি নির্ভর করেছেন বিভিন্ন সাহায্য প্রদানকারী সংস্থা, ইউ. এস. প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, টি. ভি., সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার রিপোর্টের উপর।

হেরল্ড যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে ৭ অক্টোবর থেকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে ৩৭৬৭ জন অসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ৬২ জন নিরীহ ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছে। এই সংখ্যা নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে ১১ সেপ্টেম্বরে আনুমানিক মৃতের সংখ্যা ৩২৩৪ কে ছাড়িয়ে গেছে।

অবশ্যই হেরল্ড অনুমানসাপেক্ষ একটি হিসাব পেশ করেছেন। এই হিসাবের মধ্যে সেসব মৃতের সংখ্যা ধরা হয় নি, যারা বোমার আঘাতে আহত হয়ে পরে মারা গেছেন, বা যুদ্ধের ফলে ঠাণ্ডায়, খাদ্যের অভাবে প্রাণ হারিয়েছেন। এমন কি সৈনিকদের মৃত্যুও এর মধ্যে ধরা হয় নি; (অবশ্য বিশেষজ্ঞদের পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী অবিরত বোমাবর্ষণের ফলে মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ১০,০০০), এমন কি যে সমস্ত বন্দীকে মাজার-ই-শরীফ, কালা-ই-জঙ্গী, কান্দাহার বিমানবন্দর বা অন্যত্র হত্যা করা হয়েছে, হেরল্ডের হিসাবে তাদেরও ধরা হয় নি।

মার্কিন যুদ্ধ-পণ্ডিতরা অবশ্য বলবেন ঃ মৃত্যু খুবই দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু এটা পৃথিবী থেকে সন্ত্রাসবাদ উচ্ছেদ করার জন্য প্রয়োজনীয়। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আক্রমণের ফলে অসামরিক ব্যক্তিদের মৃত্যু 'ইচ্ছাকৃত', কিন্তু আমেরিকানদের দ্বারা অসামরিক ব্যক্তিদের মৃত্যু 'অনিচ্ছাকৃত'।

বাস্তবিকই এই সমস্ত নৈতিকতার প্রশ্ন অনেকটাই অস্পষ্ট ধোঁয়াশার মতো। কিন্তু হেরল্ড বলছেন যে আফগান জনসাধারণের মৃত্যুর জন্য অনেকটাই দায়ী আমেরিকান এবং ব্রিটিশ রণনীতি। আফগানদের উচ্চ মৃত্যুহার হয়েছে কারণ আফগান জনগণের জীবনের দাম আমেরিকান বোমারুদের কাছে খুব কম। তাই ঘনবসতিপূর্ণ শহর ও গ্রামে দরজা দিয়ে রাস্তায় এসে পড়লাম। কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে আমিও আবিষ্কার করলাম আমার স্বামীর রক্তাক্ত দেহ। তার বুক এবং পেটের মধ্যে এক বীভৎস গর্ত। আমি তার কাছে গিয়ে জোরে জোরে ডাকতে লাগলাম 'কুদরত, কুদরত, ওঠো, ওঠো।' কিন্তু সে একটুও নড়ল না। চিৎকার করে আমি বলে উঠলাম- হে আল্লা, আমি এখন কি করব। মুঠো মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়তে লাগলাম অন্ধ আক্রোশে। আমার বাচ্চাদের কথাও খেয়াল ছিল না। প্রতিবেশীরাই আমার বাচ্চাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করল।

www.pathagar.com

আমার স্বামীর ওখানেই মৃত্যু হয়েছিল। আর আমার একটি বাচ্চা সামান্য আহত হয়েছিল রাস্তার উপর। আমি চোখের সামনে মধ্যরাতের নিকষ কালো অন্ধকার দেখতে পেলাম। আমার স্বামীর মৃত্যুর দু-তিন মাসের মধ্যে আমি আমার তৃতীয় বাচ্চার জন্ম দিলাম। এখন তিনটি বাচ্চা নিয়ে আমি পথে পথে ঘুরছি এই আশায় যে আল্লাই আমার বাচ্চাদের রক্ষা করবেন।

দ্য সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া

৩০-১২-০১

★ কাবুল থেকে এক রাওয়া সমর্থকের লেখা।

উদ্বিগ্ন শিশু।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে যা ঘটল

অধ্যাপক গোলাম আযম

পাশ্চাত্য সভ্যতা রক্ষার দোহাই দিয়ে এবং জাস্টিসের নামে আমেরিকা জাতিসংঘের একটি সদস্য দেশ আফগানিস্তানের সরকার ও জনগণের উপর যে বর্বর নির্যাতন চালিয়েছে তা মানবজাতির ইতিহাসের এক কলংকময় অধ্যায়। পাশব শক্তির দাপটে যা ইচ্ছা তাই করা যায়, কিন্তু ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে সব কিছুই যাচাই করে। জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ, সাধারণ ন্যায়বিচার, বিবেক, মানবতাবোধ, নৈতিক চেতনা ইত্যাদির দৃষ্টিতে এত বড় অপরাধ করা হলো যার প্রতিবাদ জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলও করতে সাহস করলেন না। তাহলে জাতিসংঘ কি লীগ অব নেশনের পরিণতির দিকেই এগুচ্ছে ?

গত অক্টোবরের ২য় সপ্তাহে (তারিখ মনে নেই) আমি মাঞ্চেস্টার শহরে টেলিভিশনে বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের চরম আবেগময় বক্তৃতা শুনলাম। সারকথা টুইন টাওয়ার, পেন্টাগন ও ওয়াশিংটনে হামলার উদ্দেশ্যে চারটি বিমানের ১৯ জন আত্মঘাতী হাইজ্যাককারীর ৩ জন যে ওসামা বিন লাদেনের লোক তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। অবশ্য তা আমরা প্রকাশ করছি না। তাই তালেবান সরকারের নিকট আমাদের দাবী "Either surrender Usama or Surrender Power" "(হয় উসামাকে দাও, না হয় ক্ষমতা ছাড়)"।

টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য এটুকু অস্পষ্ট কারণের দোহাই দিয়ে দুনিয়ার অন্যতম দরিদ্র ও অসহায় একটি দেশের উপর বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী দেশের নেতৃত্বে এত বিরাট রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস পরিচালনা করা কি সত্যিই সমর্থনযোগ্য হতে পারে ? অথচ জাস্টিসের নামে এত বড় ইনজাস্টিস করা হল। জাস্টিসের সংজ্ঞাই বদলে গেল। শক্তিমানের যুলুমই কি জাস্টিস ?

টুইন টাওয়ার গলে যেতে দেখলাম

১১ সেপ্টেম্বর সকাল পৌনে নটায় নিউইয়র্ক থেকে সড়ক পথে দশ ঘন্টার পথ দূরে ডেট্রয়েট শহরে টেলিভিশনে দেখলাম একটা টাওয়ারের উপরিভাগে আগুন জ্বলছে ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হচ্ছে। দেখতে দেখতেই আর একটি বিমান অপর টাওয়ারে লেগে ভেঙ্গে পড়ল এবং তা থেকেও আগুন ও ধোঁয়া উঠছে। বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছি। ১৫

www.pathagar.com

মিনিটের মধ্যেই ১১০ তলা উচ্চ টাওয়ার দুটোই গলে নিচে নেমে মাটিতে ঢুকে গেল। হতবাক হয়ে গেলাম। টিভি থেকে খবরে যা জানলাম তাতে মনে হলো অলৌকিক ঘটনা। এ টাওয়ার দুটোকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাইড, প্রেসটিজ ও ওয়েলথের প্রতীক মনে করা হত। এত বড় ঘটনা কেমন করে ঘটল ? সন্ধ্যায় এক ডিনারের দাওয়াতে গেলাম। ৩/৪টি দেশের মেহমান ছিল। এ ঘটনা সম্পর্কে আমার মন্তব্য জানতে চাইলে বললাম, "এত বড় ঘটনা ঘটাবার ক্ষমতা ইসরাইল ও আমেরিকা ছাড়া আর কারো নেই।"

যে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ৪টি বিমান হাইজ্যাক হলো ঐ এয়ারলাইন্সের টিকেট আমি ঢাকা থেকে নিয়ে গেলাম সস্তা হওয়ায়। ৩১ আগস্ট থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমেরিকার বহু শহরে "মুসলিম উম্মাহ্-ইন-আমেরিকা" সাংগঠনিক কর্মসূচী অনুযায়ী আমার সফর চলছিল। এ ঘটনার পরই সব প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে গেল।

জনগণের মুখে ও পত্র-পত্রিকায় প্রশ্ন উঠল ঃ বিশ্বের গোটা মহাশূন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। তাদের সামরিক কেন্দ্র পেন্টাগনে বিমান কেমন করে আঘাত হানল ? আমেরিকা কি তাহলে প্রতিরক্ষায় অক্ষম? ৪টি আমেরিকান বিমান আমেরিকান পাইলটই চালাচ্ছিল। বিশ্বের সেরা গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক কেন টের পেল না ?

এসব প্রশ্ন থেকে আত্মরক্ষার কৌশল

আমার মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হলো যে, জনগণের এ সব প্রশ্নের সদুত্তর প্রেসিডেন্ট বুশের নিকট না থাকায়ই কি কল্পিত অপরাধী আবিষ্কার করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল ? এত বড় ঘটনা ঘটাবার সাধ্য বিন লাদেনের থাকলে তিনি আগেই তার শত্রুর বিরুদ্ধে হয়তো তা প্রয়োগ করতেন। উপসাগরীয় যুদ্ধকে উপলক্ষ করে আমেরিকান সামরিক ঘাঁটি সৌদী আরবে গড়ে উঠে। ঐ ঘাঁটিতে বোমা-বিস্ফোরণে অনেক মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। এরপর সোমালিয়ায় আমেরিকান দূতাবাসে বোমা হামলা হয়। এতেও লাদেনকে দায়ী করা হয়। বিন লাদেন এ দায়িত্ব অস্বীকার করেন বটে, কিন্তু এ হামলা সমর্থন করেন। এ থেকেই আমেরিকা বিশ্বের সর্বত্র সন্ত্রাসী হামলার সাথে বিন লাদেনকে জড়িত করতে থাকে।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার জন্য লাদেন বাহিনীকে দোষী সাব্যস্ত করে বুশ-প্রশাসনের ব্যর্থতা থেকে আমেরিকার জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ফেরাবার ব্যবস্থা করা হয়। বুশ বিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দেবার দাবী জানায়। তালেবান সরকার টুইন টাওয়ার হামলায় বিন লাদেন জড়িত বলে প্রমাণ দাবী করে। প্রমাণ দিতে পারলে লাদেনকে হস্তান্তর করতে রাজী তাও জানায়। প্রেসিডেন্ট বুশ ঐ ঘটনাকে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে দাবী করেন এবং এ যুদ্ধের প্রতিপক্ষ বিন লাদেনকে সাব্যস্ত করেন। লাদেনকে তাদের হাতে তুলে না দিলে আফগানিস্তানের উপর হামলার হুমকি দেন। তালেবান সরকারের পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তান সরকারের উপর হামলা যাতে না হয় সেজন্য পাকিস্তানের সামরিক সরকার লাদেনকে ঐ দেশ থেকে বের করে দেবার জন্য তালেবান সরকারের সাথে ২/৩ সপ্তাহ ধরে কূটনৈতিক যোগাযোগ চালায়। এতে ব্যর্থ হবার পর আফগানিস্তানের উপর হামলায় পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহার করতে সম্মতি দিতে পাকিস্তানকে বাধ্য করা হয়। পাকিস্তান তালেবান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ত্যাগ করে।

তালেবান সরকারের বক্তব্য

www.pathagar.com

রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের যুদ্ধে বিন লাদেনের বিরাট অবদান রয়েছে। বিন লাদেন স্বয়ং এ জিহাদে মুজাহিদের ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁর বিপুল সম্পদ ব্যয় করেন। উপসাগরীয় যুদ্ধের বাহানায় সৌদী আরবে আমেরিকা বিরাগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আফগানিস্তানে আশ্রয় নেন। এ অবস্থায় তিনি তালেবান সরকারের সম্মানিত মেহমান।

লাদেন আমেরিকার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতা চালাবার জন্য আফগানিস্তানে বিরাট নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছেন বলে আমেরিকার দাবী তালেবান সরকার অস্বীকার করেন। এ অবস্থায় বিনা অপরাধে তাদের মেহমানকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া তারা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায় মনে করেন। তাদের পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তান সরকারের কূটনৈতিক চাপের মুখে তারা ঘোষণা করেন যে উসামা বিন লাদেন নিজের ইচ্ছায় আফগানিস্তান ত্যাগ করলে তাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তারা মেহমানকে তাড়াতে পারেন না।

একটি সংগত প্রশ্ন

বিন লাদেন নিজেকে নির্দোষ দাবী করে হেগস্থ আন্তর্জাতিক আদালতে নিজকে পেশ করলেন না কেন ? ওখানে যুগোস্লাভ নেতা মিলোসেভিচের বিচার হচ্ছে। বিনা বিচারে ও বিনা দোষে সেখানে শাস্তি হয় না। তিনি একটি দেশকে এভাবে ধ্বংস হওয়া থেকে কি রক্ষার চেষ্টা করতে পারতেন না ? যে দেশটিকে আমেরিকার হামলা থেকে তিনি এভাবে বাঁচাবার চিন্তা করলেন না কেন ? নিজের নিরাপত্তার জন্য একটি দেশকে বলি হতে দিলেন কেন ?

এ প্রশ্নের জওয়াবে কেউই বলতে পারেন না যে, লাদেন আফগানিস্তান থেকে সরে গেলেও তাঁর সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ধ্বংসের দোহাই দিয়ে আমেরিকা সেখানে হামলা চালাত। এটা তখন সহজ হত না। পাকিস্তান নিজের স্বার্থেই তালেবান সরকারকে রক্ষার জন্য কথিত নেটওয়ার্ক বন্ধ করার ব্যবস্থা করত। জাতিসংঘের মিশনকে দিয়ে তদন্ত করার দাবী জানান সম্ভব হত। যা হোক, যা ঘটে গেল এর পরিণাম কী ?

আফগানিস্তানে পুতুল সরকারের ভবিষ্যত

জাতিসংঘের সহায়তায় জার্মানীর বনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কায়েমের যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে তাতে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র বিভাগ প্রফেসর বোরহানুদ্দীন রাব্বানীর নেতৃত্বে পরিচালিত নর্দার্ন এলায়েন্সের হাতে দেয়া হয়েছে। প্রফেসর রাব্বানী তালেবান সরকার কায়েম হবার পর পূর্ব পর্যন্ত দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কেমন যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা কারো অজানা থাকার কথা নয়।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ৭ দলীয় মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান দুটো দলের একটির নেতৃত্বে তিনিই ছিলেন। অপরটির নেতা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার গুলবুদ্দীন হেকমতইয়ার। জিহাদে রাশিয়ার পরাজয়ের পর আফগানিস্তানে বিজয়ী মুজাহিদদের মধ্যে সরকার গঠনের ব্যাপারে চুক্তি হয়, তাতে কয়েক মাস একটি ক্ষুদ্র দলের নেতা মাওলানা সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী প্রেসিডেন্ট হন। এরপর প্রফেসর বোরহানুদ্দীন রাব্বানী প্রেসিডেন্ট এবং ইঞ্জিনিয়ার গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের প্রধানমন্ত্রী হবার কথা। সে অনুযায়ী রাব্বানী প্রেসিডেন্ট হন। কিন্তু হেকমতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে নানা বাহানায় বিলম্ব

www.pathagar.com

করতে থাকেন। পাকিস্তান সরকারের উদ্যোগে এবং সৌদী বাদশার সহযোগিতায় মক্কা শরীফে আফগান নেতাদের সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, রাব্বানী প্রেসিডেন্ট এবং হেকমতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন। এরপরও রাব্বানী হেকমতিয়ারকে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেননি।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইসলামের নামে ১০ বছর এ দু'নেতা একসাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হন। ইসলামের জন্যই বহু পাকিস্তানী ও আরব মুজাহিদ এ যুদ্ধে শরীক হন। পাকিস্তানে মাদ্রাসায় শিক্ষারত বাংলাদেশী ছাত্ররাও জিহাদে শরীক হয় এবং বেশ কয়েকজন শহীদ হয়। অত্যন্ত দুঃখ ও বিস্ময়ের বিষয় যে উজবেক নেতা রাব্বানী ইসলামের চেয়ে গোত্রীয় স্বার্থকেই গুরুত্ব দিয়ে পাখতুন হওয়ার দোষে হেকমতিয়ারকে সরকারী ক্ষমতায় শরীক হতে দিলেন না। তাই রাব্বানী ৫/৬ বছর শাসনকালে রাজধানী কাবুলেও আইন-শৃঙ্খলা কায়েম করতে ব্যর্থ হন।

তালেবান সরকার

রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদে শরীকদের মধ্যে আফগানিস্তানের মাদ্রাসাগুলোর ছাত্ররা অত্যন্ত মুখলিস মুজাহিদের ভূমিকা পালন করে। রাব্বানী সরকারের কুশাসনে গোটা দেশে যখন বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতায় জনগণ অতিষ্ঠ তখন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর খাঁটি ইসলামী জযবা নিয়ে ছাত্র সমাজকে ইসলামী হুকুমত কায়েমের আন্দোলনে শরীক হবার ডাক দেন।

দশ বছর আফগান জিহাদে শরীক ছাত্র মুজাহিদ মোল্লা ওমর যুদ্ধে একটি চক্ষু কুরবানী দেন। রুশদের পরাজয়ের পর তিনি নিজ এলাকা কান্দাহারে এক মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছিলেন। ইসলামী সরকারের বদলে গোত্রীয় সরকারের কুশাসনে অতিষ্ঠ জনগণের মধ্যে মোল্লা ওমরের ডাক সাড়া জাগায়। প্রথমে তিনি তার ছাত্র এবং আফগান জিহাদে শরীক ছাত্রদেরকে নিয়ে কান্দাহার শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েমের উদ্যোগ নেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় জনগণ সাড়া দেয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই কান্দাহার তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে 'তালেবে ইলম্' বলা হয়। এটা আরবী পরিভাষা। এর অর্থ হলো বিদ্যান্বেষী। তালেব মানে তালাশকারী বা আকাঙ্ক্ষী। ইলম্ তালাশকারীরাই তালেবে ইলম্। তালেব শব্দের বহুবচন উর্দুতে তালেবান। মোল্লা ওমর তালেবানদেরকে নিয়েই ইসলামী হুকুমত কায়েমের সূচনা করেন। তাই তাঁর সরকার তালেবান নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আফগান জনগণ ঐতিহ্যগতভাবেই স্বাধীন মনোভাবের লোক। সাথে অস্ত্র বহন করা তাদের অভ্যাস। রাব্বানী শাসনে জনগণ সন্তুষ্ট না থাকায় এবং দেশে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ায় রীতিমতো অরাজকতা সৃষ্টি হয়। জনগণ নিরাপদে থাকতে চায়। তাই কান্দাহারে মোল্লা ওমরের আবেগময় নেতৃত্বে এবং তার তালেবান বাহিনীর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে জনগণ এমন সাড়া দেয় যে, মোল্লা ওমরের নির্দেশে তাদের ব্যক্তিগত সব অস্ত্র তার হাতে জমা দেয়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই কান্দাহার প্রদেশে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম হয়ে যায়। জনসাধারণের এটাই তো সবচেয়ে বড় এবং প্রথম দাবী।

www.pathagar.com

কান্দাহার তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে আসার পর বিদ্যুৎগতিতে গোটা দেশে মোল্লা ওমরের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এবং আশেপাশের প্রদেশেও ব্যাপক জনসমর্থনের খবর পাওয়া যায়। দলে দলে ছাত্র ও যুবকরা মোল্লা ওমরের তালেবান বাহিনীতে শরীক হতে থাকে এবং কয়েক মাসের মধ্যেই বেশ কয়টি প্রদেশ তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে আসে। রাব্বানী সরকার জনগণের আস্থা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলায় এবং তারা তালেবানদের সক্রিয় সমর্থক হওয়ায় তালেবানদের অগ্রগতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়।

হেকমতিয়ারের বিরাট বাহিনী যে এলাকায় অবস্থান করছিল তা কাবুল থেকে খুব দূরে নয়। তালেবানদের এ বিজয় অভিযানে হেকমতিয়ার পূর্ণ নিরপেক্ষতা পালন করে নীরব সমর্থনই দান করেন। এমন কি তালেবান বাহিনী যখন কাবুল দখলের জন্য এগিয়ে আসে তখন হেকমতিয়ার বাহিনী তাদেরকে উৎসাহই দেয়। ফলে রাব্বানীর বাহিনী কাবুল থেকে পালিয়ে উত্তরাঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হয়। বিনা যুদ্ধে রাজধানী কাবুল তালেবানদের দখলে চলে আসে। মোল্লা ওমরের এ সফল গণবিপ্লব বিস্ময়কর।

উজবেক নেতা রাব্বানী ও তাজিক নেতা রশীদ দোস্তামেরা জোট বেঁধে রাশিয়া ও ভারতের সাহায্যে উত্তরাঞ্চলে টিকে থাকে এবং মাযারী শরীফকে রাজধানী বানিয়ে তালেবান সরকারকে বিব্রত করতে থাকে। একসময় তালেবানরা মাযারী শরীফও দখল করে নেয়। দেশের ৯৫ ভাগ তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে আসার পরও গণধিকৃত রাব্বানী-দোস্তাম জোট ইসলামের চরম দুশমনদের পুতুল হিসেবে টিকে থাকে। আফগানিস্তানের উত্তরে পাশাপাশি সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান ভাষা ও গোত্রীয় সম্পর্কের কারণে রাব্বানী-দোস্তাম জোটকে সাহায্য করতে থাকে। রাশিয়া ও ভারতের এত সহযোগিতা সত্ত্বেও এ জোট যা 'নর্দার্ন এলায়েন্স' নামে এখন পরিচিত, তালেবান সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে কোনো এলাকাই তাদের দখলে নিতে সক্ষম হয়নি। এখন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর চাপিয়ে দেয়া চরম অন্যায় যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে আমেরিকার পুতুল সরকার কাবুলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। রাব্বানীরা আফগানিস্তানে রাজত্ব করার যে স্বপ্ন দেখছে তা কি কখনো জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবে?

তালেবান সরকারের মূল্যায়ন

তালেবান সরকারের সামগ্রিক নেতৃত্ব দিয়েছেন মাদ্রাসায় পড়া ওলামায়ে কেরাম। তাদের ঈমান ও ইখলাস প্রশ্নাতীত। মোল্লা ওমর ও তার সাথীগণ নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কাজ করেননি। সত্যিকার ইসলামী হুকুমাত কায়েম করার জন্যই তারা সরকার গঠন করেছিলেন। তাই তারা আল্লাহ তায়ালার অলৌকিক সাহায্য ও জনগণের সক্রিয় সমর্থন পেয়েছিলেন। হেকমতিয়ার বাহিনীতে যেমন ইসলামপন্থী অনেক আধুনিক শিক্ষিত লোক ছিল তালেবানদের মধ্যে যদি তা থাকতো তাহলে মাদ্রাসা শিক্ষিত ও আধুনিক শিক্ষিতদের সমন্বয়ে আফগানিস্তানে একটি আধুনিক ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব হতো। কারণ ঈমান ও ইখলাসের সাথে ইলম ও হিকমত অপরিহার্য। এদিকে দিয়ে তালেবান সরকার পরিচালকদের মধ্যে হেকমতের অভাব ছিল বলে অনেকেই মনে করেন।

গত শতাব্দীর শেষ দু'দশকের মধ্যে প্রথমে ইরানে, পরপর সুদানে এবং সর্বশেষে আফগানিস্তানে ইসলামী সরকার কায়েম হয়। ১৯৯৯সালে লন্ডন ও নিউইয়র্কে বিশ্বের

www.pathagar.com

বেশ কয়টি দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাতের সুযোগে আমি প্রস্তাব রেখেছিলাম যে, বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের একটা ডেলিগেশন ঐ তিনটি দেশে সফর করা প্রয়োজন। কারণ ইসলামকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কায়েম করতে গিয়ে তারা যদি সফল হন তাহলে যতো দেশে 'ইকামাতে দ্বীনের' আন্দোলন সক্রিয়, সেসব দেশেও ইসলামী হুকুমাত কায়েম করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। আর যদি তারা ইসলামকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হন, তাহলে গোটা বিশ্বের সব দেশে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত বিপন্ন হবে।

তাই এমন একটি ডেলিগেশন এসব দেশে গেলে জানা যাবে যে, তারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য বাস্তবে এমন কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন যা যথার্থ এবং এমন কিছু করা হচ্ছে কিনা যার ফলে ইসলামের ভাবমূর্তি বিশ্বের দরবারে ক্ষুন্ন হতে পারে। এ ধরনের ডেলিগেশনকে তারা অবশ্যই গুরুত্ব দেবেন। তাদের সঠিক পদক্ষেপসমূহকে ডেলিগেশন বিশ্বময় প্রচার করলে তাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং তাদের ভুলটুকু দরদের সাথে ধরিয়ে দিলে তারা এর গুরুত্ব দেবেন। এটা করতে পারলে ডেলিগেশনের পরামর্শ ভবিষ্যতেও তারা চাইবেন।

দুঃখের বিষয় এ প্রস্তাবটিকে গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও এ কাজটি এখন পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি। এ বছর আগস্ট মাসে ইংল্যান্ডে আফগানিস্তানের প্রতিবেশী এক রাষ্ট্রের ইসলামী আন্দোলনের শীর্ষনেতার সাথে সাক্ষাৎ হলে আফগানিস্তানের ইসলামী সরকারকে পরামর্শ দেয়া হয় কিনা জানতে চাইলাম। তিনি হতাশা প্রকাশ করে বলেন যে, তারা পরামর্শকে গুরুত্ব দেন না। আমি বললাম যে, সকল নেতার একটা ডেলিগেশন গেলে অবশ্যই গুরুত্ব দেবেন। তিনি এ কথার সাথে একমত হলেন। ইতোমধ্যে তো আফগানিস্তানে ইসলামী সরকার উৎখাতই হয়ে গেল।

ডেলিগেশন যেতে পারলে উসামা বিন লাদেনকে রাজি করা সম্ভব হতো যে, আফগানিস্তানের ইসলামী সরকারকে রক্ষার স্বার্থে তার সে দেশ থেকে চলে যাওয়া উচিত। মোল্লা ওমরকেও বুঝান যেতো যে, জবরদস্তি করে মহিলাদেরকে চেহারা ঢাকতে বাধ্য করা, মহিলাদের উচ্চ শিক্ষা বন্ধ করা, বিশেষ মাপে দাড়ি রাখতে বাধ্য করা ও পাহাড়ে বুদ্ধের মূর্তি ধ্বংস করা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নয়। প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করা হলে চাপ প্রয়োগ করা ছাড়াই মহিলারা পর্দা করবে ও পুরুষেরা দাড়ি রাখবে।

ইসলামী আইন বাস্তবায়নের ব্যাপারে ফিকহ বা আইন শাস্ত্রের নীতি হলো (গুরুত্ব বিবেচনা করে একটার পর একটা বিধান চালু করা)। এদিক দিয়ে প্রথম জরুরী কাজ হচ্ছে জনগণের জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করা। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো জনগণের বেঁচে থাকার মতো মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা, যাতে জনগণ উপলব্ধি করে যে এ বিষয়ে সরকার আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। তাহলে প্রয়োজন সন্তোষজনকভাবে পূরণ না হলেও জনগণ সরকারের প্রতি আস্থাশীল থাকে। ইসলামী সরকারের তৃতীয় প্রধান দায়িত্ব হলো নারী ও পুরুষকে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ঈমান, ইলম্ ও আমলের দিক দিয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়া। চতুর্থ দায়িত্ব হলো নারী ও পুরুষ সবার অধিকার রক্ষার জন্য সর্বস্তরে

www.pathagar.com

ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। পঞ্চম দায়িত্ব হলো ইসলামের দৃষ্টিতে যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা সরকারী উদ্যোগে চালু করা এবং যা ক্ষতিকর তা সমাজ থেকে উৎখাত করা।

ঐ তিনটি সরকারের মধ্যে ইরান ও সুদান এ দিক দিয়ে যতোটুকু ভারসাম্য রক্ষা করে চলছে, তালেবান সরকার তা করতে পারেনি। না পারার প্রধান কারণ হলো হিকমাতের অভাব। দ্বিতীয় কারণ হলো রাব্বানী-দোস্তামদের সর্বাত্মক বিরোধিতা। সরকারকে সব সময় যুদ্ধাবস্থায় থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। তৃতীয় কারণ হলো, তালেবান সরকার পাকিস্তান ও সৌদি আরবের স্বীকৃতি ছাড়া জাতিসংঘ ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো, এমন কি মুসলিম দেশগুলোরও স্বীকৃতি পায়নি। বিন লাদেন ইস্যুতে তালেবান সরকারের একগুঁয়েমির ফলে সৌদি আরব এবং পাকিস্তানও বিরূপ হয়ে আমেরিকার হামলায় আপত্তি করেনি। তালেবান সরকার একঘরে হয়ে আন্তর্জাতিক মহা সন্ত্রাসের শিকারে পরিণত হলো, আর ওআইসিসহ সকল মুসলিম দেশ নীরবে তামাশা দেখলো। অবশ্য মুসলিম জনতা সকল গণতান্ত্রিক দেশে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

আফগানিস্তানে ইসলামের ভবিষ্যত

জাতিসংঘ ও ইঙ্গ-মার্কিন চক্র হয়তো আশা করে যে তাদের পুতুল সরকার সে দেশের জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারবে এবং তাদের নির্দেশমতো দেশ পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। প্রকৃত অবস্থা হলো যে, তারা আফগানিস্তানে দীর্ঘকাল অশান্তি জিইয়ে রাখারই ব্যবস্থা করলো। বৃহত্তর পাখতুন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব যে সরকারে অনুপস্থিত সে সরকার কী করে সফল হবে ? তাদের পুতুল সরকার সে দেশে নির্বাচনের প্রহসনও করতে সাহস করবে কি ? আফগানিস্তান এখন থেকে দিল্লী ও মস্কোর নির্দেশেই চলবে। আমেরিকা সেখানে খনিজ সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করবে।

এ পরিস্থিতি স্বাধীনতাপ্রিয় আফগান জনগণ কতোদিন বরদাশত করবে ? ইসলামী আন্দোলন জনগণের আস্থা হারায়নি। যথাসময়ে আবার ইসলামী শক্তি সংগঠিত হয়ে পুতুল সরকারকে রুখে দাঁড়াবে। সেখানে তুরস্ক ও আলজিরিয়ার মতো ধর্মনিরপেক্ষ সুসংগঠিত সেনাবাহিনী নেই।

রাব্বানীদের বাহিনী আগেও ব্যর্থ হয়েছে, আবারও হবে

তালেবান সরকার দেশ গড়ার কাজ করার সুযোগ পায়নি। অন্যায়ভাবে আমেরিকার পরাশক্তি সে সরকারকে উৎখাত করেছে বলেই সে দেশের জনগণ নিজ চোখে দেখল। জনগণ তালেবানদেরকে ব্যর্থ মনে করছে না। তাদের পূর্ণ সমর্থন এখনো বহাল আছে। তাই আজ হোক কাল হোক এ আগুন একদিন পুতুল সরকারকে উৎখাত করে ছাড়বে ইনশাআল্লাহ।

পাকিস্তানই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হলো

আফগানিস্তানে এ ট্র্যাজেডির ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হলো পাকিস্তান। আর সবচেয়ে বেশী লাভবান হলো ভারত। পাকিস্তান কায়েম হবার পর থেকেই আফগানিস্তানের বাদশাহ জহীর শাহ ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় সীমান্ত প্রদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাখতুনিস্তান কায়েমের ষড়যন্ত্র করে। সীমান্ত গান্ধী নামে

www.pathagar.com

কুখ্যাত গাফফার খানের নেতৃত্বে পশতুভাষী পাঠানদেরকে বিদ্রোহী বানাবার অপচেষ্টা চলে। রাশিয়া আফগানিস্তান দখল করে নজীবুল্লাহর পুতুল সরকার কায়েমের পর আফগানিস্তানের ইসলামপন্থী ছোট-বড় ৭টি দলকে পাকিস্তান সরকার সীমান্ত প্রদেশে আশ্রয় দেয়। পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা ১০ বছর জিহাদ করে রাশিয়াকে পরাজিত করে। এরপর থেকে কাবুলের প্রতিটি সরকার পাকিস্তানের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছে। বিশেষ করে তালেবান সরকার পাকিস্তানের সাহায্যেই টিকেছিল।

২৫ বছর পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার আফগানিস্তানের জন্য যে বিরাট কুরবানী দিল তা ভেস্তে গেল। এখন কাবুলে পাকিস্তানের চরম বৈরী এবং ভারতের পুতুল সরকার কায়েম হলো। জেনারেল মুশাররফ আফগান ইস্যুতে পাকিস্তানের জনগণের আস্থা হারালেন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এর প্রভাব কতটুকু পড়বে তা দেখার বিষয়। উপমহাদেশে ভারতের শক্তি বৃদ্ধি পেল। কাশ্মীরে ভারত আরো হিংস্র ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ হবে। এমন কি আযাদ কাশ্মীরেও ভারত সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে।

বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের ভাবনার বিষয়

তালেবান সরকারের পতনের ফলে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন দু'দিক দিয়ে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হলো। একদিক হলো এই যে, ইরান ও সুদানে ইসলামী সরকার কায়েম হওয়ায় বিশ্বের সর্বত্র ইসলামী আন্দোলন প্রেরণা বোধ করেছিল। তালেবান সরকারের পতনে ঐ প্রেরণা বিরাট এক ধাক্কা খেল। অপরদিকে মহিলাদের ব্যাপারে তালেবানদের পলিসিকে ব্যবহার করে বিশ্বের ইসলাম বিরোধী মাস-মিডিয়া ইসলামকে নারী অধিকার বিরোধী হিসেবে প্রোপাগান্ডা করার বিরাট সুযোগ পেয়ে গেল। তালেবানরা ইসলামী শাসনের যেটুকু সুফল জনগণকে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তা বিশ্ববাসী জানতেই পারলো না। ফলে নতুন করে কোনো দেশে ইসলামী সরকার কায়েমের আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে এ ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে ইরান ও সুদানকে আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করা প্রয়োজন, যাতে তালেবান সরকারকে ইসলামের প্রতিনিধি দেখিয়ে ইসলামকে হেয় করার সুযোগ যারা নিচ্ছে তাদের হামলা থেকে সত্যিকার ইসলামকে রক্ষা করা যায়।

তাছাড়া গণতান্ত্রিক যে সব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে, সেসব দেশের ইসলামী আন্দোলন যাতে ক্ষমতাসীন হতে পারে, সে উদ্দেশ্যে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনকে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আরো কয়েকটি দেশে ইসলামী সরকার কায়েম হলে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্বের দরবারে ইসলামের সত্যিকার কল্যাণময় রূপ বাস্তবে তুলে ধরা সহজ হবে। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হওয়ায় পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যও ইসলামী সভ্যতার অগ্রগতি রোধ করতে পারেনি। পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতা আবারও ইসলামের মানবিক ও নৈতিক সভ্যতার নিকট পরাজিত হতে পারে যদি ইসলামের আসল রূপ বাস্তবে কায়েম করে দেখানো যায়।

লেখক ঃ প্রবীণ রাজনীতিক।

৩১ ডিসেম্বর '০১

www.pathagar.com

আফগান রণাঙ্গনে মার্কিনীদের বিপর্যয়ের অজানা কাহিনী

সাহাদত হোসেন খান

আজাম ডট কম ইন্টারনেট সংস্থাকে মার্কিনবিরোধী ও পাশ্চাত্যবিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যের বিরোধিতা করার কারণে এ সংস্থা যদি অভিযুক্ত হতে পারে তাহলে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী হওয়ার কারণে সিএনএন, এবিসি ও বিবিসিও অভিযুক্ত। আমেরিকা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এটা আজ আর কোন গোপন কথা নয়।

গত ৭ অক্টোবর, ২০০১ তারিখ থেকে আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক অভিযান চলছে। আমরা প্রতিদিনই পাশ্চাত্যের সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে রণাঙ্গনের খবরাখবর পাচ্ছি। আমাদের পক্ষে এসব খবরের সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে না, বিকল্প কোন উৎস থেকেও প্রকৃত ঘটনা জানার উপায় নেই। বহির্বিশ্বের যে কোন ঘটনা জানার জন্য আমরা প্রত্যেকেই পাশ্চাত্যের ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ওপর কম-বেশী নির্ভরশীল। এ ধরনের নির্ভরশীলতার জন্য আমরা আফগান রণাঙ্গনের বিভ্রান্তিকর সংবাদ পাচ্ছি। এতে আমাদের মাঝে এমন একটা ধারণার জন্ম হয়েছে যে, আফগানিস্তানে মার্কিন সৈন্য ও তাদের দোসররা বিনা প্রতিরোধে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তালিবান ও আল কায়েদা যোদ্ধারা কাপুরুষের মত মার খাচ্ছে। কিন্তু সত্যিকার পরিস্থিতি মোটেও সেরকম নয়। আফগান রণাঙ্গনে শ' শ' মার্কিন সৈন্য হতাহত হচ্ছে এবং তালিবান ও আল কায়েদা যোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সত্যকে কখনো চেপে রাখা সম্ভব নয়। আজাম ডট কম ইন্টারনেট সংস্থা আফগান রণাঙ্গনের অজানা ঘটনা ফাঁস করে দিচ্ছে। এজন্য এ ইন্টারনেট সংস্থা বন্ধ করে দেয়ার জন্য পাশ্চাত্যের দেশগুলো ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তবে এতে আজাম ডট কম মোটেও বিচলিত নয়। সে সাহসের সঙ্গে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা আজ বৃটেনভিত্তিক মুসলিম পরিচালিত আজাম ইন্টানেট সংস্থা পরিবেশিত আফগান রণাঙ্গনের কিছু খবরাখবর পাঠকদের জানাতে চাই।

www.pathagar.com

আফগান রণাঙ্গনে অসংখ্য মার্কিন সৈন্য নিহত হচ্ছে

লন্ডনভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর ওয়ার এন্ড পীস রিপোর্ট-এর খবরে বলা হয়েছে যে উজবেকিস্তানের খানাবাদে মার্কিন বিমানঘাঁটিতে প্রতিদিনই আফগান রণাঙ্গনে হতাহত মার্কিন সৈন্য বোঝাই বিমান এসে পৌঁছছে। উজবেক সূত্র জানিয়েছে যে, পেন্টাগন মার্কিন সৈন্য হতাহতের যে সংখ্যা প্রকাশ করছে তা বাস্তব সংখ্যার ধারেকাছেও নয়। খানাবাদ বিমানঘাঁটিতে কর্মরত উজবেক সেনা কর্মকর্তারা বলেছেন, আফগানিস্তান থেকেও এ ঘাঁটিতে প্রচুর মার্কিন সৈন্যের লাশ আসছে। ২৫ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন খানাবাদ বিমানঘাঁটিতে ৪/৫টি করে হেলিকপ্টার এসে পৌঁছেছে। প্রতিটি হেলিকপ্টারে ১০/১৫ জন মার্কিন সৈন্যের লাশ ছিল। উজবেক সেনা কর্মকর্তাদের কাছে মার্কিন স্টাফরা স্বীকার করেছেন যে, এসব সৈন্য আফগানিস্তানে নিহত হয়েছে। একজন সাংবাদিক খানাবাদ বিমানঘাঁটিতে ঢোকার সুযোগ পান। তিনি গিয়ে দেখতে পান যে, একটি ভবনের পুরো মেঝে এবং ৪টি বড় তাঁবু আহত মার্কিন সৈন্যে বোঝাই হয়ে রয়েছে। এসব সৈন্যের কারও গুলী লেগেছে হাতে-পায়ে অথবা মাথায়। আহতদের মধ্যে কতজন মারা গেছে বিমানঘাঁটির কোন সূত্র তা জানাতে পারেনি। একজন উজবেক সৈন্য জানিয়েছেন যে, তিনি ১৫ অক্টোবর থেকে প্রতিদিন মার্কিন পরিবহন বিমানে অন্তত ২০টি করে কফিন উঠাতে মার্কিন সৈন্যদের সাহায্য করেছেন। মার্কিন সৈন্যরা একজন উজবেক সেনা কর্মকর্তাকে বলেছে যে, খানাবাদ বিমানঘাঁটিতে নিয়ে আসার পথে তাদের আহত ৪২৯ জন সঙ্গী মারা গেছে। একজন উজবেক পাইলটের সঙ্গে একজন মার্কিন সৈন্যের ভাব হয়। কিন্তু হায়! সেই মার্কিন সৈন্যটিও মাজার-ই-শরীফে কথিত কারা বিদ্রোহে নিহত হয়েছে। পেন্টাগন বলছে যে, মাজার-ই-শরীফে মাত্র একজন সিআইএ কর্মকর্তা নিহত হয়েছে। কিন্তু উজবেক পাইলট বলছেন ভিন্ন কথা। তিনি জানিয়েছেন যে মাজার-ই-শরীফে প্রচুর মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে। এটা ছিল একটি ভয়ংকর লড়াই।

আফগানিস্তানে হামলা চালানোর আগে যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন শুরু করে। প্রথমেই আফগানিস্তানের পার্শ্ববর্তী দেশ উজবেকিস্তানের খানাবাদ ঘাঁটিতে মার্কিন সৈন্যরা অবস্থান নেয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মার্কিন সৈন্যরা তাদের উজবেক সহযোগীদের কাছে দম্ভভরে বলছিল যে, তালিবান ও আল কায়েদা যোদ্ধাদের পরাজিত করতে দেড় মাসের বেশী সময় লাগবে না। কিন্তু এখন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে দেখে মার্কিন সৈন্যরা হতাশ হয়ে পড়েছে। হতাশা থেকে খানাবাদে মোতায়েন বহু মার্কিন সৈন্য চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে স্বদেশে ফিরে যাচ্ছে। তাদের হতাশা খুবই গভীর। মার্কিন সৈন্যদের মনোবলে চিড় ধরেছে এবং প্রায়ই তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি করেছে। এগুলো উজবেক সৈন্যরা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করছে।

আরব মুজাহিদদের জন্য গায়েবী সাহায্য

ডিসেম্বরের এক শনিবারে অপরাহ্নে তালিবানবিরোধী পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হাজী কাদের। তার বাহিনীকে মার্কিন বিমান ও স্পেশাল ফোর্স সহায়তা দিচ্ছিল। মার্কিন বিমান হামলায় মুজাহিদদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে তাদের পিছু হটতে হয়। এসময় তাদের কাছে হালকা অস্ত্র ছাড়া লড়াই করার মত আর

www.pathagar.com

কোন সরঞ্জাম ছিল না। আরব মুজাহিদরা পণ করেছিল যে, তারা বন্দী হওয়ার পরিবর্তে লড়াই করে শহীদ হবে। মুজাহিদরা যখন পিছু হটে যায় তখন পূর্বাঞ্চলীয় শুরা বাহিনী সামনে অগ্রসর হতে থাকে। পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর সঙ্গে বিপুলসংখ্যক মার্কিন স্থল সৈন্যও ছিল। এমন সময় আকাশ থেকে যৌথ বাহিনীর উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ হতে থাকে। এ বোমাবর্ষণে তৎক্ষণাৎ যৌথ বাহিনীর ৩শ' সৈন্য নিহত হয়। এটা নিঃসন্দেহে একটি গায়েবী সাহায্য। এ সাহায্য না পেলে মুজাহিদরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের রক্ষা করেছেন। তিনি মার্কিন জঙ্গী বিমানের পাইলট যৌথ বাহিনীর অবস্থানকে মুজাহিদদের অবস্থান ভেবে বোমাবর্ষণ করে। কুদরতী সহায়তা পেয়ে মুজাহিদদের মনোবল ফিরে আসে। এরপর তারা পাল্টা হামলা চালিয়ে যৌথ বাহিনীর আরও ৩শ' সৈন্যকে হত্যা এবং ১শ' সৈন্যকে আটক করে। যৌথ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৯শ' এবং মুজাহিদরা ছিল সংখ্যায় মাত্র ৫শ'। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এ সুসংগঠিত হামলায় নেতৃত্ব দেয় উচ্চপদস্থ মার্কিন সামরিক কর্মকর্তাগণ। লড়াইশেষে এদের ছিন্নভিন্ন লাশ রণক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মুজাহিদদের এই অভাবিত বিজয়ের পর পূর্বাঞ্চলীয় শুরা বাহিনীর কমান্ডার হাজী কাদের আরও মার্কিন স্থল সৈন্য মোতায়েনের অনুরোধ জানায়।

মার্কিন সমর্থনপুষ্ট বাহিনী তোরাবোরায় অগ্রাভিযানে ব্যর্থ

মার্কিন জঙ্গীবিমান তোরাবোরায় মুজাহিদ অবস্থানে ১৫ হাজার পাউন্ডের ডেইজিকাটার বোমা নিক্ষেপ করে চলেছে। ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, ক্লাস্টার বোমা, নাপাম বোমা, কার্পেট বোমা, অক্সিজেন বিনাশী বোমার মত মারণাস্ত্র ব্যবহার করেও মুজাহিদদের কাবু করতে না পেরে যুক্তরাষ্ট্র ডেইজিকাটার বোমা নিক্ষেপ করছে। এ ভয়ংকর বোমা হামলা সত্ত্বেও উত্তরাঞ্চলীয় জোট তোরাবোরায় মুজাহিদ অবস্থানের দিকে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হচ্ছে। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কমান্ডার হযরত আলী ও হাজী জহির বেশ কিছুদিন ধরে দাবী করছেন যে, তাদের অধীনস্ত ৩ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তোরাবোরায় হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন যে, তাদের অধীনস্ত মাত্র সাড়ে ৪শ' সৈন্য এ অভিযানে অংশগ্রহণ করছে। এদের মধ্যে ২শ' রয়েছে হযরত আলীর নেতৃত্বে এবং আড়াইশ সৈন্য রয়েছে হাজী জহিরের নেতৃত্বে। আমেরিকানদের কাছ থেকে ডলার খসিয়ে নেয়ার জন্যই উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কমান্ডাররা এমন মিথ্যা দাবী করছেন। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হচ্ছে যে, এতদিনে তারা তাদের প্রাথমিক অবস্থান থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তোরাবোরা অঞ্চল দখল করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ অঞ্চলের দৈর্ঘ্য ৩৫ কিলোমিটার। এখানে রয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় গুহা ও খাদ। জালালাবাদের ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ থেকে এই অঞ্চলের শুরু এবং পারাচিনারে শেষ। এই দুর্গম অঞ্চলে মার্কিন বোমা হামলায় কোন বিরতি দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কিনীরা চরম বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তারা বুঝতে পারছে না ওসামা বিন লাদেন জীবিত না মৃত।

কান্দাহার বিমানঘাঁটিতে মুজাহিদদের ভয়ংকর হামলা

ডিসেম্বরের এক মঙ্গলবারে বিদেশী মুজাহিদরা কান্দাহার বিমানঘাঁটিতে মার্কিন মেরিন সৈন্য ও উপজাতি অবস্থানে বড় ধরনের আক্রমণ চালায়। এই ঘাঁটিতে যৌথ বাহিনীর

www.pathagar.com

৮শ' সৈন্য ছিল। মুজাহিদ হামলায় কান্দাহার বিমানঘাঁটি ধ্বংস হয়। মুজাহিদ হামলায় যৌথ বাহিনীর প্রায় ২শ' সৈন্য নিহত এবং আরও বহু আহত হয়। এই লড়াইয়ে ২৫ জন মুজাহিদ শহীদ হয় এবং কয়েকজন সামান্য আহত হয়। এ ঘটনা থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে এখনো লড়াই শেষ হয়নি। মার্কিন মেরিন সৈন্যরা মুজাহিদদের অতর্কিত হামলার ভয়ে এ অঞ্চলে বের হতে সাহস পাচ্ছে না।

একজন মুজাহিদের মোনাজাত

আবু খুলুদ আল-ইয়েমেনী শহীদী কাফেলায় শামিল হয়েছেন। তিনি এমনভাবে শহীদ হয়েছেন যা প্রতিটি মুসলমানের জন্য গর্বের বিষয়। ৫ ডিসেম্বর আরব মুজাহিদদের দু'টি এলিট ইউনিট মার্কিন এজেন্ট গুল আগার বাহিনীর ওপর হামলা চালাতে তাখতা পুলের উপকণ্ঠে এগিয়ে যায়। ইয়েমেনের আবু খুলুদ দিচ্ছিলেন প্রথম ইউনিটের নেতৃত্ব এবং আবু হানি দিচ্ছিলেন দ্বিতীয় ইউনিটের। প্রতিটি ইউনিটে যোদ্ধা ছিল মাত্র ১ জন করে। যেখানে দু'টি ইউনিটের একত্রিত হওয়ার কথা সেখানে যাবার পথে আবু খুলুদ তার সহযোদ্ধাদের বলেছিলেন যে, এই লড়াইয়ে তিনি শহীদ হবেন। সহযোদ্ধারা তার এ উক্তি হাসি দিয়ে উড়িয়ে দেয়। রণাঙ্গনে মুজাহিদরা ইসলামের দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লড়াইয়ে গুল আগার বাহিনীর ১৭ জন সৈন্য নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়। গোলাগুলী কিছুটা কমে আসে। এ সময় কমান্ডার আবু খুলুদ গুলী খেয়ে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে যান। তিনি তখন দু'হাত উপরে তুলে মোনাজাত করে বলেন, 'হে প্রভু, আমি দীর্ঘদিন ধরে তোমার পথে লড়াই করছি। কিন্তু তুমি আজও আমাকে শহীদের মধ্যে গণ্য করনি।' মোনাজাত শেষ হওয়ার সঙ্গে তার শরীরে এসে একটি বুলেট বিদ্ধ হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পানে ধন্য হন। আবু খুলুদ যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তিনি ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। যেখানে মুসলিম জনতার আর্তচিৎকার শুনেছেন সেখানেই তিনি ছুটে গেছেন। বসনিয়া, চেচনিয়া, আফগানিস্তানসহ সর্বত্র তিনি লড়াই করেছেন। গুল আগার বাহিনীর সঙ্গে সেদিনের লড়াইয়ে আবু খুলুদ ছাড়া আর কোন মুজাহিদ শহীদ হননি।

আফগান রণাঙ্গনে আরব মুজাহিদরা যে অসামান্য শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিচ্ছে তাতে আমাদের শির উঁচু হয়ে গেছে। গত ডিসেম্বরে তোরাবোরায় আরব মুজাহিদদের নিক্ষিপ্ত মর্টারের একটি গোলা এসে ইস্টার্ন এ্যলায়েন্সের কমান্ড সেন্টারে আঘাত হানে। এ সময় সেখানে ইস্টার্ন এ্যলায়েন্স যুদ্ধ পরিচালনা নিয়ে একটি জরুরী বৈঠক করছিল। এই বৈঠকে পদস্থ মার্কিন কমান্ডার ও হাজী কাদেরের অধীনস্ত আরও কয়েকজন কমান্ডার উপস্থিত ছিলেন। মুজাহিদদের মর্টার হামলায় ইস্টার্ন এ্যলায়েন্সের কমান্ড সেন্টার ধ্বংস হয়। কিন্তু সেখানে কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। এজন্য সংবাদ মাধ্যমে এ ঘটনা প্রকাশিত হয়নি।

১০ হাজার বেসামরিক আফগান নিহত

যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বর আত্মঘাতী হামলায় যত লোক মারা গেছে আফগানিস্তানে মার্কিন বোমাবর্ষণে নিহত হয়েছে তার চেয়ে ৪ গুণ বেশী নিরীহ মানুষ। হতাহতের বিচারে আফগান ট্র্যাজেডি বহু আগেই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ট্র্যাজেডিকে অতিক্রম করে গেছে। সুতরাং চোখের পানি ফেললে আফগান রণাঙ্গনে নিহত হতভাগ্য মুসলমান নর-নারী ও

www.pathagar.com

শিশুদের জন্যই ফেলতে হবে। কিন্তু কোথায় সেসব কথিত হিতৈষী ও মানবপ্রেমিক পণ্ডিতগণ যারা ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনায় চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছিল এবং নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল ? আজ তারা আফগানিস্তানের মত একটি হতদরিদ্র মুসলিম দেশে পৃথিবীর প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নগ্ন হামলার ব্যাপারে নীরব কেন ? টুইন টাওয়ারে কতজন নিহত হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। কখনো বলা হচ্ছে নিহতের সংখ্যা ৬ হাজার আবার বলা হচ্ছে ৪ হাজার। এখন শোনা যাচ্ছে যে, সেখানে নিহতদের সংখ্যা ২ হাজারের কম। এক এক সূত্র এক এক হিসাব দিচ্ছে। মার্কিন সরকারের হিসাবে নিহতদের সংখ্যা বেশী করে দেখানো হচ্ছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই মার্কিন সরকার টুইন টাওয়ারে নিহতদের সংখ্যা বাড়িয়ে বলছে। বাড়িয়ে না বললে আফগানিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম দেশে গণহত্যা চালানো সম্ভব নয়। মার্কিন সরকার যা ভেবেছিল তাই হচ্ছে। কেউ কথা বলছে না। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই টুইন টাওয়ারে আত্মঘাতী হামলার ঘটনায় মূক, বধির ও স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে। সেদিক থেকে কারও দৃষ্টি সরছে না। আফগানিস্তানে ইতোমধ্যে মার্কিন হামলায় ১০ হাজারের বেশী লোক নিহত হয়েছে। কিন্তু এদের কথা কেউ ভাবছে না। এদিকে কারও খেয়াল নেই।

আজাম ডট কম ইন্টারনেট সংস্থার উপর আক্রোশের কারণ

যুক্তরাষ্ট্রের আত্মঘাতী হামলার এক সপ্তাহ পর আজাম ডট কম ইন্টারনেট সংস্থা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির কথা বিবেচনা করা হয়নি। আজাম ডট কম সংবাদ পরিবেশন ও প্রচারে কোথাও কোনদিন আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করেনি। দোষের মধ্যে দোষ এটাই যে, এ সংস্থা মুসলিম মালিকানাধীন। এজন্যই এর প্রতি পাশ্চাত্যের এত আক্রোশ। আজাম ডট কম সংস্থার বিরুদ্ধে সেই অভিযোগই আনা হয়েছে, যে অভিযোগ আনা হয়েছে প্রায় প্রতিটি মুসলিম সংগঠন ও মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে মুসলমান মানেই মৌলবাদী ও চরমপন্থী। জঙ্গীবাদ একটি আপেক্ষিক শব্দ। কারও সঙ্গে মতের অমিল হলেই সেই ব্যক্তিকে জঙ্গী বলা সঙ্গত হতে পারে না। প্রেসিডেন্ট বুশের সঙ্গে অনেক বিষয়েই আমাদের মতের মিল নেই। কিন্তু আমরা তাকে চরমপন্থী বলছি না এবং বলবও না। মার্কিনীরা হচ্ছে বিশ্বে একমাত্র জাতি যারা চিন্তার স্বাধীনতার জন্য গর্ববোধ করে। কিন্তু তাদের মগজ এমনভাবে ধোলাই হয়ে গেছে যে, মার্কিন আধিপত্যবাদের বিরোধিতা করলে অথবা মার্কিনীদের সঙ্গে কেউ একমত পোষণ না করলেই সে চরমপন্থী বা সন্ত্রাসী হয়ে যায়।

আজাম ডট কম ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে আত্মঘাতী হামলায় হতাহতদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। কিন্তু তারপরও এ সংস্থার প্রতি মার্কিনীদের ক্রোধ প্রশমিত হচ্ছে না। মার্কিনীদের উচিত আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখা। বেশ কয়েকটি আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদী সংগঠন ১১ সেপ্টেম্বরের হামলাকে সমর্থন করেছে এবং খোলাখুলি বলেছে যে, এ হামলায় ইহুদী নিহত এবং ইহুদীবাদী মার্কিন সরকারের ক্ষতি হওয়ায় তা সমর্থনযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রের এইচটিটিপি ডট ফ্রিম্যান ডট আইও ডট কমের মত কয়েকটি ইহুদীবাদী জঙ্গী ওয়েব সাইট রয়েছে। এসব ইহুদীবাদী ওয়েব সাইট প্রকাশ্যে জঙ্গীবাদী ধ্যান-ধারণা প্রচার করা সত্ত্বেও এগুলো বন্ধ করা হয়নি। আমরা এগুলোকে বন্ধ করে

www.pathagar.com

দিতে বলছি না। আমরা ইহুদীবাদী ওয়েব সাইটগুলোর সঙ্গে একমত নই। তবু আমরা বলব যে, একটি মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজে সবার মত প্রকাশের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে হবে। আমরা তিনটি কারণে ইহুদীবাদী ওয়েব সাইট বন্ধ করার পক্ষপাতী নই।

(১) এসব ওয়েব সাইট বন্ধ করে দেয়া হলে এগুলোর প্রতি মানুষের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাবে। মানুষ জানতে চাইবে কেন এগুলো বন্ধ করে দেয়া হল।

(২) একজন বিরুদ্ধ মত পোষণকারী ব্যক্তি এসব ওয়েব সাইটে ঢুকতে পারবে এবং বুঝতে পারবে কেন এসব লোক এমন ধরনের মত পোষণ করে। উদাহরণস্বরূপ শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদীরা আমেরিকান সরকারকে ইহুদী নিয়ন্ত্রিত সরকার বলে আখ্যায়িত করে থাকে। তারা মনে করে যে, মার্কিন প্রশাসনের মধ্যে একদল কট্টর ইহুদীবাদী রয়েছে যারা আমেরিকান নাগরিকদের অধিকার খর্ব করছে। তারা আরও মনে করে যে, ঐ চক্রটি মার্কিন স্বার্থের চেয়ে ইসরাইলী স্বার্থকে বেশী গুরুত্ব দেয়।

(৩) ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়া ছাড়া এসব ওয়েব সাইট পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া সম্ভব নয়। এতে সামান্য অসুবিধার সৃষ্টি হবে মাত্র। কারণ অনলাইনে বিষয়বস্তু থেকেই যাবে।

আজাম ডট কম চেচনিয়ার ফিল্ড কমান্ডার খাত্তাব, তালিবান শীর্ষনেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর ও আল কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের বিবৃতি অথবা এদের সম্পর্কিত খবরাখবর পরিবেশন করতে গিয়ে জঙ্গীবাদী ও সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। কিন্তু একই খবর যখন এবিসি, রয়টার্স, বিবিসি অথবা সিএনএন পরিবেশ করে তখন তা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এ ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন মুসলিম সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হলেই কোন সংবাদ 'সন্ত্রাসবাদে সমর্থন দান' বলে বিবেচিত হয় এবং অমুসলিম সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হলে তা সংবাদ হিসেবে পরিগণিত হয়। কারও ভাল লাগুক বা না লাগুক খাত্তাব, ওসামা ও মোল্লা ওমর বর্তমান বিশ্বে খবরের একটি বিশেষ উপাদান। কোন সংবাদ মাধ্যমের পক্ষেই এদের সম্পর্কে প্রাপ্ত নিউজ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আজাম ডট কম এই বাস্তবতা থেকেই ৯ ডিসেম্বর ওয়েব সাইটে ওসামা বিন লাদেনের একটি বিবৃতি প্রচার করে। এ বিবৃতি প্রচার করার জন্য বলা হচ্ছে যে, ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে। লাদেনের এ বিবৃতিটি পাকিস্তানী দৈনিক ডেইলি ইসলামে ৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। সেখান থেকেই এটি আজাম ডট কমের ওয়েব সাইটে আসে।

মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন যে, আজাম ওয়েব সাইট নাকি ওসামা বিন লাদেনের আল কায়েদা নেটওয়ার্কসহ অন্যান্য গোপন সংগঠনগুলোর কাছে সংকেত ও দিকনির্দেশনা পৌঁছে দিচ্ছে। এরকম অভিযোগ আল-জাজিরা টিভি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধেও আনা হয়েছিল। আর এবার আনা হচ্ছে আজাম ডট কম ওয়েব সাইটের বিরুদ্ধে। মার্কিনীদের বোকামির জন্য হাসি পায়। তারা কি এতটুকু বোঝে না যে, আল কায়েদা নেটওয়ার্কের কোন সদস্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই ইংরেজী ওয়েব সাইটের সান্নিধ্যে এসে নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে চাইতে পারে না?

আজাম ডট কম ইন্টারনেট সংস্থাকে মার্কিনবিরোধী ও পাশ্চাত্যবিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যের বিরোধিতা করার কারণে এ সংস্থা যদি অভিযুক্ত হতে পারে তাহলে ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী হওয়ার কারণে সিএনএন, এবিসি ও বিবিসিও অভিযুক্ত। আমেরিকা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এটা আজ আর

www.pathagar.com

কোন গোপন কথা নয়। যে কোন লোককেই সততার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই মূলত মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই। আফগানিস্তান, লেবানন, সিরিয়া, সুদান, সোমালিয়া, ইয়েমেন ও ইন্দোনেশিয়ার মত দেশগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ের টার্গেট। আর এসব দেশগুলোর সবক'টি দেশই মুসলিম। মার্কিন সামরিক অভিযানের তালিকায় পৃথিবীর দেশে দেশে স্বাধীনতার জন্য লড়াইরত মুসলিম সংগঠনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও শ্রীলংকার এলটিটিই, ইসরাইলের চরমপন্থী দল সাচ, স্পেনের বাস্ক, উত্তর আয়ারল্যান্ডের রিয়েল আইআরএ, ভারতের হিন্দু চরমপন্থী বজরং, শিবসেনা অথবা আরএসএস-এর মত জঙ্গী সংগঠনগুলো এই তালিকায় রাখা হয়নি।

চেচনিয়া প্রশ্নে পাশ্চাত্যের অবস্থান বদলে গেছে। ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর চেচেন মুজাহিদরা বিন লাদেনের সমর্থক ও 'সন্ত্রাসী' হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এমন একটা অবস্থা তৈরী হয়েছে যে, এই মুহূর্তে চেচেন মুজাহিদরা লড়াই চালাতে গেলে স্রেফ সন্ত্রাসী হয়ে যাবে। সুতরাং এত বছর ধরে যে রুশরা তাদের রক্ত ঝরাচ্ছে তাদের সঙ্গে চেচেন মুজাহিদদের আলোচনার টেবিলে বসতে হবে। মুসলমানদের আত্মরক্ষা করার অধিকার থাকা উচিত নয়, এমন কি তারা গণহত্যার শিকার হলেও। ন্যায়-অন্যায় সবকিছু তাদের মেনে নিতে হবে এবং নিজের গলা চেপে ধরে আনন্দের সঙ্গে আত্মহত্যা করতে হবে। তখন মুসলমানদেরকে আর সন্ত্রাসী বলা সম্ভব হবে না। তখন তাদের মৃত্যুর জন্য অন্যরা কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করবে। এ মুহূর্তে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলতে গেলেই বিপদ। আজাম ডট কম চেচনিয়ার নির্যাতিত মুসলমানদের খবরাখবর প্রচার করে ফেঁসে যাচ্ছে। এই সংস্থার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করা হচ্ছে যে, এটি নাকি ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী হামলায় মুসলমানদের জড়িত থাকার বিষয়ে প্রশ্ন তুলছে। আজাম ডট কম মুসলিম সম্পর্কে যে প্রশ্ন তুলেছে তার সপক্ষে জোরালো প্রমাণ ও যুক্তি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার জন্য মুসলমানদের অভিযুক্ত করছে। কিন্তু নিরপেক্ষ কোন সূত্র এই অভিযোগ নিশ্চিত করছে না। ১৯৪৫ সালে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমাবর্ষণ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যতগুলো সর্বনাশা ঘটনায় মার্কিন সংশ্লিষ্টতা রয়েছে সেগুলো নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রেই বিতর্ক দেখা দিয়েছে।

আজাম ডট কমের ওপর মার্কিনীদের আক্রোশের মূল কারণ হচ্ছে যে, এ ওয়েব সাইট আফগানিস্তানে মার্কিনীদের ভুলভ্রান্তি এবং তাদের হতাহতের বিবরণ প্রকাশ করছে। মার্কিনীদের অধিকার রয়েছে তাদের সন্তানদের সম্পর্কে জানার। আফগান রণাঙ্গনে যাদের পাঠানো হয়েছে তারা প্রেসিডেন্ট বুশ অথবা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রামসফিল্ডের সন্তান নয়। আফগানিস্তানে অসংখ্য মার্কিন সৈন্য নিহত হচ্ছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র নিহতদের সঠিক সংখ্যা প্রকাশ করছে না। যুদ্ধে হতাহত হওয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা। মুজাহিদরা তাদের শাহাদাত বরণের ঘটনা স্বীকার করছে। এ পর্যন্ত বহু মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন। কিন্তু মার্কিন সরকার দেশের জনগণকে সঠিক তথ্য জানতে দিচ্ছে না। তবে আজ হোক কাল হোক মার্কিন সরকারকে হতাহতের হিসাব দিতেই হবে। মান রক্ষার জন্য হয়ত বলা হবে যে, নিজের বোমাবর্ষণেই এসব মার্কিন সৈন্য হতাহত হয়েছে। ❑

ডিসেম্বর '০১
লেখক ঃ সাংবাদিক

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের নীতিবোধ আজ ধুলায় লুণ্ঠিত, আফগানিস্তানের গণহত্যা যুদ্ধাপরাধের শামিল

ইন্টারনেট ঃ আফগানিস্তানে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি বর্বর বাহিনীকে সামরিক সহায়তা দিচ্ছে যারা ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সময়ে রাজধানী কাবুলে ৫০ হাজার মানুষ হত্যা করেছে। এবারও দেখা গেল মার্কিন বোমারু বিমানের বেশুমার বোমা হামলার সমর্থন নিয়ে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের যোদ্ধারা কৌশলগত নগরী মাজার-ই-শরীফে প্রবেশ করে কয়েকশ' তালিবান মুজাহিদকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আপাতত আফগান পরিস্থিতিকে শান্ত বলে দেখানো হচ্ছে। কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, আফগানদের প্রতিশোধ গ্রহণের কিংবা সুযোগমত পাল্টা হামলা চালানোর ঐতিহ্য রয়েছে। এ অবস্থায় এটা অবশ্যই বলা যায় যে, আফগানিস্তানে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সমর্থনে বিরামহীন বোমা হামলা চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধাপরাধ করেছে। আফগান যুদ্ধের এক পর্যায়ে মাজার-ই-শরীফে যুদ্ধবন্দী তালিবান মুজাহিদরা সহসা বিদ্রোহ করে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সৈনিক এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বাহিনীর সৈনিকদের উপর হামলা চালায়। এ সময় জনি মাইকেল স্পান নামক একজন সিআইএ কর্মকর্তা নিহত হন। এই বিদ্রোহ দমনে বৃটিশ সেনাবাহিনী এবং মার্কিন বোমারু বিমান উত্তরাঞ্চলীয় যোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহায়তা দেয় এবং এই সুযোগ নিয়েই জোটের সৈনিকরা কয়েকশ' তালিবান মুজাহিদকে নির্দয়ভাবে হত্যা করার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়। কিন্তু সিএনএন প্রকৃত সত্য আড়াল করে যে তথ্য প্রকাশ করে তাতে দেখা যায়, কিছুসংখ্যক তালিবান মুজাহিদ নিছক পালাতে গিয়ে প্রাণ হারান। প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল একটা জঘন্য বর্বরতা। এই ঘটনায় মার্কিন বাহিনীর সাথে বৃটিশ সৈনিকরাও অবশ্যই যুদ্ধাপরাধে অপরাধী।

বৃটিশ পত্রিকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট-এর সাংবাদিক জাস্টিন হুগলার এ ধরনের তালিবান হত্যার ঘটনা কুন্দুজেও প্রত্যক্ষ করেছেন। এই সব বর্বরতার জন্য যুক্তরাষ্ট্র কিছুতেই গণহত্যার দায় থেকে মুক্ত হতে পারে না। মাজার-ই-শরীফে অবরুদ্ধ তালিবান মুজাহিদদের উপর মার্কিন বিমান হামলার ব্যাপারে একটি হাস্যকর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রোনাল্ড রামসফেল্ড। তিনি বলেছেন, তালিবান যোদ্ধাদের উপর বিমান হামলা বন্ধে

www.pathagar.com

উত্তরাঞ্চলীয় সৈন্যরা অনুরোধ জানালে আমরা তা মেনে নিতাম। মার্কিন বিমান বাহিনী আফগানিস্তানে যা করেছে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের খুনীরাও সেই একই নৃশংসতা চালাচ্ছে তালিবান মুজাহিদদের উপর। কিন্তু এটা খুবই পরিতাপের কথা যে, অধিকাংশ টেলিভিশন সাংবাদিক তাদের খবর তৈরীর সময় এইসব বর্বরতা কিংবা যুদ্ধাপরাধের বিষয়গুলো সযত্নে এড়িয়ে গেছে কিংবা বাস্তবতার তুলনায় খুব সামান্যই প্রকাশ করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভবিষ্যৎ যুদ্ধাপরাধ প্রতিহত করার জন্য পাশ্চাত্য শক্তি অজস্র আইন তৈরী করে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কথিত উদার ও মানবিক পশ্চিমা মূল্যবোধের প্রতি গোটা বিশ্বের দেশগুলোকে উৎসাহিত করার জন্য অসংখ্য মানবাধিকার গ্রুপ সৃষ্টি করা হয়।

এরপর গত ৫০ বছর ধরে পশ্চিমা বিশ্ব তার নিজের প্রশ্নবোধক নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে চীন, অধুনালপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন, আরব বিশ্ব এবং আফ্রিকার দেশগুলোর মানবাধিকার নিয়ে অনর্গল লেকচার দিয়ে গেছে। বসনিয়া, ও ক্রোয়েশিয়ার মানবাধিকার লংঘনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তারা কঠোর ভাষায় নিন্দা প্রকাশ করেছে। কিন্তু নতুন শতকের শুরুতে গত ১১ সেপ্টেম্বরের বিমান হামলার একটি মাত্র ঘটনায় সহসাই উন্মাদ হয়ে উঠলো বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন। এই যৌথ শক্তি ওই ঘটনাকে উপলক্ষ করে অবিরাম বিমান হামলায় গ্রামবাসীসহ আফগান গ্রামগুলো ধূলিসাৎ করে দিল। নিউইয়র্কে কিছু লোক হত্যা করার জন্য দায়ী করা হলো ওসামা বিন লাদেনকে। বর্তমানে এই যৌথ শক্তি আফগানিস্তানে বন্দী তালিবান মুজাহিদদের হত্যা করার সুযোগ করে দিচ্ছে উত্তরাঞ্চলীয় মিত্র সৈনিকদের। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ তার নির্বাহী আদেশবলে কথিত সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের বিচার এবং বিচার-উত্তর নিধনের জন্য বেশ কয়েকটি গোপন সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে। নিজ দেশে তো বটেই, এমন কি গোটা বিশ্বে মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রবক্তার দাবীদার যুক্তরাষ্ট্রের এধরনের অনৈতিক স্ববিরোধী এবং অমানবিক পদক্ষেপ গ্রহণে হতবাক হয়েছে বিশ্ববাসী।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার পর্যন্ত এই পদক্ষেপ দেখে বিচলিত বোধ করেছেন এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের মানবিক স্খলন দেখে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের একচোখা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সন্ত্রাসী হিসেবে যাকে সন্দেহ করবে তাকেই সরাসরি সোপর্দ করা হবে ওই গোপন সামরিক ট্রাইব্যুনালে। অথচ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সারাবিশ্বে নিজেরাই অসংখ্য সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে কায়েমী স্বার্থে। নতুন এই মার্কিন আইনের অধীনে কথিত সন্দেহভাজন ওসামা বিন লাদেন কিংবা তার আল-কায়েদার অনুসারীরা কোন কারণে নিহত না হয়ে যদি আটক হয় তাহলে নবগঠিত গোপন সামরিক ট্রাইব্যুনালে সংক্ষিপ্ত নামমাত্র বিচারের প্রহসন শেষে তাদের সরাসরি পাঠিয়ে দেয়া হবে ফায়ারিং স্কোয়াডে। হলুদ, কালো কিংবা বাদামী চামড়ার কোন কমিউনিস্ট কিংবা ইসলামপন্থী কিংবা জাতীয়তাবাদী তাদের যুদ্ধবন্দীদের গণহারে হত্যা করে অথবা শত্রুদের উপর বর্ষণ করে বোমার বৃষ্টি অথবা গঠন করে ডেথ স্কোয়াড আদালত-তাহলে অবশ্যই তাদের নিন্দা জানাবে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘ এবং গোটা সভ্য দুনিয়া। এটাই ছিল নিয়ম। কিন্তু হালে এই নিয়মটি যেন আর থাকছে না। আজ দেখা যাচ্ছে খোদ যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বিশ্ব নিজেরাই নেমে পড়েছে স্ববিরোধী অপকর্মে।

www.pathagar.com

বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মত মানবাধিকার, উদারতা ও ন্যায়ের রক্ষকরা বিশ্বের একটি দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করছে নির্বিচারে। যুক্তরাষ্ট্রে একটি মাত্র বিমান হামলার ঘটনায় ছিড়ে ফেলে দেয়া হলো মানবাধিকার সংক্রান্ত আইন-কানুনের দলিলপত্রগুলো এবং বি-৫২ বিমান বহর পাঠানো হলো আফগানিস্তানের মত একটি হতদরিদ্র দেশে গণহত্যা চালানোর জন্য। আজকের প্রেসিডেন্ট বুশের মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ও স্ববিরোধী গণহত্যার সমর্থনে মেতে উঠেছিলেন যুদ্ধপরাজিত নাজিদের শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে। ১৯৪৫ সালে নুরেমবার্গের আদালতে যুদ্ধবন্দী এবং অন্যান্য নাজিদের বাছ-বিচারহীন বিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। একই সুর ধ্বনিত হয়েছিল সে সময়কার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কণ্ঠেও। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে পাঁচ কোটি মানুষ নিহত হয়েছিল তার জন্য প্রধানত দায়ী ছিল হিটলারের দানবীয় উচ্চাভিলাষ। আজকের মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশও তার কর্মকাণ্ড সম্পাদনে হোয়াইট হাউজের রাষ্ট্রনায়কোচিত নৈতিকতা উপলব্ধি করতে নির্মমভাবে ব্যর্থ হচ্ছেন। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কারণে ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে অনেক অপরাধীকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে, এমন ঘটনা বিরল নয়। ১৯৫৪-৬২ সালে আলজেরিয়ার যুদ্ধে নির্যাতন ও গণহত্যার জন্য একজন ফরাসী জেনারেলকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। একইভাবে সাবরা ও শাতিলার ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু শিবিরে ১৯৮২ সালে গণহত্যা চালানোর জন্য ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ব্রাসেলসে। ❑

ডিসেম্বর '০১

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে পরাজিতদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা এবং আমেরিকা, ইসরাইলের 'আত্মরক্ষার অধিকার' প্রসঙ্গ

প্রফেসর আবদুল গফুর

ইংরেজিতে একটা কথা আছে ঃ 'নাথিং সাক্সিড্স্ লাইক সাকসেস'- সাফল্যের মত সফলতা-সার্থকতার বড় প্রমাণ আর কিছু হতে পারে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার পরাজিত না হলে হিটলার আর তার নাৎসীবাদ বিশ্বে এত নিন্দিত-সমালোচিত হতো না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার হাতিয়ারের আঘাতে গর্বাচেভ ও ইয়েলৎসিনের সহায়তায় রাশিয়ায় কম্যুনিজমের পতন না হলে আমাদের দেশের এককালের মহা-মহা বামপন্থীরা সিভিল সোসাইটির লেবাস গায়ে চড়িয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের খেদমতে হন্যে হয়ে উঠতেন না, অথবা সাম্রাজ্যবাদ সংহারের রাজনীতি সযত্নে পরিহার করে 'মৌলবাদ' ও 'তালেবান' উৎখাতের রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করতেন না।

আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের অবসান হয়েছে। তালেবান নেতা মোল্লা ওমর এবং সউদী ভিন্নমতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেন কবে গ্রেফতার বা নিহত হচ্ছেন, সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। বাস্তব সত্য এই যে আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের অবসান হয়েছে, মোল্লা ওমর ও ওসামা বিন লাদেন গ্রেফতার বা নিহত না হওয়া পর্যন্ত পরাজিত শক্তি হিসেবে তারা হয়ত আরও কিছুকাল গেরিলা পদ্ধতিতে ইঙ্গ-মার্কিন দখলদার বাহিনী, তাদের পৃষ্ঠপোষকতাধন্য নর্দার্ন এলায়েন্স ও তালেবানবিরোধী অন্যান্য শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ লড়াই চালিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু অতিপ্রাকৃতিক কোন অঘটন না ঘটলে তাদের শাসন আর আফগানিস্তানে অদূর ভবিষ্যতে কায়েম হতে পারছে না, এটাই সত্য। সুতরাং ওসামা বিন লাদেন, মোল্লা ওমর এবং তাদের নেতৃত্বাধীন আল কায়েদা সংস্থা ও তালেবান বাহিনী যে এখন পরাজিত পক্ষ, এটাই বাস্তব সত্য।

তালেবানরা নিশ্চিত পরাজিত পক্ষ বলে যারা আগাগোড়া তালেবানবিরোধী ছিল, তারা তো বটেই, নিকট-অতীতের তালেবান সমর্থকদের অনেকেই এখন নিশ্চিন্ত নিরাপদে মোল্লা ওমর ও ওসামা বিন লাদেনের সমালোচনা করছেন এবং তাদের বহু খুঁত

www.pathagar.com

আবিষ্কারে লিপ্ত হয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক। আমি নিজে ওসামা বিন লাদেন ও মোল্লা ওমরের কর্মপদ্ধতির অনেক কিছু কখনও সমর্থন করতাম না, কিন্তু তাদের আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি অতীতেও আন্তরিক শ্রদ্ধাবান ছিলাম, এখনও আছি। বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের কিছু কিছু ভুল কর্মপন্থার জন্য তাদের আদর্শনিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা হারাবার কোন কারণ খুঁজে পাই না। মানুষ মাত্রেই ভুল হতে পারে। আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে অনেক সময়ই এমন অনেক পথে চলি, যার ফলে আমাদের ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের উদ্দেশ্য যদি সৎ ও মহৎ হয়ে থাকে, তাহলে ভুল পথে চলবার কারণে ব্যর্থতার সম্মুখীন হই বলেই কি নিন্দিত, সমালোচিত হওয়া পছন্দ করি ? করি না।

পৃথিবীতে ভুল হয় না শুধু ফেরেশতা ও শয়তানের। ফেরেশতার কর্মশক্তি আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, ভুল করবার বা ভ্রান্ত পথে যাবার ক্ষমতাই আল্লাহ তাদের দেননি। আর শয়তানকে আল্লাহ নিজেই কেয়ামত পর্যন্ত মানুষকে বিভ্রান্ত করবার ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। এ দুইয়ের বিপরীতে মানুষকে আল্লাহ ভুল ও নির্ভুল উভয় পথে চলার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। এজন্যই জীবনে আমরা যেমন কখনও সঠিক পথে চলি, তেমনি আবার কখনও ভুল পথেও চলি। সমাজে একশ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা সাধারণত ভুল করে না। তারা 'হাওয়া' বুঝে পাল খাটাতে পারে। তারা সাধারণ অর্থে খুব কমই ভুল করে। এখন ডিসেম্বর মাস চলছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে 'ষোড়শ ডিভিশন' বা 'সিক্সটিন্থ ডিভিশন' বলে একটা কথা আছে। এরা কারা ? ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের প্রাক্কালে এরা হঠাৎ 'মুক্তিফৌজ' হয়ে যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের প্রাক্কালে দল বদলে সিদ্ধহস্ত এক ধরনের লোক দেখা যায় সমাজে। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে অভ্যস্ত এরা সাধারণত 'ভুল' করে না। এদের পরিচয় এরা সুবিধাবাদী।

ওসামা বিন লাদেন ও মোল্লা ওমর এরা কেউই সুবিধাবাদী নয়। এদের জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য অর্জনে তারা কখনও সুবিধাবাদিতার আশ্রয় নেননি। এঁদের কর্মপদ্ধতিতে ভুল থাকতে পারে, অবাস্তবতা থাকতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য অর্জনে এঁদের ত্যাগ ও নিষ্ঠার কোন তুলনা হয় না। ওসামা বিন লাদেন শুধু সউদী আরবের নয়, সমগ্র আধুনিক বিশ্বেরই অন্যতম সেরা ধনী ব্যক্তি ছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের সঙ্গেও তার পরিবারের একদা বাণিজ্যিক পার্টনারশিপ ছিল। তদুপরি তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার। ভোগ-বিলাসে গা ঢেলে দিয়ে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মত কানায় কানায় সুখের জীবন ভোগ করার পথে তার কোন বাধা ছিল না। কিন্তু এই সহজ পথে না গিয়ে তিনি নিজের জন্য বেছে নিলেন এমন এক পথ, যে পথে তিনি জীবিকা ও জীবন দুইয়ের নিরাপত্তাই হারিয়েছেন চরমভাবে। পৃথিবীর একচ্ছত্র পরাশক্তি আজ যখন তাকে জীবিত বা মৃত দেখতে চাইছে, এর অন্যথা হওয়ার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারছে না।

পৃথিবীর একচ্ছত্র পরাশক্তি যার মৃত্যু বা ধ্বংস কামনা করছে, তার নিরাপত্তা দেবে কে ? সুতরাং শুধু খৃস্টান, ইহুদী ও অন্যান্য অমুসলিম শক্তিই নয়, মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সন্ত্রাস দমনের নামে বুশের লাদেন-সংহার অভিযানের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করছেন। কিন্তু যার ধ্বংসের জন্য আমেরিকা এত বিরাট সামরিক অভিযান শুরু করে দিয়েছে, তার অপরাধ কি ? তিনি কি মানব সভ্যতার দীর্ঘ-লালিত আদর্শাবলী

www.pathagar.com

গণতন্ত্র, স্বাধীনতা বা মানবাধিকারের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছেন ? যে ওসামা বিন লাদেন একদা আমেরিকার বড় বড় নেতাদের বাণিজ্যিক পার্টনার ছিলেন, হঠাৎ তিনি আমেরিকার মহাশত্রু হয়ে দাঁড়ালেন কি করে ?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার বিশ্বস্ত দোসর বৃটেন ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে একটা সন্দেহের ভিত্তিতে। গত ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ও ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে আক্রমণের পিছনে ওসামা বিন লাদেনের হাত ছিল বলে তাদের সন্দেহ। তাই ঐ ধ্বংসাত্মক ঘটনার প্রধান সন্দেহভাজন বলে ওসামা বিন লাদেনের নাম ঐদিন থেকেই উল্লেখ করা হচ্ছে। অর্থাৎ অদ্যাবধি বৃটেন বা যুক্তরাষ্ট্র কেউই নিশ্চিত নয় যে, ঐ ধ্বংসাত্মক অভিযান ওসামা বিন লাদেনই পরিচালনা করেন। 'প্রধান সন্দেহভাজন' হিসেবে বারবার তাঁর নাম উল্লেখ থেকেও এটা নিশ্চিত যে, এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ তাদের কাছে নেই। শুধুমাত্র সন্দেহ বা অনুমানের ভিত্তিতে একটি লোক এবং সেই লোককে আশ্রয়দানের অপরাধে একটি দেশের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি যে নৃশংস সামরিক অভিযান চালিয়েছে—তা কতখানি মানাবধিকারসম্মত হয়েছে, সে প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে।

তাছাড়া যে লাদেন পরিবারের সঙ্গে আমেরিকার শাসকদের একদা গলায় গলায় খাতির ছিল, তাদের অন্যতম সদস্য ওসামা কেন পরবর্তীকালে মার্কিনবিরোধী হয়ে উঠলেন, সে বিষয়টিও এক্ষেত্রে আলোচনা করা যেতে পারে। ওসামা বিন লাদেন তাঁর জন্মভূমি সউদী আরবে এবং অন্যান্য আরব দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি মেনে নিতে পারেননি। এটা মেনে নেন সউদী সরকার। সউদী সরকারের এই মার্কিন নীতির সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণেই ওসামা বিন লাদেনকে এখনও উল্লেখ করা হয় 'ভিন্ন মতাবলম্বী' সউদী নাগরিক হিসেবে। গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের মাপকাঠিতে যদি বিচার করা হয় তাহলে অন্যদের নয়, ওসামা বিন লাদেনকেই বলতে হয় খাঁটি দেশপ্রেমিক এবং জাতিসংঘ ঘোষিত স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের আদর্শের নিশানবর্দার। সেক্ষেত্রে জাতিসংঘের স্বাভাবিক সমর্থন তাঁর প্রতিই থাকার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, দেশপ্রেম ও মানবাধিকারের আদর্শে বিশ্বাসী হবার কারণে আজ তাকে চিত্রিত করা হচ্ছে বিশ্বের সেরা সন্ত্রাসী হিসেবে।

পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ শুধু একচ্ছত্র পরাশক্তি হিসেবে শ্রেষ্ঠ সামরিক ক্ষমতার অধিকারীই নয়, বিশ্বের মিডিয়া নেটওয়ার্কও তার পৃষ্ঠপোষকতাধন্য ইহুদী ও অন্যান্য মুসলিম-বিদ্বেষী শক্তির করায়ত্ত। সুতরাং একটি জালিম শক্তিকে শান্তির অগ্রদূত এবং স্বাধীনতার সমর্থক শক্তিকে সন্ত্রাসী এবং মানবতার শত্রু আখ্যা দিতে অসুবিধা কোথায় ? বেশুমার সামরিক শক্তির অধিকারী হবার সুবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন-তখন পৃথিবীর যে কোন দেশে সন্ত্রাস চালিয়েও এই যে সাধু সাজতে পারছে, এতে জাতিসংঘের মহৎ উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হচ্ছে, সে প্রশ্নের উত্তর দেবে কে ? গায়ে শক্তি থাকলেই যখন-তখন যুক্তি প্রমাণের ধার না ধেরে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করা যদি অসভ্যতা হয়ে থাকে, তাহলে যুক্তি-প্রমাণের তোয়াক্কা না করে একটি শক্তিমদমত্ত দেশ যদি আরেকটি দুর্বল দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাতে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিয়ে যায়, তার সে আচরণ অসভ্যতার দায়ে দুষ্ট হবে না কেন ?

www.pathagar.com

তালেবান নেতা মোল্লা ওমরের অপরাধ কি? আমেরিকার চোখে তাঁর 'অপরাধ' তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'চক্ষুশূল' ওসামা বিন লাদেনকে আফগানিস্তানে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু মোল্লা ওমর তো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েছিলেন, আমেরিকা যদি ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় ওসামা বিন লাদেনের সংশ্লিষ্টতার নির্ভুল প্রমাণ দিতে পারে, তাহলে তিনি তাকে আমেরিকার নিকট সমর্পণ করবেন। আমেরিকা সে পথে গেল না কেন? এতে নতুন করে পুরাতন সত্যই প্রমাণিত হয় যে, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার সাথে ওসামা বিন লাদেনের সম্পৃক্ততার নিশ্চিত প্রমাণ আমেরিকার হাতে ছিল না এবং এখনও নেই। ওসামাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান সন্দেহভাজন বিবেচনা করে মাত্র। ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচার দাবী করে কাউকে শুধু অনুমান বা সন্দেহের ভিত্তিতে শাস্তি দেয়া চলে না। এটা ঘোরতর অন্যায় এবং চূড়ান্ত অবিচার। কিন্তু ন্যায়-অন্যায় এবং সুবিচার-অবিচার তো তাদের জন্য প্রযোজ্য, যারা ন্যায়নীতি ও সুবিচারের আদের্শ বিশ্বাস করেন। যারা মনে করেন, শক্তি থাকলেই কারণে-অকারণে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াতে কোন দোষ নেই, সেই জোর যার মুল্লুক তার মার্কা জংলী আইনে যারা বিশ্বাস করে, তাদের কাছে তো সুনীতি, ন্যায়নীতি বা সুবিচার-ন্যায়বিচারের কোন অর্থ বা মূল্য থাকতে পারে না। শক্তির দাপটই তাদের আচরণের যথার্থতা নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমা-নাগাসাকি থেকে শুরু করে আফগানিস্তানে সামরিক আগ্রাসন পর্যন্ত যত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডই চালাক-তাদেরকে কিছুতেই 'সন্ত্রাসী' বলা যাবে না! সন্ত্রাসী হবেন ওসামা বিন লাদেন, যার প্রধানতম অপরাধ তিনি তাঁর জন্মভূমি সউদী আরব ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিন সামরিক উপস্থিতির অবসান কামনা করে তার স্বদেশ ও ভ্রাতৃপ্রতিম অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অর্থপূর্ণ করার নীতিতে বিশ্বাসী।

মুসলিম বিদ্বেষী আন্তর্জাতিক মিডিয়া নেটওয়ার্কের কল্যাণে মোল্লা ওমর ও তালেবানদের বিরুদ্ধে অনেক অপপ্রচারই চালানো হয়েছে। কিন্তু একথা কেউ প্রমাণ করতে পারেনি যে, তালেবানরা মানবতাবিরোধী কোন শক্তি। আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের পটভূমি কি ছিল ? একদা যে মুজাহিদদের প্রতিরোধ যুদ্ধের মোকাবিলায় সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হয়, সেই মুজাহিদরা এক পর্যায়ে লিপ্ত হয় দুঃখজনক অন্তর্কলহে। সেই অন্তর্কলহের পাশাপাশি আফগানিস্তানের গণজীবনে নেমে আসে বিভিন্ন মুজাহিদ গ্রুপের লুঠতরাজ, নির্যাতন ও নারী নির্যাতনের মত ঘটনা। দেশের আইন-শৃঙ্খলা চরমভাবে বিপর্যস্ত হবার এক পর্যায়েই কান্দাহার থেকে মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে তাঁর মাদ্রাসার তালেবান তথা ছাত্রদের নেতৃত্বে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এগিয়ে যায়। যেসব এলাকা এদের নিয়ন্ত্রণে আসে সেখানে যেমন আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি লুঠতরাজ, খুনাখুনি, নারী নির্যাতনও বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের বিশাল অঞ্চলে বহুদিন পর জীবনের নিরাপত্তা ফিরে আসে। এর ফলে আশপাশে এলাকাসমূহেও তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠার আমন্ত্রণ আসতে থাকে। এভাবেই অল্পসময়ের মধ্যেই সমগ্র আফগানিস্তানের শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ এলাকায় তালেবান শাসন বিস্তৃতি লাভ করে।

একথা সত্য যে, তালেবানদের শাসন-নীতিতে কিছু বাড়াবাড়ি ছিল। যেমন তারা মেয়েদের বাইরে যাওয়া, স্কুলে যাওয়া যা চাকরি করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল, পুরুষদের দাড়ি রাখা বাধ্যতামূলক করেছিল এবং টিভি বন্ধ করে দিয়েছিল। টিভি বন্ধ করে তারা

www.pathagar.com

নিজেদেরই ক্ষতিসাধন করে। মেয়েদের বাইরে বেরোনোর ওপর নিষেধাজ্ঞার ব্যাখ্যায় তারা বলেছিল, এটা সাময়িক। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, তালেবান শাসনে জনগণ বহুদিন পর যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে জীবনের নিরাপত্তা খুঁজে পেয়েছিল, যার অনুপস্থিতি তালেবান-পরবর্তী আমলে এখন ক্রমেই প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, যে তালেবানদের নারী বিদ্বেষী বলে অহরহ প্রচার করা হচ্ছে, সে তালেবান আমলে তালেবান-শাসিত অঞ্চলে কখনও নারী নিগ্রহ, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটনা ঘটেনি। এমন কি যেসব পশ্চিমা মহিলা তালেবানদের হাতে বন্দী হয়, তারাও মুক্তিলাভের পর তাদের সঙ্গে তালেবানদের সদ্ব্যবহারের কথা বার বার উল্লেখ করে তাদের আচরণের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শুধু আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও মহিলাদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও মোল্লা ওমরের নীতিবাদিতা সে দেশে তাঁর অসংখ্য ভক্ত সৃষ্টি করেছে। তিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতা হয়েও অন্যদের সাথে একইভাবে খুব সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন, যা সাধারণত কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

তালেবানদের বড় সীমাবদ্ধতা ছিল, তাদেরকে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে থেকেও আধুনিক মারণাস্ত্রে সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এ যুদ্ধে তাদের পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এ যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক দিক দিয়ে বিজয়ী হলেও যে খোঁড়া অজুহাতে আমেরিকা আফগানিস্তানের ওপর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা কোন মাপকাঠিতেই আমেরিকার নৈতিক পরাজয়ের গ্লানিকে মুছে দিতে পারে না। মোল্লা ওমর তো ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার সাথে ওসামা বিন লাদেনের সম্পৃক্ততার প্রমাণ দেখাতে পারলে ওসামাকে আমেরিকার হাতে সমর্পণে রাজিই ছিলেন। এরপরও সে পথে না গিয়ে আমেরিকা হামলা চালাল কেন ?

ওসামা বিন লাদেনের অনুসৃত পথ সম্বন্ধে কারো কারো দ্বিমত থাকলেও তার মূল আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে কোন মুসলমান তো দূরের কথা, কোন মুক্তিকামী পুঁজিবাদী শোষক এবং সাম্রাজ্যবাদী, সম্প্রসারণবাদী, আধিপত্যবাদী অপশক্তির তাণ্ডব নৃত্যের দিন শেষ হয়ে গেছে। ওসামা সৌদী আরবসহ সমগ্র আরব ও মুসলিম বিশ্ব থেকে যদি সাম্রাজ্যবাদী, সম্প্রসারণবাদী, আধিপত্যবাদী অপশক্তির সামরিক উপস্থিতির অবসান কামনা করে থাকেন, এতে তার অপরাধটা কোথায় ? এতে তো জাতিসংঘ সনদের প্রতিধ্বনিই আমরা শুনতে পাই। এই সেদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিশ্চিত করতে এ ধরনের দাবীই তো জানিয়েছিল। মুখে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বুলি, আর বাস্তব ক্ষেত্রে একটি শোষক শ্রেণীর ক্ষুদ্র স্বার্থে সন্ত্রাস দমনের প্রধান পন্থা বিবেচিত হয়ে থাকে, তাহলে অপেক্ষা করুন, এ আত্মম্ভরী অহমিকার অবসানও একদিন ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই ঘটবে।

মার্কিন নেতৃত্ব দাবী করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে আফগানিস্তানে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে, তা নাকি তার আত্মরক্ষার অধিকারেই। মার্কিন নেতৃত্বের ইবলিসী বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। সম্প্রতি আর একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্রও একইরূপ অজুহাতে স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তথাকথিত

www.pathagar.com

'আত্মরক্ষার অধিকারে' হামলা চালিয়েছে। এটি মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষিত সম্প্রসারণবাদী রাষ্ট্র ইসরাইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানসহ সমগ্র বিশ্বে সন্ত্রাসী হামলা ছড়িয়ে দেবার যে জঘন্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে, তার সুযোগে ইসরাইল ফিলিস্তিনীদের ওপর আগ্রাসী হামলা বাড়িয়ে দিয়েছে শতগুণে। ইসরাইল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কোথাও আত্মঘাতী হামলায় একজন ইসরাইলী নিহত বা আহত হলে তার প্রতিশোধ নেয়ার নামে ফিলিস্তিনী এলাকায় চালানো হচ্ছে আগ্রাসন। হামাস, ইসলামী জিহাদ প্রভৃতি কট্টর স্বাধীনতাকামী সংস্থাসমূহকে তো আগেই ইসরাইল ও তার মুরব্বী আমেরিকা সন্ত্রাসীর খাতায় নাম লিখিয়ে রেখেছে। মার্কিন প্ররোচনায় এতদিন যে ইয়াসির আরাফাত ইসরাইলের সাথে আপোষের নীতি অনুসরণ করে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের নর্তন-কুর্দন বৃদ্ধির পথ সুগম করে দেন, সেই ইয়াসির আরাফাতই এখন কট্টরপন্থী জায়োনিস্ট নেতা শ্যারনের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসের দোষে দুষ্ট হয়ে গেছেন! সুতরাং কোন রকম রাখ-ঢাক না করে ইসরাইল এখন একে একে স্বায়ত্তশাসিত ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত এবং তাঁর তাবৎ প্রশাসন ও (প্রতিরক্ষা নয়) পুলিশ দফতর ধ্বংসের অভিযান প্রায় শেষ করে ফেলেছে।

এত অর্থ কি ? এর অর্থ হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন সন্ত্রাস দমনের নামে সমগ্র আফগানিস্তানে তার দখলদারিত্ব কায়েম করেছে, সেই একই পদ্ধতিতে ইসরাইল সাবেক ফিলিস্তিনের বাকি তথাকথিত স্বায়ত্তশাসিত অংশটিও গ্রাস করতে চলেছে। অর্থাৎ, ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে একটি অংশে ইসরাইল, আরেকটি অংশে ফিলিস্তিন নামে যে দু'টি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভাঁওতা দিয়েছিল মার্কিন নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘ, ইসরাইলের সাম্প্রতিক অভিযানে ইসরাইলের অঙ্গীভূত হতে চলেছে। মজার ব্যাপার এই যে, ইসরাইলের এই আগ্রাসী হামলার প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন জানিয়েছে ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকার' বলে।

বিষয়টা তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার তথাকথিত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করে ইতোমধ্যেই আফগানিস্তান দখল করে নিয়েছে। শোনা যায়, এরপর মুসলিম দেশের প্রতি তার 'নেক নজর' পড়ার আশঙ্কা আছে। মার্কিন-সুহৃদ ইসরাইল বাকি ফিলিস্তিন ভূখণ্ড দখল করেই ক্ষান্ত থাকবে বলে মনে হয় না। রাশিয়া এই সুযোগে চেচনিয়ায় তার দখলদারিত্ব জোরদার করেছে। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাজনী পন্থা অনুসরণ করে ভারত কাশ্মীর দখলের পাঁয়তারা যে শুরু করবে, তা প্রায় নিশ্চিত। একই পন্থায় ফিলিপাইন মিন্দানাও দখল-পর্ব প্রায় সমাপ্ত করে এনেছে। ইয়াসির আরাফাতের মতো নূর মিসৌরীরও এখন করুণ দশা। এসব নিশ্চয়ই করা হবে ভারত ও ফিলিপাইনের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। ভারতের আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে একদিন যদি গোটা পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দখলের প্রয়োজন অনুভূত হয়, তাতেও আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল, রাশিয়া, ভরত, ফিলিপাইন সবারই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশ বা ভূখণ্ড দখলের অধিকার রয়েছে। নেই কেবল মুসলিম স্বাধীন দেশ বা ভূখণ্ডের আত্মরক্ষার অধিকার! এরপরও যখন ওআইসির মান্যবর নেতৃবৃন্দ নাকে তেল দিয়ে দিবানিদ্রা দিতে পারেন, তখন তাদের সাফল্য আর ঠেকায় কে! আমাদের শুধু বক্তব্য, জাতিসংঘের একচ্ছত্র প্রভু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদলেহনই যদি

www.pathagar.com

ওআইসি নেতৃবৃন্দের প্রধান কর্তব্য হয়ে থাকে, তাহলে এ ধরনের সংস্থার অস্তিত্ব থাকা না-থাকা মুসলিম উম্মাহর জন্য একই কথা।

আসলে মার্কিন নেতৃত্ব আফগানিস্তানে যে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে, তার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য রয়েছে। সারা দুনিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রাম চলে আসছে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সোভিয়েত কম্যুনিজমের পতনের পর তার নেতৃত্বে সমাসীন হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে মুসলিম উম্মাহর আদর্শবাদী অংশের। ওসামা বিন লাদেন ও মোল্লা ওমর মার্কিন নেতৃত্বের কাছে প্রতিভাত হয়েছেন সেই জাগরণমুখী মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে। এ জন্যই ওসামা বিন লাদেন ১১ সেপ্টেম্বর ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত না থেকেও মার্কিন নেতৃত্বের এক নম্বর টার্গেটে পরিণত হয়েছেন এবং মোল্লা ওমর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক না থাকাতেও তাঁর আদর্শ-নিষ্ঠা মার্কিন নেতৃত্বের কলিজা কাঁপিয়ে দিয়েছে।

ওসামা বিন লাদেন প্রমাণ করেছেন, কোন ব্যক্তি ধনী, উচ্চ শিক্ষিত, বিজ্ঞানী হয়েও কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি প্রতিরোধে ও ইসলামের সেবায় নিজের সর্বস্ব তো বটেই, এমন কি জীবনও বিলিয়ে দিতে পারেন। মোল্লা ওমর প্রমাণ করেছেন আধুনিক বিজ্ঞানে অনগ্রসর হয়েও কোন ব্যক্তি কিভাবে জনগণকে ইসলামের খেদমতে শাহাদতের পথে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। মার্কিন নেতৃত্ব ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছে আধুনিক টেকনোলজি ও ঈমানী শক্তির যদি সম্মিলন ঘটে, তাহলে তা সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদসহ সমস্ত মানবতাবিরোধী অপশক্তির মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদী, জায়নবাদী, সম্প্রসারণবাদী, আধিপত্যবাদী অপশক্তি ঠিকই অনুধাবন করতে পেরেছে ইসলামের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হলে তাদের শোষণ-দাপটের চূড়ান্ত ভরাডুবি হতে বাধ্য। তাই তারা কেউ আমেরিকার আত্মরক্ষার নামে, কেউ ইসরাইলের আত্মরক্ষার নামে, কেউ অন্যান্য অপশক্তির আত্মরক্ষার নামে আজ ইসলামের নবজাগরণই স্তব্ধ করে দিতে কোমর বেঁধেছে। তবে এ লক্ষ্যে তারা সফল হবে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ স্বাধীনতা মানুষের প্রকৃতিগত চাহিদা। স্বাধীনতা সংগ্রামকে তারা যতই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে চিত্রিত করুক না কেন, মানুষের স্বাধীনতার আকুতিকে এভাবে কিছুতেই চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়া সম্ভব হবে না।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মানুষের কায়েমী স্বার্থবাদী অপশক্তি যুগে যুগে মানুষের সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকার স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে হাজার অপচেষ্টা চালালেও তাদের সে অশুভ প্রচেষ্টা পরিণামে কখনোই সফল হয়নি। অতীতকালের ফেরাউন থেকে শুরু করে আধুনিককালের হিটলার পর্যন্ত সকল শক্তিমদমত্তের ভাগ্যে যা ঘটেছে, ভবিষ্যতে তার কোন ব্যতিক্রম ঘটার কোন সঙ্গত কারণ নেই। ❑

ডিসেম্বর '০১
লেখক : সাংবাদিক, কলামিষ্ট ও ভাষা সৈনিক।

www.pathagar.com

নিরাপত্তা পরিষদ ইবলিসের গায়ে ফেরেশতার আলখেল্লা চড়িয়েছে

(দুই)

মানুষের সাথে শয়তান ও ফেরেশতার একটি বড় পার্থক্যই হচ্ছে মানুষের মধ্যে দোষ ও গুণ দুই-ই থাকে। সে যেমন শতগুণে গুণী হলেও কখনও কখনও ভুল বা বিভ্রান্তির বলে অন্যায় করে বসতে পারে, তেমনি আবার কোন মানুষ খুবই পাপী বা অপরাধী হলেও তার মধ্যে কখনও কখনও মানবিক কোন প্রাণের সন্ধাণ পাওয়া যেতে পারে। এজন্যও কথায় বলে, দোষে-গুণে মানুষ। এর ব্যতিক্রম শুধু নবী-রাসূলগণ। মানব সমাজের জন্য মহত্তম আদর্শের অনুসরণীয় মডেল হিসেবে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাদের নিষ্পাপ রাখার দায়িত্ব পালন করেন।

ফেরেশতাদের সাথে মানুষের পার্থক্য এই যে, মানুষকে যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে ভাল ও মন্দ উভয় পথে চলার ক্ষমতা দিয়েছেন, সেখানে খারাপ পথে চলার কোন ক্ষমতাই দেয়া হয়নি ফেরেশতাদের। কোন মানুষ যখন খারাপ পথে চলার ক্ষমতা পেয়েও ঐ ক্ষমতার অপব্যবহার না করে শুধু আল্লাহর নির্ধারিত কল্যাণের পথে চলে, তখন সে সৃষ্টির সেরা বা আশরাফুল মাখলুকাতের অভিধায় অভিহিত হয়। কিন্তু সে যখন এই পরম সম্ভাবনার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আল্লাহ-দ্রোহিতার পংকিল পথে নেমে যেতে থাকে তখন সে অমানবিকতার কাঙ্ক্ষিত পথের বিপরীত পথের যাত্রী শয়তান তথা ইবলিস। আল্লাহর সৃষ্টিতে জন্মগত সূত্রে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার আজাজিল অহমিকাবশত আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অভিশপ্ত শয়তান তথা ইবলিসে পরিণত হয়। মানব ইতিহাসে মানুষে মানুষে জন্মগত বা পার্থিব অবস্থানগত সূত্রে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাভিত্তিক যত বৈষম্যবাদী অন্যায়-অনাচার, অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, তার সবটাই ইবলিসী উত্তরাধিকার-সঞ্জাত। পক্ষান্তরে এক স্রষ্টার সৃষ্টি হিসাবে এবং একই আদি পিতা-মাতার সন্তান হিসাবে মানুষে মানুষে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের যে সংগ্রাম চলে এসেছে, তার উৎস হচ্ছে তৌহিদ।

মানব জাতির আদি পিতা প্রথম মানব ও প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সমস্ত নবী-রাসূলই তৌহিদের ভিত্তিতে সাম্য-

www.pathagar.com

ভ্রাতৃত্বের সমাজ গঠনের জন্য সাধনা ও সংগ্রাম করে গেছেন। আর যুগে যুগে সে সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে বৈষম্যপন্থী একশ্রেণীর সমাজপতি, যাদের এ বৈষম্যচিন্তার উৎস ছিল ইবলিসী অহমিকার উত্তরাধিকার। নবী-রাসূলরা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সকল মানুষকে এক অভিন্ন উম্মাহ, এক সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে বিশ্বে শান্তির নীড় রচনার প্রয়াস পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট যুগের নির্যাতিত মানুষেরা, 'আরাজেলুন' ও 'মুস্তাদআফুনরা', ভিড় জমিয়েছে তাদের চারপাশে। আর এতে ক্ষিপ্ত হয়ে নবী-রাসূলদের মত মহত্তম মানুষদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে বিভিন্ন যুগের প্রভুত্ববাদী সমাজপতি ও ক্ষমতাগর্বী মানুষেরা।

মানব ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, যুগে যুগে এক স্রষ্টা ও এক অখণ্ড মানব জাতির আদর্শে বিশ্বাসী ভ্রাতৃত্বপন্থী মানুষদের সাথে ইবলিসী অহমিকাগ্রস্ত বৈষম্যকামী মানুষদের মধ্যে সংঘটিত হয়ে আসছে কখনও পরোক্ষ, কখনও প্রত্যক্ষ এক নিরন্তর সংগ্রাম। এই সংগ্রামে যখন তৌহিদবাদী তথা ভ্রাতৃত্বপন্থীদের বিজয় হয়েছে, যেমন হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীতে মদীনার বুকে তখন সেখানে বিরাজ করেছে মানুষে মানুষে অনাবিল শান্তি। কিন্তু যখন বৈষম্যপন্থী শক্তি বিজয়ী হয়েছে, মানব সমাজে নেমে এসেছে অন্যায়, অনাচার ও অত্যাচারের স্টীম রোলার, মানব সমাজ অশান্তির আগুনে পরিণত হয়েছে মূর্তিমান জাহান্নামে।

বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে মানুষ আজ একুশ শতকে পদার্পণ করেছে। বিজ্ঞাপনের নিত্যনতুন আবিষ্কারে অফুরন্ত ক্ষমতার অধিকারী মানুষের আজ গর্ব ও গৌরবের অন্ত নেই। কিন্তু যদি আজ প্রশ্ন করা যায়, মানুষ কি তার জীবনের চির কাঙ্ক্ষিত শান্তির সুখ দেখতে পেয়েছে, যদি প্রশ্ন করা যায়, মানব জীবনে সাম্য ও ইনসাফের দেখা কি আমরা পেয়েছি, তাহলে যে উত্তর আমরা পাব, তা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। কারণ দূর অতীতের শাদ্দাদ-নমরুদ-ফেরাউনদের বা নিকট অতীতের হিটলার-মুসোলিনীদের বর্বরতা-মুক্ত একটি বিশ্ব সমাজ আজও সুদূর পরাহতই মনে হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীতে দুই-দু'টি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর দুনিয়ার বুকে সকল মানুষ ও সকল জাতির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লীগ অব নেশন্স ও ইউনাইটেড নেশন্স নামের যে দু'টি বিশ্ব সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল, তার লক্ষ্য ও ঘোষিত আদর্শ আজও সোনার হরিণের মত বিশ্ববাসীর ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। দূর অতীতের শাদ্দাদ-নমরুদ-ফেরাউন বা নিকট অতীতের হিটলার-মুসোলিনীরা ভিন্ন নামে আজও ঠিকই সদর্পে বিরাজ করছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ইউনিপোলার বিশ্বের একচ্ছত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের নাম জর্জ ডাব্লিউ বুশ। ইংরেজীতে 'বুশ' শব্দের অর্থ জঙ্গল। নামের সাথে কোন লোকের চরিত্রের এমন সুন্দর সাযুজ্য বড় একটা দেখা যায় না। আমেরিকার অন্যতম সাবেক প্রেসিডেন্ট বর্তমান প্রেসিডেন্টের পিতা সিনিয়র জর্জ বুশ-এর মতই জর্জ ডাবলিউ বুশও জংলী রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন। জঙ্গলের পশুদের মতই তার কাছে মানবতার কোন মূল্য নেই- "জোর যার মুল্লুক তার" এই জংলী নীতিতে জর্জ ডাবলিউ বুশ বিশ্বাসী। তাঁর এই জংলী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ কতটা শংকিত, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে আন্তর্জাতিক ক্রিমিন্যাল কোর্টের শাস্তির আওতা থেকে মার্কিন শান্তিরক্ষীদের রেহাই পেতে মার্কিন নেতৃত্বের গলদঘর্ম হওয়ার ঘটনা থেকে।

www.pathagar.com

তিন সপ্তাহ ধরে একটানা আলাপ-আলোচনা ও দেন-দরবারের পর গত শুক্রবার (১২ জুলাই, ২০০২) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালতের আওতা থেকে মার্কিন শান্তিরক্ষীদের ১ বছরের জন্য অব্যাহতিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবী ছিল শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিরক্ষীদেরকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালতের আওতা-বহির্ভূত রাখতে হবে এবং তাদেরকে ঐ আদালতের আওতা-বহির্ভূত রাখতে হবে স্থায়ীভাবে। মার্কিনী এ দাবী পূরণ হয়নি। যে সমঝোতা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তাতে শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও চীনসহ যেসব দেশ এখনও ঐ আদালত গঠনের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি তাদের সকলকেই আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালতের আওতা-বহির্ভূত রাখা হয়েছে। তাও স্থায়ীভাবে নয়, মাত্র ১ বছরের জন্য। এদিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দাবীর কাছে আংশিক নতিস্বীকার করেছে নিরাপত্তা পরিষদ, পুরা নয়। আংশিক নতিস্বীকার করাতেও যুক্তরাষ্ট্র আপাতত খুশী, কারণ এতে ১ বছরের জন্য তার শান্তিরক্ষীদের যুদ্ধাপরাধমূলক কাজকর্মের জন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না। এক বছর পর এটাকে আবার এক্সটেনশন করা সম্ভব হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য তার মূল দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে ক্ষুব্ধও কম হয়নি। মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন নেগ্রোপন্টে হুমকি দিয়েছেন, "আন্তর্জাতিক যুদ্ধপরাধ আদালত যদি কখনও একজন আমেরিকানকেও আটক করার চেষ্টা করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে অবৈধ বিবেচনা করবে এবং তার পরিণাম ফল হবে গুরুতর।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের নাগরিকদের নিরাপত্তার প্রশ্নে আমাদের অঙ্গীকারকে খাটো করে দেখা কোন জাতিরই উচিত হবে না।" তিনি বলেছিলেন, সমঝোতা প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদ রাজি না হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটার পর একটা ভেটো দিয়ে শান্তিরক্ষী বাহিনীর সকল কার্যক্রম অকার্যকর করে দিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রোধ এ কারণে আরও বেশী যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু মিত্র রাষ্ট্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল দাবীর বিরোধিতা করেছে। এইসব রাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১৫ সদস্য রাষ্ট্র ছাড়াও কানাডা, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনাসহ বহু রাষ্ট্র। এসব রাষ্ট্রের যুক্তি হচ্ছে নতুন করে কোন হিটলার বা পলপটের উত্থান প্রতিহত করতে এ ধরনের আদালতের প্রয়োজন রয়েছে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে নিরাপত্তা পরিষদ যে আংশিক নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এতে খুশী নয় এসব দেশ। যারা এই আদালতের পক্ষে কাজ করছেন তাদের হতাশার প্রমাণ পাওয়া যায় এই আদালতের পক্ষের এশিয়া বিষয়ক সমন্বয়কারী আহমদ ফয়েজের বক্তব্যে। আহমদ ফয়েজ বলেছেন, "আমরা হতাশ, নিরাপত্তা পরিষদ চ্যাপ্টার ৭-এর অধীনে যেরূপ সিদ্ধান্ত নিল, তেমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যখন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। দ্বিতীয়তঃ এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে যেসব দায়-দায়িত্ব থেকে সরে আসতে প্ররোচনা যোগাবে। তৃতীয়তঃ আন্তর্জাতিক আইনের উপর কেউ নেই, এ ধারণার ব্যতিক্রম ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে, সে ব্যাপারেও আমরা খুব হতাশ। ..... যুক্তরাষ্ট্র যতটা চেয়েছিল, তা পায়নি বটে, তবে যতটুকু পেয়েছে, সেটাই অনেক এবং বলা যায়, এটা অন্যায় হয়েছে।"

যুক্তরাষ্ট্রের দাবীর বিরোধিতা শুধু তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ থেকেই করা হয়নি, করা

www.pathagar.com

হয়েছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিম শিবিরের ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য জাতিসমূহ এবং অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। "নতুন হিটলার ও পলপটের উত্থান" প্রতিহত করার লক্ষ্যে এ প্রতিবাদের কাতারে তারা শামিল হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী মিত্রদেশ কানাডার পক্ষ থেকে সমঝোতা প্রস্তাব গ্রহণের সমালোচনা করে বলা হয়েছে, "আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি চুক্তির ক্ষেত্রে এটা একটা খারাপ নজির হয়ে রইলো।"

প্রকৃতপক্ষেই যে এটা একটা খারাপ নজির সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। আন্তর্জাতিক যুদ্ধপরাধ আদালত প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, একটানা মানবাধিকার লংঘনের মত জঘন্যতম অপরাধে অপরাধীদের বিচারের উদ্দেশ্যে। ৫৬ বছর আগে নাৎসী নেতৃবৃন্দের শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নুরেমবার্গ বিচারকালীন অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যেই এই আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। ন্যুরেমবার্গ বিচার যদি অন্যায় না হয়ে থাকে, তাহলে ঠিক একই লক্ষ্যে গঠিত এ আদালতের ব্যাপারে আপত্তি তোলার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আদালত গঠনের চুক্তিতে তো স্বাক্ষর করেই নাই, উপরন্তু সে চেয়েছে অন্য কোন রাষ্ট্র নয়, শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিরক্ষী ও নাগরিকদের গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, ক্রমাগত মানবাধিকার লংঘনের অপরাধের জন্য বিচার না করা হোক। যুক্তরাষ্ট্রের এ অন্যায় আবদারের কারণে ভারত, চীনসহ আরও বেশ কিছু রাষ্ট্র ঐ আদালত গঠনের চুক্তি এড়িয়ে যাবার সুযোগ লাভ করেছে। তারা যে নিরাপত্তা পরিষদের সমঝোতা প্রস্তাবের মারফৎ আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালতের আওতা থেকে নিজেদের সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধের সাজা থেকে আত্মরক্ষার সুযোগ পেল, তাও যুক্তরাষ্ট্রের জিদের কারণেই সম্ভব হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র জিদ না ধরলে ঐসব দেশও ঐসব যুদ্ধাপরাধের সাজা এড়ানোর সুযোগ পেত না।

অথচ এই যুক্তরাষ্ট্রই সারাবিশ্বে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নসিহত দিয়ে বেড়ায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত শিবিরের ভাঙ্গন ধরানোর লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র সেকালে ঘন ঘন স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বুলি কপচিয়েছে। জার্মানীর নাৎসী নেতৃবৃন্দের শাস্তির বিধানের লক্ষ্যে ন্যুরেমবার্গ বিচারের প্রতি মুক্তকচ্ছ সমর্থন যুগিয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্র, আজ সেই যুক্তরাষ্ট্রই কি করে নাৎসীদের মত অপরাধ করলেও মার্কিন সৈন্যদের ও মার্কিন নাগরিকদের কেশাগ্র স্পর্শ করা যাবে না বলে জিদ ধরতে পারল, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। অথচ এই যুক্তরাষ্ট্র মাত্র কয়েক বছর আগে চীনের তিয়েনমিয়েন স্কোয়ারে বিক্ষোভরত জনতার উপর চীনা বাহিনীর গুলীবর্ষণের সময় বড়মুখে চীনের মানবাধিকার লংঘনের সমালোচনা করেছিল। আজ যখন স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার লংঘন, যুদ্ধপরাধ ও গণহত্যা সংঘটনের বিচার এড়িয়ে যাবার জিদ ধরেছে, তখন চীনও যুক্তরাষ্ট্রের ঐ স্ববিরোধিতার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে আন্তর্জাতিক যুদ্ধপরাধ আদালত গঠনের চুক্তি স্বাক্ষর থেকে সরে থাকার অজুহাত পেয়েছে। এই একই সুযোগ কাশ্মীর, গুজরাট ও অন্যান্য স্থানে চরম মানবতাবিরোধী অপরাধে লিপ্ত থেকেও গণহত্যা, যুদ্ধপরাধ ও মানবাধিকার লংঘনের সাজা এড়ানোর নবতর সুযোগ গ্রহণ করেছে ভারত। নিরাপত্তা পরিষদ গত শুক্রবার মার্কিন চাপের মুখে যে প্রস্তাব পাস করতে বাধ্য হয়, তার পরিণতিতে বলা যায়, বিশ্বে তথাকথিত শক্তিমান বহু দেশেরই যুদ্ধপরাধ, গণহত্যা ও মানবাধিকার লংঘনের পথ প্রশস্ত হয়ে গেল।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদকে যে প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য করেছে, তা এক হিসেবে ছিল একটি কাগুজে আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। যেসব অপরাধ সংঘটনের আনুষ্ঠানিক অধিকার ঐ প্রস্তাব পাসের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র লাভ করল, দীর্ঘদিন ধরে সে মানবতার বিরুদ্ধে ঐসব অপরাধে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, সুদানসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে মানববিধ্বংসী অস্ত্র ভাণ্ডার মজুতের অভিযোগ তুলে সেসব দেশে বেপরোয়া আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের মত তার বিশেষ অনুগ্রহভাজন রাষ্ট্র প্রতিদিনই বৃহৎ হতে বৃহত্তর মারণাস্ত্র ভাণ্ডার গড়ে তুলছে। কোথায় কোন্ দেশে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ হচ্ছে, তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মাথাব্যথার অন্ত নেই। অথচ অদ্যাবধি পৃথিবীর একমাত্র যে দেশটি পারমাণবিক বোমা বর্ষণের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ লোক হত্যার মত অপরাধ করেছে তার নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে যেভাবে ধরাকে সরা জ্ঞান করে যখন তখন যে কোন দেশকে হুমকি-ধামকি দিয়ে চলেছে, তাতে মনে হয় সে তার বাড়াবাড়ির সব সীমা-সরহদ্দ ছাড়িয়ে যেতে বসেছে।

মজার ব্যাপার এই যে, সারা দুনিয়ায় যে দেশটি এই সেদিনও গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের নসিহত বর্ষণ করে এসেছে, আজ সেই রাষ্ট্রই মানবাধিকার লংঘন, যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার অপরাধ করার আগাম অধিকার আদায় করেছে ভেটো প্রয়োগের হুমকি দেখিয়ে। আসলে গত বেশ কিছুদিন ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিন, লিবিয়া, সুদান, সোমালিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালিয়ে আসছে। সে কারণে তার বিরুদ্ধে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ চাপা দেয়ার জন্যই এ অন্যায় লাইসেন্স অর্জন তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা দুনিয়ার স্বাধীনতার আদর্শ ফেরী করে বেড়ালেও একমাত্র বসনিয়া, কসোভো ও পূর্ব তিমুর ছাড়া অন্য কোন স্বাধীনতা সংগ্রামেই তার ভূমিকা সংশ্লিষ্ট জনগণের জন্য সহায়ক প্রমাণিত হয়নি। বসনিয়া ও কসোভোতে তার ভূমিকাও ঐসব দেশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ছিল না, ছিল একদিকে সাবেক সমাজতন্ত্রী সার্বিয়াকে একহাত দেখিয়ে দিতে, অন্যদিকে বসনিয়া, কসোভোর সাহায্যে বাইরের কোন মুসলিম শক্তি যেন এগিয়ে না আসতে পারে, তা নিশ্চিত করতে। আর পূর্ব তিমুরের বিচ্ছিন্নতা পর্বে তার সহায়তার পেছনে ছিল বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়াকে দুর্বল করে পূর্ব তিমুরে একটি খৃষ্টান রাষ্ট্রের জন্মদান করা। স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রতি যদি যুক্তরাষ্ট্রের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকত তাহলে গণতান্ত্রিক পথে ইসলামিক দল আলজিরিয়ায় ও তুরস্কে ক্ষমতাসীন হবার উপক্রম হলে তার বিরুদ্ধে সেসব দেশের সামরিক বাহিনীকে দিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক রায় ভণ্ডুল করে দিতে যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করত না।

জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিই যদি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন থাকতো, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, মিন্দানাও ও চেচনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম দমনের যথাক্রমে ইসরাইল, ভারত, ফিলিপাইন ও রাশিয়ার বর্বর অভিযানের প্রতি সমর্থন দানে এগিয়ে যেত না।

তাই বলছিলাম, যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই মানবতার বিরুদ্ধে যেসব অপরাধ সংঘটন করেছে, ভবিষ্যতে আরও বেশী মাত্রায় তা করতে চায় বলেই আন্তর্জাতিক যুদ্ধপরাধ আদালতের

www.pathagar.com

এখতিয়ার হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে চায়। আফগানিস্তানে তার সাম্প্রতিক হামলার সময় যুক্তরাষ্ট্র তো বলেই রেখেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের এক অংশ প্রকাশ্য থাকবে, অপর অংশ থাকবে গোপন। সেই গোপন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সম্প্রতি ইসরাইলী নেতা আরিয়েল শ্যারন অবলীলায় ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে হত্যা ও ধ্বংসলীলা চালানোর পর বুশ তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে তাকে শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেছে। শ্যারন যে বলেছে, আমেরিকার সঙ্গে তার মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে গোপন সমঝোতা হয়েছে, সে কথাটির তাৎপর্যও সকলকে বুঝে নিতে হবে।

এই পটভূমিতে নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্য সর্বসম্মতিক্রমে এক বছরের জন্য আমেরিকাকে তার যুদ্ধপরাধ চালিয়ে যাবার যে লাইসেন্স দিয়েছে, তার পরিণাম ফল বিশ্ববাসীকে আজ হোক, কাল হোক ভোগ করতেই হবে। আমেরিকার পরবর্তী টার্গেট ঘোষিত হয়েছে ইরাক। কিন্তু ইরাকই কি তার শেষ টার্গেট? আপাতত মুসলিম উম্মাহ ধ্বংসে তার সংকল্প জায়নবাদী ইসরাইল, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত ও খৃষ্ট অধ্যুষিত পশ্চিমা বিশ্বের কাছে ভালই লাগতে পারে। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণের প্রতি ইসরাইল, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান সমর্থন ঘোষণা করেছে। আমেরিকার বরকন্দাজ হিসেবে বৃটেন তো আছেই। কিন্তু ইরাকের পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিটলারী ক্ষুধা যে তৃপ্ত হবে, এমন মনে করবার কারণ নেই। তাই নতুন হিটলারের উত্থান রোধে কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্য অনেক রাষ্ট্র এখন শংকিত। আমেরিকার এ ইবলিসী প্রভুত্ববাদী মূর্তিতে সকল শান্তিকামী বিশ্ববাসীর মত আমরাও শংকিত। তবে একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত যে, ইতিহাস কখনও দূর অতীতের ফেরাউন বা নিকট অতীতের আপাত ক্ষমতাধর হিটলারদের পক্ষে রায় দেয়নি। যারা মার্কিনী এ জংলী উন্মত্ততাকে অপছন্দ করেও শেষ পর্যন্ত মার্কিনী হুমকির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন তারা অচিরেই উপলব্ধি করতে পারবেন তারা মারাত্মক ভুল করছেন। ইবলিসী বর্বরতার প্রতিমূর্তি বুশের জংলী জিদের প্রতি যারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করে মার্কিনী শান্তিরক্ষীদের অপরাধ করার অবাধ সুযোগ করে দিলেন, তারা তো ইবলিসের গায়েই ফেরেশতার আলখেল্লা পরিয়ে দিলেন। এ কাজটা কি তারা ভাল করলেন?

১৮ জুলাই '০২

www.pathagar.com

কালা-ই-জঙ্গি বন্দী শিবির ঃ নৃশংস গণহত্যার কলংক চিহ্ন

মোঃ মমিন উদ্দিন

২৫ নভেম্বর ২০০১। মাজার-ই-শরীফে ৬শ' তালিবান সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। বন্দী সেনাদেরকে কালা-ই-জঙ্গি দুর্গে আটক রাখা হয়। আত্মসমর্পণের পূর্বে বন্দীদের আশ্বাস দেয়া হয়েছিল, আত্মসমর্পণ করলে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী যুদ্ধবন্দী হিসেবে তাদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করা হবে। এ-ও বলা হয়েছিল, তাদেরকে জাতিসংঘের হাতে তুলে দেয়া হবে; ফলে তারা নিজ নিজ দেশে নিরাপদে ফিরে যেতে পারবে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী 'যুদ্ধবন্দী' হিসেবে আত্মসমর্পণকারী যোদ্ধাদের এই আচরণ প্রাপ্য। কিন্তু ঘটনা ঘটলো ঠিক এর বিপরীত-নৃশংস ও মর্মান্তিক। আত্মসমর্পণের পর এই ৬শ' বন্দীর তেমন কাউকে জীবিত রাখা হলো না। খবরে প্রকাশ, বন্দীরা নাকি বিদ্রোহ করেছে এবং মার্কিন স্পেশাল ফোর্স ও বৃটিশ স্পেশাল এয়ার সার্ভিসের (সাস) কমান্ডোদের সহায়তায় উত্তর জোটের যোদ্ধারা এ বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে কারাগারের ভেতরে দু'দিন ধরে বিদেশী তালিবান যোদ্ধাদের গণহারে হত্যা করে। টানা তিনদিন বিদ্রোহী বন্দীদের সঙ্গে এই সংঘর্ষে কারাগারের ভেতরে শত শত লাশ পড়ে। গতকাল এসব লাশ অপসারণের জন্য রেডক্রস ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের কারাগার নামের সেই দুর্গটিতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। তারা ফিরে এসে এ হত্যাকাণ্ডের লোমহর্ষক বর্ণনা দেন। (যুগান্তর ঃ ২৯ নভেম্বর ২০০১)। এ সংক্রান্ত সর্বশেষ খবরে বিবিসি জানায়, 'বিদ্রোহী বন্দীদের সর্বশেষ দু'জনকে গোলার আঘাতে ধরাশায়ী করা হয়েছে।'

গত ২৮ নভেম্বর বুধবার বিবিসি টেলিভিশনের খবরে জানা যায়, এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা বন্দীশিবিরে পরিচালিত এই নৃশংস গণহত্যার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানায়। এমনেস্টি বলেছে, মাজার-ই-শরীফের বন্দীশিবিরে ৬শ' বন্দীকে হত্যা করা সম্পর্কে যেসব খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে, তার সবগুলোরই সূত্র হলো নর্দার্ন এলায়েন্স এবং মার্কিন ও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ। সুতরাং নিরপেক্ষ সূত্রে এই গণহত্যার তদন্ত করতে হবে। তারা প্রশ্ন রাখেন ঃ (১) তথাকথিত বিদ্রোহ

www.pathagar.com

দমনে মার্কিন বোমারু বিমান উপসাগর থেকে (হিংস্র হয়ে) উড়ে এসে কেন (কারাগারের উপর) বোমা বর্ষণ করলো, (২) নর্দার্ন এলায়েন্স ট্যাংক থেকে কেন গোলা ছুঁড়লো এবং (৩) বৃটিশ বাহিনীই বা সেখানে হামলায় অংশ নিল কেন সে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে হবে। (ইনকিলাব ঃ ৩০ নভেম্বর, ২০০১)। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের মুখপাত্র জোসে ডিয়াজ বিবিসি নিউজ অনলাইনকে জানান, যদিও সে সময় পরিস্থিতি জটিল ছিল তারপরও অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে যেগুলোর উত্তর দেয়া হয়নি। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, দুর্গের একটি অংশে এমন কিছু লাশ পড়েছিল যাদের হাতগুলো পিঠমোড়া করে বাঁধা ছিল। এরপর পত্রিকায় বলা হয়, পেন্টাগন গণহত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। আর যুক্তরাজ্য সরকার গণহত্যার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবী নাকচ করে দিয়েছে। (ইনকিলাব ঃ ১ ডিসেম্বর, ২০০১)

যাদের হাতে গড়া এসব 'মহিমান্বিত' আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং যাদের বিতর্কিত অস্তিত্বের অপরিহার্য অংশ হিসেবে যা কখনও বা মোলায়েম মলমের প্রলেপ, আবার কখনও বা মরণাঘাতের প্রেক্ষিত সৃষ্টির 'ইনডিরেক্ট টুলস' হিসেবে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ হাতের যুৎসই লাঠি হিসেবে কাজ করে, তা যখন ফস্ করে তদন্ত চেয়েছে তার স্রষ্টা (বৃটিশ ও আমেরিকা)-এর দ্বারা বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সংঘটিত এক নৃশংস বর্বর গণহত্যার সুষ্ঠু তদন্তের আর যায় কোথায় তৎক্ষণাৎ ঔদ্ধত্যের সাথে ঘৃণাভরে নাকচ ও এর প্রতি রক্তচক্ষুর প্রাণ-কাঁপানো দৃষ্টি যেন গিলেই খেয়ে ফেলবে ওগুলোকে। তারা বলতে চাইছে, ঘটনা যাই ঘটুক (শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাস নির্মূলের বরং বোঝা উচিত ঔদ্ধত্য-দুষ্ট-দুর্বিনীত মুসলিমচক্র নির্মূলের স্বার্থেই তা করা হয়েছে) তা তদন্ত করার দুঃসাহস দেখানো ঠিক নয়। এসব সংগঠন যেন তাদের সামনে কচু পাতার পানির মত টলমল করছে- যা যে কোন মুহূর্তে সামান্য অজুহাতে ক্ষমতাদর্পীরা 'অপ্রয়োজনীয়' বলে মাটিতে ছুঁড়ে দিতে পারে। তদন্ত হলে তো থলির বিড়াল বেরিয়ে পড়বে। তাতে মানবতার ধ্বজাধারী, বিশ্বশান্তির সোল এজেন্টদের দেহের সুশোভিত রঙিন প্রলেপ মুছে গিয়ে কদর্য-ঘৃণার্হ এইডস্ আক্রান্ত দেহটা সবার কাছে দৃষ্টিগোচর হওয়ার মতো বিপর্যয়কর ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এক ধূর্ত শিয়াল হন্যে হয়ে ফিরছিল শিকার তালাশে। সহসা সে ধোপার রঙের 'টাগারি' (বৃহৎ পাত্রে)-এর ভিতর গিয়ে পড়ে। নীল লেগে দেহশ্রী একবারে পুরোদস্তুর বদলে গেছে। নীলে চকচক করছে গোটা গা। এরূপ দর্শনে সে মুগ্ধ হয়ে স্বগোত্রীয়দের মাঝে এসে বললো, বন্ধুগণ, আমার যে পরিবর্তিত সুরত তোমরা দেখতে পাচ্ছো তার মোজেজা কি তোমরা অবগত আছো ? সকলে বললো, 'না'। সে বললো, আমি বিধাতার বিশেষ ইচ্ছা ও আশীর্বাদে উচ্চতর স্তর অর্জনে ধন্য হয়েছি। এখন থেকে আমি তোমাদের পালের সেরা 'গোদা' (শ্রেষ্ঠ নেতা)। আমার কথা শোনা তোমাদের কর্তব্য- এটা আমার নয় বিধাতার সিদ্ধান্ত, দেখতেই পাচ্ছো। এরপর থেকে সে তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে এক নতুন কার্যব্যবস্থা চালাতে থাকে সকলের দণ্ডমুণ্ডের বিধায়করূপে। সে কি এলাহি কাণ্ড! বনে শান্তির নতুন গরম হাওয়া হু হু করে বইতে লাগলো। একদিন বৃষ্টির পানিতে তার দেহের রং গেল ধুয়ে। দেহশ্রী পূর্ববৎ সাদামাটা হয়ে গেল। তখন সকলে তার চালাকি বুঝতে পারলো। কুন্দুজের পতন অত্যাসন্ন মুহূর্তে আফগান ভূমি জবরদখলকারী মার্কিন নরপতি মিঃ বুশ ঘোষণা করেন, মাজার-ই-শরীফের বিদেশী যোদ্ধাদের ক্ষমা করা হবে না। তাদের ছেড়ে দিলে তারা অন্যান্য দেশে

www.pathagar.com

ছড়িয়ে পড়ে অনুরূপ অশান্তি ঘটাবে। তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কণ্ঠেও একই সুর উচ্চারিত হয়, একজন বিদেশী সৈন্যকেও জীবিত রাখা হবে না। বস্তুত কালা-ই-জঙ্গি নামক বন্দীশিবিরের পাঁচ শতাধিক সৈন্যের একজনকেও জীবিত রাখা হয়নি। সকলকেই খুন করা হয়েছে এবং খুন করা হয়েছে সুপরিকল্পিতরূপে- ঠাণ্ডা মাথায়-নৃশংস-বর্বর কায়দায়।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত হাই কমিশনার মেরি রবিনসনের মুখপাত্র বলেন, উত্তরাঞ্চলীয় সৈন্যদের দ্বারা (পিঠমোড়া করে) বেঁধে রাখা কিছু তালেবান যোদ্ধার হত্যাকাণ্ডের খবরে জাতিসংঘ বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। হাই কমিশনার মেরি রবিনসন এই পাইকারী হত্যা ঘটনার তদন্তের আহ্বান জানালে বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর বিষয়ক মন্ত্রী পিটার হেইন বিবিসি রেডিওকে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্লজ্জের মত বলেছেন, 'যুদ্ধে এমন ঘটনা ঘটে থাকে। তবে মনে রাখতে হবে এসব যুদ্ধবন্দী আল কায়েদার সদস্য। আমরা এ ব্যাপারে তদন্তের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যুদ্ধে অনেক কদর্য জিনিস ঘটে থাকে'। (ইনকিলাব ঃ ২ ডিসেম্বর, ২০০১)। আমেরিকা সাফ সাফ বলে দিয়েছে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন বাহিনীকে সেখানে পাঠানো হয়নি। তাদের কাজ অন্য, আর তা হচ্ছে নির্মূল ও ধ্বংসের। তাদের কলিজার উত্তাপ চড়ে গেছে। বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে তাদের এই নির্লজ্জ দম্ভ-আস্ফালন ঠিক সেদিনই শোনা গেল যেদিন (এই হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ'র মাথায়) "পূর্বাঞ্চলে জালালাবাদের ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণের 'কামা আদো' গ্রামে গত রাত্রে সেহেরীর সময় মার্কিন বিমান ২৫টির বেশী বোমাবর্ষণ করে দু'শ নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করে। কামা আদো শ্বেত পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত একটি দরিদ্র এলাকা। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন বোমা হামলার পর সেখানে ছুটে যায়। তারা নারী ও শিশুদের ভয়ার্ত চীৎকার শুনতে পায়।"

প্রকাশ, 'তালিবান বাহিনীর অগ্রযাত্রার প্রথম কয়েক দিনে মাজার–ই-শরীফের একটি স্কুলে মুজাহিদদের আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটে। এ সময় দোস্তাম বাহিনী ৫শ' ২০ জন পাকিস্তানী তালিবানকে হত্যা করে। রেডক্রস ও সাংবাদিকরা এই হত্যাকাণ্ড নিশ্চিত করেছেন। তারা লাশ বহন করে নিয়ে যেতে দেখেছেন। কান্দাহারে আরো বহু মুজাহিদকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছে যা এখনো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।' (ইনকিলাব ঃ ইন্টারনেট প্রাপ্ত, ৮ ডিসেম্বর, ২০০১)। খবরে আরো জানা যায়, আন্তর্জাতিক রেডক্রসের স্বেচ্ছাসেবীরা ঐ বন্দীদের আটক দুর্গে প্রবেশের আগে নিহত যুদ্ধবন্দীদের হাতে হাতকড়া খুলে ফেলা হয়েছে। এর ফলে বোঝা যাচ্ছে না হাতকড়া পরা যুদ্ধবন্দীরা কিভাবে বিদ্রোহ করলো। যুদ্ধবন্দীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে। তা সর্বৈব মিথ্যা-বানোয়াট। দায়ী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুন্যালের আওতায় বিচার কেন হবে না?

মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমানের সাহায্যে নির্বিচারে কার্পেট বোমা বর্ষণের ফলে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ অকাতরে প্রাণ হারায়। এ ধরনের নির্বিচারে বোমা বর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন এবং বিশেষ করে ১৯২৩ সালের 'হেগের' আকাশযুদ্ধ সংক্রান্ত কনভেনশনের ২২ ধারার সুস্পষ্ট লংঘন। তাই, সঙ্গত কারণেই আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের আওতায় বিশ্ববাসী এর বিচার দেখতে চায়। আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী যুদ্ধবন্দীদের মানবিক আচরণ প্রাপ্য। কিন্তু শান্তি ও সভ্যতার

www.pathagar.com

ফটকা ব্যবসায়ীরা আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত তাদের সে অধিকার হরণ করে। তাদের ওপর হিংস্র পাশবিক কায়দায় উপসাগর থেকে ধেয়ে আসা জঙ্গী বিমানের ভারী মারণাস্ত্র বোমা নিক্ষেপ করে নির্বিচারে ট্যাংকের গোলা ছুঁড়ে তাদের খুন করে। অ-আফগান যোদ্ধারা জাতিসংঘের কাছে হস্তান্তরিত হলে তারা অবাধ্য মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকবে আর তাতে করে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসরদের ঘুম হারাম হবে, ভাণ্ডারে 'বোমা' নামের মারণাস্ত্রের বিশাল মজুদ থাকতে এটা মেনে নেয়া যায় না। তাই হত্যাকাণ্ডের পর হত্যাকাণ্ড (নিজের হাতে, দোসরদের ও জারজ সন্তান ইসরাইলকে লেলিয়ে দিয়ে)-যেখানে প্রাণ সন্দিগ্ধপরায়ণ হয় সেখানে-পৃথিবীর সেই প্রান্তে, এতে আবার মানবতার মুখোশধারীদের তদন্তের খায়েশ কেন ? 'Genocide, assassination and treachery are the best way to defend the interests of a nation (of a proud American's nation) in external world'-এর প্রবক্তারা আন্তর্জাতিক নীতিমালার ধার ধারেন না। তাদের কাছে মধ্যপ্রাচ্য ও বিশেষ করে বর্তমানের আফগান মাটি মধ্য এশিয়ার 'সোনার ডিমওয়ালা' পাখিবিশেষ। তাই পাখিটাকে খাঁচায় বন্দী করা, চিরদিনের মতো করায়ত্ত করার বড় বাধা বা চ্যালেঞ্জ হলো উদ্ধত লাদেন ও মোল্লা উমর। সুতরাং এ দু'জনকে জীবিত বা মৃত যে অবস্থায়ই হোক চাই মিঃ বুশ ও ব্লেয়ারের। তাহলে সকল বাধা ও দুশ্চিন্তার অবসান হবে, নিষ্কন্টক হবে বিগত ইতিহাসের কঠিন অধ্যায় সম্বলিত মধ্য এশিয়ার দুর্গম পথ চলা। এতে রক্ত ও ক্লেদের সেই পিচ্ছিল পথ ধরে স্বসৃষ্ট সংকট শতাব্দীর-স্বঘোষিত ক্রুসেডের মোড়কে সাম্রাজ্যবাদী হায়েনার থাবায় ধুম্রজালে আচ্ছন্ন শতাব্দীর ইতিহাসের পরিক্রমায় আর একটি অনপনেয় কলংকজনক অধ্যায়ের সংযোজন হবে মাত্র।

যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক নোয়াম চামস্কি তাঁর প্রদত্ত ভাষণের বলেছেন, বুশের 'বিশ্ব থেকে অপশক্তি নির্মূল অভিযান'- এই বাক্যটি বুশের ভাষণ লেখকরা ধার করেছেন দেবতাদের মর্তে আবির্ভাবসংক্রান্ত প্রাচীন মহাকাব্য থেকে। তিনি দুঃখ করে বলেন, এটা খুবই পরিহাসের বিষয় এই যে, সভ্য দুনিয়ায় নিজেরা অপশক্তি নির্মূল অভিযানে নেমেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে এটা (এ ব্ল্যাকমেলিং বা ভাঁওতাবাজি) কোন নতুন কথা নয়। তিনি ১১ সেপ্টেম্বরের বিমান হামলা ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে অভিহিত করে বলেন যে, দু'শ' বছর সন্ত্রাস করার পর এবারই প্রথম বন্দুকের নল ঘুরে গেল যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। গত দুই শতাব্দীতে বিশ্ব পটভূমিতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল হামলাকারী। এ দেশটি তার নিজ দেশের আদিবাসীদের নির্মূল করে দিয়েছে, মেক্সিকো নামের দেশটি পদানত করেছে এবং ফিলিপাইন (ভিয়েতনাম ও ইরাক)-এ গণহত্যা চালিয়েছে ঠাণ্ডা মাথায়। এই সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র তার সমরশক্তি ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বময় এবং এর ফলে সারাবিশ্বে অসংখ্য মানুষকে অকাতরে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু দুই শতকের মধ্যে এবারই প্রথম বন্দুকের নল ঘুরে গেছে উল্টো দিকে এবং এটা অবশ্যই স্মরণীয় ঘটনা। তিনি আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ আচরণে অভ্যস্ত ইউরোপও। (জাপানের উল্লেখ তাঁর আলোচনা থেকে বাদ পড়ে গেছে বিধায় আমরা দুঃখিত)। ইউরোপ দীর্ঘদিন তার অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইউরোপের লোভী দেশগুলো তাদের পরদেশ লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় বিশ্বের অধিকাংশ এলাকা দখল করে নেয় বেশুমার হত্যা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে। তাদের ঔপনিবেশিক

www.pathagar.com

লুণ্ঠন আর হত্যাকাণ্ডের নৃশংস চিহ্নাবলী এখনো বিরাজমান রয়েছে এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা তাই সঙ্গত কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি ইউরোপীয় দেশগুলোর জন্য একটি মহাঅশনি সংকেত। (সূত্র ঃ ইনকিলাব ইন্টারনেটপ্রাপ্ত, ২ ডিসেম্বর, ২০০১)। চামস্কি ধরে নিয়েছেন সংঘটিত হামলা প্রতিপক্ষের তরফ থেকেই করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এ ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য এখনও উদঘাটিত হয়নি, তাই সচেতন নিরপেক্ষ বিশ্ববাসীর ধারণার সাথে আমরা ঐকমত্য পোষণ করি যে, এটি ইহুদীচক্রের মুসলিম বিদ্বেষপ্রসূত এক সাজানো ভয়ংকর নাটক যার ফলে শক্তিধর আমেরিকাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কস্মাৎ হিংস্র ভূমিকায় নামাতে পারলে বিশ্বব্যাপী মুসলিম উত্থান নির্মূল সম্ভব হবে। চামস্কি ইতিহাসের চক্ষুষ্মান ব্যক্তিত্ব। তিনি সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, 'বিনাশী অপশক্তি' যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা তাদের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী অস্তিত্বের- আত্ম বিনাশের স্বসৃষ্ট মোক্ষম 'বন্দুকের নলের' মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে গেছে। এটা অমোঘ বিধান। এক মহাঅশনি সংকেত বৈকি! কেউ এ থেকে রেহাই পেয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বন্দীরা অ-আফগান মুজাহিদ। তারা স্বদেশের পরাধীনতা-নিপীড়নের যাঁতাকলে প্রতিরোধের প্রশিক্ষণ নিয়ে লড়াই করছে স্বদেশে-যেখানে অপশক্তির নিষ্ঠুর থাবায় প্রিয় স্বাধীনতা-ধর্ম বিপন্ন সেভাবে হতক্লিষ্ট মুসলিম ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে একাত্ম হয়ে। তাদের আত্মা কোন দেশের সীমায় আবদ্ধ নয়। তাদের প্রাণের ছোঁয়া, পায়ের বলিষ্ঠ ছাপ, হাতের তরবারী বিশ্বময়-সর্বত্র সূর্যালোকের মত দীপ্ত। তারা আন্তর্জাতিক ইসলামী চেতনায়, অনাদি তৌহিদ কিরণে ইহকাল-পরকালব্যাপী প্রসারিত-ব্যাপ্ত।

যুক্তরাষ্ট্র নামক দেশটি অনায়াসে তার দর্পিত সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ধ্বংসকারী সুবৃহৎ হাত বাড়িয়েছে বিশ্বময়। নিজের অপ্রতিরোধ্য প্রায় শক্তির মুঠোয় খামচে ধরেছে মুক্তি ও স্বাধীনতা চেতনায় উত্থিত বিদ্রোহী-দুর্বার মহাজনদের অনন্ত স্রোতকে-মুছে দিতে চায় ওদের প্রাণ-গভীরের তৌহিদ চেতনা- মুক্তি, অবিনাশী ঢেউ। হক্ব ও বাতিলের (সত্য ও মিথ্যার) মধ্যকার এ চিরন্তন লড়াইয়ে জাগ্রত মহাজনতার বিজয় ও 'অপশক্তির' ধ্বংস অনিবার্য, সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ নেই। আফগানবাসীরা যদি প্রশ্ন করে (করবে না এমনটা ভাবা বস্তুনিষ্ঠ কারণেই অনুচিত) আমেরিকা-বৃটিশ আমাদের মাটিতে যুদ্ধ করতে এলো কেন ? মুসলমানের সন্তানদের এ মাটিতে জীবিত না রাখার তারা কে ? মাজার-ই-শরীফের রক্তস্নান কোন বৃহত্তর চক্রান্তের অংশ ছিল ? তারা যদি বলে, বিদেশী হয়ে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমরা ওদের মৃত্যুদণ্ড দিলাম, তবে কি বেশী বলা হবে ? এমনটি হলে তারা কি পারবে তাদের সৈনিকদের লাশ এখান থেকে স্বদেশের মাটিতে ফিরিয়ে নিতে ? ❑

ডিসেম্বর '০১
লেখক ঃ সাংবাদিক।

www.pathagar.com

একজন আমেরিকান মুসলমানের দৃষ্টিতে টুইন টাওয়ার দুর্ঘটনা

মাইকেল উলফ

মুসলমান হয়েছি প্রায় এক যুগ হলো। আমি কখনো মনে করিনি যে, একদিন আমি তিনজন ভিন্নধর্মী মানুষের মতো ভাবতে পারি। সে সময় আমি একটি বই পড়ছিলাম, যার নাম 'স্পিরিচ্যুয়াল অ্যাওকেনিং'- আধ্যাত্মিক জাগরণ। বইটির প্রতিপাদ্য কিছুতেই মাথায় ঢুকছিল না।

আধ্যাত্মিকতা কারো মধ্যে আসে অদ্ভুত অভিজ্ঞতায়, বিদ্যুৎবেগে; কারো মধ্যে আসে সুনির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে। আবার কারো মধ্যে আসে খুব ধীরে। যেমন করে গাছ আলো খোঁজে অথবা কম্পাস উত্তরদিকে স্থির হয়। এ অবস্থাকে আমি অর্ধসুপ্ত অবস্থা বলছি। কারণ তখনও ইসলাম সুনির্দিষ্টভাবে আমার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়নি। এই দীর্ঘ অর্ধসুপ্ত অবস্থায় কেটে গেল দীর্ঘ সময়- প্রায় কুড়ি বছর। এরপর আমি উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকার মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকি। এটা চলতে থাকলো এমনভাবে যেমন করে মাটির নিচে পানি প্রবাহিত হয়। শুধু তাদের সঙ্গেই নয়, আমার বাড়ীতে এবং প্রাত্যহিক জীবনেও এ মেলামেশা চলতে থাকলো।

অনেক আমেরিকানের মতো আমি ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো বেশ দেরীতে উপলব্ধি করি। এতে আমাকে অনেকটা খারাপ অবস্থায় পড়তে হয়। দিন যেতে থাকলো। ১৯৮০-এর দিকে আমি আবিষ্কার করলাম যে, ইসলামই একমাত্র বাস্তবসম্মত ধর্ম। এটি অদ্ভুত আচার-আচরণের কোনো কিছু নয় অথবা শুধুমাত্র রাজনৈতিক সচেতনতাও নয়। ইসলামকে বিশ্বাসযোগ্যতার নিচে রাখা হয়েছে। এ থেকেই জন্মলাভ করেছে অনেক উন্নত ভাষাশৈলীর গ্রন্থ। এ ধর্মে রয়েছে প্রার্থনার মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থাপনের রীতি যা সম্পন্ন করলে অপার আনন্দ লাভ করা যায়। এখন আমার মনে হলো, আমি যেন এক বিশাল পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে চলেছি। এর আগে ছিলাম আমি মোটামুটি ধর্মবিশ্বাসের এক সন্দেহবাদী মানুষ। মনটাও ছিল বেশ উৎফুল্ল। তবে আমি বুঝতে পেরেছি যে, তখনও ধর্মের আসল পত্তন আমাদের মধ্যে হয়নি। এরপরও মুসলমান হয়ে আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে কোন পদক্ষেপ নিতে হবে এমন ধারণা আমার মনকে নাড়া দেয়নি।

www.pathagar.com

এ জন্য আমাকে আরো অপেক্ষা করতে হয়েছে। এটি আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হলো আবার অদ্ভুতও। ইসলাম তো ইহুদী বা খৃস্টান ধর্মের প্রেরিত পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ করে। কিন্তু ইসলাম একাত্মবাদের দিক থেকে সকল ধর্মের আবরণ উন্মোচন করেছে। ইসলামে রয়েছে কোরআন; প্রথমে পড়লে মনে হবে এটা আমার এক সময়ের প্রিয় গ্রন্থ পুরোনো আর নতুন বাইবেলের (New and old testament) সঙ্গে অনেক মিল।

আমার অনেক আমেরিকান বন্ধু রয়েছে। এদের কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ অথবা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইসলামের তুলনায় এদের কৃষ্টি যেন মূল থেকে লক্ষ যোজন দূরে। তবুও কেনো যেন তারা তাদের ধর্মকেই অতি পরিচিত মনে করে। মুসলমান হওয়া আমার ব্যক্তিগত জীবনকেও সমৃদ্ধ করেছে। এর আগে আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু কোনো কিছুই আমাকে পরিতৃপ্ত করেনি যা ইসলাম করেছে। এ ধর্মের আচার-আচরণ আমার কাছে মনে হয়েছে অর্থপূর্ণ। এটা প্রাত্যহিক ঘটনার মতো কোনো কিছু নয় যে, বিপথগামী যুবকরা নিজেদের আধ্যাত্মিকতায় সঞ্জীবিত করছে। তবে এটা আমায় সত্যি ভাবায় যেন ইসলাম গ্রহণ করে আমি অদ্ভুত কোনো কিছু করেছি। এতে প্রায়ই কৌতুকের শিকার হয়েছি, অশ্লীল মন্তব্য শুনেছি। এতে আমাকে বেশ অস্বস্তিতেও পড়তে হয়েছে। তবে আমার মতো আমি ঠিকই করেছি। এরপরই ঘটে গেলো অদ্ভুত ঘটনা। যাত্রীবাহী তিনটি বিমান নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে আর পেন্টাগনে আঘাত হানলো। ঘটনার মোড় ঘুরে গেলো। এহেন ঘটনায় নিউইয়র্কে হাজার হাজার লোক মারা গেলো আর দুর্দশা ডেকে আনলো নিউইয়র্ক আর ওয়াশিংটন ডিসিতে হাজার হাজার মানব সন্তানের। যারা বেঁচে গেলো- সারাজীবন ধরে তারা মানসিক উদ্বিগ্নতা নিয়ে কাটাবে। এখন এটাই হবে অনাগতকাল ধরে আমাদের চিন্তা আর প্রার্থনার খোরাক। এ ঘটনার পেছনে রয়েছে সক্রিয় সহিংসতা। এটি এতদূর গড়াবে বোঝা যায়নি। এ ঘটনা আমাদের নাগরিকদের নিকট-অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। আজ আপনি মনে করতে পারেন আমি সেই তিনজন ভিন্নধর্মী মানুষের মতো মনে করছি নিজেকে। যা ঘটে গেলো সেটা নিয়ে একজন আমেরিকান হিসেবে আমি সন্ত্রস্ত। সহিংসতা আর মৃত্যুর শীতলতা আমার মধ্যে এই ভীতির জন্ম দিয়েছে।

এই ঘটনায় আমি রাগান্বিত। এটা ভাবতে সত্যিই কষ্ট হয় যে, যাকে ভালোবাসি সে কাছে থেকেই টুকরো টুকরো হয়ে গেলো ? গুটিকয়েক বোকা এ ধরনের কাজ করতে পারে? আমার রাগ হওয়ার আরো কারণ রয়েছে। আমরা এখন এক খোলামেলা সমাজে বাস করি। এ সমাজের কিছু সন্ত্রাসী কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নস্যাৎ করে দিয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, দিন গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ঠাণ্ডা মাথার বিচক্ষণ ব্যক্তি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এগুলো ভাবতে বেশ জটিল মনে হয়। তবুও একজন মুসলমান হিসেবে আমি এগুলো নিয়ে অন্যভাবে চিন্তা করি। এসব ঘটনায় আমি অনেকটা আতঙ্কিত যা মূলত চরমপন্থীদেরই কাজ। ইসলামের মোড়কে নিজেদের আবৃত করে এরা এহেন হীন কাজ করার প্রয়াস পেয়েছে। ইসলামের শিক্ষা এই যে, অবৈধভাবে-অন্যায়ভাবে যদি কারো প্রাণ সংহার করা হয়- তবে এ কাজ যে করলো যে যেন গোটা মানবতাকে হত্যা করলো। (সূরা-মায়েদা) এ ঘটনার হোতাদের নিয়ে ইসলামের কিছুই করার নেই। কিন্তু কিছু আমেরিকানবাসী এর উল্টোটাই ভাবছে।

www.pathagar.com

এ ঘটনার জন্য আমেরিকানরা যে ভাষা ব্যবহার করেছে আর মনোভাব দেখিয়েছে তাতে একজন আমেরিকান মুসলমান হিসেবে আমার সহকর্মী আমেরিকানদের আচরণের জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত। ঘটনার জের হিসেবে আমরা দেখলাম সানফ্রান্সিসকোর একটি মসজিদের দরোজায় শূকরের রক্ত ছিটানো হয়েছে, ৩০০ জনের একটি মার্কিনী দল ইউএসএ জিগির তুলে শিকাগোর একটি মসজিদে ঢোকার চেষ্টা করেছে। সিলিকন ভ্যালীর একটি মুসলিম স্কুলের পার্কিং এলাকায় বোমার ভয় দেখিয়েছে, টেক্সাসে গুলি চালিয়েছে, ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি মসজিদে তছনছ করেছে। ABC, NBC, CBC, CNN টিভিতে তারা অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারে 'ইসলামকে নির্মূল করার এই তো সময়' এসব ঘৃণা ছড়িয়েছে।

আশ্চর্যের কিছুই নয় যে, এখনও তাদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। আরও রয়েছে অজ্ঞতা। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে যদি এরা সংঘবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে আপনার ধর্মের দোহাই দেয়-তাহলে তো এর দায়ভাগ আপনার ওপরও বর্তায়। এখন 'শহীদ' 'শহীদ' বলেও বা আত্মোৎসর্গের যে কথাবার্তা রয়েছে তা প্রায় ইসলামের সমতুল্য। উভয় ধর্মের লোকেরা বিশ্বাস করে এতে মৃত্যুর পর পুরস্কার রয়েছে, রয়েছে এহেন ভালো কাজের জন্য মানুষের মনের মণিকোঠায় একখানি ভালো জায়গা। শতাব্দীব্যাপী এ ধারণা কোটি কোটি মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে, তাদের পরিচালিত করেছে আর তাদের জীবন পথ প্রোজ্জ্বল করেছে। আমরা চরম মূল্য দিয়ে এটাও জানছি যে, এ বিশ্বাস ভিন্ন ধারাতেও প্রবাহিত হচ্ছে। এর হোতা হচ্ছে মধ্যযুগীয় ক্রুসেডের শাসকরা যারা এসব শুরু করেছিল। এছাড়াও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কিছু বিপথগামী নেতা যেমন জিম জোনস, উগ্রপন্থী সমাজবাদীরা-যেমন ন্যাট টার্নার, জন ব্রাউন। ভয়ানক সময়ে ধর্মকে বড় ধরনের অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে, মানব হত্যার দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। যেমন নাজীবাদীরা করেছে, বসনিয়ায় হত্যাযজ্ঞ ইত্যাদি। এছাড়াও করা হয়েছে সংঘবদ্ধ জাতিগত দাঙ্গা যেমন করেছে ক্লু ক্লাক্স ক্লান গোষ্ঠী। তবুও খৃস্টানরা মনে করে তাদের ধর্ম কলংকিত হয়নি; তাদের সবকিছুই ঠিক। এটা শুধু শোকের সময় নয় বরং চিন্তারও সময়। ধরুন, আপনি একজন সাধারণ মার্কিন নাগরিক। কল্পনা করুন তো স্কুলে যাওয়ার অথবা বেকারী বা হাসপাতালে কাজে যাওয়া বাদ দিয়ে সাড়ে তিন মিলিয়ন আরব আমেরিকান অথবা জনবহুল নগরীর রাস্তায় চলাচলরত ৬০ লাখ মুসলমান কি অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে। এমন ঘটনা আমাদের অবশ্যই মনে করে দেবে যে, মানব জীবন কতটা নাজুক হতে পারে। এ ঘটনায় যারা বেশ দুঃখ-ভারাক্রান্ত আমরা তাদের অপনোদনের ব্যবস্থা করতে পারি আর যারা এই অপরাধ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের কথাও চিন্তা করতে পারি- যারা হোয়াইট হাউসে কাজ করে, ৬ জন আরব আমেরিকান যারা কংগ্রেসে কাজ করে। পাশাপাশি আরও প্রায় দু'শ' জন মুসলমানের কথা ভাবতে পারি যারা ১১ সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে কর্মরত ছিল (প্রায় পাঁচশত মুসলমান নিহত হয়েছে - অনুবাদক)।

মুসলমান আমেরিকানদের সামনেও সেই একই ধরনের কাজ করার রয়েছে। আপনি মুসলমান হলে একবার চিন্তা করুন তো যে এই সকালে একজন সন্ত্রস্ত নীল নয়না স্বর্ণকেশী একেবারে সাদামাটা গোছের একজন আরব অথবা মুসলমানের সঙ্গে বিমানে ওঠার জন্য একই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। তার জন্য আপনি কী করবেন ? যে ভেদরেখা

www.pathagar.com

তাকে আপনার কাছ থেকে দূরে রেখেছে তা কি মুছে ফেলা যাবে অথবা এমন কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ করবেন যা সে মনে রাখবে?

আমার এক বন্ধু লিখেছে পাশবিকতাই সমাজে দুর্দশা ডেকে আনে। পরিতোষণ, ফাঁকি, মিথ্যাচার এসব পাশবিকতার মাত্রা বাড়াতে থাকে। এর সঙ্গে যাদের যোগাযোগ থাকে তারা অপরাধী। আমি কিন্তু মনে করি সকল মানুষের যে কোনো ধরনের দুঃখ-দুর্দশা-তা হোক ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক সব সময় তা কেন্দ্রীভূত থাকে না।

আমাদের মনে সুস্থ চেতনার উন্মেষ ঘটুক। আমেরিকানদের দেখবার সময় এসেছে যে, অপরাধীরা যে কাজ করেছে তার চরম পরিণতি কী হবে। এসব খল মানুষেরা হয়তো নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করতে পারে। কিন্তু এটা তাদের ব্যর্থতা যে, তারা ধর্মকে উপলব্ধি করতে পারেনি। তারা একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্বাসের সুনাম নষ্ট করেছে।

আমরা এখন আবেগাপ্লুত। এ সময় আমাদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা দরকার। এমন প্রার্থনা যেন আল্লাহ দ্রুত কিছু ভালো (Sudden good) নিয়ে আসেন এবং অকস্মাৎ মন্দ (Sudden evil) থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন।

মাইকেল উলফ ঃ একজন মুসলমান। প্রথমে ছিলেন আমেরিকান, পরে তিনি একজন মুসলমান আমেরিকান। বর্তমানে তিনি-ডিরেক্টর অব হজ্ব, দ্য ইসলামিক শূরা কাউন্সিল অব সাউদার্ন, ক্যালিফোর্নিয়া, ইউএসএ।

ডিসেম্বর '০১

অনুবাদ-আবদুস সবুর

www.pathagar.com

ব্রিটিশ সরকারের সংগৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণ লাদেন ও আল-কায়েদার অজানা তথ্য

নবাব উদ্দিন

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার হাউস অব কমন্সে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদের মহানায়ক ওসামা বিন লাদেনের অপরাধের খতিয়ান তুলে ধরে বলেন, ওসামা বিন লাদেন ইজ গিলটি। ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকা ডিজাস্টারের নেপথ্যে যে ওসামা বিন লাদেনের হাত ছিলো, তার দফাওয়ারি প্রমাণপত্র হাউস অব কমন্সে তুলে ধরে বলেন, এখন আর ওসামা বিন লাদেন আমাদের কাছে সাসপেক্ট বা সন্দেহভাজন ব্যক্তি নয়, লাদেন যে অপরাধী তা এখন প্রমাণিত সত্য। গত ৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয়বারের মতো জরুরি ভিত্তিতে সংসদ অধিবেশন আহ্বান করেন। কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যদিয়ে সদস্যগণ পার্লামেন্ট ভবনে এসে পৌঁছেন এবং সাড়ে ন'টায় হাউস ভর্তি সাংসদগণের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বক্তব্য প্রদানকালে উপরোক্ত কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার হাউস অব কমন্সে ওসামা বিন লাদেনকে অপরাধী হিসেবে ঘোষণা করে লাদেনের অপরাধের প্রমাণপত্র সংসদে পেশ করেন। ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট থেকে বলা হয়, এই দলিল ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে মামলা চালানোর মতো তাৎপর্যপূর্ণ নয়। আদালতে প্রমাণ করাটা আইনগতভাবে খুব কঠিন বলে এবং তথ্য সূত্রের নিরাপত্তা বজায় রাখতে হয়-এ উভয় কারণে প্রাপ্ত তথ্য অনেক সময়ই সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু হাতে পাওয়া সব তথ্যাদির ভিত্তিতে এই দলিলে প্রকাশিত মতামতের বিষয়ে এইচএমজি নিশ্চিত।

প্রমাণপত্রে বলা হয়, ১. সরকার স্পষ্টত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে; ওসামা বিন লাদেন এবং তার নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক আল-কায়েদা ১১ সেপ্টেম্বরের নৃশংসতার পরিকল্পনা করেছে ও তা ঘটিয়েছে। আরো নৃশংসতা ঘটানোর মতো সম্পদ ও ইচ্ছা ওসামা বিন লাদেন ও আল কায়েদার রয়েছে। যুক্তরাজ্যের জনগণ হচ্ছে সম্ভাব্য টার্গেট এবং তালেবান সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণে ওসামা বিন লাদেন ও আল কায়েদা এই নৃশংসতা ঘটাতে পেরেছে। তালেবান সরকার তাদেরকে কোনো বাধা ছাড়াই সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চালানোর সুযোগ করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

২. ১৯৯৮ এবং ইউএসএস কোল সম্পর্কিত তথ্যাদি এসেছে বিভিন্ন অভিযোগনামা ও সরকারি গোয়েন্দা বিভাগের সূত্রে। ১১ সেপ্টেম্বর সম্পর্কিত তথ্যাদি এসেছে এ পর্যন্ত গৃহীত অপরাধ অনুসন্ধান ও প্রাপ্ত তথ্যের সূত্রে। কিছু কিছু বিষয়ের বিশদ বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়, কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে এর সত্যতা স্পষ্ট।

৩. গোয়েন্দা সূত্রের নিরাপত্তা বজায়ের স্বার্থে এইচএমজি'র জানা সকল তথ্য সম্পূর্ণভাবে এই দলিলে প্রকাশ করা হয়নি।

৪. প্রাপ্ত তথ্যাদি হতে দেখা যায় যে ঃ

আল-কায়েদা হচ্ছে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, যার বিশ্বব্যাপী সংগঠন রয়েছে এবং ১০ বছরের বেশি সময় ধরে যারা কাজ করে যাচ্ছে। ওসামা বিন লাদেন এটি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সবসময় এর নেতৃত্ব দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে ওসামা বিন লাদেন ও আল-কায়েদা জিহাদে লিপ্ত রয়েছে। তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের হত্যা করা ও আমেরিকার মিত্রদের আক্রমণ করা। ১৯৯৬ সাল থেকে ওসামা বিন লাদেন ও আল-কায়েদা আফগানিস্তানকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করছে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী তাদের নেটওয়ার্ক ও তৎপরতা চালু আছে। নেটওয়ার্কের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প, ওয়ারহাউস, যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড, যা তাদের তৎপরতা চালানোর জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তথ্য সংগ্রহে সক্ষম। এর মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান থেকে বিরাট পরিমাণ অবৈধ ড্রাগসের বাণিজ্য। তালেবান সরকার ও ওসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা তালেবান সরকারকে আর্থিক, সামরিক ও বস্তুগত সাহায্য দিয়ে থাকে। তারা যৌথভাবে মাদকদ্রব্য ব্যবসার তৎপরতা চালায়। তালেবান সরকার বিন লাদেনকে আফগানিস্তানে তার সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালানোর সুযোগ দেয়, বাইরের আক্রমণ থেকে তাকে নিরাপত্তা দেয় এবং মাদকদ্রব্যের মজুদ রক্ষা করে। তালেবান সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া ওসামা বিন লাদেন তার সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চালাতে সক্ষম নয়। ওসামা বিন লাদেনের সামরিক ও আর্থিক সাহায্য ছাড়া তালেবানদের শক্তিও মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তো। ওসামা বিন লাদেন ও আল-কায়েদা জঘন্য সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ক্ষমতা রাখে। ওসামা বিন লাদেন সোমালিয়াতে আমেরিকান সৈন্যদের ওপর অক্টোবর ১৯৯৩-এর আক্রমণ, যাতে ১৮ জন মারা গেছে; আগস্ট ১৯৯৮-তে কেনিয়া ও তানজানিয়াতে অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাসগুলোর ওপর আক্রমণ, যাতে ২২৪ জন মারা গেছে ও প্রায় ৫০০০ জন আহত হয়েছে-এর কৃতিত্ব দাবি করেছে এবং ২০০০ সালের ১২ অক্টোবর ইউএসএস কোলের ওপর আক্রমণ, যাতে ১৭ জন ক্রু মারা গেছেন এবং আরো ৪০ জন আহত হয়েছেন, এর সাথে জড়িত ছিলো। সন্ত্রাসবাদী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশে নিউক্লিয়ার ও রাসায়নিক সামগ্রী সংগ্রহের জন্য তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণের সাথে সম্পর্ক

৫.১১ সেপ্টেম্বরের পর আমরা জানতে পারি যে, বিন লাদেন ইঙ্গিত দিয়েছিলো যে, সে আমেরিকার ওপর একটি বড় আঘাত হানতে যাচ্ছে। ১১ সেপ্টেম্বরে আক্রমণের বিশদ পরিকল্পনা লাদেনের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী করেছে। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার সাথে জড়িত ১৯ জন ছিনতাইকারীর মধ্যে অন্তত তিনজনের আল-কায়েদার সাথে যোগাযোগ

www.pathagar.com

থাকার বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওসামা বিন লাদেন ও আল-কায়েদার আগের আক্রমণগুলোর সাথে ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য আছে এবং বহু বৈশিষ্ট্যে মিল রয়েছে। বিশেষত:

আত্মঘাতী আক্রমণ

১. একই দিনে সম্মিলিত আক্রমণ।

২. সর্বোচ্চ আমেরিকান ক্ষয়ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্য।

৩. মুসলমানসহ অন্যান্য ক্ষতিসাধনের প্রতি অবজ্ঞা।

দীর্ঘমেয়াদী নিখুঁত পরিকল্পনা

১. কোন হুঁশিয়ারি ছাড়াই।

৬. যুক্তরাজ্যসহ আমেরিকার এবং তার অন্য মিত্রদের ওপর আরো আক্রমণ করার ক্ষমতা আল-কায়েদার রয়েছে।

৭. আল-কায়েদা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের কোনো আগাম হুঁশিয়ারি দেয় না।

প্রকৃত ঘটনা

ওসামা বিন লাদেন আল-কায়েদা

৮. ওসামা বিন লাদেন ও অন্যরা ১৯৮৯ সালে আল-কায়েদা নামের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। সকল সময় সে-ই ছিলো আল-কায়েদার নেতা।

৯. ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের পেশোয়ারে অবস্থান করেছে। ১৯৯১-তে সে সুদানে চলে যায় এবং সেখানে ১৯৯৬ পর্যন্ত থাকে। ঐ বছরই সে আফগানিস্তানে ফিরে আসে এবং সেখানে থাকতে শুরু করে।

১০. পাকিস্তানে অবস্থিত আফগান শরণার্থী শিবির থেকে ১৯৯০-এর দশকে তালেবানদের উদ্ভব। ১৯৯৬-এর মধ্যে তারা কাবুল দখল করে ফেলে। পুরো আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার জন্য তারা এখনো রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত আছে। তাদের নেতৃত্বে আছে মোল্লা ওমর।

১১. ১৯৯৬-তে ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে ফিরে আসেন। তিনি মোল্লা ওমরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তালেবানদের দিকে সমর্থন বাড়িয়ে দেন। ওসামা বিন লাদেন ও তালেবান সরকার ঘনিষ্ঠ মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ এবং তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে একে অপরের ওপর নির্ভর করে। তারা একই ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শে বিশ্বাস করে।

১২. ওসামা বিন লাদেন সৈন্য, অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে তালেবান সরকারকে নর্দার্ন এলায়েন্সের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করেছেন। তিনি তালেবান সামরিক প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও অপারেশনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তালেবান সামরিক কমান্ড কাঠামোতে তার প্রতিনিধি আছে। অবকাঠামোগত সহযোগিতা ও মানবিক সাহায্যও তিনি দিয়েছেন। আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধে তালেবানদের পাশাপাশি ওসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বাধীন বাহিনীও যুদ্ধ করেছে।

www.pathagar.com

১৩. মোল্লা ওমর আফগানিস্তানে বিন লাদেনকে সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন ও চালানোর নিরাপদ আশ্রয় ও অনুমতি দিয়েছেন। তারা যৌথভাবে মাদকদ্রব্যের ব্যবসা পরিচালনা করেন। আল-কায়েদার সাহায্যের জবাবে তালেবানরা আল-কায়েদাকে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালনা, প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতিসহ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। এছাড়াও তালেবানরা মাদকদ্রব্যের মজুদের নিরাপত্তা দিয়েছে।

১৪. ১৯৯৬ সালে তালেবানরা কাবুলের দখল গ্রহণ করার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের কাছে মানবিক সাহায্য ও সন্ত্রাসবাদসহ বিভিন্ন বিষয় নিরন্তর উত্থাপন করেছে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এর অনেক আগেই যুক্তরাষ্ট্র তালেবানদের কাছে পূর্ব আফ্রিকাতে আল-কায়েদার সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের প্রমাণ সরবরাহ করেছে। তালেবানদের শীর্ষ নেতাদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের কাছে এসব প্রমাণ দেয়া হয়েছিলো।

১৫. যুক্তরাষ্ট্র সরকার তালেবান সরকারের কাছে এটি নিশ্চিত করেছে যে, আল-কায়েদা মার্কিন নাগরিকাদের হত্যা করেছে এবং আরো হত্যার পরিকল্পনা করছে। যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে সন্ত্রাসবাদীদের তাড়াতে তালেবানদের সাথে কাজ করার প্রস্তাবও দিয়েছিলো। ১৯৯৬ থেকে চলে আসা এসব আলোচনা কোনো ফলাফল তৈরিতে ব্যর্থ হয়।

১৬. আল-কায়েদা সংক্রান্ত বিপুল প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০১ সালের জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্র তালেবানদেরকে এই বলে সতর্ক করেছে যে, আত্মরক্ষার অধিকার তার রয়েছে এবং আফগানিস্তানে আশ্রয়প্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা মার্কিন নাগরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণের জন্য তারা তালেবান সরকারকে দায়ী করবে।

১৭. এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি জাতিসংঘের সমর্থন রয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদ ১২৬৭ নং সিদ্ধান্তে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা ও সন্ত্রাসবাদী ক্যাম্প পরিচালনার জন্য ওসামা বিন লাদেনের নিন্দা করেছে এবং বিচারের আওতায় আনার জন্য অবিলম্বে তাকে সমর্পণের জন্য তালেবান সরকারের কাছে দাবি করেছে।

১৮. যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ১৯৯৮-তে পূর্ব আফ্রিকায় সংঘটিত বোমা হামলায় ওসামা বিন লাদেন ও আল-কায়েদার জড়িত থাকার প্রমাণ দেয়া সত্ত্বেও পুনরায় নৃশংস ঘটনার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও, জাতিসংঘের দাবি সত্ত্বেও তালেবান সরকার জানায় যে, ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই এবং তাকে বা তার নেটওয়ার্ককে বহিষ্কার করা হবে না।

১৯. আফগানিস্তানের একজন প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তা তালেবান ও ওসামাকে এভাবে চিহ্নিত করেছেন- "একই মুদ্রার দুই পিঠ, ওসামাকে ছাড়া আফগানিস্তান টিকতে পারে না এবং তালেবানকে ছাড়া ওসামা অস্তিত্বহীন।"

আল-কায়েদা

২০. মুসলিম দেশগুলোতে অনৈসলামিক সরকারকে শক্তি প্রয়োগ ও সহিংসতার মাধ্যমে বিরোধিতা করার জন্য আল-কায়েদা নিবেদিত।

২১. আল-কায়েদা বিদ্বেষের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করে। ওসামা বিন লাদেন

www.pathagar.com

দ্ব্যর্থহীনভাবে তার সমর্থকদেরকে মার্কিন নাগরিকদেরকে হত্যা করার জন্য উস্কানি দিয়েছে।

২২. ১২ অক্টোবর ১৯৯৬-তে তিনি এরকম একটি জেহাদের ঘোষণা দেন ঃ 'ইহুদি-ক্রুসেডার গোষ্ঠী ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা ইসলামের অনুসারীরা আগ্রাসন, অসাম্য ও অবিচারের শিকার হয়েছেন...

আরব উপদ্বীপের প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর এখন দায়িত্ব হচ্ছে জেহাদে অবতীর্ণ হওয়ার এবং এই ভূমিকে ক্রুসেডার দখলদারমুক্ত করা। তাদের সম্পদ যারা তাদেকরকে হত্যা করবে তাদের অধিকারে যাবে। আমার মুসলিম ভায়েরা : প্যালেস্টাইন ও দুই পবিত্র স্থানের (সৌদি আরব) ভায়েরা আপনাদের সাহায্য চাচ্ছে এবং আমেরিকানও ইসরাইলি শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। তারা ইসলামের পবিত্র ভূমি থেকে শত্রুদের বিতাড়িত করার জন্য আপনাদেরকে আহ্বান করছে।"

একই বছর পরবর্তীতে তিনি বলেন, 'মার্কিন দখলদারদেরকে (ইসলামিক পবিত্র ভূমিতে) ভীতি প্রদর্শন করা একটি ধর্মীয় ও যৌক্তিক দায়িত্ব।" ১৯৯৮-এর ফেব্রুয়ারীতে তিনি সকল মুসলিমদের প্রতি এক ফতোয়া জারি করেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত আল-আকসা মসজিদের দখল তারা হস্তান্তর না করে এবং তাদের সেনাবাহিনী মুসলিমদের দেশ ছেড়ে না যায়, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকান এবং তাদের সামরিক ও বেসামরিক মিত্রদের হত্যা করা প্রতিটি মুসলিমের ধর্মীয় দায়িত্ব।

একই ফতোয়াতে তিনি মুসলিম বুদ্ধিজীবী, নেতৃবৃন্দ ও যুবকদেরকে "আমেরিকান শয়তানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করার" আহ্বান জানান এবং বলেন যে, "আমরা আল্লাহর সহায়তায় প্রত্যেক মুসলিম, যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করেন এবং তার আদেশ অনুসরণের মাধ্যমে পুরস্কৃত হওয়ার আশা করেন তাদেরকে যেখানে এবং যখনই পাওয়া যায় আমেরিকানদের হত্যা ও তাদের অর্থ লুট করার আহ্বান জানাই। আমরা মুসলিমদের ... শয়তানের মার্কিন বাহিনীকে হামলা করতে এবং শয়তানের সমর্থক যারা তাদের মিত্র এবং যারা তাদের পেছনে আছে তাদেকে হটানোর জন্য আহ্বানও জানাই।" পারমাণবিক ও রাসায়নিক অস্ত্র সংগ্রহের বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে ১৯৯৮-তে তিনি বলেন, "মুসলিমদের রক্ষায় এ ধরনের অস্ত্র সংগ্রহ করা একটি ধর্মীয় দায়িত্ব।" আল-জাজিরা (দোহা, কাতার টেলিভিশনে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন "আমাদের শত্রু হচ্ছে প্রত্যেক আমেরিকান পুরুষ সে আমাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করুক বা ট্যাক্স প্রদান করুক।" ১৯৯৭ ও ১৯৯৮-তে আমেরিকান টেলিভিশনে প্রদত্ত দু'টি ইন্টারভিউতে ওসামা ১৯৯৩-তে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আক্রমণকারীদের 'রোল মডেল' হিসেবে আখ্যায়িত করে। সে তার অনুসারীদেরকে লড়াইকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য উপদেশ দেন।

২৩. ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকেই ওসামা বিন লাদেন সন্ত্রাসে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য পারমাণবিক ও রাসায়নিক সামগ্রী সংগ্রহের চেষ্টা করে গেছেন।

২৪. যদিও মার্কিন টার্গেটগুলোই আল-কায়েদার অগ্রগণ্য বিষয়, এটি যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেরকেও ভয় প্রদর্শন করে। "ইহুদি ক্রুসেডার গোষ্ঠী ও তাদের সহযোগী" এবং

www.pathagar.com

"শয়তানের মার্কিন বাহিনী ও শয়তানের সমর্থক তাদের মিত্র' বলতে অবশ্যই যুক্তরাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২৫. আমরা একটি অবিরাম হুমকির মধ্যে আছি। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে যেভাবে নেটওয়ার্কটি কাজ করেছে, ধারণা করা যায় যে, ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ যারা পরিচালনা করেছে সে রকম আরো 'সেল' রয়েছে।

২৬. আল-কায়েদা নিজেরা এবং অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নেটওয়ার্ক দু' ভাবে কাজ করে। এর মধ্যে রয়েছে মিসরীয় ইসলামিক জিহাদ ও উত্তর আফ্রিকান ইসলামি চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এবং সুদান, ইয়েমেন, সোমালিয়া, পাকিস্তান ও ভারতের বিভিন্ন জেহাদি গোষ্ঠী। আল-কায়েদা তার কাজের সুবিধার্থে বেশ কয়েকটা দেশে সেল এবং কর্মী পরিচালনা করে।

২৭. ওসামা বিন লাদেন আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের নেতৃত্ব দেন। তার অধীনে রয়েছে শূরা। যার মধ্যে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। যেমন- মিসরীয় ইসলামিক জিহাদের নেতা আয়মান জাওয়াহিরি এবং বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী আবু হাফস আল মাসরি। মিসরীয় ইসলামিক জিহাদ কার্যত আল-কায়েদার সাথে একীভূত হয়ে গেছে।

২৮. শূরা ছাড়াও সেনাবাহিনী, মিডিয়া, তথ্য ও ইসলামিক বিষয়াবলীর জন্য অন্যান্য গ্রুপ রয়েছে।

২৯. মোহাম্মদ আতেফ হলো সৈনা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম পরিচালনাকারী গ্রুপের সদস্য। তার দায়িত্বাবলীর মধ্যে রয়েছে আল-কায়েদার সদস্যদের প্রশিক্ষণের মূল দায়িত্ব।

৩০. আল-কায়েদার সদস্যদেরকে অবশ্যই ওসামা বিন লাদেনের আদেশ অনুসরণ করার আনুগত্যমূলক শপথ করতে হয়।

৩১. ওসামা বিন লাদেন ও আল-কায়েদার আগের অপরাধগুলোর প্রমাণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগপত্রগুলোতে প্রকাশ করা হয়েছে।

৩২. ১৯৮৯ থেকে ওসামা বিন লাদেন আল-কায়েদার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও বাণিজ্যিক লেনদেন পরিচালনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের জন্য জমি কেনা, বিস্ফোরকসহ মালামাল রাখার জন্য গুদাম কেনা, যোগাযোগ ও ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি কেনা এবং আল-কায়েদার সদস্য ও সরার পৃথিবীকে সহযোগী সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের কাছে মুদ্রা ও অস্ত্র পরিবহন।

৩৩. আল-কায়েদার ও সহযোগী সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের ব্যবহারের জন্য ১৯৮৯ থেকে ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সুদান, সোমালিয়া এবং কেনিয়াতে ট্রেনিং ক্যাম্প ও গেস্টহাউস সুবিধা দিয়েছে। আমরা গোয়েন্দা সূত্রে জানতে পেরেছি, আফগানিস্তানে অন্তত ডজন খানেক এ ধরনের ক্যাম্প রয়েছে, যার মধ্যে কমপক্ষে চারটি সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩৪. ১৯৮৯ থেকে ওসামা বিন লাদেন আল-কায়েদার আয়ের জন্য একাধিক ব্যবসা

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠান চালু করেছেন, যাতে এসব প্রতিষ্ঠানের নামের আড়ালে বিস্ফোরক, অস্ত্র ও রাসায়নিক সংগ্রহ করা যায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে 'ওয়াদি আল আকিক' নামের হোল্ডিং কোম্পানি, 'আল হিজরা' নামের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, 'আল থেমার আল মোবারক' নামের কৃষি-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং 'লাদেন ইন্টারন্যাশনাল' এবং তাবা ইনভেস্টমেন্টস' নামের বিনিয়োগ কোম্পানি।

ওসামা বিন লাদেন এবং আগের আক্রমণগুলো

৩৫. ১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে সোমালিয়াতে অবস্থানরত যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংগ বাহিনীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটানোর জন্য মোহাম্মদ আতেফ সোমালিয়াতে ভ্রমণ করেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে সে রিয়াদে অবস্থারত ওসামা বিন লাদেনকে রিপোর্ট করেন।

৩৬. ১৯৯৩-এর বসন্তে আতেফ, সাইফ আল আদেল এবং আল কায়েদার আরেকজন জ্যেষ্ঠ সদস্য সোমালি উপজাতিকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে, যাতে তারা জাতিসংঘের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে।

৩৭. অপারেশন 'রিস্টোর হোপ'-এর অংশ হিসেবে সোমালিয়াতে কার্যরত মার্কিন সামরিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ১৯৯৩-এর ৩ ও ৪ অক্টোবর আল-কায়েদা একটি আক্রমণ পরিচালনা করে। এই আক্রমণে ১৮ জন মার্কিন সেনা সদস্য মারা যায়।

৩৮. ১৯৯৩ থেকে আল কায়েদার সদস্যরা নাইরোবিতে বসবাস শুরু করে এবং ব্যবসা স্থাপন করে। এর মধ্যে রয়েছে আসমা লিঃ ও তানজানিয়াইট কিং। আল-কায়েদার জ্যেষ্ঠ সদস্যরা বিশেষত আতেফ ও আবু উবাদিয়াহ আল বানশিরি এসব নিয়মিত পরিদর্শনে যেতেন।

৩৯. সোমালিয়াতে অপারেশন রিস্টোর হোপে মার্কিন সেনাদের অংশগ্রহণের প্রতিশোধ হিসেবে আল-কায়েদার সদস্যরা মার্কিন দূতাবাস আক্রমণের যাচাই করতে শুরু করে ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে। আলী মোহামেদ নামক একজন মার্কিন নাগরিক ও আল-কায়েদার সদস্য সন্ত্রাসী আক্রমণের সম্ভাব্যতা লক্ষ্য হিসেবে মার্কিন এম্বেসি জরিপ করে। সে ফটো তোলে এবং স্কেচ এঁকে সুদানে ওসামা বিন লাদেনের কাছে উপস্থাপন করে। সে একথাও স্বীকার করেছে যে, সে আফগানিস্তানে ১৯৯০-এর প্রথম দিকে আল-কায়েদার সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যারা সম্ভব আগস্ট ১৯৯৮-তে পূর্ব আফ্রিকাতে বোমাবাজিতে জড়িত ছিলো।

৪০. ১৯৯৮-এর জুন বা জুলাইতে আল-কায়েদার দুই কর্মী ফাহিদ মোহাম্মদ আলি মাসালাম এবং শেখ আহমদ সেলিম সুয়েদান একটি টয়োটা ট্রাক নিকে ট্রাকটির পেছনে প্রচুর অদল-বদল করে।

৪১. ১৯৯৮-এর আগস্টে আল-কায়েদার কর্মীরা নাইরোবিস্থ ইউএস এম্বেসিতে হামলা চালানোর জন্য নাইরোবির ৪৩, নিই রুভা এস্টেটে জমায়েত হন।

৪২. ৭ আগস্ট ১৯৯৮ আসাম নামের এক সৌদি নাগরিক ও আল-কায়েদার কর্মী টয়োটা ট্রাকটি মার্কিন এম্বেসিতে চালিয়ে নিয়ে যান। ট্রাকটির পিছনে একটি বিশাল বোমা ছিল।

৪৩. ট্রাকের মধ্যে আরেক সৌদি নাগরিক মোহাম্মদ রাশেদ দাউদ আল ওয়ালী ছিলো।

www.pathagar.com

সে স্বীকার করেছে যে, সে আল-কায়েদার সক্রিয় সমর্থক এবং সে ১৯৯৬ থেকে আফগানিস্তানের বিভিন্ন আল-কায়েদার ক্যাম্পে বিস্ফোরক, ছিনতাই, অপহরণ, হত্যা এবং গোয়েন্দা কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ওসামা বিন লাদেনের অনুমতি পেয়ে সে আফগানিস্তানে তালেবানদের হয়ে লড়াই করেছে। সে ব্যক্তিগতভাবে ওসামা বিন লাদেনের সাথে ১৯৯৬ সালে দেখা করে এবং আরো একটি মিশনে অংশগ্রহণের অনুমতি চায়। ওসামা আফগানিস্তানের ক্যাম্পে বিশেষ প্রশিক্ষণের পর তাকে পূর্ব আফ্রিকাতে পাঠায়।

৪৪. যখন ট্রাকটি এম্বেসির কাছাকাছি পৌঁছে, আল ওয়ালি বের হয়ে আসে এবং সিকিউরিটি গার্ডের দিকে গ্রেনেড ছুড়ে মারে। আসাম ট্রাকটি এম্বেসির পেছন দিকে চালিয়ে নিয়ে যায়। সে তখন বের হয়ে বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটায় যা একটি বহুতলা সেক্রেটারিয়াল কলেজ ধ্বংস করে এবং মার্কিন এম্বেসির ও কো-অপারেটিব ব্যাংকের গুরুতর ক্ষতিসাধন করে। এরই বোমাতে ২১৩ জন লোক নিহত হয় এবং ৪৫০০ জন আহত হয়। আসাম এই বিস্ফোরণে মারা যায়।

৪৫. আল ওয়ালি চেয়েছিলো এই মিশনের মাধ্যমে তার মৃত্যু ঘটবে। সে আল-কায়েদার জন্য মরতে চেয়েছিলো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে ট্রাকটি থেকে দূরে সরে যায় এবং বেঁচে যায়। তার কোনো টাকা ও পাসপোর্ট ছিলো না, মিশন শেষে পালানোর কোনো পরিকল্পনা ছিলো না, কারণ সে মারা যেতে চেয়েছিলো।

৪৬. কয়েকদিন পর সে ইয়েমেনে একটি টেলিফোন নাম্বারে ফোন করে তাকে কেনিয়াতে কিছু টাকা পাঠানোর জন্য বলে। একই নাম্বারে ওসামা বিন লাদেনও একই দিনে যোগাযোগের চেষ্টা করেন।

৪৭. নাইরোবির বোমা বিস্ফোরণের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে আরেক জনকে গ্রেফতার করা হয় যার নাম মোহাম্মদ সাদিক ওদেহ্। সে তার জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। সে বোমাবাজির মূল হোতাদের চিহ্নিত করে। সে আরো তিনজনের নাম দেয় যারা সবাই আল-কায়েদা বা মিশরীয় ইসলামিক জিহাদের সদস্য ছিলো।

৪৮. একই দিনে একই সময়ে দারুস সালামে মার্কিন এম্বেসিতে আল-কায়েদার কর্মীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। যাতে ১১ জন লোক মারা যায়। এর সাথে জড়িত আল-কায়েদার কর্মীরা ছিলো মোস্তফা মোহাম্মদ ফাদিল এবং কাফলান খামিস মোহাম্মদ। বোমাটি যে নিশান এটলাস ট্রাকে করে বহন করা হয়েছিলো সেটি ১৯৯৮-এর জুলাইতে দারুস সালাম থেকে আল-কায়েদার দুই কর্মী আহমদ কাফলান ধাইলানি এবং শেখ আহমদ সেলিম সুয়েদান কিনেছিলো।

৪৯. কাফলান খামিস মোহাম্মদকে বোমাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। সে আল-কায়েদার সদস্য হওয়ার কথা স্বীকার করে এবং বোমাবাজির সাথে জড়িত অন্যান্য সদস্যকেও চিহ্নিত করে।

৫০. ৭ ও ৮ আগস্ট ১৯৯৮ তে আল-কায়েদার আরো দুই সদস্য প্যারিস, দোহা ও দুবাইয়ের মিডিয়া প্রতিষ্ঠানে ফ্যাক্স পাঠিয়ে দুটি বোমাবাজির দায়িত্ব স্বীকার করে।

৫১. লন্ডনে আল-কায়দা ও মিশরীয় ইসলামিক জিহাদের সদস্যদের কয়েকটি বাসভবন

www.pathagar.com

ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তল্লাশি করে পূর্ব আফ্রিকার বোমাবাজির সাথে আল-কায়েদার সংযোগের আরো প্রমাণ মেলে। ঐ তল্লাশি পূর্ব আফ্রিকার বোমাবাজির সাথে জড়িত থাকার স্বীকারোক্তিসহ 'দি ইসলামিক আর্মি ফর দি লিবারেশন অব দি হলি প্লেসেস' নামক একটি ভুয়া প্রতিষ্ঠানের দলিলপত্র পাওয়া যায়।

৫২. আল ওয়ালি যে বোমা হামলায় আত্মঘাতী হতে চেয়েছিলো সে স্বীকার করেছে যে, তাকে ঐ ভুয়া গ্রুপের নামে ভিডিও টেপ তৈরি করতে বলা হয়েছিলো।

৫৩. যে টেলিফোন নাম্বার থেকে ফ্যাক্স করে বোমা হামলার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করা হয়েছিলো সেটি ওসামা বিন লাদেনের সেল ফোনের সাথে যোগাযোগ করেছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

৫৪. টাইম ম্যাগাজিন ১৯৯৮-এর ২২ ডিসেম্বর ওসামা বিন লাদেনকে আগস্ট ১৯৯৮-এর আক্রমণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। জবাবে তিনি বলেন ঃ 'যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক জিহাদ ফ্রন্ট আল্লাহর কৃপায় মুসলিম জাতিকে পবিত্র স্থানসমূহ মুক্ত করার জন্য আহ্বান জানিয়ে স্পষ্ট ভাষায় ফতোয়া জারি করেছে। মোহাম্মদের অনুসারীরা এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। যদি ইহুদি ও আমেরিকানদের বিরুদ্ধে জিহাদে প্ররোচনা দেয়াকে অপরাধ মনে করা হয়, তাহলে ইতিহাস সাক্ষী থাকুক আমি একজন অপরাধী। আমাদের কাজ হচ্ছে উদ্বুদ্ধ করা, আল্লাহর কৃপায় আমরা তা করেছি এবং অনেক লোক এতে সাড়া দিয়েছে।'

আক্রমণকারীদের সে চেনে কিনা একথা জিজ্ঞাসা করা হলে

'যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবনকে বাজি রেখেছে তারা প্রকৃত মানুষ। তারা মুসলমান জাতিকে গ্লানির হাত থেকে রক্ষা করেছে। আমরা তাদেরকে পরম শ্রদ্ধা করি।' যুক্তরাষ্ট্র তার কাছে কি প্রত্যাশা করে এর জবাবে :

...যে কোনো চোর বা অপরাধী যে অন্য দেশে চুরির ইচ্ছায় ঢুকে সে যে কোনো মুহূর্তে খুন হয়ে যেতে পারে...মার্কিনীরা জানে যে আমি তাদেরকে আক্রমণ করেছি, আল্লাহর অশেষ কৃপায় দশ বছরের বেশি সময় ধরে... আল্লাহ জানেন যে আমেরিকান সৈন্যদের হত্যা করে আমরা খুশি। এটি সম্ভব হয়েছে আল্লাহর কৃপায় আর মুজাহেদিনদের পরিশ্রমের বিনিময়ে... আমেরিকার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। আমরা আশা করি আল্লাহ আমাদের এ জন্য পুরস্কৃত করবেন। আমি বিশ্বাস করি যে মুসলমানরা তথাকথিত সুপার পাওয়ার আমেরিকাকে শেষ করে দিতে পারবে।'

৫৫. ১৯৯৯-এর ডিসেম্বরে আল-কায়েদার সাথে জড়িত একটি সন্ত্রাসী সেলকে চিহ্নিত করা হয় যারা যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে আক্রমণের চেষ্টা করেছিলো। মার্কিন-কানাডা সীমান্তে একজন আলজেরিয়ান আহমদ রেসামকে গ্রেফতার করা হয়। তার গাড়িতে ১০০ পাউন্ড ওজনের বোমা বানানোর রসদ পাওয়া যায়। রেসাম স্বীকার করে যে, সে নববর্ষের দিনে লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে একটি বিরাট বোমা হামলার পরিকল্পনা করছিলো। সে জানায় সে আফগানিস্তানে আল-কায়দার ক্যাম্পে সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং তারপর বিদেশে গিয়ে আমেরিকার নাগরিক ও সামরিক ব্যক্তিদের হত্যার নির্দেশ পেয়েছে।

৫৬. ২০০০ সালের ৩ জানুয়ারি আফগানিস্তানে আল-কায়েদার ক্যাম্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

www.pathagar.com

কিছু সদস্য একটি ছোট নৌকা ভর্তি বিস্ফোরক দিয়ে একটি মার্কিন ডেস্ট্রয়ার ধ্বংসের চেষ্টা করে। তাদের নৌকা ডুবে যাওয়ায় আক্রমণটি বিফল হয়।

৫৭. ২০০০ সালের ১২ অক্টোবরে ইডেন বন্দরে তেল ভর্তি করার সময় ইউএসএস কোল বোমা ভর্তি নৌকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। ১৭ জন ক্রু নিহত হয় এবং ৪০ জন আহত হয়।

৫৮. কোন আক্রমণে জড়িত কয়েকজন অপরাধী (অধিকাংশ সৌদি ও ইয়েমেনি) ওসামা বিন লাদেনের আফগানিস্তানের ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ হয়েছে। আলি ওয়ালি কোল আক্রমণের দু'জন কমান্ডারকে পূর্ব আফ্রিকার এম্বেসির বোমা হামলার পরিকল্পনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

৫৯. ১১ সেপ্টেম্বরের আগের মাসগুলোতে আল-কায়েদা মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্বে মুসলিমদেরকে আমেরিকা ও ইহুদিদের টার্গেটগুলো আক্রমণ করার জন্য অনুপ্রেরণা দিচ্ছিলো।

৬০. ১৯৯৮-এর আগস্টে পূর্ব আফ্রিকার এম্বেসিতে আক্রমণের আগে আমেরিকা ও অন্যান্য টার্গেটের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আক্রমণের প্রশংসা করে অনুরূপ ভিডিও বিতরণ করেছিলো।

ওসামা বিন লাদেন এবং ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ

৬১. ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ ছিনতাই করা চারটি বিমানের যাত্রী তালিকা থেকে ১৯ জনকে ছিনতাইকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে অন্তত ৩ জনকে আল-কায়েদার সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত করা গেছে। পূর্ব আফ্রিকার এম্বেসিতে বোমা হামলা এবং ইউএসএস কোল হামলাতে মূল ভূমিকা পালন করেছে এমন একজনকেও চিহ্নিত করা গেছে। সব ছিনতাইকারীর অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখা হচ্ছে।

৬২. ১১ সেপ্টেম্বরের বিষয়ে গোয়েন্দা অনুসন্ধানে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো নিশ্চিত করা হয়েছে। সহযোগীদের নাম যদিও জানা গেছে তবু তদন্তের কারণে তা প্রকাশ করা হলো না।

ক) সেপ্টেম্বরের প্রস্তুতি হিসেবে বিন লাদেন সমমনা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভিডিওসহ বিভিন্ন প্রচারণা সামগ্রী বিতরণ করে। এতে ইহুদি ও আমেরিকান লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণকে যৌক্তিক আখ্যা দিয়ে বলা হয়, যারা এ কাজে মারা যায় তারা আল্লাহর কাজ করতে গিয়েই মারা যায়।

খ) আমরা পরে জানতে পেরেছি যে ১১ সেপ্টেম্বরের অব্যবহিত পূর্বে বিন লাদেন নিজেই বলেছেন যে, তিনি আমেরিকাতে বিরাট আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছেন।

গ) বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদেরকে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা থেকে আফগানিস্তানে ফেরত আসার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

ঘ) ১১ সেপ্টেম্বরের অব্যবহিত পূর্বে বিন লাদেনের কিছু চেনা ঘনিষ্ঠ সহযোগী ১১ সেপ্টেম্বর বা এর আশেপাশের কোনদিন বিশেষ ঘটনা ঘটতে পারে বলে জানায়।

ঙ) ১১ সেপ্টেম্বরে আমরা জানতে পেরেছি যে, বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ সহযোগীরা

www.pathagar.com

এই আক্রমণের বিশদ পরিকল্পনার সাথে জড়িত ছিলো।

চ) বিন লাদেন ও তাদের সহযোগীদের অপরাধে সরাসরি প্রমাণও পাওয়া গেছে যা অত্যন্ত সংবেদনশীল বলে প্রকাশ করা হলো না।

৬৩. আল-কায়দার দায়িত্বে রয়েছেন ওসামা বিন লাদেন। আল-কায়দা কর্তৃক ১১ সেপ্টেম্বরের মতো বড় মাত্রার আক্রমণ ঘটানোর ক্ষেত্রে ওসামা বিন লাদেন অবশ্যই অনুমোদন দিয়েছিলেন।

৬৪. ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণের কর্মকাণ্ড আগের আক্রমণগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল-কায়দার নৃশংসতার বৈশিষ্ট্য হলো-নিখুঁত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ ঘটানোর চেষ্টা, আত্মঘাতী বোমাবাজ এবং একই সাথে একাধিক আক্রমণ।

৬৫. ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ মাত্রা ও পরিশীলতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে পূর্ব আফ্রিকা এম্বেসিগুলো ও ইউএসএস কোলের আক্রমণের সাথে তুলনীয়। তিনটি আক্রমণের ক্ষেত্রেই কোন হুঁশিয়ারি দেয়া হয়নি, যেমন দেয়া হয়নি ১১ সেপ্টেম্বরের ক্ষেত্রে।

৬৬. পূর্ব আফ্রিকার এম্বেসিতে বোমা হামলা মামলায় আল-কায়দার কর্মীরা জানিয়েছে কিভাবে গ্রুপটি বছরের পর বছর সময় ব্যয় করেছে আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য। তারা বার বার জরিপ করেছে, ধীরেসুস্থে জিনিসপত্র সংগ্রহ করেছে, কর্মীদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে এবং পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে কাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা আছে এবং কারা মারা যাওয়ার জন্য ইচ্ছুক।

৬৭. ১১ সেপ্টেম্বরের নৃশংস ঘটনার হোতারা ফ্লাইট স্কুলে ক্লাস করেছে, বড় বিমানের নিয়ন্ত্রণ বুঝতে ফ্লাইট সিমুলেটর ব্যবহার করেছে এবং সম্ভাব্য বিমাবন্দরগুলো ও রুটগুলো সার্বক্ষণিক নজরে রেখেছে।

৬৮. আল-কায়দার আক্রমণের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা মুসলিমসহ নিরপরাধ মানুষের জীবনকে অবজ্ঞা করে। পূর্ব আফ্রিকার বোমা হামলার পর এক সাক্ষাৎকারে ওসামা বিন লাদেন জানান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করার জন্য মুসলিম বা অমুসলিম নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু ক্ষমার যোগ্য।

৬৯. ওসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বাধীন আল-কায়দা নেটওয়ার্ক ছাড়া আর কোনো প্রতিষ্ঠানের ১১ সেপ্টেম্বরের মত আক্রমণ চালানোর ক্ষমতা ও উদ্দেশ্য নেই।

উপসংহার

৭০. ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এর আক্রমণ পরিচালনা করেছে আল-কায়দা, যে প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্বে আছেন ওসামা বিন লাদেন। একই মাত্রার আরো আক্রমণ চালানোর মত সম্পদ ও ইচ্ছা ঐ প্রতিষ্ঠানের রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার ঘনিষ্ঠ মিত্ররা এসব আক্রমণের লক্ষ্য। তালেবানদের সাথে ওসামা বিন লাদেনের মধ্যে জোটবদ্ধতা ছাড়া এ আক্রমণ পরিচালনা করা সম্ভব ছিলো না। তারা বিন লাদেনকে মুক্তভাবে আফগানিস্তানে বিচরণ এবং সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে পরিকল্পনা ও অনুষ্ঠানের সুযোগ করে দিয়েছে। ❑

ডিসেম্বর '০১
লেখক : লন্ডন প্রবাসী সাংবাদিক।

www.pathagar.com

সন্ত্রাস ঃ গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরিপন্থী

প্রফেসর (ড.) মোহাম্মদ আবদুর রব

সন্ত্রাস আজ ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক তথা গোষ্ঠী, সমাজ, আঞ্চলিক এমন কি বৈশ্বিক পরিধিতেও প্রকটভাবে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে এবং নানা ধরনের সন্ত্রাস ও অপরাধ বিশ্বের মানবগোষ্ঠীকে চরমভাবে শংকিত ও বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সন্ত্রাস মানুষের মানবিক সত্তাকে পরাভূত করে পাশবিক সত্তাকে বিজয়ী করে প্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিধি বা কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অবৈধভাবে এমন কোন হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যার মাধ্যমে জীবন, সম্পদ অথবা শান্তির ক্ষতিসাধন হয় অথবা সামাজিক বা ব্যক্তিজীবন হুমকির সম্মুখীন হয়-তখন এরূপ মানবীয় অপতৎপরতাকে সন্ত্রাস বা Terrorism বলে। সন্ত্রাস একটি প্রতিষ্ঠিত অপরাধ। যে কোন রাষ্ট্র বা সমাজে সন্ত্রাস শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সন্ত্রাস শান্তি বিনাশী, সৌহার্দ্য বিধ্বংসী এবং কল্যাণ পরিপন্থী বলে শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অগ্রহণীয় বিষয়। তৎসত্ত্বেও বিশ্বের প্রতিটি জনপদে, প্রতিটি রাষ্ট্রে, প্রতিটি সমাজে সন্ত্রাসের মত অনাকাঙ্ক্ষিত, অমানবিক ঘটনা অহরহই সংঘটিত হয়ে চলেছে। কখনো কখনো সন্ত্রাস রাষ্ট্রীয় এবং এমন কি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ চাঞ্চল্য এবং আলোড়ন সৃষ্টি করে সংবাদ মাধ্যমের প্রধান উপজীব্য বিষয়ে পরিণত হয়।

বিংশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তিতে তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনালগ্নে দুনিয়া যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, কূটকৌশল আর প্রযুক্তির শীর্ষে উন্নীত তখন বিশ্বে সন্ত্রাস তথা Terrorism ঐ মানবিক সাফল্যের সাথে তাল মিলিয়ে লাভ করেছে বিশেষ প্রবৃদ্ধি ও মাত্রাঙ্গিক। এখানে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের অপব্যবহার বিশ্বে সন্ত্রাসবাদকে দান করেছে এক পরম দানবীর ধ্বংস ক্ষমতা ও অভাবনীয় হিংসাত্মক ব্যাপ্তি।

নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দকে বিশ্বের শান্তিপ্রিয় ৬০ কোটি মানুষ দেখতে চায় গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিকাশের এক নতুন উষালগ্ন হিসেবে। বিশ্বায়ন (Globalization), মুক্তবিশ্ব (Free-World), মুক্ত অর্থনীতি (Free Economy), বৈশ্বিক গ্রাম (Global Village) ইত্যাদি গালভরা বুলি আর নানা মুখভরা অঙ্গীকার নিয়ে জাতিসংঘ এবং তার নিয়ন্ত্রক পাশ্চাত্য শক্তি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন শতাব্দীটিকে গণতন্ত্রায়ন ও মানবাধিকারের যুগ (The Age of Democratization

www.pathagar.com

and Human Right) বলে প্রচার করছে। কিন্তু তাদের এই গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নবযুগে শুধু ব্যক্তি ও সমাজ পর্যায়ে যে সন্ত্রাস আর নৈরাজ্য, হিংসা এবং জিঘাংসার ধারাল অস্ত্র প্রদান করে চলেছে তাই-ই নয়। এই হিংস্র সন্ত্রাসের শিল্পোন্নত ধনী তথাকথিত সুসভ্য রাষ্ট্র এবং সমাজকেও তাড়িত করে চলেছে।

সন্ত্রাস আজ ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব সমাজেই এক দুষ্টক্ষত কিংবা ম্যালিগন্যান্ট ক্যান্সার হিসেবে অসুস্থ করে তুলেছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের মতো অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে পড়া দেশগুলোতে সন্ত্রাস সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পেশীশক্তির ব্যবহার, অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতাকে একদিকে যেমন করেছে কলঙ্কিত অন্যদিকে এদেশের নগরে-বন্দরে এমন কি গ্রামীণ জনপদেও সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব সামাজিক শান্তিকে করেছে নির্বাসিত। বাংলাদেশসহ পশ্চাৎপদ দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশেই রাজনীতিতে সন্ত্রাস আজ কালো প্রাতিষ্ঠানিকতার সম্মান লাভ করেছে। অবৈধ অস্ত্র, রাষ্ট্রযন্ত্রের অবৈধ ব্যবহার এমন কি কোথাও কোথাও সামরিক বাহিনীর অবৈধ হস্তক্ষেপ ঐসব দেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বাভাবিক বিকাশকে করেছে ক্ষুন্ন এবং স্বার্থবাদী ও ক্ষমতালোভী মহলের অবৈধ ক্ষমতালিপ্সা ও ক্ষমতায় লিপ্ত থাকার বাসনা সন্ত্রাসকে তাদের কাছে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে করে তুলেছে গ্রহণীয় এবং অপরিহার্য। এই সন্ত্রাস দিয়ে সমাজের বৃহত্তর শান্তিপ্রিয় নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকারকে নিষ্ঠুরভাবে হরণ করা হয়ে থাকে। কখনো বা গণতন্ত্রের নামে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শক্তিও নিতান্ত গায়ের জোরে তাদের প্রতিপক্ষকে দমানোর অভিপ্রায়ে নগ্ন সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়। শুরু করে রাজনীতিতে পেশীশক্তির অপব্যবহার। আমরা এশিয়ার পাকিস্তান, মায়ানমার, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে সামরিক বাহিনীর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কিছু নজির দেখতে পাই। ঠিক একই অপরাধ দেখা যায় দক্ষিণ আমেরিকার চিলি, ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশের সামরিক অপশাসনের অবয়বে।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতেও ক্ষমতারোহণ এবং ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সন্ত্রাসের নগ্ন আশ্রয় নিতে দেখা গেছে। প্রতিপক্ষকে দমানোর জন্য পুলিশ লেলিয়ে দেয়া, গণতান্ত্রিক মিছিল-মিটিংয়ে ক্ষমতাসীন দলের মস্তানদের সন্ত্রাস, হামলা, নিরাপত্তা বাহিনীসমূহের নৃশংস জিঘাংসাভরা আক্রমণ, লাঠিচার্জ, বোমা হামলা এবং প্রতিপক্ষের সভ্য-সমিতিতে সুপরিকল্পিত বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো এসবই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের উদাহরণ। বাংলাদেশে বিগত আওয়ামী সরকারের শাসনামলে যে কয়টি বোমা হামলা এবং তজ্জনিত জীবনহানি ঘটেছে-তার প্রায় সব কয়টির পেছনে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক জিঘাংসা ও দুরভিসন্ধির সংযোগ দেখা যায়। শক্তিমান ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রে নিতান্ত পাশবিক শক্তি বলে নিজেদের ইচ্ছা-অভিপ্রায়কে অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে জৈব মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়াতেই কখনো কখনো নির্যাতিত-নিপীড়িতরা সন্ত্রাসকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। এ ব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, বেলফোর ঘোষণার বিষফল। জায়েনবাদী ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পর ইহুদী মার্কিন খ্রিস্টবাদী চক্রের ইহুদী তোষণ এবং খ্রিস্ট ইহুদীবাদী অক্ষ-শক্তির ফিলিস্তিনী আরবদের প্রতি অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতনের তিক্ত ফলশ্রুতিতে নির্যাতিত-নিপীড়িত বাস্তুহারা, রাষ্ট্রহারা, স্বজনহারা আরব

www.pathagar.com

ফিলিস্তিনীরা হাতে তুলে নেয় অস্ত্র, শুরু করে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম। মানবিক অধিকার আর বঞ্চনার বিচার চেয়ে বিনিময়ে জাতিসংঘসহ মানবতার ধ্বজাধারী সকল ক্ষমতাধরদের একচোখা নীতি এবং বেইনসাফি বঞ্চিত ফিলিস্তিনীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে কখনো কখনো আরো দুর্ধর্ষভাবে পরিবর্তিত করে একেক সময় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী তৎপরতায় পর্যবসিত করেছে। ঠিক একই চিত্র আমরা দেখতে পাই ভারত কর্তৃক উৎপীড়িত, নির্যাতিত ও ধর্ষিত স্বাধীনতাকামী মুসলিম কাশ্মীরী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। এখানেও অধিকারবঞ্চিত উৎপীড়িত, নির্যাতিত, মজলুম কাশ্মীরী তরুণরা গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে স্বাধীনতার জন্য হাতে তুলে নিয়েছে অস্ত্র। শুরু করেছে সশস্ত্র সংগ্রাম। ঠিক একই চিত্র দেখতে পাই ফিলিপাইনের দক্ষিণে মিন্দানাও দ্বীপের মরো মুসলমানদের স্বাধীনতার আন্দোলনেও। বিশ্ববিবেক তাদের স্বাধীনতার ন্যায্য দাবীতে সব সময় রয়েছে নিশ্চুপ ও নির্বিকার। পক্ষান্তরে দেখা যায়, শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে ফিলিস্তিনী, কাশ্মীরী ও মরোদের চেয়ে কম নিপীড়িত হয়েও ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরে খ্রিস্টান বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পাশ্চাত্যসহ তাবৎ পশ্চিমা দুনিয়া এবং তাদের অনুগত জাতিসংঘ ও বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার সব ধরনের আনুকূল্য ও সমর্থন পেয়ে আজ স্বাধীনতা লাভে ধন্য হয়েছে। পক্ষান্তরে, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, মিন্দানাও, বসনিয়া, চেচনিয়া, কসোভোসহ বিশ্বের নানা জায়গায় মুসলিম স্বাধীনতাকামীরা শুধু মুসলিম হওয়ার কারণে খ্রিস্ট ও ইহুদী নিয়ন্ত্রিত মানবাধিকারের ধ্বজাধারী জাতিসংঘ এবং বিশ্বের আরো নানা তথাকথিত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাকামী সংস্থার দৃষ্টিতে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। তাদের দুঃখ-দুর্দশা আর ন্যায্য অধিকারের দাবীতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপসহ তাবৎ বিশ্ব সম্পূর্ণ উদাসীন। জাতিসংঘ নীরব। কখনো কখনো নিতান্ত নগ্নভাবে তারা সবাই শক্তির প্রতি আনুকূল্য দেখায়। এ যেন কবির ভাষায় "প্রতিকারবিহীন শক্তির অপরাধে, বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদে।"

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আমরা ক্ষমতাধর শক্তিগুলোর আচরণেও প্রভূতভাবে দেখতে পাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের দেশের কালো মানুষের (Afro-American) মানবাধিকার দমিয়ে রাখার জন্য নানা ধরনের নিগ্রহমূলক পুলিশী আচরণ, আইনী ফাঁকতাল আর আচরণিক উদাহরণ থেকে দেখতে পাই। ষাটের দশকের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় মদদে (সিআইএ'র পরিকল্পনায়) যুক্তরাষ্ট্রের কালো মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার অবিসংবাদিত নেতা মার্টিন লুথার কিং-এর নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখতে পাই। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আমরা দেখতে পাই নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের কালো গাত্র বর্ণের কারণে পুলিশী নির্যাতনের শিকার রূড়নী কিং-এর নৃশংস নির্যাতনের চিত্র থেকে। মার্কিন শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসবাদী দল 'কু-ক্লক্স-ক্ল্যান'- যারা যুক্তরাষ্ট্রের মাটি থেকে কালো মানুষদের বিতাড়নের জন্য নিরন্তর শ্বেত-সন্ত্রাস ও খ্রিস্টবাদী ক্রুসেড চালিয়ে যাচ্ছে- তাদের ব্যাপারেও মার্কিন শক্তি নীরব-নিশ্চুপ।

বর্তমানের এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার মোড়ল বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব সময় তাদের নিজেদের জনগণের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়ে থাকে তা কোন নতুন ঘটনা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হ্যারিয়েড বিচার স্টো প্রণীত জীবনবাদী উপন্যাস "Uncle Tome's Cabin"-এ মার্কিন অশ্বেতাঙ্গদের

www.pathagar.com

উপর শ্বেতাঙ্গদের নৃশংস নিপীড়নের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর অন্য আরেকজন প্রাগ্রসর মার্কিন লেখক Alex Helly'র অবিনাশী উপন্যাস Roots সিরিজের গ্রন্থসমূহ মার্কিন কালোদের উপর বাহিরাগত সাদা প্রভুদের নৃশংসতার চিত্র ফুটে উঠেছে জীবন্তভাবে। ফেনী মোর কুপার-এর অনন্য উপন্যাস "The Last of Mohicans"-এর ছত্রে ছত্রে আমেরিকায় আদিবাসী এবং ইউরোপ থেকে আগত শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী রেড- ইন্ডিয়ানদের জাতিতাত্ত্বিক ধ্বংসের (Ethnic Cleansings) করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, আজো যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের নির্ধারিত সংকীর্ণ উষর-ধসর নিষ্ফলা রিজার্ভগুলো সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে 'নিজ দেশে পরবাসী' হিসেবে ঐ আমেরিকান আদিবাসী দুঃখী রেড-ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠীগুলো ধুঁকে ধুঁকে মরছে। তারা আজ বিশ্বের বিলুপ্তপ্রায় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আরো অসংখ্য নজির আমরা দেখতে পাই বিশ্বের নানা জায়গায় ইউরোপীয় ও আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের নৃশংস চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ, আগ্রাসন, হত্যাকাণ্ড, গণহত্যা আর গোষ্ঠীগত ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে। বৃটিশরা তাদের উপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষে অসংখ্য গণহত্যা ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়েছে। বৃটিশ জেনারেল ডায়ার ১৯১৪ সালে ভারতের জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত জনসভায় মেশিনগানের গুলী চালিয়ে প্রায় ১৫ হাজার নিরীহ শিখ-বৃদ্ধ-যুবা-শিশু, নর-নারীকে হত্যা করে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় ও বিনা করণে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের ৬ এবং ৯ তারিখে যথাক্রমে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা ফাটিয়ে ২ মিনিটে প্রায় দেড় লক্ষ নিরীহ নর-নারী-মহিলা শিশু, যুবক-বৃদ্ধকে মুহূর্তের মধ্যে বাষ্পিভূত করে ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা ঘটায়। মার্কিনীদের এ হত্যাকাণ্ডও ছিল অত্যন্ত ঘৃণিত ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। হিরোশিমা ও নাগাসাকির ঐ হত্যাকাণ্ডের পরবর্তীতে চেইন রিঅ্যাকশন ও আফটার ইফেক্টের ফলে আরো প্রায় দশ লক্ষ মানুষ দু'বছরের মধ্যে মারা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মানবতাবিরোধী আর গণতন্ত্র হন্তারক অন্য নজির দেখতে পাই ১৯৫২ সালের কোরিয়া যুদ্ধের সময়। ঐ যুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ মার্কিনীরা তাদের খিস্টবাদী পাশ্চাত্য বন্ধুদের নিয়ে এশিয়ার দূরপ্রাচ্যের উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেয় এবং সেখানে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে প্রায় পাঁচ লক্ষ নিরীহ কোরিয়াবাসীকে হত্যা করে। পঞ্চাশের দশকে ইন্দো-চীনে ফরাসী উপনিবেশবাদীরা লক্ষ লক্ষ ভিয়েতনামী ও মংকেমার জনগোষ্ঠীকে হত্যা করে তাদের উপনিবেশকে টিকিয়ে রাখার জন্য। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (ইন্দোনেশিয়া) ওলোন্দাজ উপনিবেশবাদীরা প্রায় ৫ লক্ষ যাভানীজ মুসলিমকে হত্যা করে তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্য। ষাটের দশকের প্রথম দিক থেকে নিয়ে সত্তর দশকের প্রারম্ভ পর্যন্ত ভিয়েতনামে আগ্রাসী মার্কিনী হামলায় প্রায় বিশ লক্ষ ভিয়েতনামী নারী-পুরুষ-শিশু বৃদ্ধসহ মারা যায়। মার্কিনীরা তাদের আগ্রাসী মদমত্ততায় ভিয়েতনামের নানা স্থানে অসংখ্য গণহত্যা ঘটায়। ১৯৬৮ সালের ১৬ মার্চ ভিয়েতনামের মাইলাই-এর জঘন্য গণহত্যায় প্রায় ৫ শত ভিয়েতনামী নর-নারী-শিশু এবং বৃদ্ধের হত্যাকাণ্ডের খবর যখন সভ্য সমাজে প্রকাশিত হয় তখন সভ্যতার ধ্বজাধারী মার্কিনীদের আচরণে বিশ্বজগৎ হতবাক হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে শুধুমাত্র ১৯৬৮ সালে ভিয়েতনামে ৩ লক্ষ ভিয়েতনামী আমেরিকানদের হাতে মারা যায়। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯

www.pathagar.com

পর্যন্ত এই তিন বছরে দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রায় ১১ লক্ষ ১৬ হাজার ভিয়েতনামীকে হত্যা করা হয় এবং ২২ লক্ষ ৩২ হাজারকে করা হয় আহত। ভিয়েতনামে আগ্রাসী মার্কিনীরা তাদের বিমান বহর নিয়ে 'গালিচা বোমা বর্ষণ' (Carpet Bombing) চালায়। বিধ্বংসী ন্যাপাম বোমা দিয়ে খ্রীস্টান শ্বেতাঙ্গ মার্কিনী আগ্রাসী বাহিনী ভিয়েতনামে গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। জাপান, কোরিয়া আর ভিয়েতনামসহ বিশ্বের নানা জায়গায় মার্কিনীরা লক্ষ লক্ষ স্থানীয় মহিলা-বৃদ্ধ ও শিশুর উপর অমানবিক জঘন্য ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন চালায়। পাশ্চাত্য মার্কিনী সমাজবিদ (Richard Quinney) মার্কিনীদের ঐসব নৃশংস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে War Crime-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন তার প্রখ্যাত Criminology গ্রন্থে। (Richard Quinney, CRIMINOLOGY, Little Brown and Company, Boston 1979)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খ্রীষ্টবাদী সার্বিয়া এবং তাদের স্বধর্মীয় ইঙ্গ-ফরাসী-শান্তিবাহিনীর (?) নাম নিয়ে জাতিসংঘের সার্টিফিকেটে স্বাধীনতাকামী মুসলিম বসনিয়া এবং কসোবান মুসলিম নৃ-গোষ্ঠীর উপর সার্বীয়দের জাতিতাত্ত্বিক ধ্বংস সাধনে (Ethnic cleaning) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতা করে। উল্লেখ্য, বসনিয়া-হার্জেগোবিনা এবং কসোবোতে শ্বেতাঙ্গ খ্রীস্টান সার্বরা যে নৃশংস মানবাধিকার পরিপন্থী ধ্বংসযজ্ঞ, গণহত্যা, ধর্ষণ পরিচালনা করছে তাতেও জাতিসংঘসহ যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র শক্তিরা দেখেও না দেখার মত গা বাঁচিয়ে থাকে। পরিশেষে যখন হস্তক্ষেপ করল তখন মূলত সার্বীয়দের বাঁচিয়ে দিতে প্রায় বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত বসনিয়া ও কসোবানদের স্বার্থকে ক্ষুন্ন করে জাতিসংঘের সনদের দোহাই দিয়ে বসনিয়াকে 'বানরের পিঠা ভাগ'-এর মত খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয় এবং কসোবানকেও ন্যাটো বাহিনীর অধীনে মূলত প্রকারান্তরে সার্বীয়দের সাথে যুক্ত রাখতে সবকিছু সম্পন্ন করে।

অতি সম্প্রতি অজানা সন্ত্রাসীরা খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি কেন্দ্র পেন্টাগন আর অর্থনৈতিক শক্তির প্রতীক WTC-এর টুইনটাওয়ারে আঘাত হানে। এতে হাজার হাজার লোক নিহত হয় এবং ধ্বংস হয়ে যায় বিপুল স্থাপনা সম্পত্তি। কোন তথ্য প্রমাণ ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ-এর প্রতিকার বিধানে লাদেন, তালিবান ও নানা ইসলামী গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে ক্রুসেডের হুংকার দিয়ে আফগানিস্তানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। যারা নিহত হচ্ছে তারা সবাই মুসলমান। বুশের এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সারাবিশ্বের বিবেকবান মানুষকে একদিকে করেছে হতবাক বিস্মিত অন্যদিকে মার্কিনীদের এহেন কাণ্ডজ্ঞানহীন জিঘাংসাপরায়ণ পদক্ষেপ বিশ্ববাসীর কাছে নিতান্ত মানবাধিকার পরিপন্থী পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মার্কিনীদের এ রকম একতরফা তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ নতুন কিছু নয়। এই মার্কিনীরা দক্ষিণ সুদানে খ্রীস্টান বিচ্ছিন্নতাবাদী জন গ্যারঙ-এর দলকে অস্ত্রশক্তিসহ সার্বিক মদদ দিয়ে চলেছে। তারাই বিশ্ব বিবেকের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফীকে উৎখাতের নামে ত্রিপলীতে সন্ত্রাসী বিমান হামলা চালিয়ে প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফীর ৯ বছরের বোবা মেয়েটিকে হত্যা করে। মার্কিনীরাই সোমালিয়া, লিবিয়া, সুদান, ইরান, ইরাকসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসী সামরিক হামলা পরিচালনা চালিয়েছে। তারা মাদক পাচারের খোঁড়া অজুহাতে পানামার রাষ্ট্রনায়ক নারিয়াগাকে সামরিক অভিযান চালিয়ে তস্করের মত অপহরণ করে নিয়ে যায়। তারা বার

www.pathagar.com

বার কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রোর উপর হত্যার নিষ্ফল হামলা চালায়। তারা হাইতির প্রেসিডেন্ট এস্ত্রাদাকে সামরিক অভিযান চালিয়ে পদচ্যুত করে। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী যুক্তরাষ্ট্র পাশ্চাত্য ও তাদের মিত্রবর্গ দুর্বল জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্র বিশেষ করে মুসলিম জাতিসত্তার উপর অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক এবং মানবাধিকার পরিপন্থী আক্রমণ, আগ্রাসন, শাসন-ত্রাসন আর হুমকি-ধমকি পরিচালনা করে চলেছে। পাশ্চাত্যের জন্যই বর্তমানে আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যরা তাদের নিতান্ত অমানবিক 'Operation Crused Kabul'-এর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সবশেষে বলতে চাই, সবধরনের সন্ত্রাসই গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পরিপন্থী। ইসলাম কোন ধরনের সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয় না। পৃথিবীতে বর্তমানে যে সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলছে তার বেশীর ভাগই "মুসলমানদের সন্ত্রাসী তৎপরতা" হিসেবে পাশ্চাত্যের প্রচারমাধ্যম অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে প্রচার করে চলেছে। তথ্য-প্রমাণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী ইহুদীবাদী এবং খ্রীস্টবাদীদের নৃশংস জিঘাংসাভরা সন্ত্রাসী তৎপরতা সার্বিক বিবেচনায়ই বর্তমান বিশ্বের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের জন্য সবচেয়ে বেশী হুমকিস্বরূপ। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্যের প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত বর্তমানের মুসলিম সন্ত্রাসবাদিতার বেশীর ভাগই মূলত ইহুদী খ্রীস্টবাদী চক্রের চক্রান্তে সৃষ্ট বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য ফাঁদা সন্ত্রাসী নীল-নক্শার খণ্ডাংশ বৈ কিছুই নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এসব সন্ত্রাসী ঘটনার পেছনে উৎপীড়িত নিগৃহীত বিচারবঞ্চিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বা দলের হতাশার প্রকাশ হিসেবেও দু'একটি অপতৎপরতা সংঘটিত হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্রের বিচারে এবং মানবাধিকারের নিরিখে কোনক্রমেই কোন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করা যায় না। বিশ্ববাসীকে এসব সন্ত্রাসী অপতৎপরতা থেকে বাঁচাতে হলে প্রথমেই ইহুদীবাদী খ্রীস্টবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করার উদ্যোগ নিতে হবে। পক্ষপাতদুষ্ট প্রচারমাধ্যম আর মার্কিনী পাশ্চাত্য মহলের কাছে জিম্মী হয়ে যাওয়া জাতিসংঘসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থাগুলোকেও সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত হয়ে প্রকৃত সত্যনিষ্ঠার সাথে ন্যায়ের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিপক্ষে সোচ্চার হতে হবে। বিশ্বের সকল নির্যাতিত নিপীড়িত শোষিত বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মর্মবেদনার উৎসস্থলে আমাদের পৌঁছতে হবে এবং তাদের বঞ্চনার প্রতিকার সাধন ও বেদনার অপনোদনে বিশ্ববিবেককে সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই আমরা বিশ্বের মানবগোষ্ঠীকে সন্ত্রাসের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হব। ❑

ডিসেম্বর '০১
লেখক ঃ গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক।

www.pathagar.com

আফগানিস্তান বনাম ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাজ জোট এবং বাংলাদেশ

শেখ রোকনুজ্জামান রোকন

আফগানিস্তানে নিরীহ মানুষের ওপর হামলা অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। মাটির ঘর আর ছেঁড়া তাঁবুর ওপর আছড়ে পড়ছে টোমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রসহ নানা অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র। আক্রমণকারীদের নেতৃত্বে আছে বর্তমান বিশ্বের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার তল্পিবাহক 'গ্রেট' বৃটেন। অভিযোগ খুবই গুরুতর। গোটা বিশ্বের তাবৎ সন্ত্রাসের হোতা সৌদী ভিন্ন মতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেন আশ্রয় নিয়েছে আফগানিস্তানে। গত ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিনীদের সামরিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদার প্রতীক নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সদর দপ্তর পেন্টাগনে বিমান হামলার পেছনে লাদেনের হাত রয়েছে বলে সিআইএ এবং এফবিআই'র কাছে প্রমাণ রয়েছে। তবে তাদের প্রমাণপত্রের এই নথি খুবই 'স্পর্শকাতর' ও নাজুক। এটা মোটেই প্রকাশযোগ্য নয়। সুতরাং লাদেনকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রহসনে রাজি হয়নি আফগানিস্তানের তালেবান সরকার। তালেবানদের এই বেয়াদবির শাস্তি দিতে আফগানিস্তানের 'সন্ত্রাসী' নারী, শিশু ও বেসামরিক লোকদের লাশ বানাতে বদ্ধপরিকর। তাদের এ কাজের সাগরেদ জোগাড় করতেও কোন বেগ পেতে হয়নি। সাদা চামড়াদের 'সামরিক ক্লাব' ন্যাটো আর ঠুঁটো জগন্নাথ জাতিসংঘ আগে থেকেই 'আজ্ঞে' বলে হাত জোড় করেছিল। ইঙ্গ-মার্কিন হানাদারদের আতিথেয়তার সব আয়োজন নিয়ে সহযোগিতার ডালা সাজিয়ে কাতার দিয়ে আছে আফগানিস্তানের 'প্রতিবেশি' রাষ্ট্রগুলো। এই কাতারে সামিল হতে পেরে ধন্য হয়েছে বাংলাদেশ। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নানা ইস্যুতে আলোচনার টেবিলে বসার গরজ না দেখালেও এই ইস্যুতে বাংলাদেশের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ আর প্রশাসন নজিরবিহীন ঐকমত্য প্রদর্শন করেছে।

আফগানিস্তান ঃ দুধর্ষ জাতির এক নিঃসঙ্গ ভূখণ্ড

'দুই ধারে বন্ধুর দুর্গম দগ্ধ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সংকীর্ণ মরুপথ, বোঝাই করা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে; পাগড়ি পরা বণিক ও পথিকেরা কেহ-বা উটের পরে, কেহ-বা

www.pathagar.com

পদব্রজে; কাহারও হাতে বর্শা, কাহারও হাতে সেকেলে চক্‌মকি-ঠোকা বন্দুক' ঃ কাবুলীওয়ালা।

রবি ঠাকুর নিজে কখনও আফগানিস্তানে যান নি; কাবুলীওয়ালা রহমতের চোখ দিয়ে তিনি এভাবেই আফগানিস্তানকে দেখেছিলেন। আসলে আফগানিস্তানের নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি রুক্ষ জনপদ আর রোদে পোড়া তামাটে মানুষের ছবি। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, গৃহযুদ্ধ, প্রতিরোধ আর অস্ত্রের ঝনঝনানির মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে এই মরুময় আর গিরিসঙ্কুল অনুর্বর ভূখণ্ডের ইতিহাস। সংগ্রাম-সংঘাত আর আফগানিস্তান অনেকটা সমার্থক হয়ে উঠেছে বিশ্ববাসীর কাছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই দেশটি আরো ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে, বিশেষ করে তালেবানরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পর থেকে। এসব পরিচিতির কোনটিই আফগানিস্তানের সরকার বা জনগণের পক্ষে শ্রুতিমধুর নয়। মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থা, কথায় কথায় শিরোচ্ছেদ, মেয়েদেরকে আলো দেখতে না দেয়া আফগানিস্তান সম্পর্কে প্রভৃতি নানা ধারণা কাজ করে বিশ্ববাসীর মধ্যে। কিন্তু আফগানরা বরাবরই অতিথিপরায়ণ ও আত্মমর্যাদাশীল। তাদেরও শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি আছে। আফগানিস্তানের ইতিহাস শুধু সামন্ত শাসনেরই নয়, এখানে সুলতান মাহমুদের শাসনামলে এই ভূখণ্ড হয়ে উঠেছিল ইসলামি রেনেসাঁর সঙ্গমস্থল। সুলতান মাহমদুকে উৎসর্গ করে ফেরদৌসির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ শাহনামা রচিত হয়েছিল আফগানিস্তানের মাটিতেই। আফগানিস্তানের জাতীয় খেলা হচ্ছে 'বাজকাসি'। এটা অনেকটা পোলোর মতো। সেখানে প্রতিযোগীরা ঘোড়ায় চেপে একটি মৃত ছাগলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা চালায়। আফগানিস্তানের মর্যাদা সম্পর্কে বোঝা যায় লেনিনের কথায়। আফগানিস্তান সম্পর্কে আফগান দূতকে লেনিন বলেছিলেন - Yours country is the only independent Muslim state in the world, and fate sends the Afghan people the great historic role of uniting about itself all enslaved Muslim people and leading them on the road to freedom and independence.

খ্রীস্টপূর্বাব্দ ৩২৮ সালে আলেকজান্ডারের এই ভূখণ্ড আক্রমণের আগে আফগানিস্তানের তেমন সুনির্দিষ্টকোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। আফগানিস্তান সম্পর্কে সেখানে প্রচলিত নানা উপকথার মধ্যে যে বিষয়ে জোরালো ঐক্য পাওয়া যায় তা হলো প্রাচীনকালে পারস্যের রাজা জেরুজালেম থেকে একদল ইহুদিকে বন্দী করে পারস্যে নিয়ে যায়।

পরে পারস্যের অভ্যন্তরীণ গোলাযোগের সুযোগে ঐ বন্দীরা পালিয়ে পারস্যের পাশের ভূখণ্ড বর্তমান আফগানিস্তানে বসতি স্থাপন করে। এক্ষেত্রে বন্দীদের নেতৃত্ব দেন আফগানা নামে এক ব্যক্তি। পরবর্তী সময়ে তিনি এই নতুন গোত্রের সর্দার হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে আরো অনেক গোত্র ও গোষ্ঠী এই ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করে। এবং এক সময় প্রথম সর্দার আফগানার নামেই আফগানিস্তানের নামকরণ হয়। মধ্যযুগে এসে আফগানিস্তান বর্তমান আকার পেতে থাকে। ঐতিহাসিকদের মতে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১৫ শতাব্দীতে আর্যরা এ অঞ্চল আক্রমণ করে এবং আফগান পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করে সুন্দরী মহিলাদের বিয়ে করে এখানে বসতি স্থাপন করে। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতাব্দীর মাঝামাঝি বেকট্রিয়া নামক আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চল পারস্য সম্রাট দখল করে এবং

www.pathagar.com

খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৩৩০ অব্দ পর্যন্ত শাসন করে। খ্রিস্টপূর্ব ২৪৬ অব্দে বেকট্রিয়ার অধিবাসীরা পারস্য শাসনমুক্ত হয়ে প্রায় ১৫০ বছর স্বাধীন বেকট্রিয়া সাম্রাজ্য হিসেবে শাসিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে আফগানিস্তানে ইসলাম ধর্মের প্রচার শুরু হয় এবং অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এ ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

মূলত সপ্তম শতাব্দীতে আফগানিস্তানে ইসলামের আবির্ভাবের পর অষ্টম থেকে নবম শতকের মধ্যে আফগানিস্তানের সমাজ ব্যবস্থা তখনকার মাপকাঠিতে বেশ খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এ সময় ছিন্ন ছিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীগুলো ইসলাম গ্রহণের ফলে নিজেদের মধ্যে রক্তপাত আর হানাহানি বন্ধ করে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোতে যুক্ত হতে থাকে। এর আগে আফগানিস্তানে সম্মিলিত সমাজ বা শাসন ব্যবস্থা বলতে কিছু ছিল না। গোত্র সর্দার বা গোষ্ঠীপতিরা নিজ নিজ এলাকায় শাসন চালাতেন। তাদের খেয়ালখুশিমত একেক এলাকায় একেক আইন, বিচার ব্যবস্থা আর সামাজিকতা চালু ছিল। নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ব পারস্য এবং মধ্য এশিয়ার তুর্কীরা আফগানিস্তান শাসন করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিয়ে পারস্য সম্রাট ও মোঘল সম্রাটদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে। এই সময়ে আফগানিস্তানে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত শাসকের জন্ম হয়। এদের মধ্যে সুলতান মাহমুদ, শের শাহ্ সুরি'র নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা নিজ দেশের পাশাপাশি আফগানিস্তানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতেও অভিযান চালনা করেন। ভারতের মোঘল সম্রাট বাবরও ছিলেন আফগানিস্তানের অধিবাসী। তবে তাঁদের শাসনামলে গোটা আফগানিস্তানে একক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল এমনটা বলা যাবে না। খাজনা আদায় আর বিচার ব্যবস্থার কথা বাদ দিলে গোত্রপতিরা তখনও ছিল স্বাধীন। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তানে এভাবে সুলতানদের নাম মাত্র শাসন ব্যবস্থা টিকে থাকে।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে আফগানিস্তানের আধুনিক ইতিহাস শুরু হয়। আধুনিক আফগানিস্তানের সূচনা হয় ১৯১৮ সালে। এই সময় মস্কোর বলশেভিক সরকার ব্রেস্ট-লিটভস্ক চুক্তির মাধ্যমে আফগানিস্তানে তৎকালীন আমির হাবিবুল্লাহ খানের নেতৃত্বে আফগানিস্তানকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। আফগান রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রথম রাশিয়ার কাছ থেকে আসলেও হাবিবুল্লাহ ছিলেন বৃটিশদের প্রতি অনুগত। তিনি বৃটিশদের সরাসরি তত্ত্বাবধানের সুযোগ দিয়েছিলেন। ১৯১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি গুপ্ত ঘাতকের হাতে হাবিবুল্লাহ নিহত হলে তাঁর তৃতীয় পুত্র প্রগতিশীল চরিত্রের আমানুল্লাহ খান রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। এক্ষেত্রে রাশিয়া তাকে স্বীকৃতি দেয়। আমানুল্লাহ খান আমির হিসেবে মনোনীত হয়েই বৃটিশদের বিতাড়নের উদ্যোগ নেন। ফলে বৃটেন আফগানিস্তান আক্রমণ করে এবং ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে যুদ্ধে আফগানদের কাছে পরাজিত হয়ে এই জনপদ ত্যাগ করে এবং আফগানিস্তান স্বাধীন হয়। আমানুল্লাহ নানা উপজাতিতে বিভক্ত, রক্ষণশীল, গরিব জনগোষ্ঠীকে সামনে নিয়ে আফগানিস্তানের জীবনযাত্রাকে আধুনিক করার জন্য কিছু উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ নেন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা গোত্র অধিপতিদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হতে থাকে। তাদের শান্ত-নিস্তরঙ্গ জীবনে আধুনিক পশ্চিমা শিক্ষা ছিল অনেকটা উপদ্রবের মতো। এতে করে জনসাধারণের মধ্যে আমানুল্লাহ সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

এসময় উত্তর আফগানিস্তানের বিদ্রোহী উপজাতি নেতা বাচ্চা-ই-সাকো ১২ ডিসেম্বর, ১৯২৮ সালে ইংরেজদের সমর্থনে নিজেকে আফগানিস্তানের আমির বলে ঘোষণা করে এবং কাবুল দখলের উদ্যোগ নেয়। ১৯২৯ সালের ১ জানুয়ারী আমানুল্লাহ তাঁর ভাই এনায়েতুল্লাহ খানকে ক্ষমতায় বসিয়ে কান্দাহারে পালিয়ে যান। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয় না। ঐ বছরের ১৯ জানুয়ারী বাচ্চা কাবুল দখল করে। আবার আমানুল্লাহর বরখাস্তকৃত যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল নাদির খান ১৯২৯ সালের ৮ অক্টোবর কাবুল দখল করে বাচ্চাকে বন্দি করেন এবং নভেম্বরের ২ তারিখে তাঁকে হত্যা করে নিজেকে আফগানিস্তানের বাদশাহ হিসেবে ঘোষণা করেন। এ সময় তিনি নাদির শাহ নাম গ্রহণ করেন। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণ করে তিনি দু'দিক থেকে চাপের মুখে থাকেন। একদিকে আমানুল্লাহর সমর্থকরা অন্যদিকে বাচ্চা'র সেনারা আফগানিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় নাদির শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে থাকে। এই অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে ১৯৩৩ সালে তিনি আমানুল্লাহর একজন সমর্থকের হাতে নিহত হন।

নাদির শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জহির শাহ্ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। জহির শাহের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে আফগানিস্তানের শাসন ব্যবস্থার কিছুটা স্থিতি আছে। তিনি নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করে চাচা মুহম্মদ খানকে মন্ত্রীসভার দায়িত্ব প্রদান করেন। জহির শাহই আফগানিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় ক্ষমতায় থেকেছেন। ১৯৩৩ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৩ সাল তিনি একটানা আফগানিস্তান শাসন করেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি নানা কারণে বেশ কয়েকবার মন্ত্রীসভা পরিবর্তন করে তাঁর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্নায়ু যুদ্ধের সময় তিনি সোভিয়েত ও পশ্চিমাদের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে দেশ চালাতে থাকেন। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ১৮৯৩ সালের ব্রিটিশ সীমানা বিভাজন রেখা নিয়ে আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দেয়। তাদের দাবি অনুসারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের অংশ বিশেষ আফগানিস্তানের অংশ ছিলো। পাকিস্তান এ সময় যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ইতালি প্রভৃতি দেশের দিকে ঝুঁকে পড়লে আফগানিস্তান বাধ্য হয়ে সোভিয়েতদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো পোক্ত করার উদ্যোগ নেয়। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জহির শাহ্ গোত্র অধিপতি এবং ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। বাদশা'র পরিবার, সেনা কর্মকর্তা, উচ্চমধ্যবিত্ত, সিভিল সার্ভেন্ট, ব্যবসায়ীরাও ছিলেন ক্ষমতার অংশীদার। এই সময়ে প্রথাগত ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে ব্যাপক হারে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। গতানুগতিক জীবনধারা, সংস্কৃতি চর্চার ধরণ বদলে গিয়ে আফগানিস্তানে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটে। এদের চাপে ১৯৬৪ সালে বাদশাহ সংবিধান পাল্টাতে বাধ্য হন। তিনি গোত্রাধিপতি ও ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে গড়া আইন পরিষদ বা লয়া জিরগা ভেঙ্গে দিয়ে দুই কক্ষ বিশিষ্ট নতুন জিরগা (পার্লামেন্টের নাম) গঠন করেন।

সত্তরের দশকে আফগানিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনার অবতারণা হয়। আফগানিস্তানের হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতির ছেদ ঘটিয়ে মহম্মদ তারাকি, বাবরাক কারমাল, খেসমন্দ প্রমুখের নেতৃত্বে ১৯৬৫ সালে Peoples Democratic Party

www.pathagar.com

of Afganistan, PDPA নামে একটি মার্কসবাদী রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। এর পর থেকে আফগানিস্তানের ইতিহাসে খুব দ্রুত কয়েকটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হয়। ১৯৬৬ সালে এই পিডিপিএ'র পক্ষে এই দেশের সর্বপ্রথম পত্রিকা 'খাল্‌ক্‌' (ইংরেজীতে দি পিপ্‌ল) প্রকাশিত হয়। কিন্তু আফগানিস্তানের জনগণ তখন আরো পরিবর্তন চাইছিল। পিডিপিএর পর ছাত্রদের নেতৃত্বে আরো কয়েকটি ছোট খাট রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। সমাজে এই রাজনৈতিক সংগঠনগুলো দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। অপর দিকে অর্থনৈতিক অবস্থায় মন্দা দেখা দেওয়ার পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে অসন্তোষ দেয়া দেয়।

এই অবস্থায় এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে ১৯৭৩ সালে জহির শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন দাউদ খান। কিন্তু দাউদ বিভক্ত আফগান উপজাতিগুলোর আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হন। ফলে জহির শাহের আগেরকার অস্থিতিশীল অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এছাড়া তাঁর সময়ে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ক্রমশ তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকল্পে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে সোভিয়েত অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। দেশের ভেতরে ও বাইরে তিনি ক্রমাগত মিত্রহীন হতে থাকেন। এর ফলে ১৯৭৮ সালে সরাসরি সোভিয়েত মদদপুষ্ট অভ্যুত্থানে দাউদ ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। আফগান সমাজতন্ত্রীদের প্রতিনিধি হিসেবে ক্ষমতায় আসেন নূর মোহাম্মদ তারাকি। কিন্তু একই বছর তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন আরেক সমাজতন্ত্রী হাফিজুল্লাহ আমিন। এই সময়ে আফগানিস্তানের বিভিন্ন বিষয়ে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সোভিয়েত সাহায্যপুষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন হতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতন্ত্রের প্রতি আমিনের সমর্থনের কোন কমতি না থাকলেও মস্কোর প্রতি আরো আনুগত্য সৃষ্টির জন্য ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে আর একবার আফগানিস্তানের সমাজতান্ত্রিক শিবিরে পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটে। এবার ক্ষমতায় আসেন বাবরাক কারমাল।

বারবাক কারমালের সময় থেকে আফগানিস্তানের সমাজকাঠামোকে সমাজতান্ত্রিক আদলে ঢেলে সাজানো শুরু হয় কিন্তু এবার বিদ্রোহ করে আফগানিস্তানের রাজনীতিতে সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশ বিভিন্ন গোত্রপতিরা। রক্ষণশীল আফগান সমাজের এই প্রতিনিধিরা কমিউনিস্ট শাসনে প্রথাগত সংস্কৃতি, ইসলামি মূল্যবোধের প্রতি অবহেলা এবং নতুন এক সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা লক্ষ্য করে। এর ফলে বিভিন্ন গোত্র কমিউনিস্ট সরকারের ওপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রবেশ করে। পরের এক দশক ধরে আফগানরা জানবাজি রেখে লড়াই করে ওই বাহিনীর বিরুদ্ধে। ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের মুখে ১৯৮৯ সালে এক দশকের দখলদারিত্বের অবসান ঘটিয়ে সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান ছাড়ে। এই বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারী আফগানিস্তান থেকে ১,১৫,০০০ রুশ সৈনিকের শেষ দলটি প্রত্যাহার করা হয়।

বিদ্রোহীদের গেরিলা আক্রমণের মুখে গরবাচেভের ঘোষণা অনুযায়ী রুশ সৈন্যরা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে গেলেও কাবুলের ক্ষমতায় রয়ে যান মস্কোর মদদপুষ্ট আফগান

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট নাজিবুল্লাহ। রুশ সেনা প্রত্যাহারের ঠিক দুই মাস পর ১৫ এপ্রিল বিদ্রোহীরা কাবুল দখল করে এবং নাজিবুল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ক্ষমতার দৃশ্যপটে চলে আসেন বিদ্রোহী দুই দলের নেতা বুরহানউদ্দিন রব্বানী ও গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার। তাঁরা দুজনে যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু খুব অল্প দিনেই ক্ষমতা নিয়ে এই যুক্তফ্রন্টে বিরোধ দেখা দেয়। আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে দুই দলের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে এবং এক সময়ে তা গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করে। গৃহযুদ্ধের ভয়াবহতা টের পাওয়া যায় একটি পরিসংখ্যানে। ১৯৯২-৯৪ সালে গোষ্ঠীগত লড়াইয়ে শুধুমাত্র রাজধানী কাবুলেই বেসামরিক ৫০ হাজার লোক নিহত হয়। আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক অবকাঠামো আরও ভেঙে পড়ে। এর ওপর খরা, ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তোলে। দুই দলের এই বিভাজন প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পর্যন্ত গড়ায়। ১৯৯৪ সালের প্রথম দিন ১ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি বুরহানউদ্দিন রব্বানীকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার একটি সামরিক অভিযান চালান। এতে করে ক্ষমতাসীন আফগান সরকার দুই দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করে।

ক্ষমতাসীন এই দুই দল যখন নিজেদের মধ্যে বিবাদ আর যুদ্ধ নিয়ে লিপ্ত, তখন ১৯৯২ সালে কান্দাহার প্রদেশে উত্থান ঘটে তালেবান নামে এক নতুন গোষ্ঠীর। ১৯৯৪ সালের মধ্যে তারা আফগানিস্তানের দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে। এরপর আস্তে আস্তে কাবুলের দিকে এগুতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে তালেবান ঠেকাতে বিবদমান রাব্বানী ও হেকমতিয়ার ১৯৯৬ সালের জুন মাসে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে তালেবানদের বিরুদ্ধে কাবুলে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং তালেবানদের প্রতি শান্তি প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু তালেবানরা শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ঐ বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর কাবুল দখল করে জোট সরকারকে আফগানিস্তানের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়।

তালেবান গোষ্ঠী কাবুল দখল করার পরপরই সরকার গঠন করে এবং দেশে কঠোর শরীয়া আইন জারি করে। এরপর তালেবান কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তারা প্রতিবেশী পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোন দেশের স্বীকৃতি পেতে ব্যর্থ হয়। পরে অবশ্য সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত স্বীকৃতি দেয়।

৭ অক্টোবর ২০০১ ইঙ্গ-মার্কিন জোট আফগানিস্তানে তালেবানের ওপর বিমান হামলা শুরু হলে কাবুল থেকে বিতাড়িত বিরোধী জোট রাজধানীর দিকে এগোতে থাকে। ১ মাস ছয় দিন যুদ্ধ করার পর গত ১২ নভেম্বর ২০০১ জোট কাবুলের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলে রাতের আঁধারে তালেবানরা কাবুল ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং১৩ নভেম্বর সকালে বিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোটের বাহিনী কাবুলে প্রবেশ করে। এতে করে কার্যত আফগানিস্তানে ৫ বছরের তালেবান শাসনের অবসান ঘটে।

বর্তমান আফগানিস্তানের আয়তন ৬ লাখ ৪৭ হাজার ৫০০ কিলোমিটার। আফগানিস্তানের উত্তরে রয়েছে তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, পূর্ব ও দক্ষিণে চীন ও পাকিস্তান এবং পশ্চিমে ইরান। এই দেশের জনসংখ্যা ২ কোটি ৫৮ লাখ।

www.pathagar.com

এর মধ্যে পশতু ৩৮%, হাজারা ১৯% ও অন্যান্য ৬%। আফগানিস্তানে প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে রয়েছে ফারসি, পশতু, তুর্কি। এছাড়া আরও ৩০টি ভাষা প্রচলিত এবং অধিবাসীদের মধ্যে ৯৯ ভাগ মুসলমান (সুন্নি ৮৪%, শিয়া ১৫%), অন্যান্য ১%। তাদের জন্মহার ৩.৫৪%, গড় আয়ু ৪৭ বছর, মাথাপিছু আয় ২৩০ ডলার, শিক্ষার হার পুরুষ ৪৮%, নারী ১৫%।

আফগানিস্তান সম্পর্কে নানা নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত থাকলেও বিশ্বের নানা গোষ্ঠী, রাষ্ট্র ও পরাশক্তি এই ভূখণ্ডটিকে কব্জার করতে চেয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। এর পেছনে রয়েছে আফগানিস্তানের ভৌগলিক গুরুত্ব। আফগানিস্তান এমন এক জায়গায় অবস্থিত যেখান থেকে একই সাথে বেশ কয়েকটি জায়গায় খুব সহজেই নজর রাখা সম্ভব। আফগানিস্তানের উত্তরে রয়েছে রাশিয়া ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ, দক্ষিণে ভারতবর্ষ ও ভারত মহাসাগর, পূর্বে চীনসহ মঙ্গোলীয় রাষ্ট্রসমূহ এবং পশ্চিমে মধ্যপ্রাচ্য। আধুনিক কালে তো বটেই প্রাচীন সময়েও এই অঞ্চলগুলো ছিল একদিকে যেমন নানা সম্পদে পরিপূর্ণ অন্যদিকে বিচিত্র সভ্যতা আর সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। পরবর্তী সময়ে এর মধ্যে যুক্ত হয় স্পর্শকাতর তেল-গ্যাসের আন্তঃদেশীয় সরবরাহ লাইন এবং জাপান থেকে মালাক্কা পর্যন্ত আধিপত্য বজায় রাখার নেটওয়ার্ক। বৃটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন একবার বলেছিলেন- Turkistan, Afghanistan, Transcaspia Persia...are the pieces on the board upon which is being played out a game for the dominance of the world. সাম্প্রতিক-কালে আফগানিস্তানের গুরুত্বে সাথে যুক্ত হয়েছে আর একটা নতুন কৌশলগত দিক। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার দু'টি দেশ ভারত ও পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন হয়েছে। চীন ছাড়া আর অন্য কোন স্থান থেকে এই দু'টি নতুন পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশের ওপর নজর রাখার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হচ্ছে আফগানিস্তান।

ভৌগলিক গুরুত্বের কারণে বহিরাগতদের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়েছে আফগানিস্তান। সতের শতাব্দী পর্যন্ত আফগানিস্তানের আশেপাশের শক্তিগুলো আফগানিস্তানে হানা দিলেও এই শতকের পর থেকে আফগানিস্তানে ওপর নজর পড়ে এশিয়ার পরাশক্তিগুলোরও। কিন্তু আফগানিস্তানের ভৌগলিক কারণেরই হোক আর আফগানদের বীরত্বের কারণেই হোক গত দু'শ বছরের ইতিহাসে বাইরের শক্তিগুলো আফগানিস্তানকে আক্রমণ করে জিততে পারেনি। আফগানিস্তানের পাথুরে মাটিতেই তাদের কবর হয়েছে নয়তো নাস্তানাবুদ হয়ে কোন রকমে জানটা নিয়ে ফিরে গেছে। আফগানদের বিজয়ের এই ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়টা শুরু হয়েছে উনিশ শতকের গোড়ায় বৃটিশদের নিয়ে।

১৮৩৯ সালে ভারতে অবস্থানরত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাড়ে ১৬ হাজার সৈন্য নিয়ে জেনারেল এলফিনস্টোন আফগানিস্তানে অভিযান চালান। সৈন্য ছাড়াও তাঁর সঙ্গে ছিল ৩৮ হাজার অনুসারীর আরো একটি দল। এলফিনস্টোন কান্দাহার দখল করে ৩০ জুন কাবুলে প্রবেশ করে। আধুনিক যুগে সেবারই কোনো বিদেশী বাহিনী প্রথমবারের মতো কাবুলে প্রবেশ করে এবং আফগান আমির দোস্ত মোহাম্মদকে ভারতে নির্বাসন দেওয়া হয়। কিন্তু আফগানরা বরাবরই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রম হয়নি। ১৮৪০ সালের ১ নভেম্বর উত্তেজিত জনতা এক বাজারে আলেকজান্ডার

www.pathagar.com

বার্নস নামে এক ব্রিটিশ কর্মকর্তাকে কুপিয়ে হত্যা করে। মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করার পর মাথাটা একটি লাঠির আগায় গেঁথে রাখে। এ সময় তাঁর ৩০০ সদস্যের সেনা ইউনিট কোনোরকমে প্রাণ হাতে নিয়ে কাবুল পৌঁছে। এর কয়েকদিনের মধ্যে দোস্ত মোহাম্মদের ছেলের নেতৃত্বে ৩০ হাজার আফগান সৈন্যের একটি বাহিনী বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। তারা চার দিক থেকে কাবুলকে ঘিরে ফেলে। এলফিনস্টোনের জালালাবাদে ব্রিটিশ দুর্গে নিরাপদে ফিরে যাওয়ার বিনিময়ে দোস্ত মোহাম্মদকে মুক্তির প্রস্তাব দিলে আফগানরা তাতে রাজি হয়। তখন আফগানিস্তানে ছিল ভয়াবহ শীত অন্যদিকে তাদের রসদপত্রও ছিল কম। সুতরাং এলফিনস্টোন তাঁর সৈন্য ও অনুসারীদের রেখে পালিয়ে পালিয়ে যান এবং কয়েকজন ব্রিটিশ অফিসার ও মহিলাকে নিয়ে কোনোরকমে নিরাপদে জালালাবাদের ব্রিটিশ দুর্গে ফিরে আসেন। পরে আফগানরা ফেলে আসা সেনাদের সবাইকে হত্যা করে। ওই হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া একমাত্র সৈন্যটি কোনোরকমে একটি ঘোড়ায় চড়ে মুমূর্ষু অবস্থায় ফিরে যায়। ইতিহাসে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী আর কোথাও এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়নি।

পরে গ্যান্ডাম্যাক চুক্তির আওতায় আমীর ইয়াকুব খানকে কাবুল শাসন করতে দেওয়া হয়। ১৮৭৯ সালে কাবুল নগরীতে একটি ব্রিটিশ দূতাবাস খোলা হয়। খোলার কয়েক মাসের মধ্যেই আফগানরা দূতাবাস অবরোধ করে। দূতাবাসের লোকজন শেষ পর্যন্ত লড়াই করলেও কাবুলে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত মেজর পিয়ের লুইস নেপোলিয়নসহ যুদ্ধরত সব ব্রিটিশকে কচুকাটা করে কেটে আগুনে পুড়িয়ে মারে।

১৮৮০ সালে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ৩০ বোম্বে ইনফ্যান্ট্রি প্রধান মাইওয়ান্দ মরুভূমির প্রত্যন্ত এলাকায় হাজার হাজার 'গাজি' আফগান যোদ্ধা ব্রিটিশ কামান ও মিশরীয় সৈন্যদের ওপর আত্মঘাতী হামলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। মালালেহ নামের এক আফগান যুবতীও ওই আক্রমণে যোগ দেয়। পুরুষরা রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে যেতে পারে মনে করে ওই যুবতী তার বোরকা ছিঁড়ে পতাকা তৈরি করে এবং পদাতিক বাহিনীর সামনের সারির সৈন্যদের ওপর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাইফেলের গুলিতে তাকে প্রাণ দিতে হলেও ব্রিটিশরা এ যুদ্ধক্ষেত্রে ১ হাজার ৩২০ জন সৈন্যের মৃত্যু এবং ১ হাজার রাইফেল ও কমপক্ষে ৬০০ তলোয়ার হারিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের পর ১৯১৯ সালের মে মাসে বৃটেন আবারও আফগানিস্তানে হামলা চালায় এবং যথারীতি পরাজিত হয়। ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে রুশ সৈন্য ঢোকার আগে পর্যন্ত আর কোন বিদেশী সৈন্য আফগানিস্তানে ঢোকার সাহস পায়নি। আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট করুণ। এক দশক ধরে ১৫ লাখ লাশ, ১০ লাখ এবং ৬০ লাখ উদ্বাস্তুর বিনিময়েও আফগানরা রুশদের ১ লাখ ১৫ হাজার সেনার একজনকেও আফগানিস্তানের মাটিতে থাকতে দেয়নি।

সর্বশেষ গত ৭ অক্টোবর, ২০০১ মার্কিন ও বৃটিশ সামরিক জোট আফগানিস্তানে বিমান আক্রমণ করছে। তিন হাজার ফুট ওপর থেকে বিমান হামলা করলেও ১২ নভেম্বর তালেবান বিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোট কাবুল দখল করার আগে পর্যন্ত আফগান ভূমিতে নামার সাহস পায়নি।

www.pathagar.com

তালেবান ঃ প্রতিকূলতার মুখোমুখি যে যোদ্ধা

তালেবান বলতে ছাত্র বা শিক্ষানবিশের বহুবচন বোঝায়। আফগানিস্তানের রাজনীতিতে তালেবানদের উত্থান অনেকটা বিস্ময়কর। এরা মূলত এসেছে আফগানিস্তানে সোভিয়েত বিরোধী আক্রমণ এবং জাতিগত দাঙ্গার সময়ে উদ্বাস্তু আফগানদের মধ্যে থেকে যারা পাকিস্তান ও ইরান সীমান্তের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। বিশেষ করে সোভিয়েত সৈন্যরা আফগানিস্তান থকে চলে যাবার পর আফগানিস্তানে ভয়াবহ জাতিগত দাঙ্গা দেখা দিলে হাজার হাজার মানুষ দেশত্যাগ করে ঐ এলাকাগুলোতে যায়। মানবিক বিপর্যয়ের শিকার এই আফগান তরুণরা ধর্মীয় শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তালেবানদের শুরু হয় প্রথমে শিক্ষার্থীদের একটা আন্দোলন হিসেবে। এটা প্রথমে শুরু হয়েছিল '৯২ সালের দিকে আফগানিস্তানের দক্ষিণের একটা প্রদেশ কান্দাহারে। এসময় কয়েকজন যুদ্ধবাজ কমান্ডার দুজন কিশোরী মেয়েকে অপহরণ করে তাদের শ্লীলতাহানি ঘটায়। মেয়ে দুটোর মা-বাবা একটা স্কুলে গিয়ে শিক্ষকের কাছে সাহায্য চাইলে শিক্ষক তাঁর ৫৩ জন ছাত্রসমেত কেবল ১৬টি বন্দুক জোগাড় করে ওই কমান্ডারের ঘাঁটি আক্রমণ করেন। মেয়ে দুজনকে উদ্ধার করার পর তাঁরা ওই কমান্ডারকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেন। এই কাহিনী শুনে আরো বহু শিক্ষার্থী এই আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করে। একই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় দুর্নীতিবাজ, চাঁদাবাজ নেতাদের ফাঁসি দিয়ে তারা আফগানদের মধ্যে বেশ সুনাম অর্জন করে। '৯৩ সালের দিকে একজন আফগান যুদ্ধবাজ নেতা পাকিস্তানের ৩০টি ট্রাকের একটি সামরিক কনভয় আটক করলে তালেবানরা এগিয়ে এসে সেটা উদ্ধার করে দেয় এবং আফগান যুদ্ধবাজ নেতাকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়। এই ঘটনার পর থেকে তালেবানরা আন্তর্জাতিকভাবেও পরিচিতি লাভ করে।

১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে তালেবানরা কান্দাহার প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চল দখল করে এবং ১৯৯৬ সালের জুন মাসের মধ্যে আফগানিস্তানের দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে রাজধানী কাবুলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯৯৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তালেবানরা উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কাছ থেকে কাবুল দখল করে রুশপন্থী সাবেক আফগান প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা এবং আফগানিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র চালু করে। এই বছরের ১০ অক্টোবর উত্তরাঞ্চলীয় জোটের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আহমদ শাহ মাসুদ সমর্থিত অংশ জাতিগত উজবেক জেনারেল আবদুল রশিদ দোস্তামের তালেবান বিরোধী বাহিনী ও শিয়া মুসলিম গোষ্ঠী হেজবে ওয়াহাদাতের সঙ্গে একটি জোট গঠন করেন। এরপর ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তালেবান বিরোধী জোটের সাথে বিভিন্ন ফ্রন্টে লড়াই করে সর্বশেষ এই বছরের ৯ আগস্ট মাজার-ই-শরিফ দখল করে আফগানিস্তানের অধিকাংশ এলাকায় তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

আফগানরা যখন সোভিয়েত সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল তখন '৮৫-'৮৬ সালের দিকে ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে এসে জিহাদ শুরু করেন। যুদ্ধের পর তিনি কিছুদিন নিজ দেশ সৌদি আরব ও সুদানে থাকলেও ১৯৯১ সালের দিকে আবারো ফিরে আসেন আফগানিস্তানে। '৯৮ সালে ২০ আগস্ট কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ায় মার্কিন দূতাবাসের ওপর বোমা হামলার অভিযোগে ২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র লাদেনকে হত্যা করার জন্য আফগানিস্তানে ৭৫টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে এবং এতে করে ১৯ জন মাদ্রাসা

www.pathagar.com

ছাত্র মারা যায়। এসময় তালেবানদের সাথে ওসামা বিন লাদেনের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়। এই বছর পাকিস্তান সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবের কূটনৈতিক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে তালেবানরা আফগানিস্তানের ৯০ ভাগ এলাকার শাসন ক্ষমতা লাভ করে এবং তালেবান বিরোধী জোট আফগানিস্তানের উত্তর ভাগের দশ শতাংশ ভূমিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

তালেবানদের আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের পর জাতিসংঘ বিবদমান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে শান্তি আলোচনার প্রস্তাব দেয়। তালেবানরা তা প্রত্যাখান করলে ১৯৯৯ সালের ১৪ নভেম্বর জাতিসংঘের অবরোধ আরোপিত হয়। এর আওতায় বিমান চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এর প্রতিবাদে বিভিন্ন শহরে অবস্থিত জাতিসংঘ দফতরগুলোয় আক্রমণ করা হলেও ৩ নভেম্বর তালেবানরা জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় শান্তি আলোচনায় সম্মতি প্রদান করে। তবে তারা রোমে নির্বাসিত আফগানিস্তানের সাবেক বাদশা জহির শাহের একটি শান্তি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করলে ২০০০ সালের ২০ ডিসেম্বর আফগানিস্তানে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির ঘোষণা দেয়। এর পর থেকে আফগানিস্তানে অপুষ্টিতে হাজার হাজার শিশু মারা গেছে। যুদ্ধ ছাড়াও শুধুমাত্র খাবারের অভাবেই উদ্বাস্তু হয়েছে হাজার হাজার আফগান।

২০০১ সালেই তালেবানরা আবার গোটা বিশ্বের নিন্দা ও সমালোচনার শিকার হয়। এই বছরের ১ মার্চ তারা আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশে প্রাচীনকালে পাহাড় কেটে বানানো বিশাল বৌদ্ধ মূর্তির ধ্বংস সাধন করে। এতে করে তারা আন্তর্জাতিকভাবে ক্ষোভের সম্মুখিন হয়। মূর্তি ভাঙা প্রসঙ্গে তালেবানদের জবাব হচ্ছে ইউনেস্কো এবং সুইডেন ও নরওয়ের একটি এনজিও তাদের কাছে একটা প্রজেক্ট নিয়ে গিয়ে বলে যে, বৃষ্টিতে ক্ষয়ে যাওয়া বুদ্ধ মূর্তিগুলোকে মেরামত করা হবে। তখন তালেবান নেতারা তাদেরকে প্রজেক্টের টাকাগুলো মূর্তি মেরামতে খরচ না করে আফগানিস্তানের দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাচ্চাদের জীবন রক্ষার্থে খরচ করার জন্য অনুরোধ করে। এতে ইউনেস্কো এবং সেই এনজিওটি রাজি না হওয়ায় তালেবানরা খেপে বলে যদি আমাদের বাচ্চাদের বিষয়টি তোমরা গুরুত্ব না দাও তাহলে এই মূর্তিগুলো আমরা ভেঙ্গে দেব। গত ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের টুইন টাওয়ার্স ও পেন্টাগনে বিমান হামলায় অভিযুক্ত ওসামা বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করতে রাজি না হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এর প্রেক্ষিতে ২৫ সেপ্টেম্বর সৌদি আরব কাবুলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ২৬ সেপ্টেম্বর তাদের প্রধান মিত্র পাকিস্তানের সমর্থন হারায়। এই প্রেক্ষাপটে তালেবানরা যুক্তরাষ্ট্রের হামলা মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিতে থাকে। ৭ অক্টোবর মার্কিন জোটের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে সর্বপ্রথম সামরিক হামলা চালানো হয়। ৯ নভেম্বর উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সৈন্যরা মাজার-ই-শরিফ দখল করে নেয় এবং আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে তালেবান বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। ১৩ নভেম্বর ভোরের দিকে উত্তরাঞ্চলীয় জোট তালেবান সৈন্যদের কোনরকম প্রতিরোধ ছাড়াই কাবুলে প্রবেশ করলে আফগানিস্তানে তালেবানদের পাঁচ বছরের শাসনামলের অবসান ঘটে।

তালেবানদের নেতা কালো চুল, দাড়ি এবং মাথায় কালো পাগড়ি পরা লম্বা আকৃতির

www.pathagar.com

মোল্লা ওমরের বয়স প্রায় ৪২ বছর। আফগানিস্তানের কান্দাহারের একটি ছোট গ্রামে ১৯৫৯ সালে জন্মেছিলেন তিনি। প্রথমে মৌলবী মুহম্মদ নবি মুহম্মদীর নেতৃত্বে হরকত-এ-ইনকিলাব-উস-ইসলামি নামে একটা সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। আশির দশকে সোভিয়েত বিরোধী সাতটি আফগান ইসলামী গোষ্ঠীর মধ্যে এটি একটি ছিল। সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগ দেয়ায় তার পড়াশুনা আর হয়ে ওঠেনি। লড়াইয়ে জয়ের পর এই গোষ্ঠীগুলো নিজেদের মধ্যে লড়াই সংগ্রামে লিপ্ত হলে তিনি গ্রামে ফিরে এসে ধর্মীয় মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। এখানেই ওমরের নেতৃত্বে তালেবানি আন্দোলনের সূচনা ১৯৯২ সালে। ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর নেতৃত্বে তালেবানরা কান্দাহার দখল করে নেয়। পরে ১৯৯৬ সলে ওমরের নেতৃত্বেই তালেবানরা কাবুল দখল করে। ১৯৮০ সালে রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মোল্লা ওমর চারবার আহত হয়েছিলেন। গুলিতে একটি চোখ উড়ে যাওয়ার পর সেলাই করে বন্ধ করে দেয়া হয় চোখের কোটর। ওমর ইসলামী অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলেন। তিনি খুব কমই জনসম্মুখে আসেন। দক্ষিণাঞ্চলীয় নগরী কান্দাহারের বাসভবন ছেড়ে সচরাচর কোথাও যান না। শুধু ১৯৯৬ সালে একবার কাবুলের রেডিওয়ে আফগানরা প্রথমবারের মতো তাঁর কণ্ঠ শুনেছে।

অপারেশন ইনফিনিট জাস্টিস ঃ সন্ত্রাসের দিকে যাত্রা

What is good for General Motors is good for America and what is good for America is good for the world :

একটি জনপ্রিয় আমেরিকান প্রবাদ।

সত্যি বলতে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর বিশ্ব ব্যবস্থাটা একেবারে অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। বিগত দু'টি বিশ্বযুদ্ধের সময় বলতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গায়ে সামান্য আঁচড়টুকুও লাগেনি। অথচ দু'টি বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এই রাষ্ট্রটিই যে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা তা প্রমাণ করে। আমেরিকার সাথে বিশ্ববাসীও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সরকার নিজের দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য 'বন্ধু রাষ্ট্রের'ও নিরাপত্তা প্রদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করছিল। একটি হিসাবে দেখা যায়, সারা বিশ্বে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে সার্বক্ষণিকভাবে আড়াই লাখেরও বেশি মার্কিন সৈন্য অবস্থান করে। এছাড়া আন্তর্জাতিক জলসীমায় প্রহরারত থাকে প্রায় ৫০ হাজার নৌ-সেনা। মার্কিন সামরিক সদর দপ্তর পেন্টাগনের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'বন্ধু রাষ্ট্র'গুলোর নিরাপত্তা দেবার পাশাপাশি রাষ্ট্রগুলোর জাতীয়-আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণীর ক্ষেত্রে 'পরামর্শে'র নামে খবরদারিও চালাতে থাকে খুশিমত।

সুতরাং ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির প্রতীক পেন্টাগন ও নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার্সে বিমান হামলার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে যতটা ক্ষোভ বা নিন্দা ছিল বিস্ময়ের পরিমাণও তার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। বিস্মিত হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ নিজেও। তিনি তখন ফ্লোরিডার সারাসোটায় বাচ্চাদের একটা স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়ে সেখানে ক্লাশ নিচ্ছিলেন। এ সময় তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী তাকে প্রথমে খবরটি দেন। খবরটা শুনে বুশ প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি যে, আমেরিকায়

www.pathagar.com

তাও আবার খোদ পেন্টাগনে হামলা হতে পারে। পরে তিনি দ্রুত ক্লাশ শেষ করেন। এরপর প্রায় একঘন্টা তিনি সুরক্ষিত এয়ার ফোর্স ওয়ান বিমানে করে ভূমি থেকে চল্লিশ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থান করেন। এ সময় প্রেসিডেন্টের বিশেষ নিরাপত্তা কর্মকর্তারা ছাড়া আর কেউ তাঁর খোঁজ জানতেন না। এক ঘন্টা পর তিনি লুসিয়ানায় যান। এর পর তিনি পেন্টাগন এবং টুইন টাওয়ার পরিদর্শন করেন। হামলার পরপরই জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, সন্ত্রাসী হামলা বড় বড় বিল্ডিংগুলোকে কাঁপিয়ে তুললেও তা যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিকে স্পর্শ করতে পারেনি। এ হামলা ভবনের ইস্পাতগুলোকে চূর্ণ বিচূর্ণ করেছে কিন্তু আমেরিকানদের দৃঢ় সংকল্পে এতটুকুও চিড় ধরাতে পারেনি। বিশ্বের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা থাকার কারণেই দেশটাতে হামলার জন্য টার্গেট করা হয়েছে। হামলাকারীদের আশ্রয়দাতাদের যুক্তরাষ্ট্র কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র আগেও সোচ্চার ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

১৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় শোক ও প্রার্থনা দিবস পালন করা হয়। একদিন ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল ক্যাথেড্রালে মূল অনুষ্ঠানে বর্তমান ও সাবেক প্রেসিডেন্টরা অংশ নেন। সারা দেশের অন্যান্য গীর্জা ও ধর্মীয় উপাসনালয়েও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। এর আগে হাজার হাজার উদ্ধার কর্মী উদ্ধার কাজে অংশ নেয়। হামলার প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর পরই ফুঁসে ওঠে আমেরিকা। হামলার সাথে জড়িতদের সন্ধানে ৭ হাজারেরও বেশি এফবিআই এজেন্ট আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বৃহত্তম তল্লাশিতে অংশ নেয়। ১৩ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনের এক সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কলিন পাওয়েল বলেন, সৌদি ভিন্ন মতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেনই মঙ্গলবারের সন্ত্রাসী হামলার প্রধান সন্দেহভাজন।

১৪ সেপ্টেম্বর মার্কিন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বুশকে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে। একই সময়ে হামলার শিকার লোকজনদের সাহায্য প্রদান এবং সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করার জন্য ৪ হাজার ডলারের একটি মঞ্জুরি প্রস্তাবও কংগ্রেসে পাশ হয়। প্রস্তাব দু'টি প্রতিনিধি পরিষদে ৪২০-১ ভোটে এবং সিনেটে ৬০-০ ভোটে পাশ হয়। ১৯৪১ সালে পার্ল হার্বারে জাপানী বাহিনীর আক্রমণের পর এই প্রথম মার্কিন কংগ্রেসে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কংগ্রেসের সমর্থন পাবার পর বুশ লাদেনের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। প্রথমে তিনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এক আন্তর্জাতিক কোয়ালিশনের ডাক দেন। তিনি আমেরিকান সৈন্যদেরকে 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধে অংশ নেবার আহ্বান জানান। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পর আবার যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ হাজার রিজার্ভ সৈন্যকে কাজে নামানো হয়। যুক্তরাষ্ট্র ১৫ সেপ্টেম্বর তালেবান সরকারকে ১৬ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনদিনের আলটিমেটাম দিয়ে লাদেনকে হস্তান্তর করার আহ্বান জানায়। অন্যথায় আফগানিস্তান আক্রমণ করার হুমকি দেয়। জবাবে তালেবান জানায় যথাযথ প্রমাণ ছাড়া তারা লাদেনকে হস্তান্তর করবে না। প্রমাণ পেলে লাদেনকে হস্তান্তরের ব্যাপারে তারা তিনটি শর্ত জুড়ে দেয়। লাদেনকে তৃতীয় কোন নিরপেক্ষ ইসলামী দেশের হাতে তুলে দেয়া হবে, তার আগে আফগানিস্তানের ওপর জাতিসংঘ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে

www.pathagar.com

স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তালেবান বিরোধী জোটকে সাহায্য বন্ধ করতে হবে। উচ্চ পর্যায়ের একটি পাকিস্তানী প্রতিনিধি দল আফগানিস্তানে গেলে তালেবান কর্তৃপক্ষ তাদের এই কথা জানায়। তাদের এই প্রস্তাবের খুঁটিনাটি বিষয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনার প্রস্তাব করে। প্রেসিডেন্ট বুশ তালেবানদের আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ১৮ সেপ্টেম্বরেই যুক্তরাষ্ট্রকে গোয়েন্দা সহায়তা দেবার সিদ্ধান্ত জানিয়ে রেখেছিল। সুতরাং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধের সমর্থনে প্রেসিডেন্ট বুশ ফরাসী, ইন্দোনেশীয়, ব্রিটিশ রাষ্ট্রপ্রধানসহ বিশ্ব নেতাদের সাথে আলোচনা করতে থাকেন। ন্যাটো মহাসচিব জর্জ রবার্টসন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে হামলা জোটভুক্ত ১৯টি দেশের ওপরই হামলা বলে বিবেচনা করা হবে। কিন্তু উপসাগরীয় যুদ্ধের মত সবাই আফগানিস্তানের ওপর হামলায় অংশ না নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হামলাকে সমর্থন জানায়। ব্যতিক্রম শুধু ব্রিটেন, তারা যুক্তরাষ্ট্রের সহযাত্রী হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর জর্জ বুশ ওয়াশিংটনে হামলার জড়িতদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য কংগ্রেসের একটি প্রস্তাবে সই করেন।

যুক্তরাষ্ট্র এই অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন ইনফিনিট জাস্টিস- অনন্ত ন্যায়পরায়ণতা। এর আগে মার্কিন কর্তৃপক্ষ জানায় এই যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী, ভিন্ন কৌশলে এবং চেনা ছকের বাইরে। এই যুদ্ধের নাম Gray War বা ধূসর যুদ্ধ। এই যুদ্ধে প্রতিপক্ষের কোন নির্ধারিত ফ্রন্ট নেই, কোন নিয়মিত সেনাবাহিনী নেই, নেই কোন নিয়ম-কানুন। এ যুদ্ধে যে কোন সময় যে কোন স্থানে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হতে পারে। বেসামরিক-সামরিক সব ধরনের লক্ষ্যবস্তুতেই আঘাত হানা হতে পারে। এই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যতদিন পর্যন্ত সারা বিশ্বের সন্ত্রাস নির্মূল না হবে ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হবে না। ইনফিনিট, অনন্ত। যুদ্ধের চরিত্র সম্পর্কে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড এইচ রামসফেল্ড বলেন, এই যুদ্ধ হবে গতানুগতিক ও দীর্ঘস্থায়ী। এই যুদ্ধে বোমারু বিমান, ট্যাংক ও যুদ্ধ জাহাজ ব্যবহারের চেয়ে অপ্রচলিত পদ্ধতির ওপর বেশি নির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজন হবে। প্রয়োজনে মার্কিন স্পেশাল কমান্ডো নামানো হতে পারে। মার্কিন সেনাবাহিনীতে সক্রিয় ২৯ হাজার স্পেশাল কমান্ডো মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, অন্তর্ঘাত, অপহরণ, ধারাবাহিকতাহীন লক্ষ্যবস্তুতে ক্ষুদ্র আকারের আক্রমণাত্মক হামলা চালানো, স্থানীয় লোকদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রে সজ্জিত করতে পারঙ্গম। এই যুদ্ধ হবে ম্যারাথন। এটা সহজ কোনো বিষয় নয়। আমাদের সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে এবং ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমর্থনের প্রয়োজন হবে।

অপারেশন ইনফিনিট জাস্টিসের শুরু হয় দৃশ্যত ১৮ তারিখে প্রেসিডেন্ট বুশের অভিযানের নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করার পর। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি ও দফতরগুলো আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল দীর্ঘমেয়াদী অপারেশনের জন্য। ২০ তারিখ মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রামসফেল্ড অত্যাধুনিক এওয়াক গোয়েন্দা বিমান, এফ-১৫, এফ-১৬ জঙ্গি বিমান, বি-১, বি-৫২ বোমারু বিমানসহ শতাধিক যুদ্ধ বিমানকে উপসাগরে যাওয়া নির্দেশ দেন। এগুলো আফগানিস্তানের আশপাশে অবস্থিত কুয়েত, ওমান, বাহরাইনসহ বিভিন্ন মার্কিন ঘাঁটিতে অবস্থান নেবে। আগে থেকে এ অঞ্চলে ২শ'রও বেশি মার্কিন যুদ্ধবিমান ও বিমানবাহী জাহাজ এন্টারপ্রাইজ ও কার্ল ভিনসনের অবস্থান ছিল।

www.pathagar.com

২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আরব উপসাগর অভিমুখে আরো দু'টি বিমানবাহী জাহাজের নেতৃত্বে মার্কিন ব্যাটল গ্রুপ এগোতে থাকে। এর একটি হচ্ছে ভার্জিনিয়ার নরফোল্ক নৌ-ঘাঁটি থেকে রওনা হওয়া বিমানবাহী জাহাজ থিওডোর রুজভেল্ট-এর নেতৃত্বে ১১টি যুদ্ধজাহাজের একটি বহর। এতে প্রায় ২১শ' মেরিন সৈন্য ও ১৫ হাজার নাবিক থাকে। থিওডোর রুজভেল্ট-এর সঙ্গে টোমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়তে সক্ষম দু'টি এটাক সাবমেরিনও পাঠানো হয়। এছাড়া করাচির কাছে আরব উপসাগরে প্রায় ২৫টি মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসি যুদ্ধজাহাজ অবস্থান নেয়। ৭ম নৌ-বহরের বিমানবাহী জাহাজ কিটি হকও তার ঘাঁটি জাপানের ইয়োকোসুকো থেকে ভারত মহাসাগরের দিকে রওনা হয়। এরও আগে ঐ ঘাঁটি থেকে তিনটি যুদ্ধজাহাজ অজ্ঞাত গন্তব্যে রওনা হয়ে যায়। আরেকটি বিমানবাহী জাহাজ জন এফ কেনেডীও আফগানিস্তানের দিকে যাত্রা করে। মার্কিন সেনা ইউনিটগুলোকেও সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযানে যে কোন সময় যে কোন স্থানে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত অবস্থায় থাকার নির্দেশ দেয়া হয়।

২২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উপসাগরীয় এলাকায় সাড়ে ৩শ' যুদ্ধবিমানের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য বি-১, বি-৫২ বোমারু বিমানসহ আরো প্রায় ৪০টি যুদ্ধবিমান ছাড়াও ৪০টি ইউ-২ গোয়েন্দা ও আরসি-১৩৫ পর্যবেক্ষণ বিমান পাঠায় পেন্টাগন। এদের সাথে যোগ দিতে ৩টি ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ সুয়েজ খাল অতিক্রম করে ওমানে পৌঁছে। সেখানে তারা 'অরারেশন সুইফট সেডি' নামে সামরিক মহড়ায় অংশ নেবে। যাতে করে এই ত্বরিৎ তরবারি অভিযান আফগানদের বিরুদ্ধে ত্বরিৎ গতিতে কাজে লাগানো যায়। এর আগে ১৯ সেপ্টেম্বর ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক জরুরি শীর্ষ বৈঠকে নেতারা ঘোষণা করেন মার্কিন আক্রমণ বৈধ। ব্রাসেলসে বৈঠকশেষে এক যৌথ বিবৃতিতে তারা বলেন, ১৫টি সদস্য দেশের প্রত্যেকে যে কোনো অভিযানে অংশ নেবে।

১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠতম মিত্র সৌদি আরব আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনায় তার প্রিন্স সুলতান ঘাঁটি ব্যবহার করার অনুমতি দেয়নি। তবে ২৫ সেপ্টেম্বর এই রাষ্ট্রটি আফগানিস্তানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। আরেক মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্ক, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে সন্ত্রাসী হামলার জবাব দিতে তার আকাশসীমা ও বিমানঘাঁটিগুলো মার্কিন পরিবহন বিমানকে ব্যবহার করার অনুমতি এবং তালেবানবিরোধী নর্দার্ন এলায়েন্সকে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির ঘোষণা দেয়। আফগানিস্তানের অপর দু'টি মুসলিম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে ২২ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুদ্ধবিমান উজবেকিস্তানের একটি বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করে এবং ওয়াশিংটন তাজিক ভূখণ্ড ব্যবহারের সুবিধা না চাইলেও তাজিকিস্তান সম্ভাব্য আক্রমণে মার্কিন বাহিনীকে তার আকাশসীমা ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করে। মধ্য এশিয়ায় মার্কিন সামরিক স্থাপনা ব্যবহারে রাশিয়া কোন আপত্তি করবে না বলে জানায়।

৬ অক্টোবর পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে 'পৃথিবী থেকে সন্ত্রাস নির্মূল ও গণতন্ত্র বিকাশে'র জন্য বিশ্ব কোয়ালিশন প্রস্তুত হয়। এই সময়ের মধ্যে আফগানিস্তানের আশেপাশে মার্কিন শক্তি বৃদ্ধি করা ছাড়াও জাপান সরকার যুক্তরাষ্ট্রকে এক কোটি ডলার সাহায্য প্রদানের ঘোষণা দেয় এবং মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে ৩৪ হাজার ৪শ কোটি ডলারের নতুন সামরিক বিল অনুমোদন করা হয়।

www.pathagar.com

এরপর শুরু হয় অপারেশন ইনফিনিট জাস্টিস। টুইন টাওয়ার ট্র্যাজেডির ২৭ দিন পর ৭ অক্টোবর রোববার বাংলাদেশ সময় রাত ১০টা ২৫ মিনিটে মার্কিন ও ব্রিটিশ বিমান এবং যুদ্ধজাহাজ থেকে আফগানিস্তানে প্রচণ্ড হামলা শুরু হয়। মার্কিন ও বৃটিশ বিমান বহর কাবুল, কান্দাহার, মাজার-ই-শরিফ ও পূর্বাঞ্চলীয় জালালাবাদ শহরে বোমাবর্ষণ করে। এতে তালেবান সদর দফতরের শহর কান্দাহারের বিমানবন্দরসহ অধিকাংশ ভবন বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ঘোষণা করেন, আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করছি। হামলায় বি-৫২ উপগ্রহ নিয়ন্ত্রিত বি-১ বোমারু বিমান থেকে ৫টি ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এছাড়া ৫০টি টোমাহক ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়। এর জন্য ১৫টি বোমারু বিমান ও ২৫টি এফ-১৬ ও এফ-১৫ ঈগল যুদ্ধবিমান ব্যবহার করা হয়। এর পর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত হামলা চলতে থাকে আফগানিস্তানে। রাজধানী কাবুলসহ প্রধান প্রধান শহরগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। আফগান ইসলামিক প্রেস (এআইপি)-এর তথ্যমতে ৭ অক্টোবর আক্রমণ শুরুর পর থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত ৬৩৩ জন বেসামরিক লোক নিহত হয় এবং তালেবানরা ৪টি মার্কিন বিমান গুলি করে ভূপাতিত করে। নিহত আফগানদের মধ্যে কান্দাহারে ২০৪ জন, নাগরহার প্রদেশে ১৬৩ জন, কাবুলে ৯২, হেরাতে ৭৯, বাখ প্রদেশে ৩২, পারওয়াস প্রদেশে ২২, উরুজগানে ১৮, কাপিসায় ৯, কান্দুজে ৫, হেলম্যান্দে ৫, পাতকিয়ায় ৫ ও হেরাতে ২ জন। পরবর্তী সময়ে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত নিহত হয় আরো কয়েকশত নারী, শিশু ও নিরীহ আফগান জনগণ। নিহতদের মধ্যে ১১ অক্টোবর জালালাবাদে একটি মসজিদে মিসাইল নিক্ষেপে ১৫ জন মুসল্লি নিহত হয় এবং মসজিদটিও ধ্বংস হয়। ২১ অক্টোবর শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় দক্ষিণাঞ্চলীয় তিরিনকোট শহরের কাছে একটি শরণার্থী বহরের ওপর মার্কিন বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত বোমায় ৯ শিশুসহ অন্তত ২০ জন শরণার্থী নিহত হয়। ২২ অক্টোবর দক্ষিণাঞ্চলের উরুজগান প্রদেশের দু'টি স্বাস্থ্য ক্লিনিকে মার্কিন বিমান হামলা চালিয়ে ১৮ জন বেসামরিক লোককে নিহত ও ২৫ থেকে ৩৫ জন আহত করে। ২৩ অক্টোবর পশ্চিমাঞ্চলীয় হেরাত শহরে একটি মসজিদে বোমা হামলায় নিহত হয় ৯৩ জন। এই লোকজনদের মারতে পাহাড় ধ্বংস করার জন্য বিশেষভাবে তৈরী লেজার নিয়ন্ত্রিত ৫০০০ পাউন্ড ওজনের 'জিবিইউ-২৮ বাংকার বোমা, সামরিক সরঞ্জাম ও মানব-বিধ্বংসী মারাত্মক ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে শুরু হওয়া এই অপারেশন আফগানিস্তানের এই মানুষগুলোকে মেরেই শুধু শেষ হবে এমনি নয় পৃথিবীর যে প্রান্তেই 'সন্ত্রাসী' আছে সেখানেই যুক্তরাষ্ট্রের এই 'জাস্টিস' চলবে এবং সেখানে আরো 'সন্ত্রাসী' নারী শিশু ও অর্ধাহারী মানুষকে মেরে পরাশক্তিগুলো তাদের শৌর্য ঘোষণা করবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন। ৬ নভেম্বর, ২০০১ মঙ্গলবার ওয়াশিংটন সফররত ফরাসি প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাকের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শেষে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার কোন সুযোগ নেই। কোয়ালিশনের ভেতরের ও বাইরের দেশগুলোর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এ যুদ্ধে হয় আমাদের সঙ্গে আসুন অথবা বিরুদ্ধে যান। কোয়ালিশনের শরিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, কেবল কথায় সহানুভূতি প্রকাশ করলে চলবে না, সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।'

www.pathagar.com

(রাষ্ট্র) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন;

২৫(১)(ক) অনুচ্ছেদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাইবে না কিংবা প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবেন না।

৬৩(১) অনুচ্ছেদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী নিধনে পাকিস্তানি হানাদার যতগুলো মারণাস্ত্র ব্যবহার করেছিল, তার অধিকাংশই ছিল আমেরিকান। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থামাতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব আসা, বঙ্গোপসাগরের দিকে সপ্তম নৌ-বহর চালানো প্রভৃতি ছিল সে সময় বাংলাদেশের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার খণ্ডচিত্র। স্বাধীনতা পাবার পর মার্কিনীরা বাংলাদেশের সাহায্যার্থে 'খয়রাত' নিয়ে এগিয়ে আসলেও তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ঠাট্টা করে বাংলাদেশকে 'বটমলেস বাসকেট' বা তলাবিহীন ঝুড়ি বলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে জেনারেল জিয়া এবং এরশাদের সামরিক শাসনের সময় থেকে বাংলাদেশে গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা দেখা দিলে আমেরিকার কাছে বাংলাদেশ একটা নতুন মাত্রা পায়। তলাবিহীন ঝুড়ি বাংলাদেশ আমেরিকার কাছে বেশ মূল্যবান হয়ে পড়ে। আগের খাতক-মহাজন সম্পর্কের বদলে তারা বাংলাদেশকে 'বন্ধু রাষ্ট্র' আখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রীয় নানা বিষয়ে মূল্যবান 'পরামর্শ' দিতে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে তাদের এই পরামর্শের পরিমাণ, পরিসর ও বাধ্যবাধকতা আরো বেড়ে যাচ্ছিল। রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সদর-অন্দর সর্বত্র অবারিত থাকে এই রাষ্ট্রদূতদের জন্য। বর্তমান মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরি এন পিটার্স বাংলাদেশে নিযুক্ত হবার পর তাঁর ভূমিকা ছিল অনেকটা 'ভাইসরয়ে'র মতো। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নতুন সরকার একশত দিন কী কাজ করবে তা ঠিক করে দেবার সুকঠিন দায়িত্ব তিনি নিতান্ত দয়া করে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য তাতে বাংলাদেশের মাটির নিচে মজুত তেল-গ্যাস উত্তোলন করে বিদেশে রপ্তানি করার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ছিল সব থেকে আগে।

মুখে বন্ধুরাষ্ট্র বললেও বাংলাদেশের সাথে মার্কিনীদের প্রভু-ভৃত্যের আচরণে কোন পরিবর্তন আসে নি। সাধারণ নাগরিকরা তো বটেই, বাংলাদেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকেও তারা ঠিক মানুষ বলে মনে করে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমেরিকানদের এই আচরণ সম্পর্কে কম-বেশি সবারই নানা ধরনের অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের সেসব স্মৃতি জাগরিত করার জন্য এখানে কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বাধীনতার পর থেকে এত বছর যত রাষ্ট্রপ্রধান বাংলাদেশে এসেছেন তাঁরা সবাই আমাদের জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আমাদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তানের সরকার প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো, জেনারেল জিয়াউল হক এবং নওয়াজ শরীফও সেখানে যেতে কোন দ্বিধা করেন নি। কিন্তু 'তালেবান এবং মৌলবাদী' অজুহাত তুলে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন বাংলাদেশ সফরে এসে আমাদের জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাননি। আমাদের তিরিশ লাখ

www.pathagar.com

শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর এই অজুহাত বাংলাদেশের মানুষকে সেদিন আঘাত করলেও তৎকালীন মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দলের সরকার মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পেয়ে সপারিষদ বাগবাগ হয়েছিলেন। আমেরিকার এই প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন মনে করেননি। কবি শামসুর রাহমান আজ থেকে দুই বছর আগে মার্কিন ভিসার জন্য ঢাকাস্থ দূতাবাসে গিয়েছিলেন। তাঁর এই এপয়েনমেন্টটি করে দিয়েছিল বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মার্কিন ভিসা অফিসারের দেয়া সময় সকাল ১০টায় হলেও ৭০ বছর বয়সী এই মানুষটিকে প্রায় চার ঘন্টা বসিয়ে রেখেছিল। সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু হেনা দু'তিন বছর আগে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে নিউইয়র্ক যাচ্ছিলেন, প্রবল তুষারপাতের কারণে সেই ফ্লাইটটি নিউইয়র্কে নামতে পারেনি বলে এটিকে ওয়াশিংটনে পাঠানো হয়। ওয়াশিংটনে বিমানটি দশ-বারো ঘন্টা রানওয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু হেনাসহ কোন যাত্রীকে বিমান থেকে নামতে দেয়া হয়নি। মৌলবীবাজারে মার্কিন কোম্পানী অক্সিডেন্টাল আমাদের মাগুরছড়া ভস্ম করে দিয়ে আবার তারাই আমাদের কাছে ক্ষতিপূরণ চাওয়ার ইতিহাসও আমরা জানি। বাংলাদেশের মানুষের উপর আমেরিকানদের প্রভুত্ব ফলানোর এগুলো কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। অথচ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পর্যন্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে, যার মর্যাদা একজন সচিবের ওপরে নয় তাকে সাথে পেলে বিগলিত হয়ে পড়েন। আর প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কথা বলাই বাহুল্য। নিতান্ত টিভি ক্যামেরা আর লোকজন থাকে বলে তাদের মোসাহেবি একটা শোভন পর্যায়ে থাকে। নির্বাচন কমিশন, সচিবালয় আর সরকারের নানা বিভাগের অধিবাসীরা মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাথে ছবি তোলার জন্য রীতিমত লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এবারের নির্বাচনে বিভিন্ন প্রার্থীদের পোস্টারেও তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এই মহান আমেরিকা সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্তানে হামলা চালাতে গিয়ে বাংলাদেশের আকাশসীমা, বিমান ও জাহাজ বন্দর ব্যবহার এবং তেল গ্যাস ভরানোর সুযোগ চেয়ে বাংলাদেশকে ধন্য করেছে। এজন্য ওয়াশিংটন থেকে বাংলাদেশের কাছে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠানো হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০১ শনিবার মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্স প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের নিকট এই পত্র হস্তান্তর করেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মার্কিন প্রস্তাব পাওয়ার সত্যতা স্বীকার করেনি। এ সময় প্রধান উপদেষ্টার পররাষ্ট্র বিষয়ক বিশেষ সহকারী চৌধুরী মোহাম্মদ শফি সামী যুক্তরাষ্ট্র ভবিষ্যতে এ সুবিধা চাইলে বাংলাদেশের ভূমিকা কি হবে সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'আমরা ব্রিজটি অতিক্রম করব যখন তা সামনে আসবে।' যুক্তরাষ্ট্রের এই পত্রে বলা হয়, সন্ত্রাসবাদ দমনে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের পরিকল্পনায় সারা বিশ্বে আমাদের বন্ধু দেশগুলোর সমুদ্র এবং বিমানবন্দরে প্রবেশাধিকার প্রয়োজন হবে পারে। এ প্রসঙ্গে আপনাদের কাছ থেকে এ মর্মে আশু নিশ্চয়তা প্রদানের অনুরোধ করছি যে, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সম্ভাব্য কার্যক্রমে যেসব জাহাজ ও এয়ারক্র্যাফট ব্যবহৃত হবে তা আপনাদের দেশের সমুদ্র এবং আকাশসীমায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতভাবে লাভ করবে। সুনির্দিষ্টভাবে আমরা অনুরোধ করছি যে, আমাদের যখনই দরকার হবে তখনই আপনাদের সরকারের কাছ থেকে বাংলাদেশের আকাশসীমা, সমুদ্র বন্দর ও এয়ার ফিল্ডগুলোতে আমাদের জাহাজ ও এয়ারক্র্যাফট প্রবেশাধিকার পাবে। একই সঙ্গে

www.pathagar.com

লাভ করবে পুনঃ জ্বালানি গ্রহণের সুবিধাও। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়, পরিস্থিতির আলোকে আমরা আশা করি, আপনাদের সহায়তা পেতে আমাদের যে অনুরোধ তা শর্ট নোটিশে'ই চাওয়া হতে পারে। পদ্ধতিগত বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে আমরা প্রস্তুত। আমরা এই নিশ্চয়তাও দিতে চাই যে, আমাদের সরকারের কাজ খুবই সমন্বিত। আমরা আশা করছি যে, আপনারা আমাদের অনুরোধ বিবেচনা করবেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরকে আপনাদের জবাব জানাবেন। যাতে আমরা আমাদের এ সংক্রান্ত পরিকল্পনায় আপনাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদিও গণনায় নিতে পারি। যুক্তরাষ্ট্রের ঐ পত্রে আরো উল্লেখ করা হয়, একটি মধ্যপন্থী উন্নয়নশীল মুসলিম গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কোয়ালিশন গঠনে বাংলাদেশের অবস্থান অনন্য। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ, ওআইসি, সার্ক, জি-৭৭, ডি-৮ ও ন্যামের সম্ভাবনাময় চেয়ারম্যান এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি দায়িত্বশীল ও শ্রদ্ধাভাজন সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ আমাদের মূল্যবান সহযোগিতা দিতে পারে।

মেরি এন পিটার্স তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সাথে দেখা করে তাঁর রাষ্ট্রের 'অনুরোধগুলো' জানান। আর আমেরিকার অনুরোধে মানে যে আদেশ সে কথা বুঝতে বাংলাদেশের কর্তা ব্যক্তিদের কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। সুতরাং প্রধান উপদেষ্টা সেই সময় আমেরিকার প্রস্তাব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সবার সাথে আলোচনা করার কথা বলেন। পরে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারিক করিম মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাথে আলোচনা করে জানায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের রাজনৈতিক নেতা, সামরিক প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে আলোচনার পরই বাংলাদেশ কিভাবে সহযোগিতা করতে আগ্রহী তা জানাবে। এই চিঠির ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টা রাষ্ট্রপতির সাথে কয়েক দফা কথা বলেন। প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র সাথে আলোচনা করলে তারা এই ব্যাপারে ইতিবাচক মতামত দেয়। পরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও সচিবদের সাথে বৈঠক করা হয়। বৈঠকেও আমেরিকাকে তার চাহিদামত সুযোগ দেয়ার পক্ষে মতামত দেয়া হয়।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০০১ প্রধান উপদেষ্টার পররাষ্ট্রবিষয়ক বিশেষ সহকারী সিএম সফি শামি সাংবাদিকদের সাথে এক ব্রিফিংকালে জানান, জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রয়োজনমত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের বিমান ও নৌ-বন্দর ব্যবহার করতে অনুমতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার জাতীয় পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণ ও সাবেক পররাষ্ট্র সচিবদের সঙ্গে এ ব্যাপারে ইতঃপূর্বে বৈঠক করে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। তিনি জানান, সংবিধানের ৫৮ ঘ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং প্রেসিডেন্টেরও এতে অনুমোদন রয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের ঘোষণা দিলেও বাংলাদেশ যুদ্ধে নেই শুধু সহযোগিতা দেবে।

শফি সামির এই ঘোষণার পর ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ বিকাল চারটায় ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরি এন পিটার্স প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় প্রধান উপদেষ্টা রাষ্ট্রদূতকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানান, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের কাছে প্রয়োজনে আকাশ সীমা, নৌ-বিমানবন্দর ব্যবহার এবং তাদের যুদ্ধজাহাজগুলোতে জ্বালানি সরবরাহের ব্যাপারে যে অনুরোধ জানিয়েছিল,

www.pathagar.com

বাংলাদেশ তাতে সম্মত হয়েছে। খবরটি রাষ্ট্রদূতকে জানানোর পর তিনি বাংলাদেশের অবস্থানের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

শুধু বাংলাদেশেই নয়, আমেরিকা আফগানিস্তানে হামলা চালানোর জন্য দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান ও নেপালসহ আফগানিস্তানের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর কাছে তাদের বিমান বন্দর, নৌ বন্দর ও আকাশসীমা ব্যবহার করার অনুমতি চেয়েছিল এবং একমাত্র ইরান ছাড়া বাকি রাষ্ট্রগুলো যথারীতি মার্কিন প্রস্তাবে রাজি হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের পক্ষে নানা দিক বিবেচনা করে এই রাষ্ট্রগুলোর সাহায্য কামনা করেছে। রাষ্ট্রগুলোও সাহায্যের বিনিময়ে তাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছে। ইতোমধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের ওপর থেকে মার্কিন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে সম্ভাব্য হামলার জন্যে ৬টি কূটনৈতিক কারণকে বিবেচনায় রেখেছিলো। যে ৬টি কারণকে আমেরিকান কূটনীতিকরা প্রাধান্য দিয়েছে, তা হলো-

(ক) আয়তনে ক্ষুদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র হলেও বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য। ফলে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ফোরামের জরুরি অধিবেশনে বাংলাদেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) বিশ্বের মুসলিম প্রধান দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম মডারেট দেশ। ফলে বাংলাদেশের সমর্থন আফগানিস্তানে হামলা পরিচালনার জন্যে বিশ্ব মুসলিম জনমত গঠনে প্রভাবক ভূমিকা পালন করবে।

(গ) বাংলাদেশ এলডিসিভুক্ত ৪৯টি দেশের অন্যতম নেতা। এলডিসিতে মুসলিম-অমুসলিম উভয় গ্রুপের দেশই রয়েছে। এক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশের সম্মতি প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে।

(ঘ) উপমহাদেশের মধ্যে পাকিস্তান ও ভারত ইতোমধ্যেই সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু যদি অভ্যন্তরীণ কোনো চাপে পাকিস্তান মত পাল্টায় তবে বাংলাদেশের সমর্থন কূটনৈতিক রাজনীতিতে 'ফ্যাক্টর' হয়ে দাঁড়াবে।

(ঙ) সার্কের প্রধান উদ্যোক্তা বাংলদেশ। এছাড়া ডি-৮ ভুক্ত দেশের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। তাছাড়া আগামি বছর বাংলাদেশে ন্যাম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। স্বাগতিক দেশ হিসেবে সম্মেলন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ন্যাম-প্রধানের দায়িত্ব পেতে পারে। ফলে এ ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ-এর সমর্থন আমেরিকার জন্যে জরুরি।

(চ) এছাড়া বাংলাদেশের পোশাক শিল্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। বাংলাদেশ এ বিষয়টি কতখানি কূটনৈতিক বিবেচনায় রাখে তা পরখের জন্যেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সমর্থন প্রস্তাবের সময় বিবেচনায় রেখেছিল।

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক সুবিধা দেয়ার পূর্বে বাংলাদেশও ৫টি বিষয়কে বিবেচনায় রেখেছিলো। বাংলাদেশের বিবেচনায় ছিলো-

(ক) বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি করে। ফলে আমেরিকায় বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বাজার যাতে নষ্ট না হয়।

www.pathagar.com

(খ) ২০০৪ সাল থেকে বাংলাদেশ আমেরিকায় পোশাক রফতানির প্রশ্নে কোটা সুবিধা পাবে না, সে ক্ষেত্রে যাতে করে 'বিকল্প কোনো পন্থায় আমেরিকায় বাজার ধরে রাখা যায় সে সুযোগ রাখা।

(ঘ) দেশে আমেরিকান বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। বিশেষ করে তেল-গ্যাস, বিদ্যুৎ পর্যটন ও আইটি পার্ক তৈরির ক্ষেত্রে।

(ঙ) চট্টগ্রামে বেসরকারি কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও বন্দরকে আধুনিকায়নে মার্কিন সহায়তা বৃদ্ধি করা।

(চ) এছাড়া বাংলাদেশের পোশাকশিল্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। বাংলাদেশ এ বিষয়টি কতখানি কূটনৈতিক বিবেচনায় রাখে তা পরখের জন্যেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সমর্থক প্রস্তাবের সময় বিবেচনায় রেখেছিল।

সামরিক অভিযানে দেশের বন্দর, স্থল ও আকাশসীমা ব্যবহার করতে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীকে দেওয়া অনুমোদনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন পেশ হয়। আবেদনের শুনানিতে ২৪ সেপ্টেম্বর সোমবার আবেদনকারী প্রধান কৌসুলি অ্যাডভোকেট এম আই ফারুক বলেন, সংবিধানের ৫৮ ঘ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা ব্যতীত অন্য কোনো নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা বা যুদ্ধে অংশ নেওয়া সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণী বিষয়। সংবিধানের ৬৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের অনুমোদন ছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা বা যুদ্ধে অংশ নেওয়া যায় না। মার্কিন সেনাবাহিনীকে দেওয়া ওই অনুমোদন আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যুদ্ধে অংশ নেওয়ার শামিল। এ জন্য অবশ্যই সংসদের অনুমোদন লাগবে। প্রয়োজনে সংবিধানের ৭২ (৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সদস্য বিলুপ্ত সংসদ আহ্বান করে এ অনুমোদন নিতে হবে। তাছাড়া সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ এবং আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম নীতি। ওই অনুমোদনের মাধ্যমে এ নীতিকেও লজ্ঘন করা হয়েছে।

কূটনৈতিকভাবে এসব নানা জাতীয় স্বার্থের কথা বলা হলেও এবং সামনে ভারত-পাকিস্তানের লাভবান হওয়ার উদাহরণ থাকলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটেনি। গত ৮ নভেম্বর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী (বর্তমানে রাষ্ট্রপতি) বদরুদ্দোজা চৌধুরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরশেষে বাংলাদেশে ফিরেছেন। সেখানে তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কলিন পাওয়েলের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের কোটা বৃদ্ধি এবং শুল্কমুক্ত প্রবেশ ও বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে অভিবাসী আইন শিথিল করার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু কলিন পাওয়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার অজুহাতে দাবি পূরণে ওয়াশিংটনের অপারগতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। উল্টো বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানী এবং চট্টগ্রামে বেসরকারী পোর্ট নির্মাণের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের নসিহত করেছেন।

বর্তমান চার দলীয় জোটের সরকার নিরব ব্যালেট বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে। জোটের চার শরীকের মধ্যে দুই শরীকের গায়েই জ্বলজ্বলে একটা ইসলামী সীল রয়েছে। অপর দুই শরীকও নিজেদের ইসলামী জাতীয়তাবাদী শক্তি হিসেবে পরিচয় দিতে খুব আরাম বোধ করেন। আবার, যাদের বিপ্লবে তারা ক্ষমতায় এসেছেন বলে দাবি করেন;

www.pathagar.com

সেই বিপ্লবীরা অর্থাৎ বাংলাদেশের জনসাধারণ কিন্তু আমেরিকার চেয়ে লাদেন তথা তালেবানদের অনেক বেশি পছন্দ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশাজীবী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নারী সংগঠন ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো আফগানিস্তানের মার্কিন হামলার নিন্দা জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের আকাশসীমা ও বন্দর ব্যবহারের অনুমতি বাতিলের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু সরকার বাংলাদেশের এই ব্যাপক জনমতকে সম্মান জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি। ❑

১৫ ডিসেম্বর '০১
লেখক ঃ সাংবাদিক।

মার্কিন রণতরী থেকে বোমারু বিমান উড়ে যাচ্ছে আফগান জনপদের দিকে।

www.pathagar.com

আসুন, আমরা একটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ি

নাজিব তারেক

একটি কলঙ্কিত নির্বাচন বা আদালতের রায়ে নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডাব্লিউ জে বুশ, ইতোমধ্যে মার্কিন জনগণের পয়সায় পরিচালিত মার্কিন জনগণ বা তাদের পিতা, পুত্র, স্বামীদের নিয়ে গঠিত সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন যুদ্ধ করার জন্য।

কিন্তু কেন এ যুদ্ধ ?

আপাত দেখানো হচ্ছে নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে সহস্রাব্দের নৃশংসতম, কিন্তু **বুদ্ধিদীপ্তময় সন্ত্রাসী হামলার জবাব দেয়ার জন্য এ যুদ্ধ। আসলেই কি তাই ?**

এ হামলার আগের সন্ধ্যায় বুশ জাতির উদ্দেশে ভাষণে তার অর্থনৈতিক ব্যর্থতা, বেকারত্ব বৃদ্ধি-রোধের ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন। এ ব্যর্থতা বুশ প্রশাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই, যা সেদিন একান্ত বাধ্য হয়েই বুশ স্বীকার করলেন। ইতিহাসের আলোকে আমরা দেখছি প্রতিটি এরকম পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রশাসন একটি করে যুদ্ধ জনগণের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। যেন জনগণ তার দুরবস্থার দিকে তাকানোর সুযোগ না পায় কিংবা তাকালেও সান্ত্বনা পাওয়ার একটি ছেদো যুক্তির কাছে মুখ বন্ধ করে রাখে। নিকট অতীতের ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, কোরীয় যুদ্ধ এরই প্রমাণ। আর এই সব যুদ্ধ থেকে মার্কিন জনগণের কী লাভ হয়েছে- মৃত্যু, কিছু মেডেল, জীবনভর পঙ্গুত্ব, আগের মতই ৬ ঘন্টা ১৮ ঘন্টা শ্রমদান আর নতুন একটি জাতির ঘৃণা লাভ।

মার্কিন প্রশাসনের স্বরূপটি চিহ্নিত করা গেলে ব্যাপারটি বুঝতে সুবিধা হয়। মার্কিন প্রশাসন তিনটি অংশে প্রকাশিত।

(এক) রাজনৈতিক ঃ এ অংশে সিনেটর, কংগ্রেস থেকে প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ অংশের সকল সদস্যই মার্কিন ধনিক শ্রেণীর সদস্য। অর্থাৎ সাধারণ জনগণের কোন প্রতিনিধির এ অংশে অবস্থান নেই।

(দুই) সামরিক অংশ ঃ রাজনৈতিক অংশের যেমন জনগণের অধিকার ভোট দেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ, সামরিক অংশের তদ্রূপ সৈনিক হিসেবে যোগদানও ফ্রন্টলাইনে গোলার আঘাতে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া জনগণের আর কোন সুযোগই নেই। উচ্চ পর্যায়ে যেতে

www.pathagar.com

হলে ধনিক শ্রেণীর সন্তান কিংবা প্রতিনিধি হতে হয়। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা সেভাবেই সাজানো।

(তিন) **মিডিয়া ঃ** জনগণকে বিভ্রান্ত রাখার জন্য মার্কিন প্রশাসনের সবচেয়ে বড় অস্ত্রের নাম মিডিয়া-যা পরিচালিত হয় ধনকুবেরদের অর্থে, ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে। এখানে মার্কিন জনগণের সন্তানদের ব্যাপক অংশগ্রহণ রয়েছে, কিন্তু এই মিডিয়ার অন্তর্গত হচ্ছেন লিখতে পারা বলতে পারার ক্ষমতা সম্পন্ন সেসব ব্যক্তি যারা মার্কিন প্রশাসনের মুখপাত্র হিসেবে নিবেদিত সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, পপ তারকা থেকে পর্নো তারকা (তাদের সাফল্য জনগণের কাছে স্বপ্নের মত, গল্পের মত)। যে কোন যুদ্ধের সময় এই তারকারা তাদের ক্যারিশমা কিংবা শরীর দেখিয়ে মৃত্যুযাত্রী সৈনিকদের ভুলিয়ে রাখে। তাদের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা চিন্তা করা থেকে বিরত রাখবার চেষ্টা করে। দেখা গেছে গত নির্বাচনে জনগণের পক্ষে কিছু অবস্থান নেবার কারণে ক্লিনটন-গোর জোটের বিপক্ষে মিডিয়া সরাসরি অবস্থান গ্রহণ করে এবং বুশ এর পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকে। সর্বশেষে টুইন টাওয়ার হামলার ঘটনার দিনও প্রথম টাওয়ারে আক্রমণের ১৫ মিনিট পর দ্বিতীয় টাওয়ারের আক্রমণের ৩ মিনিট আগে থেকেই বারবার জনগণকে উস্কানি দেয়া হয়েছে কোনরূপ প্রমাণ ছাড়াই লাদেন-এর ছবি দেখিয়ে, যা মার্কিন আইন ও সংবিধান পরিপন্থী।

এবার আসা যাক, এ যুদ্ধে কার লাভ কার ক্ষতি সে আলোচনায়

অর্থনৈতিক দিক

ধনিক শ্রেণীর প্রধান আয় এর উৎস যুদ্ধ সামগ্রী বিক্রয় থেকে (যা মিডিয়া মার্কিন অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রচার করে, কিন্তু সত্য হচ্ছে এটি ধনিক শ্রেণীর প্রধান আয়ের উৎস)। এই যুদ্ধসামগ্রী বাবসায়ীরা কি বিনামূল্যে মার্কিন সেনাবাহিনীকে প্রদান করবে। না, তা সম্ভব নয়। এরা জনগণের ৭ থেকে ১৮ ঘন্টা পরিশ্রমলব্ধ অর্থ যা করের আকারে সরকারি কোষাগারে জমা হয়, তা এরা বিক্রয়মূল্য হিসেবে নিজেদের পকেটে ভরবে। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এরা মধ্যপ্রাচ্যসহ অনেক দেশে কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রয় করবে। এই অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের পরিবারের জন্যই মার্কিন সিনেটর বা কংগ্রেসম্যান।

রাজনৈতিক দিক

(ক) মধ্য এশিয়ার প্রকৃত সমাজতন্ত্রের দিকে নীরব যাত্রা ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের জন্য মার্কিন মিডিয়ার গ্লামার ও জৌলুসপূর্ণ প্রচারণার সাফল্যটি আজ সর্বজন স্বীকৃত। সাধারণ মানুষ যারা কমিউনিস্ট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিল, তারা দেখলো সেই ব্যবস্থা অপসারিত হওয়াতে তাদের কোন লাভ হয় নি বরঞ্চ এই ব্যবস্থা পতনের পর তাদের উস্কানিদাতারা (যারা তখন নেতা হিসেবে পরিচিত ছিল) কোটি কোটি ডলার আয় করেছে এবং দেশের সম্পদ এসব ব্যক্তির ব্যক্তিগত, পরিবারগত বা গোষ্ঠীগত সম্পদে পরিণত হয়েছে। উল্টো সোভিয়েত ব্যবস্থায় যে খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার সুযোগ ছিল এখন তাও নেই। ফলে পুরো সোভিয়েত মধ্য এশিয়া জুড়ে শুরু হয়েছে পূর্বের ভুল শুধরে নেয়ার প্রক্রিয়া, একটি প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে

www.pathagar.com

যাত্রার শুরু যা মার্কিন প্রশাসন বা ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে একটি রক্তপাতহীন যুদ্ধ। এই প্রচ্ছন্ন হুমকির বিরুদ্ধে লড়বার প্রস্তুতি স্বরূপ এই অংশকে যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ করে তোলাই এই যুদ্ধের প্রথম উদ্দেশ্য।

(খ) পরাশক্তি হিসেবে চীনের উত্থান ঃ সোভিয়েত ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য সোভিয়েত সীমান্তে সামরিক অবস্থান ছিল জার্মানিতে, তুরস্কে, কিন্তু চীন-সীমান্তে এরকম কোন সামরিক স্থাপনা মার্কিন প্রশাসনের নেই। ম্যাপ খুলে দেখুন, আফগানিস্তানের চেয়ে প্রকৃষ্ট স্থান আর কী হতে পারে ?

(গ) মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম ও খ্রিস্টান জনগণের উত্থান ঃ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় ইউরো-মার্কিন রাজনীতিকেরা জনগণের কাছে নিজেদের ক্যারিশমা বজায় রাখার জন্য ইহুদি ধনিক শ্রেণীর কাছে নিজেদের বিক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করে। সেই সুযোগে ইউরো-মার্কিন ইহুদি ধনিক শ্রেণী ইউরো-মার্কিন খ্রিস্টান নেতৃত্বের কাছে মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদিদের জন্য একটি ভূখণ্ড দাবি করে বসে। সদস্য ভারত-আফ্রিকার উপনিবেশ হারানো খ্রিস্টান ধনিক শ্রেণী মধ্যপ্রাচ্যের বাজার দখল প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের এই সুযোগ গ্রহণ করে, পরে এ অঞ্চলে তৈল লাভ এ অঞ্চলকে ধনিক শ্রেণীর কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। ইহুদি ধনিক শ্রেণী এ ভূখণ্ডটি চেয়েছিল এজন্য যে, সাধারণ ইহুদি তাদের কাছে বোঝাস্বরূপ ছিল, আবার এই শ্রেণী বা গোষ্ঠীটি ছাড়া তারা অনেক মূল্যহীন। এই শ্রেণী বা গোষ্ঠীটিকে একটি ভূখণ্ড প্রদান করে এদের কাছে নিজেদের মূল্য বৃদ্ধি করা, দুই. মধ্য প্রাচ্যে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। সাধারণ ইহুদি জনগোষ্ঠীকে আরবদের (যারা মুসলিম ও খ্রিস্টান) মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে সর্বদা একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বজায় রাখা এবং সে সুযোগে তাদের ইউরো-মার্কিন খ্রিস্ট সহযোগীদের নিয়ে একটি নতুন বাজারে নিয়মিত ব্যবসা করা। এর সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের তৈল বা অন্যান্য সম্পদ কুক্ষিগত করা। এই লক্ষ্যে যা যা করা দরকার গত পঞ্চাশ বছরে মার্কিন নীতির আকারে ইহুদি-মার্কিন ধনিক শ্রেণী এই অঞ্চলের জনগণের ওপর যে নিপীড়ন চালিয়েছে তারই বিপরীত ফলস্বরূপ আরব মৌলবাদের উত্থান ঘটেছে। যা ইহুদি-মার্কিন ধনিক শ্রেণীর প্রশাসন মার্কিন জনগণের পয়সাকেই কাজে লাগিয়েছে (এটা সর্বজন স্বীকৃত সি আই এ চলে মার্কিন জনগণের করের পয়সায়) তারা এ বিনিয়োগটি করেছেন প্রথমত সোভিয়েত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে (আফগানিস্তান, তালেবান) পরবর্তীতে তাদের আরব শেখ বন্ধুদের বিরুদ্ধে, (অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী বিক্রয় চালু রাখার জন্য) এখন মার্কিন ও বিশ্বের সাধারণ জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য। কিন্তু এই মৌলবাদী গোষ্ঠীটি থেকেই এক অংশ এখন নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ইহুদি-মার্কিন-ভাড়াটে বাহিনী বা ইসরায়েল দিয়ে এতসব উদ্দেশ্য সম্পন্ন হচ্ছে না। তাই সৃষ্টি করা হল সাদ্দাম হোসেনকে। ইরাকের সাদ্দাম হোসেনকে ধ্বংস করা হয় নি উল্টো ইরাকি জনগণকে অবরোধের নামে ধীর মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করা হচ্ছে। আর সাদ্দাম হোসেন এর চেহারা দেখিয়ে আরব রাষ্ট্রগুলির কাছে অস্ত্র বিক্রয় করা হচ্ছে। মার্কিন জনগণকে ভাড়াটে দারোয়ান হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। (সৌদি আরবের অবস্থানরত মার্কিন সৈন্যেরা) সে সঙ্গে ধনী সন্তানেরা যারা সেনাবাহিনীর উচ্চপদসমূহে আসীন তাদের প্লেজার ট্রিপ-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এবার আসা যাক, এই যুদ্ধ প্রস্তুতির কারণস্বরূপ টুইন টাওয়ার-পেন্টাগন আক্রমণের নীল নকশার সন্ধান -

ধরে নিলাম এ আক্রমণটি লাদেন করেছেন, এরকম একটি বুদ্ধিদীপ্ত আক্রমণ লাদেন করবার পূর্বে তিনি কি এর ফলাফল সম্পর্কে ভাবেন নি ? তিনি কি বোঝেন নি যে, পরাক্রমশালী মার্কিন সামরিক বাহিনী, সি আইএ, এফ বি আই তার অবস্থা কী করবে ? কিংবা মার্কিন-ইসরায়েলী সৈন্যেরা তার মুসলিম ভাইদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কিনা ?

যদি ভেবে থাকেন তবে আফগানিস্তান মার্কিন সৈন্যদের জন্য একটি মরণ ফাঁদ। আর যদি না ভেবে থাকেন তাহলে তার মৃত্যু অত্যাসন্ন, কারণ ফলাফল না ভেবে যে কাজ করে সে নির্ঘাত নির্বোধ। তাকে মারার জন্য মার্কিনীদের চৌকস প্রতিষ্ঠান সি আই এর একটি কমান্ডো দলই যথেষ্ট, পঞ্চাশ হাজার সৈন্য প্রেরণ বাগাড়ম্বর হবে মাত্র।

কিন্তু যদি লাদেন এ কাজ না করেন, তবে কারা করলো এ নির্মম হত্যাকাণ্ড এ বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ ?

১. মার্কিন মিডিয়া ঘোষণা করেছে যে, এই কাণ্ডটি ঘটতে একটি দীর্ঘ সময়ের প্রস্তুতি প্রয়োজন যেখানে পুরো মার্কিন এভিয়েশন সিস্টেম সম্পর্কে জানা বোঝা থেকে বিমান চালনায় প্রশিক্ষিত হয়ে উঠবার প্রক্রিয়াটি জড়িত। অর্থাৎ এ আক্রমণ পরিচালনার জন্য পরিকল্পনাকারী ও অংশগ্রহণকারী উভয়েরই উচ্চ প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি। যা আরব ভূখণ্ডের শুধু ইসরাইলী জনগোষ্ঠীর আছে। এছাড়া এ দীর্ঘ সময়ে সি আই এ কিংবা এফ বি আই কি করছিল ? নাকি তারা সবই জানতো ?

২. পেন্টাগন এর পাঁচ তলা ভবন ধসে পড়েছে, কিন্তু কতজন নিহত, কে কে নিহত, কি কি ক্ষতি তা জানা গেল না কেন ? সামরিক সদর দপ্তরে কোন জেনারেল, নিদেন-পক্ষে মেজর ক্যাপ্টেন র‍্যাঙ্কের কোন কর্মকর্তাও সকাল ৯ টায় কেন ছিলেন না বা মারা গেলেন না এমন কি সামান্য আহত হলেন না ব্যাপারটা বিস্ময়কর নয় কি ?

৩. ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে অনেক বড় কোম্পানির বড় বড় অফিস। কিন্তু মৃতের তালিকায় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যারা ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি তাদের নাম তেমন পাওয়া যাচ্ছে কি ?

৪. মাত্র ক'ঘন্টার মিডিয়ার প্রচারণা দিয়েই মার্কিন জনগণকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলা হয়েছে। আর প্রতিশোধ উন্মুখ ১৫/২০ জন আরবকে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা কি কারো পক্ষে খুবই অসম্ভব ব্যাপার ? আর যারা এ কাজ করেছে তারা নিজেদের আসল পাসপোর্ট ব্যবহার করেছে- এ গল্প সি আই এ কাকে শোনাচ্ছে ? মার্কিন জনগণকে ? মার্কিন জনগণকে এতখানি নির্বোধ ভাবা কি সিআইএ'র সাজে ?

৫. যে চারটি বিমান এই সন্ত্রাসী কর্মে ব্যবহৃত হয়েছে তা কত পুরানো ? তা কি বাতিল হয়ে আসবার সময় এসেছিল ?

৬. সিয়াটেলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিরোধী মার্কিন জনগণের বিক্ষোভ মার্কিন জনদরদী মিডিয়া প্রচার করেছিল পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর; কোন বিক্ষোভের শ্লোগান বা বাণী প্রচারিত হয় নি। এমন কি লক্ষ মানুষের অংশ গ্রহণের এই চিত্র "লাইভ" এ তো প্রচারিত হয় নি উল্টো সংবাদের অংশ হিসেবে যা দেখানো হয়েছে তা হচ্ছে জনগণ হচ্ছে আইন ভঙ্গকারী এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। সেই মিডিয়া টুইন টাওয়ার এ আক্রমণের

www.pathagar.com

শুরু থকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পর্যন্ত লাইভ দেখালো কেন ? এবং কিভাবে?

৭. ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করা বা উদ্ধার কার্য ১০% থেকে ২৫% সম্পন্ন হয়েছে মাত্র, এর মধ্যেই সেনা প্রেরণ, যুদ্ধ ঘোষণা। এত তাড়াহুড়ো কী জন্য, কার জন্য এবং কেন ?

৮. প্রশ্ন উঠতেই পারে এত কিছু থাকতে টুইন টাওয়ারকে বেছে নেয়া হল কেন ? সাধারণ মানুষের আবেদনকে অন্ধ করে দেবার জন্য টুইন টাওয়ারের চেয়ে ভালো স্থান আর কি হতে পারে ? টুইন টাওয়ারের মত সুউচ্চ ভবন এর উর্ধ্বাংশের দিকে এগিয়ে আসা বিমানের এবং তৎপরবর্তী বিস্ফোরণ অগ্নি ও ধোঁয়ার কুণ্ডলীর চিত্র যত পরিষ্কারভাবে টেলিভিশনে প্রচার করা সম্ভব অন্য কোন ভবনের বা স্থানের এত পরিষ্কার চিত্র প্রচার করা কি সম্ভব ?

তাহলে পেন্টাগন ...

এটা হচ্ছে আগুনে ঘি ঢালার পরিকল্পনা। টুইন টাওয়ারের ঘটনার পর আবেগ অন্ধ জনগণকে অসহায়, হিংস্র ও আক্রমণাত্মক করে তুলবার জন্য হোয়াইট হাউসের চেয়ে পেন্টাগণই বেশি উপযুক্ত নয় কি ? কারণ হোয়াইট হাউসে আক্রমণ হলে জনগণ স্রেফ আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়বে, প্রতিশোধ পরায়ণ হবে না।

এ যুদ্ধে কার লাভ

১. মার্কিন ধনিক শ্রেণীর লাভটি নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

২. ইহুদি ইসরাইলীরা এ অজুহাতে কিছু আরব ভূখণ্ড দখল করতে পারবে এবং তারা তা শুরুও করে দিয়েছে। আসল ক্ষতি হচ্ছে মার্কিন জনগণের ও পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের।

ক) মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়া ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

খ) পুরো এশিয়া জুড়ে একটি যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করবে ফলে এশীয় দেশগুলোর উন্নয়ন ব্যাহত হবে।

গ) সাধারণ মার্কিন নাগরিকের ট্যাক্সের টাকাটি যুদ্ধ সরঞ্জাম বাবদ মার্কিন ধনিক শ্রেণীর পকেটে যাবে।

ঘ) যেহেতু যুদ্ধের অনেক খরচ তাই মার্কিন সরকার সেবামূলক খাতগুলোর বাজেট সংকুচিত করবে, ফলে এ সেবাগুলো পেতে জনগণকে সার্ভিস চার্জ, ক্রয় মূল্য ইত্যাদি আকারে তাদের গাঁটের পয়সা এসব খাতে বিনিয়োগকারী ইহুদি-মার্কিন ধনিক শ্রেণীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য থাকবে।

ঙ) এই যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্র-জাতি-গোষ্ঠীর ক্রোধ ও আক্রমণের শিকার হবে নিরীহ শান্তিকামী পর্যটক মার্কিন নাগরিকেরা।

চ) সাধারণ মার্কিন নাগরিকের কারো পিতা, কারো পুত্র, কারো স্বামী বা বয়ফ্রেন্ড যুদ্ধে মারা যাবে বা পঙ্গু হয়ে যাবে। ❑

ডিসেম্বর '০১
লেখক ঃ সাংবাদিক।

www.pathagar.com

আফগানের প্রতি রাসূলের ইঙ্গিত ?

সৈয়দ মবনু

পৃথিবীর সবকিছু সময়ের ভেতর আবদ্ধ। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ এই তিন সময় নিয়ে গোটা বিশ্ব এবং তার ভেতরের সবকিছু। মানুষের সকল কর্মতৎপরতা-চিন্তা এই তিন সময়ের প্রতিনিধি। মানুষ অতীতকে ধারণ করে সর্তমানে প্রস্ফুটিত হয়ে ভবিষ্যতে দাঁড়াতে চায়। এই তিন সময়ের যোগসূত্র যাদের চিন্তা-চেতনায় অস্পষ্ট, তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। অতীত ও বর্তমানের ধারণা বা জ্ঞান মানুষের কাছে থাকলেও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। অতীত ও বর্তমানের ধারণা বা জ্ঞান মানুষের কাছে থাকলেও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষ কোন জ্ঞান রাখে না।

আমরা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের সাধারণ দু'টি সূত্র দেখতে পাই। এক) ধর্মীয় মনীষীদের সূত্রে প্রাপ্ত ভবিষ্যৎ জ্ঞান। দুই) জ্যোর্তিবিজ্ঞানীদের কর্তৃক চন্দ্র-সূর্য-তারকা গণনা করে ভবিষ্যৎ জ্ঞান। এই ভবিষ্যৎ জ্ঞানীদের বক্তব্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য অথবা কাদের কথা বিশ্বাস করা যায়, তা ভিন্ন ব্যাপার। তবে ভবিষ্যৎ জ্ঞান অনেকটা আশ্চর্যের বিষয়। তা বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করা না করা সবই মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। এ ব্যাপারে ইসলামের স্পষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। তবে ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়ে গেলে আমরা বিস্মিত হই। যারা ধর্মবিশ্বাসী, তারা ধর্মগ্রন্থের কথাগুলোকে সত্য বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, হোক তা যে কোনো সময় বিষয়ক। মুসলমানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কুরআন ও হাদীস। বিভিন্ন নীতি বা আইন নিয়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভেতর মতানৈক্য থাকলেও এই দু'গ্রন্থে যা স্পষ্টভাবে এসেছে, তা বিশ্বাসে সবাই অভিন্ন। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি যে অবস্থায়, তা সম্পর্কে পনেরশ' বছর পূর্বের কোন মনীষী যদি কোন কথা বলে থাকেন, তবে তা অবশ্যই আজকের মানুষের জন্য বিস্ময়কর।

আমাদের কারো অজানা নয় যে, বর্তমানে আমেরিকা বনাম আফগানিস্তান যুদ্ধ চলছে। আমরা যদি এই যুদ্ধকে সামনে এসে হাদীসের পথ দিয়ে হেঁটে গিয়ে দেখি দেড় হাজার বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এ সম্পর্কে কিছু বলে গেছেন, তবে একজন মানুষ হিসেবে বিস্মিত হওয়ার কথা। কিয়ামত সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে নিদর্শনগুলোর কথা বলে গেছেন, তা এক এক করে মানুষের সামনে প্রকাশ হচ্ছে। -চিন্তাশীলদের জন্য তা অবশ্যই ভাবনার বিষয়। সহীহ হাদীসের গ্রন্থসমূহে 'কিতাবুল

www.pathagar.com

ফিতান' নামে যে স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে, সেখানে এমন একটি হাদীস আছে, যা স্পষ্ট বর্তমান আফগান পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন-

"কিয়ামত হবে না যে পর্যন্ত রোমানরা 'আমোক' অথবা 'দাবেক' নামক স্থানে পৌঁছে যাবে। মদীনা থেকে এক বাহিনী সেদিকে যাত্রা শুরু করবে - তারা হবে সেই সময়ের উত্তম মানুষ। যখন উভয়ে যুদ্ধের মুখোমুখি হবে, তখন রোমানরা বলবে, 'সেই সকল মুসলমানদেরকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করে তোমরা সরে দাঁড়াও, ওদের সাথে আমরা যুদ্ধ করব। মুসলমানরা তখন বলবে, না, আল্লাহর কসম, আমরা তাদেরকে হস্তান্তর করব না। কারণ, তারা আমাদেরই ভাই।' এই কথার উপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। মুসলমানদের একটি অংশ বিশ্বাসঘাতকতা করবে; ওদের দোয়া আল্লাহ্ কখনো কবুল করবেন না। একদল মুসলমান শহীদ হয়ে যাবে, যারা আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ শহীদ। অবশিষ্ট অংশ বিজয়ী হবে। ফলে তারা সারাজীবন ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে। অতপর তারা কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করে নেবে। তারা যখন তাদের তরবারীসমূহকে যয়তুন বৃক্ষে লটকিয়ে গনীমতের মাল বন্টনে ব্যাপৃত থাকবে, তখন শয়তান আওয়াজ তুলবে ঃ তোমাদের অনুপস্থিতিতে দাজ্জাল তোমাদের সন্তানদের ওপরে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে। এ সংবাদ শোনামাত্র মুসলমানরা সেখান থেকে চলে যাবে। অথচ গুজব ছিল সেটি। তারা সিরিয়ায় আসার পর দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। মুসলমানরা সিরিয়ায় আসার পর দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। মুসলমানরা যখন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সৈন্যদেরকে সারিবদ্ধ করবে, তখন নামাযের সময়ে হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন। দাজ্জাল তাকে দেখে পানিতে লবণ গলে যাওয়ার মত ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি ঈসা (আঃ) তাকে এমনিই ছেড়ে দিতেন, তবুও সে ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহতায়ালা তার মৃত্যু হযরত ঈসা (আঃ)-এর হাতে নির্ধারিত রেখেছেন; তাই তিনি তাকে হত্যা করে সেই রক্ত প্রদর্শন করবেন।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান)।

এই হাদীসে রোমান বলতে খৃস্টান বিশ্বকে বুঝান হয়েছে। আজকের ইউরোপ-আমেরিকা-সোভিয়েত ইউনিয়ন একসময় রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খৃস্টান ধর্মে যে বিভিন্ন শাখা রয়েছে, তার একটি রোমান ক্যাথলিক। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ হচ্ছে তার নেতৃত্বে আছে আমেরিকা-বৃটেন। আমেরিকানরা ধর্মবিশ্বাসে রোমান ক্যাথলিক। প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ নিজেও এই ধারার ধর্মবিশ্বাসী। বৃটেনের বেশিরভাগ মানুষ প্রটেস্ট্যান্ট হলেও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার রোমান ক্যাথলিক। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আমেরিকা-বৃটেনের যুদ্ধের মূল কারণ আফগানিস্তানে অবস্থানরত আরব মুজাহিদদেরকে হস্তান্তর করা-না করা নিয়ে। ইঙ্গ-মার্কিনীদের দাবী আরব মুজাহিদদেরকে আমাদের হাতে হস্তান্তর করে তোমরা সরে দাঁড়াও। আফগান ইসলামী সরকারের স্পষ্ট কথা, 'না, আমরা তাদেরকে তোমাদের হাতে হস্তান্তর করতে পারি না, যেহেতু তারা মুসলমান। তারা যদি কোন অপরাধ থাকে, তবে প্রমাণসহ আমাদের আদালতে মামলা করতে পার। আমরা তাদের বিচার করব।'

আমেরিকা এতে রাজি নয়। প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইতোমধ্যে ক্রুসেড ঘোষণা করেছেন। যুদ্ধের একটি পর্যায় শেষ হয়েছে। নতুন পর্যায় শুরু হয়েছে। আফগানের

www.pathagar.com

ইসলামী সরকার ঘোষণা করেছেন, আফগানিস্তানে একজন মুসলমান বেঁচে থাকতে আরব মুজাহিদদেরকে আমেরিকার কাছে হস্তান্তর করা হবে না। উপরে উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে, "একদল মুসলমান বিশ্বাঘাতকতা করবে। " আমরা বাস্তবে তা দেখতে পাচ্ছি। হাদীসে আরো বলা হয়েছে, " প্রচুর মুসলমান শহীদ হবে।" ইতোমধ্যে শহীদের সংখ্যা যা দাঁড়িয়েছে তা 'প্রচুর' থেকে মোটেও কম নয়। তাছাড়া যুদ্ধ তো মাত্র শুরু। উপরিউক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, "তারা কনস্ট্র্যান্টিনোপল অধিকার করবে।" এই কথাকে যদি রাসূল (সাঃ)-এর পরবর্তী সময় সম্পর্কে বিবেচনা করা হয়, তবে স্পষ্ট যে কনস্ট্যান্টিনোপল আব্বাসী খিলাফতের সময় মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে। কনস্ট্যান্টিনোপল হচ্ছে বর্তমান তুরস্ক। আর যদি বলা হয়, কিয়ামতের পূর্বক্ষণের জন্য এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রযোজ্য, তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক সেখান থেকে ইসলামকে উচ্ছেদ করে কুরআন হাতে তুলে বলেছিল, "ও পুরাতন গ্রন্থ! তোমার দিন শেষ। এখন থেকে তুরস্ক সম্পূর্ণ সেক্যুলার রাষ্ট্র।" এরপর থেকে সেখানে কামাল আতাতুর্কের নীতি চলছে। এ থেকে বড় কুফরী আর কি হতে পারে ? তুরস্কে এখনো ইসলামী তৎপরতা নিষিদ্ধ এবং সেখানের শাসন নীতি কালচার সবই আমেরিকা-ইউরোপ ভিত্তিক। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আমেরিকা-বৃটেনের যুদ্ধে তুরস্কই প্রথম মুসলিম দেশ, যারা স্থলযুদ্ধের জন্য আমেরিকাকে সৈন্য সাহায্যের ঘোষণা দিয়েছে। হয়ত এই হাদীসের ইঙ্গিত হচ্ছে, ইসলামপন্থীরা তুরস্কে আবার ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করে কামাল আতাতুর্কের কুফরী থেকে মুক্ত করবে। হাদীসে কাফের সৈন্যদের পৌঁছে যাওয়ার স্থান বলা হয়েছে। (আমোক' বা 'দাবেক'। এই দুই শহর বর্তমান সিরিয়ায়। আমরা অনুসন্ধান করলে দেখতে পাব, ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যদের বর্তমান ঘাঁটিগুলো এরই আশপাশে।

বর্তমান এই যুদ্ধের সাথে হাদীসের অনেকটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া গেলেও এটাই যে সেই যুদ্ধ তা এখনো স্পষ্ট বলা যাচ্ছে না। অন্য একটি হাদীস এখানে উল্লেখযোগ্য। হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

"তোমরা রোমানদের সাথে চুক্তি করে তাদের অন্য একটি অংশের সাথে যুদ্ধ করবে। সেই যুদ্ধে তোমরা বিজয়ী হবে। এরপর তোমরা একটি পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় নেবে, যেখানে প্রচুর গাছ থাকবে। এই বিজয়কে খ্রীস্টানরা ক্রুশের দিকে নিয়ে যেতে চাইবে। এজন মুসলমান ক্ষুব্ধ তাদেরকে আক্রমণ করবে। রোমানরা (খৃস্টধর্ম বিশ্বাসীরা) তাতে উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে থাকবে।" (সুনানে আবু দাউদ, বাবঃ মাইয়াজকুরু মিন মালাহিমির রোম)।

এ রকমের আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত মুয়াম্মাল ইবনে ফজল, ওয়াহিদ, আবু ওমর, হাসান ইবনে আতিয়া (রাঃ) তবে তাদের বর্ণিত হাদীসে শুধু এতটুকু অতিরিক্ত যে-

"মুসলমানরাও তাদের অস্ত্র নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হবে এবং সম্মিলিত খৃস্টান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ পাক মুসলমানদের এই দলকে ব্যাপক শাহাদাতের মর্যাদা দানে পুরস্কৃত করবেন।" (প্রাগুক্ত)

www.pathagar.com

এ হাদীসের শুরুতে 'তোমরা' শব্দ দ্বারা শেষ জামানার মুসলমানদেরকে বুঝান হয়েছে।। তেমনি 'রোম' শব্দ দিয়ে সকল খৃস্টানকে বুঝান হয়েছে। "একদল খৃস্টানদের সাথে চুক্তি করবে অন্যদল খৃস্টানদেরকে পরাজিত করবে।" এর দ্বারা কি পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগান মুজাহিদদের কাছে পরাজয়কে বুঝান হয়েছে ? সেই যুদ্ধে তো আমেরিকা-বৃটেন মুজাহিদদের পক্ষে ছিল। আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া ধর্মগত দিক একই ধারার। হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে, মুসলমানদের বিজয় হবে। হয়েছেও তাই। আরো বলা হয়েছে, " তোমরা পাহাড়-বৃক্ষ এলাকায় সমবেত হবে।" এই পাহাড়-বৃক্ষ এলাকা পরিস্থিতির পর্যালোচনা অনুযায়ী কোথায় ? "রোমানরা এই বিজয়কে তাদের দিকে নিয়ে যাবে।" রাজনীতি সচেতন সবাই জানেন যে, পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়কে আমেরিকা দাবী করে তাদের বিজয়। অনেকেই ভাবেন, সেটা ছিল মূলত মার্কিন-সোভিয়েত যুদ্ধ। অথচ ১৯৭৯ ইংরেজীর ২৭ ডিসেম্বরে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের ৮৫ হাজার সৈন্য বারবাক কারমালকে পুতুল সরকার করে আফগানিস্তানে প্রবেশ করল, তখন আফগানীরা ইট-পাথর-পাইপগান নিয়ে তাদের মোকাবেলায় দাঁড়িয়েছিল। তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক অনেক অনুরোধ করেও এদিকে সাহায্যের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে পারেননি। আমেরিকা আফগান মুজাহিদদের সাহায্যে এগিয়ে আসে ১৯৮১ ইংরেজীতে প্রেসিডেন্ট রোনাণ্ড রিগানের সময়। আফগানে সরাসরি যুদ্ধ করেনি, অস্ত্র সাহায্য দিয়েছিল মাত্র।

আফগান মুজাহিদদের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়ের পর আমেরিকা হয়ে ওঠে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি। ফলে তারা শুরু করল একের পর এক অঘোষিত সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার অপ্রতিরোধ্য কর্মতৎপরতা। জাতিসংঘ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থাটি হয়ে গেল সম্পূর্ণ আমেরিকা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। গোটা মুসলিম বিশ্বে সরকার ও তাদের পররাষ্ট্র নীতি হয়ে গেল আমেরিকার স্বার্থরক্ষায় সম্পূর্ণ একাকার। অথচ আমেরিকা কর্তৃক বিশ্বে সবচাইতে বেশি আক্রান্ত মুসলিম বিশ্ব। তা দেখে মুসলমানদের একজন ক্ষুব্ধ হয়ে ওদের উপর আক্রমণ করে বসবে। এই একজন কে ? উসামা বিন লাদেন বা মোহাম্মদ আতা নয় তো ? "খৃস্টানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করবে।" আজ তো আফগান ভূমে তা-ই হচ্ছে। যদিও আমেরিকা এবং তার সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদেরকে বোকা ভেবে বারবার বুঝাতে চাচ্ছে, এটা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়; এটা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে তার উল্টো। মিস্টার বুশ তো প্রথমেই ক্রুসেড ঘোষণা দিয়ে বসে আছেন। স্পেনের এপ্রিল ফুলের মতো ক্রুসেডারগণ হয়ত আফগানিস্তানেও মুসলমানদেরকে 'ফুল' বানাতে চাচ্ছেন ? এ হাদীসে ব্যাপক শাহাদাতের সুসংবাদ দেয়া হলেও জয়-পরাজয়ের ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত দেয়া হয়নি। হয়ত এ যুদ্ধে সামরিক কোন জয়-পরাজয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অথবা এই যুদ্ধ ধারাবাহিক কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘস্থায়ী হবে। মাহদী আসা পর্যন্ত এই জিহাদ ও যুদ্ধ চলবে। এ ব্যাপারে আমরা সন্দিহান এ জন্য যে, হযরত সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) এর একটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে-

"তোমরা যখন খোরাসানের দিক থেকে কালো পতাকাবাহী দলকে আসতে দেখবে, তখন সেদিকে যাও। কারণ, সেখানে আল্লাহর খলীফা আল মাহদী আছেন।" (মুসনাদে আহমদ, বয়হাকী- ফি দালায়েলিন নাবুয়াহ মেশকাত 'কিতাবুল ফিতন' আশরাতুল

www.pathagar.com

সাআ)।

এ হাদীসে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে, খোরাসান থেকে আল্লাহর খলিফা মাহদী আসবেন। অন্য হাদীসে রয়েছে, মাহদীর আত্মপ্রকাশ বায়তুল্লায় ঘটবে। এ উক্তি দু'টি কি স্ববিরোধী হয়ে যাচ্ছে ? মোটেও না। মোল্লা আলী ক্বারী এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন-

"এই হাদীসের সাথে মোটেও সেই কথা স্ববিরোধী নয় যে, মাহদীর আত্মপ্রকাশ বায়তুল্লায় ঘটবে।" (মেশকাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মিরকাতুল মাফাতিহ')।

মাহদী চল্লিশ বছর বয়সে বায়তুল্লায় জনসম্মুখে আসবেন। কিন্তু জন্মের পর চল্লিশ বছর কোথায় থাকবেন, তা স্পষ্ট নয়। হতে পারে যে, তিনি খোরাসানে থাকবেন এবং সেখান থেকে একটি কাফেলা নিয়ে বায়তুল্লায় আসবেন। এখানে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। অথবা এমনও হতে পারে, মাহদীর মূল বাহিনী খোরাসান থেকে আসবে এবং তারাই প্রথম তার সাথে বায়তুল্লায় পরিচিত হবেন। তাই আমরা খোরাসান থেকে বাহিনী নিয়ে আসা আর বায়তুল্লায় আত্মপ্রকাশ করার মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা দেখছি না। উভয় হাদীস সহীহ। তবে আমাদের বিষয় হল 'খোরাসান'। আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে মহানবী (সাঃ) যে খোরাসানের প্রতি ইঙ্গিত করে গেলেন, তা কোথায় ? রাসূল (সাঃ)-এর সময়ে গোটা আফগান অঞ্চলের নাম ছিল খোরাসান। আফগানিস্তানের প্রাচীন নাম খোরাসান। এখনো আফগানিস্তানের একটি এলাকা খোরাসান নামে পরিচিত। অনেকে বলছেন, তৎকালীন সময়ে খোরাসান অঞ্চল বলতে গোটা দক্ষিণ এশিয়াকেই বুঝান হত। আমরা যদি বর্তমান পরিস্থিতি এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও জুবায়ের ইবনে নুফায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস দু'টিকে সামনে নিয়ে পর্যালোচনা করি, তবে স্পষ্ট প্রতিভাত হবে যে, আফগানিস্তানই সেই সৌভাগ্যের অধিকারী দেশ, যেখান থেকে স্বয়ং মাহদী তাঁর বাহিনীসহ অথবা শুধু তাঁর বাহিনী আবির্ভূত হবেন দাজ্জাল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে। সেই বাহিনীর পতাকা হবে কালো। অনেকে বলছেন, পাগড়ীও কালো হবে। আফগানিস্তানের সাথে আমেরিকার যে যুদ্ধ চলছে, হাদীসের আলোকে অনেকেই সন্দিহান যে, এটাই হয়ত সেই যুদ্ধ, যার প্রতি রাসূল (সাঃ) প্রচুর শাহাদাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

আমরা দেখছি, তালেবানদের পাগড়ী কাল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পতাকাও কাল। তাছাড়া তালেবানদের চরিত্রে সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শ প্রস্ফুটিত। এখানে আশ্রয় নিয়েছেন আরবের এমন কিছু মুজাহিদ, যাদের সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বের ধারণা, তারা এই সময়ের শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং মজলুম মানবতার প্রেরণা ও আযাদীর উৎস। তাই আমাদের মনে হচ্ছে, আজ আফগানিস্তানে যা হচ্ছে, তা হয়ত মাহদীর বাহিনী গঠনের প্রস্তুতি মাত্র। এই ব্যাখ্যা আমাদের হৃদয়কে আরো দৃঢ় করে, যখন দৃষ্টিপাত করি ফিলিস্তিন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতি। হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, ইহুদীরা হবে দাজ্জালের মূল বাহিনী এবং ফিলিস্তিনের 'লুদ' নামক গেটে হবে তাদের শক্ত ঘাঁটি। ইহুদীরা দীর্ঘ ইতিহাসের কোথাও স্থিতিশীল ছিল না, আজও নেই। কোন দিনই তারা কোন রাষ্ট্রের অধিকারী ছিল না। তাদের ভেতর মজ্জাগত যাযাবরবৃত্তি সুদীর্ঘকালের। কিন্তু দেখা গেল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইঙ্গ-মার্কিনীদের সর্বাত্মক সাহায্য-সহযেগিতায় ফিলিস্তিন ভূমে একটি ইহুদী রাষ্ট্র জন্ম নিল ইসরাইল নামে। আমাদের দৃষ্টিতে যদিও ইঙ্গ-মার্কিনীরা তাদের তৈলস্বার্থে ইসরাইলের জন্ম দিয়েছে; কিন্তু মূলত এর আড়ালে

www.pathagar.com

'লুদ' নামক গেটে দাজ্জাল বাহিনী গঠনেরই কাজ চলছে। আমরা স্পষ্ট দেখছি, বিশ্বের যাযাবর ইহুদীরা আস্তে আস্তে এখানে এসে সমবেত হচ্ছে। হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে, দাজ্জাল হবে বংশগত দিক থেকে ইহুদী। বোখারী শরীফের-

"ফেৎনা আসবে পূর্বদিক থেকে।"

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পূর্বদিক বুঝান হয়েছে। বিশ্ব মানচিত্রে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পূর্বদিক হচ্ছে ভারত। অনেকে বলছেন, এই হাদীসের 'ফেৎনা' শব্দ দিয়ে দাজ্জাল বুঝান হয়েছে। অনেকে স্পষ্ট বলেছেন, দাজ্জাল বের হবে হিন্দুস্থান থেকে। এ সম্পর্কে আমাদের কাছে হাদীসের কোন স্পষ্ট দলিল নেই বলে বিষয়টিকে সন্দেহের মধ্যে রাখতে হচ্ছে। তবে ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সাথে ইহুদীদের চারিত্রিক-মানসিক এবং রাষ্ট্রীয় গভীর সম্পর্ক দেখে কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। দাজ্জাল ইহুদী এবং ইহুদীরা তার মূল বাহিনী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাদীসে দাজ্জালের অনেকগুলো নিদর্শনের মধ্যে বলা হয়েছে, তার কপালে লেখা থাকবে 'কাফ-ফা-রা'। সে যে বাহনে আরোহণ করে যাতায়াত করবে, তা চল্লিশ হাত লম্বা হবে এবং এর কপালেও লেখা থাকবে 'কাফ-ফা-রা'। চল্লিশ হাত লম্বা বাহন তো এখন আমরা উড়োজাহাজকে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে দাজ্জালের বাহিনীও প্রস্তুত হচ্ছে। মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের সার্বক্ষণিক যুদ্ধের শেষ লড়াই হবে দাজ্জাল বনাম মাহদী বাহিনীর। হাদীসের ভাষ্য মতে, মাহদীর সেই বাহিনী আসবে খোরাসান থেকে। আজকে আমেরিকা বনাম আফগানিস্তানে যে যুদ্ধ চলছে, তা মূলত ইহুদী লবি বনাম মুসলিমদের যুদ্ধ। এই যুদ্ধকে আমাদের আর ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। এই যুদ্ধ বিভিন্ন মানুষের দৃষ্টিতে বিভিন্ন হলেও আমাদের কাছে হাদীসের ভাষ্য স্পষ্ট। এই যুদ্ধ মোটেও স্বল্পমেয়াদী নয়। বৃটিশ সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ স্যার মাইকেল বোবাস যদিও বলেছেন, এই যুদ্ধের সময়সীমা পঞ্চাশ বছর, তবে আমাদের ধারণা, এই যুদ্ধ চলবে আরো সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত। হয়ত হযরত মাহদী পর্যন্ত। সাময়িক জয়-পরাজয়, অভাব-সংকট, পরিবর্তনসমূহের মধ্যদিয়ে তা চলবে এবং মুসলমানদের শেষ বিজয় আসবে হযরত মাহদীর নেতৃত্বে। আমাদের মনে হচ্ছে, এই যুদ্ধ কত দীর্ঘ হবে তা খোদ আমেরিকা, বৃটেন কিংবা আফগানীরাও বলতে পারবে না। পাশ্চাত্য শক্তি চাইলেও এই যুদ্ধকে আর এড়াতে পারছে না। কেন জানি আজ মনে হচ্ছে, পৃথিবীটা খুব দ্রুত কিয়ামতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। রাসূল (সাঃ) কর্তৃক বর্ণিত কেয়ামতের আলামতসমূহ একের পর এক প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীটা মারাত্মকভাবে অশান্ত হয়ে উঠেছে। হাদীসের জ্ঞান ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন প্রতিটি মানুষ তাই আজ খুব চিন্তিত, সংকিত। তবুও আমরা আশাবাদী, শেষ বিজয় হবে আমাদেরই। ❑

ডিসেম্বর '০১
লেখক : লণ্ডন প্রবাসী প্রাবন্ধিক।

www.pathagar.com

তালিবানদের সরিয়ে কাবুলের গদিতে আজ কারা ?

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনের আক্রমণের জবাবে আমেরিকান সরকার সন্ত্রাসবাদবিরোধী বিস্তৃত জনমত গঠন করেছে। এক্ষেত্রে তালিবান-বিরোধী দল ও সংগঠনগুলোকে আমেরিকা সমর্থন জানিয়েছে। এই বিরোধী পক্ষ নিয়ে গঠিত হয়েছে ইউনাইটেড ফ্রন্ট, পূর্বে এটি নর্দার্ন এ্যালায়েন্স নামে পরিচিত ছিল। ১৯৭৯-১৯৮৯ পর্যন্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যাদের গেরিলা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু ইউনাইটেড ফ্রন্টে ছিল না, তাদেরও এই কোয়ালিশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে আগের এবং বর্তমান সেনাধ্যক্ষরা। সকলেই নেতৃত্ব পেতে উৎসুক অথচ আফগানিস্তানে মানবাধিকারের অপব্যবহার করেছে এরাই।

হিউমান রাইটস ওয়াচ এ ব্যাপারে চিন্তিত। কারণ এই সমস্ত সামরিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থের মিলনের ফলে গঠিত আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তী সরকার আবার সেই মানবাধিকারের অপব্যবহার করবে। ১১ সেপ্টেম্বর মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু তার উত্তরে আমেরিকার এমন উপায় অবলম্বন করা উচিত নয়, যার ফলে মানবাধিকার পদদলিত হয়। যাদের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, তাদের সাহায্য করাও উচিত নয়। অবশ্য আমেরিকার দাবি, তারা এখনো পর্যন্ত তালিবান-বিরোধীদের কোন অস্ত্র সাহায্য করে নি। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমগুলো জানাচ্ছে, আমেরিকা ইউনাইটেড ফ্রন্ট এবং অন্যান্য তালিবান বিরোধী আফগান দলগুলোকে অর্থনৈতিক এবং সামরিক সাহায্য করছে।

ইউনাইটেড ফ্রন্ট এই অর্থ ব্যবহার করতে পারে রাশিয়া থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করার জন্য। ইদানীংকালে, রাশিয়া এবং ইরান উভয়েই ইউনাইটেড ফ্রন্টকে অস্ত্র সাহায্য করছে। কারণ এ ব্যাপারে উভয়ের স্বার্থই জড়িয়ে আছে। বর্তমানে এরা ইউনাইটেড ফ্রন্টের উপর সমর্থন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে। রাশিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সেরজি ইভানভ ২০০১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বলেছেন যে, রাশিয়া ১৯৯৬ থেকেই নর্দার্ন অ্যালায়েন্সকে অবিরত সাহায্য করে যাচ্ছে। এক সপ্তাহ আগে প্রেসিডেন্ট ভেলাদিমির পুতিন বলেছেন, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রব্বানী সরকারকে রাশিয়া সহায়তা করবে, এমন কি অস্ত্রসাহায্যও দেবে। ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আলি শামখানি পয়লা অক্টোবর ২০০১-এর বলেছেন, "আমরা নর্দার্ন অ্যালায়েন্সকে পূর্বের মতই সমর্থন করে যাব।"

www.pathagar.com

ইউনাইটেড ফ্রন্ট/নর্দান অ্যালায়েন্স কি ?

১৯৯৬-তে যখন তালিবানরা আফগান রাজধানী কাবুল অধিকার করে, তখন তালিবান বিরোধী দলগুলো মিলিত হয়ে "দ্য ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট, ফর দ্য সালভেশন অফ আফগানিস্তান" গঠন করে যা সাধারণত ইউনাইটেড ফ্রন্ট বলে পরিচিত। ইউনাইটেড ফ্রন্ট সেই সরকারকেই সমর্থন করে, যাদেরকে উচ্ছেদ করে তালিবানরা ক্ষমতায় আসে। বোরহানুদ্দিন রব্বানি ছিল সেই সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং ইউনাইটেড ফ্রন্টের প্রধান। গত বছর তার সদর দপ্তর ছিল উত্তর আফগানের ফৈজাবাদে। কিন্তু আসল ক্ষমতা ছিল ইউনাইটেড ফ্রন্টের সেনাধ্যক্ষ আহমেদ শাহ মাসুদের হাতে, সেপ্টেম্বরে তার হত্যার আগে পর্যন্ত। তিনি আবার রব্বানি সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন।

জামিয়াত-ই-ইসলামি — এটি ছিল আফগানিস্তানের মূল ইসলামিক দল। ১৯৭০-এ কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এটি প্রতিষ্ঠা করে। এর নেতা ছিলেন ইসলামিক আইন বিভাগের অধ্যাপক রব্বানি। রব্বানি দলীয় প্রধান হলেও সবচেয়ে শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন মাসুদ। রব্বানি ও মাসুদ দুইজনই ছিলেন তাজিক সম্প্রদায়ের (পার্সী ভাষী সুন্নি মুসলিম) যদিও তারা আলাদা অঞ্চলের ছিলেন। মাসুদ বিশেষ সামরিক সাহায্য পেয়েছিল বিশেষত ইরান ও রাশিয়া থেকে।

হিজব-ই-ওয়াদাত-ইসলামি — এটি আফগানিস্তানের প্রধান 'শিয়া' দল। এদের প্রধান সমর্থক 'হাজারা' সম্প্রদায়। আব্দুল আলি মাজারি টি 'শিয়া' দলকে একত্রিত করে এই দলটি গঠন করেন। এটির বর্তমান নেতা মহম্মদ করিম খালিলি। এই দল ইরান থেকে সামরিক ও অন্যান্য সাহায্য পায়। যদিও ইরানী কর্তৃপক্ষ ও পার্টি নেতাদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে মতভেদ আছে। স্থানীয় 'হাজারা' ব্যবসায়ীদেরও সমর্থন এদের পিছনে আছে।

জানবিশ-ই-মিল্লি-ই-ইসলামি—'জানবিশ' প্রধানত উত্তরের উজবেক সম্প্রদায়কে একত্রিত করে, ১৯৯২ সালে প্রেসিডেন্ট নাজিবুল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এটি প্রধানত পার্সীভাষী বিভিন্ন দলের নেতা এবং উজবেক সম্প্রদায়ের গেরিলা যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত। ১৯৯৮-তে এরা তাদের সব অঞ্চলের উপর অধিকার হারায়। এটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নেতা আবদুল রসিদ দোস্তাম যিনি নাজিবুল্লার দেহরক্ষী থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাপ্রধান পরিণত হন, ১৯৯২-তে এই দল গুরুত্বপূর্ণ শহর মাজার-ই-শরীফ দখল করে। এছাড়া সামানগান, বালখ্, জোজান, কাগলান প্রদেশগুলিও এরা দখল করে। অন্য অস্থায়ী যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে, এই দলটি ১৯৯২-১৯৯৭ পর্যন্ত উত্তরে সবচেয়ে শক্তিশালী জোট ছিল। কিন্তু পরে অন্তর্দ্বন্দ্বে এরা বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৯৮ সালে মাজার-ই-শরীফের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। যদিও গত এপ্রিলে দোস্তাম উত্তর আফগানিস্তানে ফিরে আসেন। (বন বৈঠকে ক্ষমতার বাটোয়ারা নিয়ে টানাপোড়েনের সময় তার ভাগে ছিঁটেফোঁটা পড়ায় ক্ষুব্ধ দোস্তাম নয়া কাবুল সরকারকে বিপাকে ফেলার হুমকি দেন। পরে অবশ্য তিনি হামিদ কারজাইয়ের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিয়েছেন।)

হরকত-ই-ইসলামি—এটিও একটি 'শিয়া' পার্টি কিন্তু এরা কখনোই আয়াতুল্লা মহম্মদ আসিফ মুসিনির 'ওয়াদাৎ' দল যেটি ১৯৯৩-১৯৯৫ জামিয়াত-ই-ইসলামি দলের সঙ্গে

www.pathagar.com

যুক্ত ছিল, তাদের সাথে যোগ দেয় নি। এটির নেতারা বেশিরভাগই 'হাজারা' নয় এমন শিয়া সম্প্রদায়ের। এই দলটিও ইরান সমর্থিত।

ইত্তিহাদ-ই-ইসলামি— এই দলের নেতা আবদুল রসুল সইফ। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় এই দলটি সৌদি আরব থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিল।

আফগানিস্তানের দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ চলাকালীন এই সমস্ত দলগুলোই বারবার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করেছে। এর মধ্যে হত্যা, বোমাবাজি, অসামরিক ব্যক্তিদের উপর সরাসরি আক্রমণ, লুঠতরাজ, ধর্ষণ, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে উৎপীড়ন, শিশু সৈন্যের ব্যবহার সবই আছে। এগুলো মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। ইউনাইটেড ফ্রন্টের বিরুদ্ধে এইসব অপরাধ নথিভুক্ত। ১৯৯৬-৯৮-এর মধ্যে, উত্তর আফগানিস্তান ও কাবুল ইউনাইটেড ফ্রন্টের দখলে ছিল। বিশেষত তাদের লক্ষ্য ছিল পাস্তুন বা পাস্তুভাষী এবং অন্য তালিবান-সমর্থক সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা। শিশুদের যাদের বয়স ১৫-এর নিচে, তাদের সৈন্যদলে নেওয়া হত এবং তালিবানদের বিরুদ্ধে কাজে লাগান হতো। ১৯৯২ সালে নাজিবুল্লা সরকারের পতন থেকে ১৯৯৬ সালে তালিবানদের কাবুল দখল পর্যন্ত, যে সমস্ত দলই ইউনাইটেড ফ্রন্টে যোগ দিয়েছে, প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই অসামরিক ব্যক্তিদের উপর আক্রমণের অভিযোগ আছে।

১৯৯৯-এর মাঝামাঝি থেকে ২০০০-এর শুরু পর্যন্ত ভিটেমাটি ছাড়া কিছু গ্রামবাসী সংগ্চরক জেলার আশেপাশে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় ফুটে উঠেছে চার মাস ধরে ইউনাইটেড ফ্রন্ট সেখানে কী করেছে। হত্যা, বাড়ি পোড়ানো, লুটতরাজ কিছুই বাকি ছিল না। তাদের লক্ষ্য ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাস্তুনরাই, কিছু ক্ষেত্রে তাজিকরা। পরিবারের সামনে থেকে পুরুষদের তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

২০-২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮। কাবুলের উত্তর অঞ্চল থেকে প্রচুর রকেট ছোঁড়া হয়। তার মধ্যে একটা গিয়ে পড়ে জনবহুল রাতের বাজারের মধ্যে। আনুমানিক ৭৬ থেকে ১৮০ জন লোক তাতে মারা যান। মনে করা হচ্ছে, এটা মাসুদের দলের কাজ। তারা সে সময় আস্তানা গেঁড়েছিলেন কাবুলের ২৫ মাইল উত্তরে। যথারীতি ইউনাইটেড ফ্রন্ট সেনাধ্যক্ষ মাসুদ অসামরিক ব্যক্তিদের উপর আক্রমণ অস্বীকার করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক রেডক্রস বাহিনীর বিবরণ অনুযায়ী গত তিন বছরের মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

মে ১৯৯৭। মাজার-ই-শরীফের আশেপাশে জানবীশ দলের প্রধান জেন পালোয়ানের অধীনে ৩০০০-এর মতো বন্দী তালিবান সৈন্যদের সরাসরি হত্যা করা হয়। কিছু তালিবানদের নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে গুলি করা হয়। আর অন্যদের কুঁয়োর মধ্যে ফেলে গ্রেনেড মেরে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

৫ জানুয়ারি, ১৯৯৭। জানবীশ প্লেন থেকে কাবুলের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় বোমা ফেলা হয়। ফলে বহু অসামরিক ব্যক্তি হতাহত হয়।

মার্চ ১৯৯৫। মাসুদের অধীনস্থ জামিয়াত-ই-ইসলামি কাবুল অধিকার করার পর অবাধে ধর্ষণ লুট চালিয়ে গেছে। আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের ১৯৯৫-এর মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। তাতে প্রকাশ ঃ "মাসুদের দল সুসংবদ্ধভাবে

www.pathagar.com

লুটতরাজ ও ধর্ষণ চালিয়ে গেছে।”

১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩। রাতে জামিয়াত-ই-ইসলামি দল এবং রসুল সইফের ইত্তিহাদ-ই-ইসলামি দল পশ্চিম কাবুলের উপর চড়াও হয়ে 'হাজারা' নাগরিকদের হত্যা ও গুম করেছে, বহু ধর্ষণ করেছে। আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী সত্তর থেকে শতাধিক লোকের মৃত্যু হয়েছে।

১৯৯৪ সালে এক কাবুলেই ২৫০০০ লোক মারা যায়। বেশিরভাগ লোকই মারা যায় গোলার আঘাতে বা রকেটের আক্রমণে। শহরের এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয় আর বাকি অংশেরও অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়। সত্য বলতে কি, দেশে সম্পূর্ণ অরাজকতা চলতে থাকে। কাবুলে জামিয়াত-ই-ইসলামি, ইত্তিহাদ, ওয়াদাৎ—সকল দলগুলোই হত্যা, বিনা বিচারে বন্দী, উৎপীড়ন ইত্যাদিতে জড়িত ছিল।

আজ পর্যন্ত একজনও আফগান কমান্ডার পাওয়া যাবে না যার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নেই। ইউনাইটেড ফ্রন্টের মানবাধিকারের অপব্যবহার রোধে ন্যায়বিচার করার কোন সদিচ্ছাও নেই। এরা আবার সুযোগ পেলে অতীতের ভুলগুলোই করবে বলে মনে করা হয়। নতুন কাবুল সরকারে সেসব নেতাদেরই ক্ষমতায় বসিয়েছে আমেরিকা এবং তার সহযোগী দেশগুলো। এতে তালিবান-বিরোধীরা শক্তিশালী হলেও সাধারণ আফগান জনগণের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচবে না। আমেরিকা, রাশিয়া, ইরান এবং অন্যান্য কিছু দেশ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এটাও দেখতে হবে সেই সাহায্য কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই দায়িত্ব নিয়ে এরা অপারগ হলে, আরও জটিলতা বাড়বে। সে ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে এই দেশগুলো দায়ী থাকবে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ২০০১

(অনুবাদ—মৌসুমী সাহা)

www.pathagar.com

আফগান পুনর্গঠন ঃ বোমা এবং ডলার

উইলিয়াম ব্লুম

নভেম্বর ২১ তারিখের ওয়াশিংটন পোস্টে একটি খবরের শিরোনাম ছিল, 'ইউ এস মিটিং এনভিসনস্ রিবিল্ডিং অফ আফগানিস্তান" (আমেরিকা আফগানিস্তানের পুনর্গঠনের প্রতি নজর দিচ্ছে)। ওয়াশিংটন অনুষ্ঠিত চব্বিশটি দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের থেকে আগত নেতাদের একদিনব্যাপী ঐ মিটিংয়ের পর আমেরিকা ও জাপানের কর্তাব্যক্তিরা জানিয়েছেন যে তারা যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের দীর্ঘস্থায়ী পুনর্গঠনের জন্য একটি 'অ্যাকশন প্ল্যান' তৈরি করেছেন।

১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে আমেরিকান নাগরিকদের সামনে স্বদেশ সম্পর্কে একটা উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরার যে চেষ্টা প্রতিনিয়ত করা হচ্ছিল তাতে খুব লাভ হয়নি। এই শিরোনাম তাদের হতমান নৈতিকতাকে আবার খানিকটা চাঙ্গা করতে কিছুটা সাহায্য করবে ঠিকই, কিন্তু আগের অভিজ্ঞতার সূত্রে বলা যায়, এর প্রচারমূল্য যতটা, বাস্তবমূল্য তত নয়।

এই বিশেষ প্রবণতাটির সঙ্গে আমরা ইতোমধ্যেই পরিচিত হয়েছি। বিভিন্ন দেশে বোমা মেরে সেখানকার জনবসতি, শহরগুলোকে নিঃশেষে গুঁড়িয়ে দেওয়া, আর যারা তাতেও মরল না তাদের তাড়া করে ফেরা। আর তারপর সেই ধ্বংসস্তুপের কোনরকম পুনর্গঠনের জন্য কিছুমাত্র না করাটা আজ দীর্ঘদিন হল আমেরিকান ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

১৯৭৩-এর ২৭ জানুয়ারী আমেরিকা প্যারিসে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। সেই চুক্তির নাম, "ভিয়েতনামে যুদ্ধসমাপ্তি ও পুনঃস্থাপন চুক্তি"। তার আর্টিক্‌ল ২১ বলে, "আমেরিকা তার প্রথাগত নিয়মনীতি অনুসারে ভিয়েতনাম (উত্তর ভিয়েতনাম) গণপ্রজাতন্ত্র ও ইন্দোচীন জুড়ে যে যুদ্ধের ক্ষত তৈরি হয়েছে সেগুলি মুছে ফেলা এবং যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠনের জন্য সাহায্যদান করে যাবে"।

তার পাঁচদিন পরে উত্তর ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রীকে একটি বার্তায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্থির করে লিখে পাঠানো হয়।

১. কোন রাজনৈতিক শর্ত ছাড়াই আমেরিকা উত্তর ভিয়েতনামের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে সাহায্য দিতে থাকবে।

www.pathagar.com

২. আমেরিকার নিজস্ব অনুসন্ধানে অনুযায়ী, (যা তখনও প্রাথমিক স্তরে ছিল) যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য তার দেয় অর্থের পরিমাণ মোটামুটি দাঁড়াচ্ছে ৩.২৫ বিলিয়ন ডলার, যা দেওয়া হবে আগামী পাঁচ বছর ধরে।

কিন্তু যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার কিছুই আমেরিকা দিয়ে ওঠেনি কোনদিন। কখনও দেওয়া হবে এমন কোন সম্ভাবনাও নেই। একই সময়কালে লাওস এবং কাম্পুচিয়াও একইভাবে ধ্বংসস্তূপে পর্যবসিত হয়েছিল। তারও হোতা যুক্তরাষ্ট্র। ভিয়েতনামের মতই অবিশ্রান্ত মার্কিন বোমাবর্ষণে ধ্বংস হয়েছিল ঐ দেশগুলোও। ইন্দোচীনের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই দেশগুলোও কিন্তু একইভাবে আমেরিকার তথাকথিত 'প্রথাগত নীতি' অনুযায়ী পুনর্গঠন সাহায্যের দাবীদার ছিল।

তারপরের ঘটনা ১৯৮০-তে। আমেরিকার বোমার এবারের লক্ষ্যস্থল গ্রানাদা ও পানামা। উভয়ের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী। শ'য়ে শ'য়ে পানামানিয়ান মানুষ 'অপারেশন জাস্ট কজ্' (আমেরিকানরা ঐসব দেশে তাদের বোমাবাজিকে খোলাখুলিই এই নামে ডাকতো) এর ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার একটা 'জাস্ট কম্পেন্‌শেসন' (যথাযথ ক্ষতিপূরণ) এর জন্য অরগানাইজেশন অফ আমেরিকান স্টেটস এবং আমেরিকার বিচারালয়ের কাছে দাবী জানাতে থাকেন। এমনকি তারা সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত যেতে পিছপা ছিলেন না। কিন্তু অরগানাইজেশন অফ আমেরিকান স্টেটস চলতো ওয়াশিংটনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে। ফলে যা হবার হয়। তারা কিছুই পান না, যেমন পান না গ্রানাডার মানুষও।

এরপর ইরাকের পালা, ১৯৯১ সাল। চল্লিশদিন এবং চল্লিশরাত্রি টানা বোমাবর্ষণে ইরাক ক্ষতবিক্ষত হয়। তাদের শক্তিসম্পদ, পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং শৌচব্যবস্থা থেকে শুরু করে আধুনিক সমাজের চিহ্নবাহী যা কিছু সেখানে ছিল সবই ভেঙে পড়ে ঐ তাণ্ডবে। আমরা জানি আমেরিকা আজ পর্যন্ত ইরাককে পুনর্গঠনের জন্য কতটা কি সাহায্য করেছে।

১৯৯৮ সালে দিব্যজ্ঞানী আমেরিকার শিকার হয় সুদান। সেখানের একটি কারখানায় আছড়ে পড়ে আমেরিকান ক্রুইজ মিসাইল। অভিযোগ, সেখানে নাকি রাসায়নিক জীবাণু অস্ত্র তৈরি হচ্ছিলো। বাস্তবে হতদরিদ্র দেশটির মোট জীবনদায়ী ওষুধ ৯০ শতাংশ উৎপাদিত হত ঐ কারখানাটিতে। তারপর কিন্তু ঐ কারখানার সম্পত্তির উপর অধিকার কায়েম করেও পরে তা ছেড়ে দিতে হয় আমেরিকাকে-পক্ষান্তরে যা ভুল স্বীকার। ফলে নিশ্চিতভাবেই সেক্ষেত্রে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা। কিন্তু ২০০১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত কারখানার মালিক, সুদানের সরকার কিম্বা মিসাইলে আহত মানুষজন, কাউকেই একটি পয়সাও দেওয়া হয়নি।

তার পরের বছরের ঘটনা যুগোশ্লাভিয়ায় ৭৮ দিনের অহোরাত্র বোমাবর্ষণ! একটা উন্নত দেশকে কার্যত প্রাক-শিল্পায়নের অবস্থায় পৌঁছে দেওয়া হল। পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা সেখানে আকাশচুম্বী। তার দু'বছর পরে, ২০০১-এর জুন মাসে সার্বিয়ানরা ওয়াশিংটনের রক্তচক্ষুতে স্লোবোদান মিলোসেভিচকে উৎখাত করে তাকে হেগেতে ক্যাঙ্গারু কোর্টের হাতে তুলে দেয়। আমেরিকা রাষ্ট্রসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলের উপর কব্জা জমায়। তারপরই ইউরোপীয়ান কমিশন আর বিশ্বব্যাঙ্কের পৌরোহিত্যে একটি 'ডোনারস্ কনফারেন্স'-এর আয়োজন করা হয়, যার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল যুগোশ্লাভিয়ার পুনর্গঠন।

শেষমেষ অবশ্য অন্য সব কিছুকে ছাপিয়ে ঐ কনফারেন্সটির মূল উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায় যুগোশ্লাভিয়ার ঋণ প্রসঙ্গ।

সার্বিয়ার প্রধানমন্ত্রী জোরান জিন্‌ডজিকের ভাল মাত্রায় পশ্চিমপন্থী বলে 'নাম' আছে। একটি জার্মান খবরের কাগজ 'ভার স্পিগেল'কে তিনি গত জুলাই মাসে একটি ইন্টারভিউ দেন। সেখানে তিনি বলেন যে তিনি পশ্চিমের এই ব্যবহারে প্রতারিত বোধ করছেন। তিনি বলেন, "এর চেয়ে অনেক ভাল যদি ঐ 'ডোনারস্ কনফারেন্স' আদৌ সংগঠিত না হত এবং তার বদলে আমাদের ৫০ মিলিয়ন ডয়েস মার্ক ক্যাশে দেওয়া হত ... আগস্টে আমাদের প্রথম কিস্তি হিসেবে ৩০০ মিলিয়ন ইউরো পাওয়ার কথা। হঠাৎ আমাদের বলা হচ্ছে যে তার মধ্যে টিটোর সময়কার ঋণের জেরে তার থেকে ২২৫ মিলিয়ন ইউরো কেটে নেওয়া হবে। ঐ পরিমাণের দুই তৃতীয়াংশে হল গিয়ে ফাইন ও সুদ, যা জমে উঠেছিলো মিলোসেভিচ্-এর আমলে গত দশ বছর ধরে। মিলোসেভিচ্ সেটা দিতে চাননি। আর বাকী যে ৭৫ মিলিয়ন ইউরো আমরা পাবো, তাও সামনের নভেম্বরের আগে নয়। আমাদের বলা হচ্ছে পশ্চিমের নাকি এরকমই রীতি। এর অর্থটা দাঁড়াচ্ছে একজন প্রচণ্ড অসুস্থ মানুষকে তার মৃত্যুর পরে ওষুধ দেওয়ার মত। আমাদের কাছে জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" গত আড়াই বছর ধরে যুগোশ্লাভিয়ার অনেকগুলো সেতু দানিয়ুবে ভেঙে পড়ে আছে, দেশের বহু কারখানা আর বাড়ীঘর বিধ্বস্ত, রাস্তাগুলো ব্যবহার্য নয়। এখনও পর্যন্ত দেশটি পুনর্গঠনের জন্য কোন ফান্ড পায়নি, বোমা মেরে যে দেশটি তাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল সেই মার্কিন দেশের থেকে।

আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে ক্ষমতায় যেই আসুক না কেন, তার পক্ষে সেখানে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি বসানো, তেল আর গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন ঠেকানো সম্ভব হবে না। ওয়াশিংটন যা চাইবে তাই হবে। কিন্তু আফগান জনগণের জন্য কিছু পুনর্গঠনে আমেরিকার সাহায্য যদি কেউ আশা করেন তো সে অপেক্ষা কত দীর্ঘ হবে কেউ জানে না।

উইলিয়াম ব্লুম "কিলিং হোপ : ইউ এস মিলিটারী অ্যান্ড সি আই এ ইন্টারভেনশনস কিন্স ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু" এবং "রোগ স্টেট : আ গাইড টু দি ওয়ার্ল্ডর্স ওনলি সুপারপাওয়ার", এই দুটি গ্রন্থের লেখক।

Courtesy
http/members.aol.com/superogue/homepage/htm

অনুবাদ : অনিন্দ্য সেন

www.pathagar.com

আফগান নারী ও মার্কিন কুম্ভীরাশ্রু

মিনি ব্রুস প্রাট

আফগানিস্তানের মাটিতে মার্কিন বোমাবাজি ও সামরিক তৎপরতা যত তীব্র হয়েছে, তথাকথিত মূলস্রোতের প্রচারমাধ্যমগুলো ততই লেখা, ছবি, মতামত, সাক্ষাৎকার ছেপে দাবি করেছে যে, এই যুদ্ধে আফগানিস্তানের নারীদের মুক্তি ঘটছে। তারা এটাকে এক তালিবান-নিকেশ অভিযানের উপরি পাওনা বলছে। যা নারীকে একদিকে যেমন তালিবানদের নির্দয় শাসন থেকে মুক্তি দেবে অন্যদিকে নবগঠিত সরকারের কাছে তার রাজনৈতিক অধিকার আদায় করবার সুযোগও এনে দেবে।

মার্কিন উপ-রাষ্ট্রপতি ডিক্ চেনী, প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামসফিল্ড, বিদেশ সচিব কলিন পাওয়েলসহ সমস্ত সরকারি আমলা এই বিষয়টিকে বারবার উল্লেখ করেছেন তাদের সাক্ষাৎকারে, বৈঠকে, সাংবাদিক সম্মেলনে। বিষয়টির নাটকীয়তা চূড়ান্ত পর্যায়ে যায়, যখন রাষ্ট্রপতি বুশের বদলে তার পত্নী লরা বুশ ১৭ নভেম্বর, প্রেসিডেন্টের জন্য নির্দিষ্ট শনিবারের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। প্রতিপাদ্য অবশ্যই তাঁর স্বামীর বাগাড়ম্বরের পুনরাবৃত্তি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার পবিত্র যুদ্ধ নাকি আসলে আফগান মেয়েদের নিজেদের যুদ্ধ। মার্কিন প্রচার মাধ্যমগুলোর এই আক্রমণাত্মক প্রচারাভিযান পরিচালনার দায়িত্ব ছিল সরকারের কোয়ালিশন ইনফরমেশন সেন্টার দপ্তরের। এই সেন্টার তৈরিই হয়েছিল যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে কোনো সমালোচনাকে বন্ধ করতে। এই যুদ্ধ-জিগির সুনিপুণভাবে পরিচালনা করেন জনসংযোগের জগতে প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব শারলট বিয়ার এবং বিজ্ঞাপন এজেন্সির পুরোধা জে. ওয়াল্টার থমসন।

আফগান নারীদের নিয়ে এই প্রচারাভিযানের নেতৃত্বে আছেন পেন্টাগনের মুখপাত্র ভিক্টোরিয়া ক্লার্ক ও ভাইস প্রেসিডেন্ট চেনীর মুখ্য রাজনৈতিক পরামর্শদাতা মেরি মার্টলিনসহ চারজন মহিলা।

এই মহিলাদের মুখপাত্র হিসেবে মর্টলিন যুদ্ধের পক্ষে প্রচারে বলেন, "আমার মনে হয় মহিলা হিসেবে আমাদের অবচেতনে এই বিষয়টি নিয়ে পুঞ্জীভূত রাগ একটু বেশিই আছে। আমার সব সময় মনে হয়, অত্যাচারিত আফগান মহিলাদের এক তৃতীয়াংশ তালিবান শাসনের আগে ডাক্তার, শিক্ষিকা বা আইনজীবী ছিলেন। এই কথাটা ভাবলেই

www.pathagar.com

আমার ভয়ঙ্কর রাগ হতে থাকে, আর আমি নিজেকে ঠিক সামলাতে পারি না।" তালিবানি শাসনের আগে কোন সময়ের কথা মার্টলিন বলছেন ? এই 'ভয়ঙ্কর রাগ' তো আমাদের হতে পারে যদি আমরা সত্যি সত্যি আফগানিস্তানের নারী স্বাধীনতার ইতিহাসের দিকে তাকাই।

হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে তালিবানি শাসনের সময় আফগানিস্তানের মহিলাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু তালিবানদের এই উত্থান কিভাবে সম্ভব হল ? এতে আমেরিকার দায়ভার কতটা ?

১৯৭৮ সালের আধা-মার্কসবাদী বিপ্লব আফগানিস্তানে এক ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠন করে, যারা সামন্তপ্রভুদের হাত থেকে শ্রমিক, কৃষক ও বৃহৎ অংশের মেহনতী জনগণকে মুক্ত করার চেষ্টা চালায়। এই ধর্মনিরপেক্ষ সংগ্রামের মূলে ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সমাজের প্রেরণা। যার পুরোধা ছিল প্রোগ্রেসিভ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব আফগানিস্তান। এরা সমস্ত প্রজার সব বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন। বহু প্রজন্ম ধরে জমা ঋণ ও তার চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সামন্তপ্রভুদের কাছে ভূমি শ্রমিকদের প্রায় ক্রীতদাস করে রেখেছিল। নতুন সরকার সেই ঋণভার থেকে মুক্তি দেন। সামগ্রিকভাবে মহিলাদের উন্নতি ও স্বাধীনতার প্রচেষ্টাও চালান।

বিপ্লবীরা প্রথমেই মহিলাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে তাদের জন্য বিশেষ সাক্ষরতা প্রকল্প চালু করেন। তার আগে মহিলাদের মধ্যে নিরক্ষরের হার ছিল ৯৬ শতাংশ। এরা নতুন শিক্ষিকা নিয়োগ করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা শুরু করেন। বিশেষ করে মহিলাদের দিয়ে গঠিত দল নিয়ে তারা গ্রামে গ্রামে চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করেন। ১৯৮৫ সালের মধ্যে হাসপাতালে আসন সংখ্যা বাড়ে ৮০ শতাংশ।

বিয়েতে কন্যাপণ দেওয়া-নেওয়ার অনুশাসন লঘু করা হয়। জীবনসঙ্গী বেছে নেবার স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাদের, একই সঙ্গে বিয়ের আগে কুমারীত্ব খোয়ানোর 'অপরাধে'র শাস্তির যে বিধি আগে প্রচলিত ছিল, তাও তুলে দেওয়া হয়। সাংবিধানিক সমানাধিকারের ধারণা কার্যকরী হয়। ডাক্তার, শিক্ষক বা আইনজীবী হিসেবে কাজ করার স্বাধীনতা অর্জন করেন আফগান নারী।

প্রশ্ন জাগে, মার্কিন সরকার কি এতসব জানত ? আফগানিস্তানের এই বিপ্লব সম্পর্কে সমস্ত তথ্য মার্কিন সরকারের সামরিক দফতর প্রকাশিত একটি বই, যার নাম "Afghanisthan a country study for 1986"-এ আছে।

তবু এই প্রগতিশীল সরকারকে উৎখাত করতেই রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার ধর্মীয় মৌলবাদীদের দ্বারা গঠিত এক প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোকে মদদ দেন। ১৯৭৯ সালে এই শ্বেতসন্ত্রাস শুরু হয়। সি. আই. এ.-র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদপুষ্ট এই সন্ত্রাস, আফগান সরকারকে বাধ্য করে সোভিয়েত সেনার সাহায্য চাইতে। এর ফলশ্রুতিতে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তা প্রায় এক দশক ধরে চলে, এবং শেষপর্যন্ত কার্টার ও পরবর্তীকালে রিগ্যানের পরিকল্পনামাফিক আফগানিস্তানের প্রগতিশীল সরকারকে উৎখাত করতে সমর্থ হয়। কিন্তু গৃহযুদ্ধ থেকে আফগানিস্তানের নিষ্কৃতি মেলেনি। নর্দার্ন এলায়েন্স এবং অন্যান্য যুদ্ধবাজ গোষ্ঠিগুলো, যারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন সামন্তশক্তির প্রতিনিধি, তারা কর্তৃত্বের জন্য

www.pathagar.com

নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়িতে বহুবছর লিপ্ত ছিল। প্রগতিশীল এই আফগান সরকারের বিরোধিতার জন্য সি.আই.এ.-র পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৮০ সালে ওসামা বিন লাদেনের সংগঠন গঠিত হয়। তদানীন্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ (সিনিয়র) পুরো কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন। বিন লাদেনের দল এবং অন্য মুজাহিদরা এরপর শিক্ষক, ডাক্তার, নার্সদের খুন করা শুরু করে; বোরখা না পরা মহিলাদের অঙ্গহানিও শুরু হয়। মার্কিন যুদ্ধ ক্ষেপণাস্ত্র স্টিংগার মিসাইল দিয়ে অসামরিক বিমানের ওপর আঘাত হানাও শুরু হয়।

মার্কিন মাথাব্যথা

এখন জুনিয়র বুশ ও তার জেনারেলরা, তাদের নিজের সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শ্বেতসন্ত্রাসের রাজত্বে নারীদের স্বাধীনতা নিয়ে দুশ্চিন্তা দেখাচ্ছে। কিন্তু চিরকালই তারা আফগান নারীদের দুরবস্থা সম্পর্কে উদাসীন ছিলো। হোয়াইট হাউস এবং পেন্টাগন আফগানিস্তানে তাদের মদদপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর নারী-বিরোধী মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল। কিন্তু তেল ব্যবসায়ীদের আফগানিস্তানের ওপর দিয়ে পাইপলাইন বসানো দশকব্যাপী প্রচেষ্টার সাফল্য হোয়াইট হাউসের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

২৬ মে, ১৯৯৭ সালে, নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক লেখায় জন এফ. বার্নস লেখেন, -"মহিলাদের ওপর বর্বর অত্যাচার, ফৌজদারি আইনের অবসান, অপরাধীদের অঙ্গহানি, পাথর ছুঁড়ে গণপিটুনিতে মৃত্যুদণ্ডের মতন আচরণবিধির কিছু মৌখিক বিরোধিতা ছাড়া মার্কিন প্রশাসনের ব্যবহার দেখে সবসময়ই মনে হয়েছে যে আফগানিস্তানের মাটিতে মার্কিন দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্যই তালিবান সরকার গঠিত হয়।" তালিবান-শাসন মধ্য এশিয়ায় মার্কিন বিদেশ-নীতির অন্যতম স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়।

"ক্লিনটন প্রশাসনের দৃঢ় ধারণা ছিল যে তালিবানদের জয় আফগানিস্তানের ১৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ যে বহুবছরের গৃহযুদ্ধ, তার অবসান ঘটাবে। শুধু তাই নয় সুন্নি মতাবলম্বী তালিবানরা ইরানের শিয়া মুসলিম নেতৃত্বের ঘোর বিরোধী; এর ফলশ্রুতি হিসাবে ওই এলাকায় ইরানের শক্তি খর্ব করবে। এবং নতুন বাণিজ্যের সম্ভাবনা রাশিয়া এবং ইরানকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করবে লিখেছেন বার্নস।

তেল-কাহিনী অমৃত সমান। "উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ক্যালিফোর্নিয়ার ইউনোকোল কর্পোরেশনের আড়াই বিলিয়ন ডলারের পাইপলাইন প্রজেক্টের কথা। এটা তুর্কমেনিস্তানের খনি থেকে আফগানিস্তানের বুক চিরে পাকিস্তানে সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে। যদিও মানবাধিকার সংগঠনগুলি এর বিরোধিতা করছে। কিন্তু এই পাইপলাইন, যা তালিবানরা ইতোমধ্যেই প্রাথমিকভাবে অনুমোদন করেছে, পূর্বতন সোভিয়েতের বিভিন্ন দেশগুলির খনিজ সম্পদকে বিশ্বের বাজারে তুলে দেবে। এতে ওই রাষ্ট্রগুলোর ওপর মস্কোর রাজনৈতিক আধিপত্যও খানিকটা খর্ব হবে।" সুতরাং তালিবানদের তৈলমর্দন চলছিল।

১৯৯৮ সালের মে মাসে সি. আই. এ. সম্পর্কে টাইমস্ ম্যাগাজিনের রিপোর্ট বলছে, "সি. আই. এ. এক গোপন বাহিনী তৈরি করেছে মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখবার জন্য। সি. আই. এ.-র অফিসার এবং পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন ছদ্মবেশে দক্ষিণ রাশিয়া ও ক্যাস্পিয়ান সাগর উপকূলে

www.pathagar.com

তেলের খোঁজে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এদের পেশ করা রিপোর্ট অনুসারে বিদেশ সচিব ম্যাডেলিন অলব্রাইট বলেন যে, 'ওই এলাকার ভবিষ্যতকে নির্ধারিত করার জন্য কাজ করাটা হবে দারুণ সম্ভাবনাময় ও উত্তেজনাপূর্ণ।"

ভিক্ষার স্বাধীনতা

আজ আমেরিকা যে আফগানিস্তানের এবং সেই সঙ্গে মধ্য এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যত ঠিক করবার দায়িত্ব নিয়েছে, তা মোটেই আফগান নারীর দুরবস্থা থেকে তাকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। যুদ্ধের প্রথম দিনই মার্কিন বোমাবর্ষণের শিকার হয় কাবুলের একটি হাসপাতাল। এই হানায় ১৩ জন মহিলা প্রাণ হারান। 'ভুলবশত' বোমা, মিসাইল ছুঁড়ে নারী-শিশু, নিরীহ মানুষকে হত্যার ফাঁকে ফাঁকে চলছে 'মুক্তি'র সচিত্র বিবরণ। ফলাও করে ছাপাচ্ছে বোরখা-মুক্ত আফগান মহিলার ছবি। চাকরির খোঁজে তাদের বেরোনোর কাহিনী।

আবার একই সঙ্গে বুশ প্রশাসন স্বীকার করেছে যে, তারা নতুন সরকার গঠনে মহিলাদের অংশগ্রহণ করার পক্ষে ওকালতি করবে না। বন্ বৈঠকে শেষ পর্যন্ত নামকে ওয়াস্তে তিনজন মহিলাকে ডাকা হয়েছিল, তাদের একজন এক প্রাক্তন মুজাহিদীন কমান্ডারের বিধবা স্ত্রী আর বাকি দুজন লতায় পাতায় রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত।

যুদ্ধ, মৃত্যু, আর ধ্বংসের ভয়াবহতা কাটিয়ে উঠে আফগান মহিলারা কতটা স্বাধীনতা বা অধিকার ফিরে পাবেন, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের চোখ ফেরাতে হবে "বোরখার আড়ালে" নামক ১৯ নভেম্বর নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটা লেখায়। লেখাটির শেষে উঠে এসেছে এক ৫৬ বছরের মহিলার কথা যার কোনও প্রথাগত শিক্ষা নেই, যার স্বামী মৃত কিন্তু আট সন্তান বর্তমান।

লেখাটির শেষ লাইনে, সাম্রাজ্যবাদের দেখানো নারী স্বাধীনতার রঙিন মুখোশের পিছন থেকে 'স্বাধীন' আফগান নারীর আসল মুখটি বেরিয়ে পড়ে-"আজ শেষ পর্যন্ত তারা স্বাধীন। তাদের ভিক্ষে চাইতে বাধা দেওয়ার মত আর কেউ নেই।" এই আফগান মহিলার ভবিষ্যত আজ মিলে গেছে বহু আমেরিকান মহিলার ভবিষ্যতের সঙ্গে। আর এই যুদ্ধের অস্বাভাবিক খরচ ভারি হয়ে নামবে আমেরিকার গরীব মানুষের মাথায়, আর তার খেসারত সবচেয়ে বেশি হবে মহিলা ও শিশুদের।

আফগানিস্তানে এই যুদ্ধ কখনই সে দেশের নারীর দুরবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে লড়া হয়নি। কোনও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার বিষয় এটা নয়। এ যুদ্ধ সম্পূর্ণই সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য বিস্তার ও বাজার দখলের লড়াই। তাই যুদ্ধ এবং এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করেই একমাত্র নারী স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে।

মিনি ব্রুস প্রাট, আমেরিকায় নারী অধিকার ও বর্ণ-বিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। লেখাটি রেভোলিউশনারি অ্যাসোসিয়েশন অব উইমেন অব আফগানিস্তান-এর ওয়েবসাইট সূত্রে পাওয়া।

অনুবাদ ঃ অনলাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

www.pathagar.com

মোল্লা উমরের প্রতি প্রখ্যাত তিন আরব মাশায়েখের ঐতিহাসিক পত্র

আপনি মুসলিম জাতির গৌরব, সমকালীন ইতিহাসের মহানায়ক বিশ্ব মুসলিম আপনার সঙ্গে আছে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হামুদ ইবনে আকরা আশ-শুআইবী, আলী খুদায়র আল খুদায়র ও সুলায়মান ইবনে নাসের আল-উল্‌ওয়ানের পক্ষ থেকে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মদ উমর মুজাহিদের প্রতি-আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর মুজাহিদ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মহান আল্লাহ আপনার হেফাজত ও তত্ত্বাবধান করুন এবং সত্যের ওপর আপনাকে আরো দৃঢ়পদ করে দিন। আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, আমাদের পত্র যখন আপনার হাতে পৌছাবে তখন আপনি পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন। আমীরুল মুমিনীন! মুসলিম উম্মাহর আলেম সমাজের জন্য আপনি গৌরবের প্রতীক। কেননা আপনি এ উম্মতকে 'আনতুমুল আ'লাউনা' বা তোমরাই জয়ী হবে-এ কথার ওপর আমল করে দেখিয়ে দিয়েছেন। বস্তুগত বিজয় বা শ্রেষ্ঠত্ব ইসলামের মূখ্য না, এখানে প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শরীয়তের ওপর সুদৃঢ় থেকে যে কোন অবস্থার মোকাবিলা করা। যেন আল্লাহ বলেছেন, 'ভীত হয়ো না, উদ্বিগ্ন হয়ো না, পূর্ণ ঈমানদার হতে পারলে তোমরাই বিজয়ী হবে।' এ আয়াত হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশে তখন নাযিল করা হয় যখন ওহুদের ময়দানে তাদের এক সাময়িক পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, চূড়ান্ত বিজয়। আর ইসলামের ওপর দৃঢ়পদ থাকাই মুসলমানের বিজয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ইসলামই সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত থাকবে অপর কোন ধর্মই এর মোকাবিলায় এসে সফল হতে পারবে না।

ইমাম বোখারী প্রসঙ্গত এর উল্লেখ করেছেন, ইমাম তাহাবী বর্ণনা করেছেন বিশুদ্ধ সনদে। তো, মুসলমানরা সাময়িক বেকায়দায় পড়লেও বিজয় ইসলাম ও মুসলমানেরই

www.pathagar.com

হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন, 'মর্যাদা ও পরাক্রম তো আল্লাহ, তার রাসূলের এবং ঈমানদারদের।' আর ওসব ঈমানদারের যারা আরব বিশ্বের প্রখ্যাত তিন মাশায়েখ আল্লামা শায়খ হামুদ ইবনে আকলা আশ-শুআইবী, শায়খ আলী খুদায়র আল খুদায়র ও শায়খ সুলায়মান ইবনে নাসের আল-উল্‌ওয়ান তালিবান-প্রধান মোল্লা মোহাম্মদ উমরের নামে এক ঐতিহাসিক পত্র প্রেরণ করেন। সম্প্রতি ওয়েব সাইটে প্রচারকৃত এ পত্রে তারা বলেন, আল্লাহতাআলা আপনাকে হেফাজত করুন এবং আমাদের এ পত্র সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় আপনি প্রাপ্ত হন। প্রখ্যাত আরব আলেমগণ বলেন, আপনার অস্তিত্ব আজ ইসলামী দুনিয়ার জন্য গর্ব ও অহঙ্কারের কারণ। আরব বিশ্বের জাগ্রত জনতা ও আলেম সমাজ আপনাকে ইসলামের মর্যাদার প্রতীক বলে মনে করেন। কেননা, আপনি আধুনিক যুগে পবিত্র কোরআনের ওপর আমল করে দেখিয়ে দিয়েছেন। যদিও পৃথিবীর এক বিশাল সংখ্যক নাগরিক আপনার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। এতে আপনার মানমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড়ও লাগবে না।

প্রতিনিধিত্বশীল আরব ইসলামী চিন্তাবিদগণ আরো বলেন, এই উম্মতের অভিভাবকদের মধ্যে আপনি অন্যতম। বিশ্ববাসীর সামনে এ কথা আজ সুপ্রমাণিত যে, মুসলিম উম্মাহর প্রতি আপনার দরদ ও ভালবাসা অন্য অনেকের চেয়ে বেশী। আপনি কুফরের সামনে মাথানত না করার অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। বিশ্ব ইসলামবিদ্বেষী শক্তির পক্ষ থেকে আপনার ন্যায় এমন এক আপসহীন নেতার ওপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছে, কোরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রকৃত মর্দে মুমিনের নিয়তি এমনই হওয়ার কথা। আপনি আমাদের সালাম গ্রহণ করুন, আপনার সকল সহকর্মী, বিশেষ করে মোল্লা দাদ-আল্লাহকেও আমাদের সালাম ও মোবারকবাদ।

যারা আপনাদের শত্রু তারা আফগানিস্তানের স্বাধীনতা, সম্মান ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থার দুশমন। এরা মার্কিনীদের হয়ে আফগানিস্তানে কুফরী সংস্কৃতি চালু করতে চায়। দুনিয়ার সকল অপশক্তি তাদের পেছনে আছে। আপনারা যে কোন উপায়ে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকুন, চূড়ান্ত বিজয় আপনাদেরই হবে। ইসলামের ওপর দৃঢ়পদ মুজাহিদদের সাহায্য করা আল্লাহর অমোঘ প্রতিশ্রুতি।

আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে নিরাপোষ এসব মুমিন আল্লাহর ওপর অকৃত্রিম বিশ্বাস ও দৃঢ় আস্থার ফলে মর্যাদাবান থাকবে, আর আল্লাহর পরাক্রমে সে পরাক্রান্তও হবে। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ সত্য। হে আমিরুল মুমিনীন! বিশ্ব মুসলিমের একটি অংশ আপনার কর্মের সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে অজ্ঞ। কিন্তু এতে করে আপনার মর্যাদায় বিন্দুমাত্রও কমতি আসবে না। আপনি এ উম্মাহর অনেক বড় একজন ব্যক্তিত্ব। অচিরেই আমরা বর্তমান সময়ের ইতিহাস রচনায় হাত দেব, অনাগত প্রজন্মকে আমরা বলে যাব যে, মোল্লা মোহাম্মদ উমর ছিলেন আজকের ইসলামী জগতের মহানায়ক। যদি কোন ভূমিকা গ্রহণ ছাড়া প্রথমেই আপনাকে শহীদ করে দেয়া হতো তথাপি আপনার অবদান স্বর্ণাক্ষরেই লিপিবদ্ধ থাকত। কেননা, বিশ্বশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়াই আপনি ইসলামের মৌলিক নীতি পদ্ধতির ওপর দৃঢ়চিত্তে শক্তপদে প্রতিষ্ঠিত থেকে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন, যখন মুসলিম নামধারী বিপুলসংখ্যক মানুষ ক্রুসেডারদের সামনে

www.pathagar.com

ঝুঁকে পড়েছিল। আমরা সবাই মিলে রোজ হাশরে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেব যে, এ যুগে মুসলিম উম্মাহর সর্বাপেক্ষা বড় শুভার্থী ও কল্যাণ-প্রয়াসী ছিলেন আপনি।

আফসোস! আমরা মুসলমানরা আপনার মতো প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারিনি। আপনার ব্যক্তিত্ব মুসলিম জাতির জন্য অনেক বড় সৌভাগ্য ও আনন্দের উৎস। বাতিলের সামনে মাথা না নোয়ানো এ মানুষটির প্রাপ্য আমরা দিতে পারিনি। হে আমিরুল মুমিনীন! যখন আপনি আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতার লাগাম হাতে নিয়েছিলেন তখন যেখানে নৈরাজ্য বিরাজ করছিল, আপনি সেখানে ন্যায়, সুবিচার, সাম্য, সম্মান, সহানুভূতি ও আস্থার পরিবেশ কায়েম করেন। আপনিই তো সোভিয়েতবিরোধী জিহাদের সুফল উম্মতে মোহাম্মদীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। কেননা, ইতঃপূর্বে এ মহান জিহাদের মহামূল্যবান অর্জন কমিউনিস্ট, ধর্মনিরপেক্ষ ও বিধর্মীদের চক্রান্তের ফলে নস্যাৎ হতে যাচ্ছিল। তখন এ সর্বনাশ আপনি ঠেকিয়েছিলেন। এমন কি গোটা মুসলিম বিশ্ব নিজ হৃত গৌরব উদ্ধারের প্রত্যাশা নিয়ে আফগান ভূমির দিকে তাকিয়ে ছিল। তারা ভাবত যে, মুসলমানের সম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা আফগান মুজাহিদদের নীতি অনুসরণেই সম্ভব।

আপনাকে আফগানিস্তানের প্রধান নির্বাহী নিয়োগ করা হলে আপনি যখন দেশটিতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থা চালু করার ঘোষণা দেন তখন আমরা বলেছি, আলহামদুলিল্লাহ। আপনার মাধ্যমে আল্লাহপাক বিশ্বব্যাপী জিহাদকে শক্তি প্রদান করেছেন। আপনি এমন একটি দেশে সরকার প্রতিষ্ঠা করেন যে দেশটি ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত রক্তমাখা এক ধ্বংসস্তূপ। এ কবরস্থানকেই জাগিয়ে তুলেছিলেন আপনি। এখানেই আপনি কায়েম করতে সচেষ্ট ছিলেন ন্যায় ও সুশাসন। শিরক ও বিদআতের বিচার-ফায়সালা করেছেন। প্রতিটি মানুষকে তার অধিকার দেয়া হয়েছে। শরীয়ত মোতাবেক বিচার-ফায়সালা করেছেন। এমন কি কেউ যদি বলে যে, আপনার শাসনকালে একই মাঠে নেকড়ে ও ছাগল চরত, তাহলেও বাড়িয়ে বলা হবে না। এরপর সারা পৃথিবীর চাপ সত্ত্বেও আপনি মূর্তি উৎখাত করেছেন। যে কাজের জন্য হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ঘটেছিল। তখন আমরা বলেছি যে, বর্তমান যুগে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আদর্শ পুনরুজ্জীবনকারী এক মর্দে মুজাহিদের আগমন ঘটেছে। তাওহীদের অর্থ ও মর্মকে নতুন রূপদানকারী এ ব্যক্তিকে দেখে আমরা বলছি, বহু দিন পর আবার মুসলিম জাতি একজন সাহসী সংস্কারক পেল। মুসলমানের সকল দেশেই আজ কোন না কোনরূপ নিয়ে মূর্তি ও প্রতিমা সংস্কৃতি চালু রয়েছে। কিন্তু আপনি এমন একটি দেশে অবস্থান করা পছন্দ করেননি, যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করা হবে। আপনার এ তাওহীদী আবেগ আমাদের সকলকে অপার আনন্দ দিয়েছে।

আপনি আপনার দেশে খোদাদ্রোহীদের লাঞ্ছিত করেছেন। ইসলামের প্রথম যুগে যেমন কাফির-মুশরিক জিম্মিরা লাঞ্ছনার সাথে মুসলমানদের কর দিয়ে বসবাস করত। আমরা বলেছি, আফগানিস্তানে আজ নতুন যুগের নতুন উমর ইসলামের বিজয় কেতন উড়িয়েছেন। দুনিয়াব্যাপী আল্লাহর প্রেমিক বান্দারা ইসলামী মর্যাদার স্বপ্নভূমি আফগানিস্তানের পানে ছুটে যেতে শুরু করলে স্থানীয় শাসকদের বাধার সম্মুখীন হন। তখন আপনার প্রকৃতিতে মর্দে মুমিনের সকল চিহ্ন ঝলসে উঠতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

পূর্ব-পশ্চিমের সকল ইহুদী, খৃস্টান, পৌত্তলিক, কমিউনিস্ট, জাতি-পূজারী, মুরতাদ ও মুনাফিক এক হয়ে একে অপরকে সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করছিল, আপনার উচ্চ মর্যাদা, প্রতাপের মোকাবিলা করবে বলে। তখন তাদের সম্মিলিত সামরিক শক্তি, সৈন্যবাহিনী আর ভয়ানক সকল মারণাস্ত্র আপনাকে বিন্দুমাত্রও ভীত বা চিন্তিত করতে পারেনি। আপনার সৈনিকরা এক মুহূর্তের জন্যও কম্পিত বা বিচলিত হয়নি। আপনি শেষ পর্যন্তই নিজ সিদ্ধান্ত ও ভূমিকার উপর অটল রইলেন। এতে পৃথিবীর তাবৎ কাফির লাঞ্ছিত হল। এ সময় অনেক নামধারী মুসলমানের ঈমানের গায়ে ফাটল ধরতে শুরু করে।, আপনাকে তখন দেখা গেছে মজবুত এক পর্বতের ন্যায় নিজের জায়গায় শক্ত হয়ে থাকতে। এ জন্য বিশ্ব মুসলিম গর্ববোধ করতে পারে। দুনিয়ার সমস্ত অবিশ্বাসী নিজেদের সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে আপনার উপর হামলে পড়ল আর আফগানিস্তানে তাণ্ডবলীলা চালাল।

ইতিহাস সাক্ষী, ঈমানদারদের ছোট একটি দলের উপর কাফিরদের এতবড় সমষ্টি এমন শক্তি নিয়ে আর কখনই হামলা করেনি। আপনি নিজের দেশ, জান, মাল, সামর্থ্য ইত্যাদি সব কিছুর কোরবানী দিয়েছেন। এছিল আপনার ঈমান ও সততার বৈশিষ্ট্য। সম্মিলিত শত্রুশক্তির সকল আয়োজনের তুলনায় আপনার ঈমান ও তাওয়াক্কুলের শক্তি ছিল বহু বহুগুণ বেশী।

আমীরুল মুমিনীন ! যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। এখানে আমরা আপনাকে মহান আল্লাহর রহমতে এক উন্মুক্ত ও সুস্পষ্ট বিজয়ের অগ্রিম মোবারকবাদ দিচ্ছি। যার পূর্বলক্ষণ প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। পাশাপাশি ওই মহাসাফল্যের সুসংবাদও দিতে চাই, যা আপনার মর্যাদাকে সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। আপনার ভূমিকা ও চিন্তাধারার সপক্ষে বিশ্ব জনমত সহানুভূতিশীল রয়েছে। আপনার প্রতিপক্ষ যারা ন্যায়নীতি, সুবিচার, মানবাধিকার, সাম্য ও স্বাধীনতার পতাকাবাহী হওয়ার দাবীদার, প্রতিটি ঘটনায়, প্রতি অবসরে তারা আজ মিথ্যাবাদী ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীরূপে লাঞ্ছিত হচ্ছে। যুদ্ধ তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। ইহুদী-খ্রীস্ট শক্তির মনোবিকার, বুকভরা বিদ্বেষও মানুষ দেখেছে। মানুষ খুব ভাল করে বুঝেছে যে, নিষ্পাপ নাগরিকদের হন্তারক কারা ? কারা মানবাধিকারের সুরক্ষাকে নিশ্চিত করে আর কারা মানুষের অধিকার ধ্বংস করে, তাও মানুষ দেখতে পাচ্ছে। তাছাড়া, একথাও দুনিয়াজোড়া মানুষ বুঝে ফেলেছে যে, স্বাধীনতার অর্থ কি আর আইনের শাসন কাকে বলে ? এ কথাও মানুষ বুঝতে পারছে যে, নানা ধর্ম, বর্ণ ও সাংস্কৃতিক ঐক্য কোন মূলনীতির আলোকে রচিত হওয়া সম্ভব।

কাফেরের দল আপনার অঞ্চলে আমেরিকার প্রভাব বিস্তারই কামনা করে। ওরা চায় ক্রুসেডীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। আপনাকে আমাদের হৃদয় নিংড়ানো শুভেচ্ছা যে, আপনি গোটা পৃথিবীকে যে দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন তার বাস্তবতা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে গেছে; যা এতদিন অনেকের কাছেই স্পষ্ট ছিল না। আপনার ঈমানী শক্তি, দৃঢ়চিত্ততা, আল্লাহ-নির্ভরতার ফলে ক্রুসেডারদের প্রতারক চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে গেছে।

হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার দৃঢ়তার গুণে কাফিররা যেমন তাদের শক্তি প্রদর্শন ও প্রতাপ-প্রমাণের ক্ষেত্রে ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত হয়েছে তেমনি আপনার শক্তিশালী ঈমানের

www.pathagar.com

আভায় বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামনে ইসলামী আদর্শ ও উত্তরাধিকার নতুনরূপে এসে ধরা দিয়েছে, যা একসময় অতীত-কাহিনীর রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আপনার ভূমিকার ফলে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মুসলমানের শক্তি ও প্রতিপত্তির উৎস কোনটি ? আপনার আপসহীন মনোবৃত্তি ও অনড় অবস্থান ইসলাম, জিহাদ, জয়-পরাজয়, আত্মবিসর্জন ও আল্লাহর রাহে সম্পদ ব্যয়ের সকল পবিত্র বিষয়ের যথার্থ অর্থ, মর্ম ও দৃষ্টান্ত কার্যত বিশ্বমানবের সামনে এসে গেছে। ইসলামের পক্ষ ত্যাগ করার শর্তে আপনাকে এক বিশাল ভূখণ্ডের অবিসংবাদিত শাসক-নেতা হয়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শান্তি-সুখ ভোগ করার প্রলোভন দেখান হয়েছে। মুনাফিকরা আপনাকে ইসলামী নীতি-আদর্শ ও জিহাদী ভূমিকা ত্যাগ করার জন্য কখনও লোভ-লালসা দেখিয়েছে, কখনও হুমকি ও চাপ প্রয়োগ করেছে। কিন্তু আপনি মুসলমানদের স্বার্থ ত্যাগ বা ইসলামী নীতি-আদর্শে শৈথিল্য প্রদর্শনে এক মুহূর্তের জন্যও রাজি হননি। এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, যদি আপনি জিহাদী চেতনা ছেড়ে মুসলমানের মান-মর্যাদার ব্যবসায় নেমে পড়তেন তাহলে আজ আপনি বিশ্বের সেরা ধনবান আর ভীষণ শক্তিধর এক শাসকরূপে বরিত হতে পারতেন। কিন্তু যে হৃদয় ঈমানের আলোক-আভায় প্রোজ্জ্বল সে কখনও ঐশী জ্যোতির বিনিময়ে আঁধার ক্রয় করতে পারে না। পারে না পরলোককে বিকিয়ে দিতে নশ্বর কোন কিছুর বদলে।

আরব জাতি তো দেড় হাজার বছর আগেকার একজন বীর ইহুদী সামওয়াল ইবনে আদিয়াকেও শ্রদ্ধাভবে স্মরণ করে তার উচ্চতর মানবিক গুণাবলীর জন্য। যে আশ্রিত ব্যক্তি ও আমানতের হেফাজতের জন্য বড় বড় সব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও নিজ অঙ্গীকার রক্ষা করেছিল। নিজের অবস্থান থেকে এক পা-ও হটেনি। অখণ্ড শামের শাসক হারিস ইবনে জাবালাহ্ গাস্সানী যখন ওই গচ্ছিত সম্পদ কেড়ে নিতে চেয়েছিল যা সামওয়ালের কাছে রক্ষিত ছিল, তখন সামওয়াল তা দিতে অস্বীকার করে। এর ফলে প্রাচীন সিরিয়ার বাদশাহ সামওয়ালের চোখের সামনে তার পুত্রকে হত্যা করে। তথাপি সামওয়াল তার সত্য অবস্থানে দৃঢ় থেকে ওই আমানত তার হকদারদের (কবি ইমরাউল কায়েসের আত্মীয়বর্গ) হাতে পৌঁছে দেয়। এরপর থেকেই সামওয়ালের এ বীরত্ব আরব জাহানে প্রবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। আপনার দৃঢ়চিত্ততা সামওয়ালের চেয়ে হাজার গুণ বেশী স্বীকৃতির দাবীদার। বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের উচিত, আপনার সাহস ও দৃঢ়তাকে উপমা হিসেবে পেশ করা এবং ভাষা, বক্তৃতা, সাহিত্য, সাংবাদিকতায় প্রবচনরূপে তা ব্যবহার করা।

প্রখ্যাত আরব করিব আ'শা তার কবিতায় সামওয়ালের যত প্রশংসা করেছেন এর সবটুকুও আপনার কীর্তিগাথার সামান্য ঝলক মাত্র। এখানে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় আমরা সে ঐতিহাসিক কবিতার কিছু পংক্তি উল্লেখ করতে আগ্রহী, যা আরবী সাহিত্যের অনন্য উত্তরাধিকাররূপে কালজয়ী হয়ে রয়েছে। কবি বলেন-

১। সামওয়ালের মত হও, কেননা সে ছিল দৃঢ়চিত্ত, উচ্চাভিলাষী। সে এত বৃহৎ এ সৈন্যবাহিনীর সাথে লড়াই করেছিল, যার ব্যাপ্তি ছিল রাতের অন্ধকারের মত।

২। সে যাকে আশ্রয় দিয়েছে তাকে আর বিমুখ করেনি। আশ্রিতের পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে।

www.pathagar.com

৩। তীমা অঞ্চলে তার দুর্গ সাদা ও কাল পাথরের তৈরী। এ এক দুর্জেয় ঘাঁটি, যা কাউকে আশ্রয় দিলে কোন অবস্থায়ই গাদ্দারী করে না।

৪। অবরোধকারী সৈন্যরা বলল, হয়ত আশ্রয় গ্রহণকারীদের সাথে গাদ্দারী কর এবং ওদের আমাদের হাতে তুলে দাও। নতুবা ওদের এ দুর্গ থেকে বের করে দাও।

সামওয়াল তখন এর জবাবে বলেছিল, আমার সন্তান-সন্ততিসহ আমি নিজে আমার আশ্রিতদের জন্য জীবন উৎসর্গ করব, তথাপি মনুষ্যত্বের অবমাননা করব না। হীনতা, ভীতি বা কাপুরুষতা আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

হে আমীরুল মুমিনীন! ইসলামী নীতি-আদর্শের উপর আপনি যেভাবে দৃঢ়তার সাথে আমল করেছেন, তা দেখে আরব আলেমগণ যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছেন। আমরা সর্বক্ষণ আপনার জন্য দোয়া করছি। আল্লাহ্ আপনাকে আমৃত্যু দৃঢ়পদ রাখেন। আমাদের আন্তরিক শুভ কামনা আপনার সাথে আছে এবং থাকবে।

আপনার ভূমিকা ও অবস্থানের উপর আরব উলামা-মাশায়েখের পূর্ণ আস্থা ও সমর্থন আছে। আমাদের হৃদয়ও এ বিষয়ে পূর্ণ উন্মুক্ত ও নিশ্চিন্ত। বিশ্বের অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদ, দাঈ ইসলামপন্থী ছাত্র-যুবক-জনতা আপনার সমর্থক। আমরা আপনার নিকট আবেদন জানাই, আপনি কোন গুজব বা অপপ্রচারের প্রতি মোটেও কান দেবেন না। যারা বলে, একজন উৎখাত হয়ে গেল আপনার অনমনীয়তার ফলে। এসবই ঈমান-বিরোধী চিন্তার ফসল। আপনার এ সিদ্ধান্ত শতকরা একশ' ভাগ সঠিক ছিল। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর সম্পূর্ণ সমর্থিত ছিল।

আপনার পরিবার , আপনার সৈন্যদল ও দেশবাসীর উপর যে বিপদ-আপদ আবর্তিত হয়েছে এসবই আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে। এ দুঃখ-কষ্ট আল্লাহর নির্দেশেই আপনারা সহ্য করছেন। আল্লাহ পাকেরই হুকুম, বিপদে ধৈর্য ধারণ, আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল, সর্বাবস্থায় দ্বীনের আহকামের উপর আমল কর, ঈমানদারদের বন্ধুত্বের বরণ কর, মুজাহিদদের সহায্য কর, কাফের-মুশরিকদের বন্ধু বানাবে না, দ্বীনের বিজয়ের জন্য সর্বাত্মক জিহাদ কর- এসব কাজ নিষ্ঠার সাথে করলে দুনিয়াতে মর্যাদা, শাসনক্ষমতা ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর আখেরাতের যে সাফল্য এ পথে রয়েছে তা কল্পনাতীত। আসহাবুল উখদুদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন তা তো এমনই।

"নিঃসন্দেহে এরা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। তাদের জন্য এমন সব বেহেশত রয়েছে যার তলদেশে প্রবাহিত স্রোতস্বিনী। আর এ হচ্ছে অনেক বড় সাফল্য।" এমন কি কাজ ছিল, যে জন্য আসহাবুল উখদুদকে এত উচ্চ মর্যাদা দেয়া হবে। এদের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তারা পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ভরসা করে দ্বীনি নীতি-আদর্শের উপর আমৃত্যু দৃঢ়পদ ছিল। কোরআন শরীফে এরা ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ের জন্য এত বড় মর্যাদার কথা বিবৃত হয়নি। অথচ এ গোটা সম্প্রদায়টিই কাফিরদের হাতে নির্যাতিত হয়ে শাহাদাৎ বরণ করেছিল।

হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা আপনার ও আপনার বিশিষ্ট সহকর্মী যথা ঃ মোল্লা দাদ-হাসান, মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী, মওলভী আবদুল হান্নান, মোল্লা বেরাদার, মোল্লা

www.pathagar.com

দাদ-আল্লাহ, মোল্লা রঈস আবদুল্লাহসহ সকল মুজাহিদ নেতা ও তালিবান যোদ্ধার প্রতি বিনীত নিবেদন পেশ করছি, সদা-সর্বদা যথাসম্ভব প্রতিরোধ সংগ্রাম ও জিহাদী কার্যক্রম যেন তারা অব্যাহত রাখেন। শরীয়তের প্রশ্নে কোনদিন যেন আপস না করেন। গোটা তাওহিদী বিশ্ব জনতার চোখে আপনারাই প্রশান্তিময় শীতলতা। আল্লাহর সকল সৈন্য আপনাদের উপর সন্তুষ্ট। দূরে থাকা সত্ত্বেও আমরা আপনাদের কাছে আছি, যতদূর সম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা আমরা করে যাব। পৃথিবীর মুসলমানদের আমরা জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করেই যাব। উদ্দীপিত করব মুসলিম সন্তানদের নতুন দিনের স্বপ্নের জন্য। সম্ভব হলে ওরা সবাই আপনার নেতৃত্বে লড়াই করবে। পরিশেষে বিজয় আমাদেরই হবে। যদি আপনারা জিহাদের দ্বারা দ্বীনের সম্মানকে উর্ধ্বে তুলে রাখেন তাহলে সহসাই আবার ইসলামী শরীয়তী শাসন কায়েম হবে। দুঃখের দিন শেষ হয়ে অন্যত্র আনন্দের সময়ও দেখা দিতে পারে। যে আল্লাহ জিহাদের হুকুম দিয়ে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা করেছেন তার ইচ্ছাতেই জিহাদ ভিত্তিক এক শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্রের উন্মেষ ঘটবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে বিশ্ব মুসলমানের প্রতি তাদের শুভার্থীরূপে একান্তভাবে অনুরোধ করছি, আপনারা দুনিয়ার সকল কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে আফগান ইসলামী যোদ্ধাদের সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসুন। বিশেষ করে আফগান জনগণের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আপনারা সকল দুঃখ-কষ্ট বরণ করে হলেও ইসলামী নেতৃত্বের সাথে থাকুন। আমীরুল মুমিনীনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের উচ্চ মর্যাদার লড়াই চালিয়ে যান। ওসব মুজাহিদের প্রতিও আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ যারা আমীরুল মুমিনীনের সাথে দৃঢ়পদে সত্যের জন্য সংগ্রামরত আছেন, আপনারা ইসলামী নীতি-আদর্শ থেকে এক চুলও নড়বেন না। সর্বাবস্থায় জিহাদ অব্যাহত রাখুন, অবশ্যই আল্লাহ ও তার রাসূলের ওয়াদা সময়মত আসবে।

এখানে পাক কোরআনের কতিপয় আয়াত উল্লেখ করছি যেসব জায়গায় আল্লাহ সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা করেছেন।

১। 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ ওয়াদা করছেন যে, তাদের শাসন কর্তৃত্ব দেয়া হবে। যেমন-পূর্বকার লোকদের দেয়া হয়েছে। যে দ্বীন তাদের জন্য মনোনীত করা হয়েছে তা বাস্তবায়িত করা হবে এবং আল্লাহ তাদের ভীতিকে নিরাপত্তা দিয়ে বদলে দেবেন। এরা এমন মানুষ যারা আমার ইবাদত করে, আমার সাথে আর কোন শক্তিকে শরিক করে না। এরপরও যেসব লোক অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসিক।'

আয়াতের এ মর্ম থেকে বোঝা গেল, যারা ঈমান আনবে, নেক আমল করবে এবং সর্ববিধ শিরক থেকে মুক্ত থাকবে তাদের জন্যই সাহায্য ও বিজয়।

২। 'হযরত মূসা (আঃ) তাঁর জাতির উদ্দেশ্যে বলেন, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং দৃঢ়পদ থাক। এ পৃথিবী আল্লাহর, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের চান, এর অধিকার দেন। তবে চরম সাফল্য তাদের জন্যই- যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে।'

আয়াতের মর্মে আল্লাহপাকের সাহায্য পাওয়ার শর্ত বলা হয়েছে, কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া, দৃঢ়পদ থাকা আর তাঁর নির্দেশের ওপর অটল থেকে তাঁকে ভয় করে

www.pathagar.com

চলা।

৩। ‘হযরত মূসা (আঃ) বলেন, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক, তবে কেবল তাঁর উপরই ভরসা কর যদি তোমরা অনুগত হয়ে থাক।’

তৃতীয় আয়াতের মর্মেও সাহায্যের শর্ত করা হয়েছে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা ও আস্থাকে।

৪। মহান আল্লাহ্ বলেন, ‘পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে নানা উপদেশের পর আমি এ কথাও লিখেছি যে, পৃথিবীর অধিকারী হবে আমার সৎকর্মশীল বান্দারা।’

চতুর্থ আয়াতের মর্মে বোঝা যায়, প্রকাশ্য ও গোপন সকল ক্ষেত্রে সংশোধন হয়ে যাওয়া নেক বান্দারাই পাবে পৃথিবীর মালিকানার অধিকার।

৫। ‘যেসব লোক স্বীকার করে নিয়েছে যে, আল্লাহ্ আমার প্রভু, অতঃপর এ স্বীকৃতির ওপর অটল রয়েছে, তাদের প্রতি এ বার্তা নিয়ে ফেরেশতা অবতীর্ণ হবেন যে, আপনারা ভয় পাবেন না, চিন্তিত হবেন না, সুসংবাদ গ্রহণ করুন সে জান্নাতের যার ওয়াদা আপনাদের সাথে করা হয়েছে। ইহলোকে আমরা আপনাদের বন্ধু ছিলাম পরলোকেও থাকব। জান্নাতে পরম দয়ালু ক্ষমাশীল আল্লাহর মেহমানদারিতে আপনাদের জন্য ওসব বস্তু রয়েছে যা আপনাদের মন চায় অথবা আপনারা যা কামনা করবেন।

এ আয়াতের মর্মে আল্লাহপাকের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের স্বীকৃতি আর দ্বীনের ওপর দৃঢ়তাকেই সাহায্য ও সাফল্যের শর্ত করা হয়েছে।’

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসে সাহায্য ও বিজয়ের শর্তরূপে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম তিরমিযি ও আহমাদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে মাসউদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে একটি বাহনে সহযাত্রী ছিলাম। তিনি তখন বললেন, ‘হে তরুণ অথবা হে তরুণ সম্প্রদায়! আমি কি তোমাদের এমন কিছু কথা বলে দেব যা তোমাদের খুব উপকারে আসবে?’ আমি উত্তর দিলাম, অবশ্যই! হযরত বললেন, ‘আল্লাহপাকের বিধিনির্দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত কর, আল্লাহ তোমাদের সুরক্ষিত রাখবেন। আল্লাহর বিধান ও আদর্শকে সমুন্নত রাখ, আল্লাহকে সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। তোমরা যদি তৃপ্ত ও সুখী অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর, বিপদে-দুঃসময়ে আল্লাহ তোমাদের স্মরণ করবেন। আর যখন তোমরা কিছু চাইবে বা কোন সাহায্য চাইবে তখন শুধু আল্লাহর কাছেই চাও। আগামীতে যা কিছু হবে এর সবই লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। যদি গোটা বিশ্ব এক হয়েও তোমার কোন উপকার করতে চায় আর এ উপকারটুকু আল্লাহর ইচ্ছা না থাকে তাহলে তারা তোমার কোনই উপকার করতে পারবে না। আর সারা পৃথিবী যদি তোমার ক্ষতিসাধনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, আর এ ক্ষতিতে আল্লাহর ইচ্ছা না থাকে তাহলে ওরা সবাই মিলেও তোমার কিছুই করতে পারবে না। আর একটি কথা জেনে রাখ, যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করা মানুষের জন্য খুবই পীড়াদায়ক, এ ধরনের ধৈর্যে মানুষের জন্য অসাধারণ কল্যাণ থাকে। আর কঠিন সময়ের পেছনেই রয়েছে সুখের সময় এবং প্রতিটি কষ্টের পরেই থাকে আনন্দ।’

জেনে রাখা উচিত যে, দুঃখ, কষ্ট ও ধৈর্য যদি পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হয় তাহলে স্বয়ং আল্লাহতাআলা মুসলমানদের সাহায্য করবেন। দুনিয়াতে তো বটেই,

www.pathagar.com

আখেরাতেও তার বিশেষ রহমত মুসলমানদের আবৃত করে রাখবে। কাফিরদের আল্লাহপাক লাঞ্ছিত, অপমানিত করবেন। এতো আল্লাহর ওয়াদা-যার কোন ব্যত্যয় নেই।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি অবশ্যই আমার রাসূলগণ ও ঈমানদারদের সাহায্য করব এবং ওই দিবসেও যেদিন মানবজাতি থাকবে সাক্ষীর ভূমিকায়।'

আল্লাহ আরো বলেন, 'কাফেররা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে রুখার জন্য নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। এরা যত খরচই করুক সবই হবে তাদের লাঞ্ছনা ও অনুশোচনার কারণ। শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হবে। তাছাড়া কাফিরদের দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে।'

বদর যুদ্ধের দিন মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, 'সম্প্রতি তোমাদের সামনে যুদ্ধরত দুটো সৈন্য বাহিনীর একটি দৃষ্টান্ত কায়েম হল। একটি বাহিনী আল্লাহর পথে লড়াই করে অপরটি অবিশ্বাসী সৈন্য দল। যারা নিজেদের খোলা চোখে মুসলিম বাহিনীকে দ্বিগুণ রূপে দেখত। আর আল্লাহ যাকে চান নিজ সাহায্যের দ্বারা শক্তি প্রদান করে থাকেন। চিন্তাশীলদের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়।'

এক হাদীসে আছে, 'এই দ্বীন এমন প্রতিটি স্থানে ছড়িয়ে পড়বে যেখানে দিবারাত্রির আবর্তন ঘটে। আল্লাহ তাআলা কিছু মানুষকে সম্মানিত করে, আর কিছু মানুষকে লাঞ্ছিত করে এ দ্বীনকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবেন। ইসলামপন্থীদের আল্লাহতাআলা সম্মানিত করবেন, আর কুফরকে করবেন লাঞ্ছিত।' সহীহ সনদে ইমাম আহমাদ হযরত তামীম দারী (রাঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ হাদীসে সাহায্য ও দ্বীনের বিজয়ের সুসংবাদ অত্যন্ত স্পষ্ট। অতএব মুসলিম জাতির অন্তরে সাহস ও আশাবাদ ধরে রাখাই ঈমানের দাবী। হকপন্থীদের বিজয় সুনিশ্চিত!

পরিশেষে আল্লাহপাকের প্রশংসাবাদ ঘোষণা করছি, আর অত্যাচারীদের জন্য করছি ঘৃণা ও চিরশত্রুতার বহিঃপ্রকাশ।

-আপনার ভাই ঃ হামুদ ইবনে আকলা আল-শুআইবী, আলী ইবনে খুদায়র আল খুদায়র ও সুলায়মান ইবনে নাসের আল-উলওয়ান। ❑

সূত্র ঃ ইন্টারনেট/যবরে মুমিন, করাচি, ১৮-২৪ জানুয়ারী ২০০২

অনুবাদ ঃ উবায়দুর রহমান খান নাদভী

www.pathagar.com

আফগান যুদ্ধের একশ' দিন নাকের বদলে নরুন লাভ

সিরাজুর রহমান

আফগান যুদ্ধের ১০০ দিন পেরিয়ে গেল (১৪ জানুয়ারী)। লাভ-লোকসানের একটা খতিয়ান করার এখন সময় হয়েছে।

মূল লক্ষ্য ছিলো, ওসামা বিন লাদেন ও তার উর্ধ্বতন সহকারীদের ধরে তাদের বিচার করা। জীবিত ধরা না গেলে তাদের হত্যা করার কথাও মার্কিনীরা ঘোষণা করেছিলো। কিন্তু ৭ অক্টোবর আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র এবং মার্কিন বোমাবর্ষণ শুরুর পর থেকে যুদ্ধের লক্ষ্য এবং পরিধির ক্রমবিস্তার ঘটেছে। বুশ প্রশাসনে স্থিরমতি পররাষ্ট্র মন্ত্রী জেনারেল কোলিন পাওয়েল এবং তার অনুসারীদের প্রভাব হ্রাস এবং যুদ্ধবাজ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড এবং তার আরো উগ্রমতি সহকারী পল উলফোভিচের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং প্রায় অলক্ষ্যে প্রথমে তালেবান সরকারকে উচ্ছেদ করার পরে তালেবান নেতাদেরও গ্রেফতার কিংবা হত্যা করা যুদ্ধের লক্ষ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ওসামা বিন লাদেনকে এখনো গ্রেফতার করা যায়নি। তিনি আদৌ জীবিত আছেন কি-না এবং থাকলে কোথায় আছেন সে সম্বন্ধেও মার্কিনীদের কোন ধারণা আছে বলে মনে হয় না। প্রচণ্ড বোমা বর্ষণে পর্বতের বর্ণালী ও দেহরেখা (Contour) বদলে যাচ্ছে। সে সব পাথরের আকার ক্রমেই বোমার ঘায়ে ছোট হচ্ছে। আফগানিস্তানের পর্বত ভেঙ্গে নুড়ি তৈরী করা মার্কিনীদের উদ্দেশ্য কিনা কে জানে ; কিন্তু বিগত কিছু কালের বোমা বর্ষণে মারা যাচ্ছে শুধু নিরীহ নর-নারী আর শিশু। ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে এবং ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে সন্ত্রাসবাদী হামলায় যত লোক মারা গেছে তার চাইতে বেশী নিরীহ লোক ইতোমধ্যেই মারা গেছে আফগানিস্তানে মার্কিন বোমার ঘায়ে। কিন্তু সরকারী-বেসরকারী আফগানদের প্রতিবাদ ওয়াশিংটনে ডোনাল্ড রামসফেল্ড কিম্বা আর কেউ গায়ে মাখছেন না। তবে ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে, মার্কিন অস্ত্র ভাণ্ডারের মওজুদ বোমাগুলো নিঃশেষ হয়ে গেলে নতুন করে বোমা মওজুদ করার প্রয়োজন হবে। সেটা মার্কিন সমরাস্ত্র নির্মাতা ও ব্যবসায়ীদের জন্যে সুখবর। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি এখন ভয়াবহ মন্দায় পড়েছে। তা সত্ত্বেও মার্কিন অস্ত্র

www.pathagar.com

নির্মাতাদের সুদিন যাচ্ছে, সেটা প্রত্যাশিতও বটে। কেননা জর্জ ডব্লু বুশ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন অস্ত্র নির্মাতা ও তেল কোম্পানীগুলোর আর্থিক আনুকূল্যে। স্বভাবতঃই তারা তার কাছ থেকে কিছু প্রতিদান চাইবেন।

একতরফা কোয়েলিশন ?

আফগান যুদ্ধ শুরুর আগে বিশ্ব জনমত, বিশেষ করে আরব বিশ্বের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে নিশ্চয়ই প্রেসিডেন্ট বুশের সংশয় ছিল। তার পরিকল্পনার সপক্ষে একটা কোয়ালিশন গঠনের জন্যে তখনকার ব্যস্ততা তারই প্রমাণ দেয়। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার সে ব্যাপারে বলতে গেলে বুশের বিশেষ দূতের কাজই করছেন। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং উপসাগরীয় দেশগুলোতে ব্যাপক সফর করেছেন তিনি। উপমহাদেশ সফর করেছেন দুই দু'বার। টনি ব্লেয়ার একাধিকবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের সঙ্গেও দেখা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধের ব্যাপারে বুশ ও তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড বৃটেনকে সত্যিকারের কোন ভূমিকা দেননি। বৃটিশ সরকার ছয় হাজার সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। প্রথম দফায় প্রায় একশ' সৈন্য কাবুলের অদূরে বাগমার বিমান বন্দরে গিয়ে পৌঁছেছিলো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মার্কিনীদের আপত্তির কারণে সে বৃটিশ পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। সে নিয়ে স্বদেশেও টনি ব্লেয়ারকে যথেষ্ট ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ হজম করতে হয়েছিল।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর মান রক্ষার্থে অবশেষে জর্জ ডব্লু বুশ কাবুলের অস্থায়ী সরকারের নিরাপত্তার জন্যে পরিকল্পিত আন্তর্জাতিক বাহিনীতে বৃটেনকে নেতৃত্ব দিতে রাজী হন। কিন্তু তারপরেই আবার আফগানিস্তান থেকে আল কায়দা ও তালিবান বন্দীদের কিউবার গুয়ান্তেনামো মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে পাঠানোর ব্যাপারে বৃটেনের মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। এই বন্দীদের হাতে-পায়ে শেকল বেঁধে, মাথায় ঘোমটা পরিয়ে মার্কিন সামরিক বিমানের আসনের সঙ্গে বেঁধে প্রায় ২০ ঘন্টা যাত্রায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এমন কি আসনে বসেই তাদের মলমূত্রও ত্যাগ করতে হচ্ছে। কিউবায় তাদের রাখা হচ্ছে ৮ ফুট লম্বা এবং ছয় ফুট চওড়া কাঁটাতারের খাঁচায়। রোদ-বৃষ্টি এবং ঝড়-ঝাপ্টার অত্যাচার থেকে তাদের কোন আশ্রয় নেই। বৃটিশ পার্লামেন্টে সদস্যদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্রকে অসতর্ক মুহূর্তে প্রাসঙ্গিকভাবেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, এ যুদ্ধ শুরু করা হয়েছিল একটি আন্তর্জাতিক কোয়ালিশনের নামে এবং এ কোয়ালিশনের প্রধান অংশীদার হচ্ছে বৃটেন। জ্যাক স্ট্র তারপর থেকে নাকি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কলিন পাওয়েলের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন।

কিন্তু এই যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে মিঃ পাওয়েলের কর্তৃত্ব যে খুবই সীমিত সেটা প্রকাশ করে দিয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড। বিবিসিকে এক সাক্ষাৎকারে তিনি অত্যন্ত গরম ভাষায় পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা, আন্তর্জাতিক রেডক্রস এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলো যতই চেঁচামেচি করুন না কেন, তিনি তালিবান ও আল কায়দা বন্দীদের যুদ্ধবন্দীর মার্যাদা এবং ১৯৪৯ সালের জেনেভা চুক্তিতে নির্ধারিত সুযোগ-সুবিধা দেবেন না।

ডোনাল্ড রামসফেল্ড যুক্তরাষ্ট্রে নয়, কিউবার সামরিক ঘাঁটিতে গোপন সামরিক ট্রাইব্যুনালে এই বন্দীদের বিচার করতে চান। এ জাতীয় আদালতে জুরি কিম্বা

www.pathagar.com

অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনে আইনজীবীর সুবিধা থাকবে না এবং ট্রাইব্যুনাল তাদের দোষী সাব্যস্ত করলে চট্‌জলদি তাদের প্রাণদণ্ড দিয়ে দেওয়া যাবে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক এলাকায় অভিযুক্তরা রাষ্ট্রের ব্যয়েও আইনজীবীর সাহায্য পাবার অধিকারী। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, আন্তর্জাতিক রেডক্রস এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থা, বৃটিশ পার্লামেন্টের সর্বদলীয় বহু সদস্য নেতৃস্থানীয় বৃটিশ ও মার্কিন আইনজীবীরা ডোনাল্ড রামসফেল্ডের এই পরিকল্পনাকে অবৈধ বলে সমালোচনা করেছেন।

এ বিতর্ক আরও তুঙ্গে উঠেছে এ কারণে যে, আল কায়দা বন্দীদের মধ্যে একজন মার্কিন নাগরিক আছে এবং ওয়াশিংটন ঘোষণা করেছে যে, তাকে কিউবার শিবিরে নেওয়া হবে না, নেওয়া হবে ওয়াশিংটনে এবং সেখানে সাধারণ আদালতে ফৌজদারী আইনে তার বিচার হবে। অর্থাৎ এই মার্কিন নাগরিক বন্দীটি আইনজীবীর সাহায্য পাবে এবং এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, আদালতে তার প্রাণদন্ড প্রার্থনা করা হবে না। এ ঘোষণার পর বৃটেনে আরও তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে, কেননা প্রথম দু' চালানে যে প্রায় ৫০ জন বন্দীকে আফগানিস্তান থেকে কিউবায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে অন্তত তিনজন বৃটিশ নাগরিক আছে এবং তাদের উপরোক্ত মার্কিন নাগরিকদের সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। গত বুধবার (১৬ জানুয়ারী) টনি ব্লেয়ার পার্লামেন্টে মার্কিন অবস্থান সমর্থনের জোরালো চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে, গুয়ান্টেনামো বে'র ঘাঁটিতে বন্দীরা মানবিক আচরণই পাচ্ছে। কিন্তু তাতে পার্লামেন্ট সন্তুষ্ট হয়নি। সবচাইতে জোরালো সমালোচনা উঠেছে তার নিজ দলের সদস্যদের কাছ থেকে। তারপর থেকে জাতিসংঘও এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের তীব্রসমালোচনা করেছে। মানবাধিকার হাইকমিশনার মেরি রবিনসন বলেছেন, যে সকল বিচারেই এই বন্দীরা যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা এবং আন্তর্জাতিক আইনের সংরক্ষণ পাবার অধিকারী। আন্তর্জাতিক আইনবেত্তারাও ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, বন্দীদের মার্যাদার প্রশ্নে সন্ত্রাসবিরোধী কোয়ালিশন ভেঙ্গে যেতে পারে এবং ইউরোপের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হতে পারে।

মস্কো-বেইজিংয়ে অস্বস্তি

ইঙ্গ-মার্কিন কোয়েলিশনে যোগ দিতে পেরে মস্কো গোড়ায় খুবই তৃপ্তি বোধ করেছিল। ১১ সেপ্টেম্বরের আগে চেচনিয়া এবং আবখাজিয়ার মুক্তিযুদ্ধ দমনে রুশ সামরিক বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচারের বিশ্বব্যাপী সমালোচনা হচ্ছিলো। কিন্তু কোয়ালিশনে মস্কোর যোগদানের ফলে রাতারাতি এই দুটি জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে মস্কোর সামরিক অভিযান সন্ত্রাস দমনের অভিযান বলে স্বীকৃতি পায়। পশ্চিমী মিডিয়ায় চেচনিয়ায় রুশদের অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনীগুলো যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রাথমিক ভাবে চীনও খুশি মনে হচ্ছিলো। যুক্তরাষ্ট্রের আফগান যুদ্ধ সমর্থনের বিনিময়ে সে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে গণ্য করার টিকেট পায়। পশ্চিমী মিডিয়ায় ফালুন গং ধর্মীয় উপ-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বেইজিংয়ের ব্যবস্থাগুলোর সমালোচনাও বন্ধ হয়। মধ্য এশিয়ার প্রাক্তন সোভিয়েট অঙ্গরাজ্য উজবিকেস্তান ও তাজিকিস্তান আফগান যুদ্ধের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে যাবতীয়

www.pathagar.com

সুযোগ-সুবিধা দিতে সানন্দে রাজী হয়েছিল। সোভিয়েট সাম্রাজ্যের পতনের পর নামে স্বাধীন হলেও এই দেশগুলো সম্পূর্ণরূপে মস্কোর প্রভাবাধীন ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্যে তারা এই প্রভাব কিছু পরিমাণে হলেও খাটো করার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল। উজবেকিস্তান বিমানক্ষেত্রগুলোর ব্যবহার ছাড়াও তার দেশে ১৫০০ মার্কিন সৈন্য মোতায়েন রাখার অনুমতি দিয়েছে। মার্কিনীরা তাজিকিস্তানের বিভিন্ন ঘাঁটি ব্যবহারেরও অনুমতি পেয়েছে। একমাত্র তুর্কমেনিস্তান ঘাঁটি কিংবা ভূমি ব্যবহারের অনুমতি না দিলেও মার্কিনীরা অবাধে সে দেশের আকাশসীমা ব্যবহার করতে পারছে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী মার্কিন গ্যালাক্সি পরিবহন বিমানগুলো গত সপ্তাহে কিরগিজিস্তানের রাজধানী বিশকেকের অদূরে মানাস ঘাঁটিতে তিন হাজার সৈন্য নামিয়েছে। উপসাগরীয় দেশগুলো, আফগানিস্তান এবং তার আশপাশের মোট নয়টি দেশে এখন মার্কিন সামরিক ঘাঁটির সংখ্যা ১৩টি।

আফগানিস্তানে আল কায়দা ও তালিবানদের বিরুদ্ধে আমমোক্তার নামার (Proxy) যুদ্ধের পাশাপাশি মধ্য এশিয়ার এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এবং তেল-সমৃদ্ধ দেশগুলোতে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা এবং সেনা মোতায়েন এই আদি সন্দেহকেই ঘনীভূত করে যে, মধ্য এশিয়া থেকে আরব সাগর পর্যন্ত তেল ও গ্যাসের পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে মোটামুটি মার্কিন প্রভাবাধীন একটা অঞ্চল সৃষ্টি করা আফগান যুদ্ধের একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল। ভ্লাদিমির পুটিন ইঙ্গ-মার্কিন জোটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দেখিয়ে সাহায্য ও বাণিজ্যসহ বহু সুবিধা পেয়েছেন। কিন্তু মধ্য এশিয়ার মার্কিন প্রভাব বৃদ্ধি এবং সামরিক উপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারছেন না।

কিরগিজিস্তানের মানাস ঘাঁটিটি চীনের পশ্চিম সীমান্ত থেকে ২০ মাইল দূরে। তা সত্ত্বেও চীনও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারছে না। তার পূর্ব দিকে জাপানে এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি আছে। তাছাড়া চীন তাইওয়ানকে তার নিজের দেশের অংশ বলে দাবী করে এবং যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে সকল প্রকারের সামরিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। চীন এ কথাও ভুলে যেতে পারে না যে, তার প্রভাবকে সীমিত রাখা এবং তাকে ঘিরে একটা সামরিক প্রভাবের বেড়ী রচনা যুক্তরাষ্ট্রের বরাবরের লক্ষ্য। গত সপ্তাহে বেইজিংয়ে সন্ত্রাসবাদবিরোধী কলাকৌশল বিবেচনার জন্যে চীন, রাশিয়া এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর কর্মকর্তা পর্যায়ে এক বৈঠক হয়। এ বৈঠকে রাশিয়া ও চীন, মধ্য এশিয়া, বিশেষ করে আফগানিস্তানে বিদেশী প্রভাবের অবসান করার আহ্বান জানায়।

পরিবর্তিত ধ্যান-ধারণা

কিন্তু আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ আন্তর্জাতিক রীতি-পদ্ধতি অনেকখানি বদলে দিয়েছে। আফগানিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের লাগোয়া দেশ নয়, তাদের মধ্যে কোন সীমান্ত বিরোধ নেই। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে সে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মার্কিনীরা নজীর স্থাপন করেছে যে, সন্ত্রাস দমনের নামে যে কোন দেশের ভেতরে আক্রমণ করা বা সৈন্য পাঠানো যাবে। চলতি সপ্তায় দক্ষিণ ফিলিপাইনে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনের অভিযানে সহায়তা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ৬৫০ জন মার্কিন সৈন্য পাঠিয়েছে। তাতে উপরোক্ত নজীর আরো পোক্ত হলো।

এ নজীর ধরে ইসরাইলের এরিয়েল শ্যারন সন্ত্রাস দমনের নামে ফিলিস্তিনের আরবদের

www.pathagar.com

হত্যা করছে ; আরব এলাকার গভীর থেকে গভীরে ট্যাঙ্ক পাঠাচ্ছে এবং আরবদের ঘরবাড়ী সুপরিকল্পিতভাবে ভেঙ্গে ফেলছে। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনী এলাকায় বেআইনী ইহুদী বসতি স্থাপনের কাজ চলছে পুরোদমে। এরিয়েল শ্যারন দীর্ঘকাল যাবৎ ফিলিস্তিনীদের অন্যান্য আরব দেশে পাঠিয়ে দিয়ে প্রাক্তন প্যালেস্টাইনের সমগ্র এলাকাটা ইসরাইলী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়ে আসছেন। ক্ষমতা হাতে পেয়ে তিনি সে পরিকল্পনাই কার্যকর করার চেষ্টা করছেন। যুক্তরাষ্ট্র আগেও ইসরাইলকে নিবৃত্ত করার সত্যি সত্যি কোন চেষ্টা করেনি। সে চেষ্টা করা এখন আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। শ্যারন বার বার ওয়াশিংটনকে আয়নায় নিজের মুখ দেখার পরামর্শ দিচ্ছেন।

কিন্তু শ্যারনের পরিকল্পনা সফল হলেই কি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আসবে ? ইসরাইল কিংবা যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের ভয়মুক্ত হতে পারবে তাতে? এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের মূলেই আছে ফিলিস্তিনীদের অসন্তোষ। আদি স্বদেশের লোকসান তারা ভুলবে না। গত ৫০ বছরে যে সব ফিলিস্তিনী দেশ ছাড়া হয়েছে তারা ভোলেনি। সুতরাং পরবর্তীরাও ভুলতে পারবে বলে আশা করার কোন কারণ নেই। ভবিষ্যতের কোন পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত দেখবে যে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করে সে সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন করতে পারেনি, বরং সন্ত্রাসকে আরো ব্যাপক করে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছে। ইতোমধ্যে যে গণতন্ত্র বাক-স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের মহান আদর্শের নামে এ যুদ্ধ সে শুরু করেছিল বা মহান আদর্শগুলোকে সে অকারণে জলাঞ্জলি দিয়েছে।

জানুয়ারী '০১

www.pathagar.com

বুশের রণ-হুঙ্কার ঃ আসল কারণ সম্বন্ধে গোর ভিডালের ব্যাখ্যা

(দুই)

বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রে সবচাইতে নামকরা লেখক, ভাষ্যকার ও চিন্তাবিদদের একজন হচ্ছেন-গোর ভিডাল। প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির আমলে তিনি হোয়াইট হাউসের একজন উপদেষ্টা ছিলেন। ৭৬ বছর বয়স্ক মিঃ ভিডাল সম্প্রতি লসএঞ্জেলেসের 'এল এ উইকলি' পত্রিকাকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। বৃটেনের বহুল প্রচারিত ট্যাবলয়েড পত্রিকা 'ডেইলি মিরর' সে সাক্ষাৎকারের বিবরণ পুনঃপ্রকাশ করেছে।

এ সাক্ষাৎকারে গোর ভিডাল প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং তাঁর 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের' তীব্র নিন্দা করেছেন। ভিডাল বলেছেন যে, গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে যে সন্ত্রাসী আক্রমণ ঘটেছে সেগুলো অন্যায় হলেও এটাও সত্য যে, আমেরিকা নিজেই বিশ্বব্যাপী তার দুষ্কর্মের দ্বারা এই বিপদ-পাত ডেকে এনেছে।

গোর ভিডাল এ প্রসঙ্গে বিগত ৪০ বছরের বিশ্বব্যাপী মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অন্যায়-অপকর্মের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণও দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই ৪০ বছরে আমেরিকা বিনা উস্কানিতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ২৫০টিরও বেশী সামরিক আক্রমণ চালিয়েছে। সেজন্যই বিশ্বব্যাপী আমেরিকাকে ঘৃণা করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালার নির্বাচিত সরকারকে অপসারণ, ১৯৬৪ সালে ভিয়েতনামের যুদ্ধ, ১৯৮৬ সালে লিবিয়ায় বোমাবর্ষণ, ১৯৮৯ সালে পানামা সিটিতে বিমান আক্রমণ, ১৯৯১ সালে নিকারাগুয়ার অর্টেগা সরকারকে অপসারণের জন্য কন্ট্রা বিদ্রোহীদের মার্কিন সাহায্য দান, ১৯৯৩ সালে শান্তি রক্ষার অজুহাতে সোমালিয়ায় সৈন্য পাঠানো এবং ২০০১ সালে আফগানিস্তানে আক্রমণের উল্লেখ করেন।

মিঃ ভিডাল বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণকে তাদের দেশের আন্তর্জাতিক ভূমিকা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানতে দেওয়া হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন, মার্কিন জনগণ মনে করে যে তাদের দেশ অনুন্নত দেশগুলোকে শত শত কোটি কোটি ডলার সাহায্য দিয়ে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র (জাতীয় উৎপাদনের অংশের হিসাবে)

www.pathagar.com

সর্বনিম্ন সাহায্য দিয়ে থাকে এবং সে সাহায্যেরও সিংহভাগ পায় ইসরাইল এবং কিছু পরিমাণে মিসর।

কলা শুল্ক এবং গণতন্ত্র হত্যা

ভিডাল বলতে চেয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র বরং অনুন্নত দেশগুলোকে শোষণই করে বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালায় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। গুয়াতেমালা দরিদ্র দেশ। তার আয়ের উৎসও ছিল সীমিত। মার্কিন ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী সে দেশের ফল রফতানী মুনাফা থেকে সামান্য যা কিছু সরকারকে দিত সেটাই ছিল আয়ের প্রধান উৎস। ১৯৫৪ সালে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আরবেনস কলার ওপর সামান্য কর ধার্য করেন। যুক্তরাষ্ট্রে গেল-গেল রব উঠল। সেক্রেটারী অব স্টেট হেনরি ক্যাবট লজ কংগ্রেসের উচ্চ পরিষদ সিনেটে ঘোষণা করেন যে, কমিউনিষ্টরা গুয়াতেমালা দখল করে নিয়েছে; সুতরাং তার কিছু একটা বিহিত করা দরকার। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার প্রেসিডেন্ট আরবেনসকে উৎখাত করার নির্দেশ দিলেন সিআইএকে। তারা নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে একজন সামরিক স্বৈরশাসককে গদিতে বসায়। তারপর থেকে অশান্তি আর রক্তপাত চলছে তো চলছেই।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্বন্ধে গোর ভিডাল বলেন যে, ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় যা ঘটেছে তাতে আফগান জনগণ মোটেই জড়িত ছিল না। সেসব ঘটনা ঘটিয়েছিলেন ওসামা বিন লাদেন এবং তাঁর কতিপয় সউদী অনুচর। আফগান নারীরা অবহেলিত হচ্ছেন, তাঁদের বোরখা পরতে হচ্ছে- তাতে প্রকৃত প্রস্তাবে বুশের কিছু এসে যায় না; আফগান নারীর সামাজিক মর্যাদার উন্নতি কিংবা তাঁদের বোরখামুক্ত করাও জর্জ ডব্লিউ বুশের আফগান যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না। আসল উদ্দেশ্য ছিল যে, ইউনোকল কোম্পানী কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চলের খনিজ তেল উপসাগর পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে একটা পাইপলাইন তৈরী করতে চায়। এই প্রস্তাবিত পাইপলাইন নির্মাণ ও নিরাপদ রাখার জন্য আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের আজ্ঞাবহ একটা সরকার স্থাপন করা দরকার। ভিডাল বলছেন যে, প্রেসিডেন্ট বুশ, তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি এবং তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড- এঁরা সবাই 'গ্যাস ও তেলের হুন্তার (চক্রান্তকারী দল)' সঙ্গে জড়িত।

পরের ধনে পোদ্দারী

যুক্তরাষ্ট্র তার উপকূলের ২০ মাইল সমুদ্রসীমায় তেল, গ্যাস কিংবা অন্য কোন আকরিকের সন্ধান কিংবা উত্তোলন নিষিদ্ধ করে রেখেছে। সুদূর ভবিষ্যতে তেল, গ্যাস প্রভৃতি সম্পদের অন্য সূত্রগুলো নিঃশেষ হয়ে গেলেও যাতে মার্কিনীদের সমৃদ্ধি ব্যাহত না হয় সেজন্যই এ ব্যবস্থা। অথচ তার শ্রমশিল্প এবং পরিবহন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তেল ও গ্যাসের ওপর। সে তেল ও গ্যাস সে আমদানী করে অন্যান্য দেশ থেকে। সে দেশগুলোকে চির দারিদ্র্যে ডুবিয়ে রেখে নিজের সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে সস্তায় এবং অবাধে তেল ও গ্যাস আমদানী নিশ্চিত করা মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।

সেজন্যই যুক্তরাষ্ট্র তেলসমৃদ্ধ 'বন্ধুত্বপূর্ণ', অর্থাৎ তাঁবেদার ও আজ্ঞাবহ শাসন ব্যবস্থা

www.pathagar.com

বহাল রাখতে চায়। তেলসমৃদ্ধ সউদী আরবের রাজতন্ত্র টিকে আছে যুক্তরাষ্ট্রের সমরশক্তির সহায়তায়। মার্কিন নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে বলে সউদী সরকারের বিরুদ্ধে চাপা গণঅসন্তোষ খুবই গভীর। বস্তুত একটা গণঅভ্যুত্থানের ভয়ে সউদী সরকার এবং তাঁদের মার্কিনী অভিভাবকরা সদাই আতঙ্কিত। ওসামা বিন লাদেন এবং তাঁর আল-কায়েদা গোষ্ঠীর উদ্ভব সউদী আরব সরকারের আজ্ঞাবহ ভূমিকার বিরুদ্ধে অসন্তোষেরই প্রতিফলন মাত্র। সর্বশেষ একটা দৃষ্টান্ত দেখা গেছে ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ভেনিজুয়েলায়। ভেনিজুয়েলা প্রধান তেল উৎপাদক দেশগুলোর অন্যতম। কিন্তু বর্তমান প্রেসিডেন্ট হিউগো শেবেজ জনকল্যাণমুখী। দেশের বিপুল গরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য তিনি হয়তো তেলের দাম বাড়াতে পারেন। সে আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। দু'মাস আগে ভেনিজুয়েলার সেনাবাহিনীর একাংশ অভ্যুত্থান ঘটিয়ে শেবেজকে ক্ষমতাচ্যুত করে। তারপর থেকে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, সে অভ্যুত্থানে মার্কিন নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু জনপ্রিয় প্রেসিডেন্টকে গদিচ্যুত করায় ভেনিজুয়েলার জনতা রুখে দাঁড়ায়। ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের সরকারও মার্কিন অনুপ্রেরণার সেনাবাহিনী কর্তৃক স্থাপিত বিকল্প প্রেসিডেন্টকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। ফলে দু'দিন পরে আবার শেবেজকে ফিরিয়ে আনতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায়ই তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ঘটানো হচ্ছে এবং বলা হয়ে থাকে যে, সে সব বিক্ষোভের পেছনেও মার্কিন হস্তক্ষেপ খুবই লক্ষণীয়।

আক্রোশের তেল, তেলের আক্রোশ

ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে আক্রোশের তেলই হচ্ছে আসল কারণ। অথচ আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের মত সাদ্দামও যুক্তরাষ্ট্রেরই সৃষ্টি। ১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লা খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর যুক্তরাষ্ট্র সে দেশের বিশাল তেল সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার আশায় এবং ইরানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যেই যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দামের ঘাড়ে চাপে। দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রসহ যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহকৃত যাবতীয় মার্কিন অস্ত্রের সাহায্যেই সাদ্দাম হোসেন ইরানের বিরুদ্ধে ৮ বছরব্যাপী যুদ্ধ চালিয়েছিলেন এবং সে যুদ্ধে দু'পক্ষে কয়েক লাখ লোক মারা গিয়েছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে সেটা ছিল ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রেরই প্রক্সি যুদ্ধ- যেমন আফগানিস্তানে কিছুসংখ্যক ভাড়াটে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ওয়ার লর্ডকে ঘুষ দিয়ে তালিবান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো হয়েছিল।

কিন্তু একপর্যায়ে সাদ্দাম আর যুক্তরাষ্ট্রের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে অস্বীকার করেন। যতদূর জানা যায়, সাদ্দামকে ফাঁদে ফেলেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের অজুহাত সৃষ্টি করা হয়েছিল। বাগদাদে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত নাকি ১৯৯০ সালে সাদ্দাম হোসেনকে এমন একটা ধারণা দিয়েছিলেন যে, পুরনো দাবীর জের ধরে তিনি কুয়েত দখল করে নিলে যুক্তরাষ্ট্র খুব অখুশি হবে না।

১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে কুয়েত থেকে ইরাকীদের বিতাড়িত করা এবং ইরাকের সমরযন্ত্রের বিরাট অংশ ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব হলেও সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়নি এবং ইরাকের বিশাল তেল সম্পদের নিয়ন্ত্রণও কোন মার্কিন আজ্ঞাবহের হাতে ফিরে আসেনি। এই ব্যর্থতার জন্য, গোর ভিডালের বর্ণনা অনুযায়ী মার্কিন 'তেল-হুন্তা'

www.pathagar.com

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে (বর্তমান প্রেসিডেন্টের পিতা) ক্ষমা করতে পারেননি। ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসের নির্বাচনে দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়ে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন।

পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাধা করে সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা, নিদেনপক্ষে গদিচ্যুত করার সংকল্প জর্জ ডব্লিউ বুশ গোড়া থেকেই ঘোষণা করেছিলেন। নিরাপত্তা পরিষদের একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৯১ সালের যুদ্ধের পর ইরাকে জাতিসংঘের একটা অস্ত্র তদারকি দলকে পাঠানো হয়। কিছুকাল পরেই সাদ্দাম অভিযোগ তোলেন যে, তধারকি দলকে গ্রহণ করা সত্ত্বেও ইরাকের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নেয়া হচ্ছে না; যুক্তরাষ্ট্র যেন সে তদারকি দলকে বরাবরের জন্যই ইরাকে বহাল রাখতে চায় এবং সে দলের কোন কোন মার্কিন সদস্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি চালাচ্ছেন। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে সাদ্দাম হোসেন ১৯৯৮ সালে তদারকি দলকে বহিষ্কার করেন।

জর্জ ডব্লিউ বুশ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অমান্য করা হচ্ছে—এ অজুহাত দেখিয়ে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু বিশ্ববাসী তখন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, ইসরাইল নিরাপত্তা পরিষদের একপ্রস্থ প্রস্তাব অমান্য করা সত্ত্বেও সে ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের বিরুদ্ধে ইসরাইলকেই সমর্থন করে যাচ্ছে। বিকল্প অজুহাত হিসেবে বুশ প্রথমে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার সঙ্গে ইরাককে জড়িত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালালেন। আরও বহু অজুহাত সাজানোর চেষ্টা হয়েছিল। সেসব চেষ্টারও ব্যর্থতার পর এখন সাদামাটা বলে দেয়া হচ্ছে যে, বিশ্বের শান্তি ও কল্যাণের জন্য নাকি সাদ্দামকে সরানো দরকার।

রণ-দামামার প্রকৃত রহস্য

ইরাকের বিরুদ্ধে পাঁয়তারা এবং সাজ সাজ রব গত কয়দিনে হঠাৎ করে অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেছে। এই কিছু দিনের আরও কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করলেই এই দ্রুতায়িত যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রকৃত রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। প্রথম কারণ এই যে, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় বুশ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। ইসরাইলের রণোন্মাদ প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়েল শ্যারন পশ্চিম তীর থেকে সৈন্য সরিয়ে আনার জন্য বুশের নির্দেশ আগ্রাহ্য করেছেন। বাধ্য হয়ে বুশ এখন শ্যারনের নির্দেশ মেনে নিয়ে চুপ হয়ে গেছেন এবং ফিলিস্তিনী নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবীদের নিধন করার অবাধ লাইসেন্স শ্যারনকে দিয়েছেন। সাদ্দামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডামাডোলে বুশ এখন তার ব্যর্থতা এবং ইসরাইলের প্রতি তার অনৈতিক পক্ষপাতিত্বের দায়িত্ব ধামাচাপা দিতে চাইছেন।

পর্বতপ্রমাণ ব্যবসায়িক দুর্নীতির কারণে এনরন, আর্থার অ্যান্ডারসন, ওয়ার্ল্ডকম, জেরোক্স, কোয়েস্ট প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বৃহত্তম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সংকটে পড়েছে। সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর সঞ্চয় এবং পেনশন ভীষণ রকম হ্রাস পেয়েছে। ধনতন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রিত মার্কিন মিডিয়াও এখন ব্যবসায়ের জগতের আকাশচুম্বী প্রলোভন ও দুর্নীতির বিস্তারিত সমালোচনায় লিপ্ত হতে বাধ্য হচ্ছে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ এই যে, এ প্রসঙ্গে দিনের পর দিন এও আলোচিত হচ্ছে জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের সকলেই সাম্প্রতিক অতীতে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কোন কোনটির কর্তৃত্বের পদে নিয়োজিত ছিলেন। মিডিয়ার সম্প্রচারের জের

www.pathagar.com

ধরে আইনজীবীদের একটা সংগঠন বুশের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই একটা দুর্নীতির মামলা দায়ের করেছে। ১৯৯০ সালে যখন তার পিতা জর্জ বুশ প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ টেক্সাসের একটা তেল কোম্পানীর পরিচালক ছিলেন। তখন তার বিরুদ্ধে বেআইনী ও অনৈতিক আচরণের দ্বারা মোটা অঙ্কের মুনাফা করার অভিযোগ উঠেছিল। সে সময় ব্যাপারটা কোন মতে ধামাচাপা দেয়া গেলেও সাম্প্রতিক কেলেঙ্কারিগুলোর জের ধরে সে বিষয়ের ওপর নতুন করে আলোকপাত হচ্ছে, বিরোধী ডেমোক্রেট দলের সংসদ সদস্যরাসহ অনেকেই সে ঘটনার প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করার এবং বিষয়টি সম্বন্ধে উন্মুক্ত তদন্তের দাবী জানিয়েছেন। ১১ সেপ্টেম্বরের পরবর্তীকালেও প্রেসিডেন্ট বুশের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তায় ধস নেমেছে। ইউরোপে, এমনকি খোদ যুক্তরাষ্ট্রেও কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন যে, এসব কেলেঙ্কারি নিয়ে প্রচার-প্রচারণা শীঘ্রই বন্ধ করা না গেলে তার পরিণতি বুশ প্রশাসনের জন্য মারাত্মক হতে পারে। বিশেষ করে নভেম্বর মাসে কংগ্রেসের মেয়াদ-মধ্য নির্বাচনে বুশের রিপাবলিকান দল তাতে বড় রকমের মার খাবে। সমালোচকরা বলছেন যে, মার্কিন জনসাধারণের মনোযোগ ভিন্নমুখী করাই বর্তমান রণদামামার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্যে নির্বাচনের আগেই হয়ত জর্জ ডব্লিউ বুশ ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ চালাবেন।

(লন্ডন, ১৪-০৭-০২)

লেখকঃ বিবিসি খ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

www.pathagar.com

আফগানিস্তান ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মুহাম্মদ সিদ্দিক

যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে কোন দেশ যদি লাদেনকে আশ্রয় দেয় তবে তাদের পরিণতি হবে আফগানিস্তানের মতোই। যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে যেভাবে হামলা চালিয়ে তালেবানের পতন ঘটিয়েছে একইভাবে বিন লাদেনের আশ্রয়দাতা দেশের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে সে দেশের সরকারেরও পতন ঘটানো হবে। এ ধরনের মন্তব্য খুব স্বাভাবিক মনে হলেও, এর গভীরতা অনেক। এই নীতি যদি বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ অবলম্বন করে তাহলে বহু দেশ অন্যদেশের সরকার পরিবর্তনের বাহানা পেয়ে যাবে। বাহানা বা ছুতা আবিষ্কার করা কঠিন হবে না। এই নীতি বিশ্ব রাজনীতিতে অরাজকতা সৃষ্টি করতে পারে।

অস্থায়ী আফগান পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল্লাহ আফগানিস্তানে নিয়োজিত বহুজাতিক বাহিনীকে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা না দেয়ার জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কাছে চিঠি দিয়েছেন। পশ্চিমারা আফগানিস্তানে শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা চায় অথচ বসনিয়ায় সে জাতিসংঘ বাহিনীকে তা প্রদান করছিল না। ফলে সেব্রেনিসাতে মুসলমানদের হত্যায় জাতিসংঘ বাহিনী ছিল নিরব। ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, ওসামা বিন লাদেনের আল কায়দা গোষ্ঠীর সদস্যদের আটক অথবা হত্যা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে চেষ্টা চালাচ্ছে তাকে হামিদ কারজাই পুরোপুরি সমর্থন করেন। কান্দাহারে এক সাক্ষাৎকারে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আমরা অবশ্য তাদের সবাইকে খতম করবো, সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করবো। কারজাই সাংবাদিকদের জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ যাবৎকালের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি প্রেসিডেন্ট বুশকে একটি চিঠি দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে বর্বর শাসন থেকে মুক্ত করতে আমেরিকা যে সাহায্য করেছে তার জন্যই আমি এ ধন্যবাদ জানিয়েছি।

মার্কিন কূটনীতিকরা জানিয়েছেন, বৃটেন আফগানিস্তানে একটি বহুজাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান এবং তাদের সংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে,। নবগঠিত আফগান সরকার সঠিক পথে না এগোলে তাবেদার ও পশ্চিমের পুতুল সরকার হিসেবে দুর্নাম কুড়াতে পারে। আফগান চরিত্র বিচিত্র। এদিকে পশ্চিম ইতোমধ্যেই ফয়সালা করেছে যে, বৃটেন হবে বহুজাতিক বাহিনী (যা আসলে ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাহিনী) এর নেতা। এটাও এক রকমের চালাকি। জাতিসংঘ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই বৃটেন নেতা।

www.pathagar.com

এটা কি আফগানিস্তানে অতীতে বৃটিশের পরাজয়ের প্রতিশোধ ? আর জাতিসংঘ যে পকেট সংঘ তাও প্রমাণিত হচ্ছে। কাবুলে উত্তরাঞ্চলীয় জোট ঢুকে পড়ল। কথা ছিল তারা আগে ঢুকবে না । প্রেসিডেন্ট বুশ ন্যাকামী করে বললেন, কাবুলে যে উত্তরাঞ্চলের সৈন্যরা ঢুকে পড়েছে তার রিপোর্ট তিনি পান নি। তিনি সব রিপোর্টই পান। শুধু এই রিপোর্টটি পান না। ভণ্ডামি আর কাকে বলে। পাকিস্তানের একনায়ককে কাঁচকলা দেখিয়ে পশ্চিম তাদের স্বার্থ পূর্ণভাবে উদ্ধার করছে। পরবর্তীতে পাকিস্তানকে ছুঁড়ে ফেলতে পশ্চিমের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হবে না।

২৮ নভেম্বর জার্মানীর পরিবেশবাদী আন্দোলন 'গ্রীন পিস' তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, আমেরিকার ওষুধ কোম্পনীগুলো এনথ্রাক্স প্রতিরোধক এন্টিবায়োটিক ওষুধের ব্যবসা বাড়াতে সুকৌশলে যুক্তরাষ্ট্রে এনথ্রাক্সের জীবাণু ছড়িয়ে মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। তারা খামাখা একজন ডাক্তার এবং দু'জন রাসায়নবিদ (যারা সবাই পাকিস্তানি) গ্রেফতার নাটক করেছে। সমগ্র পাশ্চত্য নীতি ভণ্ডামির উপর নির্ভরশীল।

খৃস্টানধর্ম প্রচারকরা আফগানিস্তান থেকে ছাড়া পেলে একজন মার্কিন পিতা গর্ব করে বললেন, 'উই হ্যাভ সাস স্ট্রং বেস অব ক্রিশ্চিয়ানিটি (অর্থাৎ আমাদের খৃস্টীয় ভিত্তি খুবই শক্তিশালী) (বিবিসি-১৫-১১)। আসলে পশ্চিমের সামরিক শক্তির বড়াই করলেন খৃস্টান ধর্মপ্রচারকবৃন্দ। এ দিকে হিথার মার্কার নাম্নী মার্কিন মহিলা ধর্মপ্রচারক স্বীকার করেন যে, তাদের বিরুদ্ধে তালিবানদের মামলার ৮০ ভাগ মিথ্যা, তবে ২০ ভাগ সত্য অর্থাৎ কিছু ধর্ম প্রচারের কাজ করা হয়েছিল। তবে তিনি অবশ্য বলেন, তালিবানদের বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ নেই। জেলে তালিবানরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে। (সিএনএন ১৬-১১)। জেলখানার গার্ডরা তাদের বোন বলেও ডাকে। মিস মার্কার বলেন যে তাদের কখনও মনে হয় নি যে তাদের হত্যা করবে তালিবানরা।

উল্লেখ্য যে, একজন জাপানীকে তালিবানরা সন্দেহ করে বন্দী করেছিল। পরবর্তীতে তাকে তারা ছেড়ে দেয়। জাপানী বলেন, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হয়। তিনি কখনও মনে করেন নি যে তার জীবন বিপন্ন (সিএনএন ১৮-১১)।

সিএনএন (১৮-১১) জনৈক সাবেক 'মান' মহিলা কারেন আর্মস্ট্রংকে (যিনি মুসলিম দেশে কাজ করেছিলেন) হাজির করেন ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে নেগেটিভ কথা বলাতে। সবাইকে আশ্চর্য করে কারেন ইসলাম ও মুসলমানদের প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন, ইসলাম সমাজ সচেতন ধর্ম। মুসলমানরা গরীবদের কথা ভাবে। সবাইকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায়।

সিএনএন-এর উপস্থাপক কারেনকে উস্কানিমূলক প্রশ্ন করেন, ইসলামপন্থীরা কি পাশ্চাত্যকে ঘৃণা করে ? পাশ্চাত্যের জন্য তারা কতটা হুমকি ? কারেন বলেন, মৌলবাদ তো প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়, তারপরে তা বাইরে যায়। শুধু ইসলামে নয়, খৃস্টধর্ম, ইহুদী ধর্ম ও ইসলাম এই তিনটিতেই মৌলবাদ রয়েছে।

সিএনএন' প্রশ্নকারী বলেন, প্রেসিডেন্ট বুশের পত্নী লরা বুশ তালিবানদের অধীনে নারীর দুরবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। সন্ন্যাসিনী কারেন জবাবে বললেন, কোন বিশ্ব ধর্মই নারীদের ব্যাপারে ভালো নয়। বরঞ্চ সপ্তম শতাব্দীতে কুরআন নারীদের মুক্তির জন্য উদ্যোগ নেয়। ধন্য মিস কারেন, কিছুটা সত্য কথা বলার জন্য। সিএনএন-এর ষড়যন্ত্র এখানে ক্ষণিকের জন্য হলেও ব্যর্থ হল।

www.pathagar.com

ইহুদী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেন, (সিএনএন ২-১২)। আমরা আরাফাতের সঙ্গে তাই করব যা যুক্তরাষ্ট্র তালিবানদের সঙ্গে করেছে। ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র যে একই রাষ্ট্র তা এককথায় স্পষ্ট। আসলে ইসরাইলের বেশিরভাগ নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রেরও নাগরিক। ইসরাইল হল যুক্তরাষ্ট্রের বর্ধিত অংশ। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র বলেন (বিবিসি, ২-১২), আরাফাত লাদেনের পদচিহ্ন অনুসরণ করছেন। আর আমাদের ডিএনএতে রয়েছে শান্তি। হামাস, আল জিহাদ ও হিজবুল্লাহ্ পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংস করতে চায় ইসরাইলী কর্মকর্তারা স্বীকার করলেন যে, ইসরাইল হল পাশ্চাত্য সভ্যতা। তাই যদি হয়, তাহলে এটিই তো প্রমাণ যে এটি একটি আগ্রাসন। তারা আরবদের এলাকার দখলদার। আরবে থাকবে আরব সভ্যতা, এটাই তো স্বাভাবিক।

সিএনএন (৩-১২) জানায়, ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীর সিনিয়র উপদেষ্টা রানান ঘিসিন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাস দমনে যা করছে, আমরাও তাই করব। এ দিকে সিএনএন-এর হোয়াইট হাউস সংবাদদাতা মেজদ গ্যারেট যে সুরে কথা বললেন তাতে মনে হলো তিনি ইসরাইল সরকারের কর্মকর্তা। মেজদ গ্যারেট বলেন, ইসরাইলের সব অধিকার রয়েছে তার রক্ষার। ইসরাইল সার্বভৌম। সব সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে। গ্যারেট বলেন, পিএলও সন্ত্রাসবাদী প্রতিষ্ঠান। গ্যারেটও বলেন যে বুশ বলেছেন, তিনি ইসরাইলের সঙ্গে আছেন, আর ইসরাইলী তাদের সঙ্গে। কলিন পাওয়েল ইসরাইলকে বলেছেন, আপনাদের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে যা ভালো তাই করুন। রানান ঘিসিন বলেন, আরাফাতকে সন্ত্রাসীদের বিচারে আনতে হবে, নইলে আমরাই তাদের বিচারের সামনে আনব। এসব কথাবার্তা ইসরাইল, যুক্তরাষ্ট্র, সিএনএনের ভিতরের ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করে। আসলে আরবদের যুক্তরাষ্ট্রের মুখোমুখি করেছে ইসরাইল।

যদিও অসলো চুক্তি অনুযায়ী আরও আগেই একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের কথা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তির গ্যারান্টি প্রদানকারী। নিউইয়র্কের ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সুযোগটি ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী পুরোপুরি গ্রহণ করছেন এবং সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের নামে ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবিকে শেষ করে দেয়ার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে ফিলিস্তিনীদের ওপর হামলা চালাচ্ছেন। ইসরাইলী বিমান অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে এসব সন্ত্রাস চালাচ্ছে। বেসামরিক স্থাপনা ধ্বংস করছে এবং এমন কি ফিলিস্তিনীদের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হত্যা করছে। তবুও কি এসব ঘটনা ও হত্যাকে সন্ত্রাস বলা যাবে না ? যুক্তরাষ্ট্র পিছনে থাকলেই কি সন্ত্রাস 'আত্মরক্ষা'য় পরিণত হয় ?

ভারতেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব এসেছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নয়া কঠোর সন্ত্রাস বিরোধী আইন পাশ না করার জন্য ভারতের পার্লামেন্টের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছেন, 'এ আইনের মাধ্যমে অধিকার হরণ ও ক্ষমতার অপব্যবহার হবে'। অ্যামনেস্টি বলে, এ আইনে নিরীহ লোকদের হয়রানির বিরুদ্ধে আইনগত সহযোগিতার কোন ব্যবস্থা নেই। এমন কি ভারতীয় সংবিধানের নাগরিকদের অধিকারের যে নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে, তা লংঘিত হয়েছে। উপমহাদেশেও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। শান্তি কি শেষ পর্যন্ত উঠে যাবে ? ❑

লেখক ঃ কলামিস্ট।

ফেব্রুয়ারী '০২

www.pathagar.com

আফগানিস্তান মুক্ত হয়েছে, না দখল হয়েছে ?

আবু আহমেদ

তামাম দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষ চায় একটা স্বাধীন আফগানিস্তান। আফগানিস্তানের নিরীহ জনগণ দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে। প্রথমে তারা কমিউনিস্টদের নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিল, তার পর তাদের ওয়ারলর্ডদের হাতে, তারপর তালেবানের হাতে, সর্বশেষ তারা বোমা ও গুলিতে মরছে আমেরিকানদের হাতে। আমেরিকা আফগানিস্তানকে তালেবানমুক্ত করতে এসে এমন এমন অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা ব্যবহার করেছে যেগুলো তারা ইতিপূর্বে আর কোথাও ব্যবহার করেনি। আফগানিস্তানের পথে-প্রান্তরে আমেরিকা হাজার হাজার টন বোমা নিক্ষেপ করেছে। অবশেষে আমেরিকার জয় হয়েছে, তালেবান হয়তো মরেছে, নতুবা পিছু হটে গেছে। কি নৃশংস ছিল ঐ যুদ্ধ, যে যুদ্ধে হাজার হাজার বন্দি তালেবান সৈন্যকে ওপর থেকে বোমা নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা হয়েছে। যে যুদ্ধে তালেবান জিততে পারবে না সে যুদ্ধ থেকে সরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই চার সপ্তাহ যুদ্ধ করার পর তালেবান সৈন্যরা হয় আত্মসমর্পণ করেছে, নতুবা পালিয়ে গেছে। তালেবানের অপরাধ কি ছিল ?

অপরাধ ছিল তারা ওসামা বিন লাদেন নামের একজন সৌদি মুসলমানকে তাদের জায়গায় থাকতে দিয়েছিল। ঐ লাদেনের নাকি একটি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ছিল, নাম আল কায়দা। ঐ আল কায়দাই নাকি ১১ সেপ্টেম্বরের নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের পেন্টাগনের সেই ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছিল। তাই তালেবান ও ওসামাকে ধ্বংস করার জন্য অতি সম্প্রতি আফগানিস্তানে আমেরিকানদের নেতৃত্বে ঐ নৃশংস যুদ্ধ হয়ে গেল। ঐ যুদ্ধে আমেরিকানরা উজবেক, তাজিক এবং হাজারাদেরকে মিত্র হিসাবে সঙ্গে নিল। উজবেক, তাজিক এবং হাজারা মিলে আফগানিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৩০%-৩৫% হবে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশতুনরা তালেবানের পক্ষে ছিল। তালেবান এক পর্যায়ে আফগানিস্তানের ৯৫% ভূখন্ড নিজেদের অধীনে এনেছিল। বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বীকৃতির জন্য যা যা দরকার সবই তালেবান পূরণ করেছিল। কিন্তু আমেরিকা যেহেতু তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি, সেজন্য বাকিরাও ঐ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। এটা ঠিক নয় যে, তালেবানে আগে দক্ষিণের পশতুনরা ছিল। শেষের দিকে তালেবান সরকারে তাজিক, উজবেক ও হাজারারাও অংশ নিয়েছিল। কিন্তু ঐ সরকার একটা বিষয়ে ভুল করেছিল। সর্বত্র

www.pathagar.com

ইসলামী শাসন কায়েম করতে গিয়ে মুজাহিদ ওসামা বিন লাদেন যুক্তরাষ্ট্রকে মুসলমানদের নির্যাতিত হওয়ার পেছনে এক নম্বরের দুশমন বলে মনে করতেন। মুক্ত আফগানিস্তানকে তারা আন্দোলনের জন্য বেছে নিলেন। যুক্তরাষ্ট্র বিন লাদেন কি করছে, করছে না ঐ নিয়ে হয়তো মাথা ঘামাত না যদি না ১১ সেপ্টেম্বরের ঐ ঘটনা সংঘটিত হতো। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মিলিটারি শক্তি যে কত হতে পারে এ ব্যাপারে বিন লাদেনের কোন ধারণাই ছিল না। বিন লাদেন এও ভুলে গিয়েছিলেন যে, এত সঙ্কটময় মুহূর্তে তালেবানদের মিত্র পাকিস্তানও তাদের সঙ্গে থাকবে না। দুনিয়ার অন্য সব মুসলমান ঠিক লাদেনের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি দেখালেও তাদের পক্ষে বিন লাদেন এবং তালেবানকে সাহায্য করার কোন উপায় ছিল না। যেমন করে ইরাকের নিরীহ জনগণকে মুসলমানরা সাহায্য করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আজকে আফগানিস্তান তালেবান ও বিন লাদেনমুক্ত। ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যরা বড় বড় আফগান শহরকে পাহারা দিচ্ছে। শোনা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র অথবা ব্রিটেনের নেতৃত্বে একটা বহুজাতিক বাহিনী আফগানিস্তানে নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে। তবে মার্কিন ও ব্রিটিশ স্পেশাল ফোর্সরা কখন আফগানিস্তান ত্যাগ করবে এ ব্যাপারে এখনও কিছু বলা হয়নি।

মার্কিনীরা সফল হয়েছে এক্ষেত্রে যে, তারা অতি সফলভাবে আফগান জনগণকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও উৎসে ভাগ করতে পেরেছে। আজকে তাজিক-উজবেক হল পশতুনদের বড় শত্রু। যে আফগানরা ঐক্যবদ্ধভাবে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল সে আফগানদের এক অংশ এখন অন্য অংশকে দিবালোকে হত্যা করছে। আসলে আফগানরা আফগান ছিল যতদিন তাদের ব্যাপারে বাইরের পক্ষগুলো নাক গলায়নি। এখন আফগানরা আর আফগান নেই, এখন তাদের পরিচয় হল তাজিক, উজবেক, হাজারা আর পশতুন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ঐসব পরিচয়েই আফগানদের ডাকে, কারণ ঐ বিভক্তিতে তাদের সুবিধে হয়েছে। অন্তত আফগানদের মধ্যে তাদের একটা শত্রুপক্ষ চাই। তারা উত্তরের উজবেক ও তাজিকদের দিয়ে নর্দার্ন এলায়েন্স নামের একটা প্রতিপক্ষ খাড়া করল। আজ ঐ এলায়েন্সই আফগানিস্তানকে শাসন করছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু ঐ এলায়েন্স একটা স্বাধীন সরকার কাবুলে স্থাপন করতে পারবে না। আমেরিকানরা যা চায় তাই হবে।

একটা উদাহরণ দেয়া যায়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হামিদ কারজাই প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, কান্দাহারে তালেবান যদি আত্মসমর্পণ করে তাহলে তালেবান সরকারের প্রধান মোল্লা ওমর সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারবেন। ওয়াশিংটনের পেন্টাগন বলল, না, মোল্লা ওমরের বিচার হতে হবে, সে বিচার হয় তারা করবে নতুবা অন্য দেশের কোন নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল করবে। হামিদ কারজাইর ক্ষমা ঘোষণা বিফলে গেল। ওয়াশিংটন কোন রকমে ক্ষমা ঘোষণার বিপক্ষে। ওয়াশিংটনের সাফ কথা যত বেশি সম্ভব তালেবানদের হত্যা কর। বহুজাতিক নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যাপারে খোদ নর্দার্ন এলায়েন্সের নেতৃবৃন্দই আপত্তি জানিয়েছে, তথাপিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটিশদের নেতৃত্বে বহুজাতিক নিরাপত্তা বাহিনী অন্যদিকে স্ট্র্যাটেজিক প্রদেশগুলোতে থাকবে ব্রিটিশ ও আমেরিকান স্পেশাল ফোর্স। তাহলে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব রইল কই! ইতোমধ্যে আমেরিকানদের চাপে হামিদ কারজাই বের হয়েছেন পুরনো বাদশাহ জহির শাহের খোঁজে। এখন এমন একজন পশতুন লিডার পাওয়া গেল না যে তাদের প্রতিনিধিত্ব

www.pathagar.com

করবে। আফগান জনগণকে এখন অর্থের বিনিময়ে কেনা যায়। তাদেরকে আগে কেনা যেত না। এখন তাদের নেতারা অর্থের বিনিময়ে আনুগত্যের বেচা-কেনা করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থ নিয়ে মাঠে নেমেছে। অনেক পশতুন মেরে পরে তারা তালেবানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। তবে একটা ঐক্যবদ্ধ আফগানিস্তান বিশ্ববাসীর দেখতে অনেক সময় নেবে। হয়তো কোন দিন দেখবেও না। আফগানিস্তানের ঘরে ঘরে এখন শহীদদের খুঁজে পাওয়া যাবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম প্রশ্ন করে যাবে তাদের পিতা-ভ্রাতা কার হাতে কি কারণে মরেছে। বিধবা স্ত্রীরা বহুদিন যাবৎ তাদের স্বামীদের আত্মার ব্যথা শুনতে পাবে। সে আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি অনেক অর্থও ঢালে তাহলেও আফগানদের ক্ষত শুকাতে অনেক অনেক বছর লেগে যাবে। একদিন আফগানরা শুধু কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নকেই ঘৃণা করত, এখন ঐ ঘৃণার তালিকায় যোগ হয়েছে আমেরিকানরাও। তালেবানের ভাল-মন্দ আফগানরা ভুলে যাবে, কিন্তু মাজার-ই-শরিফ জেলখানায় যেভাবে বন্দি তালেবান সৈন্যদের গুলি করে মারা হলো সে ইতিহাস পশতুন আফগানরা অনেক দিন ভুলবে না। একজন বিন লাদেন হয়তো আফগানিস্তানের মাটিতে শহীদ হয়ে গেছেন বা অন্যত্র মারা পড়বেন। আফগানিস্তান এখন হল অবিস্ফোরিত বোমা ও মাইনের দেশ। আফগান জনগণ একদিন অতি আত্মসম্মানসম্পন্ন জাতি ছিল। আজ সে গর্ব তাদের নেই। এখন তারা শরণার্থী, নিজ দেশেও তারা শরণার্থী। শরণার্থী হলে যে যেমন হয় সেসব এখন ওদের মধ্যে দেখা গেছে। তবে বিশ বছরে তারা একটা বিষয়কে জয় করেছে, তা হল মৃত্যুর ভয়।

এখন যুদ্ধ হল তাদের কাছে অতি সাধারণ বিষয়। বেশি যুদ্ধ শিখে গেলে সেটা যেমন নিজদের জন্য বিপদ ডেকে আনে, তেমনি অন্য জাতিকে শুধু আর্থিক সাহায্য দিয়ে চুপ করে রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। আফগানিস্তানের তালেবান বিরোধী এ যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মুসলমানদের থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। এক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মুসলিম বিশ্ব বিশ্বস্ত বন্ধু ভাবত। সে অবস্থা এখন আর নেই। এখন যুক্তরাষ্ট্র যেন খুঁজে খুঁজে মুসলমানদেরকে মারতে উদ্যত। প্যালেস্টাইন জবরদখল করে আছে ইসরাইল। আর ইসরাইল ওয়াশিংটনের ইঙ্গিতে নিরীহ প্যালেস্টাইন শিশু- মহিলাদেরকে হত্যা করে চলেছে। ইরাকের ওপর দীর্ঘদিন যাবৎ এক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখা হয়েছে। যেদিকেই মুসলমানরা তাকায় সেদিকেই তারা দেখে মুসলমানদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ চলছে। বুশ অনেকবার বলেছেন, তালেবান-বিরোধী যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। তিনি হোয়াইট হাউজে ইফতার পার্টিও দিয়েছেন। কিন্তু মুসলমানরা এটা কিভাবে বুঝবে যে যেখানে মুসলমানদের নিধন চলছে সেখানে ঐ যুদ্ধ আর নিধন ইসলামের বিরুদ্ধে নয়? তাহলে মুসলমান আর ইসলাম কি আলাদা? আফগানিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। ঐ অবস্থান না নিয়ে ঐ দেশেরও উপায় ছিল না। নতুবা খোদ পাকিস্তানকেই বিন লাদেনের কর্মকাণ্ডের জন্য মূল্য দিতে হতো। এখন বিশ্ববাসী দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র সত্যিকার অর্থে একটা স্বাধীন আফগানিস্তান চায় কি-না। অনেকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের আসল উদ্দেশ্য হল সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে তাদের তেল-গ্যাস কম মূল্যে অন্যদের কাছে বিক্রি করা। এজন্য তারা আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে একটা পাইপলাইন নিতে চায় ইন্ডিয়া ওশেনে। ঐ পাইপলাইনের একটা অংশ পাকিস্তানের ওপর দিয়েও যাবে। তাই পাকিস্তানকেও মিত্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের অতি প্রয়োজন। যে

www.pathagar.com

পাইপলাইন তারা বসাতে চাচ্ছে সে পাইপলাইনের নিরাপত্তাতেও থাকবে মার্কিন বাহিনী। তাহলে পাইপলাইন পাহারা দেবার নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানকে দখল করে রাখবে? শুধু আগামী দিনগুলোই এ প্রশ্নের জবাব দেবে। ❑

ফেব্রুয়ারী '০২

লেখক ঃ কলামিষ্ট, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে কারাবন্দী তালিবান হত্যা ইতিহাসের এক কলঙ্কিত ঘটনা

ইন্টারনেট ঃ আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন বিমানে বর্বরোচিত হামলা অব্যাহত রয়েছে। এই হামলায় অগণিত বেসামরিক লোক প্রাণ হারাচ্ছে। গত ২৫ থেকে ২৭ নভেম্বরের মধ্যে মাজার-ই-শরীফের দুর্গে আটক সকল তালিবান বন্দীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। নিহতের সংখ্যা ৪শ' থেকে ৬শ' পৌঁছতে পারে।

এদের মধ্যে বেশিরভাগ হচ্ছে পাকিস্তানী, চেচেন ও আরব মুজাহিদ। এ ছাড়া নিহতদের মধ্যে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কিছুসংখ্যক সৈন্য ও একজন সিআইএ'র কর্মকর্তা রয়েছেন। সরকারীভাবে বলা হচ্ছে, কারা বিদ্রোহের কারণে এরা নিহত হয়েছে। তাদের দাবীর মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্যতা আছে কি-না সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। সূত্র জানায়, বন্দী তালিবানরা উত্তরাঞ্চলীয় জোটের প্রহরারত সৈন্যদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে দুর্গের অস্ত্রের গুদাম ভেঙ্গে ফেলে। এরপর দুর্গের ভেতরে ও বাইরে উত্তরাঞ্চলীয় জোট ও ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর লড়াই সংঘটিত হয়। এ সংঘর্ষে বন্দী সকল তালিবান মুজাহিদ নিহত হয় বলে জানানো হয়েছে। পত্র-পত্রিকার খবরে বলা হয়, দু'জন সিআইএ'র কর্মকর্তা যখন তালিবানদের জিজ্ঞাসাবাদ করার চেষ্টা করছিলেন, ঠিক সে সময় এই বিদ্রোহের সূচনা হয়। বলা হচ্ছে, আটক তালিবানরা কারাবন্দী হতে চায়নি, তারা জিহাদ করে মরতে চেয়েছিল। সরকারী সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তোলা হয়েছে। কিলা-ই-ঝাঙ্গিতে অবস্থিত তালিবানরা ইতোমধ্যে কুন্দুজে আত্মসমর্পণ করেছে। তারা লড়াই বন্ধ ও অস্ত্র পরিত্যাগ করতে সম্মত হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এসব তালিবান মুজাহিদ জিহাদ করে মরতে চাইলে কেন তারা কুন্দুজে আত্মসমর্পণ করলো? আরেকটি প্রশ্ন হলো এই বিদ্রোহের কি কারণ থাকতে পারে। পত্রিকায় একটি আমেরিকানের মুখ দেখানো হয়, যার কোন অর্থই হয় না।

তারা একজন আমেরিকান দেখিয়ে স্বস্তি পেলে তাহলে মার্কিন সৈন্যদের হাতে আটক তালিবান মুজাহিদদের ভাল আচরণ পাওয়ার কথা ছিল। মাত্র ২ জন সিআইএ কর্মকর্তা আটক তালিবানদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে পারে- এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কারণ তারা এত বোকা নয় যে, এ রকম একটা কাজে তারা অবলীলায় যুক্ত হবেন। তৃতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, ট্যাংক ও কামান ব্যবহার করে এই বিদ্রোহ দমন করা

www.pathagar.com

হয়েছে। উপর থেকে বোমা হামলা চালানোর কোন লক্ষণ পাওয়া যায়নি।

এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে মূল বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে। সেটা হল জেনারেল রশিদ দোস্তামের বাহিনী তালিবান মুজাহিদদের আটক করে। উত্তরাঞ্চলীয় জোট প্রাধান্য বিস্তার করার প্রেক্ষিতে কেবল আফগান তালিবানরাই আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়। বিদেশী মুজাহিদদের আত্মসমর্পণের প্রশ্নই ওঠে না। বিদেশী মুজাহিদদের ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে না বলে জানিয়ে দেয়া হয়। তখন পাকিস্তান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশ যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানায়। জনাব দোস্তামের একজন মুখপাত্র এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, বিদেশী মুজাহিদদের জাতিসংঘের কাছে হস্তান্তর করা হবে। জোটের আমেরিকান সমর্থকরা এই সংকেত দেয় যে, মার্কিন প্রতিরক্ষমন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড তালিবান ও আল-কায়েদার মুজাহিদ হত্যাকারীদের প্রতি সবুজ সংকেত দিয়ে বলেছেন, তাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। তালিবান বাহিনীর অগ্রযাত্রার প্রথম কয়েক দিনে মাজার-ই-শরীফের একটি স্কুলে মুজাহিদদের আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটে। এ সময় দোস্তাম বাহিনী ৫শ' ২০ জন পাকিস্তানী তালিবানকে হত্যা করে। রেডক্রস ও সাংবাদিকরা এ হত্যাকাণ্ড নিশ্চিত করেছে। তারা লাশ বহন করে নিয়ে যেতে দেখেছেন। কান্দাহারে আরো বহু মুজাহিদকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছে যা এখনো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। ❑

www.pathagar.com

লাদেন পরিবারের গোড়ার কথা

গৌতম মণ্ডল

৯০-এর দশকের গোড়ার দিকের কথা। বোস্টন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ইলেন সিগনাইগো ব্রুকম্যান একদিন নিমগ্নে পত্রিকার পাতা উলটাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি রিপোর্টে তার দৃষ্টি আটকে গেল। রিপোর্টটি ছিল ওসামা বিন লাদেন নামে এক সন্ত্রাসীর ওপর। কয়েক দিন পর ব্রুকম্যান ওই লেখাটি তার এক বন্ধু মোহাম্মদ বিন লাদিনকে দেখিয়ে বললেন, দেখ তো ওই নামটির সঙ্গে তোমার নামের মিল আছে কিনা? মোহাম্মদ বিন লাদেন বললেন, হ্যাঁ, পত্রিকায় যে লোকটির কথা লেখা হয়েছে সে আমারই ভাই। কণ্ঠ নামিয়ে তিনি বললেন, ওর নাম ওসামা। সে আমাদের সৌদি পরিবারের একটা কলঙ্ক। আমাদের পরিবারের সদস্যরা নির্মাণ ব্যবসা বা পড়াশোনার সূত্র ধরে অনেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে যেতেন। মার্কিন পোশাক, খাবার আর সঙ্গীতের প্রতিও অনেকের ঝোঁক ছিল প্রচণ্ড রকম; কিন্তু ওসামা বেছে নিয়েছে একেবারে ভিন্ন এক পথ। হয়ে গেছে কট্টর ইসলামী মৌলবাদী। থাকতে শুরু করেছে পাহাড়ের দুর্গম গুহায়। পশ্চিমা নাস্তিকদের ধ্বংস করতে মরিয়া হয়ে উঠছে।

তার অন্য ভাইবোনরাও ব্যবসা করতেন; কিন্তু ওসামা তার ব্যবসার অর্থ যোগান দিতে থাকলেন আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের পেছনে। এভাবে ওসামা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। মোহাম্মদ বিন লাদিন দুঃখ করেই বললেন, আমার ভাই ওসামা তার নিজের জন্য কখনো নির্দিষ্ট একটি ঠিকানা খুঁজে পায়নি।

প্রায় এক দশক পর ওসামার আত্মীয় ও জ্ঞাতিরা অনেকটা বাধ্য হয়েই তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। লাদেন পরিবারের বন্ধু মৌলভি সায়েহ বললেন, একসময় এসে ওই পরিবারটি বুঝতে পারল ওসামার সন্ত্রাসের জন্য তারা নিজেরাও নির্যাতিত ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। কয়েক বছর আগে ওসামার এক বন্ধু তাকে আবারো তার পরিবারে ফেরানোর চেষ্টা করেছিলেন। পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ থেকে সরে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তাবে রাজি না হয়ে ওসামা বরং ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ওসামার এই সংকীর্ণ মৌলবাদী বিশ্বাসের কারণে তার পরিবারবর্গও হতবাক। ইদানীং ওসামা আধুনিক সৌদি আদর্শকেও অবজ্ঞা করেন।

www.pathagar.com

'৯০-এর দশকের মাঝামাঝি ওসামার সঙ্গে তার পরিবারের দূরত্ব আরও বেড়ে যায়। এমন কি ওসামার সঙ্গে নিজেদের আলাদা করার জন্য তারা তাদের পারিবারিক নাম বিন লাদেনের পরিবর্তে বিন লাদিন ব্যবহার করতে শুরু করে। অথচ এই ওসামা ছিলেন একসময় নম্র, ভদ্র, শিক্ষানুরাগী। তার এই পরিবর্তনে পরিবারের লোকেরাও বিস্মিত।

ওসামারা সব মিলে ৫৪ ভাইবোন। ২৪ ভাইয়ের মধ্যে তার স্থান ১৭তম। তার বাবা মুহাম্মদ বিন লাদেনের একই সময়ে ছিল চার স্ত্রী। তিনি এক স্ত্রী তালাক দিতেন আর অন্য একজন বিয়ে করতেন। সব ভাইবোনদের মধ্যে সম্পর্কও ছিল ভাল; কিন্তু ওসামা জন্মানোর পর তার মায়ের আর কোন সন্তান হয়নি। ওসামার মা ছিলেন সিরিয়ান। তবে তার অন্য মায়েরা মিসর ও সৌদি বংশোদ্ভূত। তারা একে একে প্রায় সবাই ওসামার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে থাকেন। পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করতেন বাবা মুহাম্মদ বিন লাদেন নিজেই; কিন্তু সমস্যা হলো তার কোন শিক্ষা ছিল না। ১৯২৫ সালে তিনি ইয়েমেন থেকে সৌদি আরবে আসেন। পেশায় রাজমিস্ত্রি মুহাম্মদ বিন কাজ করতে শুরু করেন একটি নির্মাণ কোম্পানিতে। এভাবেই ধীরে ধীরে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন তিনি। সৌদি বাদশাহ পরিবারেও অনেক ডিজাইনের কাজ করেন। হাতিয়ে নেন কোটি কোটি ডলার। একসময় নিজেই পাঁচশ কোটি ডলার দিয়ে নির্মাণ ব্যবসা শুরু করেন। রাজপ্রাসাদ তৈরি করে দেয়ার জন্য সৌদি বাদশাহ আবদুল আজিজ তাকে পুরস্কৃত করেন। লাদেন পরিবারের জামাই এমব্রস কেরি বলেছেন, মক্কার এদিক-ওদিক যতো মার্বেল মিনার-সব কিছুই লাদেন কোম্পানির তৈরি।

যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার আগ পর্যন্ত ওসামা বিন লাদেনের পরিবারের অনেকেই থাকতেন ইউরোপে। তবে তার চার ভাই পরিবার নিয়ে থাকতেন যুক্তরাষ্ট্রে। ওসামার এক ভাই আবদুল্লাহ পড়াশোনা করেছেন হার্ভার্ডে। ওসামার বাবা নিজেও মারা যান এক বিমান দুর্ঘটনায় ১৯৬৭ সালে।

লাদেন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র ওসামাই মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে থাকার ইচ্ছা পোষণ করেন। এক সময় তিনি জেদ্দার একটি প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি হন, ট্রাউজার আর শার্ট পরেন। ইংরেজি ভাষাও আয়ত্ত করেন ভালভাবে; কিন্তু কখনো যুক্তরাষ্ট্রে যেতে রাজি হননি। জেদ্দায় আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই শানিং ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ওসামা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা করেন। তখন হয়তো তার পরিকল্পনা ছিল পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দেয়া; কিন্তু ১৯৭৯ সালে যখন সোভিয়েতরা আফগানিস্তান দখল করে, তখন ওসামা সব কিছু বাদ দিয়ে মুজাহেদ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। এক্ষেত্রে তার পরিবার থেকে অবশ্য বাধা দেয়া হয়নি। কেননা ওসামা ছিলেন ওই পরিবারের 'হিরো'- বলেছেন লন্ডনভিত্তিক আল-কুদস্ আল-এরাবি পত্রিকার সম্পাদক আবদুল বারি আতোয়ান।

৮০'র দশকের শেষ দিকে ওসামা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মযুদ্ধে উৎসর্গ করেন। তিনি গঠন করেন আল কায়দা। নিজের লাখ লাখ ডলার ব্যয় করে সন্ত্রাসবাদী এ সংগঠনে যুবক মুসলিমদের ভর্তি ও তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করেন। পশ্চিমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তাদের তৈরি করেন। এরপর সাদ্দাম হোসেন যখন কুয়েত দখল করেন এবং সৌদি বাদশাহ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ নেন তখন ওসামা বলেন, একটি মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

যুদ্ধে অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করতে পারে না। তবে সে সময়ও তার পরিবারের অন্যরা ছিলেন সাদ্দামবিরোধী জোটের পক্ষে। তখন অনেক বলেও ওসামাকে পক্ষে নেয়া যায়নি। ১৯৯৪ সালে ওসামা দেশের মধ্যে একজন ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হন। সৌদি আরব তার নাগরিকত্ব বাতিল করে। পরিবারও আনুষ্ঠানিকভাবে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তবে গোয়েন্দা তথ্যে জানা যায়, সম্পর্কছেদ করার পরও পরিবারের অনেকেই গোপনে তাকে অর্থ সাহায্য দিয়েছেন।

সম্প্রতি ওসামা বিন লাদেন বিশ্বের একজন আলোচিত মানুষে পরিণত হয়েছেন। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বিন লাদেনকেই প্রধান সন্দেহভাজনদের তালিকায় রেখেছে। তাকে ধরার জন্য আফগানিস্তানে রাতদিন ক্ষেপণাস্ত্র পড়ছে। সারা বিশ্বে ওসামার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। লাদেন পরিবারের অন্য সদস্যদের প্রতিও সন্দেহের দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে বার বার। এখন যতবার, যতভাবেই তারা বলুন ওসামার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই-যুক্তরাষ্ট্র বা তার মিত্ররা কি সে কথা উপলব্ধিতে নেবে ? ❑

নভেম্বর '০১

-তথ্যসূত্র ঃ নিউজউইক

www.pathagar.com

একজন আমেরিকান তালেবানের রোমাঞ্চকর কাহিনী

জন ওয়াকার ওরফে আবদুল হামিদ। মার্কিন স্পেশাল ফোর্স আফগান রণাঙ্গনে হদিস পেয়েছে এক আমেরিকানের। এ নিয়ে তোলপাড়। বিচারের মুখোমুখি হতে হবে তাকে। মার্কিন এক এটর্নির পুত্র জন ওয়াকারকে নিয়ে এক্সক্লুসিভ ওয়েব রিপোর্ট প্রকাশ করেছে বিখ্যাত মার্কিন সাময়িকী নিউজউইক।

ওয়াকার ম্যালকম অটোবায়োগ্রাফি ১৯৯৭ সালে স্কুল পাঠ্য হিসেবে পড়ে। এই বই-ই তাকে টেনে নিয়ে যায় ইসলামের পথে। আইরিশ-ক্যাথলিক বাবা, বৌদ্ধ মা ছেলের নতুন ধর্মবিশ্বাস সমর্থন করেন। পিতা ফ্রাংকলিংক নিউজউইককে বলেন, সে তার অধ্যয়নের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী ছিল। ওয়াকার ওরফে আব্দুল হামিদ তার নামের শেষে মায়ের নাম ব্যবহারে তৃপ্ত ছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সে নতুন নাম নেয়। ওই বইটি তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সে সানফ্রান্সিসকো বে এলাকায় তাদের বাসগৃহের কাছে একটি মসজিদে যেতে শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল ইংলিশ পোশাক সে ত্যাগ করেছে। পরিবর্তে মাথায় পাগড়ি, পাজামা, পাঞ্জাবি পরে পুরোদস্তুর বনে গেছে মুসলমান। নিজেই আবার নাম নেয়-সুলায়মান। কিন্তু বাবা-মা ও ভাইবোনেরা অনুরোধ করে, সে যেন তাদেরকে 'জন' নামে ডাকতে দেয়। এই অনুরোধ অবশ্য সে মেনে নেয় এবং পিতার কাছে বলে যে, আমি একজন মুসলিম চিন্তাবিদ হতে চাই। সে তার মাকে বলে, আমি দরিদ্রকে সাহায্য করতে চাই।

এখন থেকে আট মাস আগে ওয়াকারের পিতা-মাতা পাকিস্তানের বান্নু থেকে সর্বশেষ ই-মেইল পেয়েছিল। ওয়াকারকে বান্নুতে পাঠান হয় পবিত্র কুরআন শিখতে। ই-মেইলটিতে সে জানায়, আগামী গ্রীষ্মে সে এমন একটি স্থানে যাবে, যেখানকার প্রকৃতি ঠাণ্ডা এবং কিছুদিনের জন্য কোন যোগাযোগ থাকবে না। সে তার বাবার কাছে টাকা চায়। তাকে ১২০০ মার্কিন ডলার পাঠিয়ে দেয়া হয়। সে তার পরিবারকে আফগানিস্তান বা জিহাদ সম্পর্কে কখনই কিছু বলেনি। নিউজ উইক লিখেছে, মাজার-ই-শরীফে বন্দী হওয়ার খবর পাওয়ার পর তার পিতামাতা স্মৃতিচারণ করছেন তাদের প্রিয় সন্তানের সেই মিষ্টি মুখকে, যা ছিল লাজুক ও বিনম্র। যে কিনা এখন ২০ বছরের এক তালেবান যোদ্ধা। আমেরিকান হয়ে ইসলাম ও মুসলমানের দুশমন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারার জন্য আবদুল হামিদ গর্বিত। উত্তর আফগানিস্তানের মাজার-ই-শরীফের কাছে কালা জঙ্গি দুর্গ থেকে হামিদকে অন্যান্য তালেবানদের সাথে আটক করে মার্কিন বাহিনী।

www.pathagar.com

কিন্তু হঠাৎ তাদের চোখ স্থির হয় ওয়াকারের দিকে। শ্বেতাঙ্গ তালেবানকে দেখেই তারা অবাক হয়। এই দুর্গে টানা এক সপ্তাহ লড়াই হয়। একজন সিআইএ কর্মকর্তাসহ দু'শতাধিক বিদেশী মুজাহিদ নিহত হয় এখানে। গ্রেফতারের পরপরই ওয়াকার নিউজ উইকের একজন সংবাদদাতাকে জানায়, তালেবানদের পাশে দাঁড়াতেই সে আফগানিস্তানে আসে। এদেশে একটি 'প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠাই তার স্বপ্ন।

গুলীবিদ্ধ ওয়াকার। হাসপাতালের বেডে শুয়ে সিএনএনকে বলেছে, আমি একজন মুজাহিদ। আমি আফগানিস্তানের এমন একটি ক্যাম্পে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছি, যেখানে ওসামা বিন লাদেন একাধিকবার হাজির হয়েছেন। তবে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আফগানিস্তানেই তার প্রথম নয়। এর আগে সে স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলনরত কাশ্মীরের মুজাহিদদের পক্ষে ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

নর্দার্ন এলায়েন্সের সূত্র বলেছে, ওয়াকারকে মার্কিন স্পেশাল ফোর্স তাদের জিম্মায় নিয়েছে। ওয়াকারের জন্ম ১৯৮১ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে। ক্যালিফোর্নিয়া হাই স্কুলের সেই শান্তশিষ্ট ছেলেটির তালেবান যুদ্ধবন্দী হওয়ার কাহিনী বিস্তারিত প্রকাশ করেছে। বাবা-মায়ের তিন সন্তানের মধ্যে ওয়াকার দ্বিতীয়। পপ বিটলস-এর সাবেক তারকা জন লেননের নাম অনুসারে ওয়াকারের নামের আগে জন শব্দটি জুড়ে দেয়া হয়। এই তারকার প্রতি ওয়াকার পরিবারের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। যিনি ওয়াকারের জন্মের কয়েক মাস আগে নিহত হন। ওয়াকারের পিতা ছিলেন ইউএস জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের একজন এটর্নি। তার মা ছিলেন স্বাস্থ্যকর্মী। জনের বয়স যখন ১০ বছর তখন তারা ওয়াশিংটন ছেড়ে উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় যায়। ইসলাম গ্রহণের পর সে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে। সে তার মায়ের কাছে দরিদ্রদের সেবা করার কথা বলত। তাই তার মায়ের মনে হত সে একদিন ডাক্তার হবে। কিন্তু তার বাবার বিশ্বাস ছিল, তার ধীমান ছেলে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে একজন চিন্তাবিদ হবে। সে সৌদি আরবের মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের কথা বলত। সানফ্রান্সিসকোর এটর্নি ফ্যাংকলিংক বলেন, ধর্ম ও পাঠ্য অধ্যয়নের বাইরে ওয়াকার আর কিছু পড়েনি।

১৯৯৮ সালের গ্রীষ্মে আমি তাকে তার পিতামহের দেশ আয়ারল্যান্ডে দেখাতে নিয়ে যাই। এ সময়টা জন কিছুতেই শার্ট-প্যান্ট পরতে চাইছিল না। সে পরবে ইসলামী পোশাক। তার এমন পোশাক দেখে এক রেস্তোরাঁয় কিছু স্কুলগামী শিশু-কিশোর বলে যে, সে কি 'ক্রীড়ারত' রয়েছে কিনা? জন জবাবে হেসেছে। এক আইরিশ কসাইখানায় জবাইকৃত একটি শূকর ঝুলছিল। এই দৃশ্যকে পেছনে রেখে জনের ছবি তুলতেই সে হেসে ফেলে। কারণ, সে তার বাবার দুষ্টুমি বুঝতে পারে। কারণ শূকর ইসলামে নিষিদ্ধ। ওই বছরের শেষাশেষি ১৭ বছর বয়সে ওয়াকার ইয়ামেনে গিয়ে আবার অধ্যয়নের আগ্রহ ব্যক্ত করে। এ জন্য অর্থ সাহায্য চায় এবং পিতার সম্মতিতেই সে ইয়েমেনের রাজধানী সিনায় গমন করে। প্রায় এক বছর এখানে অবস্থানকালে ওয়াকার তার ভাষা শিক্ষা এবং দেশটির জীবনধারা সম্পর্কে নানারকম রসবোধপূর্ণ ই-মেইল পাঠায়। ১৯৯৯ সালে সে ঘরে ফিরে আসে এবং সানফ্রান্সিসকোর একটি মসজিদে সে তার পড়াশানা শুরু করে। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তার ১৯তম জন্মদিনের কয়েকদিন আগে ওয়াকার ফের চলে আসে ইয়েমেনে। সানফ্রান্সিসকো বিমানবন্দরে পিতা-পুত্রের সেই শেষ সাক্ষাৎ।

www.pathagar.com

ওয়াকারের পিতা জানান, তিনি জানতে পেরেছিলেন ওয়াকারের মুসলিম বন্ধুদের অনেকে চেচনিয়ায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছে। তার এক বন্ধু এতে নিহতও হয়। ২০০০ সালের অক্টোবরে ইয়েমেনি বন্দর আদেনে ১৭ জন মার্কিন নাবিককে হত্যা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র এ ঘটনার জন্য ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে। এ সময় পিতা-পুত্রের মধ্যে কিছুটা অপ্রীতিকর ই-মেইল বিনিময় হয়। ফ্রাঙ্ক বলেন, আমি প্রথমে ভীত হই। কারণ, নিহত নাবিকদের বয়স ওয়াকারের মতই ছিল। ওয়াকার ওই সময় ই-মেইলে মত দেয় যে, মার্কিন জাহাজের উচিত হয়নি একটি ইসলামী দেশের বন্দরে নোঙর করা। যা ওই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। সুতরাং বোমা হামলাকে সে সমর্থন করে। লিঙ্ক বলেন, পুত্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে আহত করে। আমি উদ্বিগ্ন হই। কিন্তু সে যখন প্রাপ্তবয়স্ক, তখন আমার কি-ইবা করার আছে? আমি বুঝতে পারি, ছেলে হিসেবে তাকে পাল্টানোর ক্ষমতা আমি হারিয়েছি। গত বছরের শেষার্ধে ওয়াকার আমাদেরকে জানায় যে, সে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের বান্নুতে একটি মাদ্রাসায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক। কুরআন হেফজ করার পাশাপাশি ওয়াকার সেখানে স্থানীয় উর্দু ও পশতু ভাষা রপ্ত করে। লিঙ্ক বলেন, যদিও এলাকাটি লাদেন প্রভাবিত; কিন্তু আমি কখনও ভাবিনি ছেলে আমার শেষ পর্যন্ত তালেবান হবে। নিউজউইকের কাছে তিনি বলেন, যদি ওয়াকার তালেবান হয়ে থাকে, তবে তা তার মগজ ধোলাইয়ের ফসল। পাকিস্তানে সে ছিল নিঃসঙ্গ। বয়সে তরুণ। সুতরাং তাকে ভিন্নপথে পরিচালনা করা সহজ ছিল। ওয়াকার অবশ্য মাঝে-মধ্যেই একটি ইন্টারনেট ক্যাফে থেকে ই-মেইল পাঠাত। গত জুলাইতে টানা তিন মাস জন ওয়াকারের কোন সাড়া না পেয়ে লিঙ্ক মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেন। গত আগস্টে মাদ্রাসার শিক্ষকের কাছ থেকে ওয়াকারের পিতা একটি পত্র পান। এতে বলা হয়, আপনার ছেলে কুরআনের পণ্ডিত হিসেবে বেড়ে উঠছে। সে খুব মেধাবী। বিনয়ী। লিঙ্ক বলেন, চিঠি চেয়ে আমি সন্তুষ্ট হই। তবে ছেলের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে একটু বিচলিত থাকি। এরপরই আসে ১১ সেপ্টেম্বরের ভয়ংকর ঘটনা। পাকিস্তানে আমেরিকান বিরোধী বিক্ষোভের খবর জেনে আমরা আমাদের ছেলের নিরাপত্তা ভেবে শিহরিত হই। আয়ারল্যান্ডে তোলা ছেলের ছবি নিয়ে আমি সানফ্রান্সিসকোর মসজিদে যাই এবং মুসল্লীদের কাছে জানতে চাই, তারা কেউ একে দেখেছে কিনা। অনেকে তাকে শনাক্ত করে সুলায়মান আল ফারিস নামে। কিন্তু কেউ জানত না, তার ছেলে আবদুল হামিদ নামে তালেবানদের একজনে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এখনও তার মা ম্যারিলিন ওয়াকার তার 'লজ্জাবনত শিশুটি'কে মাজার-ই-শরীফের রক্তাক্ত প্রান্তরে গুলীবিদ্ধ অবস্থায় কল্পনা করতেও শিউরে উঠছেন। ম্যারিলিন বলেছেন, আমার ছেলে তো একটুতেই ভীষণ ভয় পেত। তবে এই পরিবারটি এখন কিছুটা আশ্বস্ত যে, সে বেঁচে আছে। কিন্তু তার ভাগ্য সম্পর্কে মার্কিন সরকারের কাছ থেকে কিছুই জানতে পারছে না। তাই তারা আইনজীবীদের শরণাপন্ন হচ্ছেন। কারণ যাই ঘটুক না কেন, তারা তাদের পুত্রের পাশে দাঁড়াবেনই। সে সত্যিই খুব ভাল ছেলে।

আবদুল হামিদ তালেবানদের পক্ষে মাজার-ই-শরীফ থেকে ১০০ মাইল দূরবর্তী কুন্দুজ থেকে মরণপণ লড়াই করেছে। তালেবানের পতন ঘনিয়ে এলে হামিদসহ ৫০০ তালেবানকে জেনারেল রশিদ দোস্তাম বাহিনী দুর্গে নিয়ে যায়। আবদুল হামিদ জানায়, "আমাদের প্রত্যেকের হাত ছিল বাঁধা। আমি দেখলাম, দু'জন আমেরিকান ছবি তুলছে।

www.pathagar.com

একজনের হাতে একটি ডিজিটাল, অন্যজনের হাতে ভিডিও ক্যামেরা। তারা আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। এক পর্যায়ে আমাদের পক্ষের একজন গ্রেনেড ছোঁড়ে। শুরু হয় গোলাগুলী। আমার পায়ে গুলী লাগে। আমরা দুর্গের ভূগর্ভে আশ্রয় নেই। এখানে নিহত হয় সিআইএ অফিসার মাইক স্প্যান। একটু বাদেই আমাদের উপর বোম্বিং শুরু হয়। পাশে লাশ আর রক্ত। ক'দিন বাদে উপরিভাগ নীরব হয়ে আসে। তবে উত্তর জোটের সৈন্যরা ভূগর্ভে ডিজেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। যাতে আমরা কেউ প্রাণে বাঁচতে না পারি।"

উল্লেখ্য, বৃটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকা এক অনুসন্ধানী রিপোর্টে কালা জঙ্গি দুর্গে মার্কিন গণহত্যাকে ভিয়েতনামের মাইলাই হত্যাকাণ্ডের সাথে তুলনা করেছে। আবদুল হামিদ এদিনের বিভীষিকার বর্ণনা করে জানায়, সে এক ভয়ংকর অবস্থা। "ভূগর্ভের সেলে লুকিয়ে ছিলাম আমরা। কিন্তু ধ্বংসযজ্ঞ চলছিল 'হলওয়েতে'। যা হোক আমরা ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাই। উত্তরের জোট হেন কাজ নেই যা করতে বাকি রেখেছে। শুক্রবার তারা ভূগর্ভে পানি ঢেলে দেয়। আমরা একটা রাত ঠাণ্ডা পানিতে কাটাই। যারা মারাত্মকভাবে আহত ছিল, তারা ডুবে যায়। কারণ দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমাদের কাছে প্রতিরোধের জন্য ১৪টি বুলেটসহ একটি রাইফেল ও একটি গ্রেনেড ছাড়া কিছুই ছিল না।" সে জানায়, কুন্দুজে সে তার আমেরিকান পাসপোর্ট হারায়। মার্কিন স্পেশাল ফোর্স ওয়াকারকে কুন্দুজের ওই দূর্গ থেকে মাজার-ই-শরীফ নিয়ে যায়। হাসপাতালের এ্যানেসথেসিওলজি বিভাগের প্রধান ড. আবদুল ওয়াদুদ বলেছেন, ওয়াকারকে শান্ত মনে হয়েছে। তরতাজাও। তার পায়ে ছোট্ট একটা জখম হয়েছে। কালা জঙ্গি দূর্গ থেকে বেঁচে যাওয়া ৮৬ জনের সে অন্যতম। হামিদ বলেছে, আমার ভ্রমণপথে তালেবান আন্দোলনের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষকের সাথে আমার পরিচয় হয়। তালেবান আদর্শ আমাকে আকৃষ্ট করে। ছয় মাস আগে হামিদ আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। "ইসলামি সরকারকে সাহায্য করাই ছিল আমার লক্ষ্য। কারণ আমি মনে করি, এ বিশ্বে তালেবানরাই একমাত্র সরকার যারা কেবল সাচ্চা ইসলাম কায়েম করেছে।"

জন ওয়াকার ওরফে আবদুল হামিদের ভাগ্যে কি ঘটবে? আমেরিকাসহ গোটা পশ্চিমা বিশ্ব তাকে জেনে অবাক। কিন্তু বিব্রত হওয়ার ভয়ে তাকে নিয়ে হৈ চৈ হচ্ছে না। নিউজ উইক বলেছে, ২০ বছরের তরুণ জন ওয়াকার ওরফে আবদুল হামিদকে সামরিক আদালতে হাজির করা হতে পারে। ❑

নভেম্বর '০১

সৌজন্যে : মানবজমিন

www.pathagar.com

ইউরোপ-আমেরিকার বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমান

জাহিদ জমির

এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, ১১সেপ্টেম্বরের ঘটনা ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার মুসলমানদের উপর একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আজ ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াগুলোর সাড়াঁশি আক্রমণ মুসলমানদের কাবু করার চেষ্টা করছে।পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলোর ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একতরফা অপপ্রচার হিটলারের তথ্যমন্ত্রী গোয়েবলসকে ও হার মানিয়ে দিচ্ছে। আজ সারাবিশ্বে এক বিলিয়নের বেশী মুসলমান এবং অনেক সম্পদশালী মুসলিম রাষ্ট থাকা সত্তেও 'আল যাযিরা' ছাড়া তেমন কোন আর্ন্তজাতিকমানের প্রচার মাধ্যম নেই । ১১সেপ্টেম্বরের পর ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী প্রপাগান্ডার মাত্রা এতই ছাড়িয়ে গেছে যে, পশ্চিমা মিডিয়াগুলোতে আজ মুসলিমকে টেরোরিষ্ট এবং ইসলামকে টেরোরিজম-এর সমার্থক (Interchangable) হিসেবে ব্যবহার করছে। নব্বই দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গনের আগে অথবা বলা যেতে পারে সমাজতন্ত্রী শিবিরের পতনের আগে তখনকার Bipolar বিশ্বে একটি ঠাণ্ডা যুদ্ধ (Cold war) বিরাজ করলেও সারাবিশ্বে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান ছিল। কিন্তু USSR-এর ভাঙ্গন এবং সমাজতন্ত্রী শিবিরের পতনের পর সৃষ্টি হয় Unipolar বিশ্ব, যেখানে মার্কিন আধিপত্য (hegemony) এ বিশ্বের ভারসাম্য অনেকটা নষ্ট করে দেয়। আমেরিকা তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য শুরু করেছে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধ (War on terrorism) আর এ থেকে ফায়দা লুটছে ইসরাইল, ভারত ও রাশিয়া। আজ ইহুদী দখলদারদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনীদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে ইসরাইলী শাসকগোষ্ঠী চালাচ্ছে নির্বিচার গণহত্যা আর সেজন্য ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী (চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী এবং 'বুচার অব বৈরুত') সাধুবাদ পাচ্ছে বুশ প্রশাসন থেকে। খেতাব পাচ্ছে ' Man of peace' ফিলিস্তিনীদের উপর এই গণহত্যাকে ইসরাইল বলছে 'war on terrorism'। অপরদিকে কাশ্মীরের মুক্তিকামী মানুষের দীর্ঘদিনের মুক্তিযুদ্ধকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে

www.pathagar.com

চিহ্নিত করে ভারত চালাচ্ছে কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ এবং একে বলছে ‘war on terrorism’। War on terrorism-এর নামে আমেরিকা, ইসরাইল, রাশিয়া, ভারত এরা সবাই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ (State terrorism) কে জায়েজ করে নিয়েছে এবং অন্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য একটি পথ তৈরী করে দিয়েছে অতি সহজে মুসলিম নিধন আর সারাবিশ্বে অরাজকতা সৃষ্টির জন্য। যেহেতু প্রচার মাধ্যমগুলোর সবই তাদের দখলে সেজন্য তারা সারাবিশ্বের মানুষের মধ্যে একটি আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে মুসলিমদের টেরোরিস্ট আর ইসলামকে টেরোরিজম-এর সমার্থক হিসেবে প্রচার করার মাধ্যমে।

আজ জেহাদের অর্থ বিকৃতভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। যারাই জিহাদের কথা বলছে তাদেরকে টেরোরিস্ট হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। একদিকে পশ্চিমা মিডিয়াগুলো জেহাদের অর্থ টেরোরিজম হিসেবে তুলে ধরছে অন্যদিকে কিছুসংখ্যক মুসলিম নামধারী ব্যক্তি জেহাদের অর্থকে সম্পূর্ণ বিকৃত রূপ দিয়ে ইসলাম যে একটি শান্তির ধর্ম তাকে কলুষিত করছে। গত ৬ জুন ২০০২ ছিল Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান (Graduation Ceremony)। প্রতিবছরই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ছাত্রদের পক্ষ থেকে ২/৩ জন ছাত্রকে বাছাই করা হয় বক্তব্য রাখার জন্য। এবার যে তিনজনকে বাছাই করা হয় তাদের একজন ছিলেন Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন-এর প্রধান জায়িদ ইয়াছিন। জায়িদ ইয়াছিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘Of Faith and citizenship : My American Jihad’। জায়িদ তার বক্তব্যে সুন্দরভাবে জেহাদের অর্থকে তুলে ধরেছেন। আমি তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। “Jihad in its truest and Purest form, the form to which all muslimes aspire, is the determination to do right, to do Justice even against your own interests. It is an individual struggle for Personal moral behavior. Especially today it is a struggle that exists on many levels : Self Purification and awarness. Public service and social Justice, on a global scale, it is a struggle involving People of all ages, colors and creeds, for control of the big decisions : not only who controls what piece of land, but more importantly who gets medicine who can eat.”

এ কথা সত্য যে, বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম যারা সত্যিকারভাবে ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ (Code of life) হিসেবে বিশ্বাস করে এবং মেনে চলে তারা সকলেই সন্ত্রাসমুক্ত শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে চায়; যেহেতু শান্তি হচ্ছে ইসলামী জীবন দর্শনের মূল কথা। এ প্রসঙ্গে গত ৮ জুলাই ঢাকা থেকে প্রকাশিত যুগান্তর পত্রিকার উপসম্পাদকীয় কলামে আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলোর আগ্রাসী নীতি সম্পর্কে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী লিখেছেন, “আসলে এ সত্যটি এখন স্পষ্ট যে, বিশ্ব সমাজতন্ত্রী শিবিরের পতনের পর বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও ধনবাদের আগ্রাসী ও অপ্রতিহত আদিপত্য বিস্তারের নেতৃত্বে রয়েছে আমেরিকা ও ইউরোপ এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইসরাইলের জায়োনিস্ট শাসকরা। ভারতের বাজপেয়ী সরকারও এখন এই ধনবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বজোটের ছোট শরীক হওয়ার চেষ্টায়রত। দুর্ভাগ্যের বিষয় তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য এবং

www.pathagar.com

সাবেক সোভিয়েতের মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোই তাদের আগ্রাসনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য থেকেই তাদের আগ্রাসনকে একটি মানবীয় চেহারা দেয়ার জন্য War on terrorism নাম দেয়া হয়েছে। আসলে এই যুদ্ধ ভূমি দখলের, তেল ও গ্যাস সম্পদ দখলের, এই দুর্বল জাতিগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তারের।"

আজ আমেরিকা ও তার অন্যান্য মিত্র দেশগুলো তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে বহাল রাখার জন্য সমাজতন্ত্রী বিশ্বের মত ইসলামিক বিশ্বকেও দমন করার চেষ্টায়রত। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ তাদের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলমানদের উত্থানকে দমন করার জন্য সেপ্টেম্বর ১১কে একটি Burning issue বানিয়ে নিয়েছে। Malise Ruthven সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন। "A fury for God : The Islamist attack on America" যা বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে খুব আলোচিত এবং সমালোচিত হচ্ছে। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী তার লেখায় রুদভেনের বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন 'পশ্চিমা শক্তি সবসময় তাদের আধিপত্য রক্ষার জন্য একটি প্রতিপক্ষ তৈরী এবং তার বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানোকে বৈধতা দিয়েছেন। কমিউনিস্টদের আগে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল সেমাইট ইহুদীরা। হিটলারকে ইহুদী নিধনের কাজে এগিয়ে দেয়া হয়েছিল। তারপর পশ্চিমাদের চোখে evil empire হিসাবে দাঁড়িয়েছিল কমিউনিষ্ট বিশ্ব। তাদের পতনের পর মুসলিম দেশগুলোকে তাদের কল্পিত প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে এবং সেই প্রতিপক্ষের সম্পর্ককে বিশ্ববাসীর মনে ব্যাপক ভীতি সৃষ্টির জন্য প্রধানত পশ্চিমা শোষণ ও আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভের জন্য যুদ্ধরত জনগণের রেজিসটেন্স মুভমেন্টকেই টেরোরিজম বলে চিহ্নিত করে তাকে বিশ্বের সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র দ্বারা দমনের পৈশাচিক তাণ্ডব চালানো হচ্ছে।' মূলত ১১ সেপ্টেম্বরের পর আমেরিকা ও ইউরোপের মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক গুণ বেড়ে যায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের মুসলমানকে আরও অনেক ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে। আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহে যে সমস্ত মুসলিম নাগরিকরা রয়েছেন, তাদেরকে সব সময় এ কথা ভাবতে হবে যে, তারা যে দেশের নাগরিক সেই দেশেই তাদেরকে থাকতে হবে। আমেরিকার অভিবাসী (immigrant) মুসলিম নাগরিকদের এ কথা ভাবলে চলবে না যে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষের দেশে (Country of origin) আমাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে ফিরে যাব। সুতরাং এই দেশ নিয়ে চিন্তা করলে চলবে না। এই ধরনের ধারনা সম্পূর্ণ ভুল। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের Howard বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ সোলায়মানের একটি কথা "if you are thinking of going back to your country of origin, then listen to the accent of your kids and then you will know it is never possible for you to go back" সুতরাং এখানকার মুসলিম নাগরিকদের এই দেশ থেকে চলে যাওয়ার কাল্পনিক চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে এদেশে ও এখানকার মুসলিমদের ভাবমূর্তি কিভাবে উন্নত করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। আমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মুসলিম নামধারী ব্যক্তি আছেন, যারা ভাবেন মুসলিমদের অবস্থা যা হবার হউক আমার ব্যবসা ঠিক থাকলেই হল। এ ধরনের ব্যক্তিদের আমি একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যা বেশ কয়েক বছর আগে কুয়ালালামপুরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মাহাথির মোহাম্মদ বলেছিলেন, পশ্চিমারা

www.pathagar.com

যখন মুসলিমদের উপর আক্রমণ চালাবে তখন কে লিবারেল মুসলিম, কে কনজারভেটিভ মুসলিম আর কে মডারেট মুসলিম এগুলো কিছুই দেখবে না, শুধু মুসলিম নাম হলেই চলল। তার এই কথা আজ আমরা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করছি আমেরিকার মাটিতে। তাই যে সমস্ত মুসলিম ব্যক্তি তাদের এই স্বার্থপর চিন্তার গণ্ডি থেকে বের হয়ে আসতে না পারবেন-তাদের বরং উচিত নামগুলো বদলে ফেলা; তাহলেই তারা সুখে শান্তিতে এ দেশে বসবাস করতে পারবেন। আমি আমেরিকা ও ইউরোপের মুসলমানদের সামনে তিনটি চ্যালেঞ্জকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছি। তা হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক (Intellectual) চ্যালেঞ্জ, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ। আজকে এই আমেরিকাতে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ইহুদী জনসংখ্যার কাছাকাছি। নব্বই এর দশকের শুরু থেকে লটারি ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর আমেরিকায় মুসলিম জনসংখ্যা বাড়তে থাকে যা আজ অবধি চলছে। কিন্তু আমাদের যারা লটারির মাধ্যমে এই দেশে আসছেন বা অন্যভাবে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে এই দেশে আসছেন তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই উচ্চশিক্ষাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। এখানে এসে যারা কোন না কোন ছোটখাটো কাজ নিয়ে টাকা ও ডলারের বিরাট বিনিময় হার (exchange rate) দেখে ভাবছেন অনেক টাকাই তারা আয় করছেন আর সেজন্য জলাঞ্জলি দিচ্ছেন উচ্চ শিক্ষাকে। অদূরদর্শী (Short sightedness) এই চিন্তা-ভাবনা এই সমাজে কোন অবদান রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এখানে Odd Job করে পাওয়া অর্থ নিজ নিজ দেশের প্রেক্ষাপটে হয়ত অনেক মোটা অংকের হতে পারে কিন্তু আমেরিকার প্রেক্ষাপটে তা কিছুই নয়। এই অদূরদর্শী চিন্তার গণ্ডি থেকে বের হয়ে আমরা যদি দীর্ঘমেয়াদী (Long term) চিন্তা না করি তাহলে এই সমাজে আমরা পরগাছা হিসাবে থেকে যাব- যেমনটি হামজা ইউসুফ বলেছিলেন, "We (muslim) are now seen as Parasites on the social body, contributing littlle, seheming in gettos." সুতরাং এই ঘেটো থেকে বের হয়ে আসতে হলে মুসলমানদের অদূরদর্শী ও স্বল্পমেয়াদী চিন্তা থেকে বের হয়ে দীর্ঘমেয়াদী চিন্তার দিকে ঝুঁকতে হবে এবং জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করতে হবে। আজকে পশ্চিমা সমাজে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের রয়েছে ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণা দূর করতে হলে আমাদেরকে জ্ঞানের অস্ত্রে সাজতে হবে এবং মানুষের কাছে বুদ্ধি ও যুক্তিসহকারে ইসলামের সুমহান বাণীকে তুলে ধরতে হবে। জ্ঞান মানুষকে উদার হতে শিখায়, অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখায়। আমরা আজ 'মৃতপ্রায়' অবস্থায় আছি; কারণ জ্ঞান অর্জনকে আমরা অনেকটা গৌন (Secondary) বিষয় হিসাবে চিন্তা করছি। যে জ্ঞান এক সময় মুসলমানদের হাতে ছিল এবং যে জ্ঞান অর্জন করার জন্য এক সময় পশ্চিমা দেশসমূহের লোকজন মুসলিম বিশ্বে যেত আজ সে জ্ঞান আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে। যে কোন জাতির উন্নয়নের পেছনে জ্ঞান অর্জন হচ্ছে প্রধান হাতিয়ার। এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে আধুনিক সিঙ্গাপুরের স্থপতি সাবেক প্রধানমন্ত্রী লি কুয়াং ইউ-এর কথা- তিনি একবার তার জাতির উদ্দেশে বলেছিলেন, "The moment you stop learning you are dead" আর সেই Learning-এর চিন্তা সিঙ্গাপুরিয়ানদের ছিল বিধায় কোন প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও এই দেশটি আজ একটি উন্নত দেশ হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাচ্ছে। আজকে এই বিশ্বে ৫০/৫৫টির মত মুসলিম দেশ এবং এর মধ্যে অনেক সম্পদশালী রাষ্ট্র থাকা

www.pathagar.com

সত্ত্বেও সব দেশই অনুন্নত রয়ে গেছে। কারণ আমরা এখনো মৃত রয়ে গেছি লি কুয়াং ইউ'র ভাষায়।

আমরা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের কখনই উত্তরণ ঘটাতে পারব না যদি না আমরা মুসলমানরা বুদ্ধিবৃত্তিক (Intellectual) চ্যালেঞ্জ-এর মোকাবিলা করতে পারি। আজকে প্রায় সমানসংখ্যক ইহুদী এবং মুসলিম এই আমেরিকার মাটিতে অবস্থান করছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এদেশের অর্থনীতি বলতে গেলে ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। এটা এই জন্যই এই জাতির (ইহুদী) পক্ষে সম্ভব হয়েছিল; কারণ তারা তাদের চ্যালেঞ্জ বুঝতে পেরেছিল এবং সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ছিল এবং সেই পরিকল্পনা মোতাবেক সামনে অগ্রসর হচ্ছিল, যা এখনো চলছে। এই দেশে আজকে যত মুসলিম নাগরিক রয়েছে তারা যেমন ইমিগ্র্যান্ট হয়ে অথবা তাদের পূর্ব পুরুষরা ইমিগ্র্যান্ট হয়ে এই দেশে এসেছে তেমনি একই অবস্থা এখানকার ইহুদীদের। আমেরিকার অনেক মুসলিম বলে থাকে এই দেশে ভাল সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং অফিস আদালত ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে অথবা আধিপত্যে কিন্তু এই আধিপত্য বা নিয়ন্ত্রণ তো গোড়া থেকেই ছিল না। এই নিয়ন্ত্রণ বা আধিপত্যের জন্য নিজেদেরকে তৈরী করার যে সুপরিকল্পিত সর্বোব্যাপী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ওদের ছিল সেগুলো তো আমরা এখনো গ্রহণ করতে পারিনি।

এই দেশে কংগ্রেসম্যান এবং সিনেটরদের বেশীরভাগ খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসী হলেও তারা ইহুদী স্বার্থকে বাদ দিয়ে কোন চিন্তা করতে পারেন না, অথবা বলা যেতে পারে চিন্তা করার কোন সুযোগ নেই। বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে "Time" ম্যাগাজিন এক সমীক্ষায় লিখেছিল যে, ৯৫% কংগ্রেসম্যান এবং সিনেটর ফিলিস্তিনীদের স্বাধীন রাষ্ট্র সংগ্রামের বিরুদ্ধে এই ইসরাইলের নির্বিচার এই গণহত্যার পক্ষে। কংগ্রেসম্যান এবং সিনেটরদের একতরফা ইসরাইলকে সমর্থন করার পেছনে রয়েছে শক্তিশালী 'জুয়িস লবি'। রাজনৈতিক শক্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে অর্থনৈতিক শক্তি, যার পূর্বশর্ত হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি। এই আমেরিকাতে রাজনৈতিক শক্তি (Political Power) বলতে গেলে নেপথ্যে ইহুদীদের হাতে। কারণ তাদের রয়েছে অর্থ। কংগ্রেসম্যান এবং সিনেটররা (প্রায় সমানসংখ্যক মুসলিম ও ইহুদী ভোটার থাকা সত্ত্বেও) ইহুদী ভোট নির্বাচনের আগে যেভাবে হিসেব করেন তার বিন্দুমাত্র ভোটও মুসলিমদের ক্ষেত্রে হিসেব করেন না। আমরা এখনো আমেরিকার ইলেকশনে কাকে ভোট দিব কি দিব না-- এটা জায়েজ কি না জায়েজ এই নিয়েই ঝগড়া করছি। আর গুটিকয়েক মুসলিম নাগরিক যারা ভোট দিতে যান তাদের বেশীরভাগই কোন প্রার্থীকে ভোট দিলে মুসলিম স্বার্থ কতটুকু রক্ষা হবে তা নিয়ে মোটেই চিন্তিত নন। এ কথা সত্য যে, মুসলমানদের এই দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আমাদের আজ ছোটখাটো সব মতভেদ ভুলে গিয়ে মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থে এক হতে হবে। এই আমেরিকার সমস্ত মুসলিম নাগরিক যাদের ভোট প্রদান করার বয়স হয়েছে তাদের সকলকে ভোটার তালিকায় নাম লেখাতে হবে। আমরা যতই 'হোয়াইট হাউস'-এর সামনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করি না কেন এবং যতই লাখো লাখো লোক জড়ো করি না কেন- এটা কোনই কাজে আসবে না যদি সিনেট বা কংগ্রেস-এ মুসলমানদের স্বার্থে কোন সিনেটর বা কংগ্রেসম্যান কথা না বলেন। আমেরিকার পলিসি সারাজীবন

www.pathagar.com

মুসলিমবিদ্বেষী থেকে এবং মুসলমানরা অত্যাচার আর মিথ্যাচারের নিষ্পেষণের যাঁতাকল থেকে কখনই বের হয়ে আসতে পারবে না- যদি না আমরা আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো বুঝতে পারি এবং এর মোকাবিলা করার জন্য নিজেদের তৈরী করতে পারি।

জুলাই '০২

e-mail:ibnzamir@hotmail.com

লেখক : এম এস, কম্পিউটার ইনফরমেশন সিস্টেমস ব্রুকলিন কলেজ, সিটি ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে আমেরিকা কি পেল ?

এরিক মারগোলিস

আফগানিস্তানে দু'মাস ধরে যুদ্ধ করে আমেরিকা কি পেল ?

৩০ হাজার সশস্ত্র সমর্থক সম্বলিত তালিবান সরকারের পতন ঘটল এবং তালিবানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। ৫ সপ্তাহ ধরে ব্যাপক মার্কিন বোমা হামলা থেকে আত্মরক্ষা করে তালিবান নেতা মোল্লাহ মোহাম্মদ ওমর তার লোকজনকে পশ্চাদপসারণ করে বিভিন্ন পাহাড়ে পালিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। লক্ষ্য ছিল তালিবান শাসনাধীন এলাকায় বেসামরিক লোকদের মার্কিন বোমা হামলার হাত থেকে রক্ষা করা। তালিবানের শেষ শক্ত ঘাঁটি কান্দাহার মার্কিন বোমা হামলায় ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে ১০ হাজার বোমা ফেলেছে। বহু বেসামরিক লোককে হত্যা করেছে। বিভিন্ন আফগান সূত্রের হিসাব অনুযায়ী এ সংখ্যা ২ হাজারের মত হবে। শহর-গঞ্জ ও গ্রামে মার্কিন বোমা হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ১ লাখ ৬০ হাজারেরও বেশী লোক উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

২ হাজার সালের ৩ ডিসেম্বর অর্থাৎ এক বছর আগে এই শীতের দিনে এই মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছিল যে, তালিবানের পতন রাশিয়াকে দ্বিতীয়বারের মত আফগানিস্তান দখলের পথ করে দেবে। কার্যত এখন সেটাই ঘটল। রাশিয়ার অস্ত্র ও আর্থিক সহায়তাপুষ্ট উত্তরাঞ্চলীয় জোট উজবেক ও ইরানী সৈন্যদের সম্ভাব্য সহায়তায় কাবুল ও সমগ্র উত্তর আফগানিস্তান দখল করে নেয়। এই যুদ্ধের নির্দেশনায় ছিল আফগান কমিউনিস্ট পার্টি। রুশ জেনারেল স্টাফের প্রধান মার্শাল ভিক্টর কাভাসনিন, কেজিবি'র ডেপুটি ডাইরেক্টর ভিক্টর কমোগোরভ এবং রুশ উপদেষ্টাদের সার্বিক কমান্ড ও পরামর্শ মোতাবেক এই যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে।

গত মাসের প্রথম দিকে জার্মানীতে অনুষ্ঠিত বহুল আলোচিত আফগান ঐক্য সম্মেলনে যে একটি কৃত্রিম জোট সরকার গঠিত হয়েছে তা পরিচালিত হবে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের দ্বারা। হামিদ কারজাই হচ্ছেন সিআইএ'র পশতু 'দালাল' যিনি নিজের ছাড়া দ্বিতীয় কারো প্রতিনিধিত্ব করেন না। অথচ তাকেই করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী। এ সরকারের হামিদ কারজাই ছাড়া পশতু সম্প্রদায়ের সত্যিকার প্রতিনিধিত্বকারী কেউ নেই। মন্ত্রিসভার ৩০

www.pathagar.com

সদস্যের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ পেয়েছে উত্তরাঞ্চলীয় জোটভুক্ত তাজিকরা এবং প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলো তারাই পেয়েছে। অথচ দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী হচ্ছে পশতু সম্প্রদায়ের লোক। পশ্চিমা বিশ্বকে তুষ্ট করার জন্য মন্ত্রীসভায় ২ জন মহিলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে রোমে নির্বাসিত ৮৭ বছর বয়স্ক বাদশাহ জহির শাহকে দেশে ফিরিয়ে আনার জোর চেষ্টা চলছে। কারজাই এ উদ্যোগে অগ্রণী হয়ে রোমে যান। ১৯৭০-এর দশকে রুশপন্থী কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখলের সুযোগ করে দেয়ার জন্য জহির শাহকে ব্যাপকভাবে দোষারোপ করা হয়ে থাকে। অতএব বর্তমান আফগান সরকার একটি অদ্ভুত রকমের সরকার। কার্যত এই সরকার গঠিত হবার পরদিনই জোটের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সাবেক কমিউনিস্ট নেতা রশিদ দোস্তাম উজবেকদের আরও বেশী প্রতিনিধিত্ব না দিলে যুদ্ধের হুমকি দেন। এই রশিদ দোস্তামই মার্কিন ও ব্রিটিশ সহায়তায় মাজার-ই শরীফে শত শত তালিবান যুদ্ধবন্দীকে মেরে ফেলেছিলেন। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নামমাত্র প্রেসিডেন্ট প্রফেসর বোরহান উদ্দীন রব্বানীকে একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে সম্মান জানানো হয়। তরুণ কমিউনিস্টরা তাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। এদিকে বুশ প্রশাসন দৃশ্যত ওসামা বিন লাদেনকে তাড়া করা নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, তারা তাদের নয়া বন্ধু রাশিয়া যে তার সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করে আফগানিস্তানের অর্ধেকটা কব্জা করে নিয়েছে সেদিকে তাকাবার সময় পায়নি। আমেরিকা রাশিয়ার সঙ্গে এই মর্মে একটি মতৈক্যে পৌঁছেছিল যে, তারা একটি মার্কিন ও পাকিস্তানপন্থী সরকার গঠনের জন্য অপেক্ষা করবে। মার্শাল কাভাসনিন কালবিলম্ব না করে তার লোকদের কাবুলের দখল নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে তিনি ১৯৯৯ সালে কসোভোতে অনুরূপ এক অভ্যুত্থানকালে মার্কিনীদের কোণঠাসা করে ফেলেছিলেন।

ওসামা বিন লাদেন ও আল-কায়েদাকে ধরার জন্য অভিযান অব্যাহত আছে। আল-কায়েদার কয়েকজন শীর্ষনেতা শাহাদাতবরণ করেছেন। তাদের মধ্যে মিসরীয় নাগরিক ডঃ আয়মন আল জাওয়াহিরিও থাকতে পারেন। ডঃ জাওয়াহিরি মিসরের ইসলামিক জিহাদের নেতা। ওসামা বিন লাদেনের ঘাঁটি তোরাবোরার পতন ঘটেছে। কিন্তু মার্কিন সৈন্যরা এখনো পর্যন্ত লাদেনের কোনো হদিস পায়নি। লাদেনকে ধরা গেলে তা মার্কিন প্রশাসনের জন্য স্বস্তিদায়ক হতো। কিন্তু লাদেন যদি সত্যি আমেরিকার নাগালের বাইরে চলে গিয়ে থাকেন কিংবা তার লাশ যদি না পাওয়া যায় তাহলে বুশ প্রশাসন আফগানিস্তানকে ধ্বংস করে দেয়া বিপুল সংখ্যক বেসামরিক লোককে হত্যা করা এবং অকারণে আফগানিস্তানে রাশিয়াকে প্রাধান্য বিস্তার করতে দেয়ার জন্য অভিযুক্ত হবে। আফগানিস্তানে বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমাবর্ষণ ছিল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আফগানিস্তানে আমেরিকার সত্যিকার সামরিক লক্ষ্যবস্তু ছিল উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সঙ্গে যুদ্ধরত তালিবান যোদ্ধা ও তাদের বাংকারগুলো। তালিবানরা কিভাবে মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমানের কার্পেট বম্বিং সত্ত্বেও ৫ সপ্তাহ ধরে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হলো তা সত্যি একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে আফগানিস্তানের অর্ধেক এলাকাকে কব্জা করতে না দিয়েও ওসামা বিন লাদেনকে ধরার চেষ্টা করতে পারত। আফগানিস্তানের অর্ধেকটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়াটা আমেরিকার জন্য এক ভূরাজনৈতিক পরাজয়। কেননা আমেকিার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হচ্ছে আফগানিস্তানকে মধ্য এশিয়ার তেল

www.pathagar.com

ও গ্যাস সম্পদ কজা করার ক্ষেত্রে সিংহদ্বার হিসেবে ব্যবহার করা। ৮ সপ্তাহ ধরে একটানা বিমান হামলার পর তালিবানের পতন ঘটেছে। তালেবানের পতনের পর কমিউনিস্টরা কাবুলের দখল নিল। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে চলছে বিশৃঙ্খলা ও হানাহানি। পাকিস্তান এখন একঘরে হয়ে পড়েছে। সকলেই পাকিস্তানকে অপছন্দ করছে।

এ মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত এ যুদ্ধে ওয়াশিংটনের ৬ হাজার কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে। আফগানিস্তান এখন এক সুবিশাল ধ্বংসস্তূপ। পরিস্থিতি সেখানে সম্পূর্ণ লেজে-গোবরে। আর এটা দেখে মুচকি হাসছেন রুশ নেতা ভ্লাদিমির পুটিন।

ডিসেম্বর '০১
বিদেশী সাংবাদিক।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে মার্কিন সন্ত্রাস

আ জ ম শামসুল আলম

আফগানিস্তানের মত একটি দরিদ্র দেশকে বোমা নিক্ষেপ করে ধ্বংস করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও সামরিক জোট গঠন করেছে।

আফগানিস্তানে ইসলামের উত্থানে খৃষ্টান শক্তির ভীতির অন্যতম প্রধান কারণ হল উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং তাজিকিস্তানে ইসলামের উত্থানের ভীতি। এ বিষয়ে রাশিয়া এবং আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিতে সংহতিবোধ রয়েছে। রাশিয়া আফগানিস্তানে তালিবান উৎখাতে পাশ্চাত্যের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

ফিলিপাইন, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়ায় পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টীয় শক্তি বিপুল বিনিয়োগের লক্ষ্য ছিল দেশের উন্নয়ন অপেক্ষা খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের তুলনামূলক অধিকতর অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এশীয় মুসলিম দেশগুলোর তৈল-গ্যাস সম্পদের প্রতি খ্রীষ্টীয় শক্তির রয়েছে প্রচন্ড লোভ।

নিউ ইয়র্ক শহরের ওয়ালর্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ারের ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সন্ত্রাসী হামলাকে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে হামলার কারণ দেখিয়েছে। আসল সত্য তা নয়। টুইন টাওয়ার ঘটনায় ইয়াহুদী সম্পৃক্ততা।

১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে কর্মরত প্রায় ৪ হাজার ইয়াহুদী কর্মচারীর মধ্যে ১ জনও কাজে যোগ দান করেনি। এর কারণ এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণেরও প্রবণতা দেখা যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞগণ কারণটি অনবহিত।

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ এর ঘটনার পূর্বে ১৯৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে বিন লাদেন এর ট্রেনিং ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়েছিল।

ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এ্যারিয়েল শ্যারণের ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ নিউইয়র্কে বেশ কিছু অনুষ্ঠানে যোগদানেরই কর্মসূচি ছিল। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোশাদ তাকে বারণ করেছিল। তাহলে ১১ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে যে প্রলয়কান্ড সংঘটিত হয় তা কি ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা অবহিত ছিল?

বিমানের ব্ল্যাক বক্সের ধারণকৃত তথ্য

১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ নিউইয়র্ক টুইন টাওয়ারের প্রলয়ের কারণ সম্পর্কে বিমানের দু'টি ব্ল্যাক বক্সের টেপে ধারণকৃত কথাগুলো বিকৃত হয়নি। দূর্ঘটনার পূর্ব মহূর্তে বিমানের পাইলটের সঙ্গে কী ধরনের এবং কী কথাবার্তা হয়েছিল-এটা বিশ্ববাসীর কিছুটা জানার

www.pathagar.com

অধিকার আছে। প্রতিদিন টুইন টাওয়ারে দুর্ঘটনার সঙ্গে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার এবং ওসামা বিন লাদেনের যে যোগাযোগ রয়েছে তা প্রচার করা হচ্ছে। ব্ল্যাক বক্সের ধারণকৃত কথাগুলোতো অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু তা কেন প্রচার করা হয় না।

টুইন টাওয়ার দুর্ঘটনা কবলিত বিমান পাইলটের পাসপোর্ট

টুইন টাওয়ারের দুর্ঘটনায় যে পাসপোর্টগুলো পাওয়া গেছে তা কার কার নামে ইস্যু হয়েছিল-এ তথ্যগুলো প্রচার মাধ্যমে দর্শক শ্রোতা এবং পাঠকদের জানার আগ্রহটা স্বাভাবিক। কিন্তু তা কী কারণে অবহিত করা হচ্ছে না- এরও একটা তাৎপর্য থাকতে পারে। টুইন টাওয়ারে অভিযানকারী ১৯ জন পাইলটের মধ্যে ১৭ জনই ছিল সউদী। তাদের কে কে তালিবানদের সঙ্গে সংযুক্ত তা দেখার চেষ্টা কেন করা হয় না।

টুইন টাওয়ারের ষ্টীল ফ্রেইম

দু'টি বিমান ১১ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে টুইন টাওয়ারে আঘাত হানে। এ আঘাতের ধাক্কায় বিমান ভেঙ্গে পড়ার কথা। কিন্তু টুইন টাওয়ার ছাঁই এবং পাউডার হয়ে অল্প সময়ে গুড়িয়ে পড়ে। এটা কী করে হল?

সন্ত্রাসী বিমানের আঘাতে টুইন টাওয়ারের যে ক্ষতি হয়েছে তা থেকে বেশি হয়েছে বিমানের ব্যবহৃত জ্বালানী থেকে জ্বলে উঠা আগুনে। এ আগুনের তাপমাত্রা ছিল ১৫০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রায় দু'ধরনের ক্ষতি হয়। টুইন টাওয়ারের যে ষ্ট্রিল ষ্ট্রাকচার ছিল তা ১৫০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মোমের মত নরম হয়ে যায়। টুইন টাওয়ারের অন্যান্য জিনিসপত্র উত্তাপে পুড়ে বালি এবং ছাই হয়ে যায়।

কী তাপমাত্রায় টুইন টাওয়ারের মত মজবুত ষ্ট্র্যাকচার মোমের মত তরল হয়ে বালুতে পরিণত হতে পারে- এটা উন্নত গবেষণার বিষয়। এ তত্ত্ব বৈমানিক এবং সাধারণ বৈজ্ঞানিকদের জানার কথা নয়। এ জন্য সুদীর্ঘ গবেষণা করতে হয়েছে। এ গবেষণা কোথায় হয়েছিল- তা জানার আগ্রহ মার্কিন প্রশাসনের হচ্ছে না। এ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্যও হচ্ছে না। এ গবেষণা যদি লাদেন বা তালেবানরা করে থাকে, তা আবিস্কার কেন হচ্ছে না।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে টুইন টাওয়ার বিমানের আঘাতে যে ধরণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও টেকনোলজি জানা প্রয়োজন, তা তালিবানরা কোন গবেষণাগারে উন্নয়ন করেছে, তা আবিস্কারে কোন প্রচেষ্টা কেন করা হচ্ছে না। এতে কি এই সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে মার্কিন কর্তৃপক্ষ এ প্রযুক্তির উৎস সম্পর্কে অবহিত। তাই এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করছেনা।

টুইন টাওয়ার বিধ্বংসী বিমানের পাইলট, বা সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্রকারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক থাকার কথা-এই যোগাযোগ করা হয়েছিল যা বিমান স্যারভেলেন্স তদারকের কর্তৃপক্ষ অবহিত। পদ্ধতিটি রয়েছে তমসার অন্ধকারে।

১৫০০০ পাউন্ড Daisy Cutter বোমা

মার্কিন মেরিন এবং বৃটিশ বাহিনী আফগানিস্তানে বৃষ্টির ধারার মতো বোমানিক্ষেপ করেছেন। তদুপরি কত পরিমাণ নিক্ষেপ করা হয়েছে ১৫০০০ পাউন্ড ওজনের যা কঠিনতম শীলা ভেদ করে। বিশ ফুট এর বেশি গভীরে পাথর ভেদ করে প্রবেশ করে ধ্বংস করতে পারে। মার্কিন সন্ত্রাসীরা আফগানিস্তানে স্বল্প সংখ্যক বোমা নিক্ষেপ করে তৃপ্ত হতে পারেনি। বোমা নিক্ষেপ করেছে বৃষ্টির মতো। (সাপ্তাহিক নিউজ উইক, নভেম্বর ২৬, ২০০১ পৃষ্ঠা ৩২)

www.pathagar.com

তালিবান ক্লেশ

কাবুলের নিকটবর্তী ট্রেঞ্চে তালিবান যোদ্ধাদের ত্যাগ ও কোরবানীর করুণ দৃশ্য আফগানিস্তানের উত্তর অঞ্চলীয় মুজাহিদদের দৃষ্টিতে এসেছে। খাদ্যের অভাবে তারা ইঁদুর রান্না করে খেত। যা ইঁদুরের অবশিষ্টাংশ থেকে পরিলক্ষিত হয়েছে। (Weekly Newsweek, November 26, 2001, p.33) আমেরিকার সৈন্যগণ বি-৫২ সামরিক বিমান এবং অন্যান্য বোমারু বিমানের মাধ্যমে এক মাসে প্রায় ১০ হাজার বোমা আফগানিস্তানে তালেবান এরিয়ায় নিক্ষেপ করেছে। (Weekly Newsweek, November 26, 2001, p.33) প্রতিটি বোমার মূল্য ১০ মিলিয়ন থেকে ২০ মিলিয়ন (Weekly Newsweek, November 26, 2001, P.29)

কালা-ই-জঙ্গী দুর্গের দুর্ঘটনা

(১ম ও ২য় দিনের ঘটনা)

কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার পর মুসলিম ইতিহাসে অন্যতম শোকাবহ ও মর্মান্তিক ঘটনা হলো আফগানিস্তানের কালা-ই-জঙ্গী দূর্গের নৃশংস হত্যাকান্ড। এ হত্যাকান্ডের ইয়াজিদ হলো মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশ এবং উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ হলো মার্কিন সমর.সচিব ডোনাল্ড রাম্স্ফেল্ড। ইয়াজিদ এবং উবায়দুল্লাহ্ যিয়াদের সঙ্গে জর্জ ওয়াকার বুশ ও ডুনাল্ড রামস্ফেল্ড-এর নামও অনাগত ভবিষ্যতে মুসলিম হৃদয়ে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কারবালার হত্যাকান্ড ইয়াজিদের অজ্ঞাতে সংগঠিত ও সমাপ্ত হয়েছিল ১লা মহররম এক দিনে। কালা-ই-জঙ্গী হত্যাকান্ড জর্জ বুশ এবং ডুনাল্ড রাম্স্ফেল্ড এর জ্ঞাতসারে চলেছিল সাত দিন (নভেম্বর ২৪ হতে নভেম্বর ৩০, ২০০১ পর্যন্ত)।

কালা-ই-জঙ্গী দূর্গ

মাজার-ই-শরীফের অল্প কয়েক কি.মি. পশ্চিমে কালা-ই-জঙ্গী দুর্গ অবস্থিত। এ দুর্গটি আফগান উত্তরাঞ্চলীয় মিত্র জোটের যুদ্ধবাজ সেনাপতি আব্দুর রশিদ দোস্তামের অশ্ব বাহিনীর আস্তাবল হিসাবে ব্যবহৃত হতো।

কালা-ই-জঙ্গী দুর্গ উত্তর-দক্ষিণে হলো প্রায় পাঁচশত গজ (আধা কিঃ মিঃ)। সর্বোচ্চ উচ্চতা ৬০ ফিট (২০ মিটার)। দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে। কালা-ই-জঙ্গী দুর্গটি পরিত্যাক্ত, বিনষ্ট এবং বিধ্বস্ত।

কালা-ই-জঙ্গীর হত্যাকান্ডের বিবরণ ইয়াজিদ পক্ষের এক ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে আন্ত র্জাতিক ইয়াহুদী মার্কিন সাপ্তাহিক টাইম এর ১০ ডিসেম্বর, ২০০১ সংখ্যায়। আসল ঘটনার তদন্ত এবং তথ্য উদঘাটনের একবিংশ শতাব্দির বিশ্ব মুসলিম উদাসীন এবং নির্বাক। কালা-ই-জঙ্গীর অন্যতম সীমার হলো-যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা রাজ্যের উইনফিল নগরীর ৩২ বছর বয়স্ক অর্বাচিন যুবক মাইকেল স্পান (Michael Spann)।

কালা-ই-জঙ্গী হত্যাকান্ডে ইয়াজিদ পক্ষে নিহত হয়েছিল মাত্র একজন-জন মাইকেল স্পান এবং মুসলিম তালিবান পক্ষে শহীদ ছিল প্রায় ছয়শত।

আমেরিকান বিবেক ও বিচারে এক ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ নেয়া হয় পাঁচ শত বন্দীর নৃশংস হত্যাকান্ডের মাধ্যমে। মার্কিন স্বৈরাচারীদের নিকট এটাই হলো মুসলিম জীবনের মূল্য।

www.pathagar.com

দোস্তামের মিথ্যা অশ্বাস ও ভাওতা

আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে কুন্দুজ প্রদেশ ছিল ২০০১ সালের জিহাদে তালিবানদের সর্বশেষ ঘাটি। তালিবান যোদ্ধাদেরকে বিভিন্নভাবে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল যে আব্দুর রশিদ দোস্তাম যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগান গোত্রগুলোর জাতীয় সংহতিতে বিশ্বাসী। জাতীয় পুনর্গঠনের অপরিহার্য শর্ত জাতীয় ঐক্য। তাই আত্ম-সমর্পনকারী তালিবানদের জন্য সাধারণ ক্ষমার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরাঞ্চল জোট এবং তাতে দৃঢ়বিশ্বাসী হলেন সেনাপতি দোস্তাম।

আফগানিস্তানবাসী তালিবানদেরকে স্ব-সম্মানে তাদের গৃহে ফেরার সুযোগ দেয়া হবে। বিদেশী তালিবানদেরকে জাতিসংঘ বাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হবে। তৎপূর্বে তাদেরকে আন্তর্জাতিক বিধিমতো নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখা হবে। উপরোক্ত শর্তাবলীতে আত্মসমর্পণের আলোচনা কয়েক সপ্তাহ ধরে চলছিল। আত্মসমর্পণকারী তালিবান যোদ্ধাদেরকে কুন্দুজের বিভিন্ন স্থান থেকে যান্ত্রিক যানে কালা-ই-জঙ্গীতে জমা করা হতো।

অবমাননা

যোদ্ধাদেরকে রাজধানী শহর মাজার-ই-শরীফের কেন্দ্রস্থল দিয়ে উন্মুক্তযানে করে আনা হতো। সপ্তাহ দু'য়েক পূর্বেও এ যোদ্ধারা ছিল মাজার-ই-শরীফের শাসক এবং নিয়ন্ত্রণকারী। এখন অনেকের গায়ে রক্তমাখা, গুলিগোলায় ছিন্ন বিছিন্ন ছেড়া কম্বল। তারা ছিল মাজার-ই-শরীফের পথচারীদের করুনার পাত্র।

হত্যাকান্ড শুরু- ২৪ নভেম্বর, ২০০১

প্রায় তিনশত তালিবান যোদ্ধাকে কালা-ই-জঙ্গী দুর্গে আনয়ন করা হয় ২৪শে নভেম্বর, ২০০১ শনিবার। এটা ছিল হত্যাকান্ডের প্রথম দিন।

কোন অপরাধী বা বন্দীকে গ্রেফতার করে বা ধরে এনে অন্তরীন করার পূর্বেই তাদের দেহ তল্লাশী করা সাধারণ নিয়ম। তালিবান যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। কারণ স্বরূপ হত্যাকান্ডের পর ২৮শে নভেম্বর, ২০০১ বুধবার জেনারেল আব্দুর রশিদ দোস্তাম আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন- দুর্গে প্রবেশ করার পূর্বে যদি তাদের দেহ তল্লাশী করা হতো, তবে তারা বাধা দিত, উশৃঙ্খল হতো এবং মারামারিতে লিপ্ত হতো।

দেহ তল্লাশী

প্রবেশ করার পর ২৪শে নভেম্বর, ২০০১ তালিবান যুদ্ধ বন্দীদেরকে কালা-ই-জঙ্গী দুর্গে তাদের দেহ তল্লাশির সময় অপদস্ত করা হয়। তাদের সঙ্গে চোর তস্করের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। তাদের পকেট তল্লাশি করা হয়। এতে অপমানিত এবং অপদস্ত একজন বন্দী তার জামায় লুকায়িত একটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জোট সেনানায়ক নাদির আলীকে হত্যা করেন এবং নিজেও গ্রেনেড বিস্ফোরণে শাহাদাত বরণ করেন।

রাতের বেলাও অনুরূপ আরেকজন তালেবান যুদ্ধবন্দী হাজারা সেনাপতি সাঈদ আসাদকে হত্যা করে নিজেও শাহাদাত বরণ করেন। তিন শত যুদ্ধ বন্দীর অন্যান্যদেরকে আন্ডারগ্রাউন্ড সেলে ধস্তাধস্তি করে নিয়ে নেয়া হয়।

অপদস্ত দু'জন তালিবান যোদ্ধার শাহাদাত এবং দু'জন উত্তরাঞ্চলীয় সেনাপতির হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে কালা-ই-জঙ্গী দুর্গের মর্মান্তিক ঘটনার শুরু। দু'টি কাজ করলে এ দুর্ঘটনা পরিহার করা যেতো। প্রথম দুর্গে প্রবেশের পূর্বেই যদি তাদের দেহ তল্লাশি করা হতো। দ্বিতীয়ত দুর্গ রক্ষীর সংখ্যা যদি পর্যাপ্ত রাখা হতো।

www.pathagar.com

সতর্কতার অভাব।

২৪ নভেম্বর, ২০০১ শনিবারে দু'টি দর্ঘটনার পরও উত্তরাঞ্চলীয় জোট অথবা মার্কিন সৈন্যাধ্যক্ষ সতর্কতামূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। পরবর্তী দিন ২৫শে নভেম্বর, ২০০১, রবিবার সোয়া এগারটায় মার্কিন সি.আই.এ.-এর এজেন্ট জন মাইকেল স্পান এবং তার সহকর্মী ডেভিড (ডেইভ নামে পরিচিত) তালিবান বন্দীদের মধ্যে কারা আল কায়েদার সদস্য তা-নিরূপনের জন্য জবানবন্দি নেয়া শুরু করেন।

অবমাননাকর জবানবন্দি

এখানেও মার্কিনীদের অহংকার এবং ঔদ্ধত্যের স্বরূপ প্রকাশ হয়। অপরাধী বা বন্দিদের জবানবন্দি সাধারণত সমবেতভাবে নেয়া হয় না। একজন একজন করে জবানবন্দি নেয়া হয় কিন্তু এক্ষেত্রে বন্দিদেরকে খোলা মাঠে এনে তাদের জবানবন্দি নেয়া শুরু করে। মাইকেল স্পান ছিল ৩২ বয়স্ক সুদর্শন যুবক। তালিবানদের অধিকাংশই ছিল তার থেকে বেশি বয়স্ক। একজন তালিবানকে স্পান জিজ্ঞাসা করেন- তুমি কেন এখানে এসেছ?

তালিবান হত্যা শুরু

এক ক্রুদ্ধ তালিবান তার ঘাড়ে ঘুষি মেরে জানায় "তোমাকে হত্যা করার জন্য"। এতে স্পানও ক্রুদ্ধ হন। তিনি পিস্তল বের করে-উক্ত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ গুলি করে এবং হত্যা করেন। সিআইএ এজেন্ট ডেভিড তার পিস্তলের আঘাতে আরেকজনকে হত্যা করেন। অতপর তিনি একজন উত্তরাঞ্চলীয় জোট রক্ষীর এ কে-৪৭ অস্ত্রটি ছিনিয়ে নিয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করেন। মাইকেল স্পান পিস্তলের গুলিতে আরো কয়েকজনকে হত্যা করেন। এ সময় জার্মান টেলিভিশনের একটি দল তালিবান যোদ্ধাদের ফটো নিচ্ছিলেন।

ডেভিড তার এ কে-৪৭ অস্ত্রের সাহায্যে কয়েকজনকে হত্যা করেন এবং জার্মান টেলিভিশন ক্রুদেরকে কাভার বা ছায়া দিয়ে দুর্গের সর্ব উত্তরে অবস্থিত প্রধান প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশ করে আত্মরক্ষাকরণে সহায়তা করেন। কিন্তু জন মাইকেল স্পান যুদ্ধ বন্দিদের হাতের কিল-ঘুষি ও পায়ের চাপে নিহত হন।

আফগান অভিযানে প্রথম নিহত মার্কিন

আফগান যুদ্ধে নিহত প্রথম আমেরিকান হলেন আলাবামা রাজ্যের তিন সন্তানের জনক ৩২ বৎসর বয়স্ক সিআইএ-এর এজেন্ট জন মাইকেল স্প্যান। সিআইএ-এর এজেন্ট ডেভিড তখন দুর্গের প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশ করে দুর্গের প্রধান কর্মকর্তা এবং দুজন রেড ক্রস কর্মীকে আলোচনারত দেখেন। তিনি তাদেরকে তালিবান বন্দিদের বিদ্রোহের ঘটনাটি অবহিত করেন।

রেড ক্রস কর্মীদের একজন ছিলেন ব্রিটিশ রেড ক্রস স্টাফ সাইমন ব্রুকস্। তার বর্ণনা মতে ডেভিড তাকে জানান যে, তালিবান বন্দিরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের দুর্গ প্রহরীদেরকে কাবু করে ফেলেছে এবং আনুমানিক বিশজনকে হত্যা করেছে।

এ খবর দিয়ে ডেভিড সহকর্মী মাইকেল স্পানের সন্ধানে যান। দুর্গের গেইট ছিল কিছুটা দুরে। রেডক্রস কর্মীদ্বয় দুর্গ প্রাচীরের উপর উঠে রশির সাহায্যে প্রাচীর থেকে নেমে আসেন।

এর মধ্যেই কয়েক শত মিটার দক্ষিণে বন্দি ব্লকগুলো হতে তালিবানরা তাদের

www.pathagar.com

সহকর্মীদেরকে মুক্ত করে নেন। তিনজন তালিবান ড্রেইনের মধ্য দিয়ে পলায়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্গ রক্ষীদের গুলির আঘাতে নিহত হন।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

কালা-ই-জঙ্গী দুর্গের মাঝামাঝি স্থানে ছিল দু'টি অস্ত্রাগার। তালিবান যোদ্ধারা হঠাৎ আক্রমণ করে অস্ত্রাগার রক্ষকদের কাবু করে বেশ কিছু সংখ্যক কালাশনিকভ এ.কে-৪৭, গ্রেনেড, মাইনস, রকেট লাঞ্চার, মর্টার এবং গোলাগুলি হস্তগত করে নেন।

উত্তরজোটের নিয়ন্ত্রাধীন দুর্গের অংশ

উত্তরাঞ্চলীর জোটের যোদ্ধারা দুর্গের পশ্চিম পাশের প্রধান গেইট, প্রবেশ পথ, দুর্গ প্রহরীর ভবন, ইত্যাদি নিজেদের দখলে রাখে- যাতে তালিবানরা গেইট দিয়ে পলায়ন করে শহরে ঢুকতে না পারে।

দুর্গ রক্ষীরা অধিকাংশই ভবনগুলোর ছাদে এবং প্রাচীরের উপরে উঠে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে এবং উপর থেকে তালিবানদের উপরে গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে।

দুর্গের উত্তর দিকে দুর্গ প্রাচীরের বাইরের ঢালু অংশ দিয়ে দু'টি ট্যাংক প্রশস্ত প্রাচীরের উর্ধ্বে জোট সৈনিকগণ তোলে এবং তালিবানদের অবস্থানের উপর গোলা নিক্ষেপ শুরু করে।

২৫শে নভেম্বর, ২০০১ অপরাহ্ন

২৫ নভেম্বর, ২০০১ বিকাল বেলা থেকে শুরু হয় ইঙ্গ মার্কিন বাহিনীর বোমা আক্রমণ। অপরাহ্ন ২.০০ ঘটিকায় দু'টি মিনি বাস এবং দু'টি মেশিনগান সজ্জিত ল্যান্ড রোভারে করে ব্রিটিশ ও মার্কিন সেনাগণ দুর্গ গেইটে উপস্থিত হন। মিনিবাস থেকে অবতরণ করেন নয় জন মার্কিন বিশেষ অভিযান সেনা। তাদের সাথে ছিল চ্যাপ্টা, মোটা ও উল্টানো নাশাযুক্ত এম-৪ অটোমেটিক রাইফেল্স্। ল্যান্ড রোভার থেকে বেরিয়ে আসেন এম-১৬ রাইফেল্স হস্তে ছয়জন ব্রিটিশ এস এ এস সেনা।

বোমার লক্ষ বস্তু

দুর্গে প্রবেশ করেই আমেরিকান ও ব্রিটিশ সেনাগণ আলোচনা ও পরামর্শ সভায় মিলিত হন। সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে মার্কিন সেনানায়ক বেতারে ঘোষণা করে জানান তাৎক্ষণিক করণীয় কাজ। তিনি সেটেলাইট কমিউনিকেশন সুযোগ এবং গাইডেড অস্ত্র চান।

আরো জানান যে, দুর্গের দক্ষিণ পশ্চিম অর্ধাংশে ভূমির উপর আছে তালিবান সেনা। উপরে এক লাইনে ছয় সাতটি ভবনের সব কটি তারা দখল করে রেখেছে।

দুর্গের উত্তরাংশে বিরাট মাঠ, প্রশাসনিক ভবন, উত্তর টাওয়ার, উত্তর-পশ্চিম টাওয়ার, উত্তর-পূর্ব টাওয়ার। উত্তর-পূর্ব দিকে মাঝামাঝি মেইন গেইটকীপার ভবন, দক্ষিণ-পূর্ব টাওয়ার, উত্তর টাওয়ার সংলগ্ন প্রধান ভবন, ইত্যাদি ছিল উত্তরাঞ্চলীয় যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিমের ভবনগুলোতে বোমা নিক্ষেপ করা হলে তালিবানদের ধ্বংস করা যাবে।

দক্ষিণ পশ্চিমাংশের মাঝামাঝি ছিল দুর্গের ভূমিতলভাগে বন্দীদের সংরক্ষণ স্থান। এই দুর্গটি ছিল বিশেষ ভাবে ভূমিতলে বন্দী সংরক্ষণের জন্য তৈরী।

বোমা নিক্ষেপের নির্দেশ

ইঙ্গ মার্কিন নেতৃত্বে উত্তর জোট বাহিনী দুর্গের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিম অংশে প্রচন্ড গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। এই সময়ে উত্তর জোটের তত্ত্বাবধানে ছিলেন জেনারেল আব্দুল

www.pathagar.com

মজিদ রোজী। তিনি নির্দেশ দেন যে, দুর্গের দক্ষিণাংশের একতলা সাদা ভবনটি এবং তার চারদিকের ভবণগুলোতেই বিশেষভাবে জঙ্গী বিমান থেকে গোলা বৃষ্টি করতে হবে।

আকাশে উড্ডীয়মান মার্কিন বিমানের সঙ্গে রেডিও সংযোগ স্থাপিত হয়। সাপ্তাহিক টাইম পত্রিকার নাজিদুল্লা কুরাইশীর ভাষ্য মতে জেনারেল মজিদ রোজীর নির্দেশ সেটেলাইট রেডিওর মাধ্যমে বিমানের পাইলটদেরকে নীচের অবস্থা অবহিত করা হতো।

জঙ্গী বিমানের অবহিতি

বিমান থেকে জবাব আসতে থাকে তারা কোন অবস্থানে আছে। যেমন স্থানাংক উত্তর ৩৬, ৩৯, ৯৮, ৪ পূর্ব ০৬৬৫৮৯৫, এলিভিশান উচ্চতা ১২৯৯ ফুট। শব্দ শুনা যাচ্ছিল আর চার মিনিট, তিন মিনিট, দুই মিনিট, ত্রিশ সেকেন্ড, পনের সেকেন্ড, তারপরেই তীরের আকারে মিসাইল বোমা বৃষ্টি বর্ষন।

আবদুল মজিদ রোজীর একশত মিটার দূরত্বেই ভূমিতে বোমা পতন হয়। নীচের থেকে উপরে বিমানের প্রতি যোগাযোগ সংযোগকারী ব্যক্তিরা গুটিশুটি মেরে ভয়ে দেয়ালের সঙ্গে লেগে এত নিকটে বোমা বর্ষন লক্ষ্য করতে থাকে।

তালিবান যোদ্ধারা দুর্গের অস্ত্রাগার থেকে গ্রেনেড, মাইন, রকেট লাঞ্চার, ইত্যাদি হস্তগত করলেও এগুলো ব্যবহারের সুযোগ পাননি। যেখানেই তালিবানদের নড়াচড়া দেখা যেত, প্রাচীরের উপর থেকে গোলা নিক্ষেপ করে তাদেরকে স্থবির করে দেয়া হতো।

বিমান থেকে কখন দুর্গের অভ্যন্তরে বোমা নিক্ষেপ করা হবে- তা নীচে অবস্থান রত মার্কিন, ব্রিটিশ এবং উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে অবহিত করা হতো। আর তিন মিনিট, দুই মিনিট, এক মিনিট ৩০ সেকেন্ড, আরেকটি, ইত্যাদি বলে বিমান এবং ভূমিতে অবস্থানরত ব্রিটিশ ও মার্কিনদের রেডিও সংযোগ চলতো।

ভলিবল খেলায় অংশগ্রহণকারী এবং দর্শকদের মধ্যে যেরূপ একটি আনন্দঘন অবস্থা বিরাজ করে, দুর্গ প্রাচীরে অবস্থানরত মার্কিন এবং ব্রিটিশ দর্শকদের দৃষ্টিতে এরূপ খেলার অভিনয়ে বন্দীদের উপর বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ করা হয়।

ঠান্ডা মাথায় পাঁচ শতেরও বেশি যুদ্ধবন্দীকে হত্যাকালে ফুটবল খেলায় যে টেনশন পরিলক্ষিত হয় সেরূপ অবস্থাও ছিল না। বরং পাখি শিকারের সময় শিকারীদের মনে যেরূপ উত্তেজনা ও আনন্দানুভূতি থাকে-সেরূপ পরিবেশ ছিল কালা-ই জঙ্গী দুর্গের যুদ্ধ বন্দিদেরকে হত্যার সময়।

মার্কিনীদের দুর্বিনীত অশালীন ভাষ্য

বোমা দর্শনে উত্তর জোটের সৈন্যরা অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে। তালিবানদের উপর প্রচন্ড বোমা বর্ষন ছিল হাসি আনন্দ খেল তামাশার ব্যাপার। সেটেলাইট রেডিও কমিউনিকেশনে মার্কিন সেনাগণের দূরে বিমান বাহিনীর সঙ্গে রেডিও সংযোগে বাক্য বিনিময়ে যে ভাষা ব্যবহার হয়েছে তা ছিল শালীনতাহীন। হাসি উল্লাসপূর্ণ এবং যৌন বিকৃতির পরিচায়ক।

নীচে থেকে হার্লী ডেভিডশন নামে শ্মশ্রুমন্ডিত একজন মধ্য বয়সী ব্যক্তি যোগাযোগকারীকে জঙ্গী বৈমানিকের সঙ্গে অশালীন ভাষায় বলতে শুনা যায় "কাজ কর, উড়ো, নিজেদের অন্ডকোষ চুলকান বন্ধ করো"। (সাপ্তাহিক টাইম, ১০ ডিসেম্বর, ২০০১)।

কালাই জঙ্গী দুর্গের হত্যাকাণ্ড

www.pathagar.com

যুদ্ধ প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি

অতীতে বিমান থেকে বোমা বর্ষন করা হলে লক্ষ্য থাকতো শহরের সীমা রেখায় ভিতরে যেন বোমাটি পড়ে। এখন সমর বিজ্ঞান এতো উন্নত হয়েছে যে রাইফেলের গুলি যেভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বস্তু হিট করতে পারে, আকাশ থেকে বোমাও সেরূপ নির্দিষ্ট ভবনে বোমা ফেলতে পারে। কামান দাগলেও বোমা একটা এলাকার মধ্যে পড়ে। নির্দিষ্ট ভবনে কামানের গোলা পৌছানো কষ্টকর হয়। বর্তমানে পাশ্চাত্য সমর প্রযুক্তিবিদ্যার প্রগতি এতো বেশি হয়েছে যে, চলন্ত বিমান থেকে মিসাইল বোমা অতি দ্রুত নির্দিষ্ট ভবন বা পরিবহন যানে নিক্ষেপ করা যায়।

প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নয়ন

পূর্বে রেডিও ষ্টেশন ভবন থেকে খবর, গান, বাদ্য প্রচারিত হতো। আর তা আরেকটি রেডিওতে ধরা যেতো। বর্তমান প্রযুক্তি বিদ্যায় পুরা রেডিও ষ্টেশনের যন্ত্রপাতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ আকার ধারণ করে হাতের মুঠোয় এনে নেয়া হয়েছে। মোবাইল টেলিফোনের ভিতরে রক্ষিত সিকি সাইজের যন্ত্র থেকে মোবাইল টেলিফোনের মাধ্যমে একস্থান থেকে আরেক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপচারিতায় লিপ্ত হওয়া যায়। এ সমস্তের কিছুই একশত পঁচিশ কোটি মুসলমানের কেউ আবিষ্কার করেনি। বিশ্ব মুসলিম পড়ে আছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অতীতের আইয়ামে জাহেলিয়াত থেকেও গভীরতর তমসার অন্ধকারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমর প্রযুক্তি

অষ্টদশ শতাব্দীতে মুসলিমদের হাতে অস্ত্র ছিল লাঠি, বংশদন্ড, বল্লম, তীর, তরবারী, বড় জোর গাঁদা বন্দুক, সেকেলে কামান। তৎকালীন আধুনিক কামান বন্দুক নিয়ে এসে শত শত ইউরোপিয়ান লক্ষ লক্ষ মুসলিমের কণ্ঠে উনবিংশ শতাব্দীতে গোলামীর জিঞ্জির পরিয়ে দেয়।

সমর প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বর্তমানে ২০০১ খ্রীঃ এমনি একটি বৈষম্য অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ব মুসলিম এখনও ভোজন বিলাস, যৌনতা ও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। যুক্তরাষ্ট্রের হাতে রয়েছে ১২০০০ এর বেশী (বার হাজারের বেশি আণবিক বোমা), শত শত হাইড্রোজেন বোমা। দুনিয়ার একশত বিশ কোটি মুসলিমের হাতে আছে বিশটির মত খেলনা জাতীয় আনবিক বোমা। খেলনা বন্দুক দিয়ে তারা চায় বর্তমান যুগের প্রেসিসান বোম্বিং টেকনোলজি যাদের হাতে আছে-তাদের সালে লড়তে।

আইয়ামে জাহেলিয়াত

জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যার চর্চা না করে অজ্ঞতার অন্ধকারে থেকে, তাওয়াক্কুলের ভুল অর্থ করে আমরা নিজেদেরকে এমন অবস্থায় রেখে দিয়েছি যে, স্বল্পতম সময়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে হয়ত একটি পরাশক্তি ধ্বংস করে দিতে পারে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন- সংখ্যায় তাঁরা কম হলেও মুসলিমদের হাতে ছিল সমমানের তলোয়ার, বল্লম, তীর, উচ্চমানের প্রশিক্ষণ দক্ষতা। সর্বোপরি সীমাহীন ঈমান, ইয়াকীন, বিশ্বাস, প্রত্যয়, তাওয়াক্কুল, জিকির এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ। বিদেশী সংস্কৃতির অন্ধ পুঁজা করতে করতে আধ্যাত্মিক শক্তি তো আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু সমকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নেও আমরা উদাসীন, অনাগ্রহী এবং অক্ষম। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীদেরকে যুদ্ধের ঢাল বা বর্ম তৈরীর

www.pathagar.com

প্রযুক্তিবিদ্যা অর্জন এবং যুদ্ধের ঢাল বা বর্ম তৈরীতে উৎসাহিত করেছিলেন।

কাদেশিয়ার যুদ্ধে তৎকালীন পারস্য সম্রাট তৃতীয় খসরু ইয়াজড়্গির্দ এর সেনাপতি বীর কেশরী রুস্তম এবং হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের (রা.) মধ্যে ক্রান্তি কালীন মহা সমরে পারস্য পরাশক্তির ভাগ্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। এ যুদ্ধে রুস্তম নিহত হন।

হযরত উমরের (সাঃ) খেলাফতকালে ১৪ হিজরীতে পারস্য সেনাপতি কাফের রুস্তমের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর পূর্বে ইসলাম কবুলের দাওয়াত নিয়ে তার নিকট গিয়েছিলেন সাহাবী রাবী বিন আমর (রাঃ) এবং পরে সেনাপতি মুগীরা বিন শুবা।

তাদের পূর্বেও হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের নির্দেশে আরব বাহিনীর ১২জন বীর সম্রাট ইয়াজড়্গির্দের নিকট দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের পরিধানে ছিল ছিন্ন বস্ত্র। জামাও ছিল না। অনেকের চাদর ছিল কাঁটা এবং ল তা দিয়ে দেহে আঁটকানো। সাহাবী রাবি বিন আমর (রাঃ) এর তলোয়ারের খাপ ছিল না। ন্যাকড়া দিয়ে তিনি ধারাল তলোয়ারটি জড়িয়ে রেখেছিলেন।

পারস্য শিবিরের উপরে, নীচে, কার্পেট লাগানো বিরাট তাবু। প্যান্ডেলে সেনাপতি রুস্তম সাহাবী রাবি বিন আমরকে (রাঃ) কে সাক্ষাত দান করেন।

পরাক্রমশীল সেনাপতি রুস্তম জিজ্ঞাসা করেন- যে মুসলিম দলের সৈন্যদের পেটে অন্ন নেই, দেহে বস্ত্র নেই, তারা কিভাবে তৎকালীন বিশ্বের অংশগ্রহণ করছেন।

সাহাবী রাবী বিন আমর (রাঃ) তখন বলেছিলেন-মুসলিম সেনাদের পেটে অন্ন না থাকতে পারে, দেহে বস্ত্র না থাকতে পারে, কিন্তু কলবে আছে ঈমান এবং হাতে আছে ধারাল তরবারী। যে তরবারীর ধার রুস্তমের তরবারী অপেক্ষা বিন্দু মাত্র কম নয়। তিনি রুস্তমকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন দরবার কক্ষেই দু'টি তরবারীর ধার পরীক্ষা করে নেয়ার জন্য। রুস্তম সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি বরং গর্জে উঠেছিলেন।

যুদ্ধে রুস্তমের ধারাল তরবারী নিস্প্রভ হয়ে যায়। পরাজিত রস্তমকে পলায়ন করতে হয়। পশ্চাতে ধাববান হন আরবী বীর সেনানী হেলাল। সম্মুখে নদী দেখে রুস্তম অশ্বপৃষ্ঠেই নদী অতিক্রমের জন্য নদীতে নেমে পড়েন। তাই নিজের ধাবমান অশ্ব থেকে স্বল্প জলে অবতরণকালীন রুস্তমের অশ্ব লম্ফ দিয়ে ঝাপিয়ে পড়েন।

তাল সামলাতে না পেরে সেনাপতি রুস্তম ঘোড়া থেকে পানিতে পড়ে যান। তার দেহে ছিল ভারী লৌহ বর্ম এবং মূল্যবান চাকচিক্যময় বস্ত্র। পানিতে ভিজে তাও ভারী হয়ে যায়।

রুস্তমকে পানির মধ্যে আক্রমণ করে আরব বীর হেলাল আহত করেন এবং ডাঙ্গায় টেনে তুলে হত্যা করেন। সে যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্যতম সাহাবী সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)।

কি অদ্ভুত বিশ্ব মুসলিমের চেতনা ! আরব সৈন্য হেলালের হস্তে নিহত অগ্নি উপাসক পরাজিত কাফির সেনাপতি রুস্তমের নামে শিশুর নাম রাখতে মুসলিম গৌরব বোধ করে। অথচ হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের নামটি উপমহাদেশে অতি বিরল।

বোমা নিক্ষেপ শুরু (২৫শে নভেম্বর ২০০১)

মার্কিন বিমান থেকে কালাই জঙ্গী দুর্গে তালিবান বন্দীদের উপর বোমা নিক্ষেপ শুরু হয় ২৫শে নভেম্বর রোববার বিকেল ৪.০৫ মিনিটে। সাত দফায় মার্কিন বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ চলে। উপর থেকে বোমা নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের ভূমি যোদ্ধাদেরকেও গোলাগুলি চালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্রিটিশ কমান্ডার উত্তরাঞ্চলীয় সেনাপতিকে নির্দেশ

www.pathagar.com

দেন। যখনই দুর্গের দক্ষিণাংশে কোন চলমান বস্তু দেখা যেত, তখনই উত্তরাঞ্চলীয় জোট থেকে গুলি নিক্ষেপ করা হতো। সাথে সাথে চলতো মার্কিন এম-৪ অটোমেটিক রাইফেল্স্ এবং ব্রিটিশ এম-১৬ রাইফেলের গুলি।

২৬শে নভেম্বর, সোমবার ২০০১

২৫শে নভেম্বর রোববার রাতে বিমান আক্রমণ মাঝে মাঝে চলতে থাকে। আমেরিকান এবং ব্রিটিশ সেনাদের অনেকেই দুর্গ এবং দুর্গ প্রাচীরের উপরে কর্মরত ছিলেন। সিআইএ-এর এজেন্ট ডেইভ এবং সাংবাদিকগণও রাতের বেলা বিমান আক্রমণ দৃশ্য অবলোকন ও উপভোগ করছিলেন। রাতের এক সময়ে সাংবাদিকগণ এবং ডেইভ উত্তর দিকে দেয়ালের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যান এবং হাত তুলে সড়কে চলমান গাড়ী থামিয়ে শহরে চলে যান। মঙ্গলবারে একজন আমেরিকান সৈন্য তাদেরকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। কারণ, মর্টার আক্রমণ তখনও চলছিল।

সোমবার সকালেই উত্তরাঞ্চল জোট দুর্গের উত্তর পূর্ব টাওয়ারে অবস্থান গ্রহণ করে। এটা ছিল প্রশাসনিক ভবন এবং নর্থ টাওয়ারের পূর্ব দিকে। এখানে জনৈক আমেরিকান সেনাধ্যক্ষের মতে দশ টনের মত গোলাবারুদ এবং প্রয়োজনীয় রকেট লাঞ্চার, ইত্যাদি জমা করা হয়েছিল। এখানে দুর্গের প্রাচীর এমনভাবে ছিল যে, ট্যাংক প্রাচীরের ঊর্ধ্বস্তরেও নেয়া যেত এবং একটি ট্যাংক নেয়া হয়েছিল।

দুর্গের এই উত্তর পূর্ব কোণা হতে দক্ষিণ পশ্চিমে ট্যাংকের সাহায্যে তালিবান অবস্থানের উপর গোলা বর্ষণ শুরু হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন মোহাম্মদ আকবর নামে একজন উত্তরাঞ্চলীয় কমান্ডার। মাঝে মাঝে তালিবান দিক থেকেও নিক্ষিপ্ত গুলি তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেত। তিনি বিদ্রুপের সাথে উচ্চারণ করতেন- চমৎকার! অতি চমৎকার ! নাক বরাবর এসেছে।

সোমবার ২৬ নভেম্বর, ২০০১ সকাল দশটায় মার্কিন স্পেশাল অপারেশন চারজন সৈন্য এবং দশ মাউন্টেন ডিভিশনের আটজন সৈন্য দুর্গের উত্তর পূর্ব দিকে এসে উপস্থিত হন।

দুর্গের অভ্যন্তরে তখন কোথায় বোমা ফেলতে হবে এ দায়িত্বে নিয়োজিত মার্কিন সৈন্য স্থান নির্দেশ করছিলেন। শীঘ্রই আকাশ থেকে বোমা নিক্ষিপ্ত হবে। বোমারু বিমান দুর্গের উপর দিয়ে ঘুরছিল। বিমানের পাইলট বোমা নিক্ষেপের নির্দেশকারীর সঙ্গে যে কথাবার্তা বলছিলেন দুর্গের বাইরে অবস্থানরত সৈন্যরাও তাদের হ্যান্ড সেটে তা শুনছিল। পাইলট বলছিলেন- তোমরা জেনে রাখ বোমা যেখানে পড়বে তোমরা তার অতি বিপদজনক নিকটে আছ। আমার টার্গেট থেকে তোমরা মাত্র একশত গজ দূরে অবস্থান করছ। শেষ পর্যন্ত এ বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল।

ভূমিতল থেকে বোমা নিক্ষেপ ভবন নির্দেশক বলছেন- আমিও মনে করি আমরা অতি নিকটে আছি। আমরা শীঘ্রই সরে যাচ্ছি। কিন্তু লেজার রশ্মির মাধ্যমে বোমা নিক্ষেপের টার্গেটটি দেখিয়ে দিতে হলে এর বেশি দূরত্বে থাকলে অর্থাৎ এত কাছে না থাকলে তা সম্ভব নয়। পাইলট উপর থেকে বলছিল আমি এখনই নিক্ষেপ করছি। বোমা লক্ষ্য অকুস্থল নির্দেশক জানাচ্ছে- নিম্নোক্ত স্থানাংকে বোমা নিক্ষেপ কর উত্তর ৩৬৩৯৯৯৬ পূর্ব ০৬৬৫৮৮৬৬- ইত্যাদি। পাইলট- উত্তম, নোট করলাম। অকুস্থল নির্দেশক বলছেন- সিভার্সন পালাচ্ছে দু'মিনিট অপেক্ষা করো।

লক্ষ্যভ্রষ্ট একটি বোমার ক্ষতি

ঠিক ১০ঃ৩৩ মিনিটে বোমারু বিমান থেকে মিসাইল বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এটা ছিল

www.pathagar.com

গত দু'দিন পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত বোমা থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। বোমা নিক্ষেপের ফলে ভূমি থেকে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকনা শত শত ফুট উপরে উঠে যায়। উত্তরাঞ্চল কামান্ডার আলিম রাজুন তার মাউন্টেইন ১০ রেজিমেন্টের সৈন্যদের প্রতি চিৎকার করে বলে-বেটারা ভুল জায়গায় বোমা ফেলছে। মার্কিন স্পেশাল অপারেশনের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ আলিম রাজুনের দিকে চিৎকার করে বলেন-তুমি নীচে নাম। তোমার গায়েই বোমার বিদীর্ণ টুকরা পড়বে। দ্রুত স্থান ত্যাগ কর।

আসলে এই বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। দুর্গের উত্তর দক্ষিণ টাওয়ার থেকে মাত্র দশ মিটারদূরে প্রাচীরের উপরেই বোমাটি পড়ে। কাছেই রক্ষিত একটি ট্যাংক ভূমি কম্পনের ফলে স্থানাচ্যুত হয়ে এবং এর কামান রক্ষণ টারেট উড়ে যায়। বেশ কয়েকজন উত্তরাঞ্চলীয় সেনা আহত হয়ে ভূমিতে গড়াগড়ি করতে থাকে। আহত দেহ প্রাচীরের গা বেয়ে পড়তে পড়তে কেউ কেউ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। মৃত দেহ পার্শ্ববর্তী তুলা ক্ষেতে পড়ে থাকে।

আফিজ নামক একজন সৈন্যের চোখ এবং কান দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। তাকে বলতে শুনা যায়-আমার বন্ধুরা কোথায় আছে জানিনা। নিকটস্থ আমেরিকান এবং ব্রিটিশ সৈন্যরাও বাকরুদ্ধ হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে। একজন মার্কিন বিশেষ বাহিনীর সৈন্য সাপ্তাহিক টাইম পত্রিকার প্রতিনিধিকে বলেন, এখান থেকে অল্প সময়ের জন্যে সরে যাও। আমাদেরকে কাজ করতে দাও।

বিশ মিনিটের মধ্যেই আহত এবং নিহতদেরকে নিকটবর্তী ইউএস বেইজে নিয়ে যাওয়া হয়। নয়জনকে বিমানে দেশের বাইরে নেওয়া হয়। নাইম মোহাম্মদ নামে ২৪ বছর বয়স্ক একজন উত্তরাঞ্চলীয় সৈন্য বলেন যে, তিনি বোমা পড়ার সময় উত্তর পূর্ব টাওয়ারের উপর ছিলেন। তার দেখা মতে তিনজন আহত সৈন্য ছিল আমেরিকান। তার মধ্যে একজন ধ্বংস স্তুপের নীচে পড়ে মরেই গিয়েছিল।

উত্তরাঞ্চলীর জোটের ত্রিশ জন নিহত এবং পঞ্চাশ জন আহত হয়। একটি বোমা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার ফলেই যদি ইঙ্গ মার্কিন পরাশক্তি ও তাদের দালালদের এত জন নিহত হতে পারে, তবে চার দিনের অবিরাম বোমা বর্ষনে (২৪ নভেম্বর-২৭ নভেম্বর ২০০১) ছয় শত তালিবানের কতজন যে শহীদ হয়েছেন, তাও ভেবে দেখতে হয়।

সোমবার ২৬শে নভেম্বর ২০০১ বিকাল ৪.৫০ মিঃ আমেরিকার বিশেষ বাহিনীর সৈন্যরা ফিরে আসে। সিআইএ-এর এজেন্ট ডেভিডও তাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি জোট সেনাপতি আবদুল মজিদ রোজীর সঙ্গে আলোচনার জন্য দুর্গের উত্তর পূর্ব টাওয়ারে উঠেন এবং লক্ষভ্রষ্ট একটি বোমার ক্ষতি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

পরবর্তী দিন ২৭শে নভেম্বর, ২০০১ মঙ্গলবার পেন্টাগন থেকে ঘোষণা করা হয় যে, কোন আমেরিকান নিহত হয় নি, পাঁচজন আহত হয়েছে এবং তাদেরকে জার্মানীতে লেন্ডস টুইল রিজিউনাল মেডিক্যাল সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়।

চারজন ব্রিটিশ সৈন্যও আহত হয়। একজন অত্যন্ত মারাত্মকভাবে। কিন্তু ব্রিটিশরা তাদের আহতদের সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করে না। তারা আমেরিকানদের মত মিথ্যাচারে ততটুকু অভ্যস্থ হয়ে ওঠেনি। সম্ভব হলে মিথ্যা না বলে চুপ করে থাকাই তারা পছন্দ করে।

২৬ শে নভেম্বর রজনীর বোমাবৃষ্টি

সিআইএ এজেন্ট ডেভিড সাপ্তাহিক টাইম প্রতিনিধিকে বলেন আজ রাত (২৬ নভেম্বর

www.pathagar.com

২০০১) এই স্থান ত্যাগ করবেন না। তিনি তার রাতে দেখার গগলস মুছতে মুছতে বললেন আজ রাত কালা-ই-জঙ্গীতে দেখার মত শো অনুষ্ঠিত হবে। দুর্গের বিদ্রোহ দমন অভিযানে অদ্যই হবে শেষ রজনী।

সিআইএ এজেন্ট ডেইভ কালা-ই-জঙ্গী প্রাচীর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তার স্ত্রীকে টেলিফোন করলেন সাপ্তাহিক টাইম প্রতিনিধির সেটেলাইট ফোনে। জানালেন সে রাতে তার নামও টিভি নিউজে থাকতে পারে। সমগ্র খবরটি ট্যাপ করে রেখ। আমি তোমায় ভালবাসি প্রিয়া।

মধ্যরাতে আমেরিকান এসি-১৩০ গানশিপ কালা-ই-জঙ্গী দুর্গের উপর দিয়ে উড়া শুরু করল। বোমা বর্ষনের পূর্বে অন্তত পাঁচ বার চককর দিল। তারপর নিক্ষেপিত হলো দুর্গের দক্ষিনাংশে তালিবান অংশে ভবন-ভূমি বিধ্বংসী এবং ভূমি উচ্ছেদনকারী অগ্নি বোমা। দুর্গের দক্ষিণ অংশে উজ্জ্বল সোনালী অগ্নি উপরে উঠতে লাগলো।

এরপর দুর্গ থেকে গোলা বারুদ এবং অগ্নি বোমার এমন দৃশ্য সূচিত হলো যে, শুধু বোমা নয় কালা-ই-জঙ্গীর আকাশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। বিভিন্ন রং এর হাওয়াই বাজীর দৃশ্য দেখা গেল।

বিস্ফোরণ ও এতো বেশি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সে রাতে পনের কি. মি. দূরেও ঘরের দরজা বিস্ফোরণজনিত প্রবল ঝঞ্জা ব্যাত্যয় ভেঙ্গে যায় বা খুলে যায়।

এ রাতে তালিবান বন্দীদের কয়েক শতই শেষ হয়ে যায়। অন্ধকার নিশীতে অপ্রস্তুত তালিবান বন্দীদেরকে মার্কিন বোমা বর্ষনের ফলে যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়- তার তুলনা মানব ইতিহাসে বিরল। অথচ, তারাই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বজাধারী। তাদের অনুকরন ও অনুসরণ মুসলিম বিশ্বের শিশু তরুণ মাতোয়ারা, যুবক বৃদ্ধ অভিভূত, উদ্বেলিত।

কালাই জঙ্গী দুর্গের পতন
(শেষ পাঁচ দিন)

২৭শে নভেম্বর মঙ্গলবার ২০০১

২৬ নভেম্বর দিবাগত রজনীভর বোমা নিক্ষেপের ফলে ৬০০ তালিবান যোদ্ধাদের শত শত নিহত হয় এবং বিদ্রোহী তালিবানদের সকল আশা ভরসার অবসান ঘটে। যারা জীবিত আছেন, তাদেরকে উপরে আসতে বলা হয়। উত্তরাঞ্চলীয় জোট সেনাপতি আবদুল মজিদ রোজী অনুমান করেন, তখনও হয়তো পঞ্চাশ জন জীবিত থাকতে পারে।

অভিযানকালে তালিবান বন্দি শিবিরে খাদ্য, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। তালিবানদের একমাত্র খাদ্য ছিল দোস্তাম বাহিনীর ঘোড়ার গোশত। পূর্ববর্তী সারারাতের বোমা বর্ষনে তালিবানদের সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

একজন তালিবান যোদ্ধা রাতের বেলা দুর্গ থেকে বের হয়ে যান। স্থানীয় লোকজন তাকে ধরে ফেলে এবং বৃক্ষে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়।

বিদ্রোহী তালিবানদের সকল আশা ভরসার দীপ নির্বাপিত হয়েছে মনে করে উত্তরাঞ্চলের জোট সৈন্যরা আনন্দ উৎসবে মত্ত হয়। আমেরিকানদের সরবরাহকৃত বাদামের মাখন, জেলী, ইত্যাদি দিয়ে তারা আনন্দে প্রাতরাশ করে।

কোন এক জায়গায় তিনজনকে আনন্দে হাশিম সেবন করতেও দেখা যায়। সকাল দশটায় আমেরিকান বিশেষ বাহিনী এবং ব্রিটিশ এসএস বাহিনীর সতের জন দুর্গের দ্বাররক্ষী ভবনে একত্রিত হয়। সিআইএ-এর হার্লী ডেভিডসন এবং ডেইভও সেখানে

www.pathagar.com

ছিল।

তার পরিধানে ছিল আফগানী সেলোয়ার কামিজ। হাতে ছিল একে-৪৭। তিনি সেনাপতি আবদুল মজিদ রোজীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন এবং আলোচনা শেষে সিআই এজেন্ট ডেভিডও লোকদেরকে বলেন ব্যাপারটি আজই শেষ করতে হবে।

এই লোকগুলোকে কঠোরভাবে দমন করতে হবে। সেনাপতি রোজী সাবধান করলেন যে- কোথাও কোথাও মর্টার, গোলা বোমা এখনও থাকতে পারে। সতর্ক থাকতে হবে।

২৭শে নভেম্বর ২০০১, মঙ্গলবার

২৭শে নভেম্বর ২০০১, মঙ্গলবার সকাল ১০.৫০ মিঃ যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বাহিনী এবং ব্রিটিশ সৈন্যগণ দুর্গের পূর্ব দিকের বহিঃস্থ কম উঁচু প্রাচীর বরাবর অবস্থান গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বাহিনী পূর্ব রজনীর গোলা বর্ষণ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেন। একজন সৈন্য টাইমস-এর সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা করেন- বিগত রজনীর শো (বোমা বর্ষন দৃশ্য) কি আপনি অবলোকন করেছেন? সাংবাদিক জবাব দেন- দু'ঘন্টা পর্যন্ত উপভোগ করেছি। সত্যিই দেখার দৃশ্য বটে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্ব বিক্রমে তালিবানদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। প্রায় এক শত জোট সৈন্য দক্ষিণ পশ্চিম টাওয়ার বেয়ে নীচে নেমে যায়। অবস্থান নিয়ে তালিবানদের দিকে গোলাগোলি শুরু করে। অন্যরা পশ্চিম টাওয়ারে অবস্থান নেয়। তালিবান এলাকায় বিরাজ করে নীরবতা। গোলাগোলির প্রত্যুত্তরে কোন প্রকার শব্দ ছিল না। তখন আহত ও নিহত জোট সৈন্যদেরকে বিভিন্ন গেইট দিয়ে বের করে নিয়ে আসা হয়।

একজন ইউএস বিশেষ বাহিনীর সৈন্য অগ্রসর হয়ে ব্রিটিশ এস এস বাহিনীকে অভিনন্দন জানায়। তারা উভয়েই বিগত রজনীর ব্যাপক বোমা হামলার পরিণতি সম্বন্ধে অবহিত ছিল। মার্কিন সৈনিক জিজ্ঞাসা করেন আপনার শ্রবণ শক্তি আজ কিরূপ। ব্রিটিশ সৈন্য ছিল নিরুত্তর। মার্কিন সৈন্য বলে আমি জানতে চেয়েছি আপনার কানের পর্দা ঠিক আছে তো? এটা ছিল রসালাপের অংশ।

২৮শে নভেম্বর বুধবার ২০০১

দুর্গের উপরিভাগের তালিবান বন্দী বিদ্রোহের সকল নিদর্শন দূরীভূত হওয়ার পর ২৮শে নভেম্বর বুধবার বেইজমেন্ট ফ্লোরে অবস্থানরত অবশিষ্ট তালিবান সৈন্যদের উপর নতুন ধরনের আক্রমণ শুরু হয়। উত্তর মৈত্রীয় জোটের সৈন্যরা বেইজমেন্টে ডিজেল জ্বালানী ঢেলে দেয় এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দেয় যাতে আগুন এবং ধুয়ায় ভেইজমেন্ট ফ্লোরে অবস্থানরত তালিবানগণ পুড়ে মরে যায়। [সাপ্তাহিক নিউজউইক, ডিসেম্বর ১০, ২০০১]॥

২৯ নভেম্বর, ২০০১

২৯শে নভেম্বর ২০০১ বৃহস্পতিবার উত্তর মৈত্রী জোটের সৈন্যরা বেইজমেন্টের গোলাপী রং-এর একতলা ভবনটিতে তল্লাশীতে যায়। তাতে তখনও প্রায় একশত জন তালিবান যোদ্ধা জীবিত ছিল। ঐ দিন অপরাহ্নে বেইজমেন্ট ফ্লোরে আর্টিলারী রকেট বৃষ্টি শুরু হয়। এ রকেটগুলো বেইজমেন্ট ফ্লোরের প্রধান বারান্দায় বিস্ফোরিত হয়। বন্দীগণ বন্দী সেলে লুক্কায়িত ছিলেন। তাই আর্টিলারী রকেটে তারা খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। সিঁড়িতে প্রচুর পরিমাণ দেয়াল ভাঙ্গাচূর্ণ ইট বালি এবং অন্যান্য ধ্বংস স্তুপের চিহ্ন বিরাজমান ছিল। এগুলোর মধ্যে মনুষ্য দেহের অংশ বিশেষ ছিল প্রচুর।

দুপুর ১.২৫ মিঃ জোট কমান্ডার আকবর দক্ষিণ পশ্চিম টাওয়ার থেকে তালিবানদের অবস্থামূল্যায়ন করছিল। মাঠে দেখা যাচ্ছিল শত শত মৃত ও মৃত্যু পথযাত্রী তালিবান

www.pathagar.com

সৈন্য। জোট সৈন্যরা আস্তে আস্তে তাদেরকে দেখছিলেন। কিছু কিছু মৃত সৈন্যের হাত তখনও বাধা ছিল। জোট সৈন্যরা কাঁচি দিয়ে তাদের হাত বাঁধার রশি কেটে দেয়।

কালা-ই-জঙ্গী দুর্গের প্রাচীরের উপর দিয়ে চারদিক প্রদক্ষিণ করে দুপুর ২.১০ মিনিটের মধ্যে উত্তরাঞ্চল সৈন্যাধ্যক্ষ আকবর ধারণা করেন যে, সকল তালিবান সৈন্য ইতোমধ্যে মরে শেষ হয়ে গেছে। তখন তিনি দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে দুর্গের অভ্যন্তরে অবতরণ করেন। উত্তরাঞ্চলের সৈন্যরা তালিবানদের আত্মঘাতি সাহসিকতায় ছিল ভীত, সন্ত্রস্ত। তালিবান দেখলে তাদেরকে মনে হতো যেন ভূত দেখছে।

উত্তর জোট সৈন্যদেরকে দুর্গ প্রাচীর থেকে দুর্গের অভ্যন্তরস্থ ভূমিতে অবতরণ করতে বাধ্য করা হয়। নিকটেই একজন আহত তালিবান যোদ্ধা তখনও ঘাসের উপর পড়ে থেকে মৃত্যুর প্রহর গুনছিল। তার উপর অপ্রয়োজনীয় বেশি সংখ্যক গুলি ঝেড়ে মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

দুর্গভূমিতে অবতরণ করে উত্তরাঞ্চল যোদ্ধাদের প্রথম কাজ ছিল নিহত তালিবান যোদ্ধাদের থেকে তাদের বন্দুক গোলাবারুদ ছিনিয়ে নেয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে নিহতদের পকেট থেকে তাদের টাকা পয়সা, কলম এমনকি সিগারেট পর্যন্ত যাদের পকেটে পাওয়া গেছে, তা লুট করে নেয়া।

তালিবানদের মধ্যে কম বয়সী নতুন যোদ্ধাদের পকেটগুলো ছিল উত্তরাঞ্চলীয় যোদ্ধাদের ছিঁচকে চুরির লক্ষ্য। কয়েক মিনিটের মধ্যেই উত্তরাঞ্চলীয় যোদ্ধারা তাদের পুরান জুতা ছুড়ে ফেলে দিয়ে তালিবানদের যাদের পায়ে অপেক্ষাকৃত ভাল এবং মজবুত জুতা দেখেছে, তা খুলে বদল করে নেয়।

ত্রিশটি আগুন এবং ধোঁয়ায় জ্বলসে যাওয়া অশ্বের মৃত দেহ হতে নাড়ী ভূঁড়ি বের হয়ে পড়েছিল। এগুলোর দুর্গন্ধ, গান পাউডারের ধুঁয়ার দুর্গন্ধ-সব কিছু মিলিয়ে পরিবেশ ছিল অসহনীয়।

উত্তরাঞ্চলীয় যোদ্ধারা সকল নিহত তালিবানদেরকে বিপদজনক বিদেশী এবং সন্ত্রাসী আখ্যা দেয়। মোহাম্মদ ইয়াসিন নামে একজন যোদ্ধা উত্তেজনা এবং অবিশ্বাস্য গর্ব করে সাপ্তাহিক টাইম প্রতিনিধিকে বলতে থাকে- "আমি চারজনকে হত্যা করেছি। তাদের মৃত দেহও আমি আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারি। অথচ "দূর থেকে গুলি করে হত্যা করা মৃত দেহ সনাক্ত করা খুব সহজ ব্যাপার নয়।"

কালা-ই-জঙ্গী দুর্গের অস্ত্রাগারের আগুন নিভে গেলেও মাঝে মাঝে বারুদে আগুন লেগে অনুচ্চ বিস্ফোরণ হতো। শব্দ শুনে ভীত সন্ত্রস্ত উত্তরাঞ্চলীয় যোদ্ধারা মৃত দেহগুলোর উপর দিয়ে লাফিয়ে অতি দ্রুত নিরাপদ দূরত্বে পালাতো।

কারাবন্দীদের জন্য তৈরী ভূমিতল বেইজমেন্টের এলাকা ছিল অতি বিশাল। দুর্গের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে। বেইজমেন্ট বা ভূমিতলের একটি গৃহ ছিল গুলিতে জর্জরিত ঐ কক্ষে আটকাপড়া পাঁচজন তালিবান যোদ্ধা ছিল তখনও জীবন্ত। ক্ষুদ্র জানালা দিয়ে তাদের দিকে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। তাতেও যোদ্ধারা আশ্বস্ত না হয়ে একে-৪৭ থেকে ক্রমাগত গুলি করে নিশ্চিন্ত হয় যে সবাই মৃত।

বেইজমেন্টে ছিল ঘোড়ার আস্তাবল। এতে প্রবেশ করতে উত্তরাঞ্চল যোদ্ধারা ছিল ভীত, সন্ত্রস্ত। এই ব্লকে গুলি নিক্ষেপ করা হয়। উপর থেকে একটি ট্যাংক নিয়ে এসে আস্তাবলের মৃত দেহগুলোর উপর চালানো হয়। ট্যাংক থেকে চারদিকে গুলি নিক্ষেপ করা হয়।

দুর্গের পশ্চিমাংশের প্যারেড গ্রাউন্ডে একজন আহত তালিবান যোদ্ধাকে হাত পা ছড়িয়ে

www.pathagar.com

পড়ে থাকতে দেখা যায়। তখনও তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলছিল। সে ছিল জীবন্ত। একজন মৈত্রী জোট যোদ্ধা একটি বিরাট পাথর তার মাথায় ছুঁড়ে প্রাণ প্রবাহ বন্ধ করে দেয়। তার কাছেই পড়েছিল একটি রক্তাক্ত দ্বীনী কিতাব।

৩০ নভেম্বর, ২০০২

কালা-ই-জঙ্গী যুদ্ধবন্দী দুর্গে অভ্যুত্থানের ৮ম দিনে ৩০শে নভেম্বর শুক্রবার ২০০১ বেইজমেন্ট ফ্লোরে পানি ছেড়ে প্লাবিত করে দেয়া হয়।

আবদুল হামিদ নামে একজন বন্দী সাপ্তাহিক নিউজ উইকের প্রতিনিধিকে জানায় যে, শুক্রবার রাত বন্দীরা বরফের ন্যায় ঠান্ডা জলে এবং জলের কাছে দাঁড়িয়ে কাটায়। যারা দাড়িয়ে থাকতে পেরেছে তারাই জীবিত থেকেছে। কিন্তু যারা সারা রাত দাড়িয়ে থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল তারা জলে ডুবে প্রাণ ত্যাগ করে। বন্দী আব্দুল হামিদ কুন্দুজে তার পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলে। তাঁকে ইউএস মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সম্মুখীন হয়ত হতে হবে।

আশা করা হয়েছিল যে, পাঁচ ছয়জন তালিবান তখনও হয়ত জীবিত ছিলেন। শনিবার ১১ঃ০০ টায় ছিয়াশি জন ক্ষুধার্ত তালিবান বন্দী বেইজমেন্টের বিভিন্ন কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে। তাদেরকে বস্ত্র, খাদ্য এবং জুতা দেয়া হয়।

এ ছিয়াশি জন বন্দীর মধ্যে একজন ছিল আমেরিকান। তার বয়স বিশ। ওয়াশিংটনবাসী এ বন্দী ছিল আহত। পায়ের উপর ভর করে তিনি দাঁড়াতে পারছিলেন না। তিনি ছিলেন ইসলামে নব দীক্ষিত। পাকিস্তানে এক মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছিলেন। তারপর খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাধনায় আফগানিস্তানে আসেন।

তালিবানদের আত্মসমর্পনের মাধ্যমে কালা-ই-জঙ্গী দুর্গের বিদ্রোহের অবসান ঘটে। তিনটি ট্রাকে করে আত্মসমর্পনকারী ছিয়াশি জন তালিবানকে কালা-ই জঙ্গী থেকে স্থানান্তর করা হয়।

লেখক ঃ গবেষক, সাবেক সচিব।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ ঃ আফগানিস্তান

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ

এককালে 'টস্‌টসে আপেল' বলে খ্যাত ছিলো আফগানিস্তান। এই 'টসটসে আপেল' বলে খ্যাত আফগানিস্তানের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য বৃটিশ ও রুশরা উনবিংশ শতাব্দী থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে আসছে। 'গ্রেট বৃটেন' তখন ছিলো বিশ্বের সেরা শক্তি। এই দু'পরাশক্তির লড়াইয়ে আফগানিস্তানের অবস্থা তখন বাঘে-মোষের লড়াইয়ের নল খাগড়ার বনের মতো। একদিকে রাশিয়ান সাদা ভল্লুক; অন্যদিকে বৃটিশ সিংহ।

আফগানিস্তানে আধিপত্য বিস্তারের জন্য বৃটিশ সিংহ তিন বার যুদ্ধ করে। ১৮৩৯-৪২, ১৮৭৮-৮১ এবং ১৯১৯ সালে তিনটি ইঙ্গ-আফগান দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং প্রতিবারই বৃটিশ সিংহ আধিপত্য স্থাপনে ব্যর্থ হয়। তৎকালে এ্যাংলো-আফগান যুদ্ধের ইতিহাসের একটা কথা প্রচলিত ছিলো- "ওনলি ওয়ান ম্যান ডাঃ ব্রেডন রীচড্‌ অফ জালালাবাদ, টু টেইল দি হরিবল টেইল।" দেশপ্রেমিক আফগানরা ইংরেজদের এমনই কচুকাটা করেছিলো যে, ডাঃ ব্রেডন ছাড়া আর কেউ জান নিয়ে ফিরতে পারেনি। এরপর বৃটিশ সিংহ ও রুশ ভল্লুক উভয়েই বুঝতে পারে, এই টস্‌টসে আপেল বড় শক্ত একে হজম করা সহজ নয়।

রাশিয়া মধ্য এশিয়ার আমুদরিয়া পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলো দখল করে নিয়েই তখনকার মতো ক্ষান্ত-হয় এবং ১৯২৬ সালে আফগানিস্তানের সাথে নিরপেক্ষতা ও অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করে সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু চক্রান্ত থেমে থাকেনি। চক্রান্তের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালের ১৭ জুলাই জহীর শাহ ৪০ বছর রাজত্বের পর সিংহাসন ছেড়ে বাদশাহ আমানুল্লাহর মতো ইতালী চলে যান। এরপর ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত রাশিয়া পর্দার অন্তরালে থেকে আফগানিস্তানে একের পর এক অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে দেশটিকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার প্রয়াস চালায়। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠি বা গ্রুপের মধ্যে আন্তঃকলহ লাগিয়ে দেশটিকে রক্তাক্ত জনপদে পরিণত করে। জহির শাহের বিদায়ের পর এক দশকে তিনজন আফগান প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী রাশিয়ার বন্ধুদেরই এজেন্টদের হাতে ক্ষমতাচ্যুত হন ও সপরিবারে নিহত হন। ১৯৭৩ সালে ১৭ জুলাই সর্দার দাউদ রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখল করে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন এবং তখন যুবা-শ্রেণী এবং

www.pathagar.com

সংস্কারমনা আর্মি এয়ার ফোর্স ও পুলিশের অনেকেই তাকে সমর্থন করেন। এছাড়া প্রথম দিকে বারবাক কারমালসহ বিভিন্ন গ্রুপ ও দাউদকে সমর্থন দেয়। দাউদ এতে উৎসাহিত হয়ে রাতারাতি 'পারবাস' গ্রুপের ১৬০ জন কম্যুনিস্ট কর্মীকে প্রাদেশিক প্রশাসকসহ বড় বড় পদে নিযুক্ত করেন। এর ফলে কম্যুনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে দাউদের জন্য তা কাল হয়ে দেখা দেয়। বাধ্য হয়ে ১৯৭৫ সাথে 'পারবাস' গ্রুপের ক্ষমতা ও প্রভাব কার্যকর ভাবে হ্রাস করে। সেখান থেকেই শুরু হয় দাউদের ভাগ্য বিপর্যয়ের খেলা। ১৯৭৯ এর জুলাই মাসে বিবদমান 'খালক' ও 'পারবাস'রাও অ-কম্যুনিস্ট, গণতন্ত্রমনা সর্দার দাউদকে সপরিবারে নির্মূল করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নূর মোহাম্মদ তারাকীকে ক্ষমতায় বসায়। ১৯৭৯ সালের ২৮ মার্চ নূর মোহাম্মদ তারাকীকে সরিয়ে ডেপুটি মিনিষ্টার হাফিজুল্লাহ আমিন নিজে প্রধানমন্ত্রী হন।

এভাবে রাশিয়ার সহায়তায় একের পর এক অভ্যূত্থান ও পাল্টা অভ্যূত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতার পালা-বদল ঘটান। নির্মম ভাবে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে হত্যা, বন্দী অথবা নির্যাতন চালায়। বিড়াল যেমন ইঁদুরকে সংহার করার আগে দুর্বল করার জন্য খেলা করে ঠিক সেই ভাবে রাশিয়া ১৯৭৩ সাল থেকে আফগানিস্তানের জাতিগোষ্ঠি নিয়ে খেলা করে। এই খেলার সর্দার দাউদ, নূর মোহাম্মদ তারাকী, হাফিজউল্লাহ আমিন ক্ষমতাচ্যুত ও সবংশে ধরাধাম থেকে নিষ্ক্রান্ত হন।

অবশেষে রাজনৈতিক ভাবে দুর্বল এবং দরিদ্র আফগানিস্তানে ১৯৭৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর রাশিয়ার সামরিক বাহিনী এক নগ্ন অভিযান চালিয়ে দেশটি দখল করে নেয়। রুশরা তাদের ১লাখ ৪০ হাজার সেনা এক দশক ধরে ১৫ লাখ মানুষকে হত্যা করে, আরো ১০ লাখ মানুষকে পঙ্গু করে এবং পৌনে দু'কোটি লোক দেশান্তরী হয়। এতো অত্যাচার নিপীড়ন করেও বিশ্বের শ্বেত ভল্লুক রাশিয়া টিকতে পারেনি আফগানিস্তানে। এই দখল করার পাপ তাদেরকে ক্ষমা করেনি। মহাশক্তি ধর রাশিয়ার বিরুদ্ধে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত আফগানরা শুধুমাত্র মান্ধাতার আমলের বন্দুক দিয়ে যুদ্ধ করেছে প্রায় দীর্ঘ নয় বছর। অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র দিয়েও রাশিয়ানরা ঘায়েল করতে পারেনি আফগানদের। টস্‌টসে আপেল বলে খ্যাত আফগানিস্তানকে চিবোতে পারেনি সোভিয়েত রাশিয়া। তাদেরকে কাপুরুষের মত পালিয়ে যেতে হয়েছে আফগানিস্তান থেকে, পরবর্তীকালে নিয়তির নির্মম পরিহাসকে মাথা পেতে নিয়ে পরাশক্তি রাশিয়া নিজেই খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। বর্তমানে এরা বিশ্ববাসীর নিকট হয়েছে করুণার পাত্র।

সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তান থেকে লজ্জাজনক ভাবে বিদায় নেয়ার পর বিভিন্ন উপদলীয় কোন্দলে দেশটিতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। দেশ রক্ষায় এগিয়ে আসে তালেবানরা, তালেবানদের আশাতীত সাফল্যে শংকিত হয়ে পড়ে পাশ্চাত্য শক্তি। তালেবানদের প্রতিহত করতে পূর্বাঞ্চলীয় জোটকে সমর্থন দেয় আমেরিকা। শুধু তাই নয় রাশিয়ার পতনের পরে আমেরিকা খুশী হয়। তাই সদম্ভে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ঘোষণা করে ছিলেন "লাল বিপ্লব সফল হতে দেইনি; সবুজ বিপ্লবও সফল হতে দেবো না।" তাদের সাথে সুর মিলিয়ে বৃটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার বলেছিলেন- "মুসলমানরা তাদের আধ্যাত্মিক উৎসসমূহ পুনঃ আবিস্কার করছে। ইসলামী জীবন বিধান ভিত্তিক তাঁদের রাজনৈতিক শক্তি

www.pathagar.com

আবার সংহত করছে। কারণ, তাঁরা আধুনিকতার তিক্ত ফলের প্রতি বিতৃষ্ণ, তাঁদের অতীত ঐতিহ্যের ঈর্ষা সৃষ্টিকারী গর্ববোধ দ্বারা তাঁরা উজ্জীবিত। মুসলিম উম্মার মধ্যে পুনরুজ্জীবনের এক জাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।"

এই পুনরুজ্জীবনের শংকায় পাশ্চাত্য জগত আজ শুধু আফগানিস্তান নয়; সমগ্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুশেডে নেমেছে। আফগানিস্তান, ইরাক, বসনিয়া, কাশ্মীর, চেচনিয়া তাদের উপলক্ষ্য মাত্র। তাদের লক্ষ্য সমগ্র মুসলিম জাতিকে এই ধরা থেকে নিশ্চিহ্ন করা।

সম্প্রতি যে ভাবে পাশ্চাত্য শক্তি অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র দিয়ে টনকে টন বোমা নিক্ষেপ করে আফগান ভাইদের রক্তে সে দেশের জনপদ রক্তাক্ত করছে, যে ভাবে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে তা মানবতার কোন সংজ্ঞায় পড়ে না। অথচ আজকে তারাই বিশ্বের এক নম্বর মানবতাবাদী বলে নিজেদেরকে জাহির করছে।

নিশাচর প্রাণীরা সূর্যোদয়কে ভয় পায়। তারা চায় মেঘের কুজ্ঝটিকা দিয়ে সূর্য রশ্মির গতিপথ বন্ধ করে দিতে। কিন্তু মেঘ সৃষ্ট কুজ্ঝটিকা ক্ষণস্থায়ী এবং সেটির পক্ষে রবি রশ্মিকে ক্ষণস্থায়ী ভাবে আচ্ছন্ন করে রাখা সম্ভব হলেও স্থায়ী ভাবে এর গতিপথ রুদ্ধ করা সম্ভব নয়। আফগানিস্তানে তালেবানদের সাথে আমেরিকানদের যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে অনেক দিন আগে। কিন্তু প্রতিদিন নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করছে। অথচ বিশ্ব বিবেক এখানে নিশ্চুপ। আর বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দূরে থাক পাশ্চাত্যের ভয়ে নৈতিক সমর্থনটুকু দিতেও কেউ এগিয়ে আসছে না।

ইসলাম ধর্ম মতে মুসলমান একে অপরের ভাই। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাক না কেন, একজনের বিপদে অপর ভাই ঝাপিয়ে পড়বে এটাই আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা। এই শিক্ষা যদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলো গ্রহণ করতো তাহলে কোন শক্তি নেই মুসলমানদের গায়ে হাত দেয়। সবচেয়ে উত্তম ঈমানের লক্ষণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করা। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঈমানের লক্ষণ অন্যায়কে মনে মনে ঘৃণা করা। আমরা ঈমানের দায়িত্ব এবং সময়ের দাবী মিটাতে কি করছি, বিবেকতাড়িত এ প্রশ্ন বারবারই উঠবে।

লেখক ঃ প্রাবন্ধিক।

www.pathagar.com

মার্কিন জনতার চোখে "অপারেশন ইনফিনিট জাষ্টিস"

ড. মাইমুল আহসান খান

বহু মার্কিনী ভেবেছিলেন যে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর পরই বুশ প্রশাসন আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালাবে। কিন্তু ওয়াশিংটন বলতে গেলে ধীরে সুস্থেই সামরিক অভিযান শুরু করে। বুশ প্রশাসনকে ঐ সামরিক অভিযানের জন্য আইনী ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে মার্কিন জনগণের কাছে। কোন আইনে প্রেসিডেন্ট বুশ আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালাবেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, আফগানিস্তানের তদানিন্তন তালেবান সরকারেরই কোন আইনগত মর্যাদা ছিল না।

এই বিতর্কে ওয়াশিংটনের খুব বেশী সময় ব্যয় করতে হয়নি। তিনটি মুসলিম দেশ তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সৌদী আরব ও আরব আমিরাত ১১ সেপ্টেম্বরের পর দ্রুততার সাথেই তাদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয়। পাকিস্তানের সামরিক সরকার তো রীতিমত সামরিক হামলার পক্ষে ওকালতি করে। জেনারেল মোশাররফ - এর ভূমিকা এতটা প্রকাশ্য ও ন্যাক্কারজনক হবে, তা খুব কম মার্কিনীই বিশ্বাস করতে পারছিল।

মার্কিন জনগণ বিশেষ করে মহিলাদের বিরাট অংশই ভাবতো যে তালেবান সরকার মূলত ওয়াশিংটনেরই সৃষ্টি। যারা এই বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষন করতেন, তাদের ভাষ্যও মৌলিকভাবে ভিন্ন ছিল না। দ্বিতীয় মতটি ছিল ওয়াশিংটন সরকার তালেবানদের সরাসরি ক্ষমতায় বসায়নি বা স্বীকৃতি দেয়নি। তবে পরোক্ষ তালেবানের মদদ জুগিয়েছে। দ্বিতীয় এই মতাবলম্বীদের ধারনা যে তিনটি মুসলিম রাষ্ট্র তালেবানদের স্বীকৃতি দিয়েছে, তারা প্রত্যেকেই ওয়াশিংটনের একনিষ্ঠ দালাল রাষ্ট্র তাই ওয়াশিংটনের ঈংগিত ছাড়া ঐ তিনটি মুসলিম সরকার তালেবানদের স্বীকৃতি দেয় নি। তদুপরি আরেকটি বহুল আলোচিত বিষয় ছিল তালেবানদের নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ। মার্কিন মহিলারা তাদের সরকারকে এ ব্যাপারে একেবারেই কোনঠাসা করে ফেলেছিল। মার্কিন মানবাধিকার কর্মীরা সরকারকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করে ফেলেন। সরকারকে মনে করিয়ে দেন যে, ইরানের ইসলামী বিপ্লবের পর মার্কিন প্রশাসন আয়াতুল্লাদের নারী নির্যাতনের দোষে দুষ্ট করার হাজারো প্রচারাদি চালায়। অথচ তালেবানদের

www.pathagar.com

ব্যাপারে কয়েক বছর নিরব ভূমিকা পালন করে।

১৯৮৯ সালে শেষ রুশ সৈন্যটি আফগান সীমানা ত্যাগ করার পর পর মার্কিনীরাও বাহ্যতঃ আফগানিস্তান থেকে পরিপূর্ণভাবে হাত গুটিয়ে নেয়। এর কারণ এখন পর্যন্ত মার্কিন জনগণ জানে না। মার্কিন জনগণকে বলা হয়েছিল যে, ওয়াশিংটন আফগানিস্তান স্বাধীন করে দিয়েছে। তাই আফগানিস্তান নিয়ে আর মার্কিন কোন সরকারকেই মাথা ঘামাতে হবে না। ঐ যুক্তির আলোকেই বলা হয়েছিল যে, তালেবান সরকারকে সামরিক শক্তি দিয়ে উৎখাত করে দ্বিতীয়বারের মত আফগানিস্তান পূনরায় স্বাধীন করা জরুরী ছিল।

১৯৮৯-২০০১ সাল পর্যন্ত তালেবান বা আফগানিস্তান মার্কিন পররাষ্ট্র নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় ছিল না। বর্তমান প্রজন্মের মার্কিনীরা যেমন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির নামই জানতো না এই সেই দিন পর্যন্ত; একই ভাবে আফগানিস্তানও ছিল তাদের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের মত অতীত বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভাল যে, মার্কিনীদের মেজাজে অতীত তেমন স্থান পায় না, এরা বর্তমান নিয়েই মেতে থাকতে পছন্দ করে।

বাংলাদেশকে মার্কিনীদের ঘরে ঘরে পরিচয় করে দেন পপ গায়ক হ্যারিসন। তিনি গান গেয়ে বাংলাদেশের জন্য চাঁদা তুলেন। হ্যারিসনের বাংলাদেশ তাঁর মৃত্যুকালে (গত বছর) পৃথিবীর এক নম্বর দূর্নীতি পরায়ণ রাষ্ট্র হিসেবে অবির্ভূত হয় মার্কিন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, বই-পত্রে ও কাগজে-কলমে। তালেবান শাসিত আফগানিস্তান মার্কিনীদের কাছে হয়ে উঠে নারী নির্যাতন ও আফিম ব্যবসায়ের স্বর্গরাজ্য হিসেবে। তারপরও আফগানিস্তানে সামরিক অভিযানের শুরু করতে বুশ প্রশাসনকে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে মুসলিম বিশ্বের জনমত নিয়ে ভাবনার সময় বুশ প্রশাসনের ছিল না বললেই চলে। তদুপরি বলা হয়েছে যে, মুসলিম শাসকরাই তাদের নিজ নিজ ঘর সামলানোর জন্য যথেষ্ট। বুশ প্রশাসনের সামরিক অভিযান প্রসঙ্গে জেনারেল মোশাররফের আন্তরিক ও এক শত ভাগ আনুগত্য দেখে মার্কিনীরা প্রথমে বিস্মিত হন। পরে সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী মিলিটারী শাসকদের প্রতি সাহস জুগিয়ে ওয়াশিংটন বিরাট ভুল করেছে।

মার্কিন জনগণ সরকারের কাছে জানতে চায় যে, সামরিক অভিযানে কী পরিমান নিরীহ আফগান নারী, শিশু ও বৃদ্ধ মারা যাবে এবং সামরিক অভিযানের শেষ লক্ষ্য কি হবে। শুধু তালেবানদের উৎখাতের মধ্যেই যদি মার্কিন সামরিক অভিযান সীমাবদ্ধ থাকে। তবে এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি মুসলিম বিশ্বে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তখন বুশ প্রশাসন মার্কিন জনগণের কাছে ওয়াদাবদ্ধ হন যে, এবার ওয়াশিংটন ১৯৮৯ সালের মত ভুল করবে না। তালেবান সরকারের পতন ঘটিয়ে আফগানিস্তানকে সম্পূর্ণরূপে গড়ে দেয়ার ওয়াদা দিয়েই বুশ সরকার আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান পরিচালনা শুরু করে। এই মর্মে জাতির কাছে সরকার ওয়াদাবদ্ধ হয় যে, কোন নিরীহ ও নিরপরাধ আফগানকে হত্যা করা হবে না। কেবল সন্ত্রাসীদেরকেই শায়েস্তা করা হবে।

Trudy Govier (একজন কানেডীয় দার্শনিক) মার্কিনী জনগণের ঐ সময়কার

www.pathagar.com

মানসিকতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

"After the attacks on the United States, Americans felt not only vulnerable and afraid but humiliated and furious... When attacked, most people have an impulse to fight back, to hurt the enemy in turn and "get even" and the immediate rhetoric after September 2001, was no exception to the pattern... A revenge attack is simply retaliation, and retaliation is entirely normal in violent conflicts" (A Delicate Balance:.... us about Terorism, Westview, 2002 pp. 43-47) এই কথা বলেই দার্শনিক জানতে চান যে, কীভাবে দুইটি অপরাধ একটি সমস্যার সমাধানে সাহায্য করবে। লেখক সন্ত্রাসীদের দ্বারা মৃত আমেরিকান এবং আমেরিকান সৈন্যদের দ্বারা অসংখ্য নিরীহ আফগানের প্রাণনাশের ঘটনাসমূহকে একই ধরনের অপরাধ বলে চিহ্নিত করেন। লেখক বলেন যে, যদি কেবল আমেরিকানদের জীবনই মূল্যবান, আফগানদের জীবন থাকে মূল্যহীন, তবে সত্যিকার অর্থেই মানবতা আজ বড়ই বিপন্ন। ঐ লেখক বলেন যে, আফগানিস্তানের মাটিতে হাজার হাজার আরব ও পাকিস্তানী যুবকদের ভাগ্য নিয়ে ওয়াশিংটনের কোন দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় নি, কারণ ঐ সব যুবকদের জীবন বুশ প্রশাসনের কাছে মূল্যহীন ছিল। এর কারণ ব্যাখ্যা করে লেখক বলেনঃ "At one point, President George W. Bush and his advisors had proposed to name their antiterorist operation "Operation Infinite Justice" they dropped the label when they realized that it gravely offended Muslims who understand "Infinite Justice" as refering to a cosmic justice better left to Allah than to U.S military forces" (পৃষ্ঠা ৬৭)।

লেখক দুঃখ করে বলেন যে, যুদ্ধের এই মানসিকতার কারণে আফগানিস্তানে মার্কিন অভিযানের প্রতিহিংসা পরায়নতার প্রভাব প্রতিলক্ষিত হয় সর্বত্র। যুদ্ধবাদীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। এই লেখকের মতে কত হাজার বিদেশী যুবক আফগানিস্তানের মাটিতে প্রাণ দিয়েছে তার হিসাব পর্যন্ত কেউ রাখে নি। শুধু তাই নয় যুদ্ধবন্দীদেরকে সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

"By January 2002, the difficult issue of the many other fighters had become apparent. There were Taliban soldiers young and old-presumably with varying degrees of commitment fo the cause and there were thousands of foreign nationals, the so-called Afghan Arabs, fighting along with the Taliban. Northern Alliance forces tended to make deals with the native Afghan fighters and kill off the Arab Afghans..... The United States held that al-Qaeda and Taliban prisoners did not merit prisoner-of- war status because thay were" "illegal combatants" (পৃষ্ঠা ৭০, ৭১)

এই লেখক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, আফগানিস্তানে পশ্চিমারা সামরিক অভিযান চালিয়ে যে নজীর সৃষ্টি করেছে এর পরিনতি মোটেও ভাল হবার কথা নয়। অথচ এই

www.pathagar.com

নিয়ে কেন ভাববার লেখকের বড়ই অভাব। এ্যামনেষ্টি ইনটারনেশনাল এর বরাত দিয়ে লেখক উল্লেখ করেন যে অন্তত সাত হাজার আফগান বন্দীদের বাঁচিয়ে মার্কিনীরা দেখাতে পারতেন যে, তাদের কাছে মানুষের নিশ্চিত জীবন ও মানবিক অধিকার। লেখকের উক্তিমতে মার্কিনীদের আচরণ কেন Northern Alliance বর্বরতার অনুরূপ হলো, তা নিয়ে এই দার্শনিক কোন কুল-কিনারা করতে পারেন নি। এই প্রশ্নের উত্তরের খোঁজেই নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক লিখেছেন প্রায় চারশত পৃষ্ঠার বই "Longitudes & Attitudes: Exploring the World after September 11" তাঁর মতে মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্বের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে তার দেশের পররাষ্ট্র নীতিই দায়ী। কিন্তু এই ব্যাপারে এতদিন মার্কিন জনগণকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। ২০০১ সেপ্টেম্বরের পর এখন সবাই জানতে চায় মুসলমানরা মার্কিনীদের এতবেশী ঘৃণার চোখে দেখে কেন।

"For far too long we have been in bed with Arab and Muslim dictators who, we told ourselves, are more liberal than their people.Therefore, we also told ourselves, better to have pro-American dictators than pro-democratic societies that might be anti-American. This has been very shortsighted, because these pro-American Arab and Muslim regimes have bought their stability by giving their people free rein to hate us and Israel, in their press and on the street .... I would much prefer democratically elected Arab and Muslim leaders we can live with, even if they don't partiicularly-like us , than dictators , autocrats and kings who profess to like us. but whose people............

অনেক মার্কিন বিশেষজ্ঞের মতে মুসলমানদের তেল ও গ্যাস সম্পদ কব্জা করার জন্যই শুধু সব মাথা ব্যাথা বুশ প্রশাসনের। মুসলিম দেশ বা জনগণের ভাগ্য নিয়ে ওয়াশিংটনের কোনই শুভ ভাবনা নেই। কারো কারো মতে বুশ পরিবারের ও সৌদি বহু ধনকুবের এর সাথে রয়েছে রহস্য জনক অর্থনৈতিক সম্পর্ক । এই সম্পর্কের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক। Greg Palast রচিত "The Best Democracy Money Can Buy" গ্রন্থে। এই সাংবাদিক দাবি করেন যে, আরবদের কালো টাকায় বুশ পরিবারের ভাগ না থাকলে দ্বিতীয় বুশ কোনদিনই ক্ষমতায় আসতে পারতেন না।

জেমস ব্যাকার তাঁর সাত শত পৃষ্ঠার "Politics of Diplomat গ্রন্থে বলেছেন যে, ১৯৯১ সালের গাল্‌ফ যুদ্ধের হাজার হাজার কোটি ডলারের মূল যোগানদাতা ছিলেন আরবরা। এমনকি ঐ টাকার হিস্যা পেয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টরা। মিখাইল গরবাচভকে সাহায্যের নাম করে দেয়া হয়ে চার বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পুরোটাই দিয়েছে সৌদী রাজা। আজ মার্কিনী জনগণকে বুঝানো হচ্ছে যে, সৌদী সাহায্যপুষ্ট আরব ও পাকিস্তানী মাদ্রাসা থেকেই সন্ত্রাসীদের জন্ম হয় বিপুল পরিমাণে। অথচ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে বিগত ত্রিশ বছরে সব আরব দেশের সাহায্যের পরিমাণ গত ১৯৯১

www.pathagar.com

সালে গালফ্ যুদ্ধের সৌদী হিসাব বহির্ভূত খরচের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

১৯৯১ সালে গালফ্ যুদ্ধের হিসাবভূক্ত খরচের পরিমাণ ছিল ষাট বিলিয়ন ডলার। আর হিসাব বহির্ভূত খরচের পরিমাণ এর চেয়েও অনেক বেশী। এত অল্প সময়ে এত টাকার খরচের হিসাব-নিকাশ করা সহজ ছিল না বলে আরব রাজা-বাদশারা এমনিতে জোগান দিয়েছে ঐ অর্থ। আমরা এই সবের হিসাব-নিকাশ জানি না। আরব যুবকরা বিশেষ করে শিক্ষিতরা এই সব হিসাব মুখস্ত বলতে পারে। যেমনি ইরানীরা বলতে পারে কেন ১৯৫৩ সালে মোসাদ্দেকের সরকারের পতন ঘটিয়ে শাহকে গদিতে বসানো হয়েছিল। মুসলিম বিশ্বের সাথে ওয়াশিংটনের সম্পর্কের বহুদিক এখনো উন্মোচিত হয় নি। পাকিস্তান, তুরষ্ক, মিশর সহ যেসব মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ঘনিষ্টতা বেশী সেখানেও রয়েছে বহু অজানা কাহিনী। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি মুসলিম বন্ধু রাষ্ট্রই আজ দেউলিয়া এবং মানবাধিকার লংঘনের জলন্ত খনি। এই প্রসঙ্গে মার্কিন মহিলা সাংবাদিক Caryle Murphy তাঁর "Passion for Islam, Shaping the Modern Middle East : The Egyptian Experience" গ্রন্থে বলেন ঃ "Torture of Muslim Brothers by the Nasser regime in 1960s led some of them to radical vision of their mission, which showed up in the ideology of Sayyid Qutb, who himself was tortured. Torture of detainees rounded up after Sadat's assassination so embittered some of its victims that they went on to join Osama Bin Laden,s Al Qaeda" (পৃষ্ঠা ১০০)

মার্কিন প্রশাসন মার্কিন জনগণকে এই সব কাহিনীর কথা জানতে বুঝতে দেয়নি বললেই চলে। কেবলই বলা হচ্ছে মুসলমানরা মার্কিনীদের সৌজন্যবোধের দাপট সইতে না পেরেই প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ে মরছে। কেউ বলবে হয়তো, কথাটি ঠিক। মুসলিম বিশ্বের একমাত্র আনবিক শক্তিধর জেনারেল মোশাররফ এখন যেভাবে বুশ প্রশাসনের কথায় উঠ-বস করছে, তাতে মুসলমানদের অনেকের গায়েই আগুন ধরে যাচ্ছে। পাকিস্তানী ডাক্তার কবে কোথায় কোন যুদ্ধাহত আফগানীকে চিকিৎসা সেবা দিয়েছে, সেজন্যও ডাক্তারকে বন্দী করে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার হাতে তুলে দেয়ার জন্য মোশাররফ ছুটে বেড়াচ্ছে। কী ধরনের সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তান এ প্রশ্ন তুলে মরহুম খোররম মুরাদ বেশ কয়েক বছর পূর্বেই লিখেছিলেন ঃ

"What to say of reciprocity between states, when there is no equal treatment even for citizens from unequal states. For instance, Yusuf Ramzi can be extradited to the USA in the blink of an eye, and without even a fiction of legal proceeding. But can Pakistan get an American extradited in the same manner" (Reciprocity and Beyond, 1997) পৃষ্ঠা ১৯

ঐ মরহুম লেখকের কথাতে আমি বেশী আশ্চন্বিত হইনি। আজ মার্কিনী সচেতন লেখক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাংবাদিকরাই যখন একই প্রশ্ন করে, তখনই কেবল ভাবি মার্কিন-মুসলিম সম্পর্ক আজ কতটা জটিল ও মুসলিম স্বার্থ বিরোধী। ১৯৮১ সালে যখন ইরাকী আনবিক স্থাপনা ধ্বংস করা হলো, তখন মুসলমানরা কাকে নিন্দাবাদ

www.pathagar.com

জানাবে বুঝে উঠতে পারে নি। ১৯৯০ সালে যখন পাকিস্তানকে আনবিক বোমা তৈরীতে বাধা দেয়া হলো, তখন মুসলমানরা দাবি করলেন এই বাধা কেন ভারত বা ইসরাইলকে দেয়া হয় না। এর পর থেকে বহু ঘটনা ঘটে গেছে। Thomas L. Friedman এর ভাষায় ঃ

"[T]hey did approve of bin Laden as the thumb that every young Arab wanted to stick in his ruler's eye, and in America's eye for supporting Israel. Bin Laden was the closest thing they had to an Arab Robin Hood an authentic figure who challenges the power structure. And it is always worth remembering that bin Laden, much as we may detest him, was an authentic person in his own way, that is he gave up the life of a mutimillionaire in Saudi Arabia to go off to Afghanistan to live in a cave and fight the Soviets and then the Americans. He was more authentic in that case than any Arab leader of his generation...They want to arrest their bin Ladens and evict them, but never really challenge them ideologically by laying down a progressive countervision " (পৃষ্ঠা ৩১৭)

তাই এবার সবাই ভেবেছিল যে, বর্তমান মার্কিন প্রশাসন আফগানিস্তান পূণর্গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। অথচ দেখা গেল আফগানিস্তান পূণর্গঠনে ইরানী সাহায্যের চেয়েও মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ অনেক কম। অনেক মার্কিনীদের মতে বুশ প্রশাসন এবারও আফগানিস্তানে কেবল কথার ফুলঝুরিতেই গড়ে দিতে চায়। আগামী পাঁচ বছর প্রায় আশিটি দেশ মিলে আফগানিস্তানের পূনর্গঠনে যে পরিমাণ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি -দিয়েছে, তা বিবিসি (British Brondcasting Corporation)-এর এক বছরের বাজেটের সমান। ভিন্ন হিসেবে দেখা যায় যে, হারভার্ড বা ষ্ট্যানফোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক বাজেটে যা বরাদ্দ রয়েছে এর চেয়েও কম অর্থজোগান দেবে আশিটি রাষ্ট্র আফগানিস্তানে পাঁচ বছর ধরে। সাধারণ আফগানীরা এইসব হিসাব বুঝে না। অথচ পাশ্চাত্যে বসবাসকারীরা -আফগানরা এইসব হিসেবে ওস্তাদ।

বহু মার্কিনীর মতে ১৯৯১ সালের মত এবারও যদি আরবদের অর্থ পাওয়া যেত, তবে ইতোমধ্যেই বুশ প্রশাসন ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়তো। মার্কিনীরা কথায় কথায় বলেন, যদি কোন মুসলিম দেশের শাসককে হটানোর কথা উঠে সেই তালিকার শীর্ষে রাখা উচিৎ সৌদী আরব ও মিশরকে। অথচ প্রশাসন এখন ইরাক ও পরে ইরানকে আক্রমণ করার পায়তারা করছে। বিচারের বানী যদি এভাবে নিভৃতে কেঁদে বেড়ায়, তবে কি মানবতা আরো বেশী বিপন্ন হয়ে উঠবে না ? Trudy Govier এর ভাষায়ঃ

"There's the crucial matter of due legal process, in which fundamental rights and liberties are properly respected in well-conducted trials. Due legal process really matters. From behind your veil of ignorance, you don't know whether you are a criminal, an innocent person with a shaky reputation, or an innocent person with a good repu-

www.pathagar.com

tation. you would want to select peinciples that will protect you in any one of these circumstances. you could be innocent on........

বুশ প্রশাসনের আফগান অভিযান কতটা জনপ্রিয় মুসলিম বিশ্বে তা পরখ করেছে Gallup poll-এর বিশ্লেষকরা। ২০০২ সালের মার্চ মাসে পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে যে ৮০%পাকিস্তানী ৮৬% মরোক্কান, ৮৯% ইন্দোনেশীয় এবং ৬৯% কুয়েতী বুশ প্রশাসনের সামরিক অভিযানের নিন্দা করেছে। (USA Today, Oct. 30-2002 পৃষ্ঠা 11A)

মুসলিম বিশ্বের জনমতকে এইভাবে উপেক্ষা করে কি বুশ প্রশাসন বেশীদূর অগ্রসর হতে পারবে। প্রেসিডেন্ট বুশের preemptive doctrine-এর অধীনে একের পর এক মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানো যাবে, কিন্তু এতে কোন সমস্যার সমাধানই হবে না। এতে শুধু ক্রমান্বয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে পরিণত হবে, যেমনটি হয়েছে ইংরেজদের ক্ষেত্রে।

লেখক ঃ ভিজিটিং প্রফেসর, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আইন বিভাগ ও আফগান বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, এ্যামনেষ্টি, ইউএসএ।

ওসামা বিন লাদেন।

www.pathagar.com

ISBN 984-32-0433-6